চিত্র-সূচী

বিচিত্রা-সূচী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

চিত্র-সূচী

অমোঘ সিদ্ধ

(পঞ্চম বুদ্ধ)

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ
১৩৪৬ সাল

বৈশাখ

প্রথম খণ্ড
১ম সংখ্যা

ধ্বংসের বজ্র অপেক্ষা নির্ম্মাণের মন্ত্র ও বীর্য্য অধিক কার্য্যকরী—যখন ইহা যুগধর্ম্মস্বরূপ উপস্থিত হয়।

ধ্বংসের জন্য যে ত্যাগ ও উন্মাদনা, নির্ম্মাণের জন্য ততোধিক বৈরাগ্য ও উন্মাদনা নাই। ঈশ্বরের নাম ও বীর্য্যরক্ষা—এই দুই অস্ত্র নিয়ে তোমাদের এগিয়ে দাঁড়াতে হবে।

নির্ম্মাণ করতে হবে একদল মানুষ, যারাই নির্ম্মাণশক্তিকে প্রতিদিন গুণান্বিত করে' একটা জাতি গড়ে' তুল্‌বে।

শক্তিপ্রয়োগের দ্বারাই জীবনসিদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি—ইহাই এ যুগের সিদ্ধ-নীতি। আত্ম-প্রস্তুতির অন্য সাধন নাই। নিষ্কাম কর্ম্মই শক্তিপ্রয়োগের সহজ ও উত্তম বিধান।

তোমরা জাতির মধ্যে উপাসনা-মন্ত্র প্রচার কর। জাতিকে জীবনেরই দৃষ্টান্তে সংযমের সাধনা দাও।

যেখানে উপাসনা, যেখানে সংযম, সেইখানে প্রেম, সেইখানেই ঐক্য। বৈরাগ্য-প্রদীপ্ত, নিঃস্বার্থ, জীবন—দ্বন্দ্বহীন হৃদয়—বিশ্বাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

নিরলস হও। অসংখ্য কর্ম্মের মাঝে স্তব্ধ মৌন প্রশান্তি—ইহাই সাধকের লক্ষণ। চিত্ত যত শান্ত হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হবে স্থির, স্নায়ু-চাঞ্চল্যশূন্য, ততই পরমা শক্তিকে আপনার মধ্যে স্থান দিতে পারবে। স্থিরত্ব তামস গুণ নয়—তাই ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় নাই। সতত শুচি, দক্ষ, নির্দ্দ্বন্দ্ব আধার—নিরবচ্ছিন্ন ভাগবত-প্রবাহে অভিষিক্ত হয়ে থাক্‌বে।

তোমাদের যেমন মিথ্যা নাই, তেমনি ইষ্ট ছাড়া আর কোনও সত্যও নাই—তোমাদের পাপ নাই, পুণ্য নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই—তোমরা সিদ্ধ যন্ত্র—সূর্য্যচক্রের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের সঙ্কেতে নিরন্তর ঘূর্ণিত হও। তোমাদের আনন্দের গতি অমৃতধারায় জগৎকে অভিষিক্ত করুক।

চেতনার নৈরন্তর্য্য, শক্তিপ্রয়োগের নৈরন্তর্য্য, কর্ম্মের নৈরন্তর্য্য—এই অনাহত প্রবাহই সত্য জীবন। প্রতিদিন তার গতিবৃদ্ধি হউক। সমস্ত অস্পষ্টতা থেকে তোমরা মুক্ত হও। সরল বিদ্যুদ্দণ্ডের মত মাথা তুলে' দাঁড়াও। প্রশ্ন করিও না উপায়ের কথা নিয়ে, সাধনার সঙ্কেত নিয়ে—ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় প্রভুর ইচ্ছায় বহিয়া চল—গতির মুখে সহজ ভাবেই সকল বাধা অতিক্রম করে' অনন্তে মুক্তি পাবে।

"প্রবর্ত্তকে"র নব-বর্ষ

"প্রবর্ত্তক" চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ইতিহাস, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই ঘটনাবহুল। "প্রবর্ত্তকে"র গতিচ্ছন্দের সহিত একটা সংহতিজীবনের নিবিড় সম্বন্ধ থাকায়, ইহার মর্ম্মকথায় বস্তুতন্ত্র জীবনের স্পর্শে অনুভূত হয়। এইজন্য "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক-পাঠিকাগণ কথা-সাহিত্যের সানুভূতির সহিত জীবনের তাগিদ ইহার ভিতর দিয়া লাভ করেন। "প্রবর্ত্তক" তাই অনেকের জীবন-সঙ্গী।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাকুরুক্ষেত্র উপস্থিত হয়। এই দুর্যোগ-যুগেই প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব। জাতীয়তার নব ঋক্ উচ্চারণ করিতে করিতে সে বাংলার সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়াছিল। বাণী তার ব্যর্থ হয় নাই। সেই মন্ত্র-মর্ম্ম লইয়াই ভারতে জাতি-গঠন-যজ্ঞ লক্ষ্যে পড়ে। বাঙ্গালী এই পথে আজ পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ঘটনা ও অবস্থার পীড়নেও "প্রবর্ত্তক" আজিও নীরব নহে। জাতীয়-জীবনের অমৃত-পরিবেশনের জন্য সে আজিও বাঁচিয়া আছে। সে আজিও বাঙ্গালীকে তাহার বাণী শুনাইবে।

ইউরোপের যুদ্ধে বিশ্বের প্রবল জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মানব-কল্যাণের বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রকাশ হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইউরোপের বিজয়ী জাতিসঙ্ঘ ইহাতে এক বাক্যে সায় দিয়া জগতের পতিত জাতি-সমূহের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ভারতও স্বীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তনের স্বপ্নে আশান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু সে ছিল মরীচিকা, সত্য নহে। ভারতের ভাগ্য ইহার পর অধিকতর মসীময় হইয়া পড়িল। "প্রবর্ত্তক" সেদিন বাহিরের সুযোগ ও সুবিধার বৃথা আশা না রাখিয়া, জাতিকে আত্মস্থ হইয়া আত্মগঠনের পথে চলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিল। সে নির্দ্দেশ আজ শুধু "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেরই" নহে, বাংলার তথা ভারতের অনেক ক্ষেত্রেই তাহার অনুসরণ-নীতি আমাদের চক্ষে পড়ে। বিশ্বাস, অচিরে জাতির একটা বিশিষ্ট অংশ এই শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া বিপুল ও ব্যাপকভাবে গঠন-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবে। অতএব "প্রবর্ত্তকে"র বাণী অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া যাহাতে নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, নব বৎসরে এই শুভ প্রচেষ্টাই সর্ব্বতোভাবে করণীয়।

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রসাধনা

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ায় একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন তলে তলে চলিতে থাকে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-রক্ষা-আইনের চাপে পড়িয়া উহারও অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতেছিল। যুদ্ধ-শান্তির পর জাতির ভাগ্যপরিবর্ত্তনের আশা ছিল। কিন্তু মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ডের অকিঞ্চিৎকর শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বাংলার তরুণ-প্রাণ পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নৈরাশ্যক্ষুব্ধ প্রাণশক্তিকে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতির স্বাধীনতাপ্রয়াস সিদ্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জ্জন তুলিয়াছিল। সে আহ্বান দেশবাসী উপেক্ষা করে নাই। বাংলার বহু প্রতিভাশালী তরুণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তাঁহার ডাকেই বিপুল ছাত্র-বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—দেশবন্ধুর মহাপ্রাণ বিদ্যুতের মতই ঝিলিক্ দিয়া আবার বাংলার রাষ্ট্র-গগন অন্ধকার করিল। তারপর যে দুর্দ্দিনের ইতিহাস বাঙ্গালীর ভাগ্যে মসীময় অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে ক্লান্তি আসে, নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া পড়ে।

জাতি লক্ষ্যপথে অগ্রসর না হইয়া ব্যক্তিপ্রাধান্যের দায়েই অপ্রত্যয়ে, আত্মপ্রবঞ্চনায়, গৃহবিবাদে ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়িল। স্বজাতি-প্রীতি নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

আত্মপ্রীতিতে পরিণত হইল। ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিক্ষোভ বাংলার আকাশ-বাতাস বিষময় করিয়া তুলিল। পথ-নির্দ্দেশ করার আলো নিভিয়া গেল, সেই অন্ধকারে উদীয়মান তরুণ সুপথ খুঁজিয়া পাইল না; উত্তেজনায় বিপথে পা বাড়াইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্র গৃহ-কলহে গ্লানিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রের বৈতাল তাণ্ডব-নৃত্যে মথিত হইল।

তারপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্ল্যামেন্টে বর্ত্তমান শাসনসংস্কার ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এই শাসনসংস্কার বর্জ্জন করার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, বাংলার রাষ্ট্রশক্তি নবোদ্যমে পুনঃ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলে ইহা প্রবর্ত্তিত হইল ও ক্রমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃক অংশতঃ গৃহীত হইল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালী আর কিছু করিবার পথ খুঁজিয়া পাইল না। বর্ত্তমান শাসনসংস্কারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যেমন উপকৃত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার দায়ে জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর ইহা তেমন কাজে লাগিল না। কাজেই বাঙ্গালীর রাষ্ট্রসাধনা একপ্রকার অচল হইয়াই রহিল। ১৯৩৭।৩৮এ বাংলার হৃদয়মণি সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি হওয়ায় বাঙ্গালীর প্রাণে যেটুকু আশার সঞ্চার হইয়াছিল, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাষ্ট্রপতি-পদে পুন-নির্ব্বাচনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সে আশা ও উৎসাহ একেবারে নিভিয়া যায়। বাংলার স্বজাতি-বিদ্বেষ, গৃহ-বিবাদ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বাঙ্গালী জাতির আত্মস্থ হইয়া বাঁচার ও লক্ষ্য সিদ্ধ করার সুপথ যে আবিষ্কার করিতে হইবে, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে বাঙ্গালী যে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ-কামনা অন্তরে এমনভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, যাহা নিরাকৃত করা অল্প আয়াস ও অল্প সময়সাপেক্ষ নহে। বাঙ্গালী জাতি যে সুমহান্ আদর্শ লইয়া মাথা তুলিয়াছিল, সেই আদর্শের পথে ঘটনার পর ঘটনায় ক্রমেই মন্থর-গতি হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গের দৃঢ় ব্যবস্থার প্রবল প্রতিপক্ষতা অস্বীকার করিয়া তাহা অব্যবস্থায় পরিণত করিয়াছিল, যে বাঙ্গালী দেশে শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, যেদিন দেশালাইয়ের কাঠিটা, বস্ত্র-সীবনের সূচটী পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে না আসিলে চলিত না, সেদিন যে বাঙ্গালী বয়কট-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া অন্যান্য প্রদেশকে এই পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিয়াছিল, সেই বাঙ্গালী আজ সর্ব্বক্ষেত্রে ক্লীব ও পঙ্গুর ন্যায় নিরুপায়। বিদেশী, বিধর্ম্মী তাহার দুর্গতি দেখিয়া হাসে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীও স্বজাতি সহতীর্থ হইয়াও, বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করে—ইহা বাংলার কি যে দুর্ভাগ্যের পরিচয়, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমাদের নাই।

বাঙ্গালী স্বাধীনতার অগ্নিবাণী ঘোষণা করিয়া নিজের দিকে চাহে নাই। ঘোরতর দারিদ্র্যকে সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদাসীন হইয়া সে শুধুই চাহিয়াছে দেশের স্বাধীনতা। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সে দ্বিগুণ মূল্যে স্বদেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়াছে বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের নিকট হইতে। অন্য প্রদেশবাসীর শিল্পদ্রব্য বাঙ্গালী অবাধে ক্রয় করিয়াছে, মূল্যের হিসাব করে নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি ছিল না। আপন ঘর দেখার সে সুবিধা পায় নাই। আজ তাই তাহার মাথা রাখিবার ঠাঁই নাই। তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যায়। ৫ কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়াও, আজ তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। দেশের জন্য, জাতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ ও তপস্যার ফল তাহার অদৃষ্টবৈগুণ্যে কু-পরিণাম ঘটায়। আজ তাই বদন বিস্তার করিয়া বলিতে হয়, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

জাতিগঠনে বাঙ্গালী

ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতেই যে বাঙ্গালীজাতি আত্মবৈশিষ্ট্য ও আত্মস্বাতন্ত্র্য-রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যুগোপযোগী শিক্ষা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল—শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র-সংস্কারে যে বঙ্গজননীর গর্ভে রামমোহনের আবির্ভাব, কাব্যে মাইকেল, মনীষায় বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনায় কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, মুক্তিমন্ত্রে বিবেকানন্দ—যে বাংলায়

কর্ম্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রবীর সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ—যে বাংলায় রাষ্ট্রস্বাধীনতায় দলে দলে তরুণের আত্মদান – সেই বাঙ্গালী কি ত্রিপুরীতে হেয়ঃ, অপমানিত হইয়া ঘরে ফিরিল? যে বাঙ্গালীর কণ্ঠে অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হইত, দেশ-প্রেমের অনাহত নির্ঝর ঝরিত, সেই বাঙ্গালী কি আজ নারীসুলভ কোন্দলরত? যে বাঙ্গালী আর্য্যধর্ম্মের যুগোপযোগী সংস্কারসাধন করিয়া অভিনব আচার ও প্রচার আরম্ভ করিল—যে বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুচ্চ আদর্শ স্থাপন করিল—যে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রবাণী সমগ্র ভারতকে দীক্ষা দিল, সেই বাঙ্গালী কি আজ ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের নিম্ন-স্তরে বুদ্ধিহীন, শক্তিহীন, শিষ্টাচারহীন বলিয়া হেয়ঃ, অবজ্ঞেয়, উপেক্ষিত হইল?

বাংলার সেই হিমাদ্রির ন্যায় ধর্ম্মের অহঙ্কার, সাহিত্যের অহঙ্কার, সমাজসংগঠনের অহঙ্কার অবনত করার সাধ্য তো কাহার নাই। বাংলার কবি, বাংলার শিল্পী, বাংলার বৈজ্ঞানিক, বাংলার কর্ম্মী, বাংলার রাষ্ট্রবীর, ধর্ম্মবীর—কোথাও কি তাহার তুলনা আছে? রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ যে অসহযোগ নীতির জয়নিশান উড়ে, তাহার প্রথম উদ্গাতা কি বাঙ্গালী নহে? আজ প্রদেশে প্রদেশে যে বস্ত্রশিল্প, যন্ত্র-শিল্প, পল্লীসংস্কার, পল্লীগঠন—সে সবের মূলে বাঙ্গালীর প্রেরণা কি বীর্য্য দান করে না? মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় লইয়া বাঙ্গালী হাটে বাটে ফেরী করিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে তাঁতীকে সূতা দিয়া কাপড় বুনাইবার সে প্রয়াস বস্ত্রশিল্পের উন্নতির কি আদি প্রেরণা নহে? আজও আমাদের মনে পড়ে—সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বিপিনচন্দ্রের সাক্ষ্যদানে অসম্মতি, তাঁহার দৃঢ়চিত্তে নীরবে কারাবরণ। আমাদের মনে পড়ে—"বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের নিষ্ক্রিয় অসহযোগনীতির বিশ্লেষণ। আমাদের মনে পড়ে—সুরেন্দ্রনাথ, কাব্যবিশারদ জাতির অগ্নিপ্রাণের ইন্ধন যোগাইতে অসমর্থ হইলে, কেমন করিয়া ইংরাজী 'বন্দেমাতরম্' উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', গুহ-ঠাকুরতার 'নবশক্তি' জাতিকে জাগাইয়া রাখিত। আমাদের মনে পড়ে—ইতিহাস ও যুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীনতার ভাবপ্রেরণা 'যুগান্তরে' কেমন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হইত। সেই বাঙ্গালী আজ মরিয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিব না। বর্ত্তমান ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সে রাষ্ট্রশক্তিহীন হইয়া যে নিষ্প্রভ হইবে, নিশ্চিহ্ন হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিব না। যে বাঙ্গালী জাতি-যজ্ঞের অগ্রণী, জাতীয় ঋক্ যাহাদের কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, সে জাতি কেমন করিয়া আবার উন্নতশীর্ষে ভারতের দিশারী হয়, সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় আমরা অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিব।

বাংলার স্বরূপ

জাতির প্রথম জাগরণ নদীর প্রথম অবতরণের ন্যায় ধূলিধূসরিত হয়। মেদিনীর আবর্জ্জনা ধুইয়া নদী যেমন আপনার প্রবাহ সুনির্ম্মল করে, জাতীয় জাগরণস্রোতঃ তেমনি অন্তর্নিহিত আবর্জ্জনা নিষ্কাশিত করিয়া নিষ্কলুষ জীবনগতি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। আমরা আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছি, করিতেছি, ভদ্রতার খাতিরে, লোকলজ্জার হিসাবে কোথাও মনের ময়লা রুদ্ধ করিয়া শোভন-নীতি প্রদর্শন করার প্রয়াস করি নাই। বাংলার স্বভাবপ্রগতি অশোভন উলঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়াও চলে। যাহা প্রকৃতির দান, তাহা প্রকাশ করিতে তাহার কুণ্ঠা নাই, চাতুর্য্য নাই। সরল উদারভাবেই সে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। শক, হূণ, পাঠান, মোগল, ইংরাজকে বাঙ্গালী বিনা কার্পণ্যে উলঙ্গ বুকে অভিবাদন করিয়া লইয়াছে। কেহ যে তাহার হৃদয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে নাই, তাহার জন্য দায়ী বাঙ্গালী নহে। ইহাতে পরকীয় ভাবের অলীকতাই প্রমাণিত হয়। বাঙালী একদিন পার্শী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়া, উর্দ্দী পরিয়া পাঠান-মোগলের শিক্ষা-সভ্যতা সর্ব্বান্তঃকরণে লইতে চাহিয়াছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে কমঠ-ব্রতী সম্প্রদায়কে পশ্চাতে রাখিয়া বাংলার অগ্রশীল জাতি ইংরাজের শিক্ষা ও আদর্শ সবখানি দিয়া কেমন করিয়া লইতে চাহিয়াছে, ডিরোজিও সাহেব হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আজ বিংশ শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল অতীত। ত্রিপুরী কংগ্রেসে নিদারুণ আঘাত পাইয়া প্রতিক্রিয়ার কটু কণ্ঠ পরিশ্রুত হইলেও, আমরা দেখিতেছি—শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী পরধর্ম্ম-গ্রহণের স্বভাব-প্রবণতা বশতঃ এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার ধাতু-

বিরোধী বৈষম্যময় শিক্ষা ও অনুভূতি যাহা সে অবাধে গলধঃকরণ করিয়াছিল, আজ সে তাহা বমন করিয়া দিতেছে। তাহার নিজস্ব প্রেরণা ও অনুভূতি এখনও পরকীয় অবদান-ভারে অনাবিষ্কৃত। তাহার বর্জ্জন-মন্ত্রের মধ্যেই সঞ্চিত আবর্জ্জনা নিরাকৃত করার সঙ্কেত আছে। আমরা শীঘ্রই বাংলার স্বরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইব, এ বিশ্বাস বাঙ্গালীরই আত্মপ্রত্যয়।

প্রতিপক্ষের প্রতি যে ব্যবহার ও আচরণ, তাহা অনেক সময়ে এ জাতির সংযত ও শিষ্টাচারসঙ্গত হয় না। কিন্তু এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী সঞ্চিত কলুষ ক্ষয় করিয়া ধীরে ধীরে আত্মস্বভাব ও আত্মশক্তির অনুভূতি লাভ করিতেছে। আমাদের বিসাক্ত মনোবৃত্তি এমন করিয়াই ক্ষয় পাইতেছে। কিন্তু আজ দিন আসিয়াছে, ইহা যেন প্রতিক্রিয়া হইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে আর অপচিত না করে। তাই আজ প্রকৃতিস্থ হওয়ার দিন উপস্থিত। বাঙালী স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া স্বকার্য্য-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইবে। বাঙ্গালী জাতিকে জয়যুক্ত হইতে হইবে। টানিয়া টানিয়া অতীতকে সে আর দীর্ঘ করিবে না। বাংলায় বাঙ্গালীর অভিনব যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সেই কথাই অতঃপর বলিব।

গঠনের ভিত্তি

বাংলার উত্তরে হিমালয়। গৌরীশৃঙ্গে আজিও যে জ্যোতির্ম্ময় পতাকা উষালোকে পরিলক্ষিত হয়, তাহা বাংলার জয়দ্যোতক। বাংলার দক্ষিণে সাগরোর্ম্মি অসংখ্য কোটী সফেন শীর্ষ তুলিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত উদ্বেলিত করে, উদ্বুদ্ধ করে জয়-গর্ব্বে। বাংলার পশ্চিমে গিরি-সঙ্কট — জাতি-তীর্থের দুর্গদ্বারস্বরূপ। পূর্ব্বে কাননকুন্তলা, গিরিমেখলা, সুদৃশ্য শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বিশাল ভূমিখণ্ড বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-গৌরবের ইতিহাস বক্ষপুটে রক্ষা করিতেছে। এই ৬।৭ কোটী বাঙ্গালীকে লইয়া নব-তীর্থ-রচনার ভবিষ্যদ্বাণী কেন্দুবিল্বে, নান্নুরে উচ্চারিত হইয়া নব-ভূমি নবদ্বীপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ভারতের আর্য্যজাতির বেদধর্ম্ম পরিপাক করিয়া জাতিগঠনের অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ঐক্যবদ্ধ সংহতির উপাদান ও উপকরণ, প্রেম ও রসানুভূতি—মহাপ্রভুর অকৃপণ পরিবেশনে বাঙ্গালীজাতি প্রেম-ধনে ধনী হইয়াছে। জাতিগঠনের এই অমর বীর্য্য পাছে মোক্ষ-ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাই তিনি প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া মোক্ষ-বাঞ্ছা পরিহার করিতে বলিয়াছেন। নবদ্বীপের পর হালিসহর। হালিসহরের পর দক্ষিণেশ্বর। প্রেমের সহিত শক্তির সংযুক্তি—তারই বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। এইখান হইতে দেশ ও জাতি-প্রীতির গঙ্গোত্রীধারায় দেশ ভাসিয়াছে, প্লাবিত হইয়াছে। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে জাতীয় সুখ ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির ঋক্-ধ্বনি উঠিয়াছিল। ভারতও চাহে তাহাই। শাশ্বত সুখের সন্ধানেই আর্য্যজাতির অভিযান। এই অমৃত শুধু জীবনের পরপারে, উহা পঙ্গুর উক্তি। এই জীবনেই তাহা বিধৃত আছে, জাতিকে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে।

এ জাতি চাহিয়াছে সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য। সঙ্গে সঙ্গে চাহিয়াছে সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ক্ষমা। জাতি চাহিয়াছে আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা। সঙ্গে সঙ্গে চাহিয়াছে ইন্দ্রিয়-বল, কার্য্যনৈপুণ্য, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। এ জাতির চাওয়া অন্তর-স্থৈর্য্যের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্রকারিতা, গাম্ভীর্য্যের সহিত সংস্বভাব ও মনের পটুতা, শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। এ জাতি কীর্ত্তিহীন হইয়া বাঁচিতে চাহে না। তাই কুরুক্ষেত্র-সমরে বীরশূন্যা বসুন্ধরা হইলে, মহীপতি পরীক্ষিতের দিগ্বিজয়-বার্ত্তা আমরা অতি গৌরবের সহিত অনুশীলন করি, পর্য্যালোচনা করি। ভারতের ক্ষাত্রবল যুগের পর যুগ ভারত-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। অধঃপতনের দুর্দ্দিন দেখা দিলে, ভারত চাহিয়াছে আত্মধর্ম্ম অটুট রাখিয়া তাহার উপরই পুনঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা। বিগত হাজার বৎসর ধরিয়া আমরা তাই দেখি—বাংলা দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা অপেক্ষা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের গবেষণা অধিক হইয়াছে এবং সে গবেষণায় জীবন লইয়া অগ্নিক্রীড়ার মধ্যে বাঙ্গালী জাতি আবিষ্কার করিয়াছে জাতিগঠনের অমর বীর্য্য। তাই জাতি-সাধনা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই করিতে হইবে। এ জাতির ধর্ম্ম কি, এই লইয়া যে কুতর্কের অবতারণা, তাহা অনাচারী,

লক্ষ্যহীন, পথভ্রষ্ট জাতির উক্তি। নবজাতির অগ্রদূত যাঁহারা, তাঁহারা ইহাতে সময়ক্ষেপ করিবেন না।

জাতি-বৈশিষ্ট্য

আমরা বাংলার এই ৬।৭ কোটী লোক লইয়া জাতি-গঠনের দৃঢ় ধারণা পোষণ করি। এই ধারণা ঘটনা-পরম্পরায় দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপের জাতি-সঙ্ঘে শান্তির বাহ্য প্রলেপে অন্তরে অশান্তি সৃষ্টির সমরায়োজন যেমন করিয়া চলিতেছিল, বিগত ৫২ বৎসর ধরিয়া ভারতের মহারাষ্ট্রসভা তেমনই অখণ্ড ভারতজাতিগঠনের নামে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতির প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, আজ এই যে প্রাদেশিকতার গরল-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে, ইহার পশ্চাতে প্রতিপক্ষের হস্ত নিহিত আছে। আমরা বলিব—উহা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা উপলক্ষ্য। বিশ্ব-প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আচার, পদ্ধতি, ভাষার ভিতর দিয়া জাতিবৈচিত্র্যরক্ষায় সতত সচেতন। এই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ন্ত্রণে শতাব্দী শতাব্দী কাল খৃষ্টের উপাসক হইয়াও, ইউরোপে বৃটন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, রুশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, ভারতেও প্রাচীন যুগে একই আর্য্যজাতির অন্তর্গত হইয়াও কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ ভিন্ন ভিন্ন জাতির ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নরপতিসমূহকে রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে যুধ্যমান দেখিয়াছি।

পরাক্রান্ত কোন নরপতি দিগ্বিজয়ে বিজয়ী হইয়াও, জাতি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের যুগে বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য-গঠনের স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। মোগলসম্রাট্‌গণও এই একই প্রেরণায় ভারতরাজ্য গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। অতীতের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ইংরাজের অখণ্ড ভারতসাম্রাজ্যগঠনে সহায় হইয়াছে। কিন্তু দেশ ও জাতি-বিশেষের মৌলিক ধাতুবৈশিষ্ট্য এইরূপ রাজ্যশাসনে বিনষ্ট হয় নাই। এই দিকে শিথিল শাসনতন্ত্র হইলে, আজও দেখা যায়—সেই ভাষা-ভেদে, আকার-ভেদে এক আর্য্যজাতি হইয়াও তাহারা আজিও আত্মস্বাতন্ত্র্যই চাহে। প্রকৃতির এই অলঙ্ঘ্য বিধান এখনও অকাট্য। ইহার প্রভাব হইতে যখন আমরা এখনও মুক্ত নাই, তখন এই বিষয়ে ঔদার্য্যবশতঃ আত্ম-স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় শৈথিল্য মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া কেহ যেন গ্রহণ না করেন। ইহা দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা বলিয়াই আমরা হেয়ঃ প্রতিপন্ন হইব।

সপ্তকোটী বাঙ্গালী

বাঙ্গালীর পক্ষে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রগঠনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মগঠনে উদাসীন হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে আমরা বলিব—তিনি আজ যে মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত হইয়া "অদ্ভুত ব্যাধি" সন্দর্ভে এক প্রকার বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে সত্যই আমাদের হৃদয় সূচীবিদ্ধ হয়। তাঁহার সহিত সমান মর্ম্ম-যন্ত্রণায় আমরাও অভিভূত হইয়া পড়ি। আজ আমাদের যে অভিমত, তাহা ভিত্তিহীন নহে। বিহার হইতে বাঙালীর বিতাড়ন-ব্যবস্থা ভদ্রতার খাতিরে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। বিহারের নিরক্ষর অধিবাসীদের বর্ণজ্ঞান বাঙালীই দিয়াছে। বিহারের উষরক্ষেত্র আজ যে শ্যামশ্রীমণ্ডিত, তাহা বাঙালীরই অবদানপ্রসূত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিহারের যে গৌরব, ভাষার যে মর্য্যাদা, তাহাও যে বাঙালীরই দান! এই ক্ষেত্রে বাঙালীর যে বিসর্জ্জন-বাদ্য উঠিয়াছে, ইহা সেই প্রাদেশিকতার অমোঘ প্রভাব। ইহা হইতে বিহারবাসী বিরত হইতে পারে না। ইহাতে বাঙালীর পূর্ব্ব প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়া যে অন্তর্দ্দাহ, তাহা একান্ত অসঙ্গত নহে বটে; কিন্তু বাঙালী ইহাতে বিচলিত হইবে না। বাঙলার সীমা নির্দ্ধারণ না করিয়া বাঙালী বিহারের দাবী স্বীকার করিয়া লইবে না। বাঙালার খনিজ পদার্থের আকর-ভূমি, সীমান্তের গিরি-উপত্যকা বাংলার অচ্ছেদ্য অংশ—তাহা যেমন করিয়াই পারে, বাঙালারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও কাছাড়, লইয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, প্রাচীন কামতা-রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া উহা বাংলার অন্তর্গত করিতে হইবে। বাংলায় জাতি-গঠনের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া বাঙালীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ। আমাদের জাতীয়-সঙ্গীতে "সপ্তকোটী কণ্ঠ কল-কল-নিনাদ করালে"

মন্ত্র-শব্দ আছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে লোকগণনার দিনে উহা কি সত্যে পরিণত হইবে না? বাঙ্গালীর আত্মগঠনের এই কর্ম্ম সূচনাপর্ব্ব মাত্র।

আর্য্যজাতি বেদধর্ম্মী ছিলেন। এই আর্য্যজাতিকেই হিন্দুজাতি নামে পরবর্ত্তী যুগে অভিহিত করা হয়। ভারতই এই আর্য্য বা হিন্দুজাতির জন্মভূমি। এ দেশ বিদেশী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও, জন্মগত অধিকার যে জাতির, সে জাতি পরিণামে জয়ী হইয়া দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজ নাম-ভেদে হিন্দু হই, তপশীলভুক্ত হই, মুসলমান হই, খৃষ্টান, জৈন হই, আমরা বাঙ্গালী জাতি। সাত কোটী বাঙ্গালীর এই দেশ,—পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও ঐক্য সংস্থাপিত হইলে ইহা এক বিরাট্ জাতির শক্তিপীঠে পরিণত হইবে। কোন সত্য প্রেরণা অকস্মাৎ একই সময়ে সকলের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করে না। জাতির অধিকাংশ শক্তি বিপথগামীও হইতে পারে। কিন্তু বাঙালীর যে অংশে নব জাতিগঠনের প্রেরণা সুস্পষ্ট হইবে, সেই ক্ষেত্র হইতেই জাতিগঠনের কর্ম্ম সুরু করিতে হইবে। সে অংশ আজ যদি সঙ্কীর্ণ ও অতি অপরিসর হয়, ক্ষেত্রগত এই দৈন্য অন্তঃপ্রেরণার আলোকে দূর করিয়া, তাহাকে প্রসারিত হইতে হইবে বিপুল ক্ষেত্রে। একটা শক্তিশালী সংহতি সমান আকৃতি, সমান আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া যদি দৃঢ় সঙ্কল্পে চলিতে সুরু করে, পথ যতই দুর্গম হউক, ইহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইবে না।

প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রগঠনের সমস্যা আমরা আজ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতে পারি না, যদি বাংলায় জাতি না গড়িয়া উঠে, বাংলার সীমানা সুনির্দ্দিষ্ট হয়। বাংলার দিক্‌নির্দ্দেশ—ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর নিকট তাহা উপেক্ষণীয় নহে। ভারতের ৮টী প্রদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া যে ধারণা, তাহা দৃঢ়-মূল নহে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক কলহেই তাহা প্রমাণিত হয়। ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন সিদ্ধ করিতে চায়, ভাষা ও কৃষ্টি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিতে জাতিগঠনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। এইখানে কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া যে যুক্তরাষ্ট্র, তাহা ভারতের যুক্তরাষ্ট্র নহে—বৃটিশ পার্ল্যামেন্টের দানরূপেই তাহা আমাদের মাথায় চাপিবে। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সময় ও শক্তির অপচয়। এমন কি রাষ্ট্র-স্বাধীনতার যে স্বপ্ন, প্রাদেশিক জাতি-সংহতি গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, উহাও সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইবে। যাঁহারা আজ ক্ষিপ্রবেগে স্বাধীনতার্জ্জনের কামনা রাখেন, তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার আঘাতে আমাদের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

ভারতের ৮টী প্রদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য যৎকিঞ্চিৎ যে না হইয়াছে, তাহা নহে। এই প্রতিপত্তিটুকুর উপর নির্ভর করিয়া যুক্তরাষ্ট্রগঠনের আশা সম্ভবতঃ শীঘ্রই নৈরাশ্যে পরিণত হইবে। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্নিশিখা তাহারই সূচনা করিতেছে। এই ৮টী প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ দলের মধ্যে যে ভেদ তাহা তৃতীয় পক্ষের সৃষ্টি। এই প্রদেশগুলিতে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় প্রাদেশিক জাতিসংহতিগঠনের অন্তরায় হইতেছেন। বাংলায় ঠিক ইহার বিপরীত। সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলই জাতির সংহতির পরিপন্থী হইয়াছেন। এইখানেই নিরুপায় এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদীরা চরম-পন্থী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখেন না। কিন্তু এই চরম পথ যে কি, তাহা ব্যক্ত করার নহে। উপরন্তু তাহা দুঃসাধ্যও বটে। ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয় কিরূপ সমস্যাপূর্ণ, তাহা আর বলিবার নহে। অবস্থা বুঝিয়া ভারতের জাতি-গঠনের বিধাতা হইয়াছেন তৃতীয় পক্ষ। শাসন-সংস্কারের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের খেয়ালও তাঁহারা ঘাড়ে চাপাইবেন। আমরা যতই শৃঙ্গ নাড়ি, বলীবর্দ্দের ন্যায় উহা টানিয়া টানিয়া ভারতে বৃটিশ পার্ল্যামেন্টের আবাদ মাটী চষিয়া করিতে হইবে—এই দিকে সত্যই আমরা নিরুপায়।

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা ও রাজশক্তির প্রতিবাদ

আজ কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের মনীষিরা বলিতে সুরু করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারাই ভারতজাতি-

গঠনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই বাধা তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছাকৃত। ভারতের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—কংগ্রেসের ন্যায় প্রবল রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্রস্বাধীনতার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। এই সংগ্রামের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার যদি হইত, প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের শাণিত অস্ত্রই আমাদের উপর বর্ষিত হইত। আমরা অহিংস প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করিয়াছি। অন্যপক্ষ তদনুযায়ী আমাদের প্রতিহত করার জন্য একপ্রকার অহিংস অস্ত্রই নিক্ষেপ করিয়াছেন। উহাই হইতেছে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা। জাতিগঠন যদি আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এক পথ লইতে হইবে। আর স্বাধীনতার সংগ্রাম যদি আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন মনে করি, তাহার জন্য অন্য পথ। এই পথে যেরূপ সংঘর্ষ, ঘাতপ্রতিঘাত উপস্থিত হইবে, তাহা জয় করিয়াই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে। দক্ষিণপন্থী লইয়াছেন যে সংগ্রামনীতি, বামপন্থী তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্য নীতিও প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। সংগ্রামশীল জাতিকে কিন্তু সতত স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহার প্রতিকূল শক্তি—বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি ছাড়িয়া দিবে না। এই হেতু জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবী যে স্বাধীনতা, তাহার জন্য হিংস অথবা অহিংস যে নীতিই অবলম্বনীয় হউক, জাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এইখানে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। শক্তির অভাব হইলে জাতি নিশ্চিহ্নও হইতে পারে, সংগ্রামশীল জাতির এইরূপ গুরু দায়িত্ব আছে। সংগ্রাম মৃত্যুর মধ্য দিয়াই চলিয়া থাকে। এইখানে অস্ত্রাঘাত অনিবার্য্য হয়, এইজন্য আঘাত নির্ম্মম বলিয়া যে ধৈর্য্যহীন চীৎকার—উহা এই সংগ্রামশীল চেতনারই অভাব।

আমরা বিশ্বাস করি—অগ্রে জাতি, তারপর স্বাধীনতা। এই কথায় কেহ মনে করিবেন না—জাতিগঠন পরিপূর্ণ না হইলে স্বাধীনতার দাবী সম্ভব নহে। দুইটাই যুগপৎ চলিতে পারে। অহিংসা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আজ মহাত্মাও একথা অনুভব করিতেছেন। জয়পুরের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে 'হরিজনে' সম্প্রতি তিনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই কথাই সমর্থিত হয়।

ভারতের ৮টী প্রদেশে কংগ্রেস সংগঠনের সহিত সংগ্রামনীতি চালাইবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। প্রতিবাদে এই সকল স্থান সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জাতি-সংহতি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় জাতীয় রাষ্ট্র-সংহতির মধ্যে আত্মকলহের বিষ-প্লাবন উঠিয়াছে। কর্ণধার তবুও যদি সংগঠনের সহিত সংগ্রাম চালাইতে পারেন—তাঁহার লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলির যে অবস্থা—বাংলার সে অবস্থা নহে। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী কংগ্রেস-মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন; তাঁহারা দেশ শাসন করিতে পারেন, গঠন ও সংগ্রাম তাঁহাদের কর্ম্ম নহে। অতএব স্বাধীনতার সংগ্রাম বাংলায় অন্য প্রকারের হইবে; তাহার মূর্ত্তি বাঙ্গালী কংগ্রেসপন্থী হওয়ায় তাহা অবধারণ করিতে পারে না। তবুও বাঙ্গালী সংগ্রাম-পথে। এই সংগ্রাম হেতু প্রতিপক্ষের কৌশলে সে ত্রিধাবিভক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে সংগ্রামশীল বাঙ্গালীজাতি শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

স্বাধীনতার দাবী, মানবতার দাবী। এই দাবী-ঘোষণার পর জাতির এক বিশিষ্ট অংশ সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। প্রতিপক্ষ প্রবল এবং দৃঢ় সংহতিবদ্ধ। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত বাহুবল তাহার নাই। নৈতিক শক্তিও তুলনায় অল্প মনে হইতেছে। একমাত্র নাগপাশ-বদ্ধ বাঙ্গালীর কণ্ঠে স্পর্দ্ধার সহিত উত্তপ্ত ভাষা উচ্চারিত হইতেছে। এক পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল, অপরপক্ষ বরুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিয়া প্রতিপক্ষকে জলমগ্নও করাইতে পারে। ভাষাও একটা অস্ত্র, ইহার বিরুদ্ধে কণ্ঠরোধ-নীতি প্রযুক্ত হইলে, অতঃপর আমরা কি করিব তাহা ভাবিবার মত দিন আসিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

স্বাধীনতার রথচক্র বজ্র-নির্ঘোষে বাংলায় ছুটিয়াছিল সর্ব্বপ্রথম। আজ যদি দেখা যায়—উহা তির্য্যক্ পথে উপস্থিত হইয়া জাতিকে বিপন্ন করিতেছে, তবে রথকে পিছাইয়া সুপথে স্থাপন করিতে হইবে। এরূপ করিতে হইলে যে নীতি গ্রহণীয়—তাহা লজ্জার নহে, কাপুরুষতাও নহে।

স্বাধীনতার কামনা জাতির অন্তরে জাগ্রত হইলে জাতির প্রাণশক্তি বহুপথে ধাবিত হয়, যে প্রাণ-ধারা সুপথ পাইয়া লক্ষ্যে পৌছায়—সেই পথেই জাতির পরিচ্ছন্ন প্রাণ বিপুল বিস্তৃত অবকাশে চলিয়া থাকে। আমরা যে বাংলায় জাতিগঠনের স্বপ্ন দেখিতেছি, যে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, তাহার দিগ্‌দর্শনের জন্য আমাদের সময় ও শক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্যয় হইতেছে। আমরাও এই বিষয়ে উদাসীন নহি, এই দিক্ দিয়াও আমাদের বলিবার আছে, তাহা ব্যক্ত করিব।

রাষ্ট্র-সাধনায় ভারতের কংগ্রেস অগ্রণী হইয়াছেন এবং কংগ্রেসই স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। কংগ্রেসপন্থীরা সতত সচেতন হউন আর নাই হউন, তাঁহারা যুদ্ধার্থী—তাহা প্রতিপক্ষ সতত স্মরণ রাখেন। আমাদের আইন-সচিব যখন বলেন, বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা নাই, আমরা ইহার জন্য তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাই। স্বাধীনতার জন্য বাংলায় কংগ্রেসী পার্ল্যামেণ্টারী যুদ্ধ নাই। ভারতের ৮টী প্রদেশে যে ইহা চলিতেছে, তাহার প্রতিরোধের জন্য ঐ সকল স্থানে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ চলিয়াছে। বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতেছে নিস্ফল আন্দোলনে। ইহা যেদিন প্রতিপক্ষের ক্ষতির কারণ হইবে, অন্য পক্ষ হইতে যথারীতি উত্তর আসিবে। সংগ্রামক্ষেত্রে অস্ত্রবল যে রকমই হউক, তদনুযায়ী বিরুদ্ধ অস্ত্রের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস সমস্ত দেশ নহে। এমন কি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা আজ বামপন্থীদের স্বতন্ত্র করিয়া সংগ্রামের সাফল্য পথে। স্বাধীনতার সংগ্রাম সকলের জন্য নহে। সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক লইয়া ইহা সিদ্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণপন্থীরা যে সংগ্রাম নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, বামপন্থীদের সে নীতিতে আস্থা না থাকিলে তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সংগ্রাম-নীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। আমরা দক্ষিণ ও বামপন্থী ব্যতীত কোন এক তৃতীয় পক্ষ লক্ষ্যে রাখিয়া কথা বলিতেছি। কেননা এই উভয় পন্থী স্বকার্য্য-সাধনে যে কর্ম্মনীতি ধরিয়া চলিবেন, তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ইঙ্গিতে পথ সাফল্যমণ্ডিত হইলে ইহাদের মধ্যে যে কোন শ্রেণী ভারত-শাসনে অধিকার লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করার জন্য শ্রেণী-বিরোধের আজ আরম্ভ-কাল মাত্র। এই পথ দুর্গম, ক্ষুদ্র এবং অতিশয় জটিলতাপূর্ণ। আমরা এতদ্‌সম্বন্ধে কংগ্রেসের এই উভয় পন্থীর গতি লইয়া গবেষণা করিতে পারি মাত্র, পথ-নির্দ্দেশের অধিকার আমাদের নাই।

আমাদের তৃতীয় পন্থা

আমরা এক তৃতীয় পন্থার কথাই বলিতেছি। এই পথ নিছক সংগ্রাম নহে। অথবা সংগঠনমূলক সংগ্রামও নহে। উহা অমিশ্র সংগঠন। সংগ্রামের জন্য যে সংগঠন তাহা উভয় পন্থীদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। নীতিভেদে প্রকার-ভেদ হইবে মাত্র। কিন্তু আমাদের সংগঠন সংগ্রামের জন্য নহে। সংগঠনই ইহার মূল, সংগঠনই ইহার পরিণাম। আমরা ভারতবাসী এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীও বটে। বাংলায় আমরা এই অমিশ্র সংগঠন-নীতি প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। এই সংগঠনের জন্য বাংলার সীমা-নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে জাতির বৈশিষ্ট্য আমাদের নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান বাংলায় আমরা পাঁচকোটী বাঙ্গালী। বঙ্গভাষাভাষীকে আমাদের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইতে পারিলে আমরা প্রায় ৭ কোটীতে পরিণত হইব। ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমানের কথাই বলিব। আমরা হিন্দু, মুসলমান দুই প্রধান জাতি। সংখ্যা-লঘিষ্ট ও গরিষ্ঠ লইয়া আমাদের দুশ্চিন্তা নাই। উহা যুদ্ধ-কামী বাঙ্গালীকে পরাভূত করার সাময়িক নীতি মাত্র। উহা কোন দিন চিরস্থায়ী হইবে না। তা ছাড়া প্রকৃত-পক্ষে ৫ কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে ৮।৯ লক্ষ মুসলমানের সংখ্যা অধিক বলিয়া ইসলামধর্ম্মীর গরিষ্ঠ জ্ঞান স্থায়ী সুখ সম্পত্তির হেতু নহে। উহা তৃতীয় পক্ষের ব্যবহার-নীতির পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁতার তলায় একাকার হইয়া যাইবে। আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধার্থী নহি, সংগঠনকামী। সংগঠন জাতিকে লইয়া। জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ সংগঠনের অনুশীলনে দূর করিতে হইবে। ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়ের আচার, নীতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই আমাদের

মধ্যে কৃষ্টিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের গুণ-ধর্ম্মের প্রকৃতিগত যে শিক্ষা ও সাধনা তাহা অতি ঔদার্য্যের সহিত আমাদের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। আমরা গীতার সহিত বাইবেল পড়িয়াছি। আমাদের হিন্দুত্ব তাহাতে ব্যাহত হয় নাই। আমরা খৃষ্টের পবিত্র মূর্ত্তি উপাসনা - গৃহে রাখিয়া মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। পয়গম্বরের বাণীও আমরা অবহেলা করিব না। আমাদের এক দেশ, আমাদের এক ভগবান। আমাদের জল-বায়ুর মধ্যে যে উপাদান—তাহা এই পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর আয়ুঃ ও প্রাণ। বিরোধ পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের লক্ষণ। আমরা জাতি-প্রেম সকল বিরোধ মোচনের ব্রহ্মাস্ত্র করিব। এই প্রেম ভারতের দিগ্বিজয়ী শক্তি। এই প্রেমের খ্যাতি তিব্বত, মঙ্গোলীয়া হইতে সিংহল, যবদ্বীপ, আর মিশর হইতে সুদূর চীন-জাপান পর্য্যন্ত মহাভারত রচনা করিয়াছে। আমরা প্রেমেই নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভারতজাতির বিগ্রহ বাংলায় গড়িয়া তোলার বিশ্বাস রাখি।

তৃতীয় পক্ষ ইংরাজ। বিধাতা ভারতের রাজদণ্ড তাঁহাদের হাতে দিয়াছেন। এই রাজদণ্ড কাড়িয়া লওয়ার অধিকার বিধাতার। আমাদের নহে। কাড়াকাড়ির দ্বন্দ্ব-বিসম্বাদ ভারতের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিত আছে। মহাত্মা অহিংস নীতি আশ্রয় করিলেও তিনিও কাড়াকাড়ির দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে শক্তি - পরীক্ষার কুরুক্ষেত্র অস্বীকার করিলে চলিবে না। কাড়াকাড়ির পরিণাম রক্তরঞ্জিত হওয়ার আশঙ্কা আছে"। আমরা একের অধিকৃত বস্তু কাড়িয়া লওয়ার জন্য সংগঠনব্রতী নহি। আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্য হইলে, বিধাতা স্থান সঙ্কুলান করেন। মানুষের কার্পণ্য বাধা দেয়। সাত কোটী বাঙ্গালী যদি জাতি-বিগ্রহরূপে গড়িয়া উঠে তাহাদের সৌভাগ্য, তেজ, ধন, বীর্য্য, রাজ্য, আয়ুঃ, পুষ্টি, রূপ, আধিপত্য, যশঃ, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ভোগ, বৈরাগ্য, মোক্ষ, জাতীয় সকল সম্পদই জাতির মধ্যে স্থান পাইবে। মানুষের কার্পণ্য সত্যপ্রতিষ্ঠ জাতির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে লীন হইয়া পড়িবে। এই পথে যাত্রা দুর্ব্বলের নহে। মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয়ে এই পথ সুগম হয় না। শক্তিমান বিশ্বাসী এই পথের যাত্রী। আমরা যুদ্ধার্থী না হইয়াও জাতির সম্পদ্ ও স্বাধীনতা জাতিগঠনের ভিতর দিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদে অর্জ্জন করিব। নিরলস আত্ম-বিশ্বাসী বাঙ্গালীকে আমরা এই শুভ-বর্ষে এই সংগঠনের পথে আহ্বান করি। এই পথে জ্ঞানস্পৃহা, ধনস্পৃহা, স্বাধীনতাস্পৃহা সবই আছে; নাই প্রতিবাদী মনোবৃত্তি। বিশুদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছায় উদ্বুদ্ধ পুণ্যপূত জীবন-সংহতি প্রেমের অর্ঘ্য দিতে দিতেই সপক্ষ-বিপক্ষ সকলের চিত্ত জয় করিয়া এক অপার্থিব ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই শস্যশ্যামলা বাংলা-দেশেই সম্ভব করিবে। আমরা এই হেতু যুদ্ধকামিদের দূর হইতে প্রণাম করিয়া, বাংলায় সর্ব্বত্যাগী নির্ম্মাণ-যজ্ঞের ঋত্বিকদের সংহতিবদ্ধ হইতে বলি। এই তৃতীয় পন্থাই নব-যুগের অমোঘ অব্যর্থ সিদ্ধ-পথ।

মা ও শিশু

(Walt Whitman থেকে)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ওই শিশুটা মায়ের বুকে ঘুমিয়ে আছে বেশ!
মা-ও কিন্তু ঘুমিয়ে আছে সুখে!
চুপ করো, কেউ ডেকো নাকো তাঁকে!
আমি তাঁকে দেখ্‌বো বারংবার!
দেখ্‌বো এবং আঁক্‌বো ছবি আমার স্মৃতি-পটে!
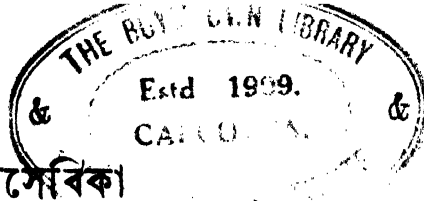
স্বেচ্ছাসেবিকা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রিলিফের কেন্দ্র বসেছে শ্যামগঞ্জে।

তখন বন্যা।

দেখতে-দেখতে জল বেড়ে গেল—দেখতে-দেখতে। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল কেউ কিছু ঠাহর করতে পারলো না। কেউ মাচা বাঁধলো, কেউ বা গাছের সঙ্গে ঘরের চাল বেঁধে তার উপরে সমস্ত পরিবারকে চালান দিলো, আর কেউ-বা দিশেহারা হ'য়ে ছেলেপিলে গরু-বাছুর নিয়ে জল ভাঙতে লাগলো কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যায় কিনা। ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তাটা পর্যন্ত জলের তলায়। থানাটা কোনোরকমে টিকে আছে, কিন্তু দারোগাবাবুর কোয়ার্টার উঠে এসেছে নৌকোতে—তাঁর বাড়ির সবাই তিন দিন ধরে' বসে', দাঁড়াবার নাম করতে পারেনি। পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে একতলা একটা ইস্কুল ছিল, ছিল তাতে কতগুলি বেঞ্চি-টেবিল, আর তার ছাদে ওঠবার সিঁড়ি, হাঁটু পর্য্যন্ত জলের মধ্যে যারা আসতে পেরেছে, তারাই পেয়েছে সেখানে আশ্রয়—মানুষ আর গরু, ছাগল আর মোষ, ঘরের বউ আর ফেরার আসামী, মহাজন আর খাতক, ডিক্রিদার আর দায়িক, পবন কয়াল আর বসিরদ্দি সেখ। একজন যদি কেউ মরে তাকে পোড়াবার বা গোর দেবার পর্যন্ত জায়গা নেই। কেবল জল।

চতুর্দিকে এমনি যখন বিপদ, খবর পাওয়া গেল কোলকাতা থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবিকা আসছেন।

দক্ষিণাবাবু এ এলেকার এস-ডি-ও। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, নূতন মহকুমা পেয়েছেন। বেঁটে, গোলগাল মানুষ, পেটের চেয়ে তলপেটটা বেশী উঁচু, বরং সর্টস পরে' থাকাতে সেইটেই বিশেষ চোখে পড়ে। সার্কেল-অফিসার হয়ে ঢুকেছিলেন, অনেক কুস্তি-কসরৎ করে' সম্প্রতি এই পদোন্নতি।

রিলিফের কাজ দেখতে মফস্বলে এসেছেন। উঠেছেন ডাক-বাংলোয়। সঙ্গে স্ত্রীও এসেছেন জল দেখতে।

হাতের কাছে আমি ছিলাম মোতায়েন, আমার ডাক পড়লো।

সকাল বেলা। ডাক-বাংলোর বারান্দায় লম্বা ইজিচেয়ারে দুই পা মেলে দিয়ে শুয়ে দক্ষিণাবাবু পাইপ টানছেন। সর্টসটা পেটের কাছটাতে গুটিয়ে যাওয়াতে সমস্তটা উরু তাঁর অনাবৃত। আগে সিগারেট খেতেন দেখেছি, এস-ডি-ও হওয়ার পর থেকে পাইপ ধরেছেন।

পাশে একটা চেয়ারে বসে' তাঁর স্ত্রী উলে কি একটা বুনছেন ধরে' ধরে'। তাঁর নাম কী জানিনা, পরোক্ষে আমরা তাঁকে দাক্ষায়ণী বলতাম। আগে কী সেলাই করতেন কে জানে, ইদানি এস ডি-ও হওয়ার পর থেকে উল ধরেছেন। সময়ে অসময়ে সব সময়ে হাতে তাঁর কাঁটা আর উলের বল। আগে কখনো তাঁকে বাইরে বেরুতে দেখেছি বলে' মনে পড়ে না, মানে যখন আমরা এক ষ্টেশনে ছিলাম—আমার বাড়ীতে যখন এসেছেন, পায়ে-চলা দূরত্ব—সেইটুকুও তিনি গাড়ী করে'ই এসেছেন, আর যতদূর মনে হয়, জানলা তুলে। এখন, এস-ডি-ও হওয়ার পর থেকে সবাইর সঙ্গে কথা কন, যেখানে সেখানে বেরোন, যার তার সঙ্গে বসে, লান্‌স খান। স্বামীকে কর্তা না বলে' সাহেব বলেন। স্বামীকে যদি স্কাউট বা ব্রতচারী নিয়ে মাততে হয়, উনি মাতেন গার্ল-গাইড নিয়ে। সভায় স্বামী বক্তৃতা করেন আর উনি করেন পুরস্কার বিতরণ। তাই এই বন্যার সময়েও তিনি তাঁর কর্তব্যটুকু করতে এসেছেন। সব চেয়ে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে, মাথায় তিনি কাপড় রাখেন না, ওটা নিতান্তই বাঙালীয়ানা। বয়েস তাঁর চল্লিশ পেরোক, কিন্তু এই বয়েসে ইউরোপের মেয়েরা 'ফিট য়্যাজ এ ফিড্‌ল'—আর, সাব-ডিপুটি থেকে এস্-ডি-ও পাড়াগাঁ থেকে বিলেত যাওয়ারই কাছাকাছি।

কাছে এগোতেই দক্ষিণাবাবু আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, 'এখন এর ব্যবস্থা করুন। ডাক-বাংলো তো আর ছাড়া যাবে না।'

উলের ঘর-গোণা বন্ধ রেখে দাক্ষায়ণী বললেন, 'একমাত্র ডিষ্ট্রিক্ট-অফিসার এলেই ছেড়ে দিতে পারি। তার আগে নয়।'

কিছুকাল চিন্তা করে' বললাম, 'নবীন প্রামাণিকের বাগান-বাড়িটা খালি পড়ে' আছে, সেটাতে ওঁরা থাকতে পারবেন অনায়াসে।'

'তবে সব ঠিকঠাক করে' রাখুন গে, বিকেলের ট্রেনেই ওরা আসছে।' এক পা তুলে এনে আরেক পায়ের উপর চাপিয়ে পা দোলাতে-দোলাতে দক্ষিণাবাবু বললেন, 'ও-সব আপনার উপর ভার রইলো। আমি পারবো না ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে।'

অভিজ্ঞের মতো সূক্ষ্ম একটু হাসলাম।

চলে' যাচ্ছিলাম, দাক্ষায়ণী বললেন, 'আমার নৌকো কী হ'ল?

'বড়ো-তরপের বাবুরা পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।'

'কথা ছিল তো আজ সকালে আসবে।'

খোঁজ নিচ্ছি।'

'এ-দিকে জল কমে' যাক আর-কি।' দাক্ষায়ণী মুখ ভার করলেন: 'এখান থেকে জোগাড় হয় না?'

'নৌকো সব এখন বাড়ি বনে' গেছে। টাবুরে নৌকোয় চড়ে' বন্যা দেখতে কি সাহস করেন?'

'না', গ্রীন-বোট আসুক।' দক্ষিণাবাবু আপত্তি করলেন: 'যা জল, দু' হপ্তার মধ্যে নামবে না। গ্রীন-বোট এলে একদিন একটা বেশ পিকনিক করা যাবে। বড়ো-তরফে এক্ষুনি লোক পাঠান। পি-ইউ-বিকে আমি বলে' দিচ্ছি, দুটো দফাদার দেবে।'

ষ্টেশনে বিকেলে আমিই গেলাম শুধু রিসিভ করতে।

ব্র্যাঞ্চ-লাইনের ষ্টেশন, ঘাস-চাঁছা মাটির উপর কাঁকর বিছিয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম। টুপি-মাথায় মাষ্টারবাবু বেরিয়ে এসে হাঁকলেন: 'ঘণ্টা।'

ঢং ঢং করে' কতগুলো ঘণ্টা পড়লো। বুঝলাম আগের ষ্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়েছে।

আমাকে দেখে বললেন, 'এ কি, আপনি? কেউ আসছেন নাকি? কে?'

'লেডি-ভলানটিয়ার।'

'এখানে কী কাজ?'

'দেশের কাজ। বন্যায় সাহায্য করতে আসছেন। গাড়িটা খানিকক্ষণ দাঁড় করাবেন মশাই।'

'ক'জন?'

'য' জনই হোক, পর-পর দু'-দুটো সিঁড়ি ধরে'-ধরে' নামতে হবে। মাঝপথে বলে' বসবেন না যেন, ঘণ্টা!'

মাষ্টার-বাবু হাসলেন, আর তাঁর হাসি মেলাবার আগেই এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল।

থার্ড-ক্লাস মেয়ে-কামরার দরজায় উৎসুক একটা ভিড় দেখলাম। সাড়ির স্থূলত্ব লক্ষ্য করে' বুঝলাম, এঁরাই। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলাম। বললাম, আমি ওঁদেরকে নিতে এসেছি।

এক, দুই, তিন, চার।

বললাম, 'সঙ্গে আর কেউ আছে?'

দলপতিনী যিনি, তিনি বিধবা, বয়েস প্রৌঢ় বললেও প্রগাঢ় বলতে হবে। আর তিনটি আপাত-দৃষ্টিতে কুমারী—বয়েস আঠারো থেকে আটাশের মধ্যে। দলপতিনী চোখের কোণায় একটু খোঁচা দিয়ে বললেন, 'মানে সঙ্গে কোনো পুরুষ এস্কর্ট আছে কিনা জিগ্‌গেস করছেন? না, নেই। দরকার হয় না।' শেষের কথা কয়টা ঠোকর-মারা।

'এই আপনাদের জিনিষ-পত্র?' গোটা দুই ট্রাঙ্ক, বিছানা ও বাসনের একটা ছালার দিকে চেয়ে সভয়ে জিগগেস করলাম।

'তাড়াহুড়ো করে' বেরিয়ে পড়েছি,' দলপতিনী বললেন, 'কোথায় কি এল না এল নজর দিতে পারিনি। এই চন্দ্রা, খাবারের ঝুড়িটা নেমেছে তো?'

'হ্যাঁ গো, নেমেছে'। কথাটা একটু নেকিয়ে যিনি বললেন বুঝলাম, তিনিই চন্দ্রা।

'এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে?' দলপতিনী গম্ভীর গলায় জিগগেস করলেন।

'এখানে একটা বাগান-বাড়ি আছে, সেখানে আপনাদের জায়গা হয়েছে।'

'বাগান-বাড়ি কি গো?' দলের ভিতর থেকে কে-আরেকটি মেয়ে আর্ত্ত স্বরে হেসে উঠলো, ও আরেকজনের গায়ে চিমটি কাটলো।

'চুপ কর্, নিমু।' আমার দিকে চেয়ে দলপতিনী গম্ভীরতরো গলায় বললেন, 'সেটা আবার কী?'

লজ্জিত বিনয়ে বললাম, 'এখানে বাড়ি-ঘরের বড়ো অভাব। এক ডাক-বাংলো, তাও আজ তিন দিন এস-ডি-ও সস্ত্রীক অকোপাই করে' আছেন। আর যা সব আছে হয় পাটের গুদোম, নয় বাজারের ছাউনি। সেখানে তো আপনারা থাকতে পারেন না?'

'দেশের কাজে নেমেছি', সর্বকনিষ্ঠাটি তেজী গলায় বললে, 'গাছতলাতেও থাকতে পারি।'

'ফাজলামো করিসনে, পুঁটি।' দলপতিনী ছোট্ট একটি ধমক দিলেন। বললেন, 'বাগান-বাড়ি বলতে আপনি কী বোঝেন?'

হাসি পেল, কিন্তু সাহস হ'ল না হাসতে। বললাম, বাড়ি বুঝি। নবীন প্রামাণিক পিওনি করে' বিস্তর পয়সা করেছে। তারই এই বাড়িখানা। ছেলেরা আসামে ব্যবসা করে, এ-বাড়ির দিকে নজর নেই। বছর খানেক ছাড়া পড়ে' আছে।'

'বাঁচা গেল।' নিমু বা নির্মলা বললে।

'সব গোছগাছ করে' রেখেছেন তো?' দলপতিনী জিগগেস করলেন।

'তা এক রকম হয়েছে।'

'তক্তপোষ?'

'দু'খানা পেয়েছি।'

'উনুন?'

'পাতা আছে।'

চন্দ্রা চেঁচিয়ে উঠলো: লণ্ঠন কটা পাওয়া যাবে জিগগেস করো, মায়া-দি।'

বললাম, 'কটা দরকার আপনাদের?'

মায়া-দি বললেন, 'লণ্ঠন-ফণ্ঠনে হবে না, মশাই। একটা হ্যাসাক কি পেট্রোম্যাক্স জোগাড় করে' দেবেন।'

'না, তবু গোটা দুই চাই।' পুঁটি বললে, 'ঐ হিঁ-হিঁ করা আলো জ্বালিয়ে ঘুমুতে পারবো না মায়া-দি।'

ষ্টেশনের বাইরে গাঁয়ের রাস্তায় একটা বটগাছতলায় এসে থামলাম।

মায়া-দি বললেন, 'কি করে' আমাদের যেতে হবে?'

অপরাধীর মতো বললাম, 'গরুর গাড়ি।'

মায়া-দি হাসলেন: 'তা হলে স্থূল-পদার্থ বলে' কিছু এখনো বর্তমান আছে এখানটায়?'

বললাম, 'জল হচ্ছে ইনটিরিয়রে, মাইল পাচেঁক উত্তর থেকে সুরু।'

'এ ঠিক পুরীর মতো হলো।' চন্দ্রা বললে, 'পুরীতে নামলাম অথচ সমুদ্রের দেখা নেই।'

'তোর দেখি বেশ কবিত্ব আসে।' মায়া-দি ভাবুকের মতো ছোট্ট একটি ভ্রূকুটি করলেন।

'ঐ যে গাড়িটা।' পুঁটু আর নিমু উল্লসিত হয়ে উঠলো।

গাড়িটা নামানো, তার মানে পিছনটা উপরে তোলা। ওরা দুজনে পিঠ ভেঙে হুড়মুড় করে' ছইয়ের ভিতরে ঢুকে পড়লো। এবং উল্লাসের মাত্রাটা এত সীমান্তে এসে পড়লো যে গাড়ির সমুখটা উঠলো আকাশে লাফিয়ে প্রায় একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট।

মায়া-দি আমার উপর প্রায় মুখিয়ে উঠলেন: 'এ কি, আপনি কি একটা মানুষ-মারা কল নিয়ে এসেছেন নাকি? এটা কি মানুষে চড়ে না এটাতে ইঁট বয়? ডেকে নিয়ে আসুন আপনার এস-ডি-ওকে। কাণ্ডজ্ঞান বলে' কিছু আপনাদের নেই?'

কিছু উত্তর দেবার আগেই শকটস্খলিতা মেয়ে দুটি হাসির একটা ফেনিল ঢেউ তুললো। পুঁটু বললে, নিমুটা কী মোটা, মায়া-দি!'

কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'আপনাদের লাগে নি তো?'

'পড়ে' গিয়ে লাগেনি, কিন্তু পড়বার আগের মুহূর্তে ভীষণ লেগেছিল।' পুঁটুই বললে।

'ও আমি চড়তে পারবো না।' মায়া-দি মুখ ভার করে' চিবুকে দুটি ভাঁজ ফেললেন। বললেন, 'আপনি কি করে' যাবেন?'

'আমার সাইকেল আছে।'

'আপনাদের এস-ডি-ও কি করে' গেছেন?'

'ঐ সাইকেলে।'

'তাঁর স্ত্রী।'

'এই গরুর গাড়িতে।'

'তাঁর না-হয় স্বামীর সঙ্গে টুর করা অভ্যেস আছে, কিন্তু জানেন, আমরা কোলকাতা থেকে আসছি, একটা ট্যাক্সি-ম্যাক্সি জোগাড় করতে পারলেন না?' মায়া-দি অন্তরাল থেকে একটি রুমাল বার 'করে' মুখ ও গলা মুছলেন। বললেন, 'আমরাও কষ্ট সইতে পারি। ক' মাইল এখান থেকে? আমরা হাঁটবো।'

'না, না, উঠে এসো গাড়িতে।' পুঁটু আবার পিঠ ভেঙ্গে গাড়িতে উঠতে গেল। বললে, 'ভেতরে খড়-বিছানো আছে, মায়া-দি। সে একটা চমৎকার থ্রিল হ'বে, বসে'-বসে' টলতে টলতে যাওয়া। চলে' আয় নিমু। হামাগুড়ি দিয়ে আসিস যেন।'

গাড়োয়ান, সবেদ আলি বললে, 'আমি ধরে রাখছি, আপনাদের ভয় নেই।' চন্দ্রা মায়াদিকে আকর্ষণ করলে, 'চলে' এসো, কি আর করা। দেশটা এমনি এখনো পিছনে।'

একে-একে সন্তর্পণে সকলেই সমারূঢ় হলেন। সবেদ গরু জুতলো।

ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ শব্দে গাড়ি চলেছে। পাশে আমি, সাইকেলে, স্লো রেসের কসরৎ করছি আর গাড়ির ভিতরে নির্মলা আর পুঁটুর ঢলে'-ঢলে' পড়া হাসির উচ্ছলিত শব্দ শুনছি।

মায়া-দি মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি পুলিশের লোক?'

'তা হলে কি আপনারা নিশ্চিন্ত হন না ভীত হন?'

'সোজা উত্তর দিন?'

'আজ্ঞে, না।'

'তবে কী আপনি? ছোট-ডেপুটি?'

'আজ্ঞে' তা-ও নয়।'

'তবে কী?'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করে' বললাম, 'সাব-রেজিষ্ট্রার।'

'পোষ্টাফিসে চিঠি-পত্র রেজেষ্ট্রি করেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তারপরে মর্মান্তিক একটা স্তব্ধতা শুনলাম। বুঝলাম আমার চাকরিটাতে ও'দের মন ওঠেনি।

নবীনের বাড়িতে যখন পৌছলাম, তখনো দিন আছে।

'এই বাড়ি।' মায়া-দির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল।

'কিন্তু বা, বাগান কোথায়?' পুঁটু হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না।

'চশমা তো একটা চোখে দিয়েছিস, চারদিকে এই সব বাগান দেখতে পাচ্ছিস না?' নির্মলা চারপাশের আগাছার জঙ্গল দেখালো।

বস্তুত এত অল্প সময়ের মধ্যে পরিত্যক্ত বাড়িটার সম্পূর্ণ পরিচর্যা করা সম্ভব হয়নি। স্বীকার করতে হবে বাইরে থেকে বাড়িটার চেহারা বিশেষ আকর্ষণ করে না, কিন্তু ভিতরে এর অনেক জায়গা, অনেক অবকাশ। উঁচু ভিতের উপর পাকা মেঝে, ফাঁকা ঘর, ঢালা বারান্দা, বাঁধানো ঘাট, উঠোনের এক পাশে সিমেন্ট-করা খানিকটা জায়গায় টিউব-ওয়েল। ঘুরে-ফিরে দেখে মায়া-দির বিশেষ অপছন্দ হলো না। কিন্তু চন্দ্রা বিপদ বাধালো। যেন কী সর্ব্বনাশ হয়েছে মুখের এমনি চেহারা করে' বললে, 'বাথরুম কোথায়?'

আমতা-আমতা করে' বললাম, 'ঘাট আছে, টিউব-ওয়েল আছে—'

মায়া-দি মুক বেঁকিয়ে বললেন, 'এমন বুদ্ধি না হলে এই দশা! ও-সব বে-আব্রু জায়গায় আমরা বেরুবো কি করে' শুনি? শিগগির একটা বাথ-রুম তৈরি করে' দিন।'

লোকজন ছিল, ছেঁচা-বাঁশের দুটো বেড়া বেঁধে বারান্দার খানিকটা ঘিরিয়ে দিলাম।

'এতেই হবে।' মায়া-দি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'এখন তোলা-জলের বন্দোবস্ত করতে হয়। বড় একটা ড্রাম, কিম্বা গোটা কয় বড় বালতি চাই, আরেকটা চাকর। এবার আমরা গা ধোবো। দু' খানা সাবান এনে দেবেন দয়া করে'। আর কিছু চা।'

কুন্ঠিত হয়ে বললাম, চা-টা আমার ওখানেই হতে পারে, যদি অনুমতি করেন।'

'না, না, সব কাজে আমরা নিজের উপরই নির্ভর করতে চাই। কেৎলি, পট, টিনের দুধ, চিনি, স্টোভ সব আমাদের সঙ্গে আছে। একটু চটপট করবেন দয়া করে'। আর আলো।'

'রাত্রের খাওয়াটা কিন্তু আমার বাড়িতে—'

মায়া-দি হাসলেন। বললেন, 'না, আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট করতে হবে না। ও-সব আমরা নিজেরাই যেমন তেমন করে' সেরে নেবো। দেশের কাজে নেমেছি অমন অনেক অসুবিধাই আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। একটা শুধু চাকর জোগাড় করে' দিন যে তেল-নুনটা কিনে আনতে পারে।'

দক্ষিণাবাবুর কাছে এলাম। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে ভিতরে বসে' তিনি কি ইনকোয়ারির রিপোর্ট লিখছেন। দাক্ষায়ণী পাশে বসে' উল বুনছেন।

আমার দিকে মুখ তুলে দক্ষিণাবাবু জিগ্‌গেস করলেন: 'কি, এসেছে সব? সব ঠিকঠাক?'

সবিস্তারে সব কাহিনী বললাম। দাক্ষায়ণী মুচকে-মুচকে হাসলেন, কিন্তু দক্ষিণাবাবু হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে চেয়ারে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে বিস্মিতমুখে বললেন, 'বলেন কি মশাই, সঙ্গে দু'খানা সাবান নিয়েও আসে নি?' তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, 'তুমি একবারটি ওদের ওখানে গিয়ে দেখে এসো না, কি-কি অসুবিধে হচ্ছে।'

'বয়ে গেছে। ওরা নতুন এসেছে, ওদেরই তো আমার সঙ্গে আগে এসে দেখা করা উচিত। ওরা এলে, পরে আমি রিটার্ণ ভিজিট দেব।'

'আহাহা, ওরা তো আর অফিসারের স্ত্রী নয়।' দক্ষিণাবাবু স্ত্রীকে গেলেন বোঝাতে কিন্তু সমস্ত শরীরে ক্রুদ্ধ একটা দৃপ্তি নিয়ে দাক্ষায়ণী পাশের ঘরে অন্তর্ধান করলেন।

পেট্রোম্যাক্সটা তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। বললেন, 'দেশের কাজে এসেছে, কেরোসিনের ডিবে জ্বালাতে বলুন গে।'

এখান-ওখান থেকে কয়েকটা লণ্ঠন জোগাড় করে' পাঠিয়ে দিলাম। তারপর বাড়ি এসে স্ত্রীর বাক্স থেকে দু'খানা সাবান চুরি করলাম আর চেয়ে নিলাম দু' মুঠো চা। চাপরাশিকে বললাম, 'দিয়ে আয়।'

খবরটা এখানকার সবলেই পেয়েছে, কিন্তু আমার তীক্ষ্ণ চক্ষু স্ত্রী পেয়েছেন যেন ভিতরের খবরটা। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা, রাজ্যে আর লোক নেই, তোমার কেন ওদের জন্যে মাথা ব্যথা? জলে পড়ে' থাকে, জলেই ডুবুক না।'

'তুমি বলো কি, বীণা? কোনোদিন তো আর খবরের কাগজ পড়লে না, নইলে মায়া দেবী, চন্দ্রা দেবী, নির্মলাবালা—এদের নাম শুনে ভক্তিতে তুমি দশায় পড়তে।' দু' আঙুলের ফাঁকে খানিকটা জায়গা দেখিয়ে বললাম, 'এত বড়-বড় অক্ষরে-অক্ষরে ওদের নামে খবরের কাগজের হেড-লাইন ছাপা হয়। প্রকাণ্ড দেশকর্মী।'

'বয়েস কত?' বীণার প্রশ্নটা মর্মভেদী।

'মেয়েছেলের বয়েস বলতে পারি এমন আমার সাধ্যি নেই।'

'বিয়ে-থা হয়নি? ছেলেপুলে?'

'বলতে পারি না।'

'বলতে পারো না কি গো? চেহারা দেখে বুঝতে পারো না হিঁদুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি না!'

'জেল-ফেল খেটেছে, এখানে-ওখানে রিলিফ-ওয়ার্কে ঘুরে বেড়ায়, কত বড় কাজ, কত বড় দায়িত্ব—ও-সব জঞ্জালের বালাই নেই বলে'ই মনে হচ্ছে।'

'জেল খেটেছে কি গো?' বীণা আমার জামার প্রান্তটা চেপে ধরলো: 'তবে ও-সব জায়গায় তোমাকে কিছুতে যেতে দেব না।'

তবু, বলা বাহুল্য, আমি গেলাম। স্বেচ্ছাসেবিকারা তখন প্রক্ষালন ও প্রসাধন সেরে চা খাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই মায়া-দি মুখিয়ে উঠলেন। দু'খানা সাবানের একখানার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে' বললেন, 'এ সাবান কি মানুষে গায়ে দেয় না এ দিয়ে কাপড় কাচে?'

'গায়ে এখন ফোস্কা না পড়লে হয়।' চন্দ্রা বললে।

প্রসাধনের পিছনে আমার স্ত্রীর সাতিশয় খরুচেপনা আমি শাসন করে'-করে' নিরস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু মনে হলো সাবান সম্বন্ধে তিনি এখনো এ-দেশে।

'নিয়ে যান আপনার সাবান।'

দু'খানা খোয়া গেলে দস্তুরমত চুরি দেখায়, একখানা খোয়া গেলে বলা যেতে পারবে স্ত্রীরই হিসেবে কোথা

ভুল হয়েছে। তাই, একখানা পাওয়া যাচ্ছিলো, তাই কুড়িয়ে নিলাম। আরেকখানা নিঃসন্ধান।

'আর এ-সব কি আপনার চা, না করাতের গুঁড়ো?' নির্মলা বললে।

শেষ চুমুকটুকু খেয়ে মায়া-দি ফোড়ন দিলেন: 'জলপাইগুড়ির কাছে, ভেবেছিলাম চা-টা অন্তত ভালো হবে। লিপটন-টিপটনের কি নাম শোনেননি আপনারা?'

'এখন কিছু পান জোগাড় করতে পারলে ভালো হত।' চন্দ্রা বললে।

'পান আমার সঙ্গেই আছে।' বিনীত মুখে বললাম।

ব্যাপারটা প্রথমে কেউই বুঝতে পারলো না। বইয়ের আকারের একটা জর্মন-সিলভারের কোটো খুলে ধরলাম ওদের সামনে।

'মিঠে পান?' মায়া-দি ভুরু কুঁচকোলেন।

'না। তবে ক্যাওড়া জলের ছিটে দিয়ে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

'কই, দেখি।' এক খাবলা দিয়ে গোটা চার পান তুলে নিয়ে পুঁটু মুখে পুরলো। অমনি দেখা-দেখি নির্মলা, আর চন্দ্রা অত্যন্ত আলগোছে।

'কটা খান দিনে?' ভরা-মুখে পুঁটু জিগগেস করলে।

'সত্তর-আশিটা হয়।'

'বলেন কি পাগলের মতো?'

'তোরা তো দেখি সব ছাগলের মতো খেতে সুরু করে' দিলি।' মায়া-দি বাধা দিলেন। বললেন, 'আমাকে গোটা দুই দে।'

আমিই দিলাম।

পুঁটু জিগগেস করলে: 'কে সেজে দেয় আপনার পান?'

'ফাজলামো করিস নে পুঁটু।' চন্দ্রা ধমকিয়ে উঠলো।

'দোক্তা, দোক্তা নেই আপনার কাছে?' মায়া-দি লোলুপের মতো বললেন, 'কিছু দোক্তা দিন না জোগাড় করে'।'

ডাক-বাংলোয়। আগের ষ্টেশনে স্বচক্ষে দেখেছি রুমালের কোণ থেকে দোক্তা খুলে কালো হাঁ করে' দাক্ষায়ণী মুখে ফেলেছেন।

'আবার কী হ'ল?' দক্ষিণাবাবু প্রশ্ন করলেন।

সবিস্তার বললাম। বুঝলাম কি-একটা কটু-কষায় বলবার জন্যে তাঁর জিভটা শানিয়ে উঠেছে, কিন্তু স্ত্রীর সামনে মুখে আনতে যেন সাহস পেলেন না।

তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিছু দোক্তা দিন।'

'দোক্তা!' কথাটা যেন নতুন শুনছেন এমনি মুখভাব করলেন: 'সে আবার কী জিনিস! তা আমি পাবো কোথায়?'

'বা, আপনি তো আগে খেতেন।'

'কী যে বলেন। গত জানুয়ারি-মাস থেকে ছেড়ে দিয়েছি। পান পর্যন্ত আজকাল খাই না, দাঁত যায় খারাপ হ'য়ে।'

রাত্রিবেলা আপিসে ঢুকে গেজেটের ফাইল ঘাঁটতে বসলাম। ঠিক দেখলাম জানুয়ারি মাসেই দক্ষিণাবাবু সাব-ডিভিসন পেয়েছেন।

বাড়ির ভিতরকার চেহারাটা আজ বেজায় গুমোট। না-ঘাঁটিয়ে বাধ্য স্বামীর মতো খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। কত কথা মনে আসতে লাগলো, প্রায় অসুস্থতার ধার ঘেঁসে। মায়া-দিকে বেশ বুঝি, চন্দ্রাকেও কতকটা বোঝা যায়—বাজে-পোড়া শাখাপত্রহীন রুক্ষ একটা গাছের মতো—কিন্তু নির্মলা আর পুঁটুর কথা মনে হলে কেন না-জানি মায়া হয়। নির্মলার মাঝে এখনো যেন একটা বড়-ঘরের আভা আছে, তার গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারায়। যেন খানিকটা আরামে আর আলস্যে সে প্রতিপালিত। বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপট লেগে এখনো যেন সে ঝাঁজরা হ'য়ে যায় নি। আর পুঁটু—পুঁটুকে দেখলে তো দস্তুরমত একটি গৃহচ্ছবির কথা মনে পড়ে' যায়। মনে পড়ে' যায় এমনি কোথাও দেয়াল-দিয়ে-ঘেরা ছোট একটি বাড়ি আছে, তাতে ওর বাবা আছে, মা আছে, ছোট ভাই-বোন আছে—পাশের ঘরে আমার মেয়ে মিনি যে ওর ম্যাট্রিকের পড়া পড়বার ওজুহাতে মাকে লুকিয়ে ওর স্বামীর কাছে চিঠি লিখছে তেমনিই যেন ঐ পুঁটু।

কিন্তু সকালে উঠেই দেশের কাজের কথা মনে পড়ে' গেল। ছুটলাম বাগান-বাড়ি। আমাকে দেখেই মায়া-দি

বললেন, 'আপনাদের এ অঞ্চলে ভালো জিনিষ কী পাওয়া যায়?'

'হরিণের শিঙ পাওয়া যায় শুনেছি!' চন্দ্রা বললে।

'আর পাটি—শীতল পাটি?' মায়া দি বললেন।

'মাছুরের ব্যাগ—ঘাসের চটি—সত্যি কিনা বলুন।' নির্মলা বললে।

'ভালো সরু-চিঁড়ে পাওয়া যায়।' হতভম্বের মতো বললাম। পুঁটু প্রবল আপত্তি করে' উঠলো, 'আপনার যত সব শুকনো কথা।'

'না, কাজের কথাই বলতে এসেছি। আপনারা কি ইনটিরিয়রে যাবেন?'

মায়া-দির যেন হঠাৎ চেতনা হল। বললেন, 'আর কেউ গেছে?'

'গেছে বৈ কি। তিনটে মিশন, তুটো সেবাশ্রম, সরকারী-বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানই বেরিয়ে গেছে। আপনারা—'

'বিকালের ট্রেনে আমাদের আরো লোক আসছে, তারা এলে পরে আমরা সব একসঙ্গে বেরুবো।' মায়া-দি গম্ভীরমুখে বললেন।

'আজ তো এখানকার হাট-বার?' চন্দ্রা জিগগেস করলে।

'কেন, বলুন তো?'

'এখানে এখন মুর্গি কত করে'?'

'মুর্গি কেন—মাছ খান না! বন্যায় বিস্তর মাছ বেরিয়ে পড়েছে। আট-দশ পয়সায় গলদা চিংড়ির কুড়ি।'

'আপনারা অফিসার-মানুষ, সস্তা বুঝুন। পুঁটু ফোড়ন দিল: 'আমরা হস্‌টেলে থাকি, খালি ডাঁটা চিবুই। তু'-একটা মুর্গির ঠ্যাং পেলে আমাদের একটু মেদ-মজ্জা হত।'

বললাম, 'আট-দশ আনার কম পাওয়া যাবে না।'

'সে তো টার্কি।' নির্মলা বললে।

চন্দ্রা প্রায় ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'অত সব বুঝি না, বিকেলে তুটো মুর্গি পাঠিয়ে দেবেন।'

কথাটা দক্ষিণাবাবুর কানে তুললে তিনি একেবারে খেপে উঠলেন: 'মুর্গি? আর-কিছু চায়নি সঙ্গে? ওদের চলে' যেতে বলুন। না বলতে পারেন, কাল ভোরে বড়-তরফের বজরা এসে পৌছুচ্ছে, সবাইকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন। ওরা যা ইচ্ছা হয় করুক।'

উল-বোনা থামিয়ে ভিতর থেকে দাক্ষায়ণী বলে' উঠলেন: 'অত লোকের জায়গা হবে কি করে'?'

বিকেলে খবর নিয়ে জানলাম, ওদের দলের বাকি ক'জন লোক পৌছুতে পারেনি।

চন্দ্রা বললে, 'ওরা নিশ্চয়ই টাটায় গেছে—সেই টিন-প্লেট এসোসিয়াশনের মিটিঙে।'

'কাত্রাসগড়েও হতে পারে—সেই মাইনিং-কমিটির ব্যাপারে।' বললেন মায়া-দি।

'তবে কি আপনারা ইনটিরিয়রে, বন্যার জায়গায় যাবেন না?'

'যাবো না তো, আমরা কি এখানে হাওয়া খেতে এসেছি?' মায়া-দি রাগ করে' উঠলেন। পরে গলা নামিয়ে বললেন, 'তুই নিজে গিয়ে একবার দ্যাখ্‌ চন্দ্রা, ও-তুটোতে মিলে সব না একেবারে পুড়িয়ে-ঝুরিয়ে শেষ করে' দেয়।

জিগগেস করলাম: 'আর তু'জন কোথায়?'

'রোস্ট তৈরি করছেন।' মায়া-দি ঠোঁট বেঁকিয়ে টিপ্পনি কাটলেন।

আমারো একটু টিপ্পনি কাটবার লোভ হল। বললাম 'ছেলেমানুষ ওঁরা কি সব পারবেন? কষ্ট করে' আপনারই তো একটু হাতা-খুন্তি নাড়া উচিত।'

মায়া-দি জলে' উঠলেন: 'ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে শিখুন।'

মাথায় একটা বাড়ি খেলাম।

'আপনি তো হিঁতুর ছেলে—আজকে কোন তিথি তা খেয়াল রাখেন যে উপোসী বিধবামানুষকে আপনি রাঁধতে পাঠান?'

'ক্ষমা করবেন। আজ যে একাদশী, সেটা আমার খেয়াল ছিল না।' দেশের কথায় আসা যাক ভেবে বললাম 'কাল যদি আপনারা বেরুতে চান তো খুব ভালো বন্দোবস্ত আছে।'

'কী বন্দোবস্ত?' মায়া-দির রাগ তখনো পড়েনি।

'কাল ভোরে এস-ডি-ওর স্ত্রী বজরায় করে' জল দেখতে বেরুচ্ছেন। প্রকাণ্ড বজরা—শুয়ে-বসে' খেলে-বেড়িয়ে আট-দশজন অনায়াসে যেতে পারে। যদি অনুমতি করেন তো ঠিক করে' দিই।'

'বজরাটা কার? কার মানে কার এক্তিয়ারে?'

'আপাততো এস-ডি-ওর।' ঢোঁক গিললাম: এস-ডি-ওর মানে এস-ডি-ওর স্ত্রীর।'

'তবে আপনার কথায় আমরা সে বজরায় যাবো কেন?' মায়া-দি ঝলসে উঠলেন: 'আপনার এস-ডি-ওর স্ত্রী আমাদেরকে একবারটি বলতে পারতেন না?'

'তিনি আশা করেছিলেন আপনারা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।'

'কোন নিয়মে? আমরা এখানে বিদেশী মানুষ, দেশের ডাকে তাঁর কর্ত্রীত্বের এলেকায় এসে পড়েছি— তাঁরই তো উচিত ছিল আমাদের তত্ত্ব-তালাস করা। এমন কী তিনি একটা পরী এসেছেন যে দু' পা হাঁটতে পারেন না।'

'মানী লোক — যেখানে - সেখানে যেতে একটু সঙ্কোচ হয়।'

'আর আমরা বন্যার জলে ভেসে এসেছি, না?' মায়া দির চোখে আগুন জলে' উঠলো: 'কিন্তু দেশের লোক কে চেনে আপনার ঐ এস-ডি-ওর স্ত্রীকে? পোসটারিটির কাছে তাঁর কী দান এই পৃথিবীতে? জিগ্‌গেস করি, তিনি খবরের কাগজ পড়েন? তবে আজকেরটা একবার পড়তে বলবেন।'

বিকেলের ট্রেনে কাগজ এসেছিল, খুলে বসলাম। এঁরা চারজন যে এখানে রিলিফের কাজে এসেছেন নিজস্ব সংবাদ-দাতা তারই একটা সালঙ্কার খবর পাঠিয়েছে। দেশ-শিশু যেখানে বিপন্ন সেখানে মাতৃরূপারা যে ঘরের কোণে বসে' থাকতে পারেন না বহুবিধ কোটেশান সহ আধ কলম তার প্রলাপোক্তি।

'এত বড় যে মানী লোক,' মায়া-দি ভ্রূকুটি করলেন: 'সম্মানটা কোথায়? দুটো পিওন-আর্দালি কিম্বা দুটো মোক্তার আর সাব-ডিপ্‌টির গিন্নিদের কাছে। মনে রাখবেন ঐটুকুই দেশ নয়। বলবেন, আমাদের বজরা লাগে না, দরকার হ'লে আমরা সাঁৎরে যেতে পারি। আর যেখানে দাঁড়াবার কারু একবিন্দু জায়গা নেই, সেখানে স্ফূর্তিতে পাল উড়িয়ে বজরায় করে' হাওয়া খেতে যেতে আমাদের ঘেন্না বোধ হয়।'

ডাক-বাংলোয় এসে দেখি কি-একটা জটলা চলেছে। দক্ষিণাবাবু কাকে ধমকাচ্ছেন।

এগিয়ে এসে দেখি আমাদের উপেন-মাষ্টার। দু'খানা দৈনিক কাগজের সে নিজস্ব সংবাদ-দাতা দু'খানা কাগজ পাবার বিনিময়ে।

'আসতে-না-আসতেই ওদের খবর বেরিয়ে গেল আর আমরা এখানে তিন-চারদিন ধরে' বসে', আপনার তা চোখেই পড়লো না?'

'কি করবো বলুন, রওনা হবার দু' তিন দিন আগে থাকতেই মায়া-দেবী আমাকে চিঠি লিখে পাঠান যে তাঁরা আসছেন এবং তাঁদের আসার খবরটা যেন ভালো করে' লিখে পাঠাই।' উপেন কাঁচুমাচু হ'য়ে বললে।

'দু'-তিন দিন আগে!' দক্ষিণাবাবু অবাক হয়ে গেলেন: 'আপনি কি ওঁর মাসতুতো ভাই নাকি?'

'আজ্ঞে, না। খবরের কাগজের আপিস থেকে আমার নামটা নিশ্চয়ই সংগ্রহ করেছেন।'

'বটে!' আমার দিকে তাকিয়ে দক্ষিণাবাবু বললেন, 'এই এদের অনেষ্টি, ট্রুথ, এই এদের ফেয়ার-প্লে।'

উপেন হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, 'আপনি ভাববেন না, আজই আমি আপনার খবরটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে ওদের খবরটা যত তাড়াতাড়ি ছাপে—'

কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'কী লেখ সাহেবকে এনে এক্ষুনি দেখিয়ে যাবে। আর মেম-সাহেব কত কষ্ট করে' পাড়াগাঁয়ে এসেছেন ভেবে দেখ, কত কাজ ফেলে, কত আরাম ভুলে—তাঁর কথাটাও ভুলে যেয়ো না।'

'না, কক্‌খনো না। লিখে এনে আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি।' উপেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

উল বুনতে বুনতে দাক্ষায়ণী নিস্পৃহের মতো বললেন, 'আমারটাতে দরকার নেই। আমি কাল সকালেই এখান থেকে চলে' যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে গেলাম: 'কেন?'

'বড়ো-তরফ খবর পাঠিয়েছে দু'খানা বজরাই কলেক্টর চেয়ে নিয়েছেন।' দক্ষিণাবাবু হতাশমুখে বললেন, 'যে একখানা পাঠিয়ে দিয়েছে তাতে চাল-ডাল মাল-মশলা চালান হতে পারে, মেয়েছেলে পারে না।'

'কাল যাবেন তো যাবেন, তাতে খবরের কাগজে ছাপা হতে দোষ কী ?'

দাক্ষায়ণী রাগ করে' উঠে পড়লেন। বললেন, 'ও-সব ঐ মুর্গি-খেকো ভোলানটিয়ারদের জন্যে। গেরস্তের বউ আমরা, ও-সব নির্লজ্জ বেহায়াপনাকে আমরা ঘেন্না করি।'

পরের দিনেও সেই অবস্থা। বিকেলের ট্রেনটা খালি ফিরলো।

এবার ওরা আন্দাজ করলো, হয় বজবজ নয় ডিহরিতে চলে' গেছে।

বললাম, 'নৌকো জোগাড় করেছি একখানা। গয়নার নৌকো।'

'আপনার তো সব ঐ শুকনো চিঁড়ে।' পুঁটু হাসলো: 'শুধু নৌকো হলে কী হবে? চাল কই? কাপড় কই? ওষুধ-পত্র কই ?'

'সব কোলকাতা থেকে পরের দিনই আসবার কথা।' চন্দ্রা বললে।

'আমি সব প্রসেশান পর্যন্ত অর্গ্যানাইজ করে' এসেছি। ছাপাখানা থেকে পাঁচশো রসিদ-বই ছেপে এসেছে।' মায়া-দি বিরক্তমুখে বললেন, 'সব হয়েছে কথার সর্দার, কাজের বেলায় ডাক পড়বে তখন আমাকে।'

'সত্যিই তো,' সমবেদনার সুরে বললাম, 'কষ্ট করে' এখানে কতদিন পড়ে' থাকবেন ?'

'আমাদের আবার কষ্ট!' মায়া-দি নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ বিস্ফারিত করলেন।

'কষ্ট শুধু, টাইমটেবলটা ছাড়া সঙ্গে কোনো বই আনিনি।' চন্দ্রা বললে, 'এখানে কোন লাইব্রেরি আছে ?'

'কন্টিনেণ্টাল লিটারেচার?' প্রশ্ন করলো নির্মলা।

'অন্তত ফিল্মের দু' একখানা কাগজ!' জানো, মায়া-দি,' পুঁটু লাফিয়ে উঠলো: 'বিজলী ঘোষ সিনেমায় জয়েন করেছে ?'

'করুক। দেখুন,' মায়া-দি ক্লান্তভঙ্গিতে বললেন, 'আমাদের গোটাকয় ডেকচেয়ার জোগাড় করে' দিন। খাড়া চেয়ারে বসে'-বসে' পিঠগুলি ধরে' গেল।'

রাত তখন নটা-দশটা, চেপে বৃষ্টি নেমেছে, শুয়ে-শুয়ে চোখ বুজে ডেকচেয়ারের সন্ধান করছিলাম এমন সময় লণ্ঠন-হাতে গোপাল এসে হাজির।

গোপাল মায়া-দিদের স্থানীয় চাকর।

বললে, 'জরুরি দরকার, বড়ো দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন।'

'কী দরকার ?'

'তা জানি না।'

'চুপ করে' শুয়ে থাকো।' দূরের তক্তপোষ থেকে গৃহিণী প্রতিবাদ করে' উঠলেন।

'বৃষ্টিতে এমন অসময়ে যখন ডাক, তখন নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে।' উঠে পড়লাম।

গৃহিণীও উঠে পড়লেন।

তারপর আমাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হ'ল তা সবিস্তারে লিখতে গেলে আপনারা ধারণা করবেন অতঃপর আমি বীণাকে ডিভোর্স করেছি কিম্বা বীণা গলায় দড়ি দিয়েছে। কিন্তু দেশের ডাক সব চেয়ে বড় ডাক—'নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ—' এই বাণী স্মরণ করে' বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ব্যাপারটা কিছু নয়, পুঁটুর ভীষণ জর এসে গেছে একটা থার্মোমিটার চাই।

জরটা খুব বেশি বলে'ই মনে হলো, অন্তত ও কাৎরানি শুনে। যার যত তোষক-কম্বল সব জড়ো করে' ওকে চাপা দেয়া হয়েছে। মাঝে-মাঝে ককিয়ে উঠছে 'ও মা' বলে'।

এই কান্নাটুকু ভারি মিষ্টি লাগলো। দাক্ষায়ণীর মুখে 'গেরস্তর বউ'-র মতো।

মায়া-দি বললেন, 'ভালো ডাক্তার আছে এখানে ?'

অসঙ্কোচে বললাম, 'আছে।'

'কী পাশ ?'

'এম-বি। স্বভাব-চরিত্র যেমন নিখুঁত, দেখতে তেমনি চমৎকার।'

'কী রকম দেখতে তা আপনাকে জিগ্‌গেস্ ক হয় নি।' মায়া-দি ধমকে উঠলেন: 'ফি কত?'

'লাগবে না ফি। বিশেষতো যখন শুনবে লেডি-ভলানটিয়র। দেশ-সেবিকা।'

'তার মানে?' মায়া দির গলাটা যেন সাঁ করে' আমাকে একটা চাবুকের বাড়ি দিল।

'নিজেই একজন বাউণ্ডুলে কিনা, এই আমাদের পীযূষ। বাপের বিষয়-আসয় ছিলো, নিজেও ডাক্তারী পাশ করেছে, দিব্যি বিয়ে-থা করে' কোথায় সমাজের উপকার করবে, তা নয়, বনে-বাদাড়ে মশা মেরে বেড়াচ্ছে।'

'এ-সব কথা এখন ওঠে কি করে'?'

'উঠলে আর কি করা যায় বলুন।' সাহস করে' বললাম: 'চারদিকে এত অপচয় আর দেখতে পারি না। এই কেবল ফ্যা-ফ্যা করে' ঘুরে বেড়ানো।'

মায়া-দি কঠোর নিস্তব্ধ।

'নইলে পীযূষের কিসের ভাবনা! আর এরা—এই পুঁটু—'

নামটা হঠাৎ কি-রকম মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পুঁটু জ্বরের ঘোরে ঘোলাটে চোখে আমার দিকে চেয়ে আবার 'মা' বলে' ককিয়ে উঠলো।

বললাম, 'জ্বর খুব বেশি?' বলে' পুঁটুর শিথিল মণিবন্ধটি তুলে নিলাম।

চিলের মতো ছোঁ মেরে মায়া-দি আমার মুঠো থেকে সেই হাত ছিনিয়ে নিলেন। বললেন, 'ছেড়ে দিন হাত। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিহেভ্ করতে জানেন না, বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

আমি একেবারে বোকা বনে' গেলাম।

'দরকার নেই আমাদের ডাক্তারে। যত সব রাফিয়ান! কালকের ট্রেনেই আমরা চলে' যাব।'

'কালকেই।' চন্দ্রা সায় দিলে।

'কিন্তু এত হাই ফিভার—ব্রেন-কম্‌প্লেণ্টও কিছু আছে বলে' মনে হচ্ছে—তায় এখানকার সিনেমা-বৃষ্টি—ক্ষমা করবেন, সিনেমা-বৃষ্টি মানে একবার আরম্ভ হ'লে আর থামতে চায় না—এই অবস্থায় ডাক্তার না দেখিয়ে রিমুভ করাটি কি ঠিক হবে?'

'চুপ করুন। আপনার কাছে আমরা পরামর্শ চাই না।' মায়া-দি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাল ভোরেই একটা ট্রেন আছে না?'

'আছে।'

'স্ট্রেচার পাওয়া যাবে?'

'বোধ হয় নয়। তবে ডাক-বাংলোর ইঞ্জিচেয়ার আছে।'

'তবে তাই। ভোরবেলা গরুর গাড়ির জোগাড় রাখবেন।'

'হ্যাঁ, আমাকে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিন।' পুঁটু আবার ককিয়ে উঠলো: 'আমার ভারি খারাপ লাগছে।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানাটা বলুন, আমি ভোরেই একটা টেলিগ্রাফ করে' দি।'

পুঁটু সত্যি-সত্যিই বাড়ির ঠিকানাটা বলে' ফেলল দেখে মায়া-দি শাসিয়ে উঠলেন: 'যান আপনাকে আর সর্দারি করতে হবে না। আমরা নিজেরাই সব বন্দোবস্ত করতে পারবো। খালি ইজিচেয়ার, গরুর গাড়ি আর এখনকার জন্যে একটা থার্মোমিটার। ছেলেপিলের বাড়ি, বাড়িতে আছে নিশ্চয়।'

'আর অডিকোলন না হ'লে অন্তত গোলাপ জলের একটা শিশি।' এটুকু চন্দ্রার সংযোজনা।

ভোরবেলা খবর নিয়ে জানলাম জ্বর নেই। মায়া-দি তাতে খুসি নন, কেননা বৃষ্টিটা ছিল তাঁদের বেরুবার বাধা। তাই দুপুরে আবার মার-মার করে' জ্বর আসতেই তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, 'বিকেলের ট্রেনেই। সঙ্গে কিছু ডাব দিয়ে দেবেন। বেশ কচি দেখে।'

'আর-কিছু কালোজাম। ঐ গাছটায় একেবারে মেঘ করে' আছে।' গোল-গোল চোখ তুলে নির্মলা বললে।

বিকেলের ট্রেনেই ওদের রওনা করিয়ে দিলাম। আমার দু'খানা গল্পের বই, একটা থার্মোমিটার কিম্বা দু'খানা শুকনো তোয়ালে গেছে তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু, অন্তত পুঁটুর চিকিৎসাটাও যে করানো গেল না, সেই দুঃখই আমার মর্মান্তিক থেকে গেল।

শুভ্র বৈশাখ

(অপ্রকাশিত রচনা)

৺রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

কালের মহাসমুদ্র মন্থন করে'
উঠ্‌ল এক আশ্চর্য্য নিধি—
এই আলোকের মহাশঙ্খ।
কালো সাগর ফেনায়িত হ'য়ে হ'ল শুভ্র,
সেই ফেনের শুভ্রতা এ'কে দিল শুভ্রতর রূপ ;
গর্জ্জমান সাগর—তার গর্জ্জন রইল স্তম্ভিত হ'য়ে
এর বুকের মধ্যে।
মহাসমুদ্রের মহাশঙ্খ···
আকাশ-তট ঝল্‌মল্‌ করে' উঠ্‌ল
এর বর্ণের প্রতিচ্ছটায়।
এই মহাশঙ্খ—
এখন কে এ'কে তুলে' ধর্‌বে,
আর কে-ই বা বাজাবে ?

তুমি অলখ্‌ হাতে তুলে' ধর্‌লে—
তোমার অনাহত ফুৎকার দিল এ'কে
প্রাণের উত্তাপ,—
এর অগ্নিময় ছন্দঃ ঝলসিত হ'ল রৌদ্রে রৌদ্রে ঃ

"আমি নববর্ষ—আমি শুভ্র বৈশাখ।
আমার প্রখর আহ্বান পুরাতনের জীর্ণতাকে
জ্বলন্ত করে' জ্বালিয়ে দিক···

অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের জাগরণে
আচ্ছন্নতা যাক্‌ কেটে,—জাগ্রত হোক্‌ তোমার
জাতির জীবন।
বাইরের প্রতপ্ত পথে এস বেরিয়ে তোমরা,—
মিছিল রচনা করে' চল
প্রাণের গতিবেগে—বেদনার প্রেরণায়।
নববাসনার নববস্ত্র পরিধান করে'
এস—বেরিয়ে এস তোমরা॥

আমরা বেরিয়ে এলাম পথে—
মাথার 'পরে প্রচণ্ড রৌদ্র,—
পায়ের তলে প্রতপ্ত বালি।
দেহ হ'ল ঘর্ম্মাক্ত···
অতৃপ্ত পিপাসা দিল গতিবেগ···
তাপ দিল যন্ত্রণাময় উত্তেজনা।

তুমি আবার দিলে ফুৎকার—
ছন্দঃ এবার মন্দ্রিত হ'ল।
একটি মাত্র মন্ত্র ঃ "বৃহৎ হ'তে বৃহত্তরে চল—।"
আকাশে কালো যজ্ঞধূম—কালবৈশাখীর কালি।
ঝড়ের গর্জ্জন···
বিদ্যুতের টিকা···বজ্রের আশীর্ব্বাদ॥

ইউরোপের চিঠি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

ঠিক সন্ধ্যায় আমি ম্যারবুর্গ (জার্ম্মাণী) পৌছলেম। খ্যাতনামা অধ্যাপক অটো (otto) জনৈক অধ্যাপক ও একজন ভারতীয় ছাত্রকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে ছিলেন। আমি তাদের সাথে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় গেলাম। নূতন, সুন্দর বাড়ী। অতি সুসজ্জিত। আহারের পর তারা চলে গেলেন। রাত্রির অন্ধকারে একাকী বসে কত কথা ভাবতে লাগলেম। অদূরে ছেলেরা সামরিক কুচকাওয়াজ (Military Drill) করছে। বুঝলেম, হিটলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ মিলিটারী শিক্ষা দিচ্ছেন।

ম্যারবুর্গ সহরটী ছোট খাট, দেখ্‌তে খুব সুন্দর। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর। সহরটির চারিদিকেই উন্মুক্ত ময়দান, অদূরে একটী ছোট খাল। সহরটী পরিচ্ছন্ন, নয়নাভিরাম, বিশষতঃ ম্যারবুর্গের গির্জ্জাটি। ভোর হতেই অধ্যাপক অটো তাঁর দুটী ছাত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে সহরটী দেখাতে ও নৈশ-ভোজে নিমন্ত্রিত করতে। মেয়ে দুটি সহরের সব দেখিয়ে ডক্টর বল-এর (Dr. Ball, ইনি একজন অধ্যাপক) বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ডাঃ বল ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন কথাবার্ত্তা কচ্ছিলেন। টেবিলের ওপর মোক্ষ মুলার কৃত পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী ও শিক্ষা (Max Muller's Life and Teachings of Ram Kribsna Paramahansa) রয়েছে। ডাঃ বল বইগুলি খুলে দেখালেন, তিনি কিরূপ অভিনিবেশ সহকারে পুস্তকগুলি পাঠ করছেন, লাল-নীল পেন্সিলে কত মার্ক করেছেন। বললেন "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন খৃষ্টের মত। তাঁর্ কথামৃতে কী স্বাভাবিকতা! নির্ঝর গৈরিক প্রবাহের ন্যায় কি অমৃত পরিবেশন করে গেছেন, তাঁর্ জীবনে চেষ্টা করে যেন কিছু করতে হয়নি, সবই যেন স্বভাবের বশে স্ফূর্ত্ত হয়েছে। তাঁর সাধনা, তাঁর লোক শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে কোথায়ও বিচার করে, চেষ্টা করে কিছু করতে হয় নি। মনটা এমন স্বচ্ছ ছিল যে, ভাব জাগা মাত্র তাঁর সিদ্ধি হয়েছে। সিদ্ধি তাঁর কাছে কষ্টসাধ্য ছিল না। চেষ্টা করে' কাজ আরম্ভ হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ হতে। রামকৃষ্ণশক্তি গৈরিক প্রবাহের ন্যায় স্বত-প্রবাহিত, বিবেকানন্দে সেই শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে পার্থিব রূপ নিয়েছে। ডাঃ বল-এর কথাগুলি আমার ভাল লাগল।

আমি বললেম, "আপনার বিশ্লেষণ কী সুন্দর! প্রকৃত প্রতিভার রূপই এই। প্রকৃতি যেখানে যত স্বচ্ছ, শক্তি অতি সহজভাবে সেখানে বিকশিত হয়। তাদের চেতনা এত উর্দ্ধস্থিত এবং এরূপ নিরাবরণ যে, জীবনের সকল স্তরগুলি তাদের দৃষ্টির সামনে স্বতঃই বিকশিত।" জীবনের কোষগুলি হয় ভাগবতী ছন্দে মূর্চ্ছিত। ডাঃ বল (Dr. Ball) স্বীকৃতি জানালেন। আমাদের কথা বেশ জমে উঠ্‌ল। অধ্যাপক-পত্নী এসে যোগ দিলেন। কিছু কথা-বার্ত্তার পরে তিনি আমাকে ম্যারবুর্গ (Marburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ম দেখাতে নিয়ে গেলেন। এখানে একটি ভারতীয় বিভাগও আছে; ভারতীয় দেব দেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি এখানে সংগ্রহ করা হয়েছে। সবই মাদ্রাজ হতে তৈয়ারী করিয়ে আনা হয়েছে। এ সবই অধ্যাপক অটোর চেষ্টায় হয়েছে।

অধ্যাপক চলে গেলেন। মেয়ে দু'টীও চলে গেল। বলে গেল, ৪টায় এসে চা খেয়ে আমাকে নিয়ে অটোর বাড়ীতে পৌছে দেবে। আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানালেম। আমার কোন কাজ না থাকায় আমি বের হয়ে পড়েলেম। অদূরে শ্যামল শস্যক্ষেত্রের নিকট শীর্ণকায় স্রোতস্বতীর তীরে গিয়ে বসলেম। ম্যারবুর্গের মাঠ ও ক্ষেতগুলি কি সুন্দর ছিমছাম! কোথায় ঝোপ্‌সা নেই, কোথায় কিছু এলোমেলো নেই। এ জাতি এত পরিশ্রমী যে মাঠ, হাট, বাট সবই এরা সুন্দর করে রাখে, নিজের গায়ে খেটে। ম্যারবুর্গের চারিদিকে প্রান্তর; সবই ক্ষেত এবং ময়দান। সহরটী

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন সহরে বিশেষ কিছু নেই—মানুষের কোলাহল নেই, ব্যবসা বাণিজ্যের হিড়িক নেই—এ জন্য বড় ভাল লাগে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এরূপ পারিপার্শ্বিকই হওয়া উচিত। মানুষের সমাজের চাহিদা হতে যখন মন মুক্ত হয়, তখনি তার হয় জগতের সাথে পরিচয়। সভ্যতার হাজার রকম দাবী মানুষকে মুক্তির চেয়ে বন্দী করেছে বেশী। মানুষ আজ যন্ত্র হতে বসেছে। তার বুদ্ধিকৌশলের অনেক চাতুর্য্যের প্রকাশ হচ্চে সত্য, কিন্তু তার অন্তরের আলো নির্ব্বাপিত হ'তে চলেছে। হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলেই মানুষ পায় তার প্রকৃত দিব্য জীবনের সাড়া—আজ তা নেই বলেই মানুষ এত সম্পদের ভেতরও এত ঐশ্বর্য্যহীন, দীন। হৃদয়ের স্বভাব আকাশের ন্যায় পরিসর ও স্বচ্ছ—অনন্তাভিমুখী তাহার সহজ গতি—আজ সেই হৃদয় আবর্জ্জনায় ক্লিষ্ট। মারবুর্গের নীল আকাশের উদার শান্তি ও প্রসন্নধৃতির ভেতর আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হল।

৪টার পূর্ব্বেই আমি ফিরলেম। মেয়ে দুটী এলে তাদের সাথে চা খেলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবার পর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অধ্যাপক অটোর বাড়ীর দিকে চল্লেম। মেয়ে দুটি অটোর কাছে Comparative Theology পড়ছেন ও reserch করেছেন। একজনের ইচ্ছা, ভারতবর্ষে কোন মিশনে কাজ করে, আর একজন কি করবে তার সিদ্ধান্ত কর'তে এখনও পারে নি। এদেশে মেয়েদের একটা 'career' করে নিতে হয়—আমাদের দেশের মেয়েদের জীবনে যে স্বাভাবিক পরিণতি, শিক্ষা ও বিবাহ এবং স্বামীর ঘর করা, তা বড় এদের হয় না। একটী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেম, আপনারা career-এর জন্য এত কেন ব্যস্ত, বিবাহ করে কেন ঘর করেন না? জানি এরূপ প্রশ্নটী ওদেশে সহসা করা অন্যায়, কিন্তু আমার স্বাভাবিকী জিজ্ঞাসার বৃত্তি নিরোধ করতে পারলেম না। মেয়েটী আমার প্রশ্নে কোনরূপ সংকোচ বা অসন্তোষ না দেখিয়ে বল্লেন—"আমরা ত বিবাহ করতে সব সময় রাজী, কিন্তু কে আমাদের বিবাহ করে।" তার সঠিক কথাটি এই: we are doing for marriage but who cares to marry us। বুঝলেম, এদের দেশে মেয়েদের সামনে কত বড় সমস্যা! এ সমস্যা আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মন এমন কতকগুলি সংস্কারে, এমন কতকগুলি চাহিদাতে পূর্ণ হয় যা' হয়ত কখনই সফল হবার নয়। এ জন্যই কখন কখনও মনে হয়, প্রচলিত শিক্ষা কি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধির অনুগমনে কতকগুলি অস্বাভাবিকী বৃত্তি আমাদের পেয়ে বসে; জীবনের স্বাভাবিকতা হতে আমরা অনেক দূরে সরে পড়ি। প্রকৃতির সহজ বৃত্তিগুলিও তখন মার্জ্জিত বুদ্ধির ভেতর দিয়ে যে রূপ নিয়ে আসে, তাতে তার সহজ ভাবটা নষ্ট হয়—এমন গড়া রূপের দ্বারাই তার সৌন্দর্য্যশ্রী হয় আড়ষ্ট। স্বরূপের প্রতিভাস হয় না। প্রকৃতিকে বুঝতে হলে বুদ্ধির বেড়া জাল ভেঙ্গে বোঝাই ভাল। অন্তত তখন স্বভাবের স্বরূপ ধরা পড়ে। স্বভাব তখন তার উলঙ্গ রূপে দেখা দেয়। তাই সুন্দর। স্বভাবের স্বভাব বিচ্যুতি করা সভ্যতার একটি কাজ, তাতে কিন্তু স্বভাবের স্বরূপের পরিচয় হয় না। স্বভাবের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনই প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃতির গভীর স্বচ্ছ সত্তার সঞ্চরণই সত্য পথ দেখিয়ে দেয়। জীবনের স্বাভাবিকতার ভেতর আছে প্রকৃত ছন্দোময় জীবনের রূপ। এ স্বাভাবিকতা আমাদের কাছে ধরা পড়ে না সভ্যতার চাপে। আমরা সন্ধ্যায় শীতল হাওয়ায় বেরিয়ে চল্‌লেম, অধ্যাপক অটোর বাড়ীর দিকে। সেদিনটা একটু গরম পড়েছিল। কিন্তু এদেশের আব্‌হাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, একটুখানিও গরম ভাল লাগে না। আমরা হেঁটেই চল্লেম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই অধ্যাপকের বাড়ীতে পৌছলেম।

অধ্যাপক অটোর বয়স হয়েছে সত্তরের ওপরে। জার্ম্মানীতে এবং সমগ্র ক্রিশ্চিয়ান জগতে তাঁর স্থান খুব উঁচু। তিনি Comparative Theologyতে ইউরোপে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর নানা পুস্তক আছে—আমাদের দেশের শঙ্কর ও রামানুজ সম্বন্ধেও। তিনি শুধু পণ্ডিত নন, তিনি একজন ভাবনিষ্ঠ ব্যক্তি—তাঁর পুস্তকে (বিশেষতঃ Idea of Holy

তাঁর অন্তরেব বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবনায় ও সাধনায় তিনি শ্লায়েরমেকার-এর (Schleirmacher) অনুগামী। জীবের একটা জৈবিক বৃত্তি (creature consciousnes) আছে। তাঁর মতে এ বৃত্তি আমাদের ভেতর পরিস্ফুটিত হ'লে ঈশ্বরের অনুভূতি স্বতঃই হয়। ঈশ্বরকে বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা বোঝা যায় না; তাঁকে পাওয়া যায় জীবত্বের শুদ্ধানুভূতিতে। জীবত্ব ঈশ্বরের সহিত নিত্য সংযুক্ত। শুদ্ধ জীবত্বের সংবেগে ঈশ্বরত্বের স্বতঃই স্ফূরণ হয়। কিন্তু এ শুদ্ধ ভাবের বিকাশ হয় শরণাপত্তিতে। ঈশ্বর-শরণ আমাদের শুদ্ধসত্তার বোধের সহিত ঈশ্বর-বোধ জাগিয়ে দেয়।

এর দ্বারাই বোঝা যাবে, অধ্যাপক অটো কিরূপ লোক ছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল প্রেমে পূর্ণ। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। পাণ্ডিত্য তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাঁর অন্তর ছিল ঈশ্বরানুভূতির দিকে সর্ব্বদা তৎপর। এ অবস্থাটা তাঁর ছিল স্বভাবগত। বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের অধিগম হলেও, অন্তর পূর্ব্ব সংস্কারাবৃত থেকে যায়। অন্তর দীপ্ত না হলেও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না। অধ্যাপক অটো অন্তর দীপ্তি দ্বারা ঈশ্বরানুভব করতে চেয়েন; শুধু অনুভব নয়, তাঁকে জেনে, তাঁতে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন, প্রকৃত একজন ক্রিশ্চিয়ান। অনেক পণ্ডিত দেখলেম এদেশে; অটোর মত ঈশ্বর সন্নিধি পাবার ঔৎসুক্য আর কারুর মধ্যে দেখতে পেলেম না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এমন সংমিশ্রণ এদেশে দেখিনি। হৃদয়ের স্ফুরণে জ্ঞান সহজ, আনন্দ ও রসযুক্ত হয়। অধ্যাপক অটো তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত। অগাধ পণ্ডিত হয়েও, পাণ্ডিত্যের ওপর তিনি শ্রদ্ধান্বিত নন। কথায় কথায় বল্লেন, "দার্শনিক মতবাদের কথা থাক, উহা তো বুদ্ধির বিলাস, ওতে কিছু স্থির নির্ণয় হয় না। জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে দেখছি ঈশ্বরানুভূতি ও বিশ্বাস জীবনকে প্রকৃতরূপে দৈবী সম্পদে স্ফূর্ত্ত করে। সেখানেই মানুষ পায় প্রকৃত কল্যাণের সন্ধান এবং ভাগবতী স্পর্শ। এই ত জীবন, নতুবা সব বৃথা। জীবন যখন আনন্দ ও জ্ঞানে স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তখন বুঝতে হবে প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়েছি—নতুবা সবই শেষ পর্য্যন্ত বৃথা হয়ে যায়।"

আমাদের নৈশ-ভোজ আরম্ভ হয়েছে,' এই সব কথাই হচ্ছে। অটোর অনেক মহিলা বন্ধু এসেছেন। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা এসেছেন। অটোর ভারতীয় ছাত্র বহিরুদ্দিন আছেন। অটো এই কথাগুলিই বলছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "দেখুন, দার্শনিক মতবাদ কোন দেশকেই তৃপ্ত করে নি; সত্য যখন জীবনকে স্পর্শ করেছে, তখনই হয়েছে জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ। এরই ফলে হয়েছে জ্ঞান, শ্রদ্ধা, মহিমার বিকাশ। এ জ্ঞান স্বতঃ স্ফুরিত, স্বতঃ-উদ্ভাসিত। এই স্বতঃ-উদ্ভাসিত জ্ঞানই সব দেশের জীবনকে করেছে সঞ্চরণ।"

আমি বল্লেম, "আপনার মতে কী Revelationই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।"

অটো উত্তর করলেন, "নিশ্চয়ই; জ্ঞান স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হয়ে আমাদের অন্তরকে করে স্ফূর্ত্ত। ঐ সব স্বচ্ছ ধারা অন্তর স্পর্শ করে' আলোকিত করে। এরূপ জ্ঞানেই হয় সত্য সমুদ্ভাসিত।"

আমি উত্তর করলেম, "আচ্ছা, সত্য উদ্‌ভাসিত হলে, আমরা কি তাকে সম্যক ধারণা করতে পারি? সে ধারণা কি জীবনের সব অবস্থায় থাকে?"

অটো উত্তর করলেন "সত্যের পূর্ণ ধারণা সম্ভব কিনা, তা বলতে পারি না—অন্ততঃ আমি জানিনে সত্যের পূর্ণ স্বরূপ কি? (আমি দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলছিনা—জীবনের অনুভূতির কথা বলছি—এই বলে অটো কথাটি পরিষ্কার করে নিলেন) কারণ, তার পূর্ণ রূপকে ধারণা করা যায় না। কিন্তু একথা অতি সত্য যে, সত্যের স্পর্শ জীবনে পাওয়া যায়—এবং এক স্বচ্ছ জ্ঞান ও অনাবিল পবিত্রতা ও করুণার অনুভূতি আমাদের অন্তরে এসে পৌঁছে।" কথাগুলি বের হল একটা শক্তি নিয়ে। অধ্যাপকের ঐকান্তিকতায় আমরা সকলেই মুগ্ধ হলেম। সকলে নির্ব্বাক হয়ে, তাঁর কথা শুনছিলেম। অটো বলতে লাগলেন, দেখুন, "আপনাদের উপনিষৎ, গীতা আমাকে বড় আকর্ষণ করে—বিশেষ করে গীতা, কারণ, তার ভেতর আমি এই revelation এর কি সুন্দর পরিচয় পাই।" আমি চুপ করে রইলেম।

অটো বল্‌তে লাগলেন, "গীতার ভক্তিবাদ আমাকে মুগ্ধ করেছে—এর ভেতর দিয়ে দেখুন কি সুন্দর বিকাশ হয়েছে—বিশ্বরূপের দর্শন।"

আমি বল্লেম—"ভক্তি যখন কৃপা-সিঞ্চিত হয়, তখনিই বিশ্বরূপ দর্শন হয়। পূর্ণ কৃপা না হলে ভগবান বা তাঁর বিভূতি দর্শন হয় না।"

অটো বল্লেন—"ঠিকই বলেছেন, কৃপা (grace) নিশ্চয়ই—ওইত ভাগবত জীবন লাভ করবার একমাত্র উপায়। কৃপা এলেই জীবন কতরূপে সার্থক হয়—জ্ঞান, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মানুভূতি সবই তখন হয় অতি সহজ।"

আমি প্রশ্ন করলেম, "আপনি ত শঙ্কর ও রামানুজের সম্বন্ধে পুস্তক লিখেছেন। শঙ্করবাদের আধ্যাত্মিকতায় কি স্থান?"

অটো বল্লেন—"শঙ্করকে আপনারা যেরূপ দেখেন, আমি তা দেখিনি। তাঁর মধ্যেও theism-এর যথেষ্ট স্থান আছে। তবে আমার রামানুজকে আরও ভাল লাগে, কারণ আধ্যাত্ম-জীবন (Life of Holy) তাঁর মতেই খুব সম্ভব হয়। আধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তি হৃদয় ও তার অনুভূতি। অটো কতরূপ অনুভূতির কথা বল্লেন—ঈশ্বরের ভয়ঙ্করত্ব, অপরিমেয়ত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তার।" আমি বল্লেম—"এগুলি ঈশ্বর-সত্তার বিশিষ্ট ভাবদ্যোতনা, কিন্তু এগুলি সত্যই তাঁর অধিভূত রূপ, অধ্যাত্ম-রূপ নয়।" অটো স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে' বল্লেন, "আধ্যাত্মরূপের ভিত্তি প্রিয়, সখা, অন্তর্য্যামী। এরূপ অনুভূতি আমাদের জীবনকে করে মাধুর্য্যে ও আনন্দে পূর্ণ। ঈশ্বর অনুভূতি যখন হতে থাকে, তখন সাধারণ জীবনের রূপ একেবারেই অন্তর্হিত হয়। আমরা একটা নবীন শক্তিতে সিঞ্চিত হই। একটা নবীন স্ফূর্তি আমাদের হতে থাকে।"

অটোর এই কথাতে আমরা সকলেই তৃপ্তিলাভ করলেম। তাঁর কথাতে এমন কিছু ছিল যাতে মনে হল তাঁর অন্তরটি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ছিল পূর্ণ। শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হলে এরূপ ধরণের কথা বড় হয় না।

কথা হতে হতে Symbology-র কথা হতে লাগল। অটো এ বিষয়ে আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বল্লেম, "অধ্যাত্ম বিদ্যায় ভারতের অতি প্রাচীন কাল হতে মন্ত্রশাস্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। মন্ত্রের ভেতর এমন কিছু আছে, যা' আমাদের আশ্রয় করে' ভগবদ্ভক্তি জাগরণ করে' তোলে। মন্ত্র শুধু প্রাণহীন প্রতীক নয়। ইহা শক্তির কেন্দ্র। মন্ত্র সত্তাকে স্বচ্ছ করে' স্তরে স্তরে বিকশিত করে' তোলে এবং শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ করে। মন্ত্র স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পুট।"

ইতিমধ্যে অধ্যাপক অটো তাঁর ঘরে গিয়ে একখানি ছবি নিয়ে এলেন। ছবিখানি আমাদের সামনে রাখলেন। এই ছবিখানির একটা ইতিহাসের কথা বল্লেন—তাঁর কোন মহিলা-শিল্পী বন্ধু একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নটাকে তিনি রূপ দিয়েছেন ছবিতে। তিনটি রঙ মণ্ডিত হয়ে একটি ওঁকারের ছবি। রঙ তিনটি শ্বেত, লাল, নীল। অধ্যাপক অটো আমাকে এই প্রতীকের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি উত্তর করলেম, ওঁ ব্রহ্মের প্রতীক, বর্ণ তিনটি বোধ হয়, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমের বর্ণ। শ্বেত সত্ত্বের দ্যোতক, লাল রজের, নীল তমের। আমাদের দেশে নীলকে পৃথ্বীতত্ত্বের রঙ বলা হয় (Earth colour)।

তখন অধ্যাত্ম-বোধ ও colour vibrations-এর কথা হতে লাগল। আমি বল্লেম, ভাবধারার বর্ণ আছে। সেগুলি অনুভূতি-বেদ্য। প্রত্যেক ভাবটির, প্রত্যেক চিন্তাটির রূপ আছে। সে রূপ সাধারণতঃ ধরা পড়ে না—মন যখন হয় স্বচ্ছ, তখন তাদের প্রত্যেকটি ধরা পড়ে। ভাবের ও চিন্তার রূপ, শক্তি, আকার সবই স্ফূর্ত্ত হয়। অন্তর ও মনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হলেই এ ভাব ও চিন্তা-সূত্রগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

শব্দ ও রূপের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ আছে। শব্দের তরঙ্গ ঘনীভূত হলেই রূপ ও আকার গ্রহণ করে। এ জন্যই আমাদের দেশে প্রত্যেক সূক্ষ্ম শব্দের (বীজ মন্ত্রের) সঙ্গে দেবতার সম্বন্ধ। দেবতার রূপ আছে, আকার আছে। শক্তি শব্দ-তরঙ্গের ভেতর দিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে দিব্য আকারে ও রূপে প্রকাশ পায়। এ জন্যই এরূপ সৃষ্টিকে বাস্তব মনে হয়—সত্যি তারা বাস্তব বটে; কারণ তাদেরও প্রত্যক্ষতা আছে, এবং অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। কিন্তু তাদের বাস্তবতা সৃষ্টির স্তরে। সৃষ্টির অতি সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে তাদের স্থিতি।

প্রত্যেক মন্ত্রের স্পন্দন একটা কম্পনের জগৎ সৃষ্টি করে। এই হেতু নানা বর্ণের সমাবেশ।

অটো বল্‌লেন—"মন্ত্র তা'হলে আপনার মতে নানাবিধ শক্তির জাগরণ করে?"

আমি উত্তর করলেম—"নিশ্চয়ই, এ জন্যই নানা মন্ত্রের নানা শক্তির কথা আছে। কোনটি জ্ঞান, কোনটি আনন্দ (আহ্লাদ), কোনটি গতি স্ফুরণ করে। এরূপভাবে মন্ত্র বিভাগ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সব মন্ত্রেরই এসব শক্তিসম্পুট আছে, তবে কোনটির কোনটায় প্রাধান্য থাকায় ফলবিশেষ উপলব্ধি হয়। কোন কোন মন্ত্র আধারের কোন স্থান বিশেষরূপে আঘাত করে—তাই এতদ্রূপ মন্ত্রের ব্যবস্থা।"

অটো জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রণবের কি মহিমা?"

আমি উত্তর করলেম—"আমার যতটা জানা আছে, একে মন্ত্ররাজ বলা হয়, এর স্পন্দন পূর্ণ গভীর শান্তির ও জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যায়। উদার মহিমা, প্রশান্ত অবস্থিতির দিকে এর গতি। জ্ঞানের তুরীয় ভূমিতে এর প্রতিষ্ঠা।"

অটো বল্লেন—"অধ্যাত্ম-জীবনে একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই শক্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যারা অধ্যাত্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত, তাদের জীবনই এ শক্তির বিশেষ পরিচয়।"

আমি বল্লেম—"প্রত্যেক মন্ত্রই এরূপ শক্তি-সম্পুট। যখনই মন্ত্রের জাগরণ, তখনই এরূপ শক্তির উদ্বোধন; সূক্ষ্মে একটা অপূর্ব্বতার সৃজন। ব্যক্তিত্বটি তখন দীপ্ত হয়ে ওঠে।"

অটো বল্লেন—"মন্ত্রের কথা আমি বলতে পারি নে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের ভেতর এমন একটি শক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যা' অতি সহজেই আকর্ষণ ও অভিভূত করে। সত্তার গভীরতর প্রদেশে আঘাত করে' জীবন-তন্ত্রীতে নবীন সুর জাগিয়ে তোলে।"

অটোর কথাগুলি সকলেরই ভাল লাগছিল। তাঁর কথাগুলির ভেতর ছিল শক্তি। তিনি অধ্যাত্ম বিদ্যায় উদ্বুদ্ধ।

রাত্রি অধিক হয়ে গেল। আমরা সকলেই ফিরলেম। শুয়ে শুয়ে অটোর কথা মনে হচ্ছিল। তাঁর অসীম জ্ঞান শ্রদ্ধায় মণ্ডিত হয়ে তাঁর চরিত্রকে করেছে বড় মধুর। এজন্যই তাঁর সঙ্গ হয়েছিল এত উপভোগ্য। ইউরোপে অনেক বড়লোক দেখলেম, কিন্তু অটোর মত এত স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, প্রেমোদ্দীপ্ত মানুষ দেখলেম না। তাঁকে দেখলে, মনে হয়, সত্যি একজন প্রকৃত ক্রিশ্চিয়ান দেখলেম।

আমি যখন ম্যারবুর্গ ত্যাগ করলেম, অটো এসে দেখা করলেন। আমি Tatuingen যাব, তিনি আমাকে বল্লেন, পথেই ষ্ট্যাট্‌ফোর্ড। সেখানে গাড়ী ৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। আমি সেখানে নেমে Goethe-house ও ষ্ট্যাট্‌ফোর্ডের পুষ্প উদ্যান দেখে যেন যাই। আমি স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁকে নমস্কার করলেম। আমি বিদায় নিলেম।

অভয়

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

কিছু তোর হয়নি বলে অমন করে,
(মিছে) থাকিস্‌নে রে ব্যথা-মলিন মুখ করে।
কি হবে নানান ফুলে, জীবনখানি সাজিয়ে তুলে-
যে ফুল যায় দু'দিন যেতে আপনি ঝরে।
নিমেষের এই ব্যথা-বেদন নিমেষ তরে॥

আপন-মনে জীবন-নদী মুক্ত স্রোতে,
কোন অসীমে মিশিয়ে যাক্ অজানাতে।
সোনার স্বপন বিফল দিন, আঁধারে যা হয়েছে লীন-
মিছে তুই খুঁজিস নে তায় অশ্রু-ধারে।
নিমেষের এই ব্যথা-বেদন, নিমেষ তরে॥

আইভরি বা গজদন্ত

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

হাতীর দাঁতের সামগ্রী আমাদের নিকট শুধু মূল্যবান্ নহে, পবিত্রও। রূপার স্থলে হাতীর দাঁতের সিঁদুর-কৌটা ব্যবহারের মধ্যে সুরুচির পরিচয় মিলে। সেইজন্য গজদন্ত-শিল্পে আমাদের অনুরাগ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দামে কাটে না বলে' বর্ত্তমানে দেখ্‌ছি এই শিল্পের প্রসার-প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। অথচ ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বেও দেখেছি, বিত্তশালী নাগরিকেরা গজদন্ত সামগ্রীর এমন কদর করতেন যে, মুর্শিদাবাদ হতে কয়েকজন ভাস্কর নিয়ম মত প্রায়ই বাড়ী বাড়ী ঘুরে হাতীর দাঁতের সুন্দর সুন্দর জিনিষ বিক্রয় করে যেতেন। তখন তখন কি ধনী, কি গৃহস্থের বাড়ীতে আলমারীতে আলমারীতে আইভরির মূর্ত্তি, খেলনা, কারুকার্য্যখচিত ছোট বড় দ্রব্যে সুরুচি ও শিল্পকলার আদর প্রকাশ পেত। আইভরি-শিল্পে ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের এখনও দৈন্যদশা হয়নি—বিদেশ থেকে চালানী বেশী হয় না কিন্তু অন্যান্য বিদেশী সৌখীন সস্তা সামগ্রীর আমদানীতে আমাদের এই শিল্পটী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের আইভরি-শিল্পের কথা পরে বিস্তারিতভাবে বল্‌ব। উপস্থিত আইভরি সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে কিছু বল্‌ছি।

হাতীর দাঁতকে শিল্পকাজে লাগাবার বুদ্ধি প্রাক্-ইতিহাসের মানব-মস্তিষ্কে জেগেছিল—তার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনও ধাতুর আবিষ্কার ঘটেনি—প্রস্তর, কাষ্ঠ, অস্থি, শিং, চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্যে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধন করত। অস্ত্র না হলে আহার্য্য মিল্‌ত না, তাই এই সমস্ত দ্রব্য হতেই তাকে বর্শা, সড়কি প্রভৃতি নানারূপ অস্ত্র প্রস্তুত করতে হ'ত। গজদন্ত বস্তুটী ও তার উপরকার উজ্জ্বলরূপ অনুন্নত আদিম মানব-চিত্তকেও সহজেই মুগ্ধ করত। পুরুষ হস্তী জঙ্গলে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে, মানুষ তার (tusk) গজদন্ত দুটীকে সংগ্রহ করে নিজ কার্য্যে লাগাত। ক্রমশঃ তার অন্তস্থিত শিল্পী মন এই সুরূপ দ্রব্যকে শিল্পকাজে ব্যবহার করতে সুরু করে।

কিন্তু এই মূল্যবান্ সামগ্রী আইভরিকে তারা দামী জিনিষ মনে করত না—তার প্রমাণ পাই আফ্রিকার

আইভরি কার্ভার: আইভরি ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তর

জঙ্গলে আদিম জাতিদের ব্যবহারে—এ বিষয় পরে বল্‌ছি।

পৃথিবীর যে সকল স্থানে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের চিহ্ন (relics) অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোথাও কোথাও হস্তীদন্ত বা অস্থিনির্ম্মিত দ্রব্যখণ্ডও খননের ফলে হাতে এসেছে। ইউরোপের পুরাতত্ত্ববিদ্গণ দক্ষিণ ফ্রান্সে ডর্ডন (Dordogne) এবং আরিয়েগ (Ariegedts) নামক স্থানে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের 'ফসিলে'র সঙ্গে বহু কারুকার্য্যখচিত আইভরি টুক্‌রা প্রাপ্ত হয়েন। উহাতে শিল্পনৈপুণ্যের অভাব দৃষ্ট হইলেও বিলাস-দ্রব্যাদিতে গজদন্তের ব্যবহার যে হত তা বোঝা যায়। তীরের মাথা, পিন্, বর্শা, চুলের কাঁটা প্রভৃতি

আইভরি হ'তে প্রস্তুত হ'ত। রিভিয়ারা ও জার্ম্মানীতেও এই ধরণের কতকগুলি অরিগ্ন্যাক্-কালচারের আইভরি পাওয়া গেছে।

পুরাতন প্রস্তর যুগের (Palæolithic বা old stone age) অরিগনেকিয়ান (Aurignacian) স্তরের সভ্যতার
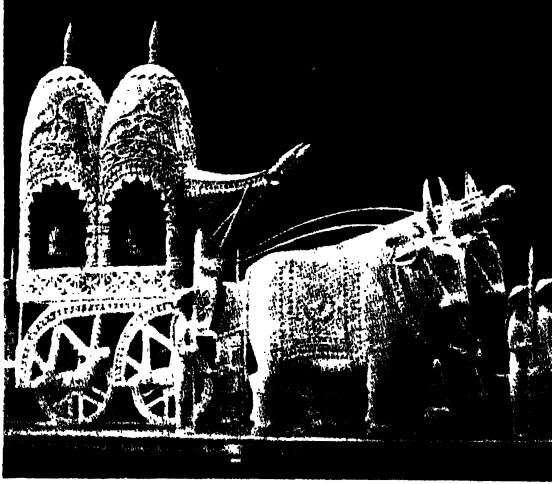
আইভরি-নির্ম্মিত গো-যান মডেল

যে সমস্ত রেলিক্ আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে আইভরি খণ্ড প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, সেই জন্য এই স্তরটী নৃতত্ত্ববিদ্গণের নিকট আইভরি-যুগ বলে পরিচিত।

শ্রেষ্ঠ আইভরি ভাণ্ডার রত্নগর্ভা আফ্রিকাদেশে বহুকাল লুক্কায়িত আছে, তার সন্ধান সর্ব্বপ্রথম পেয়েছিল সভ্য প্রাচীন মিশর আজ হতে পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইজিপ্ট্ যে সভ্যতার আলোক নিক্ষেপ করে আদিম-জগতকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল, তার রাজকীয় বা ধনীদের বিলাস ব্যাপারে আইভরি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল — তার খবর বর্ত্তমানে পাচ্ছি আমরা ফ্যারাওদের সমাধি খননের ফলে। ইলিয়ট স্মিথ্, হাওয়ার্ড কার্টার প্রভৃতি পুরাতত্ত্ব-বিদ্গণ যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে দেখা যায় কারুখচিত আইভরির অস্তিত্ব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। নাগাদা, সাকারাতে সাধারণ লোকের এবং তুতানখামেনের সমাধি থেকে আইভরির চিরুণী, হেয়ার-পিন, ফ্রেটওয়ার্ক, বাসন, সিল (seal), দাবা, বোড়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, হাতল, কাস্কেট্, ছাঁপ (inlays,) আসবাব পত্র, আসন প্রভৃতি কত কি পাওয়া গেছে।

প্রাচীন ব্যাবিলনে মিশরী-সভ্যতা-প্রভাব-প্রাপ্ত শিল্পে কারুকার্য্যখচিত আইভরি দ্রব্যের রত্ন আহরণ করা গেছে। ক্রীটে ও মাইনোয়ান কাল্চারে মেয়েদের আইভরী অলঙ্কার এবং টয়লেট দ্রব্য পাওয়া যায়। নিনেভা, আসিরিয়া, ট্রয়, ক্রীট, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রায় সর্ব্বত্রই আইভরি যে সে-যুগে ব্যবহৃত হত এবং কারুশিল্পে সমাদৃত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ প্রবন্ধে সে-যুগের আইভরি শিল্প ও কার্ভিং সম্বন্ধে সবিশদ আলোচনা সম্ভব নয়।

প্রাচীন হিব্রুজাতির মধ্যে কেহ কেহ গজদন্ত আমদানী রপ্তানীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। গ্রীক্ বীর যোদ্ধাদের অশ্বখুরে আইভরি পিন ছিল তার উল্লেখ পাই ইলিয়াডে। ওডেসিতেও গজদন্ত সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়।
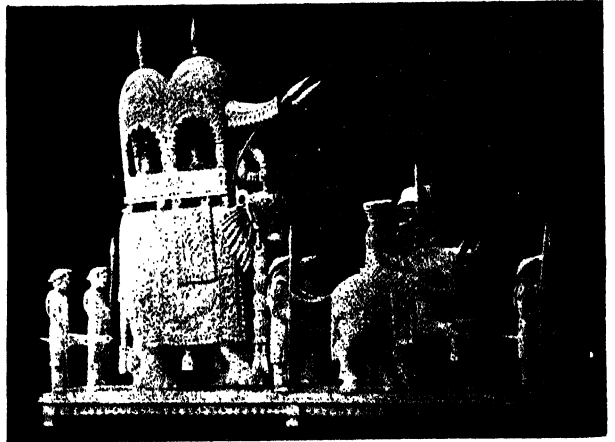
হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত রথ: ভারতবর্ষ

আফ্রিকা হতে প্রচুর আইভরি সংগ্রহ করে সুসভ্য প্রাচীন রোম আসবাব-পত্র, বিলাসদ্রব্য, বাসন-কোষন, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়ে ব্যবহার করত। কথিত

আছে জুলিয়াস সীজারের সোনটাসে যে সব বেঞ্চ ছিল তাহা ছিল আইভরি প্রস্তুত। রোমানেরা এই মসৃণ সুদৃশ্য সুন্দর গজদন্ত সামগ্রী এত অধিক মাত্রায় ব্যবহার

গজদন্তের কারুশিল্প

করেছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী দেশ হতে আইভরি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন যুগ হতেই হস্তীদন্ত নির্ম্মিত শিল্পের কিছু কিছু ব্যবহার ছিল। অতি বৃহৎ পশু বলে রাজারাজড়ারা হস্তীকে পালন করতেন এবং জঙ্গলে জঙ্গলে শীকার করতেন বা ধরে আনতেন। হিমালয়ের তরাই জঙ্গলে, মধ্যভারতের অরণ্যে এবং আসাম-জঙ্গলে অতি প্রাচীন কাল হতেই হস্তী বিদ্যমান ছিল—তাদের দন্ত থেকে সভ্য হিন্দুস্থানের মানব যে আইভরি দ্রব্য প্রস্তুত করত তার আর সন্দেহ কি। মধ্যবিত্তের জন্য কটকে যেমন উজ্জল মহিষ শিঙের জিনিষপত্র, খেলনা, আসবাবের প্রচলন—তেমনি ধনীর জন্য এই গজদন্ত। একদা রাজন্যবর্গও এই শিল্পকে রীতিমত পরিপুষ্ট করতেন।

রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, ভরতের সঙ্গে যে সমস্ত লোক রামের অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আইভরি কারুশিল্পী ছিল সম্ভবতঃ রামের খড়ম প্রস্তুত করতে তখনকার মেয়েরা হাতীর দাঁতের গহনাও পরত, কারণ প্রাচীন গ্রন্থে সে রকম আভাস পাওয়া যায়—রঘুবংশ, বৃহৎসংহিতা বা হরিবংশে আইভরি খোদাই সামগ্রী ও অলঙ্কার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গেছে। গজমতি হারের চলন যে ছিল, তা'ত বাংলার 'চণ্ডীদাস' ও 'ভারতচন্দ্রে' রয়েছে পালঙ্কে বা আসনের খুরায় গজদন্ত-খচিত পশুমুখ বিশিষ্ট কারুকার্য্যাদি উৎখোদিত ছিল। হাতীর হাড়ের এবং হাতীর দাঁতের চারুশিল্প একসঙ্গেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে; কিন্তু হাতীর দাঁতের সামগ্রী সূক্ষ্ম রুচিসম্মত, দামী ও পবিত্র বলে বিত্তশালীদের দ্বারাই উহা অধিক পুষ্ট ছিল।

বাংলাদেশে বর্ত্তমানে এই শিল্প মুর্শিদাবাদ ও রংপুর এইদুটী স্থানেই প্রকৃত পক্ষে নিবদ্ধ আছে কল্‌কাতায় বড়বাজার বেঙ্গল ষ্টোরস্‌ বাদ দিলে একমাত্র মাতৃভাণ্ডার ছাড়া আর কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের

বিভিন্ন প্রকারের ও বিচিত্র বর্ণের আইভরি : আফ্রিকা

কারিকরদের পূর্ব্বপুরুষ জয়পুর থেকে আইভরি-শিল্পের কলাকৌশল শিক্ষালাভ করে আসে। মুর্শিদাবাদের পরদের মত মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের প্রতিমা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পুতুল, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, খেলনা, ঠেলাগাড়ী সবচেয়ে সেরা। সূক্ষ্ম কাজের (Finery) দিক দিয়ে এর তুলনা হয় না। আইভরির উপর রং ফলানো বা চিত্রবিচিত্র আঁকা কাজ আদিম ভারতেই বেশী দেখা যায়—এই ধরণের একখানা বড় রিকৃস দেখে এসেছি এবারে পাটনায় জালানজীর সংগ্রহশালায়; জনৈকা রাজমহিষী এটা ব্যবহার করতেন।

ঢাকা ও শ্রীহট্টে হাতীর দাঁত-খোদাই দ্রব্য কিছু কিছু এখনও মিলে থাকে। শ্রীহট্টের পাটী ও পাখা বহুদিন হ'তে বিখ্যাত। এখনকার ভাস্করেরা বেশীর ভাগ বৈষ্ণব; এদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এমন কি কটকি রূপার জিনিষকেও হার মানায়—কটকের মহিষের শিংএ কিন্তু এমন সুন্দর জিনিষ হতে পারে না—তার আরও একটা কারণ, আইভরির স্বল্প পীতাভ রূপ ভারী মনোহর। কলকাতায় সূত্রধরেরা পূর্ব্বেও কিছুদিন হাতীর দাঁতের বোতাম, চিরুণী, হারমনিয়ামের রীড্ প্রস্তুত করত।

আফ্রিকার গজদন্ত ভাণ্ডার

বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ জেলার) আইভরি শিল্প সম্বন্ধে J. F. Reyal সাহেবের কথাগুলি উল্লেখ করছি—তিনি তৎকালীন দক্ষ ভাস্করদের খুব প্রশংসা করেছেন :

"Among these the ivory Carvers of Berhampore are Conspicuous" "......their representation of the elephant and other animals are so true to nature that they may be Considered the real artists..."*

প্রাচীন সভ্য রোম আদিম আফ্রিকার অনেকখানি দেশ অধিকার করেছিল। পৃথিবীর মধ্যে আফ্রিকার মত

সাবরাতে প্রাপ্ত সুপ্রাচীন শীলমোহর ও হেয়ার পিন

বন্যভূমি নাই; সেজন্য বহুদিন ধরে বহুল পরিমাণে হাতী এখানকার জঙ্গলে বাস করে আসছে। অসভ্য নীগ্রোরা খাদ্যান্বেষণে এদের শীকার করত কিন্তু গজদন্তের কোন মূল্যই দিত না, পশুর হাড়ের মত মাঝে-সাজে অলঙ্কারাদি হিসাবে ব্যবহার করত। এই আদিম জাতিদের নিকট আফ্রিকার জঙ্গলে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য গজদন্ত জমা হয়ে পড়েছিল।

আইভরির এই ভাণ্ডার প্রথম লুণ্ঠন করেছিল রোমানেরা। দেশে নিয়ে গিয়ে এর যথেচ্ছাচার ব্যবহার করেছিল, যেহেতু তার দাম দিতে হয় নি। কিন্তু এই সুন্দর মূল্যবান বস্তু তারা অপহরণ করতে পেরেছিল আফ্রিকার মহাদেশের সমুদ্রের ধারে ধারে স্থিত গ্রামগুলি থেকে—অভ্যন্তর প্রদেশ হতে সংগ্রহ করতে ভরসা পায় নি। এই

* Arts & Manf. of India—J. F. Reyal. p—511

সময় পর্টুগীজরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করে (west and east coastএ) অ্যাঙ্গোলা ও মজাম্বিক্ থেকে প্রচুর পরিমাণে আইভরি আহরণ করে। বেশী অভ্যন্তরে তারাও ঢুকতে সাহস করেনি—অথচ লুক্কায়িত খনির মত জঙ্গলে-জঙ্গলে, গ্রামে-গ্রামে আইভরি রত্নভাণ্ডার ছিল গুপ্ত। তাঁর সন্ধান পেয়েছিল ডাচ ঔপনিবেশিকেরা। তারা দক্ষিণ প্রান্ত হতে প্রবেশ করে' প্রায় মধ্য আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং নীগ্রোদের কাছ থেকে আইভরি সন্ধান করে।

এই গজদন্ত ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়ে অষ্টম নবম খৃষ্টাব্দে আরব বণিকেরা এই গজদন্ত ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই থেকে আরবীয়েরা প্রচুর-ভাবে আইভরি ও ক্রীতদাস দেশ-বিদেশে চালানি আরম্ভ করে দেয়। আরব-ব্যবসায়ীরা গজদন্ত চালানী কার্য্যে নীগ্রো-নেটিভদের প্রতি শেষ পর্য্যন্ত এমন অত্যাচার আরম্ভ করেছিল যে, সে নৃশংস কাণ্ডের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। নীগ্রোরা এই গজদন্ত শুধু ঘর থেকে বার করে দেয় নি—যেখানে পারে সেখান থেকে খোঁজ করে নিজেরা বহন করে পর্য্যন্ত জাহাজে তুলে দিত। নিজেরাও ক্রীতদাসের মত দেশদেশান্তরে চালান হত। এই নৃশংস ব্যবসায়িরা বহুদিন পর্য্যন্ত এইরূপ অমানুষিক কার্য্যে লিপ্ত ছিল। জাঞ্জিবারী আরবদের নৃশংস অত্যাচারের ফলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের হাত থেকে আফ্রিকার অতি লাভবান আইভরি ব্যবসা চলে আসে আফ্রিকাস্থ সিন্ধী বম্বেওয়ালা মহাজনদের হাতে। আজ পর্য্যন্তও তাই আছে। আফ্রিকা হতে অজস্র গজদন্ত সংগ্রহ করে প্রথমে এরা বোম্বাই বন্দরে আনে—সেখান থেকে পৃথিবীর নানাস্থানে চালান করে। এ সম্বন্ধে মন্তব্য :

"India now holds the highest importance in the ivory trade of the world as the chiefest markentile centre for the export and import of elephant tusks is Bombay, whereto 90% of the total out put come from Africa. Although Assam and Burma supply the demand of the world in ivory to a little extent, the African ivory is universally used."
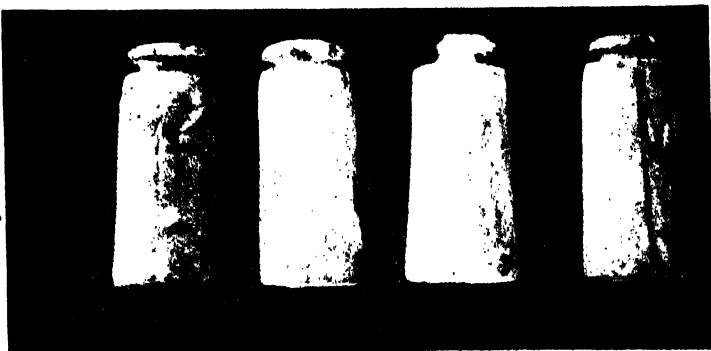
পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বের আইভরি নির্ম্মিত বোড়ে

সাকারাতে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন নৌকাকৃতি আইভরি মডেল

বোম্বাই থেকে যে আইভরি রপ্তানী হয় তার শতকরা ৯০ টন আফ্রিকা হতে আমদানী এবং বাকী আসাম ও বর্ম্মাদেশের। আসামে হাতী আছে বিস্তর সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গজদন্ত আহরণের জন্য এখনকার সংরক্ষিত জঙ্গলগুলিতে অনাবশ্যক হাতী হত্যা নিষিদ্ধ।

আফ্রিকার প্রতি সকলেরই ভীষণ লোভ ছিল ও

আছে। রত্নপ্রসূতি এই মহাদেশে আইভরি সংগ্রহে ইংরাজ-বণিকরাও যথেষ্ট হানা দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ফরতি-অভিযান পথে নীগ্রোদের মোড়লদের দ্বারা বড় বড় হাতীদন্ত সঞ্চয় করে নিয়ে আসত। কিনতে না লাগে পয়সা, বহন করে নিয়ে যেতেও না লাগে খরচা,—নীগ্রোদের কাঁধে চড়িয়ে সমুদ্রে জাহাজ পর্য্যন্ত দিব্যি বিনা মূল্যে সবই ঘটে। কিন্তু শেষ্যন্ত পর্য এরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি, কারণ ভিতরকার আরবদের খুঁটীর সন্ধান একমাত্র সিন্ধী বম্বেওয়ালারাই ভালরূপ জানে। আশ্চর্য্য, এই বিশেষ শিল্পটীর উপর বাঙালীর দৃষ্টি এ যাবৎ পড়েনি।

গ্রামের কাব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষুদ্র কবি একলা থাকে ক্ষুদ্র নদীর তীরে,
শান্তি এবং কুসুম রাজে তাহার সুখ নীড়ে।
বিহগ রয়ে কূলায়
সমীর চামর ঢুলায় ;
রৌদ্র ছায়ার লুকাচুরি শ্যামলিমার ভিড়ে।

কৃষাণেরা উঠ্‌তি ফসল প্রথম করে দান
ভক্তি-প্রীতি ভরা আহা ক্ষুদ্র সে সম্মান।
করি অজয় পার
লয়না কড়ি তার,
চরণ ধূলি লয়ে মাঝি ধন্য করে জ্ঞান।

পল্লীগ্রামের যাত্রা বাউল কীর্ত্তনেরি দল
তাহার বাড়ী প্রথম গাওয়া ভাবে সুমঙ্গল।
বাদ্যকরও আসি
বাদ্য শুনায় হাসি,
পুণ্যভূমি যেথায় পড়ে কবির চরণতল।

প্রণাম দিতে আসেন তারে স্বয়ং জমিদার,
ধনী মানী পাঠান তারে নানান উপহার।
হাকিম আসি দ্বারে
সম্মান দেন তারে
পূজারি তার গলায় পরা'ন দেবীর গলার হার

সদাই সে যে আপন ভোলা কোথায় থাকে মন
চক্ষু যেন অতীন্দ্রিয় করছে কি দর্শন।
ইন্দ্রিয় তার বশ
চায়না ক সে যশ
করেছে সে হরির পদে সকল সমর্পণ।

নিত্য নূতন অভাব তারে করে না চঞ্চল
ক্ষুদ্র বুকে আঁকড়ে রাখে গোটা ভূমণ্ডল।
নিঃস্ব তবু ধনী
চিন্তামণির খনি
পুণ্য তাহার দর্শনেতে পালায় অমঙ্গল।

প্রেমাত্মক কাম

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ; বিদ্যাবিনোদ

রাধাকৃষ্ণলীলা বাহ্যদৃষ্টিতে কামমূলক—সুতরাং অশ্লীল। এই লীলার গৌরব অনুভব করাটা 'বহিরঙ্গ' ব্যক্তির পক্ষে সুকঠিন। যাঁহার এই লীলা উপভোগ করিবার অনুকূলে একটা নূতন অধ্যাত্ম-দৃষ্টি খুলিয়া যায় নাই, তাঁহার পক্ষে গোপীভাবপুষ্ট এই রাধাকৃষ্ণলীলা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া উঠা একরূপ অসম্ভব বলিলেও ক্ষতি হয় না। আমরা যে দৃষ্টি, যে মনোভাব এবং অলঙ্কার শাস্ত্রগত যে সব canon লইয়া কাদম্বরী উপভোগ করি, সেই মনোভাব বা Canon-এর সাহায্যে "গোবিন্দলীলামৃত" বা "গীতগোবিন্দ" অনুভব করিতে পারিব না। অথচ বাহ্যতঃ এই উভয় কাব্যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য যথেষ্ট বা পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই বলিলেও চলে। তাহা হইলে আমরা কিরূপ মনোভাব লইয়া এই রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিব? কি ভাবে দেখিলে এই লীলা যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ করা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু মাত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

শৃঙ্গার-রসাত্মক রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে এই লীলার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ রহিতে হইবে। তাহা হইলেই এই লীলার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগিবে। সর্ব্বাগ্রেই আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই লীলা ঐন্দ্রিয়িক (sensuous) নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে এই লীলার প্রকাশ রহিলেও—স্বরূপতঃ ইহা অতীন্দ্রিয়, ইহা স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে subjective এবং আদৌ objective নহে। সচ্চিদানন্দময় সেই এক পরম সদ্বস্তু বা পরমাত্মারই ইহা আনন্দলীলা। বিশুদ্ধ অদ্বৈত অবস্থায় (Pure monistic stateএ) আনন্দলীলার পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা। বিশুদ্ধ অদ্বৈত অবস্থায় থাকে একটা একঘেয়েমির ভাব, একটা state of dullness। এইরূপ ভাবটা পরিপূর্ণ আনন্দ-চর্চ্চার অনুকূল নহে। বৈচিত্র্যই আনন্দস্বাদের প্রাণসার। বৈষ্ণব এই বৈচিত্র্যময় আনন্দোপভোগকেই লীলাবিলাস বলিয়াছেন। সুতরাং আনন্দময় স্বভাবের নিত্যসিদ্ধ নিয়ম-প্রেরণায়, পরিপূর্ণ আনন্দোপভোগের স্পৃহার প্রেরণায়, সেই অদ্বয় আনন্দভুক্‌ পরমাত্মা আপনাকে আত্ম-মিথুনরূপে প্রকটিত করিলেন, কিন্তু এই দ্বয়ীরূপে প্রকটিত হইলেও তাঁহার আনন্দলীলার ক্ষুণ্ণতা রহিয়া গেল; তাই দ্বয়ীকে কেন্দ্র করিয়া বহুরূপে তাঁহার লীলাপ্রকাশ। উপনিষদে যিনি "আত্ম মিথুন" তিনিই পৌরাণিকের ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, আর কোটি কোটি গোপীগণও সেই অদ্বয় পরম পুরুষেরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র—গোপীতত্ত্বকে মূলতঃ অদ্বৈত তত্ত্বমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, অদ্বয় পরমাত্মাই স্ব আনন্দাস্বাদের প্রেরণায় বিশুদ্ধ অদ্বৈত অবস্থার বৈচিত্র্য বিহীন জড়িমার ভাব দূর করিয়া, আপনাকে স্বাভিব্যক্ত বহুরূপে প্রকটিত করিয়া এক আনন্দ-চক্রের নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ চক্রেই তাঁহার সম্যক্‌ ষোলকলায় পরিপূর্ণ আনন্দ-বিলাস। পৌরাণিক ভাষায় রাসমণ্ডলীই এই আনন্দ-চক্র। এই রাসমণ্ডলীতেই তাঁহার রাসলীলা। শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি রসস্বরূপ—রসোবৈসঃ। শ্রুত্যন্তর বলিয়াছেন—আত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ। নিজের সহিত ক্রীড়া করা, নিজের সহিত রতি করা তাঁহার স্বভাব। আত্মার বাহিরে তোমার কিছুই নাই; সুতরাং তিনিই আনন্দ স্বভাবের প্রেরণায় তাঁহারই সহিত ক্রীড়া করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতির মধ্যে কোন শ্রুতি বলিলেন তিনি রসস্বরূপ। কিন্তু এই রসস্বরূপটা realised হওয়া চাই। তাই কেহ কেহ বলিলেন, তিনি আত্ম-ক্রীড় অর্থাৎ তিনি নিজের মধ্য দিয়াই নিজের সহিত নিজেই খেলা করিয়া থাকেন। ইহার বেশী কোন শ্রুতিই ভগবানের এই রসস্বরূপতা সম্বন্ধে বলেন নাই। পুরাণকারই শ্রীভগবানের এই রসস্বরূপতা সম্বন্ধে একটা বিশ্লেষণ করিয়া, তৎসম্বন্ধে এক উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন

শ্রুতিতে যাহা বীজাকারে ছিল, পুরাণে তাহাই পল্লবিত হইয়াছে। শ্রুতিতে যাহা সূত্রাকারে ছিল—পুরাণে তাহাই সূত্রসহ ভাষ্যরূপে এক অখণ্ড শ্রী প্রাপ্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রুতি তাঁহাকে 'আত্মক্রীড়ঃ' বলিয়াছেন—এই আত্মক্রীড়া কিরূপ তাহা বলেন নাই। পুরাণে এই আত্মরতি ও আত্মক্রীড়ার স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। শ্রুতি-নির্দ্দেশিত শ্রীভগবানের রসস্বরূপতা, তিনি আত্মক্রীড় বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই বিশ্লেষিত এবং সম্প্রসারিত (expanded) হইয়াছে পৌরাণিকের শ্রীরাধাকৃষ্ণরস-লীলায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, স্বরূপতঃ এই রাধাকৃষ্ণলীলা দ্বৈতমূলক নহে। ইহা নিজের সহিত নিজেরই খেলা। শিশু যেমন মুকুর লইয়া খেলা করে—ইহাও যেন ঠিক তেম্‌নিটি। এই লীলায় যিনি Subject বা কর্ত্তা তিনিই Object বা কর্ম্ম; যিনি এক তিনিই দুই; যিনি অন্তর—তিনিই বাহির, যিনি কবি—তিনিই কাব্য, যিনি ভোক্তা—তিনিই ভোগ্য, যিনি রসস্বরূপ—তিনিই 'রসোপকরণ'। বাহির হইতে কোন কিছুই হয় নাই। এই লীলা আত্মায় আত্মায় রতি, আত্মায় আত্মায় রমণ। আত্মাই আস্বাদয়িতা আবার আত্মাই আস্বাদ্য বস্তু। বাহির হইতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দিক হইতে এই লীলা বুঝিতে গেলে আমরা ইহা তো বুঝিতে পারিব না—ইহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। দেহের দিক হইতে নহে, আত্মার দিক হইতে নহে, দেহাহংএর দিক হইতে নহে, আত্মাহংএর দিক হইতে এই ভোগায়তন আমির পশ্চাতে যে চিৎঘন আনন্দঘন আত্মার প্রতিষ্ঠা আছে—তাহারই দিক হইতে এই লীলা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। লীলারস অনুভব করিতে হইলে এই লীলাতত্ত্বও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ দেশ ও কালাতীত ধামের কল্পনা করেন—একটা higher plane of existence beyond space and time. ইহাকে উঁহারা গোলক বা 'নিত্য বৃন্দাবন' বলিয়া থাকেন। এই গোলক বা নিত্য-বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলা নিত্যরূপে বিলসিত হইতেছে। ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। এই নিত্য-বৃন্দাবন তত্ত্বটা হইতেছে একটা প্রপঞ্চাতীত চিন্ময়-তত্ত্ব বা precosmic তত্ত্ব। এই প্রপঞ্চাতীত নিত্য-বৃন্দাবনের লীলা-নায়ক আমাদের "ভুবি বৃন্দাবনে"—প্রপঞ্চান্তর্গত বৃন্দাবনে প্রকটিত হইয়া থাকেন—দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া যাহার প্রকাশ। এই নিত্য দেশ-কালাতীত বৃন্দাবন ও দেশ-কালাশ্রিত পার্থিব বৃন্দাবনের আদর্শ একই। বৈষ্ণবগণ বলেন, প্রপঞ্চান্তর্গত মানুষকে নিত্য-বৃন্দাবনের আদর্শ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিবার জন্যই নিত্য-বৃন্দাবনের লীলানায়ক প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। সে যাহা হউক, এই বৃন্দাবনের আদর্শই বৈষ্ণবের আদর্শ। বৈষ্ণব কি ভাবে রস-লীলা গ্রহণ করেন, তাহাই আমরা বলিতেছি।

বৈষ্ণব বলেন — বৃন্দাবনে শ্রীভগবান নরাকৃতি। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"নরবপু তাঁহার স্বরূপ", এই নরবপু ব্যতিরেকে তাঁহার রসাস্বাদন হয় না—এই নরবপুই যেন রসাস্বাদের নিত্য-সিদ্ধ আশ্রয়। এই নরবপু বলিতে কি বুঝায়, তাহা সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বিশদ্‌ভাবে বলিয়াছেন। প্রবন্ধান্তরে তাহা সম্যক্ আলোচিত হইবে। এখানে সংক্ষেপে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নরবপু বলিতে তাঁহারা পার্থিব মায়িক মানুষ বুঝেন না। পার্থিব মানুষ বা আমরা-মানুষ জড় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর "সে মানুষ" বৃন্দাবনের মানুষ—চিন্ময়, নিত্য এবং অতীন্দ্রিয়। সহজিয়া বৈষ্ণব বলেন—

> "নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
> সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার॥
> জন্ম-মৃত্যু নহে তার নহে সে ঈশ্বর।
> গোলকের পতি তারে ভাবে নিরন্তর॥"

—তবে এই বৃন্দাবনের মানুষের সঙ্গে মায়িক পার্থিব মানুষের যথেষ্ট মিলও আছে। যেন বৃন্দাবনের মানুষের ছাঁচে 'এ-মানুষ' পার্থিব-মানুষ তৈয়ারী। বাইবেল বলিয়াছেন—God made man after His own image. সত্যই বাইবেলের এই বাণী বৈষ্ণবকথিত ভগবানের নর-বপুত্বই সমর্থন করিতেছে। বাহির হইতে পার্থিব মানুষ ও বৃন্দাবনের মানুষ যেন অনেকটা একই বলিয়া বোধ হয়। বৃন্দাবনের মানুষের লীলাখেলা ও আমরা-মানুষের লীলাখেলা অনেকটা একই বলিয়া বোধ হয়। এ হেন বৃন্দাবনের মানুষকেই বলা হইয়াছে—

অপ্রাকৃত মানুষ (supersensual man); আর প্রাপঞ্চিক মানুষ বা আমরা-মানুষ হইতেছে প্রাকৃত মানুষ বৈষ্ণবাদর্শ বৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত মানুষ স্বরূপতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতেই ইহার প্রকাশ। সেই জন্যই গোপীগণের যাবতীয় প্রচেষ্টাই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া ভুল হয়। সত্যই এই লীলায় অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ মিশিয়া রহিয়াছে; ঠিক যেমন আকাশ ও পৃথিবী দূরের দিক্‌চক্রবাল-রেখায় মিশিয়া যায় তেম্‌নি। Sensuous বুঝি supersensuous-কে গিয়া স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে আর supersensuous যেন sensouous পর্য্যন্ত আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এহেন ক্ষেত্রে প্রপঞ্চান্তর্গত বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠা। এই লীলা ও লীলা-চেষ্টিত স্বরূপতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে ইহার প্রকাশ বলিয়া অতীন্দ্রিয় সত্তা ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তা—এই উভয়বিধ সত্তাকে একত্র গাঁথিয়া লীলারসোপভোগ করিতে হয়। এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ হইতেই জন্মিয়াছে বৈষ্ণবের বিচিত্র মরমিয়া রস-সাধনা। আমরা প্রাকৃত মানুষ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের মধ্য দিয়াই সকল বস্তু বুঝিয়া থাকি। এই জন্যই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মানুষের রহস্যময় লীলারঙ্গ আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার সকল চেষ্টাই প্রাকৃত বলিয়া বোধ হয়—আমাদের মত অশ্লীল বলিয়া বোধ করি। বিশেষতঃ এক অপরূপ যৌন-সম্বন্ধের উপর বৃন্দাবন-লীলা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরাও সাধারণতঃ যৌন-সম্বন্ধ কামমূলক ভাবি বলিয়া এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে কামমুক্ত এক অনাবিল আনন্দলীলা বলিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবিকই ইহা কি কামলীলা? কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক রাধাকৃষ্ণরতি বহু স্থলেই কামানুগা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? রাধাকৃষ্ণ উপাসনাও 'কামবীজ' ও 'কাম-গায়ত্রী' আশ্রয়ে করিতে হয়—এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কাম গায়ত্রী যাহার উপাসন॥' ইত্যাদি।

কি বিশিষ্ট অর্থে কাম শব্দের ব্যবহার হইয়াছে—তাহা আমাদের জানা উচিত, নতুবা রাধাকৃষ্ণ-লীলা কামলীলা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। সকলেই জানেন যৌন-সম্বন্ধের উপর রাধাকৃষ্ণলীলা স্থাপিত বা মধুর-ভজনের প্রতিষ্ঠা। সাধারণতঃ আমরা এই যৌন সম্বন্ধকে কাম-মূলক বলিয়া ভাবি। কাম বাদ দিয়া আমরা যৌন সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না। কাম ও প্রেমে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও, আমাদের দাম্পত্যজীবন প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কাম বাদ থাকে না। যেমন পদ্ম জলের উপর ভাসমান থাকিলেও, ইহার মৃণাল-তন্তু নীচের পঙ্ককে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না—প্রেমও সেইরূপ। তাই যৌন সম্বন্ধের উপর এই লীলা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বাস্তবতঃ বৈষ্ণব-তাত্ত্বিকগণ এই লীলাকে কামানুগা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি।"

বিশেষতঃ কাম শব্দ ব্যবহারের অন্য কারণও আছে। কামকে তাঁহারা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। কামের একটা গৌরবময় দিকও আছে। কাম অবশ্য দেহগত। যৌন-মিলন কামের উদ্দেশ্য। আলিঙ্গনাদি দেহবিকার-সমূহ আশ্রয় করিয়া কাম যৌন-মিলনই ঘটাইয়া দেয়। তাহার পর আর ইহার ক্রিয়া নাই। সৃষ্টিই ইহার প্রধান ক্রিয়া। "প্রাকৃত কাম যার তার সৃষ্টিরূপা নাম।" এই কাম একটা অপ্রতিরোধনীয় শক্তি—কেহই ইহার দুর্নিবার প্রভাব এড়াইতে পারে না। ইহা নায়ক ও নায়িকার মিলন হেতু এক অপূর্ব্ব আবেগের সৃষ্টি করে। উভয়ের উভয় দেহ-মন একটা ঘন একত্বের অভিমুখে সজোরে লইয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য উভয়ের দেহ-মন-গত পার্থক্যকে দূর করিয়া মুছিয়া ফেলে—উভয়কে এক করে—একটা তাদাত্ম্য প্রাপ্তি করায়। সুতরাং কাম-তত্ত্ব হইতেছে একটা আকর্ষণ-তত্ত্ব (philosophy of attraction) রাধাকৃষ্ণলীলা একটা আকর্ষণ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ ভগবানকে অতি নিবিড়ভাবে পাইতে চাহে। এই নিবিড়ভাবে পাওয়াটা সার্থক হইয়া উঠে মানুষের পরকীয়া ভজনের দ্বারা। পরকীয়া রমণী যেমন আপন দয়িতের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষিণী হইলে, কুল-মান-লাজ-সম্ভ্রম, সমগ্র জগৎ, সমগ্র সমাজ—কোন বাহ্য শক্তিই যেমন তাহার মিলন-পথের বাধক হইতে পারে না—সে যেমন সাগরাভিমুখিনী বর্ষার গঙ্গার ন্যায় দুর্নিবার বেগে

ছুটিয়া চলে, তেমনি কান্তাভাবাবলম্বী বৈষ্ণব সাধক মধুর রস বা কান্তা ভাবের প্রেরণায় তাঁহার প্রিয়তম দয়িত বন্ধু ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে চান। একটা বিরাট্ আকর্ষণ ও অনুরাগই হইতেছে পরকীয়া ভাব-যাজনের বৈশিষ্ট্য। দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অন্য কোন ভাব-যাজনেই এই অপরূপ আকর্ষণ নাই। একটা সীমাহীন আকর্ষণ ব্যতিরেকে নর ও ভগবানের মিলন সম্ভব হয় না; ইহা সকল দেশের ও কালের ভাগবত-তাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত। যৌন-তত্ত্বের মধ্য দিয়া একটা সীমাহীন আকর্ষণের কতকটা আভাষ মেলে—বিশেষতঃ কামের মধ্য দিয়াই এইরূপ আকর্ষণের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান ও মানুষের মিলনের জন্য যে পরিমাণ আকর্ষণের আবশ্যকতা আছে, তাহা কাম ছাড়া অপর কোন ভাব দ্বারাই প্রকাশিত হইবার নহে। কাম-ভাবেতে যে রস, রঙ্গ, গৌরব, আবেগ, আকর্ষণের লীলাখেলা আছে—তাহা কোন প্রকার চিত্তবৃত্তিতে নাই। তাই বৈষ্ণব-তাত্ত্বিকগণ রাধাকৃষ্ণলীলা কামানুগা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই আকর্ষণ-তত্ত্ব যাহা নর ও ভগবানের মিলনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই আকর্ষণ-তত্ত্বকে অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিতে হইবে। বাস্তবিকই এই লীলা স্বরূপতঃ কামলীলা নহে; সাধারণতঃ আমরা যাহাকে কাম বলি—বৈষ্ণব সাধক যাহাকে প্রাকৃত কাম বলিয়াছেন, তাহা এই লীলায় নাই। এই লীলা প্রেমের শুচিতায় ভাস্বর। সকলেই জানেন, কাম ও প্রেমে তফাৎ কি। কাম দেহগত। প্রেম দেহাতীত, দেহকে স্বীকার করিয়া গড়িয়া উঠিলেও ইহা দেহকে ছাড়াইয়া যায়—আত্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আত্মার প্রশান্তি ও গভীরতায় ইহা এক পরম সুনিবিড় সমুজ্জ্বল 'গুরু বস্তু'। কামলীলার উদ্দেশ্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কার্য্য শেষ হইলেই ইহার কার্য্য শেষ হয়—ফলে আসে নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই পারস্পরিক বিস্মৃতি। প্রেমে জন্মে একটা শাশ্বত মিলন—নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একটা রস-সান্দ্র ঐক্য, যাহা তাঁহাদের সম্বন্ধটাকে স্থায়ী করিয়া দেয় এবং ভঙ্গুর হইতে দেয় না। বিশুদ্ধ কামাবস্থায় এমন এক মিলনাবেগ, এমন এক মিলন-চাঞ্চল্য, এমন এক রঙ্গ জন্মে—যাহা সত্যই অপরূপ। তবুও যতক্ষণ না এই কাম প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়—ততক্ষণ ইহা ক্ষণিক, বিদ্রোহী, ধ্বংসশীল, অবিশ্বাসী, নাস্তিক। পুরাণকার কুব্জার মধ্য দিয়া কামের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ-দর্শনেই কুব্জার রতি জন্মিত, তাঁহার অদর্শন কালে কুব্জার হৃদয়পটে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান রহিতেন না। ইহাই রূপজ মোহ, কাম বা আত্মবিলাস। এইরূপ ভোগলালসা বৈষ্ণবের আদর্শ নহে। তাই কুব্জার রতি "সাধারণী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মথুরার আদর্শ বৈষ্ণবের আদর্শ নহে—বৃন্দাবনের অনাবিল গোপী-প্রেমের আদর্শই বৈষ্ণবের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে প্রেমের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে যদ্ভাববন্ধন যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যুবক-যুবতীর যে ভাব-বন্ধন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—তাহাই প্রেম। সমাজ, কুল, মান, লাজ প্রভৃতি বহুবিধ বাধাই ছিল গোপী-প্রেমের পরিপন্থী। এই সকল বাধা পদদলিত করিয়া গোপী-প্রেম দুর্জ্জয়, দিব্য ও সর্ব্বোত্তম হইয়াছিল।

গোপী-প্রেমের আশ্চর্য্য স্বভাবের পরিচয় দিবার জন্যই গোপী-লীলা বহু স্থলে কামানুগ বলা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে কি বিশিষ্ট অর্থে 'কাম' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে উপরে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। গোপী-প্রেমের এই অপরূপ স্বভাব সম্বন্ধে সাধারণ লোককে বা বহিরঙ্গ সমাজকে সজাগ করিবার জন্যই, এবং গোপী-প্রেমের রহস্যময় স্বভাবকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই সুবিখ্যাত বৈষ্ণব টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোপীর এই কামকে "প্রেমাত্মক কাম" বলিয়াছেন। এই "প্রেমাত্মক কাম" কথাটী অতিশয় উপযোগী হইয়াছে। উপরে আমরা প্রেম ও কামের পার্থক্য ও কামের গৌরব সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তদনুসারে গোপীদের প্রেমকে কাম না বলিলে, যেন কিছু ফাঁক থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। আবার গোপীদের কামকে প্রেমাত্মক না বলিলেও নৈতিক ভুল হইয়া দাঁড়ায়। তাই দার্শনিক বৈষ্ণব শিরোমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোপী-ভাবকে 'প্রেমাত্মক কাম' বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন।

তবে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাম সাধারণ কাম নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম যৌন সম্বন্ধের উপর স্থাপিত বলিয়া এই রতি কামানুগ বলা হইয়াছে। সহজিয়া বৈষ্ণবের ভাষায় এই কাম প্রাকৃত কাম নহে—অপ্রাকৃত। বৈষ্ণব এই অপ্রাকৃত অর্থে বুঝিয়া থাকেন, যাহা প্রাকৃত নহে অথচ প্রাকৃতবৎ দেখায় তাহাই অপ্রাকৃত। এই লীলা যৌন-সম্বন্ধের উপর স্থাপিত বলিয়া যৌন-গত লীলারঙ্গ, নানাবিধ কাম-লক্ষণ ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। এই জন্য ইহা প্রাকৃতবৎ বোধ হয়; তাই উক্ত আছে—"কাম নহে কামরূপ গোপীগণ আচরে।" কিন্তু প্রাকৃত কামে আছে ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, আত্ম-বিলাস বা আত্ম-সম্ভোগ। অপ্রাকৃত কামে এই আত্ম-সম্ভোগ নাই—ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে কাম ও প্রেমের যে অপরূপ দার্শনিক অর্থ সমাধান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেই আমাদের অপ্রাকৃত কামের অর্থ পরিস্ফুট হইবে, যথা—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল" ইত্যাদি। নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতির নামই কাম। গোপীদের স্বেন্দ্রিয়-প্রীতি ছিল না—তাঁহাদের ছিল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি। তাঁহারা যে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন, বিবিধ মণ্ডনশ্রীতে নিজ দেহ অলঙ্কৃত করিতেন, বিবিধ শোভায় নিজ দেহ লাবণ্যপুর করিয়া রাখিতেন, তাহা নিজ ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-বোধ লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণসুখের জন্যই ব্যবহৃত হইত—তাঁহাদের পৃথক ইন্দ্রিয় ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের কাম ছিল অতীন্দ্রিয়। এই অতীন্দ্রিয় কামকেই বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোপীদের এই অপ্রাকৃত কামতত্ত্ব হইতেই সহজিয়া বৈষ্ণবের কাম-সাধন-তন্ত্র জন্মিয়াছে। এই অপ্রাকৃত কামতত্ত্বকে স্বীকার করিয়া সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সহস্রারে আপন শুক্র 'অটল' রাখিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া অপ্রাকৃত কাম বা ইন্দ্রিয়-বিকার-পরিশূন্য নির্ম্মল প্রেমের আস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন। সহজিয়া বৈষ্ণবের কাম-সাধনের ইতিহাস প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গোপীগণের নিজের জন্য কিছুই ছিল না—তাঁহাদের অহং-বোধ নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের দেহ-মন, সকল প্রচেষ্টা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্য। তাঁহাদের যাহা কিছু সবই অতীন্দ্রিয়-মূলক বা অপ্রাকৃত। বৃন্দাবন লীলায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের মধ্য দিয়া এই অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ বলিয়া তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা প্রাকৃতবৎ বোধ হয়—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তার ছাঁচে অতীন্দ্রিয় আকারিত হইয়াছে। বাস্তবিকই বৃন্দাবন-লীলায় সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সত্তা স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তার মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে। কাজে কাজেই এই লীলায় অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তা যেন মিশিয়া গিয়াছে। তাই গোপীদের কাম-বিলাস, হাব-ভাব, রাগ-রঙ্গ সকলই যেন প্রাকৃত মায়িক মানুষের ন্যায় বোধ হয়। সে যাহা হউক, এই অতীন্দ্রিয় পদার্থও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাকে পুরতঃ রাখিয়া, এই উভয়বিধ পদার্থকে মিশাইয়া লইয়া একপ্রকার বিচিত্র মালিকা গ্রন্থন করিয়া বৈষ্ণব মরমিয়া তাহা এক বিচিত্রভাবে উপভোগ করিয়া থাকেন। কিরূপে ইহা সম্ভব হয়, আমরা তাহাই বলিতেছি।

এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলা উপভোগ করিতে হইলে চাই আমাদেরও একটা অপ্রাকৃত মন—একটা অপ্রাকৃত বোধ। তদ্ব্যতীত এই অপ্রাকৃত লীলা অনুভূত হইবে না। আমাদের সহজ দৃষ্টি ও মন লইয়া ইহা অনুভূত হইবার নহে। করিতে গেলেই প্রাকৃতবৎ, মনুষ্য-ব্যবহারবৎ বোধ হইবে। সেই জন্যই রসিক ভক্ত বলিয়াছেন—"প্রভু কহে ভক্তের দেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃত দেহে ভক্ত চিদানন্দময়"॥ ভক্তের দেহ—প্রকৃত লীলোপভোক্তার দেহ অপ্রাকৃত—মনও অপ্রাকৃত। ক্রমেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। প্রকৃত রসিকের চিত্ত আমাদের চিত্তের মত নহে। তাঁহার চিত্ত-মন একটা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হয়, একটা higher spiritual status প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত রসিক জানেন এই রাধাকৃষ্ণলীলা বাহিরের নহে—ইহা আত্মার লীলা—ইহা আত্মায় প্রতিষ্ঠিত, দেহে নহে। ইহা স্বরূপতঃ অতীন্দ্রিয়। এই লীলা-তত্ত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন। তিনি জানেন, 'এই

লীলা অনুভব করিবার প্রথম সোপান আত্মাকে জানা—আত্মতত্ত্বকে না জানিতে পারিলে এই লীলা-স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। আবার শুধু আত্ম-তাত্ত্বিক হইলেই হয় না। বৈষ্ণব রসিক এই আত্মাকে সাক্ষাৎকার (realise) করিয়া থাকেন। যখন তিনি আত্মাকে সাক্ষাৎ করেন তৎকালে তাঁহার স্বাভাবিক জড় মন প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্গতিশীল হয় এবং পরম কৌশল ক্রমে আত্মায় অবস্থিতি লাভ করে। তখন মায়িক জড় মন মায়ামুক্ত হয়। যোগমার্গাবলম্বনে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ দ্বারাই সাধক আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। প্রবন্ধান্তরে ইহা আলোচিত হইবে। সংক্ষেপে আমরা এখানে ইহাই বলিতে চাহি যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় মনের পক্ষে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু আত্ম-সাক্ষাৎকারীর মন (The mind of a self realised being) সহজেই ইন্দ্রিয়াতীতকে (The transcendentalকে) অনুভব করিতে পারে। আত্ম-সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির মনই অপ্রাকৃত মন। বৈষ্ণব-রসিক এই অপ্রাকৃত দেহ-মন লইয়া অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস উপভোগ করিয়া থাকেন। রসিকের ভাষায় তখন তাঁহার—"অপ্রাকৃত রসে দীপ্ত দেহ ভরপুর।" অতীন্দ্রিয়ের পরশ পাইয়া, অপ্রাকৃত রসে দীপ্ত, ভরপুর দেহ লইয়া রসিক তখন লীলারসে ডুবিয়া থাকেন। এইরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকারী সাধক তখন সহজেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের ভূমিতে নামিতে পারেন এবং অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তাকে এক ছন্দে ও এক তালে গাঁথিয়া দিয়া এক অপরূপ দিব্য রহস্য-ঘন (mystic) রসোপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। অপর কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব। স্থূল, সূক্ষ্ম, রূপ-অরূপের সমবায়-লীলা-রঙ্গ একসঙ্গে আস্বাদ করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। যে মানুষ তাহা পারেন, সহজিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে "সহজ মানুষ" বলেন। তাঁহার হাব-ভাব, চিন্তা-মন অপূর্ব্ব রকমের,—যে আবেষ্টনীতে তিনি বাস করেন, রহস্যময় সহজিয়া ভাষায় তাহার নাম "সহজরূপ", সাধারণ ভাষায় ইহারই নাম শ্রীবৃন্দাবন।

যাহা হউক একটা অপ্রাকৃত মন লইয়া বৈষ্ণব সাধক গোপীর অনুগ হইয়া বৃন্দাবন-লীলা সম্যক্‌রূপে উপভোগ করেন। তখন তাঁহার নিকট গোপীগণের হাব-ভাব, কাম-কটাক্ষ সত্যই কামবিলাস নহে—উহা চিদানন্দের অভিব্যঞ্জনা বা প্রতীক বলিয়া অনুভূত হয়—তাঁহাদের রসাভিসার, রাসরঙ্গ, নূপুর-শিঞ্জন, বলয়-ঝঙ্কৃতি চিদানন্দময় হইয়া উঠে—গোপীগণের নবনীত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি সেবার দ্রব্যনিচয় চিন্ময় হইয়া উঠে, জড়ত্ব-মুক্ত হইয়া পূজার সামগ্রীতে পরিণত হয়, 'অপ্রাকৃত' হইয়া যায়। এইরূপ সাধকের—অধ্যাত্ম-চেতনার নূতন দ্বার খুলিয়া যায়, সেই নব অধ্যাত্মানুভূতির নবারুণালোকে সকল বস্তুই রঞ্জিত হইয়া যায়। তখন তাঁহার রহস্যময় অতীন্দ্রিয়ানুভূতির আলোর রঙে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকল বস্তুই নূতন রঙ প্রাপ্ত হয়। তখন এই সাধন-লব্ধ নব-জাগ্রত অপ্রাকৃত দৃষ্টির সামনে বৃন্দাবন-লীলায় কতটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সত্তা ও অতীন্দ্রিয়ের উপকরণ রহিয়াছে বা এই অতীন্দ্রিয়-লীলায় কতটা ইন্দ্রিয়ের 'খাদ' বা মিশ্রণ আছে—সাধক ইহা দেখিতে পান না। আর চিদানন্দের রঙিন চশ্‌মা পড়িয়া সাধক তখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তাকে দৃষ্টি করেন বলিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-সত্তা তাঁহার বন্ধনের বা অকৃতকার্য্যতারও কারণ হইতে পায় না। এইরূপ সাধকের দৃষ্টি যখন বিশ্লেষণ-মূলক নহে ইহা এক এবং অখণ্ড (Synthetic)। আত্মানুভূতি-লব্ধ তাঁহার Synthetic দৃষ্টি প্রভাবে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা সমগ্রভাবে ও অখণ্ডভাবে উপভোগ করেন। যে আত্ম-প্রত্যয়-বলে আমরা একটা মধুর গানকে সমগ্রভাবে উপভোগ করি—অর্থাৎ ইহা তাহার সুর, মূর্চ্ছনা—এইরূপ খণ্ডভাবে দেখি না, সেইরূপ আত্ম-প্রত্যয়-বলে, একটা সাধন-লব্ধ intuition-শক্তি দ্বারা সত্যকার বৈষ্ণব মরমিয়া এই রাধাকৃষ্ণলীলায় অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তার এক অপরূপ সমবায়-রঙ্গ উপভোগ করেন, একটা অপ্রাকৃত বোধ-বলে তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করেন অতীন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া, (transcendentally enjoys the sensuous) আবার অতীন্দ্রিয়কে উপভোগ করেন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তার মধ্য দিয়া (sensuously enjoys the transcendental) ইহাই বৃন্দাবন-লীলার বৈচিত্র্য, আর ইহাই বৈষ্ণব-রসিকের রহস্য-ঘন (mystic) রসানুভূতি।

বিধবা রতিমঞ্জরী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

রতিমঞ্জরী শেষ পর্য্যন্ত বিধবা হবেই। হবারই কথা -কারণ, এদিকে তার স্বামীকে যে-রোগে ধরেছে—তার শক্তি যেমন প্রচুর, তেমনি দুর্নিবার; এবং ওদিকে স্বামীর রক্তকণিকায় আর স্নায়ুতে বিদ্যুৎগর্ভ সে দুরন্ত তেজ থাকবার কথাই নয় যে-তেজ শম্বুকগতি রোগের—এই রোগের—পলে পলে জীবনক্ষয়ের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুতরাং অক্ষয় মরবে এবং রতিমঞ্জরী বিধবা হবে। ভরসা দিলেন, অর্ব্বাচীন কেউ নয়, চিকিৎসকেরা। বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম এবং সর্ব্বদর্শী জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে রোগী এবং দেহকে ব্যাধিসহিষ্ণু করে' তুল্‌বার সাধ্য তাঁদের আছে বলে' প্রচারিত। অক্ষয়ের বেলাতেও সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা তার ভার নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনের আশঙ্কা গোপন করে' রতিমঞ্জরীর অর্থলুণ্ঠন ছাড়া তাঁরা বিশেষ কিছু কর্‌ছেন না। তাঁরা জেনেছেন, ঔষধ বৃথাই দে'য়া হচ্ছে—এ-ব্যাধির পরিণাম মৃত্যুই।…বিধবা হওয়া রতিমঞ্জরীর অদৃষ্ট—তাকে তা হতেই হবে।

অক্ষয়ের সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে হয়েছে আজ এগার বছর হ'ল। বিয়ের সময় মঞ্জরীর বয়স ছিল মাত্র পনর, অক্ষয়ের মাত্র তেইশ।…তাদের বয়সের সেই উৎফুল্ল জোয়ারের মুখে ভেসে এসেছিল দু'টি মাত্র সন্তান; কিন্তু তাদের একটি ভূমিষ্ঠ হবার পর এক-মুহূর্ত্তও বাঁচে নাই—আর-একটির মৃত্যু ঘটেছিল গর্ভেই। কাজেই অজাত সন্তানের মত এখন তারা কাল্পনিক হ'য়ে উঠেছে—সেদিকের চিন্তায় মঞ্জরীর তীব্রতা নাই, উত্তাপও নাই।

স্ত্রীর জীবনের গতিকে স্পর্শ এবং প্রাণসত্তাকে পুনঃ পুনঃ উজ্জীবিত করে' চিরজীবী হয়ে দেহধারণ করে' স্বামীর বিদ্যমান থাকার কথা; কিন্তু তা'ও দেখা রতি-মঞ্জরীর অদৃষ্টে নাই—তা' অদৃশ্য হ'তে চলেছে…

স্বামীর শয্যালগ্ন শীর্ণ দেহের দিকে মঞ্জরী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—থাকৃতে থাকৃতে উঠে যায়।

চোখ খুলে অক্ষয় ডাকে, মঞ্জরী?

মঞ্জরী জানলার ধার থেকে ধীরে ধীরে সরে' এসে শয্যার পাশে দাঁড়ায়—

অক্ষয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি ত' আমার ডাকে ব্যস্ত হয়ে ছুটে' এলে না, রতি!

রতি তা' আসে নাই, কিন্তু অসঙ্কোচে বলে, তা'ই ত' এলাম!

অক্ষয় বলে, আমাকে তুমি মুখের কথায় সুখী কর্‌তে চাও, ভালই; কিন্তু তুমি ভারি ক্লান্ত হয়ে উঠেছ।

স্ত্রীর প্রতি অশেষ অনুকম্পাসত্ত্বেও কেবল তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে বলে' অভিমানে অক্ষয়ের চোখে জল আসে। রুগ্ন স্বামীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর নিজেরই শ্রেষ্ঠতম সম্পদটিকে, রক্ষা করার যে প্রাণপণ কামনা আর প্রয়াস সজীব হ'য়ে উঠে' মৃত্যুপথযাত্রীর অন্ধকার পথে সতর্ক আর সশস্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অক্ষয়ের মনে হয়, মঞ্জরীর আকাঙ্ক্ষার সে সজীবতা তারই আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে যেন ফুরিয়ে আস্‌ছে।…অক্ষয়ের চোখ ফেটে' জল আসে—তার মনে হয়, তার চোখে জল দেখে' করুণায় বুক ফাট্‌বে না এমন লোক পৃথিবীতে কেউ আছে কি!…বাঁচ্‌বার ইচ্ছায় তার অসম্ভব কথা মনে হয়—মৃত্যুর এই ক্রূর অব্যর্থ গতিকে নিরোধ কর্‌তে প্রাণপণ করা যেন পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় লোকের কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক প্রকাশ কর্‌ছেন, এই ব্যাধির কারণের উদ্ভব হয়েছে রোগীর কাঁচা দেহে, কৈশোরে। তুষে আগুন ধরেছে তখন। অব্যর্থ অগ্নিকণা মজ্জার কোন্

গভীর স্থানে রক্ষিত ছিল—বহু দিন প্রচ্ছন্ন থেকে' আগুন উপরে উঠে' প্রতিকারের প্রায় বাইরে এসেছে—

রতি তা' জানে—

বলে, খুব কষ্ট হ'চ্ছে? কি করবো বলো। গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেব?

ডা'ন হাতখানা একটুখানি তুলে' অক্ষয় রতিকে আহ্বান করে; বলে,—না। তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে এখানে বসো—আমি তোমার মুখের সুধা পান করি।

এ-কথায় হাসি না পায় কার! রতিরও হাসি পায়, কিন্তু সে হাসে না। ঐ রকম কথা বলাই অক্ষয়ের চির-দিনের অভ্যাস, এবং মেজাজে খাটে ভাল। নারীর মুখের আর নারীর প্রাণের সুধা পানের তৃষ্ণা তার এত প্রবল যে, মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে দেখে' সে একদিন আনন্দিত হ'য়ে উঠেছিল—আর, তার আনন্দের কারণটি সে গোপন করে নাই। সন্তান আর জন্মে নাই—তা'তেও সে পুলক ব্যক্ত বহুবার করেছে—অব্যাহত সুধা পান চল্‌বে। সে-দিন গেছে, কিন্তু মুখের পানে তাকিয়ে দৃষ্টির দ্বারা সুধা পান করতে সে এখনও চায়!…

রতি বলে, বস্‌ছি।

বলে' পায়ের কাছে বসে; কিন্তু অক্ষয়ের চোখ তখন অপরিসীম দুর্ব্বলতায় মুদিত হ'য়ে গেছে।

বাইরের লোক ভিতরের খবর তেমন কিছুই টের পায় নাই; অক্ষয়ের চোখ প্রায় দৃষ্টিহীন হ'য়ে এসেছে, এই মাত্র জানা গেছে; কিন্তু চিকিৎসক হঠাৎ চম্‌কে' দিলেন: আর কাউকে না পেয়ে বাড়ীর চাকর নন্দকেই ডেকে' তিনি বলে' গেলেন: আর ঘণ্টা বারো। প্রস্তুত থেক', বাপু।

চিকিৎসক আগেও দিগ্বিজয়ী হাম্‌বড়া কথা অনেক বলেছেন; ভরসা অনেক দিয়েছেন; আরও অমোঘভাবে চিকিৎসা কর্‌বার জন্য আরও মূল্যবান্ ঔষধ প্রস্তুত করতে হবে ব'লে অগ্রিম টাকা ঢের নিয়েছিলেন; ডাক্তারী চিকিৎসার মুখে ভস্ম নিক্ষেপপূর্ব্বক আত্মপ্রশংসা এত করেছেন যে তা'তে লোকে প্রথম প্রথম অবাক্ হ'ত, পরে হাসত'—

কিন্তু এবার তিনি অবিশ্বাসের কাজ করেন নাই; তাঁর কথা ফল্‌লো—বারো ঘণ্টার মধ্যেই অক্ষয়ের মৃত্যু হ'ল।

তখন সেখানে দরদীগণের ভিড় লেগেছে—পাণ্ডুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে এই তিরোধানের ব্যথায় তাদের চোখে জল এল…

রতি কেঁদে উঠ্‌লো; কিন্তু সে বড় কঠিন চাপা মেয়ে—গলা ফাটিয়ে অবিশ্রান্ত আর্ত্তনাদ করে' সে বাড়াবাড়ি শোক কিছুই কর্‌ল' না—তখনই উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে' সে নিঃশব্দ নিশ্চল হ'য়ে গেল — শোক বইতে লাগ্‌ল' গভীরে…

তা'কে তুল্‌তে এল তার বোন মনোমঞ্জরী; অজস্র অশ্রু আঁচলে মুছে' সে বল্‌ল', দিদি, ওঠো। একবার শ্মশানে যেতে' হবে যে।

মৃতের মুখাগ্নি কর্‌বে তার স্ত্রী—আর কেউ নাই। মনোমঞ্জরী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দিদিকে ডেকেই তার পাশেই ভেঙে' পড়ল…কিন্তু শোকের আঘাতে মানুষ যতই কাতর অবশ হোক্, এই কাজটি কর্‌বার ভার যার উপর পড়ে—তাকে উঠ্‌তেই হয়।

লোকে রতিকে ভূমিশয্যা থেকে ডেকে' ডেকে' তুল্‌ল'; স্বামীর 'শেষ কাজ' করবার জন্য বুক বাঁধতে অনুরোধ করল, এবং কাঁদ্‌ল'…

তারপর বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী একটি বিধবাকে সঙ্গে দিয়ে তাকে গাড়ীতে করে শ্মশানে নিল…

শ্মশানক্রিয়ার যেন শেষ নাই—

রতি মৃত স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মর্দ্দন কর্‌ল', দেহকে স্নান করাল', তার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে' দিল, স্নান করে' মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করল'।

শবদেহ চিতায় তোলা হ'ল…

রতি পঞ্জিকার নির্দ্দেশমত প্রচলিত পদ্ধতিতে আর প্রতিবেশিনীর সাহায্যে আর নিষ্পলক চক্ষে স্বামীর মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করল', এবং বুক কেঁপে সে অস্থির হ'য়ে গেল।

রতি জান্‌ত' না, শ্মশানে মানুষের দেহের কি গতি ঘটে ; আজ তা' দেখে' তার কষ্টের সীমা রইল না ; এবং চিতায় শায়িত দেহটাকে স্বামীর দেহ বলে' ভাবতে হঠাৎ তার ভুল হ'য়ে গেল ..

একটা মানুষের দেহকে পুড়িয়ে ছাই করে' দিতে হ'বে, চিতায় তোলার উদ্দেশ্য তাই। দৃশ্যটি স্বতঃই করুণ, সব ক্ষেত্রেই ; তবু আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অনুপাতে সে-কারুণ্যের তারতম্য ঘটে না বললে ভুল করা হবে। কিন্তু রতির মনে শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হ'ল না—উদয় হ'ল এই কথাটার যে, এ এখন আমার কেউ নয়—এ যে কোনও-দিন আমার কেউ ছিল, দেহ ভস্মীভূত হবার পর তার নিদর্শন কোথায় পাওয়া যাবে !...অনুগমন করবার পদচিহ্ন রতি চায় না ; কিন্তু তার কল্পনাকে মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে মৃত আপনার চিহ্নটি কোথায় স্থাপিত করে' গেল ! কোথাও না। নিজের বিগ্রহকে সে প্রতিষ্ঠিত করে নাই—বায়ু-প্রবাহের মত শূন্যে শূন্যে মাথার উপর দিয়ে সে বয়ে গেছে—বয়ে চলেছে বলে' মাত্র একটি অনুভূতিসাপেক্ষ জিনিসের মত সে ছিল।...বায়ুর শরীর নাই, ছায়া নাই—আত্মার শরীর-বস্তকে সে কারও সম্মুখে রক্ষা করে না।

কর্ত্তব্য সমাপন করে' রতি একান্তে নির্জ্জন স্থানে বসে' ছিল—

ধোঁয়ার একটা ঘূর্ণ্যমান স্তম্ভ হঠাৎ উর্দ্ধগামী হ'য়ে উঠ্‌তেই তার কান্না পেল'...যতই সুদূরের হোক্, যত্ন-লালিত আর বহু আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের অপরূপ পরিপাটি যন্ত্র সেই দেহটা ভস্ম হ'তে যাচ্ছে দেখে' অনুকম্পার একটা হাহাকার ওঠা স্বাভাবিক—রতিমঞ্জরী ধোঁয়ার দিকে করুণ চক্ষে তাকিয়ে রইল...ধোঁয়ার পরই জিহ্বা নাচিয়ে উল্লাসে লাফিয়ে উঠ্‌ল' অগ্নি...ইন্ধনের কঠিন শব্দ আর অগ্নির তরল শব্দ, দুই প্রকারের দু'টি শব্দ ঐক্যতানে মিশে হু-হু শব্দে ছুটে' চল্‌ল...

সেই গর্জ্জন শব্দটা খানিকক্ষণ কাণ পেতে' রতিকে শুন্‌তে হ'ল।

রতি মৃত স্বামীর দেহে ঘি মাখিয়েছে, দেহকে স্নান করিয়েছে, তাকে বস্ত্রাবৃত করেছে ; লোকে দেখেছে, তখন সে চোখ বুজে নাই—

কিন্তু অগ্নির জিহ্বা দেহকে যখন স্তরে স্তরে ভেদ করতে থাকে—তখন দেহ স্থির থাকে না, মুষ্‌ড়ে' আসে, মুচ্‌ড়ে' ওঠে ; খুঁচিয়ে তাকে ভাঙতে হয়।

সে-দৃশ্য রতিকে দেখতে দেয়া হবে না ; সঙ্গিনীটি রতিকে ডেকে আড়ালে গাড়ীতে নিয়ে বসাল'।...দাহ করা শেষ হ'লে শাঁখা ভেঙে', সিঁদুর মুছে' এবং স্নান করে' কাপড় ছেড়ে' সে যাবে। সেই ভাঙাভাঙির জন্যে কখন্ ডাক পড়বে—তারই প্রতীক্ষায় রতি চুপ করে' বসে রইল।

কাঠ ছিল শুক্‌নো এবং প্রচুর ; এবং দাহকারীদের ভিতর ছিল মুকুন্দ এ-বিষয়ে দক্ষ ; কাজেই দাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হ'ল—মাঝে মাঝে হরিধ্বনি ছাড়া প্রায় নিঃশব্দেই দীর্ঘ সময়টা অতিবাহিত হ'ল।

চিতার জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপীকৃত ক'রে তাকে শীতল করতে জল ঢাল্‌তে হবে—

রতিমঞ্জরীর ডাক্ পড়ল — তাকেও এক কলসী জল সেই আগুণে দিতে হবে।

গাড়ী থেকে নেমেই রতি দেখ্‌ল, অঙ্গারের প্রচণ্ড উত্তাপে তার উপরকার বাতাস চোখে পড়্‌ছে—বাতাস তরল হ'য়ে জ্বল্‌জ্বল্ করছে আর থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে... একটা মরীচিকার সৃষ্টি হয়েছে।...দেহ এই পৃথিবীর যত মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান্ হয়, রতিমঞ্জরীর শিক্ষা হ'ল চিতাবশিষ্ট শ্মশানাগ্নির উত্তাপসৃষ্ট এই মরীচিকা তাদের চাইতে ভাল—নির্দ্দোষ এবং নির্জ্জীব। এই মরীচিকা নির্ম্মম প্রেতভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবিতের এবং একদিন যে জীবন্ত ছিল তারও পশ্চাদ্দেশ লেহন করতে থাকে...তার স্বচ্ছ বুকে মিথ্যা বেদনা কি প্রতারণা কি ভুল করাল। প্রতিবিম্ব নাই—না মৃত্তিকার, না আকাশের। সে নির্লিপ্ত এবং স্বতন্ত্র।

"জল্লাদের কাজ আমাকেই করতে হবে"—ব'লে খুব কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বর্ষীয়সী, চিতায় জল দেয়ার পর, রতিকে নিয়ে স্রোতের ধারে বস্‌ল।

ডান হাতখানা নিজেই বাড়িয়ে দিয়ে রতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে রইল...পাথর ঠুকে' তার হাতের শাঁখা ভাঙা হ'ল—অলঙ্কার খুলে নিল।

কি ঘটছে রতি তা' অনুভব করছে না এমন নয়—

ডান হাত খালি কর্ত্তার কাজ শেষ হ'লে, না চাইতেই ঘুরে' বসে' সে বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিল···

সে-হাতও খালি হ'ল—

রতি তখন চোখ খুলে তার দু'খানা হাতের দিকে তাকাল···

একটা স্থান থেকে বিচ্যুত হ'য়ে অপর যে-স্থানে সে এসেছে, সেখানে এসে তার কতকগুলো অধিকারহানি ঘটল'—তা' ছাড়া এ আর-কিছুই নয়। ভাগ্যদেবতা তাকে যেন দিবারাত্র ব্যবহারের জন্য একটা উচ্চ স্থানে স্বর্ণ-নির্ম্মিত একখানা রঙিন আসন পেতে' দিয়েছিলেন—সেই আসন থেকে আজ তাকে নামিয়ে দে'য়া হ'ল।

সঙ্গের মেয়েটি ঘষে' ঘষে' তার সিঁদূর তুলে নিশ্চিহ্ন করে' দিল — ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরাল'—এ কাপড়ে পাড় নাই।

কাঁদ্‌ল বেশী রতির বোন্ মনো।

রতি গাড়ী থেকে নামতেই তার বেশ আর রূপের পরিবর্ত্তন দেখে' মনো আগে ধর্‌ল' দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে, তারপর পড়্‌ল' মাটিতে লুটিয়ে, আর কত যে বিলাপ সে করল'—তা' বলে' শেষ করা যায় না। ··· মনো সধবা—দিদির বৈধব্য চোখে দেখে' তার সর্ব্বাঙ্গে যেমন জাগ্‌তে লাগ্‌ল' দুঃসহ শিহরণ, তেম্‌নি ফাট্‌তে লাগ্‌ল' তার বুক দিদিরই অভাবনীয় দুর্ভাগ্যে। ... তার দিদি আর তার দিদির স্বামী এবং তার নিজের স্বামী এবং সে নিজে, এই চারজনকে ঘিরে' ধরে' তার মনের আব্‌হাওয়া তোলপাড় করে' একটা ঝড় উঠ্‌ল' যেন ··· ঝড়ের বেগের ভিতর পাক্ খেতে' খেতে' সধবা মনোমঞ্জরী কাঁদতে লাগ্‌ল যত, স্বামীর আয়ুঃ তার আয়ুঃর চাইতে দীর্ঘতর হোক্, এই কামনা করল ততোধিক।

রতি মনোর হাত ধরে' টেনে' নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল'—

মনোর ভয়বিহ্বল আর অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল'—ভয় পেয়েছিস খুব? তোর ভয় নেই। চিরকাল তুই সুখে আছিস, সুখেই থাক্‌বি।

মনো বল্‌ল', সেই আশীর্ব্বাদ করো, দিদি; কিন্তু আমি যে তোমার পানে চাইতে পারছিনে!

রতি বল্‌ল', খানিক্ চেয়ে থাক্, দেখবি, সয়ে যাচ্ছে।

বাইরে শ্রাদ্ধের কথা, অর্থাৎ খরচের অনুমান আর দ্রব্যাদির ফর্দ্দ নিয়ে, বিতণ্ডা চল্‌ছে ...

অন্তঃপুর শান্ত, প্রায়ই নীরব। একটি লোকের ফরমাস্ খাট্‌তে, মন জোগাতে, তাকে তোয়াজে রাখ্‌তে, তার ভোগোপকরণ সজ্জিত করতে, যে চঞ্চলতার প্রয়োজন হ'ত, এখন সে নাই বলে' কাজ নিঃশব্দ আর মন্থর হ'য়ে উঠেছে।

অক্ষয়ের শয়নকক্ষ এখন ব্যবহারের বাইরে প'ড়ে অষ্ট-প্রহর বন্ধ থাকে...

কি মনে ক'রে একদিন রতি দরজা ঠেলে' সেই ঘরে ঢুক্‌ল'—পালঙ্কে গিয়ে বস্‌ল' ...

এই পালঙ্ক একদা তাদের বিলাস-পালঙ্ক ছিল—এই পালঙ্কের সঙ্গে স্পর্শ ঘটে' শোক এবং রোমাঞ্চ দুই-ই জাগতে পারত...এই পালঙ্কে তাদের মনোমিলনের সুচারু নির্ম্মল একটি ইতিহাস লিখিত থাক্‌বে আশা করা যায়; প্রাণান্তকর আবেগে পরস্পরের সান্নিধ্য অনুসন্ধানের যে সত্তাব্যাপী স্পন্দন ছোটে—তারও তরঙ্গ অমর হ'য়ে এই পালঙ্কের আঁশে আঁশে বিধূনিত হবার কথা; কিন্তু তা' নাই, তা' হ'চ্ছে না; সে-কথা রতির আদৌ মনে পড়ল' না। নির্লিপ্ত চক্ষে সে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল'·· ঘরের চেহারা এরই মধ্যে যেন পুরানো হ'য়ে উঠেছে—দে'য়ালে টাঙান' ছবিগুলোকে এই ক'দিনেই ঝুলে ঘিরেছে—যেখানে যে সজ্জা আছে তাদের সকলের গায়েই ময়লা জমেছে...

রতি তা' দেখলে—

কিন্তু, একটি ব্যক্তির দৃষ্টিকে সুখ দিত' বলে এদের যে গুরুত্ব ছিল, সে-গুরুত্ব দিবার লৌকিক তাগিদ এখন আছে বলে' রতি অনুভবই ক'র্‌ল না—তাদের দুর্দ্দশায় রতির দুঃখ হ'ল না।

তারপর রতি পালঙ্ক থেকে উঠে' এসে একখানা চেয়ারে বস্‌ল'—বসে'ই তার দৃষ্টি গেল দে'য়ালে বিলম্বিত সুবৃহৎ দর্পণখানার দিকে, এবং আর-একটি জিনিস যা' তার চোখে না পড়ে' গেল না, তা' হচ্ছে তারই প্রতিবিম্ব।··· বিধবা হওয়ার পর এই প্রথম তার সর্ব্বাঙ্গের সমগ্র প্রতিবিম্ব একসঙ্গে সে দেখ্‌তে পেলে—মুখ, ললাট, হাত—সব—পা পর্য্যন্ত। তার অঙ্গে, কাজেই তার অঙ্গের এই প্রতিবিম্বে, আয়তি-সৌভাগ্যের রক্তচিহ্ন লেশমাত্র কোথাও নাই—যেন নিষ্পল্লব বৃক্ষ—দেহের সমস্ত স্নিগ্ধতা অপহৃত হ'য়ে একটা নির্লজ্জ রিক্ততা নগ্ন হ'য়ে ধূ ধূ কর্‌ছে ···

রতি হঠাৎ একটু লজ্জা পেল'—

তারপর তার মনে হ'ল, কিসের উপর যেন একটা আচ্ছাদন ছিল—অদৃষ্টের উপর, কি দেহের উপর তার ঠিক্ নাই — কিন্তু ছিল — দশজনের আকাঙ্ক্ষণীয় হ'য়ে আর আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ কর্‌তে সে ছিল...তা' তুলে' নে'য়া হয়েছে—তার ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে ···

যা' উদ্ঘাটিত হয়েছে—তা' পরের চোখে যা'ই হোক্, নিজের চোখে দেখে' রতির মনে হ'ল, উদ্ঘাটিত হয়েছে হাহাকার জাগান' শোচনীয় কিছু নয়, তার পরম স্বরূপটি ...

নিজের দেহের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রতির আরও মনে হ'ল, আভরণবিবর্জ্জিত হ'য়ে তার দেহের সুষমা আরো বেড়েছে—যেমন বাড়ে স্বর্ণের, কলঙ্কমোচনের পর। ··· ললাট থেকে সুরু করে' পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া পূর্ণচন্দ্রের মত শুভ্র এবং সজ্জাহীন এবং উজ্জ্বল। ··· বাইরে থেকে ঘটা করে' বয়ে এনে যে রত্নমালা আর শুভচিহ্ন ধারণ করা হয়, সৌভাগ্যের পরিমাপ করতে তার দরকার আছে—আর, অন্তরের আবরণ হিসাবে তাকে একটা মূল্য দে'য়া যেতে পারে, কিন্তু তা' আপনি ঘুচে' গেলে যা' থাকে তা'-ও বেশ। ··· যা' ছিল না তা' এখন একেবারেই নাই, তার ফিরে আসারও সম্ভাবনা নাই, এই ইঙ্গিতটি সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হ'য়ে যেন দেহের উপর সবাক্ হ'য়ে উঠেছে—আর, সান্ত্বনা তাতে প্রচুর। দেহকে আর রূপকে অন্তরালে স্থানান্তরিত করে' অন্তরের সঙ্গে বোঝা-পড়ার শেষ করারও অনুমতি যেন কোনও স্থান থেকে আস্‌ছে—অন্তরের ধর্ম্মেও সে আজ কারও দাসী নয়—আচ্ছাদন-প্রাচীর ঘুচিয়ে নিরাভরণতার উন্মুক্ত প্রান্তরে তাকে মুক্তি দে'য়া হয়েছে। ··· রতির চমৎকার একটু হাসি পেল'—

আয়নার ভিতর নিজের ছায়ার হাতের দিকে আর কপালের দিকে তাকিয়ে রতি মৃদু মৃদু হাস্‌ছে—ভাগ্যের দিক্-পরিবর্ত্তনে উদার একটা অবস্থিতির পুলকে উদ্গত আর প্রগল্‌ভ সেই হাসি — এমন সময়ে দিদিকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এ-ঘর ও-ঘর করে' মনো ঢুক্‌ল' সেই ঘরে, এবং রতির বিস্ময়কর হাসিটা তার কাছে ধরা পড়ে' গেল ···

মনো থম্‌কে' দাঁড়াল'—সে-হাসি কল্পনাতীত আর হৃদয়হীন নয়তো কি! বল্‌তে গেলে, শ্মশানের ছাই এখনও ঠাণ্ডা হয়নি।

রতি ফিরে দাঁড়িয়ে মনোর ভাবটা দেখ্‌ল'; ডাক্‌ল', আয়।

মনোর সঙ্গে রতির চোখোচোখি হ'ল—তখনও রতির সুমধুর ওষ্ঠ ব্যেপে মৃদু হাসিটুকু চক্ চক্ কর্‌ছে ···

মনো আর এগিয়ে গেল না; ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌ল', দিদি, হাস্‌ছ' যে?

—পাগল হ'য়ে গেছি। ··· কাঁদ্‌বার কি ঘটেছে?

শুনে' মনোর শ্বাসরোধের উপক্রম হ'ল।

রতি বল্‌ল', মানুষ মরেছে—তার জন্যে ত' কেঁদেছি! লোকে দেখেছে।

শুনে' পুনশ্চ মনোর কেমন ঠেক্‌ল' তা' বলা যায় না—জ্ঞানশূন্য হ'য়ে নিজের মরণ সে কামনা করল'।

রতিই আবার বল্‌ল'—আয়নার ভিতর নিজেকে দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌তে বেশ হয়েছি।

শুনে' মনোর এবার হ'ল রাগ—মুখচোখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল' ···

রাগ হবারই কথা, রতি তা' জানে; বল্‌ল',—রাগ করিস্‌নে, ভাই। আমি সধবা বিধবা যা' ছিলাম তা'-ই আছি। তিনি মরে' স্বর্গে গিয়ে যদি অমরের দলে মিশে' থাকেন, তবে অন্তরে আমি সধবাই আছি। কাঁদ্‌ব' কেন? আর যদি তিনি একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যেয়ে থাকেন, তবু আমি বিধবা নূতন করে' হইনি। তিনি ত' আমাকে

ভালবাসতেন না—আমাকে ঘরে রেখে' তিনি বাইরে থাকতেন। তখনই বিধবা হ'য়ে কেঁদেছিলাম — এখন আবার নূতন করে' কাঁদ্‌ব' কি ! কান্না পায় না। তবে, অনাবশ্যক একটা খোলস হাতে কপালে ছিল, তা' ঘুচে' গিয়ে ভার-টানার দায় থেকে বেঁচেছি — তা'-ই হাস্‌ছিলাম। ·· কাজ আছে বুঝি ? চল্‌। — বলে' রতি মনোকে নিয়ে ভারি বিমর্ষমুখে নেমে' এল।

(ক্রমশঃ)

রাজা কংসরাম

(ইতিবৃত্তের পরিকথা)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলমান আমলে বাঙালার যে কয়জন শক্তিমান ও প্রতিভাশালী হিন্দু অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, রাজা কংসরাম তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু বাঙালী-কংসরামের সম্বন্ধে অ-বাঙালী ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের বিবরণীগ্রন্থে কত গলদই রাখিয়া গিয়াছেন ! অনেক গ্রন্থে বঙ্গের অতি প্রাচীন সান্ন্যাল বংশের এই অসাধারণ মনীষী পুরুষটির নামেরই উল্লেখ নাই। গোলাম হোসেন তাঁহার 'রিয়াজ' গ্রন্থে রাজা কংসের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সহিত রাজা গণেশের বিবরণের ঐক্য দেখা যায়। রাজা গণেশের নাম পারসী বর্ণমালার প্রভাবে পড়িয়া সম্ভবতঃ কন্‌স হইয়া থাকিবে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট তাঁহার বাঙালার ইতিহাসে কংস স্থলে, গণেশ লিখিয়াছেন। আইন-ই-আকবরিতেও রাজা কংসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা পরবর্ত্তী রাজা গণেশের কাহিনীর অনুরূপ। কোন কোন ঐতিহাসিক রাজা গণেশের অপর নাম কংসরাম— এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বাঙালার জাতীয় ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা কংসরাম ও রাজা গণেশ উভয়েই বিখ্যাত ব্যক্তি সত্য, কিন্তু উভয়েই একই ব্যক্তি নহেন। রাজা কংসরাম তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দুর্ব্বার ক্ষমতার প্রভাবে বাঙালার মসনদকে যদিও সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রভাবাধীন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মসনদের উপর আসীন কোনদিন হন নাই, নিজের মনোনীত ব্যক্তির হাত ধরিয়া মসনদে বসাইয়া দিবার স্পর্দ্ধা তিনি রাখিতেন। আর রাজা গনেশনারায়ণ বঙ্গের তাৎকালীন সুলতানকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং বাঙালার মসনদে বসিয়াছিলেন। রাজা কংসরাম ও রাজা গণেশনারায়ণের মধ্যে ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের। রাজা গণেশনারায়ণের কাহিনী বাঙালীর অবিদিত নহে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙালীর স্মৃতিমন্দিরে যে বাঙালী মনীষীর কোন কিছুই নাই, পুরাবৃত্তের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহার চমকপ্রদ কাহিনী এবং সেই সঙ্গে বাঙালার মসনদের তাৎকালীন রহস্যময় বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কংসরামের সহিত গণেশনারায়ণের কোন সম্বন্ধ নাই এবং এই আখ্যানবস্তু ঐতিহাসিক সত্যে অনুরঞ্জিত।

বাঙালাদেশ মুসলমান-অধিকৃত হইলে ১৫০ বৎসরকাল দিল্লীর পাঠান সম্রাটদের অধীন থাকে। মহম্মদ তোগলকের সময় সমসুদ্দীন আবুল মজঃফর ইলিয়াস সাহ ছিলেন বাঙালার নবাব। তখন দিল্লীশ্বরের বিশাল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়াছে। সমসুদ্দীন এই সুযোগে স্বাধীন হইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তখন সমগ্র বাঙালা ও বেহারে মুসলমান সংখ্যায় মাত্র ৩৪ হাজার। বুদ্ধিমান নবাব হিন্দুসেনা সংগ্রহে সচেষ্ট হইলেন। তখন হিন্দুদের মধ্যে দামনাশের সান্যাল ও ভাজনীর ভাদুড়ীদের খুব নামডাক। চতুর নবাব বুদ্ধি খেলাইয়া সান্যাল

গোষ্টির 'কর্ত্তা শিখাই বা শিখিবাহন সান্যাল এবং ভাদুড়ীদের কর্ত্তা সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশবরাম ভাদুড়ী ও জগদানন্দ ভাদুড়ীকে সসম্মানে আনাইয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

জগদানন্দকে 'রায়' উপাধি দিয়া দেওয়ান করা হইল। শিখাই সান্যাল, সুবুদ্ধি ভাদুড়ী ও কেশব ভাদুড়ী এই তিনজনকে 'খাঁ' উপাধি দিয়া সেনাপতির পদ দিলেন; ইঁহাদের চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত রসদ ও অর্থ সঞ্চিত হইল। এদিকে হিন্দুদের ভিতর হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ৫০ হাজার সেনা সমন্বিত এক শিক্ষিত নূতন রণবাহিনী গঠন করা হইল। এইভাবে চারিদিক দিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া ৭৪৬ হিজরীতে নবাব সম্সুদ্দীন দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া "শাঃ" অর্থাৎ স্বাধীন রাজা উপাধি গ্রহণ করেন।

দিল্লীতে তখন খেয়ালী বাদশাহ মহম্মদ তোগলক সাম্রাজ্য-সংস্কারের নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাঁহারই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বঙ্গদেশের নবাব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন শুনিয়াই তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। দিল্লী হইতে ফৌজ আসিল, যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু রায় দেওয়ান জগদানন্দের বুদ্ধি এবং শিখাই, সুবুদ্ধি ও কেশব প্রমুখ তিনজন বাঙালী সেনাপতির রণকৌশলের শক্তি সম্রাটের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। মহম্মদ তোগলক বাঙালার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। কিন্তু পণ রক্ষার পূর্ব্বেই পরলোকের পথে পাড়ী দিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে ফিরোজ তোগলক দিল্লীশ্বর হইলেন। তাঁহারও ধনুর্ভঙ্গ পণ, বাঙালা দখলে আনা চাই-ই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের পর যুদ্ধে হারিয়া তাঁহাকেও অবশেষে বাঙালাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া নিরস্ত হইতে হইল। অতঃপর ২০০ বৎসরকাল বাঙালা ছিল স্বাধীন এবং বিহার ও উড়িষ্যা ইহার অন্তর্গত হইয়াছিল।

* * * *

নবাব সম্সুদ্দীন যাঁহাদের সহায়তায় স্বাধীন বঙ্গের বাদশাহ হইলেন, তাঁহাদের গুণের যথাযোগ্য পুরস্কারও দিলেন। শিখাই সান্যাল পাইলেন পদ্মার উত্তরে চলনবিলের দক্ষিণের বিশাল ভূভাগ, তৎকালে তাহার মুনফা ছিল লক্ষ টাকা। এই ভূভাগের শ্রেষ্ঠ স্থানে শিখাই সান্যাল যে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার নাম হইল সাঁতোরের সান্যালগড়। ইনি কুলপতির সন্তান বলিয়া কুল-অভিমানী ছিলেন। ইনি সম্রাটদত্ত উপাধি 'খাঁ' তাঁহার নামের সঙ্গে জুড়িতেন না, বলিতেন—কৌলিক সান্যাল উপাধিই আমার গৌরব। ইঁহার পুত্র রাজা কংসরাম, যিনি পরবর্ত্তীকালে বাঙালার সুলতানের অধিক ক্ষমতা ধরিতেন এবং তৎকালের King-maker ছিলেন।

ভাদুড়ীরা যে জায়গীর পাইলেন তাহা চলনবিলের উত্তরে। বিশাল চলনবিলও সান্যাল ও ভাদুড়ী এই দুই জায়গীরদারের অধিকৃত ছিল। ভাদুড়ীদের জায়গীর চাকলে ভাদুড়িয়া (ভাতুড়িয়া) নামে বিখ্যাত ছিল। ভাদুড়ী-চক্র নামেও তাহা পরিচিত। ইহার মুনফা কয়েক লক্ষ টাকা ছিল। জ্যেষ্ঠ ভাদুড়ী সুবুদ্ধি খাঁ এখানে স্বাধীন রাজার মতই রাজগী চালাইতেন। ইনি বার্ষিক এক টাকা মাত্র নজর গৌড়বাদশাহকে দিতেন। এই সূত্রে এই বংশীয়েরা "একটাকিয়া ভাদুড়ী" নামে পরিচিত হন। খা, সিংহ ও রায় এই তিনটী উপাধি ইঁহাদের প্রসিদ্ধ। ভাদুড়ী-চক্র অতিশয় সুরক্ষিত ছিল। নগরের উত্তর প্রান্তে একটী, পূর্ব্বে একটী, দক্ষিণে দুইটী ও পশ্চিমে তিনটী দুর্গ ছিল। এইজন্য ইহা সাতগড়া বা সপ্তদুর্গা নামেও বিখ্যাত।

প্রাচীরবেষ্টিত নগরী ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সর্ব্বোত্তরে দুর্গবদ্ধ রাজবাটী, ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা প্রভৃতি, তৎপরে রাজোদ্যান। পূর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ বসবাস করিতেন। পশ্চিম দিকে বিদেশী, মুসলমান সিপাহী ও কর্ম্মচারীরা থাকিতেন। নগরের মধ্যভাগে ছিল বাজার, থানা ও কারাগার। দক্ষিণ পাড়ায় অন্যান্য জাতি বাস করিতেন।

সম্সুদ্দীনের জীবনে উল্লেখযোগ্য 'রোমান্স' আসিল—এক সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি আসক্তি। তিনি ঘোষণা করিলেন—যদি কোনও হৃদয়বান্ হিন্দু ইহাকে বিবাহ করেন, আমি তাহার সমর্থন করিব। অন্যথায় আমিই ইহাকে নিকা করিব। খোদার সৃষ্ট এমন শ্রেষ্ঠ ফুলটিকে আমি এভাবে নষ্ট হইতে দিব না। কিন্তু কোনও

হিন্দুই জাতিপাতের ভয়ে বিধবা-বিবাহে সম্মত হইলেন না। তখন নবাব নিজেই তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার নাম দিলেন—ফুলমতী বেগম। ইনি বাঙালার ইতিহাসে বাঙালাদেশের 'ক্লিওপেট্রা' হইয়া যে রূপ-বহ্নি জ্বালিয়াছিলেন, তাহাতে বহু শক্তিমানকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। সে কাহিনী আমরা পরে পাঠক-পাঠিকাগণকে শুনাইব।

সেনাপতি শিখাই সান্যালের পুত্র কংসরাম সান্যাল তখন ফৌজদার। নবাব এই প্রিয়দর্শন তরুণ যুবাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। রাষ্ট্রনীতি, কূটবুদ্ধি ও সামরিক শক্তি—এই তিনটিতেই কংশরাম দক্ষ ছিলেন। মৃত্যুকালে নবাব অন্যান্য বেগম ও তাহার পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া ফুলমতীর গর্ভজাত নাবালক ময়জুদ্দীনকে নিজ উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করেন এবং কংসরাম হন তাহার অভিভাবক। নবাব মৃত্যুকালে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে ডাকিয়া শপথ করাইয়া লইলেন যে, তাঁহারা ময়জুদ্দীনের পক্ষসমর্থন করিবেন। নবাব ময়জুদ্দীনকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য পাণ্ডুয়ার দুর্গে অন্যান্য বেগম ও পুত্রগণকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ ও নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান।

কিন্তু নবাবের মৃত্যুর পর মুসলমান সেনাপতি ও কর্ম্মচারীরা বড় বেগমের পক্ষ লইয়া তাঁহার পুত্র গয়সুদ্দীনকে নবাব করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ফুলমতী তখন ঘোষণা করিলেন –'নবাবের ব্যবস্থা আমি উল্টাইয়া দিতে চাই। অর্থাৎ গয়সুদ্দীন নবাব হউন, আমি ও আমার পুত্র উপযুক্ত খায়মা' (রাজকীয় বৃত্তি) লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।' ঘোষণার পরই ফুলমতী বড় বেগম ও গয়সুদ্দীনকে আনিতে পাণ্ডুয়ায় লোক পাঠাইলেন।

কিন্তু বেগম ফুলমতীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—ফুলমতী বেশ্যা, তাহার ছেলে হারামজাদা। এখন সম্পদ দেখিয়া ভালমানুষ সাজিয়াছে। আমি উহাদিগকে ছুঁইব না,— উহারা আমার দাসদাসী হইয়া থাকিবে।

ফুলমতী তখন বিখ্যাত পাঠান সেনাপতি জুনা খাঁকে ইলিশ মান্য করিলেন। জুনা খাঁর ভরসাতেই বড় বেগম এতটা উদ্ধত হইয়াছিলেন। জুনা খাঁ গৌড়ে আসিলেন। ফুলমতী নিজে তাঁহার সহিত নিভৃতে দেখা করিলেন। আতর দিলেন, কত কি সওগাদ দিলেন, হাসিমুখে আদর সম্ভাষণ করিলেন। ফুলমতীকে দেখিয়া খাঁ সাহেবের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল, — অমনি তিনি নিকার প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। ফুলমতী জানাইলেন, — যদি তুমি আমার ছেলেকে নিষ্কণ্টক করতে পার, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই নিকা করব।—ইহার পরেই খাঁ সাহেব ময়জুদ্দীনের পক্ষ লইয়া তাহার অভিভাবক কংসরামের সহিত যোগ দিলেন। মধুসূদন খাঁও এই পক্ষে ছিলেন। ইহার ফলে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে গয়সুদ্দীন নিহত হইলেন এবং বড় বেগম ও তাঁহার কন্যাগণ বন্দিনী হইয়া ফুলমতীর দাসী হইলেন।

এইবার জুনা খাঁ ফুলমতীর পাণিপ্রার্থী হইলেন। ফুলমতী উপায়ান্তর না দেখিয়া কংসরামের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন,—আমাকে রক্ষা করুন, আমার মর্য্যাদার সঙ্গে পুত্রের মর্য্যাদা জড়িত। কংসরাম তখন এক অদ্ভুত চাল চালিলেন। তিনি জুনা খাঁর প্রধান প্রধান সহচরগণকে বড় বড় চাকরী দিয়া নানাস্থানে বদলী করিলেন। জুনা খাঁ তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছিলেন। একদা তিনি একাকীই ফুলমতীর প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিয়া নিকার জন্য জবরদস্তি করিলেন। কংসরাম পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। সহসা তিনি অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রাসাদরক্ষীদের সাহায্যে জুনা খাঁকে বন্দী করিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

এদিকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়াই জুনা খাঁর সহচরগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু কংসরামও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁহার বীরপুত্র জনার্দ্দন সান্যালকে সসৈন্যে পাঠাইলেন তাহাদের গতিরোধে। মধ্য পথেই তাঁহারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইলেন। দুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে জুনা খাঁর সহচরগণ সকলেই নিহত হইলেন। তাঁহাদের সৈন্যদলের অধিকাংশই হতাহত হইল, যাহারা প্রাণে বাঁচিল, কংসরামের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহারই সেনাদলভুক্ত হইল।

মইজুদ্দীন তখনও নাবালক। কংসরামের কৌশলেই এই নাবালকের মসনদ নিষ্কণ্টক, শত্রুকুল নির্ম্মূল হইল। রাজ্যের রক্ষক কংসরামের সুখ্যাতি লোকের মুখে তখন আর ধরে না। কংসরাম অতঃপর প্রস্তাব করিলেন,

সমারোহ করিয়া নাবালক সুলতানের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হউক।

কিন্তু বেগম ফুলমতী নির্দ্দেশ দিলেন—নাবালক সুলতান ও তাহার জননীকে যিনি পতন ও অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই অভিষেক সর্ব্বাগ্রে উচিত। মইজুদ্দীন নামে মাত্র সুলতান থাকিবে, কিন্তু তাহার অভিভাবক স্থানীয় হইয়া সুলতানের সহিত সুলতানের সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন—বীরচূড়ামণি কংসরাম; এখন হইতে তিনি হইলেন—রাজা কংসরাম।

অতঃপর মসনদে না বসিয়া এবং রাজদণ্ড প্রকাশ্যভাবে হাতে না ধরিয়া প্রকৃতপক্ষে বাঙালার কর্ণধার হইলেন রাজা কংরসাম। প্রায় সাত বৎসরকাল তিনিই ছিলেন বাঙালার প্রকৃত শাসক। রাজা কংসরামের শাসনকালে বাঙালার সকল দিক দিয়াই শ্রীবৃদ্ধি হয়, প্রভাব-প্রতিষ্ঠারও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। রাজধানী গৌড় তখন বঙ্গের রাজধানী, শান্তি, সুখ ও শৃঙ্খলার লীলাভূমি। ইঁহারই শাসনকালে ব্রহ্মরাজ প্রবল হইয়া আরাকান আক্রমণ করেন। ফলে সমগ্র আরাকান ও ত্রিপুরার অধিকাংশ ব্রহ্মরাজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা কংসরাম তাঁহার পুত্র প্রধান সেনাপতি জনার্দ্দন সান্যালকে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জনার্দ্দন জলে স্থলে বহু যুদ্ধে ব্রহ্মরাজের সেনাদলকে পরাস্ত করিয়া আরাকান ও ত্রিপুরার রাজাদ্বয়কে স্ব স্ব রাজ্যে স্থাপিত করেন। পুত্রের এই বীরত্বে প্রসন্ন হইয়া কংসরাম তাঁহাকে 'বজ্রবাহু' উপাধির সহিত পাটনার শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। রাজা কংসরামের আমলে সাঁতোড় রাজ্যেরও উন্নতি বড় অল্প হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাঙালা তৎকালে এই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ শাসকের শাসনাধীনে পরিচালিত হইয়া আদর্শ রাজ্যের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল।

বেগম ফুলমতী বরাবরই কংসরামের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। একটি দিনের জন্যও উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে নাই। নাবালক সুলতান ও তাঁহার জননীর যোগ্য সম্মান প্রদানে কংসরাম কোনদিন কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা এতই প্রবল ছিল যে, সকলেই সুলতানের মর্য্যাদা তাঁহাকেই নিষ্ঠার সহিত অর্পণ করিয়া আনন্দ পাইত। জনসাধারণের নিকট তিনি কংসরাম বাদশাহ বলিয়া অভিহিত হইতেন।

কংসরামের প্রতি বেগম ফুলমতীর সম্প্রীতি অনেকেরই চক্ষুশূল হইয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীর দল চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়া রটাইয়া দিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ আছে। প্রকাশ্যে কংসরাম মইজুদ্দীনের অভিভাবক, অপ্রকাশ্যে তিনি বেগম ফুলমতীর হৃদয়-বল্লভ। এমন কি, মইজুদ্দীন ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নিন্দুকেরা সুকৌশলে এই কলঙ্ক-কথা প্রচারিত করিয়া তাহাকেও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু যাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই অপবাদ পল্লবিত হইতেছিল, তাঁহারা তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। প্রাসাদ মধ্যে ফুলমতীর প্রভাব এতই প্রবল যে, কাহারও প্রকাশ্যে টুঁ শব্দটি করিবারও যো নাই। দরবারেও রাজা কংসরামের যে দুর্ব্বার প্রতাপ, কাহার সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে! কিন্তু লোকের নয়ন ও শ্রবণের অন্তরালে কত অপকর্ম্মই গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মইজুদ্দীন যে সময় সাবালকত্বের সীমা-রেখায় পদার্পণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই সহসা কংসরামের জীবনান্ত হইল। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর সহিত যে জনরব বিজড়িত, তাহাও অতিশয় মর্ম্মন্তুদ। মাতার কলঙ্ক অপবাদে মর্ম্মাহত ও আশু রাজ্য-ভার গ্রহণে লালায়িত মইজুদ্দীন নাকি চক্রান্তকারীদের দ্বারায় প্ররোচিত হইয়া কৌশলে বিষাক্ত পান খাওয়াইয়া রাজা কংসরামকে হত্যা করেন! কংসরামের অপমৃত্যুতে রাজধানীতে হাহাকার পড়িয়া যায় এবং সেই হাহাকারের মধ্যেই মইজুদ্দীন সেকেন্দর সাহ নাম লইয়া বাঙালার সুলতান হন।

ইঁহার পুত্রের নাম গয়সুদ্দীন। ইনিই গৌড়ের রাজ-সভায় অমর কবি হাফিজকে আনিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পান। গয়সুদ্দীনের মৃত্যুর পর যিনি হন বঙ্গেশ্বর সুলতান তাঁহার নাম সৈফুদ্দীন। তাঁহার দুই পুত্র আজিম ও নসরেৎ উত্তরাধিকারীসূত্রে বঙ্গের মসনদ লইয়া যখন আত্মকলহে মত্ত, তখন ভাদুড়ীচক্রের নেতা গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী ভ্রাতৃ-যুদ্ধে বিজয়ী নসরেতকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং ইনি কংসরামের বহু পরবর্ত্তী।

প্রাচ্যে পঞ্চবুদ্ধ কল্পনা ও সৃষ্টি

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

[পঞ্চবুদ্ধের চিত্রাদি অতি দুর্লভ— বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বা ইউরোপের কোন যাদুঘর বা শিল্পগৃহে পঞ্চবুদ্ধের চিত্র আছে—এরূপ ... যায় না। এই চিত্রগুলি নেপালের অভিজ্ঞ প্রাচীন শিল্পী কর্ত্তৃক রচিত এবং বহু আয়াসে সংগৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত চিত্রের পুনর্মুদ্রণের ... সংরক্ষিত।—লেখক]

বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব ও বিস্তৃতির ইতিহাস জগতের ইতিহাসে অপূর্ব্ব ব্যাপার। খ্রীষ্টধর্ম্ম অতি যৎসামান্য ভাব আদর্শের বাহন হয়ে ক্রমশঃ চিন্তা জগতে শীর্ণ হয়ে ...ছিল। এযুগেও খ্রীষ্টধর্ম্ম পুরাতন বার্ত্তা নিয়ে নিজের ...ণ দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রাখবার প্রয়াস করছে। কিন্তু ...র ভিতরকার অঙ্কুরে চারিদিকের বিচিত্রতাকে গ্রহণ ও ...কারের ক্ষমতা নেই বলে একটা নেতিমূলক ধর্ম্মবিধান-... তা পরিচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মব্যবস্থায় ...রিদিকের ভাব ও আদর্শের ঐশ্বর্য্যকে অস্বীকার করার ...সাহ কখনও দেখা যায়নি। যখন তিব্বত হ'তে ভারতীয় ...ণ্ডিত অতীশার আহ্বান আসে এবং অতীশা তিব্বতীয় ...ধ-জগতের সর্ব্বময় প্রভু হয়ে পড়েন, তখন তিনি তিব্বতের ...ত্রবাদ ও বণ্ডধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং এমন ...টি ধর্ম্ম-বিধান সৃষ্টি করেন—যাতে নূতন ও পুরাতন কিছুই স্থান পেয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের তপস্যা, আত্মসংযম ও কঠিন নিয়মবিধি ...ল বৌদ্ধজগতকে একটা বিশুষ্ক তত্ত্বচর্চ্চায় মগ্ন ...। হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের ধারা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারের ... নিহিত। মজ্জিমা নিকায় প্রভৃতিতে আত্মাকে ...কার করা হয়েছে। বুদ্ধদেব নিপুণ তাকিকের মত ...ও কোন খুঁত রাখেন নি, সাধনমার্গেও কৃচ্ছ্র ...স্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে সাধারণ মানবের ন্যায় ...শঃ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভ কোন ঐশী ব্যাপার নয়। ভূমি- ... মুদ্রাদ্বারা বুদ্ধ ঐহিকতার প্রতি শ্রদ্ধা নির্দ্দেশ ...ন। বস্তুতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বায়বীয় আত্মবাদের কঠিন ...। অনাত্মবাদই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মুখ্য প্রতিপাদ্য ব্যাপার ...গবানের স্থানও এই ধর্ম্মবিধানে একটা পরম ... নয়। ফলে হীনযান ... আত্মসংযমাদির ব্যবস্থা আছে কিন্তু পূজ্য-পূজকের বা ভক্ত ও ভগবানের স্থান সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

Poussin এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রাচীন ভাববিধি-বর্জ্জিত হয়ে ভক্তিবাদের প্রসাদ একটা নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, পূর্ব্বের বক্তব্য ছিল "of all that proceeds from the causes, the Tathagata has explained the cause"—নূতন ধর্ম্মবিধিতে এভাব রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াল "of all that proceeds from the causes the Tathgata is the cause" বস্তুতঃ বুদ্ধকে বিচারক বা ধর্ম্ম-প্রচারকরূপে না দেখে স্বয়ং ভগবানরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ গভীর হয়ে উঠে। ভারতের ভক্তিবাদ বহু প্রাচীন ব্যাপার। এখানকার ধর্ম্মসাধন তবু সংযম ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়নি। যে সমস্ত লোকায়ত মত ভারতে প্রচলিত আছে, সেগুলির নাস্তিক্যবাদ চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশ করে, সন্দেহ নেই; কিন্তু এদেশের চিত্তে সে-সব কখনও প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনি। বস্তুতঃ ভক্তিবাদ ও ঈশ্বরবাদ ভারতের সমগ্র ভাবব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান।

কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের নায়ক শুধু একজন তার্কিক বা ধ্যানীরূপে এদেশে প্রতিভাত হন্‌নি। ভক্তেরা ক্রমশঃ বুদ্ধের চারিদিকে একটা আরাধনার প্রবল ভাব জাগ্রত করে উঠায়। বুদ্ধ স্বয়ং ভগবান, এই ভাব জাগ্রত হ'তে বহুকাল গত হয়। কিন্তু ভক্তিবাদে প্লাবিত ভারতে ক্রমশঃ এই রকমের মত প্রচলিত হয়ে সমগ্র এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়। তারপর মন্দিরে মন্দিরে বুদ্ধ ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধূপ ও দীপের আরতিতে বুদ্ধের ঐশী সত্তা স্বীকৃত হয়।

এমনি ভাবে মহাযান-বাদ ক্রমশঃ বুদ্ধকে স্বয়ম্ভূরূপে কল্পনা ক'রে একটা বিরাট্ দেববাদ সৃষ্ট করে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের দেববাদের বহু রহস্য এই উৎস হ'তেই অধ্যয়ন

বৈরোচন

(প্রথম বুদ্ধ)

অক্ষোভ্য
(দ্বিতীয় বুদ্ধ)

রত্নসম্ভব
(তৃতীয় বুদ্ধ)

অমিতাভ

(চতুর্থ বর্ষ)

করতে হয়। নেপালে এই আদি বুদ্ধবাদ একটা বিশিষ্ট ভাবপীঠ সৃষ্ট করেছে। Old field বলেন :—"The historic Buddha is now in a word the representative of a First Cause, unoriginated, self-existing Swayambhu and this is the deity worshipped in the valley. The system of Philosophy taught in the Buddhist Scripture of Nepal is essentially monotheistic and is based upon a belief in the divine supremacy of Adi Buddha as the sole and self-existent spirit pervading the universe."

বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ, জগতের স্রষ্টা এবং জগদাত্মা-স্বরূপ এই রকমের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশঃ নব্য দেববাদ সৃষ্টির সহায়ক হয়। তাতে হিন্দুর সমগ্র দেবমণ্ডল যুক্ত হয়ে যায় বৌদ্ধ কল্পনায়।

কিন্তু মূলতঃ আদিবুদ্ধ কল্পনা পর্য্যবসিত হয় পঞ্চ বুদ্ধ কল্পনায়। "অবলোকিতেশ্বর গুণকরণ্ডব্যূহ" নামক গ্রন্থে এই বুদ্ধপর্য্যায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বস্তুতঃ এই কল্পনাকৃত্যে হিন্দুভাবই ক্রীড়া করেছে। কোন ইউরোপীয় ভাবুক বলেন "Indeed in the whole Buddhist theory of emanation and of the substantial identity of Jina & Jinaputra or Buddha & Bodhisattwas, we see the Hindu mind at work."

বস্তুতঃ হিন্দু দেবতাদের অন্তর্গ্রহণও বৌদ্ধধর্ম্মের একটা বিস্ময়জনক ব্যাপার। বৌদ্ধমতে বর্ত্তমান বিশ্ব চতুর্থ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সৃষ্টি। পদ্মপাণি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কাজ এদের উপর ন্যস্ত হয়। বৌদ্ধ মতে পদ্মপাণি ইন্দ্র, গণেশ, হনুমান, গরুড়, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাকেও সৃষ্টি করেন। তিনি প্রত্যেককে এক একটা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এমনি ক'রে আদিবুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতের সমগ্র দেববাদ একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

কিন্তু এই ব্যবস্থার মূলে হচ্ছে পঞ্চবুদ্ধ কল্পনা। আদিবুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা পঞ্চবুদ্ধ কল্পনা করেন। ধ্যানীবুদ্ধ হ'তে ধ্যানী বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ সৃষ্টি-প্রক্রিয়া উপচিত হ'তে থাকে।

পঞ্চবুদ্ধ কল্পনা ভাবের গৌরবে, রূপের ঐশ্বর্য্যে, বর্ণের বৈচিত্র্যে এবং রূপকের মহত্ত্বে অনির্ব্বচনীয়। আদিবুদ্ধের ব্যাপার অনেকের জানা আছে কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধবাদের এই মহনীয় সৃষ্টি অনেকেরই অজ্ঞাত। এ সম্বন্ধে চিত্রাদিও দুর্লভ। ভারতের বা ইউরোপের যাদুঘর ইত্যাদিতে কোথাও প্রামাণ্য পঞ্চবুদ্ধের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় না। পাঠকদের তৃপ্তির জন্য এই প্রবন্ধে পঞ্চবুদ্ধের কিছু সচিত্র পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চবুদ্ধের নাম হচ্ছে, যথাক্রমে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ। যথাক্রমে এই পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতৃরূপে খ্যাত হয়েছে।

বৈরোচন মানে হচ্ছে সমুজ্জ্বল বা ভাস্বর। ইনি ক্ষিতির দ্যোতক। বৈরোচন শ্বেতবর্ণ, একটা প্রশান্ত কারুতা সমগ্র কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছে। বৈরোচন ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় শোভিত এবং সিংহাসীন। তিনি রক্তাম্বর পরিহিত। বৈরোচন কল্পনার মূলে বৌদ্ধশীলতা একটা সার্থক প্রেরণা পেয়েছিল কারণ এই বুদ্ধ ক্ষিতির দ্যোতক। পঞ্চভূতাত্মক জগৎ মায়ার সৃষ্টি নয়—জগৎ একান্ত সত্য, এই হ'ল মূলকথা। বুদ্ধ এই জগতেই নিজের কর্ম্মপ্রবাহ সঞ্চারিত করেন। এজন্য আদিবুদ্ধের ধ্যান এই পৃথিবীর সারভূত পঞ্চভূতের সহিত গভীরভাবে যুক্ত। পঞ্চভূতকে অলীকভাবে কল্পনা ক'রে বা বর্জ্জন ক'রে নব্য বৌদ্ধবাদ অগ্রসর হয়নি।

পঞ্চবুদ্ধের দ্বিতীয় হচ্ছে **অক্ষোভ্য** অর্থাৎ অচঞ্চল। এই বুদ্ধের বর্ণ হচ্ছে নীল—ইনি জলের দ্যোতক। এক হাত ক্রোড়ে নিহিত এবং অন্য হাত ভূমিস্পর্শমুদ্রাযুক্ত ভাবে অক্ষোভ্য কল্পিত হয়েছেন। অক্ষোভ্যের দৃষ্টি পূর্ব্বের দিকে এবং বাহন হচ্ছে হাতী। বর্ণসুষমা ও ভাবলালিত্যে দ্বিতীয় বুদ্ধও অপরাজেয়। একের বহু হওয়ার ইচ্ছা সার্থক করতে হ'লে এমনি রূপবিগ্রহ-কল্পনাই শোভন হয়।

তৃতীয় বুদ্ধ হচ্ছেন **রত্নসম্ভব**। ইনি পঞ্চভূতের অন্তর্গত তেজের বা অগ্নির দ্যোতক। এই বুদ্ধের বর্ণ অগ্নির মতই হরিৎ। অশ্বই হচ্ছে রত্নসম্ভবের বাহন। বরদামুদ্রা শোভিত রত্নসম্ভবের হাত অতি মুগ্ধকর ভঙ্গীতে কল্পিত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রশান্ত কারুতা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ভূষণাদির বৈচিত্র্য এক একটি সৌন্দর্য্যস্বপ্নকে সার্থক ক'রে তুলেছে।

অমিতাভ নামটি বাঙলায় বুদ্ধের নামের পরিবর্ত্তে কাব্যবিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ অমিতাভ ও বুদ্ধ এক কল্পনা নয়। ইনি চতুর্থ বুদ্ধ। ইনি রক্তবর্ণে কল্পিত হয়েছেন। ইনি ধ্যানমুদ্রাযুক্ত। অমিতাভ পঞ্চবুদ্ধের ভিতর সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ বর্ত্তমান বিশ্বের স্রষ্টা পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব অমিতাভ হ'তেই উদ্ভূত হয়েছেন। অমিতাভের বাহন হচ্ছে ময়ূর। অমিতাভ মূর্ত্তির কল্পনা, বর্ণ, ভূষণ ও আবেষ্টনের লালিত্যে ভরপুর। বস্তুতঃ এক বুদ্ধ বহুত্বের বিচিত্র উপাদানের ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-জগতের ভিতর এক নূতন প্রেরণা উপস্থিত করেছিল। মানুষের অন্তর চায় ভগবানকে রূপ-রস-গন্ধের অসংখ্য ব্যঞ্জনার ভিতর। শুধু একটি কল্পনা মানুষের অসীম চিত্তকে তৃপ্তিদান করতে পারে না। এ জন্যই পরবর্ত্তী যুগে দেব-কল্পনার ঐশ্বর্য্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এক একটি দেবতা নানা রূপে ও ভঙ্গীতে এবং নানা লক্ষণ ও আবেষ্টনে রচিত হয়ে এক একটি রূপ-জগৎ বিম্বিত করে' তোলে — যার তুলনা পাওয়া জগতে কঠিন।

অমোঘসিদ্ধ হচ্ছে পঞ্চম বুদ্ধ। ইনি উত্তরদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ অবস্থায় কল্পিত হয়েছেন। ইহার বর্ণ সবুজ। ইহার হস্ত অতি সুললিত অভয়মুদ্রাশোভিত। সকল সফলতার উৎস বলে'ই অমোঘসিদ্ধ নামে পঞ্চম বুদ্ধ আখ্যাত হয়েছেন। অমোঘসিদ্ধের বাহন হচ্ছে গরুড়। সাতটি সাপের কুণ্ডলায়িত দেহলতা প্রভা-তোরণরূপে পঞ্চম বুদ্ধের পশ্চাতে কল্পিত হয়েছে। তান্ত্রিক যুগের পরবর্ত্তী ছাপ এমনিভাবে পঞ্চম বুদ্ধ কল্পনায় ধরা পড়ে।

বস্তুতঃ এই কয়টি বুদ্ধ কল্পনায় প্রাথমিক বৌদ্ধ-জগতের ভীরুতা ভেঙে যায়। স্বয়ম্ভু কল্পনা বৌদ্ধ জগতে একটা বিপ্লবের দ্যোতক। ঐতিহাসিক বুদ্ধ পিতামাতার স্নেহের সন্তান বলে পরিচিত, কিন্তু নব্য বুদ্ধবাদের তুরীয় বুদ্ধ জগৎস্রষ্টা—স্বয়ংসৃষ্ট নয়। স্বয়ম্ভু কল্পনাও নানাভাবে বিস্তৃত হয়েছে। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে, ভক্তিবাদ বৌদ্ধ-বিধানের সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র-ঘটিত বিচার-বিতর্ক ভেঙে হৃদয়ের ব্যাকুলতার অজস্র মন্দাকিনী-স্রোতঃ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। তাতে ভেঙে যায় চারিদিকের নাস্তিক্যবাদ। দিকে দিকে অসংখ্য মন্দির পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠে এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত হয় বুদ্ধের প্রতিমা স্বয়ং ভগবানরূপে। এমনি করে' ভক্তির প্রবাহে আবার সমগ্র এসিয়া প্লাবিত হয়ে যায়। পূজা, অর্চ্চনা, ধ্যান ও আরতি মুখরিত এই নব-যুগ চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে ও স্থাপত্যে এক নব সমুত্থান সূচিত করে। সেই সমুত্থানের আন্দোলনে সমগ্র প্রাচ্য দেশ শিহরিত হয়। ভারতবর্ষ, তিব্বত, মধ্য এসিয়া, চীন ও জাপানে এই নব শঙ্খনাদ একটা নূতন জাগরণের সূচনা করে। এতকাল সব যেন ছিল মৃত ও নিশ্চল। আবার বাস্তবিকই মহাযানেরই পথ বিস্তৃত হ'ল। এই আন্দোলনের বিরাটত্ব ও সুদূরত্ব রূপ-শিল্পের পুষ্পবিস্তৃত পথ দেখে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই বিরাট্ ধর্ম্ম-বিস্তারের ইতিহাসের মূলে পঞ্চবুদ্ধ কল্পনাই অঘটনঘটনপটু স্বপ্ন-সৃষ্টি সম্ভব করে।

শৈলখণ্ডে চন্দ্রাস্ত

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

ঢেউ খেলে যায় নীল সায়রে শ্যামল শত শৈল
কুজ্ঝটিকার শুভ্র ফেনা মাথায় ভাঙ্গে ঐলো।
উর্ম্মিশিরে চন্দ্র-তরী কাঁপ্‌ছে টলমল
নাইক নাবিক ঐ বুঝি রে গড়ায় রসাতল।
উচ্চকিত তারকারা খুলি বাতায়ন
দেখ্‌ছে চেয়ে ভাঙা তরীর নৈশ নিমজ্জন।

অনেকদিন পরে খুড়োর আবির্ভাব। ...

দরজার দিকে পেছন ফিরে ব'সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ খস্ খস্ শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লাম সুক্ষ্মদেহ, এবং একমাথা বাবরি-ছাঁটা রুক্ষ কেশ দুলিয়ে হাতের সুটকেশটা অবলীলাক্রমে টেবিলের একপাশে ছুঁড়ে রেখে—যে লোকটি বড় কর্ম্মক্লান্ত ভাবে আমারই পেয়ারের আরাম কেদারাটায় দেহলতা লুটিয়ে দিচ্ছেন—তিনি আমার নেহাৎ আপন নন, দূর সম্পর্কের খুড়ো শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। চ'টে উঠেছিলাম অত্যন্ত, অন্য কেউ হ'লে গলাধাক্কা দিয়ে ঘরের বার ক'রেই দিতাম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা চলে না, তাই মুখখানায় অমাবস্যার অন্ধকার নামিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে ব'লে উঠলাম—

"একটু আক্কেল ক'রে কাজ ক'রতে হয় খুড়ো, বুঝ্‌লে, এমন বেকুবের মতো ···"

ব'লতে ব'লতে তাঁর সুট্‌কেস্ পড়ার-আঘাতে দোয়াতদানীর উল্টে-পড়া কালীগুলো ব্লটিং প্যাডে মুছে তুলতে তুলতে, অফিসের খাতাখানাকে সরাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম।

খুড়ো, লতিয়েপড়া মাথাটাকে একটু সোজা ক'রে চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে ব'ললে—

"অবাক্ করলে বাবা! এতদিন পরে এলাম, কোথায় একটু আদর-আপ্যায়ন ক'রবে, তা নয়—কথায় যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে! কেন, শুনি? কি অন্যায় ক'রেছি তোমার? কি ক্ষতি করেছি?..."

খুড়োর কণ্ঠস্বর যেন আর্দ্র হ'য়ে উঠলো, মিথ্যে নয়, সত্যিকার; একটু অপ্রস্তুত, একটু লজ্জিতও হলাম; অতিকষ্টে মুখে একটু ম্লান হাসি টেনে এনে, এই প্রসঙ্গটাকে পালটাতে চেষ্টা ক'রলাম—; বললাম—

"তারপর? খবর কি খুড়ো? আজ প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ-সাত বছর পরে আবার পুনরাবির্ভাব যে? কোথা থেকে? কি মনে করে? সোজা বলে ফেলো তো?..."

খুড়ো দীর্ঘ ঋজুদেহ একটু সামনে হেললো, একটু পেছনে দুললো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের তলে চকিত চপলার মত একটু হাসিও খেলে গেল ব'লে মনে হ'লো; উত্তর দিলেন, "প্রথম উত্তর,—মনে তো অনেকই থাকে, আছেও—কিন্তু সফল হয় কই?"

ব'লেই হাত নেড়ে সুর ক'রলেন—

"মনের কথা রইল মনে বলা হ'লোনা"

বললাম—

"বটে! তারপর?—"

"দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—আসছি যেথান-সেথান থেকে; যে আসার কোনও হেতু নেই, এ সেই আসা! যে আসায় বর্ষা যায় বসন্ত আসে, নীরবতা যায়, কথা আসে, অন্ধকার যায় আলো আসে, এ সেই আসা। অর্থাৎ আমার এ আসা সম্বন্ধে কেউ কোনরূপ প্রশ্ন কোর'না, করলেও উত্তর পাবে না, কারো কাছে উত্তর দিতে আমি ইচ্ছুক নই, বাধ্য নই; আমি স্বাধীন, আমি উদ্দাম, আমি দুর্ব্বার! খুড়োর শীর্ণ হাতখানা একবার কড়িকাঠের দিকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় উঠেই নেমে প'ড়লো।

দেখলাম, আমার এ ঘরের অন্দরের দিকের আধ-ভেজানো দরজার পর্দ্দা নাড়িয়ে প্রেয়সীর মুখখানা স'রে যাচ্ছে।

বুঝলাম, পতিগতপ্রাণা সাধ্বী, সদর ঘরে কেউ হঠাৎ এসে তাঁর স্বামীরত্নকে আক্রমণ ক'রেছে ভেবে সাহায্যার্থ এসেছিলেন; হঠাৎ লজ্জায় পড়ে বিকৃত বদনে আত্মগোপন করছেন।

তবু উঠে গিয়ে একটু সাহস দিয়ে এলাম—"ভয় নেই গো, ভয় নেই। উনি আমার গ্রাম সম্পর্কে জ্ঞাতি খুড়ো, অনেকদিন পরে এসেছেন কিনা, তাই"—তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসিত প্রকৃতির কথা আর বিস্তৃত বিবরণ সহ প্রকাশ না ক'রেই, তাড়াতাড়ি তাঁর বিস্মিত ভীত চকিত দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে পড়লাম; কারণ ছিল —।

কারণ, তিনকূলে কেউ নেই জেনেই পিতার সমস্ত অর্থসম্পদের বরমাল্য আমার বর-কণ্ঠে অর্পণ ক'রে তিনি আপন বিপুল দেহভার এবং অমাবস্যানিভ বর্ণে আমার গৃহ পূর্ণ করতে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, চাকরীও করি আমি গৃহিণীর পিতার অফিসেই;

তিনি বড়বাবু, আমি কেরাণী, সুতরাং তস্য কন্যাকে ভয় করবার হেতু আছে।

কিন্তু, যাই হোক, গৃহিণীকে আশ্বস্ত ক'রে এসে দেখি, খুড়ো আমার টেবিলে-রাখা সিগারেটের কৌটা থেকে ইতিমধ্যে প্রায় গোটা দুই গোল্ডফ্লেক নিঃশেষ ক'রে তিনটায় মুখাগ্নি ক'রেছেন।

আমায় দেখে আর একটা এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন "নাও"—

বলা বাহুল্য, তাঁর এ সৌজন্যে আমার সারা অন্তর লঙ্কাবাটার মত জলছিল—বললাম "থাক, যথেষ্ট হ'য়েছে।"

একদিন যায়, দুদিন যায়, এমনি ক'রে দুই সপ্তাহ কেটে গেল, খুড়ো যাবার নামও করে না দেখে' প্রেয়সী একদিন মান খুইয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলি হ্যাগা, উনি তোমার কেমন তরো খুড়ো?—মিনষের চক্ষুলজ্জা নেই বুঝি, নইলে ঘাড় থেকে নামে না কেন?" কদিন থেকেই গৃহিণীর মনটা ভাব ভার দেখে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল; তাই, এই কথায় একটু ভ'ড়কে গিয়েই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম; ব'ললাম, "কেমন তরো আবার! বলেছি তো গ্রাম-সম্পর্কে, কোনও সুবাদ নেই। এখন,—ব'লতে নেই আমার অবস্থাটা ফিরে গেছে কিনা, তাই,—নইলে,—বুঝেছো, নইলে ঐ ওরাই, যখন আমি, পরীক্ষে দেবার টাকার অভাবে প'ড়তে পাচ্ছিলাম না, তখন কেউ এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি। ভাগ্যে তোমার বাপ ছিলেন, তাই রক্ষে, নইলে কি যে ঘটতো আমার বরাতে।"

বাপের কথায় গৃহিণীর চন্দ্রবদনে হাসি দেখা দিল, কিন্তু বেশীক্ষণ সে সৌন্দর্য্য দেখা আমার ভাগ্যে ঘটলো না, দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে উঠে পড়লেন; তাঁর সে ত্রস্ততায় তেলের বাটী প'ড়লো উল্টে, বাটনার পাত্র প'ড়লো ছিটকে, আর অতি যত্নে রান্না-করা ডালের বাটীটা প'ড়লো উপুড় হ'য়ে।"

চেয়ে দেখলাম—খুড়ো।

খুড়ো হাহাকার ক'রে উঠলেন—

"আহাঃ, হা—হা,—কল্লে কিগো, ক'ল্লে কি! তেল, নুন, বাটনা সব হবে, কিন্তু এমন রান্না ডালটি তো আর খেতে ব'সেই পাওয়া যাবে না! আহা হা, আজকের খাওয়াটাই বেবাক মাটি ক'রে ফেল্‌লে! —নাঃ, তোমাদের নিয়ে দেখছি আর ঘরসংসার করা চলে না, এক একটা অপদার্থ সব।"

একটা বাটী টেনে নিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ডালের খানিকটা তাতে কোষ ক'রে তুলে—বাটীটা খুড়ো এক-পাশে সরিয়ে রাখলেন; ব'ললেন—

"যে না খায়, না খাবে, কিন্তু তাই ব'লে আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না; ওটুকু আমিই খেতে পারবো; আহাঃ,—অমন খাপসুরৎ ডাল, বৌমার স্বহস্ত-পক্ক ডাল, ও ডালের কি তুলনা আছে রে ব্যাটা?"

ব'লে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ নীরব হ'য়ে গেল।

মুখে আমার কি ছিল কে জানে, কিন্তু খুড়ো সে দিকে তাকিয়েই হঠাৎ একটু দ'মে গেল ব'লে মনে

হলো। দুই একবার ঢোক গিলে বিপর্য্যস্তা গৃহিণীকে সম্বোধন ক'রে বললেন,

"তুমি কিন্তু এতটুকুও দুঃখ পেও না বৌমা; কেন না তুমি যাই-ই রেঁধে দাও, তাই আমার অমৃত।"

ব'লে হাতে-লাগা ডালটুকু দু'চারবার চেটে হাত ধুয়ে ফেললে। ব'ললে—

"জানো বাবাজী, হিট্লারের ব্যবস্থা জানো, যে-দেশের মেয়েরা খালি গাড়ী-ঘোড়া আর হোটেল-রেস্টুরেণ্ট ক'রে বেড়ায়—তাদের নির্ব্বাসিত করা হবে জার্ম্মান থেকে, আর যাঁরা আমার এই মা লক্ষীর মত রন্ধন-বিদ্যানিপুণা, তাঁদের দেশবিদেশ চুঁড়ে নিয়ে যাওয়া হবে গদী-আঁটা গাড়ীতে চড়িয়ে, আর—"

আর সহ্য হয় না; ব'ললাম—

"তুমি যাও তো খুড়ো, নিজের চরকায় তেল দাও গে' যাও—রাতদিন কাণের কাছে আর ভ্যানর ভ্যানর ভাল লাগে না; আর দেখছো, যখন একটা মানুষ তোমায় দেখলেই ব্যস্ত হ'য়ে অকাজের পর অকাজই ক'রে যায় বেশী, তখন তোমারই বা তাঁকে কথায় কথায় এরকম ব্যস্ত ক'রে তোলার কি দরকার? বাইরে যাও।"

ঘোমটার তলায় গৃহিণীর উদ্গত দীর্ঘশ্বাসটাকে সগর্জ্জনে চাপা দিয়ে খুড়ো ব'লে উঠলো—

"বটে?—আমায় অগেরাহ্যি, মানে অপমান? আমি তোদের খুড়ো, গুরুজন ব্যক্তি, আমায় অবহেলা? আমি এখুনি এ বাড়ী ত্যাগ ক'রবো, অনাহারে ত্যাগ ক'রবো, তোদের শাপ-শাপান্ত ক'রতে ক'রতে ত্যাগ ক'রবো, দেখবো তোরা কেমন সুখে থাকিস!"

তিনি পাঞ্জাবীর নীচে পৈতে হাতড়াচ্ছেন দেখে গিন্নী আঁৎকে উঠলেন—

"সর্ব্বনাশ কোরো না গো, সর্ব্বনাশ কোরো না; একে বামন মানুষ, তায় গুরুজন! ওঁকে অমন ক'রে যেতে মানা কর গো, ওঁর পা ধ'রে মানা করো।"

বারণ ক'রতে গিয়ে দেখলাম, খুড়ো ইতিমধ্যে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ ক'রেছেন।

কিছুক্ষণ পরে পা টিপে চুপি চুপি এসে দরজার পাশ থেকে দেখলাম — আরাম কেদারায় গা ঢেলে অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রে গোল্ডফ্লেকের শ্রাদ্ধ ক'রতে ক'রতে খুড়ো আমার মৃদু স্বর ভাঁজছে—

"রে কবি শুধুই দুরাশা
জলে তুই বাঁধিবি বাসা
মেটে না হেথায় পিয়াসা।
হেথা নাই তৃষ্ণা দরিয়া—"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফিরলাম; উদ্বিগ্না গৃহিণীকে সম্বোধন ক'রে ব'ললাম—

"চিন্তা নেই গো, ভাত বাড়ো, খুড়ো যায়নি।"

এমনি ক'রেই দিন যায়, রাত যায়, সপ্তাহ যায়, মাসও যায়, তবু খুড়োর যাবার গা' নেই দেখে সত্য সত্যই চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম; গৃহিণীর বিরক্তির সঙ্গে খরচ বাড়ছে যথেষ্ট; অন্ততঃ দিনে তিনবার তার ইতিবৃত্ত তাঁর কাছ থেকেই কাণে আসছে; আর আসছে টাকা জমাবার তাগাদা। আমি চোখ বুঁজলে যে এক ঐ লাইফ্ ইন্সিওর ছাড়া তাঁর প্রতি কেউ কৃপাদৃষ্টিপাত করবে না, এ কথা ধ্রুব সত্য ব'লে আমার মনে ধারণা করাতে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লেন। ব'ললেন—

"চিনি সবাইকেই, এর পরে যদি আমি গাছতলাতেও দাঁড়াই তো কেউ ঘরের দরজা খুলবে না, তা সে খুড়োই হোক, আর জ্যাঠাই হোক।"

কথাটা শুনে সত্য সত্যই চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লাম। ঠিক কথা:—ব্যয় কমাতে হবে। দরকার নেই মট্কার পাঞ্জাবী প'রে আর গোল্ডফ্লেক্ সিগারেট্ খেয়ে!

ভাবা মাত্র বাজার থেকে তিন পয়সার এক বাণ্ডিল স্বদেশী সিগারেট এনে মুখ-অগ্নি ক'রতেই খুড়ো চ'মকে উঠলো;—"আঃ, কি বিশ্রী কড়া গন্ধ ঐগুলোর, গা' বমি বমি করে। ফেলে দাও হে, ওটাকে মুখ থেকে ফেলে দাও।" বলে খুড়ো রুমালে নাক-মুখ মুছে মুখ ফেরালেন; ব'ললেন—

"ওহো, তোমায় ব'লতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, তোমার মত দু'টো আদ্দির পাঞ্জাবী তৈরী ক'রতে দিয়েছি সায়েবের দোকানে; বিল দিয়েছে,—ওটা মিটিয়ে দিও!"

একে তো বিড়ির খোঁটা, তার ওপরে নবাবজাদার মত আদেশ শুনে—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রাগে শিরশিরিয়ে উঠ্‌লো ; ব'ললাম—

"পারবো না বিল মেটাতে ; তোমার দরকার থাকে, তুমিই মিটিও, ও-সম্বন্ধে আমায় কিছু ব'লতে এসো না, আমি জানিনা।"

"বটে !"

খুড়ো একমিনিট আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ধুপ্ ক'রে বসে পড়লো ; ব'ললে—

"বটে, দরকারটা তুমি বুঝবে না ! তো কি বুঝবো আমি ? তোমার বাড়ীর অতিথি আমি যখন, তখন—তোমার যদি চারদিকে মানসম্ভ্রম না থাকতো সে কথা আলাদা, কিন্তু তা যখন আছে, আর তোমার খুড়ো হ'য়ে যদি আমি ছেঁড়া বা সস্তা দামের কাপড়-জামা প'রে ছ্যাকরা গাড়ীর মত এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াই, তবে মুখোজ্জ্বলটা হবে কার ব'লতে পারো ? আমার না তোমার ?"

কথাটা ম'নে লাগলো, লাগলো ব'লেই চুপ ক'রে গেলাম। এমনি চুপ ক'রে থেকেই আমার স্নানের সাবান, 'শেভে'র সরঞ্জাম, তোয়ালে, চিরুণী, ব্রাশ ইত্যাদি কোথায় যে একে একে অন্তর্দ্ধান হতে লাগলো, তা বুঝতে বিলম্ব হ'লোনা, কিন্তু আমি চুপ ক'রে থাকলেও গৃহিণী সক্রোধে হুঙ্কার ক'রে উঠলেন—

"বটে ! যার ধ'ন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই !" ব'ললাম—"সবুরে মেওয়া ফলে গিন্নী, সবুর কর—" গৃহিণী ব'ললেন—"এবার আমি 'আত্মহত্যে' না হ'লে দেখছি মেওয়াও ফলবে না আর তোমার ঐ খুড়োও যাবে না। কিন্তু এবার আমি দেখাচ্ছি মজা !"

বিকেল হ'য়ে এসেছে।—

অফিস থেকে ফিরে দেখ্‌লাম, খুড়ো 'শেভা'স্তে মুখের ওপর অবিশ্রান্ত ভাবে হিমানী ঘ'সছে।

গায়ে আমার গরদের পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্প্ সু।— কিছু জিজ্ঞেসা ক'রবার আগেই অতি ব্যস্ত ভাবে ব'লে উঠলো "কনে দেখতে যাচ্ছি ভাইপো, বিয়ে ক'রবো। বৌমা বলছিলেন, কতদিন আর এরকম ভাবে লক্ষ্মীছাড়া ঘরহারা হ'য়ে বেড়াবো, তার চেয়ে বে'থা ক'রে সংসার-ধর্ম্ম ক'রতে। ভেবে দেখ্‌লাম, কথাটা ঠিক।—

কতদিন—আরো কতদিন
বেড়াইব গৃহছাড়া, লক্ষ্মীহারা হয়ে
পথ হতে পথে পথে,
প্রান্তরে গহনে···দিবসে নিশীথে ?

চাই সুখ, চাই স্বচ্ছন্দ, চাই বুক-ভরা স্নেহ-মমতায় মাখা একখানি মুখ, একখানি গৃহ···বুঝলে ভাইপো..

এইটুকু আশা,
ধন নয়, মান নয়, — ধরণীর একপ্রান্তে এতটুকু বাসা,
করিয়াছি আশা—

বুঝেছো ?—"

বললাম—

"যথেষ্ট ; কিন্তু তার পরে ? এ তো তোমার গৌর-চন্দ্রিকা—ইতিটা কোথায় করা হবে ?"

খুড়ো বিকৃত স্বরে ব'ললেন—

"তোমার তো শুধু ঐরকম বেঁকা বেঁকা কথা ; কোথাও ভাল দেখতে পাও না। যাক শোনো, ইতি যেখানে এবং যেমন ভাবেই হোক, আমার দরকার তোমার সম্মতি ; ঐটী পেলেই কেল্লাফতে !" চেয়ারে বসে' প'ড়ে পা'দুখানা টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে ফের ব'ললেন, সাহায্য যা দরকার তা আমি বৌমার কাছে থেকেই পেয়েছি ; তোমায় সে জন্যে বলিনা, শুধু এইটুকু মিনতি,— তুমি যেন বৌমাকে তিরস্কার কোরোনা এর জন্যে······"

"তিরস্কার ক'রবো ? আমি ? তোমার বৌমাকে ? অবাক্ কর'লে খুড়ো। বরং তিনিই আমাকে···"

বিষম খেলাম।

প্রায় পনরো কুড়ি মিনিট পরে, সে বিষমের জের কাটিয়ে চারিদিকে চেয়ে খুড়োর টিকিও দেখতে পেলাম না। দেখলাম গৃহিণী দরজার পর্দ্দা সরিয়ে দেখে নিচ্ছেন ঘরের মধ্যে আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে কি না'।

বললাম—

"এস ; কিন্তু খুড়ো—"

মুখের কথা লুফে নিয়ে তিনি ব'ললেন,

"এইমাত্র যে তিনি তোমার নাম ক'রে তোমার বোতাম আর ঘড়ি চেয়ে নিয়ে এলেন।—"

"ঘড়ি ?—বোতাম ?—য়্যাঁ।—"

হায়রে! আমার বড় সাধের বোতাম আর ঘড়ি···

দু'জনেই দু'জনের দিকে নির্ব্বাকে তাকিয়ে রইলাম।

অনেকদিন চলে গেছে ;

খুড়ো আর ফেরেনি, খুড়ীকে নিয়ে সংসারী হ'য়েছে কিনা তার ঠিকানাও পাইনে,—কিন্তু তাঁকে সংসারী করার জন্য গৃহিণী জ্ঞাতে হোক আর অজ্ঞাতেই হোক যা উপকার করেছিলেন, তার বদলে এতটুকু প্রত্যুপকারও পাইনি

আলো-ছায়া

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে আব্‌ছায়ে আলোকে আড়ালে
　　সৃষ্টির নিগূঢ়তম নিত্য প্রাণলীলা
অজানায় অগোচরে সময়-সাগর ঃ
　　তা'রি ধারে প্রত্যহের জীবনের মেলা
উলসিত বিলসিত উর্ম্মি মুখর
　　চঞ্চল অশান্ত ক্ষুব্ধ সমুদ্র-কল্লোল ;
তীরের তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রাণের স্পন্দন ঃ
　　এ-সৃষ্টি রহস্য-ঘন গভীর অতল।

মানুষ সাধনা করে যুগে যুগান্তরে,
　　খোঁজে শুধু অসীমের দিগন্তের সীমা ;
নীরন্ধ্র আঁধার মাঝে ভাবনা আকুল ঃ
　　সৃষ্টির পিছনে কোন্ রহস্য-মহিমা ;
কোন অন্ধ মহাশক্তি ফিরিছে দুর্ব্বার,
　　কোথায় স্বরূপ তা'র, উৎস বা কোথায় ?
ধ্বনি তোলে প্রতিধ্বনি, আকুল জিজ্ঞাসা
　　ডুবে যায় মহাশূন্যে বিপুল মায়ায় !

উত্তর মিলিবে কোথা ; কে দেখাবে পথ ?
　　চিরন্তন আলো-ছায়া শুধু দোলে, দোলে ;
প্রভাতে ফুটিছে ফুল, ঝরিছে সন্ধ্যায় ঃ
　　দিনের আলোর শেষে আঁধারের কোলে।
এ-সৃষ্টির এই চির-শাশ্বত অধ্যায়—
　　দৃপ্ত জীবনের দ্যুতি, মরণের ছায়া ;
সুরু নাই, শেষ নাই, চলে পাশাপাশি ঃ
　　অবিরত লীলা আর সীমাহীন মায়া !

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা যে একমাত্র সংস্কৃতেরই আছে, ইতঃপূর্ব্বে নানা প্রবন্ধে আমরা তাহার বিশদ আলোচনা হইয়াছে। অদ্য এ বিষয়ে ভারত ও বহির্ভারতের বহু মনীষী ও মনস্বীর অভিমত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ডাক্তার বি, এস্, মুঞ্জে মহোদয় বলেন,—"আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এমন এক সময় আসিবে যখন সংস্কৃতই ভারতের শিক্ষিত লোকের রাষ্ট্রভাষা হইবে।"

ত্রিবান্দ্রম নগরে অনুষ্ঠিত বিগত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বডেন সংস্কৃতাধ্যাপক ডাক্তার এফ, ডব্লিউ, টমাস সি-আই-ই, মহোদয় বলিয়াছেন,"মৃত অশ্বকে কষাঘাত করার দায়িত্ব লইয়াও আমি একথা সকলকে জিজ্ঞাসা করি যে, ভারতে যে প্রকার বহু ভাষাবিভেদ বর্ত্তমান, তাহাতে সরল সংস্কৃত-ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্থান পুনরায় অধিকার করিতে পারে কিনা, সে কথাটা তাঁহারা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছেন কিনা?"

কাশীর গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় বলেন,—"ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা সংস্কৃতের আছে। শুধু তাহাই নহে, বিশ্বভাষা হইবারও ইহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

জার্ম্মানীর পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার এফ্, অটোস্রডর পি, এইচ, ডি, বিদ্যাসাগর মহোদয় বলেন, "যে সকল গুণ থাকিলে কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা লাভ করে, একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই সেই সমুদয় গুণ বর্ত্তমান।"

মুলতান সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী মহোদয় বলেন, 'ভারতের রাষ্ট্রভাষার সিংহাসনে উপবেশন করিবার অধিকার একমাত্র প্রাচীন ভারত-ভারতী অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষারই আছে, অন্য কাহারও এ অধিকার নাই।"

অযোধ্যার "সংস্কৃতম্" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলেন,—"আমি শতবার বলিয়াছি যে হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হইবার শক্তি নাই; ইহা কোনপ্রকারে সার্ব্বজনিক ভাষা হইলে হইতে পারে। রাষ্ট্রভাষার অন্তঃশক্তি থাকা সবিশেষ প্রয়োজন; সর্ব্বজন-বোধ্য ইহার কোনই প্রয়োজন নাই। হিন্দীর এই অন্তঃশক্তির সম্পূর্ণ অভাব। * * * যতদিন সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষা না হইবে, ততদিন ভারতবর্ষ এবং হিন্দুজাতির মঙ্গল কখনও হইবে না।"

পুণার ডাক্তার শ্রীহরদত্ত শর্ম্মা এম্, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয় বলেন,—"যদি কোন ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা থাকে, তবে তাহা একমাত্র সংস্কৃতেরই আছে।"

দেবভাষা পরিষদের যে অষ্টম অধিবেশনে সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলার আচার্য্য শ্রীআনন্দশঙ্কর বাপুভাই ধ্রুব।

মহীশূরের দেওয়ান মির্জ্জা স্যর মহম্মদ ইস্মাইলের অভিমত ইতঃপূর্ব্বে আমরা 'প্রবর্ত্তক' এবং অন্যান্য পত্রিকায় বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাঙালার চিন্তাশীলমণ্ডলে "ভারতের সাধনা"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত প্রমুখ সংস্কৃত ভাষারই রাষ্ট্রভাষাত্ব সমর্থন করেন।

পূর্ব্বোক্ত "সংস্কৃতম্" পত্র যে "রাষ্ট্রভাষাকে" প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বহু মনীষীই যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাহুল্য বোধে তাঁহাদের নাম এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

ফলকথা, সংস্কৃতের পক্ষে যে জনমত ক্রমেই বিশেষভাবে জাগ্রত হইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা এস্থলে একথা বিশেষভাবে বলিতে চাই যে, সর্ব্বভারতীয় ও অন্তঃপ্রাদেশিক কার্য্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া কথিত হইবে। ইহা ভারতের শিক্ষিত জনগণের মধ্যেই বিশেষভাবে আবদ্ধ থাকিবে, নিরক্ষর জনসাধারণ সাধারণতঃ তাহাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাই ব্যবহার করিবে। ব্যাকরণহীন ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী কুলিমজুর ও খানসামা মহলে ব্যবহৃত হইলেও, সে ভাষার দ্বারা ভারতের সাধনা ও সভ্যতার বিকাশ ও পরিপুষ্টি-সাধনা কখনই সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং সেরূপ ভাষার পক্ষে জাতীয় ভাষার স্থান গ্রহণ একটা অতিবড় দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিবে না। সুতরাং একথা দৃঢ়কণ্ঠেই বলা যাইতে পারে যে, ভারতের জাতীয়-ভাষার স্থান দেবভাষা সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষাই গ্রহণ করিতে পারে না। বর্ত্তমানের খণ্ডভারতে মহাভারত প্রতিষ্ঠা একমাত্র ইহার দ্বারাই সম্ভব হইবে। অতীতেও ভারতবর্ষে বহু কথ্যভাষা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষাকেই জাতীয় ভাষার গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ভবিষ্যতেও যদি আমাদিগকে প্রাদেশিকতা পরিহার করিয়া একতার সুবর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয়, তবে একমাত্র সংস্কৃত ভাষার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইতে পারিবে।

কাশী-তীর্থে

শ্রীমতিলাল রায়

শ্যাম সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া গাড়ী আসিয়া পড়িল পুলের উপর। নিম্নে খরস্রোতা জাহ্নবী, দূরে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি কাশীধামের অপূর্ব্ব দৃশ্য। মক্কা মুসলমানের তীর্থ, জেরুজালেম খৃষ্টানের; সেইরূপ হিন্দুর তীর্থ কাশী। কাশীর মন্দির ও সৌধশ্রেণীর মধ্যে বেণী-মাধবের ধ্বজা বিজয়-বৈজয়ন্তী। কিন্তু উহা নামেই। বেণীমাধব নাই, উহা এক্ষণে ইস্‌লামের মস্‌জিদ। হিন্দু-তীর্থের কলঙ্ক বেণীমাধবের নামে এখনও ঢাকা থাকে। বেণীমাধব নাই, কাশীর বিশ্বনাথও জ্ঞানকূপে ডুব দিয়াছেন। বিশ্বনাথের মন্দির ভিত্তি করিয়া মাথা তুলিয়াছে—মুসলমানের মস্‌জিদ। হিন্দুর তীর্থ, হিন্দুর দেবতা, হিন্দুর মন্দির নিশ্চিহ্ন করার এই প্রয়াস মুসলমান রাজত্বকালে হইয়াছিল, এরূপ নহে — আজও তাহার অন্যথা হয় না। হিন্দু-ধর্ম্মীর ধৈর্য্যের সীমা নাই, এইজন্য সেদিনও কোন ক্ষুদ্রতার ব্যথায় সে বিচলিত হয় নাই; আজও সে অটল স্থির। সহিতে সহিতে হিন্দুজাতি সহিষ্ণুতার হিমালয় হইয়াছে।

এই সকল কথার অবতারণা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক। কাশীতীর্থের করুণ ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। কাশীধামে আবার একটী নূতন তীর্থ গড়িয়া উঠিতেছে, আমি সেই কথাই বলিতেছি।

গাড়ী গিয়া পৌছিল বেনারস ক্যান্টনমেন্টে। এবার কাশীতে যাঁহাদের আহ্বানে আগমন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটী ছিল না। ষ্টেশনের বাহিরে শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভারত-বরেণ্য নেতা শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মোটরে চড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। এই তীর্থ-দেবতা কোন দেববিগ্রহ নহেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক সুদৃশ্য বিশাল মন্দিরে মর্ম্মর প্রস্তর খোদিত ভারতের মানচিত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠে এই চিত্র রচিত হইয়াছে। ভারতমাতার এই ভূচিত্রের পরিচয় দিবার আগে, এই পরিকল্পনার সূচনাপর্ব্বের কথা কিছু বলিব।

১৯৭০ বিক্রমাব্দে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করিয়া শিবপ্রসাদ বাবু পুণার সুবিখ্যাত কারভে মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই স্থানে আশ্রমভূমির উপর ভারতের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। এই মানচিত্র তাঁহার প্রাণে অভিনব ভাব সঞ্চার করে। মৃত্তিকা কুঁদিয়া পর্ব্বত নদী ভারতের যাবতীয় প্রদেশ এই মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তারপরে তিনি বিলাতে গিয়া লণ্ডনের যাদুঘরে এইরূপ মানচিত্র দেখিয়া ভারতমাতার সুবৃহৎ রেখাচিত্র নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করার প্রেরণা লাভ করেন। ১৯৭৫ বিক্রমাব্দে কাশীর প্রসিদ্ধ ভাস্কর দুর্গাপ্রসাদের উপর এই কর্ম্মভার অর্পণ করা হয়। শিল্পী বহু পরিশ্রমে ২০ জন কারিগর লইয়া ৫ বৎসরে এই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।
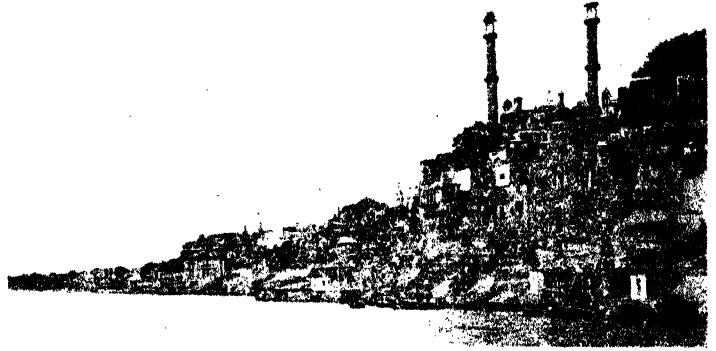
পুল হইতে কাশীর দৃশ্য

ভূচিত্রখানি দীর্ঘে ৩১ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থে ৩০ ফুট ২ ইঞ্চি। ১১×১১ ইঞ্চি করিয়া ৭৬২খানি মর্ম্মর খণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র অসংখ্য পাথর লইয়া ইহা সুনির্ম্মিত। ভারতভূমির সহিত উত্তরে পামির পর্ব্বত, দক্ষিণে লঙ্কা ও সিংহল। পূর্ব্বে মোল্‌মিন হইতে চীনের দেওয়াল আর পশ্চিমে হিরাট্‌ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ চক্ষে পড়ে। ইহা ব্যতীত আফগান, বেলুচিস্থান, তিব্বত, লঙ্কা ও মালয় প্রদেশ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্দির-গর্ভে শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত ভারতের এই মানচিত্রখানির দিকে চাহিলে মৃন্ময়ী দেশ-প্রতিমার পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহই মানসপটে ভাসিয়া উঠে। দেশ-প্রতিমার ভৌগোলিক রূপটী যেখানে যেমনটী, শিল্পী ঠিক তেমনটী করিয়াই ছানি দিয়া কুঁদিয়া তুলিয়াছেন। উচ্চ নিম্ন উচ্চতা স্থির রাখিয়া প্রস্তরের টুকরায় এই মানচিত্র দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। ভারতের প্রত্যেক নদ-নদী, হ্রদ, অরণ্য, মরুভূমি, প্রখ্যাত নগর কিছুই ইহাতে বাদ পড়ে নাই। এই মানচিত্রখানিকে ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত গুণ বড় করিয়া লইলে, ভারতবর্ষকে আমরা পাইতে পারি।

ভারতমাতার মন্দিরের সহিত ভারতের স্বাধীন যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ভিত্তি গাত্রে মানচিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত শাসিত ভারতবর্ষ, মোগল পাঠান যুগের ভারতবর্ষ সবই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এই ভারতমাতার মন্দিরে উপস্থিত হইলে ভূগর্ভ শাস্ত্র, ভূগোল-নির্ম্মাণ বিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, অন্তরীক্ষ বিজ্ঞান এবং ভারত সংস্কৃতির কারণ ও তাহার বিকাশ ও ভারতের মৌলিক তত্ত্ব অধ্যয়ন ও অবধারণের জন্য ভারতমাতার মন্দির কত বড় যে সহায় হইয়াছে, তাহা ভাষায় বলা যায় না। সাগর বক্ষ হইতে ভারতের পর্ব্বত-শ্রেণী লক্ষ্য করার জন্য ভূগর্ভ খনন করিয়া স্থান করা হইয়াছে। দ্বিতল ভিত্তিগাত্রে ভারতের ভাষা-বিজ্ঞানের চার্টগুলি দর্শনীয় বস্তু। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত এই প্রেরণা সফল করিতে গিয়া প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে তাঁহাকে বিধাতার বজ্রও মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে। একে একে সহধর্ম্মিণী, পুত্র, কন্যা কালসাগরে মিলাইয়া গিয়াছে; স্বয়ং স্বাস্থ্যহীন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্প্রেরণার অফুরন্ত উৎস শুকায় নাই, ক্ষীণ হয় নাই। অদম্য উৎসাহে, এই ভারত-মাতার মন্দিরটী পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাঁহার আজিও অবিরাম শ্রম ও তপস্যা দেখিলে মগ্ন ও বিস্মিত হইতে হয়।

ভারতমাতা। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ভারতের মানচিত্র

ভূমি ভাগের পরিমাপ নির্ভুল হইয়াছে। মানচিত্রের এক ইঞ্চির সহিত ৬৪ মাইল স্কেলে সমগ্র ভারতের পরিমাপ ঠিক রাখিয়া ইহা নিপুণভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পর্ব্বতশীর্ষগুলি দুই হাজার গজের জন্য এক ইঞ্চি মাপে ভূভাগ হইতে উচ্চে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৯ হাজার ফুট গৌরীশৃঙ্গ পাথরের টুকরায় পৌনে ১৫ ইঞ্চি উচ্চ করা হইয়াছে। হিমালয়ের চারিশত শৃঙ্গ এইরূপ যথারীতি মাপে শিল্পী আঁকিয়া তুলিয়াছেন। শিল্পির শ্রমের সহিত ধৈর্য্য ও কৃতিত্বের পরিচয় ইহাতে আছে। তুষারাচ্ছন্ন কৈলাস পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে ৩ শত ৩ প্রস্থে দেড়শত মাইল,

১৯৮৪ বিক্রমাব্দের চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ রবিবার দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীভগবানদাস কর্ত্তৃক ভারতমাতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসন্তী নব রাত্রির অনুষ্ঠানে ২৪ লক্ষ গায়ত্রী জপের সহিত পুরশ্চরণের ব্যবস্থা হয়। চারিবার চতুর্ব্বেদ পাঠান্তর পূর্ণাহুতি প্রদানান্তর ভারত মন্দিরের দ্বার মুক্ত হয়। ১৯৯৩ বিক্রমাব্দের বিজয়া দশমীর প্রভাতে মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বসাধারণের জন্য এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের ঝরণাধারার সহিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "ঐ ভুবন মনমোহিনী" সঙ্গীত-তরঙ্গে এই উৎসব মুখরিত হইয়াছিল। মহাভারত, বিষ্ণু-পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভারত বন্দনার ঋক্ ধ্বনি কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল। কাশীর পুণ্যতীর্থে এই ভারত-মাতার নবমন্দির নিখিল ভারতবাসীর গৌরব ও মহিমার কারণ হইয়াছে। তীর্থযাত্রী-দেরই ইহা শুধু দর্শনীয় বস্তু নহে, ভারতের ভূচিত্রের পূজা দিতেই ভারত-সন্তান শুধু এখানে আসিবে না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতের পরিচয় করিতে হইলে, এই ভারতমাতার মন্দিরে প্রত্যেক জগদ্বাসীকে মাথা নত করিয়া এই মন্দিরতলে জানু পাতিয়া বসিতে হইবে।

ভারতমাতার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া প্রখর মধ্যাহ্নে আমরা শিবপ্রসাদবাবুর প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। শূন্য পুরী হাহাকার করিতেছে। দাসদাসীর চক্ষে গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে অশ্রু ঝরিতেছে। গৃহস্বামী কিন্তু অটল নির্ব্বিকার। তিনি ভারতমাতার অনুধ্যানে সমাহিত। অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর রাজর্ষি জনকের ন্যায় নিরাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়াছেন। আমরা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়া এই কর্ম্মবীর ত্যাগীকে ক্ষুদ্র করিব না।

ভারতমাতার মন্দিরের সহিত তাঁহার আর একটী কীর্ত্তির পরিচয় শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধিজী ভারতে জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানদাসজীকে লিখিয়াছিলেন "আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে কাশীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।" শিবপ্রসাদ গুপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাত্মার এই শুভ প্রেরণা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে অধ্যাত্ম-জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় চরিত্র গড়িয়া তোলাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। মানব-সেবা এবং
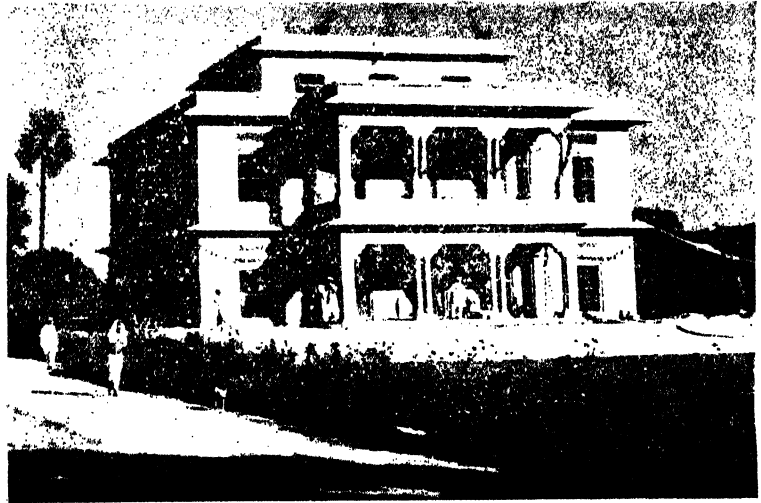
ভারতমাতার মন্দির

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, দেশপ্রীতি ও মুক্তি-ব্রত পূর্ণ করার দৃঢ় চরিত্র গড়াই শিক্ষার বিষয়-বস্তু। ভারতের প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন যুগের শিল্প বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক অভিনব শিক্ষা-নীতির প্রবর্ত্তন এই বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিক্ষার প্রধান বাহনরূপে হিন্দি ভাষাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ৮২ জন শাস্ত্রী (গ্র্যাজুয়েট), ৪৭৭ জন বিশারদ (ম্যাট্রিকুলেট) এই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের অহিংসা সংগ্রামে শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ যোগ দেওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয় বে-আইনী বলিয়া বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু আজ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠের

গ্র্যাজুয়েট এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র নিবাস এবং গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠাতার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় মালব্যজীর প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দেয়। শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠ শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্তের ত্যাগ ও তপস্যার জলন্ত নিদর্শন। ভারতমাতার মন্দির এবং শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠে উপস্থিত হইলে এই অনুভূতি প্রত্যেক অন্তর্দর্শীর হৃদয় স্পর্শ করে।

শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী

এইবার কাশী যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পরিচয় লওয়া এবং ভারতমাতার মন্দিরে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করা—কিন্তু এই মহাতীর্থে আসিয়া এক দিকে দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকা তীর্থ, বিশ্বনাথের মন্দির প্রভৃতি যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনই পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী ও শ্রীভগবানদাসজীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে আকাশের ঘনঘটা আমাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে পারে নাই। অজস্র বর্ষণধারার মধ্যেও আমরা শ্রীভগবানদাসজীর ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন। সদ্য বিবাহ বিলের পর তাঁর কল্পিত হিন্দু বিবাহ বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। সনাতনী হিন্দুদের প্রতিবাদে তাঁর সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হইলেও এই প্রগতির পথ রুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। হিন্দু সভার কর্ণধার সাভারকারের সহিত সাম্প্রদায়িক মতবাদ লইয়া পত্র ব্যবহারের কথাও বলিলেন। হিন্দুমুসলমানের ঐক্য প্রসঙ্গ লইয়া মহাত্মাজীর এই প্রেরণার মূলে কতখানি কার্য্যকরী নীতি বিদ্যমান আছে, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিলেন। প্রগতির নামে তরুণ যাত্রীদের লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্থা আছে বলিয়া মনে হইল না। শ্রীভগবানদাসজী স্থিতধী পুরুষ, শাস্ত্রদর্শী ঋষি তুল্য ব্যক্তি। তাঁহার মুখে মর্ম্মস্পর্শী হিন্দুত্বের মহিম্ন স্তুতি শুনিয়া হৃদয়ে আশা ও আনন্দ লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন অপরাহ্নে পণ্ডিত মালব্যজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাদর কুশল প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, ছেলে ও মেয়েদের একত্র শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে আমাদের কি অভিমত। ইহাতে আমাদের ঘোরতর আপত্তির কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমিও আপনাদের সহিত একমত। এই পথে আমার যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। মালব্যজীর বার্দ্ধক্য প্রায় সীমার বাহিরে বলিয়াই মনে হইল। তাঁহার হস্তপদাদির সঘন স্পন্দন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কায়কল্প চিকিৎসায় তিনি কি কোন সুফল লাভ করেন নাই? তিনি হাসিয়া বলিলেন, যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলাম কিন্তু আমারই দোষে সব নষ্ট হইয়া গেল। আমার কর্ম্মব্যস্ততাই তাহার জন্য দায়ী।

মালব্যজীর বহু কীর্ত্তির মধ্যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যে কত বড় কীর্ত্তি তাহা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। এই অসাধারণ কর্ম্মযোগীর প্রতি রক্তবিন্দু সৃষ্টিশক্তিপূত। আর তাঁহার চক্ষে দীপ্তি, ললাটে চন্দ্রজ্যোতিঃ—কিন্তু হায় কালচক্রে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বার্দ্ধক্যপীড়িত। তিনি আমাদের বিদায় অভিনন্দনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
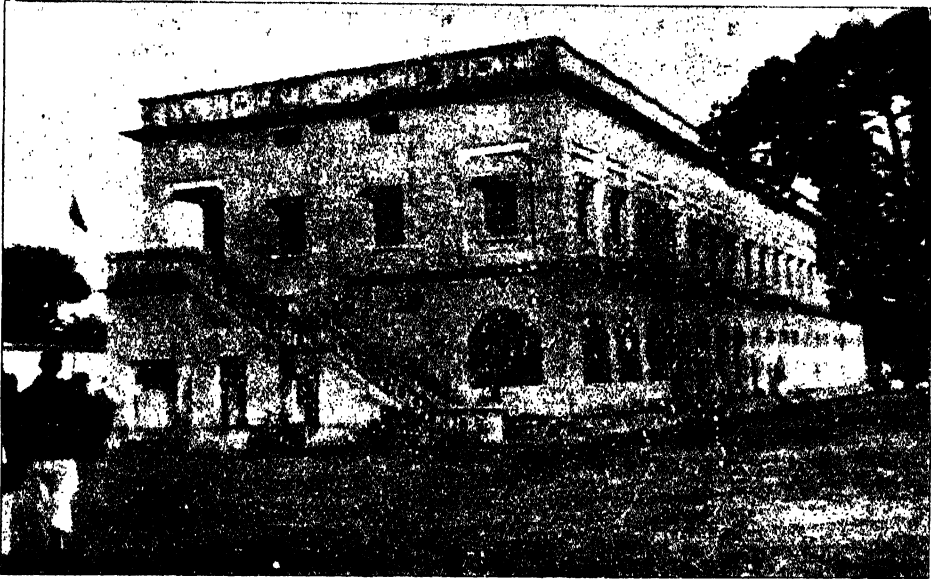
শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠ

শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্যজী

শীর্ণ তনু বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। আমরা তাঁহাকে এই সৌজন্যের দায় হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নিরস্ত করিলাম। অশ্রুবিগলিত চক্ষে করজোড়ে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বার বার তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।" আমরাও সমুচ্চকণ্ঠে প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে এই পুণ্য-মূর্ত্তির মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

সন্ধ্যার আকাশ তখন ঘন ঘটাচ্ছন্ন। বিশ্বনাথের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলাম—কাশীর বিশ্বনাথ হিন্দুর অপৌরুষেয় তত্ত্ব। অযোধ্যা, মিথিলা, দ্বারকা, বৃন্দাবন মহামানবের স্মৃতি-তীর্থ। কাশীতে অজঃ, শাশ্বতঃ, সনাতন, ইন্দ্রিয়াতীত অপৌরুষেয় তত্ত্বের প্রতীক স্থাপন করা হইয়াছে। কাশীর স্বর্ণ-মন্দিরে একখণ্ড প্রস্তর চিহ্ন কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া হিন্দু নরনারীর এই অলক্ষ্য নিত্য-বস্তুর প্রতীক স্বরূপের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। এত বড় মহাতীর্থ পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। অনন্ত অনির্দ্দেশ্যের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিয়া কত মানুষ আজিও কলুষক্ষয়ে নির্ম্মল চিত্ত হয়। কত যুগের পুঞ্জীভূত ঈশ্বর বিশ্বাসের এই পবিত্র তীর্থে মানুষ অপ্রাকৃত আনন্দে অভিভূত হয় তাহা শিক্ষার দোষে আজ আমরা আর অনুভব করিতে পারি না। আমাদের সে মস্তিষ্কবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দির-দ্বারে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যারতির অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিলাম। পূজারীদের বেদগান তান লয় মানে কি অপার্থিব ভাব ও অনুভূতি হৃদয়ে

াগাইয়া তুলিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। ইন্দু মরিতেছে, হিন্দুর তীর্থ-মহিমা আর আমরা হৃদয়ঙ্গম চরিতে পারি না। কিন্তু হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিনাশ নাই। কত সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ তার পরে শক, হুণ, পাঠান, যবন, কত বিধর্ম্মীর রাজ্যশাসনে হিন্দুস্থানের কত পরিবর্ত্তন! হে বিশ্বনাথ, তুমি কিন্তু আজিও আছ, একদিন তোমায় আমরা চিনিয়াছিলাম—সে পরিচয়ের পুরস্কার দিতে তুমি চিরযুগ থাকিবে। তোমার মন্দির কতবার ভাঙ্গিয়াছে, আজিকার এই ক্ষুদ্র কনক মন্দিরও অর্ব্বাচীন যুগের হিন্দুরাই হয় তো চূর্ণ করিবে—কিন্তু তুমি তবুও থাকিবে। হে অসীমের প্রতীক একখণ্ড কৃষ্ণ-প্রস্তর-মূর্ত্তি, তোমার মধ্যে যে মহিমা নিহিত, তাহা নিশ্চিহ্ন করার সাধ্য মানুষের নাই; তোমায় নমস্কার!

বিশ্বনাথের পূজার সুগন্ধি-মাল্য আশীর্ব্বাদরূপে মাথায় লইয়া কাশী ত্যাগ করিলাম। এই অপৌরুষেয় মহাতীর্থ দর্শনের পর মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিভূমি অযোধ্যার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় কাশীর পর অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা। সে কথা বারান্তরে বলিব।

চরম

শ্রীসুশীল জানা

রূপনারায়ণ এল যথাসম্ভব বাবুটি সেজে—। থাকবে কোথায়! যে আশ্রয় সে লক্ষ্য ক'রে এসেছিল—ভেবেছিল, কোন রকমে দিনকয়েকের জন্যে মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাঁই ক'রে নেবে—সেখানে রাত্রিতো দূরের কথা—দিনের বেলাতেই কেউ ঢোকবার চেষ্টা করেনা; রূপনারায়ণও ক'রলে না।

চরণদাস বল'লে এই গরীবকে যদি আগে একখানা চিঠি দিতেন হুজুর — তা' হলে ইষ্টিশান থেকে যে আপনাকে পাঁচশো লোক মাথায় ক'রে নিয়ে আসতো!

হতাশ হয়ে রূপনারায়ণ ব'ললে, আরে সে থাক— এখন থাকি কোথায় বলতো! ভেবেছিলাম, থাকবার ভাবনা ভাবতে হবেনা—নিজেদেরই যখন ঘর বাড়ী আছে... কিন্তু এযে দেখি প'ড়ো বাড়ী!

—আ-র হুজুর। চরণদাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে।

চরণদাস প্রাচীন—সেকালের পুরাণো প্রজা! রূপনারায়ণ ভয়ে ভয়ে ভাবলে; বৃদ্ধ হয়ত এবার সুরু ক'রবে অদূরের ওই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটিকে ঘিরে তাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের কাহিনী। পিতা-প্রপিতামহের আমল কি সুখেই গিয়েছে তারপর...রূপনারায়ণের বাবাতো তাঁর পিতা-পিতামহের জমি ভিটা চোখেই দেখেন নি—চরণদাসের এই গাঁ তো সামান্য মহাল একটা!...

কিন্তু চরণদাস সে সবের পাশ দিয়েই গেলনা। ব'ললে, থাকবার জন্যে ভাবতে হবেনা কিছু হুজুর। তারপর মাথা চুলকে ব'ললে, ব'লতে ভয় হয় হুজুর—আপনি আমার ওখানে যদি পায়ের ধুলো দেন।...বলে চরণ বার কয়েক আপন মনে মাথা নাড়লে, তারপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালে।

অপরিচিত জায়গা—রূপনারায়ণ কেমন ভয় খেয়ে গেল—চরণের ভাব ভঙ্গী দেখে। মনে মনে চরণ নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রূপনারায়ণ বিমূঢ়ের মত ব'ললে তোমার বাড়ীতেই উঠবো তবে।...

চরণ রূপনারায়ণের হাত থেকে স্যুট্‌কেশটা একরকম ঝপ্ করে কেড়ে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিলে—ব'ললে, আসুন হুজুর। ব'লে আবার সে মাথা নেড়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালে।

স্যুট্‌কেশে সম্বল কয়েকটি কাপড় জামা—আর ফিরে যাওয়ার খরচ। অপরিচিত জায়গা—ঠগের পাল্লায় গেল বুঝি! গাঁয়ের কত লোকই তো তার চার পাশে, কিন্তু

চরণের মত হৃদ্যতা দেখাচ্ছে না কেউ। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। রূপনারায়ণ হাঁ হাঁ ক'রে স্যুটকেশ ধরে টান মারলে—বললে, ওটা আমিই নিয়ে যাচ্ছি দাও। কিন্তু তোমার বাড়ীতে...

আর কেউ আমন্ত্রণ কর'লে না। কিন্তু চরণের ভাব-ভঙ্গী দেখে ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই—চরণের ওটা মুদ্রা দোষ, মাঝে মাঝে ওটা চলে তার।

রূপনারায়ণ দোমনা হ'য়ে চরণেরই অনুসরণ ক'রলে। একে একে গ্রামের সেখানে যারা জুটেছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল রূপনারায়ণের।

চরণের আশ্রয়ে রূপনারায়ণ খাতির যত্ন পেলে প্রচুর। চরণ পিতামহের আমলের প্রজা, একজন কর্ম্মচারীও বটে। চাষীদের মধ্যে অবস্থা তার ভালোই। পুরানো দিনের অনেক সংবাদ রাখে সে। পিতামহের সময়ে মহাল বিক্রী হ'য়ে গেল—কি জানি কোন খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে রইল কেবল কাছাড়ী বাড়ীটুকু আর তার চারপাশ জুড়ে আম কাঁঠালের বাগান সাজান বিঘে পাঁচ ছয় জমি। একে একে সব চলে গিয়েছে রূপনারায়ণের জ্ঞান হবার পূর্ব্বেই—এটুকুও এতদিন রূপনারায়ণের অজ্ঞাতে পড়েছিল।

চরণ দাস দুঃখ ক'রে বললে, এতদিন এতখানি জায়গা পরে ভোগ ক'রেছে হুজুর। কাছারী বাড়ীটা দেখতে দেখতে ভেঙে পড়ল — দরজা-জানলা মায় কড়ি বরগা সব কে কোথা নিয়ে চলে গেল। নীলাম্বরতো দিব্যি শাক-সব্জী ক'রচে খানিকটা জায়গা নিয়ে। এক পয়সা খাজনা দেওয়া নেই ...

এমনি অনেক খবর দিলে চরণদাস।

রূপনারায়ণ ব'ললে, এতদিন আসা আমার সুবিধে ছিলনা ব'লেই আসিনি চরণ। এবার নূতন রেল লাইন এসেচে—আসবো। তা ছাড়া কি জানতুম যে, এখানে অমন জায়গা পড়ে আছে!

তার দিন দুই পরে চরণ দাস দেখলে, আমীন নিয়ে রূপনারায়ণ ধ্বংসাবশিষ্ট কাছারী বাটী এবং তার চার-ধারের জায়গা মাপ-জোপে লেগে গিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরচে কমলপুরের রায় বাবুদের নায়েব। চরণদাস ভাবলে, এ মহাল তো রায় বাবুদের হাতেই গিয়েছে—অবশিষ্ট এইটুকুও হয়ত রূপনারায়ণ ওদেরি বেচে দিয়ে যাবে। চরণ কথাটা একসময়ে রূপনারায়ণকে জিজ্ঞেসও ক'রলে।

রূপনারায়ণ হেসে অস্থির! বললে, ক্ষেপেচ চরণ? বেচবার জন্যেই কি অতো দূর থেকে ছুটে এলাম? এইখানে এবার বাড়ী তুলব নূতন করে রে! জরীপ টরিপ তো আমি বুঝিনে—তাই ওদের নায়েবকে ডেকে এনেছিলাম।

—আমি ভেবেছিলাম ...

—হ্যাঃ, তুইও যেমন। ওইটুকু বেচলে বলে দুদিনেরই খরচ চলবে না আমার। তারপর রূপনারায়ণ এমন ভাবে হাসলে যে, চরণ রীতিমত লজ্জা পেয়ে গেল। বাস্তবিক, চরণেরই বোকামী। কিছু না জানুক — রূপনারায়ণের সাজ-সজ্জা দেখেও তো তার বোঝা উচিৎ ছিল।

রূপনারায়ণ ব'ললে, নীলাম্বরকে ব'লে দিসতো একবার —বিনি খাজনায় জমি ভোগ করা চলবে না—কিছু যেন খাজনা দেয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা এবার নিতেই হবে। তার অবস্থা কেমন?

—আজ্ঞে ভালোই। এবার ধান বেশ পেয়েছে—পঞ্চাশ টাকা হেসে-খেলে দিয়ে দিতে পারবে। আমি ঠিক আদায় ক'রে দেবো হুজুর! এতদিন গাছের ফল, পুকুরের মাছ, রবি শস্য কি কম নিয়েছে! জমিদারকে খাজনা দেওয়ার কথা ব'ললেই হ'লো। আমি একটু জায়গা নিয়ে একবার দুটো কলাগাছ পুঁতেছিলাম—তাইতে কি মারামারি।

—বটে! সব জমি আমি তোকেই দেবো। রূপ-নারায়ণ চটে উঠ্‌ল, বেটার আস্পদ্দা তো কম নয়! এবার থেকে তুই-ই চাষ-আবাদ ক'রবি, দেখবি-শুন্‌বি আমি আসবো কখনো সখনো। বছরে বছরে একটা খাজনা ফেলে দিবি—বুঝলি? কেমন?

চরণ বিগলিত কণ্ঠে বললে, আমার ভাগ্যি হুজুর!

—দিব্যি আয় হবে। রেল ইষ্টিশান নূতন হয়েছে —সহরে মাল চালান দিবি, দুঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। একেবারে টাকায় টাকা লাভ। বুঝলি?

আজ্ঞে। চরণ মহা খুশী। এতবড় সৌভাগ্য যে তার আশাতীত। ব'ললে, কত খাজনা দিতে হবে হুজুর?

চরণ জমিদারদের খেয়াল বোঝে। তাই খোস মেজাজের সময় সব কাজটা সেরে নিতে চাইলে।

রূপনারায়ণ কি ভাবলে, তারপর ব'ললে, কতো আর দিবি—দিস্ গোটা পঞ্চাশেক টাকা। ঘর তুলতে হবে—টাকার বড় দরকার, বুঝলিনে। পাঁচ টাকা ক'রে বছরের খাজনা···তোর পঞ্চাশ টাকা থেকে কি বছরের চেক কেটে দেবো।

চরণ মহা আপ্যায়িত। সে ঐশ্বর্য্যময় ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। রূপনারায়ণ তাকে স্ফীত ক'রে তুলেছে। চরণ ব'ললে, তাই দেবো হুজুর। কালই আমি ধান বেচবার ব্যবস্থা ক'রবো। আর নীলাম্বরের কাছ থেকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ঠিক আদায় ক'রে দেবো। বাপের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত জমি ভোগ ক'রছে!...

রূপনারায়ণ ব'ললে, অতো খাজনা সেকি দিতে পারে! সব তার কসুর ক'রে দিলাম — শুধু গোটা পঞ্চাশেক টাকা। না দিলে মোকদ্দমা ক'রে ভিটেছাড়া ক'রে দেবো।

রূপনারায়ণ হুঙ্কার ছাড়লে।

চরণ ছেলেকে ধমক দিয়ে ব'ললে, এঁ্যা—আস্পদ্দা তো কম নয়! হুজুরের মত তুই জামা পরবি! মরে যাবি যে রে!··

ছেলে নাছোড়বান্দা। ছোট ছেলে—তার ওপরে বুড়ো বয়সের একমাত্র ছেলে। রূপনারায়ণের ভিনিসিয়ান সার্জ্জের জামা দেখে চরণকে অস্থির ক'রে তুললে।

চরণ ভয়ে ভয়ে রূপনারায়ণকে ব'ললে, ছেলে যে থামতে চায় না হুজুর! আপনার জামা দেখে···

এ অবস্থায় রূপনারায়ণের কি যে করা উচিত, তা সে ভেবে পেলেনা। চকিতে ঠোঁটের ওপরে একটু হাসির রেখা খেলে গেল। তারপর সহসা হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললে, আস্পর্দ্ধা তো কম নয়।

চরণের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। একদিন রূপনারায়ণ চরণের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার ক'রেচে যে, তাকে ভাবতে দেয়নি—রূপনারায়ণ মনিব ··· জমিদার, তবু সে ভয়ে ভয়ে কথাটা উত্থাপন ক'রেছিল যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে।

রূপনারায়ণ চরণের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, গোটা পাঁচেক টাকা দিস্—আমি নায়েবের হাতে কিনে পাঠিয়ে দেবো।

চরণ আড়ালে গিয়ে ছেলেকে দিলে বেদম প্রহার, কিন্তু তাতে ছেলের জামা কেনাটা দৃঢ়ভাবেই নির্দ্ধারিত হ'য়ে গেল।

রূপনারায়ণের কাছে প্রলোভন প্রচুর — চরণ তার থেকে রেহাই পেলে না। রূপনারায়ণের কাছে লটারীর টিকিট দেখে আর তার গুণাগুণ শুনে চরণের চোখ দু'টো জ্বলে' উঠ্ল। ব'ললে, ষাট হাজার টাকা পাওয়া যাবে হুজুর!

—হুঁ—পাঁচ টাকা দিয়ে এই রকম একখানা টিকিট কিনতে হবে।

—আপনার বুঝি ওই একখানাই আছে?

—না, আরও একখানা আছে। নিবি নাকি তুই?

রূপনারায়ণের কাছে কিন্তু একখানাই ছিল—সেই-খানাই চরণকে দিলে। ব'ললে, কারুকে দেখাস্‌নে কিন্তু।

এমনি ক'রে চরণ ধান বিক্রী ক'রে রূপনারায়ণকে দিলে প্রায় ষাট টাকা এবং চরণের সাহায্যে বহু ধম্‌কা-ধম্‌কি ক'রে ও ভয় দেখিয়ে নীলাম্বরের কাছ থেকে আদায় হ'লো পঞ্চাশ টাকা, বাকী খাজনা হিসেবে।

তারপর একদিন রূপনারায়ণ সাজসজ্জা ক'রে বেরুলো—ব'ললে, কমলপুরের রাস্তা কোনটা চরণ?

—সেখানে কেন হুজুর?

—আর বাপু, সেদিন ওদের নায়েব এসে নেমন্তন্ন ক'রে গেল—সে মহা ঝুলোঝুলি। আমি আবার এখানে ফিরে আসবো চরণ—তারপর এখানেই থেকে যাবো।

—শীগ্‌গিরই। এখান থেকে গিয়ে মজুর মিস্ত্রি নিয়ে আবার আসতে হবে। এই বছরের মধ্যেই বাড়ী তুলে শেষ ক'রতে হবে তো।

চরণ সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে কিছুদূর গেল। ভয়ে ভয়ে ব'ললে, ছেলেটাতো জামার জন্যে একেবারে পাগল—নায়েব বাবুর হাতে তা হ'লে···ব'লে মাথা চুলক'লে।
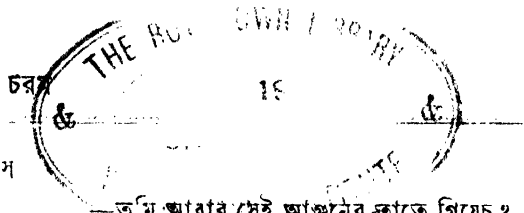
রূপনারায়ণ সহৃদয় কণ্ঠে এবার ব'ললে, হ্যাঁ হ্যাঁ—সে ব্যবস্থা আমি ক'রবো।

বৃদ্ধ চরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে রূপনারায়ণের পায়ের ধূলো নিলে। তারপর রূপনারায়ণ হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল। চরণের ছেলেটা চেঁচিয়ে ব'ললে, আমার জামা তোমার মত যেন হয় বাবু!

চরণ ছেলের মুখে হাতচাপা দিয়ে ব'ললে, আরে চুপ, চুপ—হুজুরের সঙ্গে কি ওই রকম ক'রে কথা কইতে হয়। আপনি, আজ্ঞে ব'লতে পারিস্‌নে মুখ্যু কোথাকার! ওদের যে অনেক খেয়েচি, অনেক পরেচি—ওরা যে মা-বাপ···

রূপনারায়ণ কমলপুর থেকে সোজা গেল খাজুরীর রেজেষ্ট্রী অফিসে। সেখানে চরণদাসকে পাঁচ টাকা খাজনায় বিলি-করা পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী ক'রলে কমলপুরের রায়বাবুদের হাজার টাকায়। দলিল রেজেষ্ট্রী হ'য়ে গেল।

টাকা চাই তার—দু'টাকা, পাঁচ টাকা, হাজার টাকা ...অনেক টাকা। চরণদাসের বাড়ীতে আর সে উঠ্‌লে না—একেবারে ট্রেণে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। টাকা ছিল স্যুট্‌কেশে—সেটা সে কোলের ওপরে চেপে ব'সল। ট্রেণ ছেড়ে দিল।

মাঠের মাঝখান দিয়ে উঁচু রেল লাইন চলে গিয়েছে। রূপনারায়ণ জানালার ধারে বসে' বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বহুদূরবিস্তৃত মাঠের শেষে ধোঁয়াটে বনরেখা ঘন হ'য়ে আছে। চরণের ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল। ছোট্ট একটি চাষার ছেলে মাঠের ধারে পথের পাশে কত সন্ধ্যা-সকালে এসে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে—তার রঙীন জামার জন্যে, কিন্তু রূপনারায়ণ আর ফিরবে না।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে রূপনারায়ণ। তার টাকার দরকার। সুখ-সমৃদ্ধির মুখ সে দেখেনি—তার জন্মের পূর্ব্বেই তারা বিদায় নিয়েছিল। এতদিন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলনা আর ক্ষুধিত দারিদ্র্যের সঙ্গে সে জীবন কাটিয়ে এসেচে। আজ তার অনেক টাকা। জীবনকে সে সুন্দর ক'রতে পারবে এবার—সমৃদ্ধ ক'রতে পারবে। তারপর ভদ্রার ওষুধ ··· ডাক্তার ··· চেঞ্জ। ···

—তুমি আবার সেই আগুনের স্রোতে গিয়েচ?

—এই যাচ্ছি। ব'লে ভদ্রা হাসলে। রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখের সেই হাসিতে যেন নেশার আমেজ যাই যাই ক'রেও যায় নি।

রূপনারায়ণ ভদ্রাকে শূন্যে তুলে একেবারে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। ব'ললে, চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌বে। ওষুধ-পত্র দিয়ে তোমাকে সারিয়ে তোলবার মত পয়সা আমার নেই—বুঝলে? ডাক্তারের অপমান, বন্ধুদের অপমান, ছুটী খাওয়ার জন্যে যে অপমান—সে সব গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, কিন্তু তুমিও আমাকে অপমান ক'রবে ভদ্রা!

ভদ্রা ধমক দিয়ে ব'ললে, তুমি থামবে! ঘরে এসো না আর—ঘরে এলেই তুমি ওই রকম সুরু করো।

রূপনারায়ণ বোঝে—দারিদ্র্য আছে থাক, সে নিয়ে তাকে ভাব্‌তে দিতে চায় না ভদ্রা। কিন্তু দিনান্তে যে ছুটি মেলে, তার সবটাই যে ভুগতে হয় রূপনারায়ণকে। মাঝে মাঝে মিথ্যা প্রবঞ্চনার যে অনুশোচনা—যে জ্বালা, তাতে গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না; ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়, সুখপুষ্ট সমস্ত মানবসমাজের গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু দিনের পর দিন যখন আবার জোটে না, তখন রূপনারায়ণের এ বিদ্রোহাগ্নি নিভে যায়। সকলে তাকে ত্যাগ ক'রেচে, জোচ্চোর ব'লে—জোচ্চোরেরাও তাকে বিশ্বাস করে না—সান্ত্বনা সে পায় কোথায়! তাকে নিত্য নতুন লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়—তাদের কাছে সান্ত্বনা চাওয়ার অবসর নেই, ঝাঁকিয়ে কথা কইতে না পারলে পেট ভরে না। সে নিজেও বোঝে নিজের হীনতা, কিন্তু ভদ্রার সংস্পর্শে এলে সমস্ত কোথায় মুছে যায়—নিজের অস্তিত্ব সে টের পায়, বেঁচে থাকবার অদম্য উত্তেজনা আসে। সকলে যখন ত্যাগ ক'রে যায় তখন এমনিই একজন সর্ব্বস্ব হ'য়ে থাকে বোধ হয়।

রূপনারায়ণ ব'ললে, একটা সন্ধান পেয়েছি ভদ্রা। বকুলপুর মহালটা আমাদের ছিল, তারপর বিক্রী হ'য়ে যায়। কিন্তু সেই মহালের মধ্যে খানিকটা জায়গা নাকি এখনও আমাদের আছে। মহালটা যারা কিনেছে,

তাদের নায়েবের সঙ্গে আজ দেখা হ'তে সে বিক্রীর কথা ব'ললে। ভগবান মুখ তুলে এবার চাইলেন বোধ হয়। শীগ্‌গিরই বকুলপুর যেতে হবে।

—বকুলপুর আবার কোথায়?

—আমি কি জানি ঘোঁড়ার ডিম! খোঁজ ক'রে যাবো।

টাকা পাওয়ার প্রত্যাশা আছে, কিন্তু ভদ্রাকে খুশী দেখাল না।

রূপনারায়ণ ঠাট্টা ক'রে ব'ললে, টাকা পাওয়ার কথা শুনে মুখ শুকনো হ'য়ে গেল যে গো! বড়লোক হবার ভয়ে নাকি?

—গিয়ে কতদিন দেরী হবে?

—তা দিন সাত তো ধরো।...

—অতো দিন! আমার শরীর যেন...

রূপনারায়ণ ভদ্রার গালে টোকা দিয়ে ব'ললে, যেতে না দেওয়ার চেষ্টা!...এইবার প্রথম ছাড়াছাড়ি—এতদিন রোগে, উপবাসে, অপমানে, সুখে-দুঃখে এক সঙ্গে...ওকি চোখের জল উপচে পড়লো একেবারে! আচ্ছা—আর ব'লবো না। নিষ্ঠুর মৃত্যুর বিষ-মাখানো ঠোঁটে সাদরে চুমু খেয়ে ব'ললে, রক্ত তো আজকাল কই আর ওঠে না দেখি।

রূপনারায়ণ হেসে ব'ললে, কিন্তু শরীর তোমার একটু যেন সেরেচে—নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ভয় দেখালে কি হবে...

রূপনারায়ণকে ভদ্রা যেতে দেবে না কিছুতেই, কিন্তু ভদ্রা তো বোঝে না যে, তাকে ঘিরেই রূপনারায়ণের সমস্ত স্বপ্ন আর সান্ত্বনা—সমস্ত দীনতা আর অপমান তাকে পাগল ক'রে দেয়নি। তার জীবনে ভদ্রার প্রয়োজন অনেক—তাকে ভালো হ'য়ে উঠতেই হবে।

পরিচিত একটি ঝি ঠিক ক'রে একদিন গোপনে বকুলপুরে চলে এল রূপনারায়ণ তারপর...

—মশায়, আপনার দেশলাই আছে?

অপরিচিত সহযাত্রীর প্রশ্নে চম্‌কে উঠ্‌ল রূপনারায়ণ—নীরবে দেশলাইটা পকেট থেকে বের ক'রে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ মফস্বল সহরের একটি ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখলে, যার কাছ থেকে সে লটারীর টিকিট কিনেছিল—সেই লোকটি চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল চরণদাসের কথা—দু' টাকার টিকিট সে পাঁচ টাকায় বিক্রী ক'রেছে। ভয় হ'লো, চরণদাস টাকা পেয়ে গেল নাকি! থাক, কোন রকমে সে অদল-বদল ক'রে নেবে টিকিটখানা। ও রকম সে অনেক ক'রেছে।

কিন্তু জিজ্ঞেস ক'রে খবর পেল—টাকা লাগেনি। রূপনারায়ণ হতাশ হ'য়ে গেল। কেন জানি না—লটারীর টিকিট কিনে তার দৃঢ় ধারণা হ'য়েছিল, টাকা সে পাবেই।

দিনের আলো ধীরে ধীরে শেষ হ'য়ে আসছিল।

রূপনারায়ণ নীরবে এগিয়ে চল্‌ল। গড়ে' চলল তার সৌভাগ্য। ভদ্রা এখন কি ক'রছে কে জানে? স্যুট্‌কেশে তার এগারশো টাকা। ভদ্রাকে ভালো ডাক্তার দিয়ে দেখাতে হবে—কালই। তারপর চেঞ্জ। কমলপুরের রায়-বাবুরা নতুন অভ্রের খনি নিয়েচে—তার একটা শেয়ার নিতে হবে। তারপর কত টাকা হবে তার—একখানা বাড়ী ক'রতে হবে, একখানা গাড়ী রায়বাবুদের মত। সুশ্রী ছেলেমেয়েদের কোলাহল—ভদ্রার হাসি মুখ।...

হঠাৎ মুখোমুখি দেখা সেই ঝিটির সঙ্গে—যাকে সে ভদ্রার কাছে নিযুক্ত ক'রে গিয়েছিল। রূপনারায়ণ ঔৎসুক্য-ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলে, বাড়ীর সব খবর ভালো তো ঝি?

—কে জানে বাবু ভালো কি মন্দ। আমি কি গিয়েচি! আমার বলে মরবার ফুরসুৎ নেই।

—তার মানে! তোকে যে আমি ব'লে গেলাম! তোকে কি আমি তোর মাইনে দিতাম না!

—তোমাকে সকলেই চেনে বাবু—আমারও চিনতে বাকী নেই! পয়সা দেওয়ার লোক হ'লে আর...

ঝি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রূপনারায়ণের চোখে নামল দুশ্চিন্তার ছায়া। আবার সে এগিয়ে চল্‌ল।

সন্ধ্যা তখন ঘন হ'য়ে এসেচে।

রূপনারায়ণ ভাবতে ভাবতে চলল—মাত্র তো দিন চারেক বাইরে ছিল সে। এর মধ্যে কিইবা এমন হ'তে

পারে—ভদ্রাকে সে ভালই দেখে গিয়েছে। ভদ্রা হয়তো দুঃখে নিজের দেহের ওপর অত্যাচার সুরু ক'রেছে। করুক—এবার ভালো ডাক্তার সে দেখাবে, ডাক্তারের মুখের ওপর টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে। একদিন ভদ্রা সবল সুস্থকায় হ'য়ে উঠবে—রাজরাণী হ'য়ে বসবে—চারদিকে দাসদাসী···বহু সুখদুঃখের সাথী ভদ্রা।

রূপনারায়ণ নিজেদের ভাঙা গেট ঠেলে ঢুকল। এক সময়ে এই বাড়ী তাদেরই ছিল। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা—বাড়ীর চারধার জুড়ে অনেকখানি জায়গা; খেয়ালী পূর্ব্বপুরুষরা এইখানে এসে মাঝে মাঝে বিলাসের স্রোত বইয়ে যেতেন। বাড়ীর দক্ষিণদিকে কংসাবতীর দীর্ঘ বালুতটরেখা। আজ সেই বাড়ীর পাঁচিল ভেঙে পড়েছে—কেয়ারি-করা ফুলের বাগান শুকিয়ে গিয়েছে—ভরে গিয়েছে আগাছা জঙ্গলে। যাকে এটা বিক্রী করা হ'য়েছিল তাদেরই দয়ায় এই প'ড়ো-বাড়ীতে এসে আছে। লোকে বলে, ভূতের বাড়ী।

রূপনারায়ণ এইটাই আবার কিনবে; আবার নতুন ক'রে সাজাবে সব। এতদিন এই প্রেতপুরীর মধ্যে কি যন্ত্রণা যে অনুক্ষণ সয়েচে সে! গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে যখন ঝাউ গাছের শ্রেণীর অশ্রান্ত গোঙানি শুনত, তখন সর্ব্বাঙ্গ তার ভয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত—খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ত—কারা যেন ঘন ঝুপ্সী জঙ্গলের মধ্যে থেকে ভীতিময় বড় গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে কেয়াফুলের গন্ধ ভেসে আসত—সে গন্ধ তার মনে কেবল আতঙ্কেরই সৃষ্টি ক'রত। এই জীর্ণতার ওপরে আবার সে সৃষ্টি ক'রবে নতুন ক'রে। শীর্ণ কঙ্কালের বিভীষিকার যন্ত্রণা আর সে সইবে না।

রূপনারায়ণ হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়; সুমুখ থেকে কি একটা যেন সরে গেল। তারপর আবার সে এগিয়ে চলল।

রাত্রি হ'য়েচে।

রুগ্না ভদ্রা এখন হয়ত শুয়ে আছে। অভিমান ক'রে হয়ত কথাই কইবে না। তার ঘরে তো কই আলো জলচে না! রূপনারায়ণ মনে মনে হাসলে: সে দেখচি নিতান্তই বড়লোক হ'য়ে গেল, নইলে রাত্রে কবেই বা তার ঘরে আলো জলেচে যে আজ সে তাই ভাবচে! যাক্, আসবার সময়ে দোকান থেকে একটা মোমবাতি কিনে এনে সে বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেচে।

দরজায় টোকা দিলে রূপনারায়ণ। চীৎকার ক'রে ডাকলে। ধাক্কা দিলে। কিন্তু ভদ্রার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রূপনারায়ণ মোমবাতিটা জ্বালালে। পেছনের একটা ভাঙা জানালা ছিল—সেইটে দিয়ে ঢুকলে।

মোমবাতির আলোতে নিজের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে—সেইটে দেখে সে হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই — বাইরে থেকে অশ্রান্ত ক্ষীণ ঝিল্লীর শব্দ ভীষণতাকে গভীর ক'রে তুলছে। রূপনারায়ণ এগিয়ে চলল। তার মনে হ'ল—সুমুখ থেকে অনবরত কারা সরে যাচ্ছে—পেছনে কে যেন ক্রমাগত অনুসরণ ক'রে চলেছে। তার ক্ষীণ পায়ের শব্দ সে যেন শুনতে পাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের তালে তালে। মনে হ'ল—বড় নিঃসঙ্গ সে—চীৎকার ক'রে উঠ্তে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না।

ভদ্রার ঘরে ঢুকল। ওই তো সুমুখ থেকে কে সরে গেল!—না, ওই তো ভদ্রা মুখ গুঁজে শুয়ে! আলোটা ভালো ক'রে তুলে ধরে ডাকলে—ভদ্রা ··

সঙ্গে সঙ্গে কারা হা-হা ক'রে উঠ্ল।

ভদ্রা শুয়ে আছে বিছানায় উপুড় হ'য়ে—মুখের কাছে খানিকটা রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। পিঁপড়েতে সারা বিছানাটা ভর্ত্তি।

রূপনারায়ণের হাত থেকে মোমবাতিটা পড়ে গেল, তারপর নিভে গেল। অন্ধকার আবার ঘন হ'য়ে ছুটে এল।
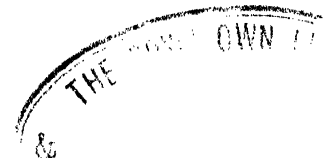
'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

বিজ্ঞানে নবযুগ

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মিত্র এম, এস্‌সি বি, এল

পদার্থ-বিজ্ঞান

বর্ত্তমান যুগে জড়-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় পদার্থবিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করিয়াছে বিস্ময়কররূপে বেশী। এ যুগে পদার্থ-বিদ্যা যে পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার যথাযথ আলোচনা গণিতকে বাদ দিয়া করা সম্ভব নহে; পক্ষান্তরে পদার্থ-বিদ্যায় অধুনা ব্যবহৃত গণিত সাধারণের বোধগম্যও নহে। সুতরাং নবযুগের পদার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাস বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইলেও, সাধারণের নিকট তাহা কি পরিমাণ হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা একমাত্র সহৃদয় পাঠকবর্গই বলিতে পারেন। নিম্নে গণিতকে মস্তকে রাখিয়াই পদার্থ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাওয়া গেল;—আশা আছে যে, বিষয়বস্তুর অসম্পূর্ণতার জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা পদার্থবিদের নিকট এ যাবৎ মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে, পদার্থবিৎ তাহাদের সমাধান করিয়াছেন প্রধানতঃ দুই প্রণালীতে:—প্রথমতঃ জড়পদার্থের শক্তিমূলক আলোচনা দ্বারা, ও দ্বিতীয়তঃ জড়ের সংগঠনমূলক অণুপরমাণুঘটিত ব্যাখ্যা দ্বারা। এযাবৎ দেখা গিয়াছে যে, যে-কোন সমস্যাই হউক না কেন, উপরোক্ত দুই পদ্ধতির যে কোনও একটিকে অবলম্বন করিয়া তাহার সমাধান হওয়া সম্ভব, অবশ্য দ্বিতীয় প্রণালীর সমাধানের দুরূহতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এই কারণে এযাবৎ প্রথম প্রণালী অবলম্বন করিয়া যত সমস্যার সমাধান হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সমাহিত সমস্যার সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম। এই উভয় প্রণালীর বিষয়ই নিম্নে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যখন হইতে বৈজ্ঞানিক ভাবিতে শিখিয়াছেন যে, বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিপদার্থেরই মান উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করিতে পারা যায়, তখন হইতেই আধুনিক পদার্থবিদ্যার সূচনা হইয়াছে। শক্তিপদার্থবিষয়ক এই ধারণা মধ্যযুগে সার্ আইজাক নিউটন ও সি হাইগেন্‌স্-এর গতিবিজ্ঞানমূলক গবেষণার ভিতর পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে যুগে ইহার পরীক্ষামূলক প্রমাণ কিছুমাত্র ছিলনা—ইহা একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। এই বিশ্বাস বৈজ্ঞানিকসমাজ কতকটা স্বতঃসিদ্ধরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; ফলে মধ্যযুগে শক্তিপদার্থের "সংরক্ষণশীলতা ও রূপান্তর" আবির্ভূত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন যে, প্রাকৃতিক কোনও প্রক্রিয়ায় শক্তিপদার্থের বিনাশ সম্ভব নহে, যদিও অবশ্য উহা একরূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে। মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময়ে বলা হইয়াছে যে, কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই বিশ্বাসের পরীক্ষামূলক ও গাণিতিক প্রমাণ উপস্থিত করেন; তন্মধ্যে জেম্‌স্ প্রেস্কট্ জুল (১৮১৮—১৮৮৯), লর্ড কেল্‌ভিন্ (১৮২৪—১৯০৭), সি এল্ এফ্ ভন্ হেল্‌ম্‌হোলট্‌জ (১৮২১—১৮৯৪) উইলিয়াম্ গিবস্ (১৮৩৯—১৯০৩), আর্ জে এফ ক্লাসিয়াস্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে রসায়ন প্রগতির সহিত জড়পদার্থের সংরক্ষণশীলতা যে পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মধ্যযুগের শেষভাগে জড়পদার্থের সংরক্ষণশীলতার পার্শ্বেই শক্তিপদার্থের সংরক্ষণশীলতা আসিয়া দাঁড়াইল; — আধুনিক পদার্থবিদ্যা (ও রসায়ন) এই দুই প্রকার সংরক্ষণশীলতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথিতনামা জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন্ যে আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞান - জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তদনুযায়ী বিশ্বাস করিতে হয় যে, জড় - পদার্থের ভর (mass) তাহার গতিবেগের উপর নির্ভরশীল। বর্ত্তমান

শতাব্দীর গবেষণা হইতে এ-কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, জড়পদার্থের ভর ও শক্তি পরস্পর পরিপূরক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদিও বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক চিন্তারাজ্যে ভর ও শক্তি দুইটি বিভিন্ন বস্তু ছিল, তথাপি আজ যেন প্রতীয়মান হয় যে উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন সত্তা।

বিশ্বপ্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিয়তই সাধিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করেন ও তাহাকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের ভিতর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন; এই চেষ্টার ফলে অনেকস্থলে পূর্ব্বরচিত শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে গড়িয়া উঠিয়াছে তদপেক্ষা দৃঢ়তর এবং অধিকতর ক্ষেত্রব্যাপী শৃঙ্খলা। যাহা হউক, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক বুঝিলেন যে, প্রকৃতির বিরাট্ শক্তি তদ্গত জড়ের শক্তি লইয়াই গঠিত। এ স্থলে অবশ্য জড়শক্তির কথাই বলা হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতি-বিজয়ের অর্থ এই শক্তি-বিজয়। এই শক্তিকে মূলে রাখিয়া প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা করার ফলেই পূর্ব্বোক্ত প্রথম পদ্ধতির উদ্ভব। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক কোনও প্রক্রিয়ায় এক সমষ্টিগত জড়-পদার্থের শক্তির পরিমাণমূলক কোনও পরিবর্ত্তন হয় না—ইহা পূর্ব্বোক্ত শক্তি-সংরক্ষণশীলতার মূল কথা। কিন্তু এই সমষ্টিগত জড়-পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তির সমস্তখানিই ব্যবহারিক জগতে প্রকটিত হয় না। তাহার সমগ্র শক্তির যে ভগ্নাংশ আমরা ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত হই—তাহা জড়ের পরিস্থিতি ও পরিবর্ত্তনের সহিত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমষ্টিগত জড়-পদার্থগুলির তাপাঙ্কের বিভিন্নতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তদন্তর্গত শক্তির কিয়দংশ ব্যবহারিকরূপে প্রাপ্ত হই; কিন্তু এই তাপাঙ্কের বিভিন্নতা লোপ পাইলে, ঐ সমষ্টির আর কোনও কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না। এই নিয়ম জড়-পদার্থের ক্ষুদ্র একটি সমষ্টির প্রতি যেমন প্রযুজ্য, বৃহত্তম সমষ্টি বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিও তেমনই। বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল; বিশ্বপ্রকৃতির এই কার্য্যকরী ক্ষমতা তদন্তর্গত অসংখ্য জড়-খণ্ডের তাপাঙ্কের বিভিন্নতা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু তাপবিকিরণহেতু এই বিভিন্নতা ক্রমশঃই হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে—সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্যকরী ক্ষমতাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। চিন্তাসূত্র সামান্য প্রসারিত করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ভবিষ্যতের গর্ভে এমন একদিন লুক্কায়িত আছে, যেদিন বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত সমস্ত জড়ের তাপাঙ্ক সমানতা প্রাপ্ত হইবে; সে দিন বিশ্ব-প্রকৃতির কার্য্যকরী ক্ষমতা কিছু মাত্র অবশিষ্ট রহিবে না! সে দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে—এ কথা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন। উপরোক্ত বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্যকারিতা-বিষয়ক যে নিয়ম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নের অনেক সমস্যারই সমাধান হইয়াছে। ইহাই হইল প্রথমোক্ত প্রণালীর ধারা। এই প্রণালীতে সমষ্টিগত জড়ের কার্য্য-করী শক্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া অভীপ্সিত তথ্য বিচার করা হয়, ইহাতে জড়ের অণুপরমাণুঘটিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা গঠন-রহস্যের কোনও প্রশ্ন উঠে না।

এক্ষণে দ্বিতীয় সমাধান-প্রণালীর দ্বারা বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া যাইবে। এই প্রণালীর সমাধানে পদার্থবিদ্‌গণ পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংগঠন-রহস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বের যাবতীয় জড়-পদার্থ যে সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত, তাহা আদিযুগে ও মধ্যযুগে জ্ঞানের অগোচর ছিল না; কিন্তু সে যুগের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করিতেন যে, পরমাণু পদার্থের অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ বা কণা; এই পরমাণুর সমষ্টিতে অণু এবং অণুর সমষ্টিতে জড়-পদার্থ গঠিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরমাণুর বিভাজ্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল ফ্যারাডে, কোহ্‌লরাউজ্-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ দ্রব-পদার্থের বিদ্যুদ্বাহিত্ব বিষয়ক পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, এই প্রকার দ্রব-পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎযুক্ত অসংখ্য কণিকা গতিশীল হইয়া তন্মধ্যে বিদ্যুৎস্রোতঃ উৎপন্ন করে। খৃষ্টীয় ১৮৯৭ সালে সার্ জে, জে, টম্‌সনও বায়বীয় পদার্থের মধ্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎস্রোতঃ পরীক্ষা করিয়া একই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ বিদ্যুদ্বাহী ক্ষুদ্র কণিকাগুলি পরস্পর সমধর্ম্মী, অতিলঘু উদ্‌যান-পরমাণু অপেক্ষাও লঘীয়ান্ ও ক্ষুদ্রতর, বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎ-

যুক্ত এবং বিশ্বের যাবতীয় জড়-পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতম গঠনোপাদানস্বরূপে বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী কালে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, এই ক্ষুদ্রতম বৈদ্যুতিক কণিকার ভর সাধারণ পদার্থের ভরের সহিত একার্থবোধক নহে; পরন্তু কণিকার এই ভর অন্তর্নিহিত বিদ্যুচ্ছক্তিরই আত্মপ্রকাশ মাত্র। ইংরাজীভাষায় এই বিদ্যুদ্বাহী কণিকার নামকরণ হইয়াছে "ইলেক্‌ট্রণ"; আমরা বাংলায় উহার আখ্যা দিব "বিদ্যুতিকা"। বিদ্যুতিকার যে গুণ উপরে ব্যক্ত হইল, তাহাতে জড়-পদার্থ ও বিদ্যুতের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ কিছুই থাকে না; সুতরাং এ কথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, জড়-প্রকৃতির মূলে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুচ্ছক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

পরমাণু ভাঙ্গিয়া বিদ্যুতিকার এই আবিষ্কার নবযুগের পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিশেষ কৃতিত্ব ও দান; বিদ্যুতিকার বিদ্যুৎ-পরিমাণ ও ভর-নির্ণয় যে সকল বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমেরিকার অধ্যাপক মিলিকানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে দ্বিতীয় প্রণালীতে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে হইলে, পরমাণু লইয়াই অগ্রসর হইতে হইত; ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য থাকিত না। বিদ্যুতিকা আবিষ্কারের পর পরমাণুর স্থানে এই কণিকা অধিষ্ঠিত হইল এবং মধ্যযুগের অনেক অসামঞ্জস্য অন্তর্হিত হইল। এই বিদ্যুতিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশেষ মতবাদ গড়িয়া উঠিল, যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Electron theory, অর্থাৎ বিদ্যুতিকাবাদ। বিদ্যুতিকাকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক সমস্যা সমাধান করিবার দ্বিতীয় পদ্ধতি আর এক পদ অগ্রসর হইয়া গেল।

"ইলেক্‌ট্রণ" বা বিদ্যুতিকার অস্তিত্ব যে কেবলমাত্র পরীক্ষাসিদ্ধ তাহা নহে, উপরন্তু যুক্তিসিদ্ধও বটে। মধ্য-যুগের ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জ্ঞাত আছি যে, আলোক ঈথর-সমুদ্রের একপ্রকার তরঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীতে জে, ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) গণিতের সাহায্যে এবং এইচ, আর, হার্টজ (১৮৫৭-১৮৯৪) পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেন যে, আলোক-তরঙ্গ ও বিদ্যুচ্চুম্বকজনিত তরঙ্গ একই গুণবিশিষ্ট—উভয়ের মধ্যে এক দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা ব্যতীত অন্য কোনও বৈসাদৃশ্য নাই। সুতরাং আলোক যে বিদ্যুচ্চুম্বকঘটিত একটি ঘটনা—তাহা বৈজ্ঞানিক-সমাজ স্বীকার করিলেন। অপর পক্ষে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, পরমাণুর স্পন্দন ব্যতীত আলোকের, তথা বিদ্যুৎকণার গতিশীলতা ব্যতীত বিদ্যুচ্চুম্বক ঘটিত তরঙ্গের উৎপত্তি হয় না। এক্ষণে আলোক-তরঙ্গ বিদ্যুচ্চুম্বকঘটিত হইতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, স্পন্দনশীল পরমাণুর অভ্যন্তরে গতিশীল বিদ্যুৎকণা বর্ত্তমান; এই পরমাণুর গঠনোপাদান রূপ এই বিদ্যুৎকণাকেই আমরা পূর্ব্বে "বিদ্যুতিকা" আখ্যা দিয়াছি। এই প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া বিদ্যুতিকার অস্তিত্ব-সাধনের কৃতিত্ব এইচ, এ, লোরেন্‌টস্‌ এবং জোসেফ লারমারের প্রাপ্য। এই যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ আনয়ন করা যাইতে পারে যে, পরমাণু কেবলমাত্র গতিশীল বিদ্যুতিকা দ্বারা গঠিত হইলে—উহা স্থিতিশীল হইতে পারে না; অথচ স্থিতিশীলতা পরমাণুর একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। কিন্তু এই অভিযোগের যথারীতি খণ্ডন হইয়াছে মঁসিয়ে ও মাদাম কুরীর "রেডিয়ম" আবিষ্কারের পরবর্ত্তী গবেষণা দ্বারা। বিখ্যাত পরলোকগত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড ও সডি কৃতিত্বপূর্ণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমাণুর মধ্যে গতিশীল বিদ্যুতিকা ব্যতীত "কেন্দ্রিকা" (nucleus) বর্ত্তমান; ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদ্যুতিকাগুলি আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নিয়তই আবর্ত্তিত হইতেছে। রাদারফোর্ড ও সডি এই কেন্দ্রিকার গঠনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া স্বীয় মতবাদে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই কেন্দ্রিকা যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত কতগুলি কণিকার সমষ্টি মাত্র; এই কেন্দ্রস্থিত কণিকাগুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি এত অধিক যে, এই কেন্দ্রিকাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রচণ্ড বহির্শক্তির প্রয়োজন। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত এই কেন্দ্রিকা যোগাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত হওয়ার জন্য পরমাণুর স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় না। যদি কোনও বহিঃপ্রযুক্ত প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে স্থিতিশীল পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত কেন্দ্রিকাকে বিধ্বস্ত করিতে পারা যায়,

তাহা হইলে পরমাণুর স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট হয়; তখন পরমাণুটী রেডিয়াম জাতীয় ধাতুর পরমাণুর ন্যায় সর্ব্বদাই ধ্বংসশীল হইয়া নানা প্রকার রশ্মি বিকিরণ করে;—ইংরাজীতে এই রশ্মিগুলিকে আমরা বলিয়া থাকি আল্‌ফা রশ্মি (X-rays), বিটা রশ্মি (B-rays) এবং গামা রশ্মি (Y-rays)। বহু পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, আল্‌ফা-রশ্মি যোগাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত গতিশীল হিলিয়াম্-পরমাণু, বিটা-রশ্মি বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত প্রচণ্ডগতিশীল বিদ্যুতিকা ও গামা-রশ্মি অতিক্ষুদ্র ঈথর-তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাদারফোর্ড ও সডির মতবাদের পর, লোরেন্‌ট্‌স্ ও লার্‌মারের বিদ্যুতিকার যুক্তিমূলক অস্তিত্ব-সাধনের বিরুদ্ধে যে পরমাণুর স্থিতিশীলতার অভাবের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা বিদ্যুতিকাবাদের বিরোধিতা না করিয়া বরং সহায়তাই করিয়াছে। আজ আমরা জানি যে, রেডিয়াম্-ধাতু নিয়ত ভঙ্গপ্রবণতার হেতু যে ক্রমরূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যান্য সকল পরমাণুরই হওয়া সম্ভব;—বহিঃপ্রযুক্ত প্রচণ্ডশক্তির প্রয়োগ দ্বারা পরমাণুগত কেন্দ্রিকাকে বিভক্ত করিলে আমরা কৃত্রিম রেডিয়াম্ পাইতে পারি।

জড়পদার্থের ক্রমবিভাগের ফলে বৈজ্ঞানিক 'বিদ্যুতিকা' আবিষ্কার করিলেন; অত্যাধুনিক কালে অবশ্য আরও কতকগুলি বিদ্যুৎযুক্ত বা বিদ্যুদ্বিহীন কণা পাইয়াছেন—প্রোটন, পসিট্রন, নিউট্রন, ইত্যাদি। জড়পদার্থের ক্রম-বিভাগ এ যাবৎ পরমাণুর সংগঠন-রহস্যের ইতিহাস এই পর্য্যন্ত দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে; কিন্তু অপরদিকে নানা প্রকার শক্তিতে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক শক্তিকণাবাদে (Quantum Theory) উপনীত হইয়াছেন। এই বিশ্লেষণের ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর, তেমনই কৃতিত্বপূর্ণ ও বিপ্লবাত্মক; নিম্নের আলোচনায় আমরা এই ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মোণ্ডলীফ্ (১৮৩৪-১৯০৭) নামক বৈজ্ঞানিক পরমাণুগুরুত্ব ও তাহার গুণাবলীর পরম্পর সম্বন্ধবিষয়ক গবেষণা করিয়া প্রমাণ করেন যে, যাবতীয় পরমাণুকে তাহাদের গুরুত্বানুযায়ী স্থান দিলে বার বার তাহাদের গুণাবলীর পুনরাবৃত্তি হয়, সেই অনুযায়ী মোণ্ডলীফ পরমাণুগুলিকে কতকগুলি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র বৃত্তে বিভাগ করেন। ইতিমধ্যে জার্ম্মান অধ্যাপক রন্‌টজেন একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসা-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ও পরে স্যার উইলিয়াম্ ব্র্যাগ্ এই রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহারদ্বারা কতকগুলি স্ফটিকের গঠনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া পদার্থবিজ্ঞানে রঞ্জনরশ্মির ব্যবহার প্রচার করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এইচ্, জি, জে মোস্‌লে দৃশ্য আলোকের পরিবর্ত্তে অদৃশ্য রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করিয়া বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করেন এবং তদ্বিষয়ক গবেষণা হইতে প্রমাণ করেন যে, যাবতীয় স্পন্দমান পরমাণুর স্পন্দন-সংখ্যার বর্গমূলের পরস্পরের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ আছে যে, সেই পরমাণুদিগের প্রত্যেককে তদনুযায়ী এক একটি বিশেষ মান দেওয়া যাইতে পারে;—এই মানের নাম পরমাণুসংখ্যা। এই ব্যবস্থানুযায়ী উদ্‌যান-পরমাণুর সংখ্যা এক এবং সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ ধাতু ইউরেনিয়ামের পরমাণুসংখ্যা বিরানব্বই। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানজগতে পরমাণুর সংগঠন ও বর্ণচ্ছত্রবিষয়ক আলোচনায় এই পরমাণুসংখ্যা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংখ্যা। প্রায় এই সময়ে য়্যাস্‌টন প্রমাণ করেন যে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুরুত্ব ভগ্নাংশ হইতে পারে না;—উহারা পূর্ণসংখ্যক।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যুতিকাগুলি কেন্দ্রিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরমাণুর অভ্যন্তরে গতিশীল—কতকটা সৌর-জগতের ন্যায়। কিন্তু এই সময়ে বর্ণচ্ছত্রঘটিত কতকগুলি পর্য্যবেক্ষণ-পদার্থ বিজ্ঞানজগৎকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল। এতৎপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে কেন্দ্রিকার চতুষ্পার্শ্বে বিদ্যুতিকার গতি নিউটনীয় গতি-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু এক্ষণে দেখা গেল যে, বিদ্যুতিকার গতি নিউটনের নিয়মাধীন হইলে, নবাগত পর্য্যবেক্ষণগুলির কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে তাপবিজ্ঞানের আরও কতকগুলি পরীক্ষা-লব্ধ ফলের ব্যাখ্যা তদনুরূপই দুরূহ প্রতীয়মান হইল। এই সকল বাধা ও দুরূহতা অতিক্রম করিবার মানসে

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক্ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-জগতের সম্মুখে "Quantum Theory" অর্থাৎ শক্তি-কণাবাদ উপস্থাপিত করিলেন, যাহার ফলে উপরোক্ত পর্য্যবেক্ষণগুলির ব্যাখ্যা অতি সহজেই পাওয়া গেল। আমরা জানি যে, এতৎপূর্ব্বে আলোক কিংবা তাপ-শক্তিকে তরঙ্গরূপে ভাবা হইত; শক্তিকণাবাদ এই বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিল যে, আলোক কিংবা তাপ-শক্তিকে শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি বা কণারূপে ভাবিলেই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত হয়। এই শক্তিকণাগুলি একস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারে, এবং আলোক কিংবা তাপশক্তির বিকিরণ বা শোষণকালে একের পর অপর এক কণার বিকীরণ বা শোষণ হইয়া থাকে।

শক্তিকণাবাদের পূর্ব্বে রাদারফোর্ড পরমাণুসংগঠনের যে প্রতিকৃতি কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নীল বোহর সেই প্রতিকৃতিকে শক্তিকণাবাদের স্রোতে ভাসাইয়া এই কল্পনা করিলেন যে, স্থিতিশীল পরমাণুতে বিদ্যুতিকা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কক্ষেই আবর্ত্তিত হইতে পারে, এবং এই নির্দ্দিষ্ট কক্ষগুলি বৃত্তাকার ও শক্তি-কণাবাদের অনুমোদিত। যখন পরমাণু শক্তি-বিকিরণ বা শোষণ করে, তখন বিদ্যুতিকাগুলি উল্লম্ফনপূর্ব্বক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরিত হয়। যতক্ষণ পরমাণুর অভ্যন্তরে এই বিদ্যুতিকার উল্লম্ফন চলিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তি বিকিরণ হয়, এবং বিদ্যুতিকাগুলি শক্তিকণা-বাদানুমোদিত কক্ষে পুনরায় আবদ্ধ হইলে, উহার বিরতি হয়। বিভিন্ন পরমাণুতে আবর্ত্তিত বিদ্যুতিকার সংখ্যা ভিন্ন; মোস্‌লে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোন পরমাণু-বিশেষে এই আবর্ত্তনশীল বিদ্যুতিকার সংখ্যা উহার পরমাণুসংখ্যার সমান। পরমাণুর শক্তিকণাবাদানুমোদিত এই প্রতিকৃতি বর্ণছত্রঘটিত অনেক প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে;—আবার এই বর্ণছত্রঘটিতই জটিলতর প্রশ্নের সমাধান করিবার নিমিত্ত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সোমারফিল্ড্ উপরোক্ত প্রতিকৃতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন এই কল্পনা করিয়া যে, বিদ্যুতিকাগুলির নির্দ্দিষ্ট কক্ষের আকার সাধারণতঃ উপবৃত্ত, যদিও স্থল-বিশেষে উহা বৃত্তাকার প্রাপ্ত হইতে পারে। নীল বোহর ও সোমারফিল্ডের এই ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান যুগে বর্ণছত্রবিজ্ঞান (spectroscopy) নামক পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্ণছত্রবাদে অনেক আবশ্যকীয় প্রশ্নের সমাধান নীল বোহর এবং সোমারফিল্ডের পরমাণু-প্রতিকৃতি সম্ভব করিয়াছে বটে, কিন্তু ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই বর্ণছত্রঘটিতই কতকগুলি সমস্যা আবার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিপ্লবের সূচনা করে; অবশ্য বিপ্লব পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিবার পূর্ব্বেই উহার সহজ মীমাংসা হইয়া গেল। মীমাংসা করিলেন হাইজেনবার্গ, দে ব্রগ্‌লি ও শ্রোডিঙ্গার-এর নূতন "তরঙ্গগতিবিজ্ঞান" (Wave Mechanics)। এই পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী গতিশীল বিদ্যুতিকাকে আমরা কণা বা তরঙ্গসমষ্টি উভয় প্রকারেই চিন্তা করিতে পারি; প্রকৃতপক্ষে একটি গতিশীল বিদ্যুতিকার কোনও এক মুহূর্ত্তে নিশ্চিত স্থান কোথায়, তাহা আমরা সঠিকরূপে বলিতে পারিনা। এইভাবে নববিজ্ঞানে "অনিশ্চয়তাবাদ" (Principle of Indeterminacy) গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। অপরপক্ষে শক্তিকণাবাদ প্রবর্ত্তনের পর শক্তি-কণার গতিবিধি-বিষয়ক পদার্থবিদ্যার আর একটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আমরা "শক্তিকণা-গতিবিধি" (Quantum Mechanics) আখ্যা দিতে পারি। পদার্থবিজ্ঞানের এই শাখায় আমরা জানিতে পারি যে, শক্তিকণাগুলিকে ব্যষ্টিগত ভাবে দেখিলে আমরা কণা ব্যতীত অন্য কিছু পাইনা; কিন্তু উহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে দেখিলে আমরা তরঙ্গ পাইতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদিও মধ্যযুগের তরঙ্গবাদ নবযুগে প্রায় বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল, তথাপি শেষ মুহূর্ত্তে উহা রক্ষা পাইয়া গেল। বিদ্যুতিকা, তরঙ্গ ও শক্তিকণা—ইহারা যেন একই সত্তার বিভিন্ন রূপ, যদিও অবশ্য ইহার কোনও যান্ত্রপ্রতিকৃতি আমরা অন্বেষণ করিয়া পাই না। কিন্তু এই যান্ত্রপ্রতিকৃতির অভাব ঘটিলেও, গণিত বলিতেছে যে উহারা মূলতঃ এক;—সুতরাং তথাস্তু; গণিতের জয়! এই জন্যই বোধ হয় সার জেমস্ জীনস্ বলিয়াছেন—"Nature herself seems to be an efficient pure Mathematician."

অর্থাৎ—বর্ত্তমান বিজ্ঞানপ্রগতিদৃষ্টে মনে হয় যে, প্রকৃতি-দেবী বুঝি বাস্তবিকই গণিতশাস্ত্রের পারদর্শিনী।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলোকে তরঙ্গবাদের বিরুদ্ধে শক্তিকণাবাদ যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাকে আইনষ্টাইনের "আপেক্ষিকতাবাদ" (Theory of Relativity) জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। তরঙ্গবাদে 'ঈথর' একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কল্পনা; ইহার ব্যতিরেকে তরঙ্গবাদ মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময় দেখা গেল যে, এই উপায়ে উহা কোনও মতেই প্রমাণিত হয় না। তরঙ্গবাদে বিশ্বাসপরায়ণ পদার্থবিদ্ আবার সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। এই সমস্যার সমাধান করিলেন সর্ব্বপ্রথম এ, আইনষ্টাইন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাহার কল্পিত আপেক্ষিকতাবাদ দ্বারা। তিনি বলিলেন যে, দেশ ও কালের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে বস্তুতান্ত্রিকভাবে কিছুই নাই, উহারা কেবলমাত্র কল্পনা-প্রসূত। এই দেশ ও কাল পাত্রভেদে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়;—সুতরাং উহারা আপেক্ষিক। উপরন্তু আপেক্ষিক দেশ ও কালের মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, যাহার জন্য যে কোনও দিকে আলোকের গতি মাপা যাউক না কেন, উহা সর্ব্বদা একই মানদ্বারা প্রকাশিত হইবে। ঈথরের অস্তিত্ব প্রমাণ এই বিভিন্ন পরিক্ষেপে আলোকগতির হ্রাসবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদি আলোকগতির হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা আমরা ঈথরের অস্তিত্বসাধন করিতে অগ্রসর হই, তবে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী; অর্থাৎ আপেক্ষিকতা-বাদ বলে যে, ঈথরের অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কারণ তাহা সাধন করিবার জন্য যে অনাপেক্ষিকতা প্রয়োজন, তাহা আমাদিগের নাই। ঈথরের অস্তিত্বসাধন করিতে গিয়া যে মতবাদের উদ্ভব হইল, পরবর্ত্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উহার প্রয়োগ দ্রুতফলপ্রসূ হইয়াছে।

আইনষ্টাইনের পর রুশীয় বৈজ্ঞানিক মিন্‌কউইস্‌কি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যদিও দেশ ও কাল স্বতন্ত্রভাবে আপেক্ষিক, তথাপি তাহাদের সংযোগ অনপেক্ষ হইতে পারে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতানুযায়ী শূন্যে জড়-পদার্থ গতিশীল হইলেই ঋজুপথেই সঞ্চারিত হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত জড় অন্য কোনও জড়পদার্থের সন্নিহিত হইলে ঐ ঋজুপথ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। শূন্যে সঞ্চারিত জড়পথের এই বক্রতা নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণসিদ্ধও বটে, কিন্তু ঐ বক্রতার পরিমাণ গণনা করিলে আপেক্ষিকতাবাদের গণনা মাধ্যাকর্ষণের গণনার সহিত এক হয় না। এই বক্রতা মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, আপেক্ষিকতাবাদের গণনাই সূক্ষ্মতর। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদের যুগে নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ থাকে না। এই নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের উপর মধ্যযুগের পদার্থবিদ্যা গঠিত; নবযুগে সেই মাধ্যাকর্ষণের মূলে কুঠারাঘাত হইলে পদার্থ-বিদ্যার যে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

আপেক্ষিকতাবাদের আর একটি বিশেষ বক্তব্য হইতেছে জড়পদার্থ ও শক্তিপদার্থের সমানতা। পদার্থ-বিজ্ঞানের আরও কতকগুলি শাখায় এই দুই পদার্থের সামান্যের আভাষ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের নবযুগে এই জড় ও শক্তির সামান্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সূর্য্য ও অন্যান্য তারকা হইতে যে অসামান্য শক্তি বিকীর্ণ হয়, তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, শক্তিকণাবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ অবলম্বন করিয়া নবযুগের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা মধ্যযুগ হইতে ভিন্ন পথে চালিত হইয়াছে, এবং নবযুগের পদার্থবিজ্ঞান প্রধানতঃ শক্তিমূলক ও পরমাণুর সংগঠনমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য এ কথা বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই যে, মধ্যযুগের ভাবধারামাত্রই অলীক, এবং নবযুগের নবভাবধারায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যই যথাযথরূপে ব্যাখ্যাও হয়; কিন্তু তথাপি ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একটা বিরাট্ বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক তরী চালনা করিতেছি। এই বিপ্লবের অবসান হইয়া কোন্ বিশেষ দিকে কি প্রকার শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে—তাহা বিজ্ঞান-তরীর কর্ণধারও জানেন কি?

অশান্তির কাল মেঘ

(আন্তর্জাতিক রাজনীতি)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' বলিয়াছিলাম যে, জার্ম্মানীর মিউনিকে বসিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা যে চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহা আর একটা মহাসমরের কারণ হইবে। এত শীঘ্রই যে এই মহাসমর আসন্ন হইয়া পড়িবে, ইহা যেন কেহ ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ওরূপ একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

"আর যুদ্ধ নয়—শান্তি"
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সালে মিউনিকে ইংলণ্ড ও জার্ম্মান রাষ্ট্রের নায়ক চেম্বারলেন ও হিটলার এই চুক্তি করেন

আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, মিউনিকে মিঃ চেম্বারলেন, মঃ দালাদিয়ের, সিনর মুসোলিনী ও হের হিটলার এই চারি মহারথী মিলিয়া যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন হিটলার জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর ইউরোপের এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গারও আর তিনি প্রত্যাশী হইবেন না। হিটলারের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যের খুবই অভাব। তথাপি লোকে ভাবিয়াছিল, ভাবিয়া আশ্বস্তও হইয়াছিল, যে, হিটলারের ক্ষুধা এবার বুঝি প্রশমিত হইল। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের দেশে ফিরিলেন। নিন্দা, প্রশংসা দুই-ই তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিল। তাঁহারা খোদ হিটলারের সঙ্গে মোলাকাত করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের কথা সাধারণে মানিয়া লইতে তেমন আপত্তি করিল না। কিন্তু যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, পূর্ব্বাপর বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে মিউনিক চুক্তির অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। মিউনিক চুক্তির কথা প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করিতেছি। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল এক কলমের খোঁচায় দিয়া দেওয়া হয়। কোন্ নীতি অনুসারে ইহা করা হইল? জার্ম্মানীর প্রতিবেশী যে সব রাষ্ট্রে জার্ম্মাণ আছে তাহারা যদি জার্ম্মানীর সঙ্গে একীভূত হইতে চায় তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে আপোষ-আলোচনা করিয়াই ঐরূপ করা চলিবে। সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল লইয়া যেমন তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা হইল, অতঃপর এরূপ আর করা চলিবে না। ইউরোপের প্রধান চারিটি শক্তি মিলিয়া আপোষে সব মীমাংসা করিয়া লইবে। এই চারিটি শক্তি কে কে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন—ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানী। সোভিয়েট রুশিয়াকে কিন্তু ইহা হইতে বরাবর বাদই দেওয়া হইয়াছে।

মিউনিক চুক্তি সংঘটিত হইবার পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইহার ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এখন সে-সব পুরাণো হইয়া গিয়াছে। একটি কথা সাধারণে যেন তেমন ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। মিউনিকে হিটলার যতই 'সাধু' সাজিয়া থাকুন, আদতে কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার

উপর কর্ত্তৃত্ব করাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় পূরণের সুবিধা হইবে মিউনিক চুক্তিতে এইরূপ ভাবা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, যে নীতির দোহাই দিয়া সুদেতেন জার্ম্মাণদের আত্মকর্ত্তৃত্ব বা Self-determination দেওয়া হইয়াছে চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে সেই নীতিই ভঙ্গ করা হইয়াছে! ত্রিশ লক্ষ জার্ম্মানকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দিতে গিয়া এক কোটি চেকোশ্লোভাকের স্বাধীনতা বিপন্ন করা হইয়াছে! চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাভাবিক সুরক্ষিত সীমা জার্ম্মাণীর অধিকারে আসায় ইহার আর টুঁ শব্দটি করিবার উপায় রহিল না। হিটলার, জার্ম্মান জাতির আত্মকর্ত্তৃত্বের ধুয়া তুলিয়া ইহাই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ ও ফ্রান্স, পশ্চাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার মত একটি রাষ্ট্র বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া থাকিলে তাঁহার পক্ষে ভীষণ অসুবিধারই কথা।

কিন্তু মিউনিক চুক্তির পর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! অনেকে বলিয়াছেন, চেকোশ্লোভাকিয়া তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কি আভ্যন্তরিক, কি পররাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই হিটলারের নির্দ্দেশ মত তাহাকে চলিতে হইবে। ইতিমধ্যে এমন কি ব্যাপার ঘটিল যাহার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াকে একেবারে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া দিতে হইল? আসুন, আমরা ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

মিউনিক চুক্তির পর ইহার পাণ্ডারা, বিশেষ করিয়া মিঃ চেম্বারলেন, বলিতে লাগিলেন ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়াছে! বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই বুঝিতে পারিলেন, হিটলারের উদ্দেশ্য সরলমতি লোকদের যেরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ইহা আরও গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। জার্ম্মানীতে ইহুদী দলন পূর্ণোদ্যমে সুরু হইল, উপনিবেশের দাবিও সে জোর গলায় পেশ করিতে লাগিল। হিটলারের অন্তরঙ্গ বন্ধু মুসোলিনী। মুসোলিনীও ইটালীয়ানদের মুখ দিয়া দাবি জানাইল, ফরাসীর কতকগুলি উপনিবেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে! সরকারীভাবে আগেকার ১৯৩৫ সালের ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তি বাতিল বলিয়াও ঘোষণা করা হইল। ওদিকে আবার মুসোলিনী ও হিটলার স্পেনে বিদ্রোহী-ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ সম্ভব করিয়া দিতেছিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রনেতারা কেমন যেন হক্চকিয়া গেলেন। তাঁহারা মিউনিকে যে বিষম কার্য্য করিয়াছেন তাহারই প্রতিরোধের জন্য যেন নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রিটেনের কর্ম্মপদ্ধতিই বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু আর একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। মিউনিক চুক্তির সময় সোভিয়েট রুশিয়াকে একঘরে করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে প্রচারিত হইল, ইহার ইউক্রেণ প্রদেশ অধিকার করিবার

পোলাণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিব
কর্ণেল বেক

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব
সভাপতি—ডাঃ হাশা

জন্য জার্ম্মানী তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। আবার একথাও শুনা গেল, জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল তাহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে লোকের সত্যই মনে হইল জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ বুঝি আসন্ন। এই বিষয়ে রহস্য কিন্তু ইদানীং ষ্টালিন ভেদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে ভাবী সংঘর্ষের কথা তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদীরাই প্রচার করিয়াছে! এই বিষয়ে ব্রিটেনের দায়িত্ব যে খুব বেশী তাহাও তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে এই উভয় দেশের মধ্যে ইউক্রেন লই বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে খুবই অল্প!

ব্রিটেন ও ফ্রান্স অতঃপর খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ আর করিয়া দিল। তাহারা বোধ হয় মিউনিক চুক্তির অল্পকা পরেই বুঝিতে পারিয়াছিল, জার্ম্মানী ও ইটালীর শ ইহার ফলে বাড়িয়াই গিয়াছে। তাহাদের ক্ষুধার প্রশম হওয়া দূরে থাকুক, ইহা ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে। মু কিন্তু ইহাদের নেতৃবৃন্দ শান্তির কথাই আওড়াইতেছিলেন এই রাষ্ট্র দুইটি তাহাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগসূ স্থাপনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ব্রিটেনের রণসম্ভার বৃদ্ধি দ্রুত আয়োজনের কথা আপনাদিগকে আগে আ বলিয়াছি। গত ছয় মাসে ইহা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে তাহার এইরূপ আয়োজনের বহর দেখিয়া বার্লিন ও রোমে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ পাইতে থাকে। এখানকার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্রিটেন অমন করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইতেছে কেন? তাহার এই কার্য্য সম্বন্ধে অন্যত্রও আলোচনা সুরু হইয়াছিল, এখনও ইহার শেষ হয় নাই। ব্রিটিশের রণসম্ভার বৃদ্ধিতে জার্ম্মানী ও ইটালীর উদ্বেগ প্রকাশ পাইলেও ইউরোপের অন্যান্য স্থানের লোকেরা কিন্তু আশ্বস্তই হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের তরফে মিঃ আর, এস্, হাডসন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া বলিয়াছেন যে, সকলেই আজ ব্রিটিশের রণসম্ভারের খোঁজখবর লইতেছে। বাণিজ্য সম্পর্কে তাহারা এখন চিন্তা করিবারও অবসর পাইতেছে না। যখন তাহারা শুনিল যে, গত দুই তিন মাসে ব্রিটেনের অস্ত্রশস্ত্র আশাতীত রকম বাড়িয়া গিয়াছে তখন তাহারা উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, "ইহাই সকলের চেয়ে সুসংবাদ!" এই একটি কথা হইতেই ইউরোপবাসীর মনের অবস্থা আজ বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ মিঃ চেম্বারলেন

জেনারেল রুডল্ফ গয়দা
চেক ফ্যাসিষ্ট নেতা

মুখে যাহাই বলুন, অন্তরে অন্তরে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মিউনিক চুক্তির পর ইউরোপে শক্তির সমত (Balance of Power) রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে এইজন্য তথাকথিত শান্তির আবহাওয়ার মধ্যে ব্রিটেন তাহার রণশক্তি বাড়াইতে ঐরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

আমাদের আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রিটিশের রণসম্ভার-বৃদ্ধি যেমন জার্ম্মানী ও ইটালীর উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল, আর একটি ব্যাপারও তাহাদিগকে কম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই। আপনারা সকলেই জানেন, স্পেনের বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কো, জার্ম্মান ও ইটালীয়ান-বাহিনীর সাহায্যে স্পেনে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহার বিজয়-লাভের মুখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাকে স্পেনের কর্ণধার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইউরোপে শক্তি-সমতা রক্ষা করার জন্য স্পেনকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত রাখা আবশ্যক। ইটালীতে রব উঠিয়াছিল, ভূমধ্যসাগর তথা ইউরোপের সমস্যা সমাধানে অতঃপর স্পেনের সহযোগিতা আবশ্যক হইবে। তাহার কথা এখন আর কেহ না শুনিয়া পারিবে না। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহা চায় না। তাহাদের ইচ্ছা, স্পেন ইউরোপীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকুক। ইহাই যে স্পেনের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল একথাও তাহারা বলিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে একথাও শুনা গেল, ফ্রাঙ্কো স্পেন হইতে ইটালিয়ান-বাহিনী সরাইয়া লইতে মুসোলিনীকে অনুরোধ করিয়াছেন! মুসোলিনী সম্প্রতি বলিয়াছেন, ভূমধ্যসাগরে তিনি কয়েদী হইয়া থাকিবেন না! ব্রিটেন সম্প্রতিকার ইঙ্গ-ইটালী চুক্তিতে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তথাপি তিনি কেন এই কথা বলিতেছেন? তাঁহার লক্ষ্য নিশ্চয়ই স্পেন। স্পেন বেয়াড়া হইলে চলিবে না। ইহাকে তাঁহার চাই-ই। স্পেন যদি হাতছাড়া হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে সেখানে যেসব ইটালিয়ান সৈন্য মোতায়েন আছে তাহাদের দ্বারা ফ্রাঙ্কোকে সহজেই স্বমতে আনয়ন করা যাইবে। তিনি কি এই জন্যই স্পেন হইতে এখনও সৈন্য সরাইয়া লন নাই?

যাহা হউক, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ব্রিটেনের রণশক্তি বৃদ্ধি ও উভয়ের একযোগে ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার হিটলার মুসোলিনীকে নিতান্তই ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। মুসোলিনী নিজ দাবী জানাইয়া গরম গরম বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, হিটলার কিন্তু অন্য ভাবে নিজ শক্তি পরখ করিয়া দেখিতে সুরু করিলেন। হিটলার ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা দুইটি বিষয় নিরীক্ষণ করিলেন। প্রথমতঃ ব্রিটেনের রণশক্তি বৃদ্ধিতে মধ্য ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আবার আত্মপ্রত্যয় যেন ফিরিয়া আসিতেছে। মিউনিক চুক্তির ফলে তিনি যেমন ও-অঞ্চলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে চলিয়াছিলেন, ব্রিটিশের শক্তি-বৃদ্ধিতে এখন যেন তাঁহার সম্ভ্রমহানিই ঘটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটেন ইউরোপে পুনরায় শক্তি-সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই জার্ম্মানীর পথে সত্যকার বিঘ্ন যদি কেহ ঘটায় তো ঘটাইবে এই ব্রিটেনই। তাই এমন কিছু চট্ করিয়া করা দরকার যাহা ব্রিটেনের এই উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিতে সক্ষম হইবে।

উপায়ও শীঘ্রই জুটিল। অঙ্গহানি হওয়ায় চেকোশ্লোভাকিয়া তাহার স্বাভাবিক সুরক্ষিত সীমা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। জার্ম্মানী যখন-তখন তাহাকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিতে পারে। জার্ম্মানীর নির্দ্দেশে সে চলিতে বাধ্য। মিউনিক চুক্তি ও হিটলারের ভাষ্য হইতে বিশ্ববাসী এই ধারণা করিয়া লইয়াছিল যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, যদিও তাহাকে জার্ম্মানীর অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। হিটলারের অভিপ্রায় মতই শাসন কার্য্যে সংস্কার সাধিত হয়। শ্লোভাক ও রুথেনরা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে। মাঝে মাঝে সংবাদ আসিত, চেক্‌রাষ্ট্রের উপর হিটলারের দাবি-দাওয়া ক্রমশঃ এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, ইহার পক্ষে তাহা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সে যেন কিঞ্চিৎ বাঁকিয়াও দাঁড়াইতেছে, এরূপ ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব বিলোপ এত শীঘ্র সংঘটিত হইবে ইহা কেহ হয়ত বুঝিতে পারেন নাই। হিটলার কর্তৃক প্রথমে শ্লোভাক ও রুথেনদের চেক্‌রাষ্ট্র হইতে মুক্তি দান, এবং পরে চেক রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিয়া বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশে নিজ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শ্লোভাকিয়াকে আবার নিজের পক্ষপুটে আনয়ন—এসব নাটকীয় ভঙ্গীতে এত শীঘ্র ঘটিয়া গেল যে, সমগ্র বিশ্বই একেবারে বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে! চারিদিকে ধিক্কার ধ্বনি উঠিল। ইহার দুই দিন পূর্ব্বেও চেম্বারলেন ব্রিটিশ শক্তির বড়াই করিয়া বলিয়াছিলেন, জগতে এখন আর কেহ শান্তির ভিত্তিমূলে আঘাত করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এ কি হইল? সকলে তাঁহার নিকট নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিল।

গয়দা: চেকরাষ্ট্রের নূতন ফারহার বলিয়া ইনি ঘোষিত হইয়াছেন। বার্লিনস্থ লিথুনিয়ার রাজদূত (সর্ব্ব বামে) চুক্তি সহি করিতেছেন। এই চুক্তিতে মেমেলকে জার্ম্মাণীর অধীনে হস্তান্তরিত করা হয়। সর্ব্বদক্ষিণে জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র সচিব হার বন রিবেন ট্রপ।

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার মধ্যেই এই সব প্রশ্নের জবাব কিছু কিছু মিলিবে। তথাপি বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান জগতে প্রত্যেক বড় রাষ্ট্রই অন্য কোন বড় রাষ্ট্রকে ভাবী শত্রু (potential enemy) হিসাবে সম্মুখে রাখিয়া নিজ শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে, এই আশঙ্কায় যে, একটির সঙ্গে অন্যটির যে কোন মুহূর্ত্তে লড়াই বাধিয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে জাপানের এইরূপ

ভাবী শত্রু সোভিয়েট রুশিয়া, ইটালীর ফ্রান্স আর জার্ম্মানীর ব্রিটেন। শেষোক্ত বিষয়ে হয়ত কেহ কেহ আপত্তি করিবেন। কিন্তু আগে আপত্তি করিবার যদি-বা কারণ ছিল, এখন আর কোন কারণই নাই। দুর্ব্বল জার্ম্মানীকে ব্রিটেন নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। কিন্তু যখনই দেখা যাইবে তাহার শক্তি এতটা বাড়িয়া গিয়াছে যে, ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই সে বাঁকিয়া বসিবে। পূর্ব্বে ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দী, বর্ত্তমান শতাব্দীতে জার্ম্মানী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই প্রধানতঃ গত মহাসমর বাধিয়া গিয়াছিল। আবার যদি

হিটলার

কখনও যুদ্ধ বাধে তাহা হইলেও এই কারণেই বাধিবে। ইউরোপে দুইটি সমান প্রবল বা প্রধান শক্তি এ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। মিউনিক চুক্তির পর ইউরোপে শক্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটেন যে-সব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার মধ্যেই জার্ম্মানী নিজ শক্তিহানির আশঙ্কা করিয়াছে। এই আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্যই হিটলারের অন্য সকলের অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস! এই ব্যাপারে শুধু ইউরোপ নহে, জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে প্রায় এক মাস পূর্ব্বে, এর পরিণাম, যতই দিন যাইতেছে ততই ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছে।

একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখি। গত এক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মণীর সীমানা যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহার জনবল ও অস্ত্রবলও সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সর্ব্বশেষে মেমেল এখন জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহার লোক সংখ্যা এখন হইয়াছে প্রায় দশ কোটি! চেকোশ্লোভাকিয়া একটি ছোট দেশ হইলেও অস্ত্রশস্ত্রে যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এই সবই এখন জার্ম্মাণীর অধিকারে আসিয়াছে! দুই লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য, হাজার খানা প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ বিমানপোত, প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র ও এই সব নির্ম্মাণের কারখানা আর অগণিত ধনসম্পদ—একরকম নিখরচায় পাইয়া যাওয়া কি কম সুবিধা ও কৃতিত্বের কথা!

মুসোলিনী

হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস ছোট রাষ্ট্রগুলির প্রাণে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় রাষ্ট্রগুলিও ইহাতে কম চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। ব্রিটেন কেন চঞ্চল হইয়াছে তাহার একটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করিয়াছি। এখন জার্ম্মানীকে যদি এইরূপ প্রবল হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদেরও বিপদ উপস্থিত হইবে খুবই। আবার এখনও ইটালী, জার্ম্মানী এক যোগেই হাতে হাত মিলাইয়া চলিয়াছে। কাজেই এখন ছোট বড় সকল রাষ্ট্রই হিট্‌লারকে বাধা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে ব্রিটেন। সম্প্রতি হিটলার

ব্রিটেনকে শ্লেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, এতকাল অপকর্ম্ম করিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে তাহার ধার্ম্মিক হইবার সাধ হইয়াছে। ঐতিহাসিক এ কথার মধ্যে ঢের সত্য পাইবেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু রাজনীতি বর্ত্তমান লইয়াই কারবার করে। বর্ত্তমানে যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহার দিকেই আপনি ঝুঁকিয়া পড়িবেন। সে অতীতে কি কি অকর্ম্ম করিয়াছে, তারার হিসাব নিকাশ লইবার আপনার অবকাশ নাই। এজন্য গত মহাযুদ্ধে ব্রিটেন দুর্ব্বল জাতিদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল, ভবিষ্যতেও ইহা লাভ করিবে। জার্ম্মানী আজ দুর্ব্বলকে গ্রাস করিতে ব্যস্ত, দুর্ব্বল কেহ কি তাহার মুখে আগাইয়া যাইতে চাহিবে? গত মহযুদ্ধে ব্রিটেন নিজ স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ভাবী মহাসমরেও যে সে ইহা না করিবে তাহা নয়। তথাপি দুর্ব্বলেরা তাহার দিকেই ছুটিবে। কারণ তাহাদের যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে তবে সে একমাত্র ব্রিটেনই। ব্রিটেনের ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, প্রচার ও কার্য্য সকলই একযোগে যেন ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকে।

হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর ব্রিটেনের মনোভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে মনে হয়। পার্লামেন্টে ও অন্যত্র ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অতঃপর কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে ব্রিটেন তাহার পক্ষ লইয়া লড়িতে পশ্চাৎপদ হইবে না। তিনি কিন্তু তাঁহার বড় সাধের মিউনিক চুক্তির কথা ভুলিতে পারেন নাই। আপোষ-আলোচনা দ্বারা জার্ম্মান জাতিকে এক জার্ম্মান-রাষ্ট্রভুক্ত করিতে দিতে তাঁহারা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার একটি স্বতন্ত্র জাতির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিবেন, ইহা তাঁহাদের কল্পনায়ও আসে নাই। কিন্তু এখন তাহাই হইল। হিটলার চেকদের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। চেম্বারলেনের বক্তৃতায় সকলে যেন আবার আশ্বস্ত হইল। চারিদিকে লেখালেখি সুরু হইল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলি ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য উপায় খুঁজিতে লাগিল। যখন এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল তাহার মধ্যেই হিটলার মেমেল অধিকার করিয়া লইলেন! মেমেল পূর্ব্বে জার্ম্মানীরই অঙ্গ ছিল। গত মহাসমরের পর ইহা আলাদা করিয়া দেওয়া হয়। পরে লিথুয়ানিয়া ইহাকে আত্মসাৎ করে। ঠিক এই সময়েই আর একটি কার্য্য সম্পাদিত হইল যাহা লইয়া খুবই বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। এ কার্য্যটি হইল মধ্য ইউরোপের ছোট রাষ্ট্র রুমানিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণীর ব্যবসা-বিষয়ক চুক্তি! ইহার আগে কিন্তু গুজব রটিয়াছিল, হিটলার রুমানিয়াকেও একখানা চরমপত্র দিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম

আলবিনিয়ার পার্ব্বত্য সীমান্তের একটি পরিবার

এই যে, তাঁহার কথায় রাজী না হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার মত ইহাকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবেন! উভয়ের ভিতরকার চুক্তির সর্ত্তগুলি প্রকাশিত হইলে গুজব নিরসন হইল বটে, কিন্তু বুঝা গেল ব্যবসাচ্ছলে রুমানিয়ায় বিশেষ অধিকার স্থাপনে হিটলার অগ্রসর হইয়াছেন। যে রাষ্ট্রগুলি হিটলারের হঠকারিতায় ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে কাল কাটাইতেছে তাহাদের কেহ কেহ স্বাধীনভাবে হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করিয়া বসিবে—ইহা যেন কেমন ঠেকিতে লাগিল। ব্রিটেন একদল ব্যবসায়ীকে বার্লিনে পাঠাইবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু হিটলারের অপকর্ম্মের দরুণ তাহা আর পাঠায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, শুধু রুমানিয়া কেন, অন্য অনেক রাষ্ট্র ব্রিটিশের সদিচ্ছার

উপর আর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। এই জন্য ইতিপূর্ব্বে তাহারা হিটলারের দুয়ারেই বার বার ধর্ণা দিয়াছে। জার্ম্মাণী ও রুমানিয়ার মধ্যে এই চুক্তি তাহারই জের বলিতে হইবে।

তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির উপর ডিক্টেটর-রাষ্ট্রগুলির এই সুবিধা যে, তাহারা চট্ করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া ফেলিতে পারে। নেতা বা ডিক্টেটরই সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, কোন প্রতিনিধি-সভা মারফৎ সাধারণের মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা তাহাদের নাই। সম্প্রতি কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স এমন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে যাহাতে ডিক্টেটরদের হঠকারিতায় চট্‌পট্ বাধা দিতে পারে। ফরাসী পার্লামেন্ট মন্ত্রী-সভাকে দেশের আর্থিক ও সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা দান করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "Full Powers Bill" বা 'সর্ব্বশক্তি প্রদায়ী আইন'। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে আলাপ আলোচনার অপেক্ষা না করিয়াই চট্‌পট্ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকেও এজন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইয়াছে। হিটলারের হঠকারিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কম চাঞ্চল্য দেখা দেয় নাই। সেখানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মর্ম্মে একটি আইন পাশ করা হইয়াছিল যে, ইউরোপে বা অন্যত্র যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে সে নিরপেক্ষ থাকিবে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকান কংগ্রেসে ইহার সংশোধনমূলক আইন পাশ করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য— ইউরোপে মহাসমর বাধিলে যাহাতে অবিলম্বে ডিমোক্রাসি-গুলিকে সাহায্য করা সম্ভবপর হয়।

আলবিনিয়ার
পলাতক রাজা জগ

ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের পর যখন ইউরোপে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তখন রটনা করা হইল, ভাবী সমরে পোল্যাণ্ড নিরপক্ষ থাকিবে। ইহা কিন্তু পোল্যাণ্ডের কথা মোটেই নয়। এখন বুঝা গিয়াছে, স্বার্থপর লোকেরাই এইরূপ রটাইয়াছে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সীমান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে অনাচার যেন লাগিয়াই আছে। তথাপি পোল্যাণ্ডকে এত শীঘ্র জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, ইহা কেহ বুঝেন নাই। ইদানীং সেখানে জার্ম্মানীর তরফে এই প্রস্তাব গিয়াছে যে, ডানজিগ অঞ্চল তাহাকে দিয়া দিতে হইবে। এই অঞ্চল জার্ম্মানী লইতে পারিলে প্রুশিয়া ও মেমেল পর্য্যন্ত এক লপ্তে হইবে। পোল্যাণ্ড এই ভাবে তিন দিকেরও বেশী জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ঘেরাও হইয়া পড়িবে, তাহার জার্ম্মান সাগরে বাহির হইবার পথও আর থাকিবে না। পোল্যাণ্ড জার্ম্মানীকে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে যে, ডানজিগের উপর কোন হস্তক্ষেপ যেন সে না করে। যদি হস্তক্ষেপ করে তবে ইহা তাহার স্বাধীনতার উপরই হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে। পোল্যাণ্ড খুব বড় রাষ্ট্র না হইলেও নিতান্ত ছোটও নয়। তাহার লোক সংখ্যা তিন কোটীর কিছু উপর। সৈন্য সামন্ত তাহারও কম নয়। তথাপি জার্ম্মানীর তুলনায় ইহা খুবই কম বলিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে জার্ম্মানীকে ঐরূপ জবাব দিয়া সে কি ভাল কাজ করিয়াছে? তাহার অখণ্ডতা দূরে থাকুক, তাহার স্বাধীনতাও কি বিপন্ন হইবে না?

ইহার জবাবেও ব্রিটেনের বর্ত্তমান মতিগতির কথাই আসিয়া পড়ে। আজ কয়েক বৎসর পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের সঙ্গে একটি আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু ফ্রান্সের উপর তো সে আর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। চেকোশ্লোভাকিয়াও তো ফ্রান্সের সঙ্গে এইরূপ চুক্তিতেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু বিপৎ কালে তাহার সাহায্য সে পাইল না। পোল্যাণ্ড তাই ফ্রান্সের বর্ত্তমান 'মেণ্টর' ব্রিটেনের দিকেই ছুটিয়াছে। আর পোল্যাণ্ডকে রক্ষায় তাহার কি স্বার্থ আগেই আপনারা তাহা অনেকটা জানিতে পারিয়াছেন। ইউরোপে শক্তি-সমতা রক্ষা করিতে হইলে আজ পোল্যাণ্ডকে বাঁচাইতেই হইবে। মিঃ চেম্বারলেন বিলাতের হাউস্ অফ্ কমন্সে ও লর্ড হালিফাক্স হাউস্ অফ্ লর্ডসে স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ড

আক্রান্ত হইলে সে যদি আত্মরক্ষার জন্ত লড়িতে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ব্রিটেন তাহাকে সকল শক্তি দিয়া সাহায্য করিবে। ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে তাঁহারা লড়িবেন—একথাও জোর গলায় বলিয়াছেন। পার্লামেন্টের সকল দল—শ্রমিক, উদারনৈতিক, রক্ষণশীল সকলেই একবাক্যে এই কথায় সম্মতি জানাইয়াছেন। এই কার্য্যে সোভিয়েট রুশিয়াকেও সঙ্গে লইতে হইবে — সকলেই এ বিষয়ে একমত। সম্প্রতি পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব কর্ণেল জোসেফ বেক লণ্ডনে গিয়াছিলেন ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনা করিবার জন্ত। এই আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

জার্ম্মানীতে কিন্তু ইতিমধ্যেই রব উঠিয়াছে, তাহাকে ঘেরাও করিয়া পিষিয়া মারিতে ব্রিটেন মতলব করিয়াছে। কাজেই আর সময় নাই, যাহা হয়, হেস্তনেস্ত এখনই করিয়া ফেলা হউক। মুসোলিনী ওদিকে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, ইটালী বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছে, এখন আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। তাহার দাবীদাওয়া এখনই মিটাইয়া দিতে হইবে। ইউরোপের আকাশ যেন ঘনকাল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এখন হিট্‌লারের সঙ্গে মুসোলিনীও শক্তির মহড়া দিতেছেন। ফ্রান্সের কয়েকটি জায়গা দাবি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সম্প্রতি সৈন্য ও রণতরী পাঠাইয়া এক হুমকীতে ক্ষুদ্র মুসলমান-রাষ্ট্র আলবানিয়াও অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। আলবানিয়ার উপর ইটালী কর্তৃত্ব করিতেছে অনেকদিন যাবৎ। তাহার স্বার্থ এখানে এত অধিক যে, সাধারণের ধারণা হইয়াছিল, বাহিরে স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এটী ইটালীরই তাঁবেদারীভুক্ত রাষ্ট্র। ইটালী কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার সামান্য পরিমাণ স্বাধীন অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চাহে না।

হিটলার যেমন রাজনৈতিক কারণে চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছেন, মুসোলিনীও সেইরূপ আলবানিয়া অধিকার করিয়া লইলেন! বস্তুতঃ এখানে ঘাঁটি আগলাইতে পারিলে যাহারা ইটালী ও জার্ম্মানীকে ঘেরাও করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে, তাহাদের কার্য্য পণ্ড করিয়া দেওয়া যাইবে। এখান হইতে যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া,

আলবানিয়ার অবস্থিতি
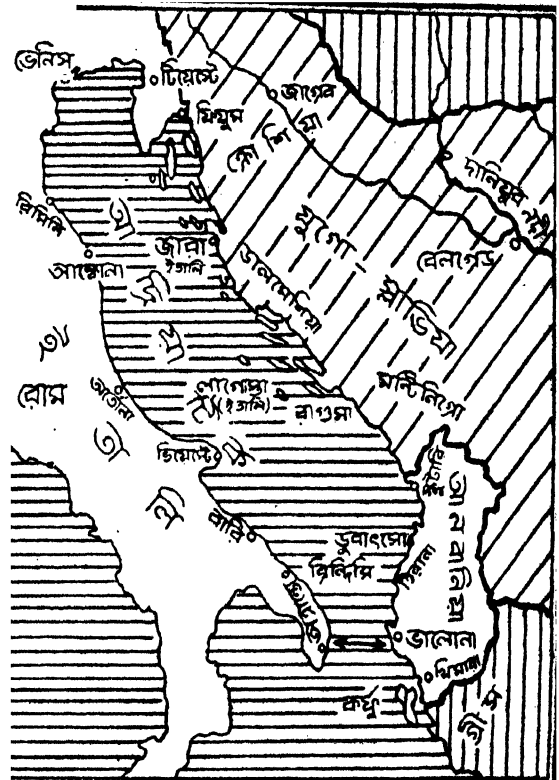
বুলগেরিয়া ও তুরস্ককে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখা যাইবে। আবার পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরেও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা চলিবে। চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের বেলায় যেমন, এবারেও তেমনি ডিমোক্রাসিগুলি সলাপরামর্শই করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের এ পরামর্শ শেষ হইতে না হইতে হয়তো মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনী আরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া না বসেন !

জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমতিলাল রায়

["জীবন-সঙ্গিনীর" প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনুরোধে পূজনীয় লেখক ইহার দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্ঘ-পূর্ব্ব পারিবারিক ও সাধন-জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে; এই খণ্ডে ততোধিক রোমাঞ্চকর ও নিগূঢ় জীবনাধ্যায়—সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীঅরবিন্দ-সংযোগে অধ্যাত্ম-সাধন পর্ব্ব বিশদভাবে আলোচিত হইবে। শুধু ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘজীবনই নহে, বাঙালা ও ভারতের জাতীয় ইতিহাসের সহিত এই অধ্যায়ের নিবিড় সম্পর্ক বর্ত্তমান—তাই জাতীয় সাধনার আলোকে ইহার মর্ম্ম বুঝিবার ও বুঝাইবার ইচ্ছা ও কৌতূহল আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আশা করি, "প্রবর্ত্তকের" পাঠক পাঠিকাদের কাছে "জীবন-সঙ্গিনী" প্রকাশের আমাদের এই কৈফিয়ৎটুকুই যথেষ্ট—প্রবর্ত্তক পরিচালক।]

যাহা কোন দিন ভাবি নাই, তাহাই হইল। আমার ভাগ্যে চিরদিন এইরূপ হইয়াছে, আজও হয়। আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি—মানুষ স্বেচ্ছাধীন নহে। সে যাহা চায়, তাহা যখন ঘটে, নিজেকে খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হয়—নিজেকে নিজের নিয়ন্তা মনে করিয়া। অহঙ্কার বড় হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থায় বুদ্ধিশক্তি ও অহমিকা কোথায় তলাইয়া যায়, তখন আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সীমাহীন সংসার-সমুদ্রে নিরুপায় আরোহী কর্ণধারের দিকেই চাহিয়া বলে—তুমিই পারের কর্ত্তা। মাথা নত হয়, চক্ষে তখনই অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। অকস্মাৎ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমার এই অবস্থাই হইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ভাবি নাই যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ত্রীকে লইয়া আমায় এমনভাবে নিরাশ্রয় হইতে হইবে। অলক্ষ্যে ভাগ্যবিধাতা এত বড় ঘটনার যে সূচনা করিতেছিলেন, তাহা কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। বরং দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, আমি নিঃসন্তান হইলেও, অগ্রজের সংসারটীকে গুছাইয়া তুলিব। সে ইচ্ছা চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হইল। অক্ষয়া তৃতীয়ায় গৃহ-লক্ষ্মীর ব্রতপূর্ত্তি যে আশীর্ব্বাদ নামাইয়া আনিল, আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইলাম। আমাকে অগ্রজের সহিত যুক্ত পরিবার হইতে স্বতন্ত্রই হইতে হইল।

রাত্রে নিদ্রা হইল না। সে যে কি দুর্ভাবনা, তাহা বলিয়া বুঝান যাইবে না। সে দিনের কথা ভাবিয়া আজ হাসিয়া আকুল হই; কিন্তু সে দিন এই দুটী প্রাণীর অন্ন-সংস্থানের দুশ্চিন্তায় আমি যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। 'তিনি' আমার অবস্থা দেখিয়া বার বার বলিয়াছেন, "রাগের মাথায় যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাই যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, এমন কথা মনে করিয়া দুঃখ করিও না। কাল সকালেই আবার যেমন ছিলে, তেমনই হইবে। ভাশুরও তোমায় ছাড়িবেন না। তুমি ঘুমাও, ভাবিও না।"

তিনি যত সান্ত্বনা দেন, যত আশা দেন, সে দিন কিন্তু মন আর কিছুই মানিতে চাহে নাই। বহু বার অনেক কিছু হইয়াছে, তাহাই চরম হইয়া থাকে নাই; ঘটনার সংঘাতে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আবার পূর্ব্ব ক্ষেত্রে ফিরিতে হইয়াছে। অদ্যকার ঘটনারও যে সেইরূপ পরিণতি হইবে না, এমন ধারণা মনে দৃঢ় হইতেছিল না। কিন্তু কে যেন অন্তর-বীণায় আঘাত দিয়া বার বার ফুকারিয়া বলে—'আর তোমার ফেরা হইবে না, আজি হইতে যাত্রা তোমার নূতন পথে।' এই সঙ্গীত হৃদয় শীতল করে না, সেখানে জ্বালা সৃষ্টিই করে। প্রথমেই মনে হয়—নূতন সংসার দুই জন প্রাণী লইয়া হইলেও, তাহার জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ, তাহা আমি কোথা হইতে পাইব? দ্বিতীয় চিন্তা—শ্রীঅরবিন্দের। পণ্ডিচারী উপস্থিত হইয়া তিনি কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। দুই বৎসর তাহাতেই চলিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অভাবের পাষাণ-ঘর্ষণে কি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি মাসে আশী টাকা হইলেই তিনি দিন চালাইয়া লইবেন, এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসরের প্রথম তিন মাস কোনরূপে চলিয়াছিল। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় [illegible] আমার স্ত্রী

হইয়াছিল। তাহার উপর নিজেই বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। দুর্ভাবনার মাত্রা এই জন্য অনেকখানি বাড়িয়া উঠিল। দুর্ব্বুদ্ধি তখনও দূর হয় নাই। তাহার উপর আবার দাদার সংসারটীর ভবিষ্যচ্চিন্তায় আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়িতেছিল। অগ্রজের আশ্রয়ে আমার জীবন-যাত্রা নিরাপদ্ ছিল বটে; কিন্তু আমার অভাবে এই সংসারটী যে অচল হইয়া পড়িবে, এই বিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। আপনার জনের প্রতি মমতার দৃঢ় শৃঙ্খল বিধাতা সে দিন হাতুড়ির আঘাত দিয়া ভাঙ্গিতেছিলেন, আমি তাহা বুঝি নাই। বৌদিদির দুর্ব্যবহার হেতু অগ্রজের প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে এবং তাহাতে পিতৃকুল উৎসন্ন যাইবে, আমি কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব—এইরূপ অন্তর-দ্বন্দ্বে হৃদয় আমার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাল যে কাণ্ড হইয়াছে, আজ হঠাৎ সংসারের কাজে নামিলে টিট্‌কারী কম হইবে না। আমার দুঃখের চেয়ে তোমার প্রতি সকলের যে অনাস্থা হইবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। এখন কি করিব, তুমিই বলিয়া দাও।"

আমি অসহায়ের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ক্লান্তির কালিমায় মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে। আমার দুশ্চিন্তার গুরুভার যেন তিনি সারারাত্রি গ্রহণ করার চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কাল যে গর্ব্বে ও আনন্দে ব্রতপূজার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছেন, কাল অন্নপূর্ণার বিজয়িনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষে যে উৎসাহের আলো তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এই এত বড় বাস্তব ঘটনাটা এক রাত্রের মধ্যেই স্বপ্নের মত মিথ্যায় পরিণত হইবে, এই কথা ভাবিয়া লজ্জায় আমার চক্ষু নত হইল। তিনি বলিলেন "আমি জানি—তুমি তেমন শক্ত মানুষ নও। রাগের মাথায় এমন কাণ্ড করিয়া ফেল—তাল সামলাইতে আমার প্রাণ যায়। সংসারের কাজে এখনই গিয়া লাগিতে হইবে। কিন্তু আবার যদি তোমার মন বিগড়ায়, সে কেলেঙ্কারী আমার সহ্য হইবে না। ঠিক করিয়া বল—আমি কি করিব?"

কল্যকার অত বড় ঘটনা আমরা দুটি প্রাণী যত বড় করিয়া লইয়াছি, সংসারে কেহই উহা তেমন আমলে আনে নাই। ছোট-বৌয়ের ঘর হইতে বাহির হওয়ার বিলম্ব দেখিয়া, পরিবারের অন্যান্য লোকেরা যথারীতি তাঁর প্রতি শ্লেষবাক্যই প্রয়োগ করিতেছিল! 'তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংসারের কাজ কে করিবে' বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে নানা জনে নানা প্রশ্ন করিতেছিল। তিনি আমার দিকে সজল নয়নে চাহিয়া কাকুতি-বাক্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন "কি করিব, ঠিক করিয়া বল?" তিনি অতিশয় সুখের সময়ে এবং অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইলে প্রায়ই ব্যঙ্গ-শ্লোক উচ্চারণ করিতেন—"মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ্ পর্য্যন্ত"। এক্ষেত্রেও তাই হইবে কি না, জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৌদিদির সদর্প কণ্ঠ পরিশ্রুত হইল—কর্ণে নিষ্ঠুর বজ্রের মত উহা বিঁধিল। তিনি বলিতেছিলেন, "কাল তো খুব গৃহিণীপণা করিয়া, আড়ম্বরে রাঁধিয়া খাওয়া-দাওয়া হইল। জিনিষ-পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে—আজ চলুক না, কতটা বাহাদুরী দেখা যাক্!"

বিস্ফারিত, সজল, সমুজ্জ্বল দৃষ্টি—নির্ব্বাক্ প্রতিমা, যেন চাবুক মারিয়া বলিতেছিল—"এত অপদার্থ তুমি, তুমি কি পুরুষ নহ? তোমার শ্রমের কি মূল্য নাই? তোমার আশ্রয়ে আমি কি সত্যই অসহায়া?" আমার বুকে শিবের বিষাণ গর্জ্জন তুলিল। আমি বলিলাম, "আজ তোমায় নিশ্চয় বলি, আর আমি ফিরিব না। বাহির হইতেছি; দুইজন হইলেও, অর্থের প্রয়োজন—দেখি কি ব্যবস্থা করিতে পারি।" তিনি আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "এখনই অর্থের জন্য তোমায় বীরত্ব দেখাইতে হইবে না। ইহার জন্য স্থির হইয়া পরামর্শ করিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "অদ্যই যে আমাদের অন্নচিন্তা চমৎকার, আজিকার ব্যবস্থাই বা কি হইবে?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভোলানাথের সংসার কিনা, আমায় একটু ভাবিতে হয়! যদি তোমার স্বতন্ত্র সংসারই করিতে হয়, দুই তিন দিন না ভাবলেও চলিবে। তবে একটা কিছু স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কথা ঠিক তো?"

আমি তাঁহার পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিলাম "অন্তর্য্যামী বলিতেছেন, আর ফেরা হইবে না।"

তিনি আজ একাশ্রয়ী হইয়া, একজনের মুখ চাহিয়া ঘর হইতে অতিশয় দর্পের সহিত বাহির হইলেন। মুক্তির দীপ্তি তাঁর বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বাঁধন সহজে টুটে না। প্রতিদিন দাদা আসিয়া ডাকিতেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই—কোন কারণে আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইব। তিনি এ বিষয়ে অসম্ভব রকমেই উদাসীন ছিলেন। আমাদের প্রতি অত্যাচারটা কতখানি হইতেছে এবং তাহা যে আমাদের সহিষ্ণুতার সীমা ক্রমেই ছাড়াইয়া উঠিতেছে, আমরা যে আজ মুক্তির জন্য বন্ধনগ্রন্থি একেবারেই শিথিল করিয়া ফেলিয়াছি, ইহা তিনি আমলেই আনিতে চাহেন না। কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে, ছোট-বৌমা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন—এমনই অভিযোগ মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া তিনি আমায় পূর্ব্বের মতই পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে এড়াইয়াই চলিলাম। এই ভাবে তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর, বিষয়টা পিতৃদেবের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। তিনি বর্ত্তমান থাকিতে ছোট-বৌয়ের প্ররোচনায় আমি এই সংসারে স্বতন্ত্র হাঁড়ী কাড়িয়াছি, এই তথ্য জানিতে পারিয়া, তিনি হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। আমায় ডাকিয়া সকল কথা শুনিলেন। তারপর মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে, মেয়ে-মানুষের কাণ-ভাঙ্গানী শুনিবে, এমন ধারণা আমার ছিল না। আমি স্রেফ্ বলিয়া দিতেছি—যদি সংসার ভাঙ্গার ইচ্ছাই থাকে, এখনও আমি বাঁচিয়া আছি, এ বাড়ী আমার, তুমি আমার ত্যজ্য-পুত্র হইবে।"

কথাটা খুব গুরুতর বটে; কিন্তু প্রথমটা প্রাণে কোন আঘাত বাজিল না। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। পিতার উচ্চ বাক্য পত্নীর কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তিনি বলিলেন "এইবার জব্দ হবে তুমি। আমি কিন্তু আর কালি-মুখ লইয়া সংসারে ফিরিব না।"

আমি বলিলাম, "বাবার রাগ খড়ের আগুনের ন্যায়—দপ্ করিয়া জ্বলে, উহা আবার নিভিয়া যাইবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। ফেরা আমার অসম্ভব।"

দিন যায়, রাত্রি আসে। প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া [illegible]

হইল। সংসারে এমন নিত্য ঘটিতেছে। এই ঘটনা কিছু অস্বাভাবিকও নহে। যিনি এই সংসারে ধাত্রী-স্বরূপ আমাদের পালন করিয়াছিলেন, তিনি আর আমাদের ফিরিবার ইচ্ছা নাই বুঝিয়া, সংসার হইতে কয়েকখানা বাসনপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন—আপত্তি উঠিলে, বলিলেন, "বাপ এখনও বাঁচিয়া আছেন। সংসারের সব কিছুরই অর্দ্ধেক অধিকার তোমাদেরও আছে।" তাঁহার সে স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া সে দিনের মত আজও আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে।

সাধন বেশ জমিয়া উঠিল। কোন কাজ নাই—আহার, নিদ্রা আর ধ্যান। শ্রীঅরবিন্দের কৃপায় আসন ছাড়িয়াছি, প্রাণায়াম ছাড়িয়াছি, মন্ত্রাদি জপের বালাই নাই। গতানুগতিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রিসীমায় যাইতে হয় না। পূর্ব্ব-সাধনার সঙ্কেতে মূলাধার হইতে দ্বিদল চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উঠাইয়া সহস্রসারে পৌঁছাইবার রেচক, পূরক, কুম্ভকের যে বাড়াবাড়ি ছিল, তাহাতে সময় যাইত, কসরৎও বড় কম হইত না। খাদ্যাদির বিচারও আজ নাই। এই কয়দিন বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হইল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, দ্বিদল চক্র বুদ্ধির কেন্দ্র। অনাহত, মণিপুর স্বাধিষ্ঠান, যথাক্রমে মন, চিত্ত ও প্রাণ। মূলাধার স্থূল আধারকেন্দ্র। সারা জীবনটাই যোগ। অন্তর সাধনায় ডুবিয়া পড়িলাম। গীতার "যদশ্নাসি, যৎ করোষি" মন্ত্রটী অনুভূতির গ্রামে উঠিল। চলিবার সময়ে পদক্ষেপটাও কেহ যেন নিয়ন্ত্রিত করে; অন্নগ্রাস লইয়া হাতটী মুখে উঠে তৃতীয় শক্তির সহায়ে, বুদ্ধি লইয়া ইহাই চিন্তা হয়। হৃদয়ে প্রেমের ঢেউ উঠে, প্রাণে কর্ম্ম প্রেরণা জাগে। আমার কর্ত্তৃত্ব সেখানে কিছু নাই। শুধু বসিয়া বসিয়া দেখি। আসন-সিদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই ছিল—নৈষ্কর্ম্ম্যে শয়নের অপেক্ষা পদ্মাসনে বসিয়া অধিক আনন্দ পাই। নিরবচ্ছিন্ন 'আমি' ও 'তুমি' এই দুইয়ের চেতনায় আমার সব ডুবিয়া যায়। সে এক অপার্থিব তৃপ্তি—আজিও আয়ুঃ ও স্বাস্থ্য হইয়া ইহা আমায় পুলকিত করে!

এমন করিয়া চিরদিন যে চলিবে না, এ কথা এই কয় [illegible] দিয়াছিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই বহির্ব্বাটীটা আমারই অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বতন্ত্র হইয়া সে অধিকার আরও অক্ষুণ্ণ হইল। সংসার হইতে পরিত্যক্ত এই দুইটী প্রাণীর মুখ-দর্শনে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। কাজেই এই দিকে আর কেহ আসিতেন না। দালানের পাশে সেই ক্ষুদ্র কক্ষটী—কারখানার চেয়ার-টেবিলের গুদামে যেখানে শ্রীঅরবিন্দকে একদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ঘরটী সংস্কৃত করিয়া সাধন-ভজনের জন্য ব্যবহার করিতাম। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে এই ঘরে আসিয়া ধ্যানে বসিতাম। সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলে, তিনি মধ্যপথে একটী দরজার কড়া ধরিয়া মৃদু শব্দ তুলিতেন, উহাই প্রাতরাশের, মধ্যাহ্নভোজনের এবং নৈশ ভোজনের আহ্বান জ্ঞাপন করিত। নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্যে পরম পরিতোষে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। পৃথিবী আমার নিকট শূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধ্যান-নেত্রে দেখিতাম—আমি আর আমার সহধর্ম্মিণী, এতদ্ব্যতীত কিছু নাই। আর দূরে সে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে শ্রীঅরবিন্দের প্রসন্ন মূর্ত্তি। আর সেখানে কত রূপের তরঙ্গ-লীলা! কত সময় অপ্রাকৃত দর্শনের ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত হইত; আর কত সময়ে নিজের অভ্যন্তরে জ্ঞানের, প্রেমের, কর্ম্মের লীলা-প্রেরণা লক্ষ্য করিয়া অতিবাহিত হইত। এ সুখ, এ তৃপ্তির অবধি ছিল না। আমার প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁহাকে তৃপ্তি দিয়াছিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, আমার অন্তরের আনন্দ শতগুণান্বিত হইয়া উঠিত। দিন এমন করিয়া কিন্তু চলিল না। মধ্যাহ্নে ভোজন শেষ হইলে, তিনি কথা পাড়িলেন, বেশ একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন—"সে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া দুর্ভাবনায় কত না ছট্‌ফট্ করিয়াছিলে! সংসারের দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে তো?"

সে দিন পর্য্যন্ত কত প্রকারের দায়িত্ব যে ঘাড়ে চাপিয়া আমায় পিষিয়া মারিতেছিল, সে কথা স্মরণে পড়িল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুশ্চিন্তা, আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা অধিক ছিল সংসারে—এই দুই বিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য আমার কি অসাধারণ প্রচেষ্টাই না করিয়াছি! নানা কারণে ঋণের গুরুভারও মাথার উপর কম ছিল না। বিশ্ব ঋণের ইতিহাসও মর্ম্মে মর্ম্মে লিখিয়া উঠিতেছিল। প্রতিদিন বিপদের আশঙ্কায় সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত। এই সব হইতে এই কয়দিন যেন মুক্তি পাইয়াছি। শরীর ও মন বেশ লঘু হইয়াছে, দায়িত্বহীন মুক্ত জীবনের অমৃতাস্বাদে শ্রী ও যৌবন আমাকে যেন নূতন করিয়া বরণ করিয়াছে। আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁরই নয়নের আলোয় আমার প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিত—আনন্দের অবধি থাকিত না।

তিনি যে সকল কথা পাড়িলেন, তাহাতে পূর্ব্ব চেতনায় আবার ফিরিয়া আসিলাম। সব যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, আবার সব ভাসিয়া উঠিল—নূতন ভঙ্গীতে, নূতন ছন্দে আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"এই কয় দিন আমি যেন কি হইয়াছি কেমন করিয়া দিন চলিয়াছে, একবারও ভাবি নাই। বল তো কি ব্যাপার?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমি যদি মেয়ে-মানুষ না হইতাম, তোমায় আর দুর্ভাবনার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া দুঃখ দিতাম না। অনেক বার ভাবিয়াছি, কথাটা পাড়ি; কিন্তু তোমার মুখখানিতে এই কয়দিন যে সুখের রঙ দেখিয়াছি, তাহা পাছে মুছিয়া যায়, তাই কিছু বলি নাই। কিন্তু আর যে চলে না—দুঃখ তোমায় দিতেই হইল।"

একজনের কর্ত্তব্য অন্যকে বহিবার শক্তি—ভগবান দেন না। নিজের মধ্যে যে নারায়ণ, তাঁর জাগরণ-ভঙ্গী সর্ব্বক্ষেত্রে এক প্রকারেরও নহে। আমি অধ্যাত্ম-সাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিব, আমার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য আমার শক্তির অনুশীলন আমি করিব না—এমন ভাগ্য আমার নহে। সেদিনও যেমন, আজও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। আমি খবর লইয়া জানিলাম—আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাদের অবস্থা বুঝিয়া পাঁচটী টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। এই কয়দিন তাহাতেই সব কিছু চলিয়াছিল। কিন্তু বাজার-হাট করিল কে? সন্তান-প্রতিম সে ব্যক্তি প্রতিদিনই আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার আনাগোনার কারণও মনে যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই, তাহাও নহে। কিন্তু সাধনার গভীরতায় চিত্তে উহা রেখাপাত করে নাই। আমার এই নব সংসার-রচনার সূচনা-পর্ব্বে তার (রামেশ্বর দে) নাম শুধু উল্লেখযোগ্য নহে, সঙ্ঘের ইতিহাসে সে একটা স্মরণীয় বিষয় হইয়া থাকিবে।

স্বদেশী যুগ হইতে শ্রীঅরবিন্দের যুগ পর্য্যন্ত যে সকল তরুণের জীবন আমাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, রামেশ্বর তাহাদের অন্যতম। আমি যে দিন হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছি, সেই দিন হইতেই সে 'তাঁর' পদপ্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া বুঝি নবজন্মের দীক্ষা লইয়াছিল, তাঁকে সে "মামীমা" বলিয়া মাতৃ-প্রেম-সুধায় অভিষিক্ত হইত। এই রামেশ্বরের সহিত যুক্তি করিয়াই তিনি সংসার চালাইয়াছেন এই কয়দিন। রামেশ্বর বাজার-হাট করিয়া আনিয়াছে, রামেশ্বর ঘড়া কাঁধে করিয়া দূর হইতে পানীয় জল আনিয়া দিয়াছে। মামীমার আদেশ-প্রতীক্ষায় রামেশ্বর স্বগৃহ পরিত্যাগ করিতেও কাতর নহে। রামেশ্বরকে সেদিন নূতন চক্ষে দেখিলাম। অপত্যস্নেহে হৃদয় আমার বিগলিত হইল।

তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া বুঝিলাম—আর একদিন পরেই তিনি কপর্দ্দকহীনা হইয়া পড়িবেন। আমাকে আর না জানাইলে নয় বলিয়া তিনি আজ অভাবের কথাটা আমায় শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু আমি কি করিতে পারি? তখনই ভাবিতে বসিলাম। ভাবিবার বিষয় কিছু না পাইলে, নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হইয়া কোন্ গভীরে তলাইয়া যাই! আত্মজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া অসীমের অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হই; কিন্তু বিষয় পাইলে, আর রক্ষা নাই। তাহাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অতিক্রম করার ধূর্জ্জটীশক্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠে। অভাব আজ জটিল সমস্যার বিষয় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত—উহাকে অতিক্রম করার চিন্তায় মুখরকণ্ঠ হইয়া নানা প্রশ্নে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। সব কথা ছাড়িয়া এই দুইটী প্রশ্ন বড় হইয়া উঠিল—ব্যবসা করিব অথবা চাকুরীতে বাহির হইব? তিনি চাকুরীর চেষ্টাই করিতে বলিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের দিকেই আগা-গোড়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমার উৎপাতময় জীবনের সংঘাতে তিনি প্রতি মুহূর্ত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেন। আমার চঞ্চল উত্তেজনাময় চরিত্র ব্যবসার পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। আমার কিন্তু চাকুরী করার আর প্রবৃত্তি ছিল না। একবার যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতে পুনরাবর্ত্তন আমার স্বভাবে নাই। ইহা ছাড়া, একটা চাকুরীর মত চাকুরী যোগাড় করাও সহজ ছিল না। কাহারও উমেদারী করার মত প্রবৃত্তি অন্তরে ঠাঁই দিতে কষ্ট-বোধ হইত। আমি বলিলাম—"সংসারে যেমন আর ফিরিব না, তেমনি চাকুরীর দিকেও আর নয়—একটা ব্যবসায়ই করি, কি বল?"

তিনি বলিলেন, "ব্যবসা করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না।"

কথাটা দৈববাণীর মতই মনে হইয়াছিল। আমার মনে কিছুই করিবার আর নাই। সম্মুখে ঠিক অন্ধকার যবনিকা ঝুলিয়া না পড়িলেও, একটা বিরাট্ শূন্যের সম্মুখে যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই অবস্থায় কিছু করা যায় না। তবু বলিলাম, "খুব ছোট্ট একটী ব্যবসা করিব। ২০৲।২৫৲ টাকার মত আয় হয়—এমন ব্যবসা।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যবসাটা কি?"

কয়েক বৎসর ব্যবসার ক্ষেত্রে থাকিয়া অনেক ছোট ছোট কারবারে মানুষের দিন চলে দেখিয়াছি।

আমার মনে হইল—দুই এক ওয়াগন কয়লা আনিয়া যদি বিক্রয় করি, ২০৲।২৫৲ টাকা রোজগার অনায়াসেই হইবে।

তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহার জন্য তো টাকার দরকার? শ্রমও বড় কম হইবে না। তুমি যে মানুষ, দুই দিনেই পুঁজি-পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবে।" দেখিলাম, তাঁহার ইচ্ছা ব্যবসার দিকে আদৌ নাই। চাকুরীর কথা স্মরণ করিলেই আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা দুই জনে অনেক ক্ষণ পরামর্শচ্ছলে তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল—যাহা করিবার, আজই নিশ্চয় করিয়া লইব। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তর্কযুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

সেই ছোট ঘরখানিতে আসিয়া বসিলাম। বসিলাম আজ এই প্রথম—অন্তর-দেবতার বাণীশ্রবণের জন্য। আজ যেন আমার সমস্তখানি এক হইয়া প্রার্থনা সুরু করিল—প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায়। ঊর্দ্ধে চাহিয়া যুক্তকরে অন্তরে অন্তরে বলিতে লাগিলাম, "হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা আমার কাছে আজ বাণীরূপে নামিয়া আসুক। সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প পদে পদে বুঝি ব্যর্থ হয়। নিজের অহঙ্কারই চিন্তা করে, কর্ম্ম করে। নিজের কর্ত্তৃত্বই

তাহার জন্য দায়ী—ঈশ্বরের নামাঙ্কিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। হে ভগবান, আজ আমায় মুক্তি দাও। তুমি বল—আমি কি করিব ?”

জীবনে এই প্রথম ডাকিয়া সাড়া পাইলাম। নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পদ্মাসনে বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কত দীর্ঘ সময় একাগ্রচিত্ত হওয়ার সাধনা করিয়াছি, কত রাত্রি নির্ব্বাক্ জ্বলন্ত দীপশিখার দিকে চাহিয়া চঞ্চল মন স্থির করার জন্য ত্রাটক্ অভ্যাস করিয়াছি! মন্ত্র জপ করিতে করিতে চিত্ত আমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রোত্থিতের ধ্যান-ভঙ্গে একটা আরাম অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আজ এই ভবিষ্যতের দিকে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ-প্রাপ্তির প্রার্থনায় হৃদয়-মন এমন এক অভিনব আনন্দে অভিষিক্ত হইল, যাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবে না। চক্ষে পুলকাশ্রু, সমস্ত মেরুদণ্ডটা স্থির অকম্পিত। চাহিয়া আছি, কিন্তু দৃশ্যমান কিছুই নাই। আত্মচেতনা আছে, শরীরের স্থূলানুভূতি নাই। একটা জ্যোতির্ম্ময় জগতে যেন আসিয়া উপনীত হইয়াছি। তারপর হাতখানা কে যেন জোর করিয়া তুলিয়া ধরিল, লেখনী হস্তে ধরাইয়া পরিষ্কার প্যাডের উপর এক ছত্র লেখা বাহির হইল "Wait, all will come."

চমক ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নোত্থিত চিত্তে কাগজের লেখাটুকুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সঠিক কর্ম্ম-নির্দ্দেশ মিলিল না। অপেক্ষার সঙ্কেত—আর সব আসিবে। ভাল তাহাই হইবে। কি সব আসিবে ? দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য—ব্যাধি, অনশন, মৃত্যু—লজ্জা, লাঞ্ছনা, অপমান! ধৈর্য্য সহকারে বরণ করিয়া লইতে হইবে? আমি চিরদিন জীবনের সম্মুখে বিপদের অন্ধকারই ঘনাইয়া আসিবে দেখিয়া থাকি, সুখের কল্পনা কোন দিন করি না। দুঃখের অপেক্ষা সুখের ভার বহন অভ্যাসগুণে অধিক সহজ-সাধ্য হয়। দুঃখের জন্য কায়-মনে-প্রাণে প্রস্তুত হইয়াই আছি। সুখের প্লাবনে কিন্তু অভিষিক্ত হই। দুঃখ অপ্রস্তুত ক্ষেত্রে নহে বলিয়া আমায় বিচলিত করে না। আজ সব কিছুর প্রতীক্ষায় দুঃখের স্বপ্নই চিত্রিত করিলাম। ব্যবসাও নহে, চাকুরীও নহে—অপেক্ষমান জীবন লইয়া আমি স্থির হইয়া থাকিব। সব আসিবে; আমায় প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ধীর প্রশান্ত চিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শিশু কন্যাটীর মৃত্যুর পর হইতে সেবার ভার সর্ব্বপ্রকারেই স্বহস্তে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রন্ধন, পরিবেশন, গৃহমার্জ্জন, শয্যা-রচনা—যাবতীয় কর্ম্মের সহিত আমাকে তিনি স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতেন। অন্যের চক্ষে ইহা কিরূপ ঠেকিবে, সে বিচারের অবকাশ আমার ছিল না। জীবন-যাপনের ব্যবস্থায় আমি তাঁর হাতের যন্ত্র ছিলাম। অন্তর-প্রেরণা বলিয়া যাহা অনুভূত হইত, সেখানে ছিলাম আমি নিঃসঙ্গ—এই অবস্থায় তাঁহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইত। অবস্থা তাঁহার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত যাহাই হউক, এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে সব ছাড়িয়া ছুটিতে হইত। অনুগমনের অনভ্যাসে চরণ বুঝি রক্তাক্ত হইত। যেখানে আমি অস্পষ্ট হইতাম, সেখানে তাঁহার চক্ষে অশ্রুর নির্ঝর ঝরিত। আজ আমার প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার কৌতুকপ্রিয় আঁখিযুগল স্থির সচকিত হইয়া আমার অন্তর দেশ দেখার চেষ্টা করিল। কত কি তিনি মনে করিলেন, ভাবিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সেদিন মূক, মৌন, উদাসীনের ন্যায় স্নানাহার সারিয়া, আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া স্থির হইয়া বসিলাম। যেন মনে হইতেছিল—এত দিন অধ্যাত্ম-সাধনার অভিনয় চলিতে ছিল। আমিই যন্ত্র ও যন্ত্রী সাজিয়া সাধন জমাইয়াছিলাম। আজ কিন্তু আমা ছাড়া আর কেহ যেন আমায় পাইয়া বসিয়াছে। ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

আজ সত্যই আমি কর্ত্তা নহি। এ ঘর গুছাইবার, গড়িবার ভার আমার নহে। আমি একটা শূন্য চেতনা। অন্যের নিয়ন্তৃত্বের ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছি মাত্র। সারা অপরাহ্ন এইরূপ তন্ময় হইয়া কাটিয়া গেল। প্রকৃতি সন্ধ্যার ধূসর বর্ণ আকাশে লেপিয়া দিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার গৃহ-কোণে জমা হইতে লাগিল। গৃহস্থের বাড়ী হইতে সন্ধ্যার শঙ্খ ধ্বনি তুলিল। সন্ধ্যা-প্রদীপ হস্তে তিনি আমার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন—ধূপ-ধূনা জ্বালিয়া পূতগন্ধে গৃহ আমার আমোদিত করিলেন। আর শেষে আমার নিস্তব্ধ নিশ্চল মূর্ত্তির সম্মুখে ভূনত প্রণাম করিয়া

সম্মুখে স্থির হইয়া বসিলেন। অভাবের মলিন তির্য্যক রেখা তাঁহার ললাটে লেশমাত্র নাই। উজ্জ্বল দীপ-শিখায় তাঁহার ভাস্বর বদন-মণ্ডলে অপূর্ব্ব দীপ্তির ছটা। আজ তিনিও কি মুক্তির মন্ত্রে অভিষিক্ত? আমার হৃদয়ের অনবদ্য অনুভূতির প্রতিমা যেন সম্মুখে বসিয়া আমার চৈতন্য গড়িয়া লইতে লাগিল। সে দেবী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তাঁর প্রণতির প্রতিদান দিবার জন্য আমার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সেই সন্ধ্যার এই অন্তরানুভূতির কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই।

এই স্বপ্ন স্থায়ী হইল না। প্রাঙ্গণে আমার পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠরব পরিশ্রুত হইল। 'তিনি' প্রস্থান করিলেন। হাসিমুখে বন্ধু আসিলেন, পশ্চাতে রামেশ্বর।

এই চিরসুহৃদের কথা পূর্ব্বেও কিছু বলিয়াছি। ইঁহারই জননীর মৃত্যুদিন পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। ইঁহার পত্নী আমাদের কাছে "মেজবৌ" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার ভক্ত শিষ্যা। এই পরিবারটীর সহিত আমার সম্বন্ধ আজও অচ্ছেদ্য হইয়া আছে। বন্ধু বলিলেন—তুমি স্বতন্ত্র হইয়াছ, শুনিয়াছি। ভালই হইয়াছে। কিন্তু দিন চলিবে কি করিয়া—ভাবিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম "আগে ভাবিয়াছি, আজ হইতে তাহা নিষেধ হইয়াছে।"

এই বন্ধুটী আমার পূর্ব্ব-সাধনার সহযোগী, সহতীর্থ ছিলেন। তিনি আমার ভাব বুঝিতেন। বলিলেন, "তাহাই যদি হয়, খুব ভাল। আমার সাধ্য কম, তবুও তুমি দেশের জন্য, ভগবানের জন্য যদি নিছকভাবে জীবন যাপন কর, আমি প্রতি সপ্তাহে তিন টাকা দিতে পারিব।"

আমার নয়ন বিস্ফারিত হইল। মুখ দিয়া বাক্য বাহির হইল না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব কি? যিনি আজ নির্দ্দেশ দিয়াছেন স্থির থাকিবার, তিনিই উপলক্ষ্য স্বরূপ বন্ধুকে টানিয়া আনিয়াছেন। আমি, তুমি, সে—সবার উপরে এই যে পরমাশক্তি, তাঁহার উপর প্রগাঢ় প্রত্যয় জন্মিল। শ্রদ্ধায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

আমার করিতে হইল না কিছুই। রামেশ্বর মাসিক ১২৲ টাকা হাতে লইয়া তাহার মামীমার সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতন সংসার রচনা করিল। সে তার পরদিনই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রধ্বনি করিতে করিতে সংসার-পাশ ছেদন করিয়া এই নূতন সংসারে সাথী হইল। ১২৲ টাকার সংসার আমাদের। তিন জনের দিন চলিতে লাগিল স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে। (ক্রমশঃ)

চিরন্তনী

শ্রীচন্দ্রিমা ভাদুড়ী (সান্যাল)

এখনো দুয়ারে পড়েনি জলের ধারা—
তুলসীর মূলে এখনো নেভেনি দীপ,
শ্যামলী বধূর এখনো ভাঙেনি ঘুম,
গগনের ভালে এখনো চাঁদের টিপ।

তপোলোক সম সুপ্ত এখনো ধরা—
ধরাতলবাসী মগ্ন কিসের ধ্যানে?
তরুণ-তপন-নয়নে জড়িমা ভরা—
তটিনী এখনো চলেনি উজল টানে!

এখনো তোমার হয়নি কি অবসর?
এখনো তোমার পদরেণু লাগি চাহি;—
এখনো মনের সকল কামনা মোর—
বেঁচে আছে আশা-সায়রেতে অবগাহি'!

এ শুভ-লগন বয়ে যায় কেন বৃথা?
এসহে দেবতা প্রভাত-তপন সম;
সময়েরে তুমি নিজে হাতে ভাঙ-গড়,
তা'রে সেবি আমি—সে'ত নয় দাস মম!

নব বর্ষে—কাল পূর্ণ হইবামাত্র 'পঁয়তাল্লিশ' চলিয়া গেল, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। পুরাতনের চিহ্নমাত্র রহিল না। না রহিলেও, স্মৃতি ত' মুছিবার নহে। আনন্দ ও নিরানন্দের কত কথাই আজ মনে পড়িতেছে। কর্ত্তব্যের অনুশাসনে মন কিন্তু বাঁধিতে হইবে দৃঢ়ভাবে। কবির ভাষায়—

"পেয়েছিলে যাহা রেখেছিলে তাহা
দিয়াছিলে ভালবাসা।
গিয়াছে যখন, যা'ক না তখন
মিছে আর কেন কর আশা।"

খেলা খেলিতে হইবে এমনি করিয়া—খেলিয়া হইতে হইবে জয়ী। ক্রীড়াক্ষেত্রের রীতি ইহাই। ইহা পালনে নূতনে পুরাতনের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবেই হইবে। নূতনের মাধুর্য্যে পুরাতনের রূপ উছলিয়া উঠিবে অপরূপ সৌন্দর্য্যে। এস' নূতন, প্রাণ আমাদের মাতাইয়া দাও, কর্ত্তব্যপথে আমরা আগুয়াণ হই।

নিবেদন—খেলা-ধূলা প্রসঙ্গে খেলা-ধূলার উচ্চাদর্শ ও মহোপকারিতার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের বক্তব্য আমরা পাঠক পাঠিকাকে সুদীর্ঘ চারি বৎসরকাল শুনাইয়া আসিতেছি। আমাদের সৌভাগ্য আমাদের প্রায় সকল কথারই সমর্থন জনসাধারণ করিয়াছেন। বক্তব্য বলিতে কখনও কখনও কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রমণের কল্পনাও কিন্তু কখনও আমরা করি নাই। তথাপি কাহারও যদি মনক্ষোভের কারণ কোন সূত্রে আমরা হইয়া থাকি, তজ্জন্য আমরা নিরতিশয় দুঃখিত। শুভ নববর্ষে ইহাই আমাদের প্রথম ও প্রধান নিবেদন।

বঙ্গদেশে ক্রিকেট্, ফুটবল্ প্রভৃতি প্রচলনে অগ্রণী বিগত যুগের যে কয়জন আমরা আছি তাঁহাদের 'প্ররোচনাতে' লেখক গত প্রায় ছয় বৎসরকাল নূতন করিয়া 'গা' ঢালিয়া দিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে ৺অমরেন্দ্র নাথ দত্তের 'রঙ্গালয়ে' খেলা-ধূলার কথা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বাঙলা সংবাদ পত্রের মধ্যে 'রঙ্গালয়'ই এ বিষয়ে অগ্রণী। কর্ত্তৃপক্ষ লেখকের উপর বিভাগীয় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন। বিভাগের নামকরণ 'খেলা-ধূলা' করিয়া সে ভার বহনে সাধ্যমত ত্রুটি হয় নাই।

নূতন পর্য্যায়ে বিভিন্ন বাঙলা সংবাদপত্রে এবং গত চারি বৎসর 'প্রবর্ত্তকে' খেলা-ধূলায় বাঙালীর আদ্যন্ত কথা, খেলা-ধূলার বাঙলা পরিভাষা এবং খেলা-ধূলার সাময়িক আলোচনা প্রভৃতি লেখক কর্ত্তৃক বর্ণিত যাহা হইয়াছে, নিরপেক্ষ সমালোচক ও ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহা সমাদর লাভ করায় লেখক কৃতার্থ। সে যাহা হউক, খেলা-ধূলার গোড়ার কথা ও তাহার ক্রমোন্নতি এবং বর্ত্তমান যুগে তাহার অবস্থা বিবৃত যাহা হইয়াছে 'নূতন করিয়া গা ঢালিয়া' না দিলে বাঙালীর ইতিহাসের এই দিকটা লুপ্ত হইত, অনেকে জানাইয়াছেন। কিন্তু 'হাল বয়ান' যথাযথ হইলেও 'অসাবধানী'র ভুল কথা প্রচারের বিরাম এখনও ত' নাই! 'আদ্যন্ত কথা বিবৃত হইয়াও এই, না হইলে পরে কি ঘটিবার সম্ভাবনা সহজেই অনুমেয়। এই কয় বৎসর খেলা-ধূলার আলোচনা প্রসঙ্গে খেলা-ধূলা-সাহিত্যের একটা রূপ দিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি হয় নাই। চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা পণ্ডিতেরা তাহা বিচার করিবেন।

বাঙলা সংবাদপত্রাদিতে খেলা-ধূলার কথার এখন 'ছড়াছড়ি'। ইহার জন্য একাধিক প্রবীণ সম্পাদক ও সাংবাদিক লেখককে 'পালের গোদা' আখ্যা দিয়াছেন। এই আখ্যা দানে তাঁহাদের মনের কথা যাহাই হউক

খেলা-ধূলা বর্জ্জিত সংবাদপত্রের চাহিদা থাকার সম্ভাবনা এখন খুবই অল্প, 'বুকে হাত দিয়া' বলিলে ইহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। আশা করি, খেলা-ধূলার লেখকেরা এই সুযোগে খেলা-ধূলা সাহিত্যের সমধিক সৌষ্ঠব সম্পাদনে বিশেষ যত্নবান হইবেন। নববর্ষে তাঁহাদের প্রতি লেখকের এই আন্তরিক নিবেদন।

লেখক ষাটএ উপনীত। তাহার দিন প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। লেখকের এই আন্তরিক নিবেদনে সকলে মনযোগী হইলে তাহার ইহজগতের খেলা শেষ হইবার পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যের একটা নূতন দিক উজ্জ্বল আভায় রঞ্জিত দেখিয়া যাইবার কিছুমাত্র অসম্ভাবনা নাই। এক আনা মূল্যের পুরাতন টেনিস বল্ ফুটবল্ করিয়া বাঙালী ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্রীড়কে পরিণত হইয়াছে, আই, এফ, এ শীল্ড জয় করিয়া লইয়াছে। 'ব্যাটম্বল্' খেলিতে খেলিতে বাঙলা আজ 'রঞ্জী কাপ' জয়ী। খেলা-ধূলা-সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাধনে সেই বাঙলা নিশ্চয়ই অসমর্থ নহে। 'পালা' যখন সুরু হইয়াছে, তাহা চরমে বাঙালী তুলিবেই। আরম্ভ পালার 'শেষ-বেশ' দেখিয়া যাইবার সাধ কাহার না হয়? সে সাধ কি মিটিবে না!

আরও কথা—'ভেক্ নহিলে ভিখ্ মিলে না'। কথাগুলা একেবারে মূল্য হীন নহে। ভেক্ কিন্তু সার করিলে ভেকধারীর পরিণামে শুভ হওয়ার আশা বিড়ম্বনা। অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়িবেই পড়িবে—দু'দিন আগে আর 'পাছে'। ক্রীড়কের ভেক ধারণ, স্বভাব বিরুদ্ধ—'সে যে পাকা সোণা'। সংবাদপত্রাদির দূরদৃষ্টির অভাবে 'পাকা সোণা'য় কোথাও কোথাও 'খাদ' মিশাইয়া চালাইবার প্রথা ভীষণভাবে 'চালু'হইয়াছে। কথায় কথায় 'ছবি ছাবা' ছাপাইয়া ক্রীড়ক বিশেষকে 'গাছে তুলিয়া' দেওয়া 'ফ্যাশনের' মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। খেলোয়াড়কে বাহবা দেওয়া, উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে যথেষ্ট। তাই বলিয়া তাহার 'মাথা খাওয়া'র ব্যবস্থা করা সমীচিন কি? সংবাদপত্রাদির কার্য্যালয়ে খেলোয়াড়দের ব্লক লইয়া ঘোরাঘুরির অনেক দৃষ্টান্ত আমরা জানি। আমাদের কালে ছাপার হরফে আমাদের কাহারও নাম বাহির হইলে লজ্জায় সে লুকাইত — বন্ধুবান্ধবের শ্লেষ-বিদ্রুপের ভয়ে। এখন ব্লক লইয়া অবাধে 'ঘোরাঘুরি' চলিতেছে। রাজপরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া 'থিয়েটারী রাজা' সাজিতে তাহাদের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা! আমরা দেখি, হাসি আর ভাবি—ইহাদের গতি কি হইবে! 'গতি'র চিন্তায় 'পরদেশী' খেলোয়াড়ের আমদানীর ব্যাপারেও চৈতন্য হইল না, আশ্চর্য্য! যাহা চলিতেছে তাহার ইঙ্গিৎমাত্র আমরা করিলাম। আশাকরি এ বিষয়ে সকলের মনযোগ আকর্ষিত হইবে ও তাহার ফলে অনিষ্ট নিবারণের বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইবে। এ দোষ ক্রীড়ক বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। কোনও কোনও ক্রীড়া সঙ্ঘেরও ইহা অস্থিমজ্জাগত। 'পোষাকপরা রাজা' হইবার চেষ্টা ইহাদেরও অত্যধিক। গতি রুদ্ধ না হইলে 'হ্যাচকাটানে প্রাণ যাওয়া'র ব্যাপার সুতরাং অল্প হইবে না।

মহিলা ক্রিকেট

মহিলা ক্রিকেট—দিল্লী

'ইণ্টারন্যাশানাল' বাতিক—'ঘরের ছেলের' জগৎযোড়া নাম হয়, কাহার না ইচ্ছা! তবে 'কাণা

ছেলেকে' পদ্মলোচন সাজাইয়া পাঠাইলে হাস্যাস্পদই তাহাকে হইতে হয়। 'বিশ্ববিজয়ী' ভারতবর্ষের হকি দল্ পাঠান এক, আর অনুপযুক্ত প্রতিযোগীকে অলিম্পিকের অন্যান্য প্রতিযোগিতায় 'বাঘাভাল্লুকদের' সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পাঠান অন্য কথা। বাতিকগ্রস্থ ভিন্ন শেষোক্ত কার্য্য অন্য কেহ করিবে না। অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগী পাঠাইবার আয়োজন বাতিকের বশবর্ত্তী হইয়াই না কি চলিতেছে। আশা করি ইহাতে প্রশ্রয় সাধারণে দিবেন না।

বেঙ্গল্-জিম্খানা—জিম্খানার উদ্যোগে বঙ্গদেশে ক্রিকেটের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই। জিম্খানার গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের আরম্ভ সম্প্রতি সমারোহ করিয়া হইয়া গিয়াছে। সমারোহের উৎসবে 'বঙ্গদেশে খেলা ধূলার যাঁহারা আদি স্তম্ভ তাঁহারা কেহ উপস্থিত ছিলেন দেখিলাম না, বা এই শুভ কার্য্যে তাঁহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপক কোনও বাণী প্রেরিত হইয়াছিল, সে কথাও শুনিলাম না। ইহার কারণ কি?

ক্রিকেটের জের—সাউথ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট্ সাউথ্ আফ্রিকার ৫৩০ ও ৪৮১ এবং ইংলণ্ডের ৩১৬ ও ৬৫৪র (৫ জনে) পরে বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হওয়ায় ইংলণ্ড নিশ্চিৎ জয়ের গৌরব উপভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। সাউথ্ আফ্রিকার প্রথম দানের খেলার উত্তরে ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প দৌড়মারের সংখ্যা দেখিয়া এবং দ্বিতীয় দানেও সাউথ্ আফ্রিকার জয়াঙ্ক পাঁচ শতের কাছাকাছি উঠায় ইংলণ্ডের জয়াশা অনেকের কাছেই ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় দানের খেলায় কিন্তু ইংলণ্ডের গিবের ১২৯, এড্রিকের ২১৯ ও হ্যামণ্ডের ১৪০শের দৌলতে 'চাকা ঘুরিয়া' যায়। জয়ী হইতে মাত্র ৪২ মার দৌড় দিতে যখন বাকী, ছয় জন খেলোয়াড় হাতে থাকিতেও, 'দেবতার কোপে' খেলা বন্ধ হইয়া যায়। 'বরাত বটে'! সে যাহা হউক প্রথম দানে সাউথ্ আফ্রিকার ভ্যাণ্ডার বিলের ১২৫, নোর্সের ১৬৩ এবং দ্বিতীয় দানে ভ্যাণ্ডার বিলের ৯৭ ও মেল্ভিলের ১০৩এর মুন্সীয়ানা খুবই।

কলিকাতায় কুচ্বেহার কাপ জয়ী হইয়াছে এরিয়ণ। প্রতিপক্ষ মোহামেডান স্পোর্টিং 'চার বাড়িতে' (4 wickets) পরাজিত। জয়াঙ্ক তালিকা এইরূপ:—

মোহামেড্ন—১৩৬, ২৩৯

এরিয়ণ—২৩৪, ১৪২ (৬ জনে)

পরাজিতের পক্ষে জাব্বারের একবার ৪৪ ও অন্যবারে ১২৮ এবং জয়ীর পক্ষে আইভান্ মুরিটার ৬০ ও সুশীল বসুর ৮০—পাকা খেলার ফলেই ঘটে।

ইণ্টার কলেজিয়েট্ ক্রিকেটে (কলিকাতায়) জয়ী হইয়াছে মেডিক্যাল্ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজকে শেষ গণ্ডীর খেলায় ৭ উইকেটে পরাজিত করিয়া।

কলিকাতায় নারী-ক্রিকেটের বাড়াবাড়ি এখনও তেমন হয় নাই। তবে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেট্ টেষ্টের উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। 'হাওয়া লাগিতে' এ দেশেও অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহারই মধ্যে দিল্লী ও রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে আমেজ বেশ দেখা দিয়াছে। রাওলপিণ্ডির নারী-দল পরাজিত করিয়াছে মিলিটারী অফিসারদিগের দলকে। দিল্লীতে নারীদল পুরুষদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে মাত্র এক মারদৌড়ে।

এম্-সি-সি—বিলাতী এই ক্রিকেট দলের অক্টোবরের মাঝামাঝি এ দেশে পৌছাইবার কথা। আশা করি এ বৎসরে ইহার কারণে ভারতবর্ষের যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা করা নিতান্ত বৃথা হইবে না এবং আমাদের কর্ম্মকর্ত্তারা 'কাগুজে হৈ হৈ' করাইয়াই কর্ত্তব্য পালন করিবেন না। যথাযোগ্য ক্রীড়ক নির্ব্বাচন না হইলে বিশেষ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা—পূর্ব্বাগ্রেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি। বঙ্গদেশেরও যাহা 'প্রাপ্য' বাঙালী যাহাতে তাহা পায় সে দিকে যেন দৃষ্টি সকলের থাকে।

'হেক্ল্ কাপ'—বিগত যুগের টেনিস্ কুশল মিঃ হেক্লের স্মৃতি সূচক এই বাৎসরিক টেনিস্ প্রতিযোগিতায় ক্যাল্কাটা-নর্থ-ক্লাব্ ক্যাল্কাটা-ক্রিকেট্ ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে ১২৮-৭৯। বাঙ্গালীর টেনিসের আজ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে ক্যালকাটা নর্থ ক্লাবের দান খুবই বেশী। নর্থ

ক্লাবের হেকল্ কাপ জয়ে বাঙ্গালীর টেনিস্ খেলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

ডেভিস্ কাপে ভারতীয় দল—আগামী প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দলে গৌসমহম্মদ, সাভুর, সোহানী ও ইফ্তিকার আমেদ নির্ব্বাচিত হওয়ায়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ খেলোয়াড়ের পরিবর্ত্তে অন্য দুইজন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হওয়া উচিৎ কেহ কেহ বলেন। অন্য দুইজনের নামও তাঁহারা করেন। ইঁহাদের অভিমত নির্ব্বাচকদিগের বিবেচনা যোগ্য হইলেও বিবেচিত হয় নাই।

সন্তোষের মহারাজা—মহারাজ মন্মথনাথ চৌধুরীর রক্তচাপ অস্বাভাবিক অকস্মাৎ হওয়ায় অবিলম্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অসুস্থতার কোনও সংবাদই আমরা পাই নাই। এ যেন আমাদের উপর অভিমান করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সময়ে আই এফ্ এ পরিচালনা সম্বন্ধে বহু বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার সৌজন্যতা ও স্বভাব মাধুর্য্যে আমরা চির মুগ্ধ ছিলাম। বয়সে খেলা-ধুলা বিশেষ কিছু তিনি না করিলেও বাঙালীর খেলা-ধুলা-সঙ্ঘ প্রভৃতির সহিত যে ভাবে তিনি মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতে দেশের যুবজনের কি কল্যাণকামী যে তিনি ছিলেন, তাহা না বলিলেও চলে। তাঁহার বিয়োগে আমরা একজন বিশিষ্ট বন্ধু হারাইলাম। ব্যথিত আমরা, আমাদের কাতর প্রার্থনা, তাঁহার অত্মার মঙ্গল হউক।

মহারাজা সার্ মন্মথনাথ চৌধুরী—পরলোকে

'বোট রেস্'—খেলা-ধুলা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতা। জয়ীর সম্মান বুঝি রাজ সম্মানকেও ছাপাইয়া যায়। প্রতিযোগিতার কথা ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণের মুখে মুখে। পাট্নী হইতে মটলেক্ পর্য্যন্ত নদী সৈকতের উভয় পার্শ্বের বিপুল জনতা, উভয় পক্ষের সমর্থনকারীদের অপূর্ব্ব উন্মাদনা এবং বালক বালিকাদেরও তাহাতে যোগদান, উপভোগ করিবার। এই রেস্ প্রথম আরম্ভ হয় কিন্তু কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে লুকাইয়া, চোরের মত। সেই প্রতিযোগিতা এখন জাতীয় উৎসব সমারোহে পরিণত।

'বোট্ রেসে', বিজয়ী কেম্ব্রিজ্ দল

গত বৎসরে পরাজিত কেম্ব্রিজ্ এবার অক্সফোর্ডকে পরাজিত করিয়াছে। ৪১/৪ মাইলের বাজী ১৯ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে মাৎ করিয়া কেম্ব্রিজ্ অক্সফোর্ডকে পশ্চাতে 'চার বাচ' দূরে রাখিয়া দেয়।

লাহোর ফুটবল—লাহোরের মণ্টমরেন্সি কাপে কলিকাতার মোহামেডন স্পোর্টিং এবার যোগদান করায় মোহামেডনের খেলার 'ঠাঠ' এ বৎসরে এখানে যাহা হইবে, তাহার আভাষ পাইবার সুযোগ ক্রীড়ামোদীরা পাইয়াছেন। পথে দিল্লীতে দুইটী সঙ্ঘের সহিত খেলায় এবং তাহার পরে বাজীর খেলায় 'লাহোর কলেজিয়ন',

'হিরোজ' দল এ সিগ্‌নাল্ সার্ভিসকে ঘাইল করিয়া প্রতিযোগিতার শেষ গণ্ডীতে পৌছান হইতে মোহামেডনের শক্তি অটুট থাকারই পরিচয় পাওয়া
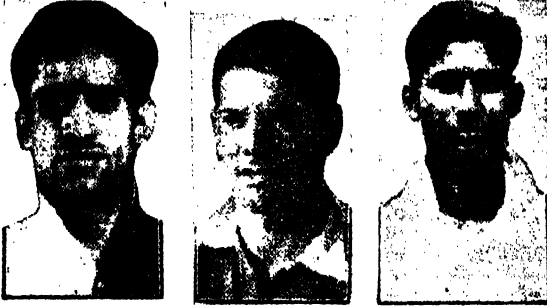
বেণীপ্রসাদ (মোহনবাগান)

কোনলী (ক্যালকাটা)

দেব (মোহনবাগান)

যায়। শেষ গণ্ডীতে ও মোহামেডনের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই।

আই-এফ্-এ—গণ্ডগোল বাধাইয়া 'কে বড়', 'কে ছোট' প্রমাণ করিতে আই-এফ্-এর কোনও কোনও ধুরন্ধর জাল পাতিয়া সদাই শশব্যস্ত। সৌভাগ্যের বিষয় কাউন্সিলের বাৎসরিক অধিবেশন এবার সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইয়াছে। দল 'অদল বদলের হিড়িক' ও তত' উত্তেজনাকর হয় নাই। না হইলেও ভবানীপুর ও হাওড়া ইউনিয়ন্ কি দশায় পড়িয়াছে কে জানে—শনি কি?—এই দুই দলের নামজাদা অনেক খেলোয়াড় 'ট্রান্স্‌ফার' লইয়া অন্য দলে গিয়াছে। ভবানীপুর বা হাওড়া তাহাতেও উৎসাহহীন নহে — এই ত' চাই! কলিকাতার ফুটবল্ মরশুমের শেষে ইংলণ্ড হইতে ভারতে এবার পেশাদার একটী ফুটবল দল আসার জল্পনা, কল্পনা চলিতেছে। আই-এফ-এ কি ভাবে নাচিয়া উঠে দেখা যাউক।

'লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্'—পর পর চারি বৎসর হকি লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হইল কাষ্টম্‌স্। পূর্ব্বে পর পর চারি বৎসর লীগ্ জয়ী হইয়াছে রেঞ্জার্স। এ বৎসরের লীগের শেষ খেলায় রেঞ্জার্সের সহিত কাষ্টম্‌সের খেলার ফল সমান সমান (০—০) হইয়াও কাষ্টম্‌স্ বাজিমাত করিল এক জয়াঙ্কে। খেলায় উভয় দলই তুল্য মূল্যের —কে বড়, কে ছোট বলা দুষ্কর। সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে এই মাত্র বলা যায়, কাষ্টম্‌সের অগ্রচারী দলের গোল গলাইবার শক্তি রেঞ্জার্সের অপেক্ষা অধিক। বিরুদ্ধ গোলের সংখ্যা হইতে দেখা যায় উভয় দলের রক্ষণ-বিভাগের শক্তি প্রায় সমান সমান। কাষ্টম্‌স্-অগ্রচারী কৌশলী হইয়াও রেঞ্জার্সের রক্ষণ বিভাগ ভেদ করিতে পারে নাই, রক্ষণ বিভাগের রক্ষা করিবার শক্তি পর্য্যাপ্ত বলিয়া। দুইটী দলই 'সেরা' দল। শেষ খেলা কিন্তু 'সেরা' হয় নাই—উত্তেজনা ও অতি সাবধানতার কারণে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রেঞ্জার্সের পরবর্ত্তী স্থান মিলিটারী মেডিকেল কর্ত্তৃক অধিকৃত। তৃতীয়ের জয়াঙ্ক কিন্তু দ্বিতীয়ের 'পাঁচবাড়ি তফাৎ'। সপ্তম স্থানে মোহামেডন্ এবং নবম স্থানে মোহবাগান বিরাজমান। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল সংখ্যা মাত্র ১১। মিলিটারী

১৯৩৯শের হকি লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্—কাষ্টম্‌স্

মেডিকেলের বিরুদ্ধেও ১১টী গোল হইয়াছে। মোহনবাগানের রক্ষণ-বিভাগ সুতরাং শক্তিশালী বলিতেই হইবে। রক্ষণ-বিভাগের শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মোহনবাগানের অগ্রচারী দল খেলিতে পারিলে, মোহনবাগান তালিকায় অনেক উচ্চে অবস্থান করিতে পারিত। ১৯০৫ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত বাঙালীর দুইটী দল গ্রীয়ার ও মোহনবাগান প্রত্যেকে একবার করিয়া লীগ্ জয়ী হইয়াছে। অন্যদিকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জয়ী হইয়াছে চারিবার, কাষ্টমস্ ষোলবার, রেঞ্জার্স ছয়বার, সেণ্টজেভিয়ার্স দুই বার, ক্যাল্‌কাটা একবার ও মিলিটারী মেডিকেল্ একবার। সামরিক দলের নাম গন্ধও জয়ীর তালিকায় নাই। কাষ্টমসের মোট গোল সংখ্যা এবার হইয়াছে ৮০। ইহার মধ্যে ওয়েষ্টন করিয়াছে ২১ ও রেণ্টন্ ১৯, হেণ্ডারসন (১৬) সি ম্যান (১৩) রেবেলো (৭) রীড্ (৩) ও ডি-ফোণ্টস্ (১)। ভবানীপুর দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া গিয়াছে। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল ইষ্ট বেঙ্গলেরই নামিবার কথা। ভাগ্যচক্রে বা অন্য কোনও চক্রে ভবানীপুরের এ দুর্গতি হইল কে বলিবে! ভবানীপুরের সঙ্গে নামিল ডালহাউসীও। দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সেণ্ট্ জোসেফ ও লিলুয়া প্রথম বিভাগে উঠিল।

বেটন্ কাপ—স্থানীয় দল ও বাহিরের দল মিশাইয়া বেটন্ কাপে প্রতিযোগী দলের সংখ্যা এবার ৪২।

নেষ্টর পেরিস্ জে, লাম্‌সডেন্
(রেঞ্জাসে'র কুশলী হকি খেলোয়াড়ত্রয়)

বাহিরের সুবিখ্যাত বম্বে লুসিটানিয়া ও ঝান্সী হিরোজ্ ইহার মধ্যে আছে। কলিকাতার কাষ্টমস্, রেঞ্জার্স বা মেডিক্যাল্ অল্পে যে কাহাকেও পরিত্রাণ দিবে, মনে হয় না। 'প্রবর্ত্তক' মুদ্রিত হইবার কালে প্রথম গণ্ডীর খেলার মধ্যে বি-এন্-আর (বি) ক্যাল্‌কাটাকে ১ গোলে, ডালহাউসী মেজররস্‌কে ৩-২ গোলে, পোর্ট কমিশনার মাড়ওয়াড়ীকে ৩ গোলে, ই-বি-আর ইউনিয়ন্ স্পোর্টিংকে ৩ গোলে পরাজিত করিয়াছে এবং সেণ্টজেভিয়র ও পুলিশের খেলার ফল হইয়াছে সমান সমান (০—০)। এই কয়টীর মধ্যে 'জোর খেলা' হইয়াছিল শেষেরটীতে। দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাওয়া ডালহাউসীর ধাক্কায় মেজররেরা 'কাৎ' হওয়া অঘটন নহে। খেলার তৌলে ডালহাউসীই—সেদিনের খেলায় সেরা—সর্ব্ববাদীসম্মত।

ছোটদের স্পোর্টস্—হালি খেলা-ধূলার বঙ্গদেশে যাঁহারা জন্মদাতা বর্ত্তমান কালে খেলা ধূলার সার্ব্বজনীনতায় তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতেছে কে জানে! বিশ্ববিদ্যালয় খেলা-ধূলার বিষয়ে কুম্ভকর্ণকেও হার মানাইয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল যুগ যুগ। 'ফ্যাশনের হ্যাচ্‌কায়' গলে রজ্জুবদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে বিশ্ববিদ্যালয় 'নড়িয়া বসিয়া' বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে—খেলা ধূলার হৈ-হৈ-য়ে গলা বাড়াইয়া দিয়াছে। না বুঝিয়া যা তা করিয়া এই গলা বাড়ানর পরিণাম চিন্তা করিবারও ইহাদের সময় বা সামর্থ্যে কুলায় নাই। ইউনিভার্সিটির দেখাদেখি কলেজ, স্কুলের (উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন) খেলা-ধূলা এথেলেটিক্ স্পোর্টসের কত রকমই দেখা যাইতেছে—'আসলে কিন্তু ফক্কা' যুব বা শিশু সমাজের স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উপকার যে ইহাতে হইতেছে বা ইহাতে এইভাবে চলিলে উপকার হইবার কোনও সম্ভাবনা আছে, কিছুতে বলা যায় না। বালিকাদের খেলা-ধূলা ও স্পোর্টস্ বালকদের ন্যায় 'একগোয়ালেরই'। মন্দের ভাল সম্প্রতি সিটি হাই স্কুলের স্পোর্টসে 'তিন দফা' বিজয়িনী আশালতা দে পাঠ এবং গৃহকর্ম্মাদিতেও অনলস। আশা করি, এই স্কুলের অন্যান্য স্পোর্টস্ বিজয়িনীরাও অনুরূপ মতিগতি সম্পন্না। বিজয়িনীদের নামঃ দৌড়, অরেঞ্জ রেস্ ও থ্রেড্‌নিড্‌ল রেসে—আশালতা দে; 'বি' গ্রুপ দৌড়ে—গায়ত্রী রায়; অঙ্ক দৌড়ে ও পোটাটো রেসে—গীতা রায়।

জ্যোতিষের চোখে ১৩৪৬ সাল

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

পৃথিবী জুড়ে একটা বিরাট উত্তেজনার চাঞ্চল্য প্রবাহিত হচ্ছে, যাতে ক'রে ছোট বড়, ধনী-দরিদ্র সকলেই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। যার উপর আস্থা স্থাপন ক'রে রাজনীতিজ্ঞেরা নিজেদের কার্য্য প্রণালী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে আসছিলেন সেই অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি লৌকিক বিজ্ঞানগুলি আজকার পরিস্থিতির মধ্যে দিশেহারা হ'য়ে পড়ছে। ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ সম্বন্ধে যা কিছু আদর্শ বর্ত্তমান সভ্যতায় গ'ড়ে উঠেছিল, একটা বিরাট আলোড়নে সব যেন তলিয়ে যাবার উপক্রম করছে। সকলেরই মনে এই প্রশ্নটাই জাগছে ততঃ কিম্—এর পরিণতি কোথায়।

আমি জ্যোতিষের আলোচনা করি ব'লে অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করেন, জ্যোতিষের দিক দিয়ে এ সম্বন্ধে কী ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে' ইউরোপের এই যে পরিস্থিতি ভারতবর্ষের উপর তার প্রতিক্রিয়া কী ভাবে অভিব্যক্ত হবে, বন্ধু-বান্ধবেরা এই প্রশ্নটাই বেশী ক'রে করেন।

দূর ভবিষ্যতের কথা এখন বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এই ১৩৪৬ সালে পৃথিবীর উপর বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের উপর কোন্ গ্রহের প্রভাব কী ভাবে পড়েছে এবং ফলিত জ্যোতিষের মতে তার অভিব্যক্তি কোন্ দিক্ দিয়ে হবে, সে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে সূর্য্য পিতা এবং রাজা, সূর্য্যের প্রভাবেই পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক বৎসর বসন্ত কালে সূর্য্য যে মুহূর্ত্তে বিষুব রেখার উপর উপস্থিত হ'ন সেই মুহূর্ত্তে তাঁর ভাব যেমন থাকে, সেই বৎসরটি তিনি সেই ভাবে পৃথিবীকে পালন বা শাসন করেন। তাঁর সেই দিনকার ভাবের উপর পৃথিবীর এক বৎসরের ভাল মন্দ নির্ভর করে।

এ বৎসর রবি বিষুব রেখার উপর এসেছিলেন গত ২১ শে মার্চ্চ (৭ই চৈত্র) কলকাতার বিকাল ৬টা ২৩ মিঃ এবং দিল্লীর বিকাল ৫টা ৩৮ মিনিটের সময়। এই সময় রবি অপর সমস্ত গ্রহদের সঙ্গে যে রকম সম্বন্ধ করেছিলেন, তাতে আসছে বছর সারা পৃথিবীর উপর তাঁর অনুগ্রহের চেয়ে নিগ্রহের ভাবটাই প্রকাশ পাবে বেশী।

মঙ্গল এবং প্রজাপতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট অশুভ প্রেক্ষা হয়েছে। তার ফল শাস্ত্রে এই রকম লেখে—

বিবাদ, শক্রতা, যুদ্ধ—প্রত্যেক দেশের ভিতরে ও অন্য-দেশের সঙ্গে। জাতিতে জাতিতে শক্রতা ও অসদ্ভাব। মিত্র বিচ্ছেদ। সব দেশে একটা সামরিক মনোবৃত্তি দেখা যাবে, চারদিকে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হবে, দেশের মধ্যে দলাদলির প্রাদুর্ভাব হবে খুব বেশী। শাসকবর্গ বা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ শক্রতা করবে যার ফলে তাঁদের বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'তে হবে। সৈন্যদলের মধ্যেও উত্তেজনা উপস্থিত হবে এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুর আধিক্য পরিলক্ষিত হওয়া সম্ভব। সব দেশেই রাজন্যবর্গ এবং ভূম্যাধিকারীদের বিরুদ্ধে একটা উত্তেজিত মনোভাব দেখা যাবে। এই প্রভাবের সময় শাসকমণ্ডলীর মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হবে, তাতে অনেক সময় তাঁদের মাথা ঠিক রাখা মুস্কিল হ'য়ে উঠবে। তার ফলে তাঁদের কাজে অনেক সময় অবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁরা এমন সব ক'রে বসবেন, এমন কোন নূতন আইন করবেন অথবা এমন সব সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করতে চাইবেন যা জনসাধারণের বিরোধী মনোভাবকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে। এই প্রভাবের ফলে শক্তিমান তাঁর শক্তি যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করতে চাইবেন, যার ফলে এক এক দলের মধ্যে ভাঙন ধরবে, এক এক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মতভেদ ও অসদ্ভাব উপস্থিত হবে। এই প্রভাবে দেশে দেশে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ এবং তাই নিয়ে ধর্ম্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতির সৃষ্টি হবে। বিপ্লববাদীরা

এই সময়ের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করবে।

এর আরও কতকগুলি ফল হচ্ছে এই যে, অনেক দেশেই বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের উপর জনসাধারণ বিরক্ত হ'য়ে উঠবে এবং কোন কোন দেশে শাসন প্রণালী একেবারে উল্টে যাবে—অনেক জায়গায় অরাজকতার ভাব আসবে। কোন কোন দেশে রাজ্যের কর্ণধারের অপযশ, প্রতিষ্ঠ হানি, পদচ্যুতি এবং জীবন হানির পর্য্যন্ত অশঙ্কা আছে। সব জায়গায় বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিদের কলঙ্ক রটানর চেষ্টা দেখা যাবে।

শাস্ত্রের লেখা এই ফল থেকে বোঝা যায় যে, এটা শাসক শ্রেণী এবং শক্তিমান্ ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে দুর্ব্বৎসর। বহু শক্তিমান্ ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির পতন ও তিরোধান এ বৎসর ঘটবে। ফ্যাসিজম্ নাৎসীবাদ বা ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি এই বৎসর চরমে পৌছুবে।

ভারতবর্ষে এর অভিব্যক্তি কী ভাবে ঘটবে তা বোঝা যাবে রবির এই বিষুব সংক্রমণের সময় রাজধানী দিল্লীতে এর প্রভাব যে ভাবে পড়েছিল তা থেকে এবং বাঙলা দেশের ফলাফল বোঝা যাবে কলকাতার এই সময়কার গ্রহসংস্থান থেকে।

দিল্লী ও কলকাতা দু'জায়গাতেই এ সময় কন্যারাশি উদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু দিল্লীর রাশিচক্রে প্রধান প্রভাব পড়েছিল বরুণ বা নেপচুনের এবং কলকাতার রাশি চক্রে সব চেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছিল শুক্রের।

এই গণ্ডগোলের মাঝখানে যেখানে সারা পৃথিবী একটা ওলট-পালটের প্রতীক্ষা করছে সেখানে ভারতবর্ষে বরুণের এই প্রভাব একটু আশ্চর্য্য ঠেকে। কেননা, এই প্রভাবের একটা প্রধান ফল হচ্ছে যে সাধারণ হিসাবে গভর্ণমেন্টের শক্তি বাড়বে, উচ্চ ও প্রতিষ্ঠাশালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর কৃষক সম্প্রদায়ের একটা সহযোগিতা দেখা যাবে, শাসনের সংস্কার, অনুন্নতদের উন্নতি এবং আইন-প্রণয়ন ও তার সুব্যবস্থিত প্রয়োগের দ্বারা দেশের গভর্মেণ্ট ও জন-সাধারণ উভয়েরই শক্তি-বৃদ্ধি হবে। দিল্লীর উপর এই প্রভাব দেখে মনে হয় যে, যতই বিরুদ্ধাচরণ হোক্ যাই হোক্, ফেডারেশন শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হবেই এবং তা বিশেষ কোন কুফল প্রসব করবে না।

এই বৎসর ভারতবর্ষে অনুন্নতদের উন্নতির জন্য নানা চেষ্টা হবে। সাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিকে লক্ষ্য পড়বে, সাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বহুপ্রতিষ্ঠান গঠিত হবে এবং এ ব্যাপারে অনেক দাতা অযাচিত ভাবে অর্থ-দান করবেন।

সারা ভারতের এই অবস্থা হ'লেও বাঙলা দেশের ভাগ্য কিন্তু সুপ্রসন্ন নয়। অবশ্য, সাধারণ ভাবে ভারতের খানিকটা ফল বাঙলাদেশ পাবে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব ফল মোটেই সুবিধার নয়।

বাঙলাদেশের এ বছরকার ভাগ্য নিয়ন্তা হয়েছেন শুক্র। তিনি আছেনও পঞ্চমে—কাজেই সোণায় সোহাগা হয়েছে। এই শুক্রের সঙ্গে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, প্রজাপতি এ-সকলের অশুভ প্রেক্ষা—কেবল বুধ ও শনির শুভ প্রেক্ষা।

প্রথমে শুক্রের ব্যাপারটা বোঝা যাক্। শুক্র নির্দ্দেশ করে আনন্দ,উৎসব, কাব্য, শিল্প, নৃত্যগীত সঙ্গীত, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, স্ত্রীলোক, শিশু প্রভৃতি। পঞ্চম ভাবও নির্দ্দেশ করে প্রায় ঐ একই ব্যাপার। সেখান থেকেও, আমোদ প্রমোদ, থিয়েটার-সিনেমা, কাব্য-সঙ্গীত স্পেকুলেশন, ফাটকা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির বিচার করতে হয়, সেই জন্যই বলছিলুম সোনায় সোহাগা।

প্রথমে খারাপ ফলগুলি বলি। এবার বাঙলায় অতিরিক্ত গ্রীষ্ম এবং অগ্নিকাণ্ড, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাকের আশঙ্কা আছে। প্রথমে অনাবৃষ্টি পরে বন্যা এবং ফলে দুর্ভিক্ষ হবে। দলাদলি খুব বেশী বৃদ্ধি পাবে। গভর্ণমেন্টের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ উপস্থিত হবে এবং ধর্ম্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ব্যাপারে আশঙ্কা আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা চরমে উঠবে। কাজেই অশান্তির একটা ফল্গুধারা সারা বছরটি ধরেই প্রবাহিত হবে। আইনপ্রণয়নের দিক দিয়েই হোক্ বা শাসন ব্যবস্থার দিক দিয়েই হোক্, কোন ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করতে পারবেন না। গভর্ণমেন্টের

আয়ের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধি হবে। সাধারণতঃ কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার প্রভৃতির দরে বিশেষ ওঠাপড়া লক্ষিত হবে। কোন বড় কোম্পানী বা ব্যবসায়ীর কারবার বন্ধ এবং দু' একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার আশঙ্কা আছে। স্ত্রীলোক ও শিশুর মৃত্যুর হার বাড়বে। নারীর উপর অত্যাচার, নারীহরণ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়বে এবং তাই নিয়ে এসেম্ব্লি ও কাউন্সিলে প্রশ্নোত্তর চলবে। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রী-পুরুষের কলঙ্ককাহিনী প্রচারিত হবে—এমন কি, এই রকম কোন ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াতে পারে।

এ সব সত্ত্বেও বাংলাদেশে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির দিকে জনসাধারণের একটা অতিরিক্ত ঝোঁক লক্ষিত হবে। সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে খুব আন্দোলন আলোচনা হ'তে থাকবে। স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রীলোকদের সাধারণ উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হবে বটে কিন্তু বিশেষ কাজ কিছু হবে না, বরঞ্চ স্ত্রীশিক্ষা যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এরকম কোন আন্দোলন প্রবল হ'তে পারে। যাতে সাধারণ শিক্ষা ব্যাহত হয়, এমন ধরণের আইনেরও পরিকল্পনা হ'তে পারে। বাঙলা সরকারের অনেক ব্যয় অস্থান-প্রযুক্ত হ'তে পারে এবং তার জন্য সাধারণের অপ্রিয় কোন নূতন ধরণের ট্যাক্সও ধার্য্য হ'তে পারে।

বাঙলা দেশের শুভযোগ একটু আছে যে, শিল্প-কলা-সাহিত্য ইত্যাদিতে তার অগ্রগতি পুরোমাত্রায় চলবে এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এ বৎসর তার কিছু প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। বাঙলার দু'চারজন ধনী এ বৎসর ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হবেন এবং দু' চারটি মিল-ফ্যাক্টরী প্রভৃতি বাঙলায় স্থাপিত হবে। সাধারণতঃ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ এ বছরে কিছু উন্নতি করবে।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাঙলার অবস্থা বড় ভাল নয়। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে নানারকম আন্দোলন হবে এবং ত্রুটি, অবিবেচনা বা ভ্রান্তিসঙ্কুল ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রীসভার নিন্দা ও প্রতিষ্ঠা হানি হ'তে পারে। বাঙলাদেশে যত রাজনৈতিক দল আছে তা সে কংগ্রেসই হোক্, মুসলিম লীগই হোক্, প্রজা-পার্টিই হোক, প্রত্যেক দলের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলাদলি, বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হবে। এঁরা পরস্পর পরস্পরের নিন্দা প্রচার করতে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করবেন যে, প্রকৃত কাজ কিছুই হ'য়ে উঠবে না। এই সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনেকেরই লোকপ্রিয়তা নষ্ট হবে এবং যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে আছেন, এমন সব ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রে লোকমান্য হবেন।

বাইরের পৃথিবীতে যে আলোড়ন উপস্থিত হবে তার ধাক্কা ভারতের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বাঙলার উপরই পড়বে বেশী। বাঙলার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ প্রচারিত হ'তে পারে যে, সেখানকার কেউ কেউ কোন শত্রুজাতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এবং এই কারণে নূতন আইনও রচিত হ'তে পারে, যার প্রয়োগ বাঙলার উপরই হবে বেশী।

ভারত এবং বাঙলার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে বলবার আরও অনেক কিছু রইল। বারান্তরে সেটা আরও পরিস্ফুট করবার ইচ্ছা আছে।

তবে মোট কথা এই যে, ভারতের অন্য সর্ব্বত্র যে সময়ে হরিজন-আন্দলোন, পল্লী-উন্নয়ন, জনশিক্ষা প্রভৃতির তরঙ্গ উঠবে, বাঙলা দেশে সেই সময় শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উচ্চস্থান অধিকার করবে। কিছু-'না'র চেয়ে তবুও ইহা মন্দের ভাল।

আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস ধারাবাহিক "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশিত হইবে। —পঃ প্রঃ

সমালোচনা

উপনিষদের আলো—বাংলাভাষায় রচিত ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বেনারস হইতে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গ্রন্থকারকে এক পত্রে লিখিয়াছেন :—

"শারদ-পূর্ণিমায় প্রকাশিত তোমার শারদ-পূর্ণিমার ন্যায় স্নিগ্ধ, মধুর ও সমুজ্জ্বল 'উপনিষদের আলো' বারম্বার বিলোকন করিয়া যে অসীম আনন্দ পাইয়াছি, তাহা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা আমার নাই। সংক্ষেপে উপনিষদের সারমর্ম্ম এমন সরল ও মধুরভাবে বাঙ্গলাভাষায় বুঝান যাইতে পারে এ বিশ্বাস আমার পূর্ব্বে ছিল না, তোমার এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষা জননীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরদিন অমূল্য রত্নহারের ন্যায় শোভা পাইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচরণ-যুগলে প্রার্থনা করি, তুমি নিরাময় ও সুদীর্ঘজীবী হইয়া মায়ের অফুরন্ত রত্ন-ভাণ্ডারে এইরূপ আরও অনেক রত্নালঙ্কারের সন্নিবেশ করতঃ বাঙ্গালীর গৌরব ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাক।"

উদ্ধৃতাংশ হইতেই পুস্তকখানির স্নিগ্ধ মাধুর্য্য অনুমেয়। বারান্তরে গ্রন্থখানির আলোচনা প্রকাশিত হইবে।—পঃ প্রঃ

নীরাজন—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—সাহিত্য-ভবন প্রেস, ২৭ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য বইখানিতে অপূর্ব্ববাবু পঁয়তাল্লিশটি কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা সবখানিই পড়িয়াছি এবং পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কবি আকাশে বাতাসে, মাঠে অরণ্যে, গ্রামে পল্লীতে, জীবজন্তুতে, নর ও নারীর মধ্যে একটা অজানা বস্তুর ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়াছেন; আর তাহাই তিনি বাঁধিতে চাহিয়াছেন ছন্দে ও গানে। যে সুর এই কবিতাগুলির ভিতরে অনুরণিত তাহা শাশ্বত, চিরন্তন, এ কারণ তাহা প্রত্যেক মানুষের প্রাণেই একটা দোলা দিয়া যাইবে কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র মাত্রা ঠিক রাখিয়াছেন, রসের হানি কোথাও ঘটে নাই। কবির ভাব ছন্দোবদ্ধ শব্দের ভিতর দিয়া পাঠকের প্রাণকে স্পর্শ করে, অনেক ক্ষেত্রে উদ্বেলিত করিয়াও তোলে। 'স্বরগের চেয়ে বড়', 'মেঠো পথ', 'খেয়া ঘাট' 'কৃষাণ পল্লী', 'মক্ষ ও মধুপ', 'ভুখারী' প্রভৃতি কবিতা কবিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে নিশ্চয়। বইখানির ছাপা বাঁধাই উত্তম। প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

—শ্রীযোগেশ বাগল

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম, এ, প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেহলীলা নশ্বর—বাণী অমর। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও বাণীর সমন্বয় করিয়া গ্রন্থকার সময়োপযোগি কাজই করিয়াছেন। নানা দিক্ হইতেই সুভাষচন্দ্র আজ বাঙ্গালীর অন্তরের আসন অধিকার করিয়া আছেন। সুভাষচন্দ্রের "কর্ম্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন সমস্যা আজ সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে কল্পান্তরের সৃষ্টি করেছে, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিবৃত্ত জাতির কাছে যে কত মূল্যবান্, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।" সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এই মন্তব্যই যথেষ্ট। বইখানি বাঙ্গালী মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। খদ্দরের প্রচ্ছদাবরণে গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা খুসী হইয়াছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী—শ্রীযতীন্দ্র-নাথ দত্ত সঙ্কলিত। ৩৯ নং মল্লিক বসু ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও চিত্রাদির সংযোজনার ফলে প্রথম সংস্করণের সহিত ইহার সাদৃশ্য হারাইয়া অভিনব সংস্করণই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ও পারিবারিক শোকতাপজনিত গ্রন্থকারের মনে যে বৈরাগ্য উদিত হয় তাহার আলোকে ঠাকুরের জীবনের স্বভাব-বৈরাগ্য ও নির্লিপ্ততা গ্রন্থ মধ্যে বেশ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্তিবান গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা মণ্ডিত হইয়া অমৃত সমান 'রামকৃষ্ণ-জীবনী' আরও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

Small pox--by Nagendra Kumar Mazumdar, published by Prof. J. K. Choudhury, M. A., 216, Cornwallis Street, Calcutta. Pages 136, price 2/8/- cloth.

ইংরাজীভাষায় অবধূত প্রণালীতে বসন্ত চিকিৎসার বই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বসন্তের কোন চিকিৎসা নাই বলিলেই চলে; যাহা আছে, তাহা টীকা দ্বারা রোগ প্রতিষেধের চেষ্টা—চিকিৎসা নহে। সুতরাং বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে ভারতবাসী ভারতীয় অবধূত প্রণালীর সাহায্যেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করে, আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়। এইজন্যই এই চিকিৎসাপ্রণালী এ দেশে একরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রণালী এত কাল মুষ্টিমেয় লোকের নিকট গুপ্তভাবে ছিল। সর্ব্বসাধারণ বা বৈজ্ঞানিকগণ ইহার বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। নগেনবাবু এই গুপ্ত-চিকিৎসা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া, একদিকে যেমন ইহার প্রচারের সহায়তা করিলেন, অপর দিকে তেমন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণকে এই প্রণালী পরীক্ষার সুযোগ দিলেন। ভারতবাসীর এই অবধূত চিকিৎসার মূলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে, তাহা গবেষণা এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থির হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থকার রোগের ইতিহাস, নিদান, লক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা, শুশ্রূষা, প্রতিষেধ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জলবসন্ত, মুসুরিকা, হাম প্রভৃতির ভেদ নির্ণায়ক সঙ্কেতও ইহাতে আছে। চারিটী পরিশিষ্টে নানা মতবাদ, শুশ্রূষাকারীর জ্ঞাতব্য, বর্ম্মার "সেসায়া" চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভারতীয় ওজনের ইংরাজী পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় গাছগাছড়ার ইংরাজী, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিন্দি ও বাঙলা পরিভাষা পুস্তকের উপযোগিতা বাড়াইয়াছে। শেষের দিকে একটী শব্দ-সূচী আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল। অনাবশ্যক পুনরুল্লেখ দোষ বইখানির প্রধান ত্রুটী।

—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ
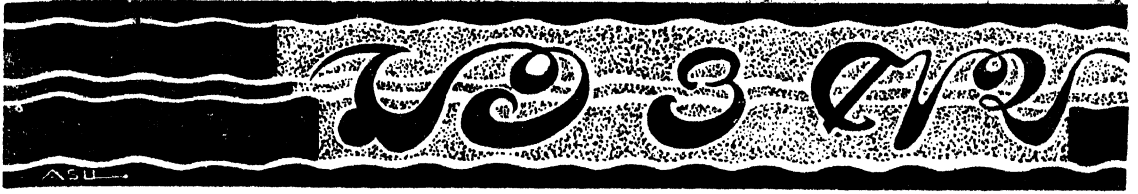
অভাব ও তাহার প্রতিকার

কলেজের এক চতুর্থাংশ আর স্কুলের এক তৃতীয়াংশ ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ। দেশের শতকরা ৪০ জন জরাজীর্ণ। আজ বিচার চলিতেছে, মানুষের খাদ্যে ফস্‌ফরাস্, ক্যালসিয়ম, আয়রণ, ভাইটামিন, প্রোটীন কতটা আছে, কতটা নাই। এই বিচার—কাজ না থাকিলে, ব্যাগার খাটার মত সময়ের অপব্যয়। আসল কথা, ভারতের লোকেরা ক্রমেই অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। অর্থহীন হওয়ার কারণ—ষোল আনা শ্রম দিয়াও, আজ মানুষের জীবন রক্ষা হয় না। চাকুরীজীবিরা তবুও দুই মুঠা খায়, কিন্তু শ্রমজীবির সংখ্যা আমাদের দেশে ৮০ জনেরও উপর। তারা শ্রমের মূল্য পায় না।

এ দেশের কৃষি-সম্পদ্ প্রধানতঃ পাট ও ধান। উঁচু জমিতে শাক-সব্জির আবাদ হয়, কিন্তু মূল্য নাই। এক এক বিঘা জমির খাজনা ২॥০—৩৲ টাকা। বীজ-ধান ও শ্রম বিঘা প্রতি ২॥০ টাকা পড়ে। এই বিঘা প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই ফলন দেখি—৩।৪ মণ ধানের অধিক নহে। কৃষক দেড় টাকার বেশী ধানের মূল্য পায় না; এই অবস্থায় তাহার কি অবস্থা হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। পাটের কথাও এইরূপ। পল্লীতে শাক-সব্জির দাম নাই। গো-পালন করিয়াও লাভ নাই। এক সের দুগ্ধ দুই পয়সা হইতে এক আনায় বিকায়। খাজনার টাকা চাই, বীজ-ধান-খরিদের টাকা চাই, বস্ত্র-খরিদের টাকা চাই। ঔষধ-পথ্যের টাকা চাই। স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য রেল-ভাড়ার টাকা চাই। অথচ উৎপন্ন বস্তুর মূল্য তদনুযায়ী মিলে না। এ জাতি বাঁচিবে কেমন করিয়া? ঋণ-সালিসী বোর্ড করিয়া গভর্ণমেণ্ট অনেক দরিদ্রকে মহাজন মারিয়া ঋণ-মুক্ত করিতেছেন। জমীর খাজনা কমাইয়া, কৃষিজাত উৎপন্ন বস্তুর দর বাড়াইয়া, জাতিকে বাঁচাইবার তাঁহারা উপায় করিতেছেন না কেন? এইদিকে শাসন-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি

অভাবেই জাতি মরে

গরীব দেশ ব্যাধিমুক্তির জন্য প্রকৃতির বিধান মানিয়া চলিলে, অনেক সময়ে ব্যাধি-মুক্ত হওয়া যাইত। দেশের টোট্‌কা-টাট্‌কা ঔষধেও আমরা রোগমুক্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার বিপরিণামী ফল—ডাক্তার ও ঔষধ দুইই না হইলে, আর আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। কিন্তু এই দুইয়েরই অভাব সর্ব্বত্র। ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা ৪০ হাজার। অতএব দেখা যায়, প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য একজন ডাক্তার মিলিতে পারে। আমরা দেখিতেছি—ডাক্তারদেরও অন্নাভাব হইতেছে। ইহার কারণ যে জাতির অর্থাভাব, তাহা আর বলিতে হইবে না।

মৃত্যুর ডাকে বাঙ্গালী

যক্ষ্মা-রোগ-নিবারণের জন্য লেডী লিন্‌লিথগোর প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছে। এইজন্য তিনি ৭৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতে গভর্ণমেণ্টের চক্ষের উপর যক্ষ্মা-রোগে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক মরে। এই রোগে অলক্ষ্যে যে কত মৃত্যু-সংখ্যা, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এক বাংলা দেশের হিসাবেই জানা যায়—দশ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়। ৪৩ হাজার লোক চিকিৎসা করার সুযোগ পায়। আর এক লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাংলায় পুরুষের চেয়ে এই রোগে নারীর মৃত্যু-সংখ্যা অধিক। ইহার মধ্যে আবার হিন্দুনারী অধিক মরে। আর দেখা যায়—যক্ষ্মারোগ ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যেই মানুষকে বেশী আক্রমণ করিয়া থাকে। খাদ্যাভাবে জাতির তরুণ প্রাণ সবল ও সুস্থ নহে। তাই এই কাল-ব্যাধির আক্রমণ। আর হিন্দুনারী পতি-পুত্রের মুখে অধিকাংশ অন্ন-গ্রাস তুলিয়া দিয়া নিজে কদন্ন গ্রহণ করে,

তাহা কি আর বলিতে হইবে? বাঁচার জন্য জাতির লক্ষ্য কোনদিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।

ম্যালেরিয়ার কবলে জাতির ধন ও প্রাণ

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চলে। এই বৎসরই বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফিবার কমিশনের বিশেষজ্ঞেরা স্থির করেন —অবৈজ্ঞানিক উপায়ে রেলপথ নির্ম্মাণ হওয়ায় জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই ম্যালেরিয়া রোগোৎপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই রোগ ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোকের প্রাণসংহার করিয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। প্রতি বৎসর দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—১৯॥০ কোটী টাকা ম্যালেরিয়ায় ব্যয় হয়। রোগাক্রান্ত অবস্থায় কর্ম্ম করিতে অক্ষম হওয়ায় ২৩॥০ কোটী টাকা আয়ের ক্ষতি হয়। শরীরের দুর্ব্বলতার মূল্য ৭১ কোটী টাকা হইবে। ম্যালেরিয়া রোগে মৃত ব্যক্তির দাহ-কর্ম্মে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। মোট হিসাব করিলে, ম্যালেরিয়া রোগ শুধু প্রাণহরণ করে না, প্রতি বৎসর দেশের ৮৮ কোটী টাকা ক্ষয় করে। অতএব যক্ষ্মারোগের অপেক্ষা ম্যালেরিয়া যে কিরূপ সমধিক প্রাণঘাতী, তাহা আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু উপায় কি?

রেলের আয়

রেলের জন্য যদি ম্যালেরিয়া-রোগের উৎপত্তি হয়, তবে এই সঙ্গে আমরা ১৯৩৭।৩৮ খৃষ্টাব্দে আয়ের হিসাব দেখাইব। রেল-কোম্পানী এই বৎসরে যাত্রীভাড়া বাবদ পাইয়াছে ২৮ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা। মালের ভাড়া পাইয়াছে ৬৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা। পশুপক্ষীর ভাড়ায় আদায় হইয়াছে ৫ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা। বিবিধ খাতে আয় হইয়াছে ১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা। মোট আয় ১০০ কোটী ২১ লক্ষ টাকা। ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, এই আয়ের এক চতুর্থাংশ টাকা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের নিকট হইতেই গভর্ণমেণ্ট কি রেল-কোম্পানীর নিকট হইতে শতাংশের একাংশও আদায় করিতে পারেন না? জাতিকে বাঁচাইবার জন্য জাতির দরদীদের হস্তে গভর্ণমেণ্ট আসিলে প্রতিকারের আশা আছে। হুজুগ না করিয়া, বর্ত্তমান প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি এই দিকে অবহিত হইবেন কি?

শাসন-সংস্কারে জাতি কি শক্তি লাভ করিয়াছে?

জাতির হস্তে রাজ্যশাসনের অনেকখানি শক্তি বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারে আসিয়াছে, বলিতে হইবে। যদি তাহা না হইবে, তবে এতদিন পরে কলিকাতায় শতকরা ৭৫ জন হিন্দু হইলেও, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার কর্পোরেশনের সদস্যসংখ্যা ইচ্ছামত করিয়া লওয়ার সাহস করেন কেমন করিয়া? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার লওয়ার জন্য দেশীয় মন্ত্রিগণ-পরিচালিত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কোন ভরসায় অগ্রসর হইয়াছেন? বাংলার বাজেটে মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয় কি প্রকারে? সরকারী চাকুরীতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত লোক গ্রহণ করার সুবিধা পান কেমন করিয়া?

দেশীয়দের হস্তে শাসনশক্তি না আসিলে, আজ হক-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করার সুবিধা পাইতেন কি? শুধু বাংলা কেন, বিহারীদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি আসিয়াছে বলিয়াই তো বিহার গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীবিদায়ের ঝাণ্ডা তুলিয়াছেন। কংগ্রেসশাসিত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলিও ইচ্ছামত শাসনশক্তি চালাইবার ক্ষমতা পাইয়াছেন বলিয়াই তো জাতিগঠনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। মহাত্মাজীর ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষানীতি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচলন করার ভরসা আছে বলিয়াই তো তিনি তাঁর অভিজ্ঞতানুযায়ী নব শিক্ষাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এ কথা শুধু বাংলার হিন্দুই বুঝে না, তাহারা ইংরাজের বিদায়-বাদ্যই বাজায়। বামপন্থীরা জয়ঢাক কাঁধে আজিও ধুনার গন্ধে ধ্বংসের মনসা দেবীকেই ডাকিয়া আনেন। ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে বাংলার জাতীয়তাপন্থী হিন্দুরা কি একবার ভাবিয়া

কর্পোরেশনের নূতন আইন

কলিকাতার লোক-সংখ্যার মধ্যে হিন্দুপ্রাধান্য কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট শাসনশক্তির সহায়ে কলিকাতার কর্পোরেশনে কলিকাতা হিন্দুপ্রধান হইলেও, হিন্দুদের প্রাধান্য নাকচ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মোট ৯৯ জন সদস্যের মধ্যে ২২ জন মুসলমান সদস্য, ইউরোপীয়ান সদস্য ১২ জন, এ্যংলো-ইণ্ডিয়ান ২ জন, শ্রমিক ২ জন—এবং তাহা ছাড়া সরকারী মনোনীত ১০ জন এবং অল্‌ডারম্যান ৫ জন হইবেন বলিয়া প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। বাকী ৪৬ জন সাধারণ সভ্যের মধ্যে মাড়োয়ারী আছে, জৈন আছে এবং হিন্দু বাঙ্গালীও আছে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে এক সিলেক্ট কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সিলেক্ট কমিটীর অভিমত মূল প্রস্তাবের পক্ষে আদৌ মূল্যবান্ নহে। কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ বলিয়াছেন যে, মোট সদস্যসংখ্যার উপর ১৬টী বৃদ্ধি করিয়া নির্ব্বাচনযোগ্য আসন ৮৪টীর মধ্যে ৬২ বরাদ্দ করা হউক। অবশ্য লোকসংখ্যানুপাতে হিন্দুসমাজের জন্য ইহাই উচিত দাবী; কিন্তু শাসনশক্তি যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের ইচ্ছামত কর্ম্মই হইবে। অতএব বাংলার জাতীয়তাবাদী হিন্দু অথবা মুসলমান, তাঁহাদের দাবীর সত্য যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে যে শক্তি হাতে পাইয়া কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্ট অভীষ্টমত কাজ করিতেছেন, সেই শক্তি জাতীয়তাবাদীদের হস্তগত করার সুপথ নির্দ্ধারণ করাই শ্রেয়ঃ। বাঙ্গালীর আত্মরক্ষা ও আত্মগঠনের এই পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাদেশিক ভাগবাটোয়ারায় বাঙ্গালীর করণীয়

কংগ্রেস ভারতকে ২১ ভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন। এই ২১টী প্রদেশে ভাষা ভিন্ন। পরিস্থিতির ভৌগলিক সুনির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমাও আছে। মাদ্রাজের মন্ত্রিমণ্ডলী অন্ধ্রদেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশ-রূপে স্বীকার করিতে চাহেন। আসাম গবর্ণমেণ্টও শ্রীহট্টকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত বিভাগ অনুরূপ করিতে হইলে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ভারতসচিবের সমর্থন লইতে হইবে। মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্টের অন্ধ্রের স্বতন্ত্রীকরণ প্রস্তাবে ভারত-সচিব সম্মতি দান করেন নাই। আসাম গবর্ণমেণ্টের শ্রীহট্ট ছাড়ার প্রস্তাবও ভারতসচিব স্বীকার করিবেন কি না, সন্দেহ আছে। কিন্তু বাংলা-ভাষা-ভাষী জাতিকে এক প্রদেশের অন্তর্গত করিতে হইলে, কাছাড় ও শ্রীহট্ট আমাদের চাইই। এক বিহার গভর্ণমেণ্টকে মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া জেলাগুলি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এই কথা আমরা পূর্ব্বেই ভিন্ন প্রসঙ্গে বলিয়াছি। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-গুলির সদিচ্ছা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের এই বিষয়ে সজ্ঞান হওয়ার উপর ইহা নির্ভর করে। শাসন-সংস্কার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, শাসনসৌকর্য্যের জন্য তাঁহাদের প্রাদেশিক বিভাগে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের তাহা সমর্থন করিয়া লওয়ায় আগ্রহ থাকিলে, ভারতসচিবের ইহাতে অসম্মতির কারণ কিছু নাই। এই বিষয়ে বাঙ্গালী জাতিকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে।

আসামের কমিশনার পদ

আসাম গভর্ণমেণ্ট কমিশনারের পদ উঠাইয়া দিয়াছেন। নৈবেদ্যের চূড়ার সন্দেশের মত পদটী শাসনব্যবস্থার শোভাস্বরূপ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। এই পদের অভাবে দেশের শাসন-নীতির ক্ষতি হইবে না। এই সিদ্ধান্ত বহু আলোচনার পর আমাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ভারতসচিব ইহা নাকচ করেন নাই; কিন্তু এমন একটী দাবী করিয়াছেন, যাহা মানিয়া লওয়া আসাম গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কতটা সম্ভব হইবে, তাহা বলা বড় শক্ত নহে। ভারতসচিব আসাম গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, কমিশনারের পদ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ঐ পদস্থ সিভিলিয়ানদের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং যে সকল সিভিলিয়নের পদোন্নতির আশা ছিল, ঐ পদ উঠাইয়া দেওয়ার ফলে তাঁহাদের ভবিষ্যতের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহাও আসাম গভর্ণমেণ্টকে পূরণ করিতে হইবে। জাতি না

সুরাহা করার উপায় এইরূপ বন্ধ করা আমরা ভারত-সচিবের পক্ষে সমীচীন মনে করি না। দেশীয় গভর্ণমেণ্ট যদি শাসন বাবদ ব্যয় কমাইয়া জাতি-গঠনের পথে আগাইয়া চলিতে চাহেন, বৃটনের সেই পথে আজ সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে। স্বজাতি-পোষণের সঙ্কীর্ণতা হইতে তাঁহাদের মুক্তি লওয়ার দিন আসিয়াছে।

লক্ষ্য করিতেছে। ফ্রান্স ও বৃটনের সামরিক শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মানী ও ইটালী ইহা যে বুঝিতেছে না, তাহা নহে। এই জন্য ইহারা বৃটন ও ফ্রান্সের ত্রিসীমায় অগ্রসর হইতেছে না। এরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটন ও ফ্রান্সের অত্যুন্নত শির দেখিয়া তাহাদের শক্তির প্রতি আমাদের মিথ্যা অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সমস্যার রুষের দান কি?

প্রসিদ্ধ সমাজতন্ত্রী জননেতা বলিয়া ফেলিয়াছেন—বৃটন ও ফ্রান্সের মধ্যে এখন গণতন্ত্রবাদের মৌলিক প্রকৃতি বিদ্যমান আছে। আমরা জানিতাম—বামপন্থী অথবা সমাজতন্ত্রী একা রুশকেই গণতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা কিন্তু জহরলালজীর কথা সমর্থন করি। বর্ত্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রসমস্যা স্পষ্টই দেখা যায়—গণতন্ত্র রুশ তাহার মহান্ আদর্শবাদের অনুকূলে কোথাও একটী অঙ্গুলীও প্রকাশ্যে সঞ্চলিত করেন নাই। স্পেন যখন নাৎজী ও ফ্যাসিষ্টের প্ররোচনায় ডিক্টেটার ফ্রাঙ্কোর গ্রাসে পতিত হইতেছিল, রুশের মন্ত্রে দীক্ষিত স্পেনের গণতন্ত্র রাষ্ট্রের সহায়তাকল্পে আরও প্রবলভাবে ও প্রকাশ্যে তাহারই অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তারপর চীন রুশের গণতন্ত্রের সাহায্যপ্রতীক্ষায় আশান্বিত হইয়াই মাথা তুলিতেছিল। জাপান তাহা অবগত হওয়া মাত্র চীনের সে প্রাণ কোরকে বিনষ্ট করার জন্য যখন অগ্রসর হইল, রুশ তখনও প্রকাশ্য-ভাবে মাথা নাড়া দিবার সাহস করিল না। গণতন্ত্রের ঢক্কানিনাদ রুশ যত করে, এমন আর কেহ নহে। চীন ও স্পেনের গণতন্ত্রের ধ্বংসলীলায় রুশের এই সামরিক নিশ্চেষ্টতায় আমরা তার মতবাদের উপর আস্থা অপেক্ষা তাহাকে সুবিধাবাদী বলিয়াই মনে করি। বৃটন ও ফ্রান্স রুশীয় গণতন্ত্রেরবিরোধী এবং সে মতবাদকে জাহির যত না করে, তার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদেরই জয় তাহার কণ্ঠে—সাম্রাজ্যবাদই ফ্রান্স ও বৃটনের মর্ম্ম। এই মর্ম্মক্ষেত্রে শত্রু হোক, মিত্র হোক, কেহ যদি আঘাত দেয়, ফ্রান্স ও বৃটন তখনই উন্নত ফণা ধরিবে। চতুর জার্ম্মান ও ইটালী ইহা জানে বলিয়াই সাপুড়িয়ার মত এই দুই বিষধরের ফণার

প্রতীচীর রাজধর্ম্ম

ফ্রান্সের আফ্রিকার উপনিবেশ ও বিস্তৃত ইন্দোচায়না আর ইংরাজের বিশাল ভারত, মিশর, প্যালেষ্টাইন, ক্যোনেডা, অষ্ট্রেলিয়া—গুরুসাম্রাজ্য রক্ষাই ইহাদের লক্ষ্য। দুই হাতে যতটা ধরে, এই দুই জাতি তাহার অধিক হয়তো ধরিয়াছে। জার্ম্মানী ইহা বুঝিয়াই ইউরোপেই আত্মবিস্তারে অভিনিবেশ করিয়াছে। আদর্শবাদের মোহে ইংরাজ টলিবে না। জার্ম্মানী তাই বিনা রক্তপাতে একে একে মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হস্তগত করিয়া চলিয়াছে। আবিসিনিয়া-গ্রাসের পর ইটালী ফ্রান্সের প্রতি হুমকী দিয়া তাহার মনের কথা বুঝিয়া লইল। তারপর সে প্রায় ২০ হাজার বর্গ মাইল ও প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাসভূমি মোসলেম-রাজ্য আলবেনিয়া গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। আছে গ্রীস, আছে তুর্কিস্থান। এই দুই ক্ষুদ্র শক্তি আজ বোধ হয় ভেকের ন্যায় কম্পিত। জগতের রীতি ইউরোপে এইবার মূর্ত্তি লইতেছে। ক্ষুদ্র হইয়া বাঁচিতে হইলে, বৃহতের আশ্রয় লইতে হয়। যে আশ্রিত, সে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াই বাঁচে। তাহার স্বাধীন স্বতন্ত্র উচ্চশির প্রকৃতির পীড়নে নত হয়। ভারতে যুগ যুগ ধরিয়া এই লীলাই চলিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। মনুসংহিতায় তাহা দেখি—রাজা অবজ্ঞেয় নহেন। অসাবধান হইয়া অগ্নির নিকট যাইলে, স্বয়ং সে দগ্ধ হয়। কিন্তু রাজার কোপাগ্নি মানুষকে সপরিবারে পশু ও দ্রব্যসামগ্রীর সহিত বিনাশ করে। রাজা অনধিকৃত ভূমি ও রত্ন অধিকার করিবেন, অধিকৃত বস্তু রক্ষা করিবেন—উহা সুরক্ষিত বুঝিলে, উহার পরিবর্দ্ধনে

লক্ষ্যে পড়ে।' বৃটন ও ফ্রান্স ইহাই করিয়াছে। আজ ইটালি, জার্ম্মানী, জাপানের পালা। রুশের সুবিধাবাদ সুসিদ্ধ হইলে, সেও ইহা ছাড়িবে না। যাহা রাজধর্ম্ম, তাঁহা আদর্শবাদের ভুয়ো কথায় নাকচ হইবে না। আদর্শবাদী বাঙ্গালী জাতিকে আজ এই সনাতন নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাবধান হইতে হইবে, সতর্ক হইতে হইবে। বাঁচিবার ও আত্মপ্রাধান্য পুনঃপ্রাপ্তির এই পথ আর অবজ্ঞার নহে।

ধনতন্ত্রের অগ্রগতি

গণতন্ত্র না ধনতন্ত্র? যতক্ষণ যার ধন নাই, ততক্ষণ সে গণতন্ত্রের জয় গায়। আবার পদমর্য্যাদালোভী মানুষও গণতন্ত্রের নামে নিজের উন্নতির আশা রাখে। পদমর্য্যাদালাভ হইলে, ডিক্টেটর হওয়ার সাধ যায়। শক্তিমানের পক্ষে ইহা কিছু অসম্ভবও হয় না। হিট্‌লার, মুসোলিনী, এমন কি গণতন্ত্র রুশের ষ্ট্যালিনও যে মাথার মণি হইয়া আছেন, অবতরণের নাম নাই—গণতন্ত্রের উপরই বলিতে হইবে।

সোভিয়েট কংগ্রেসে ডিক্টেটর ষ্ট্যালিন এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়াছেন। গণতন্ত্রের উগ্র গন্ধ তাহাতে যথেষ্ট আছে। বক্তৃতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, লেনিনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাঁহাদের ত্যাগে ও আত্মদানের ফলে নব্য-রুশের সৃষ্টি, তাঁহারা আজ কোথায়? একজন রাষ্ট্রনীতিক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন — দেশের বিপ্লব-যুগে যারা আগায়, তারা শুধু প্রাণ হারায় না, পরবর্ত্তী যুগের সুবিধাবাদীরা আসিয়া তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া দেয়। রুশে তাহাই হইয়াছে। ষ্ট্যালিন আজ তাই রুশের রাষ্ট্রপতি।

নিজের নায়কত্ব কায়েমী করার জন্য বহু জননেতার শিরচ্ছেদ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। রুশের ধন-গৌরব বাড়াইবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টাও অল্প নহে। গণতন্ত্রের সুবাতাসে পাল তুলিয়া ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে রুশ আজ ধনতন্ত্রের পথে। তাই তিনি ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের ধন-ভাণ্ডারের দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। প্রতি বৎসর কোন জাতির কত ধনশক্তি বাড়িতেছে, তাহার উল্লেখ তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে বৃটেনের ধনাগারে ২ শত ২ কোটী ৯০ লক্ষ স্বর্ণ ডলার ছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উহা দাঁড়াইয়াছে ২ শত ৩৯ কোটী ৬০ লক্ষ। মার্কিণের কথা বলিবার নহে। ৬৬৪ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার বাড়িয়া ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৮১২ কোটী ৬০ লক্ষ ডলারে দাঁড়াইয়াছে—পৃথিবীতে মার্কিণের ধনশক্তি সর্ব্ব প্রথম, তার পর বৃটন। ভবিষ্যৎ জাতি-সংঘর্ষে কাহার কি স্থান, সুধীজন ইহা হইতে বুঝিয়া লইবেন।

লেখরাজের কীর্ত্তি

সিন্ধু প্রদেশে লেখরাজে নাকি কলির কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন — তিনি হায়দ্রবাদ হইতে আসিয়া সিন্ধু প্রদেশে আশ্রম রচনা করিয়াছেন। বহু পুরুষ ও নারী তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গোল বাধিয়াছে নারীর আত্মসমর্পণ লইয়া। হায়দ্রাবাদের অনেক মহিলাকে নাকি স্বামী, পিতা, মাতা লেখরাজের আকর্ষণ হইতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। লেখরাজের কীর্ত্তি বটে!

সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুরা এই কৃষ্ণ-ঠাকুরটীকে সায়েস্তা করার জন্য সিন্ধু গভর্ণমেণ্টের উপর জিদ্ করেন। আলাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে দুইজন হিন্দু মন্ত্রী ইহার জন্য অগ্রণী হন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ ধর্ম্ম অথবা সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ বড় সুবিধার নহে। প্রধান মন্ত্রী আলাবক্স উদাসীন থাকায়, ২ জন হিন্দু মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। আলাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলী একদিকে লীগপন্থীর বিরুদ্ধতায়, অন্য দিকে কংগ্রেসের ঔদাসীন্যে অতিকষ্টে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই একটি সামাজিক ঘটনায় তাহা প্রায় ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এই ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। হিন্দু মন্ত্রীদ্বয় তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। লেখরাজের কি হইল, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

আমরা সিন্ধুর রাজ্যশাসননীতি লেখরাজের মত সমাজের ভাল অথবা মন্দ যে প্রকারের হউক, একজন মানুষের উচ্ছেদে ব্যবহার করার জিদ্ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। হিন্দু জাতি কি উৎসন্ন গিয়াছে? তাহারা কি নিজের ঘর সামলাইতে আজ অসমর্থ? মাতা, পত্নী,

... বশে রাখার জন্য আজ রাষ্ট্রশক্তির যদি শরণ লইতে হয়, এ সমাজ সত্যই ধ্বংসের পথে। হিন্দু জাতির হাড়ে হাড়ে ঘুণ ধরিয়াছে, বুঝিতে হইবে।

লীগের দাবী

গত জানুয়ারী মাসে লাহোর মোস্লেম লীগ সভায় ইসলাম-ধর্ম্মীদের রাষ্ট্রীয় দাবী কি হইবে স্থির করার জন্য এক উপসমিতি গঠিত হয়। মিরাটে গত লীগ-সভায় হায়দ্রাবাদের ডাঃ লতিফ উহা উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভারতে এখনও ৩০ কোটী হিন্দু, ৮ কোটী মুসলমান। যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হইলে, ঈশ্বর-বিধানে ভারতে হিন্দু-প্রাধান্য রাষ্ট্রপরিচালন ব্যাপারে অনিবার্য্য হইবে। তাই লীগের আজ দাবী,—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসনসংস্কার আইন পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতে স্বতন্ত্র মোস্লেম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা হউক। এই মোস্লেম-রাজ্য ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, বেলুচী, পাঞ্জাব, কাশ্মীর আর ভারতের উত্তর পূর্ব্বে আসাম ও বাংলাদেশ এবং ইহার উপর রামপুর রাজ্য লইয়া দিল্লী, লক্ষ্ণৌ; অপর দিকে হায়দ্রাবাদ, বেরার হইতে মাদ্রাজ নগরী পর্য্যন্ত ৮ কোটী মুসলমানের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লীগ সফল করিতে চাহে। কাশী, প্রয়াগ, হরদ্বার প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ মুসলমানদের দয়ায় সুরক্ষিত থাকিবে। বর্ত্তমান যুগের অবস্থা দেখিয়া ইহা স্বপ্নবিলাস বলিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিন্দুস্থান হিন্দু অধিবাসীদের প্রীতি ও ঐক্যের অভাবে এমনই করিয়া হারাইয়া যায়। আমরা কলহপ্রিয় হইয়া রাষ্ট্র ও সমাজ সর্ব্বত্র নিজেদের শক্তিহীন করিতেছি। হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জগজ্জয়ী, ইহা প্রমাণ করার জন্য হিন্দু জাতিকে সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে, উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে—এই দিকে হিন্দু জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রাজকোট

মহাত্মা গান্ধি রাজকোটে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলে, স্থির হয় যে, বড়লাট বাহাদুর গান্ধির সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকোট ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত করিবেন। এই সিদ্ধান্তে বিচার্য্য বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। মহাত্মাজীও এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লন। স্যার মরিস গয়ার যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে মহাত্মাজীর সহিত গান্ধিপন্থীরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে সর্দ্দার প্যাটেলের পূর্ব্ব অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার মরিস গয়ার বলেন, রাজকোটের ঠাকুর সাহেব শাসনসংস্কার কমিটীর সদস্যনিয়োগ সম্পর্কে যে ঘোষণা করিয়াছেন, এবং সর্দ্দার প্যাটেলকে ঐ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ—সর্দ্দার প্যাটেলের সুপারিশে যে সকল ব্যক্তি নির্দ্ধারিত হইবেন, ঠাকুর সাহেব তাঁহাদেরই নিযুক্ত করিবেন। এই লোকেরা রাজ্যের প্রজা ও কর্ম্মচারী নহেন, ইহা প্রমাণিত না হইলে প্যাটেলের সুপারিশই চূড়ান্ত হইবে।

রাজকোটের ঘটনার পরিসমাপ্তি হওয়ায় আমাদের উদ্বেগ কাটিয়া গেল। অতঃপর ফেডারেশনের পথে মহাত্মাজী কি ভাবে অগ্রসর হন, দেখিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

ত্রিপুরীর পর

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিণাম দেখিয়া বাংলায় বিক্ষোভের মাত্রা যতটা বাড়িয়াছিল, তাহা ক্রমেই প্রশমিত হইতেছে। সমাজতন্ত্রী দল ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে পন্থের প্রস্তাবটী গণতান্ত্রিকতার আদর্শ লোপ করিয়া ডিক্টেটারী নীতির প্রতিষ্ঠা বলিয়া উদ্বেগ ও আশঙ্কার মাত্রা বড় কম হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাষ্ট্রপতি হইতে সকলেই মহাত্মাজীকে দেশের অবিসম্বাদী নেতা বলিয়া স্বীকার করেন। তবে আবার তাঁহার নেতৃত্ব কায়েমী করার ত্রিপুরীনীতি সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন করে কেন? জার্ম্মানীর হিটলার, ইটালীর মুসোলিনী, ভারতের গান্ধী ভিন্ন বস্তু নহেন। সংগ্রাম-নীতির পার্থক্য আমাদের লক্ষ্যে পড়ে না। ইটালী ও জার্ম্মানীতে রাষ্ট্র-শক্তিবলে জনমত ডিক্টেটরগণের অধীন হয়; এখানে আত্মত্যাগ, জনসেবা ও অহিংসার শক্তির দ্বারা জনমতের গরিষ্ঠতা মহাত্মার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। আমরা এই অধ্যাত্ম-শক্তির সহিত পাশবিক শক্তির তুলনা করিলে, এই উভয়ের কোনটী বড়, কোনটী ছোট তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। যুক্তপ্রদেশ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে ত্রিপুরীর পর কংগ্রেসের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবাধেই চলিয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের জন্য অনুরাগের হাওয়া বহিলেও, মহাত্মার অধীনত্ব স্বীকার করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির গত্যন্তর নাই। ইহা শক্তির পরিচয়। জাতি শক্তিহীন হইলে, গণতন্ত্রের আশ্রয় চায়। ডিক্টেটরের অভ্যুদয় শক্তিশালী জাতিরই লক্ষণ। মহাত্মার আবির্ভাবে আমরা জাতির এই জাগরণই লক্ষ্য করিতেছি।

সুভাষ ও মহাত্মা

আমরা সুভাষচন্দ্রের 'অদ্ভুত ব্যাধি' সন্দর্ভটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। তিনি শরীর ও মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এই পত্র রচনা করিয়াছেন। এইজন্য

ইহা লইয়া আলোচনা আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি না। ত্রিপুরীর পূর্ব্বে ও পরে, তিনি তাঁহার অন্তরের গতিচ্ছন্দঃ যেমনটী অনুভব করিয়াছেন, নির্ভীকভাবে তাহা পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্পষ্টতার সঙ্গে অন্য পক্ষকে অস্পষ্ট করার প্রচেষ্টাও চিঠির মধ্যে আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় উপেক্ষণীয়।

কথা হইতেছে—ত্রিপুরীর পর বামপন্থী সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি হইয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারেন, এই সমস্যার জটিল জাল তাঁহাকে বিদীর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন মহাত্মাজীর নিকট চলতি বর্ষে কংগ্রেসের কার্যক্রম কিরূপ হওয়া উচিত? কংগ্রেসের প্রধান দুই দলের মধ্যে পরস্পর সংযোগিতা সম্ভব কি না? কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি একমতাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হইবে? অথবা সকল দলের কংগ্রেসসেবীদের লইয়া গঠিত হইবে এবং শেষ প্রশ্ন—পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব মহাত্মা কি ভাবে লইয়াছেন, উহা রাষ্ট্রপতির উপর অনাস্থা জ্ঞাপক কি না? আর তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ তিনি প্রয়োজন মনে করেন কি না? কিম্বা পন্থের প্রস্তাব—কয়েকজন নেতা যেমন মনে করেন—মহাত্মার সহিত রাষ্ট্রপতির মিলনজ্ঞাপক, তাহা মহাত্মাজীও মনে করেন কি না?

শুনা যায়, মহাত্মাজী এতদুত্তরে বলিয়াছেন—পন্থের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি কর্ণপাত না করিয়া, তিনি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সহিত তাঁহার মূলগত পার্থক্য আছে, এই জন্যই সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটী হইতে পারে না। অতএব রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য—তাঁহার সমর্থকদের লইয়াই ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করা। মহাত্মাজী আরও বলেন, ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্য যদি সুভাষচন্দ্রকে মানিয়া লন, গান্ধীপন্থী তাহার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না। কিন্তু তাহা না হইলে, তাঁহারা নিজেদেরই নীতি লইয়া কার্য্য করিবেন।

সংবাদপত্রে মহাত্মা গান্ধির এইরূপ উত্তর প্রকাশিত হইলে, মিঃ আবদুল আজাদ প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছেন, গান্ধিজী এমন উত্তর দেন নাই। "আনন্দবাজার পত্রিকা" জানাইয়া দিয়াছেন—এই উত্তর গান্ধিজী দিয়াছেন। জনসাধারণ ক্রমেই গান্ধি-সুভাষ-সমস্যায় নিরুদ্বেগ হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে যে সাংঘাতিক সংঘর্ষের হেতু ছিল, তাহা শুধু ভাবের মারপ্যাঁচ। বাস্তবতার লেশ মাত্র ইহাতে নাই। আমরা নির্ব্বিবাদে আশা করিতে পারি, গান্ধি-সুভাষ-মিলন দুরাশা নহে। সুভাষচন্দ্র তাই শেষে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, তাঁহার বিবৃতির বিকৃত অর্থ হইয়েছে, তাঁহাদের পরস্পরকে লোকে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্র-সমিতি যেন পন্থের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন, এমন না মনে করেন।

সুভাষচন্দ্রের এই উক্তির পর বাংলার বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রীরা তাঁহার পথে বাধা হইবেন না, ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

কুমিল্লায় সাহিত্য-সম্মেলন

চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন নূতন প্রাণ পাইয়া মন্দাকিনীধারার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে, ইহা খুব সুখের বিষয়। বাংলার সাহিত্যসেবীদের এই সম্মেলন জাতীয় জাগরণের অন্যতম লক্ষণ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, সাহিত্যসেবীদের সে দিকে সচেতন ও সতর্ক থাকা উচিত। কুমিল্লার সাহিত্য-সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" খণ্ডাংশ গীত হওয়ার প্রস্তাব উঠিলে, সাহিত্যসেবীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবাংলার রাষ্ট্রচাতুর্য্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির খোরাক-স্বরূপ হইলে, দুঃখের সীমা থাকে না। আমরা হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যসেবী জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রাখিতে পারি, এই প্রার্থনাই করি।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সাহিত্যসভার প্রধান পুরোহিত রূপে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর চিন্তাধারার পরিচয় অভিভাষণের ছত্রে ছত্রে পাইলাম। উহা শুধুই পাণ্ডিত্যপূর্ণ নহে, প্রতিভার স্পর্শে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়াছে। বাংলার রাষ্ট্র-সমস্যার আদর্শে জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী আজ খুবই বিপন্ন। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক উন্নতির সুযোগের দিন আসিয়াছে—মনে করিয়া সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এক অকল্পিত বৈষম্যসৃষ্টি করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার ন্যায় বাংলা ভাষাকে তাঁহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাষার প্রাণ বিনষ্ট করিতে চাহেন। সভাপতি তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সুনীতি বাবুকে অশেষ প্রকারে ধন্যবাদ দিই। তিনি মাতৃভাষার একজন প্রধান পূজারী। তিনি মনে করেন, সাহিত্য রাজনীতিক হাটের নিকটে অবস্থিত নহে। ভোটগণনায় সাহিত্যের মানদণ্ড নির্ণয়ের বস্তু নহে। অতএব হিন্দু হউক, মুসলমান হউক—যাঁহাদের প্রচেষ্টায় বাংলা আজ বরণীয় ভাষা বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছে, তাঁহারা এই মাতৃভাষাকে অকৃত্রিম অনুরাগে আরও গরীয়সী করিয়া তুলিবেন। মাতৃভাষার অনুশীলনে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি যাহাতে স্থান না পায়, সে দিকে সুনীতিবাবুর সহিত সকল সাহিত্যসেবীই সচেষ্ট থাকিবেন। এদিকে কোনও সম্প্রদায়ই কার্পণ্য করিবেন

চিন্তা-বীথি

মানুষ ভগবানকে বিশ্বাস করে, তা ভগবানের প্রতি করুণা নয়—আপনারই অপরিসীম সঞ্চয়। আপনার অন্তরে ভগবানকে পাওয়া—নিজেরই সর্ব্বোত্তম মহত্ত্ব ও কল্যাণকে পাওয়া। যে ভগবানে অবিশ্বাসী, সে আপনার ক্ষমতায় ও সাধনায় প্রত্যয় করে—এই প্রত্যয় সসীম, সুতরাং শক্তিও অনন্ত নয়। পক্ষান্তরে, ভগবদ্বিশ্বাসী—অনন্ত সত্তায় ও কল্যাণে বিশ্বাসী, অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে সে শক্তি ও জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করে—এই অনন্ত ভাণ্ডারই ভগবান। ভগবান সত্য নহেন, তিনি সৎ—সকল সত্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভূত। সত্য ও অসত্য—উভয়েরই তিনি অতীত—ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কায়া ও ছায়ার ন্যায় সত্য ও অসত্য সতেরই দুইটী দিক্। এই আলো-ছায়া লইয়াই জীবন। ভগবান তাই সত্য-মিথ্যা লইয়া তাঁহার সৃষ্টি-লীলা চিরদিন সম্পাদন করিয়া চলেন। তিনি মুক্ত, পূর্ণ—কোনও দ্বন্দ্বের বন্ধনেই তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিবদ্ধ নহেন।

* * * *

তেমনি ভগবান জ্ঞান নহেন. তিনি জ্ঞানাতীত চিৎ—ঐ ছায়া-কায়ার ন্যায় জ্ঞানাজ্ঞান উভয়েরই তিনি ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ভগবান আবার সুখ নহেন, দুঃখ নহেন, পরন্তু আনন্দ—যাহা সুখ ও দুঃখ, দুয়েরই অতীত, ঊর্দ্ধস্থিত। এই উদাসীন (উৎ+আসীন) ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই গীতাকার বর্ণনা করিয়াছেন—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন পুণ্যমাদত্তে বিভুঃ।

জীবের সাধনা—যন্ত্রস্বরূপ হওয়ায়। এই সাধনা সহজ, সরল। সহজ বুদ্ধিযোগেই সেই সাধনার সরল বিধি-বিধান অবগত হওয়া যায়। সরল হৃদয় দিয়াই সেই সহজ মানুষকে চেনা যায়, ধরা যায়। ইহা উৎসর্গের সাধনা। আপনার সবখানি তাঁরই ঊর্দ্ধস্থিত ইচ্ছায় ঢালিলে, আমরা যন্ত্রস্বরূপ তাঁহারই বিধানে নিয়ত চলিতে পারি। এই চলাই ঠিক চলা—ঋতময় সিদ্ধ জীবন।

আমরা অন্তরে ভগবানকে চিন্তা করিব। এই চিন্তাই বিশুদ্ধ চিন্তা। অথবা ভগবানই আমাদের বুদ্ধি-যন্ত্র ঘুরাইয়া চিন্তা করিবেন। এই স্বতঃ-প্রসূত চিন্তাধারাই জ্ঞানবৃত্তি বা ধ্যানযোগ।

তেমনি আমরা হৃদয়ে ভগবানকেই মুহুর্মুহু ভালবাসিব—প্রীতি করিব। এই প্রীতি ও ভালবাসাই বিশুদ্ধ প্রেম। অথবা ভগবানই আমাদের হৃদয়-যন্ত্র চালাইয়া সর্ব্বভূতে প্রেম প্রকাশ করিয়া তুলিবেন। এই স্বতঃ-উৎসরিত প্রেমধারাই ভক্তিবৃত্তি বা প্রেমযোগ।

আবার ভগবানই নিত্য আমাদের জীবন দিয়া কর্ম্ম করেন। সেই কর্ম্মই শুদ্ধ কর্ম্ম। অথবা ভগবানই প্রাণ-যন্ত্রে স্বীয় ইচ্ছা কর্ম্মরূপে প্রকাশ করেন। এই অনাবিল অনাহত কর্ম্মস্রোতই শক্তিবৃত্তি বা ক্রিয়াযোগ।

ধ্যানযোগ, প্রেমযোগ ও ক্রিয়াযোগ—পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণযোগের এই ত্রিভাব—ত্রিধারা। প্রত্যেক সাধক-সাধিকার জীবনে ইহা অবধারিত প্রকাশ পায়। উৎসর্গের প্রকাশই যোগ সিদ্ধি বা ভগবানের জীবনে অবতরণ।

* * * *

আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, আরোহণ ও অবতরণ যোগের এই দুই প্রকার গতি দেখা যায়। ইহা যেন একই যোগশক্তির দুই প্রকার ক্রীড়াভঙ্গী। যত আরোহণ, ততখানিই অবরোহণ বা অবতরণ। ইহাই নিয়ম। প্রকৃতির ইহা নিত্য বিধান। ভগবানকে জানা, পাওয়া, ভগবৎ স্বরূপ হওয়া—এইগুলি জীবের অধিরোহণের ক্রম-বিন্যস্ত স্তর বা পর্য্যায়। অন্য দিক্ দিয়া ইহাই মানুষের আধারে ভগবানের ক্রম-বিন্যস্ত অবতরণ ছাড়া কিছু নহে। মানুষের যাহা ভগবানকে বস্তু বা তত্ত্বরূপে জানা, তাহাই তত্ত্বের ভগবদ্ভাবে মানব-বুদ্ধিতে প্রকাশ বা অবতরণ মাত্র। যাহা মানুষের পাওয়া, তাহাই হৃদয়-বৃন্দাবনে ভগবানের মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, রসে অপ্রাকৃত সম্বন্ধের সৃষ্টি—নিত্যের ইহাই লীলা-রূপে অবরোহণ বলা যাইতে পারে। সেইরূপ ভগবৎ-স্বরূপের সহিত মানুষের অভিন্ন হওয়াই ভগবানের

পরিপূর্ণ মানব-বিগ্রহ-ধারণ। ইহাই অবতরণ-পদ্ধতির শেষ পর্য্যায়- চরম সোপান।

* * * *

ঊর্দ্ধে উঠা- ইহাই আরোহণ। জড় বা স্থূল, সূক্ষ্ম, তৎপরে কারণ এইরূপ স্তরে স্তরে, একটী ধাপের পর আর একটী ধাপ অতিক্রম করিয়া জীবাধারে চৈতন্যের ক্রমোন্নয় ঘটিয়া থাকে। ইহাই বিজ্ঞানের ভাষায় অভিব্যক্তিবাদ (Evolution theory)। ভগবান কিন্তু অন্য দিক্ দিয়াই চৈতন্যকে ক্রম-সঙ্কুচিত করিয়া, জীবে ও জড়ে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাই বিজ্ঞানের পরিকল্পনায়—Involution বলা যাইতে পারে। Evolution বা Involution—অভিব্যক্তি বা সঙ্কোচ—ভূত ও ভাব—উভয়ই যাহা হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাকেই গীতার ভাষায় স্পন্দন রূপ বিসর্গ বা কর্ম্ম বলা হয়।

* * * *

ভাব হইতে ভূত, আবার ভাবের মূলই স্পন্দন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও সম্ভবতঃ সমর্থন করিবে—অন্ততঃ আধুনিক বিজ্ঞানের ধারাও এই লক্ষ্যেই দিন দিন ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। সকল জগদ্বস্তুর মূলে আণবিক স্পন্দন (Vibration of atoms and molecules)—ইহা বিজ্ঞানেরই স্বীকৃতি। কাজেই স্পন্দন লইয়া গোল নাই। গোল কাহার স্পন্দন, ইহা লইয়াই। আধুনিক বিজ্ঞান এইখানে আসিয়া ধোঁয়ায় দিশেহারা হইয়া পড়িতেছে। অণুর (molecules) মূলে পরমাণু (atoms)—তন্মূলে ইলেকট্রণ প্রোটন, নিউট্রণ, পজিট্রণ—ইহাই বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই বস্তুগুলি ধারণার অগম্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ব্রহ্মবাদ এইখানে কি কিছু আলো দিতে পারে না? আমরা মনে করি আধুনিক বিজ্ঞানের শেষ প্রশ্নের সমাধান ভারতীয় দর্শনেই মিলিবে। সেই অনুসন্ধান-গবেষণা (research) ভারতীয় মনীষী ও সাধকগণেরই কর্ত্তব্য।

* * * *

ভারতীয় দর্শনের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা অনেকেরই আছে। বহু পাশ্চাত্য মনীষীও এই বিষয়ে মুখর কণ্ঠে সাক্ষ্য দানে কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু এই সকল চিন্তাশীল পণ্ডিতেরই সাধারণ ধারণা—ভারতীয় দর্শন একান্ত অন্তর্মুখী—ইহার মধ্যে বস্তুতন্ত্র তত্ত্ব বা কথা কিছুই নাই। অথচ বস্তুতন্ত্র এই শব্দটী হিন্দু দর্শনেই পাওয়া যায় এবং ইহা হিন্দু দর্শনেরই কথা। আসলে, ভারতীয় দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি বুঝিবার ভাব ও ভাষার সন্ধান উভয়ই আমরা হারাইয়াছি। সেই ভাব ও ভাষার সূত্র যদি আমরা পুনরাবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলেই ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের বস্তুতন্ত্র নির্দ্দেশ পাইয়া আমরা শুধু বিস্মিত হইব না, সেই বস্তুতন্ত্র জ্ঞান দিয়া জীবনকেও সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিব।

* * * *

আমরা ভারতীয় তরুণদের দৃষ্টিই বিশেষভাবে এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। অন্তর-বিজ্ঞান ও বহির্জ্ঞান, উভয়ে একই সত্যের দুই দিক্—ইহা ভারতীয় সাধনারই কথা। এই সাধনা জীবনেরই সাধনা। জীবনের কেন্দ্রভূমিতে ঈশ্বর-চৈতন্য প্রতিষ্ঠা করিলেই, সেই ইষ্টকে ঘিরিয়া হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়ই রূপান্তরিত হয়। নূতন সম্বন্ধ ও সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠে। এই নব-জীবনই ভারতের লক্ষ্য।

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হইলে দেশের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে কিরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা এইবার কুমিল্লার সাহিত্য সম্মেলন দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল। দুই দিন গড়ে দশ ঘণ্টা করিয়া অধিবেশন হইলেও কুমিল্লার শিক্ষিত নরনারী সর্ব্বক্ষণ তত্রত্য সুবৃহৎ টাউন হলটী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভিতর কখনও কোনরূপ ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন লক্ষ্য করি নাই। বিশেষ করিয়া মহিলাদের আগ্রহ ছিল অসীম, ধৈর্য্যও দেখা গেল অপরিমেয়।

সভাপতিবৃন্দ ছাড়া মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কবি নরেন্দ্র দেব, ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবি যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রবীন সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার, অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা জজ প্রতিভাবান সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ও প্রথম দিন উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতিদের মধ্যে প্রত্যেকেরই অভিভাষণ সুচিন্তিত, মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় রজনীকান্ত সেনের "অশোকের কটা ছিল নাতি" প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দার্শনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিয়া ঐতিহাসিকদিগকে অযথা কলঙ্কের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। নবীন সাহিত্যিকদিগকে গালাগালি দেওয়া ইদানীং একটা রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। সুসমালোচক আবদুল ওদুদ সাহেব সেই সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মূল সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণে শুধু সাহিত্যিক সমস্যাগুলির নহে, দেশের ও সমাজের অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসার সন্ধান পাওয়া যায়। দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই।

এইবারের সম্মেলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যেক শাখায় বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা ও তর্কবিতর্ক।

যদিও সকলক্ষেত্রে আলোচকগণ যথোপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি এইরূপ আলোচনা শুনিবার আগ্রহ শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষরূপে দেখা গেল। আমার মনে হয়, সম্মেলন হইতে প্রবন্ধ পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিয়া যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাহার সবটুকুই আলোচনায় দেওয়া উচিত। সাহিত্য ও ইতিহাস সময়ের অল্পতাবশতঃ অনেকে আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন নাই; যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারাও আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় পান নাই। যদি নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্মেলনের ছয় মাস পূর্ব্বে ঘোষণা করা যায়, এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ-দিগের নিকট যাইয়া প্রবন্ধ সংগ্রহ করেন ও ঐ সকল প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রকাশ করেন তাহা হইলে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে ১০।১৫ মিনিটে নিজ নিজ বক্তব্য মুখে বলিবেন; তারপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁহারা কিছু বলিতে চাহিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ মিনিট করিয়া সময় দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবে কাজ চালাইতে পারিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে সুন্দর আলোচনা হইতে পারে। পরে ঐ সকল প্রবন্ধ পূর্ণরূপে ও বক্তৃতার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে সাহিত্যের নানা বিভাগের কতকগুলি জটিল বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

এইরূপ প্রণালীতে কাজ চালাইবার দুইটী বাধা দেখা যায়। প্রথমতঃ বিশেষজ্ঞদিগকে প্রবন্ধ লিখিতে ও সম্মেলনে উপস্থিত হইতে রাজী করান কঠিন। তবে

যদি তাঁহাদিগকে পাথেয় দিবার ও প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পুস্তক আকারে ছাপিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে খুব সম্ভব তাঁহারা সম্মেলনের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগীতা করিতে রাজী হইবেন। আমরা জানি যে, নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ইচ্ছা থাকিলেও অর্থের অভাবে সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন না। ইঁহাদের অনুপস্থিতির ফলে সম্মেলন সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র হইতে পারিতেছে না। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককে পাথেয় দিয়া লইয়া যাইতে পারিলে আলোচনা ভালরূপে জমিয়া উঠিতে পারে। ইহার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে?

ঐ দুই হাজার টাকা পাওয়া গেলে উহা হইতে এক হাজার টাকা অস্বচ্ছল অবস্থার সাহিত্যিকদের পাথেয় ও মুদ্রণ-ব্যয় বাবদ ব্যয় করা যাইতে পারে। অপর হাজার টাকা একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে উপহার দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন ঐরূপ করিয়া থাকেন।

কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সন্দর্ভ সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিভাগে গত দশবৎসরের মধ্যে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক-লেখককে এক এক বৎসর পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। যথা ১৯৪০ সালে কাব্যে, ১৯৪১ উপন্যাসে, ১৯৪২ ইতিহাসে এইরূপ-

মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
ইনি সম্মেলন উদ্বোধন করেন

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
মূল সভাপতি

আবদুল ওদুদ সাহেব
সাহিত্য শাখার সভাপতি

বাঙ্গালাদেশে যে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদের কর্তৃপক্ষ যদি বঙ্গসাহিত্যের প্রচারকল্পে প্রতি বৎসর প্রত্যেকে হাজার টাকা হিসাবে সম্মেলনের স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতিকে দান করেন তাহা হইলে অর্থ সমস্যা দূর হয়। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স,' 'অর্থ নৈতিক কন্‌ফারেন্স' প্রভৃতির অধিবেশনের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের গুরুত্ব ও উপকারীতা ঐ সব সম্মেলনের চেয়ে যে খুব বেশী কম তাহা বলা যায় না। আর যদিও বা কম হয়, তাহা হইলেও এই প্রতিষ্ঠানটী বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সাহায্য পাইলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। বছরে হাজার টাকা দান করা ইঁহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

ভাবে পুরষ্কার নির্দ্দেশ করা যায়। কে পুরষ্কার পাইবেন তাহা স্থির করিবেন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সাহিত্য-পরিষদের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি। বাঙ্গালার বাহিরের কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি বার্ষিক একশত টাকা দিতে রাজী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও একজন প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবে সাহিত্যিকদিগকে পুরস্কৃত করিলে সাহিত্য সম্মেলনের উপযোগীতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

সম্মেলনের মূল সভাপতি প্রত্যেক বৎসর নিজের অভিভাষণের পরিশিষ্টে গত বৎসরের যে সকল ভাল ভাল বই বাংলায় বাহির হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিলে সৎসাহিত্য প্রচারের আনুকূল্য হয়।

সাময়িকী

নববর্ষের প্রচ্ছদপট

প্রবর্ত্তকের প্রচ্ছদপটের বিচিত্র অর্ঘ্য এবার শিল্পির রক্তিম কল্পনায় ভরপুর হইয়াছে। একদিকে রক্তাক্ত মৃত্যুর আগ্নেয় রসনার লেলিহ শিখাপুঞ্জ। অন্যদিকে লীলায়িত জীবনের হিল্লোলিত হরিৎ কারুতা বিম্বিত হইয়াছে অনাদ্যন্ত শক্তির সীমাহীন **প্রবর্ত্তকরূপে।** কোনটি মহৎ - জীবন না মৃত্যু ? এই দুইটি বিষয় লইয়াই বিশ্বের জাগ্রত যাত্রা রথচক্রমুখর হইয়া উঠে। এই দুইটি না হইলে সম্পূর্ণতা সম্ভব হয় না, কুলকুণ্ডলিনীর রহস্যাপ্লুত ঊর্দ্ধগতির মত অন্তরের অসীম কক্ষে এই পরিপূর্ত্তির সঙ্গীত অহরহ ঊর্দ্ধদিকে ঝঙ্কৃত হইতেছে। জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও সংহার—এই তো তুরীয় ছন্দ— ভাগবতী বিধান !

রায় জলধর সেন বাহাদুর

গত ২ই এপ্রিল রবিবার সুপ্রসিদ্ধ জনপ্রিয় প্রবীণ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুর ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সদ্য পত্নীবিয়োগ ব্যথায় তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহু সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি কাশী মিত্রের ঘাটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন।

স্বর্গীয় জলধর সেন

তাঁহার নিরীহ, নিরপেক্ষ, নম্র ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি দেশবাসীর অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং সাহিত্যিক মহলে 'দাদা' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ১৯১৬ খৃঃ মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের এবং ১৯২১ খৃঃ ইন্দোর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদে বৃত হন। সম্পাদন কার্য্যে তাঁর কুশলতার নিঃসন্দেহ পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বঙ্গ সাহিত্যে তাঁর সুপ্রচুর অমর অবদান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করি।

নাহার পরিবারের দান

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতা তালতলা পল্লীর বিখ্যাত নাহার পরিবারের গৌরব ও কৃতি সন্তান স্বর্গত পূরণচাঁদ নাহারের প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহ তদীয় উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়সিং নাহার কলিকাতা মিউজিয়মে দান করিয়াছেন। এই অমূল্য পারিবারিক সংগ্রহ সর্ব্বভারতীয় গবেষণামূলক কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইবে। এই দানের জন্য নাহার পরিবার দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদার্হ।

সঙ্ঘ-সাধকের জাপান-যাত্রা

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিশিষ্ট সাধক-কর্ম্মী এবং সঙ্ঘের কলিকাতাস্থ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য - বিস্তৃতি কল্পে বিগত ৬ই এপ্রিল 'এস, এস' তালামা' জাহাজ যোগে জাপান যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে ৪ঠা এপ্রিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ডক্টর কালিদাস নাগের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের বিভিন্ন বিভাগ এবং উহার চারি শতাধিক কর্ম্মীবৃন্দ, প্রবর্ত্তক ছাত্র-সঙ্ঘ ও উপস্থিত সঙ্ঘানুরাগী সুহৃদগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ অভিনন্দিত হন। সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তাহার গলে জয়মাল্য ও ললাটে জয়টীকা প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর সভাপতি ডাঃ নাগ বাংলার দিগ্বিজয়ী অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই অমর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দায়ভার বহনের আন্তরিক সাফল্য কামনা করিয়া কৃষ্ণপ্রসাদকে জয়তিলক ও মাল্য বিভূষিত করেন। পরদিন চন্দননগর আশ্রমে সঙ্ঘের ভাইভগ্নিগণ ও নারী-বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীবৃন্দ এক অনাড়ম্বর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। ৬ই এপ্রিল অপরাহ্নে বহু সঙ্ঘ-সভ্য, কর্ম্মী ও সুহৃদগণ

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

সমভিব্যাহারে সঙ্ঘগুরু স্বয়ং খিদিরপুর ১১নং ডকে উপস্থিত থাকিয়া বিরহ-ব্যথিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রসাদকে বিদায়-অভিনন্দন দেন।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নির্ম্মাণ-যজ্ঞের অন্যতম হোতা কৃষ্ণপ্রসাদ প্রায় দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ অবিচলিত নিষ্ঠায় ইষ্টমুখী হইয়া সঙ্ঘ সেবায় ব্রতী আছেন। সঙ্ঘ-গুরুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ স্বর্গত স্বামী চিদানন্দজীর সাহচর্য্য ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কৃষ্ণপ্রসাদের মন সহজ-ভাবেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন যুগে দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ বিদ্যালয় ছাড়িয়া প্রবর্ত্তক জাতীয় বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উত্তর বাংলা বন্যায় অক্লান্ত সেবা দিয়া ফিরিবার পর তিনি সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশ, জাতি ও ভগবানের সেবায় জীবনোৎসর্গ করেন।

এস, এস 'তালামা' জাহাজ—উপরে কৃষ্ণপ্রসাদের বিদায় অভিনন্দনের দৃশ্য।
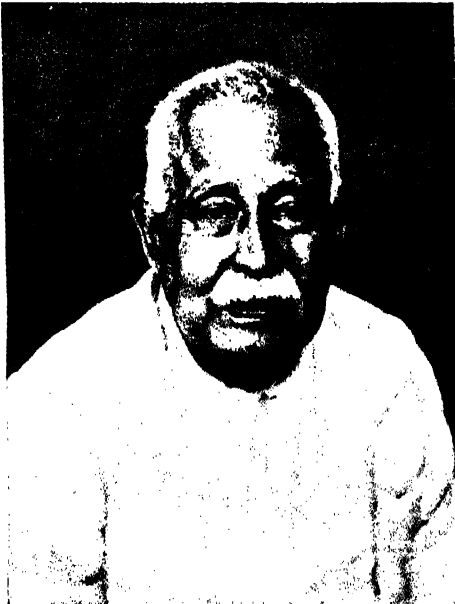
রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে, "পার্ব্বতীচরণ মুখার্জ্জী চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারীর" (পানিহাটি) প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। বাঙালী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের সিভিল সার্জ্জন হওয়ার নিয়ম ইঁহারই চেষ্টার ফল। বহু প্রতিষ্ঠান ইঁহার নীরব

বহু বাধা-বিঘ্ন-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যে এক মুষ্টি সঙ্কল্পপরায়ণ তরুণের অকপট শ্রম ও আত্মদানের মধ্য দিয়া সঙ্ঘের বর্ত্তমান অর্থনীতিক বনিয়াদ রচিত হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের সহিত দীর্ঘ বরষের বাস্তব ও সনিষ্ঠ সংযুক্তির ফলে তাঁর যে বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা আজ তাহাই তাঁহাকে সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা দিয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বহির্ভারতীয় অভিযান-প্রেরণার এই প্রথম পদক্ষেপ আকুমার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদের বিশুদ্ধ আধারাশ্রয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ভাবীকালের বহুমুখী সম্ভাবনাকে সমুজ্জ্বল ও অগ্রবহ করিয়াই তুলিবে। অপাপবিদ্ধ, অনাঘ্রাত কুসুমের মতই পবিত্র তাঁর জীবন-সৌরভ যেমন সহধর্ম্মী ও কর্ম্মিদের আমোদিত করিয়াছিল তেমনি উহা সর্ব্বত্র সকলকেই করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। দেবালয়ের ঘৃত-প্রদীপের মতই তাঁর প্রাণশিখা সর্ব্বাবস্থায় অনির্ব্বাণ উর্দ্ধমুখী জ্বলিয়া ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইবে, এ প্রত্যয় তাহার অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যে আসিয়া আমাদের সুদৃঢ় হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীযুত মতিলাল রায়ের সভাপতিত্বে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের নবম 'অডিনারী' সাধারণ সভার একটী অধিবেশন হইয়

গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাৎসরিক রিপোর্ট এই সভায় গৃহীত হয়। আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালান্স সিট হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে আমানত জমা আশানুরূপ বাড়িয়াছে। ব্যাঙ্কের আয় সন্তোষজনক হওয়ায় ডিরেক্টরগণ এ বৎসর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ট ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয় ছেন। রিজার্ভ ফণ্ডও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পরিচালকগণের তরফ হইতে শ্রীযুত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্কের Subscribed capital বাড়াইবার দিকে অংশিদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি মহাশয়ও এই প্রস্তাব সমীচীন বোধে উহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।

স্থির হইয়াছে শীঘ্রই চট্টগ্রামে ব্যাঙ্কের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আশুতোষ ঘোষ

২৪ পরগনা বন্দীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিগত ৫ই চৈত্র রাত্রে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটিতে স্বজ্ঞানে ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪ঠা বৈশাখ তদীয় পারলৌকিক কার্য্যাদি তাঁহার কৃতি সন্তানগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বর্গত ঘোষ মহাশয় আমাদের বিশেষ অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তাঁর সনম্র অমায়িক ব্যবহার, হৃদয়ের ঔদার্য্য, আচার ও ন্যায়নিষ্ঠা, স্বধর্ম্মপরায়ণতা, বিশেষ করিয়া তাঁর অসাধারণ পিতৃমাতৃ ভক্তির পরিচয় যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁরাই পাইয়াছেন। বন্দীপুর ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি হিসাবে এবং ২৪-পরগণা ডিষ্ট্রীক্ট ও বারাকপুর লোকাল বোর্ডের বহু বৎসর সভ্য থাকিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ প্রভৃতি বহু হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁর নীরব দান ও সেবা লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিত হইত। আশুতোষের মৃত্যুতে আমরা একজন উদার নিঃস্বার্থ ও নীরব কর্ম্মী হারাইলাম। আমরা বিগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্বর্গীয় আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

বেকার বান্ধব সমিতি

এই সমিতি কিছুকাল যাবৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সমিতির বন্দীপুর কেন্দ্রে একদল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে একদা পতিত ও অব্যবহার্য্য জমিকে চাষ আবাদের উপযোগী করিয়া তুলিয়া বর্ত্তমানে লাভজনক ফল, ফুল, তরীতরকারী উৎপন্ন করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাহাদের এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইতেছে। সম্প্রতি আচার্য্য রায় এই কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া যুবকদের এই উদ্যমকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ইহার প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
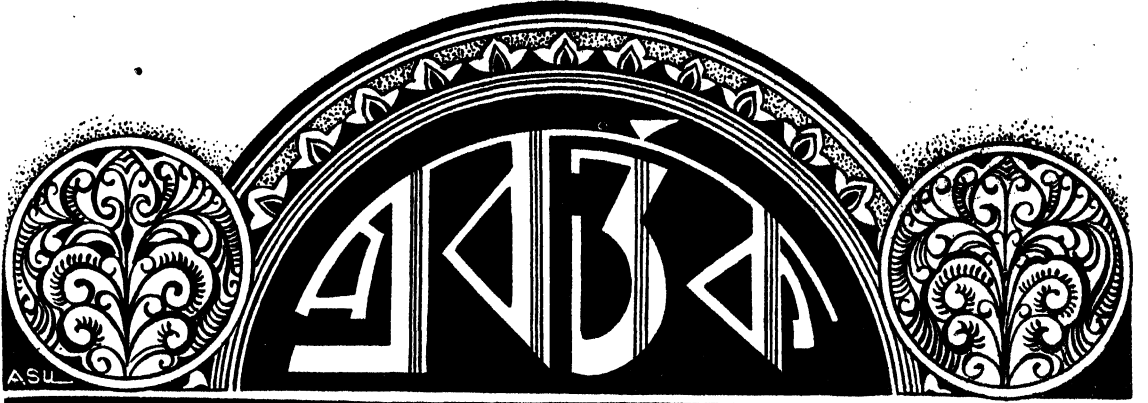
যে সুরে জীবনের সুর ভিড়িয়ে নিতে হবে, সে সুর যতক্ষণ না ফুটন্ত হয়ে উঠে, ততক্ষণ যত বেসুরা সুর জীবনে বেজে যায়। বাঁধা সুর যখন স্থির হয়, তখন আর এই উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না। সকলকে সেই প্রতিষ্ঠিত সুরের সঙ্গেই এক হয়ে যেতে হয়। তবেই ঐক্যতানের যে মূর্চ্ছনা তা' প্রাণে মধু বর্ষণ করে।

এক সুর—অহঙ্কার ভিন্ন এখানে আর বুদ্ধিভেদের কারণ নাই। ধর্ম্ম লক্ষ্য; সেই কেন্দ্র সুরে সকলেরই জীবনের সুর এক হ'লে, এক মত, এক পথ ফুটে উঠ্‌বে। কারও স্বতন্ত্র বুদ্ধি, স্বতন্ত্র পথ, স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও আদর্শ আর থাক্‌বে না। আদর্শ বা অহমিকা অথবা বুদ্ধিপ্রসূত মিলনের বাণী আজ আর জীবনকে সিদ্ধ করবে না। প্রেম ও ঐক্যের অদ্বয় বিগ্রহকে ঘিরে রস-মণ্ডল গড়ে' তোল। যত অন্তরায় সব দূর হবে। বাধাও শক্তি প্রদান করবে। যুক্তির অমৃতেই তোমরা সম্পূর্ণ অভিষিক্ত হও।

এখানে কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা তো সিদ্ধ হবে না। সকলের ইচ্ছা একের ইচ্ছায় যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশিত হবে। এখানে একটী বুদ্ধির বাঁশী বাজ্‌বে—সেই সুরে সব বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ ও উন্মাদ হবে। কারও আদর্শানুযায়ী তো সিদ্ধি এখানে নাই। এ সুর তো কারও মনের মত মিল্‌বে না। সকলের মনকে এক সুরে সায় দিতে হবে। যখন নিজের সুরে সকলের সুর মিলিয়ে না পাও, তখনই সতর্ক হও। যে সত্য সুর সঙ্ঘের হৃদয়-বীণায় ধ্বনি তুলেছে, সেই সুরে আগে সব লয় করে' দাও—তবেই স্বরূপের দর্শন পাবে। এখানে আর ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ করে' নিজেকে টিকিয়ে রাখা যাবে না—'নাল্পে সুখমস্তি'—বৃহতের উপাসনামন্দির—আর কি সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকা চলে? তোমরা ব্রহ্ম-সুরের উদ্‌গান তুলেছ—এ যে সেই বেদান্তের সাধনা। বাঙালী বেদান্তের সুর নিয়েই সিদ্ধ জীবন গড়ার সন্ধান পেয়েছে। বাঙালীই ভারতে অভিনব সংহতি-সাধনে, অখণ্ড জাতি-নির্ম্মাণে অগ্রণী হবে।

অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব

সপ্তদশ অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব গত ৮ই বৈশাখ হইতে ১৯শে বৈশাখ পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। অক্ষয়া তৃতীয়ার উৎসব সঙ্ঘের একটী সার্ব্বজনীন মহোৎসব। এই উৎসব সঙ্ঘের ইতিহাসে কয়েকটী অপ্রত্যাশিত স্মরণীয় ঘটনা আশ্রয় করিয়া গত সপ্তদশ বৎসর প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ব্যক্তি-বিশেষের জন্মতিথি স্মরণ করিয়া, আমরা অনেক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ একটী বিশেষ যুগ-তিথির উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ্য দিবার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছে। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগোৎপত্তির স্মৃতি আমাদের অন্তরে সত্যকে, শ্রেয়ঃকে রূপ দিতে প্রতি বৎসর আসে—আমরা এই অতিথির নিকট বর্ষে বর্ষে নূতন করিয়া আত্ম-নিবেদনের মন্ত্র উচ্চারণ করি। সত্য ও ঋতময় জীবনই আমাদের লক্ষ্য। জীবের পরিত্রাণ-মন্ত্র যে তারক ব্রহ্ম নাম, তাহাই শ্রীমন্দির কেন্দ্র করিয়া বিগ্রহান্বিত। এই মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করিয়া শব্দ মন্ত্র প্রণবের মর্ম্মার্থ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে।

অক্ষয়া তৃতীয়ার পুণ্যদিনে হোম, পুরশ্চরণ, কথকতা, অপরাহ্নে সভাধিবেশন পূর্ব্বক বিপুল প্রদর্শনীর দুয়ার উদ্ঘাটিত হয়। একদিকে ভারতের কৃষ্টি ও সংহতিমূলক নানা দৃশ্যপটের সহিত যুগের ইতিহাস, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির অপূর্ব্ব পরিবেশ, অন্যদিকে স্বদেশী পণ্যের প্রদর্শনীক্ষেত্রে অসংখ্য নারী-পুরুষের সমাবেশ যেন যাত্রীদের চিত্তমন উদ্বুদ্ধ করে। শোণপুরের মহারাজা সুধাংশুশেখর সিংহ দেও উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়ায়, চট্টলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বনামধন্য নেতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর, দিনের পর দিন বাংলার মনীষিবর্গ, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয় লইয়া গবেষণাপূর্ণ আন্দোলন ও আলোচনায় সভামণ্ডপ মুখরিত করেন। নৃত্য-গীত, অভিনয়, কীর্ত্তন, কথকথা, ভাগবত প্রসঙ্গে এই নবতীর্থ এই কয়দিন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল—হিন্দুজাতির প্রাণে তাহা আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছিল।

শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্র সপ্তমী তিথিতে একাদশ-চূড় শ্রীমন্দিরের গগনচুম্বী মধ্য চূড়ের সহিত সংলগ্ন হইয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য ঘটাইয়াছিল, অধ্যাত্ম-প্রাণ নরনারীর চিত্ত হইতে সে পূত-স্মৃতি মুছিবে না। পঞ্চ জ্ঞান ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যভাগে সর্ব্বোত্তম মনোমন্দির যেন ঊর্দ্ধশিরে স্বর্গের অমৃতময় চন্দ্রকে মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতেছে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিপুল শ্রীমন্দির কি যে মনোরম দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

মন্দির-গর্ভে প্রপঞ্চময় জগৎ, জীবশক্তি ও পরমাত্ম-তত্ত্বের পরিচয়-স্বরূপ পঞ্চমুণ্ডীর আসন ভিত্তি করিয়া মর্ম্মর-বেদীত্রয়ের উপর রক্তাক্ষরে অষ্টদল-পদ্মাঙ্কিত মাতৃযন্ত্র। তাহার উপর শ্বেত-প্রস্তর-বিগ্রহ, পুরুষোত্তমের প্রতীক-চিহ্ন। ভারতের প্রসিদ্ধ সাংখ্য, বেদান্ত দর্শন উভয় পার্শ্বে লতা-পল্লবে এলাইয়া পড়িয়াছে। এই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের বাচক স্বর্ণ-রঞ্জিত প্রণব-মন্ত্র চতুঃষষ্টি কলার নিদর্শন-স্বরূপ পদ্মপত্রবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ভারতের বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মতত্ত্বের এই অপূর্ব্ব বিগ্রহ-সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষকে প্রাণ দিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে।

মনীষী শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, ডাঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক এস, পি, চট্টোপাধ্যায় ডি, লিট্, জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ বাচস্পতি, সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী, সিস্টার সরস্বতী এবং পরিশেষে আনন্দবাজারের সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভামণ্ডপের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। গীত, নৃত্য, অভিনয়ে, তরুণদের আনন্দের অবধি ছিল না। ভারতের এই নব জাতি তীর্থে ধর্ম্মোৎসবের নূতন পরিচয় এই মুমূর্ষু জাতির উজ্জ্বল

ভবিষ্যৎ চিত্রিত করিয়াছিল। আমরা উৎসবদেবতাকে আগামী বর্ষে আরও অধিক যোগ্যতার সহিত সশ্রদ্ধে যাহাতে আবাহন করিতে পারি, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনাই করি।

ভারতের ধর্ম্ম

ভারত—ধর্ম্মপ্রধান দেশ। ধর্ম্ম জাতিকে ক্লীব করে, পঙ্গু করে—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ছদ্মবেশী ভারতের শত্রু। দেশের দুর্দ্দিন যুগে জাতীয়তার নামে এইরূপ দেশ-শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। আমরা ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি-গম্য করিতে না পারিয়া, এই সকল কুচক্রীর উত্তেজনাপূর্ণ দেশ-প্রীতির অর্থশূন্য ঘোষণায় বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—তথাকথিত জাতীয়তার অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্ম শাশ্বত, সনাতন। ধর্ম্মকে যদি আমরা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি, আমরা হয়তো আপাত সুখ হইতে বঞ্চিত হইব। কিন্তু যে সুখ শাশ্বত নিত্য, তাহা আমরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অবশ্যই লাভ করিব। এইরূপ ধর্ম্মাশ্রিত মানুষের কণ্ঠেই সত্য ঋক্ উচ্চারিত হইবে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"।

আমাদের আজ বড় দুর্দ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-দানের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা অনেকেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। পিথাগোরাস, এরিষ্টটল্, প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অবদান তাঁহারা যতটা লাভ করিয়াছেন, ভারতের ব্যাস-বাল্মীকি-কণাদ-গৌতমের খবর তাঁহারা ততটা রাখেন না। অতএব এই সকল অধ্যাপকগণের অধীনে বৎসর বৎসর যে বিপুল ছাত্রবাহিনী গড়িয়া উঠে, তাহারা যে ভারতীয় ভাবধারা হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। এই সকল অর্ব্বাচীন যুগের তরুণ বিনা বাধায় ভারতের ধর্ম্ম অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করে। বালুর উত্তাপে স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ-রক্ষায় উদ্যোগী হয়। কিন্তু ধাতুগত পুষ্টির অভাবে তাহাদের সকল প্রচেষ্টাই অবসাদের অন্ধকারে তলাইয়া যায়। দেশে বাড়িতেছে অবসাদ ও নৈরাশ্য, সংশয় আর কাপট্য। এ স্রোতঃ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে হইলে, একটা শক্তিশালী ধর্ম্মপ্রাণ সমষ্টির প্রয়োজন। যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ জাতির দুর্দ্দশার পথ রোধ করার আয়োজন করিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ভারতের ধর্ম্ম অলৌকিক ইন্দ্রজাল নয়। ভারতের ভগবান নর-নারায়ণ। মানুষের মতই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের জন্য এদেশের মহাপুরুষেরা যত্ন ও অধ্যবসায় করিয়া থাকেন। ভারতীয় চরিত্রের পরাকাষ্ঠা তাঁহাদের জীবনে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। রাম, ঋষভ, জনক, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ইঁহারা সকলেই মানুষ। দুষ্কর তপস্যা করিয়াই ইঁহাদের অসাধারণ চরিত্র ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছে। আমরা ভারতবাসী, আমাদের শিক্ষানিকেতনে এই সুমহান্ আদর্শের পরিচয় ও সঙ্কেত যদি না পাই—আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বেদ, উপনিষদ্, দর্শন শাস্ত্রাদি, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্ব্বাসিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে—শিক্ষার অভাবে ভারতের ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণের চরিত্র ও তাঁহাদের সুগভীর চিন্তাধারার সহিতই কেবল আমাদের পরিচয়ের অভাব হইতেছে, এরূপ নহে—পরন্তু আমরা ভুলিতেছি কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি তীর্থ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যও। আমরা ভুলিতেছি দেবগিরি, ঋষ্যমুখ, রৈবতক প্রভৃতি ভারতীয় ভাবোদ্দীপক পর্ব্বতের নাম। আমরা ভুলিতেছি তুঙ্গভদ্রা, বেদস্মৃতি সরযূ, বিতস্তা, মহানদীর পবিত্র স্মৃতি। জাতির জীবন-ধারায় নারকী গতি অনুস্যূত না হয়, ইহার জন্যই মহাত্মাদিগের পবিত্র চরিত্রের সহিত গিরি, নদী ও দেশের পবিত্র স্মৃতি প্রতিভায় আঁকিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু জাতীয় জীবন-রক্ষার এই অনিবার্য্য নীতি আমরা নিজেরাই অস্বীকার করিতেছি। হায় ভারতবাসী! দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদির সাহায্যে আত্যন্তিক স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা বলিয়াছিলেন — কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ুর্লাভের অপেক্ষা, অল্পায়ুঃ হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। কেননা, ভারতের মানুষই ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের বিগ্রহ-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। সেই দেশ আজ [illegible] বক্তি-বিশারদ লোকে

শিক্ষার আদর ভুলিতেছে—এ দেশ বাঁচিবে কি প্রকারে? ভারতের আকাশ-বাতাস অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের বাণীমন্ত্রে আজও মুখরিত, এই দেশের নৃত্যাদি মহোৎসব যজ্ঞেশ্বর নারায়ণকে কেন্দ্র করিয়া আজও অনুষ্ঠিত হয়। এই দেশ অভীষ্ট-পূর্ত্তির কামনা না করিয়া, পরমার্থপ্রাপ্তির তপস্যাই করিয়াছে। ইহাই এ জাতির স্বভাব ও স্বরূপ। সেই ভারতবর্ষ আরও দীর্ঘদিন ইহা হইতে যদি বঞ্চিত থাকে, তাহার মৃত্যু যে অতি ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা কি আর বলিতে হইবে? আমরা তাই ভারতীয় ভাবধারায় অভিষিক্ত একদল নরনারায়ণের জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছি। বাংলা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হউক।

ইহার জন্যই বাংলার কেন্দুবিল্ব, নান্নুর, নবদ্বীপ, হালিসহর, দক্ষিণেশ্বর নব-যুগ একালের তীর্থ। প্রেমের কবি জয়দেব-চণ্ডীদাসের দল বাংলায় কি আবার গড়িয়া উঠিবে না? বেদান্তের মায়াবাদ তুচ্ছ করিয়া মানবপ্রেমে উন্মাদ চৈতন্যের জীবন ধর্ম্ম বাঙ্গালী কি ব্যর্থ করিবে? মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত রামপ্রসাদের মহাপ্রাণ আশ্রয় করিয়া বাংলায় কি সন্তানধর্ম্মী একদল শক্তিশালী সমষ্টি গড়িয়া না? দক্ষিণেশ্বরের ধূলিমাটী এক বিবেকানন্দ সৃষ্টি করিয়াই কি নির্বীর্য্য হইবে? ধর্ম্মের ভিত্তির উপর এক বিজয়ী প্রাণসমষ্টির সৃষ্টি কি দুরাশা? বাংলার দরদী প্রাণ যারা তাদের, আমরা আজ ভাবিয়া দেখিতে বলি—দৈবের অধীন আমরা কোন দিন নহি। সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, ইহা আমরা জানি। জাতিকে জাগাইবার ও বাঁচাইবার জন্য বিপুল উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছে। সিদ্ধির প্রত্যাশায় কালহরণ নহে—প্রয়োগ করিতে করিতেই শক্তিসিদ্ধ জাতি গড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতিকে এইদিকে অবহিত হইতে বলি।

হিন্দুর আচার ও শীল—

ভারতের হিন্দু বাঁচিয়া আছে—তাহার পশ্চাতে আছে অমর কৃষ্টি, অমর সংস্কৃতি। জাতি দেশ লইয়া, ঐশ্বর্য্য লইয়া বাঁচে না — ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ভারতের হিন্দু-জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইলে, তাহার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করিতে হয়। এই প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছে, আমরা তবুও বাঁচিয়া আছি।

আত্মবৈশিষ্ট্যরক্ষার জন্য যে ভাব ও সংস্কৃতি, তাহা মুখের কথায় রাখা যায় না, জীবনবিধান ইহার জন্য প্রবর্ত্তিত রাখিতে হয়; ইহাই জাতির শীল ও আচার। ইহা যখন যেখানে অস্বীকৃত হয়, তখন সেইখানে জাতি আত্মঘাতী হয়। ইহা আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে। বিশাল হিন্দুসমাজ ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ার মূলে, হিন্দু জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান দায়ী বলিয়া আমরা মনে করি। যেখানে হিন্দুধর্ম্মের প্রখ্যাত শীল ও আচার উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় নূতন নূতন আচার ও পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সেইখানেই আমরা হিন্দু ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়াছি। অতীতে এরূপ হওয়ায় আমর. ক্ষতির মাত্রা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহাতে কোন ব্যক্তিগত মত-প্রভাবের দ্বারা নব নব সম্প্রদায়-সৃষ্টি জাতিকে শুভ দিবে না। হিন্দু জাতিকে এই দিকে অতিশয় সতর্ক হইতে হইবে।

আচার বলিতে আমরা প্রাচীন-শাস্ত্রাদি-কথিত দীর্ঘ ফিরিস্তি অনুসরণ করার কথা বলিতেছি না, আচারে ব্যবহারগত জীবন গড়িয়া উঠে। শীল আমাদের স্বভাব। যে ভাব ও ব্যবহার আমাদের জাতিবৈশিষ্ট্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাই আমরা আশ্রয় করিব। আমাদের খাদ্য দেশোপযোগী হইবে, আমাদের শয়ন, বিচরণ, লোক-ব্যবহার নিয়মিত ও শ্লীলতাপূর্ণ যাহাতে হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের অন্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় রাখার জন্য ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও যথানিয়মে গৃহে গৃহে উপাসনাদির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের সংযমী হইতে হইবে, সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। জীবন-বিধান যে ভাবে চালিত হইলে, আমরা ভারতীয় বলিয়া জগতের নিকট সম্মান ও গৌরব পাইব, আত্মবৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব, তাহারই অনুসরণ আমাদের শ্রেয়ঃ করিতে হইবে। আমরা রাষ্ট্রসেবাই করি, অথবা অর্থবিজ্ঞানের অনুশীলন করি, সকল কর্ম্মের মধ্যে ভারতীয় চরিত্রের পরিচয় দিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের একটা সাধনা

আছে। সেই সাধনার ভিতর দিয়া আমরা সদাচার পালন করিয়া উত্তম শীল লাভ করিব।

আচার ও শীল-রক্ষার উপায়—

ভারতীয় চরিত্রগঠনের যন্ত্রশালা ছিল গুরুগৃহ। এই গুরুগৃহ কালের কুলাল-চক্রে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ইহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি এইগুলি তক্ষশীলা, নালান্দা প্রভৃতির ন্যায় চরিত্র-গঠনের বিশ্ববিদ্যালয় হইত। আত্ম-গঠনের এই দিক্‌টা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন আলোই এইখানে পাওয়া যায় না। তবুও ভারতে ভারত-চরিত্র গড়িয়া উঠে, রক্ষা পায়, তাহা কতকটা দেশের জল-হাওয়ায়, আর কতকটা এখনও ভারতের আকাশে বাতাসে বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত নয়। বাকীটা পূরণ করে ভারতের গুরুমণ্ডলী। সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণ এখনও জাতির জীবনে অমৃত সঞ্চার করিয়া থাকেন। অর্ব্বাচীন যুগে প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদির পঠন-পাঠন বন্ধ হওয়ায় উহার প্রভাব ক্রমেই হ্রাস হয়—আর গুরুবাদের উপর গালি পাড়িয়া আমরা জাতিকে এই দিক হইতে বিমুখ করিতেছি। ইহার ফলে আমরা স্বজাতীয় ভাবধারা হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িব—বিজাতীয় ভাবেই আমরা আচ্ছন্ন হইয়া পবিত্র ভারতবর্ষকে প্রেতভূমিতে পরিণত করিব। এইরূপ কর্ম্ম হইতে আমাদের বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আত্মার অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়াই শ্রেয়ঃ লাভ করিতে চাহি। এই শিক্ষাই আমাদের মানুষ হওয়ার পরম শিক্ষা। ইহার সমস্ত বিরোধী ভাবকে দূরে পরিহার করার দরকার। উদীয়মান জাতিকে এই দৃঢ় সঙ্কল্পে হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

ধর্ম্মের বীর্য্য—

বর্ত্তমান দেশে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক না রাখার ঘোষণা চারিদিক্ হইতে শুনা যাইতেছে। ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রপ্রাণ যুগধর্ম্মে দেশের উপযোগী বলিয়াই অনেকে এইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। শিক্ষার দোষে ধর্ম্মানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, আমরা ধর্ম্মের কথা শুনিলে বিরক্ত হই। অপরিচয়ে ধর্ম্ম বাঘের মত মনে হয়। উহা যেন এক শ্রেণীর অকেজো লোকের জন্যই প্রযুজ্য। কাজের লোক যাঁরা, তাঁরা ধর্ম্মের তোয়াক্কা রাখেন না।

দেশের এই মনোভাবের জন্য যুগধর্ম্ম অনেকখানি দায়ী। কিন্তু ধর্ম্ম কালকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। যাঁহারা ধর্ম্মাশ্রয়ী বলিয়া আত্মপ্রচার করেন, ধর্ম্মবীর্য্য যদি তাঁহাদের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রেই ধর্ম্ম উপেক্ষার বস্তু হইত না। ভারতের ক্ষাত্র-শক্তি জাগ্রত থাকার যুগে ব্রাহ্মণের স্রুক্-ধারণে বাধা ছিল না। কিন্তু ক্ষাত্রশক্তির অবনতি-যুগে পরশুরাম বশিষ্ঠের বীর্য্যপ্রকাশ সম্ভব ছিল বলিয়াই, সে যুগে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিত না। এই যুগেও ধর্ম্ম গুহানিহিত থাকায় বাধা ছিল না, যদি জনসাধারণ ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিত হইত। দেশ যখন ধর্ম্ম অস্বীকার করিতেছে, অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে মানুষের অহঙ্কার যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে — তখন ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য - রক্ষার জন্য ধর্ম্মাশ্রয়ী ব্যক্তিদের সর্ব্বক্ষেত্রে ধর্ম্মবীর্য্য প্রকাশ করিতে হইবে। ধর্ম্ম সকল সময়েই কূটস্থ-চৈতন্যযুক্ত নহে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, "পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" বীরবেশে ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়।

ভারতের অধ্যাত্মবাদী যাঁহারা, যাঁহারা গুরুমণ্ডলীর অন্তর্গত, অসাধারণ মানুষ বলিয়া প্রখ্যাত। এই ধর্ম্মসঙ্কট-যুগে তাঁহারা যদি ধর্ম্মমাহাত্ম্যরক্ষায় উদাসীন হন, উহা ধর্ম্মের নির্ব্বীর্য্যতা নহে; ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামীই চলিতেছে, ইহাই সপ্রমাণিত হইবে। কিন্তু আমরা জানি "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ভণ্ডের সংখ্যা অনেক হইতে পারে, কিন্তু এদেশ হইতে ধর্ম্মবীর্য্য লোপ পায় নাই। আমরা জাতীয় জীবনের সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীর্য্যেরই জয় দেখিব। ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী আজ যত স্পর্দ্ধার কথা উচ্চারণ করুন না, ভারতের অধ্যাত্মশক্তির সম্মুখে তাহা কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় অঙ্গারে পরিণত হইবে।

সুভাষচন্দ্রের জাগরণ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন লইয়া বাংলায় ব্যাপক ভাবে জাতীয় জাগরণ যখন ঘটিয়াছিল, উহা প্রচণ্ড রাষ্ট্রমূর্ত্তি লইয়া সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিগ্রহের প্রতি পরমাণু বাংলায় ধর্ম্মসাধনার রেণুকণায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলার রাষ্ট্রসাধনার ভিতর রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের প্রাণ ছিল। রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত ঋষি বঙ্কিমের অমৃতদান ছিল। বিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রেরণা ছিল। রাষ্ট্রের নামে বাংলার ধর্ম্মই সেদিন মূর্ত্তি লইতে চাহিয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে উপনিষদের বাণী রাষ্ট্র-সাধকদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিত। বৈষ্ণব সহজিয়ার সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিপিনচন্দ্র শিবের বিষাণ বাজাইতেন। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরমে' 'কর্ম্মযোগিনে' 'ধর্ম্মে' যোগ ও সাধনের অগ্নি-বীণা বাজিত। সে ছিল বাংলার ধর্ম্মের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রসৌধ রচনার অভিনব যুগ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মর্ম্মবীণায় ধর্ম্মের রাগিণীই বাজিয়াছে, তাই সে যুগও বাংলার গৌরব যুগ বলিয়া নিখিল জাতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। তারপর দলাদলির যুগে ধর্ম্মের ভিত্তি ছাড়িয়া বাংলার রাষ্ট্র বিজাতীয় বিপ্লব ও সমাজ-তন্ত্রকে ঘরে ডাকিয়া আনিল। বাংলার আশাপ্রদীপ সুভাষচন্দ্রের ম্লান শিখা সে স্মৃতি জাগাইয়া রাখার প্রয়াস করে। কিন্তু পশ্চিমের ঝড়ে তাহা দোদুল্যমান, অস্থির। ভারতীর বীণা তাঁহার হৃদয়তন্ত্রে বাজিবার উদ্যোগ করিলেও, তাহা ছন্দোহীন হইয়া তাঁহার মর্ম্মতলে গুমরিয়া মরে। বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্র আজ ভীম ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণত। সুভাষচন্দ্র পাক খাইয়া হয়তো নিশ্চিহ্ন হইবেন। তার পর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল রাষ্ট্রপ্রলয়ের অসীম পারাবারে এ জাতির অস্তিত্বই হয়তো লোপ করিবে। এই-রূপ বীভৎস দুর্দ্দিন আজ আমাদের সম্মুখে। বাংলার রাষ্ট্র-তরীর কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যতের হাতে ইহা ছাড়িয়া দিবার যুগে বলিয়াছিলেন—"বন্দেমাতরম্-সাধনার শেষ হইয়াছে। আমাদের আজ অন্তর-সাধনায় ডুব দিতে হইবে, জাতিকে আত্মসমর্পণ-মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে এবং এই সমর্পণ-মন্ত্র সিদ্ধ করিতে পারিলে, সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, ঈশ্বর তাঁর মহাবাণী সফল করিবেন। জাতিকে মুক্তি দিবেন।"

সে ছিল ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কথা। তার পর এক দল বিপ্লবী এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে অশুদ্ধ রাজস বৃত্তি ক্ষয় করিয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উচ্চ আদালতে বিপ্লবীর বিচার করিতে গিয়া বিচারকদের হস্তে আত্মসমর্পণ শাস্ত্রগ্রন্থ উপনীত হইয়াছে। বাঙ্গালীর আত্মসমর্পণের সাধনা ফল্গুধারার ন্যায় ধীরে ধীরে মৃত্তিকা-গর্ভে অদৃশ্য হইল। গুর্জ্জরে নূতন বিগ্রহের অভ্যুত্থান। নাগপুরের জাতীয় সভায় মহাত্মার কণ্ঠে রাষ্ট্রমন্ত্রের ছলে জাতির আত্মসমর্পণের মন্ত্রই উচ্চারিত হইল। বাংলার বরপুত্র চিত্তরঞ্জন বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়াইয়া ঘরে ফিরিলেন। তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের গগনস্পর্শী হোম-শিখা মহাত্মা গান্ধীকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। এই মহাপুরুষের চিতাগ্নির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের রাষ্ট্রনায়ক গান্ধিজীকে আমরা অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়াছি। দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে সে আগুন চিরতরে নিভিল কি না, জানিতে চাহিয়াছি সুভাষের দিকে চাহিয়া। এই শ্রীমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ে বসিয়া প্রশ্নচ্ছলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছি—তাঁর উৎসর্গ-দীক্ষা কোথায় সিদ্ধ হইল? দেশবন্ধুর ভাস্বর মূর্ত্তি সুভাষের ললাটে বিমল জ্যোৎস্নালোকে সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হরিপুরা কংগ্রেস হইতে ত্রিপুরী, ত্রিপুরী হইতে কলিকাতা, সুভাষের গতি সতর্ক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। সুভাষের চিত্ত কি কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিবে? দেশবন্ধু কি মহাত্মায় রূপান্তরিত হইবেন? এই অধ্যাত্মরহস্যের অপূর্ব্ব বিজ্ঞান সকলে অবগত নহেন। আমরা আশ্বস্ত হইলাম—সুভাষচন্দ্রের আত্মস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া। সৃষ্টি ক্ষুদ্র হউক, সুভাষচন্দ্র বাংলার রাষ্ট্রচেতনার বিজয়ী বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা পাইলেন। বাঙ্গালী জাতি এই রাষ্ট্র-বিগ্রহকে ঘিরিয়া জাতিগঠনে কি সমর্থ হইবে?

বাঙ্গালীর গুরু দায়িত্ব—

ভারতে রাষ্ট্রচক্র আজ আত্মসমর্পণেরই মধুচক্র রাষ্ট্র-গুরুরূপে মহাত্মা বিগত বিশ বৎসর রাষ্ট্রসাধনায় এই-ভাবেই অভিনিবিষ্ট আছেন। তাঁর সত্তা চাহিয়াছে জাতিগত আত্মসমর্পণ। বাংলায় দেশবন্ধু, বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যুক্তপ্রদেশে মতিলাল, এমনই প্রদেশে প্রদেশে শক্তিশালী রাষ্ট্রসাধকের উৎসর্গের দাবী মহাত্মার অন্তর-বীণায় সঘনে বাজিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ বীরসাধক দেশবন্ধুর আত্মদানে তিনিও কিছুদিন ম্লান মূর্ত্তি ধরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে বেদনার অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছি। গান্ধিজী শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর অনুসরণ করিয়াছেন। বাংলার এই জ্যোতিষ্কের অস্তগমনের পর বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে দিয়াছে যে অর্ঘ্য, তাহাতে তিনি নিজেকে পূর্ণ মনে করিতে পারেন নাই। সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁর স্থির আঁখি আমরা লক্ষ্য করি হরিপুরা কংগ্রেসে; সারা বৎসরের পরিচয়ে মহাত্মা এই ক্ষেত্রে নিরাশ হইয়া, ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষকে নাকচ করিতে অভিলাষী হইলেন। বৃন্দাবনে সর্দ্দার প্যাটেল আজ তাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—"১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি-পদে সুভাষচন্দ্র যে ক্ষতির কারণ হইবে, তারযোগে তাঁর এই সংবাদ প্রেরণ, ইহা গান্ধিজীরই ইচ্ছানুগত বাণী। কেন না, সুভাষচন্দ্রের সহিত গান্ধিজী যুক্তি পান নাই। বাঙ্গালী জাতি সুভাষকে চাহে। ভারতের অনেক বাম-পন্থী সুভাষের অনুরাগী। সুভাষের অন্তরাত্মা এই দাবী উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজীর চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারিলেন না। বাংলার ইহাই ভবিতব্য। এই বিষয় লইয়া দক্ষিণপন্থীদের প্রতি বাংলার যে উত্তেজনাপূর্ণ বিক্ষোভ, তাহা জনসাধারণের অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুভাষ অতঃপর অনুরাগী বন্ধুদের শুধু সহযোগিতা নহে, সর্ব্বতোভাবে যুক্তির শক্তি লাভ করিবেন কি না, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। কলিকাতায় ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা যে দ্বিধা-বিভক্ত হইল, তাহা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বা ১৯২০।২১ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রভেদের পুনরভিনয় নহে। এই ভেদ মত ও পথেরই নহে, রাষ্ট্রসত্তার ভেদ। এই ক্ষেত্রে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রত্বের বিচার নাই। জাতির আত্মসমর্পণের পরিমাপ লইয়া ভবিষ্যৎ পক্ষাপক্ষের জয় সূচনা করিবে। সুভাষচন্দ্র এই দিকে উদাসীন নহেন। যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের জয় দিতেছেন, তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব কত অধিক, তাহাই গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

একনায়কত্বের হেতু—

ত্রিপুরীর পর কলিকাতায় যাহা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুমাত্র নাই। যাঁহারা গান্ধী ও সুভাষের একত্র হইয়া পরামর্শ-ফলে উভয়ের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আশা করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রবীণ অথবা নবীন যাহাই হউন, ভারতের রাষ্ট্রতত্ত্বের গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অল্পই বলিতে হইবে। রষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচনে ভোটাধিক্য সুভাষের পক্ষে হওয়ায়, কংগ্রেসের শক্তি কোন পক্ষে, তাহা সুনির্ণীত হয় নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থের প্রস্তাব ইহাই নির্ণয় করিয়াছে। যদি এই ক্ষেত্রে অন্যরূপ হইত, মহাত্মা তাঁহার মধুচক্র লইয়া স্বতন্ত্র থাকিতেন; তাহার আভাষ রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচনের পরই পাওয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরীতে যাহা যাহা হইয়াছিল, কলিকাতায় জন-সাধারণের বিক্ষোভপ্রকাশের সুযোগ দিয়া প্রকৃতি তাহা অন্যথা করিলেন না। গান্ধীজী ইহা জানিতেন; কলিকাতায় এই মতভেদের অঙ্কপাত করিবার জন্যই তাঁহার আগমন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে একনায়কত্বের প্রেরণা জনসাধারণের হাত-তালির জোরে তিনি লাভ করেন নাই, এবং উহা হইতে তিনি বিরত হইতেও পারেন না। উহাই ভারতসত্তার নির্দ্দেশ। ভিতরে মত-স্বাতন্ত্র্য লইয়া একযোগে কার্য্য করার কাপট্য ভারতের রাষ্ট্রে আর প্রশ্রয় পাইতে পারে না। তাই গান্ধীজীর ন্যায় রাষ্ট্রগুরুর আবির্ভাব। তিনি তাঁর মতানুবর্ত্তিতায় ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করার যেটুকু সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা মতামতের ধমকে ব্যর্থ করিতে পারেন না। তিনি দক্ষিণপন্থী। রাষ্ট্রসিদ্ধির জন্য অহিংস নীতি তাঁহার প্রথম ও চরম অস্ত্র। ইহার জন্য আত্মসমর্পিত সেনাবাহিনী তিনি গড়িয়া লইয়াছেন। ভারতের ৮টী প্রদেশ তাঁহারই হস্তে শাসিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাঁহার অহিংস সংগ্রামের সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজের

নিকট হইতে, যাহা পাইয়াছেন তাহা আশ্রয় করিয়া তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী মুক্তির আদর্শেই তিনি অনুপ্রাণিত। বিশ বৎসরের রণক্লান্তি অপনোদিত করিয়া, তিনি যদি আজ ইংরাজের সহিত সম্মানজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন অথবা ইহা তাঁহার অভিমতে দেশের অহিত বলিয়া মনে হইলে যদি তিনি তাঁহার ছন্দে পুনঃ সংগ্রাম ঘোষণা করেন, তাহার সকল দায়িত্ব তাঁহার দলের উপরই নির্ভর করিবে। জাতির বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তি তাহা যদি ব্যাহত করে, তিনি বুঝিবেন—যে শক্তি সংহত করিতে পারিলে একনায়কত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার স্বপ্ন সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অভাব হইয়াছে। এই অবস্থায় বিরোধ তাঁহার কোন ক্ষেত্রেই নাই। আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করার দিকেই তাঁহাকে লক্ষ্য দিতে হইবে।

সুভাষচন্দ্র তাঁহার প্রতি যতই অনুরাগ দেখান, গান্ধীজীর একনায়কত্বে তিনি বিশ্বাসবান্ নহেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসের গণশক্তি যতক্ষণ গান্ধীজীর অনুগত, ততক্ষণ তিনি জনসাধারণের করতালির লোভে বিভিন্ন মত লইয়া কর্ম্মচক্র নির্ম্মাণ করিবেন কেন? জহরলালজী নিজেই জানেন—তিনি দোটানায় পড়িয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্য নাই। হৃদয় চাহে এক, বুদ্ধি চাহে অন্য। তাই দুই কূল রাখিতে গিয়া কলিকাতার রাষ্ট্রসভায়ও তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। রাষ্ট্রসাধনার এই অপূর্ব্ব রহস্যময় ঘটনায় আমরা আত্মস্থ হইলে দেখিব—বাঙ্গালী আজ কি গুরুতর দায়িত্বের বোঝা মাথা পতিয়া লইল। যত মত, তত পথ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ এক পথে ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ মতটা মাথার উপর হাওয়ার জগতে ঘুরে। গান্ধীর মত তাঁহার জীবনে রূপ লইয়াছে; তিনি স্বমতাবলম্বী লইয়া কার্য্য করিবেন। কাহারও মন রাখার ধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুভাষের মত যদি বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে, তাঁহার মতাবলম্বী লোক লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। সে সুদিন যতদিন না আসে, ততদিন অনেক মতের মানুষ লইয়া কালহরণ তাঁহাকে করিতেই হইবে। বাঙ্গালীজাতি রাষ্ট্রসাধনায় এত গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই আজ গান্ধীবাদ লইয়া অযথা আলোচনা করিতেছে। কংগ্রেস হয় দক্ষিণ-পন্থী অথবা বামপন্থীর কর্ম্মক্ষেত্র হইবে। ইহার অন্যথা হওয়ার যুগ কল্পনার যুগ। সে-যুগের অক্ষপাত হইয়াছে।

উপসংহার—

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য—ভারতের রাষ্ট্র বস্তুতন্ত্র ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। ধর্ম্ম আত্ম-সমর্পণের মন্ত্র মূর্ত্তি লইয়াই আবির্ভূত। শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে। গান্ধীজী সারা ভারতের রাষ্ট্রসাধকদের লইয়া আত্মসমর্পণ - সাধনায় শক্তিশালী চক্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রগুরুর অধিকারী হইলে, তাঁহারও সুনির্দ্দিষ্ট সাধন-চক্র আছে। যদি ইহা আবিষ্কৃত হয়—একদিন ভারতের কোন এক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুরু নহে, এইরূপ চক্রধারী গুরুমণ্ডলী লইয়া ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা চলিবে এবং এই মুক্তিসিদ্ধ জাতি এইরূপ রাষ্ট্রগুরুমণ্ডলী কর্ত্তৃক শাসিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইবে। বাঙ্গালীজাতি ইহা অধ্যাত্মবাদ বলিয়া আজও উড়াইয়া দিতে পারে; কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে আমরা এই তত্ত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে বলি। তিনি যে আজ সৎসাহসের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন এবং যে গুরু দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন, তাহা কার্য্যতঃ সুসিদ্ধ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। বাঙ্গালীর আশা ও ভাষা তাঁহাকে ঘিরিয়াই জয়যুক্ত হইবে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে জাতীয়তার যে সিদ্ধ ঋক্ প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র অগ্রপুরোহিতরূপে তাহাই সিদ্ধ করুন, এই প্রার্থনাই আমরা সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট নিরন্তর করিতেছি।

ঝড়ের সঙ্কেত

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাবাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইবার জন্য আমি হাবড়া স্টেশনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি বাবার একমাত্র পুত্র, ভবিষ্যৎ জমিদারীর নির্ভুল ও নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী, পিতৃ-বিয়োগের পর জমিদারীটা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিব —এই সুখকল্পনায় আমি অতিশয় চরিত্রবান ও পিতৃবাধ্য ছিলাম।

মনে করিয়াছিলাম—দূর হইতে পিতাকে দেখিয়া হাতের জলন্ত সিগারেটটা ফেলিয়া দিব, কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন রহিল না। যথাসময়ে পশ্চিমের গাড়ী আসিয়া দাড়াইল; কিন্তু বাবা আসিলেন না। খানিকটা খোঁজ করিলাম; কিন্তু রূপনগরের জমীদার মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণী ভিন্ন ভ্রমণ করেন না ইহা জানিয়া আমি আর বেশী পরিশ্রম করিলাম না। ধীরে সুস্থে সমস্ত ট্রেণখানার মুখের উপরেই আর একটা নেভি কাট্ ধরাইয়া মনে করিলাম, কোথাও একখানা বেঞ্চে বসিয়া ঝড়বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত কাল-বৈশাখীকে লইয়া একটুখানি কবিত্ব করা যাক্। আজ এক-মাস যাবৎ বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রাত্রে নিদ্রাহীনতায় গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিলাম, কল্পনা ছিল পিতা আসিলে আগামীকাল তাঁহার নিকট কয়েক শত টাকা শোষণ করিয়া দার্জ্জিলিঙে গিয়া স্নো-ভিউ-তে থাকিব এবং সন্ধ্যার দিকে ম্যাল্-এ গিয়া বাঙালী মেমদের আধুনিক ষ্টাইলের সমালোচনা করিয়া বেড়াইব, কিন্তু পিতা জীবিত থাকিয়াই যখন আমার কল্পনা এইভাবে ব্যর্থ করিলেন, তখন তিনি মরিলে হয়ত তাঁহার তালপুকুরে আমার জল খাইবার ঘটিটাও ডুবিবে না।

একখানা লোহার বেঞ্চ একাকী আশ্রয় করিয়া বসিলাম। বেকার জীবন যাপন করিয়া শরীরে কিছু মেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার উপর গ্রীষ্মকাল এবং তাহার উপরেও ধনাঢ্য পিতার অর্থের গরম, সমস্তটা মিলিয়া কিছুকাল হইতে হাঁসফাঁস করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় এই অকাল বাদলের সজল হাওয়ায় বড়ই পুলকিত হইলাম। পকেটে কিছু টাকা ছিল, এক আধজন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে থাকিলে হাবড়া ষ্টেশনের ইহুদীর হোটেলে পদধূলি দিতাম।

ঝড়ে, বৃষ্টিতে, মেঘের গর্জ্জনে, দিশাহারা যাত্রীদের উচ্চরোলে সমগ্র হাবড়া স্টেশনের চারিধার ওলোট-পালট হইতেছিল। বৃষ্টিধারার ঝালরের বাহিরে চারিদিক ধূসর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঠিক এমনি সময়ে আমার পিছন দিক হইতে যে নাটকীয় ঘটনাটি ঘটিল, তাহা কালবৈশাখীর এই প্রবল বিপর্য্যয় ছাড়া আর কোনো অবস্থাতেই হয়ত সম্ভব হইত না।

উপন্যাস রচনা করা আমার পেশা নহে; কিন্তু যাহা ঘটিল, তাহা ঝড়ের মতো একটানে আমার আলস্যবিলাসী জীবনকে মূল কেন্দ্র হইতে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

কবিত্ব করিবার জন্য সিগারেট টানিতে টানিতে নিমীলিত দৃষ্টিতে বসিয়াছিলাম। জটলা পাকাইয়া যাত্রীর আনাগোনার দিকে একটুও লক্ষ্য ছিল না। সহসা ভীড়ের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শুনিয়া সচকিত হইয়া চাহিলাম।

নমস্কার। চিনতে পারেন?

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া এক তরুণীর দিকে মুখ তুলিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে সতর্ক করিয়া বলিয়া থাকেন, আইবুড়ো ছেলে একা-একা থাকিলে প্রেতিনী আসিয়া গ্রেপ্তার করে। সেই কথাটা সহসা মনে পড়িয়া একটু সজাগ ও সোজা হইয়া বসিলাম। বলিলাম, কে আপনি?

ওমা, চিনতে পারলেন না? আমি সরোজিনী দেবীর মেয়ে, মৃণ্ময়ী!—বলিয়া আধুনিক সজ্জায় সুসজ্জিতা সুন্দরী প্রেতিনীটি হাসিমুখে আমার দিকে চাহিল।

বলিলাম, সরোজিনী দেবী কে?

বেশ যা হোক, এই ক' বছরেই সব ভুলে গেলেন? অবশ্য আপনি তখন ছেলেমানুষই ছিলেন, চোদ্দ পনেরো বছরের বেশি নয়। আপনার নাম ত' রাজেন্দ্র?

মানলুম।

প্রেতিনী কহিল, আপনার বাবার নাম ব্রজেনবাবু ত?

বলিলাম, মিথ্যে নয়।

আপনার মায়ের নাম সুরসুন্দরী কিনা?

লোকে তাই জানে।

সে কহিল, এত বললুম, তবুও আমাকে চিনতে পারলেন না? আপনি ছোটবেলা কা'র গলা ধরাধরি ক'রে 'শিবের গাজন' গাইতেন?

সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম। সে পুনরায় কহিল, মনে নাই আপনার মায়ের আদেশে আপনার বাবা আমাদের ঘর জালিয়ে উৎখাত করেছিলেন?

চুপ করিয়া রহিলাম।

মৃণ্ময়ী হাসিমুখে আবার বলিল, সেই আমার বিধবা মা, যার ঘরে দু'বেলা আপনার জলযোগের বরাদ্দ ছিল।

আমার ভিতরের জমীদার এইবার কথা কহিল। বলিলাম, হ্যাঁ, এইবার সবই একটু একটু মনে পড়ছে। ঘর জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন, সে কথাটা কি ভেবে দেখেছ?

হ্যাঁ, আমার মায়ের নামে কলঙ্ক রটেছিল।

শুধুই কি রটনা?—নিজের কণ্ঠে আমি ইচ্ছা করিয়াই কিছু বিদ্রূপ মিশাইয়া দিলাম।

মৃণ্ময়ী বলিল, না, বয়স হবার পর জানতে পেরেছি কিছু সত্য ছিল। যাক্‌গে, এতকাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, খুবই আনন্দের কথা।

ছোটবেলা বাবা আমাকে বাইবেল হইতে দশ আজ্ঞা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ করিতে পারি, তাহার ভিতর শতকরা নব্বই ভাগ পালন করিয়াছি, উহাদের মধ্যে 'ব্যভিচার' শব্দটার অর্থ বুঝিতাম না বলিয়া গোপনে দিদিমাকে অনেক বার প্রশ্ন করিয়াছি, তিনি বলিতেন, বড় হইলে বুঝাইয়া দিব। বয়স হইবার পূর্ব্বে দিদিমা মরিয়া গেলেন, সুতরাং ব্যভিচার বুঝিতে পারিলাম না। আজও মৃণ্ময়ীর সহিত আলাপ করিতে একটু উৎসুক হইয়া ভাবিলাম, আর যাহাই হউক, ইহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে ব্যভিচার হইবে না। মেয়েটা যে প্রেতিনী নহে, বরং পর্য্যাপ্তযৌবনা পূর্ব্বপরিচিত এক তরুণী, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। বলিলাম, সত্যিই অনেক কাল পরে দেখা, আমিও খুশী হলুম। তুমি যাই বলো, বাবার কিছু দোষ নেই, দোষ হচ্ছে সেই বেটা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের—যার আমল থেকে জমীদারির আরম্ভ। এখন থাকো কোথায় তোমরা?

মৃণ্ময়ী বলিল, কলুটোলায়।

এত ঝড়বৃষ্টিতে কি যেতে পারবে? একা বেরিয়েছ কেন এই দুর্য্যোগে?

মৃণ্ময়ী চুপ করিয়া যখন রেলপথের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, আমি সেই সুযোগে তাহার দিকে একবার চাহিলাম। আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। দরিদ্রের ঘরের মেয়ে বলিয়া স্বাস্থ্যটা ছিল বলিষ্ঠ ও নিটোল। সেই বয়সেই ইহার গলা ধরিয়া 'শিবের গাজন' গাহিতে দেখিয়া মা রুষ্ট হইতেন, অর্থাৎ ইহাই ভয় ছিল, পাছে ইহার বাড়ন্ত কৈশোরের ঘন গন্ধে আমার কিশোর মনে কোনো নেশা লাগে। ইহার আজিকার আকস্মিক আবির্ভাবে সেই অতীত ইতিহাসের পুরাতন পথ বাহিয়া পুনরায় সেই বিচিত্র গন্ধটা কেমন করিয়া যেন মুহূর্ত্তের জন্য আঘ্রাণ করিলাম। কিন্তু আমি যে জমীদার, ইহা ভুলিলে আমার চলিবে না, আমার আভিজাত্যের অহংকারে ইহাও অস্বীকার্য্য, এবং নারীর সান্নিধ্য লাভের জন্যও যে আমার আগ্রহ রহিয়াছে, তাহাই বা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া?

বলিলাম, বেঞ্চে জায়গা আছে, একটু বসতে পারো। এত বৃষ্টিতে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু ধরুক।

মৃণ্ময়ী করুণ হাসিমুখে বলিল, জমীদারের পাশে প্রজা কি একাসনে বসতে সাহস পায়?

সে কথা ঠিকই বলেছ। পৈতৃক আদর্শ আমিও খুব মেনে চলি। কিন্তু কলকাতা শহরটা বড়ই আজগুবী। এখানে শ্রীলাল চামারের বাড়ীতে ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণেরা

ভাড়া থাকে? ভয় নেই, বসো এখানে। একটু ফাঁক রাখো, তা'হ'লেই হবে।

ফাঁক রাখিয়া আমার পাশে সে বসিল বটে; কিন্তু তাহাকে উসখুস করিতে দেখিয়া মনে মনে একটু কুপিত হইলাম। ধনীর পুত্র বলিয়া আমার ভিতরে এমনি একটা আত্মাভিমান ছিল যে, আমার অনুরোধকে আদেশ বলিয়া কেহ মান্য না করিলে আমার খুন চাপিয়া যাইত। কিন্তু দেখিয়া মনে হইল—ইহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বৃথা। আজ সে হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে মান রাখিতে না চাহিলে, জোর করা চলিবে না। এদিকে আবার এক তরুণী পাশে বসিয়াছে অনুভব করিয়া পুলক-শিহরণও কিছু লাগিয়াছে বৈকি! বিবাদ বাধাইয়া, তর্ক তুলিয়া এমন একটি রাত্রিকে ব্যর্থ করিতেও আমার মন উঠিল না।

সাহস করিয়া বলিলাম, আচ্ছা, তোমার ডাক-নাম ছিল বোধ হয় মীনু, নয়?

মনে আছে দেখছি আপনার!

মনে তুমিই করিয়ে দিয়েছ। একটা স্মৃতির টানে আর একটা এসে হাজির হয়। তোমার সঙ্গে কেউ নেই কেন বলো ত?

কেউ থাকলে কি আপনি খুশী হতেন?—এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইল। তাহার হাসির ভিতরে আমি সেই চিরকালিনীর ছলনা দেখিতে পাইলাম না; হয়ত ভুল করিয়াই আমার মনে হইয়া গেল, অনেকক্ষণ হইতে একটা ব্যথার কাহিনী সে যেন কেবলই চাপিয়া যাইতেছে। তাহার চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু আমার ভিতরেও যেন অস্বস্তি আনিতেছিল। আমি কেবল একবার পথের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, কোনো ইঙ্গিত আমি করিনি মৃণ্ময়ী, কেবল বলছিলুম, ভয়ানক দুর্যোগ, তুমি যেতে পারবে না।

কণ্ঠস্বর আমার করুণায় বিগলিত হয় নাই, ইহা যে আমার ভবিষ্যৎ প্রণয়কাণ্ডের একটা আভাস—এমন একটা উদ্ভট কল্পনাকেও আমি মনে মনে প্রশ্রয় দিতেছি না, কিন্তু এই দুর্য্যোগে একজন তরুণীর একাকিত্বের প্রতি একটা বিবেচনা ও কর্ত্তব্যবোধ ছিল। আমার সচেতন আভিজাত্য কলঙ্কবতী সরোজিনীর কন্যার প্রতি অবশ্যই বিতৃষ্ণ; কিন্তু যে-মীনু আমার গলা ধরিয়া শিবের গাজন গাহিত, তাহাকে বাদলের বন্যায় নিষ্করুণভাবে ঠেলিয়া দিতে আমার মন উঠিল না।

প্লাটফরম হইতে লোকজন একে একে চলিয়া গেল, বৃষ্টির ঝর-ঝর ধারা অবিশ্রান্ত ঝরিতেছিল, এবং সেই নির্জ্জনে আমরা দুইজন বসিয়া রহিলাম।

এক সময়ে সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি এবার এগোই।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কী বলছ তুমি? আর কিছু না হোক, কাপড় চোপড় ভিজে গেলেও যে বিপদে পড়বে?

উপায় নেই রাজেনবাবু, আমাকে ফিরতেই হবে তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, নমস্কার।—এই বলিয়া সটান পিছন ফিরিয়া, একটুও অন্তরঙ্গতার চিহ্ন না রাখিয়া, দ্রুতপদে তাহার হিল্‌তোলা জুতার খটাখট আওয়াজ তুলিয়া সে চলিয়া গেল। পুরাতন পরিচয়ের কোনো মূল্যই দিয়া গেল না। প্লাটফরম ছাড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রি, বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন, ঝাপ্‌সা আলো, ইতস্ততঃ ধাবমান যাত্রীর দল,—সমস্তটা মিলিয়া মনে হইল, ইহা যেন ক্ষণকালের একটা স্বপ্ন। ইহার জন্য কালবৈশাখীকেই দায়ী করিলাম। এমন ঘটনা ঘটে জীবনে। ঝড় উঠিয়া সব কিছুকে স্থানচ্যুত করে, অদ্ভুতের অবতারণা ঘটে। স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না, চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলে না। দম্‌কা বাতাস উঠিল, অতীতকালকে টানিয়া আনিয়া বর্ত্তমানের উপর নিক্ষেপ করিল, আমার ভাবনার ধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিল। ফল এই হইল যে, নূতন করিয়া আর সিগারেট ধরাইবার উৎসাহ পাইলাম না, বরং সমস্ত পথটা ধীরে ধীরে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কেমন একটা ক্লান্তি ও বৈরাগ্য আসিয়া ঘিরিল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া পা বাড়াইতেই পুনরায় মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া আমি সচকিত হইলাম। যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে কাপড়-

চোপড় ভিজাইয়া সে বিপন্ন হইতে চাহে নাই। কাছে আসিয়া বলিলাম, যেতে পারোনি ত?

মনে হইল, আমাকে দেখিয়া সে আর খুশী হয় নাই। দেখিলাম—মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিবার মতো বর্ত্তমান অবস্থা তাহার নহে। সে কেবল বলিল, ভারি বিপদে পড়লুম।

বলিলাম, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহ'লে আমার গাড়ীতে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি।

এই কথাটা শুনিবার জন্য সে যে এমন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য যেন সহসা চুরমার হইয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া সে বলিল, মান অপমানের প্রশ্ন এখন আমার নেই, আমার বড়ই বিপদ্। আমাকে দয়া ক'রে শীঘ্র পৌঁছে দিন্।

তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ডাকিলাম। সে উঠিয়া বসিল, আমিও উঠিয়া তাহার পাশে বসিলাম। ড্রাইভারকে নির্দ্দেশ করিলাম, কলুটোলা।

বৃষ্টির ভিতর মোটর যখন ছুটিয়া চলিল, আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, ব্যাপারটা কি বলো দেখি? তোমার মা কোথায়?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে কহিল, তাঁকে নিয়েই ত সব বিপদ্!

তাহার কণ্ঠস্বরে আমার সন্দেহ হইল। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, বিপদ্‌টা কি শুনি?

শুনলে প্রতীকার করতে পারবেন না রাজেনবাবু। মা আমার মৃত্যুশয্যায়।—এই বলিয়া মৃণ্ময়ী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃত্যুশয্যায়! কী বল্‌ছ? তাঁকে ফেলে তবে তুমি বেরিয়েছ কেন?

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মৃণ্ময়ী বলিল, এই গাড়ীতে যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনি মায়ের পরম শত্রু। কিন্তু সে পাষণ্ড এলো না। আমি কি করি বলুন ত?

পিতার অপেক্ষাও কৃপণ বলিয়া বন্ধুসমাজে আমার একটা দুর্নাম ছিল। যেখানে স্বার্থ ও লোভের খাদ্য নাই, সেখানে অর্থব্যয় করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সহসা গাড়ীর ভিতর বসিয়া অশ্রুমুখী মৃণ্ময়ীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, তোমার কত টাকার দরকার বলো।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলাম, যাকে পরম শত্রু আর পাষণ্ড ব'লে অভিহিত করছ, তাঁর জন্যে তোমাদের এই ব্যাকুলতা কেন, মৃণ্ময়ী?

বড়বাজারের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছিল, বৃষ্টির ছাট বাঁচাইয়া আমরা দুইজনে গাড়ীর গদির মাঝামাঝি বসিয়াছিলাম। মৃণ্ময়ী মুখ তুলিয়া বলিল, আপনার কাছে কিছু প্রকাশ করা আমার পক্ষে শোভন হবে না; তবে এইটি ব'লে রাখি, যেদিন আমাদের ঘর জ্বালানো হয়েছিল, সেদিন আমাদের যে অসহায় অবস্থা ছিল, আজো তেমনি আছে।

কেমন যেন আঘাত পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু দরিদ্রের বেদনার ইতিহাস শুনিয়া অথবা বঞ্চিতের অশ্রু দেখিয়া মমতায় বিগলিত হইব, কিম্বা তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিব, প্রাণ দিব, নিজের ভবিষ্যৎ জীবন-তরী ডুবাইব—এমন ভাবালুতা আমার নাই। নিজের সহিত কতখানি সংগ্রাম করিয়া যে একটু আগে তাহাকে টাকা দিব বলিয়া একটা বেপরোয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, এবং তাহার জন্য মনে মনে যে এখনি অনুশোচনা আসিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য বৃহৎ মনস্তত্ত্বের শাস্ত্র আওড়াইবার প্রয়োজন নাই, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা বুঝিয়া লইবেন। বাল্যপরিচয়ের কথাটা তুলিয়া মেয়েটা আমাকে একটু দমাইয়া দিয়াছে, কেমন একটা অযৌক্তিক আত্মসম্মানের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে, নচেৎ বিপন্ন যুবতীকে টাকার লোভে ভুলাইয়া এতক্ষণ আমি অন্য পথ ধরিতাম। আমার পরম গুরু পিতার নৈতিক বিচারের প্রতি ইহার বারম্বার কটাক্ষ আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন, ইহা তাহাকে জানাইয়া দিবার বাসনা হইল; তাহার মৃত্যুশয্যাশায়িনী জননীর প্রতি আমার যে একটুও দরদ নাই, ইহাও জানাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতেছিল। পৃথিবীর লোক মনে করিবে, আমি মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিতেছি; বোকা জনসাধারণ সন্দেহ করিবে, আমি একটি বিপন্ন তরুণীকে উদ্ধার করিবার জন্য মোটর ভাড়া করিয়া ছুটিয়াছি, আমি দয়ার অবতার,—তাহাদের সন্দেহ

ভঙ্গনার্থ আমি এই গাড়ীর ভিতর বসিয়া এখনই আমার পাশবিক স্বরূপ সহজেই প্রকাশ করিয়া দিতে পারি এবং তাহার জন্য কোনরূপ বিপদ্ ঘটিলে বড়লোকের ছেলে বলিয়া অনায়াসেই পরিত্রাণ পাইব, – কিন্তু একটা কুৎসিৎ বৈষ্ণবী দয়া আসিয়া আমার অকৃত্রিম পৌরুষকে আচ্ছন্ন করিল। মুখে কেবল বলিলাম, তোমাকে পৌঁছে দিয়েই আমি চ'লে যাবো, কেমন ?

মৃণ্ময়ী বলিল, তাই যাবেন, আপনার বড় কষ্ট হোলো।

কলুটোলার এক গলির মোড়ে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া একটা মৌখিক ধন্যবাদ না দিয়াই যখন পালাইবার চেষ্টা করিল, তখন আমি হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলাম। কলিকাতা রাজধানীর একটি বিশেষ খ্যাতি আছে, এখানকার নরনারী বিচিত্র। মনে করিলাম, সমস্তটাই হয়ত প্রবঞ্চনা, হয়ত আমাকেই ভুলাইয়া একটি তরুণী এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে গাড়ী চড়িয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। হয়ত ইহার অধিক দূর অগ্রসর হইলে, আমাকে 'ব্ল্যাক্‌মেল্' করিয়া টাকা পয়সা ছিনাইয়া লইবে। সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু 'ব্ল্যাক্‌মেলের' ভয় করিব বড়লোকের ছেলে হইয়া ? অভিজাত বংশের ছেলের নামে যদি একটু নিন্দাই না রটিল, তবে বাঁচিয়া থাকাই বৃথা। হয়ত ধন্যবাদ না দিয়া পলাইবার সঙ্কেত এই যে, আমি তাহাকে অনুসরণ করিব। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলাম না। ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গাড়ী হইতে বৃষ্টি মাথায় করিয়া নামিয়া আমি দ্রুতপদে মৃণ্ময়ীর অনুসরণ করিলাম। একটা দুর্দ্দান্ত খেলায় আমি মাতিয়া উঠিলাম। এমন একটা লোভের উপকরণকে কিছুতেই হাতছাড়া হইতে দিব না।

দরজার কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিলাম। মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইল না, কেবল বলিল, আসুন আমার সঙ্গে সাবধানে, নীচেটা বড় অন্ধকার।

একবার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। নিশ্বাসের দ্রুততা চাপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলাম, শহরের এদিক্‌টায় অনেক গুণ্ডার আড্ডা, এখানে থাকতে তোমাদের ভয় করে না, মৃণ্ময়ী ?

ভয়টা গরীবের জন্যে নয়, রাজেনবাবু।

তাহার কথায় আমার মুখখানা যেন ভোঁতা হইয়া গেল। কিন্তু কি করিব, অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে আসিয়াছি, মান-অপমানের প্রশ্ন তুলিলে এখন চলিবে না। আমি তাহার পিছনে পিছনে উঠিয়া উপরে আসিলাম।

প্রকাণ্ড বাড়ীর উপর তলাকার একটি ক্ষুদ্র অংশ। পাড়া, পল্লী, চেনা-পরিচয় কোথাও কিছু নাই, এতটুকু অবকাশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—চারিদিক্ যেমন জমাট, তেমনি নিরেট্। দালানের দরজাটা একবার বন্ধ করিয়া দিলে পৃথিবীর সহিত আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। কেহ মরুক, খুন হউক, আত্মহত্যা করুক, কেহ জানিবে না। আমি একবার মুহূর্ত্তের জন্য অসীম সাহস লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় একটা ছাপাখানা হইতে ফ্ল্যাট্ মেশিনের একঘেয়ে শব্দ কাণে আসিতে লাগিল। আমি একবার মুহূর্ত্তের জন্য অসীম সাহস লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার জামার সোণার বোতাম, হাতে সোনার হাত ঘড়ি, পকেটে মণিব্যাগ, এবং আমার পৈতৃক প্রাণটা—এই চারিটি বস্তু একত্র এক নিমেষের জন্য অনুভব করিয়া লইলাম, তারপর ঢোঁক গিলিয়া প্রশ্ন করিলাম, কোথায় তোমার মা, মৃণ্ময়ী ?

এই যে, এই ঘরে—বলিয়া মৃণ্ময়ী আমাকে লইয়া একটি ঘরে ঢুকিল।

অবশ্য সমস্তই সত্য। রোগীর মৃত্যুশয্যা সাজাইয়া আমাকে প্রতারিত করিবার ফন্দী নাই। বাল্যকালে যে 'মাসীমার' ঘরে বসিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিতাম, তাঁহাকে অবশ্য চিনিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ, কালের ব্যবধান ; দ্বিতীয়তঃ, চেহারাটা বিকৃত, রোগশীর্ণ। মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়াছে, আর বেশি দেরী নাই। সংজ্ঞার চিহ্ন দেখিলাম না—কেবল নিশ্চল অনড় একটি কঙ্কাল পড়িয়া আছে, কণ্ঠের মূলে কেবল মাঝে মাঝে কাঁপিতেছিল। রোগের ইতিহাস শুনিবার প্রবৃত্তি হইল না, সহানুভূতি জানাইবার উৎসাহ আসিল না, কেবল চুপ করিয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল, মৃণ্ময়ী পিছন ফিরিয়া কাহাকে কী যেন ইসারা করিতেছে। তড়িৎগতিতে ফিরিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম, পুনরায় আমাকে সন্দেহে

ঘিরিল। চাহিয়া দেখিলাম, ঘরের একান্তে দুইটি যুবক এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় আগে তাহাদের লক্ষ্য করি নাই।

মৃণ্ময়ী বলিল, কিছু আশা আছে, মনে হোলো?

না।

আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ডাক্তার দেখাবার অবস্থা আর নেই জানি, হয়ত আর এক আধঘণ্টা। কিন্তু আপনি এই উপকারটুকু করে' যান্। সুধু হাতে টাকা আমি কোথাও পাবো না, এই চুড়ি দু'গাছা বিক্রি ক'রে আমাকে কিছু টাকা এনে দিন্।

যুবক দুইটিকে দেখিয়া আমার মন ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছিল। চুড়ি দু'গাছা তাহার হাত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, সোণার চুড়ি ত' ঠিক?

হ্যাঁ, সোণারই।

আচ্ছা চললুম, বোধ হয় পারবো আনতে। —বলিয়া একবার বাহিরে পা বাড়াইলাম, এবং সেখান হইতেই পুনরায় ডাকিলাম, একটু এসো আমার সঙ্গে, কথা আছে।

গোপন প্রশ্ন করিবার সময় ইহা নহে, মৃত্যুপথযাত্রীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিবার অবসর ইহা নয়; কিন্তু স্বার্থ ও নিষ্ঠুরতা আমার সহজাত, একথা আমার ভুলিলে চলিবে না। আমার শীকার অন্যে হস্তগত করিবে, ইহার ভিতরে আমি যেমন আমার অক্ষমতার দৈন্য দেখিলাম, অন্যদিকে তেমনি আমার প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মানুষের জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই; কিন্তু মৃত্যুশয্যা দেখিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমি আমার কড়া ও গণ্ডা ত' ছাড়িতে পারি না!

মৃণ্ময়ী অন্ধকারে আমার সহিত মাঝপথে নামিয়া আসিল। আমি চুপি চুপি বলিলাম, ঢাকাঢাকি আমার কাছে নেই মীনু, একটা কথা আমাকে সত্য ক'রে বলো।

কি বলুন?

মনের আক্রোশ চাপিয়া সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কেউ নেই বলেছিলে, তবে ওই ষণ্ডামার্কা ছোকরা দু'জন কে?

ওদের ওপর রাগ হোলো কেন আপনার?

রাগ হয়নি মৃণ্ময়ী, ঘৃণা হয়েছে তোমাদের সকলের ওপর।

মৃণ্ময়ীর মুখ অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সে করুণ কণ্ঠে কহিল, এখন আমার বড় অসময় রাজেনবাবু, আমার ওপর অবিচার করবেন না।

কঠিন নির্দ্দয় কণ্ঠে বলিলাম, ওদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা জানলে, তবেই আমি নিজের ইতিকর্ত্তব্যটা ভাবতে পারবো।

ওরা আমার কেউ নয়, ওরা পথের লোক।

তবে কে ওরা?

পরিচয় পরে আপনাকে জানাবো। আমাকে ক্ষমা করুন, সেটা খুবই গোপনীয়।

গোপনীয়!—তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, না, এখনি তোমাকে বলতে হবে।

মৃণ্ময়ী একটু ইতস্ততঃ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, বেশ, এখুনি বলব। কিন্তু বাইরে যদি কোথাও আপনি প্রকাশ করেন, তবে আপনিই বিপদে পড়বেন। ওদের কোনো পরিচয়ই আমি জানি নে, ; কেবল এইটুকু জানি, ওরা বিপ্লবী। মা ওদের পলাতক অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই বলিয়া সে পুনরায় দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল

-ক্রমশঃ

জাপান যাত্রীর পত্র

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

[বিগত ৬ই এপ্রিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিশিষ্ট সাধক-কর্ম্মী প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ 'এস এস তালামা' জাহাজ-যোগে জাপান-যাত্রা করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম সমুদ্র-যাত্রা। অসীম সমুদ্র বক্ষে ভাসমান জাহাজ-জীবনের খুঁটিনাটি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ যে সকল লিপি তিনি নিয়মিত আমাদের পাঠাইতেছেন তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। পঃ প্রঃ]

রেঙ্গুন বন্দর, ১২।৪।৩৯

আজ সকালে জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছেছে। বৈকালে সহর দেখবার জন্য নামবো।

একটা কথা জানাই। আমার খাবার ব্যবস্থার কথা।......৯টার সময়ে গুরুদেবের (শ্রীমতিলাল রায়) ফটোখানি Dressing Table-এর উপর রে'খে মাতৃ-উপাসনা করছি, এমন সময়ে boy এসে ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল। খানিক পরে আবার এসে জিজ্ঞাসা করল (ইংরাজিতে)—"সাহেব, আপনি কি গান করছিলেন?" আমি বল্লাম—"না, উপাসনা করছি।" ঠিক বুঝতে পারলো না—মনে হ'ল। টেবিলটা ঝাড়তে ঝাড়তে, ফটোখানি দেখে জিজ্ঞাসা করলো—"এ ফটোখানি কার? আপনার বাবার?" 'হাঁ' ব'লে দিলে গোলমাল চুকে যেতো; আমি বল্লাম—"আমার গুরুদেবের।" এই কথাটা অনেক রকম ইংরাজি কথা ব'লে বোঝাতে পারলাম না। শেষকালে অনেকক্ষণ পরে 'বুঝেছি' বলে বল্লে—"Priest?" মনে করলাম, যাক্, অনেকটা হয়েছে! তারপর ছবিখানা ভাল করে দেখে বল্লে—"এক সাধুর? যারা হিমালয় পাহাড়ে থাকে আর লোককে দীক্ষা দেয়?" আমি বল্লাম—"উনি হিমালয় পাহাড়ে থাকেন না। কলকাতায় থাকেন। এই ফটোখানা উনি পাহাড়ে বেড়াতে যাবার সময় তুলেছিলেন।" শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হল—আমি তাঁর শিষ্য এবং সাধুপুরুষ; অতএব আমাকে বেশ ভালো ক'রে আগামী কাল হ'তে vegetable food দেবে।

তার পরদিন সকাল বেলার খাওয়া শেষ ক'রে, ১২॥০ টার সময় দুপুর বেলার খাওয়ার অপেক্ষায় আছি, কেবিনে খাবার এলো—ভাত, আলু-কপি সিদ্ধ, ডাল এবং একটি vegetable curry. ডালটা এমন গন্ধ যে মুখে দেওয়া যায় না। তরকারী একটু শুঁকে নিয়ে সন্দেহ হলো, চামচে দিয়ে ২।১ বার নাড়তেই ছোট ছোট ২।১ [illegible]

Boy কে ডেকে বল্লাম—"একি! মাংস দিয়েছ কেন?" সে বল্লে—"সাহেব, this is vegetable curry, very nice to eat." আমি "তোমার মাথা!" ব'লে তরকারী ও ডাল বাদ দিয়ে, আলু ও কপি সিদ্ধ দিয়ে কোন রকমে গোটাকতক খেলাম; রাত্রের আশায় রইলাম—ভাল ক'রে খাব। রাত্রে ৭॥০টার সময় খাবার এলো—পাউরুটী, দুধ, আলু সিদ্ধ, একটা ঝোল আর বড়া ভাজা। ঝোলটা শুঁকে দেখি—ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। Boy-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এটা কি?" উত্তর পেলাম—"Mutton soup." বড়াটা দেখিয়ে বল্লাম—"এটা কি?" "This is prepared from fat (চর্ব্বি)।" মহা মুস্কিলে পড়লাম! রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। তাকে বল্লাম—"তোমাকে গত রাত্রে সব বুঝিয়ে দিলাম, আমি এক সাধুর শিষ্য—মাছ-মাংস খাই না। আবার এসব আনলে কেন?" সে বল্লে—"আপনার বন্ধু (দেবেন) গতকাল আমাকে বলে গিয়েছিল যে, বাবুকে ডিম, মাছ, মাংস ছাড়া সকল খাবার দেবার জন্য। This is not egg, not fish and not meat, sir." আবার তাকে মিনিট দশেক ধরে বুঝিয়ে দিলাম যে, শুধু মাছ, মাংস, ডিম নয়; এ হতে যে সমস্ত খাবার প্রস্তুত হয়, সেগুলোও আমাকে দেবে না। যা হোক, দুধ-পাউরুটি খেয়ে ডেকে এসে বসলাম। কেবল মনে হতে লাগলো—সেদিনকার চন্দননগরের খাওয়ার ব্যবস্থার কথা।.....তার পরদিন ডাক্তারবাবুর মারফৎ মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে নিলাম।

* * * *

প্রথম শ্রেণীতে প্যাসেঞ্জার আছে দশজন, সবই ইউরোপীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২১ জন; ৪ জন মাত্র পুরুষ, বাকী সব স্ত্রীলোক। ৪ জন পুরুষের মধ্যে আমরা বাঙালী ২জন, আর বাকী ২ জন পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসার—ফৌজ নিয়ে হংকং চলেছে। তিন তলার ডেকে পুরুষ আমি আর বাকী প্রায় সব কেবিনেই মেয়েছেলে।

জাহাজে লাইব্রেরী আছে।...জাহাজের একেবারে নীচে মস্ত বড় একটা স্নইমিং 'পুল' আছে। অনেকে সমুদ্র-জলে স্নান করে, সাঁতার কাটে। Bathing costume পরে 'পুলে' নামতে হয়। দেখলাম অর্দ্ধনগ্ন জনকতক সাহেব-মেম স্নান করছে। আমার প্রবৃত্তি হল না। প্রথম শ্রেণীতে মিউজিক হল আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার-দেরও বসবার ব্যবস্থা আছে। ডাক্তারবাবুর ঘরে একটি ভাল রেডিও মেশিন আছে। পৃথিবীর যে কোনও স্থানের প্রোগ্রাম এই মেসিনটি রিসিভ করতে পারে। খবর সংগ্রহ করবার জন্য মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর ঘরে যাই এবং তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করি।

* * * *

পিনাং বন্দর, ১৭।৪।৩৯

সেদিন এক বড় মজার ব্যাপার হয়েছিল। বিকাল বেলা, আকাশে একটু একটু মেঘ দেখা দিয়েছে, বাতাসও জোরে বইছে, ষ্টীমারও একটু দুলতে আরম্ভ করেছে। মাথাটা কি রকম করতে লাগলো। অবস্থা ভাল নয় বুঝে—আগে হতেই বিছানা নিলাম। খানিকক্ষণ পরেই ষ্টীমারে একটা মহা সোরগোল পড়ে গেল। জানালা দিয়ে দেখি, ষ্টীমারের সমস্ত কর্ম্মচারীরা (প্রায় ২০০ হবে) গলায় একটি করে লাইফ জ্যাকেট বেঁধে ছুটাছুটি করছে। একটু ভয় হ'ল! মনে করলাম—কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই হয়েছে বা শীঘ্রই হবে। একবার ভাবলাম—আমার লাইফ জ্যাকেটটা পরে ফেলি! অতদূর না এগিয়ে, বাইরে এলাম। কোনও যাত্রীকে ডেকে দেখতে পেলাম না। কেবল কর্ম্মচারীরা বিশেষ ব্যস্ততার সহিত ছুটাছুটী করছে। একজনকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম না। সকলেই খুব ব্যস্ত। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, সকল life-boatগুলি ভাসাবার জন্য খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এদিকে মাঝে মাঝে ষ্টীমারের বিকট চীৎকার আরম্ভ হয়ে গেছে। কর্ম্মচারীগুলি সকলেই ব্যস্ত ও গম্ভীর, কিন্তু মুখে কোনও উদ্বেগের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মনে একটু সন্দেহ হলো। যাত্রীরা সকলেই যে যার ঘরে। কর্ম্মচারীরা এই কাজেই ব্যস্ত। জাহাজের rolling তখনও একেবারে থামে নাই। ...ক্রমে জানা গেল,—এসব কর্ম্মচারীদের training দেওয়া হচ্ছে! এখন ক্যাপ্টেনের অর্ডার হয়েছে—আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ ডুবলে, কার কি করণীয় কাজ—তা ঠিক করে নেবার জন্য; তাই এই সবের ব্যবস্থা! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেশ দেখতে লাগলাম। দেখবার জিনিষ বটে!

* * *

হঙ্কং বন্দর—২৫।৪।৩৯

.. সিঙ্গাপুর হতে প্রায় ১১০০ মাইল আসবার পর চীন সমুদ্রের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হল। ...এত বেশী rolling আরম্ভ হল যে আর মাথা ঠিক রাখা যায় না। ঘরের ভিতর হতে শুনছি—চতুর্দ্দিকে হাঁক্ হুঁক্ শব্দ। বুঝছি ব্যাপার কি হচ্ছে! শেষ পর্য্যন্ত উপর থেকে খানিকটা বমিও গায়ে পড়ল। আমি একেবারে মুখটা বুজে বুকটা চেপে চুপ করে পড়ে রইলাম। রাত্রে কমা ত দূরে থাক, আরও বাড়তে আরম্ভ করল। সে যে কি কষ্ট—তা নিজের না হলে কেউ বুঝতে পারবে না। সারা-রাত অনিদ্রায় কাটলো। ...সকালে একটু কমলো, টলতে টলতে ডেকে এলাম, মিনিট ৫।৭ পরেই মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল, ঘরে এসেই বমি আরম্ভ হল। বমি আর থামে না। বমিটা হবার পর শরীরটা একটু ভাল হ'ল। চুপ করে শুয়ে রইলাম।

...এক একটা ঢেউ যেন পাহাড়ের মত! প্রথম এসে জাহাজে মারে ধাক্কা। জাহাজকে কিছু সুবিধা করতে না পেরে ফিরে যায়। ফিরে যাবার সময়ে তার পিছুরটির সহিত লেগে যায় লড়াই। এই লড়াইএ দুইটাই প্রায় দু'তলার সমান উঁচু হয়ে উঠে। আর আমাদের অতবড় প্রকাণ্ড জাহাজখানা জলের ভিতর ঢুকে যায়! পরক্ষণেই আবার ভেসে ওঠে। আমার মত নতুন যাত্রীদের প্রাণটা এই দোলানিতে যায় বেরিয়ে!

জাহাজের ডাক্তারের নিকট সন্ধ্যাবেলা গিয়ে শুনলাম—এতো কিছুই হয় নি! চীন সমুদ্রের এটা স্বাভাবিক অবস্থা। জল, ঝড়, বাতাস—কিছুই নেই। এই সব থাকলে—এখন যা হয়েছে তার দশগুণ হ'ত! মনে মনে ভাবলাম, এক গুণেই তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছি, দশগুণ হলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়াই ভার!

জন্ম-চক্রে গান্ধী-সুভাষ তথা ভারত-ভাগ্য

শ্রীতিলক

মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্য্যকলাপ আমরা বাস্তব চোখে দেখছি এবং তার ভবিষ্যৎ ফলাফল যে কিরূপ দাঁড়াবে তাও কিছু কিছু অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এঁদের জন্ম-চক্র নিয়ে জ্যোতিষ-গবেষণা করলে ফলটা দাঁড়াবে কেমন — তাই পরস্পরের পরামর্শ নিতেই হবে। এঁদের প্রাণে দেশ-কল্যাণ সম্পর্কে বা যে কোন বিষয়ে যে ভাবগুলির উদয় হবে, তাহা পরস্পরের পক্ষে অশুভ কখনই হতে পারে না। পরস্পরের জায়া (শুভ) স্থানে এঁদের উভয়েরই জন্ম। এঁদের পরস্পরের জন্ম সপ্তম ভাবে অর্থাৎ জায়া ভাবে।
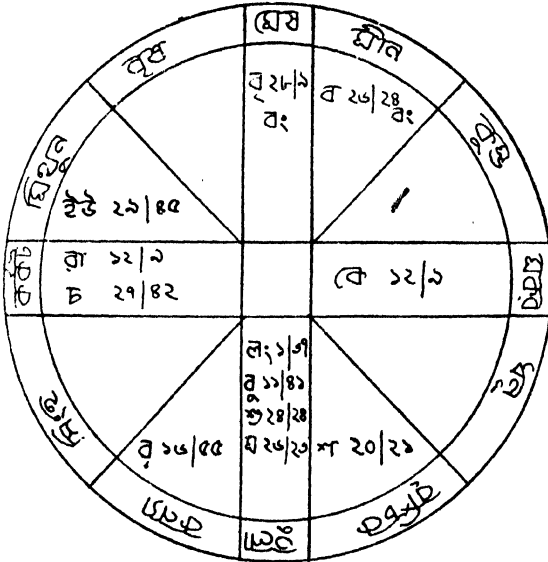
মহাত্মাজীর জন্মচক্র
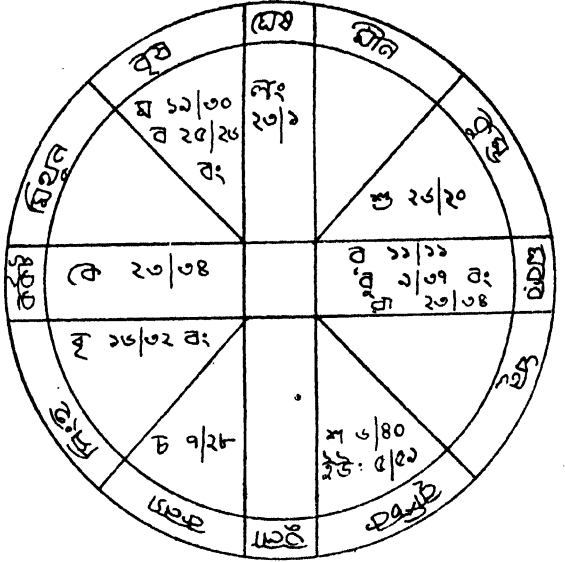
সুভাষচন্দ্রের জন্মচক্র

বলবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এঁদের জন্ম-চক্র নিয়ে দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলাফল বিচার করতে যাবার কারণ এই যে, ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ এই দুই নেতাকে কেন্দ্র করে সমুদ্ভূত।

'রাশি-চক্র' বিচারের পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন, ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বর্ষে শনি, মঙ্গল, বুধ ও ইউরেনাস্ এই চারিটি গ্রহই শুভ ও অশুভ ফল দান করে যাচ্ছে; সুতরাং গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের জন্ম-চক্রে উক্ত গ্রহগুলির স্থান ও ফলাফল বর্ণনা করে যাব। জন্মচক্র দৃষ্টে মহাত্মার লগ্ন হচ্ছে 'তুলা', আর তারই সপ্তম স্থানে বা শুভ গৃহ "মেষে" হচ্ছে সুভাষচন্দ্রের লগ্ন। ইহার তাৎপর্য্য আমরা কি দেখতে পাই? কোটি-মন সকল ... এই দুই নেতাকে

দেশের পক্ষে এঁরা কোথায়? অর্থাৎ কি ভাব নিয়ে বসেছেন? উত্তরে বলতে হবে যে, "তুলা" ও "মকর" যদি ভারতের রাশি হয়, তবে জন্মস্থানে ও স্ব-ঘরে, বা লগ্ন ও চতুর্থে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপর উভয়েরই পূর্ণ শুভদৃষ্টি রয়েছে; আবার "মেষ" লগ্নের জাতক সুভাষচন্দ্রের সপ্তম ও দশম স্থানে "তুলা" ও "মকর" রাশি (ভারতের রাশি) হওয়ায়, ভারতকে তিনি প্রিয়তম কর্ম্মভূমি বলে গণ্য করে নিচ্ছেন। কিন্তু কি ভাবে এঁরা দেখে যাচ্ছেন তাও বিচার্য্য—অর্থাৎ এঁদের কর্ম্মজগৎকে কোন্ কোন্ গ্রহ আলোকিত করেছে—তাও বলা প্রয়োজন। বুঝতে হবে—সপ্তম অর্থে জায়া, দশম অর্থে কর্ম্মস্থান।

মহাত্মাজীর লগ্নপতি "শুক্র" নিজের ঘরে সপ্তমস্থ

বৃহস্পতি বক্রী "মেষে"—পূর্ণ দৃষ্টি রয়েছে উভয়ের। প্রেমপ্রবণ মহাত্মাজীর সাধনা হ'ল তাই অহিংস আন্দোলন; চতুর্থ স্থানে অর্থাৎ স্ব-ঘরে ভারতের রাশি। বৃহস্পতি বক্রী হওয়ায় তাঁর প্রদত্ত নীতি ভারতে গৃহীত হবার পক্ষে সম্পূর্ণ বাধা রয়েছে। সপ্তমাধিপতি মঙ্গলের মহাত্মাজীর লগ্নে অবস্থিতি দৌর্ব্বল্য ও আপোষ - প্রবৃত্তি সূচিত হয়। মহাত্মার দ্বিতীয় স্থানের অধিপতি "শনি" নবমাধিপতি ইউরেনাসের সঙ্গে ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃষ্টিতে থাকার জন্য এবং পরস্পর শত্রুসম্বন্ধ - বিশিষ্ট হাওয়ায় হীনবল হয়েছে। অপরপক্ষে ভারতের রাশি-বিচারেও দৈন্যই সূচিত হয়। তা' ছাড়া ইউরেনাসীয়গণের (ইউরোপীয়গণের) সঙ্গে সদ্ভাবেরও অভাব; অধিকন্তু "কেতু" গ্রহ "মকর"কে অধিকার করে' থাকায় নানারূপ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য গান্ধীজীর কর্ম্ম পণ্ড হবার যোগ দৃষ্ট হয়।

এখন দেখা যাক্, সুভাষচন্দ্রের জন্মলগ্নের সঙ্গে কর্ম্মস্থান "মকর" বা ভারতের কি সম্বন্ধ এবং কিরূপ প্রভাবযুক্ত। "রবি" - যুক্ত বক্রী "বুধ" মকর রাশিতে দশমে অধিষ্ঠিত। দশম স্থান তাঁর কার্য্যকলাপের সম্বন্ধ প্রকাশ করে। দশম গৃহের অধিপতি "শনি" ইউরেনাসের সঙ্গে দৃষ্ট অষ্টম ঘরে (বৃশ্চিকে মঙ্গলাধিকারে)। মঙ্গল ও ইউরেনাস উভয় গ্রহই শনির সঙ্গে শত্রুতায় জড়িত। ফলে শনি হীনবল। বৃহস্পতির চতুর্থ লক্ষ্য থাকার জন্যই হোক্ বা যে কোন কারণেই হোক্, কোন গ্রহই চূড়ান্ত ক্ষতিকারক হয় নাই। ইউরেনাস শত্রুভাবে থাকা মানে স্বাস্থ্যহানির বিবিধ অবৈধ কারণ উপস্থিতির সম্ভাবনা। সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মস্থান মকর, রবি ও বুধযুক্ত থাকায় ভারতবর্ষ সত্যই সুভাষচন্দ্রের কাছে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু ভাঙ্গা এবং গড়াই হোল তাঁর কাজ—বুধ বক্রী হওয়ার জন্য। রবি আধিপত্য করায় নানারূপ আনুকূল্য ও সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হবেন, এতে সন্দেহ নাই। লগ্নাধিপতি মঙ্গল দ্বিতীয় ঘর হতে উচ্চ স্থান মকরে শুভ ফলই দান করবে। সুভাষের জন্ম-চক্রে সিংহ রাশিতে (বাংলাদেশের সিংহরাশি) বৃহস্পতি, ও মকরে বুধ বক্রী থাকায়, একদিকে যেমন তিনি বাংলাদেশকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন, অন্য দিকে তেমনি নিজের মতামতকে প্রবলভাবে স্থান দিবেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতদ্বৈধতার কারণ রবি ও বৃহস্পতির পরস্পর ষষ্ঠ দৃষ্টি। সুভাষের কোষ্ঠীতে রবির গৃহে বৃহস্পতি বক্রী হওয়ায় বৃহস্পতি কম-জোর; আবার ষষ্ঠ গৃহ মকরে একবারে উহা নিস্তেজ। ফলে বৃহস্পতি একমাত্র লগ্নে ভিন্ন দৃষ্টি দিতে পারছে না। শত্রুপুরীতেও সুভাষচন্দ্র উক্ত কারণে সুরক্ষিত থাকবেন।

মহাত্মার লগ্নের সপ্তমে বৃহস্পতি বক্রী। আর উহাই সুভাষচন্দ্রের জন্ম-লগ্ন। সুভাষচন্দ্রের লগ্নের পঞ্চমে বৃহস্পতি বক্রী—পরস্পর নব-পঞ্চম দৃষ্টি; সুতরাং ইঁহারা কেহই পরস্পরকে ছাড়তে পারেন না, অধিকন্তু, একের অন্যের সাহায্য নিতেই হবে। ইহার আরও কারণ উপরে কিছু বলা হয়েছে। দুই জনের মধ্যে আপাতঃ অমিলের মধ্যেও এই গ্রহ-সংস্থান উভয়ের মধ্যে ভাবী মিলনের সূচনা করে।

এবার মহাত্মাজী ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের কর্ম্ম-চক্র বিচারে ১৩৪৬ ও ১৩৪৭ সালে ভারতভাগ্য সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায় কিনা, বলবার চেষ্টা করব।

বর্ত্তমান ১৩৪৬ (ইংরাজী ১৯৩৯) সালে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইউরেনাস ও শনিগ্রহের নষ্ট দৃষ্টি পতিত। ফলে দেশময় অরাজকতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইউরেনাস ও মঙ্গল, এই দুইটি গ্রহের অধিকারে যে সমস্ত জাতির জন্ম তাহাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব বাড়বে। কঠোর সত্যের অধিকারী গ্রহরাজ শনির সঙ্গে উক্ত দুই গ্রহের অমিল থাকায়, শনির অধিকৃত জাতির প্রতি এদের আক্রোশ বেড়েই চলবে। কিন্তু ২৯শে বৈশাখের (১৩ই মে) থেকে ২৫শে মাঘের (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০) মধ্যে মঙ্গল ও শনি পরস্পর শুভাধ্যায়ী হওয়ার জন্য কিছু শুভ ফলের আশা করা যায়। মোট কথা, ২১শে বৈশাখ বেলা ৯ টার পর হইতে শনি গ্রহের মেষ সঞ্চারের পর এবং মঙ্গলের মকর রাশিতে সঞ্চারের পর (২৯শে বৈশাখ), ইউরোপে মহা সংগ্রামের সূচনা দেখা দিবে। শনি মেষ রাশিতে ভাল ফল দিতে না পারায়, তুঙ্গস্থান "তুলা" রাশি ও স্ব-ক্ষেত্র "মকরে" শুভ দৃষ্টি দান করবে। মঙ্গল মকরে বা তুঙ্গস্থানে আসার পর ভারতের শুভ-সূচনা করবে। শনি ও মঙ্গল কিছুকালের জন্য পরস্পর অশুভ-সূচক হওয়ায়

ভারতবর্ষে যে কোন দুই জাতির (ব্রিটিশ ও মুসলমানের?) মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়বে, ফলে অন্য একটি জাতি (হিন্দু?) দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। যাই হোক্ -কিছু কালের জন্য যে দেশময় একটা অন্যায়, অনাচার ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মত-বৈচিত্র্য, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অরাজকতার শেষ পরিণতি অবশ্যই ভারতবর্ষের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত শুভই হবে।

শনি গ্রহের মেসরাশিতে সঞ্চারের ফলে সুভাষচন্দ্রের পুনরায় স্বাস্থ্যহানি সূচনা করছে। ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস এবং মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী ১৩৪৭ সালের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে মহাত্মাজীর আর একবার অনশন-ব্রত গ্রহণ করবার কারণ আছে।

জন্মচক্র বিচারে মহাত্মাজী ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের, পরস্পরের প্রতি প্রেমাবেগ ও একাত্মভাব লক্ষ্যে পড়ে। অতএব অদূর ভবিষ্যতে মহাত্মাজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা খুবই আছে বলা চলে।

মালী-বৌ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মনে আছে, ছেলেবেলায় ফুলের সখ আমার উগ্রই ছিল।

বাড়ীর ছোট উঠানটিতে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া এত বিচিত্র রকমের ফুল গাছ পুঁতিয়াছিলাম যে, সেটি ছোট-খাটো একটি আগাছার জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। রোয়াকের নীচেয় পা ঝুলাইয়া বসিবার জো ছিল না। ভাল গোলাপ চারার পাশেই হয়ত শাখাপুষ্ট জবার ঝাড়, মল্লিকা ঝাড়ের মাথায় অপরাজিতার লতা; টগর, রঙ্গন, যুঁই ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে রীতিমত মল্লযুদ্ধ লাগাইয়াছে; চীনে জবার জঙ্গল ঠেলিয়া শীতকালে আর কাহাকেও মাথা তুলিতে হইত না; এমনই ফুল গাছের জঙ্গলে উঠান ছিল ভর্ত্তি। বাড়ির লোকের কাছে দুবেলা বকুনি সহ্য করিয়াও পরের দুয়ারে ফুল গাছ সংগ্রহের নেশা আমার শিথিল হয় নাই।

এজন্য মালী-বৌ ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়। বলিতে গেলে আমার এই পুষ্প-প্রীতির মধ্যে মালী-বৌএর প্রভাব অনেকখানি ছিল।

বাড়ীতে নিত্য পূজার জন্য সে অতি প্রত্যূষে ফুলের যোগান দিত। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা কোন কালেই অপস্রিয়মান উষার আধ অন্ধকারে সদর দরজা ঠেলিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া সে ডাকিতে ভুলিত না, 'ফুল নেন গো, মা ঠাকরোণ।'

দুয়ার খুলিয়া ঠাকুরমা বাহিরে আসিতেন, পিছনে আসিতাম দিগম্বর আমি।

ঠাকুরমা ধমক্ দিয়া বলিতেন, 'এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বেরুলি ত? যা, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুগে যা।'

মালী-বৌ হাসিয়া বলিত, 'ওনাদের ঘুম্ বড় পাতলা, মা ঠাকরোণ। ঠিক ভোর বেলাতেই দেখ না — যত ছেলেমেয়ের ফুর্ত্তি?'

পরে আমার পানে চাহিয়া বলিত, 'ফুল নেবা, ফুল?'

আনন্দে ঘাড় নাড়িতেই কলাপাতা মোড়া ছোট্ট একটি ঠোঙ্গা সে আমার হাতে তুলিয়া দিত। প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করিতাম, 'কি ফুল?'

মালী-বৌ বলিত, 'তোমরা ত সাদা ফুল নেবা না, তাই গন্ধয়ালা লাল গোলাপ দিয়েছি।'

তন্মুহূর্ত্তে ঠোঙ্গা খুলিয়া রক্তবর্ণের গোলাপ নাকের কাছে ধরিয়া সজোরে নিঃশ্বাস টানিতে টানিতে উৎফুল্ল স্বরে বলিতাম, 'আঃ, সুন্দর!'

মালী-বৌ তৃপ্তিভরা চোখে হাসিমুখে গৃহাভ্যন্তরে ফুলের যোগান দিতে চলিত।

কলাপাতা মোড়া এক পয়সার যে প্রচুর ফুল মালী-বৌ দিয়া যাইত—তাহাতে গৃহ-দেবতা নারায়ণ ও মহেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ ফুলসাজে শোভনই হইত, আমার গোলাপটি ছিল 'ফাউ'।

এই 'ফাউ'য়ের মারফতই হৃদ্যতা আমাদের গড়িয়া উঠিয়াছিল।

একদিন ভোর বেলায় মালী-বৌয়ের বাগান দেখিতে গেলাম।

বাঁশের বেড়া ঘেরা এবং বাখারির জাফ্‌রি দেওয়া অনেকখানি জমিতে নানান রকমের গাছ। প্রত্যেকটি গাছ সতেজ ও শাখা-পল্লবে বহুমুখী, প্রত্যেকটি শাখা ফুলভারে নম্র। অনেকগুলি কালো ভ্রমর ও অনেকগুলি মৌমাছি সেই ভোরের ধূসর আলোকে সুমিষ্ট গুঞ্জন তুলিয়াছে। ও-পাশে একপাটি টগর গাছটা সাদা ফুলে ছাইয়া গিয়াছে, আর কুন্দ ফুলের আধ-ফুটন্ত কুঁড়িতে এ-পাশের ঝাড়গুলি মনোরম। শীতকাল বলিয়া মল্লিকা হতশ্রী, গোলাপের গৌরব বাড়িয়াছে, শ্বেত ও রক্ত করবীর ঝাড়ে বারোমাসই সমারোহ লাগিয়া থাকে, আর দোপাটি অপরাজিতার নীল রঙের• খুসিতে বংশবৃতি ও শিউলি ঝাড় খোস-মেজাজী দেখাইতেছে। জল ঢালিয়াও রজনী-গন্ধার চারাগুলিতে ডাঁটি বাহির করা যায় নাই, কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা ও গাঁদার অপরূপ রঙে মায়া-উদ্যান ঝলমল করিতেছে।

মালী-বৌ বলিল, 'বার্ষেকাল আসুক, খোকাবাবু, তোমায় চারা দেব, পুঁতো।'

'ফুল হবে?'

'হাঁ, চোত মাসে জমি কুপিয়ে খোল-বিচিলির সার দেবা, দেখবা বার্ষেকালে কি শোভা হয় গাছের।'

'কি কি গাছ দেবে, মালী-বৌ?'

'যা তোমার খুসি। ঐ পঞ্চমুখী জবা, রক্ত-করুবি, বেল, যুঁই, টগর, গন্ধরাজ—ডাল পুঁতলেই লেগে যাবে। স্থলপদ্মের ডাল, গোলাপের ডালও দেব।' অতঃপর মালী-বৌয়ের সঙ্গে সামনের চালাটায় গিয়া বসিলাম।

সেখানে অভ্র রাংতার টুক্‌রা পড়িয়াছিল। কয়েকটি টুক্‌রা কুড়াইতে কুড়াইতে প্রশ্ন করিলাম, 'এগুলো কি?'

মালী-বৌ হাসিমুখে বলিল, 'জান না? ওই দিয়ে যে টোপর তৈরী হয়। তুমি যখন বিয়ে করতে যাবা, তখন এমন সুন্দর টোপর তৈরী করে দেব—'

'ধ্যেৎ', বলিয়া লজ্জায় মুখ নামাইয়া লম্বা একটি শোলার টুক্‌রা তুলিয়া লইলাম।

মালী-বৌ আনন্দে মুখ-চোখ উজ্জ্বল করিয়া বলিতে লাগিল, 'টোপর দেব, বৌয়ের পাতি ময়ূর দেব, ভাল মল্লিকের মালা তৈরী করে দেব—'

রূপকথার জগৎ যদি কেহ রচনা করিতে ভালবাসে—সে আমরা—বালকরাই। মালী-বৌয়ের কথাগুলি ভারি মিষ্ট। আজ ভাবি, ঐ টোপর ও মালার মধ্যে যে রোমান্স উহারা আমাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, তাহার মূল্য খুব অল্প নহে। সারা জীবনের মধ্যে ঐ মঙ্গল-লগ্নের মুহূর্ত্তটিকে ত উহারাই প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারে।

কয়েক টুক্‌রা শোলা ও রাংতা সংগ্রহ করিয়া সেদিন হৃষ্ট মনে বাড়ী ফিরিলাম।

বৈকালে যথারীতি জমি কোদলানো, সার দেওয়া ও আষাঢ়ে ফুল গাছ সংগ্রহ ও রোপন সমস্তই হইল। আশ্বিনে ফুলগাছে কুঁড়ি ধরিল; আমার মনের আনন্দের পরিমাণ সে-দিন করিতে পারিব না।

অতঃপর শাখায় শাখায় ফুল ফুটিতে লাগিল। একদিন ভোরবেলায় ঠাকুরমা মালী-বৌকে বলিলেন, 'তুই আর ফুল দিস্‌নে, বৌ, বাড়ীতেই ত অনেক ফুল ফুটছে।'

মালী বৌ হাসিমুখে বলিল, 'খোকাবাবুর হাত ভাল। দেখ গো, মা ঠাক্‌রোণ, একটা গাছও মরেনি—কেমন শীগ্‌গির ফুল ফুটছে।'

একটু থামিয়া বলিল, 'ফুল না-ই নাও, খোকার বিয়ের টোপর আর মালা আমি দেব।'

'তা'ত দিবিই।' হাসিমুখে ঠাকুরমা বলিলেন।

দৈনিক একটি পয়সা উপার্জ্জন মালী-বৌয়ের কমিয়া গেল, অথচ সে এতটুকু দুঃখ বোধ করিল না।

ঠাকুরমার কাছে সেদিন সন্ধ্যায় মালী-বৌয়ের গল্প শুনিলাম।

এই গ্রামে পূর্ব্বে পাঁচ ঘর মালী বাস করিত। ফুল যোগাইয়া, প্রতিমার সাজ ও বরের টোপর তৈয়ারী করিয়া দিন তাহাদের ভাল ভাবেই চলিত। তখন উহাদের চালার ঘর কালো চাপ বাঁধিয়া হতশ্রী হইত না, ভাঙ্গা বাঁশের বেড়া দিয়া ফুল গাছগুলিকে গরু-ছাগলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেও হইত না। মালী-বৌয়ের বাড়ীটি ছিল সব চেয়ে সুন্দর।

ডাকের সাজ, টোপর ও আতস বাজী তৈয়ারীতে ভুবন মালীর এ অঞ্চলে নাম-ডাকও ছিল। উপার্জ্জন করিত সে প্রচুর; কাজেই জাফ্‌রি দেওয়া ঘেরা নানান জাতীয় ফুলে ভরা বাগানটি ও অঞ্চলে দ্রষ্টব্য জিনিষই ছিল। মালী-বৌয়ের পুত্র-সন্তান হয় নাই; ভাসুর-পো ও দেওর-পো ছিল পাঁচটি। পাতকুয়া হইতে জল তোলা, গাছের গোড়া নিড়ানো, রজনীগন্ধার ডাঁটিতে পাটকা-পাটি বাঁধিয়া দেওয়া; কাঁচি দিয়া ফুল গাছের শুক্‌না ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া ইত্যাদি উদ্যান-চর্চ্চা তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। বাগানের যে-পাশে শুধু শ্যাম দুর্ব্বা জন্মাইত—সে-দিক্‌টাও দেখিবার মত ছিল।

মালী-বৌয়ের স্বামী ভুবন ছিল অপব্যয়ী। উপায় করিত সে প্রচুর—খরচও করিত দু'হাতে। বৃহৎ আট-চালায় ভাইপোদের লইয়া জলচৌকির উপর সুতা রাংতা বিছাইয়া সে সাজ তৈয়ারী করিত, টোপরের শোলা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে কাটিত এবং গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিত। বাড়ীর মধ্যে যে কয়খানি চালা ঘর ছিল—সবগুলিই সৌষ্ঠবযুক্ত। বছর বছর নূতন খড়ে সেগুলি ছাওয়া হইত; চালের মটকায় খড়ের ময়ূরপঙ্খী ভুবনেরই সখ। কিন্তু টাকাপয়সার হিসাব সে রাখিত না।

পূজা-পার্ব্বণে বাজী-রোশনাইয়ে কিছু উড়িত; মদ ও জুয়ার নেশায় ভুবনের আসক্তি ছিল। প্রথম প্রথম মালী-বৌ মাথা খুঁড়িয়া, উপবাস করিয়া, দিব্য-দিলেশা দিয়া ভুবনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। ভুবন তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিত না। ক্রমে মালী-বৌ বুঝিল, মিথ্যা রাগ করিয়া ভুবনকে শাস্তি দেওয়ার কল্পনা মানেই জলের উপর সোজা হাতের চাপড় মারা। ব্যথা বাজিতে তাহাকেই বাজে। ভুবন টাকাও আনে, মদও খায়, ঘরের চালে প্রতি বৎসর নূতন খড় উঠে এবং দুধ মাছের বন্দোবস্তও ভাল।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না; একদিন ভুবন পেটের ব্যথা লইয়া শয্যাশায়ী হইল, এবং সে শয্যা ছাড়িয়া আর উঠিল না। কাঁদিলে মানুষের দিন চলে না, মালী-বৌ এক হাতে চক্ষু মুছিয়া অন্য হাতে ফুলের যোগান দিতে লোকের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কেহ দেশান্তরী হইয়াছে, কেহ চাকুরী গ্রহণ করিয়া জাত ব্যবসা ছাড়িয়াছে। মালী-বৌয়ের পাঁচ ভাইপোর মধ্যে তখনও তিনটি বর্ত্তমান। এবং তিনটিই খুড়ার পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিদায় লইবার মুখে মা লক্ষ্মী এমনি করিয়াই বুঝি সংসারকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যান। ...

আমার সঙ্গে মালী-বৌয়ের হৃদ্য জন্মিবার সময় একটি মাত্র ভাইপোকে দেখিয়াছি। পেটজোড়া প্লীহা ও হলুদবর্ণের চোখ মুখ লইয়া সে কাঁথা মুড়ি দিয়া দিনরাত রোগ যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে শুনিলাম। অ'র দুইটি কোন্ যাত্রার দলে না চা-বাগানে চাকরি করিতে গিয়া বছর দশেক হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বংশ-রক্ষার আশায় মালী-বৌ ওই মৃত্যুপথযাত্রী ভাইপোটির তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু মনের সাধ তাহার পূর্ণ হয় নাই। ভাইপো দ্রুত মৃত্যু অভিমুখী হইতেছে, ভাইপো-বউ চিররুগ্নের সেবা করিতে অক্ষমতা জানাইয়া পিতৃগৃহ আশ্রয় করিয়াছে। একা মালী-বৌকে ফুলের যোগান, টোপর তৈয়ারী ও রুগ্নের সেবা করিতে হয়। আশ্চর্য্য, তবু উহাঁর মুখে হাসির ব্যত্যয় ঘটিল না।

ঠাকুরমার মুখে গল্পই শুনিলাম; সে-বয়সে দুঃখকে বুঝিতাম না; কাজেই মালী-বৌয়ের দুঃখ লইয়া মন খারাপ করিলাম না। তেমনই হাসিমুখে ও চঞ্চল চরণে তাহার ফুলবাগানে গিয়া ভাল ডালটি কাটিয়া আনিয়া নিজের উঠানে পুঁতিতাম, ভাল গোলাপ ফুটিলে মালী-বৌকে দেখাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতাম। এক বিবাহে

কথা ছাড়া মালী-বৌ আমাকে অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলিয়া লজ্জা দিতে পারিত না।

সেই লজ্জাকর বিবাহ একদিন আমার ভাগ্যে অত্যাসন্ন হইল। ছেলেবেলায় যাহাতে লজ্জাবোধ করিতাম, আজ তাহাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ খুঁজিয়া পাইলাম না। দুর্ব্বোধ্য জীবনের অর্থ আজ হয়ত বহুদিক দিয়াই সুস্পষ্ট হইয়াছে। বিবাহোৎসবে বাড়ীতে ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আত্মীয়-কুটুম্বিনীতে গৃহ ভরা, আহার ও শয়নের অব্যবস্থা পুরামাত্রায় ভোগ করিতেছি, কাজে মনোযোগ ও ভুল দুইটাই নিয়মিত ভাবে ঘটিতেছে। মনের তার চড়া পর্দ্দায় বাঁধা, কাজেই, যে-কোন সুরে সঙ্গতির অভাব বোধ করিতেছি না। এমনই দিনে মালী-বৌয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়িল।

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর এ-বাড়ীতে সে আর আসে নাই। বাঁচিয়া আছে কিনা তাহাই জানি না। যদিও বাঁচিয়া থাকে, সেই স্থবিরা নিশ্চয়ই ফুল যোগাইবার ছলে অতি প্রত্যূষে গৃহস্থের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিতে সাহস পায় না। তাহার অপটু হাতের ফুলের মালা কে কিনিবে? অনেকেই ত চাকরি ব্যপদেশে প্রবাসী হইয়াছেন, গৃহ-দেবতা শালগ্রামশিলা গুরুগৃহজাত হইয়া পাইকারী দরে পূজা পাইতেছেন, আর শিবলিঙ্গের সে সুবিধা না থাকাতে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। মানুষের প্রয়োজন অন্য দিকের, কাজেই ফুলের চাহিদা নাই। ঐ সাদা টগর, বা একরঙা জবা-করবীর চেয়ে লনের শোভা মরসুমী ফুলেই বাড়াইয়াছে। শোভা বাড়িয়াছে, গন্ধ আজ নির্ব্বাসিত।

কিন্তু এমন দিনে মালী-বৌয়ের কথা মনে উঠা উচিত নহে; তবু কেন বহুদিনকার মরিচা-ধরা তালায় চাবির সংযোগ হইল, সেই কথাই বলিব।

পাশের ঘরে মা বলিতেছিলেন, 'জানিস দেবু, মালী-বৌ বলেছে মালা দেবে, বুড়ো মানুষ টোপর সে করতে পারবে না।'

দেবু ওরফে দেবদাস অর্থাৎ বড়দা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কেন, বুড়ীকে বলনা টোপরটাও ও করে দিক।'

মা বলিলেন, 'পারলে ওই করত। বলে নজরের জুত নেই। ভাইপো মরে গিয়ে অবধি টোপর গড়া ও ছেড়ে দিয়েছে।'

উচ্চহাস্যে দাদা বলিলেন, 'ভালই হয়েছে। দেশের লোক ওকে দু' হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে। টোপর গড়া যে কত বড় আর্টিষ্টের কাজ ... ও-সব কি বুড়ী ধুড়ীর কর্ম্ম। হাঁ, শোন মা, ফুলের মালা ও দেয় দিক, যা দাম দিতে হয় ওকে দিও—'

বাধা দিয়া মা বলিলেন, 'দাম ও নেবে না। বলে, ছেলেবেলায় খোকাবাবুর কাছে বাক্যিদত্ত আছে—চারটি পেসাদ পেলেই খুসি ও। ওর তৈরী মালা গলায় দিয়ে খোকাবাবু বিয়ে করতে যাবেন।'

হো হো করিয়া দাদা হাসিলেন, 'হাঁ, হাঁ, খোকাবাবুর ত খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! কলকাতা থেকে অসীম গোড়ের মালা আনবে, তার সঙ্গে মানাবে ওই বুড়ীর মালা? দিয়ে যায় যাক্, চারটি খেতে বলো ওকে।'

পরক্ষণেই অন্য কাজের তাড়ায় ব্যস্ত হইয়া দাদা বাহির হইয়া গেলেন।

মাথার চুলে ব্যাক ব্রাশ করিতে করিতে সমস্তই কানে গেল। সুতরাং, মালী-বৌয়ের কথা মনে পড়িল। কিন্তু ছেলেবেলাকার কৌতুক-কণার মত সেটি স্মৃতির ঢেউয়ে ভাসিয়া কোথায় তলাইয়া গেল। আর একবার বেশ-বাস ঠিক করিয়া জামার 'বটন-হোলে' একটি আধফোটা রক্তবর্ণের গোলাপ গুঁজিয়া দিলাম। ডে-লাইটের তীব্র আলো পড়ায় রঙটি তাহার গাঢ়তর বলিয়াই বোধ হইল।

আলৰারের আর্তি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

দ্রাবিড় দেশই ভক্তির জন্মভূমি বলিয়া অনেক পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। পুরাণাদির সেই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়াও আমরা প্রাচীন তামিল সাহিত্যে যে শৈব ও বৈষ্ণব-কবিতাগুলি পাই, নিরপেক্ষভাবে তাহা বিচার করিলে দাক্ষিণাত্যের সেই ভক্তির প্রবাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে দশম শতকের ভিতরে দক্ষিণদেশে একদল ভক্ত বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—তাঁহারা আলৰার নামে পরিচিত। এই বৈষ্ণব-আলৰারদের পাশাপাশিই দেখিতে পাই শৈব-ভক্তগণকে এবং ভক্তির প্রাবল্য সেখানেও কিছু কম নহে। আজ আমরা এই আলৰারদের কবিতাগুলির কিছু কিছু আলোচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যের সেই প্রাচীন ভক্তিধারার একটা পরিচয় এবং আস্বাদ লইতে চেষ্টা করিব।

সমস্ত বৈধ উপায় ত্যাগ করিয়া অনন্যশরণ হইয়া শ্রীভগবানের নিকট আত্মসমর্পণই এই আলৰারদের ধর্মের মূল কথা। নাম্ম্-আলৰারের 'তিরুরুত্তম্'-এর (ভগবানের নিকটে আলৰারের পবিত্র বাণী) প্রথমেই তাই প্রার্থনা দেখিতে পাই,—

প্রভু মোর, হ'য়ো দয়াময়।
সুরগণ-প্রভু ওগো, যুগে যুগে অবতার
তরাইতে জীব সমুদয়॥
দীন এই সেবকের একটি মিনতি প্রভু,—
শুন শুন এ কাতর বাণী,—
রেখ' মোর এ মিনতি, পুন পাপ দেহ মাঝে
আর না লইও মোরে টানি॥
ক'র না ক'র না আর দয়াময় নাথ হে,
অন্ন গেয়ান মতি-দীন।
আর নাহি দিও মোরে দয়াময় হে মাধব,
এ পাপ-প্রকৃতি অতি হীন॥*

নাম্ম্-আলৰার বলিতেছে,—হে দৈত্যনিসূদন চক্রধর হরি, মনে ভাবিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কত কঠোর তপস্যা করিয়া তোমার ভক্ত হইবার উপযুক্ত এই দেহ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু হে প্রিয়,—

চরণ যুগল তব শিরেতে রাখি।
তবুত রে পিয়া সব রহিল বাকি।
আজো ত না পেনু আমি চরণ তোমার।
চলে যায় কাল যে অনন্ত অপার॥

কত দিবস রজনী তোমার চরণ-যুগল মাথায় করিয়া রাখিলাম,—হে প্রিয়, তবু যে কিছুতেই কিছু হইল না,—এখনও ত সত্যকার তোমার চরণলাভ করিতে পারি নাই। এদিকে যে অনন্তকাল বহিয়াই চলিয়াছে!

নিজের অযোগ্যত্ব স্মরণ করিয়া আলৰার বলিতেছে,—

হে কাল-বরণ কমল লোচন,
ধরমী সুজন ঋষিরা ছাড়া।
ও পূত চরণ ছুঁইতে কখন
আর কোন জন—পারে না তারা॥
অন্ধ ধেনু ও গ্রাম্য গোধন
অর্থবিহীন হাম্বা ডাকে,
কি বলিতে জানে? তবুও বলেছি,—
ওগো দয়াময় ক্ষমিও তাকে॥

অবোধ গোধন যেমন ভাষাহীন,—নিজের অন্তরের বেদনাকে সে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না,—বেদনায় শুধুই ডাকিয়া মরে, শাস্ত্রজ্ঞানহীন ভজন-পূজা-হীন আলৰারও তেমনি শুধু অব্যক্ত ধ্বনিতেই আপনার বেদনা প্রকাশ করিতেছে। মহিলা-কবি আণ্ডালও তাহার 'তিরুপ্পাবাই'-এর ভিতরে বলিয়াছে,—

ধেনুগণ ল'য়ে আমরা গহনে ছুটি
কাননে আহার—অবোধ আহীর জাতি।
আমাদেরি মাঝে জনম লভিলে তুমি
এই মহাবর পেয়েছি দিবস রাতি।

* গানগুলি J. S. M. Hooper-এর 'Hymns of the Alvars' হইতে অনুদিত।—লেখক।

আমাদের মনে তোমার আত্মীয়তা
নাহি গোবিন্দ,—অবশেষ নাহি তার,—
আমাদের সনে রয়েছে যে তব প্রীতি
এখানেই কভু থামিবে না তার ধার।
প্রণয়ে আমরা যদি কভু তোমা ডাকি
শিশু নাম ধ'রে, ক'র না ক'র রোষ,
কিছু নাহি জানি, অবোধ শিশুর মত,
আমাদের তুমি ধরিও না কভু দোষ।

কুলশেখরের একটি কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই রঙ্গনাথের প্রেম তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, এই কবিতার ভিতরে যে বৈরাগ্য তাহা শুষ্ক কাষ্ঠ-বৈরাগ্য নহে,—প্রেমের সিঞ্চনে সমস্ত বৈরাগ্য মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ত্যাগ এখানে বেদনা নহে, পরমলাভের মাধুর্য্যে সে যে সার্থক। কুলশেখর বলিতেছে,—

মিথ্যা ধরারে সত্য করি যে মানে
মর্ম্মের যোগ নাহি সে ধরার সাথ;
তোমারি লাগিয়া হৃদয়ে অনল জ্বলে,—
কাঁদি আমি শুধু,—হে মোর রঙ্গনাথ।
ক্ষীণ-কটিদেশ তন্বী নারিকাভরা
মর্ম্মের যোগ নাহি এ ধরার সাথ,—
প্রেমে আনন্দে শুধু একজন লাগি
জাগি আর কাঁদি,—হে মোর রঙ্গনাথ।
নিঠুর-ধানুকী মদন-পূজারী সাথে
মর্ম্মের যোগ নাহি ওগো নারায়ণ,
নরক-শত্রু! হে অনাদি শুধু চাহি
মাল্য-শোভিত বক্ষের পরশন।

* * * *

অনাবিল শিব ছাড়িয়া যে বরে পাপে,
নহে নহে তারা কভু মোর আত্মীয়,—
পাগল হয়েছি সেই অনাদির লাগি,
কমলোদ্ভূতা নারীর রাখাল প্রিয়।

পেরিয়ালবার এক স্থানে বলিতেছে,—হে প্রভু, সর্প-সঙ্গী সহ একঘরে বাসকারী গৃহীর ন্যায় আমি সর্বদাই ভীত এবং কাতর;—এখন যে শুধু প্রিয়তমের প্রেমই ভরসা!

কমল-নয়ন প্রভু মোর,—
—বিহ্বল চিত মোর পথ নাহি খুঁজে পায়,
সহিবারে এ বেদন মোর।

আলবার আবার বলিতেছে,—

নদী-সৈকত মাঝে বর্ধিত তরু সম
ভীত শঙ্কিত আমি নাথ,—
পুন এই জনমের বিষম গর্ত মাঝে
কভু যেন নাহি হই পাত।
এ অবধি রয়েছে সাহস,—
ওগো প্রভু—তুমি মম গন্ধ হে, রস তুমি,—
তুমি মম শ্রবণ পরশ!
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসাগরে নাবিক সম
ভীত শঙ্কিত আমি নাথ,
পুন এই জনমের বিষম গর্ত মাঝে
কভু যেন নাহি হই পাত।
চক্রধারী হে মোর প্রভু,
অপ্রীতিময় যদি সকল বচন মম,
মিনতি রাখিও মোর তবু।

কুলশেখর অন্যত্র বলিতেছে,—হে প্রভু, স্বর্গের ধন-সম্পদও কিছুই চাহি না, অনন্তযৌবনা সুন্দরী নারীও চাহি না, বিপুল রাজত্ব চাহি না, শুধু ইহাই চাহি, যদি পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেই হয় তবে বেঙ্কট-গিরির* একটি মনোহর কানন-কুঞ্জের নির্ঝরে যেন একটি মীনরূপে জন্মগ্রহণ করি। আর,—

যেথা কত পতঙ্গ গুঞ্জনে গাহে গান
চম্পক তরু হব আমি,
দাঁড়ায়ে রহিব ধীর সেই তিরু-বেঙ্কটে
যেথায় রয়েছে মোর স্বামী।
দাঁড়ায়ে রহিব আমি দেখিতে সে পদ যুগ।
মায়াময় দয়িতের মোর,
প্রবাল-উজোর-ঢেউ ক্ষীরদ সাগর মাঝে
যেই প্রভু নিদ্রা-বিভোর

অন্যত্রও কুলশেখর বলিতেছে,—যে ধন-সম্পদ্ লইয়া সংসার মত্ত থাকে, আমি তাহার লেশ মাত্র চাহি না—পূর্ণিমার চাঁদের মত শ্বেতছত্রতলে দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়া রাজাধিরাজ হইয়াও বসিতে চাহি না; শুধু এই চাই,—

* বেঙ্কট-গিরি—বৈষ্ণবদিগের তীর্থ স্থান

আমি যেন লভি এই বর,
ভাবধারা বহে যেন কানাড়ুর নদী সম
বেঙ্কট পর্বত পর।
যেথা চির করিছে বিরাজ
বিচিত্র মনোহর কানন-কুঞ্জ মাঝে
মধুময় পুষ্পের সাজ।

কুলশেখর আবার বলিতেছে,—হে প্রভু, পুরুষার্থের দম্ভ চলিয়া গিয়াছে; মানুষের দম্ভের অট্টালিকাকে তুমি তৃণের মত তুচ্ছ করিয়া তুলিয়া ফেল; আমি শুধু এই চাই,—

বেঙ্কটবাসী হে মহান্ প্রভু
শুধু এই কর নাথ;—
তোমারি প্রবাল-অধরে পড়ুক
আমারি নয়ন-পাত।
তোমারি ভক্ত সেবকবৃন্দ
যত সুরগণ আর,
সুন্দরী যত দেববালাগণ
চলে যেই পথদ্বার,
তব মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই
প্রবেশ-পথের ধার,
দাঁড়াইয়া থাকি কোন মতে শুধু,
এই দেহ অধিকার।

আবার—

গগন-চন্দ্রাতপের নিম্নে
যদি আমি কভু পাই,
স্বর্ণ-মেখলা উর্বশী-প্রেম
তাতে মোর প্রীতি নাই।
প্রবাল-অধর দেবতার এই
বেঙ্কট পর্বতে,—
সকল মানিব জীবন আমার
পারি যাহা কিছু হ'তে।

আর একটি কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই, কুলশেখর আপনাকে শ্রীভগবানের পায়ে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছেন। মা রোষভরে দূরে ঠেলিয়া দিলেও শিশু যেমন গভীর বেদনায় আবার মা মা বলিয়াই কাঁদিয়া মরে, তেমনই কুলশেখরও ভগবানের জন্য অনন্যশরণ হইয়া কাঁদিতেছে। তাই আলৱার বলিতেছে,—

তুমি যদি মোর বেদনা না কর দূর
তোমা ছাড়া মোর আশা নাই কিছু তবু,
সুরভি পুষ্প-পুঞ্জে শোভিত আহা
নিকুঞ্জ-ঘেরা বিক্রুবাকোড়ু প্রভু!
আমি যে হে প্রভু ক্ষুদ্র শিশুর মত,
কাঁদে তবু মা'র করুণার কথা স্মরে,—
যদিও মা তারে আপন সমুখ হতে
দূরে ফেলিয়াছে অতিশয় রোষভরে।

আবার কুলশেখর নিজেকে বালিকাবধূর সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছে,—

চারিদিকে ঘেরা গগন-পরশী উঁচু
বিশাল প্রাচীরে বিক্রুবাকোড়ু প্রভু,
আমি যে বালিকা পবিত্রকুলে জাত,—
স্বামী ছাড়া আর কাহারে না জানে কভু।
এখনো যে তার চপল কর্মে সবে
প্রেমিকে তাহার করে উপহাস কত,—
রণিত নূপুরে না হ'লেও মোর স্বামী,—
আমি গাব গান সেই বালিকার মত।

কুলশেখর বলিতেছে, ব্যাধিগ্রস্তকে যেমন বৈদ্য কাটিয়া-ছিঁড়িয়া কত বেদনা দেয়, ব্যাধিগ্রস্তের তবুও বৈদ্য ছাড়া আর উপায় নাই;—ভগবান্ যতই দুঃখ-বেদনা দিন, তবু তিনি ছাড়া আর অন্য অবলম্বন নাই।

তোমারি মায়ার সান্ত্বনাহীন ব্যথা
যদিও লভি গো, বিক্রুবাকোড়ু প্রভু,—
এই তব দাস তোমারি করুণা বিনা
আর কোন দিকে চাহিবে না আর কভু।
বৈদ্য যেমন পীড়িতে কাটে ও দহে
পীড়িত তাহারে চিরকাল ভালবাসে,—
তাহারি মতন হে মোর নিঠুর নাথ,—
চাহিয়া রহিব তোমারি করুণা আশে।

কুলশেখর আবার বলিতেছে,—

ক্ষুব্ধ সাগরে আমি যে বিহগ সম
যতদূর চাহি নাহি দেখি কোথা কুল,—
ভ্রমিয়া অনেক আবার আসিয়া ফিরে
আশ্রয় করি জাহাজের মাস্তুল।

আকাশের সূর্য তাহার কঠোর দহনে কমলিনীকে দগ্ধ করে, তবু সূর্যের সেই তপ্ত নয়ন কিরণ ব্যতীত কমলের বুকের দল একটি একটি করিয়া মেলিয়া যায় না।

রক্ত-অনল নিয়ে নামিয়া আসি
চড়ায় যদিও ভীষণ দাহন তার,—
ঊর্দ্ধ গগনে-আসীন রক্ত-আঁখি
বিনা নাহি ফুটে রক্ত-কমল আর।
যদি বা না তুমি ঘুচাও আমার যত
হৃদয়-বেদনা বিক্রেবাকোড়ু-প্রভু,
তোমারি অসীম প্রেম বিনে আর হায়,—
গলিবে না মোর হৃদয় কখনো তবু।

আকাশের পানে অনিমেষ-নয়নে নিয়ত চাহিয়া থাকা সবুজ তৃণদলের মত আলবার বলিতেছে,—

আকাশ যদিও ভুলে যায় একেবারে
সবুজ তৃণেরে,—বিক্রেবাকোড়ু-প্রভু,
ঊর্দ্ধোত্থিত কালো মেঘমালা পানে
অনিমেষ চোখে চাহিয়া থাকে সে তবু।
তেমনি হে নাথ, আরো বেশী—আরো বেশী—
এ দাস সঁপিবে তোমাতে চিত্ত তার,
যদিও তুমি না ঘুচাবে হে নাথ কভু
জীবনের মোর যতেক বেদন-ভার।

উত্তরবাহিনী গঙ্গার মত অবিরলধারে একটানা স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে এই ভক্ত-প্রেমিকগণের অন্তরের আবেগ। এ ভক্তি কোনো বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়া, ধর্মের কোনো রীতি-পদ্ধতির ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই, ইহা চলিয়াছে অবাধ গতিতে স্বাধীন স্রোতে, ইহাই বিশুদ্ধ প্রেম,—রাগানুগা-ভক্তি। কে বলিতে পারে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে দ্রাবিড় দেশে এই যে বিশুদ্ধ প্রেমের প্লাবন আসিয়াছিল ইহা কি শুধু দ্রাবিড় দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, না সে পূর্বে পশ্চিমে এবং উত্তরে আরও অনেকখানি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে বৈষ্ণব প্রেমের বান ডাকিয়াছিল; পরবর্তী সেই প্রবাহের সহিত দ্রাবিড় দেশের এই ভক্তি-প্রবাহকে পরিষ্কাররূপে মিলাইয়া দিবার আজ স্পষ্ট যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছি না বটে; কিন্তু এ কথা বলিলে বোধ হয় অসত্য হইবে না যে, পরবর্তী উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের উপরে এই দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে।

কমল ও মৃণাল

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

কমল ফুটে ওঠে দীঘির কালো জলে
শিহরে হিয়া তার মেলিয়া তনুদলে।
কমল দুলে দুলে মৃণালে ডেকে বলে,
তোমারে নত করি যেদিকে যত খুসী
কোমল তনুতে কী লাগে না তার ব্যথা,
মরাল যবে চলে মলিন জলে ভাসি,
তোমার গায়ে লাগে ঢেউয়ের জল রেখা,
ব্যথায় নুয়ে নুয়ে আমারে ধরে রাখ
সলিলে ভেসে ভেসে কেমনে বেঁচে থাক?

মৃণাল কেঁপে কেঁপে কমলে ধীরে বলে,
বিলীন যবে ছিনু অতল পঙ্কেতে
স্বপন দেখেছিনু গহন জল তলে,
সে মধু-স্বপনেতে গোপন যাহা ছিল
তাহার চেতনা যে তোমাতে গেল লাগি,
আমার রূপ রস গন্ধ যাহা ছিল
তাহার মাধুরীতে উঠিলে তুমি জাগি
স্বপন রেখা মম নয়ন নীরে আঁকা,
সলিলে ভেসে তাই তোমারে ধরে রাখা।

জলধর সেন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কেবলমাত্র প্রতিভাই যে মানুষকে স্মরণীয় করে তা' নয়, হৃদয়বত্তাও মানুষকে স্মরণীয় করে, জলধর দাদার জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল, তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। সবত্রই দেখেছি তিনি সুস্পষ্ট—কোথাও অপবিচয়ের বা স্বল্প পরিচয়ের আস্তরণ আমার দৃষ্টিকে প্রতিহত ক'রে দাড়ায় নি। এটা আজকালকার যুগে বড় সোজা কথা নয়—কেন না অধুনা আমরা দ্বৈতজীবন যাপন করছি। আমাদের মন মুখ এক নয়, আমাদের সদর অন্দর এক নয়, আমাদের পারিবারিক এবং আমলাতান্ত্রিক মত এক নয়। কিন্তু জলধরদা ত আমাদের যুগে জন্মান নি। তিনি আশী বছর আগে যে যুগে জন্মে ছিলেন তার সর্বোচ্চ আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। সে আদর্শ হচ্ছে আন্তরিকতা। তিনি যার দাদা হয়েছিলেন তাকে সত্যিকারের ভাই ব'লেই গ্রহণ করতেন। তাকে আপদে বিপদে দেখ্‌তেন। সঙ্কটকালে তার পাশে এসে দাড়াতেন। তার বিপন্মুক্তির কাজে নিজের সামর্থ নির্বিচারে নিয়োগ করতেন। এ শ্রেণীর লোক আজকাল আর দেখি নে, জলধরদা যে-যুগের প্রতিনিধিত্ব করতেন সে-যুগ অনেক আগেই নিঃশেষ হয়েছে। জলধরদাই হয়ত তার শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তাই জলধরদাকে হারিয়ে আমরা সুধু একজন মানুষকেই হারালুম না, বিগত যুগ এবং বর্ত্তমান যুগের ভিতর প্রবহমান একটি যোগসূত্রও হারালুম। এ হারানো আমাদের পক্ষে শারীরিক অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় একটি ক্ষতির ব্যাপার।

একদিনকার একটা উদাহরণ দিই। আমাদের কোন সাহিত্যিক বন্ধুর বিবাহ। বিবাহের ক্ষেত্র বেহালায়। আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছি। দূরত্ব এবং যানবাহনের অসুবিধার অজুহাতে অনেকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেও পাশ কাটালেন। কিন্তু নিরূপিত সময়ে দেখি জলধরদা ট্রামে ক'রে বেহালায় চলেছেন। লজ্জিত অন্তঃকরণে সঙ্গ নিলুম। দেখলুম, জলধরদা বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন, নববধূকে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং শেষকালে শুভ্র চাদরের অন্তরাল থেকে দু'খানি নিজের বই বের ক'রে বধূকে উপহার দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বিবাহের পাত্র জলধরদার নাতির বয়সী এবং জলধরদার বয়স তখন বাহাত্তর পার হয়েচে। সুতরাং জলধরদা এই বিবাহ-বাসরে অনুপস্থিত হ'লে কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু তিনি ত সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি যে তাকে ভাই ব'লে ডেকেছিলেন। তাই ভাইয়ের শুভ-অনুষ্ঠানকে তিনি তুচ্ছ করতে পারেন নি। নিজের বার্দ্ধক্যপীড়িত অপটু শরীর নিয়েও তার কল্যাণ কামনা ক'রে এলেন।

৺জলধর সেন

একটা নিজের ঘটনা বলি। সেবার কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হ'ল। আমি প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলুম। প্রথিতযশা সাহিত্যিক হিসাবে জলধরদা মঞ্চের উপর বসেছিলেন। প্রথম দিন

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পরিচিত বন্ধু, আলাপেচ্ছু ব্যক্তিগণের কোলাহল এবং ভিড় এড়িয়ে জলধরদার কাছ পর্য্যন্ত পৌছুতে পারি নি। দ্বিতীয় দিন টাউন হলের একাংশে হঠাৎ জলধরদার সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। "ইউ নটি বয়", "আমি কাল থেকে তোমাকে খুঁজছি, দেখ্‌তে পাই নি, ছিলে কোথায়?" ব'লে সবলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। জলধরদার মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে এই কথাগুলি আমার বুকের মধ্যে কেবলি তোলপাড় করচে। মনে মনে ভাবি জলধরদা ত আমাকে টাকা কড়ি দেন নি, চাকরি ক'রে দেন নি, এমন কি কোন বিপদেও আমাকে সাহায্য করেন নি, কিন্তু কি তিনি দিয়েছিলেন যা হারানোর বেদনা আমার বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করচে? উত্তর পাই যে টাকা কড়ি দেওয়াটাই মানুষের সঙ্গে আসল সম্বন্ধ নয়, এমন কি সে সম্বন্ধ অনেক সময় শুভও নয়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধ হ'ল মিলনের উদার ক্ষেত্রে। তিনি অনাবিল স্নেহ দিয়ে আমাদের তাঁর বুকের সন্নিকট ক'রে নিয়েছিলেন, আর আমরাও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে তাঁর সমীপগত হ'তে পেরেছিলুম, মানুষের স্বভাবগত এই সত্য সম্বন্ধটাই সংসারের অনেক মিথ্যার উপরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে!

জলধরদাকে সাহিত্যের বহু আসরে বক্তৃতা দিতে দেখেছি। যে রবি-বাসরের তিনি মৃত্যুর দিন অবধি সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন আমি অনেক দিন তার সদস্য ছিলুম। তাঁর বহু বক্তৃতার সারমর্ম উদ্ধার করলে এই দাঁড়ায় যে, তিনি নিজে বড় সাহিত্যিক ব'লে কোন দিন অভিমান করেন নি—তিনি নিজেকে সাহিত্যিকদের সেবক এই আখ্যায় অভিহিত করতেন। তাঁর এই কথাটার মূল্য দেওয়ার দিন আজ উপস্থিত হয়েচে। চরিত্রের পঞ্চম রিপুটিকে তিনি সমূলে বিনাশ করতে পেরেছিলেন ব'লে নয় কিন্তু সাহিত্যের তিনি কতখানি শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পেরেছিলেন তার ইতিহাসও এই কথাটুকুর মধ্যে আত্ম-গোপন ক'রে আছে। আমার মনে হয়, সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গঠনেরও অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। জলধরদা কেবলমাত্র সৃষ্টির কাজেই নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করেন নি, তিনি গঠনের কাজেও ব্রতী হ'য়েছিলেন। আজকের দিনে যাঁদের সাহিত্যিক সৃষ্টির মূল্য দিতে আমরা কার্পণ্য করি নে, তাঁদের অনেকের উদ্যমের পিছনে জলধরদার অনুকূলতা, আকুতি, এমন কি জিদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। কিন্তু এই অনাড়ম্বর এবং একান্ত অযাচিত আত্মত্যাগের কি কোন মূল্য নেই? দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধ'রে বাণীর দেউলগঠনে জলধরদার এই যে নিঃশব্দ উপচার সংগ্রহ, সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এর নিঃসংশয় আসন একদিন এ সগৌরবে গ্রহণ করবে, এমন আশা আমরা আজ করতে পারি।

সাহিত্য জলধরদার প্রাণের বস্তু ছিল, তার একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ ক'রে গেছেন (তিনি আমাদের অনেকের মত part-time সাহিত্যিক ছিলেন না), দীর্ঘ জীবনে তাঁকে অনেক শোক, তাপ, বেদনা বহন করতে হ'য়েছিল এ সব কথা তাঁর অনেক অনুরাগী বন্ধু এবং ভক্তেরা জানেন। সুতরাং তার পুনরুক্তি আমি করবো না, আমার মনে জলধরদার সম্বন্ধে যে চিত্রটি বড় হ'য়ে জাগ্‌চে সেটি হ'ল এই যে, "ভারতবর্ষের" মত একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদক হ'য়েও তাঁর কোন আপিস-ঘর ছিল না, সেখানে ছোট বড় ও মাঝারি সাহিত্যিকদের এবং সাধারণ লোকের সর্বদা অবারিত দ্বার ছিল এবং সম্পাদকীয় মুরুব্বিয়ানার কোন দিন তাঁকে কথা বল্‌তে দেখি নি। তিনি যেন সকলেরই নীচে থাক্‌তে চাইতেন। চলনে বলনে পোষাকে আসাকে কোথাও তিনি বিশিষ্টতা রাখ্‌তে চান নি। কিন্তু এই বিশিষ্টতা-হীনতার তপস্যার জন্যই তিনি আমার মনে নির্বিশেষ হ'য়ে আছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-প্রণালী, অকৃত্রিম ভদ্র ব্যবহার, এবং প্রত্যেক সাহিত্যিককে আত্মীয়-জ্ঞান সাহিত্যের জগতে চিরদিন দিগদর্শন হ'য়ে থাকবে।

খণ্ডগিরি-উদয়গিরি

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

ভ্রমণ আর 'পিক্‌নিকে'র নেশাটা আজকাল আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুবই স্বাস্থ্যকর নেশা সন্দেহ নেই—কিন্তু যখন শুনলাম 'খণ্ডগিরি' 'উদয়গিরি'তে গিয়ে পিক্‌নিক্ করে আসতে হবে তখন সে দলে ভিড়লাম না। আমাদের দেশের যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন পড়ে আছে তার পাশে একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে গিয়ে হৈ হৈ করে গান-বাজনা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সমস্তদিন কাটিয়ে দিয়ে বাড়ী আসবার সময় একবার কোথায় কি আছে উঁকি দিয়ে দেখে আসার ভিতর আধুনিক আমেরিকান মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও এর পশ্চাতে যে মস্ত বড় চিত্তদীনতা রয়েছে এটা ঠিক। ... তাই পিক্‌নিক্ পার্টির আশ্রয় না নিয়ে একদিন আমরা তিন বন্ধুতে পদব্রজে ভুবনেশ্বর থেকে খণ্ডগিরি অভিমুখে যাত্রা করলুম।

লিঙ্গরাজ মন্দির ঃ ভুবনেশ্বর

লিঙ্গরাজ মন্দিরের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তাটা চলে গেছে। চারি পাশের শত শত বৎসরের ভগ্ন দেউলগুলির প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে রাস্তাটা ক্রমশঃ দূর বনান্তরালে আত্মগোপন করেছে। তখন ভোর পাঁচটা। মাইল তিনেক পথ। আমরা বেশ আনন্দেই এই পথটুকু অতিক্রম করে গেলুম। পথটা সোজা 'কটক' চলে গেছে। মধ্যেই খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখা গেল। খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরিতে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। দুটি পর্ব্বতে বহু গুহা আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গের রাজা খারভেল জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য উদয়গিরির গুহাগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"The Udayagiri caves have been carved out of the living rocks like those of Western India. They were evidently intended for the residence of Jaina monks, and made probably in the first Century B. C. During this century the great Jaina King Kharavela of Kalinga set up a long inscription recording his achievements, in the celebrated cave known as Hathigumpha, in this very hill, and there is little doubt that at least some of the caves were excavated by him and his family.
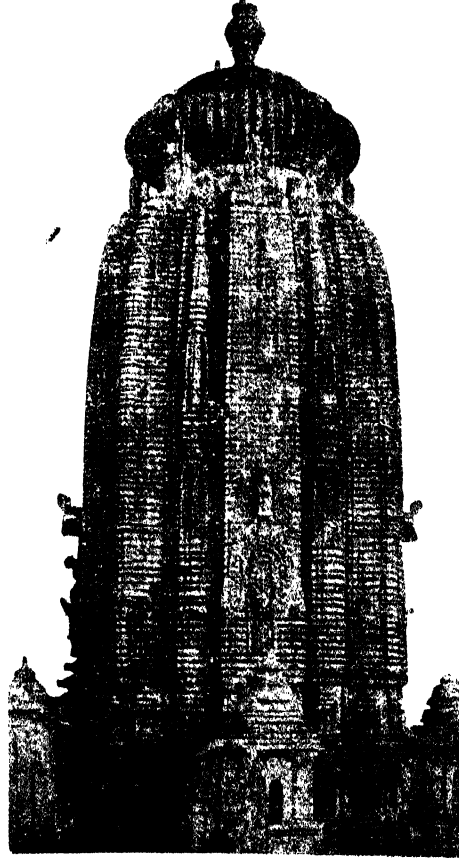
আমরা প্রথমে উদয়গিরিতে উঠতে আরম্ভ করলুম। উদয়গিরির গুহাগুলির নাম—রাণীগুহা, সর্পগুহা, অনন্তগুহা, গণেশ গুহা। রাণীগুহাটি দ্বিতল। এটীর ভিতরে অনেকগুলি ঘর আছে, এবং তৎসংশ্লিষ্ট বারান্দার যৎকিঞ্চিৎও

দেখা যায়। এই ঘরগুলির আলিসায় এবং আশেপাশে পাথরের উপর কারুকার্য্য করা আছে। এগুলির কিছু কিছু যদিও বর্ত্তমান, কিন্তু কালগ্রাসে অনেকখানিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রাণীগুহা নামটী কেন হল সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন—কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় সে
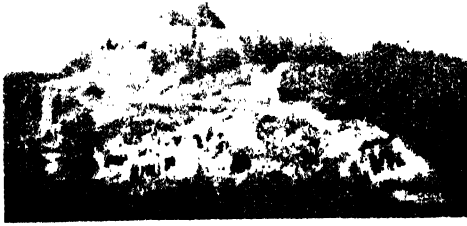
উদয়গিরি হইতে খণ্ডগিরির দৃশ্য

সমস্ত অনুমান মাত্র মনে করা যেতে পারে। এরূপ অনেকে বলেন যে রাজা অশোকের রাণী পালিয়ে এসে কিছুদিন এই গুহায় বাস করতেন, সেই থেকে রাণীগুহা এর নাম হয়েছে। সেই সুদূর অতীতকালে আমাদের দৃষ্টি চলে না—তবে গুহার ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য দেখে একথা অনুমান করা যায় যে কোন রাজা তাঁর পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলী পাথরের উপর লিপিবদ্ধ করে তাঁর রাণীকে উৎসর্গ করে গেছেন। এ মত সমর্থন করে H. A. Stark লিখেছেন—"It is flanked by a verandah upon whose inner wall there is a sculptured frieze recounting, it may be, an incident in the romantic life of the king who dedicated the caves to his queen."

আমরা এইবার রাণীগুহার কারুকার্য্য দেখতে লাগলাম। এগুলি নানা অংশে বিভক্ত। এক একটী অংশে এক একটী ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যলিপির পাঠোদ্ধার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক W. W. Hunter এগুলির সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রামাণিক বলে আমরা তার বঙ্গানুবাদ করে দিলুম। তিনি লিখেছেন—"প্রথম ভাস্কর্য্যলিপিটী প্রায় অধিকাংশ পর্ব্বত গাত্রের সহিত বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তবে যতদূর বোঝা যায় ইহা বিবাহের পূর্ব্বে কোন রাজ-পরিবারের উপহার পাঠাবার দৃশ্য ক্ষোদিত করা হয়েছে। একটী মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়—তার হাতে একটী থালায় কতকগুলি ফল রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে প্রেমাস্পদ উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয় অংশে প্রেম নিবেদন বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে রাজপুত্র এবং রাজকন্যা তরবারী হস্তে যুদ্ধ করছেন। পঞ্চম অংশে দেখা যায় রাজকন্যা পরাজিত হয়েছেন এবং রাজপুত্র তাঁকে বাহুডোরে বদ্ধ করে নিয়ে চলেছেন।" ইত্যাদি।

উদয়গিরির রাণীগুহার অনেক কারুকার্য্য শিল্পসৃষ্টি হিসাবে ভারহুত হতেও শ্রেষ্ঠ, একথা কেউ কেউ বলেন। ভাস্কর্য্যের ব্যঞ্জনার বিষয় বস্তুর মধ্যে অপূর্ব্ব সঙ্গতি, মূর্ত্তি-গুলির গঠনভঙ্গিমার প্রাণবন্ত ভাব সাচির শিল্পসৃষ্টির যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'On the whole, the Rani Nur Sculpture may be said to be typical of the school represented by the Udaygiri Caves. It shows a more advanced techinique than Bharut, while the balancing of the details in the compositions, and the vigourous and animated treatment of the figures, which are specially noteworthy in the friezes of the upper story of Rani Nur, are suggestive of a stage of development witnessed in the reliefs of the Sanchi gateways" উপরে আমরা যে রাজপুত্র এবং রাজকন্যার কাহিনীর কথা লিখেছি, কেউ কেউ বলেন ঐ বিষয়টী জৈন ঋষি কাশীর রাজপুত্র পার্শ্বনাথের জীবনের একটী কাহিনী

পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি

বর্ণনা করা হয়েছে।...এইরূপ একটী কাহিনী আছে যে কলিঙ্গের কোন রাজা একটী রাজকন্যাকে হরণ করেন, পরে পার্শ্বনাথ সেই রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

রাণী গুহা দেখা শেষ করে আমরা গণেশ গুহায় এসে উপস্থিত হলুম। এটীর নাম যদিও গণেশ গুহা

গণেশ গুহা : উদয়গিরি

কিন্তু এটী পূর্ব্বে বৌদ্ধদের গুহা ছিল। খ্রীষ্ট জন্মাবার পর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রতিপত্তিশূন্য হয়ে যায় এবং বৌদ্ধ-উপাসনা ক্রমশঃ হিন্দু উপাসনায় রূপান্তরিত পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনায় এসে পড়ে। এ গুহায় তারই স্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান আছে। রাণী গুহায় যে সমস্ত ভাস্কর্য্য আছে এ গুহাটীতেও সেই রকমের ভাস্কর্য্য দেখা যায়। এমন কি রাণী গুহার ভাস্কর্য্য এবং গণেশ গুহার ভাস্কর্য্য দু'য়ের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই গুহাগুলি দেখে এগুলি কেন তৈরী করা হয়েছিল অথবা কাহারা এখানে থাকতো সে কথা জানবার স্বভাবতঃ একটা স্পৃহা জাগে। ইতিহাস পাঠ করে জানা যায়, রাজা অশোকের অনেক পূর্ব্বে বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা উড়িষ্যায় এই খণ্ডগিরিতে এসে গুহা কেটে বাস করতো এবং পরে রাজারাণীদের এই সমস্ত স্থান দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁরাও এর মধ্যে পাথর কেটে প্রাসাদ তৈরী করে বাস করতেন। অন্ততঃ রাণী নূরের বিরাট ধ্বংসাবশেষ দেখে তা প্রাচীনকালে রাণীদেবীর প্রাসাদ ছিল এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখেছেন—"Before the time of Asoka and even of Alexander the Great, Buddhist Missionarie penetrated into Orissa and excavated rude cells in the rocks of Udayagiri and Khandagiri, there to pass this lives in contemplation. As the time went on princes and princesses followed the example, and the remains of the palaces, excavated out of solid rock attest to the greatness of forgotten kings and queens."

উদয়গিরি ছেড়ে এবার আমরা খণ্ডগিরিতে উঠতে আরম্ভ করলুম। খণ্ডগিরি উদয়গিরি হতেও আরও উঁচু এবং ওঠাও কষ্টকর। এখানে অনন্ত-

অনন্ত গুহা : খণ্ডগিরি

গুহাটীই বিখ্যাত। এই অনন্ত গুহার মধ্যে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি আছে। খণ্ডগিরির ঠিক চূড়ার উপরেই একটী জৈন মন্দির আছে। দেখলুম পাহাড়ের পাদদেশ হতে দুটী জৈন সাধু ডন-বৈঠক করতে করতে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত উঠল। তারা পাহাড়ের চূড়া মন্দিরে দেবমূর্ত্তির

সম্মুখে গিয়াও ডন-বৈঠক করতে লাগল। হয়তো এমনি ভাবেই সাধুজীরা দেবতাকে শ্রদ্ধা জানান।

রাণী নূরের ধ্বংসাবশেষ : উদয়গিরি

খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরির গুহাগুলির ভিতর তিনটী ধর্ম্মের ছাপ বর্ত্তমান। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, এবং হিন্দু ধর্ম্ম। গণেশ গুহার মধ্যে গণেশ মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, রেলিঙে যে কারুকার্য্য করা আছে তা বৌদ্ধ যুগের এবং ভারহুতের কারুকার্য্যের সহিত মিল আছে, এবং জৈন দেবতা পার্শ্বনাথ তো আছেই। তা ছাড়া এগুলি তিনটি যুগের উত্থান পতনের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই Ascetic Age-এর কথা জানা যায়, যখন সাধুরা এসে গুহা কেটে নির্জ্জন পর্ব্বতের মধ্যে বাস করে ঈশ্বরের সাধনা করতেন। তারপর Ceremonial Age যখন নানা ধর্ম্মপালগণের পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান, বাসগৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি হয়, তারপর আসে Fashionable Age। এ যুগে রাজারাণীরা এসে এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং বিলাসের বন্যা বহিয়ে দেন। এই যুগের পরই এর পতন ঘটে।...

পাহাড় থেকে নেমে আমরা আবার ভুবনেশ্বরের দিকে ফিরলুম। পাহাড়ের নীচেই একটী ডাকবাঙলা আছে। সেটীতে যখন হোক গিয়ে থাকা যায়। তা ছাড়া জৈন তীর্থযাত্রীদের জন্য একটী ধর্ম্মশালাও আছে।

খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরি হতে বহু কারুকার্য্য খুলে নিয়ে এসে কলিকাতা মিউজিয়ামে এবং অন্য মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। এগুলো নিয়ে গিয়ে এগুলির অঙ্গহানি
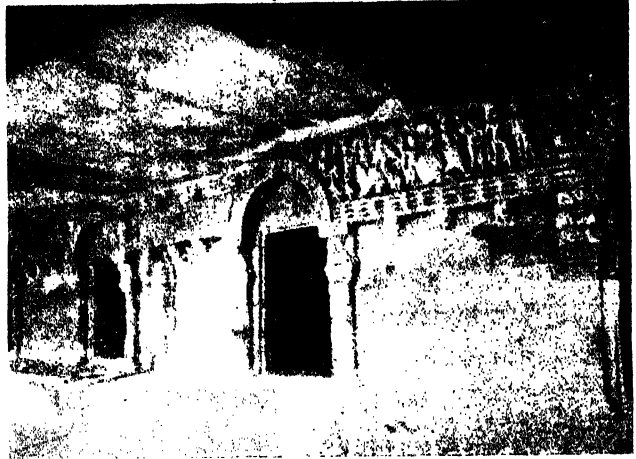
উদয়গিরি-গুহার বিখ্যাত চিত্রাবলী

করা হয়েছে। কারণ কলকাতায় যদি লোকে এ সমস্ত দেখতে পায় তো আর পয়সা খরচ করে এখানে আসবে না এবং স্থানটাও ক্রমশঃ পরিচয়হীন হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবে।

পদধ্বনি

শ্রীঅখিল নিয়োগী

অতি প্রত্যুষে সোণালী শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ বাহিরে আসে। আজও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। উঠানে গোবর ছড়া দেওয়ার জন্য যে কালো হাড়ীটি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই হাতে লইয়া সে জল আনিবার জন্য খিড়কীর পুকুরের দিকে রওনা হইল।

হঠাৎ তাহাদের শোবার ঘরের পাশের করবী গাছটার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল।

শেষরাত্রির চন্দ্রালোকের আভা আকাশ হইতে তখনো একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। সেই মৃদু জ্যোৎস্নায় সোনালী দেখিল, করবী গাছের ডালের সহিত কি যেন একটা উড়িতেছে।

অগ্রসর হইয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

জিনিষটি ভয়াবহ কিছু নহে, সামান্য একটি রুমাল মাত্র; সাধারণ কাপড়ের উপর ঢাকাই বুটীর কাজ। দেখিয়া বোঝা যায়—এই বুটীর কারুকার্য্য মূল্যবান না হইলেও তুলিতে অনেক দিন সময় লাগিয়াছিল। রুমালটি বহুদিনের পুরাতন, তাই অনেক যায়গায় সুতা আল্‌গা হইয়া বাহির হইয়া প'ড়িয়াছে। রুমালটির এককোণে ছোট্ট একটি 'M' অক্ষর লেখা।

কোনো কোনো সাপের চোখে সম্মোহিনী শক্তি থাকে এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সেই ক্ষমতার দ্বারা সে জন্তু জানোয়ারদের একেবারে স্তব্ধ ও চলচ্ছক্তিহীন করিয়া আয়ত্বে আনে। এই সামান্য রুমালখানি দেখিয়াও সোণালীর আজি সেই অবস্থা হইল; সে না পারিল ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে, না পারিল ওখান হইতে সরিয়া গিয়া গেরস্তালীর অন্য কোনো কাজে লাগিতে। সম্মোহিত প্রাণীর মতো স্থিরনেত্রে শুধু ওই দিক পানে চাহিয়া রহিল।

সোণালীর এই স্তব্ধতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, আমাদিগকে পাঁচ বৎসর পিছু হটিয়া যাইতে হইবে।

সোণালীর জীবন-নাট্যের পাঁচ বছর পূর্ব্বেকার এক সন্ধ্যায় যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা গেল—বাঙলা দেশের অজ্ঞাত এক পল্লীগ্রামে ততোধিক অখ্যাত এক পরিবারে সোণালী মানুষ হইতেছে। এটা সোণালীর মামার বাড়ী। মা বাঁচিয়া না থাকিলে মামার বাড়ীর সহিত যে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা থাকা সম্ভবপর, সোণালীর জীবনে বোধ করি, তাহার চাইতে কিছু বেশীই জুটিয়াছিল। সোণালী এই সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে তৈরী হইতেছিল।

কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের কাহিনী নয়, কাজেই মূল কাহিনীর পথ ধরিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় মামাত বোনদের সহিত সোণালী সেনেদের পুকুরে যথারীতি গা ধুইতে গিয়াছিল। সকলের পা ঘষা, গা ঘষা, গা ধোয়া সব শেষ হইয়া গেল—সোণালী যে কেন অনর্থক দেরী করিতে লাগিল, তাহা সে-ই ভালো জানে।

বোনেরা রাগিয়া কহিল, তুই তা'হলে থাক পোড়ারমুখী,—আমরা সবাই চল্লুম।

সোণালী হয়ত মনে মনে ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই জানাইতেছিল। এত সহজে তার আকাঙ্খা পূরণ হইল দেখিয়া সে সবার অলক্ষ্যে একটু হাসিল, এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। বোনেরা কলসী ভরিয়া জল লইয়া 'ছলাৎ-ছল' 'ছলাৎ-ছল' শব্দ করিতে করিতে ঘাটের পথ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

তৎক্ষণাৎ ঘাটলার পাশের ঝোপ হইতে মুখ বাড়াইয়া মাণিক কহিল, তোমার বোনরা যে এত সহজে যাবে তা ভাব্‌তে পারিনি।

সোণালী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। মাণিক কহিল, সত্যি ঠাট্টা নয়, আমি ভেবেছিলুম—অনেকক্ষণ ধরে মশার কামড় খেতে হ'বে।

সোণালী কৌতুক করিয়া কহিল, তা'হলে বেশ বুঝ্তে পাচ্ছ যে প্রেমের পথ মসৃণ নয়!

মাণিক জবাব দিল, মসৃণ ত' নয়ই বরং কণ্টকাবৃত—এই দেখ, বেতের কাঁটায় আমার হাতটা কেমন ছড়ে গেছে!

তেমনি কৌতুক-কণ্ঠে সোণালী কহিল, কাঁটার ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবেন না মহারাজ, দিন এলেই অধীনী ওখানে সর্ষপ তৈল মেখে দেবে।

এই কথায় মাণিকের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; সে কহিল, সত্যি সোণা, বোধ করি সেদিন আবার অনেক দূরে চলে গেল।

—তার মানে? সোণালী জিজ্ঞাসু নেত্রে মাণিকের দিকে চাহিল।

মাণিক বলিল, বল্‌ছি, আগে বল, আমার চিঠি কখন পেয়েছিলে?

—আজ সকালে।

—হুঁ! কাল সকালেই আমি কল্‌কাতায় চিঠি পোষ্ট করেছি কিনা, আমি জান্‌তাম, তুমি গা ধুতে আস্‌বেই, তাই এই Previous Engagement!

উৎসুক কণ্ঠে সোণালী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি ও কথা বল্‌লে কেন? সত্যি, আমার ভয় কচ্ছে। ব্যাপার কি আমায় খুলে বল—তুমি হঠাৎ কল্‌কাতা থেকেই বা চলে এলে কেন?

মাণিক জবাব দিল, এত কথা একসঙ্গে জিজ্ঞেস্ করলে আমি যে হাঁপিয়ে উঠ্‌ব সোণা! আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একে একে সব তোমায় জানাচ্ছি—

—হাঁ বল, কিন্তু কি বা তুমি বলবে আমি ভেবে পাচ্ছিনে!

সোণালীর কণ্ঠস্বরে যেন ভীরু কপোতী বাসা বাঁধিয়াছে!

মাণিক কহিল, দিন চারেক আগে কলেজের ছেলেরা মিলে বোটানিক্যাল গার্ডেনে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম। যাবার পথে আমরা নৌকো ভাড়া করে যাই। সাঁতার জান্‌তো না, এমনি একটি ছেলে হঠাৎ গঙ্গায় পড়ে যায়। তাকে কোনো রকমে বাঁচানো গেল বটে, তবে গোটা রাস্তা কথা চল্‌লো বাঙালী সাহসী কিনা সেই সম্বন্ধে—

—অম্‌নি বুঝি তুমি কোমরে কাপড় জড়িয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লে?

—না গো না, আগে গল্পটাই শেষ হ'তে দাও—

—আচ্ছা, বেশ, তুমি বল, কিন্তু তাড়াতাড়ি—

—হুঁ! শোনো; ছেলেদের মধ্যে একটি শিখ ছাত্রও ছিল। সে বল্লে—বাঙালী ভীরু আর কাপুরুষ। আমরা কয়েকটি বাঙালী ছাত্র তার সে কথার প্রতিবাদ করলাম। সে বল্লে, এখন ত ইউরোপের যুদ্ধ চল্‌ছে আর গভর্ণমেণ্টও বাঙালী রেজিমেণ্ট গড়ে তুলেছে; তাতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যেতে পারো? তোমায় বল্‌ব কি সোণালী, কেউ তার সে কথার জবাব দিতে মাথা তুল্‌লে না! লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল! ছেলেটি হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। তখন আর আমি স্থির থাক্‌তে পারলুম না—

সোণালী চীৎকার করিয়া উঠিল, তুমি! খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া মাণিক কহিল, হাঁ সোণা, আমি যুদ্ধে যাবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে এসেছি—কেন না, তা' ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

খবরটাকে পাইয়া প্রথম সোণালীর মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না! কিন্তু দুই চোখের কোণে দেখা দিল অশ্রু!

মাণিক ডান হাত দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া কহিল, ছিঃ! কাঁদে না! তুমি ত' আমায় জানো! 'বাঙালী ভীরু', একথা শুনে কি করে আমি চুপ্ করে থাকি বলো ত!

—কিন্তু তাই বলে যুদ্ধে—? অতি করুণকণ্ঠে সোণালী জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার বেণীতে একটা টান দিয়া অশ্রুসিক্ত-চোখে হাসি ফুটাইবার জন্যে মাণিক উৎসাহের সহিত কহিল, যুদ্ধে গেলেই বুঝি লোকে আর ফেরে না?

—যাও তোমার মুখে আর আমি অলক্ষুণে কথা শুনতে চাইনে—বলিয়া রাগ করিয়া সোণালী চলিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু মাণিক তাহার হাত ধরিয়া থামাইল। কহিল, দু'তিনটে বছর বৈত নয়! আমাদের যে কী সম্পর্ক তা

গ্রামের কারোর অজানা নেই। আমি জানি তোমার বড় মামারও এতে সম্মতি আছে। আমি এ-ও জানি তুমি আমার জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করবে। নয় সোণালী?

পাছে কথা বলিতে গেলে বুকফাটা কান্না বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সোণালী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। নহিলে মাণিক যে তাহার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ কথা কি নূতন করিয়া তাহার কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে!

কথাটা চাপা থাকিল না, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল।

সোণালীর সহিত মাণিকের বিবাহ হউক, এই প্রস্তাব সোণালীর বড় মামা কুঞ্জবাবু বরাবরই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। আজ মাণিকের সহিত সোণালীর যে মধুর সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, সেজন্য কুঞ্জবাবুর অনুচ্চারিত সম্মতি অনেকাংশে দায়ী।

সব কথা শুনিয়া কুঞ্জবাবু গড়গড়ার নলে একটা টান দিয়া কহিলেন, যে অবস্থায় মাণিক যুদ্ধে যেতে রাজী হয়েছে, আমি হলে আমিও হয়ত তা-ই কর্ত্তুম। ছেলে বেলায় এমন কত গোঁয়ার্ত্তুমী করেছি। আজ সেগুলোকে হেসে উড়িয়ে দি বটে, কিন্তু সেই বয়েসে তার প্রয়োজন ছিল। বেশ ও ফিরে আসুক, ততদিনে সোণালীও ম্যাট্রিক পাশ করে পড়াশুনা করতে থাকুক—ভালোই হবে। এতে কারো দুঃখ করবার কিছু নেই।

মাণিকের যুদ্ধে যাওয়ার খবর পাইয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল কুঞ্জবাবুর ছোট ছেলে বিমান। বিমান গ্রামের ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর সুরু হওয়ার পর হইতে সে রামায়ণ-মহাভারত খুঁজিয়া ছাত্র মহলে প্রমাণ করিয়াছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও এই ধরণের যুদ্ধ হইত। ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া সেকালের যুদ্ধের বার্ত্তা শোনে আর অবাক্ হয়। বিমান নিজেই হয়ত যুদ্ধে চলিয়া যাইত, কিন্তু বয়েস কম বলিয়া তাহার নাকি কোনো আশা নাই! তাই বিমান যখন শুনিল, তাহাদেরই গ্রাম হইতে মাণিক যুদ্ধে যাইতেছে—সে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতেই সে সোণালীকে বীরাঙ্গনা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল এবং আগেকার দিনে যুদ্ধে যাত্রার সময় বীরেরা যে ভাবে সম্মানিত হইত—বিমান তাহার বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া মাণিকের যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে সেইরূপ এক বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করিয়া বসিল। শুধু তাহাই নহে, বাঙালী যে কাপুরুষ নহে—এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই মাণিক যুদ্ধে যাইতেছে, তাই গ্রামের ছেলেমহলে তাহার সম্মান আরো বাড়িয়া গেল। বিমান অন্দরমহলে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া কহিল, সোণালীদি, বীরাঙ্গনার মতো প্রকাশ্য সভায় যুদ্ধসাজে তুমি সাজিয়ে দেবে—এই প্রস্তাব গ্রামের ছেলের দল আমার কাছে করেছে; তুমি রাজী আছ ত? তারপর হঠাৎ অবাক্ হইয়া কহিল, একি! তোমার চোখে জল! এই ছিঁচ্‌কাঁদুনী ভাব গেল না বলেই ত' বাঙালী মেয়েরা বীর-প্রসবিনী হয় না! এমন করে যদি তুমি চোখের জল ফেল্‌বে, তবে তোমায় আমি সভায় যেতেই দেবো না! কি রকম 'প্যাণ্ডেল' তৈরী করেছি যদি তুমি একবার দেখ্‌তে!

বিমান আরো অনেক কিছু হয়ত অনর্গল বলিয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ চাহিয়া দেখিল কোন ফাঁকে সোণালীদি পালাইয়াছে! বিষম নিরুৎসাহ হইয়া মাথা নাড়িয়া বিমান আপন মনেই কহিল—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা—
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না—"

তারপর দ্রুতপদে অন্দর ছাড়িয়া প্যাণ্ডেলের দিকে রওনা হইল, কেননা এই দুইটী লাইন কবিতা ভাল করিয়া লিখিয়া সম্বর্দ্ধনার সময় প্যাণ্ডেলে ঝুলাইয়া দিতে হইবে; তাহাতে যদি সোণালীদির মতো ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়েদের চোখ ফোটে!

ঘটা করিয়া আল্‌পনা দেওয়া হইল, বরণডালা সাজানো হইল এবং ফুলের মালা গাঁথা হইল কিন্তু বিবাহের জন্যে নয়—মরণের মুখে ঠেলিয়া পাঠাইতে।

সোণালীর ভাই-বোনেরা দল বাঁধিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাজে লাগিয়া গেল।

সোণালী শুধু ভাবিতে লাগিল, এই মারণ-যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ভাগ্যদেবতা কেন মিছামিছি তাহার সহিত কৌতুক করিতেছে? যতবার আঁচল দিয়া সবার অলক্ষ্যে মোছে—দুই চোখ আবার জলে ভরিয়া যায়!

যাত্রার দিন সেই জনতা ও জয়োল্লাসের মধ্যে ভীরু কপোতীর স্থান কোথায়?

মাণিক এক ফাঁকে লুকাইয়া আসিয়া সোণালীর সহিত দেখা করিল।

সোণালী স্থির সমুদ্রের মতো তার চোখ দুটি তুলিয়া কহিল, এসেছ ভালই হল—নইলে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে পায়ের ধূলো নিতে আমাকেই আবার ছুটতে হত।

মাণিকের মুখেও আজ যেন কথা সরে না। সোণালী কহিল, তোমাকে কী আর আমি যাবার দিন দেবো? এক বছর ধরে তোমার জন্যে এই রোমালখানি শেলাই করেছিলাম। কামনা ছিল ফুলশয্যার রাত্তিরে তোমার হাতে এই আমার সামান্য উপহার তুলে দেবো …; শুভ রাত্রি যখন জীবনে এলো না, আজই নাও …, ওখানা দেখলে হয়ত আমার কথা তোমার মনে পড়বে।

মাণিক বলিল, চোখের জল ফেলো না সোণা, যেখানেই থাকি … যত দূরেই থাকি … আমি তোমারই, আবার তোমার কাছেই ফিরে আস্‌বো—

সোণালী নিজেকে কোনো রকমে সম্বরণ করিয়া লইয়া আপন মনে কহিল, না, আজকের দিনে সবাই যখন হাস্‌ছে, আমি পোড়ারমুখী আর চোখের জল ফেলে তার অকল্যাণ করবো না—

ষ্টেসন-যাত্রী-নৌকা পতাকা উড়াইয়া ফুলের মালা সাজাইয়া, পাল তুলিয়া দিল!

যথাসময়ে করাচী বন্দর হইতে লিখিত চিঠিতে জানা গেল যে ৪৯ "বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট" আরব সাগরের বুকে জাহাজ ভাসাইয়াছে।

কিন্তু গ্রামের ভীরু মেয়ে সোণালী, তার দৃষ্টি কি অতদূরে পৌঁছিবে?

ইতিমধ্যে সোণালী প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইল এবং কলেজে পড়িবে কিনা, সে সম্পর্কে কুঞ্জ-বাবুর সহিত তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। এ বিষয়ে কুঞ্জবাবুর উৎসাহ অসীম। কহিলেন, পড়বি না কিরে? তুই যদি বৃত্তি না-ও পেতিস্, তবু তোকে আমি পড়াতাম। মাণিকের কাছে নইলে আমি মুখ দেখাবো কি করে?

সুতরাং কলেজে পড়াই স্থির হইল এবং সোণালী বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া তৈরী হইবে—হঠাৎ একদিন এমন এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে সোণালী একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া কুঞ্জবাবু পুকুরে মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া সেখান হইতে আর তিনি উঠিতে পারিলেন না।

লোকে যাহাকে বলে পর্ব্বতের আড়ালে থাকা—সোণালী, কুঞ্জবাবুর স্নেহচ্ছায়াতলে ঠিক সেই ভাবেই ছিল। পাহাড় যখন অকস্মাৎ ভাঙিয়া পড়িল, তাহাকে একেবারে খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইতে হইল—আশ্রয় ত' দূরস্থান সামান্য একটু আবরণও রহিল না।

মামীমা এইবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কহিলেন, এর পর আমার পেটের ছেলেমেয়েদেরই দু' মুঠো করে ভাত দিতে পারবো না; তুমি বাছা ত' এখন ছোটটি নও, মাণিক ফিরে আস্‌বে কিনা তাই বা কে বল্‌তে পারে!

যে পাহাড়ের আড়ালে সে ছিল—মনে হইল সেই পাহাড়ই বুঝি তার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল।

প্রথমটা কি যে সে করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

হঠাৎ কোনো একটা বাঙলা দৈনিকে 'শিক্ষয়িত্রী চাই' এই শিরোনামায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে যেন হাতের কাছে স্বর্গ খুঁজিয়া পাইল এবং অনেকখানি ভরসা বুকে আনিয়া আবেদন জানাইয়া দিল।

উত্তর আসিতে খুব বেশী বিলম্ব হইল না। স্কুলের সেক্রেটারী টেলিগ্রাম - মনি - অর্ডারে টাকা পাঠাইয়াছেন

এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে গিয়া কাজে যোগদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

নূতন স্কুল, তাই তাগিদ বেশী। সোনালীরও বিশেষ বিলম্ব করিবার হেতু ছিল না। তা' ছাড়া সে ত' পূর্ব্ব হইতে পড়িতে যাইবার জন্মে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কিন্তু কুঞ্জবাবুর অবর্ত্তমানে সে-দিনের যাওয়া ও আজিকার যাওয়ায় কত তফাৎ!

যে দিন মাণিক চলিয়া যায়, সে দিনও সে গোপনে চোখ মুছিয়াছে, কাঁদে নাই; আজ তাহাকেও যখন বিদায় নিতে হইল—সে নিঃশব্দে আসিয়া নৌকায় উঠিল, চোখের জল ফেলিয়া নিজেকে সে কিছুতেই খাটো করিল না।

স্থানীয় জমিদার নিজের মায়ের নামে এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

স্কুল-সংলগ্ন নব-নির্ম্মিত গৃহে সোণালীর থাকিবার ব্যবস্থা হইল। জমিদার বাবু তাহার জন্মে একজন ঝি ঠিক করিয়া দিলেন। পাশের বাড়ীতে থাকিবেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

কিন্তু প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এখনো স্থির হয় নাই; সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জমীদারের মনোমত কোনো আবেদন-পত্র আসে নাই বলিয়া এখনো কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নাই।

নূতন স্কুল, একা সোণালীকে সব দিক্ সাম্‌লাইতে হইতেছে—নূতন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আসিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়!

হঠাৎ জমিদারবাবু আসিয়া বলিলেন, তাঁহার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে সম্প্রতি এম্, এ, পাশ করিয়াছে, লেখাপড়ায় খুব ভাল—কিন্তু অত্যন্ত গরীব। সে জমিদারের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে কিছু লইতে অনিচ্ছুক—কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে চাকরী করিতে সে রাজী আছে—তাহাকেই তিনি নিয়োগ-পত্র দিতে চান।

জমিদারের ভাগিনেয়! স্কুল কমিটীর ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে! তাহার নামে যথারীতি নিয়োগ-পত্র চলিয়া গেল।

সে দিন স্কুলে যাওয়া মাত্র জমিদারবাবু নূতন প্রধান শিক্ষক সুবিমলবাবুর সহিত সোণালীর পরিচয় করাইয়া দিলেন।

জমিদারবাবু মিথ্যা কথা বলেন নাই; সুবিমলবাবু সত্যই বিদ্বান্, এমন কি গ্রন্থকীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাহিত্যের কথা সুরু হইলে তিনি সব কথা ভুলিয়া যান।

জমিদারবাবু সাহিত্যের প্রসঙ্গ থামাইয়া দিয়া কহিলেন, তা হলে সুবিমল, তুমি আমার ওখানেই থাক্‌ছ ত?

মাথা নাড়িয়া সুবিমল কহিল, না না, তা কেন? হেড মাষ্টারের জন্মে যে বাড়ী তৈরী হয়েছে, আমি ওখানেই থাক্‌ব। আমার খাওয়াদাওয়ার কোনো সময় ঠিক নেই, তা ছাড়া অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে লেখাপড়া করি—আপনার ওখানে থাক্‌লে আপনারও অসুবিধে, আমারও অসুবিধে—

এর পর জমিদারবাবু আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কেন না সুবিমলের আত্মাভিমান অনেক বেশী। সে কোনো মতেই বিনা কারণে কোনো সাহায্য লইবে না।

কাজেই জিনিষপত্র লইয়া সুবিমলবাবু সোণালীর পাশের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

জিনিষপত্রাদি বলিতে শুধু বই আর বই। ভদ্রলোক এত বইও সংগ্রহ করিয়াছেন, দেখিয়া সত্যই বিস্ময় বোধ হয়।

চাকরকে দিয়া সেই সব রাশিকৃত বই ঝাড়া, মোছা, রদ্দুরে দেওয়া আবার তুলিয়া নিয়া ঘর সাজানো…

সুবিমলবাবু এই খেলাঘর লইয়া বেশ আছেন। সারা দিন কাটে বই গোছানো ব্যাপারে আর রাত্তির কাটে সেই সব বই পড়ায়।

বাস্তবিক ভদ্রলোকের চোখে কি ঘুম নাই? যত রাত্তিরেই সোণালী বাহিরে আসুক না কেন, দেখে সুবিমলবাবুর ঘরে আলো জলিতেছে।

এমন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সোণালী জীবনে কখনো দেখে নাই!

সে দেখে আর অবাক্ হয়!

সে-দিন ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে সোণালী পাশের ঘরে অত্যন্ত গোলমাল শুনিয়া পড়ানো বন্ধ করিল।

তবে কি সুবিমলবাবু ক্লাশ নিতে আসেন নাই? সোণালী খানিকটা কান পাতিয়া শুনিল, গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে।

তখন সে টেবিল ছাড়িয়া সেই ঘরে গিয়া ঢুকিল।

আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সুবিমলবাবু টেবিলের ওপর পা তুলিয়া দিয়া মহানন্দে একখানি ইংরাজী সাহিত্যের গ্রন্থ পড়িতেছেন, কিন্তু চারিদিকে যে ছাত্রগণের তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে সে দিকে তাঁহার বিন্দু মাত্রও খেয়াল নাই।

সোণালীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সকলে ভয়ে ভয়ে ছুটিয়া গিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিল। হঠাৎ এতটা নিস্তব্ধতার কারণ কি দেখিবার জন্য বই হইতে মুখ তুলিতেই সুবিমলবাবু দেখিতে পাইলেন, সোণালী দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া সুবিমলবাবু তাড়াতাড়ি ছাত্রিদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তোমরা যে যার বই খুলে পড়—

সোণালী মুখ টিপিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। এত ভাল মানুষকে কি আর বলা যায়!

আর তাহা ছাড়া বলার অধিকারীও ত' সে নয়, বরঞ্চ সুবিমলবাবুই তাহার উপরওয়ালা।

খুব বেশীক্ষণ নয়, মিনিট পনেরো বাদেই পাশের ঘরের কোলাহল আবার সপ্তমে উঠিল।

সোণালী আপন মনেই কহিল, too good বেচারী!

এখানে আসিয়া সোণালী মাণিকের মাত্র একখানা চিঠি পাইয়াছে। চিঠিখানা আসিয়াছে—মেসোপোটোমিয়া হইতে। খুব বেশী কিছু লেখা নাই, সে ভালো আছে··· যুদ্ধের আরো সন্নিকটে যাইতেছে ···!

কবে যে এই মহাসমরের শেষ হইবে, কবে যে মাণিক ঘরে ফিরিবে—সোণালীর ভাগ্যদেবতা তাহা তাহাকে জানাইবে না! সে নিষ্ঠুর-দেবতা ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী সন্নিবেশ করিয়া তেমনি মূক! তেমনি পাষাণ!

শূন্য-গৃহে, শূন্য-শয্যায় সোণালীর বালিশ ভিজিয়া যায়, পরদিন প্রভাতের অরুণ-কিরণে তাহা আবার শুকায়!

ইতিমধ্যে দীর্ঘ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অপরিচিত পুরুষ বলিয়া সুবিমলবাবু সম্পর্কে সোণালীর প্রথম প্রথম যে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল—তাহা ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে-লোক শিশুর মতোই সরল এবং নারী সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, তাহার ব্যাপারে সঙ্কোচ আপনা হইতেই কুয়াসার মতো কাটিয়া যায়!

সুবিমল বাবুর সাহায্য পাইয়া সোণালী নূতন করিয়া পড়াশুনা সুরু করিয়াছে। তাহাতে তাহার কত উৎসাহ —কত আন্তরিকতা। কাহাকেও পড়াইতে এবং শিখাইতে পারিলে সুবিমল যেন বাঁচিয়া যায়। তাহার মস্তিষ্কে এত বিদ্যা জমিয়াছে যে সারা জীবন দুই হাতে বিলাইলেও ফুরাইবার আশঙ্কা নাই!

সেদিন হঠাৎ রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে সুবিমলের চাকর আসিয়া সোণালীকে কহিল, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

সোণালী সত্যই বিস্মিত হইল। এত রাত্রে যে তাঁহার সোণালীকে ডাকা উচিত নয়—সে খেয়াল পর্য্যন্ত তাহার নাই।

সোণালী একটু ইতস্ততঃ করিল। তারপর ভাবিল, সুবিমলের কাছে যাওয়াও যা একটি শিশুর কাছে যাওয়াও তাই। গায়ে একটি র‍্যাপার জড়াইয়া সে চাকরের সহিত তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুবিমল তাহাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, দেখুন, একা একা হেসে মজা হয় না—তাই আপনাকে ডেকে পাঠালুম!

সোণালী বিস্মিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবিমল কহিল, ও! আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি বুঝি? এই দেখুন, "জেরমূকে জেরমের" একখানা নতুন বই

আজকের ডাকেই এসেছে—; ভারী মজা! বসুন, খানিকটা আপনাকে পড়ে শোনাই—

সোণালী বিব্রত হইল। কহিল, এত রাত্রে! উৎসাহের সঙ্গে সুবিমল কহিল, রাত আর এমন কি বেশী? হোষ্টেলে থাকৃতে আমি ত' রাতকে রাত বই পড়েই কাটিয়ে দিতুম —কিন্তু এটা যে হোষ্টেল নয়, এবং সোণালী যে নারী একথা তাহাকে কে বুঝাইবে?

সোণালী জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

এইবার বোধ করি সুবিমল আত্মস্থ হইল; কহিল, তাইত? আজ যে খাওয়াই হয় নি!

সোণালী জিজ্ঞাসা করিল, চাকর বুঝি ভাত ঢেকে রেখে দিয়েছে?

সুবিমল কি যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, তারপর কহিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে হয়েছে, চাকরটা সন্ধ্যে বেলা এসে আমায় জিজ্ঞেস্ করলে রান্না করবে নাকি! আমি তখন এই বইখানা নিয়ে বুঝ্লেন—ভারী জমে গেছি—; বলে দিলুম আজ আর কিছু খাবো টাবো না। এখন কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে দিব্যি ক্ষিদে পেয়েছে!

সোণালী হাসি গোপন করিয়া কহিল, আশ্চর্য্য লোক ত' আপনি! দাঁড়ান চাকরটাকে ডাকৃছি—

সে তখন মুড়ি মুড়কী খাইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সোণালীর ডাকে উঠিয়া বসিল। সোণালী বলিল, শিগ্‌গীর উনুনটা জালিয়ে দে—আমি বাবুর জন্যে ভাতে-ভাত রান্না করে দি—

সোণালীর পটু-হাতে রান্না করিতে বেশী বিলম্ব হইল না!

ব্যাপার দেখিয়া সুবিমল কহিল, একি! আপনি কেন কষ্ট করে আবার রান্না করতে গেলেন? কি মুস্কিল বলুন ত!

সোণালী কহিল ব্যাটা ছেলে—রাত-উপোসী থাকৃবে এ কথা শুনে কোনো বাঙালী মেয়ে কি রান্না না করে থাকৃতে পারে?

মাথা নাড়িয়া সুবিমল কহিল, যাক্, তা হ'লে লাভ হল আমারই। ডেকে আন্‌লাম আপনাকে বই শোনাতে, এখানে এনে দিব্যি খাটিয়ে নিলাম—হা—হা—হা।

সেদিন রাত্রে ঘুম আসিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সোণালীর মনে বারে বারে শুধু এই কথাই উদিত হইতে লাগিল যে, গত এক বৎসরের মধ্যে সে মাণিকের নিকট হইতে কোনো চিঠি পায় নাই! আর একজনের কথা মনে হইয়া তাহার চোখ কেবলি জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি সোণালীর পরলোকগত বড় মামা। কুঞ্জবাবু প্রায়ই বলিতেন, মেয়েদের কি স্বাধীন হবার যো আছে রে? শাস্ত্রে বলেছে, বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অভিভাবকতায় মেয়েদের থাকৃতে হবে। এ কথায় বোনেরা দল বাঁধিয়া কুঞ্জবাবুর সহিত তর্ক করিয়াছে, ঝগড়া করিয়াছে—কিন্তু কোনো দিনই শাস্ত্রের কথা মাথা পাতিয়া মানিয়া লয় নাই।

আজ কি সোণালীকে সেই শাস্ত্রের বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে? সে কি মাণিকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে?

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সোণালীর চোখে ঘুম আসিল না; শেষ রাত্রির শীতল হাওয়ায় তাহার বিনিদ্র আঁখি ধীরে ধীরে কখন মুদিয়া গেল সে নিজেই জানিতে পারে নাই।

সুবিমল সম্পর্কে সোণালীর যখন সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, তখন অলক্ষ্যে কাণাকাণি সুরু হইল গ্রামবাসিগণের মধ্যে।

ইতিমধ্যে একদিন স্কুল-কমিটির সভ্যগণ জমিদারের খাস্ কামরায় উপস্থিত হইয়া সুবিমল ও সোণালীর এই যথেচ্ছ মেলামেশায় আপত্তি জানাইলেন এবং সেদিন রজনী যোগে গিয়া রন্ধন করিয়া খাওয়াইবার মুখরোচক কাহিনীটার বর্ণনা দিতেও ভুলিলেন না।

জমিদার বাবু গল্পটাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি সুবিমল এবং সোণালীকে ভালো করিয়াই জানেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাহাদের সম্পর্কে কোনোরূপ গুজব বিশ্বাস করিতে তিনি সম্মত নহেন।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা সোণালী রান্না চাপাইতে যাইবে, এমন সময়ে সুবিমলের চাকর আসিয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, দিদিমণি, দাদাবাবুর চালটাও আপনার সঙ্গে নেবেন—

সুবিমলের কোনো আচরণেই বিস্মিত হইবার কিছু নাই, তবু জিজ্ঞাসু হইয়া কহিল, কেন রে?

চাকরটি কহিল, বাবু, দুদিন হল না খেয়ে আছেন দিদিমণি—

—না খেয়ে আছেন? কেন রে? চাকরটি কহিল, আপনি ত' সবই জানেন দিদিমণি, দাদাবাবু কেমন আপন-ভোলা মানুষ! স্কুল থেকে আস্‌বার পথে মাইনের টাকা কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন! দুদিন অসুখ করেছে বলে' কাটিয়ে দিয়েছেন—আজই ত' আমি সব জান্‌তে পারলুম!

একান্ত পাশে থাকিয়াও ভদ্রলোক দুইদিন অনাহারে আছেন শুনিয়া সোণালীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। কোনো রকমে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া, চোখের জল গোপন করিয়া চাকরটাকে কহিল, আচ্ছা তুই যা—আমি খাবার নিয়ে যাবো 'খন—

ইচ্ছা করিয়াই সোণালী রান্নার আয়োজনটা একটু বেশী করিয়াছিল। পদের সংখ্যা দেখিয়া সুবিমল কহিল, আপনি কি দু' দিনের অনাহারের ক্ষতিপূরণ করাতে এসেছেন নাকি?

সোণালী মৃদু হাস্যে কহিল, কিচ্ছু ফেল্‌তে পারবেন না কিন্তু, আমি সব নিজে হাতে রান্না করেছি—

সুবিমল সবে প্রথম গ্রাস মুখে দিতে যাইবে, এমন সময়ে স্কুল কমিটির সভ্যগণ স্বয়ং জমিদার বাবুকে লইয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ইহাদের তরফ হইতে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া বলিবার কিছুই ছিল না। সোণালী ত্রস্তে উঠিয়া গিয়া ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া মাথায় আঁচলটা তুলিয়া দিল। দেখা গেল, জমিদার বাবু বাদে আর সবাই পরস্পরের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতেছেন!

কিন্তু ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন জমিদার বাবু স্বয়ং। কহিলেন, প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিনি! কিন্তু আর আমার সংশয় নেই; নষ্টা মেয়েমানুষ দিয়ে আমাদের স্কুলের কাজ চল্‌বে না—

এই কথা শুনিয়া সুবিমল লাফাইয়া উঠিল, আগাইয়া আসিয়া কহিল, আপনি কি বল্‌ছেন মামা বাবু, আপনি যা মনে করেছেন সব ভুল। আমিই ওঁর কাছে খাবার চেয়ে পাঠিয়েছিলুম—

—খাবার চেয়ে পাঠিয়েছিলে! জমিদার বাবু আবার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন!—কেন, আমি কি মরে গেছি নাকি? আমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্‌তে পার নি? নষ্টা মেয়ের রান্না বড় মিষ্টি নয়?

সুবিমল কহিল, আপনি মিথ্যে একজন নির্দ্দোষী নারীর মাথায় কলঙ্কের বোঝা তুলে দিচ্ছেন!

মিথ্যে! জমিদার বাবুর চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল! বেশ! কলঙ্ক আমি দেবো না; তুমিই ওকে ইচ্ছে করলে বাঁচাতে পারো!

—আমি? বিস্মিত হইয়া সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ, তুমি! আমার এলাকায় অন্যায় আমি কিছু হতে দেবো না! ওকে তুমি বিয়ে করতে রাজী আছ?

বালকের মতো লাফাইয়া উঠিয়া, সুবিমল কহিল, নিশ্চয়; তাতে যদি উনি কলঙ্ক-মুক্ত হতে পারেন—আজ রাত্রেই আমি ওঁকে বিয়ে করতে সম্মত আছি—

হঠাৎ এ কি কথা সুবিমলের মুখে! সোণালী না পারিল প্রতিবাদ করিতে, না পারিল তাহার মতামত জানাইতে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিবারই বা কি আছে? আর কি প্রতিবাদই বা সে করিবে? তাহার নারী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে সুবিমল—তাহাকে সে কোন্ মুখে প্রত্যাখ্যান করিবে? আর এ প্রত্যাখ্যানে সে-ই যে শুধু নিগৃহীতা হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুবিমলের উঁচু মাথাও যে হেঁট হইবে! না, তাহা সে কোনো মতেই পারিবে না!

আর মাণিক? তাহার উপরে অভিমান করিবার কি কোন কারণই নাই? আর অভিমান করিবে সে কাহার উপর? জীবিতের উপর অভিমান করা চলে—কিন্তু

এক বৎসর মে তাহার কোন সংবাদই লয় নাই—তাদের ভরসায়—নারী সে, কি করিতে পারে ?

জমিদারবাবু তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন—এবং ঘটা করিয়াই তাঁহার ভাগিনেয়ের বিবাহ দিলেন। কুৎসার মুখ ঐখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু বিবাহের পর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল সুবিমল। সে কহিল, নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে যাহা করা কর্ত্তব্য—সে তাহা করিয়াছে, কিন্তু যে স্কুল-কমিটীতে এত হীনচেতা লোকের বাস—সেখানে সে স্ত্রী লইয়া কোনো মতেই আর থাকিবে না। সে অন্যত্র চাকরী জুটাইয়া লইবে। জমিদারবাবুর শত অনুরোধেও সে তাহার মত পরিবর্ত্তন করিল না।

অন্তরের অপরিসীম লজ্জায় সোণালীও মরমে মরিয়াছিল, সে-ও এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচে। তাহার বিবাহিত জীবনের সুখের নীড় যদি সত্যই বাঁধিতে হয়, তবে এখানে নয়—অন্য কোথায়ও!

বিবাহের পর আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মাতুল-জমিদারের গ্রাম ত্যাগ করিবার পর সুবিমল স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া নিজেই এক স্কুল সুরু করিয়াছে, কিন্তু সেখানে সোণালীর কোনো স্থান নাই; সোণালী আজ ঘরের লক্ষ্মী, গৃহের বধূ।

এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া সোণালীর কেবলই মনে হইয়াছে যে, স্বামী তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছ হইতে সে কিছু পায়ও নাই, দাবীও জানায় নাই!

স্বামীর দিবা-নিশি আজিও তেমনি গ্রন্থের স্তূপের মধ্যেই কাটে, তাহাতেই সে আনন্দ পায় প্রচুর। একদিন যাহার সরলতার কথা ভাবিয়া মনে অনুকম্পা জাগিত, আজিও সে সোণালীর মনের কোণে এতটুকু স্থান অধিকার করিতে পারে নাই! নিশীথ রাত্রে যখন ঘুম ভাঙিয়া যায় একটি অনাগত শিশুর জন্যে সোণালীর অন্তরাত্মা হাহাকার করিয়া ওঠে, খালি কোলের মাঝখানে কাহাকে যেন জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। এমনি ভাবেই কি তাহাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে?

আজি প্রত্যূষে অকস্মাৎ ওই অতি সামান্য রুমালখানি সোণালীর মনে যেন কত যুগের ভুলিয়া-যাওয়া দক্ষিণ সমীরণকে ডাকিয়া আনিল।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া মাণিক তাহারই অন্বেষণে আসিয়াছিল; রুগ্নদেহ, রুক্ষকেশ, ধূলি-ধূসরিত চরণযুগল, কিন্তু তবু মুখে কি একাগ্রতা। তার প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিয়াছে। সে আসিয়া দেখিয়া গেল—তাহাদের উভয়ের মধ্যে আজ সাগরের ব্যবধান। তাই সে নিঃশব্দে আসিয়া নিঃশব্দেই চলিয়া গিয়াছে!

সোণালী প্রবল উত্তেজনায় দুই হাত দিয়া প্রাণপণে তাহার বুক চাপিয়া ধরিল। কাণ পাতিয়া শুনিল,—বুকেই তাহার পদধ্বনি!!

ভালোবাসি কী ?

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তোমারে ভালোবাসি মিথ্যা কথা যে!
ভালোবাসি তব কায়া;
যদি না যৌবন তৃষ্ণা জাগাইত
তুমি যে হ'য়ে যেতে ছায়া

বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কথা

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ রায়

বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করিয়া যে কয়খানি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে, তাহার প্রধান অংশ কল্পনায় অনুরঞ্জিত। অদ্যাবধি সঠিক ইতিহাস ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও প্রচারিত না হওয়ায়, প্রতাপ-জীবনের কতিপয় ঘটনা সম্পর্কে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অধিক মাত্রায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। যে বীরকেশরীর শৌর্য্য-মণ্ডিত পুণ্যগাথা বাংলার প্রতিটি ধূলিকণার সহিত নিবিড়তমভাবে সংশ্লিষ্ট—বিজড়িত, যাঁহার কীর্ত্তি-গরিমায় বাংলা আজ গরবিণী, যাঁহার বীর্য্য-মহিমায় বাংলা আজ মহিমময়ী—সেই বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের উজ্জ্বলতম জীবনেতিহাস আজও পর্য্যন্ত কোনো বঙ্গবাসী লেখক সঠিকভাবে গ্রথিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন নাই। বাংলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে আজও সকলে শোচনীয়ভাবে উদাসীন। এ উদাসীনতা প্রত্যেকটি বাঙালীর পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্কের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, "প্রতাপ-জীবনের যে কয়টি প্রধান ঘটনা সম্পর্কে সমগ্র দেশের ভ্রান্ত ধারণা আজিও বদ্ধমূল" রহিয়াছে, তাহা নিরসন মানসে বক্ষ্যমান্ প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক ঐতিহ্য পরিবেশন করিলাম।

বংশকথা, যশোরের উৎপত্তি ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য

সর্বাদৌ রাজা বিরাট্ গুহের দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ কুলীন রামচন্দ্র গুহ যশোর রাজবংশের আদি এবং বীজী। রামচন্দ্র গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজত্বকালে ফরিদপুর জেলার চন্দনা গ্রাম হইতে উঠিয়া প্রথমে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ, পরে সপ্তগ্রামের পাটমহলে আসিয়া বাস করেন, এবং নবাব-সরকারে কানুনগো পদে নিয়োজিত হন। ঐ সময় তিনি "নিয়োগী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গুহের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভবানন্দের শ্রীহরি এবং ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কর্‌রাণী গৌড়ের মসনদে উপবিষ্ট হইলে ভবানন্দ প্রমুখ ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভবানন্দ কিছুদিন পরে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্ব ও "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। সুলেমান্ কর্‌রাণীর বায়জিদ ও দায়ুদ নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ১৫৭৩ অব্দে দায়ুদ নবাব হইয়া শ্রীহরিকে "রাজা বিক্রমাদিত্য" এবং জানকীবল্লভকে "রাজা বসন্ত রায়" উপাধি প্রদান করিয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত বিক্রমাদিত্যকে প্রধান মন্ত্রী এবং বসন্ত রায়কে রাজস্ব বিভাগের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিশ্ব-বিশ্রুত বঙ্গবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাংলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ মোগল-সংঘর্ষের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়কে তাঁহার যাবতীয় বিত্তসম্পদ্ এবং দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন-সংলগ্ন 'চাঁদ-খাঁ' চকের সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা ভ্রাতৃদ্বয় দায়ুদের শেষ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কোন মতে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, ধন-সম্ভার ও সনন্দসহ চাঁদ খাঁর জায়গীরে আসিয়া বনজঙ্গল কাটাইয়া যশোর নগরের পত্তন করেন। পরে প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোরেশ্বরী দেবী আবিষ্কৃতা হইলে, উক্ত দেবীর নামানুসারে যশোর নগর ক্রমবর্দ্ধিতায়তনে বিশাল যশোর রাজ্যে পরিণত হয়। যশোর-রাজ্য এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, তাহা অতিক্রম করিতে মাসাধিক কাল ব্যয়িত হইত। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ তদানীন্তন যশোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদ্ভিন্ন, হিজ্‌লী জয় করার পর উড়িষ্যা পর্য্যন্ত এবং বিষ্ণুপুর, আরাকান্ প্রভৃতি প্রতাপের পদানত হয়। সমগ্র যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল ধূমঘাট। উহা অধুনা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তঃপাতী শ্যামনগর থানার

এলেকায় অবস্থিত। এখন যে স্থানে যশোরেশ্বরী দেবী-পীঠ, তাহাকে যশোরেশ্বরীপুর বা সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরীপুর বলিয়া থাকে। উহা প্রাচীন রাজধানী ধূমঘাটেরই একাংশ,—যেমন কলিকাতার ভিতর কালীঘাট।

অনেকেরই ধারণা আছে যে, প্রতাপাদিত্যের "যশোর" যশোহর জেলায়; কিন্তু আদৌ তাহা নহে। প্রতাপের "যশোর" যশোহর নহে।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়ের আমলের প্রাচীন যশোর নগর যেস্থানে ছিল, তাহার উত্তরাংশের নাম কালক্রমে বসন্ত রায়ের নামানুযায়ী বসন্তপুর হয়। যে স্থানে দুর্গ ও মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাকে এখন গড় মুকুন্দপুর বা শুধু মুকুন্দপুর বলে।

প্রতাপের রাজত্ব খ্রীষ্টীয় ১৫৮৪ হইতে আরম্ভ। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৫০৮ শকাব্দ, ২১-এ বৈশাখী পূর্ণিমা) তাঁহার প্রথম রাজ্যাভিষেক হয়। ঐ একই বৎসরে দেবী যশোরেশ্বরী আবিষ্কৃতা হন এবং তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ ও কুমার উদয়াদিত্যের জন্ম হয়। উক্ত দিবস আজিও যশোর রাজবংশীয়দের নিকট বিশেষভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতাপের দ্বিতীয় অভিষেক, স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিরাট্ কল্পতরু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণার পর স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা ছিল ত্রিকোণাকার। মুদ্রার সম্মুখভাগে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল—"শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য" এবং পশ্চাদ্ভাগে ফারসী ভাষায় ছিল—"বজৎ সিক্কা বছিমো জরবে বাঙ্গাল্ মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দাল"। এতদ্ব্যতীত প্রতাপ রাজকীয় পত্রাদিতে ব্যবহারের জন্য ডিম্বাকার মৃন্ময় মুদ্রার প্রচার করেন। বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে তাহা রক্ষিত হইতেছে।

চ্যাণ্ডিকান্

জেস্যুইট্ পাদরিগণ মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে "The last king of Sagar Island" বা চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অনেকে এই কথায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং পড়িয়াছেনও। হুগলী নদীর পূর্ব্বাংশ, অর্থাৎ যশোর রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের নামই চ্যাণ্ডিকান্। সাগর দ্বীপ, ধূমঘাট সকল কিছুই চ্যাণ্ডিকানের (চাঁদ খাঁ চকের) এবং সমগ্র চ্যাণ্ডিকান্ যশোর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

সুবেদার আজিম খাঁর সহিত যুদ্ধ

রাজ্যগঠন সম্পর্কীয় কার্য্যে মহামাত্য শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান ও রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তখন খানখানান আজিম খাঁন্ বাংলার সুবেদার এবং শের আফগান (নূরজাহানের পূর্ব্ব স্বামী) তদধীনে বর্দ্ধমানের জায়গীরদার। শঙ্কর রাজ-নৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শের আফগান কর্ত্তৃক বন্দী হইলে, প্রতাপাদিত্য কৌশলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনেন। ফলে আধুনিক বসিরহাটের সন্নিকট সংগ্রামপুরে (পরবর্ত্তী সময়ের নাম) শের আফগানের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ হয়। শের আফগান পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন এবং আজিম খাঁর শরণ লন। আজিম খাঁ প্রথমে সেখ ইব্রাহিমকে পাঠান। তিনিও মাত্‌লার যুদ্ধে পরাজিত হইলে বাধ্য হইয়া আজিম খাঁকে অভিযান করিতে হইয়াছিল। চাঁচ্‌ড়া-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায় এই যুদ্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। শেষে উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ

খ্রীষ্টীয় ১৫৯১ অব্দে বাংলা ও বিহারের সামন্তরাজগণের সহায়তায় মানসিংহ বিদ্রোহী পাঠান দমনার্থে উড়িষ্যায় যান। ঐ সময়ে প্রতাপও তাঁহাকে সাহায্য করেন (১৫৯২)। মোগল পক্ষের জয়লাভ ঘটে। প্রতাপ তৎপরে পুরী তীর্থে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য পরাক্রমশালী হিন্দু রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া বিখ্যাত গোবিন্দদেব ও রাধিকা বিগ্রহ এবং উৎকলেশ্বর শিব লইয়া আসেন (১৫৯৩ অব্দের প্রথম)। মহারাজ বসন্ত রায় কর্ত্তৃক কপোতাক্ষী নদী তীরে এক স্থান "বেদকাশী" নামকরণ

করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গ এবং রাজধানী ধূমঘাটের তিন মাইল উত্তরে যমুনা-ইছামতীর পশ্চিম তীরে এক স্থানের নাম "গোপালপুর" রাখিয়া উক্ত বিগ্রহদ্বয় সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উৎকলেশ্বর শিবের কোন অস্তিত্ব বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু বেদকাশীর বিপুল ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোপালপুরের গোবিন্দ-মন্দির বিরাট্ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আজিও বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের এবং কারুশিল্পের উজ্জ্বলতম গরিমা প্রচার করিতেছে। শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ বর্ত্তমানে আমাদের (যশোর রাজবংশীয়দের) নিজ বাটীতে রক্ষিত ও নিত্য পূজিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলোৎসব ক্রিয়া সমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বসন্ত রায়

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভ্রাতৃবর বসন্ত রায়ই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান চরিত্র। কিন্তু প্রতাপ পিতৃব্যের প্রতি বিবিধ পারিপার্শ্বিক ও সাংসারিক কারণে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরম স্নেহশীল মহাপ্রাণ পিতৃব্যের অন্তর তিনি কোন দিন বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। উজ্জ্বল রাজ-চরিত্রের এতবড় মারাত্মক ভুল অন্যত্র কোথাও পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। এই ভুলই শেষে বীভৎস আকার ধারণ করিয়া এক বিষময় ফল প্রসব করিয়াছিল।

প্রতাপের যশোর রাজ্যের আপন দশ আনা অংশের মধ্যে চকশ্রী নামক একটি স্থান পিতৃব্যের অংশে (ছয় আনা অংশের মধ্যে) পড়িয়াছিল। কিন্তু চকশ্রীর উপর মহারাজ বসন্ত রায়ের প্রকৃতপক্ষে কোন হাত ছিল না। কারণ জ্যেষ্ঠ রাজা বিক্রমাদিত্য তাহা তাঁহার (বসন্ত রায়ের) শ্বশুরকে যৌতুক দিয়াছিলেন। চকশ্রীর মূল্যবান্ পরিস্থিতি-হেতু দুর্গ নির্ম্মাণাভিপ্রায়ে প্রতাপ অন্য স্থানের বিনিময়ে তাহা পিতৃব্যের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্যালকবর্গের অসম্মতি-হেতু তাহা প্রদান করিবার কোনরূপ পন্থা না পাইয়া অনন্যোপায় হইয়া প্রতাপের নিকট মহারাজ বসন্ত রায় নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় অংশের অপর স্থান প্রদান করিতে সানন্দে এবং সাগ্রহে স্বীকৃত হন। কিন্তু প্রতাপ প্রকৃত বিষয় অথবা ভাব উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার (প্রতাপের) পূর্ব্বসঞ্চিত অসন্তুষ্টি ও পরবর্ত্তী কারণ-সঞ্জাত সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভাব প্রতিহিংসায় ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠে। পিতৃব্যদেব তখন রায়গড়ে (কলিকাতার দক্ষিণে) অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর একদা পিতৃব্যের যুগান্ত পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রতাপাদিত্য নিমন্ত্রিত হন। পিতৃব্যের ষড়যন্ত্র থাকিতে পারে, অনুমান করিয়া প্রতাপ সশস্ত্রে রায়গড়ে গমন করেন। তথায় তিনি পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎকারমানসে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ-কালে কূটচক্রী গৃহশত্রু গোবিন্দ রায় (মহারাজ বসন্ত রায়ের তৃতীয় পুত্র) তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ফলে, গোবিন্দ প্রতাপের হস্তে নিহত হন। ঠিক তৎকালেই মহারাজ বসন্ত রায় শ্রাদ্ধ কার্য্যের জন্য অনুচরকে গঙ্গাজল (গঙ্গোদক) আনিতে আদেশ দিয়াছিলেন। পিতৃব্যের আদেশ কর্ণ-গোচর হইলে, প্রতাপ উত্তেজনায় অধিকতর ভুল বুঝিয়া বসেন। অনুচরও প্রভুর আদেশের অর্থ সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার (মহারাজ বসন্ত রায়ের) "গঙ্গাজল" নামক প্রসিদ্ধ তরবারি আনয়ন করিয়া বসে। পিতৃব্যের সমীপবর্ত্তী হইবার প্রাক্কালে প্রতাপ অনুচরের হস্তে অস্ত্র দর্শনে ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তে পিতৃব্যকে হত্যা করেন (১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই চৈত্র, শুক্লা ত্রয়োদশী)।

বাংলার সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা—যশোর-ধূমঘাট

হুগ্‌লী অবস্থানকালে জেসুইট্ পাদ্রী ফ্রান্সিস্কো ফার্নাণ্ডেজ্ (Francisco Fernandez), মেল্‌কিওর ফন্‌সেকা (Melchior da Fonseca) ও ডোমিঙ্গ্ সোসা (Domingo de Souza) মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধূমঘাট আগমন করেন। ঐ বৎসরেই প্রতাপাদিত্যের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা ধূমঘাটে একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। ফাদার ফন্‌সেকা লিখিয়া গিয়াছেন—"বঙ্গদেশে জেসুইট্‌দিগের সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা যশোর-ধূমঘাটে

প্রস্তুত হয় এবং তাহাকে যীশুর গীর্জা নাম দেওয়া হয়। * * * আমরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট যেরূপ আতিথেয়তা, সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমন আর কোথাও পাই নাই।* * *"

জামাতা রাজা রামচন্দ্র এবং বিন্দুমতী

চন্দ্রদ্বীপের কিশোর রাজা রামচন্দ্রের (দ্বাদশ ভুঞার অন্যতম রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্র) সহিত মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন কনিষ্ঠা কন্যা বিন্দুমতীর (পূর্ব্বনাম বিমলা। মহারাজ বসন্ত রায়ের এক মহিষীর নামও বিমলা ছিল। সেই কারণে শেষে প্রতাপ-নন্দিনীর নাম "বিমলা"র স্থলে বিন্দুমতী হয়) বিবাহ দেন (১৬০৩)। বিবাহ-দিবসে নবদম্পতীকে শুভাশীষ প্রদানকালে প্রতাপাদিত্য জামাতার মস্তকে মোগল-অধীনতার নিদর্শন তারকাঙ্ক অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত রাজোষ্ণীষ সন্দর্শন করিয়া যুগপৎ ঘৃণায় ও ক্রোধে নানা কটূক্তি করেন এবং তৎক্ষণাৎ মোগলানুগত্যের হীন নিদর্শনকে ধূলিতলে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু রামচন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞা পালন-হেতু শ্বশুরদেবের পরবর্ত্তী আজ্ঞা পালনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করায়, মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর একদা বিন্দুমতী প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী 'সারসী' নামক স্থানের নদীর ঘাটে 'মহলাগিরি' তরণীতে (ইহা ময়ূরপঙ্খী বজরা অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দর। ইহাতে রাণী বা রাজবংশীয়া বিশিষ্টা মহিলারা আরোহণ করিতেন) অপেক্ষা করিতে থাকেন। বাকলার রাজবধূ ঠাকুরাণী দর্শনের নিমিত্ত তদঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ কাতারে কাতারে তথায় সমবেত হন। তখন এবম্বিধ জনতা হইয়াছিল যে, রীতিমত হাট-বাজার বসিয়া গিয়াছিল। সেই হইতে সেই স্থানের নাম হয় 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। রামচন্দ্র সংবাদ পাইয়াও বিন্দুমতীকে লইয়া যাইবার কোন ব্যবস্থা না করায়, রাজমাতা (রামচন্দ্রের মাতা) স্বয়ং আসিয়া বধূরাণীকে মহাড়ম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন (১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

প্রতাপাদিত্যের জামাতৃ-পরিত্যাগ সম্পর্কে যে অপর একটি সরস গল্প প্রচলিত আছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই। তাহা সম্পূর্ণ কপোল-কল্পিত।

কার্ভালহো হত্যা

পর্তুগীজ সর্দ্দার ডোমিঙ্গ (Domingos Carvalho) শ্রীপুরের কেদার রায় কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাঁহার (কেদার রায়ের) আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক হুগলীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি (যশোরাধিপ) প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে তিনি এক আহ্বান পান। প্রতাপের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি অবিলম্বে ধুমধাম যাত্রা করেন। পূর্ব্বে সন্দ্বীপে কার্ভালহোর আধিপত্যকালে যশোরের বণিক সম্প্রদায়ের কয়েকখানি বাণিজ্যপোত লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সে কারণে কার্ভালহোর উপর বণিক্ সমাজের বিশেষ আক্রোশ ছিল। তাহার উপর কার্ভালহোর এই ধুমধাম গমনে উপযুক্ত সুযোগ মিলিয়া যায়। প্রতিশোধ-বাসনায় তাহারা পথিমধ্যে কার্ভালহোকে আক্রমণ এবং নিহত করে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট এই নিদারুণ সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা প্রকৃত হত্যাকারিগণকে বাহির করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বাইশ ওম্‌রাহের পতন ও মানসিংহের সহিত সংঘর্ষ

সপ্তদশ শতকের প্রথমে বাংলা দেশে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মত প্রভূত গৌরবশালী ও পরাক্রমশালী স্বাধীন নরপতি কেহ ছিলেন না। দিকে দিকে যখন তাঁহার এমন শৌর্য্যবীর্য্য, যশঃখ্যাতি পরিব্যাপ্ত, তখন তাঁহার প্রতিবন্ধক হইল গৃহশত্রু রাজা রাঘবরাম রায় এবং বাসুদেব রায়ের (মহারাজ বসন্ত রায়ের ভ্রাতা) জামাতা রূপরাম বসু। মহারাজ শ্রীশ্রীবসন্ত রায়ের হত্যার পর তাঁহারা হিজলীর ঈশা খাঁর নিকট আশ্রয় লন। পরিশেষে প্রতাপ-কর্ত্তৃক ঈশা খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলে, উভয়েই আগ্রা গমন করেন। আকবর তাঁহাদের নিকট প্রতাপাদিত্যের

স্বাধীনতা ও মোগলের বিরুদ্ধতার কাহিনী অবগত হইয়া অবিলম্বে বাইশ ওম্‌রাহের (বাইশ জন বাছাই সেনাপতির) অধীনে বিরাট্ সৈন্যশক্তি প্রেরণ করেন। প্রতাপের বিখ্যাত অষ্টকোণ বুরুন দুর্গের নিকট লস্কর নগরে কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধের পর মোগলেরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং বাইশ ওম্‌রাহ নিহত হ'ন।

আকবর এবম্বিধ গ্লানিকর অবমাননার প্রতিশোধ বাসনায় পুনরায় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মানসিংহকে বিপুল বাহিনী সহযোগে যশোর অভিযানে পাঠান। পথে বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সহিত যোগ দেন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক বহু গোপন সংবাদ অবগত করাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ভবানন্দ মজুমদারের পূর্ব্বনাম দুর্গাদাস সমাদ্দার। তিনি বাল্যকালে ধূমঘাটে আসেন এবং রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া দেবসেবার পুষ্প-চয়ন কার্য্যে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি রাজ-পরিবারের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ, মহারাণী শরৎকুমারী (দ্বিতীয়া মহিষীর নাম বিদ্যুদ্বরণী) তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেই সময়ে মহারাণীর নিকট হইতে তিনি পুরস্কার স্বরূপ দেবনগর ও দুধ্‌লী নামক দুইখানি গ্রাম বৃত্তি লাভ করেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তদ্বংশীয়গণ ঐ গ্রাম দুইখানির মূল মালিক; এবং উক্ত বৃত্তি "রাণীয়ান্ বৃত্তি" বলিয়া সর্ব্বত্র কথিত ও সরকারী কাগজপত্রে লিখিত হইতেছে।

মানসিংহ যে রাস্তা দিয়া যশোর আসিয়াছিলেন, আজও তাহাকে "বাদশাহী সড়ক" বলে। সে চিহ্ন বহু-স্থানে আজও বিদ্যমান। মুকুন্দপুর দুর্গের (প্রচীন যশোর-দুর্গের) সন্নিকট তিনদিন উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হয় (১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রতাপের বীরত্বে মানসিংহ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে অবস্থা বুঝিয়া প্রতাপ সন্ধি করেন। উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, মানসিংহ কেদার রায়কে (বার ভুঞার অন্যতম) দমন করিবার নিমিত্ত শ্রীপুর অভিযান করেন। কেদার রায় পরাজিত হইলে, তিনি তদীয় (কেদার রায়ের) কুলদেবতা শিলাদেবী, অষ্টভূজা দুর্গা প্রতিমা (ক্ষুদ্র মূর্ত্তি) অম্বরে (জয়পুর) লইয়া গিয়াছিলেন। মানসিংহের যশোরেশ্বরী দেবী লইয়া যাইবার কাহিনী বিন্দুমাত্র সত্য নহে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপাস্য দেবতা যশোরেশ্বরী কালিকা মূর্ত্তি এবং অম্বরে মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত দেবী অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। জয়পুর অঞ্চলে সে দেবীমূর্ত্তি সল্লাদেবী বা শিলাদেবী নামে অভিহিতা ও পরিচিতা। যশোরেশ্বরীপুরে যে দেবী প্রতিমা নিত্য পূজিতা হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক এবং প্রাচীনতম পীঠমূর্ত্তি যশোরেশ্বরী দেবী।

প্রতাপাদিত্যের পরিণাম

বাংলার সুবেদার ইস্‌লাম খাঁর সময় প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। ভাটির জমিদারদিগের দমনে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সুবেদারকে সময়মত সাহায্য না করায়, সুবেদার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জানথনকে যশোর-বিজয়ে পাঠান। তাঁহারা প্রতাপের শাল্‌খা দুর্গে যুবরাজ উদয়াদিত্য কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের জয়লাভ ঘটে। তখন মোগল সেনানীদ্বয় অগ্রসর হইয়া বঙ্গীয় সেনাসহ মৌতলা দুর্গের নিকটবর্ত্তী কুশলী রণক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ভাগ্যক্রমে প্রতাপের পরাজয় সংঘটিত হয়। সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ইনায়েৎ খাঁ নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া প্রতাপ-সমভিব্যাহারে ঢাকায় গমন করেন। ইস্‌লাম খাঁ সন্ধির প্রস্তাব শ্রবণের ছলে তাঁহাকে (প্রতাপাদিত্যকে) বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক বন্দী করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে বন্দী প্রতাপ আগ্রায় প্রেরিত হন। পথিমধ্যে বারাণসীধামে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৬১০)।

যুবরাজ উদয়াদিত্যও পরে কুশ্‌লী রণক্ষেত্রে মির্জা-নথনের সহিত যুদ্ধে এবং মহারাণী শরৎকুমারী ও মহারাণী বিদ্যুদ্বরণী প্রমুখ রাজান্তঃপুরচারিণিবৃন্দ যমুনাগর্ভে (সে স্থানকে এখনও "শরৎখানার দহ" বলে) আত্মাহুতি প্রদান করিয়া যশোরের শেষ সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙালীর শেষ গৌরব-সূর্য্য সেই হইতে অস্তমিত; বাংলার রাজলক্ষ্মী সেই হইতে যমুনাগর্ভে নিমজ্জিতা।

বিধবা রতিমঞ্জরী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

ধনীর শ্রাদ্ধে পুরোহিত শ্রাদ্ধকারিণী রতিকে মন্ত্র পড়ালেন খুব সতেজে—কণ্ঠের রোলে আর বেগে তাকে বিপর্য্যস্ত করেই দিলেন; এবং তিনি যে গোঁজামিল দিচ্ছেন না, সবাই তা' টের পেল'।

কি বল্‌ছে তা' স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম না করেই রতি চারটি ষোড়শদান করল'। শ্রাদ্ধের জিনিস খেলো'ই হয়; কিন্তু স্বামীর শ্রাদ্ধে রতির জিনিস খেলো' নয়, মূল্যবান্।

দীর্ঘ অশৌচকাল রতির অসীম একটা ভাবনাহীন নির্লিপ্ততার সঙ্গে কেটেছিল, অন্তরের তাপ ছিল তার সঙ্গী; কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনে মনে হ'ল, সে ভারী একা ··· পরলোকগতের সঙ্গে ইহবাসীর ইহলৌকিক যে সম্পর্ক এমন দিনে নিবিড়তর হ'য়ে অশ্রুধারায় ধৌত হ'তে থাকে তা' এখানে কই! স্মৃতি ভারি সজীব আর প্রাণ ভারি ব্যথিত হ'য়ে ওঠে; তবু আনন্দ দেখা দেয়, পরলোকবাসী প্রিয় আত্মা সুখী হ'চ্ছে—অত্যাজ্য এই বিশ্বাসের বশে।

দানের সময়ে রতি ভারি ব্যাহত হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু অপরাধ তার নয়। ··· চিত্ত যার মলিন ছিল, যে-ব্যক্তি স্ত্রীর উপভোগ্য প্রাণসত্তা আর মধুময় আন্তরিকতা পরিত্যাগ করে' পাপে মধুর বিলাসবস্তুর বৈচিত্র্যের আর পণ্য রূপের আর দেহের সন্ধানে কেবলি হা হা করে' বেড়িয়েছে, শত শত বার উচ্ছিষ্টীকৃতা নারীর মত জঘন্য জিনিস যে-ব্যক্তি অপার লোলুপতার সঙ্গে টেনে' টেনে' নিয়েছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশে এই পবিত্র অনুষ্ঠান বা এই অনুষ্ঠানের পবিত্রতা উপহাস বলে' মনে হ'লে দোষ কি!

পুরোহিতের নির্দ্দেশমত অর্ঘ্য অর্পণ করতে রতির ভুল হয়ে গেল—কোন্ পাত্রে কি দিতে সে কি দিয়ে বসল'···

পুরোহিত তাকে শোকাভিভূতা মনে করে' পরম কারুণ্যের সহিত তার ভ্রম সংশোধন করে' দিলেন, কিন্তু রতির দুঃখও হ'ল খুব। ··· মৃতের উদ্দেশে অর্পিত দানের একাগ্র শ্রদ্ধা আর অন্তর্নিহিত বীজপদার্থ মৃতের গ্রহণ-শক্তির আয়ত্তের ভিতর পৌঁছে তার উদরের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না, তাকে স্নিগ্ধ করে, ইহাই লোকের বিশ্বাস এবং তাহাই মৃতের প্রেতজীবনের একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সুখ; কিন্তু সশ্রদ্ধ দানের অন্তরালে সেই দান আপ্লুত না হ'লে কি ঘটে তা' কে জানে!... পরলোকে উপনীত হ'য়ে মানুষ যদি তার কর্ম্মের ফল স্পষ্টতম আকারে দেখ্‌তে পায়, তবে তিনি তা' দেখ্‌ছেন, এবং কি তিনি মনে করছেন, আর যন্ত্রণা পাচ্ছেন কি না তা' তাঁর সেই সূক্ষ্ম ভূতাত্মাই জানে।... তাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আজ বোধ হয় তিনি জান্‌তে পারছেন, সে ছাড়া তাঁর কেউ নাই—অশরীরী আর অসহায় বায়ুভূত অবস্থায় তারই ভক্তিপূত অন্তরের অসম্বরণীয় উন্মুখতার জন্য তাঁকে লীলায়িত হ'য়ে উঠ্‌তে হয়েছে।

বর্ষীয়সী যে বিধবাটি রতির সঙ্গিনী আর তত্ত্বাবধায়িকা হ'য়ে শ্মশানে গিয়েছিল, শ্রাদ্ধস্থলেও সে রতির কাছে কাছে ঘুরছিল ...

সে বল্‌লে, বৌ, ঘোমটা একটু তুলে' দাও। লজ্জা করবার সময় এ নয়।

রতি ঘোমটা বাড়িয়ে দিয়েছিল লজ্জায় নয়, ভয়ে।... শুষ্ক বাষ্পহীন চক্ষু আর মুখে দৃশ্যমান হ'য়ে প্রতিফলিত নির্ব্বেদনা সে ঢেকে' রেখেছে—

বর্ষীয়সীর কথায় রতি ঘোমটা খানিক্ তুলে' দিল .. পুরোহিত তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।···সুদীর্ঘকালব্যাপী শ্রাদ্ধক্রিয়া বেলা গড়িয়ে গেলে শেষ হ'ল।

মোটের উপর অক্ষয়ের শ্রাদ্ধে ঘটা হ'ল ভালই—লোক খেলে' অনেক; এবং লোকে বল্‌ল', পতিব্রতার পতিনিষ্ঠার দরুণই সব তরকারী নুনে-ঝালে মুখরোচক

এবং লুচি নরম এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুমিষ্টই হয়েছে। ব্রাহ্মণগণ ভোজনদক্ষিণা পেয়ে আরো সদ্ব্যবহার করলেন—সতীর শাস্তি কামনা এবং অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্যের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করলেন।

মনোমঞ্জরীর এ ক'দিনের আচরণ হয়েছে অদ্ভুত—দিদিকে সে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়িয়েছে এবং সে মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করেছে এখান থেকে কবে' যেতে পারবে'—তাই ভেবে'।

শ্রাদ্ধের পরই সে চলে' গেল। সাধবা মনোমঞ্জরী নিজেকে নিখুঁৎ পতিব্রতা বলে' জানে—একটা নিদারুণ মর্ম্মবেদনা আর হতাশা নিয়ে সে গেল।…দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বৈধব্যের রূপের দিকে তাকিয়ে দিদির ভঙ্গিমাময় সেই হাসিটা মনো ভুলতে পারে নাই—অত্যন্ত স্বচ্ছ আয়নার উপর থেকে নিক্ষিপ্ত অসহ্য তীব্র একটা সৌর-দীপ্তির মত সেই হাসি তার চোখের উপর আর চোখে যন্ত্রণা দিয়ে অবিশ্রান্ত নেচেছে।

রতির কথাগুলোও ভুলবার মত নয়—সদ্যঃবিধবা রতি বলেছিল: "কাঁদবার কি ঘটেছে?" আরো বলেছিল: "মানুষ মরেছে—তার জন্যে ত' কেঁদেছি। লোকে দেখেছে।" তারপরও রতি বলেছিল: "আয়নার ভিতর নিজেকে দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌তে বেশ হয়েছি।"

মনোমঞ্জরী শিউরে অবাক্‌ হয়ে গেছে। এই কথাগুলো যে অন্তর থেকে বেরিয়েছে, সে অন্তর বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হবে তা' ভয়ঙ্কর—সাধ্বীর দেহে রোমাঞ্চ তা'তে জাগ্‌বেই, এবং যে-কোনো রমণী তাকে দূষিত বস্তু বলে' ঘৃণা করে' সেদিক্‌ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেই। মনো তা-ই মুখ ফিরিয়ে ছিল।

দিদি কৈফিয়ৎ দিয়েছিল বটে: স্বামী ভালবাসতেন না; স্ত্রীকে ঘরে রেখে তিনি বাইরে থাকৃতেন।

শুনে' প্রথমটা থম্‌কে' যেতে হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ জাগে: দিদির নিজেরই আচরণ সেই বেচারাকে ঘরছাড়া করেছিল কিনা কে জানে! রকম যা' দেখা যাচ্ছে!…তার উপর, সংশোধনের পক্ষ কি চিরকাল বন্ধ থাকে! ভাল হতেও ত' পারত'।…তা' হ'ত না বলে'ই যদি ধরা যায়, তবু বিধবা হ'য়ে এসেই কি হাস্‌তে হবে!

ভেবে' ভেবে' খুব অস্থির ঠেকে' মনো দিদির আচরণের প্রতিবাদ করেছিল—যে কাপড়খানা বা'র করে' সে পর্‌তে লাগ্‌ল' তার রং চাঁপার মত, আর তার লাল পাড় প্রকাণ্ড আর অতিশয় ঘোরালো—প্রান্তের দিকে কাপড়ের প্রায় অর্দ্ধেকটাই দু'দিক্‌কার পাড়ে জুড়ে' আছে; এবং কাপড়ের প্রচুর রক্তবর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখ্‌তে সে আল্‌তা পর্‌ল' চওড়া করে', সিঁদূর পর্‌ল' মোটা করে'…

সাধ্বীর লক্ষণ আর কর্ত্তব্য কি তারই অগ্নিমূর্ত্তি নির্দ্দেশ তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল' রতির চোখের উপর……

রতি একেবারে শাদা—

মনো একেবারে লাল—

রতি একদিন হেসে' বলেছিল, আমার কি মনে হ'চ্ছে জানিস্‌, মনো?

—কি মনে হ'চ্ছে তোমার?

মনোর কণ্ঠস্বর মোলায়েম নয়।

রতি বল্‌লে, তুই কি মনে করবি জানিনে।…তারপর একটু থেমে বল্‌ল,—তুই কি তা' বুঝ্‌বি!

মনো বল্‌ল, বলে'ই দেখ।

—দেখি।… আমার এই অবস্থায় আমার সাম্‌নে তোর অত ঘটা করে' সাজা বে-মানান্‌ তা' তুই জানিস্‌?

মনো দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল, কথা বল্‌ল না। দিদিই তাকে রাগিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে অন্যায় করিয়েছে তা' কি দিদি জানে না! জেনে না-জানার ভাণ করা দিদির একটা স্বভাব যেন!

উত্তর না পেয়ে রতি বল্‌ল,—তা' তুই জানিস্‌, মনো; বল্‌লিনে। তোর মনের আনন্দ তুই চাপ্‌তে পারছিস্‌ নে।

মনো বিমর্ষ হ'য়ে উঠ্‌ল—

বল্‌ল, সে কি, দিদি! তুমি অমন কথা ভাব্‌তে পার্‌লে কেমন করে'! তোমার দিকে তাকিয়ে বুক হু হু করছে তা' তোমাকে আমি দেখাব কেমন করে'!

শুনে' রতি একটু হাস্‌ল'—

বল্‌ল,—আমার কথা তুই ভুল বুঝেছিস্‌। তোর

আনন্দ কি আমার দুঃখে! তা' বল্‌ছিনে। তোর স্বামী তোকে ভালবাসে—এই আনন্দে ডুবে গেছিস্‌, আর আমার কথায় তুই রাগ করেছিস্‌।

মনো বল্‌লে, দিদি, সত্যি করে' বলো, জামাইবাবু কি তোমায় ভালবাসতেন না?

—না।

—তুমি তাঁকে ক্ষমা করো।

রতি হেসে' উঠ্‌ল; বল্‌ল, সে ক্ষমার মূল্য কি? তিনি জান্‌তেও পারবেন না—আমার দুঃখও তা'তে ঘুচবে না। আর, যে জীবন মাটি করে' দেয় তাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করা যায় না। যে বলে ক্ষমা করেছি সে চালাকি করে, কিন্তু আমি তা' পারিনে।... উপায় থাক্‌লে সে-আপোষ নিজের মন থেকেই কর্‌তাম—বল্‌তে হ'ত না।

শুনে' মনো কি বল্‌বে তা' বুঝে' উঠ্‌তে পারে নাই; স্বামী ভালবাসে না, এ-অবস্থায় সে কি কর্‌ত তা' কিছুই অনুমান করবার উপায় নাই। কাঁদ্‌বে মানুষ কত—আর, সহ্য যা' করা যায় তার সীমা কোথায়!

তবু মনো মর্ম্মাহতা হ'য়েই প্রস্থান করল। পতির নিন্দায় প্রাণত্যাগ করা যেখানে পৌরাণিক যুগ থেকে অতি সহজ হ'য়ে আছে, সেখানে নিজের মুখে পতিনিন্দা প্রচার করা কত যে গর্হিত—তা' কি ভেবে ওঠা যায়! স্ত্রীলোকের পক্ষে তা' নারকীয় অপরাধ।

কিন্তু যাবার সময়ে মনো কাঁদ্‌ল' খুব—বিস্ময়, হতাশা, মর্ম্মবেদনা প্রভৃতি বিস্মৃত হ'য়ে মনো কাঁদ্‌ল'—

রতি কাঁদ্‌ল' না—আশীর্ব্বাদ করল' প্রাণভরা, এবং মনো তাকে প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াতেই তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। মনো কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল'—সেখানে দাঁড়িয়ে যারা বিদায়দৃশ্য দেখ্‌ছিল, তারা তাদের চোখের জল নিজে নিজেই মুছ্‌ল,—বিধবা বোন্‌কে নিঃসঙ্গ হাহাকারপূর্ণ গৃহে রেখে যাওয়ার মত দুঃসহ ব্যাপার কিছু নেই বলে' সম্প্রতি সকলেরই মনে হ'ল।

মনোর গাড়ী চলে' গেলে রতি অকারণেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে' ফিরে এল।

রতির সহোদরা ভগিনী মনো—সুখে দুঃখে তার সঙ্গে রতির একাত্মতার বোধ না আছে এমন নয়—সুতরাং সে চলে' যেতেই এই গৃহ রতির পক্ষে শূন্যতর হ'য়ে উঠ্‌বার কথা, কিন্তু তা' উঠ্‌ল না—মনো চলে' যেতেই সে যেন হাঁফ ছেড়ে' বাঁচ্‌ল'। মুখরোচক জিনিষও অপরিমিত ভাল লাগে না—সুখকর দৃশ্যও দীর্ঘস্থায়ী হ'লে ক্লান্তিকর হ'য়ে ওঠে। কিছুই অসম্ভব নয়—মনোর রক্তবহুল সাজসজ্জা আর এয়তির প্রবল ঘোষণা রতির পক্ষে ঠিক তেম্‌নি ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠেছিল। মনোকে ঈর্ষ্যা সে করে না, তার সুখকামনাই কায়মনোবাক্যে করে; কিন্তু যে-সূত্রে সে নিরবচ্ছিন্ন একটা উৎসবের কলধ্বনির মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে আছে বলে' তার অষ্টাঙ্গ আর সর্ব্বান্তঃকরণ ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করছে, প্রাণের সেই বিধুবন আর অঙ্গে তার রূপ-প্রতিমা সজ্জিত করা রতির ভাল লাগে নাই।

মনোর যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সে ভদ্রলোক রেলের গার্ড, যাত্রীগাড়ীর নয়, মাল-গাড়ীর। যখন তখন সে বাড়ী ছেড়ে' চলে' যায়, যখন তখন ফেরে—দুরন্ত শীতে, প্রবল বৃষ্টিতে, নিদারুণ গ্রীষ্মেও তাই। মনো এই সময়টা কেমন করে' কাটায়! ... তাকে নিরাপদে রাখ্‌তে সেই ভদ্রলোকের চেষ্টা আর আগ্রহ কত! অষ্টপ্রহর বাসায় থাক্‌বে, এমন একটি ঝি সে রেখে' দিয়েছে—ষ্টেশনের একটা পোর্টার তার অনুপস্থিতির সময়ে রাত্রে তার বাসায় এসে থাকে—পাড়ার চৌকিদারকে বখ্‌শিস্‌ দিয়ে বলা আছে, সে যান খবরদারি করে।

স্ত্রীকে নিরাপদে রাখবার ভদ্রলোকের এই আপ্রাণ প্রয়াসের অন্য কোনো কারণ নাই, একটি কারণ ছাড়া; স্ত্রীর দেহকে আপনার স্বেচ্ছাধীনে, সুরক্ষিত আর অক্ষত রাখাই তার উদ্দেশ্য। কারণ, মন যে সকল সতর্কতার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে' আপনি গোপন পথে যাতায়াত করতে পারে তা' কে না জানে! মনের এই স্বাধীনতা আছে—গোপনে সে তা' ভোগ করতে পারে, কিন্তু দেহের তা' নাই।

স্বামী কি চান, মনো তা' জানে—জেনে' সে সাজে—দেহকে সজ্জার পারিপাট্যে চমকপ্রদ আর লোভনীয় করে'

রাখে। মালগাড়ীকে নিজের এলাকার সীমানায় পৌছে দিয়ে ভদ্রলোক ফিরে' আসে—দিন তিন্‌টেয় হোক্ কি রাত চারটেয় হোক্; এসে সে দেখে মনোমঞ্জরী যৌবন জাগিয়ে একান্ত তারই জন্যে অপেক্ষা করে' আছে ··· স্বামীর ব্যগ্র বাহুর ভিতর ধরা দিয়ে চুম্বন গ্রহণ করে' সে নিজেকে সার্থক করে।

সত্যই তা'ই—

রতির মনে পড়ে, অক্ষয় আগে তাকে উপহার দিত, গয়না, ফুল, কাপড়, তেল, এসেন্স প্রভৃতি। স্ত্রীকে নিজেরই দিকে উত্তেজিত করে' তার দেহকে নিবিড়তম আর ক্ষিপ্ততম উল্লাসের স্রোতের মাঝে শিহরিত, প্রলুব্ধ আর অন্ধ করে' তুলে' একেবারে নিঃশেষে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া সেই উপহার দেওয়ার আর কোনো অর্থ নাই, কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না—পুরুষের থাকে না। কলুষিত আত্মা আত্মাকে অস্বীকার করে' কেবল ঐ কৌশলেই স্ত্রীর মন চায়।

রতি তা' বুঝ্‌ত—তখনকার তার সেই মনে-মনে হাসিটা এখনো মনে পড়ে ...

তারপর রতির মনে পড়ে, তার ক্ষুব্ধিতযৌবনে তা'কে তার স্বামী অরুচির সঙ্গে এত কম চেয়েছিল যে, তার মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত, এই দেহ আর বহন করবার উদ্দেশ্য কি সার্থকতা কিছু থাকতে পারে কি না! ··· ভালবাসা জন্মিল না—স্বামী প্রেমাকাঙ্ক্ষা করলেন না—যে-প্রক্রিয়ার ফলে ভালবাসা জন্মে তা' ব্যর্থ হয়ে গেল; অন্তর বুভুক্ষু হ'য়ে রইল ...

হঠাৎ যেন একটা ঠেলা খেয়ে রতি তাড়াতাড়ি উঠে' বস্‌ল' ... বসে' সে নিজের দেহের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে গেল ...

আয়নায় দেহের প্রতিবিম্ব দেখে' একদিন তার মনে হয়েছিল: "দেখ্‌তে বেশ হয়েছি।" কিন্তু এখন তার মনে হ'ল, ভুল দেখেছিলাম; দেখ্‌তে বেশ হবার কথা ত' নয়! অন্তর যার সজীব হ'য়ে উঠে' দুর্নিবার আকর্ষণে আর পরম আনন্দে সাড়া দিবার সুযোগ বহুদিন হ'ল হারিয়েছে, তার দেহ সুশ্রী থাকবে কেমন করে'! দেহ স্থূল বস্তু, কিন্তু সে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে, জলন্ত জাগ্রত সম্বিতের দ্বারা—সম্বিতেরই অবয়ব এই দেহ। সম্বিৎ যার বুভুক্ষু শুষ্ক রইল চিরকাল, দেহ তার লাবণ্যে ভরপূর হয়ে পুষ্টিলাভ করবার রস পাবে কোন্ উৎস থেকে! স্পষ্ট, সুসমঞ্জস, সুদৃশ্য হ'য়ে সে থাক্‌তে পারে না—লাঞ্ছনার ক্লেশের ছায়ায়, একটা অস্বাভাবিক আব্‌হাওয়ায় আবৃত, বিকৃত, অপুষ্ট সে হবেই।

মনোর মত চেহারা তার নয়—বিতরণের অভাবেই সে হয়তো বক্র অসুন্দর হ'য়ে উঠেছে!

রতি ধীরে ধীরে উঠে' গেল ··· সুবৃহৎ দর্পণের অভ্যন্তরের প্রতিবিম্বটা সে বহুক্ষণ লক্ষ্য করল কিন্তু সন্দেহ ঘুচ্‌ল' না।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

বাঁশরী হাতে
বনেরি পথে
একা কারে ঢুঁড়ি হে মোর প্রিয়
ফুলের রেণু
ধুলায় লুটে
মাঝে মাঝে তব পরশ দিও।

স্বপন অঞ্জনে
রঞ্জিত আঁখি
আমি শুধু বঁধু
আশায় থাকি।
নয়ন জলে
হৃদয় তলে
তুমি মোর দীন আরতি নিও

দেশের কল্যাণ কোথায়?

শ্রীপুলিনবিহারী দাস

আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরবচ্ছিন্ন সুখই কল্যাণ এবং সর্ব্ববিধ দুঃখই অকল্যাণ; এবং স্থূলভাবে দৃষ্টি করিলে উন্নতিই সুখ এবং অবনতিই দুঃখ;—অপরন্তু ব্যভিচার-পরিশূন্য সর্ব্বমুখী গৌরবময় কাম্য সাধনের ও সার্ব্বভৌম ইষ্ট লাভের উপযোগী ক্ষমতার অর্জ্জনই উন্নতি; তদ্বিপরীতই অবনতি,—অভাব ইহারই অন্তর্গত।

শক্তি-সামর্থ্য ব্যতিরেকে অভাব এবং দুঃখ-বিমোচন, কিম্বা উন্নতিলাভও অসম্ভব,—তবে অপরের সাহায্য কিম্বা কৃপাভিক্ষা লাভ দ্বারা অশক্ত ব্যক্তিরও কদাচিৎ কোন কোন অভাব এবং দুঃখাদি বিমোচন-রূপ সাময়িক প্রতিকার সম্ভবপর হইলেও, সাহায্যকারীর শক্তি-সামর্থ্য হেতু সত্তার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইতেই হয়; তাই মূলতঃ শক্তি সামর্থ্যের প্রাধান্য অমান্য করিবার কোনই উপায় নাই।
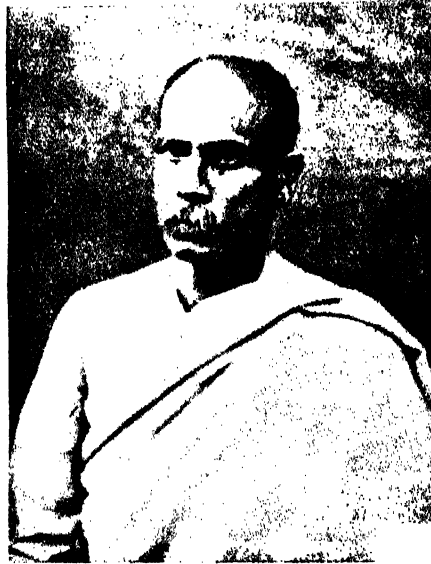
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস

জগতে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, জ্ঞানযৌগিক, নৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানারূপ শক্তি-সামর্থ্যের অস্তিত্বই বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন কালে বিভিন্নরূপ শক্তি-সামর্থ্যের সাহায্যে বিভিন্নরূপ উন্নতি ও বিভিন্নরূপ সুখসম্ভোগ লাভে কৃতার্থ হইয়া বিভিন্নরূপ দুঃখবিমোচন এবং অভাবাদি অপনোদনেও সমর্থ হইয়া গিয়াছেন।

শক্তিসামর্থ্যের অভাব এবং অপচয় হেতুই যে অবনত দেশ কিম্বা জাতিসমূহের অভাব অভিযোগ এবং ক্রম-অবনতির গতি বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তাহাও কোনও সদাশয় ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন না; শক্তির অভাব হেতু জাতির বিলোপসাধন ঘটিয়া থাকে;—অপর দিকে, প্রকৃত শক্তি-অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত অবনত দেশ কিম্বা জাতিও উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

ধন, মান, জ্ঞান, গুণ, বিদ্যা, ন্যায়, নীতি, মন্ত্র (গুপ্ত কৌশল), ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সম্পর্কিত শক্তি সাধন হেতু বর্ত্তমানে দেশে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে বটে, কিন্তু আত্মরক্ষা ও শত্রু-বারণোপযোগী কৌশলাদি শিক্ষা-সম্পর্কিত উৎসাহ উদ্যম জাগিয়া উঠিল কই? যদিও স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় কতিপয় বৈদেশিক ক্রীড়াকৌতুকের এবং ব্যায়াম-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে বিপজ্জনকভাবে ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বর্ত্তমানে যুবকগণ অতি মাত্রায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছে; তথাপি স্থিরচিত্তে সূক্ষ্ম বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক এবং ব্যায়াম পদ্ধতি প্রভৃতির প্রভাবে জাতিগতভাবে দেশের কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুইই হইতেছে, বরং নবোৎপন্ন জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গী স্বদেশকে উপেক্ষা করিয়া পরানুকরণের প্রেরণাই অধিক জাগাইতেছে; অধিকন্তু মোহগ্রস্ত দেশ-বাসিগণও ঐ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকেই কল্পনা-বলে "বিশ্বপ্রেম" নামে অভিহিত করিয়া মনে-প্রাণে ধন্য হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি উৎফুল্ল চিত্তেই যেন জাতিগত কল্যাণকে পরপদে বিসর্জ্জন দিতে অতিমাত্রায় উৎসাহান্বিত হইয়া পড়িতেছে।

তাই হতাশার তাড়নায় মনের আবেগে বাধ্য হইয়া ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য সাধনোপযোগী হিতকর প্রক্রিয়াদি সমন্বিত স্বদেশজাত পুরাকালীন লাঠিখেলা প্রভৃতি আত্মরক্ষার কৌশলাদি সম্পর্কিত শক্তি-সাধনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ হেতু দুই চারিটি কথা বলিতে যাইতেছি ; আশা করি, আমার কোনরূপ অক্ষমতা কিম্বা ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন, এবং ঐ সমস্ত সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

গদা, অসি, বড় লাঠি, বেনিঠি, মৌষ্টিক, ছুরি, বাঁক, বিনোদ, যুযুৎসু প্রভৃতির অভ্যাস দ্বারা যেরূপ আত্মরক্ষার শক্তি জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের সুসামঞ্জস্য চালনা হেতু সুষ্টুরূপে ব্যায়ামের কার্য্যও সাধিত হয় বলিয়া শারীরিক উৎকর্ষ-সাধনেও যথেষ্ট ফল লাভ হয়।

লাঠি প্রভৃতির ক্রীড়াভ্যাসে রত থাকিলে শরীর অতি স্থূল কিম্বা অতি কৃশ থাকিতে পারে না ; অধিকন্তু, স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম-প্রণালী এবং আহারাদি সম্বন্ধে সর্ব্বরূপ অত্যাচার কিম্বা ব্যভিচারাদি সম্পর্কিত যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন সহ লাঠি প্রভৃতির ক্রীড়া দ্বারা মনের প্রফুল্লতা, চিত্তের একাগ্রতা, বুদ্ধির স্থিরতা, দৃষ্টিশক্তির বিশুদ্ধতা প্রভৃতি জন্মাইতেও যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে ;—অপরন্তু লাঠি ইত্যাদির চালনায় অভ্যাস জন্মিলে আত্মরক্ষা হেতু সর্ব্বরূপ আতঙ্ক বিদূরিত হইতে থাকে বলিয়া মানব সর্ব্বদাই নির্ভীক-চিত্তে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে, এবং দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে দেশের অত্যাচারাদিও বহুল পরিমাণে বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়।

নিয়ম প্রণালী অনুসরণসহ ক্রমগতিতে লাঠি শিক্ষা ইত্যাদি অভ্যাস করিতে পারিলে দম (শম, দম) অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়—তাহার ফলে শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে, এবং সমস্ত দিন কর্ম্মে রত থাকিলেও কোনরূপ অবসাদ কিম্বা ক্লেশ বোধ হয় না। ঐরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্য যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কালে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেই মানবের পূর্ণায়ুঃ হওয়া সম্ভবপর হয় ; এবং শরীর সর্ব্বরূপে সুশ্রী, সুগঠিত, কর্ম্মক্ষম ও ক্রম বর্দ্ধনশীল হইয়া জীবনের উন্নতি-সাধনে এবং জীবন ধারণের সার্থকতা সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়ক হইয়া থাকে।

লাঠি ইত্যাদির (তদ্রূপ বিবিভিন্ন ব্যায়াম এবং অন্যান্য ক্রীড়াদিরও) অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বালক এবং যুবকগণের সর্ব্ববিষয়ে সংযমী হওয়াও নিতান্তই বিধেয় ; অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে ঐ সমস্ত বালক এবং যুবকগণই পরিণামে দেশের ও জগতের উৎপাত স্বরূপই হইয়া পড়িবে ; কারণ যুবকগণ অসংযমী হইলে অনেক সময়েই আত্মহিত উপেক্ষা করিয়াও অপরের অহিত সম্পাদনেই তাহারা অত্যধিক উৎসাহান্বিত ও আসক্ত হইয়া পড়ে ;—বর্ত্তমানে দেখিতেও পাওয়া যায় যে, অনেকানেক "ব্যায়াম" ও "ক্রীড়া" প্রতিষ্ঠানই প্রকারান্তরে এবং অলক্ষিতে দুর্ব্বল-পীড়ক, অসংযমী, স্বার্থপরায়ণ, দুর্বিনীত, লঘুচিত্ত, অসূয়াপরায়ণ, দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, তামসিক-কামনায় ও তমোগুণসম্পন্ন দুষ্ট সঙ্ঘেই পরিণত হইতেছে। তাই, দেশের কল্যাণ হেতুই যাহারা লাঠিখেলা ইত্যাদি অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক হইবে, তাহাদের মধ্যে নিয়ম-শাসন ও গুরুভক্তির দৃঢ়তা

প্রারম্ভিক লাঠি শিক্ষা—অভিযানস্থিতি দক্ষিণ (পার্শ্ব)

প্রক্ষেপ দক্ষিণ

রক্ষা হেতু দেশবাসী সর্ব্বসাধারণেরই সবিশেষ দৃষ্টি রাখাও অবশ্যই কর্ত্তব্য।

অসিতে সম্পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিতে পারিলে সর্ব্ব অবস্থায়ই অতি সন্নিকটবর্ত্তী সর্ব্বরূপ আততায়ীর সম্মুখীন হওয়ার শক্তি জন্মিয়া থাকে; দূর ক্ষেপ্য কামান-বন্দুক, তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রধারী শত্রু ব্যতি রেকে অন্য যে কোন-

বিভিন্ন অবস্থায় যুযুৎসুর কয়েকটী প্যাঁচের দৃশ্য

ছোরা খেলা

রূপ আয়ুধ-সম্পন্ন আততায়ীসমূহকে নিবৃত্ত ও দমন করা সুশিক্ষিত অসিধারীর পক্ষে নিতান্তই সহজসাধ্য হয়।

ছোট লাঠীতে সম্পূর্ণ দক্ষতা জন্মিলে সাধারণ বংশ-যষ্টি কিম্বা সহজলব্ধ তদনুরূপ যে কোনও পদার্থ (দণ্ড) দ্বারাই সাধারণ দস্যু তস্কর কিম্বা আকস্মিক আততায়ীকে যথোপযুক্তরূপে বাধা প্রদান সম্ভবপর হয়। অপিচ পথে, ঘাটে, খেলার মাঠে, রেলে, ষ্টীমারে, অধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, পরধর্ম্মী, পরদেশী পাষণ্ডগণের হস্তে লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, অপমানিত কিম্বা নারীহরণ ঘটিত দুর্গতি হেতু মর্ম্মাহত হইতে হয় না।

বড় লাঠী দ্বারা অসভ্য, অশিক্ষিত ও উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বৃত্ত জনসঙ্ঘের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি জন্মিয়া থাকে। বর্ত্তমানে "গদাযুদ্ধের" প্রচলন অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই চলে; তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচলিত "বড় লাঠি"ই প্রকারান্তরে ও আংশিকরূপে পুরাকালীন "গদার" প্রতীক স্বরূপ।

ছুরি, বাঁক, মৌষ্টিক প্রভৃতি সম্বন্ধে দক্ষতা জন্মিলে আকস্মিক দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণ প্রভৃতির প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে; রমণীগণও "ছুরির" সাহায্যে অনেক স্থলেই দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

বিনোদে দক্ষ হইতে পারিলে সহজলব্ধ যে কোনরূপ ক্ষুদ্র দৃঢ় যষ্টি সাহায্যেও অনেক সময়ে আকস্মিক আততায়ীর সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হয়।

যুযুৎসুর কৌশলে দক্ষ হইতে পারিলে রিক্ত হস্তেও অবস্থাবিশেষে আততায়ীকে নিরস্ত্র করিবার সুনিশ্চিত ক্ষমতা জন্মে।

কিন্তু হায়, হায়! দেশেরই দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমান যুগের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বৈদেশিক মোহে অভিভূত হইয়া এতদূর দাস-মনোভাবপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে,

অহিতকর বৈদেশিক ক্রীড়া ও বৈদেশিক ব্যায়াম-পদ্ধতি ব্যতিরেকে দেশহিতকর সর্ব্বরূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া পদ্ধতিকে যেন পূর্ণ মাত্রায় বাধা প্রদান করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে পুলিশ এবং গুণ্ডার হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া এবং বিভিন্নরূপে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াও বৈদেশিক হস্তে অজস্র অর্থ প্রদান করিয়া বৈদেশিক ক্রীড়া সন্দর্শনে বিপুলানন্দ উপভোগেরই প্রেরণা জাগাইতেছে এবং আশঙ্কা বিরহিত নিজ নিজ মণ্ডলীর মধ্যে ক্রূর ও কূট সমালোচনার বাক্যাস্ফালনে উৎফুল্ল হইয়া হিতাহিত - বিচারবিহীন আত্মম্ভরিতার গর্ব্ব-প্রকাশে অন্ধ হইয়াই যেন "দেশের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়া" কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যাইতেছে। দেশবাসিগণ একবার ভাবিয়া দেখিবে কি "দেশের সত্যকার কল্যাণ" কোথায়?

"চড়ুই পিঠা"

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার্-এট্-ল

এক

(হ্যাস্‌নার লিপি)

ভাই ললিতা,

লোকে চড়ুইভাতি করে, আমরা 'চড়ুই পিঠা' ক'রব। শু'নলাম পৌষ মাসের শেষ দিনে সবাই পিঠা পুলির ব্যাপার করে। আমরাও সেই দিন অর্থাৎ আগামী কাল মিনি রায়ের ভায়ের বাগান বাড়ীতে ওই কাজে লেগে যাবো। তোমাকেও যোগদান করতে হ'বে কিন্তু। মিনি, এলা, হেনা, চন্দ্রা আর তোমার জানা আরও অনেক মেয়েরা যাবে।

'চড়ুই-পিঠার' কথা শুনে মিনির দাদা মিনিকে বলেন, "কিরে তোরাও শেষে 'চাল গুঁড়ো' ধ'রলি!" ঘরেও বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ হয়েছে বিস্তর। হেসে ত' আমি বাঁচি না। অসভ্য যুগের সেই পুরাতন পর্ব্বটা পালন ক'রতে সত্যিই যেন আমরা চাচ্ছি! আচ্ছা, এরা মনে ক'রে কি? বাপ-মায়ের জেদে প'ড়ে বিয়েই না হয় করেছি, তাই ব'লে, যাক—আমাদের চড়ুই পিঠার মর্ম্ম বু'ঝবে মানুষে। উদ্দেশ্য বুঝিয়ে ব'লতে হ'বে! সাধে কি নারীর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী এত প্রকট হচ্ছে!

আমার কথায় তুমি নিশ্চয় চ'টে যাচ্ছ'। আমাদের দলের ঘর ভাঙতে সুরু ক'র তুমিই বিয়ে ক'রে। ক'রলে ক'রলে কিন্তু 'দাসীখৎ' লিখে দেওয়া আর 'পতি পরম গুরু' মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়াতে চ'টবার কথা আমাদেরই। আমরা কিন্তু, অন্ততঃ আমি, তোমার শিক্ষার এই অপ-ব্যবহারে, 'আহা' ব'লে তোমার সম্বন্ধে সহানুভূতির ভাবই পোষণ করি, তা' তুমি জানো। এ ভাব পোষণ যদি না ক'রতুম, আমাদের এই পর্ব্বে যোগদান ক'রতে তোমায় আহ্বান করতুম না। বন্ধুত্ব ক্ষণভঙ্গুর নয়—বন্ধুর কাজ শেষ পর্য্যন্ত ক'রব। আশা করি তুমি আমাদের নিরাশ ক'রবে না—

বান্ধবী—'হ্যাস্‌না'

পুঃ লছ্‌মীকে আমার ভালবাসা দেবে।

(ললিতার লিপি)

দ্যাখন্ হাসি,—

'নেওতা' পেলুম, কিন্তু আজত' পয়লা এপ্রেল্ নয়—ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। কাজেই নেওতাটা নেওয়ার সুবিধে হ'ল না। তবে হ্যাঁ ডিসেম্বরটা 'দশম' হ'লেও ওই খানেই বছর কাবার করানর মজা ক'রতে 'টম্ ফুলারি'র (Tom foolery) আয়োজনে মেতে যদি থাক', পোড়া পৌষ সংক্রান্তিকে টানাটানি ক'রে বিপর্য্যস্ত করা কেন? সেই যে ব'লে না, 'ভাত কাপড়ের কেউ নয়…'। তোমারও যে ঠিক্ তাই। এতে কি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্যতার

প্রমাণ দেয়? আমার ত' মনে হয়, এ থেকে অযোগ্যতার পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়। বাল্য ও কৈশোরে উপভুক্ত পার্ব্বণের স্মৃতি প্রাণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেই এই বিপদ তোমার ঘটিয়েছে। ধার করা সভ্যতা যাকে ব'ল কাল্‌চার, (culture) তা' কেতা দোরস্ত রা'খতে এ তোমার আত্ম প্রবঞ্চনা। যা 'নয়' জোর ক'রে তা' 'হয়' করবার যে কি যন্ত্রণা, কি মেহনত তা' তোমার চিঠির আঁচড়ে ফুটে বেরিয়েছে। আপনাকে বঞ্চনা ক'রতে ইতস্ততঃ যে করে না, 'স্বাতন্ত্র্যে' তার দাবি—হাসির কথা বটে।

তবে হ্যাঁ স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা এক হিসেবে খুবই বেশী। আমার বিরুদ্ধে 'দাসী-খত'-এর অভিযোগ তুমি যা করেছ', বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তুমি নিজেই সেই 'খতে' আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা কি না! স্বধর্ম্ম ও দেশাচারের বিরুদ্ধে অভিযান তোমার 'সাহেব'-এর সঙ্গে যে ভাবে চালিয়েছ' তা কি বিনা খতে? প্রাণের ভাষা মূক ক'রে আপনার সংস্কারের বিরুদ্ধে এই যে গা এলিয়ে দেওয়া, তা কি 'প্রভুখতের' দৃষ্টান্ত নয়! হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী ব'লে গর্ব্বের আমার সীমা নেই। স্ত্রীর কাছ থেকে হিন্দু খত জোর ক'রে নেয় না, যে নেয় সে হিন্দু নয়। দু'হাত এক যেদিন হয়, কারোরই পৃথক অস্তিত্ব আর থাকে না—জীবনে, মরণে সে বন্ধন অচ্ছেদ্য, এ আমি বিশ্বাস করি, অনুভব করি। তুচ্ছ খতের স্থান এর মধ্যে কোথায়! হিন্দু যদি অহিন্দুভাবাপন্ন হ'য়ে এর সম্মান রক্ষা না করে তবে তাকে শাসিত কর, দণ্ড দাও; কিন্তু তার দোষে হিন্দু-সমাজের দোষ দাও কেন? আত্মহত্যা কর কেন? দেশদ্রোহিতা কর কেন? জাতীয়তার পায়ে কুঠারাঘাত কর কেন? এরই প্রতিবিধান ক'রতে 'স্বাতন্ত্রের' প্রয়োজন — ধর্ম্মপত্নীর এটা কর্ত্তব্য। নইলে জীবনে মরণে বন্ধন যে অচ্ছেদ্য রাখা যায় না!

স্কুলের আমার সেই দেখন্‌হাসি তুমি, আমার মনো-রাজ্যের সেই প্রফুল্ল কুসুম, কথাগুলো ভেবে দেখো ভাই। মন ভাঙ্গবার আমি গুরু, তুমিই বলেছ'। তোমার মন ভেঙ্গে গড়বার নিমিত্ত যদি হই, তা' হ'লে কৃতার্থ হ'ব। তোমাদের 'চড়ুই পিঠে'তে আমি নিশ্চয়ই যেতুম। কি ক'রব ভাই, আজ বাঁউনী বাঁধা। তারপরে তিন দিন 'পিঠে ভাতের' আয়োজন করা আছে। যাই কি ক'রে!

চিঠি লেখা প্রায় শেষ, দুড় দুড় ক'রে লছমী এসে চিঠি খানা ধ'রে মা'রলে এক টান। তাকে সাম্‌লে ব'ললুম, 'মাসীর চিঠি জানো'? সুর ধরেছে সে, মা-চি যাবো—

তোমাদের ললিতা

দুই

হাসি নামের পুনঃ সংস্করণ 'হ্যাস্‌না'। লঘু বা গুরু-করণে বা অন্য কি প্রক্রিয়ায় এর উৎপত্তি আন্দাজ ক'রতে যে পারে ক'রবে, তবে ললিতা ছাড়া জানা শোনা সকলের আর নাকি-সুরের 'আদ-বোলা' অজানাদের কাছে হাসি নাগের চেয়ে 'হ্যাস্‌না ন্যাগের' কদর বেড়ে যায়। 'নাম পরতাপে' সমপুচ্ছধারীদের 'না জানি কতেক মধু' ভাব বিভোরতা আর তারই ফলে একজনের 'জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো' দশা প্রাপ্তি হওয়ায় মিস্ হ্যাস্‌না ন্যাগ হ'য়ে যায় মিসেস্ হ্যাস্‌না ডট্। হ্যাস্‌না তখন স্কুল থেকে সবে কলেজে ঢুকেছে।

'কচিমেয়ের অবস্থার রূপটিতে পরিবর্ত্তন প্রস্তাবে বিলেত ফেরত মিষ্টার ন্যাগ্ 'শক্‌ড্' (shocked) হয়েছিল কিনা জানা নাই কিন্তু প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল বটে। আর স্কুল-সহচরীদের কাছে হ্যাস্‌না চ'খ টেনে টেনে দম নেবার ধরণে বলেছিল, "ও ডিয়ার, ডিয়ার আই এ্যাম্ গোইং টু বি স্যাক্রিফাইস্‌ড" (oh dear dear, I am going to be Sacrificed—ওঃ আমাকে ওরা বলি দেবে) সহচরীদের সহানুভূতি আর আপশোষের তাতে বন্যা ব'য়ে যায়। এ সব কিন্তু বন্ধ ক'রে দেয় মিসেস্ ন্যাগ্। মিষ্টারকে মিসেস্ নিভৃতে ব'লে, "ন্যাকা সেজে কেলেঙ্কারী বাড়াবার রাস্তা তুমি ক'রতে পার', আমি পারি না। পরের ওপর 'অন্ধবিশ্বাস' 'অজ্ঞানতা' আর বাঁধাবুলি যত পার' আওড়াও, কিন্তু ঘর সাম্‌লে। তা ছাড়া এই যোগাযোগে কত টাকার মালিক তোমার মেয়ে হবে ভুলে যাচ্ছ!"

মিসেসের বাক্যবাণে ময়ূরপুচ্ছধারীর নগ্ন অবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে বিলম্ব হ'ল না। তার আপত্তির ক্ষীণ হ্রেসা আকাশে মিলিয়ে গেল'। কাতর ভাবে সে কিন্তু ব'ললে, "ওরা টাকার কুমীর বটে কিন্তু ছেলেটা—"

"মুখ্যু, ক্লাউন্ বিশেষ এই ত'! কোনও ভাবনা নেই। তার জন্যে অপদস্ত পাঁচজনের কাছে তুমি না হও, সে ভার আমার—"

"ব্যস্ তাহলেই হ'ল।"

মেয়েকে ডেকেও মা চুপিচুপি কি ব'ললে। 'ন্যাগ্-ডট্' মিলনের ব্যবস্থা পাকা হ'য়ে গেল'।

তখনও হবু 'ডট্' দত্ত। শিক্ষানবিশী তার সুরু হ'ল। হারমানের স্যুটে অঙ্গ ঢেকে, 'ফার্পো' আর 'এম্পায়ারে' ঘন ঘন 'বার' দিয়ে ন্যাগ্ সমাজে তার সারত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। খবরের কাগজে মিলন-বিজ্ঞপ্তিতে তুলিকা-দক্ষতার শেষ আঁচড় দাগা হ'ল—দত্ত বনে গেল' 'ডট্'।

ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে কুড়িয়ে তা' বেচে সামান্য মূলধনে মোনা দত্ত ছোটো খাটো ব্যবসা ফেঁদে, আধপেটা খেয়ে, হাঁটুর ওপর কাপড় পরে কামড়ে প'ড়ে থাকে সেই ব্যবসা নিয়ে। লক্ষ্মী দয়া করেন—মোনা দত্ত ধুলো মুঠো ধ'রলেও তা' হ'তে থাকে সোণা মুঠো। হাঁটুর ওপর কাপড় তবু সে ছা'ড়লে না। ছেলে ন'কড়ির সম্বন্ধে সে কিন্তু মুক্তহস্ত। আহা-হা হবে না। সবে ধন নীলমণি ঠাকুরের দোর ধ'রে কত ক'রে পাওয়া! সে একটু হাঁ'চলে, কা'শলে, ডাক পড়ে বড় বড় ডাক্তারের। ছেলে মুখের কথা খসাতে না খসাতে যা চেয়েছে তাই তৎক্ষণাৎ হাজির হয়েছে। বাপের ইচ্ছে ছেলে লেখাপড়া শেখে। ন'কড়ি ইস্কুলেও গেল কিন্তু তা তার ধাতে বেশীদিন সইল' না। চ'খ র'গড়ে র'গড়ে রাঙা ক'রে বাপকে ছেলে একদিন ব'ললে, "আমি আর ইস্কুলে যাব' না।" ছেলের কাতরতায় বাপকে সায় দিতে হ'ল। মোনা দত্ত মনে মনে ব'ললে, "থাকগে, কাজ শিখে বজায় রা'খলে ওর অন্ন খায় কে।"

অন্ন খাবার লোকের অভাব হ'ল না—একে একে জু'য়ে জু'য়ে তারা জমায়েত হ'তে লা'গল'। তাদের ফুসলুনিতে মোটর হ'ল, বাগান হ'ল আরও হ'ল কত কি। মা ছেলের বিয়ের জন্যে উঠে-প'ড়ে লাগল'। মেয়ে দেখা হ'ল, কথাবার্ত্তাও ঠিক হ'ল। বৌ-আনা কিন্তু মায়ের কপালে ঘ'টল না। ওপারের ডাকে হঠাৎ একদিন তল্পী-তল্পা ফেলে মা' চলে গেল'।

ছেলেকে নিয়ে বাপ জড়িয়ে প'ড়ল আরও—আহা মা-হারা ছেলে। ছেলের তখন পালক উঠেছে, জড়ান সে থা'কবে! ইডেন্‌গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল্, লেক্—এসব ছেড়ে আট-হাতি ধুতি জড়ান বাপের নাকি সুর ব'সে ব'সে সে শু'নবে! টকি রঙ্গিণীদের রঙ্গকলায় তার মন রাঙা, বাড়ীর ভাঙ্গা কাঁসিতে কি মন ওঠে! তাই যদি উঠবে অন্নাহারীদের কসরতের দাম কি? শুধু কি তাই, ধাপে ধাপে তুলে 'সোসাইটীতে'ও তার গতিবিধির যোগাড়ে তারা লেগে গেল'। সেই যোগাড়ের ফেরেই তার ন্যাগ্‌নন্দিনীর সন্দর্শন সম্ভব হয়।

অষ্টপ্রহর ছেলের বার টানে বাপের মন খাঁ খাঁ ক'রলেও সে ভা'বলে, "থাক্‌গে মায়ের শোক এতেও যদি ভুলে থাকে, মন্দ কি!" কাগজের 'ন্যাগ-ডট্' সংবাদ আত্মীয়রা যখন তাকে শোনালে তখন সে হাহাকার ক'রে উঠল'—সে যে কন্যা মনোনীত ক'রে বাক্য দান করেছে!

বাপের হাহাকার ছেলেকে স্পর্শ ক'রলে না। অন্নধ্বংসকারীরা' ত' ছিলই তার ওপর ন্যাগ্ সাহচর্য্যে লোকবল তার বেড়ে গেছে। শেখা বুলি কপ্‌চে বাপকে ছেলে ব'ললে, অন্ধ সংস্কারের প্রশ্রয় দিতে সে পারে না।

চক্ষুষ্মান সংস্কারে ছেলে দীক্ষিত হ'ল। সে তেজ সহ্য ক'রতে না পেরেই বোধ হয় তার অল্প ক'মাস পরেই বাপ চক্ষু মু'দলে। সংস্কার-অভিযানে অগ্রসর ডট্ দম্পতীর সে কি অপূর্ব্ব সুযোগ! ন'কড়ি দত্ত, Nook Ayare Dot হবার তিন বৎসর পরে হাস্‌নার ললিতাকে 'চড়ুইপিঠা'তে আহ্বান।

'অগ্রগতি'র ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী তু'জনেরই নৈতিক সাহসের অজস্র প্রশংসা গণ্ডীবিশেষের লোকের কাছে হ'লেও তার প্রভাব ললিতার ওপর এতটুকুও বিস্তার করেনি। তবু ললিতা-বিজয়িনী সে হ'বেই হ'বে, হাস্‌নার প্রতিজ্ঞা।

তিন

পৌষ সংক্রান্তি। সূর্য্যোদয়ের পর থেকে ক'লকাতার রাজপথ দিয়ে দলে দলে নরনারী গঙ্গা-স্নানে চ'লেছে। গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব সম্পন্ন তারা ক'রবে গঙ্গা-

স্নানে, সাগর-সঙ্গমে অবগাহনের পুণ্য তাইতেই হ'বে মনে-প্রাণে তাদের বিশ্বাস।

সভ্যতাশাসিত ক'লকাতাতেও জনমনের এই অপূর্ব্ব উন্মাদনা প্রাণভরে ললিতা উপভোগ ক'রছিল, নিজের ঘরের জান্‌লার অল্প-সরান পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে। ললিতার মনে হ'চ্ছিল এরা হয়ত' অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কিন্তু এদেরই কল্যাণে দেশের প্রাণ এখনও ধুক্-ধুক্ ক'রছে। শিক্ষিত ব'লে গর্ব্ব করে যারা, তারা কিনা সেই প্রাণ-সংহারে উদ্যত—একি শিক্ষা!

সভ্য ব'লে যারা সুপরিচিত, 'নেশন্' ব'লে যারা জগতের মধ্যে গণ্য, এই ভাবে তাদের উৎসব-সমারোহের কথা ললিতা কেতাবে পড়েছে কত। গর্ব্বভরে তারা এসব উৎসবে যোগদান করে। জাতীয়তার অঙ্গজ্ঞানে এ সবের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা তারা করে। উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বালক যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সবার প্রাণ যেন একসুরে বাঁধা, জাতীয়-যজ্ঞে আহুতি দিতে সকলে যেন এক আত্মা। উৎসবানন্দের গভীরতায় জাতির জীবনী-শক্তির সংরক্ষণে ও সম্বর্দ্ধনে তারা বদ্ধপরিকর। আর আমরা!

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে আপনার মনে ললিতা ব'ললে, "এর কি কোনও উপায় নেই?"

ললিতার স্বামী নিতাইবাবু তখনও শয্যায় শুয়ে। লছ্‌মী কখনও বালিস টেনে, কখনও বাপের গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাপের ঘুম ভাঙ্গাবার ফিকির ক'রছে। ক'রলে হবে কি, বাপ যে জেগে ঘুমিয়ে—সে ঘুম ভাঙ্গান ত' সোজা নয়। ললিতার আওয়াজ পেয়ে 'ঘুমন্ত' নিতাইচন্দ্র ব'ললে—"উপায় ক'রলেই আছে—"

বাপ জেগেছে দেখে লছমী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। ললিতাও রঙ্গভরে স্বামীকে ব'ললে, "ক'রবে কে? মশাই নাকি!"

"আরে সে অধিকার থা'কলে এত বেলাতেও বিছানাতে কি মুখ ঘসড়াই! তা নাই হ'ক গে পিঠে-গুলো কি প'ড়ে থা'কত এতক্ষণ—"

ঘড়ির দিকে চেয়ে ললিতা দেখে সাতটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি ও-ঘরে সে গেল'। লছমীর নিত্য প্রাপ্য প্রভাতী সম্বর্দ্ধনা সাঙ্গ ক'রে নিতাই মুখ চ'খ ধুয়ে এলো। ততক্ষণে চা আর রেকাব ভরা পিঠা-পুলী নিয়ে ললিতা সেখানে হাজির। কালবিলম্ব না ক'রে মেয়েকে পাশে বসিয়ে নিতাইবাবু সে-সবের সদ্ব্যবহারে বসে গেল'। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, একজন ভৃত্য এসে একখানা কার্ড দিলে। কার্ডখানা প'ড়ে ভৃত্যকে নিতাইবাবু ব'ললে, "ব'সতে বল আমি যাচ্ছি"। ললিতাকে ব'ললে, "আরও কিছু উদরসাৎ ক'রবার লোভ হচ্ছিল, পোষপার্ব্বণ ত' বছরে দু'বার হয় না! যাক্ নিরুপায়, সাহেব এসেছেন। যাই—"

"ও কখানা খেয়ে নাও, তাতে যা দেরী হবে তাতে বেদ-কোরাণ অশুদ্ধ হবে না।"

"হ'লেও হুকুম যখন হয়েছে তামিল তা' ক'রতে হবে, কি বল' লছ্‌মী?"

দু'বছরের মেয়ে বাপের কথা শুনে কি বু'ঝলে কে জানে, বাপের কোলে উঠে মার মুখ পানে চেয়ে হেসে ব'ললে, "আব্বা" বাপও হেসে ব'ললে, "সেই ভাল তুমি আমার একটিনি ক'র। ললিতার কোলে লছ্‌মীকে দিয়ে বৈঠকখানায় সাহেবের কাছে গেল'।

নিতাই বাবুকে দেখে সাহেব একগাল হেসে ব'ললেন, "ধন্যবাদ নিতাই বাবু, সওগাত পেয়ে কি আনন্দ যে হয়েছে! খাবার দাবার যা হয়েছে চমৎকার। এর জন্যে মিসেসেরই ধন্যবাদ প্রাপ্য। আমার হ'য়ে আপনি তাঁকে তা' জানাবেন। আপনাদের পার্ব্বণে আমার মত মুসলমান প্রতিবেশীকেও আপনারা ভোলেন নি—"

"ও সব কি ব'লছেন, প্রতিবেশী আবার মুসলমান, হিন্দু কি!"

"কিন্তু—"

"কিন্তু এতে কিছু নেই মিয়া সাহেব, এসব আমাদের বাপ পিতাম'র দে'খতা—দেখা জিনিষ না ক'রলেই 'কিন্তু' বটে।"

"ওইখানেই মস্ত 'কিন্তু'। জ্ঞান তাঁদের চেয়ে আমরা উন্নত। তার পরিচয় নরলোকে পাচ্ছে ভায়ে ভায়ে মাথা ফাটাফাটিতে—"

হেসে নিতাই ব'ললে, "বাবুর্চ্চি, খানসামা, সমাজের

তুচ্ছ ক'রে খানাপিনা, বিয়ে-সাধির এত' রবরবা তবু উন্নতি ব'ললেন না!"

"যা বলেছেন নিতাইবাবু বিনি পয়সায় থিয়েটার দেখা, বেসুরো গাইলে অকৃতজ্ঞতা হয়—তা' বটে! যাক্ আমি আসি। যাবার সময়ে একটা কথা—আমরা যারা থিয়েটারের ধার ধারি না, এমনি ক'রে পরস্পরের হৃদয় এক সুরে বাঁধবার শক্তি যেন লাভ করি এই আমার আ'জকের দিনে প্রার্থনা—আদাব। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মিয়া সাহেবকে বিদায় দিয়ে নিতাইবাবু অন্তঃপুরে গেল'। গিয়ে দেখে ললিতা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিতে বাটীর দাসদাসী সকলকে পিষ্টক বিতরণ ক'রছে। গ্রহিতার চ'খে মুখে আনন্দের অপূর্ব্ব রশ্মি দেখে নিতাইবাবুর প্রাণ জুড়িয়ে গেল'—এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে ব'ললে,—

"তোমাকে কর্ত্রী ক'রে একটা ইস্কুল ক'রব ভা'বছি।"

নতুন রহস্যের অবতারণা দেখে লোকজনের সামনে বাড়াবাড়ি পাছে হ'য়ে পড়ে সেই ভয়ে হাসি চেপে সহজ ভাব দেখিয়ে ললিতা ব'ললে, "আজ কি আপিস্ নেই?"

"আচ্ছা—দেখ', ইস্কুলটার নাম দেবো জাতীয়তা-শিক্ষাপীঠ।" কথাগুলো বলে' হা'সতে হা'সতে নিতাই-বাবু চ'লে গেল'।

চার

মিনি রায়ের ভায়ের বাগান বাড়ীতে সখিগণসহ রঙ্গভরে হাস্‌নার সংক্রান্তি-পালন সুরু হয়েছে দিবা দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্ব হ'তে। স্যাণ্ডেল-শোভনা, নৃত্যশীল বস্ত্র-পরিধানা, বক্ষমুক্ত জ্যাকেট-জাজ্বল্যমানা, অনাবদ্ধ রুক্ষ চিকুরলম্বমানা যতেক ললনার আগমনাবধি পল্লীবাসী ও বাসিনীর ঔৎসুক্য আর চাঞ্চল্যের অবধি থাকে না।

তাদের সকলের ঘরেই পৌষ-পার্ব্বণ—বিচিত্র শোভিতাদের দর্শনে পার্ব্বণের আনন্দ তাদের যেন বৃদ্ধিই হ'ল। এ যোগাযোগ যে ক্বচিৎ হয়! একদিকে পার্ব্বণের অনাবিল আনন্দ অপরদিকে কৃত্রিম রঙ্গভঙ্গ। যোগাযোগ অপূর্ব্ব বৈকি!

বাগানবাড়ীতে গান সুরু হ'ল। আশপাশের লোক হাঁ ক'রে তা' শোনবার জন্য উৎকর্ণ হ'ল, গানের সঙ্গে হাসির হররায় গান বড় স্পষ্ট শোনা গেল' না। তবু তাদের মনে হ'ল, খুব মজা ওরা ক'রছে। বেশের ও বাসের দারিদ্র্য সত্ত্বেও এটুকু বুঝিতে পারা যায় কিনা!

এ ক্ষেত্রে হাসির বহরে মনে হচ্ছিল বাগানবাড়ীতে দিনদুপুরে যেন অশরীরিণীর হাট বসেছে। বাইরের শ্রোতাদের একজন ব'ললে, "মজা ত' খুবই হচ্ছে, ছেলেপুলে না আঁৎকে ওঠে—"

সেই সময়ে গায়িকা গাইছিল',

"ছেলো পুষী আমার অংশে
ভাত দেবো (তারে) পোষ মাসে
পোষ পালাল' হায় কি হ'ল
চালের গুঁড়ি অবশেষে।"

হিঃ, হিঃ, হিঃ আর ঘন করতালির মাঝে সেই গান শেষ হ'ল। চন্দ্রা ব'ললে, "গানখানা রেকর্ড করাবার মত, না হাস্‌না দিদি? অল্প কথায় বুজরুকি—"

ললিতার চিঠি প'ড়ে হাস্‌না দ্বিগুণ উৎসাহে 'চড়ুই-পিঠে'র আয়োজনে মত্ত হয়। বাগানে পালা আরম্ভ হওয়া থেকে কিন্তু তার রোখ্ কমে যায়—যার ভাবের বিরুদ্ধতায় এত উৎসাহ, এত আয়োজন তাকে ত' স্পর্শ ক'রতে পারা গেল না, তাহ'লে! চন্দ্রার কথা শুনে হাস্‌না ব'ললে "নাঃ ওসব—" ব'লতে ব'লতে হঠাৎ তার কি মনে হ'ল, দাঁড়িয়ে উঠে আঙুল নেড়ে সে ব'ললে, "ঠিক বলেছ' চন্দ্রা এ গানটা রেকর্ড ক'রবার যোগাড় দে'খতে হবে; ললিতা—"

হেনা হেসে ব'ললে, "ললিতা ত' পলায়িতা। যারা এখন হেথা, তাদের পাকস্থলী যে নিপীড়িতা। 'পুষী'রও ব্যবস্থা গানে অন্ততঃ কিছু হয়েছে, কিন্তু মিসি আর মিসেসরা—"

মিনির ওপর ছিল 'খাওয়ান-দাওয়ান'র ভার। সে অল্প অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললে, "সব ঠিক্ আছে ভাই, এই বয় (boy)?"

ধড়াচূড়া পরা খান্‌সামা এসে হাজির হ'ল। মিনি হুকুম ক'রলে, 'খানা'। অল্প সময়ের মধ্যে 'খানা' পরিবেশন হ'ল টেবিলে। কেক্, টোস্ট, চপ্, কাটলেট প্লেটে প্লেটে সজ্জিত। প্লেটের পাশে ধূমায়মান গরম চা।

চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে একজন ব'ললে, "এর সঙ্গে দুখানা ভাজা পিঠে হ'লে মন্দ হ'ত না, 'নেম্' রক্ষেও হ'ত!"

ভুরু কুঁচ্‌কে হাস্‌না ব'ললে, ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল (disgraceful) দোহাই পিক্‌নিকের স্পিরিট্ নষ্ট কোরো না—"

চন্দ্রা—"খেয়ে উঠে স্পিরিট্‌টা দাঁদড়ে রা'খতে হবে। চালগুঁড়ো, আলুসিদ্ধ সব ঠিক আছে দেখেছি—"

মিনি—"তাতে নুন্ আর আর সব আমি আর এলা দিয়ে রেখেছি।

এলা—"ওই পর্য্যন্ত আমি আর ওতে নেই। বাকি সময়টুকু বাগানে ঘুরে ফিরে আমি কাটাব তা' কিন্তু ব'লে রা'খছি।"

চন্দ্রা—"যার যা খুসী করগে, পিঠের সপিণ্ডকরণ না ক'রে পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

খাওয়া হ'লে প্রায় সকলেই গেল পিঠের সপিণ্ডকরণ ক'রতে। চন্দ্রা দেখে আলুসিদ্ধ গোবরঘাঁটা। মুরুব্বীর মত মাথা নেড়ে ব'ললে, "আরও ময়দা মেশাতে হ'বে।"

তথাস্তু তাই হ'ল। ময়দা প'ড়ল আলুর আধাআধি। মিনি আর থা'কতে পারলে না। সে ব'ললে, "তাহলে আরও নুন্ ত' দিতে হবে।" মুখেও বলা আর সঙ্গে সঙ্গে নুনও ঢালা ঠোঙা উজাড় ক'রে। ২০।২৫টা আলুতে প'ড়ল সেরখানেক নুন্। দ্রৌপদীর এক একটা মহা-সংস্করণ এরা, এক সের দু'সের নুনে এদের কি হবে!

এলা সেখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছিল। পালাতে পারেনি হাস্‌না ঘাঁটি আ'গলে ছিল' ব'লে। সপিণ্ডকরণ প্রকরণ বোধহয় একঘেয়ে হওয়ায় হাস্‌না বাগানের দিকে ধীরে ধীরে এগুল'।"

বাড়ীর সামনেই পুকুর। তার দুপাশে কেয়ারী-করা ফুলের বাগান। বাঁ পাশের বাগান দে'খতে দে'খতে হাস্‌না গেল, 'হট্-হাউসে'র দিকে। সেখানে পৌঁছে 'হট্-হাউসে' না ঢুকে সে গিয়ে প'ড়ল নারকেল বাগানে। স্থানটা নির্জ্জন।

হাস্‌না নির্জ্জনতাই যেন খুঁজছিল। বিশ্রাম ক'রবার উদ্দেশ্যে একটা ঢিপির ওপর সে ব'সল। উত্তেজনার পরে অবসাদ এসেছে। অবসাদ ভারে ভাসা ভাসা কত কথা মনে উদয় হচ্ছে আর তাতে নেতিয়ে প'ড়ছে সে যেন আরও।

গালে হাত দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে চুপ করে হাস্‌না বসে আছে। পিছন থেকে একজন এসে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ তা'কে ক'রলে। হাস্‌নার স্বপন ভেঙ্গে গেল। ভয়ে সে আর্ত্তনাদ ক'রে উ'ঠল। মুহূর্ত্তে কোথা থেকে কে এসে সজোরে আঘাত ক'রলে নারী-নির্য্যাতনকারীকে।

আলিঙ্গন হ'তে মুক্ত হ'য়ে হাস্‌না দেখে ভদ্রবেশধারী একজন ভূলুণ্ঠিত আর তার কণ্ঠ পেষণ ক'রে দাঁত কিড়মিড় ক'রছে 'অভদ্র'-বেশ দৃঢ়পেশী কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক। অদূরে দাঁড়িয়ে লাঠী-হাতে ইস্পাতের মত মজবুত একজন মুসলমান।

মুসলমান যুবক অপর যুবককে ব'ললে, "ছেড়ে দে, ম'রে যাবে।" হাস্‌নার দিকে চেয়ে ব'ললে, "তোমাদেরই জাতের মুখে শুনেছি মা, মেয়েমানুষ দশহাত কাপড়েও ন্যাংটা, কোন সাহসে একা তোমরা বেরোও কে জানে।"

ছাড়ান পেয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে ভদ্রবেশধারীও চমকে উঠল, "এ্যাঁ তুমি এলা নও—!"

আকস্মিক ঘটনায় হাস্‌নার বুক ধড়ফড়ানি তখনও কমেনি। অপরিচিতের মুখে এলার নাম শুনে সে স্তম্ভিত হ'ল। এলার বাগানে ঘুরে ফিরে বেড়ানর কথা তার মনে প'ড়ল। বাগানবাড়ীতে দশের মাঝে তার চঞ্চল ভাবের অর্থ তার কাছে সুস্পষ্ট হ'ল। তারই এখানে এখন আসবার কথা। তার বদলে সে এসেই এই বিপত্তি। আরক্তিম মুখ তার সে নত ক'রলে।

ওদিকে হাস্‌নার উদ্ধারকর্ত্তাদেরও বিস্ময়ের সীমা নেই। "এ্যাঁ, এ যে জমীদারবাবু, দূরের ওই মস্ত বাড়ীর মালিক। ফ্যাঁসাদে ফে'লবে না ত'। ফেলে ত' আর কি ক'রব, চখের সাম্‌নে —"

ভোঁ, ভোঁ ক'রে একখানা মোটর বাগানবাড়ীতে ঢু'কল। নিতাইবাবু ললিতাকে নিয়ে হাজির। মোটরের আওয়াজ শুনেই জমীদারবাবু চঞ্চলচরণে বিপদের সীমানা পার হ'ল। অপর দু'জনের 'ঘর' ওই লাগোয়া জমিতেই। তারাও নমস্কার ও সেলাম ক'রে চ'লে গেল'।

কৃতজ্ঞ নয়নে তাদের বিদায় দিয়ে পাংশুবদনে হাস্‌না

বাগানবাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল। কাছাকাছি গিয়ে হাস্না শু'নলে ললিতা ব'লছে, "হুঁ ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে দেখনহাসি বুঝি ঘুরে বেড়াচ্ছে।" পা তার যেন টেনে ধ'রলে। তা ছাড়িয়ে তাকে এগুতে হ'ল।

হাস্নাকে দে'খতে পেয়ে ললিতা দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে।'

"সব ফেলে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি ভাই। আ'সব' না বলেছিলুম কিন্তু থা'কতে পা'রলুম না। কি খাওয়াবে চল, উনি গাড়ীতে বসে—"

সহর্ষে হাস্না ব'ললে "দুজনে এসেছ' বেশ করেছ।" বলেই যেন সে বেদম হ'য়ে গে'ল'।

ললিতা তা' লক্ষ্য ক'রলে। সে এসেই দেখেছে মিনি, হেনা এরা সবাই সে আ'সতে কোনও রকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কেমন যেন সব ছাড়া ছাড়া কথা। "তা' হ'লে এরা আমাকে চায় না"—ললিতার মনে হ'ল। সে ব'ললে, "তবে আসি ভাই, নেমন্তন্ন ত' রাখা হ'ল—"

হাস্না—"সে কি একটু চা—"

ললিতা—"পৌষপার্ব্বণে চা, অবাক্ ক'রলে—"

হাস্না ললিতার হাত দুটো চেপে ধ'রলে—"আমাকে শাস্তি দিওনা দেখনহাসি, ওঁকে ডাক'—"

সখীর সেই মধুর আহ্বানে ললিতা রুদ্ধ কণ্ঠে ব'ললে, "একান্ত ছাড়'বে না ভাই, তা হ'লে তুমিই ওঁকে ডাকো।"

হাস্নার একা যেতে কিন্তু পা এগুল' না। ললিতার হাত ধরে সে ব'ললে, "তুমিও এসো ভাই।"

অগ্রগতিশীলা সখীর এই ইতস্ততঃ ভাবে ললিতা তার মুখের দিকে চেয়ে দে'খলে, কিছু বুঝতে পা'রলে না। তার সঙ্গে সে গেল'।

সকলে দ্বিতলে উঠবে এমন সময়ে বাগানের উড়ে মালী এসে জিজ্ঞাসা কর'লে, আলু সিদ্ধ প্রভৃতি কি হবে?

ললিতা তা' শুনেই ব'ললে, "তাহলে ত' সব তৈরী, চল হাতাহাতি করে দু'খানা ভেজে নেই—"

হাস্না নিরস্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রলে, কোনও ফল হ'ল না। এগিয়ে পিঠের মালমশলা দেখে ললিতার হেসে দম বন্ধ হবার উপক্রম—

"একি—এ কোন দ্রব্য—যাক্ চা ছাড়া বরাতে আর কিছু নেই—তাই সই চল'—"

পাঁচ

চা-পানান্তে সস্ত্রীক নিতাইবাবু চ'লে যাবার পরে হাস্না মিনিকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এলা কই—"

মিনি—"অনেকক্ষণ ত' সে নেই, বাগানে কোথাও—"

হাস্না—"ললিতা এসে, চ'লে গেল' আর সে উদ্যান সৌন্দর্য্য নিয়ে রইল, বেশ! বাড়ী ফে'রবার সময় হয়েছে এইবার যাওয়া যাক্ চল'। হ্যাঁ চন্দ্রা 'সপিণ্ডকরণ' কি কাঁচাতেই হ'ল! সে যা হ'ল হ'ল কিন্তু তোমরা এত' অন্যমনস্ক কেন?"

স্পষ্ট কথা কারও কাছে পাওয়া গেল'না। দৃঢ়ভাবে হাস্না তখন জিজ্ঞাসা ক'রলে, "তোমরা আমার আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছিলে?"

"কোনও উত্তর নেই তবুও। হাস্না ব'ললে, "তা' হ'লে পেয়েছিলে। পেয়ে কেউ একটা আঙ্গুলও নাড়নি, উড়ে মালীটাকেও সাহায্যের জন্যে পাঠাওনি—"

মিনি তাড়াতাড়ি ব'ললে, "মালী তখন ছিল না, খান্‌সামাও একটু ছুটি নিয়ে গিয়েছিল।"

হাস্না—ছিল কেবল অসভ্য দুটো বর্ব্বর কোথায় ওঁৎ পেতে কে জানে! মায়ের আর্ত্তনাদে মা, মা, ব'লে তারা ঝাঁপিয়ে প'ড়ল—এদের আমরা ঘৃণা করি আর এরা—"

অশ্রু আর বাধা মা'নল না। কক্ষ নীরব নীথর ক্ষণপরে হাস্না ব'ললে "কই এলার ত' এখনও দেখা নেই।"

মিনি তখন ব'ললে, "খান্‌সামাকে সঙ্গে নিয়ে অনেকক্ষণ সে বাড়ী গেছে। আগে ব'লতে বারণ করেছিল ব'লে বলিনি—"

হাস্না—"বাড়ী গেছে, আঃ বাঁচলুম। পিকৃনিক্‌টা জবর হ'ল। এই নাও একখানা চিঠি, বাগানে কুড়িয়ে পাওয়া—যার ইচ্ছে 'সুভেনর' স্বরূপ রেখ'।"

চিঠিখানা এলার লেখা। যাকে লেখা তাকে তারা কেউ জানে না। তবু এই মেয়েদের পিক্‌নিকে সে পুরুষ হলেও তাকে এলার প্রীতিভরে আহ্বান। আগমনটা

অবশ্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোপনে সারবার ইঙ্গিত আছে।

মিনি এতক্ষণে কথা কইলে। সে ব'ললে, "একজনের দোষে—"

হাস্না—"হাড়ির ভাত একটা টিপেই ত' লোকে দেখে। যাক্ এর যবনিকা এইখানেই পড়ুক।"

যখন তারা মোটরে রওনা হ'ল আশ-পাশের কুটীর-বাসীরা উঁকি মেরে একবার তাদের দে'খলে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হাস্না বাড়ী ফি'রল। মিঃ ডট্ সাজগোজ ক'রে বসে আছে বেরুবার জন্যে। সাহেবের কাছে না গিয়ে হাস্না সরাসর চ'লে গেল' ড্রেসিং রুমে। মেম্সাহেবের রকম দেখে ডট্ গেল' ভড়কে, কি হ'ল আবার! তাড়াতাড়ি সে ছু'টল মেম্সাহেবের কাছে—মন রাখা দুটো কথা ব'লে যদি সরে প'ড়তে পারে।

ঘরে ঢুকে সাহেব দেখে হাস্না যবুথবু হ'য়ে ব'সে। এগিয়ে গিয়ে সাহেব ব'ললে "সারাদিনের এত্তে ভারী ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না?"

ব'সে ব'সেই হাস্না ব'ললে. "না, এই কাপড়-চোপড় ছাড়ি, ততক্ষণ তুমি ও' ঘরে যাও।"

ডটের বেরুনো ঘুরে গেল! ব'সতে হ'ল তাকে 'ও ঘরে'। ইত্যবসরে হাস্না মুখ হাত ধুয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে নিলে। 'ওঘরে' যেতে কিন্তু আর উৎসাহ নেই। তার ইচ্ছে সে খানিক একা থাকে। কি ক'রবে সে ভা'বছে আধ আধ স্বরে 'মা-চি' ডাক তার কানে পৌছল'। ডাক লক্ষ্য করে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল'।

সিঁড়ির মাথায় পৌছুতে না পৌছুতে হাস্না দে'খলে লছ্মীকে নিয়ে ললিতা এসেছে। অধীর আনন্দে সখীকে সে ব'ললে, "এর মধ্যে আবার—"

ললিতা—লছ্মীর জ্বালায়। কেবল বলে 'মা-চি' আমিও ব'ললুম তবেরে মা কেউ নয়, চ'ল তোকে 'মা-চি'র কাছে রেখে আসি—"

সোহাগভরে লছমীকে ললিতার কোল থেকে নিয়ে হাস্নার প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল'। তার মুখ চুম্বন ক'রে সে ব'ললে, আমার কাছে থা'কবে লছ্মী?"

লছমী হেসে ললিতার দিকে হাত বাড়িয়ে ব'ললে, "মা"!

ললিতা—ওই নাও মা, মেয়ে দুজনেই থা'কবে—বেশ বলেছিস লছ্মী—

'লছ্মী আমিও আছি'—সিঁড়ি থেকে আওয়াজ শোনা গেল'। ললিতা হেসে ব'ললে, "ওই আরও খদ্দের।"

অপ্রস্তুত হ'য়ে হাস্না ললিতাকে ব'ললে, "তুমি যেন কি উনি নীচে একবারও বলনি?"

লছমীকে কোলে করেই হাস্না দালান থেকে গেল 'ওঘরে'। মিঃ ডট্ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে ব'ললে, "আসুন আসুন নিতাইবাবু, আমার কি সৌভাগ্য—"

সিঁড়ির ধাপ কটা উঠতে উঠতে নিতাইবাবু ব'ললে, "তা বিলক্ষণ নইলে এই রাত দুপুরে এত' ঝামেলা কারও ঘাড়ে পড়ে—"

সহাস্যে মিঃ ডট্ ব'ললে, "ঝামেলা! তা আপনারও ত' কম কিছু নয় দে'খছি, ঘাড়ে ও কি?"

নিতাই—দুটো চাল গুঁড়ো। আরও কি কি আছে ব'লবার হুকুম নেই।

ব'লতে ব'লতে নিতাইবাবু সাহেবের সঙ্গে ও-ঘরে অর্থাৎ ড্রয়িং রুমে ঢু'কল। সাহেব তার আগেই 'ভার' বহন থেকে নিতাইবাবুকে রেহাই দিয়েছিল।

এ দিকে হাস্না গাঢ় স্বরে ললিতাকে ব'ললে, "দিদি—"

লছমী হেসে ব'ললে, "মা, মা"

আদর সোহাগে মথিত করে লছমীকে স্নেহ-চুম্বন দান করে হাস্না ব'ললে—ঠিক বলেছ', দিদি নয় মা। মা নইলে এত' স্নেহ আর কার বুকে! মার ভালবাসা না হ'লে এই রাত্রে—"

ললিতা—"খুব হয়েছে ঘরে চল' একটা কথা আছে।"

হাস্নার ঘরে দু'জনে গেল'। ঘরে গিয়ে লছমী কিন্তু সুর ধ'রলে—"বাবা যাব—"

ললিতা—"মা, মাসীর সখ মিটল বুঝি এবার—"

হাস্না—ও যে লছমী একজনের কাছে বাঁধা কি থাকে!

হিঃ হিঃ করে হেসে 'মা-চি'র কোল থেকে মায়ের কোলে লছমী ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। মেয়ের মুখের সামনে

আঙুল নেড়ে মা মেয়েকে ব'ললে, "মা-চিকে এখন কি ক'রতে হ'বে ব'লে দাও ত'।"

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে লছ্মী ব'ললে—"কাবো কাবো।"

ললিতা—"ঠিক্ বলেছে। দেখন্ হাসি তার আগে একটু কাজ আছে। রাগ কর' না তোমার ঘরে আজ লক্ষ্মী পাতিয়ে যাবো—রাজি? চুপ ক'রে রইলে যে!"

হাস্না—"কথা যে যুয়োচ্ছে না। অভ্যাসের দোষে মুখে আস্ছে 'না'—ব'লতে ত' পারছি না।"

ললিতা—"হৃষিকেশ যে হৃদিস্থিত ব'লবার যো কি! তা হ'লে সাহেবের হুকুম নিয়ে এসো।"

হাস্না—"সাহেবের ঘরে লক্ষ্মী—"

ললিতা—"আবার বেস্থরো। জেনেও জান' না লক্ষ্মীর বরপুত্র সাহেবরাই যে! যাও রাত হয়ে যাচ্ছে। লছ্মী এদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

ললিতার কোল থেকে লছমীকে সযত্নে নিয়ে হাস্না তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে, তার পরে ললিতার দিকে চেয়ে একটু আবেগভরেই সে ব'ললে, "চেষ্টা ক'রে পাতবার আর দরকার কি, লক্ষ্মী ত আপনার আসন আপনিই দখল ক'রলে" নির্নিমেষে ঘুমন্ত লছমীর দিকে খানিক চেয়ে হাস্না আবার কি ব'লতে যাচ্ছিল, ললিতা তাতে বাধা দিয়ে ব'ললে, "যাও ভাই সাহেবের কাছে।"

ধীরে ধীরে হাস্না কক্ষান্তরে গেল'।

* * * *

ঘড়িতে ৯টা বেজে গেছে। অত রাতে মিঃ ডটের বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল'। প্রতিবেশীরা তঃ অবাক্ সাহেব বাড়ীতে শাঁক বাজে! শাঁকের শব্দ শুনে ডট্ সাহেবও সচঞ্চল। মুখ টিপে হেসে নিতাইবাবু ব'ললে, "দেখুন না এগিয়ে ব্যাপার কি?"

অন্যমনস্কভাবে সাহেব ব'ললে, "হ্যাঁ আপনিও আসুন না।"

সাহেব গিয়ে দে'খলে হাস্নার শোবার ঘরের লাগোয়া ছোট ঘরটা ধূপ-ধুনার গন্ধে আমোদিত। রক্তবস্ত্র পরিহিতা হাস্না 'ঠাকুর' নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াল'। মুখে তার অনির্ব্বচনীয় শোভা—রূপ দেখে সাহেব মুগ্ধ!

"হাস্না, হাস্না!"

গলবস্ত্র হ'য়ে স্বামীকে প্রণিপাত করে হাস্না ব'ললে "হাস্না নয়, হাসি—"

নিতাই—"চ'খ চেয়ে দে'খ ওরে ভোলা
হাসিরাশির মিলন মেলা"

ডট্—"আর আমি কি হাসি?"

হাসি—"যা তোমার ইচ্ছা।"

নিতাই—"নিয়ে তোর বেসাতির ডালা
কুক্ দিয়ে কর কিনিবিকি।"

ডট্—আজ যদি বাবা, মা থা'কতেন—"

ললিতা—(হাসিকে) "বল ভাই, অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে আনন্দে তাঁরা আজ আত্মহারা।"

হাসি—তোমারই কৃপায়।

ললিতা—দূর তোর চড়ুই পিঠের কল্যাণে।

হাসি—যাই হ'ক সত্যই আজ আমি লব্ধিতা-বিজয়িনী, নিবিড়ভাবে তোমায় পেয়ে।

চাঁদ ও মেঘ

শ্রীব্রহ্মগোপাল মিত্র, বি. এ.

চাঁদ আসিয়া মেঘেরে শুধায়—তুমি ওগো শঠ বড়,
ভুবন-মাতানো হাসিটি আমার আবরিয়া কেন মর?
মেঘ হাসি কয়—আমি আছি বলে তোমার রূপের শোভা,
বিশ্বধরার যতেক জনার হইয়াছ মনোলোভা।
জীবন মধুর করিয়াছে দেখ জীবনের আলোছায়া,
আমার পাশেতে ঠাঁই বলে তাই উজলিছে তব কায়া॥

রোগ নিবারণে খাদ্যের প্রভাব

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর, এম্. এস্‌সি

কথায় বলে, "মুড়ি আর ভুঁড়ি ভাল থাকলেই শরীর ভাল থাকে।" মাথা ঠাণ্ডা ও মন সুস্থ, পেটটী ভাল থাকলেই আর সব ভাল থাকে। তার মধ্যে আবার পেটটি ভাল থাকা সর্ব্বাগ্রে দরকার। কারণ পেট ঠিক থাকলে মাথাও প্রায় ঠিক্ থাকে।

পেট ভাল থাকা না থাকা আমাদের আহারের উপর নির্ভর করে। শরীর বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যই জীবের প্রাণ, খাদ্যই আবার তাহার ঔষধি। আয়ুর্ব্বেদ "স্বস্থাতুরপরায়ণ"। রোগ হইলে তাহার প্রতীকার করা যেমন আয়ুর্ব্বেদের কর্ত্তব্য, ঠিক তেমনি কর্ত্তব্য তার সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা করা। এখন সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হ'লে—যাতে তার রোগ না হয় তার ব্যবস্থা করতে হ'লে—প্রথমেই জানতে হবে যে রোগ হয় কেন।

রোগোৎপত্তির কারণ কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের দেশে বহু কাল পূর্ব্বে হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে যে বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল তার একটা বিবরণ আমরা চরক-সংহিতায় দেখতে পাই (সূত্রস্থান, অধ্যায় ২৫)। রোগ উৎপত্তির বহু কারণ বর্ত্তমান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় যে, "হিতাহারোপযোগ এক এব পুরুষস্যাভিবৃদ্ধিকরো ভবতি। অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাধিনিমিত্তমিতি।" একমাত্র হিতকর আহারই শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির কারণ এবং সমস্ত কারণের মধ্যে এক অহিতাহার সেবনই রোগ জন্মাইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

দু' হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মহর্ষি আত্রেয় এই মত প্রকাশ ক'রেছিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীর নব্য বৈজ্ঞানিক যুগে সুপ্রসিদ্ধ খাদ্যতত্ত্ববিদ্ ডাঃ স্যার রবার্ট ম্যাক্‌কারিসন ঠিক যেন ঐ কথার প্রতিধ্বনি করে বল্‌ছেন, "The right kind of food is the most important single factor in the promotion of health and the wrong kind of food the most important single factor in the promotion of disease."

এইবার প্রশ্ন উঠে, হিত আহারই বা কি, অহিত আহারই বা কি? এ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণ আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেখতে পাই। নব্য বিজ্ঞানও এ বিষয়ে বহু গবেষণা করেছেন ও করছেন। সে সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করা অসম্ভব। আমি এখানে কেবল কয়েকটী উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রীর কথা বলবো যেগুলি নিত্য খাওয়া অভ্যাস করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে।

আহার্য্য বস্তু ত' পৃথিবীতে অসংখ্য। তার মধ্যে ভালমন্দ বেছে নিতে হবে। উৎকৃষ্ট খাদ্য যা' আমরা নিত্য খেতে পারি তার একটা ফর্দ্দ আমরা আয়ুর্ব্বেদে পাই। যথা—শালি ধান (যেমন দাদখানি), যব, গম, নির্ম্মল জল, মুগ (কাঁচা মুগ, ভাজা মুগ নয়), সৈন্ধব লবণ, দুগ্ধ, ঘৃত, আমলকী, জাঙ্গল পশু-পক্ষীর মাংস ও মধু। শরীর স্থিতিকারক দ্রব্যের মধ্যে অন্ন, শান্তনাদায়ক দ্রব্যের মধ্যে জল, জীবনীয় অর্থাৎ আয়ুর্বর্দ্ধক দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, শরীর বৃদ্ধিকারক দ্রব্যের মধ্যে মাংস, বলকারক দ্রব্যের মধ্যে কুক্কুট মাংস এবং যৌবন স্থিতিকারক দ্রব্যের মধ্যে আমলকী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এখানে কয়েকটী জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। ফর্দ্দটী ভাল করে বিচার করে দেখলে অনেক তথ্য জানা যাবে। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাঙ্গালীরা সচরাচর যে সব খাদ্য খেয়ে থাকি তার কতকগুলির উল্লেখ এতে নাই। তরিতরকারী, ফল, মাছ ও তৈল এগুলি ত' আমরা প্রত্যহই খাই, অথচ এগুলি ফর্দ্দে নাই। সব রকম তরীতরকারী ও ফল নিত্য পাওয়া যায় না, সুতরাং নিত্য খাওয়াও চলে না। ঋতুভেদে বিশেষ বিশেষ ফল-মূলাদি খাবার কথা আয়ুর্ব্বেদে আছে। সেগুলি পালন করে চলাই ভাল। বাঙ্গালী নিত্য মৎস্য-সেবী, আর

ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৈলসেবী। এটা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বা মন্দ, সেটা ভাববার কথা। তরীতরকারির মধ্যে আলু বার মাস পাওয়া যায়, আমরা খাইও বার মাস। সেটা ভাল কিনা বিচার্য্য; অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদে আলু জাতীয় কন্দ-শাককে নিকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে ফেলা হয়েছে।

এই ত' গেল ফর্দ্দে যে সব খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ নাই, অথচ যেগুলি আমরা নিত্য খাই। এইবার দেখা যাক্, ফর্দ্দে যেগুলি আছে সে সম্বন্ধে আমরা কি ব্যবস্থা করি।

ভাত বা রুটী অবশ্য আমাদের নিত্য খেতে হয়। ভাত ভাল কি রুটী ভাল সে বিচারে কাজ নাই। আমি বলি, দুই-ই ভাল, যার যেরূপ অভিরুচি। লবণ আর জল না হ'লে আমাদের চলে না। তবে দেখতে হবে যেন জলটী নির্ম্মল হয়। তারপর ডালের কথা। বাস্তবিক আমরা কি ডাল খাই? যে সব সংসারে ডালের ব্যবস্থা হয় সেখানে প্রায়ই ডাল রান্না হয়, ডাল একদিকে আর জল একদিকে। একে ডাল খাওয়া বলে না। ডাল হবে পশ্চিমাদের মত বেশ চাপ চাপ। সস্তায় এমন পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘী-দুধ, মাছ-মাংস খাবার অবস্থা সবার নাই। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে ডাল খেতে বেশী পয়সার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ গৃহস্থেরা অনায়াসেই তার ব্যবস্থা করতে পারেন। তখন দেখবেন এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সহসা রোগ আসে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বল্‌ছি।

এইবার দুগ্ধ ও ঘৃত। শাস্ত্রে আছে, "ঘৃতং প্রাণম্"। এমন যে প্রাণ-রূপ ঘৃত তা' আমরা পাই না। অনেকেরই ঘি কেনবার পয়সা জোগাড় হয় না, আর কেউ বা ঘি খেয়ে হজম করতে পারে না। কিন্তু খাঁটী ঘি আমরা পাই কই? খাঁটী ঘি বা মাখন হজম করা কঠিন নয়; ডিস্‌পেপসিয়া রোগীও তা' হজম করতে পারে। আমার সঙ্গে একবার ট্রেণে এক যুক্তপ্রদেশের ভদ্রলোকের আলাপ হয়। কথায় কথায় তিনি বল্লেন, যে জীবনে তিনি কখন তেল খেয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁরা তরীতরকারি সমস্ত ঘিয়ে রাঁধেন, ভাত বা রুটীতে আর ডালে যথেষ্ট ঘি খান। আর খান দুগ্ধ। মাছ-মাংস স্পর্শ করেন না। স্বাস্থ্য তাঁদের বেশ ভাল, রোগও বড় একটা হয় না।

তারপর দুধ। দুধের গুণের কথা সম্বন্ধে আজকাল দেশে খুব প্রচার চলেছে। কৃষ্ণগোপালের দেশে দুধের প্রচার দরকার হয়, এইটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। দেশে উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব, তাই আজ এরূপ প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দুধ-ঘি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন আহার ছিল। প্রতিদিন একটু ক'রে দুধ খেতে হবে, এ কথা তখন বলবার দরকার হ'ত না। আমি সবাইকে বলি, একটু ক'রে দুধ খাও। কেউ উত্তর দেয়, পয়সা নেই; কেউ বা বলে, কল্‌কাতার দুধ খাওয়া জল খাওয়ারই সমান। কিন্তু সস্তায় খাঁটী দুধ পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? অন্য সব দেশে—ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে,—সাধারণের সহযোগিতায় সরকার থেকে এর ব্যবস্থা হয়; লোকে যাতে সস্তায় ভাল দুধ পায় তার চেষ্টা হয়। আমাদের দেশে সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, জনসাধারণও তাই। উভয়পক্ষের সমবেত চেষ্টা হ'লে কল্‌কাতার ন্যায় সহরেও টাকায় ১০।১২ সের বা ১৬ সের পর্য্যন্ত ভাল দুধ যে পাওয়া যায় না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এর জন্য কি কোনরূপ চেষ্টা হয়েছে?

গুড়-মুড়ি, ডাল-ভাত, ঘি-দুধ খেয়েই আগে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য বজায় থাক্‌তো, সে হ'ত কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ। চপ্-কাট্‌লেট্, চা-টোষ্টে পয়সা খরচ করে, অথবা কেবল ঝোল-ভাত খেয়ে শরীরের কতটুকু পুষ্টি হয়, কতটুকু রোগপ্রবণতা কমে? এ বিষয়ে দুধের ক্ষমতা অসাধারণ। আয়ুর্ব্বেদ মতে দুগ্ধ জরা ও ব্যাধিনাশক রসায়ন। চরক বলেন, জীবনীয় দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা আগেই বলেছি। সুশ্রুত বলেন (সূত্র, অঃ ৪৫), দুগ্ধ বিশেষভাবে মানুষের দেহানুকূল; ইহা বল-মাংসবর্দ্ধক, মেধাজনক এবং শরীরবর্দ্ধক ও পোষক; ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে পথ্যতম। নব্যবিজ্ঞান বলেন যে দুধের এমন একটা গুণ আছে যাতে উহা অন্ত্রের মধ্যে অনেক দূষিত পচনক্রিয়া নিবারণ করে। তা' ছাড়া দুধে জলের ভাগ অনেক বেশী থাকায় (শতকরা ৮৭ ভাগ) উহা

মজুর

মাজদিয়া ট্রেণ সংঘর্ষের কয়েকটি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য : বামে অন্তিম শয়নে বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দক্ষিণে স্বেচ্ছাসেবক পরিবেষ্টিত কতিপয় আহত ও নিহত ব্যক্তি।

২রা বৈশাখ কালরাত্রি (৩টা ২৩ মিঃ) ই. বি. আর. মাজদিয়া ষ্টেশনে ঢাকা মেল ও নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় উপরে তাহারই ধ্বংসস্তূপের ভয়াবহ দৃশ্য : বাম দিকে একটি মৃত বালকের শব দেখা যাইতেছে।

কিন্তু গবেষণার গণ্ডগোলে আসল কথা তলাইয়া গিয়াছে। এবার তাহাকে টানিয়া তুলি।

ষাঁড়মারী গ্রামটি বড় নহে। বাসিন্দারা অধিকাংশই অশিক্ষিত চাষী। এই চাষীদের এক গুরুঠাকুর ছিলেন, তাঁহার নাম তিনকড়ি অধিকারী। অধিকারী মহাশয় বাল্যকালে পাঠশালে প্রবিষ্ট হন বটে, কিন্তু শৈশব অবস্থা হইতেই তাঁহার মধ্যে একটি মহৎ অভ্যাস বিকশিত হইয়াছিল। অভ্যাসটি এই—পরদ্রব্যকে তিনি মোটেই লোষ্ট্রবৎ মনে করিতে পারিতেন না। পরদ্রব্য দেখিলেই তিনি কেমন একটা মায়ার বশে তাহা গৃহে লইয়া যাইতেন। এবং এই কার্য্যে তাঁহার কৌশল ও নিপুণতা যথেষ্ট দেখা যাইত। যাহা হউক, এই কার্য্যে কৌশলের জন্য গুরুমহাশয় তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম পুরস্কার দিয়া চিরবিদায় দিয়াছিলেন।

ইহার পরে বালক অধিকারী এক যাত্রার অধিকারীর সঙ্গ লাভ করিলেন। তিনি ঈষৎ তোত্‌লা ছিলেন বলিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহাকে যাত্রায় কেবল "সাজিতে" হইত, অর্থাৎ ঢালা আর সাজা। তারপরে পদোন্নতি ঘটিল—তিনি সখী সাজিতে লাগিলেন। পরে মাঝে মাঝে তিনি বিদুর এবং নারদও হইলেন। একবার বিদুরের অভিনয়-কালে তাঁহার পেটের গোলমাল থাকায় তিনি বক্তৃতার মাঝখানেই দ্রুতবেগে সভাস্থল ত্যাগ করেন। যাত্রার অধিকারীও দ্রুতবেগে তাঁহাকে বিদায়-দান করেন।

এইবার তিনকড়ি অধিকারীর সাত্ত্বিক জীবন আরম্ভ হইল। কিন্তু একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যাত্রায় থাকাকালে তিনকড়ি সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই তিন সন্ধ্যায় কড়ি আন্দাজ গঞ্জিকা সেবনের অভ্যাস করেন। তিনকড়ি নামটা সার্থক হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক্, যাত্রা-প্রত্যাগত তিনকড়ি অধিকারী ষাঁড়মারীর কৃষককুলের পুরোহিতের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনকড়ির পিতার পিতা কয়েকটি চাষীশিষ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। যাত্রার সখী, শাড়ী ও ঘুঙুর ছাড়িয়া যখন টিকিতে পাক লাগাইয়া আর নামাবলী গায়ে দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে আসিলেন, তখন চাষীদের দুষ্ট ছেলেরা বড়ই হাসাহাসি করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা বলিয়া উঠিল—

নাচ তো সখী, তিনিক্ তিনিক্
গাঁজায় দিয়ে দম!
সখী হ'লেন পুরুত ঠাকুর—
ঘণ্টা ঢঙর ঢং!

চাষীদের সর্দ্দার বৃদ্ধ মদন ধাড়া হাঁই হাঁই করিয়া উঠিল, বলিল—আরে থাম্ বেটারা! এমনতরো তো হবেই। কেউটের বাচ্চা কেউটে হবে নি গা? এনার ঠাকুর্দ্দা নটবর কি যে-সে বামুন ছ্যাল গা? চোখে যেন আগুন জল্‌ত। শাস্তর তেনার মুখে বুলবুলি হ'য়ে ছ্যাল। বেশ করেছ, দা' ঠাকুর, পুজো-আচ্চা করো, বাপ-পিতেমোর নাম রাখ।

তিনকড়ি পরম আহ্লাদে বিগলিত স্বরে বলিলেন—দেখ, ধাড়া, তুমিই আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দার কথা সব জান। বাবার কি তেজ ছিল জান তো? ও পাড়ার মহেশ কোলে বাবাকে কি একটা গাল দিয়েছিল; বাবা দিলে তাকে ব্রহ্মশাপ। তিন মাস যেতে না যেতেই দেনার দায়ে মহেশকে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ'ল। মনে আছে তো?

ধাড়া সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা আর নেই, দা' ঠাকুর? সাধে কি বলি, তোমরা কেউটে সাপের বাচ্চা? তোমাদের কি পড়্‌তে হয়, না জান্‌তে হয়?

*

কয়েক বৎসর পরে। তিনকড়ি অধিকারী মস্ত পুরোহিত। তিনখানা গ্রামে তাঁহার দপ্‌দপা। তাঁহার প্রভাতে গাত্রোত্থান; কড়িভোর গঞ্জিকা সেবন; তৎপরে স্নান, ঘন ঘন মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ঘাট ও পথ মুখরিত করণ; ললাট, নাসিকা, হস্ত ও বক্ষস্থলে চন্দন লেপন; নামাবলী ধারণ; পূজার্চ্চনা সাধন; মধ্যাহ্নে পুনরায় পবিত্র দ্রব্য সেবন; আহার; সুনিদ্রা; সন্ধ্যাকালে আরতি-বাদন; এবং সর্ব্বশেষে বন্ধুবান্ধব সহযোগে শঙ্করের প্রিয় সেব্য সেবন ও ভোলানাথের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গ্রামের মঙ্গল-অমঙ্গলের আলোচন।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়। হঠাৎ ষাঁড়মারীর লোকেরা একদিন শুনিল, তিনক্রোশ দূরে লাঙ্গলভাঙা

গ্রামে এক নাকি বড় ভট্টাচার্য্য আসিয়া টোল খুলিয়াছে। তাহার নাম দর্পনারায়ণ তর্কচঞ্চু। বয়স নাকি অল্প, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি তিনশত একাত্তরটি পণ্ডিতের দর্প নাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে তর্কে হারাইয়া দিয়াছেন।

খবরটা ধীরে ধীরে তিনকড়ি দা' ঠাকুরেরও কাণে আসিয়া পৌছিল। তিনি তুড়ি মারিয়া তাঁহার অনুরক্ত যজমানদিগকে বুঝাইলেন—আরে বাবা, ঢের দেখেছি। যাত্রার দলে দেশবিদেশে ঘুরতে তো আর আমার বাকী নেই, পুজো-আচ্চাও ঢের করলুম, আসুক না দপ্‌পোনারাণ আর তক্কোচিংড়ি। এ শম্মার কাছে পাত্তা পেতে হবে না। এমন শাস্তরের কথা তুলতে পারি, যার জবাব বেরুবে ওর পেট থেকে? ঘাড় হেঁট ক'রে যদি না চ'লে যেতে হয় তো নটবর অধিকারীর নাতিই আমি নই।

চাষারা উল্লাসে বলিল—এই তো কথার মত কথা, দা'ঠাকুর। নটবর ঠাকুরের নাতির মতই কথা। উত্তেজিত মদন ধাড়া বলিয়া উঠিল—দাওনা, দা'ঠাকুর দপ্‌পোনারাণের একবার ভিরকুটি ভেঙ্গে। লাগাও না একবার শাস্তরের লড়াই। তুমিই কি কম যাও? তোমার ঠাকুরদার পুঁথিপত্তর নিয়ে দাও দপ্‌পোনারাণকে জব্দ ক'রে।

কথাটা সমীচীন বটে। কিন্তু—তিনকড়ি মনে মনে প্রমাদ গণিল। আবার এতগুলি বিশ্বাসী ভক্তের সম্মুখে সে কি পিছ্‌পাও হইতে পারে? নটবরের নাতির হটিয়া যাওয়া কি উচিত হয়? সে বলিল—করো না একটা ব্যবস্থা, ধাড়া! আমি লড়্‌তে রাজী আছি।

ধাড়া বলিল—আচ্ছা, আমি খবর পাঠাই, দাঁড়াও।

*

ষাঁড়মারীর দলপতি মদন ধাড়া লাঙ্গলভাঙ্গার পণ্ডিত দর্পনারাণকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করিল। বলিয়া পাঠাইল, মহাপণ্ডিত নটবর অধিকারীর নাতি তিনকড়ি অধিকারী দর্পনারাণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। দিন স্থির হইয়াছে ৭ই কার্ত্তিক। স্থান বুড়োশিবের মন্দির। দর্পনারাণ না আসিলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার পাণ্ডিত্য নাই।

যে লোকের মুখে খবর গেল, দর্পনারাণ তাহারই হাতে পাল্টা জবাব পাঠাইল, সে যথাসময়ে তর্ক করিতে প্রস্তুত এবং তিনকড়ি অধিকারীকে সে মজা দেখাইয়া দিবে।

লোক ফিরিয়া আসিলে মদন ধাড়া, কেদার মণ্ডল এবং আরও অনেকে তিনকড়িকে বলিল—দা'ঠাকুর ঠিক ঠাক ক'রে নাও তবে। তোমার ঠাকুর্দ্দার পুঁথি থেকে অস্তর বেচে নাও।

তিনকড়ি বলিল—ভেবো না, হে, ভেবো না। নটবরের নাতি আমি। ঠাকুর্দ্দার তেজ যাবে কোথায়? দপ্‌পোনারাণকে কুপোকাৎ করবই।

*

৭ই কার্ত্তিক। বুড়োশিবের তলা। মদন ধাড়া, কেদার মণ্ডল, পাঁচু কোলে প্রভৃতি চাষীরা জমায়েত হইয়াছে। তাহাদের পিছনে বসিয়া আছে আরও অনেক গ্রামবাসী। সাম্‌নে দুইখানি কুশাসন পাতা। একখানির উপর দাঁড়াইয়া আছে মহাপণ্ডিত তিনকড়ি। তাহার পরণে লাল চেলী, গলায় চেলীর চাদর, কপালে সিঁদূরের ফোঁটা, টিকিতে জবাফুল বাঁধা, আর বগলে একখানা পুঁথি। সে ঘন ঘন পথের দিকে চাহিতেছে। দর্পনারাণ এখনও আসে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মাত্র তিনটি লোক সঙ্গে লইয়া পুঁথি হাতে দর্পনারাণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে শাদা কাপড়, গায়ে শাদা চাদর, পায়ে চটি, কপালে চন্দনের তিলক। লোকটি দেখিতেও মন্দ নয় বটে। দর্পনারাণ প্রবেশ করিতেই সভাতলে গা-টেপাটেপি হইল। মদন ধাড়া উঠিয়া বলিল—পেন্নাম হই, পণ্ডিত মশাই।—তারপর তিনকড়িকে দেখাইয়া বলিল—এনার সঙ্গেই আপনার বিচার হবে। ইনি হ'লেন আমাদের গুরুঠাকুর, মস্ত লোকের নাতি, বিশখানা গাঁয়ে যার দপ্‌দপা ছিল সেই নটবর পণ্ডিতের নাতি।

বেশ বেশ—বলিয়া দর্পনারাণ আসন গ্রহণ করিলেন। দুই পাঁচ মিনিট কাটিবার পরে তিনকড়ি উঠিয়া হাতে দুইটি তালি, বুকে দুই চাপড় মারিয়া টিকির জবাফুলটা একটু নাড়া দিলেন এবং দর্পনারাণকে বলিলেন দেখি, পণ্ডিত মশাই, আপনার শাস্ত্রজ্ঞান কি রকম! বলুন তো এই শাস্ত্রবাক্যের অর্থ কি? বাক্যটি হচ্ছে—গবা গড়াং।

পানীয় ও খাদ্য দুয়েরই কাজ করে, তৃষ্ণা নিবারণ করে আর প্রস্রাব সরল করে, প্রস্রাবের সহিত শরীরের অনেক দূষিত মল বাহির করিয়া দেয়, ফলে সহজে রোগ হ'তে পায় না। আবার দুধে চূণের ভাগ কিছু আছে ব'লে—দুধ খেলে দাঁতও ভাল থাকে। প্রত্যহ অন্ততঃ আধসের দুধ সকলের পাওয়া উচিত, পাঁচ পোয়া হ'লেই ভাল হয়।

যারা দুধ হজম করতে পারে না, তারা ঘোল খাবে। দই-ও ভাল জিনিষ, কিন্তু বারমাস খাওয়া উচিত নয়। চরক ও সুশ্রুত বলেন, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দধি প্রায়ই অপকারক হয়। কিন্তু ঘরে দই পেতে তাতে সামান্য জল মিশিয়ে মন্থন করে ঘোল প্রস্তুত ক'রে খাও, নিত্য খাও। দেখ্‌বে, রোগের হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেয়েছ। চার ভাগ দধি এক ভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে মন্থন করলে তাকে 'তক্র' বলে। এই তক্র সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত,—"ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্, ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ"—নিত্য তক্রসেবী সহসা রোগগ্রস্ত হয় না। যাদের হজমশক্তি খুব কম—তারা তক্রের ঘৃত তুলিয়া লইয়া পান করিবে। এইরূপ মাঠাতোলা ঘোল অত্যন্ত লঘু, অথচ বিশেষ হিতকর।

আমি এখানে কয়েকটী বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের কথা বল্‌লাম। আর বেশী বলে প্রবন্ধ বাড়াতে চাই না। কেবল একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, মানুষের উপর খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। এ প্রভাব এত বেশী যে, এমন কি তার দেহের আকারও পরিবর্ত্তিত হতে পারে। যেমন দেখা যায় যে, যে সব জাতি নিত্য যথেষ্ট পরিমাণ মাংস খায়—তাদের দৈহিক গঠনও যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশে শিখ ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত অঞ্চলের লোকেরা ইহার উদাহরণ। এমন লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ দেহ কমই দেখা যায়।

তারপর মনের উপরও খাদ্যের প্রভাব বড় কম নয়। নিরামিষভোজীরা স্বভাবতঃই শান্ত প্রকৃতির, মাংসভোজীরা স্বভাবতঃই কিছু উগ্র। অনেক বন্য জন্তুর মাংসাহার বন্ধ করিয়া দিলে দেখা যায় যে, সে খুব নিরীহ ও শান্ত হইয়া পড়ে।

সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার ভাল, কি বেশী আমিষ ভক্ষণ ভাল, এর বিচার না করেও আমি বল্‌তে পারি যে, সব রকম খাদ্যদ্রব্য কিছু খাওয়া অভ্যাস করা ভাল। চরকের কথা সকলেই মনে রাখ্‌বেন যে, বলকারক উপায়ের মধ্যে প্রধান উপায়—মধুর-অম্ল-লবণ প্রভৃতি ছয়টী রসই কিছু কিছু সেবন। আরও একটা কথা সর্ব্বাগ্রে মনে রাখ্‌বেন, "কাল ভোজনমারোগ্যাণাম্"—আরোগ্যকর উপায়ের মধ্যে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ভোজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

বিবেক-বন্দনা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, কবিরত্ন, সাহিত্যবিশারদ

পূর্ণ-প্রজ্ঞ! যুগ-যোগ্য! বিশ্ব-বন্দ্য! সত্য-সন্ধ!
রামকৃষ্ণ-মানসপুত্র বন্দি বীর বিবেকানন্দ!
শ্রেষ্ঠ আর্য্য! যুগাচার্য্য! বিশ্ব-বিজয়ী শৌর্য্য-সূর্য্য!
নাশিলে স্বদেশবাসীর সুপ্তি বাজায়ে তীব্র তেজের তূর্য্য।
মায়া-মুক্ত! বেদ-উক্ত-মন্ত্র-শুক্ত-মূর্ত্তিমন্ত!
দিব্য-শক্তি-সিন্ধু উক্তি পাতকী-পতিত-তারণ-তন্ত্র।
দীপ্ত আয়ত ললাট-নেত্র করুণা-কিরণ-ক্রীড়ন-ক্ষেত্র!
বক্ষে বিপুল ব্রহ্ম-বীর্য্য—কণ্ঠে মেঘ-মন্দ্র ছন্দ!
রামকৃষ্ণ মানস-পুত্র বন্দি বীর বিবেকানন্দ!

সর্ব্ব-ত্যাগী—চির-বিরাগী (তবু) স্বদেশ লাগি সাজিলে সৈন্য,
বক্ষে উথলে ব্যথার পাথার দেখিয়া দেশের দুঃখ-দৈন্য।
পঠনে-মননে-ধ্যানে কৃতার্থ অতি বিচিত্র তব চরিত্র—
রাম-কৃষ্ণ-লীলার পার্থ! স্বার্থ-শূন্য আর্ত্ত-মিত্র।
যোগ-নিষ্ঠ! অখিল-ইষ্ট রামকৃষ্ণ-সাধন-সৃষ্ট।
জ্ঞানে শঙ্করাবতার, ধ্যানে বুদ্ধ, ত্যাগে খৃষ্ট!
বরদ! ব্রহ্ম-তত্ত্ব-বেত্তা। সর্ব্বমোহবন্ধ-ছেত্তা!
চিত্ত-চকোর চাহিছে আমার চুমিতে চারু চরণ-চন্দ্র।
রামকৃষ্ণ মানস-পুত্র বন্দি বীর বিবেকানন্দ!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গ্রামটির নাম ষাঁড়মারী। আমাদের গ্রামের পার্শ্বেই এই স্বনামধন্য গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটির নাম ষাঁড়মারী কেন হইল, সে-বিষয়ে অনেকবার অনেক গবেষণা করিয়া আন্দাজ করিয়াছি যে, একদা এই স্থানে হয়ত একটি ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড ষণ্ডকে কেহই নিধন করিতে সাহস করে নাই, এমন সময় এক নরপুঙ্গব তাহাকে অকুতোভয়ে নিপাত করেন, এবং সেই বীরপুরুষের স্মৃতি চিরন্তন করণ মানসে গ্রামটি ষাঁড়মারী নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। গবেষণার এই সিদ্ধান্ত যে অকাট্য হইয়াছে এমন বলিতে পারি না। কারণ, ট্রেনে সেদিন একটি তরুণকে দেখিলাম,—তন্বুলতা ক্ষীণ, ঈষৎ নত, দক্ষিণ-পবন-তাড়নে মাধবীলতার মতই দোদুল্যমান; মস্তকের কেশভার ললাট হইতে পশ্চাদ্দিকে নারীচ্ছন্দে চিরুণিত, কিন্তু সিঁথিবিহীন, আর পশ্চাদ্দিকের কেশকুল যেখানে শেষ হইয়াছে, তারপরেই ঘাড়দেশ ক্লিপ্‌-সহযোগে সুপরিস্কৃত; হাতকাটা বুক-খোলা কামিজে তন্বুলতা আবৃত, কিন্তু বক্ষস্থল মুক্ত থাকায় দুই একখানি পঞ্জরাস্থি পরিদৃশ্যমান; অধর এবং ওষ্ঠে চাপিত রহিয়াছে একটি ফুটখানেক-লম্বা বর্ম্মা চুরুট; উড়ু উড়ু মালকোছা বা মল্লকচ্ছ (!) ভঙ্গীতে, অর্থাৎ যাহাকে বলে কাব্‌লী প্রথায়, পরিহিত বস্ত্রের প্রান্ত চরণকমলদ্বয়ের উপর ঘোমটার মত পড়িয়াছে; দুইটি চরণ-কমলে দুইখানি পাপ্‌ড়ির মত শাদা রঙের শাদা ফেট্টিওয়ালা পাত্‌লা চটি। বাবাজীবন আসিয়াই আমারই পাশে বসিলেন। আমি সসম্ভ্রমে স্থান দিলাম। এ-কথা সে-কথা আশপাশ দু'একটি কথা বাবাজীর সঙ্গে কহিলাম। দেখিলাম, বাবাজীর গলার আওয়াজ মিহি,—তন্বুলতার সঙ্গে বাক্য-কোমলতা বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম—তোমার নামটি কি, বাবাজী?

মিহি স্বরে চুরুট-চাপিত উত্তর আসিল—আমার নাম সমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

হরি, হরি! নামে ও শ্যামে বেশ মিল! সমরের ইন্দ্রের সিংহরূপকে বারবার নিরীক্ষণ করিলাম। বাবা-জীবন বেত্রবৎ ক্ষীণ অঙ্গুলির সাহায্যে ঘন ঘন চুরুট চুম্বন এবং ধূম ফুর্‌ফুরন্‌ করিতেছিলেন। সমরসিংহ বটেন!

গবেষণায় নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে বেশ ভারী হেঁড়ে গলায় ধ্বনিত হইল—জানি, মশাই, জানি। জায়গা কি ভাবে ক'রে নিতে হয় তা' জানি।—বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম দণ্ডায়মান সাত আটটি ডেলী পাষণ্ডকে, থুড়ী ডেলী প্যাসেঞ্জারকে, বিমথিত করিয়া প্রায় আমারই সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন আস্তিন-গোটানো, গোঁফ-ছাঁটানো, ছোট্ট-চুল-কাটানো, ঘুসী-পাকানো এক যুবক। বাহির হইতে কে যেন বলিল—এই ননী, কাজ কি ঝগড়া ক'রে, আয় না অন্য কামরায় যাই।

উক্ত যুবক হাঁক পাড়িয়া বলিয়া উঠিল—রেখে দে তো ভালমানুষী, আয় ভেতরে চ'লে। ননী ছাড়্‌বার পাত্র নয়।

বুঝিলাম, আস্তিন-গোটানো বাবাজীবনের নাম ননী-গোপাল। বাবাজীর গালে, মুখে, হাতে, বাক্যে কোথাও তো ননীর আভাসমাত্র নাই! বাবাজী ননী, না ফণী?

আমার দক্ষিণে বাবাজী সমরেন্দ্র, আর সম্মুখে বাবাজী ননীগোপাল। দুইটি নামের সঙ্গে দুইটি দেহের মিল ঘটাইতে গিয়া বুঝিলাম, চেষ্টা বৃথা। সমরেন্দ্রের নাম ক্ষীণেন্দ্র হইলে আর ননীগোপালের নাম ফণীকরাল হইলে মন্দ হইত না। হায়, হায়, এই সঙ্গে ষাঁড়মারী সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সমরেন্দ্রের স্বরূপ যদি এইরূপই হয়, ননীগোপালেরও এবম্বিধ, তবে ষাঁড়মারী নামের যথার্থ সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগিল।

চেয়ে বড় যুক্তি আর কী হ'তে পারে? বইএর লেখার চেয়ে বড় প্রমাণ তখন আর কিছু জানা ছিল না। ভূগোলের লেখা থেকে তখন যেমন জ্ঞান হয়েছিল পৃথিবী গোল, পাঁজির লেখা থেকে তখন তেমনি জানবার উপায় হয়েছিল কবে একাদশী।

তার কিছুদিন পরেই আত্মীয়াকে প্রশ্ন করেছিলুম—একাদশী কী? তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন—তা এখনো মনে আছে, "একাদশী আবার কী? একাদশী হচ্ছে উপোসের দিন।"

এখনকার দিনেও ছেলেদের—শুধু ছেলেদের বলি কেন, অনেক প্রবীণেরও একাদশী ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান এর চেয়ে বড় বেশী অগ্রসর হয়নি।

জ্যোতিষের ব্যাপার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নানারকমে কম-বেশী জড়িত। আমাদের অনেক সংস্কার, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি এই জ্যোতিষের ব্যাপার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। অথচ, আমার আশ্চর্য্য লাগে যে, এ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আমাদের মধ্যে অতি কম লোকেরই আছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ-স্ত্রীলোক সকলেই ব'লে থাকেন বটে, "আজ ষষ্ঠী, আজ অষ্টমী, আজ একাদশী, আজ অশ্লেষা, আজ মঘা", কিন্তু এ বস্তুগুলি যে কী—তার স্পষ্ট ধারণা ক'জনের আছে? অশিক্ষিতদের কথা ধরি না, কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যেও শতকরা একজনেরও এ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। এমন কি, যাঁরা জ্যোতিষের আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যেও অনেকের এই সব ব্যাপারের সম্বন্ধে একটা আবছায়া ধারণা মাত্র আছে, দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আন্দোলন-আলোচনা চলে অথচ কাজ বড় একটা এগোয় না, তার আসল কারণ হচ্ছে জ্যোতিষের এই সব ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যেও নেই—তা যদি থাকৃত, তা হ'লে পঞ্জিকা-সংস্কার নিয়ে সভা-সমিতি বা তর্ক-আলোচনার প্রয়োজন হ'ত না, যে পঞ্জিকায় এই সব ব্যাপারগুলি অভ্রান্তভাবে গণিত সেই পঞ্জিকাই চলত; অন্য সকল পঞ্জিকা লোপ পেত। কাজেই, পঞ্জিকা-সংস্কারের সভা-সমিতির চেয়ে চার্ট ও মডেলে জ্যোতিষ বিষয়ক প্রদর্শনীর সাহায্যে জনসাধারণকে জ্যোতিষের ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা যে ঢের বেশী কার্য্যকর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার ইচ্ছা আমার প্রথম উদ্বুদ্ধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম ও রাজসিংহ পড়ে। সীতারামে জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীর হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে প্রিয়-প্রাণ-হন্ত্রী হবে, তা সফল হয়েছিল, তেমনি রাজসিংহে জ্যোতির্ব্বিদের মবারক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও ঠিক হয়েছিল। বঙ্কিমবাবু এই গণনার চিত্রগুলি এমনভাবে এঁকেছেন যাতে বোঝা যায় যে, ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি যখন বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি পড়ি তখন আমার বয়স ছিল এগার বার বৎসর। বয়সটা Hero-worship-এর বয়স এবং সে সময়ে বঙ্কিমবাবুই ছিলেন আমার আদর্শ। তাঁর জ্যোতিষে বিশ্বাস আমার মধ্যেও জ্যোতিষ সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল এবং এই জ্যোতিষ যা দিয়ে এই রকম সফল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তা শেখবার প্রবল বাসনা আমার মধ্যে জেগেছিল। এই সময় বঙ্গবাসী থেকে প্রকাশিত সামুদ্রিক এবং বসুমতীর প্রকাশিত জ্যোতিষ-রত্নাকর নিয়ে জ্যোতিষ শেখবার চেষ্টা করি, কিন্তু এগুলি দিয়ে রাশি, নক্ষত্র আর গ্রহের নামগুলি মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছু হয়নি। হতাশ হ'য়ে পড়েছিলুম, এমন সময় শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখা জাতক-কৌমুদী বইখানা দৈবাৎ হাতে এসে পড়ল।

এই জাতক-কৌমুদী বহিখানি তখনকার দিনের এক অপূর্ব্ব বস্তু—বর্ত্তমানে বাঙলার শিক্ষিত সমাজে ফলিত জ্যোতিষের যে একটা পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তাতে জাতক-কৌমুদীর প্রভাব অনেকখানি আছে, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, বইখানি যদি সে সময়ে আমার হাতে না এসে পড়ত, তা হ'লে সেইখানেই আমার জ্যোতিষ আলোচনার ইতি হ'ত। সংস্কৃত বচন এবং তার জটিল ও দুর্ব্বোধ্য অনুবাদ ছাড়াও যে সাদাসিধে ভাষায় সাধারণের বোধগম্য ক'রে জ্যোতিষের বই লেখা সম্ভব, তা ঐ

বইখানি পড়েই আমার প্রথম উপলব্ধি হয়। কিন্তু সে কথা যাক্‌

ফলিত জ্যোতিষ দিয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে কী উপকার পাওয়া যেতে পারে, গোড়াতে সে প্রশ্ন আমার মনে ওঠেনি, একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। প্রথম অবস্থায় এই কথাই মনে জাগত যে, জ্যোতিষের সকল ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা লোককে চমৎকৃত ক'রে দিয়ে প্রশংসা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করব। কিন্তু, আজ বুঝেছি যে ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং সেটা মিলে যাওয়াই বড় কথা নয়, জ্যোতিষের এর চেয়েও বৃহত্তর ক্ষেত্র ও সার্থকতা আছে। ভবিষ্যতে কী ঘট্‌বে তা শুধু জেনে কোন লাভ নেই যদি তা অখণ্ডনীয় হয়, সেইখানেই জ্যোতিষের সার্থকতা যেখানে সম্ভাব্য ঘটনার ইতর-বিশেষ করা বা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। প্রত্যেক সম্ভাব্য ঘটনার বীজ প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত আছে, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান আমাদের জানিয়ে দেয় কোন্ সময় সেই সম্ভাব্য ঘটনার অনুকূল অথবা প্রতিকূল পরিবেশ উপস্থিত হবে। সেইটুকু আমরা যদি বুঝতে পারি এবং সেই হিসেবে নিজেদের পরিচালিত করতে পারি তা' হ'লে পৃথিবী থেকে অনেক অনর্থক দুঃখ কষ্ট নির্ব্বাসিত হ'তে পারে। এইখানেই জ্যোতিষের সার্থকতা।

কিন্তু জ্যোতিষকে এই হিসেবে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে, গোড়াতেই জ্যোতিষকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া দরকার। তার তত্ত্বগুলি সুস্পষ্ট ভাবে শৃঙ্খলিত ও শ্রেণীবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কিছুদিন জ্যোতিষ আলোচনা করবার পর, যখন পুঁথির লেখা ফলের সঙ্গে বাস্তবিক ঘটনার অমিল হ'তে থাকে আমার বোধ হয় তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনেই এই প্রশ্ন জাগে—"এর রহস্য কী ?—এর মূল কোথায় ?"—অন্ততঃ আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল।

প্রথমে বাজারে প্রচলিত পঞ্জিকার গণিতিক অংশের উপর নির্ভর ক'রেই জ্যোতিষের গণনা সুরু করি। প্রথম দিন যেদিন জানতে পারলুম যে, সে গণিতিক অংশ বিশুদ্ধ নয়, তখন মনে হয়েছিল যে হয়ত সেই জন্যই ফল মেলে না। কেন না, যার উপর ভিত্তি ক'রে গণনা সেই গণিতিক অংশই যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহ'লে ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হওয়া সম্ভব নয়। এ কথা ঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু পরে বুঝেছিলুম যে, এই একমাত্র কারণ নয় এবং এ উপলব্ধি এসেছিল তখন যখন বিশুদ্ধ গণিতাংশ পেয়েও পুঁথির বচন সার্থক করতে পারিনি।

এরপর অনেক দিনই অন্ধকারে ঘুরেছিলুম, জ্যোতিষের ওপর একটা অশ্রদ্ধার ভাবই এসে পড়বার উপক্রম হয়েছিল —অথচ এ কথাও মনে হয়েছিল যে পুঁথির বচন অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করা হয়ত ঠিক নয়, হয়ত এর পিছনে কোন তত্ত্ব আছে যা আমার কাছে ধরা দিচ্ছে না। অনেক পণ্ডিতের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন কোন মীমাংসা পেলুম না, তখন মনে হ'ল—নাঃ, পুঁথির কোন কথা মেনে নেওয়া চলবে না, গোড়া থেকে—একেবারে গোড়া থেকে প্রশ্ন করতে হবে কেন ?—যতক্ষণ না তার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে ততক্ষণ কিছু মা'নব না।

রাশি, নক্ষত্র, গ্রহ—এইগুলি জ্যোতিষ গণনার মূল ভিত্তি। গোড়াতে এইগুলিই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রাশি, চক্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গ্রহ আকাশ এদের অস্তিত্ব আছে ঠিক, কিন্তু বারটি রাশি, সাতাশটি নক্ষত্রের স্পষ্ট বিভাগ আকাশে নেই। রাশি বারটি ধরা হ'ল কেন, নক্ষত্রই বা সাতাশটি কেন ? এর উত্তর অবশ্য খুবই সোজা কিন্তু অনেক চিন্তার পর সে উত্তর পেয়েছিলুম। সূর্য্যের সারা রাশি চক্রটি ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তার মধ্যে বারটি পূর্ণিমা এবং বারটি অমাবস্যা হয়, এই ব্যাপার ধ'রে রাশি চক্রে সূর্য্যের বারটি ঘর কল্পনা করা হয়েছে এবং চন্দ্রের রাশি চক্র ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তার মধ্যে পৃথিবীর সাতাশটি আবর্ত্তন হয়, এই ব্যাপার ধ'রে চন্দ্রের সাতাশটি কক্ষ বা নক্ষত্র কল্পনা করা হয়েছে। এই হ'ল রাশি ও নক্ষত্রের ভিত্তি। তারপর এল গ্রহের, রাশির ও নক্ষত্রের প্রভাবের কথা এবং তার পিছনে যে পরিকল্পনা আছে তা নির্ণয়। এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শাস্ত্রের বচনগুলির মধ্যেই এই পরিকল্পনার ইঙ্গিত সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, এবং এই পরিকল্পনা মনের সামনে স্পষ্ট হবার পর অনেক বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

দর্পনারাণ হাসিয়া বলিলেন—গব্য গড়াং? কোন্ শাস্ত্র থেকে তুল্লেন শুনি?

তিনকড়ি দম্ভভরে বলিলেন—সে তো আপনিই বল্‌বেন, মশাই! কোন্ শাস্ত্র থেকে তোলা আর অর্থ কি সেটা বলুন দেখি! এত পণ্ডিতকে তো হারিয়েছেন, এবার বলুন।

দর্পনারাণ গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, পুঁথিপত্রও একটু নাড়া-চাড়া করিলেন; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাবগতিকে বোঝা গেল, তিনি বলিতে অক্ষম। চাষী-মহলে হাসাহাসি উঠিল। দর্পনারাণ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বিজয়গর্ব্বে উঠিয়া তিনকড়ি পণ্ডিত বলিলেন — শোন সবাই, শোন। দর্পনারাণ পণ্ডিতকে সবাই আটক ক'রে রাখ। তিনি যতক্ষণ না উত্তর দিতে পার্‌বেন, ততক্ষণ ছাড়া হবে না।

চাষীরা সকলেই বলিল—সেই ঠিক্, সেই ঠিক্ কথা।

দুই ঘণ্টা কাটিয়া প্রায় পৌণে তিন ঘণ্টা হইয়াছে। দর্পনারায়ণ কত লেখা-জোখা করিতেছেন, কিন্তু উত্তর দিতে আর পারিতেছেন না। তিনকড়ি পণ্ডিত আনন্দে পায়চারি করিতেছে, আর মাঝে মাঝে টিকি নাড়া দিতেছে। মদন ধাড়া চাপা গলায় বলিল—খুব মার মেরেছে, ঠাকুর। এই না হ'লে নটবরের নাতি!

এমন সময়ে হ্যারে র‍্যা রৈ হৈ, হ্যারে র‍্যা রৈ হৈ আওয়াজ দূরে শোনা গেল। সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। একটু পরেই দেখা গেল, গলায় পৈতা, গাছ-কোমর করিয়া কাপড় বাঁধা, কাঁধে কাপড়-জড়ানো লাঠির মত কি-একটা লইয়া ষণ্ডামার্কা একটা লোক দৌড়িয়া আসিতেছে, আর তাহার পিছনে বিশ-পঁচিশটা লোক।

লোকটা তিনকড়ির সাম্‌নে আসিয়া বুক ফুলাইয়া বলিল—তুমিই কি তিনকড়ি ঠাকুর নাকি হে? আমার দাদাকে নাকি বন্দী করেছ? আমি হলুম দর্পনারাণের ছোট ভাই নিত্যনারাণ। বল তো তোমার প্রশ্নটা কি?

লোকটার ভাবগতিকে তিনকড়ি একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। তবুও সে হটিবার পাত্র নয়, বলিল—আমার

ষণ্ডামার্কা নিত্যনারাণ এক মিনিট মাত্র ভাবিয়া লইল। তারপর হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল—কি, বল্লে কি, গব্য গড়াং? বেশ। বলি বিদ্যেটা কদ্দূর তোমার? মূর্খ কোথাকার! আগেই হবে গব্য গড়াং। আহাম্মক! শোন্ তবে—আমার লাঙ্গল পুরাণে কি আছে।

বলিয়াই নিত্যনারাণ তাহার কাঁধের বস্ত্রাবৃত পদার্থটির বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল, সেটি একটি বৃহৎ কাষ্ঠ দণ্ড বা লাঙ্গলের ভাঙ্গা বাঁট। সেই দণ্ড লাঠির মত উঁচাইয়া সে তিনকড়িকে বলিল—মূর্খ, আহাম্মক! আগেই গব্য গড়াং? শোন্ তবে—

আগে হবে—জল তড়্ তড়াং
তার পরে—পত্র পড়াং
তার পরে—গব্য গড়াং।

অর্থাৎ কিনা, আগে জল তড়্‌তড়া দিয়ে জায়গা হবে, তারপরে পাতা পড়্‌বে। তারপর ভাতে গাওয়া ঘি গড়াবে। আর বেটা মূর্খ, তুই আগেই বল্‌লি গব্য গড়াং!! চাষী ভাই সব, শোন, কত বড় ভুল এই মূর্খটা করেছে।

মদন ধাড়া, কেদার মণ্ডল প্রমুখ অনেকেই বলিয়া উঠিল — ঠিক্, ঠাকুর, ঠিক। আগে জল তড়্ তড়াং, তারপর পত্র পড়াং, তারপর না গব্য গড়াং! জল পড়্‌ল না, পাত হ'ল না, আর আগেই ভাতে ঘি গড়িয়ে যাবে? তাও কি হয়? সাবাস্ তোমার বুদ্ধি! বলিহারি যাই!

মূর্খ, এইবার শাস্তি নে—বলিয়াই নিত্যনারাণ লাঙ্গল পুরাণের দ্বারা তিনকড়ির স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে বেশ দুই চারি ঘা বসাইয়া দিল। তিনকড়ি সবেগে পলায়ন করিল। তড়িৎ-গতিতে চাষীরাও কে কোথায় যেন উবিয়া গেল।

বিজয়ী নিত্যনারাণ দাদার হাত ধরিয়া বাড়ী চলিল। ষাঁড়মারীর তিনকড়ি ষাঁড় সেদিন সত্য সত্যই ভাঙ্গা লাঙ্গলের আঘাতে মারা পড়িল। ষাঁড়মারী ও লাঙ্গলভাঙ্গা নাম সার্থক হইয়া উঠিল।*

'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

ব্যবহারিক জীবনে জ্যোতিষ

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

জ্যোতিষকে আমি ভালবাসি। তার আলোচনায় আমি বহু আনন্দ পেয়েছি এবং তার আলোচনার মধ্য দিয়ে জীবনের বহু জটিল সমস্যা আমার কাছে সহজ ও সরল হ'য়ে উঠেছে। আমার এই অনুরাগ নেহাৎ অহৈতুকী অনুরাগও নয়। আমার বার বছর বয়সে যা প্রথমে একটা কৌতুহলপূর্ণ আকর্ষণ মাত্র ছিল বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরের সাহচর্য্যে তা দৃঢ়, অবিচ্ছেদ্য, অপরিবর্ত্তনীয় অনুরাগে পরিণত হয়েছে। জ্যোতিষকে আমি ভালবেসেছি কিন্তু তা অন্ধ স্নেহ নয়, পদে পদে তাকে যাচাই ক'রে নিতে আমি কসুর করিনি। তাকে পদে পদে সন্দেহ করেছি, পদে পদে তার সত্যতার প্রমাণ চেয়েছি, পদে পদে তার সার্থকতার পরিচয় দিতে আহ্বান করেছি—অনেক বোঝাপড়ার পর যখন তার স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে, তখন তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

গোড়াতে একটা কথা বলে রাখি। আমার এই প্রবন্ধে যাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত বচনের প্রাচুর্য্য এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আশা করবেন তাঁদের হতাশ হ'তে হবে। শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত এ দুয়ের কোনটাই আমি নই। আমি জ্যোতিষের অনুরাগী একজন সেবক মাত্র, তার অনন্ত রূপের যে দিকটা আমার সামনে প্রকাশ পেয়েছে—তাই নিয়েই আমি তার গুণগান করব। এ শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ নয়—এ অনুরাগী ভক্তের ভক্তি নিবেদন।

জ্যোতিষের প্রয়োগ-ক্ষেত্র বহুদিকে প্রসারিত, এক এক দিকে তার কাজ এক এক রকমের, কিন্তু তার মূলে আছে—এমন কতকগুলি সাধারণ বস্তু যাদের উপর সেই সব কাজের ভিত্তি। তার শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লেও মূল তাদের একই জায়গায়। মানে নীচে থেকে শাখা ধ'রে উপরে তার মূলে পৌছতে হয়। অর্থাৎ আত্মার যে কোন concrete প্রকাশকে অবলম্বন ক'রে তার abstract তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়। এটা যে শুধু যোগ-বিজ্ঞানের বেলাতেই খাটে—তা নয়, অন্য সব ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বেলাতেও এ কথা অপ্রযুজ্য নয় এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বেলাতেও তা সমানই খাটে। ওর আসল অর্থ আমি যা বুঝেছি—তা হচ্ছে এই যে, আত্মা যেমন বহুরূপে অভিব্যক্ত—এক এক বিজ্ঞানেরও অভিব্যক্তি তেমান বহুক্ষেত্রে, বহু শাখায়; এই শাখার যে কোন একটিকে ধ'রে তার মূলে পৌছানো যায়, যেখানে বাইরের অনেক রূপ ভিতরে একই তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। যিনি যে শাখা ধ'রে মূলে পৌছেছেন, মূলের বিষয় বলবার সময় সেই শাখার ব্যাপার তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কম-বেশী এসে পড়বেই। কেননা, বিজ্ঞানের সেই শাখার মধ্য দিয়েই তিনি প্রথম ঐ বিজ্ঞানের স্বরূপ দেখেছেন। সুতরাং ফলিত জ্যোতিষের যে শাখা নিয়ে আমি বেশী আলোচনা করেছি, আমার আলোচনার মধ্যে সেই জাতক-শাখার বেশী ব্যঞ্জনা যদি পাওয়া যায়, আমি মার্জ্জনা পাবার আশা করতে পারি।

ছেলেবেলায় সাত-আট বছর বয়সে আমার এক বিধবা আত্মীয়াকে একাদশীর উপবাস করতে দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, কবে একাদশী—তা কী ক'রে জানা যায়? তা যে মেঘ-রৌদ্র, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কোন নৈসর্গিক কারণের উপর বা বার মাস তারিখ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না তা তখনও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা বুঝতে কষ্ট হয়নি। জ্যোতিষের সঙ্গে পরিচয় করবার এই বোধ হয় আমার প্রথম ইচ্ছা।

আত্মীয়াকে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিলেন যে কবে

গেল পনের কুড়ি বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত অনেক ব্যক্তিরই জ্যোতিষের দিকে কম বেশী একটা আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং পাশ্চাত্য দেশ থেকে জ্যোতিষের অনেক গ্রন্থও এর মধ্যে এদেশে আমদানী হয়েছে—তাতে ক'রে একদিকে যেমন জ্যোতিষের আলোচনা বেড়েছে, অন্য দিকে জ্যোতিষের ব্যাপার নিয়ে যত মত তত পথেরও সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত নব গ্রহের ওপর আরও তিনটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা এদের আমল দিতে চান না। এদিকে ইংরাজিনবীশ অনেকে পাশ্চাত্য গ্রন্থ প'ড়ে তাঁদের গৃহীত সায়ন বা সচল রাশি চক্র গ্রহণ ক'রে আমাদের নিরয়ণ বা স্থির রাশি চক্র ত্যাগ করেছেন। আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে যদি জ্যোতিষ প্রদর্শনী ও সভার উদ্যোগ হয়, জ্যোতির্ব্বিদেরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং যে পরিকল্পনা যুক্তি ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই গ্রহণ করেন, তাহ'লে অনেক কাজ হ'তে পারে।

দেশী পাঁজিগুলি প্রজাপতি, বরুণ ও রুদ্র নবাবিষ্কৃত এই তিনটি গ্রহকে ত্যাগ করেই তাঁদের পাঁজি প্রচার করছেন, কেন না এ তিনটি গ্রহ তাঁদের ঋষি প্রণীত (!) সিদ্ধান্ত গ্রন্থে স্থান পায়নি। কিন্তু আকাশে ভগবান্ যাদের স্থান দিয়েছেন, ঋষিরা তাঁদের গ্রন্থে স্থান না দিলেও তাদের প্রভাব কী ক'রে অস্বীকার করা যাবে? যদি গ্রহের প্রভাব স্বীকারই করতে হয় তাহ'লে ছোট-বড়, দূরের-কাছের সব গ্রহের প্রভাব স্বীকার করতেই হবে—কম আর বেশী।

এ সম্বন্ধে আমি বলছি এই জন্যে যে, গ্রহগুলির যদি বাস্তবিক প্রভাব থাকে তাহ'লে তাদের ত্যাগ করে বিচার করতে গেলে সে বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে বাস্তবিক যদি কোন উপকার আমরা পেতে চাই, তাহ'লে নতুন-পুরণো কোন সত্য আবিষ্কারকেই ত্যাগ করা চলবে না।

সাধারণতঃ ফলিত জ্যোতিষের কথা বললেই লোকের মনে আসে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা, তা সে ব্যক্তিগত জীবনেরই হোক্ বা সামাজিক কিম্বা রাষ্ট্রীয় জীবনেরই হোক্। কিন্তু জ্যোতিষের গণ্ডী এত ছোট নয় এবং গোটাকতক ভবিষ্যদ্বাণী মেলা না মেলাতেই জ্যোতিষের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নয়। আমি অন্ততঃ এই দীর্ঘ দিনের জ্যোতিষ আলোচনার ফলে এটুকু বুঝেছি যে, জ্যোতিষকে ব্যক্তিগত জীবনে বা সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন ঢের কাজে লাগানো যেতে পারে যার দ্বারা ব্যষ্টির বা সমষ্টির সত্যিকার উপকার হওয়া সম্ভব। এখানে সকল ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সময় নেই এবং তার স্থানও এ নয়—গোটাকতক ব্যাপারের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথম একটা ব্যাপারই ধরা যাক্—স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপার। জ্যোতিষ দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের কোন্ যন্ত্র দুর্ব্বল এবং কোন্ দিক দিয়ে অস্বাস্থ্য আসতে পারে এ বিচার ছাড়াও কোন পীড়া হ'লে অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় এবং তার ভোগের পরিমাণ নির্ণয় করাও যেতে পারে—অন্য কথায় রোগের diagnosis ও prognosis-এর ব্যাপার জ্যোতিষ দিয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। জটিল রোগে রোগের মূল কোথায় তার চিকিৎসা ও পথ্য কী হওয়া উচিত এগুলির সম্বন্ধে জ্যোতিষ থেকে এ রকম সাহায্য চিকিৎসক পেতে পারেন, যা তাঁরা এখন কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তাঁদের মনের গঠন এমনি দাঁড়িয়েছে যে, জ্যোতিষ দিয়ে রোগ নির্ণয়কে হাসির কথা ছাড়া তাঁরা ভাবতে পারেন না। আগেকার দিনে আমাদের দেশে চিকিৎসা ও জ্যোতিষ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। জ্যোতির্ব্বিদের যেমন চিকিৎসার জ্ঞান প্রয়োজন ছিল চিকিৎসকেরও তেমনি অপরিহার্য্য ছিল জ্যোতিষের জ্ঞান। এ যুগের চিকিৎসকদের কাছে আমার নিবেদন যে তাঁরা জ্যোতিষের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কী সাহায্য পেতে পারেন আগে পরীক্ষা ক'রে দেখুন, পরে না হয় উপহাস করবেন।

চিকিৎসায় যেমন, তেমনি অন্য অনেক ক্ষেত্রেও জ্যোতিষের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আজকাল অনেক বাপ-মা ছেলেদের কী ধরণের শিক্ষা দেবেন, কোন্ পেশার সে উপযুক্ত—চিন্তা ক'রেও এ সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণায় পৌছুতে পারেন না। জ্যোতিষ এখানে তাঁদের খুব বেশী রকম সাহায্য করতে পারে। কার কোন্ বিষয়ে স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে তা জ্যোতিষ দিয়ে পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে—কিন্তু দুঃখের

বিষয় এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোক এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

এই রকম বিবাহের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী নির্ব্বাচনে, ব্যবসায়ে অংশী নির্ব্বাচনে, শিষ্যের গুরু নির্ব্বাচনে, গুরুর শিষ্য নির্ব্বাচনে, প্রভুর ভৃত্য এবং ভৃত্যের প্রভু নির্ব্বাচনে এমন কি এজেণ্ট, দালাল, উকীল প্রভৃতি নির্ব্বাচনের ব্যাপারেও জ্যোতিষ নানা রকমে সাহায্য করতে পারে।

সেদিন আমেরিকার কোন একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্টের প্রতি উপদেশে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। কী ক'রে খদ্দের সংগ্রহ করতে হবে তা বলতে গিয়ে কোন্ শ্রেণীর লোককে কী ভাবে সহজে আয়ত্তে আনা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁরা শ্রেণী বিভাগ করছেন চেহারা ধ'রে এবং এই চেহারার সঙ্গে জ্যোতিষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁরা চেহারাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন এবং তাদের বাস্তব, কর্ম্মী, ভাবুক ও আদর্শবাদী বলছেন—বাস্তবিক পক্ষে এগুলি জ্যোতিষের পৃথ্বী, বায়ু, জল ও অগ্নি রাশির নামান্তর মাত্র। এখানে তার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক, তবে এ দেখে একটা আশা হয়, যে পাশ্চাত্য দেশে যখন এগুলোকে এভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে—তখন হয়ত একদিন আমাদের দেশেও তা হবে। কেন না, বিলেত-ফেরত জিনিষের কদর আমাদের শিক্ষিত সমাজে আছে।

আমার মনে হয় জ্যোতিষকে যদি কাজে লাগতে হয়, তাহ'লে তার সত্য স্বরূপ সাধারণের সামনে প্রকাশ করা দরকার। তার জন্য আবশ্যক প্রচার এবং এমনভাবে প্রচার যা সহজেই সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় ও চিত্ত আকর্ষণ করে। গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ দুয়ের জন্যই প্রচার আবশ্যক। যাতে লোকে গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে যথাযথভাবে চিনতে পারে এবং তিথি-নক্ষত্র-যোগ ইত্যাদির অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারে তার জন্য চিত্র-প্রদর্শনী ও গ্রন্থশালা নির্ম্মাণ করা দরকার। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ যে চিত্র প্রদর্শনী দিয়ে এই লোক-শিক্ষার সূত্রপাত করেছেন এ একটা বড় আনন্দের কথা—এই আরম্ভের বীজ একদিন তাঁদের ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিণতির বৃক্ষ হয়ে উঠবে—এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমরা অনায়াসে করতে পারি।

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলা কত বড় দরকার তা আজকালকার সভ্য লোকেরা সহজে বুঝতে পারেন না বা চান না। তাঁরা অদৃশ্য বহু প্রভাবকে মেনে নিয়ে সেই হিসেবে নিজেদের পরিচালিত করছেন, অদৃশ্য রোগবীজাণু, অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গ ইত্যাদি মেনে নিয়ে সেই হিসেবে আচরণ করতে তাঁদের আটকাচ্ছে না অথচ গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্য প্রভাবের কথা শুনলেই তাঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করছেন। তাঁরা হয়ত বলতে পারেন যে, যে সকল অদৃশ্য প্রভাব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছু তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। কিন্তু তাঁদের এ প্রশ্নও করা যেতে পারে যে জ্যোতিষের মতে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের যে উপপত্তি পাওয়া যায়, তা কি তাঁরা পরীক্ষার দ্বারা অপ্রমাণিত করেছেন?—তা যদি না ক'রে থাকেন, তাহ'লে প্রথমে তা পরীক্ষা ক'রে দেখা কি কর্ত্তব্য নয়?

ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ইত্যাদি হিসেবে যেমন আমাদের আহার-বিহার আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে আমরা বাধ্য হই, সেগুলির প্রভাব অবহেলা করলে যেমন আমাদের পদে পদে দুঃখ পেতে হয়, তেমনি এই সৌর-বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের পারিপার্শ্বিককে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহ'লেও দুঃখ পেতে আমরা বাধ্য।

একদিন এই তত্ত্ব আমাদের প্রাচীন মনীষীদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিন তাঁরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা এই গ্রহ-নক্ষত্রের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমতালে চালাতে চেয়েছিলেন। পঞ্জিকায় এখনও তার নিদর্শন পাওয়া যায় শুভদিনের নির্ঘণ্টের মধ্যে—যেখানে সব রকম কাজের জন্য শুভ-মুহূর্ত্তের তালিকা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, এই তালিকা এখন যে ভাবে প্রস্তুত হয়, তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নয়, এবং এখন নূতন ধরণের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যার ভিত্তি হবে বিশুদ্ধ গণিত এবং গ্রহ-নক্ষত্রের বৈজ্ঞানিক ধারণা। কিন্তু তবু এ থেকে জানা যায় যে, এক সময়ে এ দিক দিয়ে একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল।

আজ যাঁরা এ মুহূর্ত্তগুলি মেনে চলেন বা মানবার চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই এ ব্যাপারগুলি কি, তার কোন ধারণা নেই। এমন কি, যাঁরা এই শুভ মুহূর্ত্তের বিধান দেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকের এই মুহূর্ত্ত নির্ণয় ব্যাপারের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি জানা নেই। কেন অমুক নক্ষত্র বা অমুক তিথি বা অমুক লগ্ন বিবাহ বা উপনয়ন বা গৃহ প্রবেশের অনুকূল, এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন "পুঁথিতে আছে—অতএব—।" এর বেশী কিছু নয়। এমন কি দুই পুঁথিতে যেখানে দু'রকম মত পাওয়া যায় সেখানে "মতান্তরে অমুক" এ বলতেও তাঁদের আটকায় না, দু-মতের কোন্‌টা ঠিক যুক্তি দিয়ে তা নির্দ্ধারণ করবার ইচ্ছাও তাঁদের হয় না।

আমার মনে হয়, জ্যোতিষের ওপর শিক্ষিত সাধারণের অশ্রদ্ধার জন্য এই সব ব্যাপার অনেকটা দায়ী। যদি জ্যোতিষের ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করা যায় তাহ'লে বিনা পরীক্ষায় তাকে অস্বীকার করতে অনেকেই দ্বিধা করবেন।

সনাতন বৈশাখ

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

হয়তো কখনো আপনার অগোচরে
স্বপনের ছবি গোপনে আঁকিয়া ছিলাম,
আজকে সেখানে অজানা যে রঙ ধরে—
জানাজানি হল, আদরে মাখিয়া নিলাম!
যত দিন যায়, তত যায় রঙ বে'ড়ে—
অদেখা সকল দেখাদেখি হয় যে রে;
চোখ দিয়ে দেখা, বুক দিয়ে ধরাধরি—
সে-সব কামনা মু'ছে যায় সরাসরি,
পসারী যে তার পসরা দিয়েছে ছে'ড়ে!

রূপের পরিধি, পরশের আলোছায়া—
মুছিয়া গিয়াছে, ভেঙেছে দখিনা আগল,
কায়ায় জড়ায়ে যেটুকু আছিল মায়া—
কচি ঘাস পেয়ে মুড়িয়া খেয়েছে ছাগল!
জীবনে যতই বোশেখ আসিয়া গেল—
সনাতনে কেন নূতন ভাবিয়া ফেল?
নূতন যা কিছু পুরাতন ভে'বে তারে—
চোখ বু'জে হায় চল ভুল অভিসারে,
বুঝিয়া সুঝিয়া আগুন লইয়া খেল?

মরণে আজকে মনে হয় না যে মরণ—
বাঁচিয়া থাকাও মনে হয় নাকো বাঁচা,
কি যেন কোথায় হয়ে গেছে—নাই স্মরণ,
পাকিয়া গিয়াছে—তবু দেখি সব কাঁচা!
জগতে হয়তো এই কথা শেষ কথা—
কুঁড়ি নেই তবু বাড়িয়া চলেছে লতা;
ফুল নেই, তবু বেঁচে আছে যত গাছ,
লোক নেই, তবু প'ড়ে আছে কত কাজ,
দেশ নেই, তবু ঘি'রে আছে স্বাধীনতা!

বেটন্ কাপ্—পর পর কয়েক বৎসর হকি-লীগ্ ও বেটন্ কাপে অজেয় এবং এ বৎসরেরও হকি-লীগ্ জয়ী কাস্টম্‌সের জয়-গতিতে ভীম পরাক্রমে বাধা প্রদান করিল বি-এন্-আর্। জয়ীর এই জয় মহা গৌরবের। এ গৌরব অর্জ্জন অল্পায়াসে হয় নাই। জয়টীকা পরিমাণ সূচিত হইবে। দুই দিনই কাস্টম্‌সের রক্ষণ-বিভাগকে বিশেষ সজাগ থাকিতে হয়। তাহাদের ক্ষণিক অলস ভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বি এন্-আর্-এর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অগ্রচারী বাজীমাৎ করিয়া দেয়—সুদীর্ঘকাল অধিকৃত বেটন্ কাপ্ কাস্টম্‌সের হস্তচ্যুত হইয়া যায় নিমিষের

বেটন্-কাপ্-বিজয়ী বি-এন্-আর ও শেষ-গণ্ডীতে পরাজিত কাষ্টম্‌সের কয়েকজন খেলোয়াড়

ধারণে কয়েক বৎসরের তাহাদের প্রাণপাত চেষ্টা এবং এ বৎসরেও ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে জয়মাল্য ধারণ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। শেষ-গণ্ডীর খেলা দুই দিন খেলিয়া তবে তাহার মীমাংসা হয়। প্রথম দিনের অমীমাংসিত খেলা (১-১) এবং দ্বিতীয় দিনের মীমাংসিত (১-০) খেলার জয়াঙ্ক হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ক্রীড়া-শক্তির আলস্যে। জয়ীর জয়-গৌরব বৃদ্ধি পায় পরাজিতের প্রতি অশেষ সম্মান দানে। বীরই বীরের সম্মান দান করিয়া থাকে।

অন্যান্য গণ্ডীর খেলার মধ্যে মোহনবাগানের রেঞ্জার্সকে ১-০ গোলে ও বম্বে লুসিটানিয়াকে ই-বি-আরের (একদিন ০-০র পরে) ১-০ গোলে পরাজিত করা সাধারণের চক্ষে

আশ্চর্য্যজনক হইলেও এই দুই দিনের খেলায় খেলার শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যের ফলেই জয়ী সাফল্য লাভ করে। 'পরদেশী' দলের মধ্যে লক্ষ্ণৌ পৌছায় শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে কিন্তু পরাজিত হয় কাস্টম্‌সের হস্তে ২-১ গোলে। গ্রীয়ারের ভবানীপুর ও জব্বলপুরকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্ণৌ-এর সহিত প্রথম দিনের খেলার ফল সমান-সমান করার কৃতিত্ব অল্প নহে। লুসিটানিয়াকে প্রথম দিন ভড়কাইয়া দেয় মোহামেডনও, খেলার ফল (২-২) সমান সমান করিয়া। পরদিনে মোহামেডনের ৫ গোলে পরাজয় তাহাদের প্রথম দিনের খেলার সুনামে আঘাত করে। রাজসাহীর বি এন্-আর্ কর্ত্তৃক পরাজয় — অন্য দিকের কথা। এ বৎসরের বেটন্ কাপের উল্লেখযোগ্য ঘটনার ইহা কয়েকটী মাত্র।

গোলের মুখে—সন্ধিক্ষণ

অন্যান্য হকি - প্রতিযোগিতা—লক্ষ্মীবিলাস কাপ্—খাল্‌সা কলেজ, কাইভান্ কাপ্—বিলাসপুর, ইন্টার কলেজ হকি—মেডিকেল কলেজ, কল্যাণ শীল্ড্—মোহামেডন্ স্পোর্টিং এবং মুসেল্ হোয়াইট্ ম্যাকেঞ্জি কাপ্—বোর্ণ এণ্ড শেপার্ড এবার জয় করিয়া লইয়াছে।

ডেভিস্ কাপে বাঙ্গালী—ডেভিস্ কাপে ভারতীয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের মধ্যে বাঙ্গালী না থাকায় আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। টেনিস্ কুশল ৺বিনয়প্রসাদের জাতি এই অভাব-জনিত ব্যথা কবে দূর করিবে ভাবিয়া নিঃশ্বাসও বুঝি পড়িয়াছিল। বোম্বাই ও কলিকাতার গত টেনিস্ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দিলীপ বসুর ক্রীড়া-দক্ষতা দেখিয়া কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হই — টেনিসে বাঙ্গালীর মর্য্যাদা রক্ষায় ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা রূপে তাহাকে বিবেচনা করিয়া। দেখিতেছি আমাদের আন্দাজ একেবারে বৃথা নহে। ভারতীয় টেনিস্ খেলোয়াড় নির্ব্বাচকেরাও যুবক দিলীপের ক্রীড়া-দক্ষতা সম্বন্ধে উচ্চভাব পোষণ করেন। ডেভিস্ কাপে সোহানী যোগদান করিতে পারিবে না জানিয়া তাহার স্থানে দিলীপের নির্ব্বাচন সকলে একযোগে করিয়াছেন। কাপ্ প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয়ের কথা আমরা ভাবিতেছি না। পরাজয় ঘটিলেও পাকা খেলোয়াড়ের পাকা খেলার কসরৎ দেখিতে পাওয়া যায় যথেষ্ট। খেলার মত খেলা দিলীপ দেখাইতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।

দিলীপ বসু
ডেভিস্ কাপে বাঙ্গালী

জো-লুইস্—বিশ্ববিদিত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইস্ এ বৎসরের 'হেভিওয়েট্'-এর বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় দুই মিনিট বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সুবিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যাক্ রোপারকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়। নির্দ্ধারিত দশ 'রাউণ্ডের' বাজী-মাৎ হইয়া যায় প্রথম রাউণ্ডেই, বিদ্যুদ্গতিতে লুইসের অপূর্ব্ব মুষ্টি চালনায়। রোপারের শোচনীয় অবস্থায় নির্দ্দেশকের নির্দ্দেশে জয়ী বিঘোষিত হয় লুইস্। এত বড় বাজী এত সহজে মাৎ করা কত বড় শক্তিধরের পক্ষে সম্ভব বুঝিতে পারিলে জয়ীর শক্তির পরিমাণ সাধারণের সহজেই বোধগম্য হইবে।

জো লুইস—
অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধা

টেবল্-টেনিস্ কৃতিত্ব—হাঙ্গেরিয়ন খেলোয়াড়-দ্বয় স্যাব্‌ডস্ (Szabdos) ও কেলেনের টেবল্-টেনিস্ দক্ষতা সত্যই যথেষ্ট, তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় কলিকাতার ওয়াই-এম্-সি-এ, রেঞ্জার্স ক্লাব ও গ্রাণ্ড্ হোটেলের খেলায় পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজনের হাতে স্থানীয় 'ভুঁইফোঁড়'-দের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে নাই।

আগার্খাঁ কাপ্—বোম্বাই অঞ্চলে আগাখাঁ কাপ্ প্রতিযোগিতা হকিতে প্রধান প্রতিযোগিতা। শেষ গণ্ডীর খেলায় ভোপাল ওয়াণ্ডারার্স টিকমগড়ের দুর্দ্ধর্ষ দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া কাপ জয় করিয়া লইয়াছে। জয়লাভ হয় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া।

পতৌদির পরিণয়—ক্রিকেট্-দক্ষ পতৌদির নবাবের ভোপাল নবাবজাদী সাজিদার সহিত শুভ-পরিণয় সমারোহের সহিত সুসম্পাদিত হইয়াছে। নবদম্পতির সর্ব্বতোভাবে শুভকামনা আমরা করি। আগামী পেণ্টাঙ্গুলারে পতৌদি মুসলেম্ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। বিবাহের অল্পদিন পরেই এ কথা প্রচারিত হইয়াছে। কথা যদি সত্য হয় ভারতে এম্-সি-সি-র আগমন কালেও ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইব, আশা করা যায়।

মহিলা ক্রিকেট্—ভারতে ইয়োরোপীয় মহিলার ক্রিকেট্ খেলার কথা ও চিত্র গত সংখ্যার 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত হইয়াছে। এ সংখ্যায় বোম্বাই অধিবাসিনী

মহিলা-ক্রিকেট্-তারকাদল (বোম্বাই)

দেশীয় মহিলা ক্রীড়কদলের চিত্র প্রকাশিত হইল। পুরুষের বিপক্ষে এই দলের মার-দৌড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৫। এ বিষয়ে কলিকাতা 'ব্যাক্ নম্বর'!

এফ্-এ-কাপ (ইংলণ্ড)—ফুট্‌বল্ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা—ইংলণ্ডের ফুটবল্ এসোসিয়েশন্ কাপ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার শেষ-গণ্ডীতে উপনীত উল্‌ভারহ্যাম্‌টন্ ও পোর্টস্‌মাউথ্ এই দুইটি দলের মধ্যে বাজীমাৎ করিবে উল্‌ভারহ্যাম্‌টন্ খেলার পূর্ব্বে মনে হয় প্রায় সকলেরই। প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণ্ডীতে এবং গত বৎসরে উল্‌ভারহ্যাম্‌টনের ক্রীড়া-দক্ষতায় এই দলের প্রতি ক্রীড়ানুরাগীর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন অসঙ্গত হয় নাই। খেলার দাপটে এই দল আখ্যা অর্জ্জন করে' 'উল্‌ভ্‌স্' (wolves); পোর্টস্‌মাউথের সম্মুখে কিন্তু তাহারা পরিণত হয় বিড়াল শাবকে—৪—১ গোলে পরাজিত হইয়া। বিজয়ীদলের অগ্রচারীগণ যেন ভেল্কী লাগাইয়া দেয়! সমবেত লক্ষাধিক দর্শক স্তম্ভিত হইয়া যায় বিজয়ীদলের ক্রীড়া-চাতুর্য্যে। উল্‌ভ্‌সের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাহাদের পরাজয়ে দলের সমর্থকেরা কোনও বিসদৃশ ঘটনা ঘটায় নাই। দিনের খেলায় শ্রেষ্ঠ দলের জয়ে ক্রীড়কোপযোগী উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচয় পদে পদে তাহারা প্রদান করে। অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহারা জয়ীর যথাযোগ্য সম্মানদানে সর্ব্ব প্রকারে উৎসাহ প্রকাশ করে। ক্রীড়াক্ষেত্রের এই উচ্চাদর্শের জন্যই খেলা-ধূলার এত কদর। রাজ রাজ্যেশ্বর হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলে খেলা-ধূলার তাই এত গুণমুগ্ধ। প্রতিযোগিতার শেষে সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষী কাপ্ ও মেডেলাদি বিতরণ করেন।

কাপ্ জয়ে মোহামেডন্—মণ্ট্‌মরেন্সি কাপ্ ও আবদুল গফুর কাপ্ মোহামেডন্ অনায়াসে জয় করিয়া লওয়ায় বাহিরের অনেক লোকে কলিকাতার এই সুবিখ্যাত ফুট্‌বল্ দলের শক্তি প্রত্যক্ষ করিবার বিশেষ সুযোগ পায়। বে-মরশুমে 'খেলার ধমক' দেখিয়া 'বিদেশী' তুটস্থ। কলিকাতার মরশুমের মুখে জয়ীর জয়গৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন নূতন যশার্জ্জনে আনুকূল্য যথেষ্ট পরিমাণে যে করিবে, সন্দেহ নাই।

লীগ্ যোদ্ধ্‌দল—'নামা'দল ক্যাল্‌কাটা কর্ত্তৃপক্ষের সহৃদয়তায় প্রথম বিভাগে থাকিয়া যাওয়ায় যোদ্ধ্‌দলের সংখ্যা হইল এবার তের। দ্বিতীয় বিভাগের সেরাদল রেঞ্জার্স প্রথম বিভাগে উঠায় আমরা খুবই আনন্দিত। পুরাতন 'নেভাল্ ভলেণ্টীয়রস'ই নাম পাল্টাইয়া হয় রেঞ্জার্স। ইহারা পূর্ব্বে প্রথম বিভাগেই ছিল। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ইহাদের দ্বিতীয় বিভাগভুক্ত হইতে হয়। স্ববিভাগে আবার তাহারা আসিল। এই স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার শক্তি তাহারা অর্জ্জন করুক।

ক্যাল্‌কাটার অবস্থা এবার গত বৎসরের ন্যায় শোচনীয় হইবে না আশা করা যায়। ভবানীপুর গত পূর্ব্ব বৎসরে ইষ্ট বেঙ্গলের সহিত আবেষ্টনী বদ্ধ হইয়া লীগ্‌ তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কিন্তু গত বৎসরে দলের অবস্থা সসেমিরে হইয়াছিল। এ বৎসরে আভ্যন্তরীন গোলযোগের জন্য দলের প্রায় সব নামজাদা খেলোয়াড় অন্যান্য দলে চলিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গাদল কিন্তু 'শ্বাস' যুক্ত—'আশ' সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত থাকাই উচিত। সর্ব্বান্তঃকরণে দলের শুভকামনা আমরা করি। কালীঘাটের 'ব্রহ্মাদি' অনুরক্তি দেখাইবার অসুবিধা ঘটিয়াছে, নূতন আইন জারী হওয়ায়। ইষ্ট বেঙ্গলেরও বিদেশী বধূর বিরহ ভোগ অবশ্যম্ভাবী, নূতন আইনে। এরিয়নের এন্‌, ঘোষের 'ঘরে ফিরা' সুখের কথা কিন্তু প্রাঙকেট্‌ 'এরিয়ন' হইয়া যাওয়া স্থূল চক্ষুতে অসঙ্গত হইলেও বৈজ্ঞানিক যুগোপযোগী। হিট্‌লারের 'এরিয়ানী' নজীরও ত' রহিয়াছে! চাকুরী দিয়া কয়েকজন নূতন খেলোয়াড়ের আমদানী ই, বি, আর করিয়া লইয়াছে—উদ্দেশ্য সফল হউক। পুলিশ দলের গত বৎসরে ক্রমোন্নতি অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। নিজ শক্তির উপর ভরস্তর এ বৎসরেও তাহাদের খুব। গোরার দুটী দল—ক্যামেরণ ও বর্ডারার্সের শক্তি অল্প নহে, সামরিক দল দুটীর অভিমত। গত বৎসরের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কাষ্টম্‌স সগৌরবে যুদ্ধদানে বিশেষ কুশলী—'মারি ত' গণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার,' ইহাদের ক্রীড়া পদ্ধতি। 'গণ্ডারেরা' সাবধান! দলে ভারী হইবার চেষ্টা মোহনবাগান এবার খুবই করিয়াছে। সুখের বিষয় 'সংগ্রহ-অভিযান' বাঙালার গণ্ডী পার হয় নাই। অন্যান্য দলের খেলোয়াড় অদল-বদল যথেষ্ট হইলেও মোহামেডন্‌ স্পোর্টিং এর দল অটুট্‌ অবস্থাতেই আছে। উপরন্তু দলের কয়েকজন পুরাতন খেলোয়াড় দলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। লীগ্‌ জয়ে মোহামেডনের ষষ্ঠ অভিযান অমিত বিক্রমেই হইবে, সন্দেহ নাই।

লীগের মুখপাতে—লীগ্‌ খেলার মুখপাতের পূর্ব্বে লীগে নিযুক্ত যোদ্ধৃদল সম্বন্ধে উপরে উক্ত কথা লিখিত। মুখপাতে মোহনবাগানের রেঞ্জার্সকে ১—০ গোলে পরাজিত করা, ক্যাল্‌কাটা ও ই-বি-আর এবং কালীঘাট ও কাষ্টম্‌সের খেলার ফল (১—১) সমান-সমান হওয়া হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির অবস্থার বিশেষ তারতম্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মোহামেডন্‌ ও ভবানীপুরের অমীমাংসিত খেলা (১—১) কিন্তু ভবানীপুরেব নূতন দলের পক্ষে খুবই কৃতিত্বজনক। রেঞ্জার্সের ই বি-আরকে ৩ গোলে পরাজিত করাও

লীগ্‌ কাপ্‌—১৯৩৯'এ জয়ী হইবে কে?

প্রথম বিভাগে নবাগতের বিশেষ শক্তিমত্তার প্রমাণ। 'বউনী'তে ইষ্ট বেঙ্গল ক্যামেরনের কাছে ১-০ গোলে পরাজিত। 'ফেরতা' ফিরাইতে না পারিলে বিপদ আছে। বরাত-জোরে কাষ্টম্‌স্‌ পুলিশকে পরাজিত করিয়াছে—২-১ গোলে। বর্ডারারস্‌কে 'কাণ ঘেঁসিয়া মারিয়াছে মোহনবাগান ১-০ গোলে। মোহামেডন স্বরূপ দেখাইয়া দেয় ই-বি-আরের বিরুদ্ধে খেলায়, ৩-১ গোলে জয়ী হইয়া।

অবসর গ্রহণ—কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্গরক্ষক ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের খ্যাতনামা ক্রীড়ক আর্ম্মস্ট্রং স্বদেশ প্রত্যাগমন করায় তাঁহার অপূর্ব্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্য উপভোগে আমরা বঞ্চিত হইলাম। ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের জনপ্রিয় ভূতপূর্ব্ব নেতা টেলরও খেলার মাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মোহনবাগানের কুমার 'ডুমুরের ফুল' ত' হইয়াছেই। সামাদেরও (ই-বি-আর) অভিপ্রায় বোধহয় ওই জাতের ফুল হইবার।

কে, দত্ত (মোহনবাগান) বড় রসীদ (মোহামেডান) মন্মথ দত্ত (মোহনবাগান) কে ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস) নূর মহম্মদ (মোহামেডান)

লীগের বিভিন্ন দলের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়

আর্ম্মষ্ট্রং (ক্যাল্‌কাটা) সামাদ (ই, বি, আর) কুমার (মোহনবাগান) টেলর (ক্যাল্‌কাটা)

লাঠি-খেলা প্রসঙ্গে—লাঠি-খেলা সম্বন্ধে 'প্রবর্ত্তকের' এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে, প্রবন্ধ-লেখক লাঠি-খেলার কথা বলিতে অন্যান্য খেলা-ধূলা সম্বন্ধে অবান্তর অনেক কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার মতামত আমাদের মতামত নহে। লাঠি-খেলা, খেলা নামধেয় হইলেও প্রকৃতপক্ষে খেলা-ধূলার অন্তর্গত ইহা নহে—আত্মরক্ষা ও সশস্ত্র হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবার একটী প্রকরণ শিক্ষা। বাঙালার অধঃপতনের সঙ্গে বাঙালার গৌরবের লাঠিও গিয়াছে। উড়ো জাহাজ, বোমা, কামান, গ্যাসের যুগেও নূতন করিয়া লাঠি চালনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশী বা বিদেশী খেলা-ধূলার জনপ্রিয়তা লাঠি-চালনা শিক্ষার পথে অন্তরায়, মনে যাঁহারা করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

দিন চলিতে লাগিল নিরুপদ্রবে। সংসারের সুব্যবস্থা হওয়ায়, তাঁহার সহিত কথার আর প্রয়োজন ছিল না। ভোজনাদির সময় ব্যতীত দেখা শোনারও প্রয়োজন ফুরাইয়াছিল। নৈশ ভোজনের পর বহির্বাটীতেই শয়ন করিতাম, সঙ্গী ছিল রামেশ্বর। অতি প্রত্যুষে আমরা তিন জনে শয্যা ত্যাগ করিতাম। প্রাতঃকৃত্যাদি লইয়া আমি যখন ব্যস্ত থাকিতাম, রামেশ্বর বহির্বাটীর গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিত। অন্তঃপুরের শয়ন-কক্ষটী হইতে ধূপ-ধুনার গন্ধ ছোট্ট বাড়ীখানিকে পুলকিত করিত। এমনই করিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়। দিন ভালই চলে দেখিয়া পিতৃদেব দাবী জানাইলেন—যখন তাঁর দুই সন্তান, তখন রাত্রির ভোজন-ব্যাপারটা আমার সংসারেই চলিবে। আমি নতশিরে তাহা স্বীকার করিলাম, পত্নীকেও কথাটা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ইহা ত পুণ্যের কথা, আমাদের সৌভাগ্যের কথা!" ১২৲ টাকার উপর তিন জন হইতে সাড়ে তিন জনের দিন চলিতে লাগিল। কেমন করিয়া চলে, সে খবর লওয়ার অবকাশ আমার ছিল'না।

একটা দরজা-জানালা-শূন্য পোড়োঘর পড়িয়া ছিল। এক প্রতিবেশী বন্ধু আসিয়া তাহা কায়েমী করিয়া দিলেন; আর এই ঘরের সম্মুখে সুদীর্ঘ খোলা বারান্দার অল্পাংশ ঘিরিয়া রন্ধনশালার ব্যবস্থা হইল। ক্ষুদ্র সংসার, এই অল্প আয়েও এমন পরিপাটী অপূর্ব্ব শ্রী ধরিল—যে দেখিত, সেই দুই দণ্ড চাহিয়া থাকিত। দ্রব্যাদি অল্প হইলেও, গুছাইয়া রাখার কৌশল সকলকে চমৎকৃত করিত।

গভীর স্তব্ধতার মধ্যে চিত্ত সমাহিত হইলে, আমার চক্ষের সম্মুখে শূন্যে অপূর্ব্ব অক্ষরে লিপি ভাসিয়া উঠিত। পড়িবার উপক্রম করিতাম; কিন্তু লেখাগুলি নিমিষে মিলাইয়া যাইত। এমন কত লিপি যে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কোনটীর মর্ম্মবোধ করিতে পারি নাই।

কলিকাতার কোন এক বন্ধুর সহিত পরিচয় হওয়ার পর বাংলার এক প্রসিদ্ধ বিপ্লবপন্থী দলের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সেই বন্ধু দল-বল সহ পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ায়, এই সময়ে আমার অবকাশের অন্ত ছিল না। আমি অন্তর্জ্জগতে তলাইয়া যাওয়ার অবকাশ পাইয়াছিলাম। অন্তর্জ্জগতের বিচিত্র রহস্য আমার চিত্ত চমৎকৃত করিত। সাধনার এই সুযোগ দীর্ঘদিন রহিল না। হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন—পল্ রিশার (Paul Richard) নামে তাঁহার এক বন্ধু ফরাসী ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডেপুটী-পদপ্রার্থী, চন্দননগরে তাঁহার পক্ষে ভোট-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মঁসিয়ে পল্ রিশার ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্পে পণ্ডিচারী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী মাদাম রিশার শ্রীঅরবিন্দের সহিত "আর্য্য" পত্রিকার পরে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঁসিয়ে পল্ রিশারের জন্য চন্দননগরে আমাকে স্বতন্ত্র দল গড়িতে হইল। সাধারণতঃ দুইটী দল বর্ত্তমান ছিল। এক দল মঁসিয়ে ব্লুজেনের পক্ষে আর এক দল মঁসিয়ে লেম্যারের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি একক তরুণদের লইয়া তৃতীয় পক্ষ-রূপে ভোট-যুদ্ধে অবতরণ করিলাম। মঁসিয়ে রিশার পণ্ডিচারী প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইলেন। চন্দননগরে দুইটী প্রবল প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া এই নূতন পদপ্রার্থীর জন্য যতগুলি ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা চন্দননগরের পক্ষে নগণ্য হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য স্থানে মঁসিয়ে রিশারের পরাজয় হওয়ায়, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেতে এইরূপে ফরাসী রাষ্ট্র-সাধনায় আমার দীক্ষা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইহাতে আমরা সিদ্ধকাম হইয়াছিলাম, সে কথা পরে বলিব।

ম'সিয়ে পল্ রিশারের পরাজয়-বার্ত্তা লইয়া শ্রীঅরবিন্দের যে পত্রখানি আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার আথিক দুর্গতির কথা লিখিত ছিল। আমি সেই অংশটুকু বারবার পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। উপায়-ক্ষম হইয়াও একপ্রকার পরান্নে জীবন যাপন করিতেছি – এই অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দের অভাব অভিযোগ কি রূপে পূরণ করিব, তাহা ভাবিয়া অস্থির হইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন "তোমার ৮০ৎ এমাসে না পাওয়ায়, অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছি। ১৫ৎ বাড়ী ভাড়ার বাকী পড়িয়াছে। বাহির হইতে টাকা আসার পথ বন্ধ। তোমারও ভিতর দিয়া অর্থ যদি না আসে, বলিতে হয়— 'Fate has been against us'.

পত্র পড়িয়া আমার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সেদিন সত্যই নিরুপায় মনে করিয়া চক্ষু আমার অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। স্নানের সময় উপস্থিত হইলে আমি উঠিলাম না; কাজেই স্ত্রীই আমার নিকট আসিলেন; আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিষয়টা জানিয়া লইলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহারও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমার চেয়েও তিনি যে অধিক নিরুপায়, তাহা তিনি নিজেও জানিতেন। তবুও তিনি ভরসা দিয়া বলিলেন "স্নানাহার সারিয়া লও। দুর্ভাবনায় কোন ব্যবস্থাই হয় না। স্থির হও, সুস্থ হও— ভগবান একটা উপায় করিয়া দিবেন।"

মনে পড়িল — "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" শ্রীঅরবিন্দের দাবী পূরণ করার অক্ষমতা অন্তহীন দুর্গতি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর-প্রসাদ ব্যতীত এই অবস্থায় পরিত্রাণের আর পথ কি? অন্তরে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়িল, তবুও উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন পথ দেখি না, আমাদেরও এই অবস্থা—কি করা যায় বল তো?"

সে যুগে দেখিয়াছি—অন্ধকারে যখন সর্ব্বদিক্ ছাইয়া গিয়াছে, আশার ক্ষীণ খদ্যোৎও একবিন্দু আলো দেয় না, তাঁর অতি অকিঞ্চিৎকর আনুকূল্য আমার ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে; আজও তাহার অন্যথা হইল না। আমার কন্যার গলায় এক ছড়া বিছা-হার ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া বলিলেন "এইটা বেচিয়া, যাহা পার পাঠাও; তারপর একটা পথ বাহির হইবেই।"

এই অতি অকিঞ্চিৎকর সহায়তা আমার অন্তরে আশার উদ্রেক করিল না। কিন্তু কেমন যেন মনে হইল—এই সূত্র ধরিয়াই একটা পথ মিলিবে। আমাদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়ার ব্রত পূর্ণ না হইলে, শ্রীঅরবিন্দের দাবী পূরণ করার অধিকার মিলিবে না। আমি তৎক্ষণাৎ সেই হার-ছড়াটী আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ-পত্নীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম "ইহার বিনিময়ে আমায় কয়েকটা টাকা দাও।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "কত টাকা চাই?"

আমি সব কথা তাঁহাকে বলিয়া, তিনি যাহা পারেন তাহাই দিতে বলিলাম। তিনি হার লইলেন না; ত্রিশটী টাকা আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। এই নারী আমাদের মধ্যে "মেজ-বৌ" নামে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন।

আমি এই ৩০ৎ তার করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে পাঠাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে জানাইলাম—পত্র পরে পাঠাইতেছি। হার-গাছটী স্ত্রীর হাতে ফেরৎ দিলাম।

এই ঘটনার পর বুক হইতে দুশ্চিন্তার জগদ্দল পাথর যেন নামিয়া গেল। সমস্যার সমাধান দেখিলাম না। কিন্তু অন্তর যেন লঘু হইয়া, কেমন এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল।

আমি চিরদিন দেখিয়াছি—প্রত্যেক মানুষের পশ্চাতে অলক্ষ্যে কর্ম্মের পর কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া বিধাতা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন আসে, স্রোতের ন্যায় একটীর পর আর একটী আসিয়া মানুষকে বিপন্ন করে। সৌভাগ্যেরও এমনই প্রবাহ বহিয়া চলে। মানুষের জীবন অলক্ষ্য যাহা, তাহার ক্রম-বিকাশের প্রণালী মাত্র। ব্যর্থতার অনাহূত প্লাবন দেখিয়াছি, সাফল্যেরও প্রবল স্রোতঃ স্বীয় জীবনের ইতিহাসে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাকাশে

যখন প্রথম নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, তাহার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া মনে হইল—আমার ভিতর দিয়া শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁর অসাধারণ জীবন-ব্যাপারের রসদ দাবী করিয়াছেন, তাহা কোন মতে অপূর্ণ থাকিবে না। আজকার ত্রিশটী টাকা পাঠাইবার অনুপ্রেরণার মধ্যে সমস্ত ভবিষ্যতের সাফল্য যেন বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা ঘটে, অন্তরে অন্তরে তাহার সূচনা পূর্ব্বেই হইয়া যায়—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। রাত্রির অন্ধকারে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্লান্ত পথিকের ন্যায় আশ্রয়-প্রার্থী এক পরিচিত বিপ্লবী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরীর তাঁর কৃশ, মাথার কেশ রুক্ষ। কাশি-সর্দ্দিতে কণ্ঠে তাঁহার বাণী উচ্চারিত হয় না। এমন কত অসহায় নিরাশ্রয় দেশপ্রেমিক এইখানে শ্রান্তি অপনোদন করিয়া প্রাণ পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। একদিন যেমন সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত দিবারাত্র এই ক্ষুদ্র বাড়ীটীতে ভীড় করিতেন, শ্রীঅরবিন্দের শুভাগমনের পর ভারতের সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বহারা দেশ-সাধকদের ইহা হইল অবাধ আশ্রয় ক্ষেত্র। ইহার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—কত নাম করিব—এই ক্ষেত্রে পদধূলি দিয়াছেন; আবার এই প্রাঙ্গণেই উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণ বৈঠক বসাইয়া ছদ্মচারী দেশকর্ম্মীদের মুক্তি দিয়া গিয়াছেন। দেশজননীর পরিপূর্ণ দৃষ্টি এই সন্ত তীর্থে চিরদিন লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আমি অপ্রত্যাশিত বন্ধুটীর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"খুব পরিশ্রান্ত আপনি, বিশ্রাম করুন।" ইহারা আসিয়াছিলেন আমার নিকট বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সুবিধায়। আমি ইহাদের দিয়াছিলাম শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগ। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া ইহারা যখন আসিতেন, আমি তাঁহাদের নিরাপদ্ শ্রমাপনোদন ও সেবাদির ব্যবস্থার সঙ্গে অন্তরে উৎসর্গ-যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিতাম। আত্মসমর্পণের মন্ত্র তাঁহাদের কর্ণপুটে ঝঙ্কার তুলিত। আর অলক্ষ্যে যে অনবদ্য সেবার পবিত্র হস্তখানি চির উদ্যত থাকিত, তাহার স্পর্শ আজ পর্য্যন্ত কেহই বোধ হয় ভুলিতে পারেন নাই। সে যুগের সেই সকল দেশ-সাধনার পুরোহিতগণের সহিত দীর্ঘ দিন পরে আবার যখন সাক্ষাৎকার হইয়াছে, স্বতঃ-উৎসরিত সে স্মৃতির কাহিনী তাঁহাদেরই কণ্ঠে শুনিয়া চক্ষু আমার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন যে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক সমিতির একজন কর্ণধার। আমাকে সকলেই ভালবাসিতেন, এ আশ্রয় ছিল তাঁহাদের শান্তি ও স্বাস্থ্যের পুণ্যতীর্থ। সারারাত্রি কাশিয়া কাশিয়া বন্ধু মেঝের উপর গয়েরের স্তূপ জড় করিলেন। পরদিন প্রভাতে গৃহদেবী নির্ব্বিকার চিত্তে সকলের অলক্ষ্যে কখন যে তাহা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, তাহা জানিবার উপায় রহিল না। এই নিরুপায় অবস্থায় বৈপ্লবিক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—ইহারা যেমন করিয়া পারেন, শ্রীঅরবিন্দের জন্য প্রতি মাসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এ পৃথিবীতে কেহ কাহারও নিকট কিছুর জন্য ঋণী নহে। বর্ষণধারার ন্যায় ঈশ্বরের দান যখন নামিয়া আসে, মানুষ যন্ত্রস্বরূপ তাহা বহন করে তাঁহারই ইচ্ছায়। তবুও সেই কয় বৎসর শ্রীঅরবিন্দের ব্যয়ভার-বহনের উপায় যাঁহাদের জীবন আশ্রয় করিয়া সম্ভব হইয়াছিল, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিব, তাঁহারা চিরদিন আমার ধন্যবাদার্হ হইয়া থাকিবেন।

কথা শুনিয়া 'তিনি' প্রফুল্ল মুখে বলিলেন "নূতন সংসার পাতিয়া ভগবানের বাণী পাইয়াছ—তোমার সব কিছু আসিবে। এ কথায় বিশ্বাস হারাও কেন?"

আমি সজল নয়নে বলিলাম, "জীবনের ধ্রুবতারা তুমি। কুটিল কণ্টকময় কর্ম্মক্ষেত্রে পথ হারাইলে আলো দিও, আনন্দ দিও।" ইহার পর শ্রীঅরবিন্দের পত্র পাইলাম। "Your money (by wire & letter)—clothes reached safely"—আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠিল।

শ্রীঅরবিন্দের টাকার সুবিধা হইল; কিন্তু আমার অসুবিধার মাত্রা কিছু বাড়িয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দের অর্থ নিঃস্বার্থ দান-রূপে আমার নিকট উপস্থিত হইলেও, দেশের মুক্তিকামীদের দাবী অগ্রাহ্য করার মত দুর্ব্বুদ্ধি আমার ছিল না। এই কর্ম্মে আমি 'তাঁহার' সাহায্য পাইয়াছি প্রচুর। দিন নাই, রাত্রি নাই, নব নব

অতিথি-সমাগমে বাড়ীটা আমার উৎসবময় হইয়া থাকিত। ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যেও অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হইত না। প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলাম "ধৈর্য্য ধর, সব আসিবে।" আমি স্থির হইয়া একাসনে দিবারাত্র শুধু দেখিতাম—অসংখ্য প্রকার ঘটনার সৃষ্টি। প্রাতঃকালে দলে দলে ভিখারী—কেহ নাম লইয়া; কেহ গান গাহিয়া প্রাঙ্গণে অসিয়া দাঁড়াইত। অন্নপূর্ণার মুষ্টিভিক্ষা কোন কারণে বারণ মানিত না; তার উপর ধর্ম্মের অতিথি, কর্ম্মের অতিথি, বিপ্লবের অতিথি—কেমন করিয়া কি হয়, কিছুই আর বুঝিবার উপায় ছিল না। ক্রমে এমন হইল—রন্ধন-শালার অগ্নি আর নির্ব্বাপিত হয় না। দিবারাত্র রন্ধনাদি চলিতেছে! এই অন্তহীন শ্রম তাঁহার একার উপর দিয়াই বহিত। নিজের ভোজনাদির সময় ছিল না, বিশ্রামেরও অবকাশ মিলিত না; কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতাম প্রফুল্ল মুখে হাসির জ্যোৎস্না। তিনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতেন না—নীরব নত মুখে মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি ভাবিতাম—এই প্রাণ ক্ষুদ্র সংসার-ক্ষেত্রে বন্দী থাকিতে পারে না বলিয়াই ভগবান দেশ-ব্রত-সাধনার বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহাকে টানিয়া আনিয়াছেন—এ মহাব্রত কবে পূর্ণ হইবে কে জানে?

দেখিতে দেখিতে দুই মাস অতিবাহিত হইল। শ্রীঅরবিন্দের মুরারিপুকুরের বাগান বিক্রয় হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার অংশের কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে টাকা তাঁহার নিকট পৌছায় নাই। আমার উপর তাগিদের ভার পড়িল। অতিকষ্টে কিছু টাকা আদায় হইয়াছিল। ইহার উপর এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "সাগরসঙ্গীতের" ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দেওয়ায়, তিনি তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মহাযোগী উমানাথ শঙ্করের ন্যায় একদিকে খুব উদাসীন হইলেও, অন্যদিকে বেশ হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি টাকার দিকে খুব হুঁসিয়ার থাকিতে বলিতেন। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন "দেশহিতৈষীর উদর-গহ্বরে টাকা প্রবেশ করিলে, তাহা উদ্গীর্ণ হওয়ার উপায় নাই।" তাঁহার অনেক টাকাই অর্দ্ধ পথে লোপাট হইয়া যাইত। তিনি তাই একবার দুঃখ-মিশ্রিত রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—"Philanthropic stomach digests sovereignly."

যাহা হউক, তিনি এই সময়ে মঁসিয়ে পল রিশারের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি দার্শনিক পত্র প্রকাশ করার অভিলাষ করেন। উহা ইংরাজী ও ফরাসী উভয় ভাষায় বাহির করার কথা হয়। ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার জন্য ইংরাজী ও ফরাসী দেশের জন্য ফ্রেঞ্চ ভাষায় বেদ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ, উপনিষদের অনুবাদ ও মর্ম্মার্থ, যোগ ও সাধন সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি এই পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর-ভাষ্যের মায়াবাদকে গোড়া হইতেই নাকচ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ভিত্তির উপর নিজের অভিনব অনুভূতি প্রকাশ করিয়া, নূতন জীবনাদর্শ-প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই এই সময়ে বলিয়াছিলেন "It will be the intellectual side of my work for the world."

শ্রীঅরবিন্দের এই কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় ভারতীয় যোগ ও দর্শন শাস্ত্রের যে অমর অনুভূতি সঞ্চিত হইয়াছিল, তিনি নিঃশেষে তাহা জগৎকে দান করিয়া অধ্যাত্ম শক্তি-সঞ্চারে অভাবনীয় পথের সন্ধানে অভিযান করিয়াছেন।

এই সময়ের আর দুই একটা সামান্য কথা না বলিলে, আমার জীবন-রঙ্গের আবর্ত্ত-ভেদ হয় না; তাই অতি সংক্ষেপে এই যুগের কথা বলিতে হইল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুগগুরুর সঙ্কেতেই তন্ত্রসাধনার যে ভীম অগ্নি আমার ভিতর দিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা যখন সারা ভারতে প্রলয়-সৃষ্টির উপক্রম করিল, তখন শ্রীঅরবিন্দই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "থাম, তন্ত্রসাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ না উহা বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। তন্ত্রের লক্ষ্য—বেদান্তের প্রতিষ্ঠা। ইহার নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই। এক কথায় ইহার প্রয়োজন আর একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" তিনি আমায় অতঃপর তাঁহার "আর্য্য" পত্রিকার গ্রাহক-সংগ্রহের আদেশ দিলেন। আমি এক সঙ্গে দুই শত 'আর্য্য' চাহিলাম। তিনি আমার অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "উগ্র

রাষ্ট্রপন্থীদের মধ্যে 'আর্য্য'-প্রচার হইলে, 'আর্য্যে'র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যাহারা বেদান্ত ও যোগের অনুরাগী, তাহাদের মধ্যেই 'আর্য্য'-প্রচারের চেষ্টা করিও।" তাঁহার এই সকল উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া, আমার তাৎকালীন বৈপ্লবিক সঙ্গিগণ একটু বিচলিত হইলেন। আমি কিন্তু নিজের উদ্দাম গতিপথ রোধ করিয়া, তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমার অন্তরে এই যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছিল, সহধর্ম্মিণী তাহার সংবাদ রাখিতেন না। বিন্দুমাত্র কাল তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনারও অবকাশ ছিল না। যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় রাষ্ট্রনৈতিক তন্ত্রসাধনায় সে যুগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সুগভীর আন্দোলন আলোচনায় আমার দিবা রাত্রি অতিবাহিত হইত। তিনি গৃহদ্বারে কাণ পাতিয়া সব কিছু শুনিতেন; কিন্তু কি সমস্যার সমাধানে আমরা এমন ভাবে অভিনিবিষ্ট, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সুবিধা পাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমাদের মধ্যে এত তর্কযুদ্ধ কিসের জন্য ?"

আমার মুখে তখন হাসি ছিল না, আমি তখন অতি জটিল সমস্যার মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ পত্রিকাপ্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ, তিনি বেদান্তের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন জাতি-গঠনে উদ্যত হইয়াছেন। আমি বাংলার বিপ্লবীদলের সম্পর্কে থাকায়, তাঁহার উপদেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমতালে চলিতে পারিতেছি না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশ বিপ্লবী নেতৃগণের কর্ম্ম-কৌশলে প্রায় অগ্নিক্ষেত্র-রূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বহু দূরে। তিনি আমার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তিনি একবার স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন। "I want now some breathing time, however brief, which will enable me to accomplish the present stage, which is the central, of my advancment……that is the first reason why I call a halt." আমার সহজ জীবন-যাত্রার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আমায় আত্ম-সমর্পণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারই তর্জ্জনী-সঙ্কেতে তথাকথিত তন্ত্র-সাধনায় উদ্বুদ্ধ প্রাণে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমার নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না, ছিল শুধু মন্ত্র ও সাধনা—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত পণ্ডিতচেরীতে পুনঃ সাক্ষাৎকার-কাল পর্য্যন্ত, তিনি যে আদেশ দিয়াছেন, সাফল্যে অথবা বিফলতায় আমি সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছি। তাঁর আদেশ-পালনের অক্ষমতাকে আমার মৃত্যুর ন্যায় মনে হইত। তাঁর কাজে রত থাকাই জীবনের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ অকস্মাৎ প্রগতিশীল জীবনের অগ্নি-গতি রুদ্ধ করিয়া তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে হাঁকিলেন 'দাঁড়াও'। আমার পশ্চাতে তখন প্রচণ্ড গতি-বেগ লইয়া রুদ্র-বাহিনী ছুটিতেছিল; তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা তখন যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তিনি হয়তো তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই ইহার পর কোন কোন কার্য্যে তাঁহার লেখনী-মুখে লঘু তিরস্কার আমার বুকে খোঁচা দিয়াছে। আমি বুঝিলাম, যোদ্ধার হস্তের তরবারির ন্যায় আমি যন্ত্র মাত্র। তাঁর প্রয়োজন যখন শেষ হইয়াছে, আমায় এক মুহূর্ত্তেই অচল স্তব্ধ হইতে হইবে। কিন্তু মানুষ একটা জড়যন্ত্র নয়, সজীব বস্তু। তাই জীবনের প্রচণ্ড গতি সামলাইতে আমায় আরও একটী বৎসর অতিশয় চিত্তক্লেশ লইয়া চলিতে হইয়াছিল। জীবনের এই সন্ধিক্ষণ কিরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলিবার ভাষা নাই। আমার অবস্থা যে স্বচ্ছ নহে, স্ত্রী তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সময় পাইলেই করুণ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "আজকাল তুমি কেমন হইয়া যাইতেছ। আমায় আর কোন কথা বল না!"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিতাম "এসব কথা শুনিবার মত অবস্থা তোমার নয়, আমি ক্রমেই তোমার সীমার বাহিরে আসিয়া পড়িতেছি।"

তিনি হাতের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িতেন, বলিতেন "আমায় পর করিয়া, তোমার কোন কাজ সিদ্ধ হইবে না। আমাকে বলিতেই হইবে—তোমার অবস্থার কথা।"

আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতাম—এই গৃহাঙ্গণা বর্ত্তমান গুরু সমস্যার সমাধানে কি কাজে লাগিবে? তাঁহাকে এই সকল কথা জানাইয়া লাভ কি? ইহাতে তাঁহার দুর্ভাবনাই বাড়িবে।

কিন্তু তিনি আমাকে নীরব থাকিতে দিতেন না। গৃহস্থালীর সকল কাজ ফেলিয়া, আমার পা দুইটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিতেন "ছাই খাওয়া দাওয়ার কাজ, তোমার মুখ চাহিয়াই আমার জীবন; তোমার কাজের জন্যই আমার এই তপস্যা, আমার এই শ্রম। আমার সঙ্গে তোমার যদি ভেদ ঘটে, তোমার কথা আমি যদি জানিতে না পারি, এত খাটুনী কি শরীর সহিয়া নিবে?" তাঁহার সে আকুতি উপেক্ষা করার উপায় ছিল না, আমি তাঁহাকে সব কথাই বলিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহাকে জানাইলাম—শ্রীঅরবিন্দের নূতন নির্দ্দেশ লইয়া আমার সঙ্গীদের মধ্যে যে বিক্ষোভ-সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উপশান্ত করার মত পথ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

যখনই আমি সমস্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যাই, আর তাহা হইতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করিতে গিয়া আঁধারের মাত্রা বাড়াই, তখনই দেখি—কি এক অমানুষিক শক্তি তাঁহার হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়—তাঁহার চক্ষের দীপ্তি, কণ্ঠের বাণী আমার মনের আঁধার দূর করিয়া দেয়। আমি বহু বার উহা দেখিয়াছি; কিন্তু প্রতি বার উহা উপেক্ষা করিতেও কসুর করি নাই।

তিনি সব কথা স্থির হইয়া শুনিয়া বলিলেন, "অরবিন্দ ঠিক কথাই বলিয়াছেন। তোমার একাজ নয়। তবুও যে এতদিন তিনি তোমায় ইহা হইতে বিরত করেন নাই, বরং এই কাজে উৎসাহ দিয়াছেন, সে কেবল তোমার বাহিরের চাঞ্চল্য দেখিয়া। তোমায় অরবিন্দের পথই লইতে হইবে।" প্রত্যাদেশের নির্ভুল বাণী তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমিও জানি—আমার এ কাজ নহে। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই মন্ত্রই আমি পালন করিতেছি। কোথাও কাপট্য রাখি নাই। কোন স্বার্থে পাছে জড়াইয়া পড়ি, এই জন্য দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণভাবে রামেশ্বরের হাতেই ন্যস্ত। রামেশ্বরের সততা ও সত্যনিষ্ঠা আমায় তৃপ্তি দিত। এই সংসারের সকল কর্তৃত্ব তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া, আমি এক প্রকার নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকার চিত্তে গান গাহিতাম—'তাঁরই কাজে আছি রত, আর কিছু জানি না রে।' কর্ম্মে কিন্তু কোথাও ত্রুটি রাখিতাম না। একদিন শ্রীঅরবিন্দই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আমায় যে ক্রিয়া-যোগের অনুষ্ঠান দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আজ তিনি আমায় সম্পূর্ণ-রূপে বিরত করিয়া বেদান্তের আশ্রয়ে নিখিল মানবজাতির কল্যাণ-মন্ত্রে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। সহধর্ম্মিণীর চক্ষের দৃষ্টিতে, কণ্ঠের ভাষায় তাহাই সমর্থিত হইল। যে সমস্যার জাল হৃদয়ে আমার ঘনাইয়া উঠিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহা বিদীর্ণ করিয়া স্থির সঙ্কল্পের হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। গীতার আশ্বাস-বাণী অগ্নিময় অক্ষরে আমার কাছে অভিনব মর্ম্মার্থ ফুটাইয়া তুলিল—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে সার্ব্বিয়ার অন্তর্গত সেরাজেভো নগরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নী নিহত হওয়ার ফলে, আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইউরোপে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এই বৎসরেরই ১৫ই আগষ্টে ৬২ পাতায় 'আর্য্য' পত্র মসিয়ে রিশার ও মাদাম রিশারের সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় বাহির হয়। 'আর্য্যে' প্রকাশিত দিব্যজীবনের সংবাদ, বেদের রহস্য, উপনিষদের বাণী, যোগ-সমন্বয় প্রভৃতি সন্দর্ভ এক্ষণে আমাদের আলোচনার বস্তু হইল। এই সময়ে স্বদেশী যুগ হইতে যে সকল তরুণ আমার সান্নিধ্যে আসিয়াছিল, দিবাভাগে তাহাদের সহিত 'আর্য্য' লইয়া আলোচনা চলিত; আর বর্ষার ঘন ঘটায় দুর্য্যোগময়ী রজনী আসিলে বাংলার সর্ব্ব-শ্রেণীর বিপ্লবীরা আসিয়া এই সুযোগে তাঁহাদের কর্ত্তব্য লইয়া গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেন। একদিকে বেদ ও বেদান্ত; অপর দিকে জীবন্ত রক্ত-তন্ত্রের ক্রিয়া। কি মহাশক্তি যে আমায় সেদিন সব্যসাচীর ন্যায় একদিকে অমিশ্র ভবিষ্য যুগসৃষ্টি, অন্য দিকে বর্ত্তমান যুগের যবনিকা-ক্ষেপণ করিতে সহায় হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দিবারাত্র দর্শন, সাহিত্য আর বিপ্লবের যুক্তিতর্কে কণ্ঠনালী আমার আড়ষ্ট হইয়া উঠিত। অলক্ষ্যে সহানুভূতির অশ্রুসিক্ত চক্ষে আমার হৃদয় শান্তি-সুধায় অভিষিক্ত করিতেন যিনি, তাঁর সেদিনের অন্তরের আকুতি উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। শ্রমের জন্য

ছিল না, কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের বুদ্ধি হার মানিয়া প্রতি পদ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিত।

চন্দননগর পুলিস গুপ্তচরদিগের সতর্ক দৃষ্টিতে শিহঁরিয়া উঠিয়াছিল। স্থির হইল—উত্তরপাড়ার এক অব্যবহার্য্য প্রাচীন ভগ্নঘাটের যে ক্ষুদ্র কুটুরীটী এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করে, সেইখানে সকলে উপনীত হইয়া ইউরোপের এই মহাযুদ্ধে ভারতের বিপ্লবীদের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবে।

সন্ধ্যায় সেদিন আকাশে কালী লেপিয়া দিয়াছে। সারা দিনের অজস্র বর্ষণে পথ কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল। আমি বাহির হইলাম। পত্নীর কাছে আর কোন কথা গোপন ছিল না। তিনি আমার কাজে বাধা ছিলেন না কোন দিনই—শুধু বিষণ্নমুখে বলিলেন "এই দুর্য্যোগে নৌকা-পথ ব্যতীত অন্য উপায়ে কি যাওয়া চলিবে না?"

আমি বলিলাম "না, কোন পথই নিরাপদ্ নহে; তুমি কি বিপদের আশঙ্কা করিতেছ?"

তিনি বলিলেন "বিপদ্ তোমায় স্পর্শ করিবে না, তাহা আমি জানি। তবুও একা পথে যদি কষ্ট হয়, ঝড় তুফান উঠে!"

আমি "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি" বলিয়া নৌকা-পথে উত্তরপাড়ায় উপনীত হইলাম।

বিপুল অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের আড়ালে অর্দ্ধভগ্ন কুটুরীর মধ্যে সেদিন পরিচিত অনেক বন্ধুকেই দেখিলাম। আজ কেহ বাঁচিয়া আছেন, কেহ নাই। মনে পড়ে আজ যিনি মানবেন্দ্র, ওরফে নরেন্দ্রনাথ, তিনিও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সে দিনের সকল কথা অবশ্য এই ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। রাত্রি শেষে বর্ষার কোটালে গঙ্গাস্রোতঃ দু'কূল উপচিয়া ছুটিতেছে। প্রচণ্ড দক্ষিণা বাতাসে পাল তুলিয়া নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিল। বাড়ী পৌছিলাম অতি প্রত্যুষে। নিদ্রাহীন দুটী আঁখি আমার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত। তিনি আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। সেদিন ভাবি নাই, কে এই দুরন্তের পৃষ্ঠরক্ষা করে। আজ মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে সাধ যায়—"কে তুমি মহাদেবি, আজ মৃত্যুর পারে বসিয়াও আমায় সান্ত্বনা দাও? অন্ধকারে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া রাখ?"

(ক্রমশঃ)

চিন্তা-বীথি

ধর্ম্মের সাধন—আত্মসমর্পণ। ফলে—উপলব্ধি। এই উপলব্ধিই জীবনের রস ও সৃজনের বীর্য্য। উপলব্ধির মূল—ভগবদ্-জ্ঞান। আত্মসমর্পণ—শ্রীভগবানে। তিনিই অতঃপর জীবনের পরিচালক। সাধক ও সিদ্ধ শ্রীভগবানই। আমার জ্ঞানাজ্ঞান দিয়া আর উপলব্ধির বিচার নহে—তিনি যাহা করেন, তাহাই জ্ঞান, তাহাই সত্য, ঋত; আর সকলই অজ্ঞান, অসত্য, অনৃত। ইহাই আত্মসমর্পণ-যোগের যন্ত্র-ভাবের অনুষ্ঠান। যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র আমি—"যথা-নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

* * *

আমি যন্ত্র। এই আমি কে, তাহা সম্পূর্ণ জানি না—কিন্তু আমি চলিতেছি তাঁহারই হাতে, আমার অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা তাঁহারই শক্তির স্পন্দন, তাঁহারই ইচ্ছার ক্রিয়া—এইটুকু জ্ঞান লইয়াই আমার সাধনার আরম্ভ। আত্মসমর্পণ-যোগের ইহাই প্রাথমিক ভিত্তি। এই জ্ঞান যত স্থির হয়, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ততই আমার ভিতরটা স্বচ্ছ, সুন্দর, শান্তিময় হইয়া উঠে—বাহিরেও সেই স্বচ্ছতা, শান্তি, সুষমা জীবনের সর্ব্বঘটনায় ও অবস্থায় যেন ক্রমে ক্রমে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। ইহাই ভিতর দিয়া বাহিরের নিয়ন্ত্রণ—বহির্জ্জগতের উপর অন্তর্জ্জগতের শাসনপ্রতিষ্ঠার সুনিয়ম।

* * *

আত্মসমর্পণের পরও জ্ঞানের বিচার আসে। কিন্তু তাহা মুখ্য নহে, গৌণ। মুখ্য কথা—আমি নয়, তিনিই

সাধিতেছেন। জানা, বুঝা তাঁহারই—আমার নয়। তিনিই অন্ধকারের মধ্যে আলো ফুটাইয়া তুলিতেছেন—অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিতেছেন; অস্বচ্ছ, জটিল, বিশৃঙ্খল যাহা তাহার মধ্যে স্বচ্ছ, সরল, ছন্দোময় শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া বুদ্ধিকে জ্ঞানশক্তির উৎকৃষ্ট প্রকাশযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। যত দিন যাইতেছে, এই জ্ঞানবিকাশই হইতেছে। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রকাশ—প্রতিদিনই এই জ্ঞানের লীলা অন্তরে বাহিরে ফুটিয়া উঠিতেছে। আমি এই জ্ঞানস্রোতেই ভাসিয়া চলিতেছি। চিন্তাগুলি এই জ্ঞানপ্রবাহেরই ঢেউ। ভাব-মুখে জ্ঞানপ্রকাশই চলিয়াছে। ভাবের নিয়ামক তিনিই।

* * * *

শ্রীভগবান ভাবের ঠাকুর। তিনি অনন্ত ভাবঘন। সর্ব্বজ্ঞানের তিনিই আধার। তাঁর মধ্যেই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজ নিহিত আছে। আত্মসমর্পণযোগী এই অনন্ত ঠাকুরের সহিত যোগ সূত্রে যুক্ত হইয়া, পূর্ণতার পথ আবিষ্কার করেন। যোগ যত পূর্ণাঙ্গ হয়, নিজের মধ্যে অসীম প্রতিভার দ্যোতনা ততই ফুটিয়া উঠে। জ্ঞান, কর্ম্ম পূর্ণতারই সাধন। কিন্তু বুদ্ধি, মন নিশ্চল না হইলে, সিদ্ধ জ্ঞানপ্রকাশ পায় না। আত্মসমর্পণেই বুদ্ধি, মন স্থির, নিশ্চেষ্ট হয়। তখন চেষ্টা ও চিন্তার অতীত যে পরম জ্ঞান, তাহা বুদ্ধিক্ষেত্রে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। উহাই তখন জীবন-পথ আলোকিত করিয়া তুলে।

* * * *

আত্মসমর্পণে শুধু বুদ্ধি, মন নিয়ন্ত্রিত হয় না—ইন্দ্রিয়গুলিও নিয়ন্ত্রিত হয়। তবেই যোগ পূর্ণাঙ্গ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধিরই শক্তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে মন নিয়ন্ত্রিত করে। এই সমুদায় ইন্দ্রিয়ই যোগী ভগবানে সমর্পণ করেন। চক্ষু দেখে, কর্ণ শুনে, জিহ্বা রস গ্রহণ করে, ত্বক্ স্পর্শ করে ও নাসা গন্ধ আঘ্রাণ করে—কিন্তু যোগী একে একে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানেরই হাতে নিবেদন করিয়া দিয়া নিঃসম্পর্ক হইতে চাহেন। হস্ত লিখিতেছে—যোগী মনে করেন, ভগবান লিখাইতেছেন, তাই লিখিতেছি; চক্ষু দেখিতেছে—যোগীর ধারণা, ভগবানই দ্রষ্টা, আমার চক্ষু দিয়া তাঁহারই দর্শন। এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বভাব ভাগবত ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়াই আত্মসমর্পণযোগীর সাধনার নিয়ম। ইহাই আত্মশোধন-রূপ প্রাথমিক যোগাঙ্গ। বুদ্ধির শোধন ও ইন্দ্রিয়ের শোধন এই আত্মশুদ্ধিরই দুইটী অংশ, দুই প্রকরণ।

* * * *

তিনি দেখিতেছেন। ইহা যখন মনে করিতেছি, তখনই ইহা শুদ্ধ প্রত্যক্ষ। এইরূপ প্রত্যক্ষই নির্ভুল প্রমাণ। মনে রাখাই অনুস্মরণ। ইহা স্মৃতির সাধনা। মনে রাখিতে রাখিতে ক্রমে ইহা স্বতঃই আভ্যন্তরীণ অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন এই প্রত্যয়ের আর কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে না।

"যার যেমন ভাব, তেমন লাভ
মূল সে প্রত্যয়।"

—সাধক রামপ্রসাদের এই সিদ্ধবাণী যোগ-শাস্ত্রেরই অনুগত। মহর্ষি পতঞ্জলিও প্রমাণ ও স্মৃতি, এই দুই বৃত্তিই শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য ত্রিবৃত্তি—বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা যোগের সহায় নহে, প্রতিকূল। আর প্রত্যয় বা ধারণা হইতেই যৌগিক ধ্যান, সমাধির উৎপত্তি। কাজেই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগুলিকে স্মৃতি-যোগে ভগবৎপরায়ণ করিয়া তুলিতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে আমরা ভাগবত ভাবে অভিষিক্ত হইতে পারিব। আত্মসমর্পণ-যোগী প্রতি প্রত্যক্ষকেই সহজ ভাবে ইষ্টে নিবেদন করিয়া, তাহাদের মৌলিক প্রত্যয়গুলির পরিশোধন করিয়া তুলেন। "বোধং বোধং প্রতিবোধং"—এই প্রতিবোধই শুদ্ধ ভাব বা ধারণাশক্তি। ভগবৎ-প্রত্যয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই সিদ্ধ প্রতিবোধের উন্মেষ হয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি শুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলেই যোগীর অন্তরে প্রাকাম্যশক্তির বিকাশ হয়। শুদ্ধ ও সিদ্ধ ইন্দ্রিয়সামর্থ্যই প্রাকাম্য।

* * * *

যোগ-বিজ্ঞান—ফলিত সাধন বিজ্ঞান। ইহা শুধু তত্ত্ব-বিদ্যা নহে। আত্মসমর্পণযোগীর সাধনা প্রতি ক্ষণে, প্রতি নিমিষেই চলে। শরণ ও স্মরণই তাহার সাধনা। আমি যন্ত্র—আমি ইষ্টের অনুগত, আমার নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, প্রবৃত্তি কিছুই নাই—প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই—যাহা তিনি করান, তাহাই আমার প্রবৃত্তি; যাহা হইতে তিনি বিরত করান, তাহাই আমার নিবৃত্তি—এই ভাবই যন্ত্র-ভাব—যন্ত্রবোধের সাধনা। প্রকৃত যন্ত্র-বোধে ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব আসিতে পারে না। কিন্তু সতর্ক হইতে হয়—ভাবের ঘরে চুরি না চলে। তাহাতেও শঙ্কা নাই। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই সাধনের অল্প মাত্র অনুষ্ঠানেও মহাভয়ের হাত হইতে অবশ্যই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সাধনায় তাই সংশয় রাখিতে নাই। প্রত্যয়ই অগ্রগতির মূল। প্রত্যয় দৃঢ় হইলে, আর কেহই বা কিছুই যোগীর পথে বাধা দিতে পারে না। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ধৃতি—এই সকল প্রত্যয়েরই অন্তর্গত পর্য্যায়। আত্মসমর্পণযোগের ইহাই গোড়ার কথা।

জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তন

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় গগনে দুইটী জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল প্রভায় আর সমস্ত জ্যোতিষ্কই ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে দুইটী হইতেছেন হিটলার এবং মুসোলিনী। উভয়েই তাহাদের অমানুষিক প্রভাবের দ্বারা নিজের দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। মুসোলিনী বলেন, "আমার কেবল একটী মাত্র দোষ আছে—তাহা এই যে ইতালী ব্যতীত আর কোনও উপাস্য দেবতা আমি মানি না।" জার্ম্মানজাতির স্বার্থ ব্যতীত হিটলারও আর কিছু বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। গত শতাব্দীর নেপোলিয়নের মতন হিটলারের প্রতি পদক্ষেপেই ইউরোপ শঙ্কাকুল হইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র গতিতে হিটলার ইউরোপের মানচিত্র বদ্‌লাইয়া ফেলিতেছেন। রোম-বার্লিন অক্ষ-দণ্ডের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ায় আজ জগত সন্ত্রস্ত। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ইংলণ্ড ও ফরাসীর মত পৃথিবীকে ভোগ করিবার অধিকার ইতালী এবং জার্ম্মানীরও আছে—এই দাবীই তাঁহারা করিতেছেন। সুতরাং হিটলার ও মুসোলিনীর ন্যায্য দাবী বা অন্যায্য দাবী সবটাতেই জগতের লোক শঙ্কিত হইয়া উঠে। এই সব দাবীর পশ্চাতে রহিয়াছে মুসোলিনীর "প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠার এবং হিটলারের প্রাচীন "পবিত্র রোম সাম্রাজ্য" (Holy Roman Empire) প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বিশেষ করিয়া বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আজ হিটলার ও হিটলারের সৃষ্ট নব্য জার্ম্মানীর উপর নিপতিত হইয়াছে। হিটলারের এই বিস্ময়কর অভ্যুদয়ের পশ্চাতে জার্ম্মান জাতির বহু শতাব্দীর যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা রহিয়াছে তাহা অনুধাবনীয়। রুশিয়া ব্যতীত গ্রেট বৃটেন সহ সমস্ত ইউরোপ, এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকা ব্যাপিয়া প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য একদা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সাম্রাজ্য বৃহৎ হওয়ায় সেই সময় দুইটী রাজধানীর প্রয়োজন হয়—একটী রোম এবং অপরটী কনষ্টাণ্টিনোপোল।

ইতালীর রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর জার্ম্মানজাতির নেতা হিসাবে বর্ত্তমান অষ্ট্রিয়ার হাপস্‌বুর্গ রাজবংশ পবিত্র রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন জার্ম্মানীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্য ছিল কিন্তু সকল রাজ্যই হাপ্‌সবুর্গ জার্ম্মান সম্রাটকে মান্য করিয়া চলিতেন। তাহারা বহু বৎসর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়া ব্যতীত এবং স্পেন ও ইটালীসহ সমগ্র ইউরোপের উপর আধিপত্য করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বীর-কেশরী নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তখন হইতে হাপস্‌বুর্গরাজগণ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট উপাধিতে মাত্র ভূষিত হন এবং অবশিষ্ট জার্ম্মান রাষ্ট্রসমূহ সম্রাটের প্রাধান্য অস্বীকার করে। অবশ্য তখনও বোহেমিয়, মেরেভিয়া, হাঙ্গেরী এবং বর্ত্তমান যুগোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর হইতে আবার জার্ম্মাণীর বহুধাবিভক্ত রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হইতে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মান কন্‌ফেডারেশন নামক একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তখনও প্রায় ত্রিশটী স্বতন্ত্র জার্ম্মান রাজ্য ছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ঐ মিলন চেষ্টা বিফল হয়। বিগত ১৮৬৬ সালে প্রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অষ্ট্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য জার্ম্মান রাজ্যগুলিকে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত করিতে আরম্ভ করেন। বিগত ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো প্রুশিয় যুদ্ধের পর প্রুশিয়ার রাজাকে সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করিয়া আধুনিক জার্ম্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিসমার্কই ঐ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বিসমার্ক জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিলেও অষ্ট্রিয়াবাসী জার্ম্মানগণ তখন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর বাহিরেই ছিল। অষ্ট্রিয়ার অধীনে জার্ম্মান ব্যতীত মেনিয়ার, চেক্, শ্লোভাক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি থাকায় বিসমার্ক অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর অন্তর-দ্বন্দ্বের অবসান মিটাইয়া ঐক্য বিধান করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই।

১৮৭০ সালের পর হইতে ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে।

সাম্রাজ্য বিস্তারে জার্ম্মাণীর অগ্রগতি দেখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড, ফরাসী ও রুশিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে। জার্ম্মান কন্‌ফেড রেশনের সঙ্ঘবদ্ধ অত্যুগ্র আগ্রহ দমন করিবার নিমিত্ত এবং ঐক্যবদ্ধ ও উদীয়মান জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রশক্তি বিনষ্ট করিবার জন্যই উহারা ভিতরে ভিতরে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। তাই তুচ্ছ ছুতো ধরিয়া মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ১৯১৪ সালের মহাসমর ঘটাইয়া তোলেন। ঐ যুদ্ধে ৩২টী দেশ যোগদান করে। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক এই চারিটী দেশের বিপক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি ২৮ দেশ সমবেত হয়। পরাজিত জার্ম্মাণী যাহাতে আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে সে জন্য মিত্রশক্তিপুঞ্জ ভার্সেলিসে যে সন্ধিসর্ত্ত রচনা করেন ঐপ্রকার একদেশদর্শী ও কঠোর সন্ধিপত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও রচিত হয় নাই। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার বড় বড় টুক্‌রা পুরাতন ও নবগঠিত প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়—যাহাতে এইসব স্বার্থভোগী প্রতিবেশীর দল সর্ব্বদাই ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকে। সেই অন্যায় ভাগ বাঁটোয়ারায় পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, নিথুলিয়া, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও ইটালী সকলেই অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর অংশ পাইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর উপনিবেশগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫৯ বৎসরের জন্য বার্ষিক দশ কোটী পাউণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রতিশ্রুতি জার্ম্মাণীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বিজয়ী পক্ষ আদায় করে। এক লক্ষের বেশী সৈন্য সে রাখিতে পারিবেনা এবং তাহার শৈলপ্রধান রাইন অঞ্চলে সে কখনও সৈন্য মোতায়েন করিতে বা দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তাহা সত্ত্বেও সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক সর্ত্ত ছিল এই যে, বিগত মহাসমর ঘটাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জার্ম্মাণীর উপর চাপান হয়। এ সবের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে জার্ম্মাণী তথা জার্ম্মান কন্‌ফেডারেশন যেন আর কখনও ভবিষ্যতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে।

ভার্সেলিস সন্ধির ফলে লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত জার্ম্মান জাতির সংঘবদ্ধ অমোঘ আন্তরিক আশা আকাঙ্ক্ষা বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠে হিটলারের মধ্যে। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত কেহ একথা ভাবিতেও পারে নাই যে, জার্ম্মাণী আবার কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিবে। হিটলারের দ্রুত অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ঘটনা। এই সময়ের পর হইতেই সে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এবং ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মানগণ জাতি হিসাবে বিশ্বমানবের সভায় তাহাদের ন্যায্য আসন প্রাপ্তির বিষয়ে আশান্বিত হইয়া উঠে। নাৎসীপ্রচারকার্য্য ও কৌশল জার্ম্মাণীতে অভূতপূর্ব্ব জাগরণের সঞ্চার করে এবং বৈপ্লবিক দ্রুত গতিতে জার্ম্মাণী তাহার অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯৩৪ সালে হিটলার অবাধে সামরিক সম্ভার বৃদ্ধি করার নীতি ঘোষণা করেন। ক্ষতিপূরণ না পাইবার অজুহাতে ফ্রান্স ১৯২৩ সালে জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চল দখল করিয়া বসে। কিন্তু ১৯৩৪ সালে ভার্সেনিস্ সর্ত্তের এতবড় অবমাননার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া জার্ম্মাণী বলপূর্ব্বকই রূঢ় অঞ্চল পুনরায় দখল করে। ফ্রান্স একা কিছু করিবার সাহস না পাইয়া ১৯১৪ সালের মতই ইংলণ্ড ও রুশিয়ার সঙ্গে মিতালী প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে ও ইহার ফলে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি (Franco-Soviet Pact) বিধিবদ্ধ হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এবারে জার্ম্মাণী রাখিতে চাহে নাই। ১৯১৪ সালে উভয়দিকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় এবং বহু শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ায় জার্ম্মাণীর পরাজয় ঘটে। ফরাসীর উল্লিখিত নীতির প্রতিবাদকল্পে হিটলার ভার্সেনিসের সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া রাইন অঞ্চলে সেনা সন্নিবেশ করেন এবং ফরাসীকে জানাইয়া দেয় যে জার্ম্মাণী তাহার সঙ্গে ২৫ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে—যদি পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণ-রাজ্য বিস্তারে ফরাসী বাধা না দেয়। কিন্তু উহাতে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ রুশিয়ার মিতালী বিসর্জ্জন দিতে রাজী হন নাই।

জার্ম্মাণীর কূটনীতি তখন অন্য খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ভার্সেলিসের বখরাদারীতে ইটালীর ভাগে সামান্যই পড়িয়াছিল। লুণ্ঠন দ্রব্যের সেরা অংশ যায় ফরাসী ও ইংরাজের ভাগে। উহাতে মিত্রশক্তিপুঞ্জের

বপক্ষে ইটালীর বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। অবশেষে মুসোলিনী যখন ১৯২২ সালে প্রাচীন রোমান গরিমা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন লইয়া ইটালীতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন—তখন হইতে ঐ বিদ্বেষ আরও প্রবলাকার ধারণ করে। ইটালীর রাজনীতির গতি লক্ষ্য করিয়া হিটলার তাহা নিজের কার্য্যে লাগাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ফলে রোম বার্লিন মিতালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ অক্ষদণ্ড পরে প্রসারিত হইয়া জাপানকেও দলে ভিড়াইয়া লয়। রোম বার্লিনের মিতালী একটী সাময়িক চুক্তি মাত্র নয়। উহা দুইটী দেশের উদীয়মান বৈপ্লবিক জাতীয়তার সমন্বয়। এজন্যই উহা অমোঘ শক্তি লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই রোম বার্লিন অক্ষদণ্ডের তাড়নায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

১৯৩৭ সালে ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়ায়। একদিকে রুশিয়া ও বিশ্বের সমাজতন্ত্রবাদীগণ হিটলারের পতন ঘটাইবার জন্য ফ্যাসিজমের বিপক্ষে পৃথিবীর জনমত গড়িয়া তুলিবার জন্য বিপুল প্রচার কার্য্য বিশ্বময় চালাইতে থাকে। নবজাগরিত সাম্যবাদী রুশিয়ার জাগরণ ইংলণ্ড ও ফরাসী ভাল চক্ষে দেখিতে পারে নাই বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মাণীর অভ্যুদয় তাহারা একরূপ বাধ্য হইয়াই সহ্য করিয়াছিল।

অপর পক্ষে পরাজিত জার্ম্মেণী ভার্সেলিস সন্ধির ফলে সঙ্কোচিত আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরাইয়া পাইবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতে থাকে। ইতিমধ্যে নাৎসীদের প্রচার কার্য্যের ফলে ইংলণ্ড, ফরাসী ও রুশিয়া দেশেও জার্ম্মাণীর উপর সহানুভূতিসম্পন্ন রাষ্ট্রীয়দল গড়িয়া উঠে। এই সময়ে ভার্সেলিসের সর্ত্তে জার্ম্মাণীর উপর বিগত যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইয়া যে ধারা লিখিত হইয়াছিল—তাহা সরাসরি অস্বীকার করেন (denouncement of the war-guilt clause). এবং সুইটজারল্যাণ্ডে, বেলজিয়াম ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিপত্র সই করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহার দ্বারা কতকগুলি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিপদের আসন্ন কারণ দূরীভূত করেন। এইভাবে জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চলের ব্যাপারে নীতি প্রয়োগ করিবার সুবিধা করিয়া লইলেন।

১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে মুসোলিনীর সম্মতি অনুসারে হিটলার অষ্ট্রিয়া দখল করেন এবং ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তি অনুসারে সুদেতেন অঞ্চলও জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এতদিনে বিসমার্কের স্বপ্ন সফল হইল। উহাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলা যায় না। জাতীয়তার ক্রমবিকাশধারায় এই জার্ম্মান কন্‌ফেডারেশনের বিস্তৃতি ঐতিহাসিক পরিণতি। সুদেতেন অঞ্চলের ব্যাপারে একটী মহাসমর আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ ইংলণ্ড যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই—অথবা রুশিয়ার সামরিক শক্তির উপরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই—অথবা রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া "যায় শত্রু পরে পরে" নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার কৌশল তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল। যে কারণেই হউক অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চল বিনা রক্তপাতে দখল করিয়া হিটলার একদিকে বৃহত্তর জার্ম্মান রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অপরদিকে চেকোস্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় উহা যে অর্থনৈতিক, রাজনীতিক বা সামরিক কোন হিসাবেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে অধিক দিন পারে না, এ কথাও হিটলার ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন।

সুতরাং ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে হিটলার বিনা রক্তপাতে আবার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করিয়া বসিলেন। মিউনিক চুক্তির কুফলই তাঁহার এই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। চেকোস্লোভাকিয়া দখলের সংবাদ বিশ্ববাসী ভাল করিয়া সমজাইবার পূর্ব্বেই হিটলার অনায়াসেই লিথুনিয়ার নিকট হইতে মেমেল ছিনাইয়া লইলেন। মেমেলের অধিবাসীগণ অধিকাংশই জার্ম্মান এবং ১৯১৮ সালের পূর্ব্বেও ইহা জার্ম্মানীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং মেমেলবাসীগণকে বৃহত্তর জার্ম্মান রাষ্ট্রের অধীন করিয়া হিটলার বিশেষ অপকর্ম্ম কিছুই করে নাই। হিটলারের এই অপ্রত্যাশিত অগ্রগতিতে পোল্যাণ্ড চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভার্সেলিস সন্ধির ফলে পোল্যাণ্ডকে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাস্তা দিবার অভিপ্রায়ে জার্ম্মানীর রাজ্যের ভিতর দিয়াই একটি রাস্তা দেওয়া হয়। 'উহাকেই পলিশ করিডর'

(Polish corridor) বলে। ঐ রাস্তাটি এবং ড্যানজিক্ সহরটী জার্ম্মানী দখল করিতে পারে, এই আশঙ্কাতেই বর্ত্তমানে ইউরোপের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেকের সহিত লণ্ডনে চেম্বারলেনের পরামর্শের ফলে পোল্যাণ্ডের বিপদে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ইহা অবধারিত যে জার্ম্মানী ড্যান্‌জিগ ও করিডর দখল করিবেই।

জার্ম্মানীর ভাবী উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় লইয়া রাজনীতিক মহলে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। সমগ্র জার্ম্মানজাতিকে এক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ করা তাহার কাম্য। ঐ কার্য্যের আর খুব সামান্যই বাকি আছে। শুধু বেলজিয়ামের ভিতরে ২টী প্রদেশ, ডেনমার্কের ভিতরে ১টী প্রদেশ, ইটালীর ভিতরে টাইরল এবং পোলেণ্ডের ভিতরে কয়েকটী অঞ্চল ফিরিয়া পাইলেই তাহার অখণ্ড জার্ম্মানীর প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু উহাই কি তাহার কামনার শেষ? চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করায় এখন একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পররাজ্য গ্রাস করিতেও হিটলারের কোন আপত্তি নাই। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ইংলণ্ড ও ফরাসীর মত পৃথিবীকে ভোগ করিবার দাবী জার্ম্মানীরও যে আছে, এ কথা হিটলারের বক্তৃতাদিতে ও নব্য জার্ম্মাণীর বাইবেল হিটলার-রচিত 'মে ক্যাম্প' পুস্তকে সুস্পষ্ট প্রকাশ।

আবার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করায় এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, হিটলার কি ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার যে সাম্রাজ্য ছিল তাহাও পুনরুদ্ধার করিয়া জার্ম্মানীর সার্ব্বভৌমত্বের আবরণে রাখিতে চান? যদি তাহাই হয় তবে হাঙ্গেরী এবং যুগোস্লাভিয়া রাজ্যও তাঁহাকে কুক্ষিগত করিতে হইবে। আর যদি ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উর্ব্বর অঞ্চল ইউক্রাইন দখল করিবার অভিপ্রায় তাঁহার থাকে, তাহা হইলেও সামরিক প্রয়োজনে বোহেমিয়া অধিকার একান্ত প্রয়োজন। বিসমার্ক একদিন বলিয়াছিলেন, "বোহেমিয়া যার ইউরোপ তার"। এখন কথা এই যে, যদি হিটলার পূর্ব্বতন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দাবী করেন তবে যুগোস্লাভিয়ার উপরে দৃষ্টি দিবেন। আর যদি সাম্যবাদী রুশিয়ার পতন কামনা করেন, তবে লিথুনিয়া এস্‌থেনিয়া, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার উপরে নীতি প্রয়োগ করিবেন। বিগত মহাসমরের সময়ে শোভিয়েট রুশিয়ার বৈপ্লবিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্রেষ্টলিটভ্‌স্ক নামক স্থানে জার্ম্মাণীর একটা সন্ধি হয়। উহার সর্ত্তানুসারে জার্ম্মাণী, ইউক্রানিয়া, পোল্যাণ্ড, লেট্‌ভিয়া, লিথুনিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৯১৮ সালে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের সঙ্গে ঐ সন্ধিসর্ত্ত মিত্রশক্তিপুঞ্জ বাতিল করিয়া দেন। তারপর ভার্সেলিসের সন্ধিসর্ত্ত রচিত হয়। এই অপমান নব্য জার্ম্মান জাতির পক্ষে বিস্মৃত হইবার নয়। ভার্সেলিসের সন্ধিসর্ত্ত সমাধি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তরে ব্রেষ্টলিট্-ভস্কের সর্ত্তের পুনরুদ্ধারের দাবী উঠা স্বাভাবিক। হয়ত বা হিটলার সেই কথাই ভাবিতেছেন। তবে কথা উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে হাঙ্গেরীকে রুমেনিয়া গ্রাস করিতে দেওয়া হইল কেন? রুমেনিয়াকে ভিত্তি করিয়া ইউক্রাইন রাজ্য জার্ম্মাণীর তাঁবেদারীতে গঠিত হইবে, এ কথা শুনা যাইতেছিল। তবে কি হিটলার পূর্ব্বদিকে রুশিয়ার সঙ্গে বিবাদ না করিয়া পশ্চিম প্রান্তে ফরাসীর সঙ্গেই বিবাদ আরম্ভ করিবেন? এদিকে মুসোলিনীও তো জিবুতি, টিউনিস প্রভৃতি দাবী করিয়া ফরাসীকে শাসাইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। আমাদের মনে হয় ইংরাজ ও ফরাসী যাহাতে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকে সেভাবে উহাদের উপর ইটালী ও জার্ম্মাণী চাপ দিবে। এবং উহাদের নিরপেক্ষতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই রুশিয়ার দিকে হিটলারের অভিযান আরম্ভ হইবে। সোভিয়েটের প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারিলে পরে ইংলণ্ড ও ফরাসীর সঙ্গে আবার তাহার বল পরীক্ষা হইবে। রুজভেল্টের শান্তি প্রস্তাবের উত্তরে মুসোলিনীর সরাসরি 'না' এবং হিটলারের কথার মারপ্যাচে 'হাঁ-না' প্রত্যুত্তর হিটলারের নবীন জার্ম্মানীর বিশ্ববিজয়ের আকাঙ্ক্ষাই সূচিত করে না কি?

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি—

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, উৎপত্তি ও স্বরূপ লইয়া বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানকালে বাদবিসম্বাদের অবধি নাই। এই সম্বন্ধে ধারণা-বৈচিত্র্য সাধারণতঃ শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, পরিবেশ ও মানসিক প্রবণতা প্রভৃতির কারণে ঘটিয়া থাকে। ভাবলোক হইতে যখনই এই সকল প্রভাবিত ধারণা সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া চরিত্র-রীতি-নীতিতে রূপায়িত হয়, তখনই আসে সংঘাত। এইরূপ সংঘাত আজকাল আদর্শবাদী ও বাস্তবতাবাদী, প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থী, নীতিনিষ্ঠ ও দৃষ্টিনিষ্ঠ, স্থিতিশীল ও প্রগতিশীল প্রভৃতি নানা নামধেয় দলের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কেন এইরূপ একদেশদর্শিতা হয় সে সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় বিগত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন :—

কেন্দ্রাভিমুখী এবং কেন্দ্রাপসারী এই উভয় ভাবের সুসামঞ্জস্য হইলে মানসিক ও সামাজিক জীবনে সুসার আসে, সাহিত্যে শাশ্বত গুণযুক্ত রসসৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টি কখনও একদেশদর্শী হইতে পারে না, তাহার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, সুষমা ও শক্তি, স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, নীতির বন্ধন ও বাধাবন্ধহীন স্বাচ্ছন্দ্য গতি উভয়েরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। বন্ধনের মধ্যে মুক্তি এই মহা সত্য কেন্দ্রাভিমুখী মনোভাব প্রকাশ করিতে চাহে; কেন্দ্রাপসারী মনোভাব মুক্তির মধ্যে আপনাকে বাঁধিতে চাহে। যেখানে এই দুই ভাবকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা হয়, সেখানেই একদেশদর্শিতা আসিয়া পড়ে, সেখানেই একদিকে ভার পড়ে, সৎ-এর বহু মুখের মধ্যে একটিকে মাত্র স্বীকার করিয়া লইলে যাহা হয় তাহা ঘটে—একের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। * * * *

যাহা সত্যকার রস-রচনা, তাহা প্রাণধর্মী—প্রাণের স্ফূর্ত্তি যেমন স্বতঃ হইয়া থাকে, এই রূপ রস-রচনার স্ফূর্ত্তিও স্বতঃ হইয়া থাকে; দেশ, কাল, পাত্র—এগুলির প্রভাব বা আবেষ্টনীকে এই রূপ প্রাণধর্মী রচনা বর্জন করিতে পারে না,—এই জন্য ইহা বাস্তবানুসারী হইতে বাধ্য; আবার সেই সঙ্গে, লোকাতিগ দৃষ্টি বা অনুভূতির পরিচয়ও ইহাতে পাই,—অন্যথা বিশ্ব-মানবের আস্বাদনের উপযোগী রসের সৃষ্টি ইহাতে হইতে পারিবে না। সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মহাকালের মান-দণ্ডের আবশ্যকতা আছে; যাহা সত্য, যাহা মহৎ, যাহা সার্থক, তাহাই নিরবধি কালের স্রোতের মধ্যে টিকিয়া যায়; যাহা অসত্য, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা নিরর্থক, তাহা ক্ষণিকের খ্যাতি পাইয়া বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

আর্টের খাতিরেই আর্ট—সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, সাহিত্যের অন্য কোনও দায় বা কর্ত্তব্য নাই—এ কথার বিচার তখনই হইতে পারে, যখন এই আর্ট এবং ইহার চরম স্বরূপ বা প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে এবং ইহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে আমরা স্থির ধারণা করিতে পারিব; আর্টের অনুশীলনের বা আস্বাদনে—সে আর্ট রূপ-কলারই হউক, বা সাহিত্য-রচনারই হউক, সঙ্গীতেরই হউক বা নৃত্য ও নাটকেরই হউক—আমরা যে অপার্থিব রসানুভূতির অধিকারী হই, তাহাই আর্টের লক্ষ্য; এবং সাংসারিক জীবনের বিষবৃক্ষে ইহাই অমৃততর মধুর ফল। আর্টের উদ্দেশ্য আর্ট, অর্থাৎ এই রসানুভূতি;—সুতরাং যেখানে এই রসানুভূতি নাই, সেখানে আর্ট নিষ্ফল—সাহিত্য সেখানে নিরর্থক। ইহা হইল আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতের কথা। সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনে আর্ট অর্থাৎ কলা ও সাহিত্য উদ্দেশ্য-বিহীন থাকিতে পারে না, তাহা বিচার্য। মানসিক ও আত্মিক জীবনের প্রভাব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য ভাবে আসিয়া পড়ে, সুতরাং জীবন সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। এইরূপ প্রভাব কাম্য কি না, ইহা হইতে আমরা মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারি কি না, এ কথার সমাধানের সঙ্গে, সাহিত্য উদ্দেশ্যযুক্ত হইবে অথবা নিরুদ্দেশ্য হইবে, এই প্রশ্ন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। এক প্রকার সাহিত্য আছে, যাহার প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, সেই প্রকার সাহিত্যের উৎস রিরংসা এবং তাহার কাম্য ঐ মনোবৃত্তির উত্তেজন; সেই প্রকার সাহিত্য হয় তো আধুনিকতার বাস্তবের ও শিল্পের দাবী করিয়া 'সাহিত্য নীতিনিষ্ঠ হইবে না' এই মতবাদের ধ্বজা উড়াইয়া লোকের কাছে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করে। সে রূপ সাহিত্য জগতে নূতন নহে, তাহা কখনও টিকে নাই, টিকিবেও না; এবং এ যুগে সেইরূপ সাহিত্যের জন্য ধর্মাধিকরণের ব্যবস্থা সব দেশেই অল্প-বিস্তর আছে। যথার্থ বাস্তব-বাদী সাহিত্য যদি সত্য দৃষ্টির সঙ্গে দর্শনের লক্ষ্য বা আদর্শ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা আমাদের আদরের সহিত গ্রহণীয়। প্রাচীন আরব কবির উপদেশ এই প্রসঙ্গে সার্থক উপদেশ বলিয়া মনে হয়—'তুমি যে সব কবিতা ও শ্লোক রচনা করিয়াছ, সেগুলির মধ্যে প্রশংসার যোগ্য ও সকলের চেয়ে সুন্দর কবিতা সেইটি, যেটি শুনিয়া লোকে বলে—হাঁ, ইহা সত্য বটে।'

মানুষের মনের ধর্ম বহু জটিলতায় পূর্ণ; সাহিত্য এই সমস্ত জটিলতারই প্রকাশ করিয়া থাকে, এখানে আমরা একটী বা দুইটী ধর্মের ধ্বজা খাড়া করিয়া, অন্য সবগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারি না। নিছক সাহিত্য-দৃষ্টিতেই দেখিব, ব্যক্তিগত ও জাতিগত রুচি এবং সংস্কৃতি আমার কাছে কিছুই নহে যেহেতু আমি বাস্তব-বাদী সাহিত্যিক, এই সাহসের উক্তি তাঁহারই সাজে, যাঁহার শক্তি আছে, যাঁহার পক্ষপাতহীন সমদৃষ্টি আছে, মানব-ধর্মিতার সাধনার ফলে যাঁহার চিত্তে সহানুভূতি আছে, ধৈর্য্য আছে, ক্ষমা আছে এবং যাঁহার রস-সৃষ্টি অনুভূতির বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত। * * *

মুদ্রিত সাহিত্য হাতের ঢিল, বা ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বীজ, কোথায় গিয়া কাহার মনে কিরূপ কার্য করে, তাহা কাহারও জানা নাই। প্রারম্ভে

ভাবশুদ্ধি, অমায়িকতা, সত্যাদিদৃক্ষা থাকিলে, তবেই যথার্থ রসসৃষ্টি সম্ভব হয় ; তখন সার্থক ও কল্যাণকর সাহিত্য-রচনা দেশকে ও সমগ্র মানব জাতিকে ধন্য করে।

মুস্লিম সাহিত্য—

মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক রেষারেষি কিছুকাল হইতে দেখা দিয়াছে তাহা সাহিত্যের পবিত্রাঙ্গণেও ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। এই মারাত্মক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুস্লিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সাহেব তাঁহার অভিভাষণে নিম্নোদ্ধৃত সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন :—

সাহিত্যে জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডী আমি কখনও স্বীকার করি নাই, এখনও করি না ; কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য স্বীকার করি। সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান যে জাতিরই হউক, ইহা সাহিত্য পদবাচ্য হইলেই সার্ব্বজনীন হইয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতেই উদ্ভুত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু বাঙ্গালী হিন্দুর কিম্বা বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য নয় ; ইহা উভয়েরই সম্মিলিত সাহিত্য ; উভয় জাতি এই সাহিত্যকে আপন ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়া সৌষ্ঠবশালী করিয়া না তুলিলে এই সাহিত্য যে নিতান্তই একদেশদর্শী হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দিয়া এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট না করিলে আজ মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যকে শুধু শাক্ত হিন্দুদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় এত উন্নত অবস্থায় পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না।

বঙ্গীয় মুসলমান তাহার ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার লইয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙ্গালী সাহিত্যের যে অংশে মুসলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়া উঠে, তাহাই "মুস্লিম সাহিত্য" এই সাহিত্য অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে পৃথক নহে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে, রূপে, রসে মুসলমান ব্যতীত অপরের সংস্কৃতিগত সাহিত্য হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। মুসলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক শব্দ ও ভাবের স্পষ্ট ছাপ বহন করিলেও, ভাষায় এই সাহিত্য পুরাদস্তুর বাঙ্গালা, প্রাণের স্ফুরণে এই সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার ভিজা মাটির সম্মোহন গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে।

আমার মতে শুধু মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত হইলেই সে-সাহিত্য "মুস্লিম সাহিত্য" হয় না। যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অভাব যে সাহিত্যে বর্ত্তমান, তাহা মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত হইলেও মুস্লিম সাহিত্য নয়। পক্ষান্তরে যে সাহিত্যে তাহা পূর্ণ মাত্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহা মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত না হইলেও মুস্লিম সাহিত্য।

গো-ধন ও হিন্দু সমাজ –

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে একদা গৃহপালিত পশুকুলের মধ্যে গো-জাতির অত্যধিক প্রয়োজনীয়তাবোধ উহাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ও সমাজজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু সমাজের সহিত গরুর নিত্য নৈমিত্তিক কতরূপ যে সম্বন্ধ ছিল তাহা প্রাচীনের নিকট সুপরিজ্ঞাত হইলেও অর্ব্বাচীনের নিকট বিস্মৃতপ্রায় হইতে চলিয়াছে। তাই ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদারের গো-সেবা পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের যে সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল তাঁহা হইতেই এই সম্বন্ধ সুন্দর সুপরিস্ফুট হইবে।

বর্ষ আরম্ভ করিতে হইলে ভগবতী বোধে গো-পূজা করিতে হয়, এ কারণ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে হিন্দুগণ পরম উৎসাহের সহিত গো-ভগবতী পূজা করিয়া থাকেন। কুমারীগণ এবং সধবা মেয়েরা সম্পূর্ণ বৈশাখ মাস গো-পাদপদ্ম পূজা করতঃ পঞ্চগ্রাস সবুজ ঘাস (তাজা ঘাস) আহার দিয়া গোকুল ব্রত করিয়া থাকেন।

পুরাকালে আর্য্যকন্যাগণ গোদুগ্ধ দোহন করিতেন বলিয়া অদ্যাবধি দুহিতা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। কুমারীগণ গো-সেবা ও দুগ্ধ দোহন করিতে করিতে বিবাহযোগ্যা হইলে (জ্যোতিষ মতে শুভযোগ না মিলিলেও) গোধুলি লগ্নে বরপাত্রে অর্পিতা হইতেন। অদ্যাবধিও গোধুলি লগ্নে বিবাহ হইয়া থাকে ; গো-সেবাপরায়ণা দুহিতার গোধূলি লগ্নে বিবাহ হইলেই গরুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল না। বয়োপ্রাপ্তে গর্ভাধান দিনে (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রথম দিনে) দ্বিতীয় সংস্কার প্রথানুযায়ী স্ত্রীকে পঞ্চগব্য (গোময়, গোমুত্র, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত) সেবন করাইয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন পঞ্চগব্য জরায়ুস্থ দুষ্ট কীট ধ্বংস করিয়া বীর্য্যধারিণী শক্তি দান করে। গাভীর পঞ্চগব্য জননীর গর্ভধারিণী শক্তি দান করতঃ আমাদের জন্মের সহায়তা করে ; এবং ভূমিষ্ঠ কাল হইতে আজীবন গাভীস্তন্য পীযুষ পানে আমরা জীবিত থাকিতে পারি বলিয়া গাভীকে শাস্ত্রকারেরা পঞ্চমাতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

কোন পুণ্যকার্য্যে বা শুভ-যাত্রায় মঙ্গল কামনা হেতু যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাকে যাত্রা-মঙ্গল বলে। ঐ মন্ত্রেও ধেনুবৎসা প্রযুক্তা অর্থাৎ বৎসাযুক্তা গাভী দর্শন অভাবে পাঠ ও শ্রবণ করিলেও কার্য্যসিদ্ধ হয়। হিন্দুর জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত গরুর সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। জন্মে (গর্ভাধানে) পঞ্চগব্য, বিবাহে গোধূলী, যাত্রায় সবৎস ধেনু দর্শন, ব্রতে গোকুল, শ্রাদ্ধে চন্দ্রধেনু ও বৃষোৎসর্গ, মরণে চড়া ঝাঁটি ও গোময় লেপন। এই ধেনু রক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। রামায়ণে দেখিতে পাই, স্বেচ্ছাচারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আর্য্য ঋষির আশ্রমস্থ ধেনুর লোভে লোভী হওয়ায় পরশুরাম ধেনু রক্ষার্থে যেন অবতার–রূপে ধরায় অবতীর্ণ হন ; তাহার কীর্ত্তি কাহিনী রামায়ণে বর্ণিত আছে।

কৃষি কার্য্যে ও জীবন ধারণে গরুর প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নহে ; যখনই ঋষিগণ মানবের আহারার্থে পঞ্চ শস্য আবিষ্কার করিয়া সমাজে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখনই গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইল। কৃষিকার্য্যে গরুই প্রধান সহায় চাষ করিতে গরু আবশ্যক, ক্ষেত্রে সার দিতে গোময় প্রধান উপাদান, গোমুত্র ক্ষেত্রের পোকা নাশক ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকারক। গোময় শুষ্কাবস্থায় ঘুঁটে রূপে আমাদের জ্বালানি কাঠের সহায়তা করে। মাতৃস্তন্য পানে আমরা কেবলমাত্র বাল্যকালে কয়েক মাস জীবিত থাকি, কিন্তু আমরা মাতৃরূপিণী গাভীর পীযুষপানে চিরকাল জীবিত থাকিতে পারি।

গরু যে কেবল জীবিতবস্থায় আমাদের মঙ্গল সাধন করে তাহা নহে, ইহারা মৃত্যুর পরেও আমাদের অনেক উপকার করিয়া থাকে। ইহার চর্ম্মে জুতা, হাড়ে চুণ, ছুরির বাঁট ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং হাড়-সার জমির মূল্যবান সার।

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কাব্যাকারে গ্রথিত। প্রণেতা স্বামী শ্যামানন্দ। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রেঙ্গুন, বর্ম্মা হইতে প্রকাশিত। সর্ব্বসমেত পৃষ্ঠা ।/০ + ৬২৪; ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর ও মজবুত। মূল্য ২৸০।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন কথা অবলম্বন করিয়া নানাজনে নানারূপে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্ত সমাজে এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজেও ঐগুলির প্রভাব স্বভাবতঃই পরিদৃষ্ট হয়। "বর্ত্তমান গ্রন্থের মধ্যে কবিতায় যথাসম্ভব সহজভাবে ঠাকুরের আদ্যন্ত জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার নিরাড়ম্বর প্রয়াস লক্ষ্য করিলাম। ভক্তবৃন্দ তথা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই উপলব্ধি হইবে, নিঃসন্দেহে ইহা আশা করা যায়। পুস্তকখানির যথাযোগ্য প্রচার আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

ভক্তমালিকা — রচনাসংগ্রহ। শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত এবং শ্রীজয়দেব রায় কর্ত্তৃক ৯ বি, সাহানগর রোড, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

নাভাজী রচিত হিন্দী "ভক্তমাল" হইতে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান যে সরল এবং অকপট হৃদয়-বৃত্তির অনাবিল প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, বিশ্বাসী ভক্তের নিকট বাঁধা পড়েন—ভক্তিমার্গের এই সাধারণ বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই লেখকের রচনা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষায় বলিতে হয়—"ভগবানের কাছে জাতিকুল, আভিজাত্য, পদমর্য্যাদা, ধনসম্পদ্ বা অগাধ পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই, তিনি সরল অকৈতব ভক্তির বশীভূত।" নিছক ভক্তির উপরে ভিত্তি করিয়া নীতিনিষ্ঠ সহজ শিক্ষা প্রসারে বইখানির উপযোগিতা সমধিক। আমরা ধর্ম্মপিপাসু পাঠকগণের মধ্যে ইহার যথোচিত সমাদর প্রত্যাশা করি।

মাতৃভূমি—সচিত্র মাসিক পত্রিকা—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩৬৬। সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩২, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০, বার্ষিক ৩৷৷০

সমালোচনার জন্য উক্ত পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই মাস হইতে ঔপন্যাসিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আদর্শ হিন্দু হোটেল" উপন্যাস বাহির হইতেছে। তাহা ছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাদি ও সম্পাদকীয় রচনাদির মধ্যে রুচি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে পত্রিকা পরিচালনের ক্ষেত্রে নূতনের আবির্ভাব আশঙ্কাজনক মনে হইলেও, পত্রিকাখানি আশঙ্কাকে আশায় পরিণত করিবে বলিয়াই ভরসা হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

ককটেল কনফেশন — মণি বাগচি প্রণীত। ডি এম-লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

৮টী অত্যাধুনিক গল্প। অত্যাধুনিকতার (ul ra-modernism) সকল দোষ গুণের উৎকৃষ্ট নমুনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেখকের ছদ্ম নামে যে আত্ম পরিচয়, তার মধ্যেই এ রকম বই লেখার হয়ত হদিস খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে—তাই তাঁর নিজের কথাগুলিই এখানে উদ্ধৃত করি—

"মনে করেছেন—বাগচি বুঝি লিখতে পারে না? খুবই ভালো লিখতে পারে, তবে ওর একটা প্রিন্সিপল্ আছে — যেখানে লেখা ছাপাবে, অথচ টাকা পাবে না সেখানে ও নির্ম্মম আর নিঃসঙ্কোচ। হয়ত হাক্সলির একটা লেখাই নিজের নামে চালিয়ে দিলে।"

অত্যাধুনিকতার মূলে এই অর্থ সমস্যাই আগাগোড়া বর্ত্তমান কি না বইখানি আগাগোড়া পড়িয়া এই সন্দেহই সুস্থচিত্ত পাঠকের মনে জাগিতে পারে। অবশ্য রুচিনিষ্ঠ পাঠকপাঠিকা এ রকম বই না ছুঁইলেই ভাল করিবেন।

শ্রীঅঃ

দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট —স্বাস্থ্য সংখ্যা (দশম)

ইতিপূর্ব্বে এই গেজেটের নয়খানি 'স্বাস্থ্য সংখ্যা' প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল বিশেষ সংখ্যা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সুধীমহলে যে খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহা এই দশম সংখ্যার সিঃসন্দেহে আরও বৃদ্ধিই পাইবে। স্বাস্থ্যের প্রতীকস্বরূপ গতিময় অশ্বরসমন্বিত ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন ভঙ্গী ও অবস্থার চিত্রবাহুল্য খুবই চিত্তাকর্ষক। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, স্বতন্ত্র প্লেটে বা সাধারণ ভাবে যে সকল স্বাস্থ্যোদ্দীপনা-মূলক ছবি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা সবই বিদেশী। এই ধরণের বৈদেশিক চিত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই স্বীকার্য্য। তবুও পরিচিত পরিবেশের মধ্য হইতে আহৃত সুপুষ্ট শিশু বা স্বাস্থ্যসম্পন্ন তরুণের সচিত্র পরিচয় সোজাসুজি আমাদের অধিক চিত্তগ্রাহ্য হয়। স্বদেশজ ফলের 'ব্রেকফাষ্ট' চিত্রখানি এত মনোগ্রাহী হইবারও ইহাই অন্যতম হেতু। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ লিখিত রচনাসম্ভার পাঠকের স্বাস্থ্যজ্ঞানের উপর নূতন আলোকপাত করিবে। এই সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন সংখ্যাখানির সুসম্পাদনার জন্য সম্পাদক অমল হোম মহাশয় সত্যই প্রশংসার্হ।

আর্থিক জগৎ—(২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)

আর্থিক জগৎ পুরাপুরি ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহা সগৌরবে এক বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করায় ১ম সংখ্যাখানিকে বিশেষ সংখ্যা করা হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাংলার অর্থনীতিক পাঠক-সমাজে সুপরিচিত এবং তাঁহার নির্ভীক নিরপেক্ষ সম্পাদনায় 'আর্থিক জগৎ' এই একটি বৎসরের মধ্যেই বাংলার বাণিজ্য-জগতে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। অতএব একরাশি আশীর্ব্বচন মস্তকে ধারণ না করিলেও এই পত্রিকাখানি স্বমহিমা ও স্বনিষ্ঠায়ই জাতির বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারিক জীবনক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে।

হিরণ্যকশিপু বংশের ইতিহাস—মূল্য চারি আনা মাত্র।

প্রজাপতি দক্ষ—মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শ্রীসাহাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রাপ্তিস্থান :- প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসাহাজী কৃত পুরাণ-মঙ্গল সিরিজের আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানি যথাক্রমে ২নং ও ৪নং পুস্তক। পুরাণ হিন্দু জাতির ঐতিহাসিক ভিত্তি। পৌরাণিক যুগে ইতিহাস রচনার ভঙ্গী ও ধরণ আধুনিক কালের মত ছিল না বলিয়া পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন অনেকেরই ধারণা পুরাণের মধ্যে ঐতিহ্য কিছুই নাই, পরন্তু উহা আজব গাঁজাপুরি আখ্যানের সমষ্টিমাত্র। ইহা যে কত ভ্রান্ত ধারণা তাহা শ্রীসাহাজী কৃত পুরাণ সিরিজের আলোচ্য বই দুইখানি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। শ্রদ্ধাবুদ্ধির সহিত সাহাজীর মৌলিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মিলিত হইয়া পুরাণের গভীর গহন হইতে যে তথ্য ও ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা জাতীয় ঐতিহাসিক বনিয়াদ রচনায় শ্লাঘনীয় ও বিশ্বাস্য উপাদান হইবে। এই হিসাবে প্রভূত পরিশ্রমপ্রসূত সুলভ পৌরাণিক গ্রন্থমালার সৎপ্রচারের জন্য শ্রীসাহাজী উদীয়মান জাতির নিকট ধন্যবাদার্হ। এই বইগুলি পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।

মাতৃ-মিলন—শ্রীতারকেশ্বর শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ, বাগেরহাট খুলনা, মূল্য দশ আনা মাত্র।

পুস্তকখানি জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তিমূলক কীর্ত্তনগীতাভিনয়। শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ সঙ্কল্প হইতে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর অদ্বৈতালয়ে মাতৃ-সন্দর্শন পর্য্যন্ত ঘটনা গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত বলিয়া গ্রন্থখানি ভক্তসমাজে সমাদৃত হইবে। এইরূপ কীর্ত্তনাভিনয়মূলক উচ্চাঙ্গের ভক্তিরসাত্মক নাটক জনসমাজে যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

গো-সেবা—ডাঃ যামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রণীত।

পশুখাদ্যের চাষ—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত।

প্রকাশক :—দি গ্লোব নার্শারী, ২৫নং রামধন মিত্রের মিত্রের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র (প্রত্যেকখানি)।

আলোচ্য পুস্তক দুইখানি প্রকাশ করিয়া গ্লোব নার্শারী দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। কৃষি বিষয়ক ও কৃষি সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তক এই নার্শারী হইতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে গোধনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা বোধই একদা গো-সেবাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। ভারতের সে গৌরবযুগে গবাদির পালন বিধি ও খাদ্যচাষ প্রতি গৃহস্থেরই জ্ঞাত ছিল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হইবে না। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার যুগে পাশ্চাত্য দেশে গবাদি পশু-পালনের বিস্ময়কর বিজ্ঞানসম্মত উন্নতি সাধিত হইলেও আমাদের দেশে উহার ফল উল্টাই হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায় তো আমরা যথাযথ অবলম্বন করিতে পারি নাই, পরন্তু যুগের প্রতিক্রিয়ায় চিরন্তন সংস্কার ধ্বংসে শ্রদ্ধাহীন চিত্ত সেবাপরায়ণহীন হইয়া পড়ায় ব্যষ্টি ও সমাজ-জীবনের সুখ স্বাস্থ্য ও সম্পদের সহায়ক গৃহপালিত এই গবাদি পশুর রক্ষণ পোষণ ও পালনের প্রতিও আমরা ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। গ্লোব নার্শারীর স্রষ্টা শ্রদ্ধেয় অমর রায়ের কৃষি ও পশু পালনাদি বিষয়ের বস্তুতন্ত্র সাফল্য ও অভিজ্ঞতা শুধু অনুকরণযোগ্য নহে, অনুধাবনীয়ও। "গো-সেবা" পুস্তকে গবাদি পশুর বিভিন্ন ব্যারাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং "পশু খাদ্যের চাষ" পুস্তকে গো-জাতি পশুকুলের উন্নতির জন্য বিভিন্ন অবস্থায় পশুখাদ্য চাষের কথা বর্ণিত হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য প্রতি গৃহস্থের ঘরে এই বই দু'খানি থাকা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

বৃহত্তর সম্ভাবনা—শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু, মূল্য ১৲। প্রকাশক—এন, এম রায় চৌধুরী কোং লিঃ, কলিকাতা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বারোটী গল্পের সমষ্টি। প্রথম বই হলেও কয়েকটি গল্পে আখ্যায়িকা ও রসসৃষ্টিতে লেখক বেশ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'বৃহত্তর সম্ভাবনা' গল্পে লেখকের গল্প লেখার শক্তির পরিচয় বিশেষ সুপরিস্ফুট। গল্পের দিক দিয়ে এই "বৃহত্তর সম্ভাবনা" আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে। 'শিল্পী' গল্পে লেখক যে শিল্পীকে সৃষ্টি করেছেন —তা সার্থক হয়েছে। 'বন্ধনহীন গ্রন্থী' ও 'অযাচিত' গল্প দুটী বইয়ে স্থান না পেলেই ভাল হত। লেখকের ভাষার গতি আছে, আছে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও সহানুভূতি। "বৃহত্তর সম্ভাবনা" পড়ে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, লেখকের ভবিষ্যৎও 'বৃহত্তর সম্ভাবনায়' সমুজ্জ্বল।

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
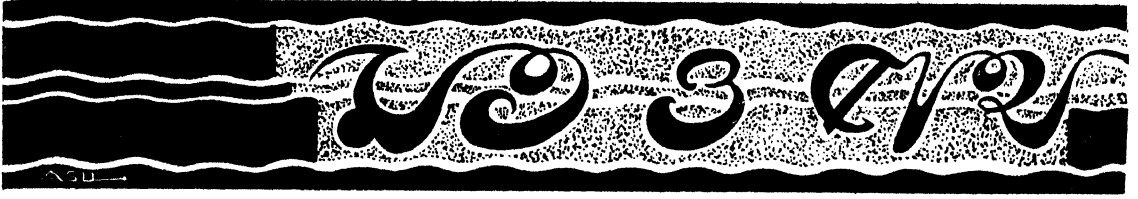
বাংলায় ধর্ম্মচর্চ্চা

বাংলায় যুবকদের মধ্য হইতে ধর্ম্মাভাব কিরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর রিপোর্টে পাঠকদের মনোবৃত্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। নব্য পাঠকদের সাহিত্যে রুচি প্রশংসনীয়। সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যার নিম্নে আইন-সংক্রান্ত পুস্তকের পাঠক সংখ্যা স্থান পাইয়াছে। তারপর ইতিহাস। ধর্ম্মপুস্তক পড়ার আগ্রহ বৎসর বৎসর কমিয়া পাঠ্য বিষয়ের শ্রেণী-সংখ্যায় দশম স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী জাতি আজ উন্নতি অথবা অবনতির পথে, তাহা বিচার্য্য।

রাজকোট-সমস্যা

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ-তপস্যায় রাজকোটের ঠাকুর সাহেব টলিলেন না। বড়লাট সাহেবের হেপাজতে ফেডারেশন কোর্টের জজের রায় মহাত্মাজীর পক্ষে প্রযুজ্য হইলেও, ঠাকুর সাহের কূট রাজনৈতিক চালে উহা অচল করিয়া দিয়াছেন। সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত ঠাকুর সাহেবের যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে সর্দ্দারের সাত জন মনোনীত সদস্য, আর ঠাকুর সাহেবের তিন জন সদস্য লইয়া কমিটী-গঠনের কথা ছিল। সর্দ্দার প্যাটেল এই সাত জনের মধ্যে দুই জন মোস্‌লেম ও একজন ভায়েৎ প্রতিনিধি লইতে রাজী ছিলেন।

কিন্তু শেষে দেখা গেল রাজকোটের মুসলমান অথবা ভায়েৎরা সর্দ্দারজীর নেতৃত্ব মানিতে স্বীকৃত নহেন। কাজেই সাত জন হিন্দু প্রতিনিধিই মহাত্মাকে মনোনীত করিতে হয়। এই অবস্থায় মোস্‌লেম ও ভায়াৎদের মধ্যে আন্দোলন উত্তেজনা সীমা ছাড়াইয়া যায়। এমন কি, মহাত্মাজীর অপমানহানি করিতেও এই শ্রেণীর লোকেরা কুণ্ঠা করে নাই। ঠাকুর সাহেব গান্ধীজীকে এই ফাঁকে ফেলিয়া বেশ জব্দ করিতেছেন। মহাত্মাজীর হরিজন ও মোস্‌লেম প্রীতির পুরস্কার রাজকোটে মিলিয়াছে। রাজ-কোটের শাসনশক্তি বিদেশী বণিকের হস্তে নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি সর্ব্বত্র এক মূর্ত্তি ধরিয়াই প্রজা শাসন করে। সাম, দান, ভেদ আর দণ্ড ইংরাজের একচেটিয়া নহে। ইহা প্রাচীন ভারতেরই রাষ্ট্রনীতি। ঠাকুর সাহেব স্বধর্ম্ম ছাড়েন নাই। মহাত্মাজীও স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া প্রতিকারপ্রার্থী। কোন ধর্ম্মের জয় হয়, দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

রেল-দুর্ঘটনা

শিয়ালদহ ষ্টেশনের ৬৬ মাইল দূরে মাজদিয়া ষ্টেশনে যে বীভৎস মৃত্যু-যজ্ঞ লক্ষ্যে পড়িল, তাহা মানুষকে হতভম্ব করে। এমন পৈশাচিক রেল-দুর্ঘটনা স্বপ্নাতীত। ষ্টেশনে একখানি যাত্রীপূর্ণ গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার পশ্চাতে অবাধে একখানি গাড়ী আসিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এমন অবস্থা রেল-কর্ত্তৃপক্ষের এত নিয়ম-কানুনের ভিতর কেমন করিয়া ঘটে, তাহা বুঝিবার মত মাথা আমাদের নাই। বাংলায় নেতৃপুরুষ হইতে ধনী ব্যবসায়ী, কৃষক শ্রমজীবী পর্য্যন্ত কেহ মরিল, কেহ বিকলাঙ্গ হইয়া প্রাণে বাঁচিল। কত পিতা, কত মাতা পুত্র-শোকে কাতর হইল; কত সতী পতিহারা হইল, তাহার ইয়ত্তা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। যে সকল যাত্রী নিখোঁজ হইয়াছে, তাহারা যে ইহ-জগতে নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিহিটার রেল দুর্ঘটনা হইতে আজ মাজদিয়ায় যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিল, তাহার জন্য বিধাতাকে দায়ী করা ছাড়া দুর্ভাগা দেশবাসীর আর কোন উপায় নাই। কিন্তু রেল-

কর্ত্তৃপক্ষগণ এই নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী নহেন কি? সেদিনও ডিহিরি জংশনে একটা মালগাড়ীর ঘাড়ে চলন্ত এঞ্জিন আসিয়া গার্ডকে নিহত করিল। রেল-পরিচালনের ভার ভারত-গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরিণাম যদি এইরূপ হয়, পুঞ্জীভূত গলদ কোথায় জমিতেছে, তাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত হওয়া উচিত। জীবন আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, কিন্তু জীবনের উচ্চমূল্য দেশবাসী যদি দাবী করেন, গভর্ণমেণ্ট সে প্রবল আন্দোলন কোন অজুহাতে দমন করিবেন?

কলিকাতা কর্পোরেশন

১লা মে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কর্পোরেশন বিলের আর এক দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই বিলের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু মুসলমান একযোগে আন্দোলন স্বরু করিয়াছে। পৃথক্ নির্ব্বাচনের ফলে বাঙ্গালী মুসলমান কর্পোরেশন-প্রতিনিধির পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার পথে প্রচুর বাধা পাইবেন। কলিকাতায় ব্যবসায়ী মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। অতএব নূতন কর্পোরেশনের বিলের ফলে অবাঙ্গালী মুসলমানই কর্পোরেশনে প্রবেশ করিবে।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের ভাগ-বাটোয়ারা আর মহাত্মাজীর পুণা-চুক্তির দৌলতে বাঙ্গালী আজ ছন্নছাড়া হইতে বসিয়াছে। কর্পোরেশন হইতেও যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা এই হেতু রহিত হইল। কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন হইলেও, উহার প্রতিনিধি-সংখ্যা অতঃপর ৪৭টী হইবে স্থির হইয়াছে। এই ৪৭ জনের মধ্যে ৪ জন তপশীলভুক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকিবেন। এই নির্ব্বাচন পুণা-চুক্তির নির্দ্দিষ্ট প্রথা ধরিয়াই হইবে। এইখানেও নির্ব্বাচন-স্বাতন্ত্র্যের ফন্দী অবলম্বিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মনোনীত সভ্যের সংখ্যা দশ জন ছিল। অতঃপর উহা আট হইবে। উহাদের মধ্যে আবার তিন জন হইবে তপশীল-ভুক্ত। মুসলমানের সভ্য-সংখ্যা বাইশ জনই থাকিবে। মুষ্টিমেয় সাহেব সওদাগরের সভ্য-সংখ্যা হইবে বার জন। বাংলার হিন্দু কি বিল্বপত্র শুঁকিয়া বিসর্জ্জনের পথে? রাজশক্তির অনুগ্রহ যদি সম্প্রদায়-বিশেষ লাভ করিয়া থাকেন, তবে দুয়ো সম্প্রদায় বলিয়া যাঁহাদের অন্যান্য রূপে ঘায়িল করার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাদের একেবারে বাদ দিলে ক্ষতি কি হইবে? হায় রে পদমর্য্যাদা—এই অবিচার গলার আওয়াজে প্রতিবাদ করিতে করিতে হিন্দুরা বেমালুম কর্পোরেশনে প্রবেশ করিবে। বাংলার একচ্ছত্র রাষ্ট্রনেতা সুভাষচন্দ্র এইদিকে কি উদাসীন থাকিবেন? কংগ্রেস আটটী প্রদেশের রাজত্ব হাতে পাইয়া সংগঠনের পথে, সেখানে মুমূর্ষু বাংলার নেতা বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার জন্য তিনি কি করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার ভাবিবার বিষয়। এইখানে সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মপ্রতিভা যদি সুফল প্রসব করে, তবেই তাঁহার জয় বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ স্বীকার করিয়া লইবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বাংলায় হক-মন্ত্রিমণ্ডলের সুশাসনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বালাই নাই। কেন নাই, সে কথা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। একের অত্যাচার অন্যে যখন মুখ বুজিয়া মানিয়া লয়, কোনপ্রকার বিক্ষোভ-সৃষ্টির সেখানে কারণ থাকে না। বাংলার সর্ব্বত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের এইরূপ দুরবস্থাই হইয়াছে। হিন্দুর দেব-দেবী তো পদাঘাতে সর্ব্বত্র ধূলিধূসরিত হয়, এ সংবাদ আন্দোলনপ্রিয় সাংবাদিকগণের কল্পনাপ্রসূত নহে। আমরা ময়মনসিংহের একটী গ্রামে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, হিন্দুগণের একটি মৃণ্ময় প্রতিমা মুসলমান যুবকগণের পদাঘাতে বেদী হইতে ভূমিতলে, তারপর পথে আসিয়া পদচাপে কেমন করিয়া চূর্ণ হইয়াছে। সংখ্যালঘু হিন্দুগণ আকাশের দিকে চাহিয়া বিধাতার বিচার-প্রার্থনাই করিয়াছে। চক্ষে না দেখিলেও শুনিয়াছি, নারীহরণের প্রয়োজনও ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে—চাহিদার হুকুমই ইহার জন্য যথেষ্ট। জাতির দুরবস্থা আরও কতদূর গড়াইবে, কে জানে? বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এবং অন্যান্য কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু

হিন্দু সম্প্রদায় কংগ্রেস-শাসনে যে রূপ জড়সড়, হতভম্ব হইয়া পড়িতেছে—এই সকল ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমাপ্তিকাল আসন্ন। সম্প্রতি গয়ায় তবুও যে এক কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, গয়ার হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেন, কংগ্রেসী শাসনটা তাঁহাদের অনুকূলে, নতুবা এত বড় ধৃষ্টতা করিবার ভরসা তাহারা করিবে কেন? প্রকাশ—এক মুসলমান-দম্পতি খানিকটা মাংসের ঝোল একটি হিন্দু বালিকার উপর নিক্ষেপ করে। ইহা তাহাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। হিন্দু বালিকার উপর মুসলমানের মাংসের ঝোল নিক্ষেপ ধর্ম্ম-লোপ করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি জন্য হইবে? এই মনে করিয়া হিন্দু সম্প্রদায় ধর্ম্মের দায়ে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তাহার পর সর্ব্বত্র যাহা হয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মারপিট্। ফলে বহু হতাহতের সংখ্যা ঘটনার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুর বাদ্যভাণ্ড বাজাইলে বিরোধ হয়। কাশীতে প্রধান মন্ত্রী পন্থ হিন্দুকে ইহা করিতে বারণ করিয়াছেন। কিন্তু পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান একদিকে হবিষ্যান্ন, অন্যদিকে গো-মাংস রন্ধন করে, ইহার মীমাংসা কে করিবে?

দেশীয় রাজ্যে গণ্ডগোল

ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দেশীয় রাজ্যেই প্রজা আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে সার্ব্বভৌম রাজশক্তি চিরদিন প্রজাশাসন করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ ভারতে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করার দৃষ্টান্ত দেখিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজাদের এতদনুযায়ী শাসনসংস্কারের দাবী বড় হইয়া উঠিতেছে। হিন্দু রাজ্যগুলিতেই এই আন্দোলনের মাত্রাধিক্য দেখা যায়। জয়পুরে গান্ধিজীর ভক্ত ও অনুচর যমুনালালজী সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। রাজকোটে স্বয়ং মহাত্মা হানা দিয়াছেন। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে অশান্তি উপদ্রব লাগিয়াই আছে। অবস্থা বুঝিয়া বাংলার ত্রিপুররাজ শাসন-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা দেশীয় রাজ্যগুলিতে সার্ব্বভৌম রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা শিথিল করিয়া প্রতিনিধিদের লইয়া নূতন শাসনসংস্কার যুগের হাওয়ায় অনিবার্য্য মনে করি। দেশীয় রাজন্যবৃন্দের এইদিকে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাশ্মীর ও হায়দারাবাদ

ভারতের কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অবস্থা কিছু অস্বাভাবিক। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান দেশ। হিন্দুর সংখ্যা শতকরা মাত্র দশ জন। কাশ্মীর রাজ্যে হিন্দু নরপতি। হায়দ্রাবাদ ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু মুসলমান ইহাদের অধিপতি। কাশ্মীর-রাজ বহু পূর্ব্ব হইতে প্রজাপ্রতিনিধিদের লইয়া শাসনপরিষৎ গঠন করিয়াছেন। কাশ্মীরের লঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে গরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় উপেক্ষা করে না। উভয় সম্প্রদায় একযোগেই কাশ্মীরের রাজ্যশাসননীতির সংস্কার-প্রয়াসী। হায়দ্রাবাদের মুসলমানগণ শতকরা ১০ জন হইলেও, গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের তাহারা বিরোধী। এই লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে লইয়া নিজাম গভর্ণমেণ্ট সার্ব্বভৌম স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্যশাসননীতি অটুট রাখিতে চাহেন। শতকরা নব্বই জন হিন্দুকে আমলে না আনিয়া, নিজাম গভর্ণমেণ্ট শাসনপরিষদে মুসলমানের সভ্যসংখ্যা অধিক রাখিতে চাহেন এবং রাজসরকারের চাকুরীবৃত্তিতে মুসলমানই অধিক থাকিবে, এইরূপ জিদ্ বজায় রাখিতে কৃতসঙ্কল্প।

কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে সোজাসুজি আন্দোলন করিতে প্রস্তুত নহেন। দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের উপরই তাহাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। এমন কি, সত্যাগ্রহ না করার জন্যও মহাত্মাজী মাঝে মাঝে উপদেশ দেন। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা একপ্রকার নেতৃহীন হইয়া গণতন্ত্র শাসনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্য্যাতনে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে। হায়দ্রাবাদে হিন্দুসভা ও আর্য্যসমাজ ঘোরতর আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। সমগ্র ভারতব্যাপী রাষ্ট্র আন্দোলনের ফলে আমাদের ভাগ্য কোন পথে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতৃগণ কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ ভারত ব্যাপী আন্দোলনের ভিতর দিয়া ফেডারেশনের পথেই

যেন চলিতেছেন। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠা খুব স্বাভাবিক; কিন্তু ইহার উত্তর নাই।

কলিকাতায় এ, আই, সি, সি,

ত্রিপুরীর পর কলিকাতায় এ, আই, সি, সি'র দলবদ্ধ সুভাষ-বিরোধী নীতি শিথিল করিয়া কংগ্রেসের গতিকে আর কিছুদিন অচল রাখা এবং সুভাষের সাধারণ পুনর্নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা—এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল; কিন্তু এ আশা সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

ত্রিপুরীর পর মহাত্মাজীর যে সকল গোপন পত্রালাপ চলিয়াছিল, তাহার দ্বারা সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, ত্রিপুরীতে যাহা হইয়াছে, গান্ধিজী তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় করিবেন না। পন্থের প্রস্তাব মহাত্মা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রকাশ্যভাবেই জানিতে চাহিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে গান্ধি প্রমুখ নেতৃবর্গের আচরণ অতিশয় সুস্পষ্ট থাকিলেও, সুভাষ উহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। গান্ধী-পন্থীদের সহিত মহাত্মা একমত হইয়া গোড়া হইতে একই কথা বলিতেছেন—"পন্থের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হওয়ার পর সুভাষ যদি উহা বিধিবহির্ভূত মনে করেন, তাহা উপেক্ষা করার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সুভাষের সহিত তাঁহার মূলগত পার্থক্য আছে এবং এইজন্যই তিনি সম্মিলিত কমিটী-গঠনে অসম্মত। ভারত-রাষ্ট্রসমিতিতে সুভাষ অধিকাংশ সদস্যের মতে তাঁহার মতানুবর্ত্তী মানুষ লইয়া ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।" সুভাষচন্দ্র তবুও মহাত্মার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। মহাত্মার সহিত তাঁহার মতভেদ আছে জানিয়াও তিনি শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মার আনুগত্যে নিজ মতের প্রতিষ্ঠা কেমন করিয়া ছাড়িতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বিবৃতির পর বিবৃতিতে কথাটা আরও জটিল হইয়াই উঠিয়াছিল। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন—"নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতি যেন মনে না করেন, পন্থ প্রস্তাব মানিতে আমি অনিচ্ছুক এবং রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত নহি।" শেষ পর্য্যন্ত তিনি মহাত্মাজীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে বিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা দক্ষিণপন্থীদের চক্ষে বিসদৃশ মনে হইয়াছে এবং বাংলার পল্লবগ্রাহী মনোবৃত্তি গান্ধী-পন্থীদের প্রতি ইহাতে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই নীতি আমরা শোভন হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

সেদিনও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে মতভেদ এত প্রবল, যে এ-ক্ষেত্রে গান্ধীজী তাঁহাকে কোন সাহায্য করিতে সমর্থ নহেন।" এ কথা সুভাষ যে জানে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা দেশের নিকট স্পষ্ট করিয়াই বলিব—যেখানে মতভেদ, সেখানে পথভেদ অবশ্যম্ভাবী। গান্ধিজী ইহা জানিয়াই সুভাষকে নিজ পথে চলিতে বলিয়াছেন। যে পথ তাঁহার নহে, সে পথে তাঁহার সাহায্যও সম্ভব নহে। সুভাষ তবুও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায়, বাংলার দৈন্যই প্রকাশ হইয়াছে।

যাহা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট দিনের ন্যায় পরিষ্কার। সুভাষ সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিপরায়ণ নানা রাষ্ট্রমতের মানুষ লইয়া ঐক্যবদ্ধ সংহতিরচনায় উদ্বুদ্ধ। গান্ধিজী একমতের মানুষ লইয়া, সংগঠনশীল মনোবৃত্তির সাহায্যে ভারত-সেবার সঙ্কল্পে কৃতসঙ্কল্প। দুই নেতার দুই পথ। গান্ধীজীও যেমন সুভাষের সংশ্রব চাহেন না, তেমনি সুভাষের মতবাদের শক্তি যদি সত্য হয়, তিনিও তাঁহার সাহায্য কামনা করিবেন না। অতঃপর আমরা 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' ভিতর দিয়া তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচয় পাইব। মতবিরোধ-বড়কে ছোট দেখায়। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর আজিও ঘুচে নাই—ইহাতে আমাদের গৌরবই ক্ষুণ্ণ হয়। জাতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আজ একজনকে আশ্রয় করিয়া প্রশ্রয় পায়, কাল সুভাষকেও উহা বিদ্ধ করিবে। এই ইতিহাস স্বদেশী যুগ হইতেই পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গালী যদি সুভাষের জয় অন্তরের সহিত দিয়া থাকে, সুভাষের সংগ্রামশীল জীবনের তালে তালে পা ফেলিয়া ধীর পদক্ষেপে অনুসরণ করাই এখন তার বড় কাজ। হাত তালি আর ক্ষোভ-প্রকাশের কটু কণ্ঠ বাঙ্গালীজাতিকে অনেক শক্তিহীন করিয়াছে। এই অতীত স্বভাবের অনুসরণ আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি না।

মহাত্মা কি হিটলার?

একজন মনীষী বলিয়াছিলেন, জনমত ঘোড়ার চাবুকে একদিক্ হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরায়। কথাটা রূঢ় হইলেও, ইঁহা সত্য। জনমতের মূল্য চিরদিনই সাময়িক। উহা স্থায়ী ভাবে কার্য্যকরী হয় না। এই জন্য জনমতের উর্দ্ধে যদি নেতার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, দেশের আশা সর্ব্বকালে দুরাশায় পরিণত হইবে। মহাত্মাজীর জীবনে আমরা এই অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সুখী হইয়াছি। বাংলার নেতৃত্বের আসন জনমতের প্রভাবে এক সত্য হইতে আর এক সত্যে, এমন দোলায়মান অবস্থা বহুবার দেখিয়াছি। সুরেন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিই, সর্ব্বত্যাগী বাংলার জননেতা দেশবন্ধু গয়া কংগ্রেসের পর আত্মপ্রেরণা লইয়া যখন দাঁড়াইতে চাহিলেন, জনমত তখন গান্ধির অনুকূলে—দেশবন্ধুকে তখন কি রকম নাকানাবুদ হইতে হইয়াছিল, আমরা তাহা ভুলি নাই। বাংলার জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াই তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। দিল্লীর কংগ্রেসে দেশ-মাতৃকা তাঁহার ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দেন। তারপর দেশবন্ধুর সংগ্রামশীল জীবনের পরিচয় বাঙ্গালীর বুকে চিরদিন অগ্নিময় অক্ষরে লেখা থাকিবে। আবার দীর্ঘ সংগ্রামের পর পুনঃ শক্তিসঞ্চয়ে ও সংহতি-গঠনে স্থিরচিত্ত হইয়া, একপ্রকার সন্ধির শ্বেত-পতাকা ধারণ করিয়া ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে যখন তিনি দাঁড়াইলেন, বুঝা গেল—তিনি নেতা নহেন, বিভিন্ন বিচিত্র অস্থির জন-মতেরই তিনি সেবক। তাঁহার ত্যাগ-তপস্যাপূত অনুভূতিগ্রাহ্য যে সুপথ—দেশ তাহা গ্রহণ করিল না। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অঙ্কপাত হইল।

আজ দেখিতেছি, জয়-পরাজয় তুল্য করিয়া ভারতের অসামান্য জননেতা জনতার কণ্ঠরবের উর্দ্ধে আপনাকে স্থাপন করিয়া, ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সাধনা করিতেছেন। এই একমাত্র যুগ-মানব, যিনি জনমতকে স্বমতানুবর্ত্তী করার পথে চলার ভরসা করিয়াছেন।

আমরা গণতন্ত্রের নামে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিবাদ সংরক্ষণ প্রয়াসী হইয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বের সীমার মধ্যে বন্দী থাকিতে চাহি। কোন এক মহান্ ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া, গণ-নারায়ণ ব্যক্তিত্বের বলি দিয়া যে বিগ্রহ রচনা করে, তাহাই গণতন্ত্রের শক্তি-মূর্ত্তি। জার্ম্মানীর ত্রাণকর্ত্তা হিটলার গণতন্ত্রেরই জয়ধ্বজা। মহাত্মাজীর সেইরূপ পদ-মাহাত্ম্য এ দেশে সম্ভব হউক আর না হউক, তাঁহার এই সৎসাহসের প্রশংসা আমরা করিব। সর্দ্দার প্যাটেলের কথারই আমরা প্রতিধ্বনি করি। জার্ম্মাণীর হিটলার রুদ্র, ধ্বংসের বজ্র তাঁহার হাতে। ভারতের হিটলার গান্ধী শিব-সুন্দর। সৃজনের শতদল তাঁহার হাতে। ভারতে গান্ধি যদি সত্যই হিটলারের তুল্য পদ লাভ করেন, ভারতের ভবিষ্যৎ আমরা আশাপ্রদ বলিব।

মহাত্মা দক্ষিণপন্থী। সত্য-প্রেম ও অহিংসা তাঁহার স্বভাব। আপনাকে বলি দিতে দিতে তিনি আজ প্রায় সপ্ততিতম বর্ষে উপনীত। জেনারেল্ ফ্রাঙ্কোর মত কামান বন্দুক লইয়া তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করেন নাই। তাঁহার শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির ফলে ভারতের আটটী প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট হাতে লইয়া জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি করার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছেন। ইহাপেক্ষা অধিক সুযোগ যদি কেহ আনিতে পারিতেন, আমরা তাঁহারও জয় দিতাম। তাহা যখন হয় নাই, সেরূপ কল্পনা করিয়া মহাত্মাজীর সাফল্যকে আমরা ব্যর্থ বলিয়া মনে করিব না। এই শক্তি যদি ব্যর্থ হইবে, তবে আজ বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের অভীষ্টানুযায়ী উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইতে পারেন কেমন করিয়া? ভারতের স্বাধীনতার্জ্জনের সুনীতি জনমতের উপর নির্ভর করে না। জনমত-প্রতিষ্ঠিত জননেতার প্রতিভায় উহা বিদ্যুতের ন্যায় ঝিলিক্ দিয়া উঠে। বাংলার রাষ্ট্রশক্তি বাঙ্গালীর হাতে যদি সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধাসৃষ্টির হেতু হয়, কংগ্রেস-শাসিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে অধিকতর সংহতিবদ্ধ করিয়া তোলার সুবিধা উহাতে না হইবে কেন? গান্ধিজীর অনুবর্ত্তিগণ পাঁচ হাজারী মন্ত্রিপদ লইয়া স্ব-স্বার্থ চরিতার্থ করেন না, নেতার নির্দ্দেশে মুমূর্ষু জাতির প্রাণে শক্তি-সঞ্চারের সাধনা করেন। মহাত্মাজী এই পথে দেশকে গড়িতে চাহেন, জাতিকে সংহতিবদ্ধ করিতে চাহেন। স্বাধীনতার জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য যে উদয়াচলে আরোহণ করিবে, সেই নির্ম্মাণ-কার্য্যে তিনি একনিষ্ঠ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার আচরণ নিন্দার্হ বলা যায় না।

যদি অন্য পথ কাহারও থাকে, অন্য পথে এই আত্ম-কলহে ছন্নছাড়া মৃতপ্রায় জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে লইয়া যাইতে কেহ পারেন, সে পথে বাধা দিবার ইচ্ছা কেন, সাধ্য মহাত্মারও থাকিতে পারে না। তিনি ভারতের বহু বিচিত্র মতাবলম্বী জননেতা হওয়া অপেক্ষা এক-মতাবলম্বী জনগণের নেতা হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে ইষ্টমূর্ত্তির ন্যায় ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাহা সিদ্ধ করার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। বহুজনের করতালি ও খ্যাতি এই অবস্থায় প্রত্যেক নেতাকেই তুচ্ছ করিতে হয়। পূর্ব্বে কেহ এ ভরসা করিতে পারেন নাই। কাহারও সম্মুখে কর্ম্মের এমন সুনির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিও বিকশিত হয় নাই। তিনি যদি শক্তিশালী নেতা হন, তাঁহার অনুগত জনগণের শাসনাধীনে জনমতকে স্বমতে আনয়ন করিবেনই। হিটলার ইহাই করেন। মুসলিনিও এইরূপ গণতন্ত্রের উপর আসন পাতিয়াছেন। ভারতেও তাহার অন্যথা হইবে না। বিধাতার অকাট্য নীতি বাঙ্গালী ভাবপ্রবণতায় উত্তেজনায় করতালি দিয়া উড়াইয়া যেন না দেয়। আমরা তাই বলি, বাঙ্গালী পার তো বড় হও। বিদ্বেষের কালিতে বীভৎস হইও না।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব

শ্রীমহিমচন্দ্র দাস

আজ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সপ্তদশ-বার্ষিকী অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবে শোণপুরের মহারাজা মহোদয় পুরোহিত মনোনীত হয়েছিলেন, অনিবার্য্য কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে না পারায়, এই অধমপুরের মহাদীনের ভাগ্যে সেই সম্মান জুটে গেল। যে আসন গত ষোল বছর ধরে' কত গুণী-জ্ঞানী-ধনী-মানী অলঙ্কৃত করে' এসেছেন, আজ অদৃষ্টের ফেরে আমার মত গুণ-জ্ঞানহীন, ধন মানহীনের দ্বারা তাহা যদি কলঙ্কিতই হয়—সে দায়িত্ব আমার নয়। কলিকাতার সান্নিধ্যে এত লোক থাকিতে সঙ্ঘগুরু বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্ত হতে আমাকে স্মরণ করে' যে অহেতুকী স্নেহ, সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাহা অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত হলেও, আমার কাছে উহা অতি দুর্লভ পদার্থ। সে আদর উপেক্ষা করবার মত সম্পদ্ আমার নাই, সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করবার মত শক্তিও আমার নাই। সুতরাং সেই আদর ও আদেশ উভয়ই শিরোধার্য্য করেছি এই ভরসায় যে, আমার সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতা-ক্রটি সুবিজ্ঞ ও সুযোগ্য যজমানেরাই পূরণ করে' নিতে পারবেন, ভুলচুক যেখানে যা' হবে তাঁরাই শোধরিয়ে দিতে পারবেন।

এই অনুষ্ঠানের কর্ম্মসূচীতে সভাপতির অভিভাষণ একটী দফা আছে, তার সুযোগ নিয়ে এই কথা কয়টী বলে' নিলাম। কিন্তু অভিভাষণটীও যদি তাঁরা বানিয়ে দিতেন, তবে আমি পূর্ব্বতম বঙ্গের ব্যঞ্জনহীন উচ্চারণে এই বিদ্বজ্জন-ভূয়িষ্ঠ সভার সমগ্র গাম্ভীর্য্য একেবারে ভূমিসাৎ করে' এই উৎসবারম্ভ হাস্যোজ্জ্বল করে' তুলতে পারতাম। কিন্তু লেখা পড়ার সৌভাগ্য না ঘটলেও, উচ্চারণ-প্রকাশের সুযোগ ছাড়ব কেন?

এই উৎসবের যিনি প্রবর্ত্তক, আর কিছুর জন্য না হোক, শুধু এই অক্ষয়া তৃতীয়া দিনটীর জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। এই দিনটীর সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথমারম্ভ-স্মৃতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত আছে। ইহা নাকি সত্যযুগাদ্য। কত হাজার বছর আগে এমনই দারুণ গরমের সময়ে ত্রিভুবনতারিণী, তরল-তরঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাদেবী মর্ত্তে্য আগমন করেছিলেন। তাঁরই সুশীতল স্পর্শে সগর-বংশের অভিশপ্ত সন্তানগণের ভস্মরাশিতে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছিল। রূপক নহে, আমি সত্য বলে'ই বিশ্বাস করি—একটী মন্ত্রে, একটী স্পর্শে মৃত জাতি যে জেগে উঠে, তা' আমি বিশ্বাস করি। তাই এই দিনটীর স্মৃতি আমার কাছে এত উজ্জ্বল। এই স্মৃতিটী জাগিয়ে রাখবার জন্য শত শত উৎসবের প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। আজ আবার শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা। সুতরাং উৎসবের স্থান চন্দননগরে হওয়াও যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ইহা সত্যই উপলব্ধি করি বলে'ই সুযোগ পেলেই এখানে ছুটে আসি— ঐ ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করে' স্নিগ্ধ হই। এখানকার অনাবিল স্নেহ, অহৈতুকী প্রীতি, অতিথি-সেবা, উৎসবের অপূর্ব্ব আনন্দকে স্বল্পবিশিষ্ট জীবনের পাথেয় করে' নিয়ে যেতে চাই।

এই উৎসবের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘগুরু ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন, সম্পাদক মহাশয় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতৎসংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীর পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁদের কথার উপর কথা বলা, প্রদীপ দিয়ে সূর্য্য দেখানোর মত, খোদার উপর খোদকারী করার মত—সে সাহাস আমার নাই। যাঁরা এ সকল আয়োজন করেছেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানানই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। আভাষে যা' পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, এই উৎসবের বিশালতা, ব্যাপকতা ও নিপুণতা ইহাকে সর্ব্বজনমনোহারী করেছে।

এই সফলতার মূলে যে জিনিষটী আছে, বৈদিক ঋষির সেই প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ দিবার প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি। কারণ আজ ভারতে সেই প্রার্থনার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারত আজ ভোগ-মন্ত্রদ্বারাই পরিচালিত; জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, স্বার্থভেদ ত আছেই। তার উপরেও লক্ষ্য যেখানে এক, সেখানেও নেতৃত্বের ভেদ আসন গেড়েছে। এই সঙ্কটকালে ঋষির সেই প্রার্থনা—

সমানী ব আকুতি সমানী হৃদয়ানি বঃ সমানমস্তু বো
মনো, যথা বঃ সুসহাসতি।

—"তোমাদের হৃদয়-মন এক হউক, আকৃতিও এক হউক, তাহাতেই তোমরা জয়যুক্ত হইবে।" এই প্রার্থনা সকলেই করি; কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় তেমন জোর নেই বলে'ই তা' সফল হচ্ছে না, এদেশের ভাগ্যাকাশও মেঘমুক্ত হচ্ছে না।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের একত্ববোধ জন্মেছে, সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্—আপনারা একই পথে চলেন, একই কথা বলেন, তাই আপনাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। এই ঐক্যবন্ধের প্রেরণা আপনাদের কাছে পেয়ে আমি কৃতার্থ মনে করছি।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মর্ম্মকথা বল্‌তে আমি অধিকারী নহি কিন্তু ইহার অপূর্ব্ব সৃজনীশক্তির যে বহির্বিকাশ দেখেছি আমার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ইহার সংগঠন-প্রণালীর ব্যাপকতা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। এই অনন্ত-প্রসারী কর্ম্মক্ষেত্রের উৎস কোথায়, আলোচনা আমি করব না। গাছ সৌন্দর্য্য, ভরা ইহার কুসুমদাম এবং ফলরাশি আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাতেই আমার তৃপ্তি। তজ্জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমি উৎসবের উদ্বোধন করছি। সর্ব্বাগ্রে সকল যজ্ঞের যিনি একাধারে পুরোহিত, ঋত্বিক্, হোতা, দেবতা—

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্, যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্
হোতারম্ রত্নধাতরম্

সেই অগ্নিদেবকে নমস্কার করি এবং তাঁরই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে' বলি—

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু

এইখানেই আমার পৌরোহিত্য শেষ হল। এর পরেই আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করব। কাজেই এখনই আমার পৌরোহিত্যের দক্ষিণাটার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই। আমার একটী মেয়েদের স্কুল আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তাধীন নয়, সরকারের অনুগৃহীতও নয়। তবু সেখানে আড়াই শতের অধিক মেয়ে পড়ে, বছর বিশ পঁচিশটী মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে। আমরা বুড়োরা তাদের পড়াই, পরীক্ষায়ও পাশ করাই। শ্রদ্ধেয় মতিবাবু দেখে এসেছেন, মেয়েদের খাইয়েও এসেছেন। কিন্তু তিনি জানেন, আমিও বলেছি যে, আমরা ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত হতে পারি, কিন্তু মা হ'তে ত পারছিনে। মেয়েদের ও বুড়োদের উভয়ের মা হয়ে যিনি তাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্মানুযায়ী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারবেন অথচ তাদের গতি সুষ্ঠু ও যাতে বিভ্রান্ত না হয়ে জীবনের যথার্থ সার্থকতার পথে চালিত হয়, তার ব্যবস্থা করতে পারবেন, এমন একজনকে চাই। শ্রদ্ধেয় মতিবাবু এমন এক ব্রতচারিণী তৈরী করে দিবেন, কথা দিয়েছিলেন। আজ পৌরোহিত্যের দক্ষিণা-স্বরূপ সেই প্রার্থনাই তাঁর কাছে জানাচ্ছি। আবার বল্‌ছি—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।*

* ১৭শ বার্ষিক প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবের সভাপতির

সাময়িকী

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

উদ্বোধন দিবস

বিগত ২২শে এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যায় সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র চন্দননগরে সপ্তদশ বার্ষিক অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন-কার্য্য যথারীতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে কীর্ত্তন, সঙ্ঘোপাসনা, পুরশ্চরণ, হোম, কথকতাদির পর অপরাহ্নে উক্ত সভার অনুষ্ঠান হয়। পূর্ব্ববিঘোষিত সভাপতি শোনপুরের মহারাজা বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় চট্টলের জননায়ক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, এম-এল-এ মহোদয়কে সভাপতিত্বে বরণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত মেলা ও প্রদর্শনীর পরিচয় সহ রিপোর্ট পাঠ করিলে, সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় সঙ্ঘের সহিত শ্রীযুক্ত দাসের আন্তরিক যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। ক্রমে শ্রীযুক্ত সুন্দর শর্ম্মার বক্তৃতার পরে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিলে, তাঁহাকে মেলার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ একটি বক্তৃতা দিলে সভাভঙ্গ হয়। পরিশেষে শ্রীযুক্ত দাস মেলা ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

দ্বিতীয় দিবস

এই দিন (২৩শে এপ্রিল, রবিবার) বঙ্গের বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও আন্তর্জ্জাতিক অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। সাভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের বক্তৃতার পর, সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বাঙালীর গৌরবময় অতীতের কাহিনী বিবৃত করিয়া একটী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। ক্রমে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ সাহায্যে "ভারত ও দ্বীপময় মহাসাগরে হিন্দু সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস" আলোচনা করার পর, শ্রীযুক্ত নাগ বিদায়গ্রহণ করিলে, রাত্রি ৯ ঘটিকায় নবদ্বীপের বাউল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত আরম্ভ হয়।

তৃতীয় দিবস

এই দিনের (২৪শে এপ্রিল, সোমবার) সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি হেতু তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত অভিভাষণ ("ভারতীয় ভেষজ" সম্বন্ধে) পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হয়।

চতুর্থ দিবস

২৫শে এপ্রিল, মঙ্গলবার দিবস ভারতবিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জ্যোতিষ সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি বরণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের বক্তৃতার পর, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় জ্যোতিষ সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণমূলক বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত আচার্য্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রী একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্নোত্তর হয়। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

পঞ্চম দিবস

এই দিন (২৬শে এপ্রিল, বুধবার) শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর [illegible] তিলাল রায় সভাপতি বরণ প্রসঙ্গে ভারতীয় বাদ-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত নিয়োগী "জীবন বনাম মতবাদ" শীর্ষক দীপালী বক্তৃতায় বিরাট্ জনমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করেন।

ষষ্ঠ দিবস

২৭শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দিবস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে 'প্রবর্ত্তক ছাত্রসঙ্ঘের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন" সম্পন্ন হয়। ছাত্র-সঙ্ঘের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ করিলে, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রণজিৎ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক বিধিতন্ত্র পঠিত ও সদস্যগণ
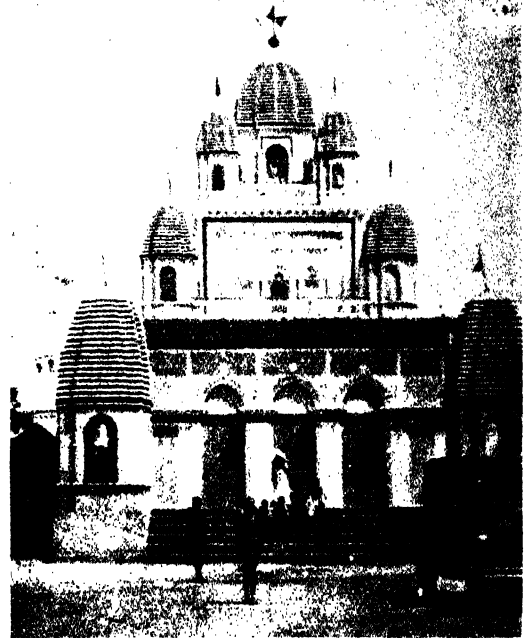
শ্রীমন্দির : সম্মুখ হইতে

কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর সভার সম্মতিক্রমে বিধিতন্ত্র ও প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি কর্ত্তৃক ঘোষিত হইলে, অধ্যাপক প্রমোদচন্দ্র ভড় ও অধ্যাপক মণিলাল ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা দেন। ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গের পর এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মঃ মেনার ও তদীয় পত্নীর উপস্থিতে সন্তান সঙ্ঘের ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়।

সপ্তম দিবস

এইদিন (২৮শে এপ্রিল, শুক্রবার) অধ্যাপক এস্, পি, চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি ভূগোল আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সভাপতি-বরণ বক্তৃতার পর মানচিত্র সাহায্যে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় 'মানব ও পৃথিবী" বিষয়ক একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। অতঃপর ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় সঙ্ঘের ভৌগলিক অভিযান সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা করিলে সভাভঙ্গ হয়।

অষ্টম দিবস

এই দিন (২৯শে এপ্রিল) রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীরামপুরের শ্রীমন্দির যুবক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভক্তিমূলক "জয়দেব" নাট্যাভিনয় বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়।

নবম দিবস

৩০শে এপ্রিল, রবিবার সায়াহ্নে কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্যসভার অধিবেশন সম্পন্ন হয়। সভার প্রথমে স্বর্গীয় জলধরবাবু ও জ্ঞানেন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় একটী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস-ধারার ধারাবাহিক বিবৃতি দান করেন। অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বাগচীর নির্দ্দেশে সঙ্ঘের সাহিত্য-ব্রত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত একটি সুন্দর আলোচনা করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায়ের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁহার অদম্য প্রাণশক্তির পরিচয় শিক্ষিত মাত্রেরই কাছে সুবিদিত। "প্রবর্ত্তক"-এর পৃষ্ঠায় গোড়া হইতেই তিনি যে বিশেষ সাহিত্য-রচনার আভাষ লক্ষ্য করিয়াছেন—ইহার জন্য তিনি (সঙ্ঘগুরু) ধন্যবাদার্হ। আজ তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগে তিনি বিশেষ আনন্দিত ক্রমে অভিভাষণে বর্ত্তমান সাহিত্যের অনুকরণ প্রবৃত্তির সহিত সত্যকার সাহিত্য সেবার তুলনামূলক বিশ্লেষণে শ্রীযুক্ত বাগচী সকলের মনে রেখাপাত করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে সভাপতির অনুরোধ "ওমর খৈয়াম"-এর অনুবাদক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান সাহিত্যের গতির ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত বাগচীর কথা সমর্থন করেন। ক্রমে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মৈত্র একটি সদ্যরচিত কবিতা, শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু ও অধ্যাপক মণিলাল ভট্টাচার্য্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মনুজ সর্ব্বাধিকারী পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা হইতে একটি কবিতা আবৃত্তি করিলে, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাইবার পর সভাভঙ্গ হয়। সর্ব্বশেষে রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রফেসার হীরেন্দ্রকুমার বসু ও দল কর্ত্তৃক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

দশম দিবস

১লা মে, সোমবার উৎসব-ক্ষেত্রে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। উহাতে সিষ্টার সরস্বতী, ডিলিট্ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর কুমারী রেণুকণা ঘোষ সভানেত্রী-বরণ করেন। নারী-মন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অমিয়প্রসুন দত্ত, ব্যাকরণতীর্থা নারী-সমস্যার সমাধানমূলক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, সভানেত্রী তাঁহার সুন্দর অভিভাষণে নারী-জাগৃতির সময়োপযোগী ইঙ্গিত পরিব্যক্ত করিয়া, সকলকে সমভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন। অতঃপর ধন্যবাদ-দান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় নারী-সমস্যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সহ একটি শিক্ষামূলক বক্তৃতা দেন। অতঃপর রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত "পতিব্রতা" নাটিকা অভিনীত হয়।

একাদশ দিবস

২রা মে, মঙ্গলবার, রাত্রি ৯ ঘটিকায় "নিউ বোম্বে থিয়েটার ক্লাব" কর্ত্তৃক "প্রতাপাদিত্য" নাট্যাভিনয় হয়।

সমাপ্তিদিবস

গত ৩রা মে, বুধবার, চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ রক্ষিতের অনুপস্থিতিতে, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সমাপ্তি সভার সভাপতিত্বে বৃত হন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত যথাবিধি সভাপতি বরণ করেন। তৎপর উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রদ্ধানন্দজী মেলার পরিচয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতায় আশানুরূপ সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—"উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মেলা ও প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভারতে মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্যম নূতন নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—ভারতে আজিও এইরূপ বহু মেলার সহিত আমাদের পরিচয় আছে। জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা কে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনে এইরূপ উৎসবের সার্থকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দিক দিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে—তাহা আশাপ্রদ। জাতি গঠনের ভিত্তির উপর শিক্ষা-প্রদভাবে সংস্কৃতিমূলকপরিবেশ রক্ষা করিয়া, এইরূপ ভাবে মেলা পরিচালনায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অগ্রণী। আমার মনে হয়, বিভিন্নস্থানে যাঁহারা মেলা প্রভৃতির আয়োজন করিয়া থাকেন—তাঁহারা নিজেরা আসিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই মেলা প্রত্যক্ষ করিয়া গেলে বিশেষ লাভবান হইবেন। সঙ্ঘের জাতিগঠনমূলক বিরাট্ প্রচেষ্টার ইহা অন্যতম সামান্য অঙ্গ। সর্ব্বশেষে আমার প্রার্থনা, যাঁহারা প্রতিদিন মেলায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ পরিবেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মূলগত প্রচেষ্টায় নিবিড়তা উপলব্ধি করিয়া জাতীয়তার অগ্নিময়ী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং সহযোগিতা ও আন্তরিকতার দ্বারা ইহার প্রসারে অবহিত হইবেন। সঙ্ঘের সহিত নানারূপে বহুদিন হইতে আমার পরিচয়, আজ আমার পরিবর্ত্তে বাহিরের অপর কেহ সঙ্ঘের এই আদর্শ উদ্যমের পরিচয় ব্যক্ত করিলে, তাহা অধিকতর আনন্দপ্রদ হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি আন্তরিকভাবে আজ এই শুভ প্রচেষ্টার সর্ব্বসাফল্য কামনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।"
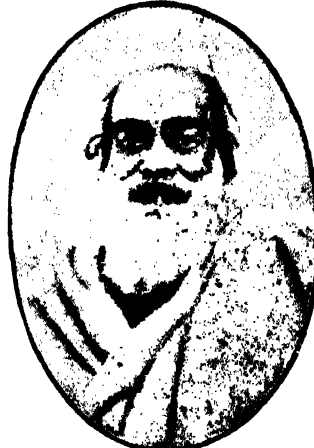
মূল সভাপতি—শ্রীমহিমচন্দ্র দাস

শ্রীযুক্ত মজুমদারের অভিভাষণের পর, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মেলা ও প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয় সমূহের মধ্যে জাতীয় শিক্ষামূলক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া, ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম তত্ত্বের বস্তুগত ভিত্তি বিশ্লেষণ করেন এবং ধর্ম্ম যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে জীবনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষ মাত্রেই যে বিগ্রহরূপে লীলার মধ্য দিয়া জীবনপ্রবাহ বহন করিয়া চলিয়াছে—তাহা প্রাঞ্জলরূপে বুঝাইয়া দেন। ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গের পর, ক্রমে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিগণ কর্ত্তৃক "কর্ণ" ও "দেশের ডাক" অভিনীত হয়।

২৫শে বৈশাখ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ৭৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে দেশবাসীর সহিত আমরা তাঁহার শতায়ুঃ কামনা করি।

সঙ্ঘ-সভ্যের মহাপ্রয়াণ

গত ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সঙ্ঘের বিশিষ্ট গৃহস্থ-সভ্য সত্যচরণ ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সত্যই

অন্তিম শয়নে সাধক সত্যচরণ ঘোষ

মর্ম্মাহত হইয়াছি। অমায়িক ব্যবহার ও শিশুসুলভ সরলতার গুণে তিনি সঙ্ঘ এবং পল্লী-পরিবার সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পরলোকগত স্বামী চিদানন্দজীর সংস্পর্শে আসিয়া বিপ্লবযুগের অগ্নিপ্রাণ সত্যচরণের মত ও জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে পৌষ তিনি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বেদীমূলে প্রত্যক্ষ দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তদবধি সঙ্ঘের সহযোগী সভ্যরূপে পরিচিত হন। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় জন্মস্থান হাওড়ার অন্তর্গত দফরপুর গ্রামে সঙ্ঘের উপাসনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার অনুপ্রেরণা পাইয়া সঙ্ঘগুরু ও সহতীর্থ-মণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং স্বীয় পল্লীভবনেই যথাবিধি সঙ্ঘমাতৃকার মূর্ত্তিস্থাপন পূর্ব্বক এই উপাসনাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ইহার পর হইতেই তিনি আপনার পত্নী, কন্যা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র সকলকেই সঙ্ঘের পরিধিমধ্যে আনিবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া পড়েন। এই আকুলতা অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার অন্তরে দেদীপ্যমান হইয়া তাঁহাকে সত্যই যেন উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল এবং মরণের কিছু-কাল পূর্ব্বে এই প্রবল অধ্যাত্মক্ষুধা সত্যই তাঁহার পক্ষে যেন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

১১ই এপ্রিল তিনি অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে কাতর হইয়া কর্ম্মস্থল হইতে পল্লীগৃহে ফিরিয়া যান এবং একদিন পরেই অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে দেহরক্ষা করেন। চির জীবনের আরাধ্য ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে এবং ইষ্টের পটমূর্ত্তির উপর স্থির লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসটী বহির্গত হয়।

গৃহস্থ হইয়াও সত্যচরণের মধ্যে ছিল সর্ব্বত্যাগী সঙ্ঘব্রতী হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা—এই অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মরণান্তেও সার্থক হইবে, বিধাতার নিকট আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে এই প্রার্থনাই করিতেছি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভা

ধর্ম্ম হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড। হিন্দুর পার্থিব জীবনযাত্রা ঈশ্বরাভিমুখী। ইহাই দীর্ঘ অধঃপতনযুগে তাকে রক্ষা করিয়াছে। কালধর্ম্মে এই আশ্রয়চ্যুত সে হইতে বসিয়াছে। ব্যাপক ধর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়াই এই জাতির আবার অভ্যুত্থান সম্ভব। তাই শ্রীপাট-অম্বিকায় বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের পৌরোহিত্যে বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে অনুষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসভার জাগরণ লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রীত ও আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীপাঠ অম্বিকা এক সময়ে বিশেষ স্থানাধিকার

করিয়াছিল। এখনও মন্দিরে রক্ষিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাচীনতম শ্রীমূর্ত্তি, স্বহস্তলিখিত পুঁথি ও তৎপ্রদত্ত বৈঠা প্রভৃতি বহু লীলাস্মৃতি ভক্তের প্রাণে অনাবিল আনন্দবিধান করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে বহু লোক সমাবেশ হয় এবং বক্তৃতা, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রবন্ধাদি পঠিত হয়।

সভাপতিকে সেবাইত শ্রীযুক্ত অজিতকুমার গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি দর্শন করাইতেছেন

শ্রীপাঠ অম্বিকা মন্দিরের অন্যতম সেবাইত ও এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী মহোদয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এই সভার সাফল্যের ও জনপ্রিয়তার হেতু বলা চলে। আমরা বাংলার হিন্দু সাধারণের দৃষ্টি বাংলার এই সুপ্রাচীন বৈষ্ণবতীর্থের প্রতি আকর্ষণ করি।

বাংলার প্রাচীন পল্লী-শিল্পসম্পদ্

বিদেশ হইতে আমদানী সস্তা ও চাকৃচিক্যময় শিল্প-সম্ভারের বাহুল্য ও প্রভাবে আমাদের নিজস্ব গৃহশিল্প অনাদরে প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু একদা এই বাংলা দেশেই বিভিন্ন প্রকারের আলিপনা, খেলনা ও পুতুল, বেত ও ধাতুর কারুকার্য্য, সূচী ও বয়ন-শিল্প প্রভৃতি যে কতদূর শিল্পনৈপুণ্য এবং সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলার পল্লীশিল্প' (Folk Arts of Bengal) গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। এই শিল্প-পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীঅজিতকুমার মুখার্জ্জি মন্তব্য করিয়াছেন, পশ্চিম এশিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পসম্পদের সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। গ্রন্থকারের মতে, বাঙালী জাতির মধ্যে অনার্য্য জাতির রক্তপ্রাচুর্য্য হেতুই আজিও বাঙালী এই প্রাচীন ধারাবলম্বনে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা
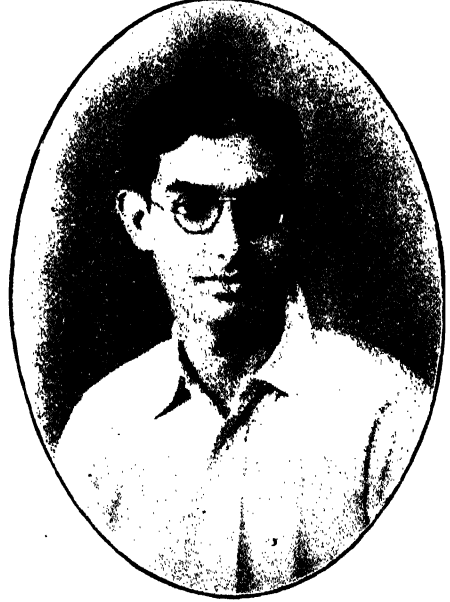
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিকের বিচার্য্য হইলেও বাংলার উপেক্ষিত লুপ্তপ্রায় অতীত শিল্প-গৌরবকে এদেশ—ওদেশের আধুনিকের সম্মুখে এমন সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে উপস্থাপিত করার জন্য গ্রন্থকার, প্রকাশক উভয়েই আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির নিকট প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

পরলোকে দানবীর রামবল্লভ নন্দন

হুগলী-বাঁশবেড়িয়ার ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও কমিশনার রামবল্লভ নন্দন মহাশয় বিগত ১৭ই চৈত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট জীবন স্বীয় পল্লী বাঁশবেড়িয়ার উন্নতিকল্পে কাটাইয়া যান। তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার নীরব কর্ম্মী। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় ১০ হাজার টাকা ও অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর অকাতর দান, রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ, নলকূপ-সংস্কার প্রভৃতি বহু সৎকার্য্য তাঁকে দেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

গত ১৬ই বৈশাখ রবিবার তদীয় পারলৌকিক কার্য্যাদি তাঁহার কৃতী সন্তান কর্ত্তৃক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় দুই হাজার কাঙ্গালীর মধ্যে বস্ত্র ও রৌপ্য মুদ্রা বিতরণ করা হয়। শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। বাঁশবেড়িয়ার রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায়, মিঃ ডোনাল্ড ম্যাক্‌ফারসন্ এম্‌-এ, আই-পি-এস্, রায় বাহাদুর পান্নালাল মুখার্জ্জি,

৺রামবল্লভ নন্দন

মিঃ জে, এন, বসু, রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ, মিঃ তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র কৃতী পুত্র (শ্রীযুত ননীগোপাল নন্দন) ও পাঁচজন পৌত্র (জীবনকৃষ্ণ নন্দন, বিজয়কুমার নন্দন, অজিতকুমার নন্দন, সুশীলকুমার নন্দন ও সুধীরকুমার নন্দন) রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিয়া শোকসন্তপ্ত -পরিবারবর্গকে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

ভাষায় প্রাদেশিকতা

যুক্তপ্রদেশের বাঙালী সমিতি সম্প্রতি এক সভা করিয়া বাঙালা ভাষার উপর অবিচার করার জন্য ঐ প্রদেশের শিক্ষা বিভাগকে নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বাঙালীদের শিক্ষাসম্পর্কিত স্বার্থ রক্ষা করিবেন বলিয়া কংগ্রেসী শিক্ষামন্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বেও যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহাও রক্ষিত হয় নাই। তাঁহাদের হিন্দী-উর্দ্দু যথেচ্ছা চালাইতে বাঙালীর আপত্তি না থাকিলেও, মাতৃভাষার মধ্য দিয়া বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের ন্যায্য দাবী যদি বাঙালী করে, তাহাতে তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় না। বাঙালা ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই প্রাদেশিক মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমন হইলে বাঙালী অবধারিত পিছাইয়া পড়িবে। অন্য প্রদেশের মত হীন প্রাদেশিক মনোবৃত্তির উর্দ্ধে উঠিয়াও বাঙালীকে সর্ব্বতোভাবে তার স্বকীয় মর্য্যাদাবোধে সচেতন হইয়া উঠিতে হইবে এবং এ জন্য বাংলা ও বাংলার বাইরে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করারও প্রয়োজন।

হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ আশ্রম

হাইলাকান্দি কাছাড় জেলার একটি মহকুমা হইলেও ইহাকে পল্লীসহর বলা চলে। এখানকার সেবাকেন্দ্র এই রামকৃষ্ণ আশ্রমটিকে ঘিরিয়া তরুণপ্রাণ লীলায়িত হইবার
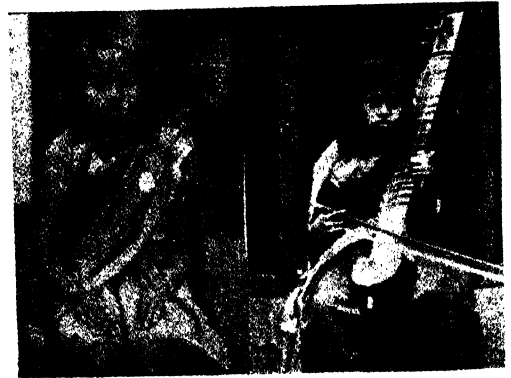
কুমারী নিভা সেন গুপ্তা কুমারী বীণাপাণি আচার্য্য

সুযোগ পায়। বর্ত্তমান আশ্রম-পরিচালক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগ ও একনিষ্ঠায় আশ্রমটি ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে। সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধপ্রতিযোগিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণকে এই সকল বিষয়ে উৎসাহিত করারও যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি একটি উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় ৺বিপিনচন্দ্র আচার্য্যের কন্যা কুমারী বীণাপাণি আচার্য্য 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে প্রথম পুরস্কার এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্তের কন্যা কুমারী নিভারাণী সেনগুপ্তা ভজনসঙ্গীতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নবনির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন এবং বিদায়ী মেয়র মিঃ এ, কে, এম, জ্যাকারিয়া

ব্যাঘ্রের উৎপাত

দিন কয়েক পূর্ব্বে আলীপুর চিড়িয়াখানায় আবেষ্টনী আবদ্ধ একটি জলহস্তীর দংষ্ট্রাপিষ্ট হইয়া জনৈক মুসলমান মহিলা নিহত হইয়াছে। ইহা অসাবধানতার ফল। কিন্তু সাবধানতা সত্ত্বেও ব্যাঘ্রবহুল জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী বস্তিসমূহের মানুষ ও গৃহপালিত পশুকুল যে নিস্তার পায় না, সেইরূপ সংবাদ সম্প্রতি আমরা পাইয়াছি। কাছাড়-কাটলিছড়া চা-বাগানের শ্রমিকপল্লীর নিকটে দিন-দুপুরে একটি বাঘ আসিয়া গো-পাল আক্রমণ করে। ইতস্ততঃ পলায়মান গরু ও মানুষের মধ্যে অসীম সাহসের সহিত উক্ত বাগানের ম্যানেজার অতি সন্নিকটে গিয়া আক্রমণকারী-ক্ষিপ্তপ্রায় বাঘটিকে এক গুলিতেই হত্যা করে। বাঘটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ ফুট। শিকার-কুশলী মিঃ এলেন চালমার্স ইতিপূর্ব্বে এমনি দুঃসাহসিক-ভাবেই ১৫টি বাঘ শিকার করিয়াছেন

কৌতূহলী জনতাপরিবেষ্টিত মিঃ এলেন চালমাস কর্ত্তৃক নিহত ব্যাঘ্র

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন

কলিকাতা মুস্লিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বিগত ৬ই এবং ৭ই মে এই সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী মৌলভী এ, কে, ফজ্‌লুল হক সম্মেলনের উদ্বোধন

করেন এবং সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সাহেব মূল সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সাহেব। শতাধিক মুসলমান সাহিত্যিক প্রতিনিধি (মহিলা ও পুরুষ) এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়াডু প্রভৃতি বহু হিন্দু সাহিত্যিকও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

আশা ও আনন্দের কথা, এই সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণগুলির (লিখিত এবং মৌখিক) প্রায় অধিকাংশই অসাম্প্রদায়িক ও উদার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। এই প্রসঙ্গে মূল সভাপতির অভিভাষণ (এই সংখ্যার নিষ্কর্ষ দ্রষ্টব্য) বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বাংলায় অখণ্ড জাতীয়তাগঠনে মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের গুরু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে গিয়া ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জির সুরে সুর মিলাইয়াই বলিতে ইচ্ছা হয়: বাঙালার মুসলমান সাহিত্যিকগণ রচিত বাঙ্‌লা সাহিত্য অখণ্ড বাঙ্‌লা সাহিত্যেরই একটি অংশ হইবে এবং উহা দুই মহাসমুদ্রের মিলনক্ষেত্র রচিত করিবে।

অতএব স্বতন্ত্র মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করি না। হিন্দু-মুসলমান লইয়াই বাঙালী তথা বাঙলা ভাষা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনই উভয়ের একমাত্র সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির কলিকাতা-অধিবেশন

গত ২৯শে, ৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে তারিখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নবনির্ম্মিত বিরাট্ সভামণ্ডপে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে সমগ্র বাংলা দেশের বিশেষ করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে যে ভীষণ উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। জনমন রাষ্ট্রীয় চেতনায় যে কতখানি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা

দক্ষিণে—রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কীয় বিবৃতি পাঠ করিতেছেন : মধ্যে ডাঃ কিচলু কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকাত্তোলন দৃশ্য : বামে—সভানেত্রী নাইডু রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করিতেছেন
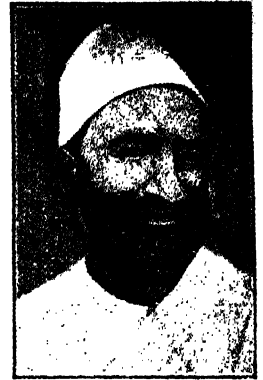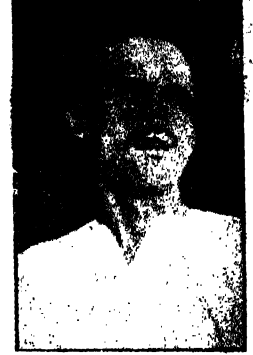
"ওয়ার্কিং কমিটী"র কয়েকজন সদস্য : বাংলা হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মনোনীত হইয়াছেন

এবারকার অধিবেশনে বেশ বুঝা গেল। বিগত জানুয়ারী মাসের শেষে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তী ঘটনা-পারম্পর্য্যের পরিণতিই এই কলিকাতা কংগ্রেস এবং সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদত্যাগ। পণ্ডীত জওহরলালজীর আপ্রাণ আপোষ-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও ওয়ার্কীং কমিটির সদস্য না-হওয়া অধিবেশনের একটি দুঃখজনক
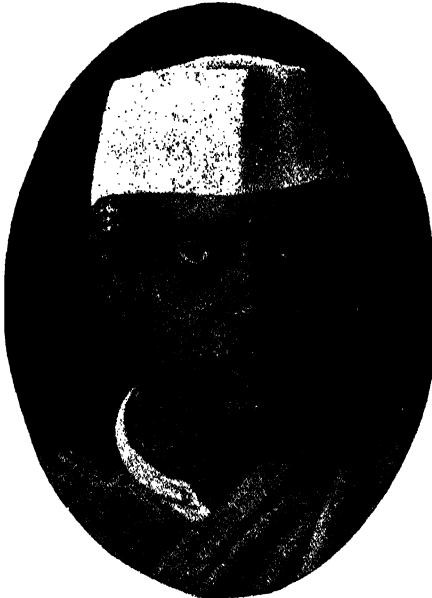
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
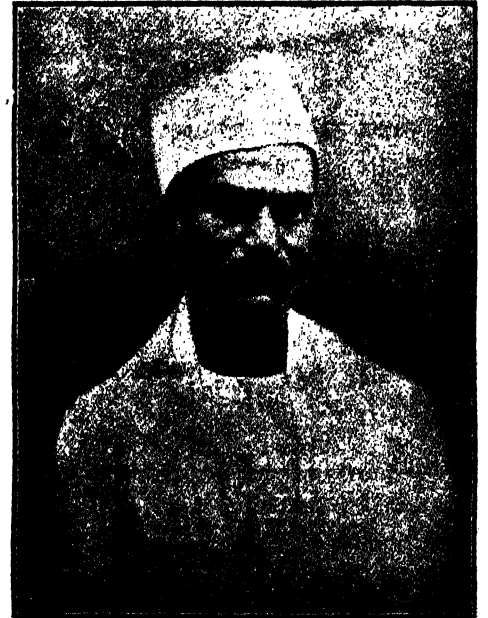
নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ঘটনা। মহাত্মার অজ্ঞাতসারে গৃহীত পন্থ-প্রস্তাবানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি-গঠনে তাঁহার অপারগতা ও সুভাষচন্দ্রের ঐ প্রস্তাবমতই কার্য্য করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয্য এবং পুরাপুরি পুরাতন কমিটি লইয়া কার্য্য করিতে অনিচ্ছাই এই অনাপোষের মূল কারণ। এই হেতু অখণ্ড জাতীয় জীবনের সঙ্ঘবদ্ধতার মূলে এখানে যে দলগত ভেদ সৃষ্টি হইল তাহা এই সঙ্কট যুগে বড়ই অবাঞ্ছনীয়। ভাবীকালে ইহা কি রূপ লইবে তাহা ভারতের ভাগ্য বিধাতাই জানেন। আমরা বলি, বাঙালী সঙ্ঘবদ্ধ হও। সংগঠন প্রতিবাদের গোড়ার কথা। উত্তাপ উষ্ণতা শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় নয়। উহা ভাবতারল্যেরই লক্ষণ। সমান হৃদয়-মন-বুদ্ধি লইয়া এক মত ও পথাবলম্বী হওয়ার মধ্যে শ্রী ও বিজয় নিহিত। এই অধিবেশন যেন এই দিকে বাঙালীকে অবহিত করে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নবনির্ম্মিত বিরাট সভামণ্ডপের অভ্যন্তর-দৃশ্য ফটো—ডি, রতন এণ্ড কোং

শুভ পরিণয়

বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী এবং অধুনা মুক্ত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত তারাকিশোর বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নিবেদিতার সহিত কুমিল্লানিবাসী শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র দাসের শুভ-পরিণয় গত ৭ই মে তারিখে বর্দ্ধন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাসাবাটীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহোদয় দম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন। কল্যাণীয়া নিবেদিতা (মীরা) প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী। তার নম্র স্বভাব, ইষ্টনিষ্ঠা, নিয়মিত উপাসনা ও অনবদ্য জীবন দেবালয়ের ঘৃতপ্রদীপের মতই স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করিয়া নবাবেষ্টনীকে শিব-সুন্দর ও মধুময় করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের শুভ কামনা।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গযোগে অহং-বুদ্ধির সমর্পণ হয় ভগবানে। তারপর, সব কাজ ঈশ্বরের। তিনি অন্ন-গ্রহণ করেন হাত দিয়ে, রসানুভূতি করেন হৃদয় দিয়ে; তিনি কথা বলেন, লেখেন—মুখ দিয়ে, লেখনীর সাহায্যে—ভালমন্দ সব চিন্তা তিনিই করেন মস্তিষ্ক নিয়ে সব কাজই তাঁর হয় এই পরিমিত আধার-যন্ত্রের সাহায্যে। এই যোগ-জীবনই সঙ্ঘের ধর্ম্ম। ইহা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ—অঙ্ক-শাস্ত্রেরই মত অকাট্য, বিধিবদ্ধ।

সঙ্ঘ তাই যোগযুক্ত চৈতন্যেরই সমষ্টি। সমর্পণের সাধনা যেখানে যত দৃঢ় ও স্পষ্ট, যোগশক্তি সেখানে সেই পরিমাণেই অভিব্যক্ত হয়। সঙ্ঘে উচ্চ-নীচ বস্তু-ভেদ নাই—সাধন-পর্য্যায় অবশ্য স্বীকার্য্য। সঙ্ঘ এক জাতি—তাদের এক লক্ষ্য, এক ইষ্ট, এক ধর্ম্ম—এক ভগবান। সঙ্ঘের মানুষ প্রতি প্রভাতে এক মন্ত্র উচ্চারণ করে—সমান হৃদয়, সমান আকূতি বলে' হৃদয়ের সুর বাঁধে। তারা এক সঙ্গে উপাসনা করে—এক যজ্ঞশালায় আসন পেতে ক্ষুৎ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। ইহা জীবনব্যাপী ঐক্যেরই সাধনা।

সঙ্ঘের যে সাধনা, যে বিজ্ঞান ও শাস্ত্র, তা' উৎসর্গের ভিতর দিয়েই স্বতঃ প্রকাশিত হয়। একটা অসাধারণ প্রাণশক্তির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। স্বভাব ইহার সহায় বটে, কিন্তু স্বভাবই আবার পুণ্যযজ্ঞ পণ্ড করে। তাই স্বভাবের পরিবর্ত্তন চাই। স্বভাবের পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরের জন্য যে যুক্তি, যে জ্ঞান ও শিক্ষা, তা' আজ প্রত্যেক সঙ্ঘধর্ম্মীকেই আয়ত্ত করতে হবে।

শরীরের স্বভাব, মনের স্বভাব—কোন মতে প্রশ্রয় দিও না। হয়ত ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুখ বজায় থাকে; কিন্তু সমষ্টি-প্রাণ যে ক্ষেত্রে আশ্রিত, সেই ক্ষেত্র আঘাত পায়। দরদী ইহা বুঝ্‌বে। তাই স্বভাব-পথ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। চল্‌তে হবে—অসাধারণ দিব্য পথে সঙ্ঘ-প্রাণের নির্দ্দেশ নিয়ে। সতত স্মরণ রাখ—"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" সঙ্ঘই যে নিখিল দেশের, মানবজাতির মুক্তিতীর্থ-রূপে ঈশ্বরেচ্ছায় গড়ে' উঠ্‌ছে। ইহার তোমরা উত্তম সেবক হও।

জাতীয়তার আদর্শ

যে দেশ সমুদ্রের উত্তরে, হিমাচলের দক্ষিণে, তাহার নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নহে। দেশের, জাতির বিকৃত নাম নিদারুণ অপমানজনক। জোর করিয়া বাপের নাম ভুলাইয়া দিবার একটা প্রবাদ আছে। জোর করিয়া আমাদের জাতীয়তার মহিমা খর্ব্ব করার ইহা অপপ্রচেষ্টা। আমরা ইণ্ডিয়ান হইব না, ভারতবাসী হইব। আমরা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি স্পর্শ করিব না, আমরা ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিব। ঋষিরা সত্যই বলিয়া গিয়াছিলেন—জাতীয় ভাষা ও শব্দজ্ঞান দুষ্ট ও অপকৃষ্ট করিতে পারিলে, ইহার আশ্রয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল—ম্লেচ্ছ শব্দ ঘৃণাব্যঞ্জক নহে। ইহা অভারতীয় জাতিসমূহের সংজ্ঞা মাত্র।

ভারতের স্বাধীনতাকামী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে জাতীয়তার গুণ ও গরিমা যদি অম্লান অমিশ্র না হয়, তবে তাঁহাদের কণ্ঠে স্বাধীনতার জয়গান যতই উচ্চগ্রামে উঠুক না কেন, এমন কি তাঁহাদের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিতেও যদি দেখা যায়, ভারতবাসীকে তবুও তাঁহাদের সংশয়ের চক্ষে দেখিতে হইবে। অনেক সময়ে বস্তুবিশেষের বিলোপসাধনের জন্য শত্রুপক্ষের কণ্ঠে তদনুকূল কীর্ত্তি-বাণী ঘোষিত হয়। শত্রু আত্মস্বার্থে বলি দিয়াও বস্তু-বিশেষ ধ্বংস করে। ইহাই যে তাহার লক্ষ্য, ইহাই যে তাহার বৃহত্তর স্বার্থ। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহার মৃত্যুপণ স্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রযুজ্য হয়। তাই দেশ ও জাতির নামে কাহারা নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, কাহারা দুঃখ বরণ করিয়াছে, কেবল ইহা দেখিয়াই দেশ-ভক্ত নির্ণয় করা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। জাতীয়তার সাধনা কোথায় পবিত্র গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় অনাহত প্রবাহে চলিয়াছে, কোথায় জাতির শীল ও আচার সর্ব্বস্ব পণে সুরক্ষিত, সুপালিত? কোথায় কাহারা বিজাতীয় ভাবাশ্রয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ? নির্ম্মল নিখুঁৎ ভাবধারায় অভিষিক্ত হইয়া ভারতীর পূজা-মন্দিরে যুগের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাহারা দৃঢ় সঙ্কল্পে সমাহিত, ভারতের সমস্ত আশা ও ভরসা সেইখানেই নিহিত আছে বুঝিতে হইবে।

আমরা এই জন্য জাতীয়তার ক্ষেত্রে ভারতীয় শোণিত-ধারার বিকৃতি ও মিশ্রণ যেখানে লক্ষ্য করি, সেখানে নিরাশ হই, আর এই মিশ্র চরিত্রের মানুষ জাতীয় মুক্তির জন্য উত্তেজনাপূর্ণ বাণীর প্রচার করে যখন, তখন দেশের অবালবৃদ্ধবনিতাকে সতর্ক হইতে বলি। বলি, সাবধান। মিশ্র বুদ্ধি আমাদের এতদিন অনেক শ্রম ও তপস্যা পণ্ড করিয়াছে। মিশ্র চরিত্রের মানুষ যত বড়ই প্রতিভাশালী হউন, দেশপ্রেমিক হউন, আমার ভারতের যশঃ ও আয়ুঃ, কীর্ত্তি ও মহিমা ইহাদের দ্বারা চিরদিনের মত নষ্ট হইবে। স্বাধীনতার নামে পরাধীন জাতির প্রাণ সহজেই জাগিয়া উঠে, তাই ভারতীয়ের ছদ্মবেশে মিশ্র ভাব, মিশ্র ধর্ম্ম, মিশ্র চরিত্রবিশিষ্ট নেতা, উপনেতা হইতে আমাদের সতত দূরে থাকিতে হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে—আমরা ভারতবাসী, আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আমাদের বৃত্তি যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও সেবা। একাধারে ইহা সম্ভব যেখানে, সেইখানেই আমাদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। তাহা না হইলে, অংশে অংশে ভারতবাসী হইয়া এই চতুর্ব্যূহ কর্ম্মকে রূপ দিব, লীলায়িত করিব। আমাদের শতদ্রু, চন্দ্রভাগা পুণ্য নদী। আমাদের দেশের বেদস্মৃতিপ্রধানা গঙ্গা-নর্ম্মদা-সরস্বতী-গোদাবরী, পাপভয়হারিণী কৃষ্ণবেণীর কূলে কূলে হৃষ্টপুষ্ট-নরনারীপরিপূর্ণ ভারতজাতির বাস। আমাদের দেশেই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগ—চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় ধর্ম্মের হ্রাস-বৃদ্ধির লীলাবৈচিত্র্য। এই দেশেরই মুনিগণ তপস্যা করেন। যাজ্ঞিকেরা হোম করেন। ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণকামনায় সর্ব্বলোক দানযজ্ঞের

অনুষ্ঠান করেন। এই ভারতভূমি কর্ম্মভূমি। অনেক পুণ্যফলে এইখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যোজন-যোজন-বিস্তৃত লবণ-সমুদ্র বলয়াকারে ইহার বহির্বেষ্টনী। এই ভারতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়াই আমরা চাই অভ্যুত্থান, আমরা চাই মুক্তি। ভারতের জাতীয়তার মর্ম্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা এই সনাতন জাতির জাগরণপ্রার্থী। আমরা কম্‌রেডের কথা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিব। 'ইন্‌ক্লাব' 'জিন্দাবাদ' শব্দের গর্জ্জন উঠিলে, দূরে সরিয়া দাঁড়াইব। শ্রমিক কৃষক, ধনী জমিদার, ব্রাহ্মণ শূদ্র, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির মধ্যে ভেদ-সৃষ্টির চাতুরীপূর্ণ তথাকথিত আন্দোলনের জয়ঢক্কার প্রতিবাদ করিব। আমরা ভারতে চাই স্ব স্ব কর্ম্ম গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে বৈশিষ্ট্যময় জীবন, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট অবস্থা-স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু বিচিত্র প্রকৃতি ও অবস্থার মধ্যেও আমরা সমধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া অখণ্ড ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিব। ধর্ম্মই আমাদের সাম্যের লক্ষ্য হইবে। কোন অবস্থার দায়ে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল, জ্ঞানী হইতে মূর্খ, ধনবান হইতে দীন-দরিদ্র কেহই পরধর্ম্ম স্বীকার করিবে না। ভারত কর্ম্মবাদী। অন্য কোন বাদে ইহাদের বিশ্বাস নাই। কর্ম্ম আমাদের অবস্থাবিশেষের মূল হেতু। এই কর্ম্মই বেদে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে, বেদান্তে ব্রহ্মসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ভাগবত জাতি ইহারই নামান্তর করিয়াছে সেবা। আমরা তাই সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মবাদী। ফলে, আমাদের অধিকার নাই। আমরা ভারতবাসী এই কর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মবাদী অবিকৃত ভারতকে অধর্ম্মক্ষয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিব। দিবই দিব। আজ যাহারা ভারতের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অধ্যাত্ম-কুহেলিকায় অস্পষ্ট অক্ষম মনে করে, তাহারা অতি শীঘ্র দেখিবে—অন্ধ স্তাবকের বাণী যে মিথ্যা দেবতার আরাধনা করিতেছিল, তাহাই জাতির একটা ভীষণ কুহেলিকা। ভারতের অধ্যাত্ম-জাগরণের ফলেই জাতির মুক্তি অব্যর্থ ও অমোঘ হইবে।

সমধর্ম্মী ও একনায়কত্ব

জাতি আছে। তাহার দেশ ও ধর্ম্মও আছে। স্বপ্নে আমরা অনেক কিছু দেখি। কিন্তু তাহা সত্য নয়। দেশের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার মত একটা দুঃস্বপ্ন এ জাতির মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশ শুদ্ধ লোককে এইভাবে প্রভাবান্বিত করিতে না পারিলে, ইহাদের দুর্ব্বুদ্ধিটা ফলববতী হয় না। তাই এই দুষ্টকল্পনা ঢাক পিটিয়া প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে জাতি আর বুদ্ধির খোরাক পায় না, মস্তিষ্কবিকৃতির বীজই সঞ্চয় করে। মানুষ ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে।

দেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রটা হইয়াছে যুগের কর্ম্মভূমি—ভাব-প্রচারের তীর্থক্ষেত্র। গান্ধিজী বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া তীর্থস্বামীরূপে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য মতবাদী আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। তাহারা অসংখ্য প্রকার মতের মানুষ হইলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রটাকে গান্ধিজীর কবল হইতে ছিনাইয়া লওয়ার জন্য এক অস্থায়ী ঐক্যব্যূহ রচনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই বিভিন্ন মতবাদীদের ক্ষণিক সমষ্টিশক্তি গান্ধিজীকে ক্ষেত্রচ্যুত করিতে পারে, কংগ্রেসের কুরুক্ষেত্রে কিছুদিন ইহার পতিত্ব লইয়া একটা প্রেতের যুদ্ধ বাধিবে। কিন্তু সে কথা এখন ভাবিবে কে? ইহাদের আসন্ন লক্ষ্য—গান্ধিজীকে অপসৃত করা। আমরা দীর্ঘ পরাধীনতার পীড়নে যেমন অসহিষ্ণু হইয়াছি, তেমনি অদূরদর্শী হইয়া জাতির উত্থানের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছি।

বিশ বৎসর মুকুটবিহীন হইয়াও, গান্ধিজী ভারত-রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে গণ-আন্দোলন পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। দেশের শাসনশক্তি অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদর্শ-স্বপ্নানুযায়ী ভারতগঠনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সর্ব্বজাতির ইতিহাসে এইরূপই হয়। মার্কস্‌-লেনিনের স্বপ্নই রুশে সফল হইয়াছে। আজও ষ্ট্যালিনের মস্তিষ্কে রাজ্যশাসনের যে নীতি স্থান পায়, তাহার আর প্রতিরোধ হয় না। প্রতিরোধ করার সাধ্য কেহ যদি প্রকাশ করিতে চাহে, তাহার কাঁধের উপর আর মাথা থাকে না। বিজিত স্পেন আজ ফ্রাঙ্কোর পদানত। ফ্রাঙ্কোকে আশ্রয় করিয়াই

স্পেনের স্বপ্ন অতঃপর ফলিতে থাকিবে। এ অধিকার বিধাতারই দেওয়া। সেদিনও বোম্বাইয়ের পার্শীরা গান্ধী-নীতির প্রতিবাদী হইয়া স্পষ্ট বাক্যেই গান্ধীর মুখের বাণী তাহারা শুনিয়াছে, যে তিনি চিরদিন মাদক-দ্রব্য-নিবারণের পক্ষপাতী। কংগ্রেসও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত। আজ ক্ষমতা পাইয়া, তিনি তাহা হইতে বিরত থাকিতে পারেন না। দেশ স্বাধীন হয়। দেশের পুরোভাগে একের মস্তিষ্কে বিধাতার সঙ্কেত মূর্ত্তি গ্রহণ করে। সে চিহ্নিত মানুষ কে ? শক্তি অর্জ্জন করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা লইয়া বিরোধ চলিতে থাকে। ভারতে গান্ধীর বিরুদ্ধে যে কলকোলাহল উঠিয়াছে—সুধীজনকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার জীবননীতির কোন প্রকার গলদের জন্যই ইহা নহে। অন্য অনেকের মধ্যে এই পদাকাঙ্ক্ষা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে দলাদলির মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধ পক্ষ মাথা তুলিতে চাহিতেছে। আরও আশ্চর্য্য, দেশের এক শ্রেণীর লোক এই অসদৃশ প্রস্তাবটাকে বড় করিয়া দেখার জন্য নানা অবান্তর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেছে। যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা অসাধারণ, তাহাকে বিদায় দিয়া, যাহা সহজ প্রকৃতির দান তাহা বড় করিয়া দেখার এই চেষ্টা জাতির পক্ষে যে কতখানি অক্ষমতার পরিচয়, তাহা আর বলিবার নহে।

গান্ধিজীর অপরাধ তিনি চাহিতেছেন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক সমধর্ম্মসম্পন্ন সংহতি এবং একনায়কত্ব। ইহাই কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধির অমোঘ ও অব্যর্থ উপায়। যে তপস্যায় এইরূপ সংহতি গড়া যায় এবং ইহার নায়কত্বের অধিকার জন্মে, সে তপস্যা যাহাদের নাই, তাহারা একটা সহজ পথকে আশ্রয় করিয়া এই বৃহৎ আদর্শটাকে লোকচক্ষে হেয়ঃ প্রতিপন্ন করিতে শতমুখ হইয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অবুঝের সংখ্যা এত বেশী—তাহারা মহাত্মার চির প্রসিদ্ধ নীতিকে অন্যায় অসম্ভব, এইরূপ নানা কথায় ব্যর্থ করার চেষ্টা করিতেছে।

বৃহত্তর আদর্শ সিদ্ধ করিতে হইলে, যাহা সহজ সাধারণ, তাহার সমবায়ে উহা কোনদিন সাফল্যমণ্ডিত হয় না। যে লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, উহাকে প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ফলে এই একই লক্ষ্যে চলার অসংখ্য মানুষ ক্রমে পরস্পর বিষম ভাব পরিহার করিয়া সমধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। আর এই সময়ে দিশারীকেই তাহারা একনায়কত্ব করার অধিকার দিতে সঙ্কোচ করে না। বিশ বৎসর একই লক্ষ্যে, একই কর্ম্মক্ষেত্রে মহাত্মাজীর অবহিত থাকার ফলে, কংগ্রেসে এইরূপ বাঞ্ছনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মাজী এই সাধন-লব্ধ সুবিধা হইতে সহজে বঞ্চিত হইতে চাহেন না।

অসংখ্য অজ্ঞান লোকের সমষ্টিসংগঠন কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্ভব হয়। ইহার একটা সাময়িক প্রভাবও আছে। প্রতিপক্ষের কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এই শক্তিকে কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়। এইরূপ সমবায়ের উদ্দেশ্য চিরদিন ধ্বংসকরী। সৃষ্টির বীর্য্য ইহার মধ্যে থাকে না। জাতির অগ্নি-পরীক্ষার যুগে এইরূপ বিষম সৃষ্টি সকল দেশেই হইয়া থাকে। আমরা গান্ধিজীর বিরুদ্ধে এইরূপ পরস্পর বৈষম্যময় বিভিন্ন দলগুলির একটা সমষ্টিগঠনের প্রচেষ্টা দেশে দেখিতেছি। বিচক্ষণেরা অনায়াসেই রায় দিতে পারেন—ইহা প্রতিক্রিয়াশক্তি। জাতীয় সংহতিসৃষ্টির ইহা অনুকূল নহে। ভারতের ঋষি গাহিয়াছিলেন—

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং।
সমানম্ মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

যদি কোথাও ভারতের এই ঋষমন্ত্র মূর্ত্ত হয়, তাহাই ভারতীয় ভাবধারায় অভিষিক্ত জনগণের চিরবাঞ্ছনীয় বস্তু। আমরা তাই গান্ধিজীর সমধর্ম্মসম্পন্ন লোকসংহতির একনায়কত্বের জয় কামনা করি। ইহা যেখানেই হউক, ভারত-ধর্ম্ম বলিয়া, ইহার বিরুদ্ধভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া আমরা সুসংস্কৃত মনোবৃত্তির পরিচয় নহে বলিয়াই মনে করি।

রাজকোটে নূতন যুগ

সেদিনও সুভাষচন্দ্রের পত্রত্তোরে গান্ধিজী বলিয়াছেন, রাজকোটে আমি ভুল করি নাই। রাজকোট আমায় পথ দেখাইয়াছে। স্যার জন গায়ারের রায় হাতে লইয়া তিনি রাজকোটে পুনঃ অভিযান করিলেন। গিয়া দেখিলেন— মুসলমান ও ভায়াৎ সম্প্রদায় বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। আর কেম্‌ব্রিজ-অক্সফোর্ডের শিক্ষানবিশী না হইয়াও রাজকোটের দরবারী বীরবল ভারতের বড়লাট সাহেব ও ফেডারেশন কোর্টের প্রধান জজের উপর এমন চাল চালিলেন, মহাত্মাজী হতবুদ্ধি হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন, আমি রাজকোটের জন্য যে শক্তিলাভ করিয়াছি, তাহা বীরবলের হাতেই সমর্পণ করিলাম। রাজকোটে মহাত্মাজী এক প্রকার দিগ্‌বাজী খাইলেন। যে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, রাজকোট আন্দোলন আমার মিথ্যা নহে; বড়লাট ও ফেডারেশন কোর্টের জজের নিকট উপস্থিত হওয়া আমার ভুল হয় নাই। রাজকোটের মুসলমান ও ভায়াৎদের হাতছাড়া করার বীরবলী চালে মহাত্মাজীকে বলিতে হইল—রাজকোট ব্যাপারে আমি যাহা করিয়াছি, তাহার মধ্যে হিংসা ছিল; কিন্তু এইখানে আমি ভরসা পাইয়াছি, জ্ঞান পাইয়াছি। গান্ধিজী রাজকোটে আত্মসমর্পণ করিলেন, এক প্রকার নাক কাণ মলিয়া বলিলেন—আইন অমান্য, অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ সবই হিংসা। আত্মসমর্পণই জাতীয় মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। মহাত্মাজীর অনুতাপ কার্য্যকরী হইল। দমনমূলক শাসননীতি ঠাকুর সাহেব প্রত্যাহৃত করিলেন। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানার টাকা প্রত্যর্পণ করা হইল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইল। রাজকোটের শাসন-সংস্কারে প্যাটেলের কণ্ঠ নীরব। মহাত্মাজী মৌন মূর্ত্তি ধরিলেন। ঠাকুর সাহেবের পক্ষ হইতেই ১০ জন প্রতিনিধির নাম ঘোষিত হইল। যে প্রজাপরিষৎ গঠন করিয়া রাজকোটে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, ঠাকুর সাহেব তাহাদের আমলে আনিলেন না। রাজকোটে রাষ্ট্রশক্তি জয়ী হইল। গান্ধিজীর এইখানে আসল পরাজয়। প্রবল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যাহা করিতে পারেন নাই, ক্ষুদ্র রাজকোটের হিন্দু রাষ্ট্র শক্তির নিকট মহাত্মাজীর শির অবনমিত হইল।

মহাত্মাজী বলিলেন "আমার অনুতাপ ও পরাজয়-স্বীকারের ফলে রাজকোটের নূতন ইতিহাস রচিত হইল। শাসক-শাসিতের মধ্যে মিলনেই আমার ইচ্ছা সাধিত হইয়াছে। বীরবলের উপর আমার ভাল ধারণা ছিল না। ঠাকুর সাহেব সত্য রক্ষা করেন নাই; তাই অন্তঃপ্রেরণায় অনশন। কিন্তু হৃদয় আমার দুর্ব্বল হওয়ায় আমি বড় লাট ও বড় জজের সহায় লইয়াছিলাম। নিজের ভুল বুঝিলাম, তাই আমার এই আত্মসমর্পণ।"

তিনি সকলকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"সৎ ও অহিংস যদি হও, বীরবলের উপর মন্দ ধারণা করিতে পারিবে না। সৎ ও আত্মবিশ্বাসী হইলে, শত্রুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। আত্মার ঐক্যই পরম পুরুষার্থ। আমার ইহাই কামনা। রাজকোট সম্বন্ধে সব অস্ত্র ত্যাগ করিলাম, কিছু বলিবার নাই। কেবল অনুরোধ করি, আমার ৫০ বৎসর সাধনার অভিজ্ঞতার উপর তোমরা আস্থা স্থাপন কর।"

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে জালিওয়ানাবাগের নৃশংস কাণ্ডের পর আজ পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর যে রণ-নীতি আমরা মান্য করিয়া আসিতেছি, রাজকোটে তাহার পূর্ণাহুতি দিয়া তিনি ত্রিবাঙ্কুরের প্রতি বলিতেছেন, "সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখ। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সম্মানজনক সর্ত্ত কর, বন্দী সত্যাগ্রহীদের জন্য উত্তেজিত হইও না। দাবী কমাও, আপোষ কর।" মহাত্মাজী আজ প্রতিবাদী মনোবৃত্তি হইতে মুক্তি চাহিতেছেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চট্টল অধিবেশনে এই বাণীই কি আমরা উচ্চারণ করি নাই? জাতির মুক্তিকামনা পূর্ণ করিতে হইলে, অহিংসার উপর আরও বড় অস্ত্রবল আছে, উহা অপ্রতিবাদী মনোবৃত্তি। আজ গান্ধিজীর মনোভাবের এই অভিব্যক্তিতে সঙ্ঘধর্ম্মীদের চিত্তে আত্মবিশ্বাসের অগ্নি-শিখা কি জ্বলিয়া উঠিবে না?

মহাত্মাজী আজ বলিতেছেন, "শাসক ও শাসিতের মধ্যে মিল চাই।" ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তকের অনুষ্ঠান-পত্রে এই কথাই লিখিত হইয়াছিলঃ—"ক্ষুদ্র প্রবর্ত্তক কি

করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে—নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে, রাজা প্রজার মর্য্যাদা রাখে না—প্রজা রাজবিদ্বেষী হয়—যাহা না থাকিলে, প্রজায়-প্রজায় সহানুভূতি থাকে না—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে; যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জালা অনুভব করে—প্রবর্ত্তক সেই অমূল্য বস্তুগঠনে সহায়তা করিবে।" তারপর প্রবর্ত্তক বলিয়াছিল—"সেটী কি?" উত্তর দিয়াছিল "চরিত্র।"

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুরু আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে মুক্তি-সাধনায় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন "অপ্রতিবাদী মনোবৃত্তি"। আর জাতির চরিত্রই এই অভাবনীয় অপার্থিব অস্ত্র-ব্যবহারের অধিকারী বলিয়া স্থির করিলেন, মর্ম্মবাণী যে ক্ষেত্রেই মূর্ত্ত হউক, আমাদের নতি সেইখানেই প্রদান করি। হয়তো 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' সাধনা করিয়াই শেষ হইবে। হয়তো গান্ধিজী এই অভিনব স্বপ্নকে রূপ দিতে আর অবকাশ পাইবেন না। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জয়ধ্বজা ধরিবার যে অধিকার-সূত্র তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা উপেক্ষা করিয়া এ জাতি স্বাধীনতা লাভ করিবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীও আমরা করিয়া রাখিলাম। যাহা হইলে এ জাতি মুক্তির অধিকারী হয়, তাহা না হইয়া মুক্তিকামনার পূর্ত্তি যদি দেখি, তাহা মরীচিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

উপসংহারে বলিব, যাঁহারা জড়বাদী, পরকীয় প্রভাবে পুষ্টবুদ্ধি, তাঁহারা বলিতেছেন, রাজকোটে গান্ধিজীর চালাকি বীরবলের গুঁতায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইলে তিনি আর এক চালবাজী আরম্ভ করিলেন। অনেক অদূরদর্শী বলিতেছেন, গান্ধিজী ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়া রাজকোটে যদি অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার পরিণাম এমন ভ্রান্তিপূর্ণ হইলে কে আর গান্ধিজীকে অনুসরণ করিবে? ভারতে আত্মসমর্পণযোগের জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা মহাত্মাজীর এই অদ্ভুত আচরণের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ মর্ম্মার্থ অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মহাত্মাজী ঠাকুর সাহেবের মতিপরিবর্ত্তনের জন্য অন্তর-প্রেরণায় অনশনব্রত গ্রহণ করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়; আর এই সঙ্গে প্রকৃতির প্ররোচনায় তিনি বড়লাট সাহেবের ও প্রধান মন্ত্রীর সহায়ে জয়গর্ব্বে গোড়ার সঙ্কল্প বিস্মৃত হন। সৌভাগ্যবান্ তিনি বীরবলের গুঁতা খাইয়া তাঁহার বিবেক বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। তিনি পূর্ব্বচেতনার মূলে উপস্থিত হইয়া দেখেন—প্রাণভয়ে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। প্রাণসংশয় পীড়া হইলে, মহাত্মাজীর পত্নী নিষিদ্ধ ভোজন গ্রহণ করেন নাই, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পুনঃ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজ অনশন-ক্লেশ-পীড়নে দুর্ব্বল-চিত্ত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বাঁচার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অনুতপ্ত। ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইতে হইলে, চিত্তে কি দৃঢ়তার প্রয়োজন, তিনি রাজকোটে তাহার সন্ধান পাইলেন। তাঁহার মত বহুজনপূজিত নেতার পক্ষে এইরূপ ভ্রান্তিস্বীকার কত বড় সৎসাহসের পরিচয়, তাহা যাঁহারা অতি সতর্ক হইয়া আত্মসম্মানরক্ষায় ব্যস্ত, তাঁহারা মনে মনে বুঝিবেন।

মহাত্মাজী যে জন্য অনশন-ব্রত লইয়াছিলেন, তাহা ভাসিয়া গিয়াছে; এবং এতদিন অন্যকে নিজের অভীষ্ট-মত অবস্থায় দেখার যে নীতি ঈশ্বর তাঁহাকে অনুশীলনের জন্য প্রয়োগ করিতে দিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষে তাহা প্রত্যাহৃত হইল। দৈবী-সম্পদের ইয়ত্তা নাই। ঈশ্বরের অস্ত্রাগারে অহিংসার উপর অস্ত্র আছে। মহাত্মাজীর ভিতর দিয়া ভগবান তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রয়োগ-বিধি গান্ধিজীর ভাগ্যে আছে কি? যদি এমন হয়—ভারতের কুরুক্ষেত্রে সত্যই ঈশ্বর-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বলিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—ঈশ্বর-যুক্তির মানুষ যাঁহারা, তাহাদের আবার এমন ভুল ভ্রান্তি হয় কেন? নরদেহে সমগ্র ঈশ্বর-চৈতন্যের সংযুক্তি কত অশ্রুপাতের ভিতর দিয়া উপলব্ধিগম্য হয়, তাহা কে বুঝিবে? ভারতের যাঁহাকে আমরা পূর্ণাবতার স্বীকার করিয়াছি, সেই কৃষ্ণচন্দ্র কুরুক্ষেত্রের শেষে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পার্থকে বলিয়াছিলেন, যে চেতনার সংযুক্তিতে সেদিন গীতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম, আজ সে চেতনা হইতে নিজেকে বিচ্যুত মনে করিতেছি।" মর্ম্মীদের বুঝিতে বলি, নরদেহে নারায়ণের লীলামূর্ত্তি কখন কি ভাবে খেলিয়া যায়, তাহা নিরাকরণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। আজ ভারতের অসাধারণ চরিত্র বস্তুতন্ত্র করার যে আয়াস গান্ধিজীর জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা ধন্য হইতেছি। ভারত ধন্য হইয়াছে।

ঝড়ের সঙ্কেত

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

দুই

মোটরে করিয়া ভিজিতে ভিজিতেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। কালবৈশাখীর দুর্য্যোগে সন্ধ্যারাত্রে আমার জীবনে এমন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটিল যে, সহসা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে উৎসাহ পাইলাম না। পথে ঘাটে অসংখ্য যুবক যাহারা অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, আমি ছিলাম তাহাদেরই একজন কিন্তু সেই রাত্রে বৃষ্টি-বাদলে কলিকাতার রহস্যময় পথে ভিজা অন্ধকারে আর ঝাপসা আলোয় মোটরের ভিতর বসিয়া আমি যেন সহসা এক নাটকের প্রধান নায়ক হইয়া উঠিলাম। তরুণ বয়সের রসকল্পনায় যে-সকল অর্ব্বাচীন গা ভাসাইয়া দেয়, তাহারা এমন একটা নাটকীয় সংস্থানের মধ্যে হয়ত আত্মহারা প্রণয়-কাহিনীর বিষয়বস্তু খুঁজিয়া পাইত, কিন্তু আমি ইহাতে একটা বৈষয়িক লাভের সন্ধান আবিষ্কার করিলাম। দুই গাছা সোনার চুড়ি পকেটের ভিতরে রাখিয়া হাত দিয়া মাঝে মাঝে অনুভব করিতেছিলাম। মৃণ্ময়ী হাত হইতে চুড়ি খুলিয়া দিয়াছে, কিন্তু আমার ঠিকানা লয় নাই। যদি টাকা লইয়া আমি ফিরিয়া না যাই, তবে কিছুই তাহার করিবার থাকে না। এমন কোনও প্রমাণ তাহার নিকট রাখিয়া আসি নাই, যাহার জোরে সে চুড়ি দুগাছা ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইতে পারে। প্রতারিত হইতে গিয়া প্রতারণা করিয়া আসিলাম, এজন্য নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিল। চুড়ি দুগাছা যখন পাইলাম, তখন মোটরভাড়াটা পকেট হইতে দিতে গায়ে লাগিবে বলিয়া মনে হইল না।

মৃণ্ময়ী আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে, এমন একটা কথা উঠিতে পারে। কিন্তু যাহার মা ছিল কলঙ্কবতী, যাহাদের জীবনযাত্রার ইতিহাসে সাধুতার কোনও স্থান নাই, তাহাদের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার মূল্য কতটুকু? মেয়েটার প্রতি আমার একটা ক্ষণিক লোভ জাগিয়াছিল সন্দেহ নাই, উহার সহিত কিছুকাল একটা সম্পর্ক পাতাইলে মন্দ হইত না, কিন্তু সোনার চুড়ি দুইগাছা পাইয়া আমার সেই লোভটা কোথায় যেন উবিয়া গেল। তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলে চুড়ি-বিক্রয়ের টাকাও তাহাকে দিতে হইবে এবং তাহাকেও হয়ত পাইব না,—এমনও হইতে পারে, বিপ্লবী বলিয়া কথিত দুইটি যুবকের দ্বারা আমার কোনও ঘোরতর অনিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়, তাহার চেয়ে বরং সমস্তটাই গিলিয়া ফেলি। চুড়ি দু'গাছা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইব, তাহাতে অমন পাঁচটা মৃণ্ময়ী জুটিয়া যাইবে। মৃণ্ময়ী অপেক্ষা স্ত্রীলোকই আমার নিকট প্রধান—এমন আদর্শ ও ইহার উদাহরণ আমার জীবনে বিরল নয়। খুশি হইয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। মৃণ্ময়ী এতক্ষণ তাহার মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তটি গণিতেছে, এই অসুবিধাজনক অবস্থাটা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আমি আর মনে করিলাম না।

বাড়ীতে ঢুকিয়া মাতৃদেবীকে দেখিয়াই মনে পড়িল যে, আমি পিতাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, কই রে, এঁরা এলেন না?

তাঁহার বহুবচনার্থ শুনিয়া রাগ হইয়া গেল। বলিলাম, তোমার পতি-পরম-গুরুটি চিরদিন আমাকে এমনি হায়রাণ করেন।

আমি আদরের পুত্র, সুতরাং বেমক্কা কথা বলাই আমার অভ্যাস। মা বলিলেন, আ মুখপোড়া। ওই কি কথার ছিরি? তবে কি দিল্লী থেকে রওনা হতেই পারেন নি?

বলিলাম, খুব সম্ভব লাড্ডু খেয়ে স্ত্রীপুত্রের কথা ভুলে গেছেন। ভদ্রলোক আমার দার্জ্জিলিং যাওয়াটা স্রেফ মাটি ক'রে দিলেন।

মা রাগ করিয়া বলিলেন, কেবল নিজের যাওয়ার কথাটাই ভাবছিস, এদিকে মানুষটার পথে বিপদ আপদ কিছু ঘটলো কিনা, সেদিকে তোর ভ্রুক্ষেপ নেই!

বলিলাম, তাঁর বিপদের চেয়ে বড় বিপদ যদি আমার দার্জ্জিলিং যাওয়া না হয়।

দূর, পোড়ারমুখো।—বলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

কথাটা মিথ্যা নয়। পিতা আমার এমনি সতর্ক ও সাবধানী পুরুষ যে, তিনি বরং অন্যকে বিপদে ফেলিবেন কিন্তু নিজে বিপন্ন হইবেন না। তাঁহার বিপদের কথা ভাবা অপেক্ষা আমার দার্জ্জিলিং যাত্রা অনেক বড়। দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে ট্রেণ-সংঘর্ষে তাঁহার মৃত্যু অপেক্ষা কলিকাতায় বসিয়া একশো পাঁচ ডিগ্রী উত্তাপে আমার শোচনীয় মুমূর্ষু অবস্থা অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক। পিতা মরিলে দুঃখ নাই, কারণ পিতারা চিরদিনই মরিয়া থাকেন, কিন্তু আমার ন্যায় পুত্র মরিলে সমগ্র জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, দেশের পক্ষে অপূরণীয় অভাব, — দেশকে এত বড় অনিষ্ট হইতে আমি অবশ্যই রক্ষা করিব। আগামী কাল মৃণ্ময়ীর সোনার চুড়ি বিক্রয় করিয়া ও মায়ের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া আমি কলিকাতা ত্যাগ করিব। পিতা আমার চিরদিনই স্বার্থসচেতন, সুতরাং আমি যে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? মাতাঠাকুরাণী অলঙ্কার না দিলে আমি অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিবার নামে মদনানন্দ মোদকের বড়ি দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিব। এমন অনেকবার করিয়াছি। আমার কুড়ি বৎসর বয়স অবধি আমি অবশ্য না বলিয়া কয়েকবার গোপনে পিতৃদেবতার বাক্স হইতে কিছু কিছু লইয়াছি, কিন্তু পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা চলিয়া যাইবার পর হইতে আমি আফিঙ ও দড়ি —এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমার পায়ের নিকট আসিয়া টাকা-পয়সা জড়ো হইতে থাকে। অবশ্য এখনো একটু অস্বস্তি আছে, উভয়ের একজনের মৃত্যু না হইলে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য, দুইজনেই এমন বয়সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন যে, একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অপরজন যে পুনরায় বিবাহ করিবেন, এমন সম্ভাবনা কম। তবে বাংলা দেশে সবই সম্ভব, পিতার ন্যায় বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে কিশোরী পাত্রী জুটিতে বিলম্ব হয় না। তবে মাতৃদেবীর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত, তাঁহার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে,—অবশ্য বিলাত হইলে কি হইত বলা যায় না।

মনে মনে এই সব যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিতে করিতে আমি আমার টেব্‌লের নিকট স্থির হইয়া বসিয়া চুড়ি দু'গাছা বাহির করিলাম। আগামীকাল আমার অনেক কাজ। কিছুকাল হইতে যে দুয়েকটি বদ্ অভ্যাস আমার হইয়াছে, তাহার জন্য যদিও আমি আন্তরিক লজ্জিত ও অনুতপ্ত, যদিও আমার ন্যায় কুলাঙ্গার সমাজের পক্ষে ঘৃণ্য, —কিন্তু কি করিব, আমার অভ্যাসগুলি দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। অহিফেন অবশ্য আমি সেবন করি না, তবে উৎকৃষ্ট বিলাতী মদ্য আমি একরূপ নিয়মিতই ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং তাহার সরঞ্জাম এই পরিমাণে লইতে হইবে, যাহাতে পথে ঘাটে, শীতে ও দুর্য্যোগে অভাব না ঘটে। দ্বিতীয় কথাটা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে আমি একবার ঈশ্বরের নাম করিব, কারণ, সবই তাঁহার ইচ্ছা —সেই হৃষীকেশ আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে যে কাজেই নিযুক্ত করুন, আমি তাহাই করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রতি আমার অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তি, তিনি সর্ব্বদাই আমার ভিতরে থাকিয়া আমাকে চালিত করেন, আমার প্রাণ-চাঞ্চল্য তাঁহারই সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট হয়। সম্প্রতি থিয়েটার ও সিনেমার দুই তিনটি অভিনেত্রীর সহিত বহু অর্থব্যয় করিয়া অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিয়াছি,— উঁহাদের কাহার মুখে কতটা পরিমাণ সতী নারীর ছাপ আছে, এবং কাহাকে সঙ্গিনী করিলে আমাকে পথে-ঘাটে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না, সেই কথা টেব্‌লের নিকট বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে হৃষীকেশ আমার প্রাণের ভিতর হইতে কানে কানে আদেশ করিলেন যে, অলঙ্কার না পাইলে পিতার সহি জাল করিয়া আগের মতো ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়ো, বিপদে পড়িলে একমাত্র বংশধর বলিয়া অবশ্যই পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ধার পাইবে। ভয় নাই, তুমিই ইহাদের শিবরাত্রির সলিতা!

কিন্তু চুড়ি দু'গাছার দিকে চাহিয়া আমার একটু ভাবান্তর ঘটিল। কিছু নেশা করিয়া বাড়ী ফিরিলে, এই চুড়ি দেখিয়া একটু নেশা লাগিত। কিন্তু তাহা হইল না। মনে হইল, এই চুড়ির সহিত মৃণ্ময়ীও আসিয়া আমার এই

ঘরে দাঁড়াইয়া আমার বিচার বিবেচনাকে নিঃশব্দে পরীক্ষা করিতেছে। ঘরের আলোটা যেন মৃদু, সেই স্বল্প আলোয় আমি যেন দেখিলাম আমার ঘরে সন্ধ্যাবেলাকার বৃষ্টিবাদল যেন এই চুড়ি দুগাছার পিছনে পিছনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সব বুঝিলাম। বুঝিলাম আমার মনুষ্যত্বকে বাজাইয়া ইহারা কিছু কাজ গুছাইয়া লইতে চাহে। চুড়ি দুগাছা যাহার হাতের তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে চিনি সন্দেহ নাই, তাহার গলা ধারাধরি করিয়া শিবের গাজন গাহিয়া বেড়াইয়াছি তাহাও সত্য, সেদিনকার সেই হৃষ্টপুষ্ট বালিকার মাংসল দেহের উষ্ণ ঘন গন্ধে আমার কিশোর রক্তে যে অর্থহীন নিগূঢ় অন্ধ বিপ্লব বাধিয়া যাইত তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু আজ? আজ দার্জ্জিলিং যাইবার কালে ছেলেখেলার মতো একটা সাময়িক সঙ্গিনী জুটাইতে পারিলেই আমার কাজ চলিয়া যাইবে। আমি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় মৃণ্ময়ীর বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিব অথবা বিনা পারিশ্রমিকে সোনার বদলে তাহাকে টাকা দিয়া মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া আসিব—এত বড় উদারতা বিংশ শতাব্দিতে অচল। মৃণ্ময়ীর বয়স কাঁচা, তাহার দুগাছা চুড়ি গেলে চার গাছা জুটিতে বিলম্ব হইবে না, কিন্তু আমি এই কালবৈশাখীর লটারিতে যাহা পাইলাম তাহা খোয়াইলে আমার দার্জ্জিলিং যাত্রার আর্থিক সাচ্ছল্য ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহা পারিব না।

উঠিয়া ভিতরে গেলাম। পিতা আসেন নাই সুতরাং মা রান্নাঘরে পাচককে উপদেশ দিয়া পিতার জন্য প্রস্তুত করা খাবারগুলির ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমি খাইতে বসিয়া বলিলাম, একটা মজার কথা শুনবে, মা?

মা মুখ তুলিলেন।

বলিলাম, হাবড়া স্টেশনে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তুমি তাদের চেনো।

কে বল্ ত?

সেই যে তারা, তুমি আর বাবা যাদের পথে বসিয়ে ছিলে?

ওমা, কে রে?

বলিলাম, তোমরা নিজেদের কলঙ্ক ভুলেছ কিন্তু তারা তোমাদের কীর্ত্তি ভোলেনি। সরোজিনী আর তার মেয়ের কথা মনে নেই? সেই যে, তোমার হুকুমে বাবা যাদের ঘর জালিয়ে দিয়েছিলেন?

মা বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অনেক দিনের কথা হোলো। সর্ব্বনাশী এখনো বেঁচে আছে?

সরোজিনীর মৃত্যুশয্যার কথাটা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাপিয়া গেলাম। মায়ের চোখে মুখে নারী জাতির যে আদিম হিংস্রতা ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম তাহাকে প্রশ্রয় দিলাম না। বলিলাম, হ্যাঁ, তার সেই মেয়েটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

কোথা আছে এখন সে-মাগি?

অত জানিনে, তবে তার মেয়েটা আমাকে দেখে চিনলো। পুরনো কথা তুলে খুব খোঁটা দিলে।

মায়ের চোখ জলিয়া উঠিল। বলিলেন, সাপের বাচ্ছা সাপই হয়। ছোবল মারবে বৈ কি, সেই মায়ের মেয়ে ত? পায়ের জুতো খুলে অমনি মারলিনে কেন তুই?

মায়ের মুখে এই সকল ভাষা আমি সহসা শুনিতে পাই না। তাহাদের অন্যায় ও কলঙ্ক যে কত গভীর তাহা আমি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই উপলব্ধি করিলাম। বলিলাম, তারা কি করেছিল মা?

মা বলিলেন, সে কথায় আর দরকার নেই। শুধু এই কথা ব'লে রাখি, ফের পথে ঘাটে দেখা হ'লে আর মুখ ফিরে চাইবিনে। ওরা বড় নোংরা, ওদের ছায়া মাড়াতে নেই।

কিন্তু ছায়া যে মাড়িয়েছি ইতিমধ্যে!

মা আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি খাইতে খাইতে বাঁ হাতে চুড়ি দু'গাছা তাঁহাকে সোৎসাহে দেখাইলাম। বলিলাম, সরোজিনীর মেয়ে আমাকে এই দুগাছা দিয়ে বললে, দয়া ক'রে আমাকে কিছু টাকা এনে দিন্, আমাদের বড় বিপদ।

মা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তুই হাত পেতে নিলি কেন?

তাঁহার মুখের চেহারা বিবর্ণ ও যন্ত্রণাকাতর হইতে দেখিয়া আমি প্রথমে একটু যেন অনুতপ্ত হইলাম। কিন্তু পরে বলিলাম, আমি তোমার অত্যন্ত বাধ্য আর চরিত্রবান্

ছেলে, তুমি যদি আমাকে আগে থেকে শিখিয়ে রাখতে যে, ওদের কোনো জিনিস আমি কখনো স্পর্শ করব না তা হ'লে আমি একবার ভেবে দেখতুম। কিন্তু তুমি তা ব'লে রাখোনি। এখন কি উপায় তাই বলো।

মা বলিলেন, টান মেরে ফেলে দিয়ে আয়।

বলিলাম, পরের জিনিষ ফেলে দেবো, অধর্ম্ম হবে যে। তা ছাড়া টাকা এনে দেবো ব'লে হাত পেতে নিয়েছি। আর কিছু নয় মা, জীবে দয়া!

মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওই চুড়ি বিক্রি করতে যাওয়া তোমার হবে না,—হয়ত গিল্‌টি, তুই হয়ত ধরা পড়বি পুলিশের হাতে,—ওরা সব পাপই করতে পারে। আমি টাকা দিচ্ছি, কুকুরের মুখে যেমন মাংস ছুড়ে দেয়, এই টাকা আর চুড়ি তেমনি ক'রে ওদের কাছে ফেলে দিয়ে আসবি। ফিরে এসে চান ক'রে ঘরে উঠ্‌বি।—এই বলিয়া তিনি রাজমাতা ভিক্টোরিয়ার ন্যায় দীপ্ত ভঙ্গীতে চলিয়া গেলেন। উপরের দালান হইতে একবার গলা বাড়াইয়া বলিলেন, যত রাত্রিই হউক, আমাকে যাইতেই হইবে, ওই নোংরা বস্তু ঘরে রাখা হইবে না।

আহার সারিয়া মায়ের নিকট ত্রিশটা টাকা লইয়া শুভক্ষণে দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম। পথে নামিতেই এক সাইকেলওয়ালা ডাকপিওন হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রাম বাবার। খুলিয়া পড়িয়া দেখি, তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার আসা হইল না, দুইদিন পরে আসিয়া পৌছিবেন। মনে মনে পিতার মুণ্ডপাত করিলাম এবং মাকে জব্দ করিবার জন্য টেলিগ্রামের কথা না জানাইয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। পকেটে ত্রিশটা টাকা ও সোনার চুড়ি, আজ রাত্রিটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার ভালোই কাটিবে। ইচ্ছা করিয়া অল্প খাইয়াছি, নেশা করিবার মতো জায়গা পেটে বেশ আছে। রাত্রে আর ফিরিব না, চিরকালের অভ্যাস মতো কাল সকালে আসিয়া একটা মিথ্যা রোমাঞ্চকর গল্প বলিব, এবং আমি জানি মা বিশ্বাস করিবেন। কলিকাতার রাত্রির পথ বড় মধুর বোধ হইতে লাগিল।

মা যতটা নোংরা বলিলেন অতটা নোংরা আমার মনে হয় নাই। স্ত্রীলোকের নিকট স্ত্রীলোক যতটা নোংরা, এমন তাহারা পুরুষের চক্ষে নহে। পৃথিবীতে স্ত্রী-কবি অনেক জন্মাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের খ্যাতি নারীবন্দনা কাব্যের জন্য নহে,—যেমন পুরুষ-কবির বেলায় খাটে। নারীর মুখে নারীর স্তাবকতা পৃথিবী এখনো শুনে নাই। যাহা হউক, আমি মৃন্ময়ীর ব্যবহারে ও আচরণে কোথাও মালিন্য লক্ষ্য করি নাই। ইহা সত্য, সে আমার সাহায্য চাহিয়াছে কিন্তু কিছু দাবি করে নাই; আমার মানবতার প্রতি আবেদন জানাইয়াছে, কিন্তু ছলনার সঙ্কেতে অভিভূত করিতে চাহে নাই। কবে তাহাদের কোন্ অন্যায়ের কথা মা মনে করিয়া আজিও তাহাদের তিরস্কার করিলেন, আমি কিন্তু ইহার সঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহাদের অন্যায়টা চারিত্রিক অথবা বৈষয়িক তাহা আমার অজ্ঞাত। যদি চারিত্রিক হয় তবে আমা অপেক্ষাও তাহারা হীন একথা স্বীকার করিতে আমার অহঙ্কারে বাধে; যদি বৈষয়িক তবে তাহাদের অপেক্ষা আমি কম জুয়াচোর ইহা স্বীকার করিবার আগে আমি অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিব। নিজের অধঃপতন লইয়া আমি গৌরব করি না বটে, কিন্তু মৃণ্ময়ীরা আমা অপেক্ষাও অধঃপতিত—এ কথা আমি মানি না।

যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা হইল না। মায়ের রুদ্রাণী মূর্ত্তির উগ্র কণ্ঠ আমাকে যেন মৃণ্ময়ীদের বাড়ীর দিকেই ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আকাশ পরিস্কার হইয়াছে, গ্রীষ্মকালের রাত দশটা এমন কিছু গভীর রাত নহে, আমি আবার গোয়াবাগান হইতে কলুটোলায় যাইবার জন্য ট্রামে উঠিয়া বসিলাম। আজকার রাতটা আমি চরিত্র রক্ষা করিব। ইহা দেখিব, আমার এই সংযমের বিনিময়ে আমি কতটুকু শ্রেষ্ঠতর বস্তু আদায় করিতে পারিব। মৃণ্ময়ীর মা মরিতেছে, আর তাহার মাথার উপর কেহ থাকিতেছে না, যে-দুইটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে দেখিয়া আসিয়াছি তাহাদের পুলিশের ভয় দেখাইয়া অবশ্যই তাড়াইতে পারিব,—তাহার পরে মৃণ্ময়ী আমার কবল হইতে আর যাইবে কোথায়? বাল্যকালে আমি তাহার খেলার সাথী ছিলাম, কিশোরকালে তাহার শিবের গাজনের সঙ্গী ছিলাম, যৌবনকালে যদি মাসখানেকের জন্য তাহার প্রিয়তম না হইতে পারিলাম, তবে আজ এই রাত্রে কোমর

বাঁধিয়া তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে যাইতেছি কোন্ নির্ব্বুদ্ধিতায়? মা মরিলে আজ রাত্রে সে কাঁদিবে, কাল রাত্রে আমার সহিত দার্জ্জিলিং যাইতে পাইয়া হাসিবে, কারণ আমার মনে হয় স্বামী ও সন্তান ছাড়া আর কাহারও মৃত্যু স্ত্রীলোকের মনে গভীর রেখাপাত করে না। মায়ের মৃত্যুতে যদি সে আলুথালু হইয়া কাঁদিবার চেষ্টা করে তবে আমি তাহাকে চোখ টিপিয়া ভালোবাসার লোভ দেখাইয়া থামাইব এবং আড়ালে লইয়া গিয়া মৌখিক অভয় দান করিব। মৃণ্ময়ীর চোখে মুখে আমি একটি কৌমার্য্যময় শুচিতা লক্ষ্য করিয়াছি, ভ্রষ্টচরিত্রের যুবক হইয়া সেই বস্তুটির প্রতি স্বাভাবিক প্রলোভন আমি অবহেলায় ত্যাগ করিতে পারিব না। মায়ের তিরস্কারই আমাকে যেন উৎসাহিত করিল।

বাসাটা ভুলি নাই, সটান আসিয়া কলুটোলার পথে সে গলিটা বাহির করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকারে হাতড়াইয়া গলির সর্ব্বশেষ দরজায় ঢুকিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম।

মৃত্যুর দৃশ্য দুই চারিবার আমি দেখিয়াছি, একবার দুর্ব্বলতাবশতঃ কবে জানি চোখে রুমালও চাপা দিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া জীবন সম্বন্ধে নূতন করিয়া আমাকে চিন্তা করিতে হইল। উপরে উঠিয়া ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভিতরে আলো তেমনই জ্বলিতেছে, মৃণ্ময়ী তেমনি করিয়া নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

রোগীর নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, এখন অবস্থা কেমন?

মৃণ্ময়ী কহিল, আপনি যাবার মিনিট দশেক পরেই মারা গেছেন। আপনাকে এই রাত্রে ভারি কষ্ট দিলুম, আমাকে ক্ষমা করবেন।

তাহার বলিবার সহজ ভঙ্গী দেখিয়া আমি শুদ্ধ ও নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কণ্ঠস্বরে তাহার এতটুকু কারুণ্য, এতটুকু অসহায়তা নাই। সন্তান হইয়া মায়ের মৃতদেহের কাছে এমন নির্ব্বিকারভাবে কেহ বসিয়া থাকিতে পারে আমি কল্পনাও করিতে পারি না। অন্ত দিকটাও আছে; কে সৎকার করিবে, কে মড়া বহিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে, তাহার নিজের উপায় কি হইবে, আগামী কাল সকালে অভিভাবকহীন অবস্থায় সে কোথায় দাঁড়াইবে—এই সব চিন্তা সে করিতেছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, এসব কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। তাহার শান্ত ও অবিচলিত ভাবের মধ্যে যেন একটা সুদূর কাঠিন্য ও রুক্ষতা আবিষ্কার করিতে পারিলাম।

ঘরের ভিতরে পা বাড়াইতে আমার যেন মন উঠিল না। কেবল গলা বাড়াইয়া এক সময় প্রশ্ন করিলাম, সেই ছোক্‌রা দুজন কোথায় গেল?

মৃণ্ময়ী উঠিয়া আসিল, বলিল, এ ঘরে লোকজন আসবে, তাদের পক্ষে এখানে থাকা বিপজ্জনক। আমি তাদের সরিয়ে দিয়েছি।

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, সে কি, তোমার ত লোকজন কেউ নেই, আজকের বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে কেমন ক'রে?

মৃণ্ময়ী সহজ কণ্ঠে বলিল, বিপদ? মানুষ জন্মালেই মরে, মা সকালে বেঁচেছিলেন, এখন আর নেই—এটা আর এমন কি বিপদ, রাজেনবাবু? এই ত' বিছানাতেই রয়েছেন তবে প্রাণটা আর নেই—এই মাত্র!

ডাকিনীর মুখের দিকে আমি চাহিলাম, তাহার মুখ দেখিয়া আমার ভয় করিতে লাগিল। নিকটে ও দূরে জনমানব কেহ নাই, তখনকার সেই ছাপাখানার শব্দটাও থামিয়া গেছে, বৃষ্টিবাদল বন্ধ হইলেও পথে লোক-চলাচল আর নাই বলিলেও হয়,—আর ভিতরে একা এই দুঃসাহসিকা মৃতদেহ পাহারা দিয়া অপেক্ষা করিতেছে। মনে করিলাম, ত্রিশটা টাকা ও সোনার চুড়ি দুইগাছা ইহার হাতে দিয়া আমি পলাইয়া যাই, এই একটা অদ্ভুত আকস্মিক ঘটনার জালে জড়াইয়া ও বিপদে মাথা দিয়া আমার ঘুরপাক খাইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু মৃণ্ময়ীর টসটসে যৌবন ও গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া আমি পুনরায় লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা হলে এসব করবে কে?

মৃণ্ময়ী বলিল, আপাতত আপনাকেই এসব করতে হবে।

আমাকে ?—বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কী বলছ তুমি, মীনু ? এসব ত আমার অভ্যাস নেই। আর তাছাড়া আমাকে এখুনি ফিরতে হবে। আর তাছাড়া—

মৃণ্ময়ী গলার আওয়াজে যেন একটু জোর দিয়াই বলিল, আপনার সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা না হ'লে কি করতুম এখন আর বলতে পারিনে, কিন্তু দেখা যখন হয়ে গেল তখন আপনাকেই সব করতে হবে।

তোমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ থাকলে আমি না হয় খবর দিতে পারতুম।—আমার কণ্ঠে পুনরায় প্রতিবাদ ফুটিল।

আমাদের কেউ নেই।—মৃণ্ময়ী বলিল।

কিন্তু একা ত' সব করা যায় না, মৃণ্ময়ী ?

মৃণ্ময়ী বলিল, একাই সব করা যায়। আমি অপেক্ষা করি, আপনি গিয়ে সৎকার সমিতিতে খবর দিন্, তারা গাড়ী এনে নিয়ে যাবে। রাজেনবাবু, আপনি আর দাঁড়াবেন না, বেরিয়ে পড়ুন। আপনি পুরুষ মানুষ, ভয় কি ?

সে যেন আমাকে ঠেলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া দিল। তাহার চেহারা দেখিয়া আমার প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না, এবং পলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াও যেন পৌরুষে আঘাত লাগিল। মনে একটা সান্ত্বনা রহিল এই যে, আগামী কাল ইহাকে আমি আমার কবলে পাইব, ও ইহার অভিভাবকহীন অবস্থাটার সুযোগ লইয়া কিছুকাল সরস জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।

ইহার পরে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত না বলিলেও চলে। মৃণ্ময়ী আমাকে পুরুষ মানুষ বলিয়াছে, সুতরাং অনিচ্ছাসত্বেও কোনো কাজ হইতে পিছাইতে পারিলাম না। রাত্রি বারোটার সময় গাড়ী আনিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেলাম। মৃণ্ময়ী কাঁদিল না, কোনো কাজেই পিছাইল না, কেবল যখন তাহার মাতাকে চিতার উপর চড়ানো হইল তখন তাহার কণ্ঠস্বরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, রাজেনবাবু, আর আমার কেউ রইল না।

আমি তাহার দিকে একবার চাহিলাম। সত্য বলিব, ইতিমধ্যেই আমার একটা শ্মশান-বৈরাগ্য আসিয়াছিল। আমি যেন ক্ষণকালের জন্য তাহার প্রতি আমার বর্ব্বরোচিত আসক্তি, তাহার রূপ, তাহার যৌবন, আমার স্বার্থপরতা ও চিত্ত মালিন্য—সমস্তই ভুলিয়া গেলাম। আগামী কাল প্রভাত হইতে এই তরুণীর জীবনে যে ঝটিকা ও সংগ্রাম ও সংঘর্ষ সুরু হইবে, আমি যেন তাহার সেই দীর্ঘ ইতিহাসটা মানস চক্ষে দেখিতে পাইলাম। চিরদিন নিজের দিক হইতেই পৃথিবীকে বিচার করিয়াছি, আত্মপরতাকেই সকলের আগে স্থান দিয়াছি এবং নিজের সুযোগ-সুবিধা ভিন্ন আর কাহারও সমস্যাকে কখনও বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু আজ রাত্রিশেষের অন্ধকারে নদীতীরবর্ত্তী শ্মশানের চিতাগ্নির আভায় আমি যেন পলকের জন্য সমগ্র পৃথিবীর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিলাম, নিজের পাওনাগণ্ডাই সর্ব্বাগ্রগণ্য নয়, কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত হতমান জীবনের নিরুপায় লাঞ্ছনা, যাহা দুঃখে ও দুর্দ্দশায় জর্জ্জর, তাহার সমস্যা অনেক বড়।

বলিলাম, মৃণ্ময়ী, কেউ যার নেই তার পিছনেও একজন থাকে, তুমি সেইদিকে চোখ রেখো।

মৃণ্ময়ী আমার কথার জবাব দিল না, কেবল নীরবে জলন্ত চিতার দিকে তাকাইয়া রহিল। যে-কথাটা আমি সহসা বলিয়া ফেলিলাম তাহার সম্যক্ অর্থ আমি নিজেও বুঝিলাম না। নিরুপায়ের পিছনে ঈশ্বর আছেন এমন আজগুবী কথা আমি বলিবার চেষ্টা করি নাই, তাহার পিছনে আমি আছি—এমন বেয়াড়া ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিও আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না, কিন্তু শ্মশান-বৈরাগ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বোকার মতো এমন একটা মন্তব্য করিলাম যাহা তাহাকেও উৎসাহিত করিল না, নিজেও তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইলাম না।

ভোরের দিকে পথে ঘাটে যখন লোকজন জাগে নাই তখন মৃণ্ময়ীকে বাসার কাছে পৌছিয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমি মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া তাহার নিকট আসিব, সে যেন ইতিমধ্যে কোথাও না গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করে।

গতকাল তাহার সম্বন্ধে যেসকল সুখ-কল্পনা করিয়াছি আজ তাহাতে যেন উল্লাস বোধ করিতে পারিলাম না।

তাহার সহিত প্রণয় করিব এবং মাসখানেক পরে আখের ছিবড়ার ন্যায় তাহাকে পথের ধারে ফেলিয়া চলিয়া যাইব—আমার এই মনোভাব আমাকে যেন আর উৎসাহিত করিল না। এই ভাবিয়া আমার ভয় হইল যে, উহার সহিত মেলামেশা করিতে গেলে আমি এমন ভাবে হয়ত জড়াইয়া পড়িব যে, সেই জাল ছিঁড়িয়া বাহির হওয়া কঠিন হইবে। আমি স্বার্থপর ও লোভী সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার স্বার্থপরতা ও লোভ নির্দ্দয়ভাবে একজনের জীবনকে পদদলিত করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে ইহা যেন অতিশয় অমানুষিকতা মনে হইতে লাগিল। আখের ছিবড়ার মতো তাহাকে ফেলিয়া দিলে সে কোথায় আশ্রয় পাইবে, এই কথাটা মনে হইতেই আমি নিরুৎসাহ বোধ করিলাম। যাহার পিছনে স্থিতি-স্থাপকতা আছে অথবা সামান্য একটা শিকড়ও আছে, তাহাকে লইয়া সাময়িকভাবে আনন্দ উপভোগ করা চলে, কিন্তু মৃণ্ময়ীর কিছুই না থাকার জন্য সে আমার নিকট একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতেই আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম। অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার পক্ষে নিরাপদ, তাহাকে কাছেই টানি অথবা দূরেই ফেলিয়া দিই, কিছুই যায় আসে না—এক ঘাটের জল ফুরাইলে অন্য ঘাটে গিয়া সে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে, আমিও মুক্তি পাইয়া বাঁচিব; কিন্তু মৃণ্ময়ীর যদি চরিত্রশুচিতা থাকে তবেই আমার পক্ষে বিপদ, কারণ স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ আসিলে প্রাণের আনন্দে আর স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইতে পারিব না, সে আমার পক্ষে একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

তেমন সমস্যা যাহাতে না দেখা দেয় তাহারই চেষ্টা করিব। নীতিজ্ঞান টনটনে থাকিলে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু রকমের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়—বিংশ শতাব্দির সন্তান হইয়া এতখানি উদার আমি হইতে পারিব না। সুতরাং মাছও ধরিব অথচ জলস্পর্শ করিব না—এইরূপ স্থির করিয়া নির্জ্জন মধ্যাহ্নকালে গা ঢাকা দিয়া আমি পুনরায় মৃণ্ময়ীর কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

উপরে উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মৃণ্ময়ী জামাকাপড় পরিয়া মেঝের উপরেই বসিয়া কি যেন লেখাপড়া করিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি।

বলিলাম, ঘরের জিনিসপত্র গেল কোথা?

মৃণ্ময়ী কহিল, সকাল বেলা লোক ডেকে এনে সব বিক্রি করেছি। আমার ত' আর কোনো দরকার রইলো না।

কিন্তু বাঁচতে গেলে সবই ত লাগবে, মৃণ্ময়ী? তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মৃণ্ময়ী আমার দিকে মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিল। বলিল, যেদিকে দু'চোখ যায়। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভেতরে আসুন?

বলিলাম, বসতে দেবার ত' কিছুই রাখোনি, কোথায় বসবো? তুমি এমন একটা কাণ্ড করেছ যেটা পুরুষ মানুষকেই মানায়, মেয়েদের পক্ষে বে-মানান।

সেটা কি বলুন ত?

রাগ করিয়া বলিলাম, যে দিকে দুচোখ যায়—এ কথা বলা আমাদের পক্ষে সহজ, আমরা কৌপীন এঁটে মজুরী ক'রে দিন চালাতে পারি, কিন্তু তোমাদের পক্ষে এই বাহাদুরী সম্ভব নয়।

মৃণ্ময়ী কি যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল আমার কথাটা সে গ্রাহ্যই করে নাই, আমার মন্তব্যে তাহার কিছুই যায় আসে না। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলাম, তোমার এমন একটা লক্ষ্য হয়ত আছে যেটা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করতে চাও না, কি বলো?

মৃণ্ময়ী পুনরায় মৃদু হাসিল এবং যাহা আমি প্রত্যাশা করি নাই, সেই তিরস্কার সে সহজেই আমাকে করিয়া বসিল। বলিল, ঠিকই বলেছেন। আপনার কাছে আমার মনের কথা কেনই বা প্রকাশ করব?

কেন করবে না?—নিজের কণ্ঠে জোর দিলাম।

সুস্পষ্ট চক্ষে সে আমার দিকে চাহিল। তাহার সেই নিঃসঙ্কোচ ও সহজ দৃষ্টির কাছে আমি যেন কিছুতেই মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে কহিল, আপনার সাহায্যের জন্য কাল থেকেই আমি উপকৃত, আপনার উপকার আমি মনে রাখবো। কিন্তু আপনার এই ছেলে-

মানুষী দাবি কেন ? আপনার অনুরোধেই এতক্ষণ আমি বসেছিলুম। আমি কোথায় যাবো অথবা কি করবো, এ আপনি শুনতে চাইবেন না, রাজেনবাবু।

সে যেন আরো কি বলিতে যাইতেছিল, আমি পকেট হইতে তাহার দুইগাছা চুড়ি ও পনেরোটি টাকা বাহির করিয়া তাহার নিকট রাখিলাম। সে কহিল, চুড়ি আপনি বিক্রি করেননি ?

বলিলাম, না, সময় পাইনি। তিরিশ টাকা ছিল, তার মধ্যে পনেরো টাকা তোমার মায়ের কাজে খরচ হয়েছে। তোমার চুড়ি নিয়ে যাও।

তা হ'লে তিরিশ টাকা আপনি আমাকে দান করলেন? আপনি তা হ'লে একজন মস্ত দাতা বলুন ?

ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলাম, সামান্য টাকার জন্যে বিদ্রূপ ক'রো না, মৃণ্ময়ী ?

সামান্য ?—মৃণ্ময়ী হাসিয়া বলিল, আপনার কাছে যেটা সামান্য আমার কাছে সেটা এক মাসের খাই খরচ। আপনাদের মতন ধনী লোক দেশে আছে বলেই ত' আমাদের দিন চলে! আচ্ছা, এবার আপনার কাছে বিদায় নেবো, রাজেনবাবু।

বলিলাম, একটা কথার জবাব চাই, মীনু।

কি বলুন ?

তোমার মায়ের 'পরম শত্রু' আর 'পাসণ্ড' ব'লে তুমি যাকে স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে, সে কে ?

মৃন্ময়ী বলিল, ওটা মাটীর তলায় চাপা পড়েছে, সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দোবো না।

পুনরায় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কোথায় গিয়ে থাকবে তুমি ?

সে কথা আপনি জানতে চান্ কেন ?

বলিলাম, ছেলেবেলায় আমি তোমার শিবের গাজনের সঙ্গী ছিলুম সেই অধিকারে জানতে চাই।

মৃন্ময়ী বলিল, সে অধিকার আপনার মা-বাবা নষ্ট করেছেন আমাদের ঘর জালিয়ে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

আমার যেন একটা ব্যাকুলতা আসিল। মনে হইল সে চলিয়া গেলে তাহার সহিত আমার অনেকখানি যাইবে। কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, তবে এক রাত্রির পরিচয়ের অধিকার নিয়ে জানতে চাইছি, জানতে চাইছি মনুষ্যত্বের অধিকারে—বলো মৃন্ময়ি!

বড়লোকের মনুষ্যত্ব ?—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মৃন্ময়ী নীচে নামিয়া গেল। আমি যেন ভয়ানক অপমান বোধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

— ক্রমশঃ

একখানি ছবি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কৈশোরে হেরি তব ও মধুর রূপ,
মুগ্ধ হৃদয়—হ'ত সব ভাষা চুপ।
যৌবনে হেরি তব মাধুরী মদির—
বিপুল পুলকে হত হৃদয় অধীর।

অধরে দ্রাক্ষার মধু, কি শোভা তনুর
পুষ্পদানী সে যেন পুষ্পধনুর।
ছবিও যে পে'ত প্রাণ ভুলাইত সব
তোমারে দেখাই ছিল মহা উৎসব।

দরশনে দিত যেন পরশন সুখ,
স্নিগ্ধ নয়ন হ'ত, স্নিগ্ধ এ বুক।
আজ তুমি তাই আছ, আমি আছি সেই
উপে গেছে অনুরাগ আর তাহা নেই।
কই সে আনন্দ কই—বসে' ভাবি হায়—
সেও কি মোদের মত জুড়াইয়া যায় ?

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঙ্গলা সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের তুলনায় যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা সাহিত্য ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যের আদর্শ-স্থানীয়। প্রাচীন-সাহিত্যের তুলনায় যে বর্ত্তমান সাহিত্য বহু শাখায় সমৃদ্ধ, সে বিষয়ে, বোধ করি, কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই কি বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী জাতির পক্ষে যথেষ্ট?

এ যুগের সাহিত্যের পাঠকগণ ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। ইংরাজী সাহিত্য পাঠেই তাঁহাদের রুচি ও রসজ্ঞতা পরিপুষ্ট। তাঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যের সন্ধান রাখেন। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় নিতান্ত দরিদ্র। তাঁহাদের কথা থাকুক। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সাহিত্যকে উন্নতির উচ্চশিখরে সমারূঢ় করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সে সাহিত্যের এত অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্দ্দশা ও রিক্ততা আসিল কি করিয়া? কোথায় গেল সেই উচ্চ আদর্শ, বিরাট্ কল্পনা, অপূর্ব্ব রসদৃষ্টি, কোথায় সেই উদার সৌন্দর্য্যরচনা? এ সকল অন্তর্হিত হইল কেন? ভাবের রাজ্যে ভাব-বিলাস আসিয়া জুটিল কোথা হইতে?

শরৎচন্দ্রের অন্তগমনের পর বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের ঔজ্জ্বল্য ও শ্রী আর নাই। আকাশে নক্ষত্রের অভাব নাই, কিন্তু জ্যোতিষ্ক আর দেখা যাইতেছে না। অদূর ভবিষ্যতে কোন জ্যোতিষ্কের উদয় হইবে, তাহার সূচনাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বঙ্গ-সাহিত্যের এই দীনতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, জাতীয় জীবনের উপস্থিত গতি ও প্রকৃতির কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়।

একথা সকলেই স্বীকার করেন — সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব। বর্ত্তমান যুগে এই জাতীয় জীবনের অনেক দিক্ হইতেই অধোগতি দেখা যাইতেছে। কি শিক্ষা, কি ধর্ম্ম, কি কৃষি, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি অর্থ, কি সামর্থ্য—কোনও দিক্ হইতেই বর্ত্তমান যুগকে উন্নতির যুগ বলা যায় না। যে সকল ক্ষেত্রে বিগত যুগে রথী-মহারথিগণ নায়কতা করিতেন, সে সকল ক্ষেত্রে এখন নগণ্য পদাতিকের রাজত্ব। যে সকল পদ দিগ্বিজয়ী ব্যক্তির দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, সেই সকল পদে এখন তৃতীয় শ্রেণীর লোককে বিরাজ করিতে দেখা যাইতেছে। শিক্ষার আদর্শ অত্যন্ত অনুন্নত, ধর্ম্মভাব জড়বাদের ও ভোগানুরাগের তাড়নায় অন্তর্হিতপ্রায়। বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড পৌরুষ ও সহৃদয়তা, বিবেকানন্দের দূরদর্শিনী বিদ্যা ও বাগ্মিতা, ভূদেবের চিন্তাশীলতা, সুরেন্দ্রনাথের বীর্য্যবতী কর্ম্মনিষ্ঠা, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধনা, রাসবিহারীর প্রখর ধীশক্তি, আশুতোষের মনীষা ও তেজস্বিতা, চিত্তরঞ্জনের আত্মহারা দেশপ্রীতি—সবই যেন আজ কথা-শেষ! দেশে ক্রীড়া-কৌতুক, বায়স্কোপ-থিয়েটার, রেডিও-গ্রামোফোন, বিদেশী খেলা ও চটুল নৃত্য ইত্যাদিরই প্রাধান্য। অধ্যবসায় ও অনন্যমনা অবধানের ফলে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে, এ যুগে তাহা একেবারেই সম্ভব হইতেছে না। জাতীয় জীবনের বিবিধ শাখার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই—সমস্তগুলিই নিষ্ফল, রিক্ত ও শুষ্কপ্রায়। কেবল কয়েক শ্রেণীর পতঙ্গ অনবরত গুঞ্জনধ্বনি করিয়া প্রচণ্ড চাঞ্চল্যে বঙ্গবনানীকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে।

যে জাতীয় জীবনের সর্ব্বশাখায় এই দুর্দ্দশা, তাহার সাহিত্য-শাখাই শুধু সমৃদ্ধ হইবে কেন? সবই ত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে অনুস্যূত!

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত আমাদের জাতি বিদেশ হইতে আহৃত বিদ্যা, জ্ঞান, বিদগ্ধতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিয়া আসিয়াছে। সেই পরিপাকের ফলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় সাহিত্য না হইলেও, উৎকৃষ্ট সাহিত্য। তাহার পর হইতে এ জাতি বিলাতী বিদ্যাকে গোগ্রাসে

গিলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পরিপাকের জন্য বিশ্রাম পর্য্যন্ত করে নাই—রোমন্থনের অবসর তাহার নাই।

স্বরাজ আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে একটা আলোড়নের চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। সে চাঞ্চল্য জাতির অন্তঃসুপ্ত জীবনী-শক্তিকে কতকটা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু সেই জীবনীশক্তি সুপরিচালনা লাভ করিল না, কোনও গঠনমূলক জাতীয়ব্রতের সাধনা করিল না, কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র পাইল না। ইঞ্জিনে ষ্টীম হইল, কিন্তু গাড়ী চালাইবার পথ, শৃঙ্খলা ও গন্তব্যস্থানের স্থির হইল না। সুযোগ্য আশ্রয়ের অভাবে তাহা বিদেশীয় আদর্শ, মতবাদ ও তত্ত্ব-তথ্যগুলিকে অবলম্বন করিল মাত্র। সে জীবনী-শক্তি স্বাধীনভাবে কোনও মৌলিক সাধনায় বিনিয়োগ লাভ না করিয়া, ইউরোপের অনুচিকীর্ষাকেই প্রধান ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিল। জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই অনুচিকীর্ষারই প্রাবল্য, কোথাও মৌলিকতার প্রয়াস-চিহ্ন দেখা যায় না।

জীবনী-শক্তির উন্মেষ হইল, অথচ তাহা সুপথে পরিচালনা লাভ করিল না, তাহার যে কুফল, তাহা ফলিবেই। তাই জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে দেখি—উচ্ছৃঙ্খলতা, বিদ্রোহ, ভাঙ্গিবার বাসনা, গঠন-কার্য্যে অধীর হঠকারিতা, পূর্ব্বতনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং শক্তির অযথা অপব্যয়।

ইহারই ফলে বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলার সকলদিকেই দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, দেখা যাইতেছে। সাহিত্যেরও তাই দুর্গতি। আজকালকার অধিকাংশ লেখক বিদেশী বিদ্যাকে পরিপাক না করিয়াই তৎসাহায্যে সাহিত্য-রচনার চেষ্টা করেন। তাহাতে দুন্দুভিনিনাদ যতটা শোনা যায়, রসের বাঁশরী ততটা বাজে না। এ সাহিত্য বিদেশী সাহিত্যের এমনই অনুকৃতি যে, অনেক স্থলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয়—স্থানীয় আবেষ্টনী ও পরিস্থিতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ইহা পরগাছা মাত্র, দেশের মাটির সঙ্গে ইহার যোগ নাই; দেশের প্রাণ-রস ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলে না, ইহা প্রাণহীন উপদ্রব মাত্র। যে ভাষায় এই সাহিত্য রচিত, তাহাও খাঁটি বাঙ্গলা নয়, ইংরাজীতে ভাবিয়া তর্জ্জমা করিয়া লেখা। এ ভাষা প্রত্যেক লেখকের যেন নিজস্ব, যাহাকে তিনি নিজের ষ্টাইল ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। দেশের লোকের এ ভাষার সঙ্গে পরিচয় নাই।

সমালোচনা-সাহিত্যে যে কয়জন তথাকথিত ধুরন্ধরের সাক্ষাৎকার মিলে, রস-সাহিত্য-বিচারে তাঁহাদের যোগ্যতা দেখা যায় না। যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের বদহজমের ঢেঁকুর — যাহার বলে, তাঁহারা কোটেশন্ ও বচনের নজীরে ইহা অমুক হইল না, আর উহা, উহা না হইয়া যদি তাহা হইত, এই প্রকার স্পর্দ্ধিত পাণ্ডিত্যপ্রকাশক মন্তব্যের সাহায্যে সভা-সমিতিতে বাহবালাভের জন্য লালায়িত।

পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যরথিগণ বিদেশ হইতে ভাব, চিন্তা, আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশ হইতে লইয়াছিলেন সর্ব্ব প্রকার উপাদান, উপকরণ এবং তাহাদেরই সমন্বয়ে তাঁহারা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশের পক্ষে অপূর্ব্বই হইয়াছিল। তাঁহারা বিদেশকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু স্বদেশকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহারা বিদেশকে যতটা জানিতেন, তার চেয়ে ঢের বেশী জানিতেন, বেশী বুঝিতেন—স্বদেশকে। বিদেশী বিদ্যা তাঁহাদের অনুশীলনের বস্তু ছিল; কিন্তু স্বদেশী জ্ঞান ছিল তাঁহাদের গৌরবের ধন—প্রাণের সামগ্রী। স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে এই শোভন সামঞ্জস্য তাঁহাদের জীবনে ছিল বলিয়াই, সাহিত্য-সেবার মূলে একটা দেশ-প্রাণতা ছিল। তাই তাঁহারা প্রকৃত দেশীয় সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের মত খৃষ্টধর্ম্মী ষোল-আনা সাহেবের রচনার বিষয় মনে করিলেই আমার কথাটা, বোধ করি, আরও পরিষ্কার হইবে। তাঁহার নেকটাই ও কোটের নীচেও যে বাঙ্গালীর হৃদয় ছিল, তাহাতেই মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য-রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। তা' ছাড়া, দেশটা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এতটা বিলাতী হইয়া উঠে নাই।

আর আজকাল হইয়াছে ইহার বিপরীত। আজ-কালকার লেখকেরা আপনার দেশকে ভাল করিয়া জানেনই না, চিনেনই না। অতীত দূরে থাকুক, দেশের বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গেও তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় নাই;

দেশের সংস্কৃতির সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক নাই, দেশের জ্ঞান-সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, দেশের প্রতি মমত্ব-বোধই নাই; বিদেশের ভাবে, চিন্তায়, স্বপ্নে ইঁহারা যেন মুহ্যমান। ইঁহারা দেশের যে নাগরিক জীবনটুকুর খোঁজ রাখেন, তাহা বিদেশেরই স্বদেশী সংস্করণ মাত্র।

ইহার ফলে যে সাহিত্য রচিত হইতেছে, তাহাকে সাহিত্য বলা কঠিন। আর যদি তাহা এক শ্রেণীর সাহিত্যও হয়, বাঙ্গলায় লেখা হইলেও, তবু তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য নয়।

এখন কথা উঠিতে পারে, সাহিত্য হইতে হইলে কি দেশের নাড়ীর সঙ্গে—দেশের মাটির সঙ্গে যোগ থাকিতেই হইবে? ইউরোপের আদর্শে এক প্রকার সাহিত্য ইদানীং আমরা পাইতেছি, তাহার সঙ্গে কোন মাটীরই যোগ নাই—তাহাকে ব্যোম-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। সে সাহিত্য এদেশে ছিল না। আমি সে সাহিত্যের কথা বলিতেছি না। আমি সম্পূর্ণ রস-সাহিত্যের কথাই বলিতেছি। এ সাহিত্যের সহিত দেশের মাটীর নিবিড় সংযোগ চাইই ত—নতুবা তাহাকে প্রাণরস যোগাইবে কে? কোনও সাহিত্যকে জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইলে, দেশের মাটীর সঙ্গে তাহার যোগ থাকিতেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে একথাও বলি, এ যুগেও কোন কোন লেখক আছেন, দেশের মর্ম্মস্থলের সহিত যাঁহাদের যোগ আছে। কিন্তু কেবল এই যোগ থাকিলেই ত যথেষ্ট হইল না—প্রতিভা মাটী হইতে উঠে না। 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।' দেশের মাটী যদি এই প্রতিভাকে পুষ্টি দান করে, তবেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্ভব হয়। বর্ত্তমান যুগে তাহারই অভাব হইয়াছে। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাজনীতিক অবস্থা, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন, শিক্ষাবিভাগের পরিবেষ্টনী, কোনটাই এই প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-সাহিত্যের একটা স্থান হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের কিছুমাত্র লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৃপা করিয়া যাহাকে আশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা কখনও গৌরবের আসন লাভ করিতে পারে না। বঙ্গ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, পাঠ্য-নির্ব্বাচন, পরীক্ষাগ্রহণ, প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন, ডিগ্রী-বিতরণ—সমস্তই একটা উপেক্ষার সহিত সম্পাদিত হয়। দেশের বড় বড় শাখা—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, এমন কি মূল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাহিত্যের একটা পরিবেশ বা পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্বন্মণ্ডলী হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে কোন উল্লেখ-যোগ্য অবদান নাই। সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, ইতিবৃত্ত ও কুলপঞ্জী ইত্যাদির দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি। সেদিক্ হইতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের দান অধিকতর। রস সাহিত্যের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না।

পরীক্ষাসর্ব্বস্ব, নীরস, শুষ্ক শিক্ষা-বিভাগের প্রাণহীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ হওয়া যেমন কঠিন, প্রকৃত রসজ্ঞতা ও সাহিত্য-বিচারবুদ্ধির পরিপুষ্টি হওয়াও তেমনই কঠিন। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার সহিত সাহিত্যচেষ্টার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শিক্ষাক্ষেত্র সরস ও অনুকূল না হইলে, আজকার দিনে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের কোনও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সাধারণ পাঠক-সমাজ, সাময়িক্-পত্র-পরিচালক ও গ্রন্থ-প্রকাশকগণের তরফ হইতেও সাহিত্য-চেষ্টা কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করে না। দেশের যে অর্থ ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদে ব্যয়িত হয়, তাহার একাংশও যদি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলেও সাহিত্যের এ দুর্দ্দশা হয়ত হইত না।

সাহিত্যিকরাও মানুষ—সামাজিক জীব। তাহাদের গৃহ-সংসার আছে, জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রয়োজন আছে। দেশের লোক বা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান উদরান্নের চিন্তা হইতে যদি তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিত, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইত। কোন দেশেই সাহিত্যিককে উদরান্নের জন্য বিষয়ান্তরে শক্তি-সামর্থ্য, চিন্তা-চেষ্টাকে এমন করিয়া নিয়োগ করিতে হয় না। সারস্বত সেবাই তাহাদের লক্ষ্মীর করুণা-লাভের সহায়। এ দেশের সাহিত্যিকদের ডান হাতে উদরান্নের সংস্থানের জন্য শ্রম করিতে হয় আর বাঁ হাত দিয়া সাহিত্য রচনা করিতে হয়, ইহা অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন। জীবনের অধিকাংশ

শক্তি-সামর্থ্যই যদি জীবনসংগ্রামে ব্যয়িত হয়, তবে জীবনের মাধুর্য্য ফুটাইবার জন্য আর কি অবশিষ্ট থাকিবে? জীবনের মাধুর্য্যই বা আসিবে কেমন করিয়া?

সাহিত্যিকরা শুধু সামাজিক ও সাংসারিক জীব নহেন, তাঁহারা যুগধর্ম্মেরও অধীন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—ফলে, তাঁহারা বুনো রামনাথের বা লালন ফকিরের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য-রচনায় জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। যে স্বল্পে সন্তুষ্টি, যে অনাড়ম্বর রস-তন্ময় জীবনযাত্রা ভারতের সারস্বত সাধনার অঙ্গীভূত ছিল, এযুগে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। প্রাচীন যুগেও কোন কবিকে উদরান্নের জন্য শ্ববৃত্তি বা অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না। রাজ-রাজন্যগণই তাঁহাদের প্রতিপালক ছিলেন, শুধু প্রতিপালক নয়, তাঁহাদের প্রধান নর্ম্মসুহৃৎই ছিলেন। বৈষ্ণব সাধক-কবিগণ ছিলেন বৈরাগী; তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখি—মধ্যযুগের বাঙ্গলা ভাষার কবিগণ দেশের শ্রেষ্ঠ ভূস্বামিগণের বিদ্বৎসভা অলঙ্কৃত করিতেছেন। নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা লাভ না করিলে, সাহিত্য-সাধনা সার্থক হয় না, প্রতিভার স্ফুরণে বাধা জন্মে। বর্ত্তমান যুগে অন্যান্য দেশের লেখকগণকে অন্য কোন উপজীবিকা গ্রহণ করিতে হয় না, সাহিত্যই সে ভার গ্রহণ করে। বিদ্বৎ-সভা, রসজ্ঞ পাঠক সম্প্রদায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি লেখকদের জীবন-যাত্রার পথকে সুগম, নিরুপদ্রব ও ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সকল দেশই সাহিত্যকে জাতীয় সম্পদ্-স্বরূপ মনে করে; তাই এই জাতীয় সম্পদের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহাদের দুর্গতি দুঃস্থতা কোন দেশে এমন নাই।

স্রষ্টা হইতে গেলে, দ্রষ্টা হইতে হয়। গৃহ-বাতায়নে বসিয়া জগতের জীবন-যাত্রাকে নিবিষ্টচিত্তে ও তন্ময়-নেত্রে দেখিতে না পাইলে, সৃষ্টির উপকরণ কোথা হইতে আসিবে? স্রষ্টাকেও যদি জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্রের ক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য অহরহ উদ্ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্ভবপর হয় না।

এদেশে আর্থিক দারিদ্র্য অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক, আরও অধিক জ্ঞান-দারিদ্র্য—শিক্ষা-হীনতা। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। সাহিত্য যে আনন্দটুকু দেয়, তাহা অন্যান্য আমোদপ্রমোদ হইতে প্রাপ্ত আনন্দের তুলনায় সূক্ষ্মতর—এই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় আনন্দের জন্য অর্থব্যয় করিতে কয় জন প্রস্তুত? দেশে সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি এই সকল কারণে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। দুই এক জনের কথা বলিতেছি না, আমি সাধারণ ক্ষেত্রের কথাই বলিতেছি। সাধারণ নিয়মের দুই একটী ব্যত্যয় সর্ব্বকালেই সম্ভব; কিন্তু দুই একটি কোকিল ডাকিলেই ত আর বসন্ত-সমাগম সূচিত হয় না।

বলা বাহুল্য, এ যুগের লেখকেরা কেহই, বোধ করি, রাজরাজন্যের আশ্রয় চাহেন না। রাজরাজন্য বা বিশিষ্ট ধনী দেশে নাইও; আর যাঁহারা আছেন, পাশ্চাত্য প্রভাবে, তাঁহাদের বিলাস-ব্যসন অন্য পথে চরিতার্থতা কামনা করে। পরদত্ত বৃত্তির প্রত্যাশাও তাঁহারা করেন না, করিলেও তাহা দুর্লভ; কেননা, সরকার বা কর্ত্তৃপক্ষের সে প্রবৃত্তিই নাই। তাঁহারা চান, তাঁহাদের রচনা দেশের বিদ্বৎসমাজ সাদরে গ্রহণ করুক, গৃহে গৃহে তাঁহাদের গ্রন্থ বিরাজ করুক; লোকে যেমন বিলাস-ভূষণ, সাজসজ্জা, আমোদ-প্রমোদের জন্য কিছু কিছু ব্যয় করে, সাহিত্যের গ্রন্থাদির জন্য তেমনি কিছু কিছু ব্যয় করুক। কিন্তু ইহাও বোধ করি, দুরাশা—কেননা, সেরূপ রসিক পাঠকমণ্ডলীই বা দেশে কোথায়? অথচ এই পাঠক-চিত্ত ও লেখক-চিত্তের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে রসসৃষ্টিও সম্ভব নহে।

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি উঠে, তবে সে মর্ম্মর ফুটে।"

আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে সেই রসপরিবেশনেরও স্থান সঙ্কীর্ণ; কেননা, পূর্ব্বে যে আনন্দ-দান ও আনন্দ-গ্রহণের মধ্যে লেখক ও পাঠক চিত্তের রসপরিচয় সম্বন্ধ ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন পাঠক রসসৃষ্টির আনন্দে আর তৃপ্তি বোধ করে না, লেখকও তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় না। এখন শুধু পাঠকের কৌতূহলী মনের তৃপ্তির জন্য লেখককে কেবলই বিস্ময়রস যোগাইতে হয়—ফলে, সাহিত্যের মধ্যে সত্যকার আনন্দ বা সাহিত্য-

রস আদানপ্রদানের সম্বন্ধ বা অবকাশ নাই। এই সাধারণ সাহিত্য-বিমুখতার মধ্যে যাঁহারা বাকী রহিলেন, তাহাদের মধ্যে যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহাদের মন নাই; আর যাঁহাদের মন আছে, তাঁহাদের ধন নাই— গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করিতেই প্রাণান্ত, পুস্তক কিনিয়া পড়িবে কে? পড়িবেই বা কখন্?

সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমাদরের সঙ্গে জাতীয় জীবনের নানা শাখার এইরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সেই সকল শাখার শ্রীবৃদ্ধি হইলে, সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য শাখার আন্দোলনটাই বড় বেশী করিয়া চোখে পড়িতেছে, ফলসৌষ্ঠবের সেরূপ সূচনা দেখিতেছি না, ইহাই দুর্ভাগ্য।

পরিশেষে, একটী মাত্র কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সেই একটী কথায় শুধু সাহিত্য কেন, সকল কথাই এক সঙ্গে বলিবার চেষ্টা করিব। অগ্নির পক্ষে যেমন দাহকতা, জলের পক্ষে যেমন শীতলতা, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বও তেমনি তাহার সহজ ধর্ম্ম। এই মনুষ্যত্ব আজকাল বড়ই খর্ব্ব হইয়াছে, এমন কি দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, দশদিকে আপনা হইতেই তাহার প্রকাশ দেখা যাইবে। দশটা কবি, দশটা কর্ম্মী, দশটা বীর, দশটা শিল্পী তখন দেশের দশদিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তবেই দেশ বড় হইবে, দেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল হইবে। তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের সেই মনুষ্যত্ব-সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। এই মনুষ্যত্ব-সাধনার প্রধান উপকরণ প্রাণশক্তি বা পৌরুষ এবং দ্বিতীয় উপায় হইতেছে ধী-শক্তি বা বুদ্ধি। তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের এই প্রাণশক্তি ও ধীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। দেশের সাধনা, সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি অবহিত হইয়া তাহার নাড়ী ও ধাতুর সহিত সংযোগ রাখিয়া, তাহার পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া প্রথমতঃ আমাদের পৌরুষ-শক্তি জাগ্রত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আর্য্য ব্রাহ্মণের মতন বৈদিক মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হইবে—হে ভগবান, ধন চাহি না, মান চাহি না, দীর্ঘ জীবন বা অন্য কোন কিছু প্রিয় বস্তুতে আমার কামনা নাই; তুমি শুধু আমাদের সেই ধী-শক্তি দাও, যাহাতে আপনি চিন্তা করিয়া বুদ্ধি সহকারে আমাদের শুভ পন্থা আমরাই বাছিয়া লইতে পারি।

গান

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ দাশ

আমারে যখন ব'লেছিলে তুমি
তোমারে চাওয়া ভুল,
আমি যে তখন বহু দূরে হায়,
ফিরিবার নাই কূল।

ধ্রুবতারা জ্বলে দূর গগনে,
সাথীহারা মোর এমন লগনে,
সুন্দর চির সত্যেরে মনে
কেমনে করিব ভুল।

কূলেতে তোমার উঠি-উঠি যবে,
বলিলে ক'রো না আশা,
সাগর তখন উঠিল দুলিয়া
শুনিল না মোর ভাষা।

আঁখিতে তখন ভ'রে এল জল,
পদতলে তরী হ'য়ে গেল তল,
তখন ডুবে ডুবে বুঝি কূলখানি খুঁজি,
মু'ছে মু'ছে চলি ভুল।

বন্ধন ও মুক্তি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বৃদ্ধ নারাণ দাসের দিন বেশ কেটে যায়।

কেউ যে তাঁর নাই সে কথা তাঁর মনেই হয় না, কেউ যে কোনদিন ছিল তাও কোনদিন মনে পড়ে না। তিনি যেন একাই এসেছেন এবং একা দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

দিনগুলো কাটে বেশ,—শুধু বিষয়-কর্ম্ম—টাকাকড়ির হিসাব নিয়ে যায়। সকালে স্নান সেরে তাগাদায় বার হন, দুপুরে বাড়ী ফিরে যা হয় দুটো সিদ্ধ করে নিজে খান, আর একটা পোষা কুকুর আছে তাকে দেন। দুটি মাত্র প্রাণী নিয়ে সংসার। একটী মূক,—ভাষা প্রকাশে করে শব্দের দ্বারা, লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।

কাজকর্ম্ম করে পাড়ার মতির মা। তারও সংসারে কেউ নেই, আছে একটা বিড়াল আর তার তিনটী ছানা। তাদের নিয়ে সে মহা ব্যস্ত, তাদের খাওয়া দাওয়া—শোওয়া ঘুমানো—সব কিছু তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

তার দিকে তাকিয়ে নারাণ দাস মনে মনে কষ্ট পান; বেচারা বুড়োমানুষ, আপনার সব কিছু একে একে যমের হাতে সঁপে দিয়ে আবার কতকগুলো বিড়াল পুষে মায়ায় জড়ানো কেন?

মতির মাকে ডেকে বলেন—"বেড়ালের ছানাগুলো লোককে দিয়ে দেনা বাপু, বুড়ো বয়সে সব ছেড়ে আবার রাজা ভরতের মত মায়ায় জড়ানো কেন?"

মতির মা নিরুপায়ভাবে হাত কচলায়। বলে—"কি করি দাদাঠাকুর, ওদের উপলক্ষ্য করেই বেঁচে আছি, ওরা গেলে কি নিয়ে বাঁচব, কি নিয়ে থাকব?"

নারাণ দাস ভাবেন — বেচারা সংসারবদ্ধ জীব, — সমবেদনায় তাঁরও চোখ দুটি ছলছলিয়ে ওঠে। সেই মুহূর্ত্তে —মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর মনে জেগে ওঠে নিজের অতীত জীবনের কথা।

একটী মাত্র ছেলে,—বেঁচে থাকলে তার বয়স হতো সাতাশ বৎসর, এতদিন নাতি-নাতনীতে তাঁর ঘর ভরে যেত।

তখনই নারাণ দাস সচকিত হয়ে ওঠেন, মনে পড়ে যায়—জগন্নাথের কাছে সুদ সমেত সাড়ে সাত টাকা পাওনা, আজ সেই টাকা দেওয়ার দিন। ধড়ফড় করে উঠে তিনি ছাতাটা টেনে নেন, রং-ওঠা ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়াটা পায়ে দিয়ে দরজায় তালা এঁটে বার হয়ে যান।

নিশ্চিন্ত হয়ে অতীতের চিন্তা—নিজের চিন্তা করবারও সময় তাঁর নাই।

এই আত্মভোলা মানুষটীর স্কন্ধে শ্রীধর যে কেমন করে এসে পড়লো, সেই হচ্ছে জানার কথা।

বিন্দু বৈষ্ণবীর কাছে পাওনা ছিল সতের টাকা পাঁচ আনা সাড়ে তিন পয়সা; সেই টাকার তাগাদা করতে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বৃদ্ধ নারাণ দাস বুদ্ধিহত হয়ে গেলেন। যদি জানতেন বিন্দু সেই মুহূর্ত্তেই মরবে এবং মরার সময় ছয় সাত বছরের অপোগণ্ড ছেলেটার ভার ঘাড়ে চাপিয়ে যাবে তা হলে তিনি কখনই যেতেন না।

বিন্দু এক পয়সা দেনা শোধ করলে না, উল্টে ঘাড়ে চাপিয়ে গেল সেই অপোগণ্ড ছেলেটাকে,—তাঁর হাতের উপর ছেলের হাত রেখে কেঁদে বলে গেল, "ওকে যেন ছাড়বেন না বাবা, ও আপনারই কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।"

কি মুস্কিল—

পরের ছেলে নিয়ে নারাণ দাসের প্রাণ যায়। এক-দিনেই নারাণ দাসকে সে ছেলের প্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

বাড়ীতে এসেই শ্রীধরের কাজ হল কুকুরটাকে কারণে-বিনা কারণে প্রহার করা। বেচারা প্রভুভক্ত কুকুরটা পড়ে মার খায় আর কেঁউ কেঁউ করে চীৎকার করে পাড়াশুদ্ধ জ্বালাতন করে তোলে। অবশেষে একদিন সে ফোঁস করলে—অর্থাৎ দাঁত বার করে কামড়াতে গেল, সে দিন

হতে সত্যই সে ছাড়া পেলে। শ্রীধর বুঝলে এর পরে আর একে ঘাঁটানো ভালো নয়।

তারপর আরম্ভ করলে সে নব নব আবিষ্কারের ফন্দী। কোথায় ঘরের দেয়ালের মাথায় আচারটুকু তোলা থাকে, চৌকীর পর বাক্স রেখে তার উপর উঠে সে-সব শেষ করতে তার দুদিন দেরী হয় নি। দুধটুকু, চিনি, ঘি প্রভৃতি খেয়ে সে যেমন মোটা হতে সুরু করলে—দুশ্চিন্তায় অনাহারে নারাণ দাস তেমনি শুকিয়ে শীর্ণ হতে আরম্ভ করলেন।

কিছু বলতেও পারেন না — মৃত্যুশয্যা-শায়িনীর শেষ অনুরোধ,—যতদিন না শ্রীধরের বাপ বৃন্দাবন হতে ফিরে আসে, তাকে রাখতেই হবে। কিন্তু শ্রীধরের বাপ আর যে ফিরবে, সে আশা নাই।

বাড়ীর আবিষ্কার-পর্ব্ব শেষ করে, শ্রীধর পাড়ায় বার হল আবিষ্কারের চেষ্টায়।

নিত্য লোকের নালিশ—

কাণ ঝালাপালা হয়, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে পালাই পালাই ডাক ছাড়ে। সেদিন শ্রীধর মতির মার বিড়ালের ছানাগুলিকে যা নাকাল করেছিল, তাতে মতির মার কান্নায় পাড়ার লোক জ্বালাতন হয়ে উঠেছিল।

দিনের পর যত দিন যায়, নারাণ দাস ততই লোকের কথা শুনতে পান।

নাঃ, এ আপদ্ ছেলে নিয়ে তো বড় দায় হলো। কোন রকমে এর বাপের সন্ধানটা পেলে পাঠিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যায়।

তিনি লোককে বলেন, "এইবারই ওকে বিদেয় করবো দেখে নিয়ো, নারাণ দাসের ঘরে আর ওর জায়গা হচ্ছে না। যেখানে খুসী মরুক গিয়ে, আমার কেন এ ভার বওয়া—?"

পাড়ায় পাড়ায় দুষ্টামী করে শ্রীধর যখন ঘোরে, তখন উভয়েরই ভিন্ন মূর্ত্তি।

নারাণ দাস ঘন করে দুধ জ্বাল দিয়ে রাখেন, শ্রীধর চুমুক দিতে দিতে অসন্তুষ্ট সুরে বলে, — "দিন দিন যেন তুমি কি হচ্ছো দাদু, দুধে একটু চিনিও দাওনি। জানো—আমি মিষ্টি না হলে খেতে পারি নে—"

নারাণ দাস সঙ্কুচিত হয়ে বলেন, "তাই তো, ভুলে গেছি ভাই, আচ্ছা, কাল বেশী করে চিনি দেব।"

ভাত খাওয়ার বেলাও তাই—

আজকাল পাঁচখানা তরকারী রাঁধতে হয়, নইলে শ্রীধরের খাওয়া হয় না। তাতেও তার অসন্তোষের সীমা নাই: এ তরকারী ভাল নয়, ঝাল বেশী—নুন কোনদিন বেশী - কোনদিন কম—ইত্যাদি নালিশ করে। নারাণ দাস সচকিত হয়ে ওঠেন, তার পরদিন ভাল করে রাঁধার অঙ্গীকার দেন।

মুক্ত জীব নারাণদাসের সকালে আর কাজে যাওয়া হয় না, শ্রীধরের ফরমাস মত রান্না করতেই সময় কাটে। পরের ছেলের জন্য জ্বালাও পোহাতে হয় বড় কম নয়। কোথায় কার কলসীতে ঢিল মেরে ভেঙ্গে দিয়েছে; কার গাছের কুমড়ো নষ্ট করেছে, কার কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে,—এসব ক্ষতিপূরণ করতে নারাণদাসের বহু কষ্টে সঞ্চিত টাকা বার হয়ে যায়।

রাত্রে শ্রীধরকে গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়িয়ে তার বিছানার পাশে বসে তামাক খেতে খেতে নারাণ দাস উচ্ছ্বসিত ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করেন, আর নয়, — পরের ছেলের জন্যে নিজের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট—আর নয়। কাল সকালেই তিনি তাকে দূর করে দেবেন, আর পাঁচখানা রেঁধে খাওয়াবেন না।

কিন্তু দেখা যায়,—তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন, রাত্রের প্রতিজ্ঞা আর নেই।

শ্রীধরের গুণ্ডামীর জন্য তাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়া হল—তবু যা হোক সমস্ত দিনটা আটকা থাকবে তো!

বেলা তিনটার আগেই শ্রীধর গম্ভীরমুখে বাড়ী এসে বই শ্লেট রেখে বার হয়ে গেল, বৈকাল বেলা গুরুমশাই এসে নালিশ করলেন।

এমন দুর্দ্দান্ত ছেলেকে তিনি কিছুতেই পাঠশালায় রাখবেন না। বাপরে, আজ তাঁকে যা নাকাল করেছে, তা বলবার নয়। পাঠশালাশুদ্ধ ছেলের সামনে তাঁর মাথায় গাধার টুপি পড়িয়ে এক গালে চূণ আর এক গালে কালি মাখিয়ে সে যা কাণ্ড করেছে—

বলতে বলতে গুরুমশাই প্রায় কেঁদে ফেললেন আর কি!

শ্রীধরের পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হল, তার আনন্দ দেখে কে? সদম্ভে সকলের কাছে সে বলে বেড়াতে লাগলো—"কেমন জব্দ করেছি, আর আমায় পড়তে বলতে হবে না।"

কুকুরটার সঙ্গে তার অপরিসীম সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়েছে; কারণ খাবার ভাগ সে পায়। ছায়ার মত সে শ্রীধরের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে; শ্রীধর কারও ওপর বিরক্ত হলে তাকে লেলিয়ে দেয়, সেও দারুণ প্রভুভক্তের মত আদেশ পালন করে। সেদিন প্রসন্ন ঠাকুরের ছাগশিশুর গলা ছিঁড়ে দিয়েছে, আর একদিন ভশ্চায মশাইকে রীতিমত দৌড়াতে হয়েছে, আছাড় খেতে হয়েছে।

বড় বিরক্ত হয়ে নারাণ দাস তার বাপের খোঁজ করতে লাগলেন এবং ঠিকানা সংগ্রহ করে তখনই একখানা পত্র লিখে দেবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়লো শ্রীধরের পিতা,—বিন্দুর স্বামী সনাতন। নিজের পরিচয় দিয়ে সে দাঁড়ালো।

নারাণদাস অত্যন্ত সচকিত হয়ে উঠলেন। শ্রীধরের পিতা যে সত্যই আসবে, এ আশা তিনি মোটেই করেন নি। লোকের কাছে শ্রীধরের দুষ্টামীর সময়ে বার বার তার পিতার কথা বললেও তিনি ঠিকই জানতেন—সে আসবে না।

সনাতন শ্রীধরকে নিয়ে যাবে—

কিন্তু শ্রীধর একেবারে বেঁকে বসলো—সে যাবে না। যাকে সে চেনে না, তার সঙ্গে সে যেতে রাজি নয়।

কে তার কথা শুনবে?

শুষ্কমুখে নারাণ দাস বলিলেন, "তোকে যেতে হবে বই কি শ্রীধর, তোর বাবা এসেছে—"

শ্রীধর গর্জ্জন করে বললে, "আমি যাব না—কক্ষনো যাব না—"

অন্তরের কোথায় যে গভীর বেদনা বাজছিল তা নারাণ দাস বুঝতে পারলেন না, তবু মুখে ধমক দিয়ে বললেন, "যাবিনে বই কি, আমার হাড়মাস জ্বালাতে এখানে থাকবি তো? তোকে যেতেই হবে—কে তোর জন্যে খাটবে—পিণ্ডি সেদ্ধ করে খাওয়াবে শুনি—?"

শ্রীধর সোজা উত্তর দিলে,—"কেন, তুমি—?

রাগ করে নারাণ দাস বললেন, "তুমি যে আমার স্বর্গে বাতি দেবে কিনা, তাই আমি তোমার পিণ্ডি সেদ্ধ করব—তোমার আবদার সইব—না—?"

শ্রীধর ছল-ছল চোখে শুধু চেয়ে রইলো।

শ্রীধর চলে গেল।

আশ্চর্য্য—নারাণ দাস ভেবেছিলেন শ্রীধর গেলে তিনি মুক্তি পাবেন, এতে তাঁর খুব আনন্দ হওয়ার কথা, কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে আর ঢুকতে পারা যায় না, সব যেন শূন্য হয়ে গেছে। কুকুরটা পর্য্যন্ত থেকে থেকে সেই অশান্ত দুষ্ট ছেলেটার জন্য এমনভাবে কাঁদছে যা শুনে নারাণ দাসের চোখে পর্য্যন্ত জল আসে।

জোর করে তিনি তার কথা ভুলতে চান—

সমস্ত গ্রামখানা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ভশ্চায মশাই নারাণ দাসকে ডেকে বললেন, "ছেলেটাকে দিলে কেন নারাণ? অমন বয়সে সবাই দুষ্ট থাকে; আর এক বছর পরে ওকে দেখে আর চেনা যেতো না—এমন শান্ত হয়ে যেতো।"

রেঁধে যে খেতে হবে, সে কথাও নারাণ দাসের মনে হয় না। কেবল কুকুরটার কান্নায় তাঁকে আবার ভাত চড়াতে যেতে হয়।

রাঁধতে বসে মনে হল—সে নাই। দীর্ঘ দুইটী বৎসর ধরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে যার অত্যাচারে পাগল হয়ে যেতে হতো—সে চলে গেছে। আজ তিনি যত বেলাতেই

রাঁধুন, যতই রাঁধুন বা নাই রাঁধুন, কেউ বিরক্ত করবে না।

আস্তে আস্তে তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো।

• একি করলে ভগবান—নিজের সব যমকে দিয়ে পরের ছেলের জন্য তাঁর এ মনোকষ্ট কেন? সে তাঁর কে,—কেউই তো নয়।

কুকুরটাকে ভাত দিলেন; সে একটা ভাতে মুখ দিলে না, আকাশের দিকে মুখ তুলে ভৌ ভৌ করে কাঁদতে লাগলো।

নারাণ দাস ভাত ফেলে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লেন—

কে জানে সে এখন কতদূরে—কোথায় যাচ্ছে? এতক্ষণ ক্ষুধায় ছটফট করছে, তার পিতা খেতে দেবে কি না কে জানে? সে তো জানে না শ্রীধর কখন খায়—কি খায়?"

"দাদু—"

কে রে—কে ডাকে?

ধড়ফড় করে নারাণদাস উঠে বসলেন দরজার পাশে শ্রীধরের মুখখানা দেখা গেল—

"শ্রীধর—"

তিনি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, "তুই না চলে গিয়েছিলি—কি করে এলি—?"

শ্রীধর দুই হাতে চোখ ঢাকলে—"আমি পালিয়ে এসেছি দাদু—"

বলতে বলতে নারাণদাসের বুকের মধ্যে মুখখানা রেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলো, তোমার পায়ে পড়ি দাদু, আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি দেখো আমি এখন হতে খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকব, লেখা পড়া করব, তোমায় একটুও বিরক্ত করব না—তুমি যা বলবে তাই শুনব। আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না দাদু, আমি আর তোমায় ছেড়ে যাব না।"

তার কপালের উপর মুখখানা রেখে সজল চোখে রুদ্ধ-কণ্ঠে নারাণ দাস বললেন, "সত্যি তোকে আর পাঠাব না শ্রীধর, কারও কাছে তোকে দেব না। তোর মা আমার কাছে তোকে দিয়ে গেছে, আমি তার দেওয়া জিনিষ বুকে করে রাখব।"

উভয়ের চোখের জল একত্রে মিলে গেল।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ভোরের শিশির নীরে
ফোটায়ে ফুলের মেলা
কে তুমি চলেছ ফিরে?

কে তুমি ঘুমের দেশে
আসিয়া রাতের শেষে
নয়ন চুমিয়া মোর,
আনিলে আলোক তীরে

অতনু-তনুর লাগি'
সোনালী স্বপনে মোর
বেদনা উঠিল জাগি'।

কে তুমি প্রভাত বেলা
খেলিয়া এমন খেলা
আঁখির পলকে হায়
রহিলে অলখ ঘিরে।

মার্ক্‌সবাদ, রাষ্ট্রধর্ম্ম ও ভারতবর্ষ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

আধুনিক যুগ লাল পতাকা উড়িয়েছে। এই পতাকার উত্থান-পতনের সঙ্গে ইউরোপের অসীম কল্পনা ও সাধনার ইতিহাস জড়িত। ইউরোপের ইতিহাসে লাল পতাকার জন্ম এ যুগে হয়নি—তবে এবার লালতত্ত্বের আরও দুটি চেহারা বেরিয়েছে—একটি ব্রাউন, অন্যটি কাল। নাজি জর্ম্মন ব্রাউনের ভক্ত—ফ্যাসিষ্ট ইতালী কালোর রূপে মশগুল হয়েছে। এই ত্রিমূর্ত্তির সংহত ভঙ্গী একটা ঐক্যের প্রতিপাদক। সে ঐক্য আধুনিক সংহতাত্মক (totalitarian) রাষ্ট্রবিধির মূল প্রতিপাদ্য হয়েছে।

এই ব্যবস্থার সহিত বিশেষতঃ এই তত্ত্বের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি সম্ভব? ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যের বর্ত্তমান বিরাট্ রিক্ততা ইদানীং গোল গম্বুজের ন্যায় একটা প্রতিধ্বনির মৌচাক সৃষ্টি করেছে। ইউরোপের সব আওয়াজই এখানে বেজে উঠে। এই যন্ত্র-যুগের শিক্ষাকেন্দ্র-গুলিতে ইউরোপের কলই কাজ করছে। কাজেই এই অবস্থায় ইউরোপের প্রতিটি আন্দোলনের একটি মুখর প্রতিরূপ এদেশে সহজেই বিম্বিত হচ্ছে।

ইউরোপের সমষ্টিবাদ (socialism) বহু কালের ব্যাপার। ম্যাকস বিয়ার (Max Beer) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে ইংরাজীতে 'সোসালিষ্ট' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। সুইস ভাবুক সিসমণ্ডি (Sismandi) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'অর্থ-নীতিক নূতন তত্ত্ব' নামক যে বই বাহির করেন তাতে "Surplus value"-তত্ত্ব প্রথম বিবেচিত হয়। এই তত্ত্ব কার্ল মার্কস-এর 'Das Capital' বইর মেরুদণ্ড স্থানীয়। তা' ছাড়া ফরাসী ভাবুক 'প্রুধোঁ' (Proudhan) একখানি বই লিখে তার নাম দেন, "What is property?" এর উত্তর দেওয়া হয়েছে "Property is theft"! এই রকম একটা ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে ইউরোপের যন্ত্রযুগের আয়োজনের মধ্যে। যন্ত্রযুগের বিরাট আয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র বিধি ব্যবস্থা ও তত্ত্ববাদকে হতশ্রী করে' দেয়। সমগ্র ইউরোপই একটা নূতন শক্তির সঙ্গমে আত্মভোলা হয়ে যায়। রুসোর 'সাম্য', 'মৈত্রী', 'স্বাধীনতা' 'সামাজিক চুক্তি' প্রভৃতি কল্পনা একটা নব্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে' ইউরোপীয় সমাজকে মথিত ও রক্তাপ্লুত করে—এর পরিণাম একটা বিরাট আহুতিতে পরিণত হয়। অন্নের জন্য যেখানে কারখানার দ্বারের সামনে দাঁড়াতে হবে—সেখানে সাম্যবাদের কলরব কাজ এগিয়ে দেয় না। কাজেই এসে পড়েছিল একটা নূতন অবস্থা যার কোন কূল পাওয়া যাচ্ছিল না।

অপরদিকে যন্ত্রসংগ্রহ দানবীয় গ্রাসে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়। রাজার অত্যাচার দূর হয়েছিল বটে—সম্রাটের গ্রীবাচ্ছেদ যা' একদা সহজ করে' তুলেছিল, এ যুগে তাকে সহজ করা সম্ভব হয়নি। অসংখ্য কল-কারখানার সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীময় সে সব দ্রব্যের বিক্রী ও বিস্তারের চেষ্টা নূতন দানবীয় শক্তির উদ্বোধন করে' সমগ্র পৃথিবীকে পীড়িত করা হয়। ক্রমশঃ সব জায়গায় সৃষ্টি হল ট্রাষ্ট (Trust) প্রথা ও জর্ম্মনীতে কার্টেল (Cartel) প্রথা। এমনি করে' একটা জগজ্জয়ী দানব ভূমিষ্ঠ হল।

ঠিক দানব বলে' গোড়ায় এ ব্যাপারকে কেউ মনে করেনি। সমগ্র ঘটনা-পরাম্পরকে ভাল করে' তলিয়ে দেখতে অনেক সময় লেগেছে। নানাভাবে ছিটেফোঁটা আক্রমণ হতে সুরু হয়ে ক্রমশঃ ভেদবুদ্ধি এর ভিতর শনির রন্ধ্র খুঁজে বের করে। ফরাসী ভাবুক পিয়ার লেরু (Pierre Leroux) এই সূত্রে সমাজের ভিতর দু'টি বিসম্বাদী শ্রেণী আবিষ্কার করেন—একটা হল 'বুর্জ্জয়া' অন্যটি হ'ল 'প্রোলিটেরিয়ট'। প্রথমের কাজ হ'ল কাজে নিযুক্ত করা, দ্বিতীয়ের হল কাজে নিযুক্ত হওয়া। ক্রমশঃ প্রুধোঁ (Proudhon) প্রভৃতি ভাবুকেরা এই ভেদের দিকটা উৎকট করে' তোলে। ধনী ও শ্রমিকের অহরহ একটা যুদ্ধ চলেছে, এ রকম একটা চিন্তার কৃত্রিম উদ্বোধন ও-দেশে লক্ষিত হচ্ছে।

তিন ফুট উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে অঙ্কিত তীরন্দাজের ছবি

পর্ব্বতগাত্রে অঙ্কিত বৃহদাকার নৃত্যশীলা নারীর চি
মস্তকগুলি ঈজিপ্সীয় ধরণের

মধ্য-সাহারার প্রাগৈতিহাসিক চিত্র

মধ্য-সাহারার অন্তর্গত হোগার গিরিমালায় ('গ' শৃঙ্গ) অঙ্কিত বিচিত্র জীবজন্তুর চিত্র। ছবিগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু বর্ণের সমাবেশে চিত্রিত। উপরের পুঞ্জীভূত গোচিত্রসমন্বিত প্রাচীর চিত্রখানির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ফুট ও প্রস্থ ৫ ফুট হইবে।

এই শ্রেণীর চিন্তা ও ভাব ক্রমশঃ ইউরোপীয় সাহিত্যকেও আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু কার্ল মার্কসের আগে এসব চিন্তা-সংগ্রহকে বিধিবদ্ধ করে' একটা তত্ত্ব হিসেবে কেউ উপস্থিত করতে পারেনি। এরকম একটা অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করে' মার্কস সমগ্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অমরত্ব দান করে। ভাবজগতে যত দিন একটা পরিপূর্ণ তত্ত্বের সহিত কোন চিন্তাধারাকে সমন্বিত করা না যায়—তত দিন তা'র কোন গুরুত্ব হয় না। ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বদখেয়ালীর বাজে বকা অপেক্ষা উচ্চতর মর্য্যাদা সে সবকে দেওয়া যায় না। ফলে বহুকাল এ রকম ব্যাপার চল্‌ছিল। ইদানীং নব্য ইউরোপের ভাবধারার প্রবর্ত্তকরূপে 'মার্কস' তত্ত্ব আলোচনার বিষয় হয়েছে।

কিন্তু মুখ্য বিষয় হচ্ছে—এই তত্ত্বের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণগুলি আলোচনা করা। তাতে করে' ইউরোপের ভাবের গবাক্ষকে খোলা হবে। শুধু ইউরোপীয় দর্পণে এই তত্ত্বের বিচার করলে কোন সত্যেই উপস্থিত হওয়া যাবে না। সত্য কোন দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ বস্তু নয়। কোন বিশিষ্ট আবেষ্টনে রেখে যে জিনিষকে বিরাট্ বা মহৎ মনে হয়—অন্য আবেষ্টনে তা' একান্তভাবে অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। ভারতবর্ষের আধুনিক আলোচকগণ সাধারণতঃ দেখা যায় ইউরোপীয় ভাবুকদের সব premiss-গুলি মেনে নিয়ে ওদের তালে কথা বলে' থাকে—তার বাইরে একটি পা'ও এগিয়ে দিতে জানে না। ফলে অতি প্রশংসার প্রতিধ্বনি বা ইউরোপের মানসিক উচ্ছ্বাসের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য ক'রেই কাজ শেষ করতে হয়।

এদেশের দ্বিতীয় পথ হ'ল ইউরোপের সব কিছুকেই ভ্রূকুটি করে' তিরস্কার করা। যুক্তির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে সক্ষম না হয়ে 'উপনিষদ' বা 'বৌদ্ধ-মতবাদে'র দু'-একটি উক্তি উদ্ধৃত করে সে সবকে জগদ্দল পাথরের মত দুনিয়ার মতের উপর অন্ধভাবে চাপান। এ রকম অকিঞ্চিৎকর চেষ্টাই আধুনিক ভারতের দীনতা inferiority complex) প্রমাণ করে। এখনও অন্ধ-সংস্কারকের প্রেরণা এদেশে প্রচুর।

বর্ত্তমানে দেখা যাচ্ছে একদিকে ইউরোপের সাম্যবাদ, সমষ্টিবাদ ও যন্ত্রবাদ (Industrialism, Socialism) প্রভৃতির জয়ধ্বনি সুরু হয়েছে কংগ্রেসের মঞ্চ হ'তে—অন্যদিকে 'অহিংসবাদ', 'উপবাসবাদ', 'কৌপীনবাদ' (loin cloth philosophy) 'অহিংস অনশনবাদ' ও 'আরণ্যযুগবাদ' (neolithic idealism) সুরু হয়েছে সেই তক্ত হ'তেই। এ বিপরীত বিধানগুলির ভিতর কি কোন সাম্য বা সমানধর্ম্ম আছে? এই খিঁচুড়ীকে জীবনের সত্যে পরিণত করা কি সম্ভব? নানা দেশের, নানা কালের ও অবস্থার উক্তির কতকগুলি মুণ্ডমালা গেঁথে কি সে-সবকে ঐক্য দেওয়া যায়? ভাবে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা না করলে—কাজে ঐক্য সম্ভব হয় না—সে সব আত্মবিরোধী ও আত্মঘাতী হয়।

সমষ্টিবাদ যাদের প্রাণের বস্তু তাদের অহিংসবাদের বড়াই করা চলে না। তেলে জলে মিশ খায় না। একথা ভুলে যাওয়া হয় যে তুরীয় তত্ত্ব কারও ব্যক্তিগত খেয়ালকে মেনে চলে না। সৃষ্টি ও সংহার একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ। সংসারের প্রতি অণুর ভিতর প্রকাশের যে প্রেরণা তা মৃত্যু ও ধ্বংসের তালে অগ্রসর হচ্ছে। বিরোধই সৃষ্টি। শুধু subject নিয়ে দুনিয়া হয় না—objectএর সহিত প্রতিসংস্পর্শ না হ'লে ইন্দ্রিয়ের বা তন্মাত্রের পাদপীঠে তা আসে না। চিন্তায় এই বিরোধ হচ্ছে Thesis ও Antithesisএর সঙ্ঘর্ষে—জীবন ও সৃষ্টির প্রতিচ্ছন্দে অহরহ প্রলয়ের বীণ বাজছে। সংহার না হ'লে সৃষ্টি হয় না—প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব সংহারের ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিকাশ সম্ভব হচ্ছে—এক্ষেত্রে 'কোণঠ্যাসা', 'কৌটোয় পুরা' 'তকমা-তাবিজে লিখা' অহিংসার স্থান কৈ? আমার হুকুমে কি সমুদ্রের অনিদ্র তরঙ্গ রুদ্ধ হবে? চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোক হয়েও অশোকবংশকে ধ্বংস হ'তে রক্ষা করতে পারে নি। তুরীয় ধর্ম্মের জলধিতরঙ্গকে কে প্রতিরোধ করবে? বুদ্ধদেব বৃক্ষতলে ধ্যানযুক্ত হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রমের যে মন্ত্র পেয়েছিলেন তা'ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে—মৃত্যুকে স্বীকার করে'। সব কিছু নির্ব্বাপিত করার মূলে আছে তুরীয় ধর্ম্মের বহুমুখী রসরূপের অস্বীকৃতি। ফলে সমগ্র ভারত

হ'তে বৌদ্ধবাদ অন্তর্হিত হয়েছে। জগতে তার যতটুকু আছে তা' রয়েছে মহাযানের প্রভাবে। মহাযানবাদের প্রেরণা তান্ত্রিক শক্তিবাদ হ'তে গৃহীত। বস্তুতঃ বুদ্ধের qutetistic attitude পরবর্ত্তী যুগে বর্জ্জিত হয়। বুদ্ধশক্তি প্রজ্ঞার সংযোগে এই অঘটন ঘটন সম্ভব হয়। শুধু তা' নয়—বৃক্ষতলে সমাসীন অচল তপস্বী বুদ্ধ, সচল পঞ্চবুদ্ধরূপে কল্পিত হন—এবং প্রত্যেকেই শক্তিযুক্ত হন। শক্তিযুক্ত হওয়ার মানেই antithesisএর আরোপ—নির্গুণ, নির্ব্বিকার ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা নয়। এমনি করে' চীন ও জাপানে এই তান্ত্রিকবাদ (Tantric Philosophy) একটা বিপুল কর্ম্মবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে' তুরীয় সত্যদর্শনকে সাময়িক রাহুগ্রাস হ'তে মুক্ত করে।

ভারতবর্ষে এই ব্যতিরেকী তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্বয়ী সমর্পণতত্ত্ব বা মুখ্য সমন্বয়বাদ (Synthesis) কাজ করেছে। এই তত্ত্ব বহুস্থলে বিরোধবাদের গ্লানির উপর প্রলেপ দান করেছে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ হিংসা বিষয়ক ছুঁৎমার্গের সম্বন্ধে কোন লঘু Sermon দেন নি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, "যে মনে করে সে কাকেও হত করছে এবং যে মনে করে সে হত হচ্ছে — তারা দু'জনেই ভুল করছে — এটা আমারই যাতায়াতের বঙ্কিম ধারা।" এক মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ একটা অনিবার্য্য ও সহজ তুরীয় বিধিকে এমন একটা পাদপীঠে স্থাপন করলেন যাতে করে এর সমস্ত তিক্ততা, গ্লানি ও সামান্যতা দূর হয়ে গেল। অন্বয়ী বিধির প্রসঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'সব কিছু ত্যাগ করে' আমার শরণ লও'। এই সমর্পণের তত্ত্ব subjectএর ভিতর objectএর বিলীন হওয়া। অনাদ্যন্ত তুরীয় সংহরণের অখণ্ডশ্রীকে বার বার ইহাই উদ্ঘাটিত করে।

ইউরোপ ব্যতিরেকী সাধনার ভক্ত। ইউরোপে মধ্যযুগের (Middle Age) জনসমাজ খ্রীষ্টীয় সামাজিক বিধির প্রাথমিক আত্মসমর্পণকে মেনে চল্‌ত। রাজার ও ধর্ম্মযাজকগণের বিধিকে মেনে চলাই সে যুগের বিশেষত্ব ছিল। যাকে 'Renaissance' বা সমুত্থান বলা হয়, কারও মতে তা 'পতনের' ধর্ম্মেই অনুসিক্ত। কারণ এযুগে প্রতিবাদ ওঠে—বিরোধ জাগ্রত হয় এবং সমগ্র সমাজ রূপান্তরিত হয়। ইহা লক্ষ্য করে' কোন ইউরোপীয় ভাবুক উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, "Eyes were turned from Heaven to Earth"। Heaven-এর সহিত Earth-এর বিরোধ কল্পনা' Spiritএর সহিত Matterএর সঙ্ঘর্ষ চিন্তা এ যুগে বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠে। এটা হ'ল নেতিমূলক বা ব্যতিরেকী মনোভাবের সূচনা। বস্তুতঃ ইউরোপের খ্রীষ্টীয় বিধিও একটা বিরোধের উপর নিহিত ছিল। বাইবেলে আছে—Spirit is life, flesh is death"। Matter ও spirit-এর এই বিরোধ-কল্পনা—যা ভারতীয় তত্ত্বে সমীকৃত হয়েছে—তা বহুকাল হ'তেই ইউরোপীয় চিন্তাধারার মেরুদণ্ডরূপে কাজ করছে। এজন্যই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে "the greatest negative religion on earth" বলা হয়েছে। এই নেতিমূলক ধর্ম্ম ইউরোপের নেতিমূলক তত্ত্বের রক্তসঞ্চার করছে।

ফলে বার বার এই একই তত্ত্ব ও মনোবিহার নানা সাময়িক ঘটনা ও অনুষ্ঠানে নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। মার্কস্‌বাদও ইউরোপের মনস্তত্ত্বের এই বিশিষ্ট ছন্দ প্রমাণিত করে। কাজেই যারা মনে করে, এযুগে চল্‌ছে বলে এ তত্ত্বটা ইউরোপের চরম কথা—তারা কিছুকাল পরেই দেখতে পাবে, ইউরোপ আবার নূতন পথে চলেছে। কিন্তু ইউরোপের মনের 'তাল' এক—ইঙ্গিত ও ভঙ্গী এক—ভিতরকার প্রেরণা একই ভাবে চল্‌ছে।

বস্তুতঃ ইউরোপ সত্যকে নেতিমূলক বিধিতে গ্রহণ করে। 'নেতি' 'নেতি' বল্‌তে গিয়েও ইতির খবর পাওয়া চলে। ইউরোপ Vogue বা ফ্যাশনের অহরহ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। আজ যা' ভাল কাল তা' বর্জ্জিত হচ্ছে। আজ romanticism, কাল classicism তারপর হয়ত Symbolism বা Expressionism এমনি ভাবে 'এটা নয়' 'এটা নয়' নেতি নেতি করে' ইউরোপের ভাবের জাহাজ বোঝাই হচ্ছে নূতন নূতন বন্দর ঘুরে'। ইউরোপ নিত্য নূতনের পক্ষপাতী এইজন্য। সত্যের বিশ্বরূপ ইউরোপ এমনি ভাবে পায়। তাই দর্শন, কাব্য ও কলা অহরহ পুরাতনকে বর্জ্জন করে' নূতনকে গ্রহণ করে থাকে। এই হ'ল ইউরোপের 'mood'।

এই 'mood' ইউরোপকে অগ্রগতি দান করছে বার

বার। কার্ল মার্কস ইউরোপের এই অন্তর্নিহিত তত্ত্বই উদ্ঘাটিত করেছে এক নূতন পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে।

যারা খণ্ডভাবে মার্ক্সের চিন্তাধারাকে অধ্যয়ন করে—তারা জানে না ইউরোপের অগ্রগতির ছন্দ কি? ফরাসী বিপ্লব যে বিরোধকে একদিন জাগ্রত করে, সে বিরোধের আলম্বন আর নেই। অনেক রাজার মুণ্ডপাত করা হয়েছে সেই যুগসন্ধিতে, তবুও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই বিংশ শতাব্দীতেও অনেক Kaisar ও Czar মুকুট হারিয়েছে কিন্তু তারপর? কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করতে এবার কিছু দেরী হয়েছে। ঝগড়া বিরোধ ও সংগ্রামের উপলক্ষ্য অনেককাল খুঁজে পাওয়া যায়নি—যদিও ছুতো বের করা হয়েছিল অনেক। সত্যিকার লড়াইর ভোজদণ্ড আবিষ্কার করে' কার্ল মার্কস ইউরোপে অমর হয়েছে। একথা ভুললে ইউরোপকে একটা সার্ব্বভৌম দিক হ'তে দেখা হবে না।

কার্ল মার্কসের গুরু হচ্ছেন হিগেল। হিগেলের অনুখ্যাত ভাববিধি (dialectic) নিয়ে ইউরোপ গৌরব করে। হিগেলের মতে প্রত্যেক জ্ঞানের মূলেই একটা বাদ, ও প্রতিবাদ আছে এবং এ তুটির সম্মিলনে একটা নূতন সংবাদ সৃষ্ট হয়। একে Thesis, Antethesis ও Synthesisএর প্রক্রিয়া বলা হয়। আমাদের যা কিছু জ্ঞান সবই একটি নেতিমূলক আবেষ্টনেই পরিপক্ক হয়। 'বৃক্ষ কি' এ কথাটি 'বৃক্ষ কি নয়' জানার উপর নির্ভর করে। এমনি করে' হিগেল ভাবের রাজ্যের একটা গুপ্তছন্দ আবিষ্কার করে—যা' ইউরোপীয় তত্ত্বের ইতিহাসে একটা যুগসত্য (land mark) বলা চলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় আলোচকেরা এই dialectics-এর সার্থকতা ও দুর্ব্বলতা ধরতে পারেন নি। এটা এদেশের ব্যতিরেকী বা নেতিমূলক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। এটা শেষ প্রথা বা একমাত্র প্রথাও নয়। হিগেল শুধু ইউরোপের প্রকৃতি ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করে'ই এই বিধিকে পেয়েছেন। ইউরোপের সমগ্র প্রগতির ইতিহাসই এই বিরোধপ্রবণতার উপর নিহিত—কাজেই হিগেল অজ্ঞাতসারে এতে ইউরোপের মনোদর্পণই নগ্ন করেছেন—বিশ্বের নয়। তা ছাড়া কোন তুরীয় পরম বিধির শেষ প্রশ্নের মীমাংসা এতে নেই বলে তত্ত্বপীঠ ভারতবর্ষে ইহা চরম তত্ত্ব বলে স্বীকৃত হবে না।

হিগেল ভাবুক ছিলেন—ভাবরাজ্য ছিল হিগেলের জগৎ। কাজেই এই antithesis-এর বার্ত্তা তিনি ধরলেন চিন্তা জগতে। মার্কস উচ্চতম সত্যের ভাবুক নয়, অরূপ তাত্ত্বিকও নয়। মার্কসের খেলাধুলা ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আয়োজন ও আন্দোলনের ভিতর। হিগেলের মৌলিক গবেষণা বা স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেরণার দাবী মার্কস্ কিছুতেই করতে পারেন না। হিগেলের ভাবের কাঠামো (frame work) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী প্রুধোঁ, সিসমণ্ডি প্রভৃতির মালমশলা যোগ করে' মার্কস্ ভাবুকগণের মনোহরণের জন্য একটা সমগ্রতাপূর্ণ (whole) তত্ত্ব উপস্থিত করেন। সে তত্ত্বে মার্কস মাটি খুঁড়ে জনতার জন্য সাপ বের করেন। মার্কস্ বল্‌লে, সমাজ কতকগুলি শ্রেণীর (class) সমষ্টি। Thesis, Antethesis ও Synthesis চল্‌ছে ভাবের আবহাওয়ায় নয় পরন্তু কঠিন তুনিয়ার এসব শ্রেণীর ভিতর। তিনি দাঁড় করালেন materialistic conception of history অর্থাৎ জড়বাদাত্মক ইতিহাসের কল্পনা। তাঁর মতে হিগেলের spiritual কল্পনার ধারা বা 'idea'র সজ্ঘাতের ব্যাপার একটা উড়ো স্বপ্ন। সজ্ঘাত চল্‌ছে বাস্তব সমাজের শ্রেণীগুলির মধ্যে। এই হ'ল মার্কসের "Theory of class struggle." অর্থাৎ ধনিক ও শ্রমিকের ভিতর, bourgeoise ও proletariat-এর ভিতর যে দ্বন্দ্ব চল্‌ছে তাই সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে, এটাই হল social evolution-এর প্রক্রিয়া। এটা হল মার্কসের Sociological theory of evolution। ইহা Darwin-এর biological theory of evolutionকে হতশ্রী করে দিল।

ইউরোপের বাইরের বিশেষ ভারতীয় তাত্ত্বিকরা সহজেই এই ইউরোপের প্রাচীন মনস্তত্ত্বের মূল খুঁজে পাবে। মার্কসের materialistic conception of history একটা সত্যিকার thesisই নয়—এটা হিগেলের conception-এরই একটা antethesis। কারণ হিগেলের মতে "history is the progressive manifestation

of the absolute spirit" কাজেই Marx-এর ভিতর দিয়ে কোন নূতন কথা পাওয়া যাচ্ছে না — হিগেলের মতের বিরোধবাদের উপর নিজের ভঙ্গুর পাদপীঠ তিনি স্থাপন করেছেন। কাজেই, মার্ক্‌সকে উনবিংশ শতাব্দীর এ্যারিষ্টেট্‌ল মনে করার মূলে তেমন সার্থকতা নেই।

মার্কসের বাহাদুরী হচ্ছে সমাজের ভিতরকার দলগুলিকে তত্ত্বের দিক হ'তে বিরোধীভাবে দাঁড় করান। 'Das Capital'-এর' Surplus value-তত্ত্বও মার্কসের নিজের কল্পনা নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সুইস (swiss) ভাবুক সিসমণ্ডি এই বিরোধ (apple of discord) সৃষ্টি করেন। উৎপন্ন দ্রব্যাদির surplus value * গ্রহণ শ্রমিকদের exploitation মাত্র — এ সব নূতন কথা। এমনি ভাবে একটা নূতন হিংসার প্রেরণাকে শাণিত কর৷ হয়েছে বিপ্লবের জন্য। বস্তুতঃ কোন ভাবুক বলেছেন, ইচ্ছা করেই ইউরোপে ধনী ও শ্রমিকের ভেদের বীজ রোপণ করা হয়েছে।

প্রোলিটেরিয়েট না হলে বুর্জ্জোয়াকে জব্দ করা যায় না; কাজেই মার্কসের antethesis একটা সৃষ্টি করতেই হবে ভাবজগতে। এই জন্যে শ্রমিককে ধনিকের বিরুদ্ধে দাঁড় করে' ক্রমশঃ পরিপক্কভাবে ইউরোপের বিরোধী শিবির স্থাপিত হয়েছে।

এর ভিতর যে অনৃত, অসত্য ও অবিচার লুকান আছে, তা দেখান কঠিন নয়। স্বাভাবিক নিয়মেই তা প্রতিপন্ন হচ্ছে। মহাযুদ্ধের সময়ে সাম্যবাদীরা স্বদেশপ্রেমিক হয়ে উঠে—তাদের বিরুদ্ধভাব দীপ্যমান হয়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে totalitarianism একটা নূতন কল্পনা ও সৃষ্টি। Stalin, Hitler, ও Mussolini বস্তুতঃ তিন রকমের আবেষ্টনের ভিতর এই একই নব্য সৃষ্টি সম্ভব করেছে।

মার্কসের Evolution, Darwin ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাবুকদের কল্পিত theoryর মত একটা 'progressive' ব্যাপার। চরম সত্যকে সরল রেখার মত কল্পনা করার মূলে আছে আধুনিকতার অপূর্ণতা স্বীকার এবং সৃষ্টির প্রবাহকে খণ্ড ও গলিতভাবে কল্পনা করা। এ দেশে progression-এর রূপ হচ্ছে বঙ্কিম — কুণ্ডলিনী ও পদ্ম তারই প্রতীক। ভারতীয় কল্পনার লক্ষ্য সরলরেখাক্রমে অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতায় পৌছান নয়, পরন্তু অহরহই চরম সত্যের বিকশিত ক্রোড়ে সৃষ্টি ও সমাজ শিহরিত হচ্ছে। প্রতি যুগই চরম সত্যের ছায়াকে রূপান্বিত করছে। এ সত্য কোথা তা' ইউরোপীয় ব্যতিরেকী তত্ত্ব কল্পনা করতে পারে না। হিগেলের consciousness of the absolute spirit তাঁর dialectic methodএর ভিতর দিয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভব কি? মার্ক্‌সের শ্রেণী-স্বার্থের চরম কল্পনা class struggleএর ভিতর দিয়ে মূর্তিমান হ'তে পারবে কি?

খণ্ডতার ভিতর দিয়ে ও struggle-এর ভিতর দিয়ে চরম সত্য পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চরম সত্যের ধারণা করা—অথবা চরম সত্যকে একটা সুদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত মনে করা ভুল। প্রতি মুহূর্ত্তেই অসীম সত্যের লীলা দীপ্যমান—সরল রেখার শেষ প্রান্তে —evolution-এর শেষ পাদক্ষেপের অপেক্ষা তা' করে না।

কিন্তু ঐ সত্যের হিসেবনিকেশ করেই জাগতিক কর্ম্মধারা অগ্রসর হয়। অসীম সত্যের শতদলের প্রত্যেক বঙ্কিম হিল্লোলে মানুষের ব্যতিরেকী জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। অসীম সত্য তৃপ্তি নিয়ে আসে—তা মৃত্যুরই মত নির্গুণাত্মক। আপেক্ষিক সত্যে থাকে অতৃপ্তি—তাই হচ্ছে জীবন। মধুমক্ষিকা মধু আহরণ করে' মৌচাকে রক্ষা করে' যখন সে তা'তে উপবিষ্ট হয় তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জগৎ মধু আহরণের জায়গা। বিরোধ, সঙ্ঘর্ষ প্রভৃতি subject ও object-এর ক্রিয়ার প্রতিফলক। কাজেই ইউরোপের এই মত্ততার মূলে ভারতীয় তত্ত্বের আলোকপাত করা প্রয়োজন। একান্তভাবে অন্বয়ী সাধকের জন্য নিখিল রসসম্পুটপূর্ণ জগৎ কল্পিত হয়নি। আধুনিককালে এই মানসিক অরাজকতার যুগে ভারতকে স্থির প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে এই গভীর তত্ত্বকে উপলব্ধি করে' জীবনে ও সমাজে নিয়োগ করতে হবে।

* "The labourer in a day earns more than what he needs for his subsistence. The capitalist takes the labourer's product. This residue from which pays, rents, interests and profits are drawn, is called surplus value."—Proudhon.

মধ্য-সাহারার প্রাগৈতিহাসিক চিত্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক

গ্রীষ্মমণ্ডলেই প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক সন্ধানে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় মিল্‌লেও, ঠিক স্পষ্ট ধারণা আজ পর্য্যন্তও পরিস্ফুট হয়নি। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারে প্রত্ন মানবের আত্মোৎকর্ষের একটা স্পষ্ট শিক্ষিত মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার পূর্ব্বে আদিম মানবসমাজ কোন পথে তাদের উৎকর্ষ ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল, তাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, রসজ্ঞান কি রকম ছিল, এবং কি ভাবে, কোন্ প্রণালীতে পথ করে নিয়েছিল—এই সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আপ্রাণ চেষ্টায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নানাস্থানে যে সকল গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে (এবং আরও আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে) সেগুলির মধ্য দিয়েই এই সমাজ ও সভ্যতার অনেক খোঁজ পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে গত ১৯৩৫ সালে ফরাসী আভিযানিকদল মধ্য সাহারায় উষর-মরু বুকে যাত্রা করেন। এই অভিযানে যে চিত্রাবলী তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি রস সৃষ্টির ইতিহাসে অপূর্ব্ব।

একদিন মানুষের সভ্যতার পরিমাপ ছিল আত্মোৎকর্ষের প্রামাণিক মানদণ্ডে। ফলে যে দেশের যে রকম প্রামাণিক নিদর্শন মিলে, সেই দেশ সেই পরিমাণে সভ্য বা বর্ব্বর বলে' গণ্য হত। প্রাগৈতিহাসিক মানবদের পাথরের অস্ত্রসস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু না পাওয়াতে ঠিক হয়েছিল, আদিম মানব শুধু বাঁচার চেষ্টাই করে' গিয়েছিল—হঠাৎ যেদিন স্পেনের গুহা-চিত্র, সিন্ধু নদ তীরের সভ্যতার আবিষ্কার হল সেদিন থেকে নতুন করে ইতিহাস রচনার অবকাশ এল। যাদের মধ্যে শুধু বাঁচবার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করার বাসনা, এবং সেই বাসনাকে ফলবতী করার যে কার্য্যতঃ প্রয়াস, তা দেখে বর্ব্বর বলতে যে মনোবৃত্তির ধারণা সাধারণতঃ হয় তদনুসারে ইহাদিগকে আর সত্যই বর্ব্বর বলা চলে না। হয় তো এই গুহা-চিত্রগুলির তথ্য নিরূপণে একদিন দেখা যাবে, যে আমরা যাকে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বলে' এসেছি, সেই পদ্ধতির চিত্রগুলি একটী মূল পদ্ধতিরই বিভিন্ন বিকাশ; মূলে সেই আদিম প্রবৃত্তি, চিন্তা ও প্রকাশের ভঙ্গী পরবর্ত্তী শতাব্দীর মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মধ্য-সাহারার মরুবুকে হোগার পর্ব্বতগাত্রে আবিষ্কৃত চিত্রমালা বহু সমস্যা সামাধানের পথ দেখায়। এখানকার বিরাট্ প্রাচীর-চিত্রে (Fresco) প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর এবং শীকার প্রভৃতিতে তখনকার সমাজের অভিজ্ঞতার আভাষ কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলির আবিষ্কারের ফলে বর্ব্বর জীবনের (Primitive Life) অনেক অপ্রকাশিত কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। নারীচিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দুইটি নৃত্যরতা রমণী (স্বতন্ত্র প্লেট দ্রষ্টব্য)।

হোগার পর্ব্বতমালার 'ক' সংখ্যক শৃঙ্গের হস্তি যূথ

মাথায় তাদের পালক বা বৃক্ষপত্রের আবরণ। ভঙ্গীতে প্রকাশ তালের আভাষ—এই ধরণের নৃত্যরীতি এখনও নিগ্রোদের মধ্যে দেখা যায়। এই ছবিখানির সৌন্দর্য্য প্রকাশের অপূর্ব্বতায় প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন ইজিপ্তের পদ্ধতি। এই প্রবন্ধে যে কয়টী ছবি প্রকাশ করা হ'ল, সমস্তগুলিতেই সৌন্দর্য্য ও রসজ্ঞানের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছে, দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। কোন অজানিত কালের এই ছবিগুলি আজকের চিত্রজগতেও বিস্ময়ের বস্তু!

এক সময়ে এই উপত্যকায় বিভিন্ন জাতির সমাবেশ হয়েছিল; তারা এখানে কিছুকাল বসবাস করে প্রাকৃতিক কারণে অথবা যাযাবর বৃত্তির প্রেরণায় পুনঃ স্থানান্তর মিশরের আদিম অধিবাসীরা। কিছুকাল পূর্ব্বে E. F. Gantler, C. Kilian Francis Rod প্রভৃতি পরিব্রাজকরা সাহারার বুক থেকে এই ধরণের কাজ প্রচুর আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁরা বর্ব্বর প্রদেশের অধিবাসীদের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন যে, সেই কাজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ক শৃঙ্গের কাজের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক ধরণের। তাঁরা অনুমান করেন, হয়তো এই 'লাইকো বার্ব্বার' শিল্প একদিন সাহারার ইতস্ততঃ পর্ব্বতমালায় খোঁজ করলে অনেক পাওয়া যেতে পারে।

খ ও গ শৃঙ্গের চিত্রমালা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। এই সমুদয় চিত্রগুলিতে রচনা বৈশিষ্ট্য ও ঘটনা-সমাবেশ,

সাহারার অন্তর্গত হোগার পর্ব্বতমালার 'খ' সংখ্যক শৃঙ্গের চিত্র: এই চিত্রগুলি বিভিন্ন জীবজন্তু ও মানুষের এবং সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অঙ্কিত

হয়েছিল আর রেখে গিয়েছিল তাদের আগমনের বার্ত্তা পাহাড়ের গায়ে। হোগার পর্ব্বতমালায় তিনটী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির পদার্পণের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যে তিনটী শৃঙ্গের মাঝে এই চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে, সেই শৃঙ্গ তিনটীকে আমরা আমাদের সুবিধার জন্য ক, খ, গ, সংখ্যক চিহ্ন ব্যবহার করবো। উচ্চতায় ক শৃঙ্গ ৪৮০০ ফুট্, খ শৃঙ্গ ৫৬০০ এবং গ শৃঙ্গ ৬২০০ ফুট। ক উপত্যকায় রঙীন ছবি নেই, আছে কেবল উৎকীর্ণ চিত্রমালা। বিষয় বস্তু হস্তীযুথ, সিংহ, উটপাখী শীকার প্রভৃতি। এই উৎকীর্ণের বৈশিষ্ট্য (Style) অপর দুইটী শৃঙ্গ হতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন এগুলির (Libyc-Barbarian Style) স্রষ্টা পশ্চিম সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতে এখনও অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে উৎকীর্ণ চিত্র একেবারে নেই; শুধু অঙ্কিত চিত্রের সমাবেশ। এই চিত্রগুলির শৈল্পিক-রীতিতে (Tecnique) কতকাংশে মিশরীয় প্রভাব দৃষ্ট হলেও, আদিমতা (Primitiveness) বিবেচনায় উহা ক শৃঙ্গ হতে বহু প্রাচীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার গুহা মানবের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কবিশিষ্ট হওয়ায়ও এই প্রাচীনতার অন্যতম কারণ বলা যায়। ইজিপ্তের সঙ্গে ঘনিষ্টতা সম্বন্ধে অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে এই বলা যায়, হয়তো এই প্রদেশবাসীই প্রাচীন ইজিপ্তের শিল্প-গুরু ছিল—আমাদের অনুমানপক্ষে আরো স্পষ্ট প্রমাণ মিল্‌তে পারে যদি আমরা কল্পনাকে আর একটু প্রসারিত করে' কয়েক হাজার

বৎসর পেছিয়ে হোগার উপত্যকার দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—ইর হার্‌ হার্‌ (Ir 'har har'), তামারারেষ্ট্‌ (Tamararasset), তাফাস্‌সেট্‌ (Tafassasset) নামক তিনটী নদী এ উপত্যকাকে উর্ব্বর করে প্রথমটী উত্তরে এবং দ্বিতীয় নদী দুটী যুক্ত হয়ে দক্ষিণে চলেছে। এক সময়ে এই নদীমুখ উর্ব্বর ছিল, এ কল্পনা করে নেওয়া যায়। এবং এই দুইটী নদীর ধার দিয়ে যে সকল জাতি এখানে প্রথমে বসবাস করে, তাদের শঙ্করজাতি বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। তুষারাবৃত ইউরোপ যখন মানুষের বসবাসের অযোগ্য ছিল তখন ইবেরিয়ন (Iberian

অধিবাসীরা এখানে কিছুকাল ছিল। এখন কথা হচ্ছে, নীল নদের উর্ব্বর ভূমি ত্যাগ করে' দু'হাজার মাইল উষর মরু ভেদ করে হোগার উপত্যকায় যাবার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না, বরঞ্চ হোগার উপত্যকার অধিবাসীদের মিশরের দিকে আগমনের সম্ভাবনাই অধিক। এই পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব-দেশান্তরী হওয়ার আর একটি কারণও অনুমান করা যায়; কয়েক সহস্র বৎসর ধরে সাহারা ক্রমে শুষ্ক থেকে শুষ্কতর হয়ে উঠায় যখন হোগার উপত্যকা পর্য্যন্ত মরু তুষার আক্রান্ত হল, তখন সেখানকার মানুষ ও জীব জন্তুকে বাধ্য হয়েই সেই প্রদেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁরা নিজেদের বাসভূমি
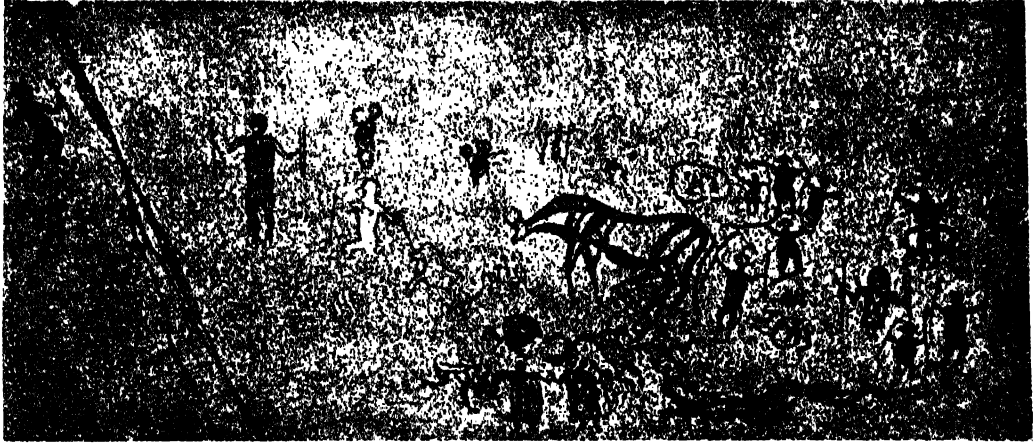
হোগার পর্ব্বতমালার 'থ' সংখ্যক শৃঙ্গে অঙ্কিত বিভিন্ন জীবজন্তু ও মানুষের চিত্র: এই চিত্রগুলি সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অঙ্কিত

Peninsula) উপদ্বীপের কাছাকাছি ইরহার্‌-র্‌ নদীর মোহনা দিয়ে ক্রোম্যাগনরেড জাতি এবং অপর দিকে বিষুবরেখার উষ্ম মণ্ডল থেকে অন্য দল ইষদোম্ম (নিগ্রোয়েড জাতি) হোগার উপত্যকার দিকে এসেছিল। এই দুইটী ভিন্ন প্রকৃতির যাযাবর-সমাজ বহুকাল পর্য্যন্ত এখানে বসবাস করেছিল—বোধ হয় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে পরে তারা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই শঙ্কর জাতি যে বিভিন্ন স্থানে আবার বসবাস করেছিল তার প্রমাণ আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সের এবং স্পেনের গুহাচিত্রগুলি থেকে পাই। এই অনুমান এই দুই দেশের চিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকেও পাওয়া যায়। এও হতে পারে, হয়তো অগ্রণী হোগারবাসীর একটী দল মিশরে এসেছিল, অথবা মিশরীয় আদিম

ত্যাগ করে কোথায় গিয়েছিল? খুব সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-পুরুষদের পথই অনুসরণ করে যে পথে তারা প্রথমে এসেছিল, সেই পথেই আবার দেশান্তরিত হয়েছিল; একদল উত্তরে অন্য দল দক্ষিণে। আবার এও হতে পারে যে, হোগারের অল্প পরিসর উপত্যকায় এ দুই দলের স্থান অসঙ্কুলান হয়ে পড়ায় একদল পূর্ব্বদিকের নীল নদের ধার দিয়ে মিশরের উর্ব্বর ভূমিতে বসবাস করেছিল। কারণ পূর্ব্বদিকের একমাত্র বড় নদী নীলনদ হোগারের একই দ্রাঘিমায় (latitude) অবস্থিত। এবং তারাই যে ফ্যারাও অধিকৃত ইজিপ্তের শিল্প-গুরু হয়নি একথা কল্পনা করা অস্বাভাবিক হবে না।

নীলনদ তীরবর্ত্তী জনপদ হোগার উপত্যকার-যাযাবর

শঙ্করজাতির সংস্পর্শে এসেছিল কিনা, কিম্বা তারাই আদিম ফ্যারাও বংশের স্রষ্টা কিনা, এ তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে একমাত্র চিত্রপদ্ধতি ছাড়া নৃতত্ত্ব, ভাষা তত্ত্ব প্রভৃতি অন্য প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন। এবং তার দ্বারা হয়তো সঠিক উত্তরও মিলতে পারে। আর নর-তত্ত্বের যে পরিচ্ছেদ এখনও অন্ধকারাবৃত সেই ইতিহাসও হয়তো পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এ বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ আফ্রিকার বিচিত্র ভূমিতে এখনও যে সব অনাবিষ্কৃত স্থান রয়েছে সেগুলির মাঝে হয়তো আমাদের প্রশ্নের উত্তর ঢাকা রয়েছে। নীল নদের তীরবর্ত্তী যে আদিম জাতির বংশধর এখনও রয়েছে—যাদের সাধারণতঃ মরূদ্যানবাসী বলা হয়—তারাই হয় তো প্রাগৈতিহাসিক হোগার উপত্যকার যাযাবর শঙ্কর জাতির বংশধর।
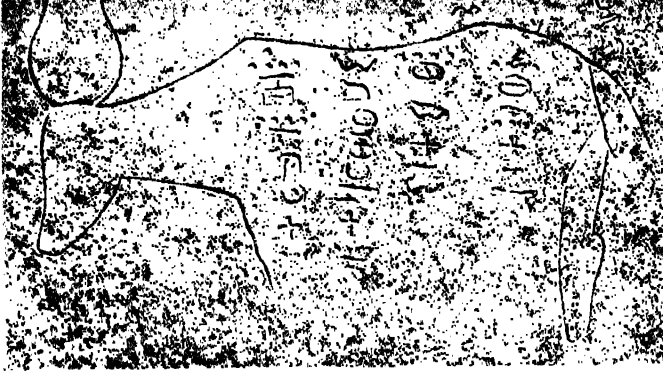
হোগার পর্ব্বতমালার 'ক' সংখ্যক শৃঙ্গে উৎকীর্ণ আর একটি ষাঁড়ের চিত্র

ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ব বাদ দিয়ে ছবিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, দেশ-কাল-পাত্রাতীত সৌন্দর্য্য-রচনায় মুগ্ধ হতে হয়। এরা মিশরীয় শিল্পের স্রষ্টা কি মিশরীয় শিল্পী এদের স্রষ্টা, সে তর্ক না তুলেও আমরা এই চিত্রগুলির মধ্যে যে রস-সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখতে পাই, তাতে একথা জোর করেই বলা চলে—যাযাবার প্রাগৈতিহাসিক মানব হয় তো আজকের মানবের উৎকর্ষের তুলনায় বর্ব্বর ছিল, কিন্তু তারা অরসিক ছিল না।

গান

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

ও চরণ তব দাও দাও সখি,
দাও পদধূলি শিরসি,
দুলিছে দোদুল নিখিল গোকুল
তব প্রেমরস পরশি'।

মাধুরী তোমার
লতায় পাতায়,
গহনে গগনে
কি মধু ছড়ায়,
সে আঁখি কোথায় নিরখি' তোমায়,-
দাও রসধারা সরসি'।

বঞ্চনার বোঝা

শ্রীবিজয় গুপ্ত
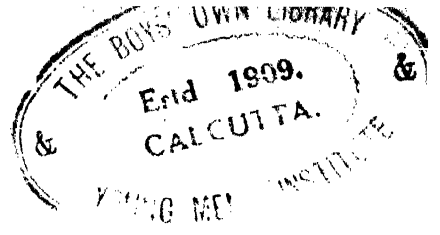
সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় সাবিত্রী আসিয়া উপস্থিত।

'না, এতো বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে চলবে না দাদা, উঠুন।'

বলিলাম, 'এই ত' উঠেছি, কি করতে হবে বলো না।'

'নিন্, তবে হাত পাতুন।'

তথাস্তু। হাত পাতিতেই নেকড়ায় বাঁধা কি একটা ভারী বস্তু সে আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠস্বরও বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

'শিগ্গীর যান দাদা, উঠে পড়লে মুস্কিল হবে।'

বস্তুটা যে কি তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিলেও জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি আছে এতে?'

ফিস্ফিস করিয়া সাবিত্রী জবাব দিল, 'দু'গাছা রুলি।'

পরে নিজেই বলিতে লাগিল, 'গালা ভর্ত্তি···ফাঁপা জিনিষ কিনা, তেমন কিছু হবে না।'

বলিলাম, 'বেস্পতিবারের সকালে সোণার জিনিষ···'

কণ্ঠস্বরটা হয়ত একটু উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছিল; বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল, 'আবার চেঁচাচ্ছেন কেন দাদা··· আপনার পায়ে পড়ি, যান শীগ্গির—বিক্রী ক'রে যে কটা টাকা হয় নিয়ে আসুন।'

'কিন্তু, সোণা যে লক্ষ্মী, এই লক্ষ্মীবারে···'

অধৈর্য্যকণ্ঠে সাবিত্রী বলে, 'হোক লক্ষ্মী···মা লক্ষ্মী আমার মাথায় থাকুন—না হ'লে যে চলবে না।'

ঘড়িতে টং টং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল।

গমনোদ্যত ভঙ্গিতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলাম, 'তা' যাচ্ছি, কিন্তু সকাল বেলাতেই কি এমন দরকার?'

নতমুখে ধীরে ধীরে সাবিত্রী বলে, 'সবই তো জানেন দাদা, কি করে চালাচ্ছি।'

বলিলাম, 'তা জানি দিদি, তবু শুনিনা··।'

মৃদুস্বরে সাবিত্রী বলিতে আরম্ভ করে, 'জাপানী অপিসে একটা চাকরী খালি আছে। বড়বাবু বলেছে, সাহেবকে ভেট দিলে নাকি হতে পারে।···কাল সারারাত আমার সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া ক'রেছে—বলে, কখানা গয়নাই তো এই করে খেয়েছি, রুলি বেচে আর ভেট দোব না—হয়তো এমনই হবে।··· আপনিই বলুন না দাদা···!'

আমাকেই সে সাক্ষী মানিয়া বসিল, বলিল, 'চাকরী হলে অমন কত রুলি হবে।'

বলিতেই হইল, 'তা তো বটেই···!'

ইতিমধ্যে সুখেন্দুর হয়ত ঘুম ভাঙিয়াছে···সাবিত্রীর কাণ ঠিক সজাগ ছিল—ওঘরে সাড়াশব্দ শুনিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময়ে করুণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া এমন করিয়া নীরবে অনুরোধ করিয়া গেল যে, রুলি দু'গাছা পকেটে ভরিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রহিল না। চটিজুতাটি পায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া গেলাম।

সাবিত্রী আমার নিজের বোন নয়—পাশের ঘরের ভাড়াটে মাত্র। এ বাড়ীতে ভাড়া আসিবার পর কেমন করিয়া, কোথা দিয়া সে যে আমার ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল, তাহা আমি বিশদ্ভাবে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।···এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি দেখিতেছি, সাবিত্রীর স্বামী সুখেন্দুর চাকরী নাই। গোড়ার দিকে দু'একটা টিউশানী করিয়া কোনরকমে কায়ক্লেশে চলিতেছিল। আজ ক'মাস হইল সে অবলম্বনটুকুও গিয়াছে। সাবিত্রীর গায়ে যে ক'খানি গহনা ছিল, অভাবের পীড়নে ধীরে ধীরে তাহারাও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। সবশেষ বাকী ছিল এই রুলি দু'গাছা। সাহেবকে ভেট দিবার কঠিন প্রলোভনে পড়িয়া আজ তাহাও বুঝি টিকিল না। ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। কি জানি নিজের বোন নাই বলিয়াই বোধ হয় এতখানি মায়া উহার উপর পড়িয়াছে।···

কাছেই বন্ধু সেক্‌রার দোকানে গিয়া রুলি দু'গাছা বিক্রয় করিয়া আসিলাম। দাম মিলিল, সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা। বন্ধু যখন রুলি দু'গাছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরখ করিয়া দেখিতেছিল, তখন আমি সেদিকে চাহিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার কেবলই মনে হইতেছিল, সাবিত্রীর ধবধবে মণিবন্ধ দু'টি···গিয়া দেখিব খালি··· নিরাভরণা।

উপায় নাই ; বাঙ্গালীর অপিসে চাকরী করি, মাহিনা পাই মাত্র বত্রিশটি টাকা, তাও ঠিক সময়ে নয়—কখনো বা দ্বৈমাসিক, কখনো বা ত্রৈমাসিক। উপস্থিত হাতে ছিল মাত্র চারটি টাকা। নতুবা কিছু দিয়া রুলি বিক্রয়টা বন্ধ করিতে পারিতাম।

বাসায় ফিরিয়া দেখি, সাবিত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাকে ফিরিতে দেখিয়া চকিতে ইসারা করিয়াই সরিয়া গেল।

পাশাপাশি ঘর ; ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া আমিও নিজের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অল্পক্ষণ পরে সুযোগমত সাবিত্রী আসিয়া টাকাটা লইয়া গেল।

দাড়ি কামাইতে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম, ও ঘরের কথাবার্ত্তা।

সাবিত্রী বলিতেছে, 'হ্যাঁগা, যাবে না আজ ভেট দিতে ?'

'টাকা কই ভেট দেবার !'

'টাকার যোগাড় করেছি, এই নাও।'

সাবিত্রী বোধহয় টাকাগুলি সুখেন্দুর হাতে দিল।

'কোথায় পেলে ?' বিস্মিত হইয়া সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করে, তারপর খালি হাতের দিকে নজর পড়িতেই বলে, 'ও···রুলি দু'গাছা বেচেছ বুঝি ?'

সাবিত্রীর জবাব শোনা যায় না—সে বোধ হয় অপরাধীর মত নীরবে, নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকে।

সুখেন্দুর গলা শোনা গেল, 'এত করে বারণ করলাম—তবু কি শুনতে নেই ?'

মৃদুকণ্ঠে সাবিত্রী জবাব দেয়, 'ভাবছ কেন, চাকরী হ'লে অমন কত হ'বে।'

সুখেন্দুর সুতিক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চাকরী যে হবেই, একথা তোমায় বললে কে ?'

'কে আবার বলবে—আমার মন বলছে। হবে, হবে, হ'বে—আমার মন বলছে নিশ্চয়ই হবে।...নাও, দেরী করো না, তৈরী হয়ে নাও।—আমি চললুম রান্নাঘরে।'

খানিক পরে আমার ঘরের সামনে আসিয়া সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা, আছেন নাকি ?'

সাড়া দিলাম, 'এস, আছি বইকি।'

ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে সুখেন্দু বলিল, 'অপরাধের মধ্যে বলেছিলাম, জাপানী আপিসের বড়বাবু বলছে, সাহেবকে ভেট দিলে চাকরী হতে পারে···সেই শুনে রুলি দু'গাছা ছিল, তা'ও বিক্রী করে দিলে···চাকরী হবার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে ?'

কি বলিব ! বলিলাম, চেষ্টা করতে দোষ কি ?'

ঈষদুষ্ণ কণ্ঠে সুখেন্দু বলিল, 'আপনিও ওই কথা বলবেন ?···যদি না হয়, রুলি দু'গাছা তো গেল !'

সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, 'যাবে কেন ভাই...কথায় বলে পুরুষের বরাত পাতা চাপা—একটা না একটা লেগে যাবেই।'

আমার কাছে সমর্থন না পাইয়া সুখেন্দু অপ্রসন্ন মুখে ফিরিয়া গেল। তারপর, সাবিত্রীর তাড়ায় তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া সাহেবকে ভেট দিবার জন্য কুড়িটি টাকা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুখেন্দু যাইবার পরেই সাবিত্রী আসিয়া উপস্থিত।

'ঠিক চাকরী হবে...বুঝলেন দাদা, আমার মন বলছে হবে।'

সাবিত্রীর ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের নিখুঁত একটি সুর মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

বলিলাম, 'কেন হবে না দিদি, খুব হবে। না যদি হবে তো, এত লোকের হচ্ছে কেমন করে ?'

সাবিত্রী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, 'ঠিক বলেছেন—এ কথা উনি কিছুতে বুঝবেন না। ভাবনা কি, চাকরী হলে অমন কত হবে।'

বেলা হইয়া গিয়াছিল, আমিও আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

সুখেন্দুর চাকরী হইল না। সাবিত্রীর এত বড় আশার উপর নিষ্ঠুর বিধাতা কেমন করিয়া যে তাঁহার খড়্গ হানিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আজ নয়, কাল নয়, এমনি করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া সুখেন্দু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও সাবিত্রী কিন্তু নিরাশ হয় নাই। প্রায় প্রত্যহই আমার নিকট আসিয়া বলিত, 'আপনি দেখবেন দাদা, এবার নিশ্চয়ই হবে।'

কি জানি কেন, শেষ পর্য্যন্তও তাহার মনে এ বিশ্বাস অটুট ছিল। কিন্তু এ বিশ্বাস একদিন তাসের প্রাসাদের মত নিষ্ঠুরভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রুলি বিক্রয়ের সতেরো টাকা ক' আনায় টানাটানি করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল। প্রতিদিনই সুখেন্দু বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত সে আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিন্তু ফিরিবার পর মুহূর্ত্তেই সুখেন্দুর মুখ দেখিয়া সাবিত্রীর মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু, বুক না বাঁধিলে যে উপায় নাই—সুতরাং পরদিনের জন্য আশান্বিত হইয়া নীরবে সে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর সম্মুখে সযত্নে আহার্য্য পরিবেশন করিত। তারপর, আহারাদির পর সুখেন্দু কতকটা সুস্থ হইলে এক সময়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিত, 'হ্যাঁগা, বড়বাবু কি বললে?'

'বললে, পরশু যেতে।' নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সুখেন্দু জবাব দেয়। কণ্ঠস্বরে তাহার এতটুকু বিরক্তি বা উত্তাপ প্রকাশ পায় না... সাবিত্রীর কষ্টটা সে বোধ হয় অনুভব করিতে পারিয়াছে।

এমনি করিয়া বড়বাবুর একদিন পরশুর মেয়াদও ফুরাইল।

সেদিন সুখেন্দু বাড়ী ফিরিলে সাবিত্রী আর উৎকণ্ঠা চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—'হ্যাঁগা, কি হ'ল চাকরীর?'

জামাটা খুলিতে খুলিতে সুখেন্দু বলে, 'সব ব্যাটা জোচ্চোর, আমার কুড়ি টাকা ভেট খেয়ে আর একজনকে করে' দিলে।'

'অ্যাঁ, বল কি!' সাবিত্রীর মুখের অবস্থা দেখিয়া আমারই ভয় হইল। সুখেন্দু না দেখিলেও এ ঘর হইতে আমি লক্ষ্য করিলাম—দু'হাত দিয়া কপাটটা চাপিয়া ধরিয়া সাবিত্রী কোনমতে সামলাইয়া লইল। সারাদিনের অভুক্ত স্বামী তাহার ঘরে ফিরিয়াছে...এ সময়ে না সামলাইলে তাহার চলিবে কেন!

শেষ রাত্রে সাবিত্রীর ভীষণ জ্বর হইল।

ঘুমের প্রকোপে রাত্রে ব্যাপারটা জানিতে পারি নাই। বেলা বাড়িতেই সুখেন্দু আসিয়া হাজির হইল। আমি তখনো বিছানায় শুইয়া।

'দাদা, আপনার কাছে থারমোমিটার আছে?'

'থারমোমিটার!' ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, 'কেন বল ত?'

ম্লানমুখে সুখেন্দু জবাব দিল, 'সাবিত্রীর ভয়ানক জ্বর।'

'জ্বর! কখন হয়েছে?'

'তা জানি না। হঠাৎ রাত্রে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।'

থারমোমিটার বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম, 'এই নাও—চল, আমিও যাচ্ছি।'

সুখেন্দুর পিছনে পিছনে এ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কোন সাড়া-শব্দ নাই, সাবিত্রী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। চুলগুলি মুখের আশেপাশে অবিন্যস্ত...আগোছাল।

কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্ন স্বরে বলিলাম, কি গো দিদি, কেমন আছ?'

সাবিত্রী জবাব দিল না, রক্তবর্ণ চোখ দুটি মেলিয়া একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়া আবার চোখ বুজিল।

সুখেন্দু ছেলেমানুষ; তাহার উপর অর্থের সামর্থ্যও নাই। বলিলাম, 'তুমি ভেব না সুখেন্দু ও কিছু নয়, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।'

পাড়ার এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের সহিত পরিচয় ছিল, একটি টাকা ভিজিট কবুল করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম। ডাক্তার আসিয়া দু' পুরিয়া ওষুধ দিয়া মামুলী সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিলেন।

বেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে, আমার আবার নিজের চাকরী বজায় করিতে হইবে। সুখেন্দুকে আড়ালে ডাকিয়া খরচপত্রের জন্য পাঁচটি টাকা দিয়া আপিসে চলিয়া গেলাম। সমস্তদিন কাজে মন বসিল না। কেবলই

সাবিত্রীর কথা মনে হইতে লাগিল। বড় আশা করিয়াছিল সে, কেবলই আসিয়া বলিত, 'আপনি দেখবেন দাদা, এ চাকরী নিশ্চয়ই হবে, আমার মন বলছে হবে।' তাই, এতবড় আঘাতটা বোধ হয় সহিতে পারে নাই। জানি, এমন অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করা অন্যায়—ভীষণ অন্যায়, কিন্তু মানুষ যখন নিরুপায় হইয়া পড়ে তখন সে যা হ'ক সামান্য কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া যে পারে না! আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, উপশম হওয়া দূরে থাক, সাবিত্রীর জ্বর আরও ভীষণভাবে বাড়িয়াছে। মাঝে মাঝে খুব আস্তে ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিতেছে। আমি আসিতেই আমার হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া সুখেন্দু কাঁদিয়া উঠিল।

বেচারীর অবস্থা দেখিয়া বড় মায়া হইল, বলিলাম, 'যাও ত ভাই, একবার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো ত—কিছু বলতে হবে না, আমার নাম করলেই সে আসবে।'

সুখেন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

সাবিত্রীর মাথার নিকট বসিয়া আগোছাল চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে কোমল স্বরে ডাকিলাম, 'হ্যাঁ দিদি, কেমন আছ এখন?'

বার দুই ডাকিবার পর সে চোখ মেলিয়া চাহিল।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন কেমন আছ দিদি?'

আমার দিকে না চাহিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া নিজে নিজেই সে বকিতে লাগিল, 'চাকরী হ'ল না!……ভেট দিয়েও……চাকরী হ'ল না!'

বুঝিলাম, চাকরী না হওয়ার আঘাতটা বড় ভয়ানক লাগিয়াছে।…

অল্পক্ষণ পরে সুখেন্দু ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেছেন।'

সাবিত্রী তখন ফিস্‌ফিস্ করিয়া সেই কথাই বলিতেছে।

সুখেন্দুকে আড়ালে ডাকিয়া আনিলাম।

বলিলাম, 'ভাবনা নেই, কাল সকালে ভাল ডাক্তার ডেকে আনব…জ্বরটা বড্ড বেশী হয়েছে কিনা তাই…।'

মৃদুস্বরে সুখেন্দু বলিল, 'সমস্ত দিন ধরে ভুল বকছে…ওই এক কথা, কেবল বলে, চাকরী হল না!'

এমন সময়ে সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ডাক্তার বাবু—।

বলিলাম, 'এইমাত্র আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।'

সাবিত্রীর বিছানার কাছে আগাইয়া আসিতে আসিতে ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'গিয়েছিলাম একটা রুগী দেখতে, ফিরতেই চাকরটা সুখেন্দুবাবুর স্লিপখানা দিলে … কেমন আছে এখন রুগী?'

বলিলাম, 'সমস্ত দিনই ভুল বকছে।'

গম্ভীর হইয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'ডিলিরিয়াম … হুঁ, কেসটা বোধ হয় বেঁকে দাঁড়াবে।' এই সময়ে সাবিত্রী আবার অস্ফুটে বকিতে আরম্ভ করিল।

ডাক্তারবাবুকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার বাবু জবাব দিলেন, 'দেখুন, আমাদের হোমিওপ্যাথিতে একটা কথা আছে—রোগের নয় রুগীর চিকিচ্ছে, অর্থাৎ রুগীকে ভাল করলে রোগ আপনিই পালাবে…ব্যাপারটা তা'হলে বোঝা গেছে, শক্ লেগেই এমনটা হয়েছে … আচ্ছা, ওষুধ আমি দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি এক কাজ করবেন সুখেন্দু-বাবু, মেণ্টাল এ্যাগনি…অর্থাৎ মানসিক যন্ত্রণা থেকে রিলিফ দেবার জন্য ওঁকে বলবেন, আপনার চাকরী হয়েছে … তা'হলেই দেখবেন, কতকটা রিলিফ হবে।'

ডাক্তার বাবু দু'পুরিয়া ওষুধ দিয়া বিদায় লইলেন।

তাঁহাকে বিদায় দিয়া সুখেন্দু ও আমি দু'জনে আসিয়া সাবিত্রীর বিছানার পাশে বসিলাম।

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুখেন্দু ডাকিল, 'সাবিত্রি, সাবিত্রি!'

'উঁ', সাবিত্রী অস্ফুটে জবাব দিল।

ইসারায় সুখেন্দুকে প্ররোচিত করিলাম। কাণের নিকট মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলাম, 'হোক মিথ্যে — না বলে উপায় কি, ডাক্তার বাবু ঠিক বলেছেন…।'

সুখেন্দু সাবিত্রীর মাথায় হাত রাখিয়া পুনরায় ডাকিল, 'সাবিত্রি!'

'উঁ।'

'শুনেছ সাবিত্রি ?' কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সুখেন্দু বলিল, 'শুনেছ সাবিত্রি, আমার চাকরী হয়েছে।'

রক্তবর্ণ চোখছুটি মেলিয়া সাবিত্রী সুখেন্দুর হাতখানি চাপিয়া ধরিল, তারপর একবার আমার পানে ফিরিয়া চাহিল।

হোক মিথ্যা—তবু সুযোগ পাইয়া বলিলাম, 'সুখেন্দুর চাকরী হল, আর এই সময়ে তুমি রোগ করে' বসলে দিদি ?—দেরী নয়, শিগ্‌গীর সেরে ওঠ।'

'চাকরী ?…হয়েছে ?' বলিতে বলিতে পাশ ফিরিয়া সাবিত্রী চোখ বুজিল।

বসিয়া বসিয়া চোখে ঘুম জড়াইয়া ধরিতেছে। সুখেন্দুকে বলিলাম, 'দেখ ভাই, আমি একটু গড়িয়ে নিই গে…দরকার হলেই আমায় ডাকবে, বুঝলে ?'

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, ডাক্তারের কথাই ঠিক, জ্বর উপশম হইয়া সাবিত্রী কতকটা সুস্থ হইয়াছে।

মাথার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন কেমন আছ দিদি ?'

সাবিত্রী অস্ফুটে জবাব দিল, 'ভাল !'

বলিলাম, 'হ্যাঁ শীগ্রি শীগ্রি সেরে ওঠ।…সুখেন্দুর চাকরী হয়েছে, আপিসে জয়েন করতে হবে।'

সাবিত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া ম্লান হাসি হাসিল।

মিথ্যা দিয়াই মিথ্যাকে ঢাকিতে হয়।

সাবিত্রী সারিয়া উঠিয়াছে।… দুর্ব্বল শরীর লইয়া সে ক্রমাগতই কাজকর্ম্ম করিতেছে। রাঁধিতে রাঁধিতে বিশবার আমার ঘরে উঁকি মারিয়া ঘড়ি দেখিয়া যায়—কত বেলা হইল। নটার মধ্যে সুখেন্দুকে ভাত দিতে হইবে…পাছে তাহার আপিসের বেলা হইয়া যায়। প্রত্যহ সাড়ে আটার পূর্ব্বে সে অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া সুখেন্দুকে তাগাদা দেয়।

সুখেন্দু বলে, 'এই তো সবে নটা…'

সাবিত্রী বলে, 'তা হ'ক, নতুন চাকরী একটু আগে যাওয়াই ভাল।'

যেন সুখেন্দুর অপেক্ষা চাকরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাহার কোন অংশে কম নয়। বসিয়া বসিয়া সাবিত্রীর কর্ম্মব্যস্ত যাতায়াত লক্ষ্য করি। মুখে তাহার সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। দুর্ব্বল দেহে, রুগ্ন মুখের রেখায় রেখায় তরঙ্গায়িত হাসির ঢেউ দেখিয়া আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করিতে থাকে। এ যে কত বড় ছলনা সাবিত্রীর জানা না থাকিলেও, আমার জানিতে বাকী নাই। তবু অন্তর্যামীর কাছে নালিশ জানাই, বলি, 'দেখো, সাবিত্রীর এ স্বপ্ন যেন না ভাঙ্গে, যেমন করিয়া পার, ইহাকে সার্থক করিয়া দাও।' আড়ালে ডাকিয়া সুখেন্দুকে বলি, 'ভাই, প্রাণপণ করে চাকরীর চেষ্টা কর, ঠিক ভগবান একটা জুটিয়ে দেবেন, ভয় কি !'

পঁচিশটি টাকা আপিসের এক বন্ধুর কাছে ধার করিয়া সুখেন্দুকে দিয়াছি। আফিস হইতে অগ্রিম মাহিনা লইয়াছে বলিয়া পাঁচটি টাকা নিজের কাছে রাখিয়া, বাকী কুড়িটি টাকা সে সাবিত্রীর হাতে দিয়াছে। সাবিত্রীর মুখে হাসি যেন আর ধরে না। সমস্ত দিন ধরিয়া সে হিসাব করিয়াছে, কেমন করিয়া এই ক'টি টাকায় গুছাইয়া সংসার চালাইবে।

সাবিত্রীকে ছলনা করিবার জন্য আপিস যাইবার নাম করিয়া সুখেন্দু প্রত্যহ বাহির হইয়া যায়—সংবাদপত্রের কর্ম্মখালি দেখিয়া সম্ভব অসম্ভব সব স্থানেই উমেদারী করিয়া ফেরে—দরখাস্ত লিখিয়া পাঠায়।

ইতিমধ্যে আবার একদিন হঠাৎ সাবিত্রীর জ্বর হইল।

সুখেন্দুর হাজার নিষেধ সত্ত্বেও সে শুনিল না, জ্বর গায়েই ভোর হইতে উঠিয়া রাঁধিতে আরম্ভ করিল।

খবরটা সুখেন্দুর মারফৎ পাইলাম—বুঝিলাম সাবিত্রীকে যদি নিবারণ করিতে পারি বলিয়া সে আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। উঠিয়া রান্নাঘরের দোরের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ দিদি, এটা কি ভাল—শেষে আবার একটা অসুখে পড়বে যে !'

রাঁধিতে রাঁধিতে খুন্তী হাতে বাহিরে আসিয়া সাবিত্রী জবাব দেয়—'না, দাদা না, ও কিছু নয়—পারছি বলেই করছি, না পারলে করব কেম ?'

কি আর বলিব - নীরবে চলিয়া আসিলাম। হাজার গোপন করিলেও বেশ বুঝিলাম, ভিতরে ভিতরে সাবিত্রী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তাহার সে শ্রী নাই, কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে—মুখখানি, শুষ্ক, রুগ্ন, মলিন। তবু, সুখেন্দুর চাকরী হইয়াছে, এই আনন্দে মাঝে মাঝে অধরের কোণে হাসির বিদ্যুৎ ঝলকিয়া ওঠে। ভিতরে ভিতরে যতই অক্ষম হইয়া পড়ুক, বাহিরে সে কিছুতেই হার মানিবে না।

একদিন আপিস হইতে ফিরিতেই সুখেন্দু আসিয়া বলিল, 'চলুন দাদা, একটু বেড়িয়ে আসি।'

অবাক্ হইয়া বলিলাম, 'এমন সময়ে! এই তো আপিস থেকে এলাম!'

সুখেন্দু সাবিত্রীর অলক্ষ্যে চোখ টিপিয়া ইসারা করিল, বলিল, 'তা হ'ক চলুন দরকার আছে, যাব আর আসব।'

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিলেও কৌতূহলী হইয়া সুখেন্দুর পিছনে পিছনে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

'এই দেখুন,' পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া সুখেন্দু আমার হাতে দিল। একটু সরিয়া গিয়া গ্যাসের আলোর সামনে মেলিয়া পড়িয়া দেখিলাম—গৌহাটি স্কুলে একজন গণিতের শিক্ষকের প্রয়োজন—সুখেন্দুর দরখাস্ত পাইয়া তাহারা ডাকিয়া পাঠাইয়াছে সাতদিন পড়াইবার জন্য। ছাত্রদের এবং কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হইলে ঐ পদেই তাহাকে নিযুক্ত করা হইবে।

বলিলাম, 'বেশ ত' চলে যাও না···হতেও পারে।'

সুখেন্দু মৃদু আপত্তির সুরে বলিল, 'যদি না হয়, কতকগুলো টাকা ভাড়া খরচ করে··'

'না, না ও কোন কাজের কথা নয়। তুমি যাও—উপস্থিত দশটা টাকা না হয় আমি দিচ্ছি।'

'কিন্তু সাবিত্রীর রোজই জ্বর হচ্ছে।'

বুঝিলাম ব্যথাটা তাহার কোথায়। একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, 'তা' বলে, এমন করে বসে থেকেই বা কি করবে—চাকরী হলে বরং ডাক্তার দেখান, চিকিৎসা সবই হতে পারে। ও কিছু নয়...তুমি যাও। সাবিত্রীকে বলবে, আপিসের কাজে সাতদিনের জন্যে গৌহাটি যেতে হবে।···হুঁ, ঠিক হবে, চাকরীটা হয়ে গেলে তখন ওকে ঘটনাটা খুলে বললেই হবে। দেরী নয়, যাও। কালই বেরিয়ে পড়।'

পরদিন সুখেন্দু চাকরীর জন্য গৌহাটি যাত্রা করিল। যাইবার পূর্ব্বে পরামর্শমত সাবিত্রীকে বলিয়া গেল, 'আপিসের কাজে গৌহাটি যাচ্ছি—যদি ভাল কাজ দেখাতে পারি, মাইনে ডবল বেড়ে যাবে।'

অন্তরাল হইতে দেখিলাম, সংবাদটা শুনিয়া সাবিত্রীর চোখ দুটি আনন্দে চকচক করিয়া উঠিল। সুখেন্দু চলিয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া সাবিত্রী আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'শুনেছেন দাদা? আপিস থেকে গৌহাটি পাঠাচ্ছে···কাজ দেখাতে পারলে মাইনে ডবল বেড়ে যাবে।'

বলিলাম, হ্যাঁ, শুনেছি। আর সুখেন্দু যেমন ছেলে, ও নিশ্চয়ই ভাল কাজ দেখাবে।'

সাবিত্রীর মুখে আনন্দে ও গর্ব্বে হাসি ফুটিল ... রুগ্ন মুখে স্তিমিত, অপর্য্যাপ্ত হাসি ··· বাসি ফুলের মত অপ্রদীপ্ত, ম্লান।

বলিলাম, 'কিন্তু দিদি, তোমার শরীরটা যে দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে ... একটু নজর দাও।'

'কি যে বলেন! এই ত, ভালই আছি।'

কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল, 'আপনি কিন্তু আর হোটেলে খাবেন না, এ-ক'টা দিন আমার কাছে খান ... দেখুন তো চেহারাটা কি হয়ে গেছে আপনার?'

না বলিবার সাধ্য কি...নীরবে বসিয়া রহিলাম। সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া নারীর সনাতন স্নেহ-মন্দাকিনীর সহস্র রূপ যেন একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিল।

তবু বলিলাম, 'কি দরকার। তার চেয়ে এ-ক'টা দিন একটু জিরিয়ে নাও।'

'দাদা যেন কি! .সাবিত্রী ভ্রূভঙ্গি করিল, 'না, ও আমি কোন কথা শুনব না ... না খেলে আমি কিন্তু বড্ড রাগ করবো।'

সুখেন্দু যাইবার দিন চারেক পরে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিল।

আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে ভিতর বাড়ীর ভাড়াটেদের ঝি চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, 'ওগো এস গো, বৌমা তোমাদের কলতলায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

ছুটিয়া গেলাম। দেখি, কলতলার পিছলে পা পড়িয়া ঘাড় গুঁজিয়া চৌবাচ্ছার ধারে সাবিত্রী পড়িয়া আছে ··· ডানদিকের কপালটা কাটিয়া চোখের পাশ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ ঝি আর আমি দু'জনে ধরাধরি করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় সাবিত্রীকে ঘরে আনিয়া শোয়াইলাম।

বলিলাম, 'তুমি একটু বস ঝি, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি, আশে-পাশের ভাড়াটেদের বাড়ীর স্ত্রীলোকে সমস্ত ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর ডাক্তার মন্তব্য করিলেন, 'দেখুন, এ আমি ভাল বুঝছি না, এখানে যখন এঁর কেউ স্ত্রীলোক আত্মীয় নেই, তখন এক কাজ করুন, এঁকে হাসপাতালে দিন।'

'হাসপাতালে!'

ডাক্তার বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, 'অবাক্ হচ্ছেন যে! ··· হাসপাতাল শুনলে আপনারা অমন ভয় খান কেন? ... হাসপাতালে যেমন যত্ন হবে, বাড়ীতে তেমন হবে কি?'

ডাক্তারবাবু নিজেই টেলিফোন করিয়া হাসপাতালের গাড়ী আনাইয়া দিলেন। ঝি, আমি এবং ও বাড়ীর আরও একটি ভাড়াটে ছোকরা মিলিয়া তিনজনে ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিলাম।

অজ্ঞান সাবিত্রীকে ফেলিয়া রাখিয়া আপিস যাইতে পারিলাম না। অপরাহ্নের দিকে চোখ মেলিয়া সে একবার চাহিল, বলিলাম, 'এখন কেমন আছ দিদি?'

জবাব না দিয়া, আর একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া, সে চোখ বুজিল।

তারপর বিড়বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুনিলাম, বলিতেছে, 'পোড়া উনুনটা আর ধরে না, আটটা বাজ্‌ল যে, আপিসের ভাত ... আঃ কি জ্বালা!'

বুঝিলাম, সারা সকালটা সুখেন্দুর আপিসের ভাত দিবার জন্য সে যেরূপ করিত, ঝোঁকের মাথায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে।

পরের দিন।

আপিস হইতে লোক আসিয়া খবর দিয়া গেল। বাঙ্গালীর আপিস একদিন কামাই করিলে সমস্ত অচল হইয়া যায়, কাজেই তাড়াতাড়ি আপিস ছুটিলাম। তা'ছাড়া সাবিত্রী আজ বোধহয় একটু ভাল আছে। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, আপিসে গিয়া সুখেন্দুকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিব। শেষ পর্য্যন্ত অনেক ভাবিয়া টেলিগ্রাম করিলাম না। বন্ধুবান্ধবরাও নিষেধ করিলেন, 'মিছিমিছি সে বেচারার মন খারাপ করে দিয়ে কি হবে ... ভাল করে' পড়াতে পারবে না, শুধু শুধু এতখানি কষ্টই সার হবে। তার চেয়ে চেপে থাক এ-কটা দিন, এসে পড়ল বলে'।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত — সুতরাং টেলিগ্রাম করা ভাল বিবেচনা করিলাম না।

পাঁচটার পর আপিস হইতে বাহির হইয়া হাসপাতালে গেলাম। শুনিলাম, সাবিত্রীর জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু জ্বরের প্রকোপ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে।

পাশে গিয়া বসিয়া মাথায় হাত দিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল। বুঝিলাম, সে সুখেন্দুকে খুঁজিতেছে।

এবারেও মিথ্যা কথা বলিতে হইল—বলিলাম, সুখেন্দুকে খবর পাঠিয়েছি—সে এল বলে।'

কথাটা শুনিতে পাইয়া সে অস্ফুটে বলিল, 'না, না কাজ নেই।'

বুঝিলাম, সুখেন্দুকে খবর দিয়া এ-সময় তাহাকে উৎকণ্ঠিত করিবার ইচ্ছা সাবিত্রীর নাই। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বর ভীষণ বাড়িয়াছে।

মনে মনে ভাবিলাম, না, কাজ নাই, যাহার জিনিষ সে

আসিয়া দেখুক। কাল নিশ্চয়ই একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিব। চাকরী যাইলে আবার হইবে, কিন্তু এমনভাবে অতর্কিতে যদি সাবিত্রী ফাঁকি দেয় তো সে ক্ষতি আর ইহজীবনেও পূরণ হইবে না।

পরদিন সকালে টেলিগ্রাম করিবার জন্য বাহির হইতেছি, এমন সময়ে পিওন আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম দিল। সুখেন্দু টেলিগ্রাম করিয়াছে—মর্ম্মার্থ এই, 'চাকরী হইয়াছে—সন্ধ্যায় পৌছিব ··· সাবিত্রী কেমন?'

এত উৎকণ্ঠা, এত দুঃখের মধ্যেও সুখেন্দুর চাকরী হইয়াছে, খবর পাইয়া মনটা আনন্দে দুলিয়া উঠিল। যাক্, বাঁচা গেল। ক্রমাগতই মিথ্যার বোঝা বাড়িয়া উঠিতেছিল, সমস্ত অপরাধের এইবারে নিরাকরণ হইবে।

টেলিগ্রামটা পকেটে করিয়া সাবিত্রীকে খবরটা দিবার জন্য হাসপাতালে গেলাম। মনে মনে গৌরবও অনুভব করিতেছি — খবরটা আমিই প্রথম তাহাকে শুনাইব। আনন্দে হয়ত তাহার শীর্ণ, শুষ্ক ঠোঁটের কোণে চিরপরিচিত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে।

গিয়া দেখিলাম, সাবিত্রী নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে। ডাক্তারী নিয়মানুসারে রোগীকে জাগাইবার উপায় নাই, সুতরাং খবরটা যত আনন্দেরই হ'ক ফিরিয়া আসিতে হইল। মনে মনে ভাবিলাম, ভালই হইয়াছে, খবরটা সুখেন্দুরই দেওয়া উচিত। আমি মাঝখান হইতে নির্লজ্জের মত তাহার আনন্দটুকু অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

সন্ধ্যার সময়ে আপিস হইতে ফিরিবার মুখে ভাবিলাম, সাবিত্রীর খোঁজ লইয়া যাই। বাসায় ফিরিয়া সুখেন্দু আসিলে তাহাকে লইয়া পুনরায় হাঁসপাতালে আসিব। হাসপাতালে ঢুকিবার সময়ে লোভ হইতে লাগিল। পকেটে টেলিগ্রামটা ছিল, ভাবিলাম, খবরটা শুনাইয়া যাইব নাকি?

বারান্দা দিয়া সাবিত্রীর বেডের দিকে চলিলাম, দু'তিনটি ছাত্রের সঙ্গে ডাক্তারবাবু এইদিকে আসিতেছেন। কাছাকাছি হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সাবিত্রী এখন কেমন আছে ডাক্তারবাবু?'

টুপিটা আরও খানিক মুখের উপরে টানিয়া দিয়া নতমুখে ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'পারলাম না, অনেক চেষ্টা করেছিলাম, জ্বরটা ওঠবার সময় সইতে পারলে না—দুর্ব্বল শরীর কিনা ... হার্টফেল করলে।'

আমার জীবনের সে একটি অবর্ণনীয় মুহূর্ত্ত, কি যে হইয়াছিল, তাহা আমি আজো জানি না, বলিতেও পারিব না। কেবল এইটুকু মনে আছে, ডাক্তারবাবু আমার হাতটা ধরিয়া আমাকে বাহিরে টানিয়া আনিলেন।

খানিক পরে বলিলাম, 'একবার দেখাবেন ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু কোমলকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, একটু সুস্থ হন, তারপর হবে।'

অল্পক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু নিজেই সঙ্গে করিয়া সাবিত্রীর বেডের কাছে লইয়া গেলেন।

একখানি চাদরে ঢাকা দেওয়া সাবিত্রীর মৃতদেহ তখনও শোয়ানো রহিয়াছে—চাদরের ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে, আলতা-রাঙা শীর্ণ দু'খানি পা।

'আর নয়, আসুন', ডাক্তারবাবু হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া আনিলেন।

বারান্দায় বাহির হইয়াই দেখিলাম, সুখেন্দু উর্দ্ধশ্বাসে বাসায় ফিরিয়া প্রতিবেশীদের নিকট বোধ হয় খবর পাইয়াই ছুটিয়া আসিতেছে।

আমাকে দেখিতে পাইয়া হাতটা টানিয়া ধরিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাবিত্রী কই দাদা, বেঁচে আছে ত?'

কোন কথার জবাব দিতে পারিলাম না। আমার দুটি চোখ অশ্রুর প্রবল উচ্ছ্বাসে অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, সাবিত্রী কই, সাবিত্রী?' সুখেন্দু ডাক্তারবাবুর হাতদুটি জড়াইয়া ধরিল।

যে যত কঠিন প্রাণ, সে-ই বোধহয় বড় ডাক্তার হইবার দাবী রাখে। এমন নিষ্ঠুর কথাটা উচ্চারণ করিতে

এতটুকুও বাধিল না, একজন ছাত্র আগাইয়া আসিয়া বলিল 'আধঘণ্টা আগে তিনি মারা গেছেন—হার্ট ফেলিওর।'

সুখেন্দু ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। বালির কাগজের ঠোঙা করিয়া বোধ করি সাবিত্রীর জন্য আঙুর-বেদানা আনিয়াছিল, সেইগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া একাকার হইয়া গেল।

সুখেন্দুকে হাত ধরিয়া তুলিলাম। কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সুখেন্দু বলিল, 'আমি যে তাকে চাকরী হওয়ার খবর দেব বলে' এতো তাড়াতাড়ি এলাম দাদা … চলুন ডাক্তারবাবু, নিয়ে চলুন—আমি শুধু একটিবার দেখব —চাকরী হওয়ার খবরটা তাকে শোনাব।'

বলিলাম, 'কাকে শোনাবে ভাই, যে শোনাবার সে যে চলে গেছে…।'

হায় রে, পৃথিবীতে মিথ্যাই বড় হইয়া রহিল!… সত্য যেদিন ধরা দিল, সেদিন শত চেষ্টাতেও স্বীকার করিবার সুযোগ মিলিল না!…চিরকালের জন্য মিথ্যা ও বঞ্চনার বোঝা-ই ভারী হইয়া রহিল?

পাণ্ডবরাজ্যের কালপর্য্যায়

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিষসিদ্ধান্তাচার্য্য

প্রাচীন কালের ইতিহাস সমালোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন; এইজন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীন চিন্তাবিশিষ্ট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পণ্ডিতদিগের মতে এবং গ্রন্থে—একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দেশ দ্বারা প্রমাদ ও ভ্রান্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যায়। বস্তু মাত্রেই সমুত্থান ও সম্পাত, এই দুই প্রকার কারণ দ্বারা প্রদ্যোতিত হয় এবং যাহার ইতিহাস, তাহার জন্মের পশ্চাৎ লিখিত হইয়া থাকে। (১) আপ্তপুরুষগণ তপস্যা দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া যিনি যে পরিমাণ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত বিষয়ের স্বরূপ নিজ আত্মাতে অনুভব পূর্ব্বক যে যে উপদেশ করেন, তাহাকে আপ্তোপদেশ বলে এবং তাদৃশ উপদেশ যে গ্রন্থে লিখিত থাকে, তাহাকেই আপ্ত গ্রন্থ বা শাস্ত্র গ্রন্থ বলে। কিন্তু যদি কেহ আপ্তপুরুষের নাম মাত্র উল্লেখ দ্বারা সৃষ্টিক্রমের বিপরীত ভাবে—অথবা জন্মের পূর্ব্বে ইতিহাস-রচনার উল্লেখ বা উপদেশ করেন, তাহা হইলে বিদ্বান্‌গণ উহাকে অজ্ঞ বা উন্মত্তের তুল্য ভাবিয়া অবহেলা করিলেও, বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার অযৌক্তিক বাক্যকে অন্ধ পরম্পরা-সূত্রে স্বীকার করিয়া থাকে; এই জন্য বিদ্বান্‌গণ বিজ্ঞানহানি আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রবাক্যের বিচার পূর্ব্বক সত্য গ্রহণ ও অসত্যত্যাগের পক্ষে—প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ প্রমাণের ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞান মানুষের স্বতন্ত্র ও চিরন্তন বস্তু হইলেও, ব্যক্তিবিশেষে ইহার অধিকারী হওয়া যায়; এই জন্য বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্‌দিগের মধ্যে পরম্পরা ও অন্ধ-পরম্পরা, এই দুই প্রকার প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বিষয় পরিলক্ষিত হয়। জ্যোতিঃশাস্ত্র ভিন্ন বহু পুরাণ গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে — স্বার্থ ও স্বাধীন চিন্তা দ্বারা মত ও মতান্তরের সমন্বয় এবং বিজ্ঞান ও সত্যশূন্যরূপে বহু বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়; এই জন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আর্য্যরাজগণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধেও মত-মতান্তরের অভাব হয় নাই।

(১) যথা—"অনিত্যাদর্শনাচ্চ" মীমাংসাদর্শনম্ ১।১।২৮ ইতি জনন-মরণবন্তশ্চ বেদার্থাঃ শ্রূয়ন্তেববরঃ প্রাবাহনিরকাময়ত কুসুরুবিন্দঃ ঔদ্দালকিরকাময়ত ইত্যেব মাদয়ঃ। উদ্দালকস্যাপত্যং গম্যতে ঔদ্দালকিঃ যদ্যেবং প্রাক ঔদ্দালকি জন্মনঃ নায়ং গ্রন্থো ভূতপূর্ব্বঃ। এবম্ নিগ্যহ্যতা।

বরাহমিহিরাচার্য্য ৫০৫ খৃষ্টাব্দে ৪২৭ শকাব্দে এবং বঙ্গাব্দ পূঃ ৮৮ সালে "পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীহর্ষ প্রণীত খণ্ডখাদ্যের আমরাজটীকাতে ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, "নবাধিক-পঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যঃ দিবং গতঃ" অর্থাৎ ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ৫০৯ শকাব্দে ও বঙ্গাব্দে পূঃ ৬ সালে বরাহমিহির স্বর্গারোহণ করেন।

উক্ত ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ৫২০ শকাব্দে ও বঙ্গাব্দ ৫ সালে "ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত" নামে গণিত-জ্যোতিষের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং বরাহমিহিরের স্বর্গারোহণ কাল হইতে "ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে"র রচনা-কাল মাত্র ১১ বৎসরের ব্যবধান হইতেছে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহিরকে দেখিয়াছিলেন; এইজন্য বরাহমিহিরের সমসাময়িক ব্রহ্মগুপ্তের কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার্য্য। উল্লিখিত ৫০৫—৫৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বরাহমিহির "বৃহৎ-সংহিতা" গ্রন্থ রচনা করেন। এবং ঐ গ্রন্থে তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আসন্মঘাসু মুনয় শাসতি পৃথ্বিং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃশককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ।(১)

শকারম্ভের ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ কল্যব্দ ৬৫৩ বর্ষগতে) যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল।(২)

কহ্লন, পণ্ডিত ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে ১০৭০ শকাব্দে, বা ৫৫৫ বঙ্গাব্দে "রাজ-তরঙ্গিণী" নামে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।(৩) উক্ত গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে কুরু-পাণ্ডবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর (শক পূঃ ২৫২৬ খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ বর্ষ) অতীত হইলে, পৃথিবীতে কুরুপাণ্ডবগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এস্থলে দেখা যায় যে, বরাহ-মিহিরের সিদ্ধান্তানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালকে কহ্লন পণ্ডিত, কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব-কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "জ্যোতিনির্বন্ধ" গ্রন্থের ভাষ্যকর্ত্তা মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন বিশেষ বিশেষ রাশিতে গ্রহগণের স্থিত্যানুসারে গণনায় প্রায় খৃঃ পূঃ ২৪৫৪ বর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—এস্থলে ৫ বর্ষের মাত্র প্রভেদ হইয়াছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে নৈঋত ও বায়ুকোণস্থ পুলহ ও ক্রতু নামক তারকাদ্বয় প্রথমে উদিত হয়, তাহার মধ্যভাগে দক্ষিণোত্তর রেখার সমদেশে অবস্থিত অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের এক একটী দৃষ্ট হয়। উক্ত এক একটী নক্ষত্র সহকারে সপ্তর্ষিমণ্ডল ১০০ শত বর্ষ করিয়া অবস্থান করে। কহ্লন বলেন—পরীক্ষিত যখন রাজ্য শাসন করেন, সেই সময়ে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিল।

বরাহমিহিরের সিদ্ধান্তানুসারে কল্যব্দ ৬৫৩ বর্ষগতে শক পূঃ ২৫২৬ খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ বর্ষে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল ধরিলে, উহা হইতে ১০০ শত বর্ষ মধ্যে যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষিত উভয়েরই রাজ্যশাসন সময়ে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরীক্ষিতের রাজ্যশাসন সময়ে মঘাস্বাসন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণেও ঐরূপ উল্লেখ আছে।(১) বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে — পরীক্ষিতের সময় হইতে নন্দরাজের সময় পর্য্যন্ত সময়ের ব্যবধান মাত্র ১০১৫ এবং (বায়ু ও মৎস্য) পুরাণান্তরে ১০৫০ বর্ষ ব্যবধানের উল্লেখ দেখা যায়। এই নন্দরাজার সময় হইতে কলি-বৃদ্ধির উল্লেখ আছে। যথা—

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি।

(১) "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালঃ" এই শব্দে অর্থকর্ত্তাগণ শকারম্ভের ২৫।২৬ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫১।৫২ খৃষ্টাব্দে সপ্তর্ষিগণের মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লেখ করাতে দুষ্টার্থের প্রকাশ পাইয়াছে।

(২) কল্যব্দ ২৪৩৯ খৃষ্টাব্দ ১৫২ শকাব্দ ৭৪ বর্ষ পরেও আর একবার মঘাস্বাসনের কাল পাওয়া যায়।

(৩) কহ্লন পণ্ডিত "শালিহোত্রসমুচ্চয়" নামে অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১) সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্য নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাম্।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলিঃ দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।

বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩৩ ৩৪

যাবৎপরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ বিষ্ণু পুঃ ৪।২৪।৩৯,৩২
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি।
—ভাগবত ১২।২ ৩২

যে সময়ে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিবে, সেই সময় নন্দরাজাদিগের অভিষেক এবং কলিবৃদ্ধি হইবে। পরীক্ষিতের জন্ম সময়ের মঘাস্বাসন হইতে নন্দ-রাজার অভিষেক সময়ের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান কালের ব্যবধান ১০১৫বর্ষ; পুরাণান্তরে ১০৫০বর্ষ।

পুরাণদর্শন-উপক্রমণিকা (১) বলিয়াছেন—পরীক্ষিতের জন্ম-সময়ে মঘার সপ্তর্ষি সমস্থত্রাংশে অর্থাৎ মঘার শেষ অর্দ্ধাংশ সহ পূর্ব্বফাল্গুণীর অংশ; এই সময়ে কলির মধ্যের ১২০০ বর্ষ অতীত হইয়াছিল—কলির আরম্ভ হইতে নহে। নন্দদিগের পূর্ব্বে কলিতে দুই বার মঘাস্বাসন হইয়াছিল; প্রথম কলির ১৬৭-২৬৭ (খৃঃ পূঃ ২৯৩৪—২৮৩৪) এবং দ্বিতীয় কলির ১৯৬৭-২০৬৭ (খৃঃ পূঃ ১১৩৪-১০৩৪) তৃতীয় মহাপদ্মানন্দের অভিষেক তথা তৃতীয় কালীন নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশের ১১০০ বর্ষ পরে ১২০০ বর্ষ পর্য্যন্ত কিন্তু বরাহ-মিহির ও কহ্লনের সিদ্ধান্তানুসারে মঘাস্বাসন সম্বন্ধে বহু প্রভেদ হইয়া পড়ে। নন্দরাজ্য সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে ভবিষ্য-বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে—

তত স্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিক শতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।

কল্যব্দ ৩৩১০ (খৃষ্টাব্দে ২০৯) বর্ষ গতে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য এই নন্দবংশের নিপাত করিবেন। কহ্লন পণ্ডিতের সিদ্ধান্তানুসারে নন্দরাজাদিগের পূর্ব্বে পুরাণোক্ত ১০৫০ বর্ষ হইলে, খৃঃ পূঃ ৮৪১ বর্ষে পরীক্ষিতের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু মঘাস্বাসন পাওয়া যায় না; এতদনুসারে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে পূর্ব্বোক্ত বরাহ-মিহির ও কহ্লণপণ্ডিতের সহিত পৌরাণিক মতের কোন সম্বন্ধ নাই।

নন্দদিগের রাজ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পণ্ডিত মিঃ উল্‌ট য়ার্ট এলফিন্ সাহেব খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে আরম্ভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তানুসারে খৃঃ পূঃ ৪২৫ বর্ষ।

বিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪) "মহাপদ্মানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ ১০০ বর্ষ মগধের অধিপতি হইবেন" এইরূপ উল্লেখ আছে। প্রায় পুরাণ গ্রন্থ মাত্রেরই সিদ্ধান্ত এই যে পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে নন্দরাজার অভিষেক-কাল পর্য্যন্ত ৫৯ জন রাজা রাজত্ব করেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্যকালগুলিকে একত্র করিলে ১০৫০ বৎসর হয়, মাত্র বিষ্ণুপুরাণে ১০১৫ বর্ষ হইয়া থাকে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে খৃঃ পূঃ ৪২৫ অব্দে নন্দরাজ্য ধরিলে, খৃঃ পূঃ ১৪৭৫ অব্দে পরীক্ষিতের সময় নির্দ্দেশ হয়। উল্‌ট য়ার্ট এলফিন্ সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে নন্দরাজ্য ধরিলে, খৃঃপূঃ ১৪৩০ অব্দে পরীক্ষিতের সময় ধরা যায়। পৌরাণিক মতে—ইহারই ৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম প্রমাণিত হয়।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত এই যে—মহাভারতের যুদ্ধের কাল খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বর্ষ, অয়নাংশ পুরা ৪৮ ধরিলে খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বর্ষ; বিষ্ণুপুরাণ হইতে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ বর্ষ এবং ইহাই ঠিক (১) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাভারতে উল্লেখ আছে—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সময়ে পরীক্ষিত গর্ভস্থ ছিলেন। যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়। সুভদ্রার পৌত্র পরীক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের, তখন যদুবংশ-ধ্বংস হয়।

মহাভারতে ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর কুরুপক্ষের নিধনশ্রবণে গান্ধারীর অভিসম্পাতে শ্রীকৃষ্ণ ৩৬ বর্ষে অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন বনচারী হইয়া অতি কুৎসিৎ উপায়ে নিহত হইবে।

দেবী ভাগবতে ৭ অধ্যায়ের উল্লেখ অনুসারে কুরু-কুলক্ষয়ের (কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের) ৩৬ বর্ষ পরে যদুবংশ বিনষ্ট হইয়াছিল এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ কালে ১০০ শত বর্ষের অধিক বয়স হইয়াছিল।

(১) এই গ্রন্থ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

(১) গোয়ালিয়র নিবাসী একজন পণ্ডিত প্রয়াগ সমাচার পত্রিকায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন—উহা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঐক্য হইয়াছিল। (পত্রিকার সংখ্যাটী মনে নাই; ইহা পুরাণ দর্শন উপক্রমণিকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে)।

"পুরাণদর্শনউপক্রমণিকা" গ্রন্থকর্ত্তা—পরীক্ষিতের জন্ম সম্বন্ধে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

১। উন্‌ট্যার্ট এলফিনের মতে খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে নন্দদিগের রাজ্যারম্ভ সময় হইতে বায়ু ও মৎস্যপুরাণোল্লিখিত ১০৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্মকাল ধরিয়া খৃঃ পূঃ ১৪৫০ শক পূঃ ১৫৩৮ এবং ১৬৫২ কলের্গতাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম।

২। নন্দদিগের পশ্চাতে ১০৫০ বর্ষ ব্যবধান সংখ্যা যোগ করিয়া ৭৫০ খৃষ্টাব্দে ৬৭২ শকাব্দে বা ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে পরীক্ষিতের জন্মকাল এবং ইহার ৩৬ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৮৮৮ কলের্গতাব্দে পরীক্ষিতের অভিষেক-কাল। সুতরাং ৭৫০ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রমাণিত হয়।

গ্রন্থকারের এই কল্পনাপ্রসূত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তানুসারে শিলাদিত্য বা শালিবাহনই রামচন্দ্র এবং ৫১৫ শকাব্দে ৫৯৩ বঙ্গাব্দে ৩৮৮৮ কলের্গতাব্দে অন্তর ত্রেতা অব্দই রামচন্দ্রের জন্মাব্দ। বাপ্পাদিত্য—শ্রীকৃষ্ণ; ইনি ৬১১ শকাব্দে ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং যশোধর্ম্ম দেবই যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ ৬০৮ হইতে ৭০৮ শকাব্দ ৬৮৬—৭৮৬ খৃষ্টাব্দ এবং ৭৭৩—৮৪৩ সম্বতের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা শিলাদিত্য বা শালিবাহনের সহিত রামচন্দ্রের; যশোধর্ম্ম দেবের সহিত যুধিষ্ঠিরের এবং বাপ্পাদিত্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের আরোপ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উক্ত ভ্রান্তমতের নিদর্শন স্বরূপ ছয় প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার খণ্ডন করা যায়। যথা—

১। মহাভারত রচনা-কালে শ্রবণার প্রথমে আদি বিন্দু ধরা হইত। আদি পর্ব্বের "বিশ্বামিত্র প্রতিশ্রবণ পূর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি চকারঃ" এই প্রমাণে উহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। পুনঃ অশ্বমেধ পর্ব্বে উল্লেখ আছে—

> অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্ম্মাসাঃ শুক্লাদয়: স্মৃতাঃ।
> শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ॥

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে জন বেণ্টলী সাহেব "হিষ্ট্রোলজিক্যাল রিভিউ অফ্ দি এষ্ট্রোনমী" গ্রন্থে আর্য্যদিগের যে মহাযুগমালিকা লিখিয়াছেন, উহাতে তিনি যুক্তিসঙ্গত রূপে মহাভারতের রচনা-কাল খৃঃ পূঃ ৫৩০ বর্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসমসাময়িক ব্যক্তিগণ ৫৮৬—৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্ম হইলে—জন্মের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা কখন সম্ভব নহে।

২। "নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" এই পৌরাণিক বাক্যের দ্বারা নন্দরাজদিগের ১০৫০ বর্ষ পরে যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্যকাল নির্ণয় হয় না।

৩। নন্দরাজার সমসাময়িক কালে মহামতি চাণক্য বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং সেই চাণক্য পণ্ডিতের রচিত গ্রন্থে কর্ণ প্রভৃতির নামোল্লেখ করা সম্ভব নহে।

৪। বরাহ-মিহির খৃষ্টাব্দ ৪৮০—৫৮৭ বর্ষের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাদির জন্মের পূর্ব্বে বরাহমিহিরের জন্ম হইলে তাঁহার পক্ষে যুধিষ্ঠিরের নামোল্লেখ করা এবং শকারম্ভের ২৫২৬ (খৃঃ পূঃ ২৪৪৮) বর্ষ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে নির্দ্দেশ করা কখন সম্ভব হয় না।

৫। উদয়পুর মিউজিয়মে রক্ষিত খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে ঘোশুণ্ডী শিলালেখ হইতে শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রমাণ দেখা যায়। (১)

৬। যাঁহারা ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুপাণ্ডবদিগের উল্লেখ করা সম্ভব নহে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা উন্মত্ততার জ্ঞাপক, সন্দেহ নাই। (২)

(১) শ্রীযুক্ত উমাকান্ত হাজারী কৃত "বৈদিক গবেষণা" ২য়ঃ ১৭৭-১৭৮ পৃঃ।

(২) গোবিন্দদাস সেনের সঙ্কলিত "ভৈষজ্যরত্নাবলী" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—ধন্বন্তরীসদৃশ ভিষগ্বর বাগ্‌ভট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় চিকিৎসকের পদে ব্রতী থাকিয়া "অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা" নামে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু মহাভারতে বাগ্‌ভটের নাম দেখা যায় না এবং যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কালে সংগৃহীত গ্রন্থের রচনাকালেও অনুমান করা যায় না; বরং বাগ্‌ভটের গৌরব-বৃদ্ধির জন্যই এইরূপ প্রক্ষিপ্ত প্রমাণের সন্নিবেশ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কেহ বলেন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধুদেশে ভিষগ্বর বাগ্‌ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের এবং শ্রীকৃষ্ণের যে কলিযুগেই আবির্ভাব হইয়াছিল—উহা পুরাণোক্ত নন্দবংশ হইতে ১০৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের সময় নির্দ্দেশ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং বরাহ-মিহির ও কহ্লন পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত দ্বারাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; ইহা ব্যতীত বৃহৎ পরাশর হোরা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের "কলিযুগেতু ভবিতা তথা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ", এই প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্য বা আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাণের সহিত বরাহ-মিহির ও কহ্লনের মতের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। কিন্তু উক্ত সম্বন্ধহীনতার পক্ষে—দুই প্রকার কারণ স্বীকার করা যায়। যথা—

১। বরাহ-মিহির ও কহ্লনের পরবর্ত্তী কালে পুরাণে লিখিত হওয়া।

২। পুরাণোল্লিখিত উক্ত বিষয়কে অবদ্য ভাবিয়া অগ্রাহ্য করা।

মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত মহারাজাদিগের ইতিহাস মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে, উহা দৃষ্টে সেই সময়ের অবস্থা কিছু কিছু জানা যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত ১২৪ জন রাজা ৪১৫৭ বর্ষ ৯ মাস ১৪ দিনের (কল্যব্দ ৪৫০ বর্ষ গতে খৃঃ পূঃ ২৬৫২ হইতে খৃষ্টাব্দ ১৫০৬ পর্য্যন্ত সময়ের) মধ্যে হইয়াছিল, তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। (১)

শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ ক্ষেমক পর্য্যন্ত ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ ১১ মাস ১০ দিনের মধ্যে (খৃঃ পূঃ ২৬৫২-৮৮১ হইয়াছিল) ইহার বিস্তার—

আর্য্য রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। যুধিষ্ঠির	৩৬	৮	২৫
২। পরীক্ষিত	৬০	০	০
৩। জনমেজয়	৮৪	৭	২৩
৪। অশ্বমেধ	৮২	৮	২২
৫। (দ্বিতীয়) রাম	৮৮	২	৮
৬। ছত্রমল	৮১	১১	২৭
৭। চিত্ররথ	৭৫	৩	১৮
৮। দুষ্টশৈল	৭৫	১০	২৪
৯। উগ্রসেন	৭৮	৭	২১
১০। (প্রথম) শূরসেন	৭৮	৭	২১
১১। (প্রথম) ভুবনপতি	৬৯	৫	৫
১২। রণজিৎ	৬৫	১০	৪
১৩। ঋক্ষক	৬৪	৭	৪
১৪। সুখদেব	৬২	০	২৪
১৫। নরহরিদেন	৫১	১০	২
১৬। সুচিরথ	৪২	১১	২
১৭। (দ্বিতীয়) শূরসেন	৫৮	১০	৮
১৮। পর্ব্বতসেন	৫৫	৮	১০
১৯। মেধাবী	৫২	১০	১০
২০। সোনচীর	৫০	৮	২১
২১। ভীমদেব	৪৭	৯	২০
২২। নৃহরিদেব	৪৫	১১	২৩
২৩। পূর্ণমল	৪৪	৮	৭
২৪। করদেবী	৪৪	১০	৮
২৫। অলংমিক	৫০	১১	৮
২৬। উদয়পাল	৩৮	৯	০
২৭। ভুবনমল	৪০	১০	২৬
২৮। দমাত	৩২	০	০
২৯। ভীমপাল	৫৮	৫	৮
৩০। ক্ষেমক	৪৮	১১	২১

মহারাজ ক্ষেমকের প্রধান পাত্র বিস্রবা রাজা ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন; ১৪ পুরুষ ৫০০ বর্ষ ৩ মাস ১৭ দিন। (খৃঃ পূঃ ৮৮১—৩৮১) ইহার বিস্তার—

	বর্ষ	মাস	দিন
১। বিস্রবা	১৭	৩	২৯
২। পুরসেনী	৪২	৮	২১
৩। বীরসেনী	৫২	১০	৭
৪। অনঙ্গশায়ী	৪৭	৮	২৩
৫। হরিজিৎ	৩৫	৯	১৭

পুরাণ-দর্শন-গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তি-দিগের আবির্ভাব-কালের মধ্যেই ইঁহার বিদ্যমানতা প্রমাণ হয়।

(১) সম্বৎ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ ১৮২৬ অব্দের হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক হইতে "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" এবং "মোহন চন্দ্রিকা" নামে দুই পাক্ষিক পত্রিকা ১৯৩৯ সম্বতে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীনাথ দ্বার হইতে প্রকাশিত হইয়া মেবার, চিতোর ও উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধি ছিল। উক্ত পত্রিকার অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ১৯-২০ কিরণে অর্থাৎ দুই পাক্ষিক পত্রিকায় ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীমন্মহারাজ হইতে মহারাজ যশপাল র্য্যন্ত ১২৪ জন রাজার রাজ্যকাল প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর্য্য রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
৬। পরমসেনী	৪৪	২	২৩
৭। সুখপাতাল	৩০	২	২১
৮। কদ্রুত	৪২	৯	২৪
৯। সজ্জ	৩২	২	১৪
১০। অমরচূড়	২৭	৩	১৬
১১। অমীপাল	২২	১১	২৫
১২। দশরথ	২৫	৪	১২
১৩। বীরশাল	৩১	৮	১১
১৪। বীরশালসেন	৪৭	০	১৪

প্রধান পাত্র বীরমহা রাজা বীরশালসেনকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন; ১৬ পুরুষ ৪৪৫ বর্ষ ৫ মাস, ১৩ দিন (খৃঃ পূঃ ৩৮১—খৃষ্টাব্দ ৬৫) তাহার বিস্তার—

১। বীরমহা	৩৫	১০	৮
২। অজিৎসিংহ	২৭	৭	২৯
৩। সর্ব্বদত্ত	২৮	৩	১০
৪। (দ্বিতীয়) ভুবনপতি	১৫	৪	১০
৫। বীরসেন	২১	২	১৩
৬। মহীপাল	৪০	৮	৭
৭। শত্রুশাল	২৬	৪	৩
৮। সংঘরাজ	১৭	২	১০
৯। তেজপাল	২৮	১১	১০
১০। মাণিকচন্দ্র	৩৭	৭	২১
১১। কামসেনী	৪২	৫	১০
১২। শত্রুমর্দ্দন	৮	১১	১৩
১৩। জীবনলোক	২৮	৯	১৭
১৪। হরিরাব	২৬	১০	২৯
১৫। (দ্বিতীয়) বীরসেন	৩৫	২	২০
১৬। আদিত্যকেতু	২৩	১১	১৩

প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধদেশের রাজা আদিত্যকেতুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন; ৯ পুরুষ ৩৭৪ বর্ষ ১১ মাস ২৬ দিন। (খৃষ্টাব্দ ৬৫—৪৪০ বর্ষ) ইহার বিস্তার—

১। ধন্ধর	৪২	৭	২৪
২। মহর্ষী	৪১	২	২৯
৩। সনরচ্চী	৫০	১০	১৯
৪। মহাযুদ্ধ	৩০	৩	৮
৫। দুর্ণাথ	২৮	৫	২৫
৬। জীবনরাজ	৪৫	২	৫

আর্য্য রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
৭। রুদ্র সেন	৪৭		২৮
৮। আরীলক	৫২		৮
৯। রাজপাল	৩৬		

সামন্ত মহানপাল রাজপালকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন; ১ পুরুষ ১৪ বর্ষ। (খৃষ্টাব্দ ৪৪০—৪৫৪ বর্ষ) ইহার বিস্তার নাই।

রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে রাজা মহানপালকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন; ১ পুরুষ ৯৩ বর্ষ। (খৃষ্টাব্দ ৪৫৪—৫৪৭ বর্ষ) ইহার বিস্তার নাই।

শালিবাহনের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগীরাজা সমুদ্র-পাল বিক্রমাদিত্যকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন; ১৬ পুরুষ ৩৭২ বর্ষ ৪ মাস ২৭ দিন। (খৃষ্টাব্দ ৫৪৭—৯১৯ বর্ষ) ইহার বিস্তার—

১। সমুদ্র পাল	৫৪	২	২০
২। চন্দ্র পাল	৩৫	৫	৪
৩। সহায় পাল	১১	৪	১১
৪। দেব পাল	২৭	১	২৮
৫। নরসিংহ পাল	১৮	০	২০
৬। সাম পাল	২৭	১	১৭
৭। রঘু পাল	২১	৩	২২
৮। গোবিন্দ পাল	২৭	১	১৭
৯। অমৃত পাল	৩৬	১০	২৩
১০। বলী পাল	১২	৫	২৭
১১। মহী পাল	১৩	৮	৪
১২। হরি পাল	১৪	৮	৪
১৩। সীস পাল (ভীম পাল)	১২	১০	১৩
১৪। মদন পাল	১৭	১০	১৯
১৫। কর্ম্ম পাল	১৬	২	২
১৬। বিক্রম পাল	২১	১৪	১৩

পশ্চিম দিকের রাজা বণিক্‌জাতীয় মুলুখচন্দ রাজা বিক্রমপালকে আক্রমণ করিয়া ময়দানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি বিক্রমপালকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন; ১০ পুরুষ ১৯১ বর্ষ ১ মাস ১৬ দিন। (খৃষ্টাব্দ ৯১৯—১১১০) ইহার বিস্তার—

১। মুলুখ চন্দ	৫৪	২	১০
২। বিক্রম চন্দ	১২	৭	১২

	আর্য্য রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
৩।	অমীন চন্দ (মাণিক চন্দ)	১০	১	৫
৪।	রাম চন্দ	১৩	১১	৮
৫।	হরী চন্দ	১৪	৯	২৪
৬।	কল্যাণ চন্দ	১০	৫	৪
৭।	ভীম চন্দ	১৬	২	৯
৮।	লোবচন্দ	২৬	২	২২
†৯।	গোবিন্দ চন্দ	৩১	৭	১০
১০।	রাণী পদ্মাবতী	১	০	০

রাণী পদ্মাবতীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র ছিল না; এইজন্য মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। তিনি রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; ৪ পুরুষ ৫০ বর্ষ ২১ দিন। (খৃষ্টাব্দ ১১১০—১১৬০ বর্ষ) ইহার বিস্তার—

১।	হরিপ্রেম	৭	৫	১৬
২।	গোবিন্দপ্রেম	২০	২	৮
৩।	গোপালপ্রেম	১৫	৭	২৮
৪।	মহাবাহু	৬	৮	২৯

রাজা মহাবাহু রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করেন। বাঙলা দেশের রাজা আধিসেন তাহা শুনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া আপনি রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন; ১২ পুরুষ ১৫১ বর্ষ ১১ মাস ২ দিন। (খৃষ্টাব্দ ১১৬০—১৩১২ বর্ষ) ইহার বিস্তার—

১।	আধি সেন	১৮	৫	২১
২।	বিলাব সেন	১২	৪	২
৩।	কেশব সেন	১৫	৭	১২
৪।	মাধব সেন	১২	৪	২
৫।	ময়ূর সেন	২০	১১	২৭
৬।	ভীম সেন	৫	১০	৯
৭।	কল্যাণ সেন	৪	৮	২১
৮।	হরি সেন	১২	০	১৫
৯।	ক্ষেম সেন	৮	১১	২৫
১০।	নারায়ণ সেন	২	২	২৯
১১।	লক্ষ্মী সেন	২৬	১০	০
১২।	দামোদর সেন	১১	৫	১৯

রাজা দামোদর সেন আপনার পাত্রদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার এক পাত্র দীপসিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাজা দামোদর সেনকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজ্য করেন; ৬ পুরুষ ১০৭ বর্ষ ৬ মাস ১২ দিন। (১৩১২—১৪২০ খৃষ্টাব্দ) ইহার বিস্তার—

দীপসিংহ	১৭	১	২৬
রাজসিংহ	১৪		
রণসিংহ	৯		১১
নরসিংহ	৪৫		১৫
হরিসিংহ	১৩		২৯
জীবনসিংহ	৮		১

রাজা জীবন সিংহ কোন কারণবশতঃ নিজের সমস্ত সৈন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। বিরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চহ্বান সেই সংবাদ পাইয়া জীবন সিংহকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন; ৫ পুরুষ ৮৬ বর্ষ ২০ দিন। (১৪২০—১৫০৬ খৃষ্টাব্দ) ইহার বিস্তার—

১।	পৃথ্বীরাজ	১২	২	১৯
২।	অভয় পাল	১৪	৫	১৭
৩।	দুর্জ্জন পাল	১১	৪	১৪
৪।	উদয় পাল	১১	৭	৩
৫।	যশ পাল	৩৬	৪	২৭

বর্ত্তমান ইতিহাসানুসারে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বিরাজ আজমীঢ়ের চৌহান বংশীয় হইলে ১১৮১—১১৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজ্যকাল ধরা যায়। সুতরাং তদনুসারে খৃঃ পূঃ ২৮৯১ কল্যব্দ ২১১ বর্ষ গতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ-কাল হইয়া থাকে। কিন্তু এই গণনায় ২১৪—৩০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল এবং ৬৪৮—৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যকাল নির্ণয় হয়।

সম্বৎ ১২৪৯ খৃষ্টাব্দ ১১৯২ বর্ষে শহাবুদ্দিনের পূর্ব্বে মহারাজ যশপালের রাজ্যাবসান-কাল ধরিলে ১৪০—২৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল হয়। কিন্তু এই বিক্রমাদিত্যের পুত্রের নাম প্রাদিত্য ছিল, ইহা বর্ত্তমান ইতিহাসে পাওয়া যায়; সুতরাং ইহার বংশের বিস্তার ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা ব্যতীত ৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোবিন্দচন্দ্র ও রাণী পদ্মাবতীর রাজ্যকাল হইয়া থাকে। অতএব বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত উল্লিখিত ইতিহাসের যে অসম্বন্ধ ভাব ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ উহার সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ পাইতে পারেন।

† বর্ত্তমান ইতিহাসে উল্লেখ আছে, রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩—১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বাঙলা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বিনাশ করেন।

বিধবা রতিমঞ্জরী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর রতির হাতে কিছু টাকা এসেছে—হাজার বারো। টাকাটা অক্ষয়ের উপার্জ্জিত ত' নয়ই, বলা যেতে পারে সে-টাকা কারো উপার্জ্জিতই নয়; কৌশলপূর্ব্বক হাতে আনাকে উপার্জ্জন করা বলা চলে না। অক্ষয়ের বাবা গোকুলেশ্বর ছিলেন মাঝারি-পসারের উকিল; তাঁর মুখে একমুখ লম্বা দাড়ি ছিল—তার দরুণ তাঁকে বেশ সাত্ত্বিক দেখাত; কিন্তু তিনি একদিন একটা গুরুতর অপরাধ করে' বস্‌লেন, আর তা প্রমাণিত হ'ল। জনৈক ধনী ব্যক্তির উইল-সংক্রান্ত বিসম্বাদ ব্যাপারে তিনি চুরি করে' হস্তক্ষেপ করেন—উইলখানাকে অকেজো করে' দিয়ে ধরা পড়ে' যান—তাঁর ওকালতি করার অনুমতি কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে' নেন। ঐ ব্যাপার সংঘটিত করার পূর্ব্বেই তিনি পক্ষের কাছ থেকে পক্ষের পদে চুক্তিকৃত পুরস্কার আদায় করে' নিয়েছিলেন, হাজার বিশেক, অপরাধের সাজা তিনি মাথা পেতে' নিলেন।

অক্ষয় তার পিতার মৃত্যুর পর বছর ছয় জীবিত ছিল, এবং ঐ টাকার হাজার আট সে স্ফূর্ত্তি করে ব্যয় করে' গেছে। অক্ষয়ের চিকিৎসাতেও খরচ হয়েছে অনেক—লোকে চাপ দিয়ে করিয়েছে, এ-কথাও বলা চলে। ভয় আর সান্ত্বনা দুইই দেখিয়ে চিকিৎসকগণ অসদুপায়ে আহরিত অর্থ অকাতর চিত্তে শোষণ করেছেন।

অবশিষ্ট যা' আছে, তা রতির।

টাকার মালিক রতি, মাত্র ছাব্বিশ বছর তার বয়স, রূপ প্রচুর, শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ; সুতরাং প্রতিবেশিনীরা তাকে প্রবোধ দিতে আর সাবধানে রাখ্‌তে ভারি ঝুঁকে' এল ...

রতি তাদের কথা কাণ পেতে' শুনায়, আর অতিশয় বিষণ্ণ হয়ে থাকার ভাণ করে।

তাদেরই ভিতরকার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী একজন রতির শোক প্রশমনের জন্য অশ্লীলতাবর্জ্জিত রাজ-সংস্করণের রামায়ণ একখানা নিয়ে এল—রতির হাতে দিয়ে বল্‌ল, পড়বে। এমন মধুর কথা ত্রিজগতে আর নেই। বলে' সরোজিনী রামায়ণের মধুরতা যেন রসনায় সত্য সত্যই অনুভব করে—তাকে তেম্‌নি দেখায়।

রতি বল্‌ল, রাখো, পড়ব'। ধর্ম্মকাহিনী ছাড়া আমার কি আর রইল!...তোমরা, ভাই, এস; পড়ে' পড়ে' আমাকে শুনিও—মন খাড়া রেখে' আমি ত' পড়তে পারব' না এখন।

শুনে' রামায়ণদাত্রী সরোজিনী দাসী বিগলিত হ'য়ে গেল—অকালবিধবাকে সে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা থেকে নিস্তার দেবে; বল্‌ল,—তা' আস্‌ব বৈ কি। এখন খানিক পড়ব'?

সময়টা অপরাহ্ণ, সুতরাং অবকাশ আছে। রতি বল্‌ল, পড়ো।

—কোনখান্‌টা পড়ব?

—রাবণ সীতাকে চুরি করে' নিয়ে গেলে রাম যেখানে তাঁকে খুঁজছেন।...রামায়ণ পড়েছি অনেকবার—ঐখানটা আমার বড় ভাল লাগে।

—পড়ি। বলে' সরোজিনী সুর করে' পড়তে সুরু করল্‌।

সলক্ষ্মণ রাম হাহাকার করে' সীতাকে অনুসন্ধান করছেন—তাঁর ক্রন্দনের উদ্বেলতার সীমা নাই ...

পড়তে পড়তে সরোজিনী চোখ মোছে—

কিন্তু রতির মন চলে অন্যদিকে। সীতা রামের স্ত্রী—রাম অযোধ্যার রাজা, বুদ্ধিমান, বীর; তাঁর সঙ্গে রয়েছিল লক্ষ্মণের মত ভাই; অযোধ্যার যাবতীয় লোকে দেখেছে, তিনি স্ত্রী সীতা আর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে বনগমন করলেন। তাঁর মত রক্ষক আর কি হ'তে পারে! জননীগণ

এবং প্রজাগণ নিশ্চিন্ত যে, সীতা রামের কাছে আছেন—সীতার অনিষ্ট করতে কে সাহসী আর সক্ষম।...সীতাকে রাবণ যখন চুরি করে' নিয়ে গেল, তখন সর্ব্বপ্রথম কি এই কথাটিই রামের প্রাণে ধক্ করে' ওঠে নাই, অযোধ্যা মনে করবে কি, কি ঠাওরাবে তাঁকে!...আদর্শ পত্নীপ্রেম তাঁর অবশ্যই ছিল, কিন্তু ও-কথাটাও বিবেচ্য।

যে কারণেই হোক্—কিম্বা কারণ যত মিশ্রিত কারণই হোক্, রামের দুঃখে মর্ম্মবেদনা জাগেই—নিঃশ্বাস পড়েই—মনে হয়, সীতার জীবন কেবল রামের ঐ আকুলতা আর একনিষ্ঠা আর আত্মার ঐ বন্ধনের জন্যই সার্থক।

রতির একটা নিঃশ্বাস পড়ল, রামের দুঃখে নয়, নিজের দিকে তাকিয়ে...একটি পুরুষ শরীরের আর মনের সমুদয় সামর্থ্য লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে' দিয়ে যাকে পৃথিবীময় অনুসন্ধান করছে, সেই পুরুষের লক্ষ্য আর আকাঙ্ক্ষিত পাত্রী সে ত' কখনো ছিল না—এখনো নয়।

রতির যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স পনর'—তার পূর্ব্বেই তার দেহের মত মনও গ্রহিষ্ণু প্রসারিত আর উদগ্রীব হ'য়ে অজ্ঞাত অথচ কল্পনায় দৃষ্টরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি পুরুষকে তার সেই বিকাশকে সার্থক করতে আমন্ত্রণ করেছে

সেই পুরুষ একদিন যথার্থই এল—রতি দু'টি চক্ষুর দৃষ্টির আলিঙ্গনে তাকে বেঁধে' নিল—সস্মিত উন্মুখ অন্তর নত করে' তার অন্তর চুম্বন করল। রতি দেখ্‌ল, পুরুষটি সুপুরুষ—দেখলেই ধরা দিতে হয়, এমনি তার দৈহিক আকর্ষণ·· রতি কায়মনোবাক্যে সধবা হ'ল···তার দেহ-লাবণ্যে দেখা দিল জ্যোৎস্নাবিকিরণ—মনে এল জোয়ারের উদ্দামতা...অক্ষয় পেল' এই দুর্লভ আর তৃপ্তিকর দেহের আর ভাবের খোরাক্—আর স্ত্রীর পরিপূর্ণ সত্তা এল তার নিজের করায়ত্তে···অক্ষয়কে বেশ খুশী দেখাতে লাগল...

কিন্তু হঠাৎ একদিন আগুনের একটা ফুল্‌কি এসে পড়ল'।

রতিদের বাড়ীতে পড়্‌শী মেয়েদের আসা-যাওয়ার অন্ত এখনকার মত ছিল না—তারা জান্‌ত', রতির কপাল মন্দ; কিন্তু রতিকে তা' কেউ জানায় নাই। তাদের নিজের অদৃষ্টে পতিসম্পর্কীয় অশুভ কি অশান্তি কিছু ঘটছে না বলে' সেই আহ্লাদে দেমাকে অনর্থক ব্যথা দিবার ইচ্ছা তাদের জন্মে নাই—এমন দিন আস্‌বে, যখন অক্ষয়ের অকথ্য দোষ আপনি সেরে' যেতে বাধ্য, এ আশাও বোধ হয় অনেকের মনে ছিল...কিন্তু বছরখানেক চুপচাপ থাকার পর তাদেরই ভিতরকার একটি মেয়ের হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, সত্বরই সাবধান করে' দেয়া দরকার; কারণ, ঘরের পুরুষের মন যদি কুপথে যায়, তবে তাকে ফেরা'তে চেষ্টা করা ঘরের বউয়ের আশু কর্ত্তব্য, এবং যদি কেউ সেদিকে ঘরের বউকে উস্কিয়ে দেয়, তবে উভয় পক্ষেরই হিত সে করে।

কথায় কথায় একদিন সেই মেয়েটি রতির দিকে ভারী করুণ চক্ষে তাকিয়ে বলেছিল—আচ্ছা, ভাই বৌদি, তোমার একটা কথা মনে পড়ে?

—কি কথা?

—তুমি যেদিন বিয়ে হ'য়ে এ-বাড়ীতে এলে, তার দিন-তিনেক পরে একটা গোলমাল হয়েছিল—জানো তা'?

—কই তা' জানিনে ত'! আমাকে নিয়ে?

মেয়েটি একটু হেসেছিল, খুব ম্রিয়মান হাসি—

বলেছিল, তোমাকে নিয়ে নয়।···তারপর একটু চুপ করে' থেকে' সে বলেছিল, তোমাকে দেখ্‌তে দু'টো মেয়ে এসে রোয়াকে দাঁড়িয়েছিল...মনে নেই?

রতি একদৃষ্টে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না · কিন্তু তারপর?

—তারপর সবাই মিলে 'যা, যা' করে' তাদের তাড়িয়ে দিল...

—তা'তে কি হয়েছে! কি বল্‌তে চাও তুমি?—রতির কণ্ঠস্বর একটু উগ্র শুনাল'।

—অক্ষয়দাকে নিজের দিকে টেনে' রেখো—আর কিছু বল্‌তে চাইনে।—বলে' মেয়েটি চট্ করে' উঠে' গিয়েছিল।

রামায়ণ শুন্‌তে শুন্‌তে রতির ঐ সব কথাগুলো মনে পড়ল···

মেয়েটি তখন পড়ছে, লক্ষ্মণ সীতার চরণচ্যুত আভরণ সীতার চরণাভরণ বলে' সনাক্ত করছেন..

—বৌ, শুন্‌ছ?

রতি বল্‌ল, হুঁ।

কিন্তু সে শুন্‌ছে না—সে ভাবছে পুরাতন কথা...যেদিন সে স্বামীকে নিজের দিকে টেনে' রাখতে বিশেষ করে' সচেষ্ট হবার ইঙ্গিত পেয়েছিল, সেইদিনই হয়েছিল তার বৈধব্যের সুরু।...সেই কথা স্মরণ হ'য়ে আজও তার গা শিউরে উঠল' ... দশ বৎসর আগে মেয়েটির কথায় প্রাণ সেদিন যেমন করে' ছ্যাঁৎ করে' উঠেছিল আজও সে অনুভূতি তিলমাত্রও ক্ষীণতর হয় নাই—জ্বালা দিয়ে তা ঠিক্ তেম্‌নি তাজা আছে।

রতি বলে' উঠ্‌ল',—আজ ,ভাই, ঐ পর্য্যন্তই থাক্—আবার কাল শুন্‌ব'। মাথাটা হঠাৎ ধরে' উঠ্‌ল'।

সরোজিনী রামায়ণ বন্ধ করে' অতৃপ্ত চিত্তে উঠে' পড়্‌ল', বলল', থাক্।—বলে' সে দ্বিতীয় কথাটি না বলে' চলে' গেল।

রতির প্রাণে ঝঙ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল, রাম সীতাকে খুঁজ্‌ছেন—কল্পনায় তিলোত্তমার মত সুন্দরী মেয়ে সৃষ্টি করে' নিয়ে তাকে খুঁজ্‌ছেন না—বারাঙ্গনাকে খুঁজছেন না—পরস্ত্রীকে খুঁজ্‌ছেন না—নিষ্কলুষ চিত্তে তিনি খুঁজ্‌ছেন আপন স্ত্রীকে ···

এই অনুসন্ধান আর ,যা' না হোক্, অতীব পবিত্র। কৌমার্য্যের দিনে সে-ও পুরুষ খুঁজেছিল—নিত্যনৈমিত্তিক ছিল তার সেই আহ্বান, আর তা' ছিল পরম পবিত্র; কিন্তু তার স্বামী যে নারীকে আমরণ খুঁজে ফিরেছেন সে কেবল নারী—অপবিত্র মনে কেবল অঙ্কশায়িনী করতে তিনি নারীকে খুঁজেছিলেন—স্ত্রী বল্‌তে যা' বুঝায়, তাকে তিনি খোঁজেন নাই···তাকে পেয়ে তিনি স্ত্রীরত্ন লাভের আনন্দ অনুভব করেন নাই—ধন্য হন নাই—কেবল নারীরই রূপ আর দেহ তার রূপে আর দেহে তিনি সম্ভোগ করে' গেছেন—অন্তরে কামনা করেন নাই—পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই ··· তাকে তিনি অশুচি স্পর্শ দিয়ে দিয়ে অশুচি করে' রেখে' গেছেন – তার শরীরকে তিনি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে' দিয়ে গেছেন। ··· মনো রাগ করেছিল অকারণে।

৫

মনো চিঠি লিখেছে—

লিখেছে: "দিদি, তোমার দুরবস্থার একশেষ দেখে এসেছি। ওখান থেকে আসার পর থেকে মনটা এত খারাপ হ'য়ে আছে যে তা' বল্‌তে পারিনে। আশা করি, ভেবে' চিন্তে' এতদিনে মনটাকে সুস্থ করেছ।

তোমার স্নেহের সুকুমারবাবু ভালই আছেন।" ইত্যাদি।

"ভেবে' চিন্তে' মনটাকে সুস্থ করেছ।" মনোর এ কথার মানে এই যে, সৎপথ থেকে' রতি ভ্রষ্ট হয়েছিল—মৃত স্বামীর দোষ ক্ষমা করে' আর গুণ স্মরণ করে' অনুতপ্ত চিত্তে তাঁকে এখন ধ্যান করছ। যদি তা' না করে' থাক তবে অবিলম্বেই করো। মনো এই উপদেশ দিয়েছে।

তারপর, স্বামী সুকুমারের খবরটা অমন করে' উচ্ছ্বসিত আনন্দে দিবার উদ্দেশ্য তাকে স্বামীসম্পর্কে বিদ্ধ করা, এবং তার নিষ্ঠামূলক আর ক্ষমাময় স্ত্রীধর্ম্ম থেকে' বিচ্যুতির তীব্র নিন্দা···রতির তা' হৃদয়ঙ্গম হ'ল—কিন্তু তা'কে অর্থাৎ মনোর এই সতর্কীকরণ আর ভর্ৎসনাকে মান্য করে' ভাব্‌তে বসার হেতু কিছু নাই; ভাব্‌বার মত যা' তা' ফুটেছে ঐ আয়নার ভিতর। মনোর সদুপদেশপূর্ণ পত্রখানা হাতে নিয়ে রতি আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে—ভিতরস্থ প্রতিবিম্ব তা'কে যেন টেনে' রেখেছে, সরে' আস্‌তে দিচ্ছে না।

রতির মনে হয়েছিল, বিধবা হ'য়ে আর সধবার চিহ্নমুক্ত হ'য়ে দেখতে সে আরো ভাল হয়েছে। কিন্তু সেদিন সন্দেহ জেগেছে, তা' সে হ'তে পারে নাই-হ'তে পারা অস্বাভাবিক; হ'তে না পারার হেতুও সে পেয়েছে। আজ আবার আয়নায় সে দেখ্‌তে এসেছে, তা' সত্য কিনা।. যার সঙ্গে তার বিয়ে হ'েছিল, শাস্ত্র মতেই তার দেহের উপর সেই ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার আর একাধিপত্য জন্মেছিল; কিন্তু সে-ব্যক্তি তা' নিয়ে কেবল নিদারুণ ক্রীড়ামোদ করে' গেছে—তার কুরুচিপূর্ণ অপব্যবহার করেছে—প্রেমশূন্য কলুষ-লোলুপতার সঙ্গে আর বন্য একটা ক্ষুধা নিয়ে এই দেহটাকে সে নিষ্পীড়ন করেছে। যখন তার যৌবন পবিত্রতায় আর পরিপূর্ণতায় দেবভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল, তখন সেখানে এসে দৈবাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটি অন্ধ ক্ষিপ্ত পাপপরায়ণ দস্যু—তাকে প্রতারিত করে', ভুল বুঝিয়ে, আর অন্যায়ভাবে

লুণ্ঠন করে' নিয়ে তাকে সর্ব্বস্বে বঞ্চিত আর নিঃস্ব নিঃসম্বল করে' রেখে গেছে।

বয়স তার ছাব্বিশ, অন্তর তার শুদ্ধ, কলুষস্পর্শে দেহ তার ক্ষুণ্ণ, লুপ্ত শ্রী—মনে হয় অনধিকারী কর্ত্তৃক উপভুক্ত হওয়ার কষ্টে রতির বুক ফাট্‌তে লাগল, — মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই দেহ ভোগ করবার যোগ্যতা যার ছিল না— সে কেন তা' করে গেছে।

তারপর তার মনে হ'ল, পুণ্যদ আর পবিত্রাত্মা বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় নাই কি! গেছে। বিবাহ হয় নাই, সার্থক ফলপ্রসূ তৃপ্ত হয় নাই—পাপের বিষে জীবনহীন হয়ে মন্ত্রমালা বৈবাহিক গ্রন্থি দিয়ে সন্ধি ঘটাতে পারে নাই।

রতি তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল—থাকৃতে থাকৃতে যেন হঠাৎ দৈবোত্তেজনায় মস্তিষ্কের শক্তি বেড়ে তার মনে হ'ল, না, এখনো সে একেবারেই ফুরিয়ে যায়নি — এই দেহ নিয়ে কোথাও-না-কোথাও তার স্থান এখনো হ'তে পারে। ত্বকে এখনো লাবণ্য আছে—আয়ত চক্ষে এখনো অপরূপ দীপ্তি আছে—যৌবনের রূপ এখনো একেবারে লুপ্ত হয় নাই—দেহ নিটোল, সরস; বাহু যুগলের গঠন সৌন্দর্য্য মৃণালের সঙ্গে এখনো তুলনীয়…

রতি দুই বাহু সমান্তরালে প্রসারিত করে' দিয়ে তৃষ্ণাতুর চক্ষে নিজের চোখের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল।… পৃথিবীকে শূন্য শক্ত নীরস মনে হ'ত—তা' এখন হ'ল না। রতি একটু হেসে বেরিয়ে এল। তার মনে হ'তে লাগল, নূতনতর একটা তরল তাড়িৎ হিল্লোলে তার প্রাণে—তারি পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপে তার বিলুপ্ত যৌবনশ্রী সমুজ্জ্বল হ'য়ে মুখমণ্ডলে দেখা দিচ্ছে।

৬

পুরুষ বিপত্নীক হ'লে তাকে বিপত্নীক সেজে' থাকৃতে হবে, এমন কোনো প্রথা নাই—নারী বিধবা হ'লে তার বিধবা সাজ্‌বার একটা তোড়জোড়ই দেখা যায়। পথে-ঘাটে বিপত্নীক পুরুষকে দেখে' মহিমান্বিত ত্যাগের নিদর্শনে বুঝবার উপায় নাই যে, লোকটির স্ত্রী নাই; কিন্তু বিধবাকে যেখানেই দেখা যাক্‌, দেখেই তার অবস্থা সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহই থাকে না—সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হয়, এই রমণীর সকল সুখের এবং ভোগের শোচনীয় বিয়োগান্তক-ভাবে অবসান হ'য়ে গেছে—তার বাহিরের জীবনের উপর যবনিকা পড়েছে। … নারী আর পুরুষে এই যে পার্থক্য, একজনের পক্ষে অত্যাজ্য ধর্ম্ম, আর একজনের পক্ষে নেহাৎ হেলাফেলা, এর ভিতর পরাধীনতার বন্ধন আর স্বাধীনতার হাম্‌খোদাই খেয়াল আছে—আর আছে অভদ্র একটি ইঙ্গিত। বিপত্নীক ব্যক্তিকে জানান' হয়েছে, তোমাকে রোখে কে! তোমার জন্যে অনেক নারী বসে' আছে—গ্রহণ করো। অপর পক্ষে বিধবাকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় কাউকে মনে মনে পছন্দ করেছ কি তোমার স্খলন হ'ল—তুমি জাহান্নামে গেলে। তোমার আশা কি আকাঙ্ক্ষা করবার কিছু নেই—আছে বলে' মনে করতেও নেই…আর তা' তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে দেখা'তে হবে—তোমার চিরস্থায়ী শোকচিহ্ন অনুগ্রহকারী মৃত সেই পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন — তোমার আত্মবিলুপ্তির পথে ঋজুরেখায় চালিয়ে নেবার অঙ্কুশ… শুভ্র পবিত্র বিসর্জ্জিতসর্ব্বস্ব শোকাহত মৃতাত্মা সেজে' বসে' থাক—পুরুষের প্রলুব্ধ চক্ষু শিউরে উঠে', ফিরে' যাবে—দরদী প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে …

সত্যই মনো কেঁদেছে—

আরো অনেকেই রতির দুঃখে কেঁদেছে—

বাড়ীর ভৃত্য নন্দর মুখেও সেই দুর্দ্দিনের পর থেকে হাসি বিশেষ নাই—

ইন্দ্রজিতেশ্বরানন্দ সিংহের পত্নী রণদাকিঙ্করীও সেদিন বেড়াতে এসে রতির দুঃখে কেঁদে ফেল্‌লেন…

ইন্দ্রজিতেশ্বরানন্দ সিংহ ধনী আর জমিদার—তা তাঁর নামেই প্রকাশ। ইন্দ্রজিতেশ্বরানন্দ সিংহের স্ত্রী রণদাকিঙ্করী সেই অনুপাতে মোটা—তিনি বস্‌বার সময়ে মনে হয়, পড়লেন বুঝি ধপ্‌ করে'; আর মনে হয়, বস্‌লেন বটে, কিন্তু উঠ্‌তে পারবেন না; উঠবার সময়ে মনে হয়, আবার বুঝি বসে' পড়তে হয়।

সে যা-ই হোক্‌, রণদাকিঙ্করী কেঁদে ফেল্‌লেন; ফেল্‌বেনই, কারণ, গোকুলেশ্বর ছিলেন ইন্দ্রজিতেশ্বরানন্দ

সিংহের বন্ধু—তিনি এখনো বেঁচে আছেন। উভয় পরিবারে বিশেষ ভালবাসাবাসি।

রণদাকিঙ্করী এখানে ছিলেন না—দৌহিত্রীর বিবাহে বাইরে গিয়েছিলেন—আজই সকালে এসেছেন ··· এবং এসেই বার্ত্তা শুনে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে' পড়েছে।

অনেক আলাপের পর এল রতির ভবিষ্যৎ জীবন-যাপন কিরূপ প্রণালীতে হবে সেই কথা ···

রণদা জিজ্ঞাসা করলেন, কি করবে ভেবেছ, বৌমা? মনের একটা স্থিতি চাই ত'!

অন্তরের স্থিতিশীলতা অচঞ্চল করে' আনতে কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধনার প্রয়োজন তা' স্মরণ করে' রণদা অসহায় একটু অশ্রু মোচন করলেন।

রতি বল্‌ল, আমার মাথার ঠিক নেই, খুড়ীমা। তোমরা যা' বল্‌বে তা-ই আমি করব।

—আহা, বাছা!··· আমি বলি একবার তীর্থ বেড়িয়ে এস। তীর্থের একটা মাহাত্ম্য আছেই। সাধু-সজ্জনের সাক্ষাৎ মেলে কত!

—তা' সত্যি, খুড়ীমা। কিন্তু শান্তি আমি কোথাও পাব না, খুড়ীমা। তাঁর সঙ্গেই আমার শান্তি ঘুচে গেছে। বলে' রতি চোখের উপর আঁচল তুলে' ধরল'।

কিন্তু সহস্র নীতিসূত্রের চাইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলপ্রদ—

রণদার তা' মনে পড়ল', এবং শান্তিলাভের উদাহরণ এবং পথ তিনি আরো দেখালেন···

বেশীদিনের কথা নয়, বেশী দূরের কথাও নয়—রণদার এই দৌহিত্রীর বিবাহে সমাগত কুটুম্ব আত্মীয়গণ যারা এসেছিল তাদেরই ভিতর ছিল একটি 'আবাগী'—তারও অদৃষ্ট রতিরই মত—রতিরই বয়সী সে। রণদা শুনে' এসেছেন, সে মেয়েটি আর কোথাও এবং আর কিছুতেই শান্তি না পেয়ে গুরু ডেকে দীক্ষা নিয়েছে—আর শিব-পূজায় দীক্ষিতা হয়েছে। ··

মেয়েটি বলেছে, শান্তি সে পেয়েছে—দিবারাত্র সেই ধ্যানেই সে থাকে—নিজেকে নিযুক্ত করে' রাখে অষ্টপ্রহর···

তারপর রণদা প্রস্তাব করলেন, তেম্‌নি কিছু করো না, বৌমা, একটা প্রতিষ্ঠা টতিষ্ঠা!

রতি বল্‌ল, তা' আমি ভেবেছি, খুড়ীমা — ভাবতেই জ্বালা যেন খানিক্ জুড়িয়েছে। ভগবানের গোপালমূর্ত্তি আমার বড় ভাল লাগে।

শুনে' রণদার বুক ছল্‌ছল্ করে' কেমন ঠেকতে লাগল' তা' বলা যায় না। শিশুতে ভগবানের গোপাল-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করা প্রত্যেক জননীর সহজ প্রাণধর্ম্ম ... সেই মূর্ত্তিকে লালন করার জাগ্রত লালসা নিয়েই সসন্তান সধবা এবং নিঃসন্তান বিধবাও আপন অস্তিত্ব অনুভব করছে ... রতির মুখের এই ইচ্ছা এমন স্বাভাবিক আর সুন্দর আর পিপাসাতুর লালনলালসায় এমন প্রাণস্পর্শী মধুর শুনাল' যে, রণদা পুনরায় কেঁদে ফেললেন — প্রত্যেক নারীর শাশ্বত আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি রতি করেছে।

বল্‌লেন, আহা, তা ই করো, তা-ই করো, বৌমা; তোমার ভাল হোক্। ... তোমার ভাল হবে — সতীর ইচ্ছা গোপালই পূর্ণ করবেন। শিব-টিব নয়, গোপালই তোমার চাই। ··· ঠাকুরের সেবা করবে তুমি নিজে হাতে—তাতে কোনো দোষ হবে না; বিধবা আর ব্রাহ্মণ সমান। কিন্তু পূজো করিও পুরুতকে দিয়ে — ফল মূল মিষ্টি ভোগ দিলেই চলবে। বলে' রণদা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে' দিয়ে ভারি তৃপ্তি লাভ করলেন। ·· তারপর অন্য কথা এনে ফেল্‌লেন—দৌহিত্রীর বিবাহে কেমন ঘটা হ'ল তার পুনরাবৃত্তি করলেন, জামাই কেমন হ'ল তারও বর্ণনা দিলেন ···

তারপর যখন উঠে গেলেন তখন তাঁর সন্তোষ দেখ্‌বার মত—অকাল-বিধবা তাঁর কন্যাতুল্যা রতি দিশে পেয়েছে।

কিন্তু তিনি চলে' যেতেই রতি যা' করল তা' হঠাৎ তিনি দেখে' ফেল্‌লে নিশ্চয় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়তেন—রতি খানিক্ হাস্‌ল' ··· ভগবানের গোপাল-মূর্ত্তির উল্লেখটা বেশ লাগসই হয়েছে। মনেও পড়েছিল ঠিক্ সময়মত।

হাস্‌তে হাস্‌তে সে গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল—

নন্দকে ডেকে' একখানা খামের চিঠি ডাকে দিতে সে পাঠিয়ে দিল।

— ক্রমশঃ

পল্লীগীতিকায় নারীপ্রেমের ভূমিকা

শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় সাহিত্যে নারী একটি গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নারীচরিত্রের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম আছে, যাহার জন্য কবির কাব্যে তাহারা অমর। ত্যাগে, সেবায়, প্রেমে ভারত রমণী একদা আদর্শের উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন—প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নারী আন্দোলনকে অনেক সময় নারী জাগরণ বলা হয়, কিন্তু ইহা ভুল। নারী-জাগরণ বহুপুর্বেই হইয়াছিল, ইহা তাহারই নবজাগরণ বা Revival। আমাদের বৈদিকযুগের লোপামুদ্রা, ঘোষা, শাশ্বতী, উপনিষদযুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসা, মহাকাব্যের আত্রেয়ী, তৎপরবর্ত্তী যুগের লীলাবতী, মীরাবাঈ—ইহারা স্বনামধন্যা। শিক্ষায়, দীক্ষায়, পাতিব্রত্যে, সংসারধর্মে ইহারা ছিলেন আদর্শস্থানীয়া। সীতা সাবিত্রীর আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা হিন্দু রমণীর অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যুগে যুগে দেশে দেশে এবং সমাজে বিপ্লব আসে, কত রাজ্য ধ্বংস হয়, কত নূতন দেশ গড়িয়া ওঠে কিন্তু আদর্শের অক্ষয়কীর্তি এতটুকুও পরিম্লান হইতে পারে না। সীতা সাবিত্রীর আদর্শ তাই পরবর্তীকালের নারীদের জীবনের মর্মে মর্মে প্রসারিত হইয়াছিল। পল্লীগীতিকার মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা প্রভৃতি নারী-চরিত্রেও সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ দেখিতে পাই এবং তাহাদের চরিত্র-সুষমায় মুগ্ধ হই।

গীতিকায় নারীচরিত্রই প্রধান। নারীর প্রেম, নারীর হৃদয় ইহাতে পরিপূর্ণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে প্রেম, সেই প্রেমের জন্য নরনারীকে ধৈর্য্য, ত্যাগ দেখাইতে যে কতখানি সহনশীলতার দরকার—তাহারই অভিব্যক্তি এই গীতিকাগুলিতে পাই। প্রেমের জন্য নায়কনায়িকাকে পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে কিন্তু একটা সুন্দর জিনিষ আমরা দেখি যে নরনারী অনুরাগে ব্যাকুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা তাহাদের মিলনকে সামাজিক বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছেন। মহুয়া নদেরচাঁদকে স্বামীত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল। কাঞ্চনমালা রাজপুত্রকে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিতা ছিল। সামাজিক ও নানা দৈবিক দুর্ঘটনার প্রতিকূল স্রোতে তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ভাসিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু ব্যর্থ হয় নাই। প্রেমের গভীরতা পদে পদে আঘাত পাইয়া আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শত বিপদের পরও পল্লীগীতিকার নায়িকাকে বলিতে শুনি—

> কেমন কইরা যাইবাম দেশে বন্ধুয়ে মারিয়া
> তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া
> আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে
> তার কাছে সুজন বাগ্যা জোনাই যেমন জ্বলে।
> সোনার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ
> আমার চক্ষু নিয়া তুমি নয়ান ভইরা দেখ।

শ্রীরাধিকার অফুরন্ত প্রেমের ধারার পার্শ্বে বাংলার শ্যামল কুটিরচ্ছায়ায় পল্লীনায়িকাদের প্রেম যেন মালতীকুসুমের মত ফুটিয়া উঠিয়া অঙ্গণের শোভা বর্ধন করিতেছিল।

বিরহিণী শ্রীরাধার কাতরোক্তি—

> নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস
> সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাশ।

আর এদিকে কঙ্কের অদর্শনে প্রেমিকা বিরহ-বিধুরা লীলার অবস্থা দেখুন—

> নয়নেতে নিদ্রা নাই, পেটে নাই অন্ন
> সর্বস্থানে খুঁজে লীলা করি তন্ন তন্ন।

শৈশবের ক্রীড়াসাথী, কৈশোর ও যৌবনের বিলাসসঙ্গী, দিনের পর দিন যাহার সঙ্গে অন্তরের প্রেমলীলা চলিতেছিল, সেই কঙ্কধর আজ কোথায়? কঙ্কের বাঁশী আর বাজে না, ভাটিয়াল গানে আজ আর তরুলতা মুগ্ধ হয় না, কঙ্ক যে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে—'শূন্য গৃহ পড়ে আছে দেখে অভাগিনী'। তখন পাগলিনীপ্রায় লীলা বন হইতে বনান্তরে তাহার কঙ্কধরের সন্ধানে ছুটিয়া চলিল। বনের কুসুম, বনের পশুপক্ষী, তরুলতা, নদী, পাহাড় সকলকে বিরহিণী শুধাইতে লাগিল—আমার

কঙ্কধরকে তোমরা দেখিয়াছ ? দিনমণিকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি,
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও—
আলোক চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও ॥

প্রেমের জন্য গীতিকার নায়িকারা অনেক সময় কুলত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নারীর ধর্ম বিসর্জন দেয় নাই। নারীধর্মের যে উজ্জলমূর্তি এই গাথাগুলিতে অঙ্কিত হইয়াছে –দুঃখে ও বিপদে তাহার ধৈর্য, পাতিব্রত্যে ও প্রেমের একনিষ্ঠতায় তাহাদের তুলনা বিরল। কুলধর্ম ত্যাগ করিল বলিয়াই যে তাহারা অসতী হইয়া গেল, এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। কুলের বাহিরে আসিয়াও যে সতীত্বের চরম পরাকাষ্ঠা তাহারা দেখাইয়াছে, তাহার নিকট আচার্যের ধরাবাঁধা আইনকানুন নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃত সতীত্বের জন্ম হয় প্রেমে। প্রেম যাহাকে রক্ষা করে, তাহার বিনাশ হইবে কিসে? পল্লীগীতিকার নারীদের এই যে প্রেম, এই প্রেম সমস্ত মানবজাতির আকাঙ্খিত বস্তু। দীনেশ বাবু বলেন—'সমাজ তাহাকে (এই প্রেমকে) রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।' কুটুনীর লোভনীয় প্রস্তাবে, কাজীর ধৃষ্টতা ও দেওয়ানের উৎপীড়নে পড়িয়া শত অভাবের মধ্যেও মলুয়া আপন প্রেমের খর্বতা স্বীকার করে নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া সে প্রেমের সাগরে পাড়ি দিয়াছিল, নানা দুঃখ কষ্টের দিনেও একদিনের জন্যে সেই বিনোদের প্রতি তাহার একটুও মনোভাব পরিবর্তন হয় নাই। পঞ্চভ্রাতার ভগিনী হইয়া, শৈশবে নানান সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়াও প্রেমের জন্য এই নারীর যে আত্মত্যাগ, তাহা অপূর্ব। জীর্ণগৃহে অনশনে বাস করিয়াও স্বামী-গৌরবে চিরদিন সে অম্লান রহিয়াছে। কুটুনীর প্রলোভনকারী প্রস্তাব সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়াছে—

কাজিরে কইও কথা নাহি চাই আমি
রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী।
আমার সোয়ামী সে যে পর্বতের চূড়া,
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া।
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান
না হয় দুষমণ কাজি নউখের সমান।

আবার একদিকে নানান দুরবস্থায় পড়িয়া বিনোদ যখন মলুয়াকে তাহার পিত্রালয়ে যাইতে বলিল, তখন মলুয়ার উত্তর শুনুন—

বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায়,
তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায়।
সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া,
বড় সুখ পাইবাম তোমার চন্দ্রামিত্তি খাইয়া।
* * *
শাক ভাত খাই যদি গাছ তলায় থাকি
দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি।
পিরথিমির সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা।

প্রেমের রাজ্যে এই মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়? আইনকানুনে বাঁধা সতীত্বের ধর্ম কতটা খর্ব হইল, আচার্যেরা ইহার বিচার করিবেন, কিন্তু যে সতীত্ব চিরন্তন, প্রেমের মধ্যে যাহার উদ্ভব ও প্রেমেই যাহার লয়—সেই খাঁটি সতীত্বের উজ্জল দৃষ্টান্ত মলুয়া ও গীতিকার অন্যান্য নায়িকাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মলুয়ার মত ভেলুয়াও তাহার ভাই ও পিতার ঐশ্বর্যের মোহ ত্যাগ করিয়া মদনকুমারের প্রেমে ভাসিয়া চলিল। তারপর, জীবনে কত ঝড়ঝঞ্ঝা আসিল, নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল, মদনকুমারের সহিত স্থানের বিচ্ছেদ ঘটিল, কিন্তু মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। নানা বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনার পরিসমাপ্তিতে ভেলুয়া ও মদন-কুমারের মিলন প্রেমেরই জয় ঘোষণা করিল।

রূপকথার কাঞ্চনমালা নিজের সুখ অপেক্ষা স্বামীর মঙ্গলই বড় দেখিল। অন্ধ স্বামীর দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য কাঞ্চনমালা নিজের জীবনে সব চেয়ে বড় শাস্তি মাথা পাতিয়া নিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

স্বামীর সুখের লাইগ্যা আমি যাইবাম ছাড়িয়া
সোয়ামীরে কর সুখী নয়ন দান দিয়া।
কি জানি বলিলে পাছে স্বামীর না হয় ভাল
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল।

সপত্নীর হাতে স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের স্বার্থত্যাগ ও স্বামীর জন্য নিজের জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন, একমাত্র

পল্লীগীতিকায়ই সম্ভব। কাঞ্চনমালা শুধু প্রেমিকা নহে, দধিচীর-গৌরবে মহিয়সী।

'ধোপার প্যাটে' রাজপুত্র ও রজকিনী কাঞ্চনমালার প্রেম ও তাহাদের গৃহত্যাগ। রাজপুত্র তাহার রাজত্বের মোহ ত্যাগ করিল, কাঞ্চনমালা পিতামাতার স্নেহমমতা ভুলিয়া গেল—প্রেমের এমনি গভীরতা!

ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু, পর কইলাম আপন
অবলার কুলভয় হইল দুষমণ।
কিসের কুল, কিসের মান, আর না বাজাও বাঁশী
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণের দাসী।

কিন্তু, কাঞ্চনমালার জীবনে ইহার পরে যে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটিল, তাহা বড়ই করুণ! বিপদের মধ্যেও যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে বাঁচিয়াছিল, সেই রাজপুত্র বিধাতার চক্রান্তে এক রাজকন্যার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। কেহ কেহ এইজন্য রাজপুত্রের উপর প্রসন্ন নহেন; কারণ, যাহার জন্য রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়া এবং যাহাকে সঙ্গে লইয়া সে প্রেমের পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিল, মাঝপথে সেই হতভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া অপর এক রমণীর সহিত বিবাহ—ইহা রাজকুমারের প্রেমের ভঙ্গুরতা স্বীকার করে। কিন্তু আমরা এ স্থলে দেখিব যে, রাজকুমারের প্রেমে দৌর্বল্য থাকিলেও কাঞ্চন নিজের প্রেমের গভীরতায় তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। যখন রাজপুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী তাহার কাণে গেল, তখনও তাহার প্রতি কাঞ্চনমালার প্রেম এতটুকুও খর্ব হয় নাই। রাজপুত্রকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য পাগলিনীর বেশে রাজপুরীতে গমন এবং বন্ধুর সুখের জন্য নিজের প্রাণ আহুতি দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে নাই। 'বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিয়াছি, মনের আশা আমার মিটিয়াছে। সুন্দর নারী লইয়া বন্ধু সুখে থাকুক, তাহা হইলেই আমার সুখ।' এই কথা কতবড় প্রেমিকা হইলে বলিতে পারে?

মনের দুঃখু মিটিয়াছে মিটিয়াছে আশা
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা।
সুখেতে থাক গো বন্ধু সুন্দর নারী লইয়া
সুখে কর গীরবাস জনম ভরিয়া।

না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম
তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম।

শ্রীরাধিকার প্রেম ও পল্লীগীতিকার নায়িকাদের প্রেম—উভয়ই তীব্র ও গভীর। যদিও রাধাকৃষ্ণ হইলেন প্রতীক (symbol), তথাপি প্রেমের দিক হইতে গীতিকার নারীদের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য যাহা আছে, তাহা পরিণতিতে। শ্রীরাধিকা প্রেমের জন্য কুলমান সবই ত্যাগ করিয়াছিল, সমাজের কোন নিষেধ মানিল না—

গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই, কহ আন।

গীতিকার নায়িকারাও প্রেমের জন্য যথেষ্ট আত্মত্যাগ করিয়াছে। দুর্জয়, শক্তিশালী প্রেমের কাছে সামাজিক বাধা নিষেধ বন্যার জলে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে। তাই—

ঘর কইলাম বাহির রে, বন্ধু
পর কইলাম আপন।

কিন্তু রাধিকার প্রেম মর্ত্যের মায়া ছাড়িয়া অবশেষে দূর দূরান্তরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আমাদের চক্ষের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। গীতিকার নারীদের প্রেম পল্লীপ্রাঙ্গণের মাঝখানেই ঘুরিয়া বেড়ায়, বাহিরে যাইতে চাহে না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আধ্যাত্মিকতা আছে, পল্লীগীতিকায় তাহা নাই। মর্ত্যের ধূলামাটি আলো, বাতাস, তরুলতার সঙ্গে গীতিকার প্রেম জড়িত, রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনেকটা স্বর্গীয়। দীনেশবাবুর ভাষায় বলা যায়—'পল্লীগাথায় প্রেম সুরধুনী, বৈষ্ণবপদে প্রেম মন্দাকিনী।' বৈষ্ণবদের প্রেম এমন একস্থানে উপনীত হয়, যেখানে অসীম এক বেদনা বাজে—

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

কিন্তু গীতিকার প্রেমের শেষ পরিণতি এই—

ফুল যদি হইতাম বন্ধু, ফুল হইতা তুমি
কোণাতে ছাপাই রাখ্‌তাম, ঝাইড়া বান্‌তাম বেণী।

পৌরাণিক নারী-চরিত্রের সঙ্গে গীতিকার নারী-চরিত্রের যে প্রভেদ, তাহা মৌলিক নহে, সামাজিক আবেষ্টনীর। পৌরাণিক যুগের নারীদের জীবনে দেবতার প্রভাব অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত ছিল। নারী সেখানে

অসহায়া। অসহায়া বলিয়াই প্রেমের তীব্রতা সত্ত্বেও সে আপন ইচ্ছামত চলিতে পারিত না; পথে চলিতে চলিতে দেবতার আশীর্ব্বাদ তাহাকে নিতে হইত। তাহারা অনেকটা দৈবাধীনা ছিল। সেই জন্যই মৃত স্বামীর শব লইয়া সাবিত্রী তুর্বলার মত বসিয়াছিল, কারণ সত্যবানের জীবনের অনেকখানি দৈবায়ত্তে ছিল। গীতিকায় এই দৈবায়ত্ততা নাই, আপন কর্ম্মের ফল আপনাকে ভোগ করিতে হইবে, দেবতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তপস্বিনী চন্দ্রাবতী তাহার নিষ্পাপ হৃদয়কে শিবের পায়ে উৎসর্গ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু জয়ানন্দের আকর্ষণও তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চন্দ্রাবতী শিবের উপাসনা করিত। জয়ানন্দের প্রার্থনা তাহার কাণে যাইত না। কিন্তু যেদিন জয়ানন্দ মন্দির ভিত্তিতে মালতী ফুলের রসে অন্তরের শেষ আকুলতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল সেই দিন—

জলে গেলা চন্দ্রাবতী, চক্ষে বহে পানি
হেনকালে দেখে নদী ধরিছে উজানী
একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ
জলের উপর ভাসে জয়ানন্দের দেহ।

চন্দ্রাবতীর চক্ষে তখন জলধারা ঝরিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেম-বন্যার জল ছুটিল। কবি গাহিলেন—

স্বপ্নের হাসি, স্বপ্নের কান্দন, নয়ান চান্দে গায়
নিজের অন্তরের দুক্ষ পরকে বুঝান দায়।

গীতিকার এই সব নায়িকা চরিত্র আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া দেয়। প্রেমের নিবিড় বন্ধন, ধৈর্য, সাহস, ব্রত-চারিণীর নিষ্ঠা, চরিত্রের সর্বতোমুখী বিকাশ—পল্লী-গীতিকার প্রাণ। সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে, জীর্ণ গৃহে বাস করিয়াও মলুয়ার কি উজ্জ্বল মূর্তি, পদে পদে বাধাবিঘ্নের আঘাত খাইয়াও নদেরচাঁদের প্রেমে মহুয়া গৌরবিনী, তপোনিরত চন্দ্রার অন্তরের অপূর্ব শান্তি, প্রেমের মন্দিরে আত্মত্যাগ—দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা মুগ্ধ হই, আত্মহারা হই। এ প্রেমের তুলনা বুঝি আর কোথাও নাই।

নারী-প্রেমিকের প্রতি

শ্রীহিরণ্ময় মুন্‌সী

নারী-প্রেমিক! নারীর কথায় জিহ্বাতে রস ঝরে
কপ্‌চে মরো নারী-প্রেমের বুলি,
নারীর প্রতি অত্যাচারটা দেখ্‌ছো চোখের পরে?
দেখো চেয়ে চোখের চশমা খুলি'।

হাজার সীতা কাঁদছে ব্যথায় পাপের অশোক বনে
লোভ-দশানন তাকায় কুড়ি চোখে,
হাজার যাজ্ঞসেনীর বসন হর্‌ছে দুঃশাসনে,
হাজার দৈত্য দেবীর প্রতি রোখে।

নারী-হরণ নিত্য যেথায় ... ধর্ষনেরি গ্লানি ...
অমর্য্যাদা নিত্য চিত্ত দহে,
সেথায় হাজার নারী-প্রেমিক নারীত্বে শেল হানি'
নারী-প্রেমের রসাল কথা কহে।

নারীরে চাও করতে পুরুষ?...ফাটাও বটে গলা!
সুখের হবে নারী বাইরে এলে?
আদিম যুগের বর্ব্বরতার পূরবে ষোলকলা,
[illegible] নারী সব ফেলে আজ গেলে।

নারীর সাথে পার্টনার-শিপ! রোচক ভারী হবে?
বটে! নারী হবে প্রাণের ইয়ার?
সদর পথে ... পার্কে ... লেকে ঘুরবে সগৌরবে
শুনবে নারীর মুখে কি ... মাই ডিয়ার?

নারী-প্রেমিক! প্রেম তো ও নয় ... মাংস-লোলুপতা,
তাই নারীরে চাইছ সুখের গ্রাসে,
নারী-স্বাধীনতার নামে প্রচণ্ড লুব্ধতা
উগ্র হয়ে জাগছে—মরি ত্রাসে!

প্রেমের বুলি থামাও বাপু! নারীর শুভকামী!
ঘুচিয়ে দাও নারীর অমর্য্যাদা,
ধুঁক্‌ছে নারী পাপের অতল গহ্বরেতে নামি',
উর্দ্ধে তারে তুলতে পারো দাদা?

ষণ্ডামী আর গুণ্ডামী আজ ছুটছে নারীর পিছে
—জোরসে মুগুর মারো তোমাদের মাথে,
নইলে ওগো নারী-প্রেমিক! প্রেম তাদের মিছে
কুম্ভীপাকে ডুবৰে নারীর সাথে।

নাটাল : দক্ষিণ আফ্রিকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বর্ত্তমান যুগের ভৌগোলিকগণ নাটাল নাম ব্যবহার করিলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত এই প্রদেশের নাম নেটাল হওয়াই উচিত। কারণ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে যিশু খৃষ্টের "নেটাল ডে" বা জন্মদিবসে ইহা ভাস্কো-দা-গামার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল বলিয়াই এই নাম। ইহার পর তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া শ্বেতাঙ্গ জাতিরা ইহার কোন সংবাদ জানিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরাজ ইহার উপকূলে পদার্পণ করিয়া দেখিতে পায়, জুলু জাতির অত্যাচারে তথাকার জনপদ-সমূহ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা দ্বারা ইংরাজদিগের স্থাপিত উপনিবেশ আক্রান্ত হইলে, কিং নামক একজন সাহসী ইংরাজ বর্ব্বর-জাতিপূর্ণ দুর্গম প্রদেশের উপর দিয়া সাত শত মাইল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গ্রেহাম্‌স টাউন নামক স্থানে সাহায্যের জন্য গিয়াছিলেন। তখন সাত শত মাইল দূরবর্ত্তী এই জনপদটিই ছিল সাহায্য পাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকট স্থান। ইহা হইতে উপলব্ধি করা যায়, কিরূপ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া ইংরাজদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ওলন্দাজরা ইংরাজদিগের প্রাধান্য সন্তোষের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।
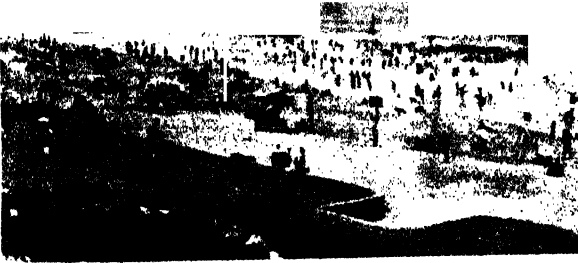
আব্‌হাওয়া বা জলবাতাসের দিক দিয়া বিচার করিলে, নাটাল বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অধিকার করিবার উপযুক্ত দেশ বলিয়া অবশ্যই বিবেচিত হইবে। সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত ড্রাকেনবার্গ নামক পর্ব্বতের পার্শ্ব বা ঢালুগুলি অতিশয় স্বাস্থ্যকর। পার্শ্ববর্ত্তী বারিধিবক্ষে প্রবাহিত 'গালফ ষ্ট্রীম' আখ্যায় অভিহিত উত্তপ্ত উৎস সমূহের জন্য এই দেশের আব্‌হাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ-সাধক হইয়াছে, ইহাও সত্য। অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত মালভূমিগুলি অপেক্ষা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এই প্রদেশের ভূমি বহুগুণ উর্ব্বর। এই উর্ব্বরতার জন্য নাটাল "গার্ডেন-কলোনি" বা "উদ্যান-উপনিবেশ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিবেশী প্রদেশসমূহ ইহার নাম দিয়াছে "কলোনি অফ্ স্যাম্পলস্"। উৎপন্ন বস্তুসমূহের বৈচিত্র্যই এই বিচিত্র নামকরণের কারণ।

সমুদ্রতীর : দার্ব্বাণ

উপকূলাংশ হইতে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিবার পর, ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণ গিরি-বর্ত্মের উপর দিয়া ট্রান্সভাল হইতে এই দেশের উর্দ্ধাংশে প্রবেশ পূর্ব্বক গণতন্ত্র গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শ্বেতাঙ্গদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দুর্দ্দান্ত দেশীয়-দিগের সহিত বহু সঙ্ঘর্ষের হেতু হইয়াছিল। ইংরাজ ও ওলন্দাজ—এই শ্বেতাঙ্গ জাতিদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কতিপয় সঙ্ঘর্ষ সঙ্ঘটিত হইবার কারণ। প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজদিগের

জুলু-ল্যাণ্ড লইয়া ইহার আয়তন প্রায় ৩৫ হাজার বর্গ মাইল। এই প্রদেশ সমুদ্রতীর হইতে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চাতালের ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়া অবশেষে অভ্যন্তরস্থ মালভূমির সীমান্তে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। এই বিভিন্ন স্তর ইহার আব্‌হাওয়াকে বিচিত্র করিয়াছে। আমরা এই প্রদেশকে তিনটি নৈসর্গিক বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

প্রথমে উপকূলাংশ। এই অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ভূমি বিশেষ উর্ব্বর। আব্‌হাওয়া অতিরিক্ত উষ্ণ নহে। ইক্ষু, কদলী, আনারস, ভুট্টা, কতিপয় কলাই, শাক-সব্জী এই অঞ্চলে জন্মায়। গিরি-গাত্রে চায়ের চাষ চলে। কার্পাসও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে এক বৎসরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন তুলা এখানে জন্মিয়াছিল।

ইহার পর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। ইহা উপকূল এবং অভ্যন্তরস্থ মালভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই অংশে ভুট্টা, গম, 'কাফির কর্ণ' আখ্যায় অভিহিত শস্য ও তামাক উৎপন্ন হয়। পশুপালন এই অঞ্চলের প্রধান কার্য্য। পশুপালনের পরিণামরূপে এই প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পশম এবং চামড়া চালান যায়।

মেয়ঁস গার্ডেন—আলেকজেন্দ্রা পার্ক : পিটার মরিটজবার্গ

ইহার পর মালভূমি বা সমুচ্চ প্রান্তরপূর্ণ প্রদেশ প্রসারিত। এই প্রদেশ প্রধানতঃ পশুপালনের জন্যই প্রসিদ্ধ। এই অংশে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-উৎপাদনকারী বিস্তৃত বনানীও বিদ্যমান।

উপকূলবর্ত্তী নিম্নভূমিগুলিতে তালজাতীয় তরুশ্রেণী, বেণুবৃক্ষ, ম্যাংগ্রোভ বৃক্ষ এবং কফি, আরারুট, ধান্য ও আর্দ্রক বা আদা জন্মিতে দেখা যায়। উপকূলের নিম্ন-ভূমিগুলি পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইলে পর্ব্বতশ্রেণীর পদতলে প্রসারিত যে সকল উচ্চতর স্থান দেখা যায়, উহারা উৎকৃষ্ট চারণভূমি বলিয়া ঐ প্রদেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পশুপালনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই দেশে উৎপন্ন পালিত পশুপালনের বৈশিষ্ট্য—ইহারা খর্ব্বকায় কিন্তু দীর্ঘ-শৃঙ্গ হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার পালিত পশু আমদানি করা হইতেছে। আঙ্গোরা হইতে আনীত সুদীর্ঘ রেশমী-লোমযুক্ত ছাগও নাটাল নিবাসী পশুপালকরা পুষিয়া থাকে।

আফ্রিকার অন্যান্য অংশের ন্যায় ভুট্টাই আদিম অধিবাসীদিগের প্রধান ফসল। ভুট্টা-গাছের শীর্ষগুলি "মিলি" নামে অভিহিত। ইহা মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে লৌহ এবং পাথর কয়লা (প্রায়ই উর্দ্ধস্থ ভূস্তরে) পাওয়া যায়। রৌপ্যমিশ্রিত সীসা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। নাটালের সলটপিটর বা যবক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত। স্বর্ণও পাওয়া যায় এবং যাহাতে লাভবান হইবার মত স্বর্ণ সংগ্রহ করা যায় তদ্বিষয়ে প্রবল চেষ্টা বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকল প্রকার হিতকর বা লাভজনক চেষ্টা বোয়ার যুদ্ধের সময় স্থগিত ছিল।

নাটালের উন্নতি-পথের একটি প্রধান বাধা শ্রমিক সমস্যা।

তাপ-প্রধান অত্যুর্ব্বর অংশগুলিতে, শ্বেতাঙ্গদিগের পক্ষে পরিশ্রম করা কঠিন, অথচ আদিম অধিবাসীরা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে নারাজ। এইরূপ অবস্থায় উপনিবেশিকদিগকে বাধ্য হইয়া ভারত হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হইয়াছিল। ভারতীয় শ্রমিক সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাহাদিগের খাইতে পরিতে অল্প ব্যয় হয় বলিয়া তাহারা স্বল্পেই সন্তুষ্ট। ভারতীয় শ্রমিকদলের সহিত ভারতীয় বণিকদলও নাটালে গমন

করিয়াছিল। • ইহারা এই দেশে এইরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই আর ছিল না। দেশে কাজ পাওয়া কঠিন অথচ নাটালে কাজের অনুপাতে কুলীর সংখ্যা কম বলিয়া সকলকেই সমাদরের সহিত নিযুক্ত করা হইত। ভারতীয় বণিকরাও নাটালে গিয়া প্রথম প্রথম বিশেষ উন্নতিই করিয়াছিল। আমরা কিছুকাল পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, এই দেশে প্রায় ১ লক্ষ ভারতবাসী বাস করিত। য়ুরোপীয় অপেক্ষা ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল অধিক।

শ্বেতাঙ্গজাতির শাসনে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরাও আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছিল—এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না। নাটালের আদিম অধিবাসীদিগের সংখ্যা ১০ লক্ষের কম নহে। ইহাদিগের মধ্যে জুলু (Zulu) জাতিই দুর্দ্দান্ত। মধ্যে

সাহায়ান সম্প্রদায়ের নারী

মধ্যে জুলুরা বিদ্রোহী হইয়া অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে উপনিবেশিকদিগের মধ্যে স্কটিস জাতির আধিক্য বা প্রাধান্য বিদ্যমান বলিয়া অনুমান হয়। জার্ম্মাণ ও নরউইজিয়ান উপাদানও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ছাড়া মালয়, চীনা এবং ভারত মহাসাগরের বক্ষে বিরাজিত দ্বীপপুঞ্জের "ক্রিয়োগ" আখ্যায় অভিহিত জাতি এই দেশে বাস করে। এই সব মিলিয়া ঔপনিবেশিকদলের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ হইবে।

জনৈক যুবক জুলু-সর্দ্দার

এই দেশের উন্নতির অন্যতম অন্তরায় বন্দর বা পোতাশ্রয়ের নৈসর্গিক বা স্বভাবগত অভাব। জাহাজ বা জলযান যাতায়াতের যোগ্য জলধারার অভাবও অস্বীকার করা যায় না। দার্ব্বাণই এখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য বন্দর। জনৈক ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরের নাম হইতে এই পোতাশ্রয়টি দার্ব্বাণ আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছে। এই বন্দরটির উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে বটে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। এই বন্দরের সম্মুখে এবং নদী-মুখে বালুকারাশি জমিয়া যাওয়ার জন্য বড় বড় জাহাজের পক্ষে যাতায়াত সহজ নহে। অনেক সময় বড় জাহাজকে দার্ব্বাণ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং যাত্রীদিগকে "ক্রেটের" সাহায্যে উপকূলে অবতরণ করিতে হয়।

দার্ব্বাণে পদার্পণ করিলে প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে জুলু-কুলীদিগের চালিত রিকৃশাগুলি; জুলু-রিকশা চালক-

জনৈক বৃদ্ধ সাহায়ান সর্দ্দার

দিগের অতি বিচিত্র বেশ সর্ব্বাধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শকটের সম্মুখে সংযোজিত অশ্বের ন্যায় ইহারা দাঁড়াইয়া থাকে এবং আরোহীর ইঙ্গিত মাত্র শুধু অশ্বের মতই বেগে ছুটিতে থাকে তাহা নহে, ক্রীড়ারত বালকের ন্যায় সকল বিষয়ে অশ্বের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এখানে রিকৃশার সংখ্যাই বেশী। তাই বলিয়া ৭০ হাজার নরনারীর আবাসস্থলী এই নগরে ট্রাম, মোটর প্রভৃতি নাই তাহা নহে। পথচারীদের বেশ-বৈচিত্র্য এবং সেই বেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য ও চিত্তাকর্ষক পথগুলি প্রশস্ত এবং পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান গৃহগুলি সুদৃশ্য, বিশেষ সরকারী সৌধসমূহের সৌন্দর্য্য স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

দার্ব্বাণকে "সিটি অফ্ ভিশন" বা স্বপ্নপুরী আখ্যা দান করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই সুন্দর নগর ও বন্দর, এই আখ্যার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বালুকারাশি সঞ্চিত হওয়ায় জন্য যতই অসুবিধা ঘটুক, ইহা যে বর্ত্তমান যুগের একটি বিশ্ব-বিখ্যাত বন্দর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ইহাও সত্য কথা। ইহার সরকারী আখ্যা "পোর্ট নাটাল"।

দার্ব্বাণের চতুর্দ্দিকের চিত্ত-চমৎকারী দৃশ্য ভ্রমণকারীর মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। একদিকে ভারত মহাসাগরের চির-চঞ্চল বীচিময় চুম্বিত উদার উপকূল—শুভ্র সৈকত। সেই শুভ্র সৈকতে নানা বর্ণ-বিচিত্র পরিচ্ছদধারী স্নানরত নরনারী ও ক্রীড়ারত বালকবালিকা। সহরের অপর পার্শ্বে সবুজ শোভায় সমৃদ্ধ উপবনাবলী। দার্ব্বাণের তরুলতার প্রাচীসুলভ শান্তসুষমা ও শ্যামলতা প্রতীচীর পর্য্যটকের পক্ষে অতিশয় প্রীতিপ্রদ। বিভিন্ন জাতির বাসস্থলী এই নগরের বক্ষে প্রাচী ও প্রতীচী সম্মিলিত হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না। ওয়েষ্ট এবং স্মিথ ষ্ট্রীটে ভ্রমণ করিলে উপলব্ধি করা যায় আধুনিক সভ্যতার সকল উপকরণে এই সহর কিরূপ সমৃদ্ধ। পথের দুই পাশে বড় বড় দোকান ও সরকারী কার্য্যালয়সমূহ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সৌধসমূহ যেমন সমুন্নত তেমনই সুদৃঢ়। সরকারী কার্য্যালয়গুলি কংক্রিটের গাঁথনি। প্রাচ্য দেশসমূহের নরনারী যে পল্লীতে বাস করে তথায় আসিলে মনে হয় প্রাচীর কোন প্রসিদ্ধ নগরে উপনীত হইয়াছি।

শস্যক্ষেত্রে কর্ম্মরত কাফ্রী কৃষক

প্রাচীর সহিত প্রতীচীর সংযোগসাধক ভারত মহাসাগরের তীরদেশে দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্তের শোভা যিনি

দেখিয়াছেন তিনি সেই দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারিবেন না। আমরা দার্ব্বাণে অবস্থানকালে প্রায়ই সূর্য্যাস্ত সময়ে সমুদ্র-তটে আসিয়া সেই দিব্য দৃশ্য দর্শন করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে মগ্ন হইতাম। ভারত মহাসমুদ্রের গভীর বারিরাশির গম্ভীর গর্জ্জন-গানের মধ্যে আমরা যেন আমাদের স্বর্গাদপি-গরীয়সী জন্মভূমি ও মানব জাতির মহাতীর্থ স্বরূপ ভারতবর্ষের সংবাদ শুনিতে পাইতাম। সান্ধ্য-সূর্য্যের প্রশান্ত সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র বর্ণৈশ্বর্য্য বারিধির বিচঞ্চল বীচি-বল্লরীর বক্ষে অপরূপ রূপ-রাজ্য রচনা করিত।

যাঁহারা স্বাস্থ্য-সঞ্চয় বা অবকাশবিনোদনের জন্য দার্ব্বাণে আগমন করেন তাঁহারা সূর্য্যকরোজ্জ্বল শুভ্র সমুদ্র-সৈকতের দিকেই সর্ব্বাধিক আকৃষ্ট হন। স্নানার্থীর পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান অতি অল্পই আছে। কারণ

মিচেল পার্ক—দার্ব্বাণ

সলিল-রাশিতে স্নানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-সঞ্চায়ক সৌররশ্মিতেও স্নান সম্পাদিত হয়। যাঁহারা সৌরকরকে সর্ব্বব্যাধিহর বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে দার্ব্বাণের সমুদ্র-সৈকত স্বর্গস্বরূপ। সৈকতের পশ্চাতেই বড় বড় বিশ্রামাগার বা হোটেল অবস্থিত বলিয়া পর্য্যটকের পক্ষে অবস্থানের কোনও অসুবিধা নাই। স্নানের সময় সুন্দর ও সুবিস্তৃত বেলা-বক্ষে যে বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশিত হয় তাহা একান্ত মনোমুগ্ধকর। নানা বর্ণের বিচিত্র ছত্র ও বস্ত্রাবাস বিস্তৃত রহিয়া ব্যস্ততাপূর্ণ বেলার বুকে হর্ষ ও হাস্যের হাট

জুলুদিগের ক্রেয়াল নামক কুটির

বসাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সন্তরণের সুবিধার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। যাহাতে বালকবালিকারা নিরাপদে স্নান ও সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে সে বিষয়েও সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ উপনিবেশ দার্ব্বাণেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। অন্যান্য নগর ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিলেও আজিও ইহাই এই প্রদেশের বৃহত্তম সহর। কিন্তু বৃহত্তম সহর হইলেও ইহা নাটালের রাজধানী নহে। এই প্রদেশের রাজধানীর নাম পিটার-মরিটজবার্গ। দুইজন (পিটার ও মরিটজ) ওলন্দাজ নেতার নাম হইতে এই বিচিত্র আখ্যার উদ্ভব। ইহারা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদলের অগ্রণী ছিলেন।

এই নগর উপকূল হইতে ৫০ মাইল অভ্যন্তরে উপস্থিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে বিরাজিত। শস্য এবং ফলপ্রসূ শ্যামসুন্দর প্রদেশের উপর দিয়া অগ্রসর

রেলপথের সহায়তায় এই নগরে পৌছান যায়। আকারে পিটার মরিটজবার্গ দার্ব্বাণের অর্দ্ধাংশ হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু আর্থিক উন্নতির বা বাণিজ্য বিষয়ক উৎকর্ষের পরিচায়ক নানা প্রকার ব্যাপার এই নগরে আগমন করিলে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এখানে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক, ব্রুয়ারি বা বিয়ার মদ্য প্রস্তুত করিবার স্থান, ট্যানারি বা চর্ম্ম পরিষ্কৃত করিবার কারখানা দেখা যায়। সুবিশাল সরকারী কর্ম্মমন্দির সমূহ এবং সুদৃশ্য মিউনিসিপ্যাল গৃহগুলি জানাইয়া দেয় ইহা এই প্রদেশের রাজধানী।

জুলু পল্লী : বাসগৃহ ও শস্যাগার দেখা যাইতেছে

পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত বলিয়া এই নগরের প্রাকৃতিক পরিস্থিতিও বিশেষ প্রীতিকর। এই নগরের নিকটেই ৬ হাজার ফিট উচ্চ এবং টেব্‌লের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটি পর্ব্বত। নগরের নিকটবর্ত্তী দর্শনীয় দৃশ্যসমূহের মধ্যে উমজেনী নদীর দ্বারা সৃষ্ট প্রসিদ্ধ হাউইক্ প্রপাতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উমজেনী নদীর নৃত্য-মত্ত নীর এখানে ৩ শত ফিট নিম্নে সবেগে পতিত হইয়া এই প্রচণ্ড প্রপাত সৃষ্টি করিতেছে।

যাঁহারা পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত উপত্যকার বক্ষে তুঙ্গতনু পর্ব্বত-প্রাচীরের পার্শ্বে এই জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি ও বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই স্থান হইতেই অসমসাহসিক অগ্রণিগণের দুর্জ্জয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। সেই অভিযানের ফলে দুর্দ্দান্ত জুলুজাতির অত্যাচার প্রায়ই চিরদিনের জন্য সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর সঙ্ঘটিত সংগ্রামে প্রচণ্ড-প্রকৃতি জুলুরা প্রকাণ্ড পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্লোয়িদ নদের তটদেশে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই বিরাট বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে ঐ স্থানে একটি গীর্জ্জাগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। পিটার রেটিফ এবং গার্ট মরিটজ নামক বিজয়াভিযানের প্রধান নেতৃদ্বয়ের নামানুসারে এই নগর পিটার মরিটজবার্গ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই নামকরণ ব্যাপার সম্পাদিত হয়। এই নাম ঐ বীরদ্বয়ের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। যাঁহারা অসভ্যতার গভীর অন্ধকারে সভ্যতার আলোক বিস্তৃত করিয়া মানব-জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এই নির্ভীক নেতৃযুগল তাঁহাদিগের অন্যতম।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইহা এই উপনিবেশের শাসন-কেন্দ্র বা রাজধানীরূপে গৌরবান্বিত হইয়াছে। ঔপনিবেশিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ২৪ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত পরিষদের (ওলন্দাজ ভাষায় Volksraad) উপর উপনিবেশের শাসনভার অর্পিত ছিল। এই পরিষদই কয়েক বৎসর পার্শ্ববর্ত্তী জিলা সমূহকে শাসন করিয়াছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ মার্টিন ওয়েষ্ট নাটালের ছোট লাট পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পিটার মরিটজবার্গই তাঁহার রাজধানী হয় এবং তাঁহার সহায়ক কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনও এই স্থানেই আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই গঠিত রয়াল চার্টার অনুসারে) নাটালের ব্যবস্থা পরিষদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিটার মরিটজবার্গের বক্ষে এই রাষ্ট্রীয় সভার প্রথম অধিবেশন সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ইহার পরেও নাটালের উন্নতির পথে বহু বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বাধা জন্মাইয়াছিল অর্থ সম্পর্কীয় সমস্যা বা সঙ্কট। ব্লোয়িদ নদের যুদ্ধে পূর্ণ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেও দেশীয়দিগের কোন কোন দুর্দ্দান্ত সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বাম্বাটা ও সিগাননন্দা নামক সর্দ্দারদ্বয়ের নেতৃত্বে জুলুরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া পড়িলে পিটার মরিটজ-বার্গকে কেন্দ্র করিয়া সামরিক অভিযান বা কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিতে হইল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রেজিমেণ্ট নাটালে প্রথম প্রবেশ করে। সেই সময় হইতে মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিটার মরিটজবার্গ একটি প্রধান সেনানিবাস ছিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উপকূল হইতে পিটার মরিটজবার্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেলপথ প্রথম স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে উইট ওয়াটার্গর‍্যাণ্ড স্বর্ণখনিসমূহ আবিষ্কৃত রেলপথ প্রসারিত করার জন্য উৎসাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। নাটাল সরকার ট্রান্সভালের সীমান্তে রেলপথ প্রসারিত করিয়া উইটওয়াটার প্রান্ত হইতে উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশের বাণিজ্য করায়ত্ত করিতে কামনা করিলেন।

ইহার ফলে তাঁহারা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল চার্লস-টাউন পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত করিলেন। ট্রান্সভালের কর্ত্তৃপক্ষ বা গণতন্ত্র এ বিষয়ে সম্মতি বা যোগ দিতে বিলম্ব করিলেন বলিয়া কিছুদিন রেলপথ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিতে হইল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর পিটার মরিটজ-বার্গ সুবিখ্যাত স্বর্ণখনিসমূহের সহিত রেলপথের সহায়তায় সংযুক্ত হইল। এই সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অংশের সঙ্গেও সম্মিলিত হইল। সেই স্মরণীয় দিনের পর পিটার মরিটজবার্গ হইতে ক্রমশঃ রেলপথের শাখাসমূহ উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া ইহার কার্য্যোপযোগিতাকে বহু গুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এক্ষণে নাটালের সকল প্রধান স্থানের সহিত ইহার (রেলপথের সহায়তায়) সংযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এই নগরটি ইয়ুনিয়নের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক রেল লাইনের প্রধান ডিপো। ইহা উত্তর নাটালের প্রসিদ্ধ কয়লা খনিপূর্ণ প্রদেশের সহিত সংযুক্ত রেলপথের বিখ্যাত জংশনও বটে।

পিটার মরিটজবার্গের অর্থনীতিক উন্নতির সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমানে এখানকার বিভিন্ন ব্যবসার কারখানাসমূহে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার পরিমাণ ১০ লক্ষ পাউণ্ড। এখানে চর্ম্মনির্ম্মিত পণ্য পদার্থের ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা চলিয়া থাকে।

জুলু সুন্দরী

জুলু তরুণীগণ জলাশয় হইতে জল লইতেছে

চোকোলেট, বিস্কুট, খনিজ জলের ব্যবসাও চলে। লোহার কাজ এবং ফার্ণিচার বা গৃহ-সজ্জার বাণিজ্য পিটার-মরিটজবার্গে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসর যে কৃষি-প্রদর্শনী বসিয়া থাকে উহা সমগ্র ইয়ুনিয়নের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া বিবেচিত। প্রদর্শনীর সময় সমগ্র নগরে উৎসবের স্রোতঃ বহিয়া যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ সময় এখানকার দোকানপাট পণ্য পদার্থে পূর্ণ হইয়া

বিচিত্র বেশধারী জুলু রিক্সাচালক

অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাশিত করে এবং ইহাই ক্রয়-বিক্রয়ের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

ছায়া-শীতল বৃক্ষবীথির তলদেশে বিচরণ বা বিশ্রাম পিটারমরিটজবার্গবাসীর অবসর বিনোদনের এক সুন্দর উপায়। ইহাকে "সিটি অফ্ ট্রিজ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নগর হইতে বাহির হইলে ভ্রমণ ও উপবেশনের উপযোগী প্রচুর তরুচ্ছায়া শীতল স্থান দেখা যায়। অনেকে উমসিনডুসী নদীর তটদেশে পিক্‌নিক্ বা চড়াইভাতি করিবার জন্য গমন করেন। নদীতীরে কোমল মখমলের মত প্রসারিত শ্যামল শষ্পাসন। যেন স্নেহময়ী প্রকৃতিমাতা পরিশ্রান্ত পান্থ বা ক্লান্ত সন্তানের জন্য শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছেন। এই সুকোমল শ্যাম-সুন্দর শয্যায় বসিয়া পিক্‌নিক অতিশয় প্রীতিকর ব্যাপার।

পিটার মরিটজবার্গের আর একটি দর্শনীয় স্থান বোটানিকাল বাগান। এই বোটানিকাল বাগানের বক্ষে বিরচিত বিস্তৃত বৃক্ষ-বীথির শীতল তলদেশে উপবেশন করিলে শুধু যে শ্রান্তি দূর হয় তাহা নহে, একপ্রকার অপূর্ব্ব শান্তি অন্তরে সঞ্চারিত হয়। এই উদ্যানের পুষ্পকুঞ্জপূর্ণ কুঞ্জের মঞ্জুল স্মৃতি একান্ত মনোমুগ্ধকর। দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি যেন কাহার জন্য পুষ্পাঞ্জলি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আলেক্‌জেন্দ্রা পার্ক নামক ময়দানে ক্রিকেট এবং ফুটবল ম্যাচ প্রভৃতি খেলা হয়। এরূপ নেত্রতর্পণ ক্রীড়াক্ষেত্র সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার বক্ষে আর আছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়ার স্থান ও ব্যবস্থা বিশেষরূপে বিদ্যমান বলিয়া এই নগর ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিবর্গের চিত্তাকর্ষক। পোলো খেলার দিকে পিটার-মরিটজবার্গবাসীর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার পোলো সম্মিলনের কেন্দ্রস্থল ইহা। কৃষি-প্রদর্শনীর সময় নগরবাসীদের দ্বারা "পোলো-সপ্তাহ"ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইস্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না পোলো খেলার জন্মস্থান প্রাচী। আমরা লাডক, তিব্বত প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রগাঢ় পোলো-প্রীতি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

সহরের সৌধসমূহের মধ্যে টাউনহল, প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কীয় কার্য্যালয়গুলি এবং ডাকঘর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। টাউনহলের প্রধান কক্ষটিতে প্রায় দুই হাজার লোকের বসিবার উপযুক্ত স্থান বিদ্যমান। শুধু যে বড় বড় সভা-সমিতি এই গৃহে অনুষ্ঠিত হয় তাহা নহে, স্থানীয় আর্ট-গ্যালারি বা চিত্র-প্রদর্শনীও এইস্থানেই অবস্থিত। প্রসিদ্ধ-নামা চিত্রকরদিগের চিত্র এই চিত্রখচিত প্রকোষ্ঠগুলিকে বিশেষ বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। নেটাল মিউজিয়াম এবং বুয়র ট্রেকার্ণ মিউজিয়াম নামক যাদুঘর-দ্বয় ভ্রমণকারীমাত্রেরই দর্শনযোগ্য।

দিনান্তে নগরের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান সবুজ শোভায় সমৃদ্ধ এবং সান্ধ্য-সূর্য্যের রমণীয় রক্তরাগে রঞ্জিত শৈল-সমূহের বিজন বক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করা বা চিন্তা করার মত প্রীতিপ্রদায়ক ব্যাপার অতি অল্পই আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত স্থান ইহারা। ইহারা আমাদের অন্তরে ভারতের পর্ব্বত-বন্ধুর প্রদেশের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া তুলিত। বহু বিষয়ে দক্ষিণ ভারতের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না।

নাটালের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ড্রাকেনবার্গ দণ্ডায়মান। এই প্রকাণ্ড প্রাকারবৎ পর্ব্বতের উচ্চতা ১১ হাজার ফিটের কম নহে। যেমন ভারতের হিমাচল, য়ুরোপের আল্পস্, উত্তর আমেরিকার রকি, উত্তর আফ্রিকার আৎলাস, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিস, তেমনই ড্রাকেনবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকার মহান্ মেরুদণ্ডের মত দণ্ডায়মান। উত্তরস্থ মণ্ট আউক্স সোর্সেস নামক পর্ব্বতের উচ্চতাও প্রায় ড্রাকেনবার্গের সমান। দক্ষিণে জায়ান্টস্ কাস্‌ল নামক পর্ব্বত উত্তরে এবং দক্ষিণে দণ্ডায়মান এই দুইটি পর্ব্বতও ড্রাকেনবার্গ পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের কেন্দ্র বা মধ্যস্থলে কাথকিন শৈল-শিখর। প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যাপিয়া এই অম্বরচুম্বী অভ্রভেদী প্রশান্ত-গম্ভীর পর্ব্বতপুঞ্জ মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। প্রায় শত-সংখ্যক সমুচ্চ শিখর সারি-সারি প্রসারিত রহিয়া যে বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকাশিত করিয়াছে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে তাহা অতুলনীয়। যেন বহু সংখ্যক বৃহৎ বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ড্রাকেনবার্গ কোন ঊর্দ্ধস্থ বিরাট্ বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞাপন করিতেছে।

ড্রাকেনবার্গের মণ্ট আউক্স সোর্সেস নামক অংশটি ড্রাকেনবার্গ ন্যাশনাল পার্ক নামেও অভিহিত। ভ্রমণ-কারিগণ ইহাকে পৃথিবীর সুন্দরতম ও পরম উপভোগ্য দৃশ্যাবলীর অন্যতম বলিয়া মনে করেন। এই অপূর্ব্ব পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিকারী বলিয়া নাটালবাসী আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের বিচিত্র দর্শনীয় দৃশ্য সমূহের অন্যতম বুশম্যান জাতির অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রপূর্ণ কতকগুলি গুহা-গৃহ। তুগেলা নদীর উৎপত্তি স্থানের আশ্চর্য্যজনক সৌন্দর্য্যও উল্লেখযোগ্য। এই দৃশ্যকে অতুলনীয় বলা চলে। জল-

চার্চ্চ ষ্ট্রীটের মোড় : পিটার মরিট্‌জবার্গ

স্রোতের বেগে একটি সুড়ঙ্গাকার পথ গড়িয়া উঠিয়াছে। টুগেলা নদী সেই পথে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা দুই হাজার ফিট নিম্নে নামিয়া একটি প্রচণ্ড প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। অত্যুচ্চ স্থান হইতে একটি মাত্র ধারায় অধঃপতিত এরূপ প্রপাত দক্ষিণ আফ্রিকায় আর নাই।

টুগেলা নদীর খাস উপত্যকাটি প্রায় সাত মাইল দীর্ঘ। এই উপত্যকার স্বভাব-শোভায় অভিজ্ঞ ভ্রমণকারিগণও একান্ত মুগ্ধ হইয়া অতুলনীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বিচিত্র দর্শন ক্ষুদ্র উপত্যকা একটি ফাটল মাত্র। এই ফাটলটি ৯০ ফিট হইতে ১ মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত। দুই ধারের তুঙ্গ-তনু প্রস্তর-প্রাকার এক হাজার হইতে পাঁচ

হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই প্রাকৃতিক প্রাচীরের গাত্রে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে দণ্ডায়মান রহিয়া ভৈরব-গম্ভীর দৃশ্য প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন প্রস্তরখণ্ডের শীর্ষ হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত ছিদ্র বিদ্যমান। দেখিলে মনে হয় শিলাগুলি বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ-বক্ষ হইয়াছে।

এই প্রস্তর-প্রাকারবেষ্টিত ফাটলের ভিতর দিয়া নদীর স্ফটিক-নির্ম্মল জলধারা কলকলনাদে সরীসৃপের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বজ্রবৎ গভীর গর্জ্জনে দশ দিক্ মুখরিত করিয়া গম্ভীর দৃশ্যে দর্শককে স্তম্ভিত করিয়া নদী যেখানে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামিতেছে সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। যেন কোন অজ্ঞাত ঊর্দ্ধলোক হইতে নদী নামিয়া আসিতেছে। সত্যই বিধাতার অপার করুণার অন্যতম অভিব্যক্তি সঞ্জীবনীশক্তিশালিনী নদীর অবতরণ নিসর্গ জগতের এক নিরুপম ও অপরূপ ব্যাপার।

টুগেলা উপত্যকার অপরূপ রূপমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যেন কোন মহাকবির রচনা বিচিত্র কাব্যগ্রন্থ অথবা দক্ষতম চিত্রকরের অঙ্কিত আলেখ্য সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। বৃষ্টিবিহীন গ্রীষ্মের দিনে টুগেলা ক্ষীণা নির্ঝরিণীর ন্যায় কুলু কুলু তানে নামিয়া আসে কিন্তু বৃষ্টি নামিলে বা তাপস্পর্শে ঊর্দ্ধস্থ শৈল-শীর্ষের শুভ্র তুষার দ্রবীভূত হইয়া অবতরণ করিলে ইহা রুদ্ররূপ পরিগ্রহ-পূর্ব্বক ভৈরব রবে নামিয়া আসিয়া বিস্ময়কর দৃশ্য অভিব্যক্ত করে। তখন টুগেলা হইয়া পড়ে বন্ধনহারা মহান মুক্তির ও দুর্জ্জয় শক্তির অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। দুই দিকে সমাধি-মগ্ন যোগীর ন্যায় প্রস্তর প্রাচীর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ড—মধ্যে টুগেলা ভাবাবেশে নৃত্যরত ভক্তের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত।

আরও অগ্রসর হইলে কাথেড্রাল রক্স নামক পাহাড়-শ্রেণী পাওয়া যায়। ইহারা নদীগর্ভ হইতে ৫ হাজার ফিট উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গীর্জ্জা-গৃহের শৃঙ্গশীর্ষের ন্যায় কাথেড্রাল স্পায়ার্স আখ্যায় অভিহিত দুইটি শিখর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উপত্যকার শীর্ষদেশে চির-জাগ্রত প্রহরীর প্রায় সেন্টিনেল রক নামক শৃঙ্গ নদী-নীর হইতে ৬ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দার্ব্বাণ হইতে ট্রান্সভাল পর্য্যন্ত প্রসারিত রেলপথ কলেনসো নামক স্থানে টুগেলা নদীকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পর এই রেলপথ লেডিস্মিথ স্থানে পৌছিয়াছে। বোয়ার যুদ্ধের সময় এই স্থানটি খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। নাটালের নগরসমূহের মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থান পাইবার উপযুক্ত। এই নগর হইতে বিস্তৃত একটি শাখা রেলপথ ড্রাকেনবার্গ অতিক্রম করিয়া অরেঞ্জ-প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। অন্য দিকে পূর্ব্ব-কথিত প্রধান রেল লাইনটি উত্তরদিকে এবং ড্রাকেনবার্গের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। গ্লেনকো নামক জংশনে প্রধান রেলপথ হইতে শাখা লাইন ডাহিনে অগ্রসর হইয়া ডাণ্ডি নামক স্থানের কয়লাখনি সমূহের নিকটে উপনীত হইয়াছে। এই অঞ্চলেই বোয়ার যুদ্ধের প্রথম পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আরও উত্তরে নাটালের সীমান্তে নিউকাসল নামক স্থান অবস্থিত। কয়লাখনিসমূহের কর্ম্মকেন্দ্র ইহা। সকলেই জানেন ইংলণ্ডের নিউকাসল নগর কয়লাখনির জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত। ঐ নগরের নামানুসারে নাটালের কয়লা-খনি-পূর্ণ প্রদেশের রাজধানী এই জনপদ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর এই রেলপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া ৫ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে আরোহণপূর্ব্বক ড্রাকেনবার্গের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ড্রাকেনবার্গের লায়িংসনেক নামক অংশের নিম্নে টানেল বা সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে মাজুবা ছিল। সীমান্তে অবস্থিত চার্লস টাউন অতিক্রম করিলে ট্রান্সভালের সীমানায় পৌছান যায়।

মমতা

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

'দেখো মামীঠাকরুণ, পটলার অবস্থা দেখো ; কেমন ক'রে মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, দেখো, দেখো !—'

বলিয়া হাড়ীদের ধূলো হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'আ মরিরে, আ মরি, আ মরি—'

বলিতে বলিতে ঘড়াটা ঘাটে নামাইয়া, ঘোষালদের বড় বউ মমতা পট্‌লাকে তুলিয়া লইয়া, তার মুখের রক্ত জল দিয়া ধুইয়া দিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ পরে তা'র হুঁস হইল যে, সন্ধ্যাদীপ দিবার জন্যই সে ঘাটে কাপড় কাচিতে আসিয়াছিল। ব্যস্তভাবে পট্‌লাকে ধূলোর কোলে দিয়া বলিল—'ধূলো, আমাদের বাড়ীতে চল্—আমি একটা ডুব দিয়ে নি'।

ধূলো বলিল—'এমন অবেলায় কেনে ছুঁতে গেলে মামীঠাকরুণ, আবার ডুব দিতে হবে।'

'—তা হোক্ গে, তুই যা আমাদের বাড়ী।'

স্নানান্তে মমতা সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া, ধূপ ধূনা দিয়া ঠাকুরঘরে তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া আসিয়া, ধূলোকে জিজ্ঞাসা করিল—'দিনে ভাত-টাত্ খেয়েছিস তো রে ধূলো !'

'—না মামীঠাকরুণ, ভাত কোথা পাবো !'

মমতা তাড়াতাড়ি চাট্টি গুড়-মুড়ি আনিয়া দু'ভাই-বোনকে দিয়া বলিল—'এই কয়টা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'মা, একটু পরেই ভাত দিচ্ছি।'

তা'রা গুড়মুড়ি খাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে, মমতা ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া যা জানিল, তা'তে তা'র মনটা বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। মুখে শুধু বলিল—'আহা !'

জমিদার-বাড়ীতে অন্নপ্রাশন। ভারী ভোজ। 'দল-মাদল' কাজ, ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হইয়াছে। এঁটো পাতা কুড়াইয়া জায়গা পরিষ্কার করা হইতেছে, ব্রাহ্মণের মেয়ে-ছেলে খাওয়াইবার জন্য।

পাতা-শুদ্ধ মাখা-চোঁখা এঁটো ভাত-তরকারী বাড়ীর বাহিরে গিয়া কাঙ্গালগরীবদের বিলাইতেছেন জমিদার-কন্যা স্বয়ং। ওরি মধ্যে যা'রা একটু কদরের, তা'দেরই ভাগ্যে অনুগ্রহ বর্ষণ লাভ হইতেছে সমধিক। দরজার পাশে ধূলো দাঁড়াইয়া ছিল তা'র বৎসর পাঁচের ভাইটি পট্‌লাকে লইয়া। ধূলোরও বয়স বৎসর বারোর বেশী হইবে না। মা বাপ, আত্মীয় বান্ধব, কেউ তাদের নাই ; ঘর-বাড়ী, চাল চুলোরও বালাই নাই। ভাইটির হাত ধরিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিখ মাগিয়া ফেরে সারাদিন। এ'র বাড়ী চাট্টি এঁটু ভাত—ও'র বাড়ী চাট্টি পান্তা—তা'র বাড়ী বা চাট্টি গরম ভাত, এমনি করিয়া দশজনের বাড়ী হইতে দশমুঠা সংগ্রহ করিয়া, আগে ভাইটিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া অবশিষ্ট যা' থাকে, তাই দিয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত করে। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া তাদের 'মামী-ঠাকরুণে'র বাড়ীর ভিতর ঢেঁকিশালাটায় শুইয়া পড়ে। তা'দের মামীঠাকরুণ বড়লোক নয় ; দুটি ছেলেমেয়েকে ভাত দিয়া পুষিবার মত অবস্থা তা'র নাই। থাকিলে ধূলোকে যে ভিক্ষা করিতে হইত না, একথাটা ধূলো নিজেই প্রচার করে। তবে, মাসে অনেকগুলি দিনই 'মামীঠাকরুণ' তা'র দুখের ভাতের অংশ তাদের দিয়া থাকে।

জমিদার বাড়ী ভোজ ; ভালমন্দটা প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইবে। মন তাদের অতি মাত্রায় লালসাচঞ্চল। সাগ্রহে দরজার ভিতরে উঁকি মারিতেছে। তরকারী, মাছ, পায়েস, সন্দেশ, দই এক সঙ্গে মাখা মাখি হইয়া এঁটু শালপাতার ভিতর হইতে যে গন্ধ ছড়াইতেছিল, তা'র লোভে পট্‌লার অস্থিরতা চরমেই উঠিয়াছিল। জমিদার-

কন্যা একটা পাতা একজনকে দিয়া যখন আর একটা আনিতেছেন,—তখনই সে দুহাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিতেছে—'আমাকে দাওগো, আমাকে দাও।' 'থাম্' বলিয়া তিনি যখন পাতাটা আর একজনকে দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন হতাশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সতৃষ্ণ নয়নে পটলা সেই পাতাটার পানে চাহিয়া থাকিতেছে। আর একটা দিতে আসিলে আবার সে ঐরূপ করিতেছে; আবার ধমক খাইয়া চুপ করিতেছে। শেষে একবার আগ্রহাতিশয্যে হাত বাড়াইতে গিয়া সে জমিদার কন্যার কাপড় স্পর্শ করিয়া ফেলিল। ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি লাথি মারিলেন পটলাকে। পড়িয়া গিয়া পটলার একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল; মাথায় পিঠে চোট লাগিল; ঠোঁটের কতকটা কাটিয়া গিয়া অজস্র রক্ত পড়িতে লাগিল। —"আহা, অম্নি ক'রে মারেগো' বলিয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়া ধুলোও কয়টা কটু মন্তব্যের সঙ্গে একটা লাথি খাইল। সে উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাইটিকে কোলে করিয়া তার মামীঠাকরুণদের 'ছলে' পুকুরের ঘাটে গেল, রক্ত ধুইয়া দিতে; এবং সেইখানেই মামীঠাকুরুণের সঙ্গে ধুলোর দেখা হইল।

পুরুষদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া থাকিলেও, দু'বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে তা' ছিল না। দিনে মমতা ও তার শ্বাশুড়ী পান্তা খাইয়া কাটাইয়া দিয়াছে। হেঁসেলে ভাত ছিল না। তাড়াতাড়ি সে ভাত রাঁধিয়া ধুলোদের দিল। তা'রা দু'ভাইবোনে খাইয়া নিজের জায়গায়,—ঢেঁকিশালে শুইয়া পড়িল আরামে! অপমান—অভিমান—ক্ষোভ তাদের নাই। অপ্রতিকার্য্য বিষয়ে ওরা নির্ব্বিকার। অনিবার্য্য নির্য্যাতন সহ্য করিতেই হইবে, এমনি একটা সহজাত সংসার লইয়াই যেন ওরা জন্মিয়াছে। অবজ্ঞাপ্রদত্ত উচ্ছিষ্টভোজন ওদের ভাগ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত!

অপমান গা-সওয়া মনে তরঙ্গ না তুলিলেও, পটলার দেহ কিন্তু আঘাতটাকে নির্ব্বিকারে সহ্য করিতে পারিল না। পরদিন সকালে দেখা গেল, তার মুখ ফুলিয়া হাঁড়ী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও অনেকটা। যত বেলা পড়ে, মুখ তত ফুলিয়া উঠে। ধুলো কাঁদে—'মামীঠাকরুন কি হবে!' মমতা বুঝিল, রোগ জটিলতার দিকেই ছুটিতেছে। ডাক্তার চাই, সতর্ক শুশ্রূষা চাই, টাকা চাই। ভাবিবার সময় নাই; আরো পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত। মমতা শ্বাশুড়ীকে লুকাইয়া গলার হার বন্ধক দিল। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইত না বলিয়া অলঙ্কার সে পরিত না। সুতরাং হার বাঁধা দেওয়া ব্যাপারটা আপাততঃ গোপনই থাকিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন— রীতিমত শুশ্রূষা যদি হয়, বাঁচিতেও পারে। মমতা এখনও পর্য্যন্ত আপনাকে সরাইয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। ঢেঁকিশালে গিয়া পটলার মাথা কোলে করিয়া বসিল! শ্বাশুড়ী সন্ধ্যাবেলা কাপড় কাচিতে গিয়াছিলেন; আসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন —ভ'র সাঁঝবেলায় ছুঁতে গেলে কেনে আবার! যাও ডুব দিয়ে এসো গে।

মমতা ধীরে ধীরে জবাব দিল—আজ এইখানেই থাকি মা, আহা, ছোঁড়ার অসুখটা বড় বেশী হয়ে উঠেছে। তুমিই মা আজকার মত সাঁঝ-ধূপটা দাও।

শ্বাশুড়ী ঝঙ্কার দিলেন— দেখে বাঁচি না বাপু, তোমার বাড়াবাড়ি; ছোটলোক নিয়ে এত নাড়া-ঘাঁটা কেনে গো! তোমার স্বামী বিশখানা গাঁয়ের বামুনের মাথার মণি; বিধান পাঁতি সে চাক্‌লা জুড়ে দেয়। আর, তার ঘরে এই অনাচ্ছিষ্টি—অনাচার! আচ্ছা লোকের বেটী ঘরে তুলেছিলাম বাপু—বংশের গৌরবটুকু সব চিবিয়ে খেলে গো!

মমতা জবাব দিল না। শ্বাশুড়ী আপন মনে গজ্-গজ্ করিতে করিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ লইয়া বাড়ীর বাহিরে ঠাকুর-ঘরে দিতে গিয়া বুঝি হোঁচট-ই খাইলেন। ওরে বাপরে! আর রক্ষা আছে! 'এই বয়সে আমার কপালে এই দুর্ভোগ', 'লোকে বেটাবউ বাঞ্ছা করে কি জন্যে' ইত্যাদি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তারস্বরে; আর ঠক্-ঠক্ করিয়া মাথা ঠুকিলেন ঠাকুরঘরে। পাশের বাড়ীর কর্ত্রীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি প্রশ্ন করিয়া মমতার শ্বাশুড়ীর দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে পারিয়া সহানুভূতি দেখাইলেন। সন্ধ্যা পার হইতে না হইতে গ্রামকে-গ্রাম রটিয়া গেল ছোটলোকের সঙ্গে মমতার 'ওলা মেলা'র কথা। বর্ষীয়সীরা 'লম্প' হাতে করিয়া মমতাদের বাড়ী

আসিয়া মজলিস জাঁকাইলেন। ভারিক্কি হইয়া উপদেশ দিলেন; চিবাইয়া চিবাইয়া শ্লেষ করিলেন। কেউ বা প্রসঙ্গতঃ নিজের বউমার দেমাক ও অনাচারের কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া মনের ঝাল খানিকটা মিটাইয়া লইলেন। শ্বাশুড়ীর আবার ভয়ও হইল। পার্শ্ববর্ত্তিনীদের জোড়হাত করিয়া বলিলেন—'ব'লে-ট'লে দিওনা যেন বোন, তা'হ'লে আমার ভাতের বরাদ্দও উঠে যাবে।'

মমতা নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেল; কা'রও কথার কোন জবাব দিল না। তিক্ত মন্তব্যে তাহার মন যে বিষাইয়া উঠে নাই, তা' নয়। সুতরাং হাতে রোগীর শুশ্রূষা করিলেও,—আরব্ধকার্য্যে অভিনিবেশের অভিনয় করিলেও, তা'র মনের ভিতর অভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ, লজ্জা তরঙ্গ-ভঙ্গে দাপাদাপি করিতেছিল। কিন্তু তা'র চরিত্রের মৃদু নমনীয়তা তা'কে নীরব রাখিল। সে অন্ধকারে চোখের জল ফেলিল; দু'একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিল।

মমতা নিষ্ঠার দেবী। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, হিন্দু নারীর প্রত্যেকটি বিহিত কর্ত্তব্য সে অক্ষরে অক্ষরে পালিয়া চলে। কিন্তু তবু যখন তা'র শ্বাশুড়ী আবিষ্কার করিয়া বসিলেন —'ভিতরে-ভিতরে সে চিরকাল মেলেচ্ছ' এবং সমাগতারা যখন তা' লইয়া ছোট-খাটো 'কূট' কাটিতে লাগিলেন, তখনই মমতার বুকে বাজিল দারুণ। কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া, কথা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন বা স্বপ্রতিষ্ঠ করা চিরদিনই মমতার অভ্যাসের বাহিরে। কিছুই সে বলিল না।

ধুলোদের উপর মমতার সমবেদনার কথা শুনিয়া জমিদার-কন্যা দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিয়াছেন — 'বটে!' তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, তাঁকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই মমতার এই আয়োজন।

কি একটা ছুটিতে প্রভাত পরদিন সকালে বাড়ী আসিল। কর্ম্মব্যপদেশে তা'কে বিদেশে থাকিতে হয়। স্বামীকে দেখিয়া, মমতা ধুলোকে রোগীর শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিবার জন্য বাহিরে যাইতেছিল। প্রভাত ডাকিয়া বলিল—'শোন মমতা, তোমার এই হাড়ী-ডোম-মুচি নিয়ে 'ওলামেলা'র কথায় দেশে আর কাণ পাতা যায় না। তা' ছাড়া, তুমি বোধ হয় ভুলে যাও নি যে, এ বংশ চিরদিন নৈষ্ঠিকতার জন্য সকলের পূজ্য, ব্রাহ্মণ্যগৌরবে সমুজ্জ্বল। সুতরাং তোমার নিষ্ঠাহীনতার প্রশ্রয় দিয়ে আমার পিতৃ-গৌরবকে, বংশের গরিমাকে তো ম্লান করতে পারি না।' প্রভাতের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক।

মমতা বজ্রাহতার মত দাঁড়াইয়া রহিল। একি! তার চিরদরদী স্নিগ্ধচিত্ত স্বামীর মুখে একি কথা! স্বামীর কণ্ঠস্বরের এই নিষ্ঠুর পারুষ্য মমতাকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিল। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল—'যা' বলবার, খাওয়া-দাওয়া ক'রেই ব'লো! সারারাত জেগে এসেছ, স্নান-টান করে' ফেলো আগে। আমি এসে রান্না চড়িয়ে দিয়ে তোমার সন্ধ্যার যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।'

শ্বাশুড়ী বলিলেন—'রক্ষে কর বউ মা, এই হাড়ী-ডোম রুগী নিয়ে মাখামাখি ক'রে, এম্নি একটা ডুব দিলেই শুদ্ধ হওয়া যায় না। গঙ্গায় মাথা না ডোবানো পর্য্যন্ত তো হেঁসেল ছোঁওয়া হবে না, বাপু! রান্না আমি করছি, তুমি তোমার রুগীর সেবা কর। তোমার রুগী সারলে, যা হয় ক'রো।'

গত রাত্রি হইতে আঘাত খাইয়া খাইয়া মমতার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াই ছিল। শ্বাশুড়ীর কথায় ক্ষোভ বাড়িয়াই উঠিল। কিন্তু শ্বাশুড়ীর কথার কোন জবাব না দিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া শক্তকণ্ঠে বলিল—তোমারও কি তাই মত!

প্রভাত দৃঢ়ভাবেই জবাব দিল—'এ মতের বাহিরে যাওয়ার তো কোন প্রয়োজন দেখি না।'

মমতা আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া রোগীর কাছে বসিল।

প্রভাত অভিমানভরে বৈকালে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় গ্রামময় রাষ্ট্র হইল—প্রভাত এই 'মেলেচ্ছ' বউকে আর গ্রহণ করিবে না; আবার বিবাহ করিবে। এ বউ ভাত খাইতে চায়, বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিবে, থাকিবে খাইবে; পৃথক্ ঘর করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, পত্নীত্যাগ পাপ কিনা!

মমতার কাণে কথাটা ভাসিয়া আসিল। দুঃখে, অভিমানে তার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। আর কেউ

না চিনুক, তার স্বামী তো তাকে চেনে। একি ভুল বুঝিল সে! একটা দিন থাকিয়া একটা কথা বলার অবকাশও দিল না। অনাচার তো সে কখনও করে না। হেঁসেল না হয়, না-ই ছুঁইল; কিন্তু স্বামীকে ছুঁইবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত হইল, এ দুঃখ তার মরিলেও যাইবে না। বিস্মিতও সে কম হইল না। তার দেব-স্বভাব স্নেহপ্রবণ স্বামী হঠাৎ এমন করিয়া বিগড়াইয়া উঠিল কি প্রকারে! সারারাত ধরিয়া মনে মনে কত কল্পিত সমস্যা সে তুলিল; সমাধানও করিল অনুরূপ। স্বভাবতঃই মমতা একটু ভাবপ্রবণ, তা'তে এই আঘাত। সুতরাং তার অভিমানক্ষুব্ধ মনের ভিতর বিচিত্র কল্পনার ছুটোপাটি চলিল সারারাত ধরিয়া।

ক্রমে মমতা শুনিতে পাইল—প্রভাত যখন বাড়ী আসে, গ্রামে ঢুকিবার পথে জমিদার-কন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়। সে পুষ্পিত ও পল্লবিত আকারে আরও কতকগুলি মিথ্যা ইঙ্গিত মিশাইয়া মমতার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ধারণা প্রভাতের চিত্তে জন্মাইয়া দেয় এবং তাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, নিষ্ঠায় ঘোষাল বাড়ী আজও সকলের প্রণম্য; প্রভাত নিজে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামের ভিতর দিয়া আসিবার সময়েও মমতা সম্বন্ধে দু' চারিটা চাপা মন্তব্য প্রভাতের কাণে ঢুকিল। বাড়ীতে ঢুকিয়া সে মমতাকে পটলার মাথা কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিল। তাই সে এমন হঠকারিতা করিয়া বসিয়াছিল।

মমতা ব্যাপার শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। ইহা যে তার স্বামীর প্রাণের কথা নয়, সাময়িক মোহ মাত্র, এই ভাবিয়া দুঃখভার অনেকটা লাঘব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু – না, তা' কি হয়। অসম্ভব। তবু একটা সশঙ্ক প্রশ্ন তার মনে কাঁটার ডগার মত বিঁধিতে লাগিল।

আরও কয়দিন চলিয়া যায়। পটলা ভালো হইয়াছে। কিন্তু মমতার দুঃখ ও অভিমান বাড়িয়াই চলে। একদিন অভিমানভরে স্বামীকে সে লিখিল—'যদি সে এতই অসহনীয় হইয়া থাকে, তবে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে চায় তার স্বামী!' প্রভাত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মমতার আছে, তার যা' ইচ্ছা সে করিতে পারে।'

মমতা শাশুড়ীর কাছে বলে—সে ঘরের কোনো জিনিষ স্পর্শ করিতে চায় না; তাকে পৃথক্ 'সের চালে'র ব্যবস্থা করা হউক।' তিনি বলেন—প্রভাত না আসা পর্য্যন্ত তিনি কোন নূতন ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

এমনি করিয়া আরও কয়দিন কাটে। জমিদার-কন্যার প্ররোচনায় মমতার শাশুড়ী ধুলো ও পটলাকে আর বাড়ী ঢুকিতে দেন না। তা'রা-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা'!

মমতা এই হতভাগাদের বড় ভালবাসিত। এই হৃদয়হীনতা তার বুকে নিদারুণ আঘাত দিল। সেও আর বাড়ীর মধ্যে না থাকিয়া বাহিরের ঘরে থাকিল; এবং হার বন্ধক দেওয়ার টাকা যা' অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়া খরচ চালাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ধুলো ও পটলাকে সে ছাড়িল না; বাহিরের ঘরের বারান্দার এক কোণে তাদের শোওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

শাশুড়ী রাগিয়া লাল হইলেন। জমিদার-কন্যা প্রভাতকে পত্র দিলেন। প্রভাতের অভিমান ছুটিয়া গেল; দুর্জ্জয় ক্রোধ তার স্থান অধিকার করিল। তার পরদিনই খবরের কাগজে যা' পড়িল, তাতে সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রটি নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে:—

"নৃশংস নারীনির্য্যাতন ও ধর্ম্মধ্বজীর কীর্ত্তি।"

অনাথ উৎপীড়িত হরিজন বালকের রোগে শুশ্রূষার অপরাধে মমতা দেবীকে তাঁহার ধর্ম্মধ্বজী স্বামী প্রভাত ঘোষাল ও শাশুড়ী অমানুষিক নির্য্যাতন করিতেছে; বাহিরের ঘরে আটক করিয়া রাখিয়াছে। হে দেশের জননী ও ভগ্নিগণ! হে সহৃদয় ভ্রাতৃবর্গ! এই অত্যাচারিতা মহীয়সী রমণীর উদ্ধারকল্পে আপনারা অবহিত হউন। এই ব্যাপারে সাধারণের অর্থ-সাহায্য না পাইলে নির্য্যাতিতার উদ্ধার সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিপক্ষ প্রবল। অতএব বিনীত নিবেদন, আপনারা যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে সাহায্যকারীদের নাম প্রকাশ করা হইবে। ইতি

সম্পাদক, অনাথ ও নির্য্যাতিত সহায়িনী সমিতি।

……গ্রাম।

সম্মুখে যে ট্রেণ পাইল, প্রভাত তাহাতেই বাড়ী ফিরিল। গ্রাম-প্রবেশের মুখে সে দেখিল, পতাকাশোভিত এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত—'মমতা দেবীকি 'জয়', 'হরিজনকি জয়', 'নারীর মুক্তি চাই' 'ধর্ম্মধ্বজী নিপাত যাউক' প্রভৃতি চীৎকার শুনিয়া প্রভাত বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত দেহ ঘামিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া গেল। দাঁতে দাঁত টিপিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল পথের ধারে একটা মুড়ো বাঁশ ঝাড়ে। মাথায় দারুণ আঘাত লাগিল; রক্ত ছুটিতে লাগিল ক্ষতস্থান হইতে। পাশেই বাগানে ধূলো পট্‌লাকে লইয়া কাঠি কুড়াইতেছিল। সে তার 'মামা-ঠাকুরে'র এই অবস্থা দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ছুটিয়া প্রভাতের কাছে আসিল; কিন্তু সে কি করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। পটলাকে বলিল—'তুই ছুটে যা' পটলা, মামী-ঠাকুরণকে শীগ্রি ডেকে আন্।' পট্‌লা ছুটিয়া গিয়া মমতাকে খবর দিল। মমতা তখন শিবপূজায় বসিয়া মাত্র চন্দন ঘসিয়াছে। শুনিবা মাত্র তার কণ্ঠ হইতে অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে উচ্চারিত হইল—'শিবশঙ্কর!' তারপর স্খলিত পদে কোন প্রকারে দেহটা বহিয়া লইয়া মূর্চ্ছিত প্রভাতের কাছে আসিল। তারও চোখে তখন ব্রহ্মাণ্ড পাক খাইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাতের বুকের পাশে সে বসিয়া পড়িল। তার মাথা প্রভাতের বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল। ধূলো চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; পট্‌লাও তার কান্নায় যোগ দিল। মমতা শশব্যস্ত হইয়া বলিল—'চুপ কর'। প্রভাতের জ্ঞান ফিরিতেছিল। সে চোখ মেলিয়া সম্মুখে মমতাকে দেখিয়া আবার চোখ বুজিল। তা'র দু' রগের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; ললাটে দৃঢ় কুঞ্চন প্রকট হইল। মমতা তাহা দেখিয়াও দেখিল না। বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়িয়া, প্রভাতের রক্তাক্ত মাথা বাঁধিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আমার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ী যেতে পারবে!'

প্রভাত নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—'থাক্, থাক্, তুমি স'রে যাও আমার কাছ থেকে। তোমাকে দ্বিতীয়-বার স্পর্শ করবার আগে আমার সংজ্ঞা যেন চিরতরে লুপ্ত হয়। ভগবান্!'

তারপর সে উঠিয়া টলিতে টলিতে আগাইয়া চলিল বাড়ীর দিকে। মমতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গতি তার এমন স্খলিত যে, দেখিলেই বুঝা যায়, প্রতি পদেই তাকে মূর্চ্ছার সঙ্গে লড়াই করিতে হইতেছে।

প্রভাত বাড়ী ঢুকিল। মমতা বাড়ীতে যাইতে পারিল না। শিবমন্দিরে গেল পূজা সমাপ্ত করিতে। কিন্তু পূজা সে প্রথমে করিতে পারিল না; উচ্ছ্বসিত অশ্রুর অঝোর ঝরণ তাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে কোন প্রকারে পূজা শেষ করিল। প্রণাম করিয়া উঠিবে; এমন সময়ে বাহিরের উঠানে 'মমতা দেবী কি জয়' ইত্যাদি কোলাহল শুনিয়া সে অতি মাত্রায় বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে শোভাযাত্রীরা শিবমন্দিরের কাছে উপস্থিত হইল। সংক্ষিপ্ত হইলেও, শোভন শোভাযাত্রাটি। সম্মুখে দুই ছোক্‌রা পেটে হারমোনিয়ম ঝুলাইয়াছে; মাঝখানে পতাকা হস্তে যেন কোন্ নারীসমুদ্ধারিণী সভার দুইজন নারীসভ্য এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক ধোপ-দোরস্ত নেতৃস্থানীয় যুবক। পশ্চাতে অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা, ছোট ছোট পতাকা ধরিয়া। গান চলিতেছে; মাঝে মাঝে 'ধর্ম্মধ্বজী নিপাত যাউক' ইত্যাদি উৎকট চীৎকার।

নেতৃস্থানীয় যুবকটি আগাইয়া আসিয়া নাটকীয় ভঙ্গিমায় হস্তাদি সঞ্চালন করিয়া আবেগকম্প্রকণ্ঠে মমতার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল—'আসুন দেবি, আজ নির্য্যাতিতা আপনাকে সভাপতি করে' আমরা ধন্য হই, কৃতার্থ হই। তথাকথিত ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করে,' নারীর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি; হরিজনের দাবী পূর্ণ করি। ধর্ম্মধ্বজীদের মুখে চুণকালি পড়ুক। জগতে সাম্যের বান ডাকাইয়া দি'!'

এই অযাচিত দরদে মমতার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—'বেরিয়ে যান এখান থেকে। লজ্জা-হীনতারও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন! কুলবধূর এ অপমান করবার মত নির্লজ্জ দুঃসাহস কে জাগিয়ে দিল আপনাদের মনে? আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নয়, একটি কথাও নয়। এক্ষুণি বেরিয়ে যান আমার সম্মুখ থেকে। অপরিচিতা কুলবধূর বাড়ী চড়াও ক'রে, তার সম্মুখে

দাঁড়িয়ে এত বড় বেহায়াপণা দেখাতে যা'রা সাহস পায়, তাদের স্থান শিষ্ট-সমাজে নয়।'

বে-গতিক দেখিয়া, চাপা-গলায় সশ্লেষ কটু মন্তব্য করিতে করিতে শোভাযাত্রা ভাগিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর হইতে মমতার দৃপ্ত মন্তব্য শুনিয়া প্রভাত বিস্মিত হইল।

জমিদার-কন্যা প্রভাতকে এই মর্ম্মে চিঠি দিয়াছিলেন যে, মমতা হরিজনোদ্ধারে মাতিয়াছে; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নেতৃ-যুবকদের সঙ্গে মমতার যোগাযোগ থাকাও অসম্ভব নয়, ইত্যাদি। প্রভাতের বিকৃতির কারণ এইখানেই। মমতার মমতাপ্রবণ চিত্তকে সে ভাল করিয়া জানিত। পূর্ব্বেও প্রভাত দেখিয়াছে, বৃদ্ধা মাতু ডোম্‌নী যখন রোগ-শয্যায়, তখন মমতা ওষুধ দিয়াছে, শুশ্রূষা করিয়াছে, ঝোলভাত রাঁধিয়া নিজে লইয়া গিয়া তাকে দিয়া আসিয়াছে। প্রভাত যে তখন ইহাতে গৌরব বোধ করিত! তার কাছে মমতার এই দরদ নিষ্ঠার পবিত্র চন্দনে মাখিয়া এক অপূর্ব্ব মহত্ত্বের দিব্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত যে!

জমিদার-দুহিতা যাদের প্রহার করিয়াছেন, মমতা তাদেরই উপর দরদ দেখাইয়াছে; সুতরাং তাঁর রাগ হইবারই কথা। জানি না, আর কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল কিনা। যাহা হউক, তিনি প্রতিশোধ তুলিলেন এইভাবে। প্রভাত তো এ রহস্য ভেদ করিতে পারিল না, চেষ্টাও করিল না; মোহগ্রস্তই হইয়া রহিল।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সংস্কারক যুবসঙ্ঘ সংবাদ শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। অমন একজন মহিলাকে দলে টানিতে পারিলে, তাদের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। তাদের পরিচালক যুবকটি কোথাকার যেন সমিতির দু'জন নারীসভ্যকে এই উদ্দেশ্যে আনাইয়াছিল। সে এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া সভা ডাকিয়া, বক্তৃতা দিয়া, কাগজে লিখিয়া, মমতার মন গলাইয়া অনেক কিছু করিতে চায় যে!

বৈকালে জমিদার-দুহিতা স্বয়ং আসিয়া প্রভাতের শারীরিক ব্যথার জন্য দুঃখপ্রকাশ তথা মানসিক বেদনায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় কোন প্রকারে সায়ং-সন্ধ্যা সারিয়া প্রভাত ঠাকুর ঘরের বাহিরে আসিয়াছে; ধূলো কাঁদিয়া উঠিল—মামাঠাকুর, শীগ্রি এসো, মামীঠাকরুণের কি হল!

প্রভাত তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে গিয়া দেখে—ধূলি-শয্যায় মমতা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ধূলোকে জল আনিতে বলিয়া প্রভাত মমতার পাশে বসিয়া নাড়ী ও নিশ্বাস পরীক্ষা করিল। ধূলো জল আনিল। জলের ঝাঁপট মুখে-চোখে দিতে মমতার চেতন হইল। আজ প্রভাত ভাল করিয়া দেখিল—সে সোণার কান্তি মলিন হইয়াছে; সেই সুকোমল দেহবল্লী কঙ্কাল-সার হইয়াছে। মমতা প্রভাতকে পাশে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

প্রভাত বাহিরে আসিয়া ধূলোকে জিজ্ঞাসা করিল—জানিস, 'ধূলো! হঠাৎ তোর মামীঠাকরুণের এমন হ'ল কেন?'

ধূলো বলিল—'হঠাৎ নয় মামাঠাকুর, সেই যেদিন হ'তে মামীঠাকরুণ 'ভিন্নু' হয়েছেন, সেইদিন থেকেই তো খাওয়া দাওয়া নাই। না খেয়ে-না-খেয়ে, ভেবে ভেবে আর কেঁদে-কেঁদে এমনি হ'য়েছে। আজ বিকেল বেলা থেকে কেবলই কাঁদছে।'

প্রভাত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

রাত্রে প্রভাত সবে শুইয়াছে, এমন সময়ে ধূলো বাহির হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—'মামীঠাকরুণের আবার ফিট্ হ'য়েছে।'

প্রভাত দ্রুতপদে মমতার ঘরে আসিয়া বহু চেষ্টার পর তাহার চেতনা সম্পাদন করিল। মমতার মুখে একটু জল দিয়া, ধূলোকে কাছে বসিতে বলিয়া প্রভাত একটা বাটি হাতে বাহির হইয়া গেল। গোয়াল খুলিয়া, নিজেই একটা গাই দুইয়া, একবাটি টাট্‌কা দুধ লইয়া ফিরিল।

মমতা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। প্রভাত আসিয়া ধূলোকে বলিল—'তুই শু'গে যা'; কোন ভয় নাই। এখানে রয়েছি।' ধূলো বাহিরে চলিয়া গেল।

দুধের বাটি নামাইয়া প্রভাত ডাকিল—'মমতা !'

আর মমতার চোখের জল বাধা মানিল না! সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল।

'—দুধটা খেয়ে নাও।'

প্রভাতেরও কণ্ঠস্বরে রুদ্ধ রোদন লুটোপুটি খাইতেছিল।

মমতার দুধ খাওয়ার আগ্রহ দেখা গেল না। প্রভাত জোর করিয়াই খানিকটা দুধ খাওয়াইল।

কিছুক্ষণ পরে মমতা বলিল—'আমি ভাল আছি, তুমি শোওগে।' প্রভাত নীরব। আবার কতক্ষণ পরে মমতা বলিল,—'কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ! বাড়ীতে শোওগে।'

প্রভাত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—'এতটা অপমান আমার না ক'রলেও পারতে মমতা! মাথাটা আমার হেঁট ক'রে দিলে! কোথাও আমার মুখ দেখাবার যো নাই। যুব-সঙ্ঘে যোগ দিয়ে খবরের কাগজে আমার কুৎসা না রটালেও পারতে। বেশ করেছ! এখন ভগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা- যেন এ রাত্রি আমার শেষ না হয়! রাতের অন্ধকারে লোকের সবিজ্ঞ দৃষ্টি হতে আত্মগোপন করে' বেশ আছি।'

—'আমি যুবসঙ্ঘে যোগ দিয়েছি! খবরের কাগজে তোমার কুৎসা রটিয়েছি! কি বলছ তুমি!—'

—'দাঁড়াও মমতা—'

প্রভাত বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা খবরের কাগজ আনিয়া মমতার হাতে দিয়া বলিল—'এইখানটা পড় দেখি!'

মমতা পড়িয়া অবাক্ হইল। তার বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—'আমি তো এর কিছুই জানি না!'

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মমতা বলিল—'যদি পারো, এ রহস্য ভেদ ক'রো। অমূলক সন্দেহের বিষ-বাষ্পে স্নেহ-প্রেমের পূত-বিগ্রহ কালো করো না। আমার একটি অনুরোধ, জমিদার-দুহিতার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'র, তা' হ'লেই সব ব্যাপার তোমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে প'ড়বে।' শেষের কথা কয়টা উচ্চারণ করিবার সময়ে মমতার কণ্ঠস্বরে ক্ষুব্ধ অভিমান ঝরিয়া পড়িতেছিল।

প্রভাত ভাবিতে লাগিল। সে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। মমতার বিরুদ্ধে বড় বড় প্রমাণ একদিকে,—আর একদিকে মমতার সহজ সরল দৃষ্টি, অকৃত্রিম দরদ-মাখানো কণ্ঠস্বর ও তাহার দেহের এই শোচনীয় পরিণতি। ধূলো বলিয়াছে—'যে দিন থেকে ভিন্ন হয়েছে, সেইদিন থেকে না-খেয়ে না-খেয়ে, ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে এমনি হয়েছে।' জমিদারকন্যার সহসা অস্বাভাবিক আগ্রহ ও আকর্ষণ তার উপর; যাচিয়া পথে মমতার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করা, তাকে চিঠি দেওয়া;—সবগুলো প্রভাতের মনের ভিতর একসঙ্গে ভীড় জমাইল। এদিকে মমতা সকালে যে ভাবে সঘৃণ ক্রোধে সঙ্ঘের শোভাযাত্রাকে তাড়াইয়াছে, তা' বাড়ীর ভিতর হইতে প্রভাত স্বকর্ণে-ই শুনিয়াছে। কিন্তু,—তবু—

অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে স্নেহ বড় সহজেই ম্লান হইয়া পড়ে!

হঠাৎ একটা দারুণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ধূলো ভাইটিকে লইয়া বাহিরে জীর্ণ বারান্দার একটি কোণে শুইয়া ছিল। একটা কেউটে সাপ পটলকে দংশন করে; সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া ধূলো ভাইটিকে কোলে তুলিতে যাইবে;—সাপটা তাকেও বুকে কামড়ায়। উভয়ের আর্ত্ত চীৎকারে প্রভাত আলো লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিয়া, বিপন্নভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—'মমতা, শীগ্রি এসো, সর্ব্বনাশ হয়েছে।'

মমতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল পাথরের মত।

চিরিয়া রক্ত বাহির করা, পোড়ানো, ল্যাক্সিন ব্যবহার কিছুরই ত্রুটি করিল না প্রভাত। কিন্তু বিধাতা যে হতভাগাদের কোলে টানিয়াছেন!

মমতার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে কাতর স্বরে বলিল—'বাঁচবে না!' প্রভাত ম্লান মুখে বলিল—'সম্ভাবনা তো দেখি না।'

প্রভাত চেষ্টার ত্রুটি করিল না। ডাক্তার ডাকাইল।

কিছুতেই কিছু না। সব শেষ হইয়া গেল। 'হা হতভাগারা' বলিয়া প্রভাত কাঁদিয়া উঠিল। মমতার অশ্রুধারার বিরাম নাই।

রাত্রে প্রভাত মমতাকে বলিল—পারো তো আমায় ক্ষমা ক'রো, মমতা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

—তা কেন বল্‌ছো। তোমার প্রকৃত রূপটি তো আমার কাছে অজ্ঞাত নয়! আমি স্থির জানতাম, এ তোমার সাময়িক রাহুগ্রাস!

—না মমতা, আমার সান্ত্বনা। স্তোকবাক্যে আমার অপরাধ ঢাকতে যেও না। আমি মহাপাতক করেছি, মমতা!—বলিয়া প্রভাত আবেগভরে মমতার দু'হাত চপিয়া ধরিল।

মমতা প্রভাতের পায়ে মাথা রাখিয়া অজস্র অশ্রুধারে তার পা ভাসাইল।

তাকে বুকে ধরিয়া প্রভাত বলিল—এই সঙ্গে যদি খুলোদের ফিরে পেতাম!

দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে মমতা বলিল—'হা হতভাগারা!'

তার দু'চোখে দু'ঝলক তপ্ত অশ্রু বাহির হইয়া আসিল!

কাব্য-লক্ষ্মী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কল্পনারি আল্‌পনা দেয় অন্তরেরি অঙ্গনে
মোর কবিতা-সুন্দরী সে—রঙ্গে,
তুল্‌ছে ভ'রে মনের সাজি বকুল-অশোক-রঙ্গনে
কনক-চাঁপার দীপ্তি তাহার অঙ্গে!

চিত্তে মম নিত্য জাগে বসন্ত তার ইঙ্গিতে-
কোকিল গাহে মনের বন-কুঞ্জে,
উপ্‌চে উঠে আমার হিয়া উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতে,
ছন্দ শত অলির মত গুঞ্জে।

অনুপ্রাসের হাওয়া আমার হিয়ায় উঠে হিল্লোলি'
ভাবের মাতন জাগে আমার মর্ম্মে,
আনন্দে ধায় পাগল-পারা জীবন-ধারা কল্লোলি'—
সুরের আবেশ লাগে সকল কর্ম্মে।

গন্ধ-কমল ফুটায় সে যে সংসারেরি পঙ্কে,
দুঃখে সে দেয় সান্ত্বনারি স্পর্শ,
প্রিয়ার মত চুম্বি' মোরে লয় সে তুলে অঙ্কে,
বক্ষে আমার জাগে বিপুল হর্ষ!

বেদনা মোর ছন্দ হ'য়ে সদাই উঠে মুঞ্জরি'
মোর হাহাকার সঙ্গীতে চায় ফুট্‌তে,
ঝঙ্কৃয়মান বীণার মত দিবস-রাতি গুঞ্জরি'—
পরাণখানি প্রয়াস করে উঠ্‌তে।

দৈন্য কভু যায় না মুছে আমার মনের তারুণ্য,-
বেড়াই ঘৃণা বিদ্রূপেরি ঊর্দ্ধে,
স্রষ্টা আমায় দিয়ে ধরার আনন্দ আর কারুণ্য
ক'রলে আমার হৃদয় ভরপুর যে!

শোকের ঝড়ে মুস্‌ড়ে না যাই—ভয় করিনা কষ্টকে,—
সম্মুখে মোর—অ-লোক আলোর দীপ্তি,
জাগ্‌ছে নিতি আঁখির আগে আনন্দ-ধাম স্পষ্টরে
জীবনে তাই জাগ্‌ছে বিমল তৃপ্তি!

আধুনিক নারীর শিক্ষা ও বিবাহ-সমস্যা

শ্রীমমতা ঘোষ (মিত্র)

স্বপ্নে ভাবা যায় না এমন ঘটনাও ঘ'টে থাকে। প্রায় একশ', বছর আগে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা ত' দূরের কথা, তাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবার প্রয়োজন আছে—তাই কারুর কল্পনায় আসেনি। কালচক্র ঘুরেছে, বর্ত্তমান যুগে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, বিবাহ, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বহু সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে, মেয়ে-পুরুষ সকলেই মেয়েদের বিষয়ে হ'য়ে উঠেছেন সচেতন। প্রথম বিস্ময় কেটেছে, এখন আধুনিক নারীর দোষত্রুটি সকলকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে।

প্রায়ই শোনা যায়, আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের চালচলন নিন্দনীয় এবং শিক্ষাই এজন্য দায়ী। শিক্ষা তাদের সুন্দর করে না, তাছাড়া স্বামীর সংসারে সুখের বদলে অশান্তির আগুন জ্বালে। একথা কতদূর সত্য তা' দেখ্‌তে হ'বে।

শিক্ষিতা মেয়েরা বিলাসিতাপ্রিয়, অলস, গৃহকর্ম্মে উদাসীন ইত্যাদি অভিযোগ শোনা যায়। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও এসব দোষ মাঝে মাঝে দেখা যায়। কলঙ্ক চন্দ্রেই শোভা পায়, তারায় নয়—এটা সবাই স্বীকার করবেন আশা করি। কাজেই এই সব দোষযুক্ত অশিক্ষিতা মেয়ের চেয়ে শিক্ষিতা মেয়ে ভাল বা কাম্য ব'লে মান্‌তে হ'বে! তাছাড়া দোষ বিদ্যার নয়, শিক্ষাদানের দোষ, মানুষ করার প্রণালীর দোষ। বিদ্যা উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়, মনো-জগতকে অন্ধকার হ'তে আলোর রাজ্যে এনে দেওয়াই তার কাজ। বিদ্যার অপরাধ নয়, শিক্ষাদান প্রণালী খারাপ হ'লেই ঘটে অনর্থ।

বিলাসিতার বিষয়ে এ কথা বলা যায় যে, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নয়, মেয়ে মাত্রেই কিছু না কিছু বিলাসিতা-প্রিয়—সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব যুগে, সর্ব্ব কালে। যুগে যুগে, কালে কালে মেয়েরা পুরুষকে খুশী ক'রে এসেছে ত্যাগে, সেবায়, আত্মদানে। খাইয়ে খায়, হাসিয়ে হাসে—এই তাদের স্বভাব। মেয়েরা সাজে—সে ত' পুরুষেরই জন্য। পুরুষ দেখবে, তৃপ্তি পাবে, মুগ্ধ হ'বে—তাই সাজে তারা আবরণে, আভরণে। শুন্‌তে পাই, আধুনিক মেয়েদের সজ্জা দৃষ্টিকটু হ'চ্ছে। পরোক্ষে পুরুষই দায়ী তার জন্য। পুরুষ দেখ্‌ছে, উপকরণ জোগাচ্ছে, তাই ত' সাজ্‌ছে মেয়েরা। আজ যদি পুরুষ অপছন্দ করে, তবে কালই মেয়েরা অন্যভাবে নিজেদের সাজাবে। মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ কি? দায়ী ত' পুরুষ সমাজ। বাপ, ভাই বা স্বামী যদি পছন্দ না করেন, উপকরণ না আনেন—তখনই ঘট্‌বে সজ্জার পরিবর্ত্তন। শুধু দোষ দিলে চ'লবে না, কারণ এবং মূল দুই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এ কথা যেন কেউ বুঝবেন না যে, আমি বিলাসিতার হ'য়ে ওকালতি ক'রছি। আমি জানাতে চাই, এটা নারীর নারীধর্ম্মেরই এক অংশ। তাই ব'লে মেয়েরা সমস্ত কাজ বিসর্জ্জন দিয়ে দিন-রাত সাজসজ্জা নিয়ে মত্ত থাক্‌বে—এ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সব কাজ বজায় রেখে, সাধ্যমত আয়ের সামান্য অংশ মনোমত বেশ ভূষার জন্য ব্যয় করা চলে। কারণ তা' তাকে সৌন্দর্য্য দান করে। যে সাজে তার নিজের তৃপ্তি ও যে দেখে তারও চোখ ও মন মুগ্ধ হয়। সুতরাং তার প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে মাত্রাধিক্য না হওয়াই মঙ্গল।

মেয়েদের চালচলন খারাপ হ'চ্ছে। কিন্তু খারাপ হ'ল কি ক'রে? দোষ অভিভাবকদের। বিলাসিতার উপকরণ জোগান ব'লে মেয়েরা বিলাসী হয়। স্নেহবশতঃ গৃহ-কর্ম্মে বিরত রাখেন ব'লেই মেয়েরা হ'য়ে ওঠে কর্ম্মবিমুখ অলস। যেমন বীজ বপন ক'রবে তেমনই ফসল ফ'লবে—এই চলিত কথা এখানেও খাটে। শিশুকাল হ'তে যেভাবে মানুষ চালিত হয়, ভবিষ্যতে সেই রকমই হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই বলি, কী লাভ মেয়েদের দোষ দিয়ে? অপরাধী যদি কেউ হন ত' তাদের স্নেহশীল অভিভাবকগণ। শিশুকন্যাদের পিতামাতারা যদি এখন হ'তে সাবধান হ'ন, তা' হলে ভবিষ্যতে শিক্ষিতা নারীরা হ'বে ত্রুটিহীন।

তারপরের অভিযোগ বিবাহিত জীবনে স্বামীর পরিবারে আধুনিকেরা শান্তি দিতে পারে না, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাক্‌তে তারা অক্ষম।

আগেকার দিনে ছিল আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং তখনকার নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের বিবাহ হ'ত অল্প বয়সে, স্বামীর সংসারে যেভাবে চালান হত—ঠিক সেই ছাঁচে তারা গড়ে উঠ্‌ত, হ'য়ে যেত তাদেরই একজন। সুতরাং বিরোধ বাধত না। এখন জীবন-সংগ্রাম কঠোর হ'য়েছে, মেয়ের বাপের পয়সার অভাব, ছেলেরা উপার্জ্জনে অক্ষম, বেকার ইত্যাদি কারণে ছেলে-মেয়ে দুয়েরই বিবাহ আর তাড়াতাড়ি হ'চ্ছে না, বছর যাচ্ছে এবং বয়স বাড়্‌ছে। এই সুযোগে মেয়েরা ক'রছে পড়াশুনা, ফলে তাদের মনের জাগরণই ঘটে। দোষ-গুণের বিচার, পছন্দ-অপছন্দ, নিজস্ব মতামত প্রভৃতি দেখা দেয়। বিদ্যা দেয় তার ফল পরিপূর্ণরূপে। এইভাবে বয়স্থা ও শিক্ষিতা হ'য়ে যায় তারা স্বামীর ঘরে। একজন প্রবল ও অপরজন দুর্ব্বল হ'লে প্রবলের শাসনে থাকে এবং তাকে মেনে চলে; কিন্তু দু'জন সমান হ'লে ঘটে সংঘর্ষ। বর্ত্তমান যুগে তাই ঘট্‌ছে। স্বামীর সঙ্গে বিরোধ বাধে এইখানে, নির্ব্বিচারে স্বামীর মতামত গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হয় না এবং স্বামীকে চোখ বুঁজে মা-ঠাকুমার মত দেবতা জ্ঞানে পূজা ক'রতে অনিচ্ছুক হয়। পরিবার-বর্গের সঙ্গে অমিল হওয়ারও কারণ আছে। একভাবে মানুষ হ'য়ে বয়স্থা বধূ এল স্বামীর ঘরে, দেখ্‌ল এসে সেখানকার অন্যরকম চালচলন; তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই বধূ নতুন সংসারে মিশে যেতে পারে না, সংসারও বধূর সঙ্গে মিশ্‌তে অক্ষম হয়। তারই ফলে বধূ হয় অপরাধী। শিক্ষার দোষ হয়, আধুনিক মেয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়। প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য ব'লে এক মুহূর্ত্তে কোন মানুষেরই আমূল পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না। স্বামীর আত্মীয়েরা যে ভাবে দেখ্‌তে চান বধূর বয়স ও শিক্ষা সেইরূপ নিতে বাধা দেয়, তার মন বিচার চায়, বিদ্রোহ করে। এইসব কারণে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

এর কি কোনই প্রতীকার নেই? আছে বৈ কি? স্বামীকে হ'তে হ'বে বিবেচক, তাঁর স্বজনদের হওয়া দরকার কোমল ও স্নেহশীল। তাঁরা যা চান তা' পেতে সময় লাগে, হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেতে হয় এটা তাঁদের মনে থাকে না। ছাড়তে হ'বে, ছাড়াতে হ'বে। বধূর স্বতন্ত্র সত্তা তাঁদের স্বীকার করার প্রয়োজন আছে। বধূ তখনই নিজেকে বিসর্জন দিয়ে সংসারের সকলের সন্তোষ বিধান ক'রতে পারে যখন সেই সংসারের সকলের সঙ্গে প্রাণের যোগ ঘটে তার। সেই প্রাণের যোগ সাধনের জন্য চাই সহৃদয় ব্যবহার, তাকে কর্ত্তব্য পালনের যন্ত্র না ভেবে মানুষ ভাবা। তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এবার শিক্ষার বিষয়ে বলা যাক। বর্ত্তমানে মেয়েরা ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'র্‌ছে। বিদ্যার্জ্জন খুবই ভাল জিনিস—কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদ তারও আছে। জ্ঞানের আলো অজ্ঞতার অন্ধকার নাশ করে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল শুধু খেলেই হ'বে না, সেটা হজম ক'রে মানিয়ে নেওয়া চাই। আলোয় মানুষ সব জিনিস দেখ্‌তে পায়, শিক্ষার প্রভা আলোর সঙ্গে তুলনীয়। উচ্চ শিক্ষা সব মেয়ের বরণীয় নয়। উচ্চ শিক্ষার যথার্থ অধিকারিণী তারাই যারা আজীবন কুমারী থেকে দেশ-সেবা বা সমাজ-সেবার ব্রত গ্রহণ ক'রবে। সাধারণ মেয়েদের বিবাহের বয়স হওয়া উচিত ১৭।১৮র মধ্যে এবং বিদ্যা ম্যাট্রিক শ্রেণী পর্য্যন্ত কাম্য। অল্প বয়সে মন থাকে কাঁচা ও নমনীয়, পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া আরও অনেক কিছু জীবনে শেখবার আছে, শিক্ষা গ্রহণ করারও বয়স আছে। ১৭।১৮র ভেতর বিবাহ হ'লে নতুন জীবন সুন্দর ও মধুময় হ'বারই সম্ভাবনা, স্বভাব ও অভ্যাসের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন শক্ত নয়। মধ্য শিক্ষার আলো চন্দ্রকিরণের মত মনকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল ক'রে রাখে, প্রখর দীপ্তিতে সূর্য্যের মত দগ্ধ করে না।

জীবনে দরকারে আসে না এমন জিনিস শিক্ষার বিষয় হওয়া অকর্ত্তব্য। এ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি ইত্যাদি শেখানো মানে সময়ের অপব্যয় এবং মনের ওপর অত্যাচার। গৃহস্থালী, শিশুপালন, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, সেলাই আদি শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনে কাজে লাগে। গৃহ সুন্দর ও শান্তিময় রাখাও আর্টের অন্তর্গত। সুখের বিষয়, কল্‌কাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এই বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক'রছেন।

এখন কথা উঠ্‌তে পারে ১৭।১৮র মধ্যে বিবাহ হ'বার অন্তরায় মেয়ের বাপের আর্থিক অসুবিধা। যে পণ দিয়ে পাত্র কিন্‌তে হ'বে সেই সম্বল সংগ্রহ ক'রতে সময় লাগে,

ইতিমধ্যে মেয়ের বয়স বাড়ে; অগত্যা পড়াশুনো চল্‌তে থাকে। মেয়ের বাপের মনে এ আশাও ক্ষীণভাবে থাকে যে শিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ সহজে হ'বে, দুঃখের বিষয় সব সময় তা' হয় না। এর প্রতীকারের একমাত্র উপায় হ'চ্ছে পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধন। পণপ্রথা যে পর্য্যন্ত না বন্ধ হ'বে ততদিন এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না। উচ্চ শিক্ষিত পাত্র ও পাত্রের পিতা হাত মেলে পণের টাকা গ্রহণ ক'রতে কিছু মাত্র লজ্জাবোধ করেন না, এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? "ঘরের টাকা খরচ ক'রে ছেলের বিয়ে দেব" এমন কথা যারা বলে তারা যে কী শ্রেণীর জীব বুঝি না। প্রথা আছে এই দোহাই দিয়ে অকুণ্ঠিত ভাবে পণ নিতে এরা সিদ্ধহস্ত। এ ভিক্ষুক মনোবৃত্তি কবে দূর হ'বে? এর উচ্ছেদ সাধনের জন্য আন্দোলন আলোচনা অনেক হ'য়েছে, এই নিদারুণ অত্যাচারের পায়ে কত কুমারী আত্মাহুতি দিয়েছে, কত না জীবন-মুকুল ফোট্‌বার আগে ঝ'রে প'ড়েছে এরই দুঃসহ তাপে। তবু সমাজ টলে নি, তবুও পাত্রপক্ষের মন গলে নি। আমার মনে হয় আইন ক'রে এই জঘন্য ও ভীষণ প্রথা বন্ধ করা উচিত। অন্য কোন পথ নেই। শিক্ষা মনের মালিন্য দূর ক'রে অন্তর সুন্দর করে না, তার প্রমাণ বাঙলা দেশের পরধনলোভী পাত্র ও পাত্রপক্ষ অহরহ দিচ্ছেন। এ প্রথা বন্ধ হ'লে তবেই ঘরে ঘরে শান্তির বাতাস বইবে।

উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা স্বামিগৃহে অসুবিধাগ্রস্ত হয়, কেন হয় তার কারণ আগে বলেছি। শিক্ষিত মন গতানুগতিক পথে চল্‌তে পারে না। অপরে যা বল্‌বে নির্ব্বিচারে তাই মেনে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন। তাই হয় না মনে মনে মিলন, পদে পদে বিরোধ বাধে।

আধুনিক বর শিক্ষিতা বয়স্থা বধূ কামনা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বাপের অর্থ-ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি দিতে ভুল করে না। মন জাগ্‌লে সে তার কাজ করে। স্বামীর পণ গ্রহণ বধূর মন বিষাক্ত ক'রে তোলে। যে স্বামী স্ত্রীর পিতার কাছে দাবী জানিয়ে পণ গ্রহণ করেন তিনি ভাব্‌তে ভুলে যান বা ভাবা প্রয়োজন বোধ করেন না যে বয়স্থা ও শিক্ষিতা স্ত্রী এই জিনিসটা কী চোখে দেখ্‌বে। নগদ টাকা অলঙ্কার আস্‌বাব ইত্যাদিরই যেন তার প্রয়োজন, একটি কন্যা গ্রহণ না ক'রলে এগুলি হাতে আস্‌বে না তাই বিবাহের আয়োজন ক'রতে হয়। অথচ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর মনও দাবী করেন। এবং তিনি ও তাঁর আত্মীয় স্বজন আশা করেন। নব বধূ তাঁদের সকলের সেবা যত্ন ক'রে তাঁদেরই একজন হ'য়ে যাবে। আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি! যদি বধূ বলে—"বিয়ের সময় ত' এ সর্ত্ত হয় নি, যা চেয়েছিলে পেয়েছ; তখন আমি ছিলুম অবান্তর, সেই আমার কাছে তোমাদের কিছুই প্রত্যাশা করার নেই। আজ চাচ্ছ, সেদিন আমায় খুঁজেছিলে কি?" এ কথাগুলি বল্‌লে বা ভাব্‌লে বিশেষ অন্যায় হয় না। একজন মানুষকে মানুষ ব'লে মনে করা হয় নি এইটা তার মনকে অপমান-পীড়িত ক'রে তোলে। কাজেই শ্রদ্ধান্বিত মন নিয়ে উচ্চশিক্ষিতা বধূ স্বামীগৃহে প্রথম পদার্পণ করে না, ক'রতে পারে না। তার অন্তরে যে সুরের গুঞ্জন ওঠে তা' মিলনের মদির আবেশপূর্ণ সব ক্ষেত্রে হয় এমন ব'ল্‌লে ভুল করা হ'বে। সমস্ত কারণগুলি বিবেচনা ক'রলে বধূর প্রতি বিরূপ হ'বার অবকাশ পাওয়া কঠিন। অবশ্য এই সব ব্যাপার প্রত্যেক ঘরে ঘট্‌ছে এ কথা বলি না, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত ও জাগ্রত মন বিশিষ্ট মেয়েদের বধূজীবন অনেকটা এ ধরণের হ'চ্ছে। মনের মধ্যে এই বিষাক্ত কীট লুকিয়ে থাকে সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্র করে আত্মপ্রকাশ। ফলে শান্তির অভাব ঘটে।

বর্ত্তমানে বিবাহিত জীবন নানা কারণে আশানুরূপ হ'চ্ছে না, তার অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করলুম। এর প্রতীকারের উপায় মেয়েদের উচ্চতর শিক্ষা কিছু পরিমাণে বন্ধ করা ও বিবাহের বয়স কমানো। সব কিছু বুঝতে শিখ্‌লেই বাড়ে বিপদ। অজ্ঞতা এক রকম আশীর্ব্বাদ। ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রলে এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া উপায় দেখি না।

লক্ষ্মীমণি

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

কৈলাস কৈবর্ত্তের বয়স যখন চল্লিশ তখন লক্ষ্মীমণির সাহিত তার দ্বিতীয়বার বিবাহ হইয়া গেল। লক্ষ্মীমণি কিন্তু তখনো দশের কোঠা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। বয়স হিসাবে এ-বিবাহ একটু দৃষ্টিকটু হইলেও, কুল হিসাবে ইহার কোন খুঁত ছিল না। কাজেই যারা প্রথমে একটু অমত করিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাদেরও মত দিতে হইয়াছিল। বিবাহের পরই লক্ষ্মীমণিকে স্বামীর ঘর করিতে যাইতে হয় নাই। নিতান্ত বালিকা বলিয়া কয়েক বছর বাপ মার কাছে থাকিবারও সে অনুমতি পাইয়াছিল।

লক্ষ্মীমণি আর তার মা আমাদের প্রতিবেশী, কিন্তু 'তুর্জ্জন' নয়। তাদের বাড়ীটা ছিল ঠিক আমাদের বাড়ীর পাশেই। কয়েক বছর আগে গ্রামের স্কুলে একটা মাষ্টারী লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম। বেতন সামান্যই। কোন রকমে সংসার চলিয়া যাইত। এখানে থাকিবার সময়, লক্ষ্মীমণি প্রায়ই আমার ছোট বোন্‌দের কাছে পড়া লইতে আসিত। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, লেখাপড়ায় তার বেশ একটু মনোযোগ ছিল। কৈবর্ত্তের ঘরের মেয়ে হইলেও, চোখে মুখে তার এমন একটা বুদ্ধির দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইত, যা আমি অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েদের মুখেও দেখি নাই। তাই তার অনেক সঙ্গিণীদের মধ্যে কেন-না-জানি তাকেই আমার বিশেষ করিয়া চোখে পড়িত। লক্ষ্মীমণি যখন স্বামীর ঘর করিতে যায়, তখন সে বাঙ্‌লা লেখাপড়া তুই-ই শিখিয়াছিল।

প্রথমবার শ্বশুড়-বাড়ী যাইয়া লক্ষ্মীমণি বেশীদিন থাকিতে পারে নাই। কাঁদিয়া কাটিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। বছরখানেক পরে আবার যখন তাকে ধরিয়া বাঁধিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখনও তার কান্নার বিরাম ছিল না। সেদিন তার কান্নার নমুনা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, তার এ-কান্না বুঝি আর কোনদিন থামিবে না। তার স্বামী বস্তুটিকে আমি দেখিয়াছিলাম। রঙটা তার কি রকম, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে, গভীর অমাবস্যার রাত্রিতে পথে বাহির হইলে, তাকে চিনিয়া বাহির করা তুষ্কর। গোল ভাঁটার মত চক্ষু তুইটা অতিরিক্ত গাঁজা খাওয়ার দরুণই বোধ হয় রক্তবর্ণ। সর্ব্বোপরি চোখে মুখে একটা জঘন্য কুশ্রীতা, তার ডাকাতের মত চেহারাটাকে বিশেষ করিয়া মানাইয়া তুলিয়াছিল।

লক্ষ্মীমণি কেন যে শ্বশুড়বাড়ী যাইতে চাহিত না তার কারণও বোধ হয় এই স্বামীবস্তুটি। যাকে দেখিলে ভয় করা মানুষের স্বাভাবিক, তাকে শুধু স্বামী বলিয়াই যে সে একেবারে গলিয়া পড়িবে, ইহা আশা করা অন্যায়। উপরন্তু কৈলাসের হৃদয়বৃত্তি বলিয়া একটা পদার্থ ছিল না। সামান্য ত্রুটিতে সে লক্ষ্মীমণির উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া যাইতে পারিত। ব্যথা লাগিত না। যা মানুষের লাগে।

লক্ষ্মীমণি যে শ্বশুড়বাড়ী একেবারেই যাইত না, তাহা নহে। কয়েকবার গিয়াছিল। শেষবার অনেকদিনের জন্য। দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর যখন সে তার মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল, তখন তার বয়স আঠারো কি উনিশ। এবার কৈলাসই তাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল।

গ্রামে ফিরিলেই সে একবার আমাদের বাড়ীতে আসিত। এবারও আসিয়াছিল। সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তার চোখে মুখে কৈশোরের সেই সহাস্য উজ্জ্বলতা আর নাই। যেন কার অবহেলায় তার দেহের পরিপূর্ণ যৌবন একখানা পুরাণো ছবির মত আবছা হইয়া গিয়াছে। যে মরুভূমিতে সে চলিয়াছিল, সেখানে মরুদ্যানের স্বপ্ন ছিলনা; কেবল মরীচিকা। তাই জীবনের সহজ-পথ ছাড়াইয়া সে যে জটিল পথ ধরিয়াছিল, তার জন্য যে দায়ী, সে বোধ হয় লক্ষ্মীমণি নয়, স্বয়ং কৈলাস।

লক্ষ্মীমণিদের বাড়ীর সঙ্গেই আর একঘর কৈবর্ত্ত ছিল। হরিদাস এই পরিবারের। গ্রামের স্কুলেও সে নাকি কয়েক বছর লেখাপড়ার অভিনয় করিয়াছিল। কিন্তু, তাস পাশায় হাত পাকাইয়া, আর তামাকের ধূয়ায় ঠোঁট পোড়াইয়া, বেশীদিন সে আর সেখানে টিঁকিতে পারে নাই। মাষ্টারদের হরদম কানমলা খাইয়া, নেহাৎ পৈতৃক প্রাণটা

বাঁচাইবার জন্যই তাকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল। স্কুলে সে যা বাঙ্‌লা শিখিয়াছিল; তা বটতলা আর কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের উপন্যাস পড়িবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বোধ হয় উনিশ কুড়ি বছরের কাছাকাছি আসিয়া সে সমস্ত প্রেমের ব্যাপারটাকে এত সুন্দর ও সহজভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। এই হরিদাস একদিন দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীমণির প্রেমে পড়িয়া গেল। এ-দিক ও-দিক চাহিয়াও দেখিল না। ভাবিল না।

প্রেমের পরীক্ষায় যে সে সহজেই পাশ হইয়া যাইবে, তা আমি জানিতাম। বিবাহিত হইলেও লক্ষ্মীমণি ভাল-বাসার সন্ধান পায় নাই। হরিদাস যখন সেই অনাস্বাদিত অমৃতের সন্ধান আনিয়া দিল, তখন সে নির্ব্বিবাদে তার কাছে আপনার সব কিছু বিলাইয়া দিতে দ্বিধা করিল না। এম্‌নিই হয়। পৃথিবীতে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, মানুষের প্রবৃত্তিকে বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আট্‌কাইয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সুবিধা পাইলেই সে জাল ছিঁড়িয়া পালাইয়া যায়। ইহাতে লাভ আছে কিনা জানিনা, তবে যায় জানি।

পূর্ণিমার রাত্রি। বেশ মনে আছে। জান্‌লাটা খুলিয়া বসিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের মাঝে-মাঝে-আসা বাতাসে গাছের পাতাগুলি এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। আকাশে কেবল দুই-একটি তারা। এখানে-সেখানে ব্যাঙের লাফ। আর শুক্‌না পাতার মধ্যে সাপের আঁকা-বাঁকা গতি। তার মধ্যে আমি চোখেমুখে জ্যোৎস্না লইয়া জাগিতেছিলাম।

অনেকক্ষণ জাগিয়াছিলাম। হঠাৎ পুকুরপারে চোখ পড়িতেই দেখিলাম, দুইটি ছায়ামূর্ত্তি আলোতে আসিয়া মানুষ হইয়া বাঁধানো ঘাটের উপর বসিয়া পড়িল। বেশ কাছাকাছি। কৌতূহলী হইয়া বাহির হইয়া লতাপাতা-ঘেরা একটা গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাদের মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। চিনিলাম, হরিদাস আর লক্ষ্মীমণি। চোখে তাদের ভালবাসার উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চলতা স্বপ্নময়।

শুনিলাম, লক্ষ্মীমণি হরিদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, 'চল আমরা পালিয়ে যাই। যেখানে হোক্। নদীর ধারে থাক্‌ব। তুমি মাছ ধর্‌বে, বাজারে বেচ্‌বে। আমাদের দিন চ'লে যাবে।'

হরিদাস তার মুখখানা লক্ষ্মীমণির কাছে আনিয়া বলিল, 'যাব। কিন্তু, মা কাঁদ্‌বে যে। আমি ছাড়া যে আর তার কেউ নেই।'

'কাঁদ্‌বে না। কয়েকদিন বইত নয়। তাকে আমরা নিয়ে যাব—'

'সে যাবে না লক্ষ্মীমণি', তবু যেখানে হোক্ তোমাকে নিয়ে যাব।' বলিয়া হরিদাস লক্ষ্মীমণির কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, কাল্‌কেও তোমায় ঐ ষণ্ডাটা মেরেচে?'

উত্তরে সে অতি মৃদুস্বরে বলিল 'হ্যাঁ, রোজই মারে। তোমার সাথে কথা বলি ব'লে মারে। মারুক। মেরে ফেল্‌বে?...মরতেই ত চাই।...

হরিদাস কি যেন বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ যেন কাহাকে দেখিতে পাইয়া সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। পুকুরের ওপারে রাস্তার উপর চোখ পড়িতেই দেখিলাম, একটা কালো মূর্ত্তি ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে—আর বলিতেছে, 'হারামজাদী, আয় তোকে খুন ক'রব।' বুঝিলাম, কৈলাস। হরিদাস আর লক্ষ্মীমণি হঠাৎ বাঘের সাম্‌নে-পড়া হরিণের মত ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনিতে পাইলাম একটা করুণ আর্ত্তনাদ: যেন তীরের মত বুকে আসিয়া লাগিল। বুঝিতে দেরী হইল না যে লক্ষ্মীমণি কৈলাসের খাঁচায় পড়িয়াছে।

পরদিন লক্ষ্মীমণিকে দেখিলাম। প্রতিদিনের মতই কাজে ব্যস্ত। কেবল তার সমস্ত দেহ ঘিরিয়া যেন একটি নিরাশ্রয় কান্না কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। তার ভাষাহীন প্রতিবাদ এম্‌নি ভয়াবহ, যে হঠাৎ আমার মনে হইল, পৃথিবীর এই মাটির আকর্ষণ হয় ত তাকে আর বেশীদিন টানিয়া রাখিতে পারিবে না। সে যেন গ্রীষ্মের শুষ্ক পাতার মত সংসারের দুরন্ত রৌদ্রে পুড়িয়া গিয়াছে। এখন খসিয়া পড়িবার অপেক্ষা মাত্র।

দুই একদিন পরের কথা। বন্ধের দিন। দুপুর বেলা স্নান করিয়া ঘাট হইতে ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্মী-মণিদের বাড়ীর ভিতর একটা চেঁচা-মেচি শুনিয়া দৌড়াইয় গেলাম। দেখিলাম, রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে কৈলাস মাঝে মাঝে রুখিয়া গিয়া লক্ষ্মীমণিকে

চড়-চাপড় মারিতেছে। আর সে মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছে। শিশুকাল হইতে এই মেয়েটাকে চোখের উপর বড় হইতে দেখিয়াছি। আমাদের ঘরে সে আপন-জনের মতই আসিত যাইত। তাই বোধ হয় মেজাজটা খারাপ হইয়া গেল। আমি কৈলাসকে উষ্ণ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'য়েচে কৈলাস, যে তুমি ওকে এত মারছ?'

সে তার বজ্রমুষ্টি দৃঢ় করিয়া বলিল, 'আমি ওকে খুন ক'র্‌ব। হারামজাদী, এত বড় নচ্ছার।'

আমি বলিলাম, 'আগে খুলেই ব'লনা কি হ'য়েছে। খুন ক'র্‌বার অনেক সময় পাবে।'

কৈলাস বুক চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, 'আর কি হ'য়েছে বাবু, এই চিঠিটা প'ড়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। হারামজাদা, হরিদাসকে একবার পেলেই হয়। পরের ইস্তিরির সঙ্গে পিরীত করাটা একবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব। মগের মুল্লুক না কি?'

আমি চিঠিটা আগাগোড়া পড়িলাম। তার মধ্যে লেখা ছিল:

'হরিদাস, আজ আমাকে রাত্তিরে লইয়া যাইও। আমি চুপ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া থাকিব। আমি আর সহিতে পারিনা। কালও আমাকে মারিয়াছে। তুমি না আসিলে আমার পথ আমাকে দেখিতে হইবে। উপায় নাই।' ইতি—

তোমারই—

লক্ষ্মীমণি।

চিঠিটা কৈলাসকে ফিরাইয়া দিতেই সে আর একবার বীররস দেখাইয়া লক্ষ্মীমণির দিকে হুঙ্কার করিয়া ছুটিয়া গেল। আমি তাকে বাধা দিয়া কহিলাম, ছি ছি কৈলাস, তুমি কি পাগল হ'য়েচ? ওত ঠিকই লিখেছে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি পুলিশে খবর দেব।'

কৈলাস চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, 'মার্‌বনা? বেশ্যাকে মাথায় নিয়ে পূজা ক'র্‌ব নাকি? আপনাদের যা করে করুক। আমাদের মধ্যে সে নিয়ম নেই। আপনি আসেন কেন এর মধ্যে?

[illegible] হইল এই মুহূর্ত্তে

ওর মাথাটা গুঁড়া করিয়া ফেলি। কিন্তু একটা ছোট-লোকের সহিত মারামারি করিতে ইচ্ছা হইল না। চলিয়া আসিলাম। তারপরে যে তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছিল, তাহা আরও ভীষণ। জ্বলন্ত টিকা দিয়া নাকি তার গায়ে ছাপ দেওয়া হইয়াছিল। হায় লক্ষ্মীমণি!

রাত্রে বিছানায় শুইয়া কেন না-জানি কেবল মনে পড়িতে লাগিল, লক্ষ্মীমণির সেই ভীরু-অশ্রু-করুণ চোখ দুইটি। আর তার সঙ্গে আর একখানি মুখ, অনেকদিনের আগের,—গলায় কল্‌সী বাঁধা; ভিজা চুলগুলি মাটি আর বালিতে জট-পাকানো। সুন্দর মুখ। এম্‌নি অত্যাচারে পৃথিবী হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। কবেকার কথা: মনে পড়িল!...তারপর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোরের বেলা মায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই মা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'যা না হীরু' দেখে আয়। লক্ষ্মীটা বুঝি বিষ খেয়ে মরেচে। আহা, এমন মেয়েটা।'

মা আরও কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু আমার শুনিবার অবকাশ হইল না। চলিয়া গেলাম! বুকটা ব্যথা করিয়া উঠিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, লক্ষ্মীমণিকে উঠানের একপাশে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। তার বিধবা মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। আর কৈলাস নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সব দেখিতেছে, যেন কিছুই হয় নাই।

প্রভাতের প্রথম রৌদ্রটুকু হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মীমণির ঠোঁটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তার নিষ্প্রভ নম্র চক্ষু দুইটিতে বহুদিনের বেদনা যেন জমিয়া পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আমার মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কাহাকেও সান্ত্বনা দিলাম না। শেষে কি হইয়াছিল তাহাও জিজ্ঞাসা করিলাম না। যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলাম, তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। দূরে বসন্তের ভোরের কোকিল ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির শেষ-সঞ্চিত শিশিরগুলি একটা উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। মনে হইল, তারাও যেন কাঁদিতেছে। আমার চোখেও বোধ হয় এক ফোঁটা জল নামিয়াছিল। আমি তাকে পড়িতে দিলাম না। চোখেই ফুটিয়া আবার চোখেই শুকাইয়া গেল।

একতারা

পুরাতন খাতা

শ্রীকালিদাস রায়

পুরাতন যত কবিতার খাতা ধূলা ঝেড়ে জড়ো করি'
একে একে পাতা উল্‌টায়ে যাই আর মাঝে মাঝে পড়ি।
হাতে কাজ নাই, চোখে নাই ঘুম—করুণায় ভরা মন,
পুরাণো খাতায় খুঁজিতেছি যেন জীবনের হারাধন।
প'ড়ে হাসি পায়, কত জায়গায় ছেলেমানুষের মত
আপন খেয়ালে মিল দিয়ে দিয়ে লিখিয়া গিয়াছি কত।
ভাগ্যে সে সব রহিয়া গিয়াছে খাতার পাতায় চাপা—
পাগল বলিত নিশ্চয়ই লোকে যদি হতো সব ছাপা।
মাঝে মাঝে দেখি দু'চার পংক্তি সুরচিত মনে হয়—
কেটে কুটে ছেঁটে ছাপিলেও চলে, নেহাৎ মন্দ নয়।
নিজের লেখারে কিছুখন ধরি করিলাম উপহাস,
খাতা পানে চেয়ে পড়িল সহসা গভীর দীর্ঘশ্বাস।
খাতার পাতার অক্ষরগুলি করুণ নয়নে চেয়ে
কি কথা বলিল, হৃদয় গলিল, আঁখি এলো জলে ছেয়ে।
ঘোলা হয়ে এলো পাতার লিখন তরুণ "আমির" শোকে—
অশ্রু ঝরিল করুণ ধারায় প্রৌঢ় 'আমির' চোখে।
কৈশোরে যেবা পাঠের কক্ষে গভীর রাত্রি জাগি'
তপশ্চরণ করিল কঠোর কবির কাম্য লাগি',
নব যৌবনে প্রণয়াবেদনে লুব্ধ হলো না যেবা,
হেলায় ত্যজিল ক্রীড়া-কৌতুক প্রমোদ সুখের সেবা,
ত্যজিল মধুর সুহৃৎ-সমাজ, তেয়াগিল বিশ্রাম—
এই খাতা লয়ে শ্রমজলপাত ক'রে গেল অবিরাম।
কত বসন্ত, কতই শরৎ গেল দ্বারে গান গেয়ে,
বাতায়ন খুলি একবারো যেবা দেখিল না হায় চেয়ে।
তাহার বেদনা কেহ বুঝিবে না, কেবা বল চেনে তারে?
তাহারি ব্যথায় আজিকে আবার বুক ভরে হাহাকারে।
কতদিন এরে আগুলি রাখিল পরম ধনের মত,
দ্বারে কর হেনে চলে গেল হায় জীবনের কত ব্রত।
ক্ষুধার অন্ন শুকায়ে গিয়াছে, নিদ্রা গিয়াছে দূরে,
ভরেছে খাতার পাতাগুলি যেবা আঁখরে আঁখরে জুড়ে।
এর লাগি বলি দিল জীবনের কত শুভ, কত আশা,
কত উৎসাহে অর্পিল এরে প্রাণভরা ভালবাসা।
তোমরা তাহাকে চেন নাক কেউ লুপ্ত সে অনাদরে,
আজি সে ব্যর্থ জীবনের ধূলি মুছাই করুণা ভরে;
সেই অভাগার বেদনায় আঁখি আজিকে অশ্রু ঢালে—
তাহার ভ্রমের ব্যর্থ শ্রমের পুঞ্জিত জঞ্জালে।
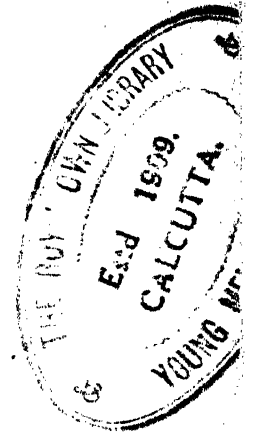
লীগ্ তথ্য—সমকক্ষ দেশীয় দলকেও বাদ দিয়া স্থানীয় সামরিক ও অসামরিক সাতটী দল কলিকাতায় ফুটবল্ লীগের পত্তন করে। দেশীয় দলের বিপুল ও বিশেষ সাহায্যে সৃষ্ট হয় আই-এফ্-এ। আই-এফ্-এ হইবার পরে নূতন লীগ্ভুক্ত কয়েকটি দলের বাড়-বাড়ন্ত হয় খুবই, সঙ্গে সঙ্গে দু'একটী নূতন দলকেও আসরে দেখা যায়। লীগ্ প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় দলকে এই সকল দলের দূরে রাখা সুতরাং কেবল কৃতঘ্নতা নহে ক্রীড়াক্ষেত্রের উচ্চাদর্শকে পদদলিত করার চরম দৃষ্টান্ত — বঙ্গদেশের ফুট্বল ইতিহাসের দুরপনেয় কলঙ্ক। এ কলঙ্কের জন্য দায়ী স্থানীয় ইয়োরোপীয়ন দলগুলি।

রোগের চিকিৎসা ও পথ্য—লীগের খেলা আরম্ভ হওয়ায় এবং ইহাতে দেশীয় দলের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশীয়ের 'ম্যাচের মত ম্যাচ্' খেলা বন্ধ হইয়া যায়। খেলার অভ্যাস রাখার অন্তরায় এই ভাবে ঘটায় তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় দল হেয়ার স্পোর্টিং খেলার মাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উদ্যত—এমন সময়ে 'চিন্সুরা টাউন' শীল্ড-প্রতিযোগিতা করিতে 'তাল ঠুকিয়া' দাঁড়াইল। ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কথা। অবসর গ্রহণেচ্ছু হেয়ার স্পোর্টিং-এর খেলোয়াড়দের সম্মত করাইয়া চুঁচুড়ার উৎসাহীরা চিন্সুরা টাউনের হইয়া তাহাদের শীল্ড খেলাইল। নীচতার কারণে ইয়োরোপীয়ন দলের কঠিন রোগের চিকিৎসা ও সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের সুব্যবস্থা ইহাতেই হইয়া গেল—এই দেশীয় দলের সম্মুখে 'কচুকাটা'র মত পড়িতে লাগিল ইয়োরোপীয় দল। শীল্ড্ শ্বেতাঙ্গের হস্তচ্যুত হয় হয়, শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে দেশীয়ের জয়গতি বিপক্ষের বহু আয়াসে রুদ্ধ হওয়ায় শ্বেতাঙ্গের সম্ভ্রম-রক্ষা কোনও প্রকারে হইয়া যায়।

১৯১১—রোগের কসুর যাহা থাকে তাহা প্রায় নির্ম্মূল করিয়া দেয় মোহনবাগান ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শীল্ড-জয়ী হইয়া। লীগ্বাণে দেশীয় দলকে ঠুঁঠা জগন্নাথে পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যায় দেশীয়ের তীব্র অভিযানে। সুদিনে যাহা ঘটে নাই অপেক্ষাকৃত কমজোরী দেশীয়ের দুর্দ্দিনে তাহা ঘটিয়া গেল। শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গ-ভীতির অবধি রহিল না। ভরসার মধ্যে লীগের 'ধারে' আসিবার 'কালার' অধিকার নাই। সুতরাং তাহারা ভাঙ্গিয়াও মচ্কাইল না—লম্ফ ঝম্প শ্বেতাঙ্গের চলিতে লাগিল।

৺সুধীর ভট্টাচার্য্য — এস. পি. সর্ব্বাধিকারী

হেয়ার স্পোর্টিং-এর সুবিখ্যাত খেলোয়াড়দ্বয়

'সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথা'—বাঁকিয়া চুরিয়া লাফালাফি করিলেও সর্ব্বাঙ্গে তখন ব্যথা।

জার্ম্মাণ যুদ্ধ অবসান হইল কিন্তু খেলার মাঠে পূর্ব্বের বাফ্‌স্ বা স্রপ্‌শায়ার দেখা দিল না, ক্যালকাটা ক্লাবের উইন্‌কৃওয়ার্থ আর আসিল না। জ্যাকৃসন্‌, হাণ্টার্‌, লিণ্ড্‌সে, এ্যাস্টনের যুগ ত' বহু পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। একটা স্লেটার বা শার্মাণও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুযোগ পাইয়া 'মরণ কালেও' হেয়ার স্পোর্টিং 'কামড় দিয়া গেল'। মোহনবাগান জেরবার করিল। উপায় কি! সর্ব্বাঙ্গে যে 'বিষফোড়া'। লোক-লজ্জার খাতিরে লীগের গণ্ডী ত' বাঁধিয়া রাখা আর যায় না! শীল্ড-জয়ী লীগে প্রতিযোগিতা করিতে পাইবে না! তাহা যে বড়ই দৃষ্টি ও শ্রুতি-কটু। তথাপি ব্যবস্থা হইল মোহনবাগান দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইবে। অপরাধের কোঠায় এই ব্যবস্থা, 'গোদের উপর বিষফোড়া'। ইহার চিকিৎসা প্রথম বিভাগে উঠিয়া মোহনবাগান যথাযথ করিতে না পারিলেও মোহামেডন্ গড়িয়া তোলে তাহাদিগের মধ্যে হেয়ার স্পোর্টিং অন্যতম। সুদীর্ঘকাল খেলার মাঠে বাঙ্গালীর সম্মানের আসন পাতিয়া দিয়া যখন তাহারা দেখিল দীর্ঘ পরিশ্রমে তাহাদের শৈথিল্য আসিয়া পড়িতেছে, তখন তাহারা কুশলী খেলোয়াড়ের জন্য বিদেশীর দ্বারে ধর্ণা দিল না, তাহাদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত কিন্তু শেষ সময়ে তাহাদের একমাত্র যোগ্য বাঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের উপর বড় আশায় ফুটবলে বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষার ভার দিয়া তাহাদের পথ খোলাসা করিয়া দিতে তাহারা অবসর গ্রহণ করিল। খেলোয়াড় আমদানী করিয়া ক্লাবের 'রবরবা' রাখিতে ইচ্ছা করিলে হেয়ার স্পোর্টিং অনায়াসেই তাহা করিতে পারিত। ইহা করিলে বাঙ্গালীর ফুটবলের ভীষণ অকল্যাণ—তাহা কি তাহারা প্রাণ থাকিতে করিতে পারে! মোহনবাগানের

মোহামেডন্ স্পোর্টিং-এর লীগ্-জয়ী কয়েকজন খেলোয়াড়

স্পোর্টিং প্রাণ ভরিয়া তাহা করিয়াছে। লীগে এখন অধিকাংশ দেশীয় দল বিদেশীয় দলের উপরথাকের। লীগ্ পত্তনকারীদের মধ্যে রেঞ্জার্স, ডাল্‌হাউসী ও ক্যালকাটার 'নামিয়া যাওয়ার' অবস্থাও ঘটিয়াছে পুনঃ পুনঃ। চমৎকার এই প্রতিশোধ!

জয়ীর অবিমৃষ্যকারিতা—শীল্ড্-জয়ী মোহনবাগানের কোনও কোনও পুরাতন খেলোয়াড় সময়ের ফেরে কমজোরী হওয়ায় বা অবসর গ্রহণ করায় তাহাদের স্থলে ঘরের ছেলে যোগান না দিয়া আমদানী করা বিদেশী খেলোয়াড়ের গাঁদি তাহারা লাগাইয়া দেয়। মোহনবাগানের এ দুর্ব্বুদ্ধি হইবে অঙ্কুশে অনুমান করিতে পারিলে তাহাদের পূর্ব্বগামী হেয়ার স্পোর্টিং বেপরোয়াভাবে জমি ছাড়িয়া দিত না নিশ্চয়ই। দেহের শোণিত দিয়া বাঙ্গালীর ফুটবল্ খেলা যাহারা সার কিছু আছে দেখিয়া হেয়ার স্পোর্টিং মোহনবাগানকে পথ ছাড়িয়া দেয়। মোহনবাগানও বাঙ্গালীর শিরে জয়মুকুট পরাইয়া দেয়। অ-বাঙ্গালী ক্রীড়ক দলভুক্ত করিয়া কিন্তু এই জয়গৌরব রক্ষার উপায় রুদ্ধ হইয়া যায়। মোহনবাগানের দেখাদেখি বাঙ্গালীর অন্যান্য দলেরও পরদেশী-প্রীতি অতি মাত্রায় দেখা দেয়। ঘরের ছেলে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে। 'ফুটবলের রাজা' বাঙ্গালীর সে কি ভীষণ অবস্থা। পরকে দিয়া কিন্তু কোনও কাজই হয় নাই—লীগ ও শীল্ডের কয় বৎসরের খেলার ফল হইতে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। অনিষ্ট হইয়াছে যথেষ্ট, 'গেঁয়ো যোগীদে'র অবহেলা করিয়া।

'মোহামেডনের মার মার'—লীগের দ্বিতীয় বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রথম বিভাগে উন্নত মোহামেডন্ আসরে নামিয়াই আরম্ভ করে 'দেখ্ মার'।

প্রথম বৎসরেই তাহাদের লীগ্‌জয়ী হওয়ায় এবং পরে পুনঃ পুনঃ আসর একচেটিয়া করায় লীগের আরম্ভে দেশীয় দলের প্রতি ঘোর অবিচার করার ইয়োরোপীয়ন দলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ মাত্রায় হইয়া যায়। ভারতবর্ষে ফুটবলের গোড়া ক্যাল্‌কাটা ও ডালহাউসীর ইহার পরে লীগ্‌ তালিকার সর্ব্বনিম্ন স্থানভুক্ত হওয়াও প্রায়শ্চিত্তের একটা রকম। সব হইল কিন্তু যে ভাবে ইহা সংঘটিত হওয়া উচিৎ ছিল সে ভাবে ইহা হইল না। মোহমেডান্‌ ক্লাবে পরদেশী খেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য জয়গৌরবের হানি করে প্রভূত পরিমাণে। এই দেশীয় দলের অভূতপূর্ব্ব জয় বাঙ্গালীর জয় বলিয়া গ্রহণ করিতে বঙ্গদেশ ইতস্ততঃ করিল। এ সম্বন্ধে বার বার আলোচনা আমরা করিয়াছি এবং আমদানী-করা খেলোয়াড়ের দ্বারা জয়ের অন্তরালে ভবিষ্যতে তাহাদের দুর্গতির বীজ নিহিত—এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেও দ্বিধা বোধ করি নাই। কয় বৎসরের ঘোর পরিশ্রমে মোহামেডনের পুরাতন খেলোয়াড়েরা এবার বিশেষ ক্লান্ত, এ বৎসরের এ পর্য্যন্ত লীগ খেলায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। এই সকল খেলোয়াড়েরা যে মেকৃদারের সে মেকৃদারের স্থানীয় খেলোয়াড় পাওয়া দুর্ঘট—আমদনী করারই কারণে। নূতন আইনে আমদানী করার পথও রুদ্ধ। এ অবস্থায় কয়েক বৎসরের মধ্যে মোহামেডানের ক্যালকাটা বা ডালহাউসীর অবস্থা যদি ঘটে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। এ বৎসরের লীগের প্রথমার্দ্ধের সমাপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই। দশটী খেলা খেলিয়া মোহামেডন চতুর্থ স্থানে অবস্থিত। ইষ্ট বেঙ্গল ও রেঞ্জার্স কর্ত্তৃক তাহাদের পরাজিত হওয়া এবং ভবানীপুর, কালীঘাট ও বর্ডারাবৃসের সহিত তাহাদের খেলার ফল সমান-সমান হওয়া, তাহাদের পূর্ব্বশক্তি হ্রাসেরই লক্ষণ।

মোহনবাগান—খেলোয়াড় আমদানীতে প্রথম মোহনবাগান আমদানীর অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া গত কয়েক বৎসর স্থানীয় খেলোয়াড় লইয়া হালুচালু করিয়াছে। ফলে তাহাদের কয়েকজন খেলোয়াড় এখন 'পাতে দিবার' মত দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের লইয়া মোহনবাগান লীগের প্রথম দশটী খেলাতে অজেয় হইয়া তালিকার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের জয়াঙ্ক এখন ১৮ এবং পূর্ব্ব লীগ্‌জয়ী মোহামেডানের জয়াঙ্ক ১৩। যে ভাবে মোহনবাগান এখন খেলিতেছে, খেলার সেই ঠাট বজায় রাখিতে পারিলে এবং ই-বি-আরের বিরুদ্ধে তাহাদের খেলার দৃশ্য পুনঃ সংঘটিত না হইলে আসনচ্যুত তাহারা হইবে না মনে হয়। একটা ভয় বৃষ্টি নামিলে। এ তাল সামলাইতে মোহনবাগান যদি পারে—বাজিমাৎ তাহারা করিবেই।

ইষ্টবেঙ্গল্‌—পুনঃ পুনঃ পরদেশী লইয়া খেলিয়া ইষ্টবেঙ্গল্‌ 'ভেস্তাইয়া' গিয়াছে প্রতিবারই। পরদেশী লইয়া খেলার যে দোষ (কখনও মার মার, কখনও কোণ লওয়া) ইষ্টবেঙ্গলে যত দেখা গিয়াছে তত আর কোথাও দেখা যায় নাই। যে কারণেই হউক ইষ্টবেঙ্গলের এবার সুমতি হইয়াছে। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই এখন বাঙালী। দশটী খেলা খেলিয়া তৃতীয় স্থানে এখন তাহারা অবস্থিত। গত বৎসরে লীগ্‌ প্রতিযোগী দলের মধ্যে মোহামেডনকে পরাজিত করে ইষ্টবেঙ্গলই। এ বৎসরেও মোহামেডনের প্রথম পরাজয় ঘটিয়াছে ইষ্টবেঙ্গলের হস্তে। খেলার ধারা সমভাবে বহিলে লীগ্‌ তালিকায় সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

বেণীপ্রসাদ (মোহনবাগান) এস. চৌধুরী

লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল)

মোহনবাগানের পা পিছ্লাইলে ইষ্টবেঙ্গলের অবস্থা উন্নতও হইতে পারে।

রেঞ্জার্স—যে কয়টী দল লইয়া সর্ব্বপ্রথম লীগ্ খেলা আরম্ভ হয় তাহাদের মধ্যে রেঞ্জার্সও ছিল। দেশীয় দল লীগ্‌ভুক্ত হইলে অল্প দিনের মধ্যে রেঞ্জার্স দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যায়। প্রথম বিভাগে আবার তাহারা উঠিয়াছে বহু বৎসর পরে। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা নূতনের উৎসাহের সহিত সংযোজিত হওয়ায় ক্রীড়াদক্ষতা তাহাদের ফুটিয়া

মুলার (রেঞ্জার্স)

লাম্‌সডেন্ (রেঞ্জার্স)

উঠিয়াছে আপনা হইতে। লীগ্ তালিকায় এখন তাহারা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। মোহামেডন্ এ বৎসরে দ্বিতীয়বার পরাজিত হইয়াছে এই রেঞ্জার্স কর্ত্তৃক। মোহনবাগান কর্ত্তৃক তাহারা পরাজিত মাত্র এক গোলে। আক্রমণ ও রক্ষণ উভয় বিভাগই রেঞ্জার্সের ভাল—অভাব দক্ষ-নেতার। এ অভাব খেলিতে খেলিতে পূরণ হইলে এবং মোহনবাগানের ভুলচুক্ হইলে বাজীমারা রেঞ্জার্সের পক্ষেও অসম্ভব নহে। সবুট্ রেঞ্জার্সের 'ভিজা মাঠের'ও সুবিধা আছে কিনা।

এরিয়ন্‌স্—৺দুঃখীরামের নাম সংশ্লিষ্ট এই দলের আমরা সর্ব্বতোভাবে শুভকামনা করি। পূর্ব্বে প্রায় প্রতি বৎসরই বাঙালী খেলোয়াড় লইয়া ইহারা যুঝিয়াছে প্রাণপণ শক্তিতে। অ-এরিয়ন 'এরিয়নস্'ভুক্ত দুঃখীরাম কখনও করে নাই। সেই ভাবধারা রক্ষা করা এরিয়ন্‌সের উচিত ছিল। তাহা কিন্তু ইদানীং ঘটে নাই। কেন ঘটে নাই কর্ত্তৃপক্ষের জবাবদিহী করা সহজ নহে। এ বৎসরের গঠিত দল বেশ চলনসই বলিয়া অনেকের মনে হইয়াছিল। কাগজে কলমে কিন্তু তাহা মিলাইয়া পাওয়া যাইতেছে না। খেলা ইহাদের যাহা হইতেছে সেভাবে যদি তাহা চলে, বিশেষ ভয়ের কথা। খুব সজাগ খেলোয়াড়দের থাকা উচিত।

ভবানীপুর—দলাদলির ফলে ভবানীপুর এবার খুবই শক্তিহীন। তথাপি মোহামেডনের বিরুদ্ধে তাহাদের তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইবার ধরণ দেখিয়া আশা হইয়াছিল 'ঘর বজায়' থাকিলেও থাকিতে পারে। তালিকার এমন স্থান এখন তাহারা অবস্থিত যাহা তাহাদের পক্ষে বিশেষ ভয়াবহ। রক্ষণ-বিভাগের খেলা ঈষৎ উন্নত হইলে নামিয়া যাইবার ভয় বোধহয় থাকিবে না।

ক্যাল্‌কাটা—দশটী খেলার মধ্যে ক্যাল্‌কাটার দু'টীতে জয়, তিনটীতে খেলার ফল সমান-সমান এবং সাতটীতে পরাজয় সন্তোষ-জনক বলিতে পারা যায় না আদৌ। অথচ মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মোহামেডান প্রভৃতির বিপক্ষে তাহাদের খেলা ভালই হইয়াছে। খেলার সে 'রেশ' তাহাদের অন্যান্য খেলায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। খেলার দোষ কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়। দলের সংখ্যা বাড়াইয়া ক্যাল্‌কাটাকে নামাইয়া না দিয়া এবার প্রথম বিভাগে রাখা হইয়াছে। এবারও 'ঘোসো' করিয়া যদি প্রথম বিভাগে থাকে ক্যাল্‌কাটার পক্ষে লজ্জার কথা।

ম্যাক্‌ফার্লেন ও মুনরো (ক্যালকাটা)

সামরিক দল—সামরিক দল দু'টীর খেলার উল্লেখ গতবারে আমরা করিয়াছি। বর্ডারার্স ও ক্যামেরনের মধ্যে খেলার প্রভেদ 'উনিশ বিশ'। তবে বর্ডারার্সের মোহামেডানের বিরুদ্ধে খেলার ফল সমান-সমান করা উল্লেখযোগ্য। এই খেলায় নির্দ্দেশকের নির্দ্দেশে মুসলমান দর্শকের অভদ্রভাবে অসন্তোষ প্রকাশের সমর্থন কেহই করিবে না। নির্দ্দেশে ভুল-চুক্ বা অন্যায় হইয়া থাকে—যথাযথভাবে তাহার প্রতিবাদ হওয়া

বাঞ্ছনীয়। সে যাহা হউক সামরিক দুইটি দলের কোনওটীর লীগে কিছুমাত্র আশা নাই।

অন্যান্য দল—'গণ্ডার-মারা' কাস্টম্‌স্ এবার এখন পর্য্যন্ত তেমন কোনও কসরৎ দেখাইতে পারে নাই। রেলওয়ে দল ই-বি-আর্, লাইনে গড়াইবার মতই গড়াইতেছে। কালীঘাট এখন পঞ্চম স্থানে অবস্থিত। তাহাদের ও ই-বি-আরের জয়াঙ্ক সমান-সমান — দশ। কালীঘাটের খেলা হইতেছে মাঝামাঝি ধরণের। ক্রমে ইহাদের খেলার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুঃখের বিষয় ইহাদের নামজাদা খেলোয়াড় জন্-এর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইষ্ট্ বেঙ্গলের পুরাতন দুর্গরক্ষক তালুকদারের অকাল মৃত্যুতেও আমরা বিশেষ দুঃখিত। লীগে পুলিশের অবস্থা শোচনীয় হইলেও তাহা সামলাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

'একাদশে'—লীগের একাদশ সংখ্যক ইষ্ট্ বেঙ্গল 'বেদম' করিয়া দিয়াছে বর্ডারার্সকে ৫-১ গোলে কাৎ করিয়া। কালীঘাট রেঞ্জার্স-এর হস্তে পরাজিত ২-১ গোলে। মোহনবাগান ও মোহামেডনের খেলার ফল হইয়াছে সমান সমান (১—১)।

বাছাই খেলা—লীগ্ প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত দলগুলিকে দুই দলে (ইণ্ডিয়ান্ ও ইউরোপীয়ন) ভাগ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বাছাই করা খেলোয়াড় লইয়া একাধিক 'খয়রাতী খেলা'র আয়োজন করা যাহা প্রতি বৎসর হইয়া থাকে এবার তাহার প্রথম খেলার ফল হইয়াছে সমান-সমান (২-২) হিসাব মত 'ইণ্ডিয়ান'-এর জয় হওয়া উচিৎ ছিল। বাছাই খেলায় প্রায়ই কিন্তু বে-হিসাবী হইয়া যায়। এবার ভিজা মাঠের সুযোগে ইয়োরোপীয়নের খেলা উৎরাইয়া যায়। তা যাউক উভয় পক্ষেরই খেলার ধরণ দর্শনযোগ্য হয় নাই। দর্শকের সংখ্যাও বিশেষ ছিল না। 'খয়রাত' অল্পস্বল্প করিয়াই সুতরাং সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

জোসেফ (কালীঘাট) রেবেলো (কাষ্টম্‌স্) টেম্পলটন্ (পুলিশ)

জুম্মা খাঁ (মোহামেডন্) রে (ক্যাম্‌রণ) পি, দাশগুপ্ত (ইষ্ট্ বেঙ্গল্)

প্রথম 'খয়রাতী' খেলার কয়েকজন খেলোয়াড়

নিখিল-ভারত-সন্তরণ (বেনারস)—এই প্রতিযোগিতায় কলিকাতার সাঁতারুরা সন্তরণে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে বিশেষভাবে। ডুব সাঁতারে তালতলার এস্, ব্যানার্জ্জী, ওয়াটার-পোলোয় হাটখোলা, ১১০ গজ সাঁতারে (ফ্রি ষ্টাইল্) হাটখোলার শচীন নাগ, ২২০ গজ বুক-সাঁতারে তালতলার সমীর চ্যাটার্জ্জী ও ১২০ গজ রিলে রেসে তালতলা আর কাহাকেও 'উঠে ধানে পত্যি' করিতে দেয় নাই।

ডেভিস্ কাপ—'ডবলে' গৌস মহম্মদ ও সাভুরের বেল্‌জিয়মের গীলাও ও ইণ্ডিকে ৬-৪, ৬-৪, ৫-৭, ৬-৪এ পরাজিত করা ও নেয়ার্টের বিরুদ্ধে সিঙ্গেলে গৌস মহম্মদের ১০-৮, ৬-২, ৬-৪এ জয়ী হওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর ইণ্ডিয়া বেলজিয়ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে।

বাঙালা সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য—

কবি দিলীপকুমার রায়ের সুর-সাধনার খ্যাতি ভারতবর্ষ ডিঙিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বাঙালা গানের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রায়ের প্রচেষ্টা কাহারও অবিদিত নয়। সস্তায় মন-ভুলাইবার অতি-আধুনিক ঢঙ্ অথবা ওস্তাদী পরানুকরণের প্রভাবে বৈশিষ্ট্যহীন অস্বাভাবিকতা বাঙালা গানের সমৃদ্ধি-পথে বিঘ্নস্বরূপ বুঝিয়া, বাঙালার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রায় প্রভৃত শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা জ্যৈষ্ঠের (১৩৪৬) "ভারতবর্ষ" হইতে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, প্রকৃত সুর-সাধকের নিকট ইহার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি :—

"আমাদের দেশে আমরা বাঙালীকে গাইয়ে বলতে কী যে নার্ভাস্ হয়ে পড়ি—ওস্তাদের ভয়ে বাঙালীর গানকে গান বল্‌তেও ডরাই, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙালির গীতি-প্রতিভা আজ সর্ব-স্বীকৃত। পেশোয়ারী রণবীর সানিও সেদিন আমাকে লিখেছেন যে, বাঙালী শিল্প-প্রকর্ষ থেকে প্রতি অবাঙালীর শেখা কর্তব্য। লাহোরেও চ্যারিটি কন্সার্টে একাধিক বাংলা গান গেয়েছিলাম আমরা, কারণ ওখানকার সঙ্গীত-কোবিদরা বল্লেন যে, পাঞ্জাবে বাংলা গানের আদর যথেষ্ট। অথচ বাংলা দেশে কেবলই শুনি যে, সঙ্গীতে অল-ইণ্ডিয়া ফেম হবার একটিমাত্র বাঁধা সড়ক আছে—তার নাম 'সেঁইয়া তু কাঁহা গেঁইয়ার' হুহুঙ্কার। কিন্তু যদি আজ বলি যে, ভবিষ্যতে অল্‌-ইণ্ডিয়ান গায়কদের কণ্ঠ আস্‌বে বাংলা গানের কাছে ধর্ণা দিতে—যেমন অতীতে আমরা দিতাম হিন্দুস্থানী গানের কাছে, তা হলে হয়'ত তুমি এখনো তেতে উঠবে, কারণ দু'দিন আগেও বাংলা গানের নামে তোমার অধরে দিত হাসির ঝিলিক্, নাসাগ্রে খেলত কুঞ্চনের ঢেউ, চোখে নিভত ঔৎসুক্যের আলো।... সত্যসিদ্ধি মানে নির্বিশেষ একাকার হয়ে যাওয়া নয়। প্রতি জাতীয় মনের মাটি যে ফুলের অনুকূল সেই ফুলের চাষেই সে শুভপ্রসূ হয়ে ওঠে—অন্তর্জগতেও সহজপটুতা বলে একটা জিনিষ আছে, যে যা সহজে পারে তার উচিত সেই দিকেই ঝোঁকা—নৈলে তার সহজসিদ্ধি হয় না। মানুষের মতন প্রতি জাতিও তার আন্তর স্বভাবের খনি থেকেই আত্ম-বৈশিষ্ট্যের সাঁচ্চা জহর সংগ্রহ ক'রে বিশ্বের দরবারে পাঠায় নজর। তাই বাঙালীর মনের কথা প্রাণের ভাব অন্তরের স্বপ্ন যদি সে তার কাব্য-সঙ্গীতে নিজস্ব ঢঙে ফুটিয়ে তুলতে পারে সৌন্দর্যের রসায়নে, কেবল তাহলেই বাংলা গান বিশ্বসভায় ঠাঁই পাবে—গলাবাজিতেও না, তানসেনী রাগমালার মাছিমারা অনুকৃতি নৈপুণ্যেও না—এ সবের ঢঙ হাজারই বৈশ্বমানবিক বা সর্বজাতীয় হলেও নকল-নবিশিতে মুক্তি নৈব নৈব চ।...আমাদের সঙ্গীতকে আমি মনে করি অন্তরাত্মার দুরভিসারের একটি পরম সাধনা। এ-সাধনার গতি আত্মনিবেদনে; মুক্তি—অমৃত-ঐশ্বর্য্যের ধ্রুবলোকে। এই জন্যেই আমি বরাবরই এত বড় গলা ক'রে বলতে সাহসী হয়েছি যে, য়ুরোপের বাঁধাধরা সুর ও গানের পদাঙ্ক অনুসরণে আমাদের গানের মঙ্গল নেই। কারণ আমাদের গানের স্বধর্ম হ'ল তার সুরমুক্তিতে, অন্তরাত্মার দল মেলায়, বিনা সুর বিহারে। আমাদের গায়ক যদি প্রতি পদে সুরকারের তাঁবেদার হয় তবে তার গগনচারণের পথই হবে অবরুদ্ধ। গীতার কথায় আমি বিশ্বাস করি যে, স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। তাই স্বরলিপি ওদের কাছে সুধা হয়েও আমাদের কাছে হতে পারে বিষ।...চৈনিক জ্ঞানীর কথা তাই তো মনে পড়ে এত বেশি : আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ যে সুরের বিদ্যুৎসঞ্চরণে, নীলনন্দনে—তাকে স্বরলিপির খাঁচায় পুরতে গেলে তার অকাল মৃত্যু অনিবার্য।"

পটুয়া-শিল্প ও শিল্পী—

শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহোদয়ের বাংলার স্বকীয় সংস্কৃতি-প্রীতির পরিচয় আমরা পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার প্রগাঢ় দরদ ও অমিশ্র দৃষ্টিভঙ্গী জাতিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিতে অনেকখানি সহায়তা করিবে। শ্রীযুক্ত দত্তের বাংলার গণ-সঙ্গীত, গণ-নৃত্য ও গণ-শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা ও গভীর অনুরাগ বাঙালীর নব জাগরণের ভিত্তি রচনায় অমূল্য মাল মশলা যোগাইবে। "বাংলার শক্তির" চৈত্র সংখ্যায় তিনি "পটুয়া-সঙ্গীত" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলার নিজস্ব জন-সংস্কৃতির বহুমুখী আলোচনা প্রসঙ্গে যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা উদীয়মান জাতির বিশেষ অনুধাবনীয়। বাংলার একদা এই অনুপম শিল্পকলা-কুশল এবং অধুনা অনশনপীড়িত ও অবহেলিত পটুয়া ও তাহাদের শিল্প সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্বেও ইহারা পুরুষানুক্রমিক যে রসকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চ্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয়; এবং জগতের রসকলার আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের রসকলা-পদ্ধতি অতি-প্রাচীন ভারতের প্রাগ্-বৌদ্ধ-যুগের আদিম রসকলা-পদ্ধতির অবিকল-প্রবাহিত বিশুদ্ধ পরম্পরার অভ্রষ্ট ও অপরিবর্ত্তিত রূপ-ধারা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি-প্রাচীন প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের চিত্রকলা-পরম্পরা তাহার আদিম ধারার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্রকলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে 'চিত্রলেখা'গুলির ও যমপট ইত্যাদি চিত্রপটের ও তাহাদিগের 'চিত্রকর' ও প্রদর্শকদিগের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই চিত্রকরগণ যে ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ

ছিলেন এবং সেই সকল চিত্রলেখা ও চিত্রপট যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদেরই তুলিকা-সৃষ্ট অতুল রূপ-সমৃদ্ধিতে বিভূষিত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। পাল-যুগে বিখ্যাত 'নাগ'-পদ্ধতি-পন্থী চিত্রকর ধীমান ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমান ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কারণ এখনও ইহারা পটে নাগচিত্র-সুশোভিত মনসাদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত। আজকাল সাধারণ লোক ইহাদিগকে "পটুয়া" নামে অভিহিত করিলেও ইহারা আপনাদিগকে প্রাচীন সংস্কৃত 'চিত্রকর' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতের 'চিত্রলেখা'-অঙ্কনকারী চিত্রকরদের বংশসম্ভূত, ইহার একটি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও চিত্র আঁকার প্রক্রিয়াকে 'লেখা' নামে অভিহিত করিবার প্রথা যদিও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে, তথাপি এই চিত্রকরগণ এই সম্পর্কে কখনও 'অঙ্কন' অথবা 'আঁকা' কথা ব্যবহার করে না; পরন্তু সর্ব্বদাই সেই অতি-প্রাচীন 'লেখা' কথাটিই আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। চিত্রশিল্প-কুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিও ইহারা যুগের পর যুগ সযত্নে বহন করিয়া আসিতেছে।

এতদিন আমরা অজন্তার সুবিখ্যাত চিত্রকলা-পদ্ধতিকেই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতির একমাত্র অবশিষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম; কিন্তু এখন হইতে বাংলার এই নিজস্ব চিত্রকলাই সেই গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির আরও যে-কয়েকটি গৌরবময় বিশেষত্ব আছে, তাহা ইহাকে বিশ্বের চিত্রকলার সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতি-মার্জ্জিত চিত্রপদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরলতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। একদিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জ্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা ততোধিক ভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলঙ্কারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রাদোষের অথবা কোনরূপ আড়ষ্টতা দোষের ছাপ পড়ে নাই। বাংলার এই অপূর্ব্ব চিত্রকলা একদিকে যেমন চিরপ্রাচীন, তেমনি অপরদিকে আবার ইহা চিরনূতন। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার খেলাধূলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতি শোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপ-কল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রস-প্রাচুর্য্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় সহজ ও জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ। একদিকে বাংলার এই পল্লী-শিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপরদিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের ক্ষমতাও জগতে অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদির পত্রের অঙ্কনের অতি চমৎকার ও মনোহর আলঙ্কারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যাসের ও ভাবব্যঞ্জনার আদর্শে যে অস্বাভাবিকতা, দুর্ব্বলতা, কৃত্রিমতা ও অতি-কচিভাব লক্ষিত হয়, বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতিতে সেই সকল দুর্ব্বলতা ও দোষ নাই। এই সকল চিত্রপটে একদিকে পুরুষদেহের বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ভাব-ভঙ্গীর অঙ্কন-প্রণালী ও অপরদিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণ-মূলক অঙ্কনবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ অভিব্যঞ্জনা এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোন রকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতি পরিস্ফুটভাবে কাহিনী বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলা-পদ্ধতি ভারতের আদিম যুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্ম্মযুগমূলক পুরুষ-কাহিনীর ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবন-প্রণালী, শক্তিপটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিক সত্য, এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক 'রমন্তিকতা' (romanticism)র ভাব-তরঙ্গ বাংলার এই সকল প্রাচীন শিল্পিগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে তাহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি বাংলার পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য্য-রসে এই সকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্রশিল্পিগণ রসকলার সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যান নাই এবং তাহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যমরাজার অনুশাসনে ধর্ম্মের অন্তিম জয় ও অধর্ম্মের অন্তিম পরাজয়ের কাহিনী অতি জ্বলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলা-রূপসীর আত্মা আজ তাহার বহু যুগের পুঞ্জীভূত বিলাসবেশভূষার জটিলতার ভারে প্রপীড়িত হইয়া পরিপ্রেক্ষিতের ভেল্কিবাজী ও আলোছায়াপ্রান্তের মরীচিকাময় বেড়াজালের আবেষ্টনের পীড়নে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া সহজ সরল আত্মপ্রকাশের আগ্রহে তাহার বিলাস হর্ম্ম্যরাজি পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বনজঙ্গলে মানবজাতির আদিম লালিত্যহীন সরলতার মধ্যে সহজ সরল আত্মপ্রকাশের উপযোগী যে-চিত্রভাষার অনুসন্ধানে ব্যর্থপ্রয়াসে উন্মাদের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বাংলার পল্লীর সুমধুর চিত্রলেখা-লক্ষ্মী আজ তাঁহার সলজ্জ অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া সেই অতিবাঞ্ছিত অনুপম ও একধারে প্রাঞ্জল অথচ শক্তিময়, লাবণ্যময়, প্রাণময়, কৃত্রিমতাবিহীন এবং ভাবব্যঞ্জনায় ও রসব্যঞ্জনায় ভরপুর চিত্রভাষার সন্ধান বিশ্বমানবকে মিলাইয়া দিবে।

গ্রন্থপরিচয়

ভোরের পাখী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল (১০।১বি, নেবুতলা রো, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। দাম এক টাকা মাত্র।

স্বরলিপিসহ গীতি-গ্রন্থ 'ভোরের পাখী'র ইহা পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। সুনির্ব্বাচিত ত্রিশটি গান ও উহার স্বরলিপি পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমেই স্বরলিপির ব্যাখ্যা সংযোজনার ফলে গায়কের বিশেষ প্রথম সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রচুর সুবিধা হইবে।

সুগায়ক ও গীতিকবি হিসাবে নির্ম্মলবাবু সঙ্গীত-জগতে সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিয়াছেন। গীতিপুস্তক "স্বপন খেয়া" ও "পথের বাঁশী" রচনা করিয়াও তিনি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। "ভোরের পাখী" তাঁহার এই যশঃ ও সম্মান বৃদ্ধিই করিবে।

'ভোরের পাখীর' অধিকাংশ গানই সুকণ্ঠ নির্ম্মলবাবু আমাদের গাহিয়া শুনাইয়াছেন। গানগুলির পদ-লালিত্য ও অবাধ সুর-মাধুর্য্য আমাদের মুগ্ধ ও মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। ছন্দ যেমন কবিতার প্রাণ, সুর তেমনি সঙ্গীতের প্রাণ। অখণ্ড অরূপ ও অব্যক্তকে সুরব্রহ্ম মীড়ে মীড়ে মূর্চ্ছনা তুলিয়া মর্ত্ত্যলোকের অপ্রত্যক্ষ অনুভূতির তারে এক অনাস্বাদিত আনন্দহিল্লোল স্পর্শ দিয়া যায়। ইহাই তো গানের চরম সার্থকতা। তাই সকল চারুশিল্পের শেষ কথা সঙ্গীত। কথা এখানে গৌণ—উপযোগী আনুষঙ্গিক আশ্রয় মাত্র। কোকিলের কাকলি কি অর্থহীন 'তা-না-না'-র ভাবময় সুরসংযোজনা হিয়ায় অনির্ব্বচনীয় হিল্লোল তুলে। এইজন্য যে ধ্যান, তন্ময়তা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন, তাহা সুগায়ক নির্ম্মলবাবুর আছে বলিয়াই তাঁহার 'ভোরের পাখী' মোহনিশার সুপ্ত চেতনাকে জাগরণের ছোঁয়া দিয়া অনন্ত অবকাশের মাঝে মুক্তি দেয়।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

মৈত্রেয়ী—চিত্রনাট্য। শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী প্রণীত এবং শ্রীসুব্রত রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত; মূল্য দুই টাকা।

নাট্যোক্ত পৌরাণিক কাহিনীটী পরিচিত, কিন্তু তরুণ লেখকের স্বপ্নের আলিপনায় উহার মধ্যে মানবতার মর্ম্ম নূতন রঙে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইটুকু বিশেষভাবেই উপভোগ্য। মহাভারতীয় চরিত্রগুলি স্বমহিমায় আশানুরূপ না ফুটিলেও, নাটকোচিত কল্পনার স্বপ্নময় পরিবেশ-সৃষ্টির যে আভাস পাওয়া তাহা মনোরম! প্রতিভার দুইটী স্বভাব-শক্তি—কল্পনা ও রচনা। এই উভয় কবচকুণ্ডল লইয়াই এই তরুণ কবি জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন, বিশেষভাবে এই প্রগতির যুগে মার্জ্জিত দৃষ্টি ও রুচি লইয়া তিনি যে ভারতীয় ভাব ও রসের পরিস্থিতি আপনার সাধনার ক্ষেত্র-রূপে বাছিয়া লইয়াছেন, ইহার জন্য সত্যই অন্তরের সহিত আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। শুভব্রত বাবু শুভ ব্রতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্কুরমাণ প্রতিভা ফুলে-ফলে শতদলে বিকশিত হউক—এই আশা ও প্রার্থনা করি।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

কাব্যগুচ্ছ—কবিতা সমষ্টি; শ্রীকুমুদনাথ দাস প্রণীত এবং বুক কোম্পানী লিঃ, ৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২॥০ টাকা।

উক্ত পুস্তকে ছোট ছোট কবিতাগুলি সুর-ভেদে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সমাজের পারিপার্শ্বিকতা হইতে যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপরে নৈতিক শিক্ষামূলক অভিব্যক্তির সহজ প্রকাশ সমগ্রভাবে মানব-মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, কবিতাগুলির মধ্যে এইরূপ উপাদান তো আছেই; তাহা ছাড়া প্রকৃতির বিচিত্র অনুভূতিও লক্ষ্যে পড়ে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে এইরূপ কবিতার সমাদর হইবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মজবুত ও রুচিসম্মত।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

মাষ্টার সাহেব—শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক শ্যাম বাবুর ঘাট, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস হিসাবে বইখানি প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, বর্ত্তমান যুগে ইহার সার্থকতা আছে প্রাণবন্ত আবেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের ও সমাজের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্যাগুলির অবতারণায়। মাষ্টার সাহেবের নায়ক গার্হস্থ্য ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়া লেখক সুনির্ব্বাচিত ঘটনা অবলম্বনে নিজেরই আদর্শ অভিব্যক্ত করিয়াছেন; তবে লেখকের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন নূতন আলোকের দীপ্তি নাই—তাহা পুরাতনের গৌরবে গরীয়ান্। ঘটনা-সংস্থাপন মন্দ নয়, তবে বর্ণনা ও তত্ত্বালোচনা উপন্যাসের দিক্ হইতে কিছু গুরু হইয়া পড়ায়, আখ্যায়িকার একটানা রসসৃষ্টি বিঘ্নিত হইয়াছে। এবং এই কৈফিয়ৎ লেখক স্বয়ংই উপন্যাসের মধ্যে দিয়াছেন: "আমি বুঝিতেছি, আমার পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার মধ্যেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। নাঃ—আর পারা যায় না। এ কি রকম নভেল গা?" প্রচ্ছদপট, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই মনোরম।

শ্রীরণজিৎকুমার দে

বুকের বীণা—(গানের বই) শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। ৭৬ নং বংশী গলি, বারাণসী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷০, বাঁধাই ১॥০।

লেখক আজীবন বাংলার বাহিরে বাস করিতেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার মত দুঃসাহসও তাঁহার নাই। এই কৈফিয়ৎ মুখবন্ধে গ্রন্থকার দিয়াছেন।

লেখকের এ বিনয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্তরে কবিতার উৎস না থাকিলে, কেহ তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য ব্যগ্রও হয় না। লেখকের ভাব-সম্পদ্ আছে—আছে দরদ ও আন্তরিকতা। তবে মাঝে মাঝে অপটু চরণে চলিবার চিহ্ন লক্ষ্যে পড়ে। ভাষা ও প্রয়োগ শিল্পের এই যৎকিঞ্চিৎ অভাব না থাকিলে, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গানের বই হইত। নিয়মের আট-ঘাট বাঁধা আধুনিক গান না হইলেও,

গানগুলি যে বিনা বাধায় পিতা-পুত্রে একত্র শুনিয়া অনাবিল আনন্দ পাইবেন, এ-কথা অকপটে বলিতে ভরসা করি।

সত্যপ্রিয়—শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ৬৩ বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি নাটকের ভঙ্গীতে লিখিত। পুস্তকের সর্ব্বত্র ইংরাজী-বাংলা মিশ্রিত ভাষা ব্যবহারে অতি আধুনিক হইবার উৎকট প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বিষয়, ঘটনার সামঞ্জস্য, উপাখ্যান সঙ্গতিহীন। নাটকখানির সুমহান্ শেষ পরিণতি আগাগোড়া ঘটনাপারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

জয়যাত্রা—শ্রীরবিদাস সাহা রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান —প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বয়সে তরুণ হইলেও, ভাবে ও ভাষায় তারল্য নাই। সংযম ও আন্তরিকতায় কবিতাগুলি স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সুরসাল কবিতাগুলি পাঠকগণের আনন্দ-বর্দ্ধনে সমর্থ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা

মহাচীনে মহাসমর—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত, প্রকাশক — এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। দাম বারো আনা।

শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্বের কাহিনী রচনায় ধীরেনবাবুর সুনাম আছে। এই সাফল্যের পিছনে আছে তাঁর সহজ সরল আর্টিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গী। পাঠকের মন বিশেষতঃ শিশুর মনকে মুগ্ধ করবার কৌশল তাঁর জানা আছে। আলোচ্য বইখানি নূতন ধরণের কতকগুলি গল্পের সমষ্টি এবং গল্পগুলির রচনায় লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সব চেয়ে বেশী ভাল লেগেছে 'নানকিন ফ্রন্টে', 'মৃত্যুর মুহূর্ত্তে', 'জাপানী সংবাদ', 'স্পাই', এই কয়টি গল্প। 'মহাচীনে মহাসমর' পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা যেন চীনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে নায়কদের দেশভক্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি প্রত্যক্ষ করছি। ছেলেদের বীরোচিত চরিত্রগঠনের পক্ষে বইখানি বিশেষ উপযোগী এবং সাময়িকও বটে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

অন্ধের বাঁশী—শ্রীলাবণ্যকুমার চৌধুরী, মূল্য ১।০, প্রকাশক শ্রীহীরেন্দ্র চৌধুরী, মণিপুরী রাজবাড়ী, শ্রীহট্ট।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অন্ধ নায়কের চরিত্র চোখে খুব কমই পড়ে। এই হিসাবে লাবণ্যবাবুর 'অন্ধের বাঁশীর বিশেষত্ব যথেষ্ট। তিনি বেশ নিপুণতার সহিত অন্ধ নায়ক পদ্মলোচনের চরিত্রটী ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

পুস্তকান্তর্গত 'নেলীর বিবাহ' পর্ব্বটির সহিত বইখানির অন্য অংশের ——— সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। লেখক সম্ভবতঃ নেলীর সখী কিশোরী প্রতিমার মনের গড়নটী পাঠকের চোখের সামনে ধরার জন্যই এই দৃশ্যের অবতারণা করে' পুস্তকারম্ভ করেছেন এবং তা তিনি সফলতার সহিতই করেছেন। এই দৃশ্যের পর প্রতিমাকে আবার যখন দেখা গেল, তখন আর সে কিশোরী নয়, যৌবনের সীমানায় এসে পৌঁছেছে। গল্পটীর প্রকৃত আরম্ভ এইখান থেকেই।

বন্ধু-পুত্রের প্রতি স্নেহ, প্রতিশ্রুতি রক্ষার আন্তরিক নির্ব্বাক্ চেষ্টায় প্রতিমার পিতা অভয়বাবুর চরিত্রটী অতি মধুর ও উদার হ'য়ে ফুটে উঠেছে। কালীপদর ভালবাসা, প্রতিমার প্রেম, অন্ধের প্রতি দরদ, একনিষ্ঠতা সবই ফুটেছে বেশ। আর একটী চরিত্র, সেটী নমিতা— বাংলাদেশের বৌদি; ঠাট্টা-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-সহানুভূতিসম্পন্ন এই জীবটীর অভাব যদিও বাংলাসাহিত্যে নেই, তবু এ চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষত্ব আছে। ভাষা সুন্দর ও গতিশীল।

শ্রীসুবোধকুমার রায়

কল্যাণকল্পতরু (ধর্ম্মতত্ত্ব সংখ্যা)—

গোরক্ষপুরের সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা (ইংরাজী ও হিন্দী) কল্যাণ কল্পতরুর ধর্ম্মতত্ত্ব সংখ্যা যথাসময়ে আমরা পাইয়াছি ও পাঠ করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ধর্ম্মতত্ত্ব সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে ইংরাজীতে। কল্পতরুর ষষ্ঠ বর্ষের ইহাই প্রথম সংখ্যা। সংখ্যার নাম 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সারগর্ভ প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত করায় সংখ্যার নামকরণ সার্থক হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকদিগের মধ্যে আছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গিরিধর শর্ম্মা চতুর্ব্বেদী, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার, মহাত্মা বিনায়ক, প্রিন্সিপাল্ ইরাক তারপোরওয়ালা, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এবং অন্যান্য বহু সুলেখক। প্রবন্ধের মোট সংখ্যা ৭৪। সংখ্যা ৩৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সতরখানি ত্রিবর্ণ, দুইখানি দ্বিবর্ণ এবং তিনখানি একবর্ণ চিত্রে এই সংখ্যা সমৃদ্ধ। বর্ত্তমান ভাবঅরাজকতার দিনে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ঘাটন-কল্পে কল্যাণ-কল্পতরুর এই বিরাট্ প্রচেষ্টা সত্যই মহনীয় ও প্রশংসনীয়।

জীবশিব মিশন পত্রিকা—

এই মাসিক পত্রিকাখানি জীবশিব মিশনের মুখপত্র হইলেও, ইহাতে ধর্ম্ম-সাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হওয়ায় সুখপাঠ্য হইয়া থাকে। এইরূপ পত্রিকার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই ভাল। বার্ষিক ২৲, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। সম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৩।৩ ই কামারডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

প্রণব—

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র। ত্রয়োদশ বর্ষ চলিতেছে। হিন্দু-সংগঠন, হিন্দুর উন্নতি-অভ্যুদয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিস্তার লক্ষ্যে রাখিয়া পত্রিকাখানি পরিচালিত হয় এবং এইরূপ ধরণের প্রবন্ধাদিও উহাতে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার প্রথমেই সঙ্ঘাচার্য্যের যে বিদ্যুদ্বাণী থাকে, তাহা অনতি-দীর্ঘ হইলেও অগ্নিগর্ভ। বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আচার্য্যদেব বলিয়াছেন— "হিন্দু! ক্ষুদ্রকে ভোলো, গণ্ডীকে ভাঙো, বৃহৎকে বরণ কর, ব্যষ্টির দিক্ থেকে সমষ্টির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর, মহাশক্তি, মহাকল্যাণ, মহাশান্তি তোমার সুনিশ্চিত।" পত্রিকাখানি প্রণব কার্য্যালয়, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
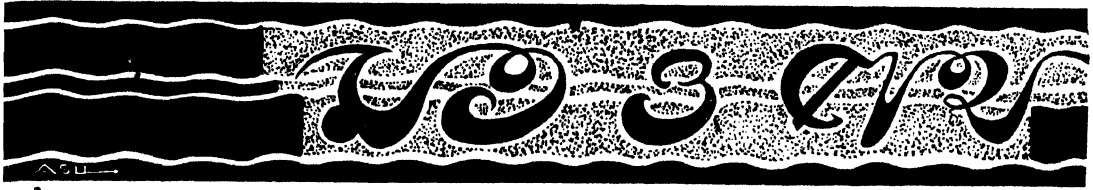
হায়দ্রাবাদে সত্যাগ্রহ

দেশীয় রাজ্যগুলির অন্যতম মুকুটমণি—হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদের নিজাম—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বাৎসরিক আয় ৮৷৷৹ কোটী টাকা। এই দেশীয় রাষ্ট্রে অক্ষরপরিচয় আছে, এমন মানুষের সংখ্যা শতকরা ৩·৩ জন মাত্র। শিক্ষার জন্য হায়দ্রাবাদ গভর্ণমেণ্ট যাহা ব্যয় করেন, তাহার অধিকাংশ সুবিধা পায় হায়দ্রাবাদের মুসলমান অধিবাসী; কিন্তু এই অধিবাসিবৃন্দের সংখ্যা সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে ১০ জনেরও অধিক নহে। এই মুষ্টিমেয় মুসলমান প্রজার জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রা খরচ করা হইলেও, হিন্দু প্রজার নিজেদের জন্য কিছু ব্যয় করার উপায় নাই। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর হায়দ্রাবাদ গভর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই ইহার কারণ। এই বিরুদ্ধ নীতির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ৪০৬৩ হইতে কমিয়া বর্ত্তমানে শূন্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

নিজাম বাহাদুর মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয় করেন ৬ লক্ষ টাকা। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারবিভাগ হইতে খরচ হইয়াছে মোট ১৪ লক্ষ টাকা। ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত টাকাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজা বুকের রক্ত নিঙড়াইয়া যোগান দেয়। কিন্তু সেই টাকায় হিন্দুর মন্দির নির্ম্মাণ হয় না, বরং পুরাতন মন্দির যেখানে আছে, তাহাদের সংস্কার তো দূরের কথা, ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হয়—রাজ্যে মসজিদের গম্বুজ গড়িয়া উঠে, গির্জ্জার চূড়া উঠিতেও বাধা হয় না।

সমগ্র হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দু রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ২৬৮ জন মাত্র ছিল—ইহা দিন দিন আরও কমিতেছে। সুদূর আরব ও উত্তর ভারত হইতে মুসলমান কর্ম্মচারী আনা হইতেছে—হিন্দু অধিবাসী আর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে চাকুরী পায় না।

হিন্দুকে শোষণ করিয়া হিন্দুর উপর এই নির্য্যাতন-নীতি যখন সহ্যের অতীত হইয়াছে, তখনই ভারতের হিন্দুজাতি তাহার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদের কণ্ঠ তোলা নয়, সংহতিবদ্ধ ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। হায়দ্রাবাদের হিন্দু প্রজা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। যে সহস্র সহস্র লোক সত্যাগ্রহ করিতেছেন, তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৭০০০ (সাত হাজার) সত্যাগ্রহী বন্দী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের প্রজা শতকরা ৭৫ জন। কাজেই হায়দ্রাবাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে মূলতঃ দেশীয় প্রজাশক্তিরই আন্দোলন, তাহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা ও পঞ্জাবের আর্য্য সমাজ অবশ্য হিন্দু জাতির পক্ষ হইতেই এইখানে সাহায্যহস্ত প্রসারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—কেন না, মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে কংগ্রেসর পক্ষে এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করার উপায় নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ অংশ গ্রহণ না করিলেও, কংগ্রেসের শক্তি এই ক্ষেত্রে ন্যায়-পক্ষের নৈতিক সমর্থন সম্পূর্ণভাবেই করে, ইহা পণ্ডিত জহরলালজীর উক্তি হইতে বুঝা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের মত মানুষও এই আন্দোলনের জয়-কামনা করিয়া শুধু উৎসাহ-দান নয়, ন্যায় ও যুক্তিরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত শোলাপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ২ জন হিন্দু নিহত ও ২৬ জন আহত হইয়াছে। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে সত্যাগ্রহ-শিবির স্থানান্তরিত হইয়াছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দ এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামেই প্রাণ আহুতি দিয়াছেন। বদ্রীনাথের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য কুরু শেঠি স্বয়ং সদলবলে হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে হায়দ্রাবাদের সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদে প্রজাশক্তি জয়ী হইলে, দেশীয় রাজ্যঘটিত ব্যাপারে হিন্দুর অধিকার ও মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে—ইহাই একমাত্র লাভ নহে, কংগ্রেসের সহায়তা ব্যতিরেকে একা

হিন্দুজাতির পক্ষে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জন করা সম্ভব, এই সত্যও প্রমাণিত হইবে। হিন্দু ভারত তাই আশানেত্রে হায়দ্রাবাদের দিকে চাহিয়া আছে। হিন্দুর এইটুকু জয়ও কত দীর্ঘ তপস্যা ও আত্মবলির মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। আশার কথা, হিন্দুপ্রাণ আজ উদ্বুদ্ধ, হায়দ্রাবাদ তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল

গত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ঊর্দ্ধতন পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সম্বন্ধীয় আলোচনার ফলে, খাঁ সাহেব আবদুল হামিদের প্রস্তাবে মনোনীত ৮ জন সদস্যের স্থানে ৪ জন এবং বাকী ৪ জন তপশীলভুক্ত সভ্যের স্থলে ৩ জন তপশীলভুক্ত ও ১ জন মুসলমান সদস্য মনোনীত না হইয়া নির্ব্বাচিত হইবেন, এইরূপ দুইটী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় হিন্দুর জনসংখ্যা শতকরা ৭০ জন, ভোটদাতৃ-সংখ্যা শতকরা ৮০ জন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাণও শতকরা ৮০ টাকা। এই হিন্দুগরিষ্ঠ কেন্দ্রের জন্য নূতন আইন গঠন করিয়া বাংলা হইতে মন্ত্রিমণ্ডল হিন্দুকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন — ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবে তাঁহাদের সেই সঙ্কল্প নাকি এক প্রকার বানচাল হইয়া গিয়াছে। সংশোধিত আইনে নির্ব্বাচিত মুসলমানের আসন একটী বাড়িবে; কিন্তু হিন্দুর আসন যেমন তেমনিই থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী জোর গলায় বলিয়াছিলেন—তাঁহার বিলের উদ্দেশ্য কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রাধান্য খর্ব্ব করা, হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট করা নহে। সংশোধনের পরও, যখন হিন্দুর আসন-সংখ্যা একটীও বাড়ে নাই, কমেও নাই, তখন প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু তবুও তাঁহার সমর্থক মৌলানা আক্রমণ খাঁ ইহাতে তাঁহাদের অর্দ্ধযুগের সাধনা ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়া নিষ্ফল ক্রন্দন করিলেন কেন, তাহার হেতু বুঝা যায় না।

মেয়র শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন দেখাইয়াছেন--কর্পোরেশনের ৮৭ জন সদস্য, অল্ডারম্যান ৫ জন—ইঁহাদের মধ্যে ইউরোপীয় ১৬ জন, মুসলমান ২২ জন, কংগ্রেস ২৮ জন—বাকী স্বতন্ত্র হিন্দু ও অন্যান্য। এই ২৮ জন কংগ্রেস-সভ্য যদি কাজ চালান, তাহা কৃতিত্বেরই পরিচয় বলিতে হইবে।

কর্পোরেশনের মোট রাজস্ব ৪৮ লক্ষ টাকা; ইহার মধ্যে মুসলমানের অংশ ৭৩ হাজার মাত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক হিন্দু গড়ে ৪৵১০ কর দেয়, মুসলমান ৸৵০। পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকুরীতে শতকরা ৪ জন মুসলমান নিযুক্ত হইতে দেখা যাইত—এক্ষণে শতকরা ২৪ জন, বিলে ২৫ জন দেওয়া স্থির হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেসের প্রাধান্য নষ্ট হইতেছে, না সমস্ত হিন্দু ভোটদাতৃগণেরই উপর অনিবার্য্য অবিচার হইয়া পড়িতেছে?

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার দৃষ্টি লইয়া সর্ব্বত্র একই নীতি লইয়া চলাও মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। যে নীতি কর্পোরেশনে, তাহাই ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হইলে, সমগ্র বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থান গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মাননীয় হক ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল ইহাতে নিশ্চয়ই সম্মত হইতে পারেন না।

চাকুরী বাটোয়ারার প্রতিবাদ

সরকারীচাকুরীবণ্টন ব্যাপারেই মাননীয় হক সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নীতির বিপরীত আচরণ করিতে হইয়াছে। যতদিন না মুসলমানেরা শিক্ষায় ও অর্থে হিন্দুদের সমকক্ষ হয়, ততদিন সাম্প্রদায়িক হারে চাকুরীর ভাগবাটোয়ারা থাকিবে—গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই অভিমত প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ করেন। অন্যতম হিন্দুমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সরকার ইহার পরিবর্ত্তে নিজের সুচিন্তিত মত বক্তৃতায় ও ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চুক্তির পর হইতে মুসলমানেরা এই দিকে জোর দিয়া আসিতেছে। স্যার আবদার রহিম এই নীতির সমর্থন করেন। মুসলমানেরা শতকরা ৫৫টী চান—তদানীন্তন বাংলার লাট স্যার জন এণ্ডার্সন কোন কোন সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৪৫টি সংরক্ষণ করার

প্রস্তাবে সম্মত হন। ইহাতে কিন্তু মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হন নাই। এ বিষয়ে এখনও মুসলমানদের ঘোরতর চাপ থাকিলেও, হিন্দু মন্ত্রিগণের জন্যই মিঃ হক ইহাতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪৫টী চাকুরী সংরক্ষণ করার প্রস্তাব যখন উত্থাপিত হয়, তখন গভর্ণমেণ্টবিরোধী কংগ্রেস নহেন, জাতীয়বাদীরাই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর মুসলমান ৬০, তপশীলভুক্ত ২০ ও হিন্দু ২০—এইরূপ হার প্রস্তাবিত হইলে, সরকার-বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা-পার্টি, উভয়েই তাহাতে সহযোগিতা করেন এবং উক্ত প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু তাঁহার মন্তব্য-পত্রে তিনটী প্রশ্ন মন্ত্রিমণ্ডলকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন—

১। জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকুরীর হার নির্দ্ধারিত হওয়া সঙ্গত কি না?

২। মুসলমানদের মধ্যে যে চাকুরীর অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করা হইবে, তাহাতে সরকারী বিভাগসমূহে কর্ম্মদক্ষতার হ্রাস হইবে কি না?

৩। সরকারী কর্ম্মচারী কি প্রণালীতে নিযুক্ত করা হইবে—প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা, না মনোনয়ন দ্বারা?

কংগ্রেস পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মিঃ হকের প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, উক্ত নীতি গৃহীত হইলে, দেশের একটা প্রভাবশালী সম্প্রদায়কে যেমন এক দিকে কৃত্রিম উপায়ে খর্ব্ব করা হইবে, তেমনি অপরদিকে গভর্ণমেণ্ট সম্প্রদায়বিশেষকে বড় করার অপচেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন। ইহা ছাড়া, এই নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—শাসনকার্য্যের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহার প্রতি উপেক্ষা করা হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ে মতভেদ হওয়ায়, মন্ত্রী নলিনীরঞ্জন তাঁহার পদত্যাগ করিবেন বলিয়া যাঁহারা আশা ও দাবী করেন, তাঁহাদের উত্তরে তিনি দৃঢ়স্বরে জানাইয়াছেন—পদত্যাগ তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে না। শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথার মর্ম্ম একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। নলিনীরঞ্জন পদত্যাগ করিলেই হিন্দু মন্ত্রীর পদ শূন্য থাকিবে না। মন্ত্রিমণ্ডলে থাকিয়া হিন্দু পক্ষের অনুকূলে যেটুকু সরকারী নীতিকে তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন, তাহাও যদি সম্ভব না হয়, তবে সে পদ-ত্যাগের মূল্য কি! মন্ত্রী নৌশের আলীর পদত্যাগেও যেমন হক-মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গে নাই, তেমনি হিন্দু-মন্ত্রীর পদত্যাগেও তাহা ভাঙ্গিবে না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। এইদিক্ দিয়া শ্রীযুক্ত সরকারের যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নহে। তাঁহার পরামর্শানুযায়ী হিন্দুদের জন্য অন্ততঃ ৩টী পদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাবটুকুও গৃহীত না হওয়ায়, তিনি গভর্ণরের নিকট স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন।

অতঃপর এই বিষয়ে হিন্দু জাতির পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃগণ গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার অনুরোধ করিয়া তার করেন। গভর্ণর বাহাদুর সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যে প্রতিনিধিমণ্ডলী দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা, মিঃ এন কে বসু, মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জী ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আছেন—কিন্তু কংগ্রেসপক্ষের প্রতিনিধি কেহই নাই। ইহার কারণ কি? অন্ধ্রদেশের স্বতন্ত্রীকরণের জন্য কংগ্রেস-মন্ত্রী রাজাগোপালাচারিয়া যখন ভারতসচিবের দ্বারস্থ হইতে পারেন—স্বয়ং মহাত্মা গান্ধিজীও যখন ভারত রাজপ্রতিনিধি বা চীফ জষ্টিসের সমীপে যাইতে কুণ্ঠা করেন না, তখন বাংলার কংগ্রেস-নেতৃগণ কেন জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তানগণের সহিত গভর্ণরের নিকট ডেপুটেশনে যোগদান করিতে পারিবেন না? বিশেষতঃ, এই বিষয়ে কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভায় যে নীতির অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে রাখিয়া, জনসাধারণ ডেপুটেশনের সহিত কংগ্রেস কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ এক-মত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এইরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

গভর্ণর বাহাদুর বিধিমতে এইরূপ ডেপুটেশন গ্রহণ

করিতে পারেন না, এই মর্ম্মে প্রধান মন্ত্রী গভর্ণর সমীপে প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার স্বতন্ত্র পত্রে ইহা সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত বলিয়াই গভর্ণরকে জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকারের সকল মন্তব্য যেরূপ সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ হইয়া থাকে, মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিবাদে তাঁহার এই যুক্তি হিন্দু নেতৃগণের উদ্দেশ্যসমর্থনে সহায়তা করিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। অখণ্ড বঙ্গের হিন্দুজাতির পরিপূর্ণ সমর্থন এই ডেপুটেশনের পশ্চাতে থাকিলে, গভর্ণরের পক্ষে তাঁহাদের দাবী কোন মতেই উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

মহাজনী বিল

বঙ্গীয় মহাজনী বিলটী ব্যবস্থাপরিষদে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। বিলটীর প্রথম ধারা গ্রহণ করার পর, তালিকাভুক্ত ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে বিলের পরিধি হইতে বাদ দিয়া, উহার দ্বিতীয় ধারার একটী সংশোধনমূলক উপধারা গৃহীত হয়। তাহার পর পুনরায় আলোচনায় সমবায়বীমা সমিতি, সমবায় সমিতি, বীমা কোম্পানী, জীবনবীমা কোম্পানী, মিউচুয়াল বীমা কোম্পানী, প্রভিডেণ্ট কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড-সমূহকেও বিলের পরিধি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় সংশোধক প্রস্তাবে বাংলার বিল্ডিং সোসাইটীর ব্যবসার অনুকূলে দাদন সংক্রান্ত কয়েকটী অন্তরায় দূর হয়। চতুর্থ সংশোধক প্রস্তাবানুযায়ী পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ১৯৩৯ সালের সমস্ত নূতন বা বিচারাধীন মামলাকে এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সংশোধন প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট উত্থাপন করেন এবং প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গৃহীত হয়। অন্যান্য সংশোধক প্রস্তাবগুলির এখনও আলোচনা শেষ হয় নাই।

বিলের যে অংশ পরিষদে গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট (Notified) ব্যাঙ্কগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে মিঃ সুরাওর্দ্দী জানাইয়াছেন যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের গেজেটে নোটিস দিয়া অন্যান্য শ্রেণীর যে কোনও ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট (Notified) ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে। ঘোষণার পর নোটিফাইড্ ব্যাঙ্কগুলি বিলের আওতা হইতে রক্ষা পাইবে। গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম (Rules) প্রণয়ন করিবেন, তাহাতে যে সব সর্ত্ত দেওয়া থাকিবে, উহা যে ব্যাঙ্ক মানিবে, তাহাই নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবে।

মন্ত্রীদের বেতন

পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্রের বেতন-হার ভারতে সর্ব্বোচ্চ ও জাপানেই সম্ভবতঃ সর্ব্ব নিম্ন ছিল। কংগ্রেস শাসনতন্ত্রে প্রবেশ করায় ভারতের এই ব্যয়বহুল প্রথা বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলি ও অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির মধ্যে এই বেতনের হারে এখনও উল্লেখযোগ্য তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীদের গৃহীত মোট বেতনের পরিমাণ—বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁহারা বাড়ীভাড়া প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র ভাতা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মন্ত্রীর বেতন বিহারে বার্ষিক ১৪ হাজার টাকা, মাদ্রাজে ১৩৷৷৹ হাজার টাকা ও আসামে ১১,৫০০৲ টাকা। পক্ষান্তরে, পাঞ্জাবের প্রত্যেক মন্ত্রী সেই স্থলে বাৎসরিক ৪৫,৮০০৲ ও বাংলার প্রত্যেক মন্ত্রী ৪৭৷৷৹ হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করেন। তুলনায় প্রতিপন্ন হয়, বিহার, আসাম ও মাদ্রাজ, এই তিনটী কংগ্রেসী প্রদেশের তিন জন মন্ত্রী একত্র যে পরিমাণ বেতন লইয়াছেন, অকংগ্রেসী বাংলার একজন মন্ত্রী একাই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। অকংগ্রেসী পঞ্চনদ অবশ্য বাংলাকেও এই ক্ষেত্রে হার মানাইয়াছে।

বাংলাদেশের একাদশ সচিব একত্র ৭ লক্ষ টাকা বেতন পাইয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ৩ শত সদস্য ৯ লক্ষ টাকা লইয়াছেন। শাসনকার্য্যের এই ব্যয়-বৈষম্যের অনুপাতে আয়-বৈষম্যের অঙ্কপাত করিতে পারিলে দেখা যাইত যে, তুলনায় বাঙালা ও পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টগুলির অপেক্ষা এই তিন চারি গুণ অধিক বেতন দেওয়ার স্বচ্ছলতা আছে, তাহা নহে। বাংলায় বিশেষভাবে জাতিগঠনের বিভাগগুলিকে

নিরাহারে রাখিয়াই মন্ত্রীদের ও সদস্যদের পোষণ করিতে হয়। যে ত্যাগ ও তপস্যার প্রেরণা থাকিলে, দেশের হৃদয়-জয়ের সঙ্গে দেশবাসীর ডাল-ভাতেরও ব্যবস্থা করার আন্তরিক চেষ্টা স্বতঃ-উৎসৃত হয়, তাহা অন্তরের বস্তু বটে, কিন্তু এই বেতনের হার আমাদের মত পরাধীন দেশে তাহার একটা বস্তুতন্ত্র পরিমাপক নহে কি?

সামাজিক বিধি

বোম্বাই প্রদেশে হিন্দু দাম্পত্যবিধির ৪৮৮ ধারা সংশোধন করিয়া এই আইন প্রস্তাব করা হইতেছে যে, কোন নারীর স্বামী পুনঃ বিবাহ করিলে বা উপপত্নী রাখিলে, ঐ স্ত্রী স্বামীর সহিত স্বতন্ত্র হইয়া বাস করার দাবী জানাইয়া, খোরপোষ আদায় করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে যেভাবে ঐ ধারা প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক বিচারকের পক্ষে স্ত্রীর দাবীর অনুকূলে রায় দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই এই সংশোধন-প্রস্তাব। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই আইন প্রবর্ত্তন করিলে, অন্যান্য প্রদেশেও ইহা অনায়াসে গৃহীত হইতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিবাহ হইলে, উক্ত বিবাহ বিধিসম্মত করিবার জন্য একটী বিল পেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অসবর্ণ বিবাহ করিতে হইলে, 'সিভিল ম্যারেজ এক্টের' আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন বজায় রাখিয়া অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু সমাজের মধ্যে সিদ্ধ করিতে হইলে, এইরূপ বিধানের প্রয়োজন আছে। বিধিটী অবশ্য অনুমতিমূলক হইবে।

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বহু সমস্যা জীবনের পথেই সমাধানের অপেক্ষা রাখে। রাষ্ট্রশক্তি অনুকূল হইলে, এই সমাধান ক্ষিপ্র হয়। বাংলা দেশেই দেখা যায়, এক পর্য্যায়ের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য থাকায়, শুধু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার নয়, 'পুত্রদায়গ্রস্ত' পিতারও মনোমত শিক্ষিত বর বা বধূ পাওয়া কতখানি দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ ব্যতীত অন্যান্য নবশাখ জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক আত্মবিকাশে আমরা এইরূপ মেল ভাঙ্গার প্রয়োজন অনুভব করিলেও, সম্ভাবনা বহু ক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইহার প্রতিকার যেখানে আইনের সাহায্যে সম্ভব, সেখানে তাহার আশ্রয়-গ্রহণ ক্রমবিকাশের পথই সহজ করিয়া দিতে পারে।

বাংলায় আত্মহত্যা

বঙ্গীয় সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সারা বাংলায় আত্মহত্যার সংখ্যা মোট ৩৯৩১। ইহার মধ্যে অধিকাংশের কারণ দারিদ্র্য বলিয়াই আমাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহা প্রায় স্বীকার করিতে চাহেন না। যদি দারিদ্র্যই কারণ না হয়, তবে অন্য গুরুতর কারণ কি, তাহাও অনুসন্ধান করার যোগ্য। গভর্ণমেণ্ট এই প্রায় চারি হাজার আত্মহত্যার একটা হেতুমূলক অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিবেন কি?

কয়েকটী তরুণ ও তরুণীর প্রণয়নৈরাশ্যঘটিত আত্ম-হত্যার খবর পাওয়া যায়। ইহাও সামাজিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। পরীক্ষায় বিফল হইয়াও, কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী অপঘাত মৃত্যু বরণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার চেয়ে জীবনের পরীক্ষা উচ্চতর; এই মনোভাব রোপণ করাই তাহাই প্রতিকার। তাহাও শিক্ষাসাপেক্ষ। সে শিক্ষা—ধর্ম্মশিক্ষা, জীবন্ত অগ্নিময় চরিত্রের সংস্পর্শে তরুণের জীবনে ধর্ম্মবীর্য্য সঞ্চারিত করা। বাঙালীকে এইদিকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেকারসমস্যাই যদি কারণ হয়, তাহাও শিক্ষা ও বস্তুনিষ্ঠ সাধনার প্রভাবেই মোচন করার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাপটের মৃত্যুপণ

মারাঠী সেনাপতি বাপট দুই বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা না হইলে, তিনি জলে ডুবিয়া তনুত্যাগ করিবেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও নাই। কাজেই সেনাপতি বাপাটকে তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে হইলে, আগামী জুলাই মাসেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তিনি ২৩শে জুলাই দিবা দ্বিপ্রহরে মুলা ও মুঠা নদীর

সঙ্গম-তীর্থে জলে ডুবিবেন। শুনা যায়, ইহাতে মহাত্মা গান্ধীর অনুমতিও তিনি নাকি পাইয়াছেন।

জাপানে হরিকুরী প্রথা প্রচলিত আছে। এই মারাঠী সেনাপতির মনোভাব উহারই অনুকৃতি। তাঁহার ধারণা, মরিতে না শিখিলে জাতি বাঁচিবে না। সত্য কথা; কিন্তু মরার এই বিধি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। উপরন্তু, ইহাতে উদীয়মান জাতিকে ভ্রান্ত দৃষ্টান্তে অপথে উৎসাহিত করার আশঙ্কা আছে।

সঙ্কল্পের সাধনে যদি মৃত্যু ঘটে, সেই মৃত্যুই বরণীয়। উহাই দেশ ও জাতিকে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্য্য দেয়। নহিলে বাপটের এই অর্থহীন আত্মহত্যা অন্তঃশূন্য ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু আমরা বলিতে পারিতেছি না। এই বীর মারাঠীর কাছে যদি আমাদের কথা পৌঁছিত, তাহা হইলে আমরা বলিতাম—এই দেহেই দেহান্তর গ্রহণ করিয়া, দেশ ও ভগবানের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দাও। উহাই "অমৃতত্বায় কল্পতে।"

পর্দ্দা কলেজ

মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তার হয়, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই, বিশেষতঃ, নারীর মধ্যে। বাঙালায় মন্ত্রিমণ্ডল মোসলেম ছাত্রীদের জন্য পর্দ্দা কলেজ স্থাপন করিতেছেন, ইহা সুখের কথা।

কলিকাতা পার্ক সার্কাসে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথায় সম্পূর্ণ পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত থাকিবে ও মুসলমান নীতি অনুসারে তাহা পরিচালিত হইবে। কলেজের স্থান ও গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ১২,০০০০০৲, গৃহ-সজ্জাদির জন্য ১১,২০০০৲, দুই বৎসরের গৃহ-ভাড়া ২১,৬০০৲ এবং তাহা ছাড়া চল্‌তি খরচের জন্য ১৩,৯০০০৲ ব্যয় স্থিরীকৃত ও মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। এই কলেজের পরিচালনার জন্য ইংলণ্ড হইতে ইংরাজ-মহিলাকে আনা স্থির হইয়াছে। কোনও হিন্দু মহিলা গ্রহণ করা হইবে না।

কলেজের জন্য যে বিরাট্ ব্যয়-কল্পনা, তাহা দরিদ্র দেশের সঙ্গতির তুলনায় অনেকটা নবাবী ধরণের, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সুশিক্ষিতা ভারতীয়া মহিলা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলেও ইংরাজ-মহিলা আনিতেই হইবে, ইহাও অভিনন্দনীয় নীতি বলা যায় না—অবশ্য যদি না পাওয়া যায়, তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বাংলা বা ভারতে এমন মুসলমান বা অহিন্দু সুশিক্ষিতা মহিলা নাই, ইহা কি সত্য? অথবা মুসলমান মহিলার যদি অভাব হয়, তাহা হইলে খৃষ্টান মহিলাও বরং ভাল, তবু হিন্দু-মহিলার সেখানে প্রবেশাধিকার কল্পনাও করা যায় না!

আমাদের প্রশ্ন, কলেজের শিক্ষা যদি খাঁটি মুসলমান 'কাল্‌চার' লক্ষ্য করিয়াই হয়, তবে ইংরাজ-মহিলা কি সত্যই তাহা দিতে পারিবেন? পাঠক-পাঠিকাকে আমরা জনাইতে পারি—পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলও এই প্রকার একটা পর্দ্দা-কলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যেভাবেই হউক, শিক্ষার প্রসার হউক — ইহাই আমরা চিরদিন কামনা করিব। শিক্ষার অগ্নিবীর্য্য সকল গোঁড়ামী ভেদ করিয়া আপনি আপনার মুক্তি-পথ আবিষ্কার করিয়া লইবে।

শ্যামের মিশ্র-বুদ্ধি

প্রাচ্যের দেশগুলি সকলেই স্ব স্ব আত্মবৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠুক, ইহাই আমরা চাই। ইরাণ এই পথে। বিজয়ী গ্রীক্ জাতির প্রদত্ত 'পারস্য' নামের কলঙ্ক ঘুচাইয়া, সে প্রাচীন 'ইরাণ' নাম বরণ করিয়াছে। ইরাণ—আর্য্য শব্দেরই নামান্তর। সুতরাং এই নামান্তর সমীচীনই হইয়াছে। ইরাণ প্রাচ্যের মূল সংস্কৃতি আর্য্যকৃষ্টিরই উপর দাঁড়াইয়া স্বীয় অভিজাত বৈশিষ্ট্য ও গৌরব অনুভব করার চেষ্টা করিতেছে।

শ্যামেও এই একই সাড়া জাগিয়াছে, ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু শ্যাম দেশ এখানে একটু ভুল করিয়া বসিয়াছে। শ্যাম তার এই শ্রেষ্ঠ গৌরব—আর্য্য সংস্কৃতির পরিচয় জানে না অথবা ইহাকে তার পরাজয়ের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। ইহা ভ্রান্ত বুদ্ধি। শ্যামের আসল নাম 'চম্পা', তাহা হইতে 'চ্যাম্' অর্থাৎ 'শ্যাম' হইয়াছে। তার বর্ত্তমান নরপতির নাম 'প্রজাধিপক'—ইহাও সংস্কৃত নাম। এ সকলই শ্যামের ভারতের সহিত নিবিড় সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। নবজাগ্রত শ্যাম পাশ্চাত্য প্রগতির আবিল স্রোতঃ যে

সর্ব্বনাশকর, তাহা বুঝিয়াছে—তাই তার ছাত্রছাত্রীদের পাশ্চাত্য অনুকরণে চুল ছাঁটা, রুজ, লিপ্‌ষ্টিক প্রভৃতি কদাচারগুলির মোহ মুক্ত করিবার জন্য কঠোর বিধি প্রবর্ত্তন করিতেও হইয়াছে। এই চেষ্টা সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে 'শ্যাম' নাম ঘুচাইয়া দেশের 'লা থ্যাং' নামান্তর করা যে মিশ্র-বুদ্ধির লক্ষণ, ইহা আমরা শ্যামবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

শ্যামের গৌরব — তার আর্য্য কৃষ্টি, তার ভারতীয় সংস্কৃতি। প্রাচ্য সভ্যতার এই প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক ভিত্তি উপেক্ষা করিয়া, শ্যাম পাশ্চাত্যপ্রগতির প্রলয়-প্লাবন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। আমরা ডাঃ কালিদাস নাগ মহোদয়ের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি। তিনিই শ্যাম কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এই বিষয়ে পত্রযোগে আলাপ করিয়া, তাঁহাদের এই মিশ্র-বুদ্ধির সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার সতর্ক বচন উচ্চারণ করিতে অধিকারী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে পারেন।

ডিগ্‌বয়

গত ১৮ই এপ্রিল ডিগ্‌বয় অয়েল কোম্পানীর ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর পুলিস গুলি-বর্ষণ করে, ইহার ফলে ৩ জন শ্রমিক নিহত ও ২০ জন আহত হয়। এই ঘটনার তদন্ত করেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তদন্তের পর এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সহরে টহল দিবার সময়ে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্যই লেঃ মরে ও পাণিরামের দল গুলি ছুঁড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। ট্যানিস টাউলার, জিলেসপী বা আসাম অয়েল কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারী কেহই গুলি ছুঁড়ে নাই বা তজ্জন্য কোনও খুন-জখমও হয় নাই। জনসাধারণ এই তদন্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ডাঃ বি, সি, রায়ের প্রস্তাবে, আসাম মন্ত্রিসভা এই সম্বন্ধে পুনরায় নূতন তদন্তের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একজন হাইকোর্টের জজ অথবা স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের দ্বারা এই তদন্তের ব্যবস্থা করা হইতেছে। জষ্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ডিগবয়ের ধর্ম্মঘট ব্যাপারে আসাম গভর্ণমেণ্ট অয়েল কোম্পানীকে পুলিসের সাহায্যদানে নিষেধ করিয়াছেন, এই অজুহাতে জনৈক এংলো-ইণ্ডিয়ান সহযোগী পত্রে আসাম গভর্ণমেণ্টকে "A Criminal Government" বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। আসামের চীফ সেক্রেটারীর প্রথম ইস্তাহারে এই সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাতে সহযোগী উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু আসাম গভর্ণমেণ্টের পরবর্ত্তী ইস্তাহারে রহস্যের উদ্ঘাটন হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বরোদোলী জানাইয়াছেন—চীফ সেক্রেটারীর উক্ত ইস্তাহার বিধিসঙ্গত হয় নাই। ইহার জন্য চীফ সেক্রেটারী পদত্যাগে প্রস্তুত হইলে, প্রধান মন্ত্রী অবশ্য তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন। যাঁহারা এই ঘটনা উপলক্ষে আসাম গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে আশা সফল হয় নাই। আসামের ব্যাপার লইয়া পরামর্শের জন্য প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। আলোচনা এখনও চলিতেছে।

ধর্ম্মঘটকারিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার প্রামাণিক এই দাবী জানাইয়াছেন—তদন্তের ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত পদচ্যুত শ্রমিকদের পুনরায় কোম্পানী পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করুন এবং যে সকল শ্রমিক প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদের বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করুন। এই উভয় দাবীই মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া খুবই সমীচিন এবং সমর্থনের যোগ্য।

থেটিস্-ডুবি

বৃটিশ ডুবো-জাহাজ থেটিস প্রায় ৯০ জন বিশিষ্ট আরোহী ও নাবিকবৃন্দ লইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য শুধু ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যসৃষ্টি নয়, সর্ব্বত্র সমবেদনার করুণ রাগিণী মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। জার্ম্মান রাষ্ট্রপতি হিটলারও ইহাতে সহানুভূতির বাণী পাঠাইতে কুণ্ঠা করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মানুষের হৃদয়তন্ত্রী কোন না কোন ঘটনায় সমস্বরে বাজিয়া উঠে। থেটিসের ডুবি এইরূপই এক ঘটনা—সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করে।

থেটিস্-ডুবি সম্বন্ধে বিলাতের কমন্স্-সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন দুর্ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়া বলেন যে, এই বিষয়ে প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা হইবে। লণ্ডনের মেয়র ৬ই জুন ম্যান্‌শন্ হাউসে এই সাবমেরিণের মৃত নাবিকদের পরিবারবর্গের জন্য একটী সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছেন।

যে চারিজন মানুষ এই দুর্ব্বিপাকে দৈব কৃপায় বাঁচিয়াছে, তাহাদের মুখে যতটুকু বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—কি অতুল ধৈর্য্য ও বীরত্বের সহিত ক্যাপ্টেন ওরাম ও তাঁহার সহচরবৃন্দ মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন! বীর জাতির জীবনেতিহাসে এইরূপ ঘটনা একবার, দুইবার নয়, বহুবার ঘটে—মৃত্যুকে নির্ভীকভাবে সম্মুখে রাখিয়াই তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়।

আমরাও দূর হইতে এই অনামা অজানা বীরগণের উদ্দেশে অশ্রু-তর্পণ করিতেছি।

— চিন্তা-বীথি —

গুরু—জ্ঞান বিকাশ করেন। জ্ঞানের প্রকাশ—অন্তরে। জ্ঞানময় গুরু অন্তরে স্বপ্রকাশ হইলে, তাঁহার চিন্ময় দ্যুতি বুদ্ধিক্ষেত্র আলোকিত করিয়া তুলে। জ্ঞান নিত্যগুণ — ইহা আত্মারই চিৎশক্তি। আত্মা চিন্ময়, জ্ঞানঘন। কিন্তু বুদ্ধির স্বচ্ছতার গুণভেদে ইহার প্রকাশ বা অপ্রকাশ নির্ভর করে। বুদ্ধি সত্ত্বগুণাশ্রিত হইলে, তাহা আত্মার ভাস্বর জ্যোতিঃ অংশতঃ প্রকাশিত করিতে পারে। রজোগুণে সঞ্চালিত বুদ্ধি আত্মার কর্ত্তৃত্বে খণ্ড খণ্ড বস্তুজ্ঞান প্রকাশক্ষম হয়—কিন্তু অখণ্ড জ্ঞানের অবধারণে তাহা সমর্থ হয় না। তামস বিমূঢ় বুদ্ধি জ্ঞানকে মূর্চ্ছিত করিয়া রাখে—ইহা আবরণ-শক্তি। প্রমাদ ও আলস্য ইহার লক্ষণ। রাজস বুদ্ধির লক্ষণ চিত্ত বা প্রবৃত্তির বিক্ষেপ। সত্ত্বই বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি। ঋষি পতঞ্জলির ভাষায়, সত্ত্বই প্রমাণ ও স্মৃতিরূপা চিত্তবৃত্তি বিকশিত করে—রজঃ আনে বিকল্প ও বিপর্য্যয় এবং তমঃ হইতেই নিদ্রা—যাহা প্রমাদ ও আলস্যেরই নামান্তর বলা যাইতে পারে।

গুরু-বৃত্তি—সত্ত্ববৃত্তি, তাহা তাই প্রমাণ ও স্মৃতি-স্বরূপ। মস্তিষ্কের সহস্রদলে গুরুপাদুকার স্থান। ইহাই গুরু-পীঠ। শ্রদ্ধায়, প্রণতিতে গুরু তত্ত্বের জাগরণ হয়। আত্মসমর্পণেই গুরুলাভ—ইহাই অধ্যাত্মজগতের অব্যর্থ বিধান।

* * * *

জ্ঞান দুই প্রকার—ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষর-জ্ঞান প্রবৃত্তি-মূলক। ইহা ইন্দ্রিয়-কার্য্যও বলা যাইতে পারে। অক্ষরই শব্দ-মন্ত্র। ইহা নিত্য বেদের উপাদান। বেদ তাই আগম-পদ বাচ্য। আ-গম—অর্থাৎ আ-রূপ মূল শব্দ হইতে যাহা গত। 'আ'-ই 'অ—ই—উ' রূপে সংবৃত বা সঙ্কুচিত হইয়া ত্রি-স্বরে আত্মপ্রকাশ করে। স্বর ও ব্যঞ্জন যাহা সমাহারে বিশ্বপ্রকৃতি গঠন করে, তাহা ইহারই ক্রমপরিণতি। সুতরাং 'আ'-কারই আদিবর্ণ। তাই ঋষি বলেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু এই অখণ্ড মণ্ডল-স্বরূপ 'আ-কার' অর্থাৎ শব্দ-মূল প্রত্যক্ষ করান, তাই তিনি জ্ঞানদাতা। শব্দই অক্ষর-জ্ঞানের মূলশক্তি। গীতাকার তাই বলিয়াছেন—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবম্।

কর্ম্মের মূলে ব্রহ্ম বা বেদ; এই বেদ আবার অক্ষর হইতে সঞ্জাত। অর্থাৎ বেদের উপাদান অক্ষর বা শব্দ-শক্তি। গুরু-বীর্য্যই শব্দ-শক্তি স্ফুরিত করেন অর্থাৎ মন্ত্র-সিদ্ধ চৈতন্য দান করেন।

* * * *

গুরু ও শিষ্য—চৈতন্য ও চিত্তের সম্বন্ধযুক্ত। শিষ্যের চিত্ত গুরুর চৈতন্যে যুক্ত হইয়া মুক্তি পায়। গুরু-চৈতন্যই শিষ্য-চিত্তকে আপনার মধ্যে লীন করিয়া, শিষ্যকে নিঃশ্রেয়স্ দান করেন। ইহাই মুক্তি বা নবজন্ম। খণ্ড বুদ্ধি তখন অখণ্ডেই লয় পায়—ক্ষর-জ্ঞান অক্ষরে গিয়া

সম্মিলিত হয়। এই মিলনই—উৎসর্গের গূঢ় রহস্য। আত্ম-সমর্পণ যোগ গুরু-শিষ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। গুরুই তখন শিষ্যের অন্তরে জ্ঞানবিকাশ—তাহার কণ্ঠ দিয়া অপূর্ব্ব শব্দ মন্ত্র প্রকট করেন।

* * * *

এইজন্য উত্তম শিষ্য গুরুরই বিগ্রহে পরিণত হয়। সম্বন্ধের সাধন—এই রূপান্তরের রসায়ণ। মন্ত্র বা শব্দশক্তি তাহার উপকরণ। সম্বন্ধের সূচনা—দীক্ষা-মন্ত্রে। ইহা মান্ত্রী দীক্ষা। শাক্তী দীক্ষাও মন্ত্রময়ী—সে মন্ত্র প্রকট না হইলেও, বিশুদ্ধ অক্ষরশক্তি—ইহাই ভাবের অমর বীর্য্য। শাম্ভবী দীক্ষার মূলেও স্বয়ং গুরু-বীর্য্য চৈতন্য-রূপে কর্ম্ম করেন। একই উদ্দেশ্য হইলেও, ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ—এই ত্রিক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করে বলিয়া গুরু বা চৈতন্যশক্তির এই ভাবভেদে প্রকাশভেদ ঘটে এবং তাহাতেই সম্বন্ধের সাধনেও রূপান্তরের ক্রম পরিদৃষ্ট হয়। ব্যক্ত শব্দ-মন্ত্রেই মান্ত্রী দীক্ষা-সম্বন্ধ হয়। শাক্তী দীক্ষা অব্যক্ত মন্ত্রে। শাম্ভবী বা উত্তম দীক্ষাই 'জ্ঞ' অর্থাৎ বুদ্ধির সিদ্ধ প্রকাশে সম্ভব হয়। এই সকল ক্রম সাধন বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। যোগ পথে ইহা যথাকালে উন্মেষিত হয়। তাই গীতা বলেন—"কালেনাত্মনি বিন্দতি।" সদ্‌গুরু যে ভাবেই, যে ক্রমেই শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া দীক্ষা দিন না কেন, কালশক্তির পরিপাকে উহা যথাক্রমে পরিণতি লাভ করিবেই—ইহার অন্যথা নাই। দীক্ষার সিদ্ধ বীর্য্য কোন-দিনই ব্যর্থ হয় না। "জন্মনি জন্মান্তরে বা"—সে শক্তি কার্য্য করিবেই, জীবনের সিদ্ধি আনিয়া দিবেই।

* * * *

হিন্দু-কৃষ্টি বেদমূলা। বেদের সাধন — আগমাভ্যাস অর্থাৎ শব্দ-বিজ্ঞান লাভ করা। ইহা গুরু-মুখে গ্রহণ করিতে হয়। "গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম"—গুরুর বাণী ব্রহ্ম-বাণী অর্থাৎ বেদের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, গুরুর মর্ম্ম দিয়াই তাহা বুঝা যায়। অক্ষর হইতে ভাষার উৎপত্তি। গুরু মুখে শব্দ-বিজ্ঞান লাভ করিলে, বুদ্ধি যাবতীয় বিশ্ব-প্রকৃতির জ্ঞান ও অনুভূতির সামর্থ্যসম্পন্ন হয়। ইহাই বুদ্ধির সিদ্ধি। পাতঞ্জল দর্শনের সাধন ও বিভূতি পাদে এই সামর্থ্যের পরিচয় ও তাহা অর্জ্জন করার সঙ্কেত দেওয়া আছে। বুদ্ধির পরম সিদ্ধিই সমাধি বা কৈবল্য। শব্দের ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ—ত্রিবিধ ক্রম ধরিয়াই বুদ্ধি এই আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ করে। ইহারই তথ্য সাংখ্য-দর্শনে নিহিত আছে। "তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ।" উৎসর্গের ফলে বুদ্ধির শোধন হইলে, তাহার মধ্যে স্বতঃই এই ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ অর্থাৎ সম্পূর্ণ শব্দ-বিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

* * * *

আত্মসমর্পণের মূলনীতি শরণ বা আনুগত্য। ইহাই প্রপত্তি। গীতার প্রথম অধ্যায়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া প্রিয়তম সখা ও নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রপত্তি বা শরণাগতিই গ্রহণ করেন—শিষ্যত্বের মৌলিক লক্ষণ সেইখানেই অর্জ্জুন-কণ্ঠে মহর্ষি ব্যাসদেব প্রকাশ করিয়াছেন—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাম্ প্রপন্নম্"

প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত শিষ্যকেই গুরু বা নরনারায়ণ পরম জ্ঞান দান করেন। গীতা তাই আত্মসমর্পণ মহাযোগেরই নিগূঢ় মন্ত্রশাস্ত্র। চণ্ডী তাহার সাধন-বিজ্ঞান। বাঙালী গীতা ও চণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার অন্তরঙ্গ জাতি গঠনের কৃষ্টি ও স্বাধ্যায়-মূলক সাধন-ভিত্তি অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারে। আত্মসমর্পণযোগী ভক্ত ও শিষ্যের নিকট পর পর অষ্টাদশ পর্ব্বে ভারতের মহাগুরু যে বেদসার সিদ্ধ মন্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শুধু ভারতের নয় নিখিল মানবজাতির ইহা মুক্তি ও অধ্যাত্মজাগরণের কুঞ্চিকা অর্থাৎ চাবীকাঠি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* * * *

গীতার যোগমন্ত্রই আত্মসমর্পণের সিদ্ধ-মন্ত্র। ইহার মধ্যে যে যোগ ও সাধনার ভিত্তি-প্রস্তুতির সঙ্কেত আছে, অতঃপর সেই কথাই আমরা উল্লেখ করিব। গীতার মন্ত্র শুধু ব্যক্তিতন্ত্র সাধ্য-সাধন লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয় নাই, ব্যক্তি ও মানবসমষ্টির মুক্তি ও জীবন-সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট। তাই এই আত্মপ্রস্তুতির অনুশীলন—ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয়েরই পক্ষে প্রযুজ্য। আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই অনুশীলনই এই স্তম্ভে ধারাবাহিক প্রকাশ করার চেষ্টা করিব।

জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীমোতিলাল রায়

৩

সেদিনও বাংলার প্রগতিপন্থী রাষ্ট্রসাধকগণ মনে করিয়াছিলেন ইউরোপের যুদ্ধে ইংরাজ যত জড়াইয়া পড়িবে, ভারতের মুক্তির দাবী তত প্রবল করিয়া তুলিতে পারিলে তাহা উপেক্ষা করার সাধ্য রাজশক্তির হইবে না। বাংলার তাৎকালীন বিপ্লবপন্থীরা এই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, বাংলার জেলায় জেলায় দল গড়ার কাজে লাগিয়া গেল। প্রকৃতির রহস্যময় নীতি—এমন ঘটনারও সৃষ্টি হইল, যাহার জন্য এই সময়ে বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর বিপ্লবী দল আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। অন্তর বাধাহীন ছিল না, বাহিরে কিন্তু এই প্রবল উত্তেজনা-স্রোতঃ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। অন্তরে অনুভব করিতাম—জাতির মধ্যে অন্ততঃ এমন একটা বৃহত্তর সমষ্টি গড়িয়া উঠার দরকার—যে সমষ্টির উন্নত চেতনাস্তরে ভারতের স্বাধীনতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে — তেমন সম্ভাবনা কোথাও ঘটিয়া উঠে নাই। স্বাধীনতা সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু বন্ধুদের চক্ষের সম্মুখে আসন্ন স্বাধীনতার মরীচিকা সেদিন এমন ভাবে চিত্রিত হইয়া উঠিল—সেখানে কোন যুক্তি কার্য্যকরী হইবার নহে। অন্তর-পুরুষ দ্রষ্টার আসন লইয়া বসিল, বাহিরের সবখানি দেশব্রতীদের ইচ্ছানুসরণ করিয়া চলিল। ঈশ্বরের বিধান অতিক্রম করার সাধ্য কাহারও নাই, এই দৃঢ়বিশ্বাসে বিপৎ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম।

সাধনার অনেক কথা বলিতে পারি নাই। অনেক কিছু অপ্রকাশ থাকিয়া গেল। বাংলার এই বিপ্লব-যুগের ইতিহাসও তেমনই প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। ইহাও চিরদিন গোপন থাকিয়া যাইবে; কেন না, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার বিপ্লব-যুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় জাগরণের পর বাংলার বিপ্লব-যুগের একটা প্রলয়ঙ্কর অঙ্কের যবনিকাপাত এই সময়ে হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ধরণের মনোবৃত্তির উপর বাংলার বিপ্লব-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল, অতঃপর তাহার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। যে মেধা ও মস্তিষ্ক লইয়া বাংলার বৈপ্লবিক যুগের সূচনা, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

এই ইতিহাসের বিশদ আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ, সে যুগের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা বিজড়িত ছিলেন, তাঁহাদের ভাব ও আদর্শের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের টানিয়া আনা অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় হেতু, সে ব্যর্থতার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া অকারণ অর্ব্বাচীন যুগের তরুণদলের পুনরায় বিপথে চলার প্রবৃত্তি-সৃষ্টি—দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। তরলমতি তরুণেরা বিষয়ের অন্তরনিহিত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, বিস্ময়কর বৈপ্লবিক কর্ম্ম-কৌশলের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত আরও একটী কারণ, নীরব, মৌনমূর্ত্তি, এক অতি অপ্রসিদ্ধ নারীজীবনের যে পুণ্যকাহিনী অনুস্মরণ করিয়া এই বিষয়ের অবতারণা, শুধু তাঁর ভাব ও চরিত্র আমার জীবনের সংঘাতে যে যে ঘটনায় প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার অধিক কাহিনী ব্যক্ত করা অতিশয় দোষযুক্ত হইবে বলিয়া মনে করি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে কাজের তাড়া প্রবল হইল। পুলিস অসতর্ক ছিল না; দেখিতে দেখিতে আমি পুলিস-প্রহরীবেষ্টিত হইয়া রাত্রিদিন এক প্রকার বন্দী অবস্থায় কাল কাটাইতে লাগিলাম—কিন্তু কর্ম্মের তাগিদে তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমায় বাহিরে যাইতে হইত। এই বিপৎ-সঙ্কুল দিনে আমার বাহিরে যাওয়া ও পুনরায়

নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া আসা, ইহার মধ্যে যে কালের ব্যবধান, উহা একজনের পক্ষে কিরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই ব্যক্তির দিকে চাহিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে করুণ অনুভূতি জাগিয়া উঠিত। বহির্গমনের প্রতি পদে তাঁহার বিষন্ন মুখ ও সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া কতবার বিরক্ত হইয়াছি। তিনি তাহা বুঝিতেন; বুঝিতেন বলিয়াই বলিতেন "তুমি বিরক্ত হইতেছ, কিন্তু আমি কি তোমার কাজে বাধা দিতেছি?"

আমি বলিতাম, "বাধা দিতেছ বৈকি, কত উৎকণ্ঠা উদ্বেগ লইয়া আমায় চলিতে হয়, আর প্রতিবার বাহির হওয়ার সময়ে তোমার এই ম্লান বিষন্ন মুখ হৃদয়ে কি যে আঘাত দেয়, কতখানি যে আমায় নিরুৎসাহ করে—ভাবিয়া দেখ কি?"

তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কখনও নীরব হইয়া থাকিতেন, কখনও বলিতেন "আমি যে কত বড় অসহায়া, তুমি বুঝিবে না। এই যাইতেছ, আবার যতক্ষণ না ফিরিয়া আইস—ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্ত দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় বুকে আমার অন্ধকার ঘনাইয়া তুলে—নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়—সে বেদনা তুমি স্বামী হইয়াও বুঝ না, এই আমার দুঃখ!"

আমি বলিতাম "দেশের কাজে যাদের প্রাণ, তাদের এই বন্ধন শ্রেয়ঃ নয়। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তোমার একমাত্র আশ্রয়। বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

তিনি এই কথায় বড় ক্ষুন্ন হইতেন নিজেকে অপরাধী মনে করিতেন—মনে মনে মৃত্যুচিন্তাও আসিত। তিনি বলিতেন "আমার জন্য তোমার বিপদ্—তাই ঈশ্বরকে বলি, যত শীঘ্র হয় এ বাধা দূর হোক। যাঁরা বড় কাজ করেন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র না থাকাই ভাল। সত্যই তুমি একমাত্র আশ্রয় — দুর্ব্বল মন, ভয়ে প্রাণ অস্থির হয়। ঈশ্বর আছেন, তুমি বড় কাজ কর—আমি যেন শীঘ্র মুক্তি পাই—এই আশীর্ব্বাদ চাই।"

তাঁর ম্লান হাসি আমায় বিদায় দিত। বুকে কিন্তু ছুরি চলিত। কিন্তু এই তিক্ত অনুভূতি অধিকক্ষণ ভোগ করার সময় ছিল না—আমি বিদায় লইয়া কোন ঝোঁপের ধার দিয়া, এঁদো পুকুরের পাড়ে উঠিয়া, গলি-ঘুঁজির পথে চোরের মত ছুটিতাম, পুলিসপ্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া। দুই ঘণ্টার রাস্তা ছয় ঘণ্টায় অতিবাহিত হইত। কলিকাতার ষ্টেশনে নামিবার কথা—দমদমায় নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিতাম। ফিরিবার সময়ে দুই চারিটা ষ্টেশন দূরে নামিয়া, হাঁটিয়া হাঁটিয়া, অতিশয় ক্লান্ত দেহে গোপন পথে বাড়ী ফিরিতাম। পথের যত ক্লান্তি, যত আতঙ্ক, সব মুছিয়া যাইত; কর্ম্মের গুরুত্ব লঘু হইয়া পড়িত। তাঁর অসীম আকুলতাপূর্ণ সজল নয়ন আমায় অভিষিক্ত করিত প্রতি ক্ষেত্রে। আজ ভাবি—এত বিপদ্ বরণ করিয়া এই নির্ব্বিঘ্ন জীবনযাত্রার মূলে ঈশ্বর-প্রসাদ দায়ী বটে, কিন্তু এই সতীকে আশ্রয় করিয়াই তাহা মূর্ত্তি লইত—উপলক্ষস্বরূপ এই আশ্রয়-তত্ত্বের মহিমা তাই বুঝি ভুলিবার নয়।

সে একদিন আমারই বাড়ীতে এক বিষম সমস্যা লইয়া সভানুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যার পর হইতেই একজন, দুই জন করিয়া এমন কত বন্ধু উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের নৈশ-ভোজনের গুরুভার চিরদিনের ন্যায় তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে গুরু-সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের আলোচনা চলিতেছিল—তাহা আর শেষ হয় না; কখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, বর্ষার আকাশে ঘন ঘটায় কত চিকুর হানিয়া গিয়াছে; গুরু গুরু বজ্রধ্বনি উঠিয়াছে, থামিয়াছে; কত বার ঝাঁপিয়া ঝাঁপিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ হয়, আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলাম না। স্থির হইল, এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ লইয়া কার্য্য হইবে। সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সকলেই ক্ষুধাতুর। মধ্য দরজায় হয় তো বহু বার কড়া নাড়ার শব্দ হইয়াছিল, সে মৃদু আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করে নাই। নিশীথ রাত্রি, নিঃশব্দ পদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। অপ্রশস্ত রন্ধনশালায় মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিজা সেঁৎসেঁতে মেঝের উপর অঞ্চল বিছাইয়া স্তিমিত নেত্রে প্রফুল্ল কমল ঢলিয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্রির শ্রমকাতর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসাদে শিথিল, শ্লথ। যেন অজস্র স্নিগ্ধ বারিপতনের আঘাতে

লতাবল্লরীর ন্যায় তাঁর সবগানি অবনমিত, এলায়িত। নিদ্রা শ্রম লাঘব করে। ইচ্ছা হইল না—এই শ্রান্তি সুখে বাধা দিই। অনেক সময়ে তাঁহার অতর্কিতে আমার সাধ্যমত যাহা, তাহা করার উপক্রম করিয়াছি; কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার চক্ষু পড়িয়া যায়—আমার উদ্যম প্রায় সর্ব্ব সময়েই ব্যর্থ হয়। দেখিলাম, রন্ধন-কর্ম্ম শেষ করিয়া, সব কিছু সুসজ্জিত রাখিয়া, অবসন্নতার ভার দেহখানি সহিতে না পারায়, তিনি ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। বর্ষাকালে রাত্রে ভোজনের জন্য খেচরান্নই হইয়াছিল। আমি সেই অন্নভাণ্ডটী ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার অতর্কিতে একটা বিরাট্ কর্ম্ম সমাধা করার বাহাদুরী লইবার জন্য হাঁড়ীর কাণাটী ধরিয়া দুই হস্তে যেমনই উঠাইতে যাইব, মুখের পাত্রটী সহসা অপসারিত হইয়া তাহা হইতে অত্যুষ্ণ বাষ্প উদ্গীর্ণ হইল, আমার হাত দুইটী তাহাতে প্রায় ঝলসিয়া গেল, মুখে একটা অব্যক্ত অস্ফুষ্ট চীৎকারও উঠিল। তাঁহার বিশ্রামসুখ-ভঙ্গ না করার জন্যই আমার এই সাধু-প্রয়াস, তাহা তিনি বুঝিলেন না—সুপ্তোত্থিত হইয়া কটু ভৎর্সনায় আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। আমি একেবারে অসাধুর ন্যায় হতভম্ব হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রথমেই হাত দুটা ধরিয়া তিনি আমায় বলিলেন "খুব জলছে তো! গরম ভাপ্ লেগেছে, জলবে বৈ কি!" তিরস্কার বড় কটু কণ্ঠেই উচ্চারিত হইত। বিরক্তির সুর কাণে মধুবর্ষণ করে না। গজ্-গজ্ করিয়া সে যে কত কথা—সারাদিনের ক্লান্তি, সারারাত্রির দুঃখ সব একত্র হওয়ায় তাঁহাকে সে রাত্রি বড় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইল। "আমার এমন জীবন যদি, তবে বিবাহ করার কি প্রয়োজন ছিল?" "সারাদিন খাটিয়া রাত্রে যে দুই দণ্ড নিদ্রা যাইব, সে ভাগ্যও নাই।" "পয়সা কড়ির দিকে খোঁজখবর নেই, যজ্ঞিশালা খুলে বসা হয়েছে!" মুখে তাঁহার খৈ ফুটিতে লাগিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিটের বোতল আনিয়া আমার দুই হাতের উপর ঢালিতে ঢালিতে তিনি বলিতে লাগিলেন "আমি মরিনি তো? ডাকিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত? ও সব সোহাগ দেখান নয় তো, আমায় জ্বালাতন করা!" গঞ্জনার বেদমন্ত্র নীরবেই সহ্য করিলাম। ওদিকে ক্ষুধাকাতর বন্ধুগণ বিলম্ব দেখিয়া হট্টগোল সুরু করিলেন। শেষে দশ পনেরখানা হাত টেবিল চাপড়াইয়া বিজ্ঞপ্তি দিতে লাগিল "আমরা আর থাকিতে পারি না, অন্তঃপুরেই বোধহয় খাওয়া করিতে হইবে!"

রঙ্গ দেখিয়া তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন বোধহয় বুঝিতে পারিলেন না; শেষে হাসিয়াই ফেলিলেন, বলিলেন "ডাক, এতক্ষণে বাকড়্ জলেছে তবু ভাল। এদিকে ভোরও হয়ে আসে।"

বৈঠকখানায় যত বড় উৎসবই লাগিয়া থাকুক, রামেশ্বরের সুনিদ্রার ব্যাঘাত কিছুতেই হইত না। কিন্তু এত বড় একটা গোলযোগে তাহারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে নিদ্রোত্থিত হইয়াই বুঝিয়া লইল—ব্যাপারটী কি; তাহার পর যাহা হইবার, তাহাতে আমার আর প্রয়োজনই রহিল না। অতি প্রত্যুষে ভোজনাদি সমাধা করিয়া, যাহাদের প্রস্থানের সুযোগ ছিল, তাঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন; অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন, স্নিগ্ধ বর্ষার বাতাসে অঙ্গ মেলিয়া দালানে সারি সারি শুইয়া পড়িলেন। নীরব নিস্তব্ধ পুরী—কে বলিবে কিছু পূর্ব্বে এখানে এত বড একটা অভিনয় হইয়া গিয়াছে!

শ্রীঅরবিন্দের পত্র আসিল। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার রাষ্ট্র-ক্ষেত্র হইতে আত্মগোপন করিলে, বাংলায় রাষ্ট্রনেতা বলিয়া কেহ ছিলেন না। বাংলার বিপ্লবপন্থীরাই দেশের রাষ্ট্রভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিপ্লবপন্থীদের সংহতি একই ছত্রতলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলার ঢাকা, বরিশাল ও কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী নেতারা এক হইয়া সেদিন শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা করিতেন। আমার যত দূর মনে পড়ে, এই সময়ে ৫০ হাজার তরুণ বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেত পাইলে, একযোগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দ এই উগ্র রাষ্ট্রনীতির মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য এই সময়ে নূতন ঋক্-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিপ্লব-সংহতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ হয়তো মনে করিয়াছিলেন,
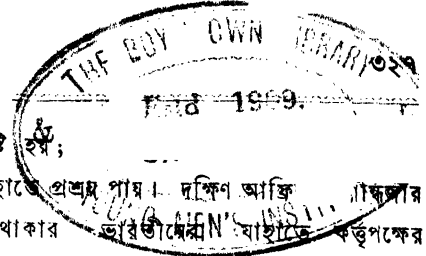
এই সকল তরুণ যদি তাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুপথ পায়, তাহা হইলে ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লবনীতি তাহারা প্রত্যাহার করিবে। এই জন্য তিনি বাংলা হইতে দুই সহস্র যুবকের সেবাবাহিনীগঠনের বাণী ঘোষণা করেন। কিন্তু তাৎকালীন দেশনেতাদের কণ্ঠে ইহাতে তেমন সাড়া উঠে নাই এবং যে কয়েক শত যুবক এই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য আবেদন করিয়াছিল, বাংলার তরুণ বিপ্লবীর সংখ্যা তাহার মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। অবস্থা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

সেবা-বাহিনীগঠনের আহ্বান শুনিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের এই বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা এই সমস্যার সিদ্ধান্ত স্থির করার জন্য পূর্ব্বে এক পরামর্শ-সভার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আমরা সেদিন কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি নাই। শ্রীঅরবিন্দ যে সুস্পষ্ট অভিমত পত্রযোগে পাঠাইলেন, তাহা তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করিতেন এবং উদীয়মান জাতিকে কি ভাবে গড়ার আকৃতি রাখিতেন, এই পত্রখানিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে—ইহা অবশ্য ২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

তাঁহার সেই সুচিন্তিত সঙ্গতিপূর্ণ রাজনীতিক সিদ্ধান্ত আর অপ্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে এবং এই পত্রের মধ্যে তাঁহার যে সঙ্কেতপূর্ণ ভবিষ্য নির্দ্দেশ ছিল, তাহা আমার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমি পত্র-খানির মর্ম্ম যথাসম্ভব এইখানে সন্নিবেশিত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছিলেন "দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধির রাজভক্তি-মূলক যে নীতি, তাহা ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। বাংলার সেবাবাহিনীগঠন নিছক রাজভক্তিরই নিদর্শন, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর কর্ম্ম তবুও কতকটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি কর্ত্তৃক পরিশোধিত। দাসমনোবৃত্তির হীন রাজভক্তি রাষ্ট্রনীতিক কৌশল নহে, এবং ইহা আদৌ উত্তম নীতি বলিয়াও গ্রাহ্য হয় না। প্রতিপক্ষকে ইহার দ্বারা প্রতিহতও করা যায় না; শত্রু নিরস্ত্রও হয় না। বরং এই নীতির দ্বারা জাতির স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই বাড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়; চাতুরীই ইহাতে প্রশ্রয় পায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজীর উদ্দেশ্য—তথাকার ভারতীয়েরা যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ সদয় ব্যবহার লাভ করে, অবশ্য এই কার্য্যের ফলে গান্ধিজীর আরও বড় কিছুর প্রতীক্ষা আছে। ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী নহে। এখানে রাজভক্তি বা অ্যাম্বুলেন্স দল গঠন আমাদের আদৌ উপযোগী নহে। ভারতের সেবাবাহিনী গঠন করিয়া রাজভক্তি প্রদর্শনের কোনই হেতু নাই।"

ইহার পর তিনি জাতির লক্ষ্য সম্বন্ধে তর্জ্জনী দেখাইয়া যেন বলিয়াছেন "ভারত কিছুর সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাগে নাই। আমাদের জাগরণ—জাতি গড়িবার জন্য। ইংরাজীতেই তাঁর মূল বাণীটুকু উদ্ধৃত করি—"Not to secure a few privileges but to create a nation of men, fit for independence and able to secure and keep it."

এই কথার পর তিনি স্পষ্ট করিয়াই ভারতের জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চারিটি নীতি উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রথম, চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা (eventual independence); দ্বিতীয়, "যেখানে অধিকার নাই, সেখানে সহযোগিতা নাই (no co-operation without control); তৃতীয় "কথায় ও কার্য্যে পুরুষোচিত সাহস। (a masculine courage in speech and action) এবং চতুর্থ "প্রকৃত অধিকার পাইলে, তাহা গ্রহণের তৎপরতা এবং তাহার জন্য যথার্থ মূল্য দেওয়া, তাহার অধিক নহে। (Readiness to accept real concessions and pay their just price, but no more.)

স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য রাখিয়াই জাতির জাগরণ। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছিলেন "আমাদের স্বীকার করিতে হইবে—এই স্বাধীনতা এখনই সম্ভবপর নহে। ইহার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। ইতিমধ্যে কোন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে বৃটিশশাসন-রক্ষার জন্য আমাদের উদ্যত থাকিতে হইবে। কারণ, ইহার দ্বারা নিজেদেরই ভবিষ্য স্বাধীনতা রক্ষা

করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট যদি স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী-গঠনে সম্মত হন, এমন কি বয়-স্কাউট সংহতি-গঠনেও হস্ত প্রসারিত করেন, আমরা সেখানে দলে দলে যোগ দিব। কিন্তু সেবাবাহিনীগঠনের ডাকে আমরা কোন মতেই সাড়া দিব না।"

বেলুড় মঠের শরৎ মহারাজ লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণা-পত্র পড়িয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তরুণের সেবা-বৃত্তির আদর্শপূর্ত্তি লক্ষ্যে রাখিয়া যুবকদের উৎসাহ দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "ইউরোপের রণক্ষেত্রে নির্ব্বাক্ আত্মবলির ভিতর দিয়া জাতির সেবাবৃত্তির অনুশীলন কষ্টকল্পনা। সেবাবৃত্তির অনুশীলন আমরা জীবনের প্রতি পদে করিতে পারিব। ইউরোপের যুদ্ধে সামরিক শিক্ষালাভের জন্যই যাওয়ার প্রয়োজন আছে। যদি গভর্ণমেণ্ট টেরিটোরিয়াল্‌স্ অথবা স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী, এমন কি বয়েস্ স্কাউট দল-গঠনের অভিলাষী হয়েন, আমরা ইহার পরিবর্ত্তে কোন প্রতিদানের দাবীই করিব না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এক টেরিটরিয়াল্‌স্ ছাড়া বয়-স্কাউট ও ভলাণ্টীয়ার দলের উপর সামরিক শাসন ভিন্ন গভর্ণমেণ্টের অন্য কোনই কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না।"

তাঁহার পত্র লইয়া সারা রাত্রি বিচার-বিতর্ক চলিল। নানা চিন্তায় আমাদের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। সেবাবাহিনী-গঠনের সঙ্কল্প গভর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেরই প্রয়োজন ছিল না। গভর্ণমেণ্ট যখন সেনাবাহিনী গঠন করিতে চাহিবেন, তখন ব্যাপারটা বুঝা যাইবে—এই স্থির করিয়া আমাদের সভার কার্য্য সেই রাত্রির মত শেষ হইল।

বর্ষার আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল। শারদ প্রভাতের অরুণবর্ণ সূর্য্যকিরণ দেখিয়া মনে পড়িল—বাংলার ঘরে ঘরে এইবার মায়ের বোধন-মন্ত্র উচ্চারিত হইবে। আমার শূন্য দালান দশভুজার আবির্ভাবে কি এবারও নবশ্রী ধারণ করিবে?

দরিদ্রের সংসার—মহালয়ার পর প্রতিদিন প্রভাতে [illegible]

শয়নগৃহ, বৈঠকখানা, গৃহাঙ্গণ সুনিপুণ করস্পর্শে অপূর্ব্ব শ্রী ধরে। বর্ষার প্রভাতে মঙ্গলঘটে গঙ্গাবারি পূর্ণ করিয়া, প্রবেশদ্বার হইতে সর্ব্বত্র জলসিঞ্চনে তিনি অভিষিক্ত করিলেন। জগজ্জননী মহাদুর্গা আসিবেন, তাহারই আবাহন-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম "মা আসিবেন, খবর পাইয়াছ নাকি?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "মা আসিবেন না? সারা বর্ষ ধরিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছি, মা আসিবেন। তাই কোথাও ময়লা না থাকে দেখিয়া বেড়াই।"

এ এক অপূর্ব্ব ভাব! হউক কল্পনা, কিন্তু বাস্তব রূপের যে পবিত্র দ্যোতনা এই অনুভূতির স্পর্শে চক্ষে পড়িয়াছে, তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। তবুও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা আসিবেন, কোথায় গিয়াছিলেন? কোথা হইতেই বা আসিবেন?"

তিনি বলিলেন "তোমাদের বুদ্ধি আছে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস কম। তিনি আসিবেন সাড়া পাইতেছি, সংবাদ পাইতেছি; হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতেছি; কোথা হইতে আসিবেন, সে উত্তর জানার আর দরকার কি?"

বাড়ীতে যখন প্রতিমা আসিত, তখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রতিমা আনার সাধ্য যখন রহিল না, সে দিনও মহাপূজার সময়ে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি; আর আজ এ মন্দিরে মহাকালীর আসন পাতিয়া নিয়ত পূজার যুগেও এই পর্ব্বকালে তাঁহার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে ভাবিয়াছি—জীবনের তালে তালে মহাকালীর যে চরণচ্ছন্দ, তাহা তো অনাহত; আজ অকস্মাৎ নূতন আবির্ভাবের মত দেবীর আগমন-কল্পনা মনেরই বিলাস নহে কি? কিন্তু সে রূপ দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছি—দেবী আসেন। ঘটে-পটে-প্রতিমায় তিনি হয়তো বিশেষ-ভাবে, এই বিশেষ দিনে আবির্ভূতা হন। কিন্তু আমার এই জীবন্ত প্রতিমায় পূজার যে ধুম দেখা দেয়, তাহা তো অস্বীকার করিতে পারি না! কালও তো এই লালিমা, এই ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্যে পড়ে নাই! সপ্তমীর প্রভাতে এই প্রতিমার আরও আনন্দময়ী মূর্ত্তি, অষ্টমীতে আরও, নবমীর প্রভাতে সে রূপশ্রী ইহাঁতে পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিবে। বর্ষে বর্ষে ইহাই দেখিয়াছি। আজ আমার নূতন সংসারে তিনি কি

অপূর্ব্ব শ্রী ধরিবেন, তাহার জন্য চিত্ত আমার উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল।

তিনি প্রাণময় জল ছড়াইতে ছড়াইতে, হাসিয়া বলিলেন "আজ মা আসিবেন, কিন্তু আমাদের বাড়ী নয়, হাড়ীদের বাড়ী রাত্রি যাপন করিবেন। কাল প্রভাতে —বুঝেছ—"

সে আবেশবিভোর নয়নপল্লবে ভক্তিবিশ্বাসের ঝরণা যেন ঝরিয়া পড়ে। বহির্দ্বারে বামাকণ্ঠে কে বলিল "পেতে ধুচুনী লিবেক মা?"

মলিন-বস্ত্রা, রুক্ষকেশা, কর্কশশ্রী হাড়ীর মেয়ে বাঁশের চাচ্ তুলিয়া ধুচুনী, পেতে, ফুলের সাজি কাঁকে পিঠে করিয়া হাঁকিতেছে—"পেতে-ধুচুনী লিবেক মা?"

ওষ্ঠপুটে রহস্যময় হাসি! ষষ্ঠীর প্রভাতে পাঁচ পয়সায় এক জোড়া পেতে খরিদ করিয়া তিনি সগর্ব্বে অন্তঃপুরের দিকে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া গেলেন "আমার মা আসিতেছেন। এ পেতে কেনা নয়, পাঁচ পয়সা মায়ের পূজা দিলাম, বুঝ্‌লে?"

সারাদিন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার প্রদীপের আলোয় সে অনিন্দ্যমুখে লাবণ্যের তুলি আর এক পোঁচ কে যেন মাখাইয়া দিয়াছে। কলায় কলায় চন্দ্রের সৌন্দর্য্যই বাড়ে, দেবীপক্ষের প্রতিদিন আমার গৃহ-দেবীর এই সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি অতি অপূর্ব্ব—অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে হৃদয় ভরাইয়া দেয়।

আমি নিঃস্ব, অর্থহীন। সংসারে থাকিতে প্রতি বৎসর এইদিন পূজার বাজার করিয়া আনিতাম। নূতন বস্ত্র প্রতি জনকে দিয়া একখানি মনের মত লাল পেড়ে শাড়ী তাঁহার করকমলে অর্পণ করিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিতাম। দেবীর আগমনের এই সন্ধিসন্ধ্যায় পরমানন্দের মধ্যে নয়নে বোধহয় অভাবের এক ফোঁটা অশ্রুও বাহির হইতে চাহিতেছিল। পলকে তিনি তাহা বুঝিয়া লইলেন। সন্ধ্যার প্রদীপে আজ যে আনন্দের শিখা জ্বলে, তাহাতে নিরানন্দের ছায়া কেন? তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তুমি বিষণ্ণ কেন?"

এই পূজার দিনে একখানি নব বস্ত্রের অতি ক্ষুদ্র দাবী আমার হৃদয়কে পীড়িত করিতেছিল। নিজেকে অকৃতার্থ মনে হইতেছিল। মানুষের এ দুর্ব্বলতা বুঝি বর্জ্জনের বস্তু নয়। আমার মনের কথা তিনি বাহির করিয়া লইলেন; তারপর সান্ধ্য-প্রণাম চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন "আমি তো কিছু চাহি না। কাছে বসিয়া আমার সময় নষ্ট করিও না, রাত্রির খাওয়া তো আছে!"

মৃদু হাসিয়া তিনি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে অন্ধকারে পদচারণা করিতে করিতে অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিলাম—

"আমি ছিলাম গৃহ-বাসী,
করিলি সন্ন্যাসী
আর কি করিবি কেলে সর্ব্বনাশী—"

রাত্রি ঘন হইলে, বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছি—মাঝের দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া আওয়াজ হওয়ায় উঠিয়া গেলাম—তিনি হাতে দিলেন একখণ্ড কাগজ। আলোয় মেলিয়া দেখিলাম—পেন্সিলে অস্পষ্ট বাঁকা-বাঁকা অক্ষরে এই কয় ছত্র লেখা:—

"কেত্তন করিতে করিতে যেমন বলিয়াছিল—ভেঙ্গে দিব তোমার কুলেরই কথা, আমিও তেমনি উড়ুনি পরে' সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিলুম।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী"

"পুঃ—আমি হাসিমুখেই দিলাম, এতে আমার কোন কষ্ট নাই।"

হই আত্মসর্পণযোগী—ঈশ্বরের যন্ত্র মেধা, হৃদয়, প্রাণ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র লিপিটুকুর মধ্যে আমার দারিদ্র্য-দুঃখের উপর যে অমৃতপ্রলেপ দিবার ব্যাকুলতা তাঁর হৃদয়ে রূপরসে সে দিন লীলায়িত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়া চক্ষের অশ্রু বারণ মানে নাই। পূজার দিনে নব-বস্ত্র দিবার যোগ্যতা স্বামীর নাই। পত্নীর প্রাণে সে দুঃখের তাড়না ক্ষুণ্ণতা আনিল না, রূপান্তরিত হইয়া আমায় সান্ত্বনা দিল, এই শিক্ষাহীনা নারীর মহত্ত্বপূর্ণ হৃদয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। তাঁর কথাগুলির মধ্যে আমারই একটী কাহিনী নিহিত ছিল। সেইটী উপলক্ষ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন—"তুমি দুঃখ করিও না, আমি তোমার উড়ুনী পরিয়াই লজ্জানিবারণ করিব;

কেমন করিতে যাইতে যেমন
বলিয়াছিল ভেবেছেন
তোমায় ফুলেশ্বরী কথা
আমিও তেমনি উ চুনি
পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে দিলুম
শ্রীমতী যশোরানী দে
পু: আমি হাসিমুখেই
দিলুম এতে আমার
কোন কষ্ট নেই।

ইহাতে আমার দুঃখ নাই, তোমার হাসিমুখই আমার জীবনের আলো ও আনন্দ।"

সপ্তমীর প্রভাতে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অনুভব করিলাম—দেবী আসিয়াছেন বৈ কি, এত তৃপ্তি, এত প্রসন্নতা তাহা না হইলে কোথা হইতে আসিল?

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি চক্ষু বুজিয়া শুইয়া থাকিতেন; আমি নিদ্রাভঙ্গে বহির্ব্বাটী হইতে আসিয়া রুদ্ধদ্বারে টোকা মারিতাম। তিনি চক্ষু মুদিয়া, খিল খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন "সাড়া দাও—তুমি তো?" কত ব্যঙ্গ-কৌতুকের পর চক্ষু উন্মীলিত করিতেন। প্রভাতের প্রথম দৃষ্টিটুকু স্বামীর জন্যই তাঁহার তোলা থাকিত। সপ্তমীপ্রভাতে মধুধারা বহিয়া গেল। আমি তাঁহার শয্যাধারে বসিলাম। আমি তখন কত কি ভাবিতেছিলাম।

"ছোড়দিদি, যাব?"

মেজ বৌয়ের কণ্ঠস্বর। মেজ-বৌ ঘরে প্রবেশ করিল। হাতে তার সিঁদুর, আল্‌তা, রুলি, আর নব বস্ত্র। একছড়া ফুলের মালা আমার গলায় দোলাইয়া, সে ভুনত প্রণাম করিল। তারপর সে বসিল ছোড়দিদির প্রসাধনে। সে অপার্থিব দর্শন দুটা চোখে দেখা যায় না। আমি তাই বাহিরে আসিয়া হাঁক্ ছাড়িলাম।

সপ্তমীর মধ্যাহ্নে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা। এত অমৃত আস্বাদ–মহেশ্বরীর প্রসাদ বৈ কি! গৃহলক্ষ্মীর পরিধানে নববস্ত্র। চরণ অলক্তরঞ্জিত, ললাটে সিন্দুরবিন্দু। এই রূপ দেখিবার নহে, ধ্যানের। আমার সপ্তমীর রাত্রি নেশাখোরের মত বিভোর হইয়াই কাটিয়া গেল।

অষ্টমীর প্রভাতে মেজ-বৌ আসিয়া জানাইল "আজ ঠাকুরের নিমন্ত্রণ—মধ্যাহ্নভোজনের।"

ছোড়দিদি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার মুখে 'হাঁ না' কিছুই নাই। আমার চিত্ত মহাদুর্গোৎসবের আনন্দে হারাইয়া গিয়াছে। ভোজনের পর মেজ-বৌয়ের বাড়ী হইতে ফিরিলাম—নূতন ধুতি, নূতন চাদর, ললাট শ্বেতচন্দনলিপ্ত। তিনি দেখিয়া বলিলেন "মেজ-বৌ বড় হারাইয়াছে; আচ্ছা দেখে নেব, এক পৌষে জাড় পালায় না!" এই কথার অর্থ সে দিন বুঝি নাই।

পূজা শেষ হইল অন্তর্যোগে, অধ্যাত্ম-উপচারে,—বুকে আঁকিয়া দিয়া গেল এক অভিনব চৈতন্যের অনুভূতি। সম্মুখে আসন্ন পরিবর্ত্তনযুগ।

শরৎ গেল, হেমন্ত আসিল। ইউরোপের রণডঙ্কা কাণের কাছে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমার চিত্ত কিন্তু লাট্টু খাইতেছে পরমানন্দে—কোন এক ঊর্দ্ধ-চেতনার স্তরে। তারপর একদিন প্রভাতে শীতের আড়ষ্ট মূর্ত্তি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—আমি আসিয়াছি জীবনের আর এক অঙ্কপাতের সূচনা হাতে করিয়া।

পিতৃদেব কয়দিন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। নানা উপসর্গ। চিকিৎসকেরা আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। পীড়া কিছু গুরুতর বলিয়া কেহই রায় প্রকাশ করিলেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে ডাক আসিল ; দেখিলাম তাঁহার শূন্য ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, নীথর শৈলখণ্ডের ন্যায় শয্যার উপর স্তব্ধ কলেবর। তাঁহার ললাটে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলাম "কেমন আছ ?"

তিনি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন "বস, কথা আছে।"

আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তাঁহার কথা আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলাম। কোন যোগ্যপুত্রের সম্মুখে পিতা অকপটে জীবনের আত্মকাহিনী এমন করিয়া বলিতে পারেন, সে ধারণা আমার ছিল না। বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নপুটে যেন অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিতেছিল ; আমিও নয়নবারি সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। সুকৃতি অপেক্ষা জীবনের দুষ্কৃতির দিক্‌টাই এমন আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছিলেন, যেন মনে হইতেছিল—কোন এক আগ্নেয়গিরি তাহার গর্ভস্থিত জালাময় অংশটাকে নিঃশেষে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, চিরদিনের জন্য শান্তিশীতল মূর্ত্তি ধরিতে চায়। ঠিক তাহাই হইল। তাঁহার কথা শেষ হইলে, দেখিলাম—তাঁহার ললাটে অরিষ্টযোগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেন হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া সন্তানের কাছে জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া আজ মুক্তিপ্রার্থী। শ্বাসকষ্ট লক্ষ্যে পড়িল। নাড়ী টিপিয়া স্পন্দনের ভেকগতি অনুভূত হইল। অগ্রজকে ডাকিলাম। বৈঠকখানায় কয়েক জন বন্ধুরা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সব কথা বলিলাম। গৃহদেবী শুনিয়া বলিলেন "তুমি সব কাজেই বড় ব্যস্ত হও। এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আসিয়াছি। তুমি জীয়ন্ত মানুষ মারবে না কি ?"

এ দুর্নাম আমার ছিল। রোগীর শুশ্রূষায় আমার বড় আনন্দ হইত। কিন্তু যেই আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিতাম, আমি উতলা হইয়া উঠিতাম। মৃতদেহ লইয়া আত্মীয়-স্বজনের হাহাকার আমার ভাল লাগিত না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হইয়াছে, মুমূর্ষু ব্যক্তি আমার কাঁধের উপরই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছেন। অরিষ্টলক্ষণাদি আমার কিছু জানা ছিল। খুব জিদ্ হইল, পিতাকে আমি গৃহ-মধ্যে মরিতে দিব না! আমি তাঁহাকে সঙ্গীদের সাহায্যে বিছানাশুদ্ধ তুলিয়া লইলাম। তিনি কাতর-কণ্ঠে বলিলেন "কোথায় লইয়া যাও ?" গৃহ হইতে বাহির করার সময়ে দরজার শিকল ধরিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার শিথিল করমুষ্টি ছাড়াইয়া লইলাম। সিঁড়িতে নামিবার সময়ে তিনি আবার দরজার বাজু চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু আমার সহিষ্ণুতা ছিল না, অতি শীঘ্র যেন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে হইবে—এইরূপ প্রেরণার ঝঙ্কার অন্তরে উঠিতেছিল। বহিঃপ্রাঙ্গণে তাঁহাকে নামাইলাম, বলিলাম—"গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করুন।" জোড়করে তাহা তিনি করিলেন। আমার স্ত্রী আসিয়া তাঁহার মুখে জল দিলেন, ললাটে চন্দন লেপিয়া তুলসীপত্র সাজাইয়া দিলেন। আমরা তারক-ব্রহ্ম নাম করিতে করিতে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলাম।

পৌষ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। আকাশের চন্দ্র হিম-জালে জড়াইয়া অপরূপ শোভা ধরিয়াছে। শষ্পাচ্ছাদিত গঙ্গাতটে আসিয়া তাঁহাকে ভূমিশয্যার উপর স্থাপন করিলাম। ঘন ঘন শ্বাস লইতে লইতে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; আমি জ্যোৎস্নপ্লাবিত কুহেলিকাময়ী গঙ্গোত্রী-ধারার দিকে সঙ্কেত করিয়া বলিলাম "ঐ কলুষনাশিনী জাহ্নবীধারা, আপনাকে এইবার আমি গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাইব।"

গঙ্গাসৈকতে তাঁহাকে শয়ান করাইলাম। শীতের শিহরণে ভাগীরথী শীর্ণকায়া হইয়াছেন। সবেমাত্র জোয়ার আসিতেছে। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় গঙ্গাদেবী তটদেশে যেন সেইরূপ তরঙ্গোচ্ছ্বাসের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলারতা। প্রথম একটী তরঙ্গ পিতৃদেবের চরণস্পর্শ করিল ; তারপর একটী একটী করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহার চরণযুগল জাহ্নবীসলিলে নিমজ্জিত হইল। মুক্ত উদার দৃষ্টি অনন্তনীলের দিকে চাহিয়া সব স্থির হইয়া আসিতেছিল। উচ্চকণ্ঠে আমরা তখন নাম কীর্ত্তন করিতেছি। অর্দ্ধ অঙ্গ জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ স্থলে, আর তালে তালে ঈশ্বরীর নাম-কীর্ত্তনে জীবের দেহান্তর—পূজনীয় জনকের এই মহামৃত্যোৎসব, আমি অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া গাহিতে লাগিলাম—

জয় জগদীশ হরে।
জয় জগদীশ হরে।
জয় জগদীশ হরে॥

পিতার জীবন-দীপ নিভিল। অতীতের অঙ্কপাত এইখানে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ জীবনের নূতন অঙ্ক সংযোজন করিল।

— ক্রমশঃ

স্পেন-গৃহ-বিবাদের যবনিকাপাত

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের সম্প্রতি যবনিকাপাত হইয়াছে। এই ঘরোয়া যুদ্ধ ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক কাল হইতেই স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিবাদ সর্ব্বদাই আন্তর্জ্জাতিক বিবাদে পরিণত হইত। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বিভিন্ন দল উপদলের বিবাদের অছিলায় পূর্ব্বকাল হইতেই শক্তিপুঞ্জের ভারসাম্য (balance of Power) বজায় রাখিতে ইংলণ্ড, ফরাসী ও প্রাচীন জার্ম্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত। স্পেন রাজ্যের উত্তরাধিকার উপলক্ষ্য করিয়া আরও কয়েকবার ঐরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। উহাকে War of Spanish Succession বলে। ইতিহাস পাঠকেরা সে বিবরণ জানেন। বর্ত্তমান ব্যাপারও প্রথমে দক্ষিণ ও বামপন্থিগণের বিবাদে আত্মপ্রকাশ করে। বিদ্রোহী জেনারেল ফ্রাঙ্কো দক্ষিণপন্থিগণের এবং প্রেসিডেণ্ট সেনর আজানা বামপন্থিগণের নেতা হিসাবে আসরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু বিবাদ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ড, ফরাসী ও রুশিয়ার স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে বামপন্থিদের অর্থাৎ স্পেন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এবং ইটালী ও জার্ম্মানীর সৈন্যগণ দক্ষিণপন্থিগণের অর্থাৎ বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়াছেন। সুতরাং এখন আর ইহাকে স্পেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলা যাইতে পারে না। স্পেন এই ব্যাপারে বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। উহা পৃথিবীব্যাপী ভাবী মহাসমরের উদ্যোগ-পর্ব্ব। সম্প্রতি ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সংগ্রাম শেষ হইয়াছে এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিজয়ী হইয়া সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ফরাসী এত চেষ্টা করিয়াও শক্তিপুঞ্জের ভারসাম্য বজায় রাখিতে পারিলেন না;—ইটালী ও জার্ম্মাণী ওজনে ভারী হওয়ায় ঐ ভারকেন্দ্র ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে হেলিয়া পড়িতেছে (deflecting towards the right)। উহাতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে হিটলার ও মুসোলিনীর প্রভাবই ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগের সাধারণ নির্ব্বাচনে বামপন্থীদল জয়ী হইয়া স্পেনের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ নির্ব্বাচন বিধিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া উহার বিপক্ষে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। বামপন্থী দলে অনেকগুলি উপদল ছিল। তাহাদের মধ্যে ষ্টালিনপন্থী কম্যুনিষ্ট, ট্রট্স্কিপন্থী কম্যুনিষ্ট, সমাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, এনার্কোসিণ্ডিকেলিষ্ট প্রভৃতি বহুবিধ প্রগতিশীল দল ছিল। দক্ষিণপন্থিগণের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট, রাজতন্ত্রী এবং ক্যাথলিক দলগুলি ছিল। নির্ব্বাচনের পরই কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া প্রায় এক হাজার গির্জ্জা জ্বালাইয়া দেয় এবং প্রায় তিন সহস্র ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে পেট্রোল দিয়া পুড়াইয়া মারে। অথচ গবর্ণমেণ্ট বা পুলিশ ঐ হাঙ্গামা নিবারণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে পারে নাই। কারণ ঐ উন্মত্ত জনসাধারণের ভোট পাইয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। যদিও ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণের ভণ্ডামীর জন্য উহাদের বিপক্ষে জনমত জাগ্রত হইয়াছিল এবং স্পেনের সমাজ ব্যবস্থার নিন্দনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহ ঘোষণা করা অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়; কিন্তু এস্থলে জনসাধারণের ভোটে বির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্টের স্থিতিকালে ঐ প্রকার উন্মত্ত আচরণ সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের আচরণ আরও অধিকতর নিন্দনীয়। সরকারী তক্তে বসিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অসমর্থ গবর্ণমেণ্টের তখনই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। পার্লিয়ামেণ্টে দক্ষিণপন্থিদের নেতা সটেলো ঐ বীভৎস ব্যাপারের প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করেন। ফলে ঐদিনই রাত্রিতে একদল কমিউনিষ্ট তাহাকে গুলি করিয়া তাহার মৃতদেহের উপরেও অসম্মানজনক ব্যবহার করে। উহাতে দেশে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রমুখ কয়েকজন সেনাপতি ঐ প্রকার বীভৎস ব্যাপারের প্রতিকার করিবেন বলিয়া শপথ করেন। তার কয়েকদিন পর হইতেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে এদেশে অনেককে দেখা যায় যাঁহারা ডিমোক্রেসির দোহাই দিয়া স্পেন গবর্ণমেন্টের কোনও দোষ দেখিতে নারাজ। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে প্রত্যহ মাদ্রিদ্ সহরে গড়ে প্রায় দুইশত লোককে বিনা বিচারে সন্দেহ বশতঃ হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রকাশিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে সাধারণতঃ জেনারেল ফ্রাঙ্কোকেই নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। কোনও দল বিশেষের উপর আদর্শগত ঐক্যের জন্য মমতা প্রদর্শন করা রাজনীতিক উদ্দেশ্যের অনুকূল হয় বটে; কিন্তু অপক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে ঐ সব লিখার ইতিহাসের দিক হইতে কোনও মূল্যই থাকে না। গণতন্ত্রী স্পেনের শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের আইন সভার বিপক্ষদলের ধনপ্রাণ নিরাপদে রাখিতে যে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধেও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ অস্বাভাবিক হয় নাই। গৃহযুদ্ধে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচুর নিষ্ঠুরতা পরিদৃষ্ট হয় এবং স্পেনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উভয় পক্ষই চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিয়াছে।

বিদ্রোহীপক্ষ স্পেনের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু মাদ্রিদ, ক্যাটেলোনিয়া, বিলবাও প্রভৃতি স্থানে তাহারা ব্যর্থকাম হয় এবং মরক্কো, সিভিল, বুর্গোস্, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তাহারা সাফল্য লাভ করে। পরে ঐ সমস্ত অধিকৃত স্থানে ঘাটি করিয়া অবশিষ্ট স্পেন বিজয়ে বিদ্রোহীরা অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা বুর্গোসে একটী অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করে। তারপর হইতেই সমস্ত স্পেন বিজয়ের জন্য বিদ্রোহীদের সত্যকার অভিযান আরম্ভ হয়। ১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগে বিদ্রোহীদের উত্তর দিকে ছিল বুর্গোস ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ এবং দক্ষিণ-দিকে ছিল সিভিল ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ। তাহাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র ছিল না। উত্তর দিকে সেনা পরিচালনা করিতেন জেনারেল মোলা এবং দক্ষিণ দিকে স্বয়ং জেনারেল ফ্রাঙ্কো। এই দক্ষিণ শাখা ১৯৩৬ সালের মধ্যভাগে বেভাজোজ অধিকার করিয়া পর্ত্তুগালের সীমানা লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং দ্রুত অগ্রসর হইয়া টলেডো পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। ঐ স্থান হইতে মাদ্রিদ প্রায় ৩০ মাইল। বিদ্রোহীদের উত্তর বাহিনীও ঐ সময়ে গুডালজারা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মাদ্রিদের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ সময় সকলেই মাদ্রিদের পতন আসন্ন বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের ভারসাম্য বিধানের জন্য ফরাসী বামপন্থী প্রধান মন্ত্রী লুই ব্লাম স্পেন গবর্ণ-মেণ্টকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হন। উহাতে জার্ম্মান পররাষ্ট্র বিভাগ ইংলণ্ডকে অবস্থার গুরুত্ব জানাইয়া দেয়। ফলে ইংলণ্ড পরিষ্কারভাবে ফ্রান্সকে বলিয়া দেয় যে, স্পেনের ব্যাপারে যদি ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায় তাহা হইলে ইংলণ্ড ফরাসীকে সাহায্য করিতে পারিবে না। কারণ ইংলণ্ড তখন অপ্রস্তুত। ফলে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর 'নন ইণ্টারভেন্‌শন্ কমিটি' নামক একটা বিরাট প্রহশনের অভিনয় হইতে থাকে। ঐ কমিটির উদ্দেশ্য হইল যাহাতে স্পেনের বিপদ স্পেনেই আবদ্ধ থাকে এবং ইউরোপে ছড়াইয়া না পড়ে। এজন্য স্পেনের কোনও পক্ষকে অন্য কোনও রাষ্ট্র সামরিক সাহায্য করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ কমিটির আওতায় ইংলণ্ড, ফরাসী ও রুশিয়ার বহু স্বেচ্ছা-সৈনিক স্পেন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যোগদান করে। এবং ইটালী ও জার্ম্মানীর অজস্র ফ্যাসিষ্ট বাহিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে প্রেরণ করে।

স্পেন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়াছিল। কারণ তাহা না হইলে ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই মাদ্রিদের পতন হইত। তাহা ছাড়া আইরান্, সেণ্টসিবাষ্টিয়ান, প্রভৃতি দুর্গগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল—সুধু সুশিক্ষিত ফরাসী সেনানীগণের বাহুবলে ও সুপরিচালনার ফলে। যাহা হউক উভয় পক্ষ বৈদেশিক সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যপুষ্ট হওয়ায় ঐ গৃহযুদ্ধ ১৯৩৬ সালে শেষ হইতে পারে নাই। পূর্ণ তিন বৎসর পরে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিজয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

স্পেনের বিবদমান দুইটি দলের পক্ষে ও বিপক্ষে ইউরোপে ও এদেশে বহু মিথ্যা প্রাচারকার্য্য হইয়াছে এবং হইতেছে। অনেকেই একথা প্রচার করিয়াছেন যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয় স্পেনের পরাধীনতারই নামান্তর। কারণ ফ্রাঙ্কো, হিটলারও মুসোলিনীর তাবেদার মাত্র। কিন্তু এই সব উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকার্য্যের মিথ্যার মুখোস কালের গতিতে আপনিই খুলিয়া পড়িবে। কে জানে হয়তো শক্তির সদ্ব্যবহারে স্পেনের সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি পরাক্রান্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পরিচালনায় আরও গরীয়ান্ হইয়া শোভা পাইবে। ইউরোপের বর্ত্তমান কুটিল রাষ্ট্র-পরিস্থিতিতে শক্তিসমষ্টির সাম্য রক্ষা করিতে স্পেনের সহযোগিতার প্রত্যাশা সকলেই করিবে।

সাময়িকী

পরলোকে ডাঃ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুচিকিৎসক নীরবকর্ম্মী ও দানবীর ডাঃ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৮২ বর্ষ বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। পানিহাটীর সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান গোপালচন্দ্র স্বকীয় মাহাত্ম্যে তাঁহার বংশের শতগুণ মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। জীবিত অবস্থায় সম্পত্তির

৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রায় সব দান করা খুব কমই শুনা যায়। মহাপ্রাণ ডাঃ গোপালচন্দ্রের জীবনে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাণিহাটীতে দাতব্য হাঁসপাতাল স্থাপনে তাঁহার লক্ষ টাকা দান মধ্যবিত্ত-ঘরের ডাঃ গোপালচন্দ্রের মহাপ্রাণতার বিশেষ পরিচয় দান করে। কর্ম্মদক্ষতা ও চরিত্র মাহাত্ম্যের জন্য এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইতে সিভিল্ সার্জ্জণের পদে তিনি উন্নীত হন। এ সম্মান লাভ বাঙালীর সেই প্রথম। তাঁহারই দৌলতে বাঙালী সেই সুযোগ আজও উপভোগ করিতেছে। ১৮৮৩-১৯১৫ পর্য্যন্ত তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণকালে তিনি রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১৬ খৃঃ পাশ্চাত্য দেশের মেডিকেল স্কুলসমূহের বিধি, নিয়ম, পরিচালন, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতির অভিজ্ঞতার্জ্জনের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং এই সম্বন্ধে তিনি যে মূল্যবান পরামর্শ দেন তাহাও সাদরে গৃহীত হয়।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে অনুরাগী তিনি চিরদিনই ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেও সদানন্দ গোপাল বাবুকে দেখিয়া মনে হইয়াছে, এখনও ইঁহার সঙ্গ পাওয়া যাইবে বহুদিন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে একটা মহৎ হৃদয় সংসার হইতে চলিয়া গেল। ভগবৎ চরণে তাঁহার আত্মা বিলীন হইয়া পরাগতি লাভ করুক—হে-ভগবান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানলাভ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ডক্টর সত্যচরণ চ্যাটার্জ্জি (রাঁচি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের লেক্‌চারার) এবং মুকুন্দ মুরারী চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা সায়েন্স কলেজের লেক্‌চারার) এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ পাইয়াছেন। ডাঃ চ্যাটার্জ্জি 'ভূতত্ত্ব' (Geology) এবং মুকুন্দবাবু পশুতত্ত্বের (Zoology) উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া এই বৃত্তি পাইয়াছেন।
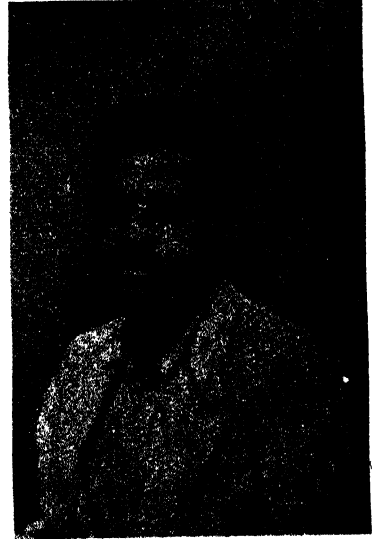
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভড়

"আয়নোস্ফীয়ার" বিষয়ের উপর মৌলিক গবেষণামূলক 'থিসিস্' প্রদানের ফলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভড় মহাশয় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এপ্‌লটন্, চ্যাপম্যান ও ডাঃ মেঘনাথ সাহা তাঁহার এই থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন। যতীন্দ্রবাবু ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী।

সঙ্ঘাশ্রমীর মহাপ্রয়াণ

সঙ্ঘের অনুরাগী সঙ্ঘাশ্রয়ী ৺তেজেন্দ্রলাল মুহুরী বিগত ১০শে মে রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় চট্টল আশ্রম-প্রাঙ্গণে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন হইতেই ইনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি চট্টল কেন্দ্রে সঙ্ঘগুরুর উপস্থিতিকালেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। সঙ্ঘপ্রীতি গুরুনিষ্ঠা, এবং উপাসনাদির প্রতি অনুরাগ শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে অবিচলিত ছিল। সঙ্ঘগুরুর নির্দ্দেশে বিগত ২৭শে মে তারিখে চট্টল আশ্রমে ৺তেজেন্দ্রলালের যথাযোগ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ঐদিন সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র চন্দননগরেও আশ্রমস্থ মাতৃমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনার পর পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-কামনা ও ৺তেজেন্দ্রলালের জীবনী আলোচনা করা হয়।

৺তেজেন্দ্রলাল মুহুরী

দফরপুর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

দফরপুর পল্লীতে (হাওড়া) ৩০শে বৈশাখ প্রাতে স্থানীয় প্রবর্ত্তক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রতিযোগিতামূলক এক ক্রীড়া ও ব্যায়াম-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। উহাতে পার্শ্বস্থ ডোমজুড় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণও যোগদান করেন। আশপাশ গ্রামের বহু ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীগণের ক্রীড়াকৌশল ও আবৃত্তি কুশলতায় বিশেষ প্রীত হন এবং শিক্ষক পরেশচন্দ্র ঘোষের সুপরিচালনার প্রশংসা করেন। হাওড়ার এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসের অঙ্কিত প্রায় ৫০ খানি চিত্রের এক প্রদর্শনী সম্প্রতি কালনা 'বাণী-মন্দিরে' অনুষ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমান মহারাজকুমার এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। উপরে মুদ্রিত 'জননী' ও 'দুই ভাই' চিত্র দু'খানি বহু দর্শকের বিশেষ সমাদর লাভ করে।

২১শে মে রবিবার শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে ৺সত্যচরণ ঘোষের যে স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া পরলোকগতের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। ৺সত্যচরণ ঘোষ দফরপুর সঙ্ঘের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার বৃহৎ স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য উপস্থিত সকলেই স্থানীয় সঙ্ঘ - সভ্যগণকে ও সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ ঘোষকে সহায়তা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক : চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন

বিগত ২৫শে মে চট্টলের চৌরাঙ্গী যতীন্দ্রমোহন এভেনিউস্থ সঙ্ঘের নিজ গৃহ প্রবর্ত্তক ভবনের দ্বিতলে শ্রীমতিলাল রায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ইহার পূর্ব্বে ৭ ঘটিকায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এই চট্টল শাখার উদ্বোধনোপলক্ষে 'যাত্রামোহন সেন হলে' শ্রীমতিলাল রায়ের পৌরোহিত্যে যে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চ্যাটার্জ্জি বাঙালীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করেন।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড : চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধন-দৃশ্য।

রায় বাহাদুর ডাঃ বেণীমোহন দাস সঙ্ঘের কার্য্যনীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের মূলে কোন ধনবাদীর মনোবৃত্তি নাই পরন্তু দেশের প্রকৃত কল্যাণকল্পে ইহা স্থাপিত। অতঃপর জাতিনির্ম্মাণ-যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর তপস্যাপূত সঙ্ঘের এই ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য, ইতিহাস ও এই নবাভিযানের মর্ম্মকথা সভাপতি মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুত ভীমজী নারায়ণ, শ্রীযুত সঞ্জীবপ্রসাদ সেন, শ্রীযুত হলধর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাথ, শ্রীযুত সুশীলকুমার চৌধুরী প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং স্থানীয় বহু উকীল, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই একবাক্যে এই শাখাকেন্দ্রের আধুনিক আসবাব-ব্যবস্থাদির প্রশংসা করেন এবং শুভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অনেকেই ব্যাঙ্কে আমানত গচ্ছিত রাখেন।

শুভ পরিণয়

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সহযোগি সভ্য চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সোমের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ পুরেন্দ্র-নাথ সোমের সহিত বাগনাননিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্রের কন্যা কল্যাণীয়া নীলিমারাণীর শুভ বিবাহ বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নবদম্পতীর এই মিলন মধুময় হউক।

ভাগ্যের পরিহাস

দীপিকায় (কুষ্টিয়া) প্রকাশ জনৈক বালকের মা একটি দুর্ঘটনার ফলে যে-পথের যে-স্থানে তাহাকে প্রসব করে, ঠিক তের বৎসর পরে ঐ বালক দ্বিচক্রযানে যাইবার সময় মোটরের আঘাতে ঠিক ঐ স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বেচারীর দুর্ঘটনায় জন্ম—দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু!

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ... [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ
১৩৪৬ সাল

শ্রাবণ

প্রথম খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

অসত্য তোমায় অসুন্দর করে, তোমায় অপ্রকাশ রাখিতে চায়। সত্য তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার প্রকাশ। তুমি সত্যকেই আশ্রয় কর।

যাহা আশ্রয় করিয়াছ, প্রলয় দেখিয়াও আত্মহারা হইও না। ধরিয়া থাক দৃঢ় হস্তে। যাহা সত্য, যাহা ঋতময়, তাহা কোন মতে ব্যর্থ করে না। ধৈর্য্যহীন হইয়া, আত্মনিষ্ঠা হারাইও না। হৃদয়ের শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ করিও না। বাহির দেখিয়া যেমন আপনাকে স্থির করা যায় না, তেমনি মনের সাময়িক অবস্থার উপরও স্থায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তত্ত্বের দিকেই লক্ষ্য রাখিও। যাহা তোমার বস্তু, যাহা তোমার লক্ষ্য, যাহা তোমার রসকেন্দ্র, তাহা হইতে চিত্ত যেন বিচলিত না হয়—দুঃখেও নয়, সুখের প্রলোভনেও নয়। রাত্রিতে তাহাকে স্মরণ রাখিও—দিবসের অসংখ্য কর্ম্ম-কোলাহলেও তাহাকে ছাড়িও না।

যুগের প্রভাব—ধর্ম্মের চেয়ে স্বার্থ বড় মনে হয়। যাহা নিত্য নহে, তাহাই আশ্রয় বোধ হয়। মানুষ ধন-কড়িই সম্বল মনে করে। এই মন যাহা বহে, তাহাই জীবনের সবখানি হইয়া যায়। মনের কেন্দ্রে এক মনোবহা নাড়ীর কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এই মনকে সতত তত্ত্ব বহন করিতেই শিক্ষা দাও। সব ফেলিয়া সে যেন ঈশ্বর-বস্তু বহিতেই শিখে। তাহা হইলেই তুমি ভাগবতময় হইবে। শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, শরীর, স্বাস্থ্য সবই তুচ্ছ—প্রধান ঈশ্বর-শরণ। কথাটা সহজ, কিন্তু এই কলিযুগে ইহাই আজ হাজার বার স্মরণ রাখার দরকার। দিবারাত্রির মধ্যে একবার সত্য আসে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সত্যই উহা অল্পক্ষণ। কিন্তু ঐ সময়ে চিত্ত যার উদ্বুদ্ধ থাকে, সে ত্রি-যুগের উপর উঠিয়া দাঁড়ায়। রাত্রির শেষ প্রহরে এখনও সত্য-যুগ আবির্ভূত হয়। ঐ সময়ে অমৃত সঞ্চয় কর। ভগবৎ-স্মরণই ইহার উপায়। তুমি কৃত-যুগের মানুষ হইবে। সময়েই বসন্তের ফুল ফুটে—অসময়ে শ্রম ব্যর্থ হয়। তাই যুগের হাওয়ায় জীবনের পাল তুলিয়া, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হও। অলসতায় মহাক্ষণ হারাইও না।

নূতন মন্ত্র

অনেকদিন পরে "আনন্দমঠের" কথা মনে পড়িল। একখানি গ্রাম্য-চিত্র। "গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক নাই। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা। পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ। কিন্তু সব নীরব…। তাঁতীর তাঁত বন্ধ, ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ, দাতার দান বন্ধ। অধ্যাপকের টোল বন্ধ। শিশুও কাঁদিতে সাহস করে না।" সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ১১৭৫ সালের দুর্ভিক্ষ-চিত্র আঁকিয়াছেন। গ্রামের জমিদার সস্ত্রীক গ্রাম ত্যাগ করিতেছেন। পথে বিপদ্ ঘটিল। স্ত্রীকন্যা অপহৃতা। কবি মহেন্দ্রের সম্মুখে স্বদেশ-জননীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। জন্মভূমির বীজ-মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' প্রবর্ত্তিত করিলেন। মায়ের রূপ "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনী, দ্রুমদলশোভিতা, ফুল্ল-কুসুমিতা। মা সুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী, সুখদা এবং বরদা। এই মা দুর্ব্বলা নহেন। সপ্তকোটী কণ্ঠ এখানে করাল নিনাদ করিতেছে। দ্বিসপ্তকোটী ভুজে খরকরবাল শোভা পাইতেছে।" মাতৃমন্ত্রের সহিত মায়ের ধ্যান ভাষার ঝঙ্কারে হৃদয় পুলকিত করে।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল মন্ত্রদ্রষ্টা দেশের যে বীভৎস দৃশ্য দুর্ভিক্ষচিত্রে আঁকিয়াছেন, আজ তাহা ক্রমে প্রত্যক্ষ হইতেছে। বাংলার গ্রামগুলির দিকে চাহিলে আমরা কি আজও দেখিতে পাই না যে, লোকে আর খাইতে পায় না! কেহ এক সন্ধ্যা খায়, আর এক সন্ধ্যা উপবাস করে। তারপর অনশনে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলে। কেহ বা রোগাক্রান্ত হইয়া আর্ত্ত কণ্ঠে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। আজও গ্রামে গোয়াল শূন্য। কৃষকেরা গরু বেচিয়াছে, লাঙ্গল জোয়াল বেচিয়া ফেলিয়াছে, বীজধান দিলে খাইয়া ফেলে। কোথাও কোথাও ছেলেমেয়ে বেচিয়াও পেটের খোরাক জুটে না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৭৬ সালের মন্বন্তর পৃষ্ঠপটে আঁকিয়া ঋষি মুক্তিযজ্ঞে জাতিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন 'বন্দেমাতরম্' সিদ্ধমন্ত্রে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী মাতৃ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। সেই মন্ত্রপ্রভাবে বাঙ্গালী অসাধারণ জীবন-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর যশোগৌরব দেশভক্তির পরিচয়ে—সারা ভারত 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে। ২৫ বৎসরের সাধনায় বাঙ্গালী সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়াইয়া যে সংগ্রামশীল জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা সারা ভারতের অনুকরণীয়, অনুসরণীয় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া লইবে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ এই মন্ত্রশক্তির যথারীতি সাধন করিয়া বলিলেন, "আমরা দেশের পূজা করিয়াছি। দেশজননীকে ঈশ্বরের আসন দিয়াছি। আমরা অনেক দূর আগাইয়াছি। কিন্তু ইহা প্রাচ্যভাবাপন্ন মনকে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে টানিয়া আনার একটা সোপান মাত্র। ইহা রূপের উপাসনা, ইষ্টের উপাসনা। পরিপূর্ণ পরমেশ্বরের আরাধনার পথে ইহা আরোহণ-পর্ব্ব। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দেমাতরম্-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছি। সমস্ত বিপদ্ হইতে মুক্তির জন্য এই মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়াছি। কিন্তু সহসা সাহস ও বিশ্বাসের হ্রাস হইয়া পড়ে। মন্ত্রের উচ্চারণ অনুচ্চ হয়; মন্ত্রশক্তি ম্লান হইয়া পড়ে। ইহাও ভাগবত ইচ্ছা। এই মন্ত্র-সাধনের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। 'বন্দেমাতরমের' অপেক্ষা মহত্তর মন্ত্র আসিতেছে। কেননা, বঙ্কিমই ভারতের জাগরণকল্পে শেষ ঋষি নহেন। তিনি কেবল মাত্র প্রাথমিক সাধন দিয়াছেন। সাধারণভাবে পূজার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিগূঢ় অধ্যাত্মোপাসনার নিয়ম ও অনুষ্ঠান প্রদান করেন নাই।

তাৎকালীন একজন সর্ব্বপ্রধান স্বদেশভক্ত ও মহাপ্রাণ জননেতার এই অনুভূতি বাঙ্গালী কি সংশয়ের চক্ষে দেখিবে? বাঙ্গালী কি সংস্কার ও আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নবজন্ম-পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইবে?

যে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র আসমুদ্রহিমাচল হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের যুক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, যে 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্র বুকে ধরিয়া ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছিলেন, যে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে যুবকেরা রক্তাক্ত হইয়াছিল, সেই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ঋষি বঙ্কিমের শতবার্ষিকী উৎসবে তেমন করিয়া ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিল না কেন? আর কেনই বা ভারতের শ্রেষ্ঠতম নেতৃগণ এই মহামন্ত্রের উচ্চারণে আজ কুণ্ঠাপ্রকাশে সাহসী হন এবং মন্ত্র-মহিম্নস্তুতির অঙ্গচ্ছেদেও চিত্তক্লেশ অনুভব করেন না?

১৯১০ সালে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের তর্পণান্তে নূতন অন্তরমন্ত্র জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্যপ্রভাবযুক্ত মনোবৃত্তিপরায়ণ জন-নায়কগণ এ অনুভূতি লাভ করিবেন না। আজ গান্ধিজীও বলিতেছেন 'জাতীয় পতাকা ও বন্দেমাতারমের প্রতিবাদে যদি একটীও কণ্ঠ বাজিয়া উঠে, তবে ঐ পতাকার উত্তোলন অথবা মন্ত্রের উচ্চারণ বন্ধ করিতে হইবে।' যে জাতীয় পতাকা একদিন ভারতের পথে পথে উড়াইয়া দলে দলে দেশসেবীরা ছুটিয়াছে, সে পতাকারও কর্ম বন্দেমাতরম মন্ত্রের ন্যায় বোধ হয় শেষ হইয়াছে, তাহার শক্তিও হীন হইয়াছে। নতুবা এমন কথা গান্ধিজী বলিতে সাহস করিবেন কেন?

প্রথম বেদধ্বনি ভারতীর মন্দির হইতে পরিশ্রুত হইয়াছিল। দেশ-জাগরণের প্রথম ঋক্ বাঙ্গালীই উচ্চারণ করিয়াছিল। পূর্ব্বমন্ত্রের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; জাতীয়তা-সাধনের প্রথম উদ্গাতা আজ কি অধ্যাত্মসাধন-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নূতন মন্ত্রে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে না? বাঙ্গালীর সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। সাধন শক্তির মাত্রা যতখানি হইলে, বাহিরে সে আবার সাধনার নূতন ছন্দঃ ঘোষণা করিতে পারে, সে অবস্থায় বাংলার সাধকেরা এখনও উপনীত হইতে পারেন নাই। তাই 'ইনক্লাব জিন্দাবাদের' আত্মঘাতী মন্ত্র আমাদের শুনিতে হইতেছে। আমরা শীঘ্রই বাংলার অধ্যাত্মশক্তির জাগরণ পরিলক্ষ্য করিব। নূতন পতাকা ধরিয়া নূতন মন্ত্রে নিখিল জাতিকে নব দীক্ষায় অভিষিক্ত করার বিধান ভগবান বাঙ্গালীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। এত দুর্দ্দিনেও আমরা তাই আশার গানই গাহি—'আসিবে সেদিন, আসিবে।'

বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বিশ্বের দরবারে তাঁর স্থান উচ্চে। বাঙ্গালী হঠাৎ একদিন এই দৃষ্টিলাভ করিয়া কবিগুরুর পূজা সুরু করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মেরুদণ্ড আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি পলিত-কেশ, ক্ষীণ-শক্তি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁর প্রাণে সবুজের সাড়া আছে, দৃষ্টির প্রখরতা আছে, আর আছে হৃদয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অপরিসীম দরদ। তাঁর বাঁশীতে যে সুর বাজে, তাহা নিখিল বিশ্বের হিতবাণী। তাঁহার মুখের বাণী ভারতের নূতন স্বপ্ন। আর হৃদয়-বীণায় মীড়ে মীড়ে যে মূর্চ্ছনা উঠে, তাহা বাংলার প্রতি, বাঙ্গালীর প্রতি অসাধারণ অকৃত্রিম মমতা।

রবীন্দ্রনাথের বাঁশী বাঙ্গালীর আত্মাকে জাগাইয়াছে, খোরাক দিয়াছে, পরিপুষ্ট করিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে চিরদিন তিনি আশা জাগাইয়াছেন। বাঙ্গালীকে নূতন স্বপ্নে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কোথাও কিছু বৃহৎ ও মহতের আভাষ দেখিলে, তিনি শতমুখে তাহার জয় দিয়াছেন। বড় কিছু হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি কোনদিন প্রেরণা-সঞ্চারে অকৃপণ হন নাই। বাঙ্গালীজাতির প্রতি তাঁহার প্রীতি ও মমতার সীমা নাই।

স্বদেশী যুগের বাঙ্গালী যে অমর প্রেরণায় মাথা তুলিতে চাহিয়াছিল, বিপ্লব-যুগে তাহা অনেকটা মলিন হইয়া গিয়াছে। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালীর দলাদলি এ জাতিকে অর্দ্ধমৃত করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের অভ্যুত্থানে বাঙ্গালীর প্রাণে যে আশার বন্যা বহিয়াছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথেরও উৎফুল্ল প্রাণের সংযোগ আছে। সুভাষচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করার পূত আকাঙ্ক্ষার বাণী আমাদেরও কর্ণে অমৃত স্পর্শ দিয়াছে। তারপর গান্ধিজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিতে দেখিয়া, রবীন্দ্রনাথ সতর্ক-বাণীর সহিত ইহার ভাল-মন্দ উভয় দিকটা সুভাষচন্দ্রকে এবং বাঙ্গালীজাতিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার "কন্‌গ্রেস" সন্দর্ভ এই উত্তেজনার যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী নিশ্চয় পাঠ করিয়াছেন।

তিনি সুভাষচন্দ্রের জাগরণের মধ্যে গান্ধিজীকে অবনমিত করার আভাস পাইয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন। আবার অন্য পক্ষে গান্ধিজীর ভক্তবৃন্দের স্পর্দ্ধিত আচরণ দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া বলিয়াছেন 'গান্ধিজীর তপস্যা ও দুঃখ-বরণের বিরুদ্ধে তাঁহাদের এই আচরণে তাঁহার প্রতি অসম্মানই করা হইতেছে।' কংগ্রেসের প্রাদেশিক মনোবৃত্তির ফলে বাংলা যে উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা তিনি নিঃসঙ্কোচেই ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তবুও মহাত্মার গুণ-গরিমা প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠা করেন নাই। দেশকে

এতখানি টানিয়া আনার শক্তি গান্ধিজীর মধ্যে দেখিয়া তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস না থাকায়, তাঁহাকে টলাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু মহাত্মা এইখানে দৃঢ়পদ। রবীন্দ্রনাথ বলেন 'তিনি যদি মহাত্মার মত চরিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হইতেন, তবে মহাত্মাজীর ন্যায় তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী হইত না, তিনি অন্যরূপে জাতিকে পরিচালিত করিতেন। তিনি নিজের মধ্যে মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' এইরূপ হইলে, বাঙ্গালী নিজেদের সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত। গান্ধিজীর কর্ম্মপ্রণালী এবং তাঁহার ভক্তদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা যে তেমন নাই, তাহা তাঁহার এই কথাতেই প্রমাণিত হয়।

মহাত্মাজীর উচ্চ প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ বহুবার করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে, এই যুগে, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীর চক্ষে তাঁহাকে তিনি যে ভাবে ফুটাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

পলিটিক্সকে তিনি বাহিরের দিক্ থেকে যন্ত্রশক্তি আর মানুষের মনকে মন্ত্রশক্তি মনে করেন। এই দুইয়ের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন "এই দুটাই ব্যবহার-গুণে কম শক্তির পরিচয় দেয় না। মূল্য যেমন দিতে হয়, সময়ও ততোধিক ব্যয় হয়। মহাত্মা এই যুগে যন্ত্রশক্তির সম্মুখে আত্মিক বল লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোথাও তাঁর ভয় নাই। সব জায়গায় জয় না হউক, পরাজয়ের ভিতর দিয়াও তিনি গড়িয়া চলিয়াছেন এক অপার্থিব অসাধারণ সৃষ্টি।" তাঁহার মতে, "অশিক্ষিতদের লইয়া সহজে দক্ষযজ্ঞ করা যায়, কিন্তু অহিংসাধর্ম্মী গড়া সহজ কথা নয়। ধ্বংস এদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য সৃষ্টি।" মহাত্মাবিরোধী বাঙ্গালী জাতি কি কবিগুরুর কথায় কর্ণপাত করিয়া আত্মস্থ হইবে? কবি-দৃষ্টি দিয়া রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীর গতিভঙ্গীর সত্য অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ইহা সত্যই তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন, গান্ধিজীর অসহযোগ-সাধনার শেষে লোকশিক্ষার পর্য্যায় আসিয়াছে; তাই তিনি অসহযোগে আর ভীড় না জমাইয়া, তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া এক অনভ্যস্ত পথে নূতন দল বাঁধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। জন-পূজার যে প্রথম মন্ত্র—মানুষকে শিব-সুন্দরে পরিণত করা, গান্ধিজীর এখন এই কাজ। জাতির প্রকৃত স্বাধীনতাও এই কর্ম্মের মধ্যেই নিহিত। জনগণের সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ না করিলে, জাতির স্বাধীনতা সিদ্ধ হয় না।

গান্ধিজীর কর্ম্ম-বিশ্লেষণের পর বাংলার জননায়ক সুভাষচন্দ্রের নিখিল ভারতে আসনগ্রহণের সাধনা কবীন্দ্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন। "এই পলিটিক্সের আসরে তিনি আনাড়ী। দলাদলির পরে যে ধুলি উড়িবে, সেখানে তিনি ভবিষ্যৎকে দেখিতে পান না"—এইখানে তাঁহার অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তিনি বাংলাকেই ধরিয়া আছেন। যে বাংলাকে বড় দেখার স্বপ্ন তাঁহাকে চির যুগ পাইয়া আছে, তিনি নিশ্চয় জানেন—এই বাংলা বড় হইলেই সমগ্র ভারতের লাভ হইবে। তাই তিনি সুভাষচন্দ্রকে অন্তরে বাহিরে দীনতা দূর করার সাধনা গ্রহণ করিয়া, এই পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে আকূতি জানাইয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের এই অধ্যবসায়ে কবিগুরুর সহায়তা আছে, সহানুভূতি আছে। তাঁহার যে বিশেষ শক্তি, সুভাষকে তাহা কাজে লাগাইবার জন্য তিনি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবিগুরু বড় আশায় বলিয়াছেন "বাংলাদেশ সার্থকতা লাভ করিয়া, সসম্মানে ভারতের সত্য রাষ্ট্রশালায় প্রবেশ করিতে পারিবে।" সুভাষের তপস্যায় তাহা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই কবির কণ্ঠে এই আহ্বান-বাণী উঠিয়াছে। কিন্তু হে কবি, বাংলার দরদী ও মরমী, মাথার মণি, আজ যন্ত্রশক্তি শুধু লৌহাদি ধাতুর নির্ম্মিত দণ্ডচক্র নহে, আমাদের মন হইয়া গিয়াছে ধাতু-যন্ত্রের অপেক্ষা কঠিন, অন্ধ। তাই দলের নীতি ধরিয়া দম্ভের সার্থকতাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীকে সার্থক করার তপস্যা আজিও ক্ষীণ প্রবাহে অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মত অস্পষ্ট হইয়াই রহিল।

মনের বিপ্লব

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্তির হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী মনীষী রবীন্দ্রনাথ। আমরা যে ইহা সমর্থন করিব, 'প্রবর্ত্তকের' পাঠকদের তাহা বলিতে হইবে না। মহাত্মাজীকে আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিয়াছি—'ভারতের স্বাধীনতা আমার সত্যের জন্য বলি দিতে পারি।' সেই সত্যটা কি, তিনি বহুবার তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার সব চেয়ে বড় সত্য—ঈশ্বর-প্রাপ্তি। ইহাই তাঁহার সব চেয়ে বড় কথা। দেশের স্বাধীনতার অনুকূল শক্তিটাকে তিনি খাটাইয়া লইতে চাহেন। চলার পথে তিনি ইহাতে অধিক সুবিধা পাইয়াছেন। গান্ধিজী রাষ্ট্রসাধনায় সত্য ও অহিংসার সাধনাই করিয়াছেন। এই পথে ঈশ্বরস্বরূপই লাভ করা যায়। তাঁহার পদচিহ্ন ধরিয়া জাতি চলিয়াছে কোথায়, এ প্রশ্ন এতদিন আসে নাই। আজ একদল লোক থমকিয়া

দাঁড়াইয়াছে গান্ধিজীর স্বরূপ বাহির হওয়ায়। তাঁহারা বলেন "এ পথ আমাদের নয়। সত্যাগ্রহ আমাদের রাষ্ট্র-সংগ্রামের অস্ত্র। আমরা স্বাধীনতা চাই। তাহার জন্য চাই সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি, আর চাই বৈপ্লবিক সংহতি।" কংগ্রেসের বামপন্থীদের এই পথের যাত্রী বলা যাইতে পারে। মহাত্মাজী বিশ্বাস করেন—মানবাত্মার অভ্যুত্থান সত্য ও অহিংসাপূত চরিত্র লইয়াই সম্ভব হয়। কেমন করিয়া হয়, তাহার প্রমাণ মিশ্র অহিংস নীতি আশ্রয় করিয়াও তিনি ভারতের ৮টী প্রদেশে তাঁহার ধর্ম্ম ও আদর্শ-মত চরিত্রগঠনের সুযোগ পাইয়াছেন। সত্যাগ্রহ আজ তাঁহার চক্ষে বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে কোন কিছু প্রাপ্তির দাবী নহে, পরন্তু উহা প্রতিপক্ষের অন্তরপরিবর্ত্তনের উপায়। তিনি অহিংস নীতির ভিতর দিয়াই জাতির পরম সত্য যদি লাভ করিতে পারেন, দেশের বাস্তব স্বাধীনতা এই চলার পথেই পাওয়া যাইবে, এই বিশ্বাস রাখেন। তিনি অহিংসার দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। যে সকল তথাকথিত কর্ম্মী ইহা ব্যবহার করিতে চাহে, তাহারা ইহার জন্য উপযোগী নহে। তাই তিনি বলিতেছেন —ইহার জন্য মানুষ গড়া চাই। পূর্ব্বের ন্যায় অহিংস আন্দোলন আর চলিবে না। অতএব সত্যাগ্রহ এক্ষণে বন্ধ রাখিতে হইবে।

গান্ধি ইহার জন্য দলও বাঁধিয়াছেন, কর্ম্মক্ষেত্রও লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী যূথ-ভ্রষ্ট, তাহার মাথা রাখিবারও ঠাঁই নাই। বাঙ্গালী মরিতেছে। তাই গান্ধিপন্থীরা যখন বলেন "চাই ঈশ্বরবিশ্বাস, চাই সুতা কাটা, চাই গম পেষা, কায়িক তপস্যা, আর সত্য ও অহিংসাপূত মনের জন্য চাই নিয়ম, সংযম, আচারনিষ্ঠা আর উপাসনা", অন্য পক্ষ তখন বলিতেছেন "গলা টিপিয়া ধর এই সব অধ্যাত্মবাদীদের। স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য; তাহার জন্য এত আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন নাই। ধর সত্যাগ্রহ অস্ত্র, আন বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ কর।" অসাধারণ চিন্তা-বিপ্লব! দক্ষিণ হইতে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "তপস্যার ভিতর দিয়া অর্দ্ধেক রাজনীতিক অধিকার পাইয়াছি; তপস্যার ভিতর দিয়াই পুরা পাইব।" জহরলালও দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিতেছেন "বামপন্থীদের অজ্ঞতার পরিচয় ঐ ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠনে। ভবিষ্যৎ মহাসংগ্রামের জন্য সংগঠনের পথে উহা বাধা। উহা দূর করিতেই হইবে।" রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন "কংগ্রেসের শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। শাসনসংস্কারে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, শক্তির প্রতিষ্ঠা—ইহা আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।" তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের দলপতিকে শাসাইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র তাহা তুড়ি মারিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীর পর মহাত্মাকে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছিলেন—বামপন্থীদের প্রতি অবিচার হইলে, কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিরোধ বাধিবে। মহাত্মাজী সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। নব্য ভারত চায়—গান্ধির অধ্যাত্মবাদ উল্লঙ্ঘন করিতে; আর গান্ধিজী চাহেন—জাতির মধ্যে অধ্যাত্মবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া এক অভিনব যুগ স্থাপন করিতে। চিন্তা-বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত অধিক আমরাই। বাঙ্গালী যদি শাসন-সংস্কারে মনের মত করিয়া স্থান পাইত, ভারতের ৮টী প্রদেশ কংগ্রেসের অধীনে না হইয়া, ৯টী প্রদেশে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বাংলার জাতীয়তার মধ্যে আজ আধ্যাত্মিক সাধনের ধৈর্য্য নাই। কিন্তু অসহিষ্ণু হইয়া কি যে পরিণাম হইবে, তাহাও সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। কংগ্রেস জাতিগঠনের পথে এবং গান্ধিভক্তদের শক্ত হাতেই তাহা সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ-শাসন-যুগে শাসন-সৌকর্য্যে যেমন কড়া আইন প্রবর্ত্তিত হইত, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে কংগ্রেসবিরোধীদের তদ্রূপ আইন করিয়া নিরস্ত করা হইতেছে। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিহারে ১৮ লক্ষ বাঙ্গালীর ন্যায্য অধিকার কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। মানভূমের সদর এলাকায় ১২ লক্ষ বাঙ্গালীকে মাতৃভাষা ভুলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। মানভূমের ৩০ লক্ষ কুর্ম্মী মাহাতোরা বাঙ্গালী। সাঁওতালেরাও বাংলাভাষাভাষী। তাহাদের বুলি বদলাইয়া বিহারী করার চেষ্টা চলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের যে দাবী, অধ্যাত্মবাদেরও দাবী তদপেক্ষা কম চড়াও নয়। আমরা এই অবস্থায় বলিব—ভারতের অধ্যাত্মশক্তি যখন প্রাণ ও আয়ুঃ বলিয়া কথিত, তখন এই শক্তিকে আজ যে ভীতির চক্ষে দেখিতে হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীকে বুঝিতে বলি—অধ্যাত্মবাদ তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। বাংলার যে অধ্যাত্মবাদ পঙ্গু ক্লীবের ন্যায় শক্তিহীন, উহা ঠিক অধ্যাত্মবাদ নহে, ফাঁকিবাজি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৭২ বৎসরের স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ১২ বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ, আর মঠ, আশ্রম, আখড়ার সন্ন্যাসী, অবতার আর বাবাজীদের দেখিয়া যাঁহারা অধ্যাত্মবাদ ব্যাখ্যা করেন, গান্ধিজীর দৌলতে তাহা নাকচ হওয়ার উপক্রম হইতেছে; ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। জড়বাদ সঙ্কীর্ণ। অধ্যাত্মবাদ উদার বিরাট্। অতএব যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী, তাঁহারা মুক্ত-কচ্ছ হইয়া, অবতার সাজিয়া ভণ্ডামীর সুযোগ যাহাতে না পান, তাহার জন্য সচেষ্ট হইলে, বাংলার অধঃপতনের দিন আজই শেষ হয়। যাঁহারা খাঁটী অধ্যাত্মবাদী, তাঁহারা কি এই দিকে অবহিত হইবেন?

রাষ্ট্রশক্তি

বোম্বাই সহরে ভারতের রাষ্ট্রসভার কার্য্যকরী সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেস সদস্যনিয়ন্ত্রণের অনেকগুলি কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কতকগুলি নিয়মের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থিগণ, এমন কি জহরলাল পর্য্যন্ত বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১১৯টি ভোটে উহা গৃহীত হইয়াছে। বিরুদ্ধে ৮৭ খানি ভোট পড়িয়াছিল। কংগ্রেসে বামপন্থিগণের শক্তির অঙ্ক কষিয়া বাহির হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক যদি ক্রমে ক্রমে আরও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে আর যদি ইহাতে দলাদলি না বাড়ে, কংগ্রেসে বাম-পন্থীর প্রভাব প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে, এমন আশা অনায়াসেই করা যায়। কংগ্রেস বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে মত ও আদর্শভেদ যতদিন থাকিবে, দলাদলি বন্ধ করা যাইবে না। এইজন্য যে দলের প্রতিষ্ঠা যখন থাকিবে, সেই দল তখন তাহাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য প্রয়াস করিবে। দক্ষিণ-পন্থিগণের এইজন্য এইরূপ প্রচেষ্টা বোম্বাইয়ের কার্য্যকরী বৈঠকে করিতে হইয়াছে এবং অন্য পক্ষকে ইহা অন্যায় বলিয়া আন্দোলন করিতেই হইবে; কেননা, পূর্ব্ব পক্ষকে খাটো করিতে না পারিলে, এই পক্ষের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে বলিব, কেহ কোথাও কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেছে, ষাঁড়ের সম্মুখে রক্ত-পতাকা ধরিয়া তাহাকে উন্মত্ত করার ন্যায় এই কথায় তাঁহারা যেন উত্তেজিত না হন।

আজ আমাদের স্থির হইয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে 'কঃ পন্থা'? "শাসনতন্ত্র ধ্বংসকর"—এই কথা আজ আর খাটে না। সর্দ্দার প্যাটেল বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রাষ্ট্রতন্ত্র যখন হাতে পাইয়াছি, তখন আমরা ইহার ব্যবহার করিবই। এই শাসনতন্ত্র পাওয়ার পূর্ব্বে কংগ্রেস ইহার ধ্বংস কামনা করিয়াছিল। পাওয়ার পর ব্যবহারের কথা উঠিল। কংগ্রেসের যে দলটী শাসনতন্ত্র-পরিচালনার সুযোগ পাইলেন, তাঁহারা হইলেন দক্ষিণ-পন্থী আর যাঁহারা পাইলেন না, তাহারাই হইলেন বামপন্থী। চাকা ঘুরিলেই এই বাম-পন্থীই আবার দক্ষিণ-পন্থী হইবেন। রাষ্ট্রচক্র এমনই রহস্যময়। এই হেতু উত্তেজনার ধুলি উড়াইয়া দেশের চক্ষু অন্ধ না হয়, সে দিকে আমাদের সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে হইতেছে।

স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই। একটা দীর্ঘ তপস্যায় নিয়মতন্ত্র ব্যবস্থায় দেশ কতকটা যে স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এরূপ না হইলে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি হইতে মন্ত্রিমণ্ডলী সদলবলে তাঁহাদের ইচ্ছামত দেশের অবস্থা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন কেমন করিয়া? বাংলার হক মন্ত্রিমণ্ডলী এই যে কলিকাতা কর্পোরেশনে তাঁহাদের ইচ্ছামত আইন প্রণয়নে সমর্থ হইলেন, কতকটা স্বাধীনতার ইহা প্রমাণ বৈ কি! যাঁহারা শাসন-শক্তি হাতে পাইবেন, তাঁহারাই তাঁহাদের স্বপ্ন ও আদর্শ অথবা স্বার্থ আইনের দ্বারা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। গান্ধিজী তাঁহার অধিকৃত ৮টী প্রদেশে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম সম্পন্ন করায় যেমন উদ্বুদ্ধ, বাংলায় হক্ মন্ত্রিমণ্ডলও তদ্রূপ নিজেদের ইচ্ছামত বাংলাকে গড়িয়া লইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, জাতির যে সংহতিশক্তি রাষ্ট্রের সুদর্শনচক্র হাতে পাইবেন, সেই সংহতির যে ভাব ও আদর্শ, তাহাই কর্ম্মে পরিণত হইবে। উহা শুধু শাসনকার্য্য নহে, শিক্ষায় ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তাঁহারা যাহা ভাল বুঝেন তাহাই হইবে। নিখিল জাতির তাহা মনঃপূত না হইলে, তাহারা চীৎকার করিবে মাত্র। ইংরাজের একাধিপত্য-যুগে এইরূপই হইত। আজ দেশশাসনের অধিকারসূত্রে দল-বিশেষের হস্তে কতকটা আধিপত্য আসিয়াছে। মন্দের ভাল এই যে, এই দল বিদেশী নহে, ভারতীয়।

ভারতীয় হইলেও, আমরা যেন অধিক বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। কেননা, ভারতীয় ভাব ও আদর্শ গান্ধিজীর মধ্য দিয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এমন কথা শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় স্বীকার করিবেন না। আবার এই তর্করত্ন মহাশয়ের যদি শক্তিশালী দল থাকিত, আর সেই দলটাই রাষ্ট্রচক্র হাতে পাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিত, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোক উহা ভারতীয় হইতেছে বলিয়া একমত হইত না, ইহাও অবধারিত। অতএব যদি কোন শক্তিশালী নেতার কোন ভাব ও আদর্শকে কার্য্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দল গড়িতে এবং রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করিয়া লইতে হইবে, তাহা না হইলে তাঁহার আদর্শবাদের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি হাতে পাইয়া যাঁহারা তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী শিক্ষা-সভ্যতা প্রচার করেন, রাষ্ট্রশক্তিহীন অন্যের পক্ষে তাহার প্রতিবাদ করা ছাড়া আর এক উত্তম পথ আছে, উহা হইতেছে—ভারতে আরবী-পার্শী শিক্ষার প্রচলন-যুগে হিন্দুরা যেমন দেব-ভাষাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিল, তেমন করিয়াই ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষা-পদ্ধতি অথবা বাংলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-নীতি যদি নূতন মূর্ত্তি ধরে, ভারতের কৃষ্টি ও সংহতি সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা তাহা তদনুরূপভাবে রক্ষা করার জন্য প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা আত্মরক্ষা মাত্র, ব্যাপ্তি

নহে। আত্মরক্ষার এই প্রয়াস সাময়িক। যত দীর্ঘ দিন এই নীতি অবলম্বিত হয়, ততই ইহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু—তাহার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথেরও আছে, গান্ধিজীরও আছে, শ্রীঅরবিন্দেরও আছে; আমাদের জিন্না সাহেবেরও আছে। প্রত্যেকের আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে আদর্শভেদ থাকিলেও, বহু যুগের অনুশীলনে ও ধ্যানে অনেক ক্ষেত্রে নিখিল মানবজাতির শাশ্বত সুখের বলিয়া তাহা প্রতীত হয়। এইরূপ সুমহান্ আদর্শ যাঁহাদের মধ্যে বিধৃত, তাঁহারা কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে উদাসীন। তাঁহারা কি মনে করেন—অন্য ভাবের ভাবুক রাষ্ট্রক্ষেত্রের নিয়ামক হইবে আর তাঁহাদের ভাব ও আদর্শ কার্য্যকরী হইবে? এইরূপ ঔদাসীন্যে আমরা নিজ বাসভূমে শুধু পরবাসী হইতেছি না, স্বধর্ম্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ক্লীবের সংখ্যা বাড়াইতেছি। আমরা এই জন্য বলিব—ভারতের কংগ্রেস হইতে বাঙ্গালী এক প্রকার উপেক্ষার আঘাতই পাইতেছে। বাংলার মনীষায় যে ভাব ও স্বপ্ন অবধৃত, যে অধ্যাত্মবাদ জীবনে এ জাতি অনুভব করিয়াছে, সেই ভাব ও আদর্শ লইয়া আমরা তাহাকে আগাইয়া আসিতে বলি। ইহার জন্য কংগ্রেস কেন, যদি হিন্দু সভাও আগাইয়া আসে, আমরা আমাদের কৃষ্টিগত আদর্শ কোথায় চরিতার্থ হইতে পারে, ইহা দেখিয়া দলপুষ্টির আয়োজন করিব। ভারতের সাধনা আর কোথাও রাষ্ট্রবিমুখ হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টাদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি।

আমাদের মতামত

'প্রবর্ত্তকের' মতামত কোন দলের মতামত নহে এবং যুগ-প্লাবনের আবিল তরঙ্গে জাতিকে ভাসিয়া যাইবার মত যুক্তিহীন উত্তেজনা-বাণীও 'প্রবর্ত্তক' উচ্চারণ করে না। সে জাতিকে স্বস্থ হইয়া কোন এক বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়াইয়া সংহতি-রচনায় উদ্বুদ্ধ করে—যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহিত রাজসিক ব্যস্ততার প্রভাব এড়াইয়া শনৈঃ শনৈঃ অব্যর্থ লক্ষ্যের পথে আগাইয়া যাইতে শুভ বাণী উচ্চারণ করে।

আমাদের অভিমত কেহ কেহ যুগোপযোগী নহে বলিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ যুগপ্রভাবে অতিষ্ঠ উত্তেজিত বাঙ্গালীকে সময়োপযোগী সুখাদ্য পরিবেশন করা হইতেছে বলিয়া আমাদের ধন্যবাদও প্রদান করিয়াছেন। আমাদের প্রবাসী সাহিত্যিক শ্রীঅবনীনাথ রায়ের একখানি পত্র আমরা পাইয়াছি। তাঁহার আনন্দপ্রকাশের কারণ—তিনি বাঙালার অবিসংবাদী নেতা, চিন্তাশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লেখায় ও বক্তৃতায় পক্ষপাতশূন্য সত্যবাণী শুনিতে পান নাই। সর্ব্বত্রই উত্তেজনা ও হুজুগের কালিমা-লেপনই তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে। ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্যের অনুকূল সৃষ্টি না হইয়া, যাহা ক্ষণিকের, তাহার দিকেই জাতিকে অন্ধের মত পরিচালিত করার চেষ্টা দেখিয়া তিনি আতঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত পত্রখানি অতি দীর্ঘ বলিয়া 'প্রবর্ত্তকে' স্থান করা গেল না। তাহার অনেক অংশই আমাদের পাক্ষিক 'নবসঙ্ঘে' উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের কথা—আমরা চাহিতেছি ভারতের অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের জয়। আমরা দেখিতে চাহি—যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী তাঁহারা ক্লীব নহেন, পরমুখাপেক্ষী নহেন, এবং জীবনকে ও জাতিকে তাঁহারা অস্বীকার করেন না। অধ্যাত্মবাদ জীবনবাদেরই মৌলিক ভিত্তি; জীবন হইতে ইহা স্বতন্ত্র নহে। এইদিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে, তাহার পর আছে দীর্ঘ প্রস্তুতির কাল। ধৈর্য্যহীন উত্তেজনায় আমরা দীর্ঘ দিন শক্তিক্ষয় করিয়াছি। আজ দিন আসিয়াছে অধ্যাত্মবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতিকে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রকট করা। এই কর্ম্মে হুজুগ ও উত্তেজনা নাই বটে, কিন্তু আছে অসাধারণ শ্রম ও তপস্যা। আমরা চিরদিন এই পথে বাঙালার মনীষাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছি। আমরা ব্যর্থ হই নাই। এই ঈশ্বরপ্রসাদ আমাদের দৃষ্টিকে ক্রমপ্রসারিত করিয়া ধরিতেছে। বাঙালীর মুক্তি এই পথে।

ঝড়ের সঙ্কেত

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

তিন

স্ত্রীলোকের বিদ্রূপে সেদিন অপমান বোধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পর কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষত গভীর হইলেও ঘা একদিন শুকায়, মানুষ আবার নিজের সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করিয়া লয়, ইহাই রীতি। মৃণ্ময়ীর বিদ্রূপের স্মৃতি ফিকা হইয়া আসিল, অপমান আর মনে রহিল না। কিন্তু এই কথাটা ভাবিয়া মনটা টন টন করিতে লাগিল, যে, অস্খলিতকৌমার্য্য একটি তরুণীকে হাতের মুঠায় পাইয়াও হারাইলাম। বড়লোক বলিয়া খোঁচা দিয়া গেল, বাল্যবন্ধুত্বকে অস্বীকার করিল, একরাত্রি ধরিয়া তাহার অসময়ে উপকার করিলাম তাহা সে ভুলিল, দানের কৃতজ্ঞতাকে গ্রাহ্য করিল না,—এবং সর্ব্বোপরি এই যে আমার তরুণ বয়স, এই যে আমার বিস্তৃত বক্ষপট ও বলিষ্ঠ বাহু—ইহাদেরও সে মুখ বাঁকাইয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। সকল গুণের অধিকারী হইয়াও আমি তাহার ন্যায় একটা সমাজচ্যুতা অভিভাবক-হীন স্ত্রীলোকের নিকট ঠাঁই পাইলাম না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। তাহার এই অহঙ্কারের মূল ভিত্তি কোথায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমি তাহাকে অধঃপতনের পথে লইয়া গেলেও, তাহার গৌরববোধ করা উচিত; আমার বংশমর্য্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আভিজাত্য স্মরণ করিয়া সানন্দে আমার পায়ের তলায় তাহার প্রাণ দেওয়া কর্ত্তব্য—কিন্তু কোন আত্মাভিমান তাহাকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিল, বুঝিলাম না। তবে কি পুরুষকে না পাইলেও, মেয়েরা কাজ চালাইতে পারিবে? তবে কি মৃণ্ময়ী অন্যের প্রতি আসক্ত?

স্ত্রীলোকের রুচি ও স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোনো পদার্থ আছে, তাহা এই প্রথম আবিষ্কার করিলাম। তাহাদের ভিতরে কিছু নাই বলিয়াই উপরটা অত সুন্দর, তাহাদের প্রাণের চেহারায় কোনো রং নাই বলিয়াই উপরটা অত মনোহর। পশুরাজ্যে স্ত্রীজাতির রূপ নাই ও পুরুষের বুদ্ধি নাই; প্রকৃতি নিজের কাজটা একরকম করিয়া সারিয়া লয়; কিন্তু মানবজাতির মধ্যে পুরুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক থাকার জন্য প্রকৃতিদেবীর বড় অসুবিধা হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের ফাঁকি ঢাকিবার জন্য মেয়েদের মাথায় রেশমের গোছার ন্যায় চুলের রাশ দিয়াছেন, গায়ের চামড়া ঢাকিয়াছেন অতি মসৃণ মখমলে, চোখের দৃষ্টিতে দিয়াছেন মধুরতম মিথ্যার ইঙ্গিত, চরণ দুখানি করিয়াছেন কমল-পল্লব; এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে এমনই উপকরণ সাজাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা পুরুষের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিকে বিকৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মৃণ্ময়ীর এই দম্ভ দেখিয়া আমার একটু ভাবান্তর ঘটিল। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এখন হইতে আমাকে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে, এই চিন্তাটাই আমার নিকট পীড়াদায়ক বোধ হইল। আমার প্রলোভনে সে প্রলুব্ধ হইবে এবং আমার ভালোবাসা পাইয়া সে ধন্য হইবে, ইহাই জানিতাম; কিন্তু মৃণ্ময়ীর স্পর্দ্ধা আমাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল।

ব্যাঘ্রের কবল হইতে শিকার পালাইলে, তাহার কিরূপ অবস্থা হয়? নখর ফুলাইয়া, নিজের থাবা চাটিয়া, গোঁ গোঁ করিয়া হিংস্রভাবে পদচারণা করিয়া বেড়ায়। মৃণ্ময়ী পলাইবার পরে আমি বাড়ীর সহিত বিবাদ করিলাম, মাকে ধমক দিলাম, চাকরবাকরকে খুব প্রহার করিলাম, নেশা করিয়া স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইলাম। এই ভাবে মনের দূষিত বাষ্প খানিকটা নির্গত হইবার পর আমার চৈতন্য ফিরিল এবং কবির ভাষায়—'তাহারেও বাদ দিয় দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।' আমি পুনরায় অন্য শিকারের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিলাম।

আজ কয়েকদিন হইল পিতৃদেব দিল্লী হইতে ফিরিয় অসুখে পড়িয়াছেন। অসুখ তাঁহার নূতন নহে, অসুখট বার্দ্ধক্যের। এদিকে আমার দার্জ্জিলিং যাওয়া ঘটে নাই,—পিতার অসুখের জন্যও বটে ও অসময়ে বর্ষা আরং হইয়াছে সে-কারণেও। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি

এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী মিলাইয়া পিতৃদেবের পেটের ভিতরটাকে একরূপ ঔষধালয় বানাইয়া তুলিতেছি। কিন্তু তাঁহার অসুখ বাড়িতে লাগিল।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিলেন। কাছে গিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার মায়ের কাছে শুনলুম সরোজিনীদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, তারা এখন কোথায়?

পিতার কৌতুহলটা আমার কাণে বাজিল; কিন্তু আত্মরক্ষার্থে তাড়াতাড়ি বলিলাম, হ্যাঁ, সে একদিন দেখা হয়েছিল বটে, আর কোনো খবর রাখিনে। সরোজিনী ত' মারা গেছেন।

বলো কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যুর দিনেই মেয়ের সঙ্গে দেখা, আমার কাছে মেয়েটি কিছু সাহায্য চেয়েছিল।

বাবা বলিলেন, হ্যাঁ, শুনেছি সব। তা'হলে সরোজিনী মারা গেল? অনেক দুঃখ পেয়েছে বটে।

বলিলাম, আপনি ত তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, বাবা?

মিথ্যে নয়।

কেন দিলেন?

আমরা ছিলুম জমীদার, তারা প্রজা।

বলিলাম, তারা কিছু দোষ করেছিল?

বাবা চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, তোমার মায়ের হুকুম পালন করেছিলুম।

একটু প্রশ্রয় পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, গরীবের ঘর জ্বালাবার হুকুম মা দিল কেন?

বাবা যেন কি ভাবিলেন, পরে কহিলেন, অপরাধ একটু ছিল বৈকি। তারা মাথা হেঁট ক'রে থাকতে চায়নি, চেয়েছিল সমান সমান অধিকার। দারিদ্র্যটা ছিল তাদের অহঙ্কার, গরীব ব'লেই তাদের স্পর্দ্ধা ছিল অনেক উঁচুতে। তারা ভেঙেছে, কিন্তু মচ্‌কায়নি।

আমি যেন সহসা নূতন আলোয় পৃথিবীর দিকে চাহিলাম। সরোজিনীর মৃত্যুশয্যাটা চোখের উপর ভাসিল, সেই মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতার ছায়ায় চরম দারিদ্র্যের কোনও মহিমা ছিল কিনা—প্রদীপের আলোয় সেই অস্পষ্ট দৃশ্য আমার মনে পড়িল না। লোভে ও আত্মপরতায় আমি যখন জরজর হইয়া মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়াছিলাম, তখন তাহার আচরণ ও ভঙ্গীতে উন্নতরুচির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহাও এখন আর স্মরণ করিতে পারি না। তবু মনে মনে সেই দিনকার সমস্তটা ভাবিয়া আমার ন্যায় মাংসলোভীও লজ্জায় মাথা নত করিল। ভাবিলাম, আমার কৌশল-কুটিল নীচতা ও কুৎসিত লোভ হয়ত মৃণ্ময়ী সত্যই ধরিয়া ফেলিয়াছে, হয়ত আমার হৃদয়হীনতার দৈন্য ও কদর্য্যতা তাহার নিকটে আর চাপা নাই।

বলিলাম, মা'র কাছে আমি অন্য কথা শুনেছিলুম, বাবা।

তিনি বলিলেন, তোমার মা কখনও চরিত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন না, রাজেন।

নিজের চরিত্রটা স্মরণ করিয়া আমি একটু ভয় পাইয়া চুপ করিয়া গেলাম। কথা বাড়াইতে সাহস হইল না। তিনি বলিলেন, মেয়েটি এতদিনে ত' বড় হয়েছে। বোধ-হয় বিয়ে হয়নি, কি বলো?

ঠিক বলতে পারিনে।

বোধ হয় হয়নি, কারণ নিন্দেটা ওদের পেছনে কুকুরের মতন ছিল কিনা।

বলিলাম, নিন্দেটা ত' মিথ্যে নয়, বাবা।

বাবা বলিলেন, অনেক নিন্দেরও আবার মহিমা আছে, রাজেন।

তবে আপনি নিজের হাতে ঘর জ্বালাতে গেলেন কেন?

তাদের ঘর জ্বলেছিল, তাই তোমার মায়ের ঘর রক্ষা হয়েছে। অবশ্য ক্ষতিপূরণ আমি করবার চেষ্টা করেছি।

বলিলাম, বুঝতে পারলুম না, বাবা।

এর বেশি আর কিছু বোঝবার নেই।

বাবাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। মৃণ্ময়ীর শেষ মন্তব্যটা আমার কাণে আবার যেন নূতন করিয়া বাজিল, বড়লোকের আবার মনুষ্যত্ব! বাল্যকালে আমাদের হাতে তাহারা মার খাইয়াছে, ধনী ও দরিদ্রের ভিতরকার সম্পর্কটাকে বিষাক্ত করিয়াই

ভাবিয়া রাখিয়াছে, যতদিন মৃণ্ময়ী বাঁচিবে ততদিনই সে এই কথাটা ঘোষণা করিয়া বেড়াইবে যে, যাহারা ধনী তাহাদের খেয়াল আছে, মেজাজ আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই। সংস্কার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আমার আচরণে সে হয়ত খেয়াল ও লোভকেই লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ খুঁজিয়া পায় নাই।

আমার মনোবিকারকে আমি সংযত করিতে পারিলাম না। আলমারীর বইগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, উহারা যেন অতীতকালের শত সহস্র অন্যায় ও উৎপীড়নের ইতিহাস বুকে লইয়া মুখ বুজিয়া আছে। একটা অন্ধ, অবরুদ্ধ, নিগূঢ় প্রশ্ন যেন ওই গ্রন্থগুলি হইতে বাহির হইয়া আমার চারিপাশে বীভৎস মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইল। আমার নিজ জীবনের চেহারাটা একটা যেন বিলোল লালসা ও সম্ভোগবাসনার পুঞ্জীভূত স্তূপ। ক্ষুধার খাদ্য যোগাইয়া বারম্বার ক্ষুধাকেই জাগাইয়াছি, প্রবৃত্তি ও দুরন্তপনার তরঙ্গে ভাসিয়া অকুণ্ঠ আত্মপরতাকে প্রাধান্য দিয়া আমি যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছি তাহা আমারই একটা নিজস্ব জগৎ, তাহার হালচাল আমিই জানি, আর কাহারও সহিত না মিলিলেও আমি একটা বিশেষ আনন্দের মধ্যে বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু আজ পিতামাতার অন্যায়ের গুরুভার সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়া যেন আমার উপরেই চাপিয়া বসিল। আমার বাল্যকালে যাহা আমার অজ্ঞানে ঘটিয়াছিল, যাহা আমার স্মৃতির চতুঃসীমার মধ্যে কোনও দাগ কাটিয়া রাখে নাই, আজ যেন কবরের মাটি ফুঁড়িয়া সেই দুষ্কর্ম্মের কঙ্কালটা বাহির হইয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। পিতার আলাপের মধ্যে আমি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাই নাই; শুধু পাইলাম একটা স্বেচ্ছাকৃত বর্ব্বর অহেতুক উৎপীড়নের কাহিনী—যাহার কোনও সুস্পষ্ট যুক্তি নাই, নীতি নাই, প্রয়োজন নাই।

কলিকাতা সহরে আমি তাহাকে কোথায় খুঁজিয়া বাহির করিব? যাহাদের জীবন ও স্থিতির মূল আমরা নষ্ট করিয়া পথে বসাইয়াছি, তাহারা পথে পথেই বাসা বাঁধিয়াছে—আজও সেই মেয়ে কলিকাতার শাখাপ্রশাখা-বহুল পথের রহস্যে ভাসিয়া গিয়াছে, আমি কোথায় গিয়া তাহার সন্ধান করিব? কোনও চিহ্ন, প্রাণের কোনও নিশানা, বন্ধুতার কোনও আভাস—এমন কিছুই নাই যাহার রেখা অনুসরণ করিয়া মৃণ্ময়ীকে গিয়া গ্রেপ্তার করিব। আর কিছু নয়, কেবল এই কথাটা জানাইয়া দিতে বাসনা হইল, আমি নিজে লোভী ও আত্মপর হইতে পারি, কিন্তু তোমাদের উপর উৎপীড়ন যাহারা করিয়াছে আমি তাহাদের পুত্র হইলেও, এই আদিম বর্ব্বরতা আমি সমর্থন করিব না।

পৃথিবীতে যাহারা চিরকাল ধনী বলিয়া পরিচিত হয়, তাহারা চিরকাল ধরিয়াই গরীবের বুকের উপর দিয়া তাহাদের খেয়াল ও স্বেচ্ছাচারের রথ চালাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমিও যে তাহাদেরই একজন প্রতিনিধি, মৃণ্ময়ী এই কথাটা জানিয়া গেল,—কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিব? তাহার ন্যায় তরুণী আমি অনেক দেখিব, অনেক কাল ধরিয়া অনেককেই ভালবাসার দিক্ হইতে প্রতারিত করিব, প্রয়োজন হইলে তাহাদের পরিচ্ছন্ন জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হইব না, কিন্তু এই অপবাদ কিছুতেই সহ্য করিব না যে, বড়লোক মাত্রই মনুষ্যত্বহীন, অহেতুক অত্যাচার করাই তাহাদের পেশা, গরীবের অক্ষমতার সুযোগ লইয়া ঘর জ্বালাইয়া দেওয়াতেই তাহাদের আনন্দ।

পিতার রোগের দুর্ভাবনা ও আমার এই মনোবিকার লইয়া আমি যখন বিক্ষুব্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলাম, তখন একদিন সহসা পটপরিবর্ত্তন ঘটিল।

সন্ধ্যার সময়ে কোনও কালেই বাড়ীতে ঢুকি না, ইহা আমার অভ্যাস নাই। চরিত্রকে গোপন রাখিয়া ও কৈফিয়ৎ বাঁচাইয়া অনেক রাত্রেই বাড়ী আসিয়া পৌছাই। কিন্তু পিতৃদেবেতার অসুখের জন্য চরিত্র রক্ষা করিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ঢুকিতেছিলাম, দেখিলাম একটি যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিছু নেশা করিয়াছিলাম, সেই কারণে চোখ মুখের চেহারা সহজ ছিল না, প্রাণের ভিতরে কিছু রাজসিক উল্লাস সঞ্চিত হইয়াছিল।

ছোকরা আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

কে আপনি?

আমার নাম শ্যামাকান্ত ভট্টশালী।

কি চাই বলুন?

আপনাকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।

চোখ রগড়াইয়া মুখের গন্ধ চাপিয়া, তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলাম। পরে বলিলাম, কোথা থেকে আসছেন আপনি? কোথায় যাবো?

শ্যামকান্ত কহিল, আমাকে চিনতে পারলেন না?

বলিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত আপনি।

সে কহিল, হারিকেনের আলোয় দেখেছিলেন, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় তাই মনে পড়ছে না।

বলিলাম,পূর্ব্বজন্মেও আপনাকে আমি দেখিনি।

ছোকরা আমার কথায় হাসিমুখে বলিল, সরোজিনী দেবীর মৃত্যুর দিনে আমরা ঘরে ছিলুম, আপনি দেখেন নি?

ও,—স্যরি! কি চাই আপনার?

দিদি একবার আপনাকে ডাকছেন।

ছলনাময় বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়া কহিলাম, দিদি কে?

মৃণ্ময়ী।

পুনরায় শ্যামাকান্তের মাথা হইতে পা অবধি লক্ষ্য করিলাম। বলিলাম, তিনি কি আপনার সহোদর ভগ্নী?

আজ্ঞে না।

তবে কি অতি-আধুনিক দিদি?

কথাটা বোধ হয় শ্যামাকান্ত বুঝিল না, বলিল, যদি একটু তাড়াতাড়ি আসেন ত' ভাল হয়, তিনি রাস্তায় অপেক্ষা করছেন।

ভিতরে ভিতরে অসীম উল্লাস বোধ করিলাম, বাহিরে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কহিলাম, কি দরকার আপনি জানেন?

আমি ঠিক জানিনে, তাঁর কাছেই শুনবেন।

তবে একটু অপেক্ষা করুন, আসছি—বলিয়া আমি ভিতরে গেলাম। উপরের ঘরে গিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চুল ফিরাইলাম। শরীরটা ঠিক নিজের আয়ত্তে নাই, মাথার ভিতরটা একটু মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, মৃণ্ময়ীর পূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া একটু সম্ভ্রম করিয়াছি, এইভাবে তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইতে কেমন যেন ভরসা পাইলাম না। কিন্তু এখন আর উপায় নাই; যাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া কামনা করিয়াছি, সে দরজায় আসিয়া উপস্থিত। পৈতৃক দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পারি, কিন্তু পিতামাতার হইয়া অবশ্যই ক্ষমা চাহিতে পারিব। তাহার পর তাহাকে ভালবাসিয়া অতীত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া দিতে পারিব।

কয়েকটা এলাচ মুখে পুরিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। শ্যামাকান্ত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়া বীডন ষ্ট্রীট দিয়া আসিয়া হেদুয়ার কোনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, মৃণ্ময়ী সেখানে দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ লক্ষ্য করিতেছে। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে নমস্কার করিল না, অভ্যর্থনা জানাইল না, কেবল শ্যামাকান্তকে বলিল, তুমি আর দাঁড়িয়ো না নীরেন, চ'লে যাও। আনা দুই পয়সা দিন্‌ত ওকে?

আমি স্তম্ভিত হইয়া পকেট হইতে দুই আনা বাহির করিয়া দিলাম। শ্যামাকান্ত চলিয়া গেল। তারপর বলিলাম, এ যেন একটা ভেল্‌কি। ও যে বললে ওর নাম শ্যামাকান্ত ভট্টশালী?

মৃণ্ময়ী হাসিমুখে বলিল, আমি শিখিয়ে দিয়েছিলুম।

বলিলাম, তোমাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখছি কোন্ দিন আমিও পুলিসে ধরা পড়বো।

ভয় নেই, পুলিশ মানুষ চেনে। আসুন, এইদিকে যাই।

চলিতে চলিতে বলিলাম, হঠাৎ এই মনুষ্যত্বহীন বড়লোকটিকে স্মরণ করলে কেন, মৃণ্ময়ি?

বড়লোককে স্মরণ না করলে আমরা যাই কোথা?

ঠিকানা জানলে কি ক'রে?

আপনাদের ঠিকানা ছোটবেলা থেকেই জানি।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে পুনরায় কহিল, আপনার বাবার ত খুব অসুখ, নয়?

বলিলাম, কেমন ক'রে জানলে?

মৃণ্ময়ী হাসিল। বলিল, আপনি আজ বিকেলে ধর্ম্মতলার হোটেলে ঢুকেছিলেন কেন?

আমি ভয় পাইয়া মাথা নীচু করিলাম। মৃণ্ময়ী চলিতে চলিতে বলিল, শ্যামাকান্ত ভট্টশালী আর হরিহর মোদককে রেখেছি আপনার পেছনে পেছনে।

বলিলাম, তোমার কি উদ্দেশ্য, মৃণ্ময়ি?

সত্যি বল্‌ব?—মৃণ্ময়ী বলিল, আপনাকে এই নীতি শিক্ষা দেওয়া যে, বড়লোকের ছেলে ব'লেই টাকা নষ্ট করার অধিকার আপনার নেই।

এইবার হাসিলাম। বলিলাম, এই কথা শোনাবার জন্য বুঝি এত দূর এসেছ?

হাঁ, আজ সারাদিনে অন্ততঃ দশ মাইল হেঁটেছি, দু'দিন আমাদের অন্ন জোটেনি, কারণ পয়সা নেই।

বলিলাম, তা'হলে বড়লোকের মনুষ্যত্ব তোমরা তখনই স্বীকার করতে পারো, যখন তারা টাকা দিতে পারে?

মৃণ্ময়ী বলিল, না, রাজেনবাবু। মনুষ্যত্ব তাদের কোনোদিনই নেই—নেই বংশপরম্পরায়। আমরা তাদের মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়ে সম্মান মূল্য আদায় করি।

কে তোমরা?

আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়মকর্ত্তা।

বলিলাম, কিন্তু নিধিরাম সর্দ্দারদের ঢাল তরোয়াল কই?

আছে, যথাসময়ে আপনাদের ঘাড়ে পড়বে—বলিয়া মৃণ্ময়ী হাসিল।

এই বুঝি তোমাদের বিপ্লবের আদর্শ? আমাকে ডেকে এনে এই কথাই প্রচার করতে চাও?

না,—মৃণ্ময়ী বলিল, তার চেয়ে বড় কাজ আপনাকে দেবো।

যথা?

স্বার্থত্যাগের মহৎ ব্রত।

আমি চলিতে চলিতে মৃণ্ময়ীর দিকে এইবার একবার ভাল করিয়া চাহিলাম। সত্য বলিব, মাতৃবিয়োগের শোক ও সেই সেদিনকার গভীর দুশ্চিন্তার সুগভীর কালো ছায়া তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে। সারাদিনের পথশ্রম ও ক্লিষ্টতা তাহার টসটসে তরুণ মুখশ্রীকে যেন সুন্দর করিয়াছে। ভাঙা চুলের গোছা তাহার মুখে চোখে; আভরণ কোথাও কিছু নাই; সামান্য জামা, সামান্য শাড়ী, কিন্তু প্রচুর স্বাস্থ্যের উপকরণ সর্ব্বাঙ্গে থরে থরে সাজানো। আমি মনে মনে লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। আশান্বিত হইলাম।

মৃণ্ময়ী কহিল, কি, চুপ ক'রে রইলেন যে?

ভাবছি ছোটবেলাকার কথা, তুমি সেই শিবের গাজন গাওয়া মেয়ে, এখন বিপ্লবীদলের দিদি। একটা কথা কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে ক'রে, মীনু।

বলুন?

তোমাকে এমন বোকা বানালে কে?

আপনাদের মতন বড়লোকেরা।

কিন্তু তাদের ওপর রাগ ক'রে এমন জীবনটা নষ্ট করবে?

মৃণ্ময়ী প্রশ্ন করিল, নষ্ট আপনি কা'কে বলেন?

লুব্ধ, উজ্জ্বল, একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, এই সবই কি তোমার কাজ?

আমার কণ্ঠে বোধ হয় মধুর আস্বাদ ছিল; পথের নির্জ্জনতা হয়ত আমাকে অল্পে অল্পে মোহগ্রস্ত করিতেছিল। রাত্রির কলিকাতার পথের আলোছায়া মৃণ্ময়ীর ললাটে, গ্রীবায়, বক্ষে কী যে মায়া বুলাইল তাহা বলিতে পারিব না। আমি কেবল মাত্র একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিলাম, এবং সেটি পাইলেই শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া নিরুদ্দেশ শূন্যে এমন ভাসিয়া যাইতাম যে, পিতার অসুখ, আমার কর্ত্তব্য, বাড়ী ফিরিবার কথা, মৃণ্ময়ীর পরিণাম,—কিছুই চিন্তা করিতাম না।

নিজের কণ্ঠে পুনরায় মধু ঢালিয়া বলিলাম, মৃন্ময়ি, এ তোমার ঠিক পথ নয়, তা তুমি জানো?

মৃণ্ময়ীর নীরবতা সহসা বিদীর্ণ হইল। সে একটু সরিয়া গিয়া বলিল, রাজেনবাবু, আপনার নিজের পথটা কি? নেশায় টলটল করছেন, একজন মেয়ে এসেছে সাহায্য চাইতে, তাকে কি ভাবে অপমান করবেন তারই ফন্দী আঁটছেন মনে মনে; আপনার বাবার অত বড় অসুখ, সেদিকে আপনার ভ্রূক্ষেপ নেই; আমরা উপবাস ক'রে রয়েছি দু'দিন, আপনি গ্রাহ্য করলেন না—

আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

মৃণ্ময়ী পুনরায় কহিল, আমি এলুম আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে, মিনতি জানাতে; এলুম আমার ছোট ভাইবোনদের অন্নবস্ত্র চেয়ে নিতে,—আর আপনি আমাকে পথ ভুলিয়ে দিতে চান্। আপনার পথটা কি এই?

আমার নেশা কাটিয়া গেল। পুনরায় ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে বলিলাম, দেশে এত বড়লোক থাকতে আমার মতন লোকের কাছে সাহায্য চাওয়ার রহস্য কি?

রহস্য কিছু নয়।—মৃণ্ময়ী বলিল, টাকা অপব্যয় যারা করে, তারা সদ্ব্যয়ও কিছু করে বৈকি। আপনি ত কৃপণ নন্।

একখানা খালি ফীটন্ গাড়ী দেখিয়া ডাকিলাম। মৃণ্ময়ীকে বলিলাম, ওঠো।

ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অনেক ভাড়া নেবে যে?

তা হোক, এসো।

সে উঠিয়া বসিল। আমি তাহার পাশে বসিলাম। সে কহিল, এ সব ছাই খান্ কেন? এলাচের গন্ধে আপনার মুখের দুর্গন্ধ ঢাকা পড়েনি।

বলিলাম, আর লজ্জা দিয়ো না, কোন্ দিকে যাবে ব'লে দাও।

মৃণ্ময়ী কহিল, একটা সর্ত্তে কিন্তু আপনার সঙ্গে গাড়ীতে উঠলুম ব'লে রাখছি।

সর্ত্তটা কি।

আমাকে অনেক টাকা দেবেন।

অনেক টাকা তোমার কি হবে?

অনেক দরকার।

আমার স্বার্থ?

মৃণ্ময়ী বলিল, যে-টাকা আপনি জুয়া খেলেন, যে-টাকা আপনি সিনেমা আর থিয়েটারের গ্রীণরুমে খরচ করেন, যে টাকা নেশায় দেন্, সেই টাকাটা দিন দরিদ্রদের।

বলিলাম, দরিদ্রদের? পঁয়ত্রিশ কোটির জন্যে নিজের আনন্দ মাটি করব?

আপনার জীবনের লক্ষ্য কি?

আমার জীবনের লক্ষ্য এই নয় যে, জনকয়েক অক্ষম বেকার ভবঘুরের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হবো!

মৃণ্ময়ীর গলার আওয়াজ যেন একটু ভারি হইয়া উঠিল। বলিল, আর যারা কোনো ভাল কাজের জন্যে জীবনপাত করে, তাদের জন্যে একটু স্বার্থত্যাগ করা যায় না?

ভাল কাজ?—হাসিয়া উঠিলাম,—এর কি কোনো বাঁধা-ধরা হিসেব আছে? ভাল কাজ করার চেয়ে ভাল ক'রে বাঁচাটা অনেক বেশি দামি মৃণ্ময়ি। এই ধরো তোমার জীবন, তুমি কল্যাণ করে গেলে পরের জন্য, তোমার দিকে চাইলে কে? তুমি পেলে যশ, পেলে প্রতিষ্ঠা, পেলে হাততালি—কিন্তু বুকের ভেতরকার মরুভূমি হা হা ক'রে ত' জ্বলতেই থাকলো। বড় আদর্শের জন্যে তুমি সারাজীবন ধ'রে তিল তিল—

আমি বোধ করি আরও বক্তৃতা দিতাম, কিন্তু মৃণ্ময়ী গাড়োয়ানকে বলিয়া গাড়ী থামাইল। বলিল, আসুন, আমাকে কিছু বাজার ক'রে দেবেন। আঃ, কী বকতেই পারেন আপনি।

তাহার সেই অদৃশ্য অপোগণ্ড সখের ভাইগুলার উপর অসীম বিরক্তি ও আক্রোশ লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম এবং আধঘণ্টা ধরিয়া কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া জীবনেও যাহা করি নাই, সেই দোকান-বাজার ঘাড়ে করিয়া গাড়ীতে চাপাইয়া আবার গাড়োয়ানকে চালাইতে বলিলাম। গাড়ী দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল, আমি মেঘমলিন মুখে গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। আসল প্রাপ্তির কথাটা এখনও চাপা পড়িয়া আছে ভাবিয়া রাগ হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের অনুগ্রহলাভের জন্য জীবনে অনেক সহ্য করিয়াছি, ইহাও সহ্য হইবে। দেখিতেছি ইহার শাখা-প্রশাখা অনেক দূর অবধি বিস্তৃত, সমস্ত শিকড়গুলি একে একে উৎপাটন করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে; ধৈর্য্য

হারাইলে চলিবে না। দুই দিক্ হইতে দুইটা অসুবিধা আমাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমতঃ মেয়েটার সহিত আমার আবাল্য পরিচয়, অর্থাৎ অসভ্যতা প্রকাশ করিতে একটু বাধে; দ্বিতীয়তঃ, ভাল রকম লেখাপড়া জানে, চিত্তদৌর্ব্বল্যের অন্ধিসন্ধিগুলা বড় তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলে; পাকা পাকা কথা বলে। মিষ্ট করিয়া দু'কথায় ভুলাইয়া প্রশ্রয় পাইবার উপায় নাই। টাকাপয়সাগুলা কোন্ অতলে তলাইতেছে কে জানে!

আমি তাহাকে পথ ভুলাইতে গিয়া নিজে পথ ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু মৃণ্ময়ী পথ ভুল করে নাই। আমার চোখে মুখে যে-পরিমাণ আবেশ-পুলক সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার ছিল সেই পরিমাণ উৎকণ্ঠা। আমার চোখ ছিল তাহার প্রতি, তাহার দৃষ্টি ছিল পথ ফুরাইবার দিকে। এতগুলি কথা এতক্ষণ ধরিয়া যে তাহাকে বলিলাম, তাহা যে কেবল তাহার মনে কোনো আঁচড় কাটে নাই তাহাই নহে, সে গ্রাহ্যই করে নাই। শুধু পরাজিত এবং উপেক্ষিত নহে, আমি যেন পুনরায় অপমানিত বোধ করিলাম।

এক সময়ে সে গাড়ী থামাইল। বলিল, এইখানে নামতে হবে।

এতক্ষণে চমক ভাঙিল। পল্লীটার দিকে চাহিয়া সহসা ভয় পাইলাম। চারিদিকে বস্তি, ভদ্রসমাজ কোথাও নাই। কুলী, মজুর, কলকারখানা, বিড়ির দোকান, পতিতালয়, বাজার এবং চারিদিকে কুৎসিৎ হট্টগোল। বলিলাম, কোথায় থাকো তোমরা?

এই সামনের গলিতে।—মৃণ্ময়ী পিছন ফিরিয়া দেখাইল।

অন্ধকার গলিটার দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিলাম না, কেবল বুঝিলাম সেই সুড়ঙ্গপথে জন্তুজানোয়ারের আনাগোনাই বেশি মানায়। মৃণ্ময়ী সহিসকে দিয়া জিনিষ-পত্রগুলি নামাইয়া লইল এবং আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিল, শীগ্‌গির নেমে আসুন, এটা গাড়ী দাঁড়াবার জায়গা নয়।

বলিলাম, আমার যাবার কি দরকার?

সে বলিল, যারা এখানে আছে, তারা আভিজাত্যে কম নয় আপনার চেয়ে, রাজেনবাবু।

মার খাইয়া, গাড়ীভাড়া দিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই দাঁড়াইল, চাবুকের শব্দ না করিলে আমাকে দিয়া কোনো কাজ পাওয়া যাইবে না। তাহার সহিত আসিয়া যেখানে দাঁড়াইলাম, তাহা একটা ভৌতিক রাজ্য। গাড়ীর সেই সহিসটা আন্দাজে ঠাহর করিয়া মাথা হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আমার মনে হইল—কলিকাতা শহর হইতে শত সহস্র মাইল নির্ব্বাসনে আসিয়া পড়িয়াছি; কেহ বাহির করিয়া না দিলে, আর এই গোলকধাঁধাঁ হইতে বাহির হইতে পারিব না। মৃণ্ময়ী আমাকে দাঁড় করাইয়া কোথায় যে মিশাইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না, মনে হইল গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিয়া ভাল করি নাই। একবার উপর দিকে চাহিয়া একটুখানি আকাশ দেখিতে পাইলাম। যাহা সন্ধ্যা হইতে লক্ষ্য করি নাই, তাহাই এতক্ষণে চোখে পড়িল। দেখিলাম ফিকা একটুখানি জ্যোৎস্নার আভাস কায়ক্লেশে এই খোলার চালের ভিতর দিয়া উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে। পাশেই জলের ধারা বহিতেছিল, সেই জল প্রেতিনীর চক্ষুর ন্যায় আমার দিকে মাঝে মাঝে কটাক্ষ হানিতেছিল। আমি নিরুপায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আলোর রেখা দেখা গেল। মৃণ্ময়ী বাহির হইয়া আসিল। কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কারো পায়ের শব্দ পাননি ত?

বলিলাম, পায়ের শব্দ! কা'র?

কত লোক আসে। দুষ্ট লোক বরং ভাল কিন্তু ভদ্রলোকেরা বড়ই সন্দেহজনক। আমরা এখানে প্রাণ হাতে ক'রে থাকি।

গা ছম-ছম করিয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিলাম, পুলিসের কথা বলছ?

মৃণ্ময়ী অদ্ভুত হাসি হাসিল। বলিল, বস্তির মেয়ে-মানুষকে কেউ সন্দেহ করে না। আসুন।—বলিয়া আলোটা হাতে করিয়া সে অগ্রসর হইল।

মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও নাই, আমাকে লইয়া মৃণ্ময়ী কি উদ্দেশ্য সাধন করিবে তাহাও জানি না, কিন্তু মাটির দাওয়ার উপর পা বাঁচাইয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া একটি

কুঠরীতে আসিয়া ঢুকিলাম। উঁচু নীচু মাটির উপর খবরের কাগজ ও দরমা পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করা এবং সমস্ত ঘরে ছোট্ট একটি স্যুটকেস ছাড়া আর কোথাও কোনো আসবাব নাই। আমি এই প্রেতপুরীর ভিতরে ঢুকিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলাম, এইটি বুঝি তোমার ঘর, মীনু?

হ্যাঁ, বসুন। এখানে আদরও নেই, অবহেলাও নেই।

দুই জনেই বসিলাম।

বলিলাম, তুমি একা থাকো এখানে?

একা!—মৃণ্ময়ী বলিল, আট ভাই বোন আছি পাশাপাশি ঘরে। ডাকবো তাদের? ওরা নিঃসাড়ে প'ড়ে আছে। আপনি যে নতুন মানুষ। অপরিচিত কেউ এলে ওরা গা ঢাকা দেয়।

ওরা কি করে?

কিছুই করে না, শুধু লুকিয়ে থাকে নাম ভাঁড়িয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যটা কি জানেন? ভাইরা যখন থাকে না, অনেক মাতাল আসে,—মনে করে এটা বেশ্যালয়।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, সম্মান গেলে জীবনে আর থাকে কি মৃণ্ময়ী?

মৃণ্ময়ী বলিল, সম্মান লোক কেড়ে নিতে পারে না, রাজেনবাবু, নিজের সম্মান থাকে নিজেরই মধ্যে। প্রবলের কাছে মহতের অপমান খুবই সহজ, কিন্তু তাই ব'লে মহৎ আপন মহিমা হারায় না।

জীবনে যে-প্রশ্ন আমার ন্যায় অধঃপতিতদের মুখে কোনওদিনই আসে নাই, আজ এই রাত্রির অন্ধকারে স্তিমিত প্রদীপ শিখার আলোয় বসিয়া মৃণ্ময়ীর অপরিসীম যৌবনের দিকে চাহিয়া সেই প্রশ্নই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বলিলাম, কিন্তু নারী-ধর্ম্মরক্ষার একটা কথা থাকে ত? অর্থাৎ বলপূর্ব্বক যদি কেউ—

মৃণ্ময়ী বলিল, আপনি যদি অত্যাচার করেন আপনিই ছোট হবেন, আমার কোনো ক্ষতি হবে না।

হঠাৎ হাসিয়া বলিলাম, হবে না? বলো কি?

সহসা যেন বাঘিনীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, না, সে-ক্ষতি আমাকে স্পর্শও করবে না।

অনেকক্ষণ পরে বলিলাম, তবু একটা কথা যাবার সময় আমি ব'লে যাবো, আমাকে ক্ষমা ক'রো মীনু। গায়ে পড়া কোনো উপদেশ তোমাকে দিয়ে যেতে আর আমার সাহস নেই, কারণ আমাদের রুচি আর আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি বলছি আমাদের বাল্য পরিচয়ের অধিকার নিয়ে, আমরা সেই দুটি উলঙ্গ বালক বালিকা গ্রামের পথে শিবের গাজন গেয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতুম—আকাশ আর বাতাস আর সোণার ধানক্ষেত আমাদের কাণে কাণে কত কি কথা শোনাতো; সেই-দিনকার সেই বাল্যস্মৃতির অধিকার নিয়ে জানতে চাইছি, এই অভিশপ্ত, পলাতক, দরিদ্র আর হতমান জীবন কি তোমার ভাল লাগে?

লাগে।—মৃণ্ময়ী বলিল।

কেন—কেন লাগে? বলবে আমাকে?

অনুপ্রাণিত কণ্ঠে মৃণ্ময়ী বলিতে লাগিল, সেই সোণার ধানক্ষেত আমার দেশ নয়, রাজেনবাবু। এইখানে, এই যন্ত্রণার মাঝখানে, এই দারিদ্র্য আর অপমান, এই উৎপীড়ন আর পাশবিকতা—এর মাঝখানে খুঁজে বা'র করতে পারছি আমার সোণার দেশের হৃৎপিণ্ড। উপবাসে আর যক্ষ্মায় যারা ধুঁকছে, আপন জীবনের ভিত্তিকে যারা অজ্ঞানে বিষাক্ত ক'রে তুলছে, যারা পাপ আর অন্যায় আর দুষ্কৃতিকেই ধর্ম্ম ব'লে মেনেছে—সেই সব মূঢ় পশু পঙ্গু আর বিকলাঙ্গদের নিয়ে আমি ঘর বেঁধেছি। আমিও সেই অভিশপ্ত দলের সঙ্গে এই প্রকাণ্ড প্রশ্নের সমাধান করতে চাই, পৃথিবীতে একদল কেন স্ফীত, আর একদল কেন কৃশ! একদল কেন হবে অন্নদাতা, আর একদল কেন বা অন্নহীন! সোণার ধানক্ষেত নয়, রাজেনবাবু, আমার ভাইবোনদের সঙ্গে এই কাজেই আমি নেমেছি। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন কিনা বলুন।

বলিলাম, আমি পুলিসকে অত্যন্ত ভয় করি, কারণ এদেশের পুলিস ভয়ঙ্কর। তোমাদের বে-আইনী সাহায্য করব কেন?

মৃণ্ময়ী বলিল, যদি বলি মনুষ্যত্বের আইনে?

তুমিই ত বলেছ—বড়লোকের মনুষ্যত্ব নেই!

তাহ'লে আপনারা যে আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, তারই না হয় ক্ষতিপূরণ করুন?

বলিলাম, পিতার অপরাধে পুত্রের প্রতি দণ্ড?

মৃণ্ময়ী সহসা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আপনার বাবার কোনো অপরাধ নেই।

সান্ত্বনা দিয়ো না, মৃণ্ময়ী।

সত্যিই বলছি।

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, যিনি স্বহস্তে তোমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন তাঁকে অপরাধী বলবে না? তোমরা মা-মেয়ে সংসারে কত ছলনাই জানতে?

আমার আকস্মিক অসংযত মন্তব্য শুনিয়া স্খলিতবস্ত্রে মৃণ্ময়ী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সটান গিয়া ঘরের কোন্ হইতে ছোট সুটকেসটা আনিয়া খুলিল। ভিতরে ছোট একটা কাপড়ের মোড়ক ছিল, সেটি খুলিয়া অতি পুরাতন একখানি বাংলা ভাষায় লেখা পত্র ধীরে ধীরে খুলিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল, ভাল ক'রে দেখুন ত', হাতের লেখাটা কা'র চিনতে পারেন?—এই বলিয়া সে আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া স্খলিত কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, আমার বাবার হাতের লেখা—

এইবার সবটা পড়ুন,—মৃণ্ময়ী দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করিল।

"সরোজিনী, তোমার ঘর পোড়াইলাম, তাহার কারণ তোমার ও আমার ভিতরকার সম্পর্ক বর্ত্তমান সমাজ এবং আমার স্ত্রী স্বীকার করিল না। তোমার ইহ জীবনের সমস্ত ভার আমি গোপনে বহন করিব। তোমার কন্যার বিবাহের জন্য তোমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলাম।

ইতি—তোমার ব্রজেন্দ্র"

স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া মৃণ্ময়ীর মুখের দিকে চাহিলাম। মৃণ্ময়ী চিঠি লইয়া সুটকেশে রাখিয়া সেটি পুনরায় তুলিয়া আসিল। তারপর ডাকিল, রাজেন্দ্রবাবু?

সাড়া দিতে পারিলাম না।

শুনছেন? চিঠি দেখানো কি অন্যায় হল?

মুখ তুলিলাম। সে কহিল, আবার আসছেন ত?

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। তারপর বুকপকেট হইতে মণিব্যাগটা বাহির করিয়া তাহার দিকে ফেলিয়া দিলাম। সে একটু চিন্তিত হইয়া আমার দিকে একবার চাহিল, তারপর মণিব্যাগটা তুলিয়া কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় ব্যাগটা আমার বুকপকেটে রাখিয়া দিল।

বোধ করি আমার উঠিবার শক্তি ছিল না, হাত পা সত্যই অবশ হইয়া গিয়াছিল। মৃণ্ময়ী বুঝিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল, এবং হাত ধরিয়া সন্তর্পণে বাহিরে আনিয়া গলির মুখে দিয়া বলিল, এরপর যেন বাবুকে আর খুঁজে আনতে না হয়।

আমি তাহার কথার উত্তর দিলাম না, কেবল আমার পিতামাতার হইয়া তাহার তথাকথিত কলঙ্কবতী মৃতা জননীর নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রর্থনা করিতে লাগিলাম। সমস্ত পথটা ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিলাম। আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল।

—ক্রমশঃ

অভিশপ্ত

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

বিরহের তীব্র দুখে সুদীর্ঘ রজনী
জাগরণে কাটে নাই যার
অশ্রুজলে ভাসি বার বার,
জাগাভে প্রিয়ার স্মৃতি সদা শূন্য মনে
যে জীবনে আসেনি আষাঢ়

অভিশপ্ত সে হৃদয়—জানে না যে প্রাণময়
কোথা থেকে প্রেমের ঠাকুর
নিখিল মানবজনে প্রতিদিন পলে পলে
শুনাইছে আনন্দের সুর।

শতবর্ষ পূর্ব্বে মাহেশের রথযাত্রা

শ্রীজহরলাল বসু

আমাদের দেশে হিন্দুদের রথযাত্রার পর্ব্ব বা উৎসব অনেকদিন হইতে প্রচলিত। দারুব্রহ্ম জগন্নাথের এই রথযাত্রার উৎসব বর্ষাকালে আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই পূর্ব্বেতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। কেই বা ইহার প্রবর্ত্তক, বা ঠিক কোন সময়ে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন—তাহা আজিও অবধারিত হয় নাই।

এই রথযাত্রা পর্ব্বটীর মূলে হিন্দুদের পুরাণাদিলব্ধ তত্ত্ব কতদূর নিহিত তাহাও বলা যায় না। অনেকের মতে রথস্থিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই মূর্ত্তিত্রয়ের কল্পনা বৌদ্ধদের ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্ন হইতে লব্ধ। সেটাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে রথারূঢ় এই ত্রিমূর্ত্তিকে হাত কাটা আকারে পরিকল্পনা প্রবর্ত্তকের শুধু রুচিহীনতা বা বিবেকশূন্যতার পরিচয় দেয়।

পুরীর রত্নবেদিকায় প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের ত্রিরত্ন মূর্ত্তি ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘই কালক্রমে হিন্দুদের প্রভাব পুনর্বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা নামান্তর গ্রহণ করে এবং তথায় বৌদ্ধ ও হিন্দু এতদুভয়ের সংমিশ্রণে একটা জগাখিচুড়ি রকমের, না বৌদ্ধ না হিন্দু ধরণের, পূজাপদ্ধতি বা উৎসবানুষ্ঠান গড়িয়া উঠে। হিন্দুদের রথযাত্রা মানে হইল রথারূঢ় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার কংশবধার্থে অভিযান।

কালক্রমে এ উৎসবটি ব্যাপকতা লাভ করে ও বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। যদিও পুরীর রথই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং এই রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সমাগম হয়; কিন্তু সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় এ বৎসর এই রথযাত্রায় বাঁকুড়ায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইহার পিছনে অন্য কারণ থাকিলেও তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তঃপাতী মাহেশের রথও অনেক দিনের। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বেকার সাময়িক পত্রে মাহেশের এই রথযাত্রার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণ হইতে তখনকার ও এখনকার এই মেলা অনুষ্ঠানের বা উৎসব-উপভোগের তারতম্য সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্নে তখনকার রথযাত্রার বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

"মাহেশ ও বল্লভপুর গ্রামদ্বয়ে রথযাত্রায় পূর্ব্বে যেরূপ লোকের জনতা হইত এ বৎসর তাহার দশাংশের একাংশ লোকের সমাগম হয় নাই। * * * এই যাত্রা ন্যূনাধিক সপ্ততি বা অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর প্রাগল্‌ভ্যরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১২৫৭ সালে জগন্নাথ এবং রাধাবল্লভপক্ষীয় সেবায়তগণের মধ্যে প্রণামি উপলক্ষে যে এক বিরোধের প্রণালী অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত হইতেছিল তাহা জলিয়া উঠিল। * * * মান্য বদান্যবর মৃত কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহোদয় মাহেশের দারুভূত মুরারির আরোহণার্থে দারুময় রথ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। * * কোম্পানি বাহাদুর মাহেশের পথ বিস্তার করিবার এবং এতন্নগর দিনেমারদিগের দ্বারা সুশোভিত হইবার অপিচ এতন্নগরের বিশেষ নিয়ম থাকা প্রযুক্ত নানা স্থানীয় ধনবান্ এতন্নগরের আশ্রিত হইয়া এই পর্ব্ব ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া উঠিল এবং সেই ব্যাপকতা সহ বহু মনুষ্যের সমাগমে অনেক প্রণামীর আগমন * * *।"
(জ্ঞানারুণোদয়, ১ খণ্ড, ১২৫৯ সাল—পৃঃ ৯৪)

এই সঙ্গে ১২৮০ সালের বসন্তক নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত স্নানযাত্রার বিবরণও নিম্নে প্রদর্শিত হইল:

"এ পরবটী প্রায় মাঝারী দলের ইয়ার লোকেরাই একচেটে কোরে নেছেন। বড় বড় নামজাদা ইয়ারেরা এটাতে পূর্ব্বে বড় আমোদ করেছেন ও এখন নাম খাতায় উঠে ডাকসাইটে হয়ে পড়েছে। যারা সকল ইয়ারকির পথে নূতন কাক তাদেরই এটা বড় দরকারী, একখান গহনার নৌকা বোঝাই কোরে মেয়ে মানুষকে দুচার বার স্নানযাত্রায় নিয়ে যেতে না পাল্লে ইয়ারের দলে নামজারী হবার যো নাই ও পুরাণো কুরুচেরা তা হলে কল্কে দেবেন না। স্নানযাত্রার জন্য সকলেই অগ্রের দিবস রাত্রে কলিকাতা থেকে রওনা হয়। তা' এবারে রবিবারে স্নানযাত্রা পড়াতে

বড়ই সুবিধে হয়েছিল, অনেক চাকরেকে সাহেবের নিকট বাপের ব্যামো হয়েছে বলে ছুটি নিতে হয় নি। শনিবারের রাত্রে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে যাত্রা কোরেছিল —সকলেই সরঞ্জাম আপন আপন সাধ্যমত কোরেছিল— তিলকাঞ্চন থেকে দানসাগর পর্য্যন্ত বল্লে বলা যায়। কিন্তু রবিবারের সকাল বেলা সহরে বড় রগড় উঠেছিল— মল্লিকদের যোল বছরের ছেলেটিকে রাত্রে না দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর মা কেঁদে কেটে পড়ে আছে, দত্তদের মেজ কর্ত্তা লোহার সিন্ধুকে এক তোড়া টাকা কম দেখে বুকে হাত দে পড়েছেন। শীলদের সেজবোর হাতের খাড়ুগাছটা পাওয়া যাচ্ছে না, ঢোলেদের হাতবাক্সটি খিড়কির দ্বারে ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে, সেকরাদের পাত্‌কোতলার ঘটিটী হারায়েছে। এইরূপ গণ্ডগোলে সহর ভরা—স্নানযাত্রার এই কি ধর্ম্ম?"

উপরের এ বর্ণনাটি পড়িলে হুতোমের দ্বাদশ গোপাল বর্ণনা মনে পড়ে: আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবু বিলাসও মনে পড়ে। এই সকল বিবরণের ভাষা লঘু হইলেও সে সময়কার সমাজের প্রচলিত রুচি বা দেশীয় আচার পদ্ধতির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

বন্ধু

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

সুবিমল তাহার প্রিয় বন্ধু অজয়ের আগমন আশায় বসিয়া আছে, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানা ডাকের চিঠি তাহার হাতে দিয়া গেল। মেয়েলী-ছাঁদের হাতের লেখা দেখিয়া সুবিমল প্রথম বিস্মিত হইল। পরে লেখাটা চিনিতে পারিয়া একান্ত কৌতূহলে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল:

"বিমল দা,

পরশু আমার জন্মতিথি। বাবা অবশ্য আপনাকে যথারীতি নিমন্ত্রণ কর্‌বেন, তবু এই সুযোগে আপনাকে দু' কলম লেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

আমার জন্মদিনে আপনি কি উপহার দিবেন? আমি চাই এমন একটা জিনিষ, যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না— জলে, স্থলে কোথায়ও জন্মায় না। অর্থাৎ খুব সুন্দর একটী কবিতা!

আসবেন কিন্তু! আপনার যা ভোলা মন, হয়তো আপনার ঐ অদ্ভুত বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে সব ভুলে যাবেন! মনে থাকে যেন।

গীতা।"

পুঃ—আপনার বন্ধুটীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন— বেশ মজা হবে। বাবার দ্বারা তাঁকে পৃথক নিমন্ত্রণ কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছি। ইতি

চিঠিটা দুই দুই বার পড়িয়া তৃতীয় বার পড়িবার উদ্যোগ করিতেই অজয়ের কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি পত্রটা পকেটে পুরিয়া সুবিমল বন্ধুকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইল।

অজয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যমুখে বলিল, একটা সুখবর আছে বিমল, তোর গুরুদেব ভোলানাথবাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর মেয়ের জন্মতিথিতে যোগদান করবার জন্য। কিরে ব্যাপার কি, বুড়োর মতলব টতলব আছে নাকি কিছু?

সুবিমল সোৎসাহে বলিল, যাবি অজয়? আমাকেও বলে দিয়েছে তোকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তোকে নিতে ইচ্ছেও হয় আবার ভয়ও হয়। কত রকমের লোক আসবে—হয়তো কারো সাথে মতে মিলবে না, অমনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উৎসব-ক্ষেত্র রণ-ক্ষেত্র করে তুলবি।

"তার মানে তুই বলতে চাস্ আমি ভদ্রসমাজে মিশবার উপযুক্ত নই।"

"অনেকটা তাই। তবে তোকে নিতে পারি তিনটী সর্ত্তে।"

"যথা?"

"১ নম্বর—তোর ঐ মোটা লাঠিটা সঙ্গে নিতে পার্‌বিনে। ২য়, অনাবশ্যক কথা বলতে পার্‌বিনে। ৩—"

"পেট ভরে খেতে পার্‌বিনে—"

"হ্যাঁ, তাই। তোর ঐ খাওয়া দেখলে ভদ্রলোকেরা সব অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকবে।"

"তবে সোজা কথায় বল্—ভদ্র হ'তে হ'লে এই তিনটী গুণ চাই, খালি হাতে চলা, লোকে শালা বল্লেও চুপ করে থাকা এবং বেশী খেতে না পারা। নমস্কার! এ শর্ম্মা তা পারবে না। দেশটা ডুবালি তোরা যত 'অ্যারিষ্টোক্রেটিকের' দল জুটে।"

"তবে তোর গীতা দেখা হ'ল না।"

"ব'য়ে গেল। আমার মতে খালি হাতে পথ চলে মূর্খ, গালি খেয়ে হজম করে কাপুরুষ, খেতে পারে না রুগী। এই তিনের সংমিশ্রণকে যদি আভিজাত্য বুঝায়, তবে সে আভিজাত্যের শিরে আমি শত বার পদাঘাত করি।"

"আহা চটিস্ কেন, আমি চাই তুই সেখানে গিয়ে হাস্যকর কিছু না করে বসিস্। জানিস্, সেখানে কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা সব আসবেন। আর তুই যদি কারো একটা তুচ্ছ কথায় রেগে তেতে 'লঙ্কাকাণ্ড' সুরু করে দিস্ তবে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় বল দেখি?"

অজয় হাসিয়া বলিল, আচ্ছা লাঠিটা যদি তোর আতঙ্কের কারণ হয় তবে ওটা উৎসবক্ষেত্রে নাই বা নিলাম।

সুবিমল বলিল, এই তো গুড্ বয়ের মতো কথা। আর একটা কথা তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি, শোন—মেয়েদের সঙ্গে মুখোমুখি হ'লেই যুক্তকরে নমস্কার করবি।

"তা, সে যে বয়সেরই হউক্?"

"হ্যাঁ,—না, তা কেন। ধর্ এই সর্দ্দা আইনের গণ্ডী পেরিয়ে গেছে যে সব মেয়ে। Say, sixteen and above."

"Sixteen! Sixteen তো আমাদের টুনীর বয়স রে।"

"তা হ'কৃগে। মেয়েরা নমস্য সব বয়সেই। বৃথা তর্ক করিস্ নে। আরে আসল কথাটাই বলা হয় নি। প্রেজেণ্ট দিবি কি বলতো?" জন্মদিন কিনা—"

"প্রেজেণ্ট মেয়েদের আর কি দেওয়া যায়। একখানা ভাল বই দিলে কেমন হয়—এই সাবিত্রী টাবিত্রী গোছের।"

"ড্যাম্ ইওর সাবিত্রী! ওসব আজকাল out of date."

অজয় থতমত খাইয়া বলিল, তবে শরৎ চাটুয্যের 'গৃহ-দাহ'?

সুবিমল বলিল, তা এক রকম চলে বটে। তাই দিস্।

অজয় ও সুবিমলে খুব ভাব। সুবিমলের বয়স ২৪।২৫, দেখিতে খুব সুন্দর। অজয়ের বয়স প্রায় সাতাশ। ব্যায়াম-পুষ্ট দীর্ঘ দেহ। দেখিতে অনেকটা আবাঙ্গালী গোছের। তিন বৎসর হইল এম, বি পাশ করিয়া প্রাইভেট প্র্যাকৃটিস্ করিতেছে। এই তিন বৎসর বিবাহের জন্য আত্মীয় স্বজন না করিয়াছে এমন কাণ্ড নাই।

ধনীর দুলালের এই অদ্ভুত খেয়াল দেখিয়া মেয়ের বাপদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের মূলে ছিল এক হাস্যকর ছেলেমানুষী। যৌবনের প্রারম্ভে মন যখন প্রাণরসে ভরপুর তখন নাকি তাহারা পরস্পরের দেহ ছুঁইয়া, অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাদের এই নিবিড় বন্ধুত্ব আজীবন অটুট রাখিবে। পাছে বৌ আসিয়া ভালবাসায় ভাগ বসায় এই ভয়ে তাহারা ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল — জীবনে বিবাহ করিবে না।

সুবিমল এখন কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, রাত দিন কল্পলোকে ভাসিয়া বেড়ায়। অজয় নাড়ী টিপে, মানুষের দেহে অক্লেশে ছুরি বসাইয়া বেশ দুই পয়সা উপায় করে। তবু তাহাদের কৈশোরের সেই প্রতিজ্ঞা তেমনই অটুট রহিয়াছে; এখনও তাহারা একজন আর একজনকে না দেখিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না—এমনি ছেলেমানুষ!

সুবিমলের ভালবাসায় সম্প্রতি একটু ভাঙ্গণ ধরিয়াছিল কিন্তু সে তাহা স্বীকার করিত না। তাহার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভোলানাথবাবু তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই এটা-ওটা উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইতেন। এই সূত্রে ভোলানাথবাবুর কন্যা গীতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। পরিচয় ক্রমে নিবিড় হইয়া প্রতিবেশীর অবসর-আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তখন ভোলানাথবাবু সুবিমলের সাংসারিক অবস্থার খবর লইতে গিয়া বড়ই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কবিতার খাতাখানা ছাড়া সংসারে তাহার মূল্যবান আর কিছুই ছিল না। বৃদ্ধ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন কিন্তু মেয়েকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না।

গীতা সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, বয়স ১৮।১৯। দেখিতে খুব ফর্শা না হইলেও মুখের চেহারায় বেশ একটা লালিত্য ছিল। এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের খুব সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু মুখের চেহারায় এমন একটা সারল্য মাখান লালিত্য থাকে যে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। গীতা ছিল ঠিক এই ধরণের মেয়ে। ছোট বেলায় মা হারাইয়া সরল প্রকৃতি পিতার অন্ধ ভালবাসায় মানুষ হইয়া স্বভাবটী হইয়াছিল তাহার বড়ই অগোছাল। মা-হারা মেয়েদের যেমন হইয়া থাকে।

ভোলানাথবাবু শুধু নামে ভোলানাথ ছিলেন না। কাজেও ছিলেন ভোলানাথ। পুরাকালের ভোলানাথকে সাদাসিধা গোছের দেবতা পাইয়া অনেক ষণ্ডা মার্কা দৈত্য দানব সস্তায় বর লইয়া অমর হইয়া দেবতাদেরই আবার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। একালেও এমন অনেক মানব-দৈত্য আছে যারা দাতার দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে একেবারে পথে না বসাইয়া ছাড়ে না। জীবন ভরিয়া পরের দায় ঠেকাইতে গিয়া নিজের যখন কন্যাদায় উপস্থিত হইল তখন তিনি সভয়ে দেখিলেন, বাস্তুভিটাটী পর্য্যন্ত দেনার দায়ে বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু পরের জন্য চিন্তা করাই যাহার হৃদয়ের ধর্ম্ম, নিজের কথা সে কখনও ভাবে না। ভোলানাথবাবুর সংসার তেমনই চলিতে লাগিল। আত্মীয়-অনাত্মীয়ে ভরা বাড়ীখানা তেমনই কাজের ও অকেজো লোকের সমাগমে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা তেমনই হাসিমুখে ফিরিতে লাগিল, সংসারানভিজ্ঞ ছোক্‌রার দল চাঁদার খাতায় তেমনই মোটা অঙ্ক বসাইয়া নিতে লাগিল।

গীতার জন্মতিথি উপলক্ষে এবার ভোলানাথবাবু একটু বিশেষ আয়োজন করিলেন। জানা অজানা অনেক তরুণ যুবককে নিমন্ত্রণ করিলেন, যদি ভাগ্যগুণে ক্রমে মেয়েটীর মতিগতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে।

দেখিতে দেখিতে রকম বেরকমের যান-বাহনে ভোলানাথবাবুর বহিরঙ্গন ভরিয়া গেল। গীতা তাহার বন্ধু লীলার সাহায্যে একে একে সকলকে সম্ভাষণ করিতেছিল। ভোলানাথবাবু কারণে অকারণে হাঁকা হাঁকি ডাকা-ডাকি করিয়া উৎসব-বাড়ীর কোলাহল অক্ষুণ্ণ রাখিতেছিলেন।

গীতার সন্ধানী চক্ষু কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। একটী পরিচিত পায়ের শব্দ শুনিবার জন্য অবাধ্য কাণ অনেকের সাগ্রহ বাক্য অবহেলা করিতেছিল। লীলা ব্যাপার বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, সুবিমলবাবু এলেন না যে এখনো?

গীতা নির্লিপ্ততার অভিনয় করিয়া বলিল, কে জানে হয়তো বন্ধুর সাথে গল্পে মজে আছেন।

লীলা কহিল, বন্ধু—অজয় ডাক্তার? ভারি চমৎকার লোক।

গীতা বলিল, তুই জানলি কি করে?

"আজ ভোরে বাবার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা নিয়ে কাকাবাবুর কথা হচ্ছিল কিনা—তাই লুকিয়ে শুনছিলাম। বাবাতো 'অজয়' বলতে অজ্ঞান। ওঁর মত খাঁটি ছেলে বাংলাদেশে নাকি খুব কমই আছে।"

"জামাতৃ পদে বরণ কর্‌বার মতলব টতলব আছে নাকি রে?"

"কার, কাকাবাবুর?"

গীতা ঠোঁট বাঁকাইয়া কি একটা উত্তর দিতে চাহিতেছিল এমন সময় সুবিমল বন্ধুসহ একযোগে ঘরে প্রবেশ করিল এবং হাতযোড় করিয়া তরুণীদ্বয়কে নমস্কার করিল।

উৎসব-বেশে সজ্জিতা গীতাকে দেখিয়া অজয় বন্ধুর বক্তৃতা, সতর্ক বাণী সকলই ভুলিয়া গিয়া স্থানুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুবিমল বন্ধুকে একটা ধাক্কা দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, কাঙালের মত হাঁ করে দেখছিস্ কি হতভাগা। অসভ্য কোথাকার!

বন্ধুর ধাক্কা খাইয়া অজয় আত্মস্থ হইল। সুবিমলের শিক্ষামত যুক্তকর কপালে ঠেকাইতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল সম্মুখে নমস্কার করিবার মত আপাততঃ কেহই নাই। মেয়েরা অজয়ের এই অসভ্য ব্যবহারে একটু দূরে, অন্তরালে গিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। সুবিমল লজ্জায় ঘৃণায় মুখ লুকাইবার জায়গা পাইতেছিল না। তাহার এই দুরবস্থা দেখিয়া তরুণীদ্বয় আবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, কই আপনার বন্ধুর সঙ্গে তো আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন না।

এমন সময় ভোলানাথবাবু ঘটনাস্থলে আবির্ভাব হইয়া সুবিমলকে তরুণীদের বিদ্রূপবাণ হইতে রক্ষা করিলেন। অজয় ভোলানাথবাবুকে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ মহা খুশী হইয়া বলিলেন, বেশ, বেশ বেঁচে থাক বাবা। তুমিই বুঝি সুবিমলের বন্ধু?

অজয় বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

"আজ ভুবনের মুখে তোমার অজস্র প্রশংসা শুনলাম। তা বেশ বাবা, বেঁচে থেকে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

অজয় আবার মুখ তুলিয়া গীতার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই বন্ধুর তিরস্কারবাণী স্মরণ করিয়া গর্ব্বিত দৃষ্টি বন্ধুর দিকে ফিরাইল। ভাবটা যেন, 'দেখ্ মূর্খ সুধী-সমাজ আমাকে কি বলে।'

সুবিমল মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, ডাক্তার হিসাবে অজয় খুব নাম করবে, জ্যাঠামশায়। এই দু বছরেই—

ভোলানাথবাবু সুবিমলের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, শুনলাম ভুবন বল্ল, বড় বড় সাহেব ডাক্তাররা যেখানে ছুরি বসাতে ইতস্ততঃ করে অজয় নাকি সেখানে বিনা দ্বিধায় ছুরি ধরে। বেশ বাবা, এই তো চাই।

লীলা প্রশংসমান দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে সুবিমল একখানা ভাঁজ-করা সোণালী রংয়ের কাগজ গীতার হাতে দিয়া বলিল, As you desired.

গীতা সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া কাগজখানা লইল এবং ভাঁজ খুলিয়া পড়িল :—

আজিকার শুভদিন—
শুভ জন্মবার,
ঘুরে ফিরে আসে যেন
আরো শতবার!

কৃপণের ধনের মত গীতা কাগজখানা পরম যত্নে ব্লাউজের ভিতর রাখিয়া দিল। তারপর অজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, কবি তো কবিতা উপহার দিয়েই খালাস পেলেন, কবির বন্ধু—

লীলা বলিল, অজয়বাবু হয়তো একখানা 'প্রিস্কৃপ্‌শন' লিখে এনেছেন। লীলার কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

গীতার ঐ সুন্দর কোমল হস্তে 'গৃহ-দাহের' জঞ্জাল তুলিয়া দিতে অজয়ের মন আজ কিছুতেই সায় দিতেছিল না। অজয় এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তারপর নিজের অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য আঙটিটা খুলিয়া বলিল, If you do not mind.

গীতার মুখে বিরক্তি ও বিস্ময়ের ভাব একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। লীলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজকার এই শুভদিনে কিছু রিফিউস্ করতে নেই গীতা। মনে কর সুবিমলবাবুই ওটা দিচ্ছেন।

সুবিমল বন্ধুর বেয়াদবী দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। বয়স্থা কুমারী কন্যাকে আঙটি দানের মধ্যে যে একটা চিরন্তন ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে তাহা কি অজয় জানে না?

৪

পরের দিন দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরতা বৌদির চরণপ্রান্তে সুবোধ বালকটীর মত বসিয়া অজয় বিনা ভূমিকায় নিবেদন করিল, বৌদি, আমি বিয়ে কর্‌ব।

বৌদি যেন আকাশবাণী শুনিলেন। গা ঝাড়া দিয়া ঠিক হইয়া বসিয়া বলিলেন, বিয়ে করবে? ভূতের মুখে রাম নাম যে আজ!

অজয় বিনা দ্বিধায় কহিল, সত্যি বৌদি।

বৌদি আহ্লাদে আটখানা হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, বেশ মেয়ে দেখতে বলি।

অজয় বলিল, মেয়ে ঠিক।

বৌদি বিস্ময়ে অবাক্। তাহার লক্ষ্মণ দেবরটীর আজ হইল কি! তামাসা করিয়া বলিলেন, পাত্রী কে শুনি—সুবিমল নয় তো?

অজয় লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল, দূর, সুবিমলের প্রফেসার ভোলানাথবাবুর মেয়ে গীতা।

বৌদি যেন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, গীতা! বাঁচালে ঠাকুরপো। ভোলানাথবাবুর মেয়ে। তা মেয়েটী খুব সুন্দরী না হলেও মুখের চেহারাটা খুব চমৎকার বটে। আমি দেখেছি তাকে। আমার বোনের 'ক্লাস ফ্রেণ্ড' কিনা। কিন্তু এমন সুন্দর চেহারার শিক্ষিতা মেয়ে তোমার দোজবরে বয়স আর বৈজ্ঞানিক চেহারা দেখে যদি পছন্দ না করে।

অজয় তাহার নিজের পেশী-বহুল বাহুযুগলের সহিত ক্ষণিক দৃষ্টিবিনিময় করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আমি ও-সব বুঝি না। বিয়ে করতে হয়—ঐ আমার একমাত্র পাত্রী। পার যোগাড় কর নতুবা বিয়ের নাম আর মুখে এনো না।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে বাড়ীতে একটা শঙ্কামিশ্রিত আনন্দের হিল্লোল বহিতে লাগিল। গৃহিণী নয়নযুগলে প্রচুর জল আমদানী করিয়া ছল ছল চক্ষে বলিলেন, এবার অজয়ের বৌ না এলে আমি আত্মঘাতী হব।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার জোরে কর্ত্তা অবশ্য কথাটা পুরাপুরি বিশ্বাস করিলেন না, তবু পাকা রাজনীতিজ্ঞের মত গৃহিণীকে অভয় দিয়া বলিলেন, এ আর বেশী কথা কি! ভোলাথবাবু তো আমার মুঠোর ভিতর। তাঁর মেয়ে তোমার পুত্রবধূ হবে—এ তো তাঁর পূর্ব্বপুরুষের সুকৃতির ফল বলতে হবে। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি তাঁর কাছে। কে জানে আজকালকার ছেলেপিলে—মত বদলাতে কতক্ষণ?

ভোলানাথবাবু অজয়ের পিতার ঠিক মুঠার ভিতর না থাকিলেও আর্থিক অবস্থা তাঁহার বড়ই খারাপ জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইদানীং তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় হইত—দেনার দায়ে তাঁহার চাকরিটী না যায়। কারণ যাহারা তাহার দক্ষিণ হস্ত মুক্ত রাখিতে মুখের কথায় হাসিয়া হাসিয়া মুঠো মুঠো টাকা 'নাম মাত্র সুদে' ধার দিয়াছে তাহারাই আজকাল কথায় কথায় এমন সব জায়গায় ভয় দেখায় যেখানে ভোলানাথবাবুর মত লোককে মোটেই শোভা পায় না।

লোকগুলি মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিবার আগে মেয়েটীকে একটী সৎপাত্রে দান করিবার জন্য ভোলানাথ-বাবু বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় অজয়ের পিতা যখন অযাচিতভাবে গীতাকে তাহার পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি এই কুবেরসম বৈবাহিক ও অজয়ের মত গুণবান্ জামাতা পাইয়া আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন।

দুইদিন পরে অজয় তাহার ডিস্‌পেন্‌সারীর একটী নির্জ্জন কক্ষে বিশেষ মনোযোগের সহিত কি একটা মেডিকেল জার্ণালের পাতা উল্টাইতেছিল। হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইল তাহার মানস-প্রতিমা সশরীরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুবিমল হইলে ব্যাপারটা ভৌতিক ভাবিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিত কিন্তু অজয় ভয়ানক বৈজ্ঞানিক। তাহার অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। সে বিনাড়ম্বরে স্মিতহাস্যে বলিল, বসো গীতা, ব্যাপার কি বলতো?

বর্ব্বরটার কথা শুনিয়া গীতা হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে পারিল না। বিবাহের কথা হইতেই 'তুমি'—বিবাহ হইলে তো একেবারে পাইয়া বসিবে দেখিতেছি! যাক্, সে আসিয়াছে আজ সন্ধি করিতে, ঝগড়া করিতে নয়। মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্য্য আনিয়া গীতা বলিল, দেখুন আমি এসেছি আপনার কাছে বিশেষ একটা কাজের কথা নিয়ে—খুব প্রাইভেট্।

"বেশ বল, আমার এই প্রাইভেট্ রুমে থার্ড পার্সন কেউ বিনা হুকুমে আসতে পারে না। তুমি ঢুকলে কি করে? আশ্চর্য্য! বোধ হয় নারী বলে দারোয়ান ব্যাটা ছেড়ে দিয়েছে।"

"আপনি বোধ হয় শুনেছেন—

"আগামী পরশু শ্রীমতী গীতা দেবীর সঙ্গে শ্রীমান্ অ—

"দেখুন সম্বন্ধটা ভেঙে দেওয়া যায় না? অবশ্য আমার স্নেহময় পিতার মাথা অবনত না করে। আমার পিতার দারিদ্র্য ও সরলতার সুযোগ নিয়ে এমন একটা জুলুম করা কি ঠিক?"

বিষণ্ণ মুখে অজয় বলিল, জুলুম! সে কি রকম! তুমি কি বলতে চাও, আমি তোমার একান্তই অনুপযুক্ত।

গীতার ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যভরা বিদ্রূপের হাসি ক্ষণিকের তরে খেলিয়া মিলাইয়া গেল। দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, দেখুন, যুক্ত-উপযুক্তের কথা হচ্ছে না। মানুষের মন বলে তো একটা কথা আছে? এই বিবাহে আমার মত নেই মোটেই।

অজয় বলিল, কিন্তু আমার আছে। দেখ গীতা, আমার কাব্য উপন্যাস পড়ার অভ্যাস নেই, তাই কথা হয়তো তোমার মত সাজিয়ে বলতে পারব না কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কি জান, তোমার সাথে আমার পরিণয়—এটা হচ্ছে—পণ্ডিতেরা কি বলেন—ভবিতব্য! নতুবা আমার এই কঠিন বিজ্ঞান সাধনার মাঝে হঠাৎ তুমি ধ্যানের বস্তু হয়ে দাঁড়াতে পারতে না।

গীতা হতাশ হইয়া বলিল, আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

খুশী হইয়া অজয় বলিল, তোমায় আমার মনের অবস্থা বোঝাতে পারব না গীতা। সেই আর্য্য-সভ্যতার দিন নাই নতুবা তোমার আমার সম্পর্ক সে দিন তোমার জন্মতিথির উৎসব-ক্ষেত্রেই স্থির হয়ে যেত।

গীতা একান্ত হতাশভাবে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, আপনি আমার একটা মিনতি দয়া করে রাখবেন—

অজয় উল্লসিত হইয়া বলিল, বল।

গীতা বলিল, আমি আমার স্নেহময় পিতার মান রাখতে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে একমাত্র মন্ত্র পড়ে বিয়ে হওয়া ছাড়া আমার সঙ্গে আপনার আর অন্য কোন সম্পর্ক থাকবে না। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যত রাজ্যের লজ্জা আসিয়া যেন গীতাকে অধিকার করিয়া বসিল। তার দৃষ্টি আপনি নত হইয়া আসিল।

এই অনাবিল লজ্জার পরশ তাহার অনবদ্য মুখশ্রীকে যেন শতগুণ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। অজয় মুগ্ধ দৃষ্টিতে গীতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, গীতা, নিশ্চয় জেন, তুমি যাকে বরণ করতে যাচ্ছ সে আর যা-ই হউক্ লম্পট নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার মন-রাজ্য জয় না করে দেহের প্রতি লোভ কখনও করব না।

৬

বিবাহের পর দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে।

অজয়ের শয়ন-কক্ষ। বৃহৎ হলের দুই পার্শ্বে দুইখানা পালঙ্ক গীতার নন্-কো-অপারেশনের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। একটিতে অজয় একখণ্ড 'চয়নিকা' হস্তে উস্‌খুস্ করিতেছে ও প্রতি মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অতৃষ্ণ নয়নে গীতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই কয়দিন অজয় বেজায় কাব্যানুরাগী হইয়া উঠিয়াছে।

অজয় জানিত গীতা কবিতা ভালবাসে। তাই রাজ্যের যত কবিতার বই কিনিয়া আনিয়া শয়নকক্ষটীকে একটী ছোটখাটো লাইব্রেরীতে পরিণত করিয়াছে। গীতাকে খুশী করিবার জন্য সেকেলে পণ্ডিতমশায়দের ইংরাজি শিক্ষার মত নিজেও কাব্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও সে এখন পর্য্যন্ত গীতার মন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া সে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। সে যে গীতার 'স্বামী' এই কথাটা মনে ভাবিতেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইত।

হঠাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধি অজয়ের মাথায় খেলিয়া গেল। বাতিটা নিভাইয়া দিয়া গীতার পালঙ্কে শুইয়া পড়িয়া ঘুমের ভাণ করিলে কেমন হয়! গীতা যা নিদ্রাকাতর, হয়তো রাজ্যের ঘুম চোখে নিয়া শুইতে আসিবে এবং অন্ধকারেই নিজের পালঙ্কে গিয়া শুইয়া পড়িবে। তারপর কখন হয়তো ঘুমের ঘোরে তাহাকেই জড়াইয়া ধরিবে। কথাটা ভাবিতেই অজয়ের দেহ এক অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তারপর ভয়ে, আনন্দে, অতি সন্তর্পণে গীতার পালঙ্কে আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং আলোটা নিভাইয়া দিয়া

ঘুমের ভাণ করিতে গিয়া এক সময় সত্য সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

জায়ের আদরের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া গীতা যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল তখন রাত, এগারটা। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ফাল্গুনী-পূর্ণিমার চন্দ্র-কিরণ অজয়ের ব্যায়ামপুষ্ট দেহের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অজয়ের কাণ্ড দেখিয়া গীতা মনে মনে হাসিল।

অন্য দিন হইলে গীতা একখানা মাদুর পাতিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহার মনের অবস্থা অন্য রকম। যে অস্বাস্থ্যকর স্মৃতি দুষ্ট ব্রণের ন্যায় তাহার বিবাহিত জীবনকে পীড়া দিতেছিল আজ তাহা সে সবলে মুছিয়া ফেলিতে চায়। গীতা নিদ্রিত স্বামীর দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক দৃষ্টে তাহার জ্যোৎস্না-স্নাত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটী ক্ষুদ্র মশক অজয়ের গণ্ডস্থলে বসিয়া পরমানন্দে রক্ত শোষণ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র দেহ রক্ত খাইয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিল। গীতা আর থাকিতে পারিল না। এক অভূতপূর্ব্ব কাতর অনুভূতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আজ এই প্রথম সে স্বামীর জন্য সহানুভূতি অনুভব করিল এবং এই শুভ মুহূর্ত্ত সে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিল। মশক-শিশুটীর নিকট অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে গেলে উপকৃত মানব শিশুটীর নিকট হইতে অত্যাচারের ভয় আছে, তাহা সে ভাল রকমই জানিত। কিন্তু সে অত্যাচারের স্বরূপ কল্পনা আজ তাহাকে পীড়া দিতে পারিল না।

কম্পিত হস্তে সে তাহার চম্পক-অঙ্গুলী দ্বারা মশকটীকে পিষিয়া ধরিল অজয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে বিস্ময়ে, আনন্দে পুলকিত হইয়া অধীর কণ্ঠে বলিল, ভগবান সাক্ষী—শ্রীমতী গীতা দেবী আপনা হইতেই সর্ত্ত ভঙ্গ করিল। এই বলিয়া সে গীতার লজ্জা-রাঙা মুখখানা অজস্র চুম্বনে ভরিয়া দিল।

*　　*　　*　　*

পরাজয়ের লজ্জা লুকাইবার জন্য ঘরখানাতে দিনের আলো প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই গীতা বিছানা ছাড়িয়া পলাইল। অজয় একই দিনে দুই রাজ্য জয় করিয়া বিজয় গর্ব্বে পরিত্যক্ত পালঙ্কখানার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অপর দিকে পাশ ফিরিতেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল বন্ধু সুবিমলের হস্ত-লিখিত একখানা চিঠি বিছানার এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য, আজ আত্মসমর্পণের দিন আপন কুমারী জীবনের ইতিহাস স্বামীর নিকটে মুক্ত করিয়া খুলিয়া ধরিবার জন্য গীতা ইচ্ছা করিয়াই পত্রখানা বিছানায় ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। মহা কৌতূহলে চিঠিখানা হাতে লইয়া অজয় পড়িতে লাগিল :—

"গীতা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। জগতের সব কিছু বাহিরের চেহারা দিয়ে বিচার করতে যেওনা—ভুল করে বসবে।

তুমি ভাবতে—আমি তোমায় খুব ভালবাসি। এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল! আমি ভেবে আশ্চর্য্য হই—মেয়েগুলি কি বোকা! এই অসার জাতটাকে আমার চেয়ে বেশী ঘৃণা জগতে বোধ হয় কেহ করে না।

আমার ধারণা পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় নেকামী—প্রেম!

তুমি যখন আমার এই চিঠি পড়বে, তখন আমি আগ্রার পথে থাকব। সেখানে গিয়ে, ভরা পূর্ণিমার রাতে তাজের সামনে দাঁড়িয়ে মূর্খ সম্রাট্ সাজাহানের উদ্দেশে প্রাণ খুলে দুটো গালি দিব। তারপর কোথায় যাব—জানি না। বাংলায় নয়, এটা ঠিক্।

সুবিমল।"

চৈনিক নাট্য-রীতি

শ্রীবিনয় সরকার, এম. এ.

সূচনা
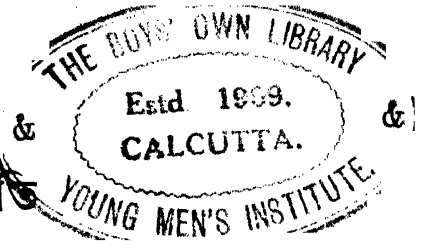
চীনাদের মধ্যে একটা চল্‌তি প্রবাদ আছে, "থিয়েটার যারা দেখে তারা নির্ব্বোধ, যারা করে তারা পাগল"। যে দেশে নাটক সম্পর্কে এইরূপ ধারণা, সেখানে নাট্য-শিল্পের প্রসার ও প্রতিপত্তি কতদূর সম্ভবপর, তা' সহজেই অনুমেয়। নাটক শব্দের সমার্থজ্ঞাপক কোনও শব্দ চীনাদের ভাষায় পাওয়া যায় না। চীনা ভাষায় 'সি' একটা শব্দ আছে; তা'র অর্থ 'তামাসা করা', 'বিদ্রূপ করা' ইত্যাদি। আর একটি শব্দ আছে—'চি' অর্থাৎ 'কৌতুক করা'। এই 'সি' ও 'চি'র সমবায়ে চৈনিক নাটকীয় আমোদ-প্রমোদের সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় অনুরূপ সংজ্ঞার অভাবে এদেরকে নাট্যপর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট করা হল।

গোড়ার কথা ও গ্রীক প্রভাব

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, খৃঃ পূঃ ৮ম শতকে চীন-দেশে নাটকের উৎপত্তি; আবার কারও কারও মতে, খৃঃ পূঃ ৯ম শতকে ইহার প্রকাশ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইহাও বলেন যে, গত ছয় শত বৎসর ধ'রে নাটকীয় পরিস্থিতি গ'ড়ে উঠেছে। চীনদেশে নাটকের আদিম অভিব্যক্তি হ'য়েছিল—ধর্ম্ম-প্রবণ আব্‌হাওয়ার ভিতর দিয়ে। এটা যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ মহাসত্য। সর্ব্বদেশের জাতীয় নাটকের উৎপত্তি আলোচনা করতে গেলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, জাতীয় আদিম নাটকের প্রাণরস যুগিয়েছে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। কোনও বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখেছেন—"In fact, for the actual beginnings, we should look back as far, at least, as the eighth century B. C. In Tso Ch'iu-nêng's commentary on the Spring and Autumn Annals, it is recorded that in the fifth year of Duke Yin of the Lu State (716 B. C.), the Duke having completed the Shrine—Temple to Chuang Tzû, his half-brother's mother was about to instal the Choruses.... Those were pantomimic, and waved large feather fans: they also danced and sang during the performance." চীনের Shê'n hsi' বা ধর্ম্মমূলক নাটকের প্রচার থেকেও ধারণা করা যায় যে, ধর্ম্মপ্রবণ আব্‌হাওয়ার মধ্যেই চৈনিক

চীনা নাটকের একটী দৃশ্য

নাটকের উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে কন্‌ফুসিয়াস্‌-দিনপঞ্জীর কথা মনে করা যেতে পারে। রাজা অথবা ধনী ব্যক্তিদের পূর্ব্বপুরুষগণের মন্দিরে সেই সময়ে গান-বাজনার সহিত মাথায় পাখীর পালক, হাতে পতাকা ইত্যাদি নিয়ে বহু লোকে একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নৃত্যগীত ক'রত। Bullock বলেন—"ক্ষেত্রে যখন পক শস্যের শীর্ষ আন্দোলিত হ'ত, যুদ্ধ-অবসানে ক্লান্তির মাঝে যখন জয়ের আনন্দ উৎসারিত হ'ত, অশান্তির পরিশেষে যখন শান্তির বাতাস বইত, তখন একটি বিরাট্ সাধারণ-ভোজে বিশেষ আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হ'ত। অনেকের মতে, এইরূপেই হয় চৈনিক নাটকের উৎপত্তি।" কিন্তু Dyer Ball ইহা স্বীকার

করেন না। কোন কোন গবেষক যেরূপ কষ্ট-কল্পিত অনুমানের সাহায্যে ভারতীয় নাটকের মূলে গ্রীক্-প্রভাব দেখেছেন, Dyer Ballও সেরূপ উপায়েই চীনা-নাটকের জন্ম-লগ্নে গ্রীক্-নক্ষত্রের উপস্থিতি অনুমান করেন। Dyer Ball এর উক্তি বেশ কৌতুকদায়ক। তিনি বলেন,—"The whole idea of the Chinese play is Greek. The mask, the chorus, the music, the colloquy, the scene and the act are Greek.··· The Chinese took the idea and worked up the play from their own history and their own social history.······The whole conception of the play is foreign, while the details and language are Chinese." Dyer Ball-এর এই অনুমান তাসের প্রাসাদই বটে! সত্যই যদি গ্রীক্ নাটকের প্রভাব চৈনিক নাট্যরীতির গোড়ায় দেখা দিত তো চীনা ভাষায় 'নাটক' শব্দের সংজ্ঞা পাওয়া যেত! তা' ছাড়া, এতদিনে একটা উন্নত নাট্যরীতি চৈনিক নাট্যশিল্পকে প্রবুদ্ধ ক'রতে পারত। সুতরাং গ্রীক্-প্রভাব কল্পনা ক'রতে গেলে, গ্রীক্ নাট্য-সাহিত্যকেই খর্ব্ব করা হয়।

আদিম নাটমঞ্চ

চৈনিক নাট্যরীতির উৎপত্তি যে ধর্ম্মমন্দির থেকে হ'য়েছে, তা'র প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত পুরাতন মন্দিরের সঙ্গেই নাটমঞ্চ আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণের সম্মুখেই কাঠের পাটাতন; উপরে মাদুরের আচ্ছাদন; তিনদিক্ উন্মুক্ত। এখনও বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মোৎসবে নাটমঞ্চ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। নাটমঞ্চ সঙ্কীর্ণ ও কিঞ্চিৎ উঁচু হওয়ায় অভিনেতৃবৃন্দকে লম্ফ-সাহায্যে প্রবেশ ও প্রস্থান ক'রতে হ'ত! চীনা ভাষায় মঞ্চ-প্রবেশকে কহে "জ্যাঙ্গ্" অর্থাৎ আরোহণ আর প্রস্থানকে কহে "হিয়া" অর্থাৎ অবতরণ। এই দু'টো শব্দ এখনও প্রচলিত আছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অভিনেতৃগণ দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রবেশ করে এবং বাম পার্শ্ব দিয়ে প্রস্থান করে। মঞ্চের পশ্চাদ্দেশ কারুকার্য্যময় সিল্ক দ্বারা আচ্ছাদিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসি-সন্নিবিষ্ট। মঞ্চদেশ কার্পেটে-মোড়ানো। এইরূপ নাটমঞ্চে সখের অভিনেতারা 'ধর্ম্মোৎসব-উপলক্ষে' অভিনয় ক'রতেন।

আধুনিক নাট্যমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ

আধুনিক কালে আদিম নাটমঞ্চের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। দৃশ্যে দৃশ্যে পর্দ্দার উত্থান-পতনের ব্যবস্থা না থাকায়, দর্শকদের সম্মুখেই দৃশ্যোপযোগী দ্রব্য-সম্ভার আনা ও রেখে আসা হয়। Limelight ও spot-light-এর কোন বন্দোবস্ত নেই। মঞ্চের পিছন দিকে সাধারণতঃ তিনটি দ্বার আছে। Orchestra এই তিনটি দ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দর্শকদের সাম্‌নেই থাকে। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি নিকটেই রয়। চীনা মঞ্চাধ্যক্ষ দৃশ্যসমূহের প্রয়োজনসাপক্ষে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে কাষ্ঠখণ্ড পাঠিয়ে বোঝান যে, বর্ত্তমানকার ঘটনাস্থল বনপ্রদেশ। অভিনেতা কিঞ্চিৎ ন'ড়ে চ'ড়ে এক পা উঠিয়ে প্রমাণ করেন যে, এখন সে অন্য স্থানে এসেছে। এইরূপে দর্শকদের মনে দৃশ্যান্তর্গত ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস দেবার ব্যবস্থা আছে। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর—এ সব কিছুই নেই। এ ছাড়া, আরও একটি বিষয় সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অভিনয়ে অভিনেতার স্মৃতি-শক্তিকে সাহায্য করবার জন্য স্মারক বা Prompter-এর কোন অস্তিত্ব নেই। রঙ্-বেরঙের আলোর কোন কারিকুরি নেই। এর কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বে চীনদেশে দিনের বেলাতেই অভিনয় হ'ত। সূর্য্যাস্তের পরে অভিনয় করা আইনতঃ নিষিদ্ধ হ'লেও, বর্ত্তমানে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অভিনয় হ'য়ে থাকে। পূর্ব্বেকার আইন অব্যবহারে বর্ত্তমানে অচল হ'য়ে প'ড়েছে। তবে, বর্ত্তমানে দু'বার অভিনয় হয় – অপরাহ্নে ও গোধূলি-লগ্নে। Variety Programme অনুসৃত হ'য়ে থাকে। দর্শকবৃন্দ প্রবেশপত্র-ক্রয়কালে তিনটে জিনিষ পান; যথা,—গাঢ় রক্তবর্ণ কাগজে মুদ্রিত প্রোগ্রাম, এক কাপ্ চা আর একটি পাইপ! চমৎকার অতিথি-সৎকার! নাট্যগৃহটি কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং রঙ্-বেরঙের কাগজের লণ্ঠনের (lantern) আলোকে আলোকিত। অভিনয়কালে দর্শকবৃন্দের মধ্যে ঘর-গেরস্থালী, সুখ-দুঃখের কথা, পানাহার ইত্যাদি সবই

চ'লে থাকে। প্রয়োজনমতে নিদ্রারও ব্যবস্থা আছে। মোটের ওপর, দর্শকবৃন্দকে আনন্দ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা অত্যধিক আগ্রহপরায়ণ। চীন-সভ্যতার এটিও একটি আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য।

অভিনয়শিক্ষা

নাট্যমঞ্চ ব্যবস্থাপনে technique না থাকলেও, অভিনেতামাত্রকেই বিশেষ বিশেষ ভূমিকাভিনয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও বহিরবয়ব পরিবর্ত্তন সাধন ক'রতে হয়। উপর্য্যুপরি তিন চার বৎসর ধ'রে নাট্যশিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক অভিনেতাই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী চরিত্রাভিনয়ে শিক্ষিত হয়। সুতরাং, নিরক্ষর অভিনেতাদিগকে আজীবন একই ধরণের চরিত্রাভিনয় ক'রতে হয়। বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে বিভিন্ন স্বর-সাধনপ্রণালীও অনুসৃত হ'য়ে থাকে।

রাজকীয় নাট্য-শিক্ষায়তন

যে সমস্ত অভিনেতা অভিনয় ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তারা "রাজকীয় আপেল উদ্যানের ছাত্র সম্প্রদায়ের" (Pupils of the Imperial Pear Garden) নামে অভিহিত হয়। এর কারণ এই যে—সম্রাট্ তাঙ্-মিঙ্-হুয়াঙ্ (৭১২ খৃঃ অঃ—৭৫৫ খৃঃ অঃ আর্ট ও গীতবাদ্যাদি অনুশীলনার্থে 'চাঙ্গান' নামক স্থানের রাজোদ্যানে 'লি য়ুয়ান্ চিয়াও ফ্যাঙ্গ' বা রাজকীয় নাট্য-শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট্ নিজে প্রায় শতাবধি গায়িকাকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাদান কার্য্য হ'ত রাজার ঐ আপেল - উদ্যানে। প্রথমে প্রায় তিন শত ছাত্রছাত্রী ছিল। রাজার উপদেশমতেই শিক্ষা-কার্য্য চ'লত। এই সময়েই 'চুয়ান্-চি' নাট্যাভিনয়ের প্রচলন হয়।

অভিনেত্রী-প্রচলন

গোড়ায় স্ত্রীলোকেই স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় ক'রত। সাধারণ রঙ্গালয়ে তাহাদিগের অভিনয় আইনতঃ নিষিদ্ধ না হ'লেও, রাজদরবারে উৎসবোপলক্ষে স্ত্রীলোকের অভিনয় নিষিদ্ধ আছে। ব্যভিচারিণী এক স্ত্রী অভিনেত্রীর পুত্র সম্রাট্ কিয়েন্-লাঙ্ কর্ত্তৃক এই নিষেধ সর্ব্বপ্রথমে রাজ-দরবারে কার্য্যকরী হয়। অধুনা সাধারণ নাট্যাগারেও পুরুষ স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় ক'রে থাকে এবং সর্ব্বসাধারণ অভিনয়ে স্ত্রীলোক-গ্রহণের অপক্ষপাতী। অবশ্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে স্ত্রীলোকে অভিনয় ক'রলেও, চীনারা একে সহৃদয়তার চক্ষে দেখে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও সাংহাইতে "theatre of cats"এ একদল স্ত্রী অভিনেত্রীর সমাবেশ হয়। তারা পুরুষ-চরিত্রও অভিনয় ক'রেছিল। ঠিক ইহারই পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত রঙ্গালয়েই স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সম্মিলিত অভিনয় করে। বর্ত্তমানে পিকিং নগরের রঙ্গালয়াদিতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে তিন রকমের যোগাযোগ দেখা যায়। কোথাও বা পুরুষেই পুরুষ ও স্ত্রীচরিত্র অভিনয় ক'রছে; কোথাও বা স্ত্রীলোকেই স্ত্রী ও পুরুষচরিত্র অভিনয় ক'রছে; আবার কোথাও বা পুরুষে পুরুষ-চরিত্র, স্ত্রীলোকে স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় ক'রছে। পিকিং সহরে 'Temple of Heaven'এর নিকটবর্ত্তী 'তিয়েন্-চিয়াও'তে (Heaven's Bridge) প্রসিদ্ধ

চৈনিক নট ও নটী

নটনটীরা আছে। নাট্যকলার যা' কিছু উন্নতি, তা' পিকিং সহরের এই নটনটীদের প্রচেষ্টাতেই সম্ভবপর হ'য়েছে।

সমাজ-চক্ষে নট-নটী

সমাজ-চক্ষে চীনা-থিয়েটার প্রচলিত প্রতিষ্ঠান নয়। এরূপ আইনও র'য়েছে যে নট, নাপিত, দাসের পুত্রেরা সাধারণ পরীক্ষাদিতে অংশগ্রহণ ক'রতে পারে না। এ ছাড়া, নটীদিগকেও পুরাতন আইনমতে গণিকা শ্রেণীভুক্ত করা হ'য়ে থাকে। স্ত্রী-চরিত্ররূপদাত্রী অভিনেত্রীকে 'তান্' বলা হয়। এর অর্থ "অত্যুগ্র কামনাপূর্ণ পশু"। সুতরাং নটনটীদের জীবনধারা বংশপরম্পরায় সামাজিক চক্ষে খুবই হীন, খুবই ঘৃণ্য!

পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্রের বিভিন্ন বিভাগ

নাটকীয় পুরুষ-চরিত্র মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত; যেমন—(১) বৃদ্ধ ব্যক্তি—ইনি হয় সম্রাট্, নয় পরিবারের কর্ত্তা, নয় রাজনৈতিক প্রধান পুরুষ; (২) যুবা—ইনি নায়ক, প্রেমিক বা উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ; (৩) সয়তান—কপট চরিত্রাভিনেতা; (৪) হাস্যরসপরিবেশক ব্যক্তি—এঁরা আবার দুই শ্রেণীভুক্ত; কেউ বা অশ্লীল হাস্যরসিক, আবার কেউ বা অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতিসম্পন্ন। এই চারিটি বিভিন্ন বিভাগে অভিনেতারা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অভিনয় ক'রে থাকে। স্ত্রী-চরিত্রও প্রধানতঃ চারিটি বিভাগে সন্নিবিষ্ট, ; যেমন—(১) বৃদ্ধা রমণী (লাও-তান্); (২) প্রথম প্রেমে প্রেমিকা রমণী (জিঙ্-তান্); (৩) ষোড়শী তরুণী (সিয়াও-তান্); (৪) দাস-বালিকা (ইংরেজীতে যা'কে বলা যায় Soubrette)। রমণীরাও বিভিন্ন বিভাগে নিজ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অর্থাৎ একই ধরণের একঘেয়ে চরিত্র অভিনয় ক'রে থাকে। মূলতঃ প্রত্যেকটি চরিত্রাভিনয়েই গতানুগতিক অভিনয়-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিরক্ষরতাই এর মূল কারণ।

চৈনিক 'নটনাথ'

চীনা অভিনেতাদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে। মঞ্চের প্রবেশমুখে wingsএর পার্শ্বেই দর্শকচক্ষুর অগোচরে প্রাচীরোপরি কাঠের একটি প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। প্রতিমূর্ত্তিটি একটি শিশুর। প্রত্যহই সুগন্ধ দ্রব্যাদি অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হয়। অভিনেতারা মঞ্চপ্রবেশ-মুখে শিশু-বন্দনা ক'রে অভিনয় আরম্ভ করে। কাঠের এই শিশুমূর্ত্তিটি 'ল্যাং-ল্যাং-পাও-সা' নামে সুপরিচিত। কথিত আছে, ইনিই চৈনিক 'নটনাথ'। এঁর উৎপত্তি ও ইতিহাস ভালরূপে জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, এই প্রতিমূর্ত্তিটি সম্রাট্ চুয়াঙ্-সঙ্গের। ইনি জনৈক নট কর্ত্তৃক নিহত হ'য়েছিলেন। জীবদ্দশায় ইনি চৈনিক নাট্যমঞ্চের প্রভূত উন্নতি সাধন ক'রেছিলেন; তাই অভিনেতারা কৃতজ্ঞচিত্তে অভিনয়মুখে এঁকে স্মরণ ক'রে থাকে।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও বর্ণ-বৈচিত্র্য

অভিনয়োপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ মোটামুটি তিন রকমের:—প্রথম—প্রাচীন জাতীয় পরিচ্ছদ; দ্বিতীয়—আধুনিক জাতীয় পরিচ্ছদ এবং তৃতীয়—বৈদেশিক পরিচ্ছদ। তবে, প্রধানতঃ, পোষাক-পরিচ্ছদে বর্ণ-বৈচিত্র্য সুপরিস্ফুট। চরিত্রের সামাজিক পরিস্থিতি দামী পোষাক-পরিচ্ছদের উপরে নির্ভর করে না। পরিধানের ধরণ, পরিচ্ছদের বর্ণ ও গড়ন চরিত্রসমূহের উচ্চতা-নীচতা, সদাশয়তা-নীচাশয়তা, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য সূচিত করে। বর্ণ-বৈচিত্র্যে কি কি সঙ্কেত আছে তা'র আভাষ নীচে দেওয়া গেল—

রক্তবর্ণ—আনন্দ ও মর্য্যাদাবোধক;
শুভ্রবর্ণ—গভীর শোকজ্ঞাপক;
কৃষ্ণবর্ণ—অগভীর শোকজ্ঞাপক; কঠোর জীবনযাত্রা ও হীন জীবনযাপনের আভাস;
হলুদবর্ণ—রাজবংশধর, পুরোহিত সম্প্রদায়ের সভ্য অথবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের চিহ্ন;
নীলবর্ণ—সাধুতা এবং সরলতা-পরিচায়ক;
সবুজবর্ণ—ব্যভিচারিণী রমণী এবং দাস-পরিচায়ক;
গোলাপীবর্ণ—লাবণ্য এবং অনাবিলতা-সূচক।

সুতরাং, অভিনয়কালে পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণ বৈচিত্র্য-দর্শনেই অভিনেয় চরিত্রের মূল প্রকৃতি অতি সহজেই

ধারণা ক'রতে পারা যায়। সাধারণ দর্শকবৃন্দের পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক। প্রথম থেকেই অভিনয়ের অর্থবোধ অতি সহজে সম্ভবপর হয়। অর্থবোধক এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও কচিৎ অদলবদল হ'য়ে থাকে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রাবলীর পোষাক-পরিচ্ছদাদি ও তাহাদের বর্ণ বাঁধাধরা আছে, কোনও পরিবর্ত্তন নেই। তবে, অধুনাকালে যে সমস্ত উপন্যাস নাটকীকৃত হ'চ্ছে, তাতে নাটকীয় চরিত্রাবলীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের অভাব থাকে। বর্ত্তমানে, চৈনিক নাটকের উপাদান জাতীয় উপন্যাস থেকেই সংগৃহীত হ'চ্ছে। অভিনেতারাও পোষাক-পরিচ্ছদের উপকরণ উপন্যাস-পাঠে সংগ্রহ করে।

নাট্য-সম্প্রদায়—উত্তুরে ও দখিণে

অধুনা, চীনা নাট্যসম্প্রদায় দুই বিভিন্ন দলে বিভক্ত; যথা—উত্তুরে (Northern) ও দখিণে (Southern)। নাটক যে শ্রাব্য-কাব্য, তা' উত্তুরে দল ভালভাবেই শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেয়; আবার অপর পক্ষে, নাটক যে দৃশ্যকাব্য তা' দখিণে দল বেশ ক'রেই দর্শকদের দেখিয়ে দেয়। মোটের ওপর, আসল কথাটা হ'চ্ছে এই যে, উত্তুরে দল সুষ্ঠু আবৃত্তি ও উচ্চকণ্ঠে গান ক'রে থাকে এবং দখিণে দল বেশ মার্জ্জিত রুচির মধ্য দিয়ে নিম্নস্বরে আবৃত্তি-গীতাদি ক'রে ও উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদাদি পরিহিত হ'য়ে অভিনয় করে। 'পিকিং'ই হ'চ্ছে নটনটীদের নাট্য-প্রতিভাবিকাশের কেন্দ্রস্থল, ইতিপূর্ব্বে তা' বলা হ'য়েছে।

চীনা অর্কেষ্ট্রার বৈশিষ্ট্য

চীনা থিয়েটারে অর্কেষ্ট্রা একটি বিশেষ ও প্রধান অঙ্গ। নট-নটীদের মধ্যে বার্ত্তালাপপ্রসঙ্গেই যে অর্কেষ্ট্রার আধিপত্য আছে তা' নয়, নট-নটীদের চলন-ফেরন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতেও গীতবাদ্যাদির যথেষ্ট প্রভাব আছে। এতদ্ব্যতীত, অর্কেষ্ট্রার একটি সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হ'চ্ছে এই যে, যখনই কোন চরিত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় বাক্য কহে, তখনই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রাদি-সহকারে একটি তুমুল বাদ্যধ্বনিপ্রকাশে বাক্যটির বৈশিষ্ট্য ও অর্থপূর্ণতা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত দর্শকদের মনে সঙ্কেতিত হয়। এ যেন পাঠ্যপুস্তকে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগানো—'VVI' (Very Very Important)।

অর্কেষ্ট্রার গঠন

আট নয় জন বাদক নিয়ে এই অর্কেষ্ট্রা গঠিত। বাদ্য-যন্ত্রাদির মধ্যে দোতারা বেহালা, মৃদঙ্গ, ঢোলক, প্যান-কৌ (তীক্ষ্ণস্বর-বিশিষ্ট এক জাতীয় মৃদঙ্গ), ক্লারিওনেট্, ক্যাস্টানেট্, করতাল, ফ্লুট্ বাঁশী, গীটার, ম্যাণ্ডোলিন, হিয়েন্-জে (সর্পচর্ম্মে আবৃত লম্বা ত্রিতার-বিশিষ্ট ম্যাণ্ডোলিন) এবং 'প্যাঙ্-জে' (একখানি ফাঁপা খোদাই করা কাষ্ঠখণ্ড: ছোট একখানি ছড়ি দিয়ে আঘাত ক'রলেই বাদ্যধ্বনি বহির্গত হয়।) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গায়ক যখন 'প্যাঙ্-জে' রীতিতে গান করে, কেবলমাত্র তখনই 'প্যাঙ্-জে' যন্ত্রে বাদ্যধ্বনি উত্থিত হয়। 'সিন্-সি' প্রদেশে এই 'প্যাঙ্-জে' রীতির জন্ম।

সঙ্গীতে 'প্যাঙজে' ও 'কিঙ্গডায়ান্' রীতি

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন 'কিঙ্গ-ডায়ান্' থিয়েটারে এই 'প্যাঙ্-জে' রীতি সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

নারীবেশধারী চীনা-নট

অতঃপর 'কিঙ্গ-ডায়ান' ও 'প্যাঙ্-জে'—সঙ্গীতের উভয় রীতিই একই মঞ্চে চ'ল্‌তে লাগল। এমন কি, একই গানে উভয় রীতি-প্রবর্ত্তনাও দেখা যায়। তবে, চীনা সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, 'কিঙ্গ-ডায়ান্' বা 'পেকিং' রীতি পুরুষের পক্ষে উপযোগী; অপরপক্ষে ধীর, ললিত এবং প্রশান্ত 'সিন্-সি' বা 'প্যাঙ্-জে' রীতি স্ত্রীলোকের পক্ষে সুবিধাজনক।

দুই শ্রেণীর নাটক—সামাজিক ও ঐতিহাসিক

চীনা নাটক মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত; সামাজিক ও সামরিক বা ঐতিহাসিক। সামাজিক জীবনের সাধারণ আবেষ্টনী নিয়ে সামাজিক নাটকের পরিপুষ্টি। তবে এতে হাস্যরসের প্রাধান্য বড় বেশী। সত্য কথা ব'লতে কি, অধিকাংশ নাটকেই ভাঁড়ামী ও অশ্লীলতা সুপরিস্ফুট,

ভ্যাঙ্‌চানির (চীনা ভাষায় যা'কে বলে 'সিঙ্-জাঙ') বাহুল্য খুবই আছে। সামরিক বা ঐতিহাসিক নাটকে যুদ্ধ এবং ভয়াবহ কার্য্যাদির সংঘটন আছে। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস থেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে নাটকের উদ্ভব। চীনা নাটকের ইতিহাস আলোচনা ক'রলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাসই চীনা নাটকের প্রাণরস যুগিয়েছে। সম্রাট্‌দিগের আওতাতেই চৈনিক নাট্যসংসার গঠিত হ'য়েছে। তবে, মজার ব্যাপার এই যে, চল্‌তি রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন ক'রে নাট্য-সাহিত্য গঠিত হ'তে পারে না; অতীত রাজবংশের ঘটনাবলী নিয়ে ইতিহাস, নাটকাদি লেখা যেতে পারে—এইরূপই চীনাদের আইন। আইনগত বাধা ব্যতীত অন্য কারণও আছে। সেটা হচ্ছে এই,—যতদিন না এক রাজবংশ অতীত হয়, ততদিন তা'র ঘটনা-পঞ্জী লিখিত ও প্রকাশিত হয় না। তাই ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকে চল্‌তি রাজবংশের ঘটনার রেখাপাতও হয় না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Republicএর প্রারম্ভে 'চ্যাঙ্' জাতীয় নাটকের উৎপত্তি হ'লেও, প্রাচীন নাট্যকারদিগের প্রতি অহেতুক আকর্ষণ থাকায় চীনা সঙ্গীত ও থিয়েটারের ক্রমিক উন্নতির পথে বিলক্ষণ বাধা জন্মেছে। এই সংরক্ষণশীলতাই চীনাদের জাতীয় প্রগতির পরিপন্থী। জাপানীরা চীনাদের এই জাতীয় দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজয়াভিযান চালিয়েছে। এই দুর্ব্বলতার জন্যই মহাচীন আজ বিজিত জাতি-রূপে পরিগণিত হ'তে চলেছে।

নাটকের বিষয়-বস্তু

কোনও বিশিষ্ট সমালোচক চীনা নাটক সম্পর্কে ব'লেছেন—"The Chinese drama in its present state is of anything but a mystically religious character; it is grossly realistic, and drawn in crude, angular lines. Everything is rendered with the highest degree of realism and minuteness, and the spectators would rather outrage all sense of decency than lose a single detail prescribed in the play. When it contains such events as a seduction, a wedding or a birth, they expect to see, and they do see, details of the most private nature represented on the stage." সুতরাং এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, চীনা নাটক বাস্তবতার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেচে। এবারে নীচে চীনা Comedyর দু'একটা নমুনা দেব।

"কৃপণ"

Comedyর নাম "কৃপণ"। উদ্ধৃত দৃশ্যটিতে মৃত্যু-শয্যাশায়ী কৃপণ তার পুত্রকে 'শেষের উপদেশ' শোনাচ্ছে—

কৃপণ। বৎস! আমার শেষের সময় ঘনিয়ে আস্‌ছে! কি রকমের শবাধারে আমায় কবর দেবে বল তো?

কৃপণ-পুত্র। যদি আমার মন্দভাগ্যে পিতৃহারা হ'তেই হয়, তা'হ'লে সর্ব্বাপেক্ষা দামী শবাধারে আপনাকে রক্ষা ক'রব!

কৃপণ। বৎস! পাগলামী ছাড়'। অনর্থক ব্যয়-বাহুল্য ভাল নয়। যখন আমরা মরি, তখন কি দেখ্‌তে পাই 'কোন্‌টা দামী, কোন্‌টা গর-দামী'? ঘরের পেছনেই একটা পুরোনো টব প'ড়ে আছে, সেটাই বেশ ভাল শবাধার হ'তে পারবে।

কৃপণ-পুত্র। আপনি ব'লছেন কি! ঐ টবটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান। আপনি যেরূপ লম্বা, তা'তে ক'রে ওর ভেতরে আপনাকে কোন প্রকারেই ধরানো যাবে না!

কৃপণ। আচ্ছা,—বেশ, টবটা যদি খুবই ছোট হয়, তা'হ'লে ক্ষতি কি! আমার এই দেহটাকেও ছোট করা সোজা। একটা কুঠার দিয়ে আমার শরীরের মাঝখানে আঘাত কর। তারপর কর্ত্তিত দু'টো অংশকে একটার পর একটা চাপা দিয়ে টবের ভেতরে অনায়াসে রাখ্‌তে পারবে। আর দেখ! —হ্যাঁ, একটা কথা! দেহটা কাট্‌বার জন্য আমার ভাল কুঠারটা ব্যবহার ক'রো না। কোন প্রতিবেশীর একখানা কুঠার ধার ক'রে নিয়ে আসবে!

কৃপণ-পুত্র। আমাদের তো একখানা কুঠার আছেই, তা' সত্ত্বেও অন্যের কাছে ধার ক'রতে যাব কেন?

কৃপণ। 'কেন'?—আচ্ছা ব'লছি! বুড়ো হাড় বেজায় শক্ত! আমার ঐ ভাল কুঠারটা দিয়ে যদি এই হাড় কাটো, তা'হ'লে কুঠারের ধার ক্ষ'য়ে যাবে! তখন ঐ কুঠারের ধার ফিরিয়ে আন্‌তে যে আবার খরচা!

বেশ বোঝা গেল যে, অতিশয়োক্তিই চীনা-নাটকের প্রাণবস্তু। মরণের গভীর বিভীষিকার পরিবর্ত্তে হাস্য-রসের খোরাক যোগানো হ'য়েছে। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হ'লেও, ইহা অতি-বাস্তবতা দোষে দুষ্ট। চরিত্রাঙ্কণ খুবই ঝরঝরে, পরিষ্কার, জটিলতাবর্জ্জিত। Artএর ক্ষেত্রে মানব-চরিত্র রহস্যময় ক'রে আঁকাই Artistএর লক্ষ্য! এখানে অত্যধিক সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে নাটকীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য-হীন হ'য়ে প'ড়েছে। কৃপণের একবগ্‌গা কার্পণ্যই হ'য়েছে সুপ্রকটিত।

নাটকীয় চরিত্রের আত্মপরিচয়

চীনা-নাটকের চরিত্রসমূহ প্রবেশ মাত্রেই আত্ম-পরিচয় দিয়ে থাকে। কুলের খবর নাটকীয় চরিত্রেরা কিরূপে দেয়, তার একটা নমুনা দেওয়া গেল। চরিত্রটি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রেই কইছে—"আমার বাড়ী 'তুঙ্-পিঙ্-ফু'তে। আমার ডাক নাম 'লিহু', পোষাকী নাম 'ত্‌সুঙ-সুজ্যাঙ্গ'। আমার বয়স যাট; আমার স্ত্রী 'লি-জি'র বয়স আটান্ন।" এইরূপে কুলের খবর দেওয়া ইউরোপীয় মধ্যযুগের নাটকাদিতেও দেখা যায়! এতে ক'রে সূত্রধার বা প্রোগ্রামের অভাব অনুভব ক'রতে হ'ত না।

ত্রি-সাম্য

চীনা নাটকে স্থান-কাল-ক্রিয়ার সাম্য বজায় রাখবার কোন বালাই নেই। গতানুগতিকতার স্রোতে চীনারা গা ভাসিয়ে চলে। কাল-সাম্য যে মোটেই নেই, তা'র প্রমাণ দেওয়া গেল। "গায়িকা" নাটকে একজন পর্য্যটক জনৈক জমিদারের নিকটে কতিপয় গায়িকা চাইলেন। জমিদার ব'ল্লেন—"আচ্ছা, দেব" এবং পর মুহূর্ত্তেই
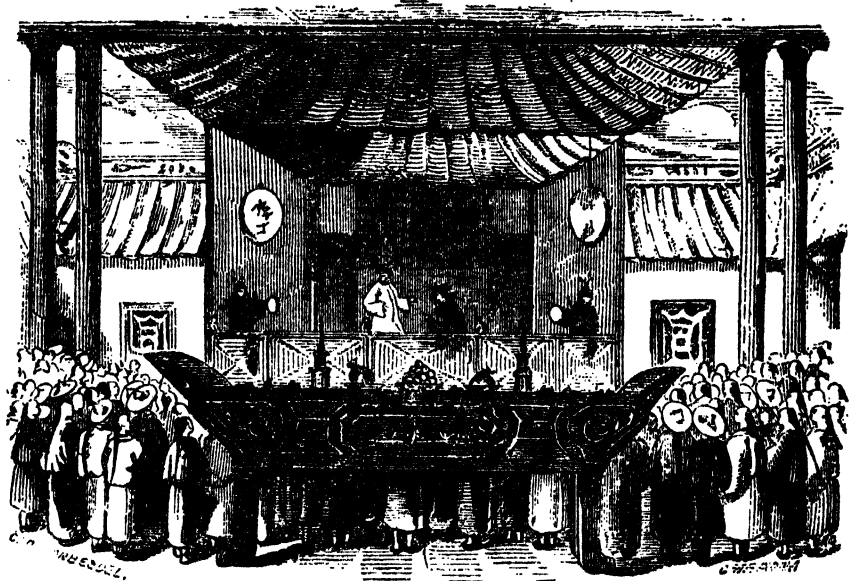
চৈনিক রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দৃশ্য

কইলেন—"মশাই! গায়িকারা পৌঁছেচে।" এ যেন ভানুমতীর খেল! ব'লতেই হাজির।

প্রস্তাবনা

নাটকের প্রস্তাবনা-দৃশ্যের চমৎকারিত্ব আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে অষ্ট অবিনশ্বরই উপক্রমণিকার কার্য্য ক'রছেন। এঁরা অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ 'সি ওয়াঙ্গ মু'র স্তব-স্তুতি করেন। বর্ত্তমানে মঞ্চে এঁদের দেখা না গেলেও, পর্দ্দার ওপরে লেখা থাকে—"তিয়েন্-কুয়ান্-ত্'জু-ফু" অর্থাৎ "ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।" আবার প্রায়শঃই একটা ছবিতে 'চি-লীন' (একপ্রকারের হৃষ্টপুষ্ট জন্তু, শরীরটা ঠিক অশ্বের ন্যায়, কিন্তু একটা সোজা শিঙ বেরিয়েছে কপাল থেকে) এর পৃষ্ঠে আরোহী অবস্থায়

দেখা যায় দীর্ঘজীবনদেবতা 'সৌ-সিঙ্গ'কে। ইনিও ছবির ভিতরে সঙ্কেত-সাহায্যে দর্শকবৃন্দের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। মাঝে মাঝে হয়তো বা 'সৌ-সিঙ্গ'কে মঞ্চের ওপরেও দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যরূপেও প্রস্তাবনা-কার্য্য হ'য়ে থাকে। কোন কালে মানব 'তুঙ্গ-যুঙ্গে'র সাথে স্বর্গের এক দেবীর বিবাহ হয়, তাঁদের পুত্রের জন্মদিনে উক্ত অষ্ট অবিনশ্বর ও সাত্ জন স্বর্গের দেবী সদ্যোজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর, কালক্রমে পিতার শিক্ষাগুণে ঐ শিশু সাম্রাজ্য-মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরূপে পরিণত হ'ল। প্রস্তাবনা-দৃশ্যান্তর্গত অভিনেতারাও কামনা করেন যে, প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিই এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রলাভে কৃতার্থন্মন্য হন। সময়ে সময়ে স্বর্গীয় মন্ত্রীর পরিচ্ছদ-পরিহিত 'তিয়াও-চিয়া-কুয়ান্‌কে'ও দেখা যায়। ইনি সঙ্গের নৃত্যগীতান্তে প্রস্থান-সময়ে সূর্য্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করেন। অর্থ এই যে, দর্শকবৃন্দ দিনে দিনে লক্ষ্মীর বরপুত্র হ'য়ে উঠুন। মোটের ওপর, চীনা-নাটকে প্রস্তাবনা থাকবেই ও তা'তে অতিথি দর্শক-বৃন্দের কল্যাণ-কামনাও রইবে! এই আত্যন্তিক ভদ্রতা বা ভব্যতা চীনা সভ্যতার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন!

উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা-দৃশ্যে দেব-দেবীকে টেনে আনা হলেও, সেখানে উদ্দেশ্য এই যে, দর্শকবৃন্দের কল্যাণ কামনা করা। এটাও একটা বাস্তব অভিলাষের নিদর্শন। পূর্ব্বেই ব'লেছি —অতি-বাস্তবতা চীনা নাটকের প্রাণ-বস্তু। অলৌকিক ঘটনা-সংঘটন নেই। 'ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়'ই চীনা-নাটকের মূল নীতি। চরিত্রগুলো একটা আস্ত, গোটা ভাবের প্রতীক—কোনও ঘোর প্যাঁচ নেই। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নেই, কর্ম্মের বাহুল্য আছে। ভাবের প্রাবল্য নেই, আদর্শের প্রচণ্ডতা আছে। এর কারণ এই যে, চীনা-থিয়েটারে দর্শকবৃন্দ যেমন স্বাধীনভাবে পানাহার, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি ক'রে থাকে, তেমনই শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র-গঠনোপযোগী উপকরণের সন্ধানও করে। চীনা-থিয়েটার লোকশিক্ষা দেবার দিকে অতি মাত্রায় ঝোঁক দেওয়াতেই হয়তো বা অতি-বাস্তবতাদোষে দুষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে। তাই, মৌলিকের পরিবর্ত্তে গতানুগতিক, সাধারণের পরিবর্ত্তে অতি সাধারণ, আসলের পরিবর্ত্তে নকল ভাবের বেশী আমদানী হ'য়েছে। তাই এই প্রগতি-প্রবণ যুগেও চীনা-থিয়েটার অভিনবত্বকে প্রাণ ভ'রে আঁকড়িয়ে ধরতে পারছে না। চীনা নাটক ও থিয়েটার সম্পর্কে কোনও একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ঠিকই ব'লেছেন—"Chinese dramatists are frankly humanitarian......The Chinese say, quite rightly, that drama is nothing but pretence, and do not have to show characters on the stage acting and talking like normal beings. Their mood is not imitatively realistic, but systematically playful. The Chinese have a different philosophy of art, and a different philosophy of life from us. The public, however, whether Chinese or foreign, enjoys a play in the ratio that it can be fooled by the goings-on behind the foot-lights." সুতরাং, চীনা অভিনেতারা অত্যধিক পরিমাণে 'theatrical' যে হবে, তা'তে আর সন্দেহ কি!

উপসংহার

অতঃপর এই প্রবন্ধ উপসংহৃত হবার পূর্ব্বে চীনা নাটক ও থিয়েটার সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক ইতিহাসিকা গুটিকয়েক ছত্রে প্রকাশ করা যা'ক। চীনা নাটকের বীজ ধর্ম্মপ্রবণ আবহাওয়ায় যখনই কেন না অঙ্কুরিত হোক, এর শৈশবাবস্থার সন্ধান মেলে—তাঙ রাজবংশের (৭২০ খৃঃ অঃ —৯৬০ খৃঃ অঃ) শেষাবস্থায়। এই সময়ের কোন নমুনা নাটিকা মেলে না। কথিত আছে, 'সূত্রধার' জাতীয় একজন অভিনেতাই গান ও আবৃত্তি-সহকারে নাটকীয় রস পরিবেশন ক'রত। এর জুড়ী অনেকটা বাঙালী কথক-ঠাকুর। এই হ'ল চীনা নাটকের আদিম অবস্থা। সুঙ রাজবংশের (৯৬০ খৃঃ অঃ—১১২৬ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে নাটকের অধিকাংশ অংশই গানের মধ্যে দিয়ে অভিনীত হ'ত। নাটকীয় বিষয়-বস্তু অতীব সাধারণ ও গীতি-

কবিতার প্রাবল্য ছিল। কোন নাটকেই পাঁচজনের বেশী অভিনেতা দেখা যেত না। এই হ'ল চীনা নাটকের দ্বিতীয় অবস্থা। চিউ এবং য়ুয়ান্ রাজবংশদ্বয়ের (১১২৬ খৃঃ অঃ—১৩৬৮ খৃঃ অঃ) রাজত্বকাল চীনা নাটক ও থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। এই সময়েই নাট্য-রীতির বহুল পরিবর্ত্তন হয় ও অভিনবত্ব আসে। আজও এই পরিবর্ত্তন ও নূতনত্বের ছাপ চীনা নাটক ও থিয়েটারের ওপরে অতি মাত্রায় র'য়েছে। Giles সাহেবের মতে, "The drama of this period is to all intents and purposes the drama of to-day." য়ুয়ান্ বা মঙ্গোল রাজবংশের (১২৮০ খৃঃ অঃ—১৩৬৮ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালেই বিখ্যাত একশত নাটক অভিনীত হয়। সম্রাটদিগের পৃষ্ঠপোষকতাতেই নাট্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল। এই সময়েই 'কুয়েন-চিয়ান্'-এর সঙ্গীত-রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই হ'ল চীনা নাটকের চরমোন্নতির যুগ বা তৃতীয় অবস্থা। মিঙ রাজবংশের (১৩৬৯ খৃঃ অঃ—১৬৪৪ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে চীনা থিয়েটার সর্ব্বসাধারণের নিকট সহানুভূতি পায়। 'ছুইই-ডায়ান্' নামে নূতন ধরণের নাট্য-রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। 'ছুইই-চেঙ' নগরে এই নাট্য-রীতির উদ্ভব। সাধারণতঃ এক অঙ্কের ছোট ছোট নাটিকা অভিনীত হ'ত। সাহিত্যের বিচারে নাটিকাসমূহের কোন মূল্য নেই। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র-সহকারে বেমিল, বেতালা বাদ্যধ্বনির সৃষ্টি হ'ত। কিন্তু এই সব নাট্যরীতি-বাদ্যপন্থা পরবর্ত্তী রাজবংশের রাজত্বকালে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। এই হ'ল চীনা নাটকের চতুর্থ অবস্থা। মাঞ্চুদের রাজত্বকালে (১৬৪৪ খৃঃ অঃ—১৯১২ খৃঃ অঃ) 'কিঙ-ডায়ান্' বা 'পেকিং' সঙ্গীত-রীতির প্রবর্ত্তন হয়। এই সঙ্গীত-রীতি প্রায় প্রত্যেক থিয়েটারেই প্রচলিত হয়। এখনও এর প্রচলন আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই 'প্যাঙ-জে' রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে। মাঞ্চুদের রাজত্বকালেই নাট্য-রীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখবার প্রচেষ্টা হয়। এই সময়েই জাতীয় নাট্য-রীতির চরম পরিণতি প্রকাশ পায়। 'কিঙ-ডায়ান্' রীতির সমধিক প্রচলন সত্ত্বেও 'প্যাঙ-জে' রীতির চলন আছে, তবে এটা চাট্‌নী জাতীয়। এই হ'ল চীনা নাটকের পঞ্চম অবস্থা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই চীন নাটকে ও থিয়েটারে পাশ্চাত্য প্রভাব আমদানী হ'য়েছে। বর্ত্তমানে এই ষষ্ঠ অবস্থা চ'ল্‌ছে। ইউরোপীয় আদর্শানুযায়ী 'ওয়েন্-মিঙ-হি' বা সভ্যতা-সংস্কৃতিবোধক comedy জাতীয় নাটক চীনা থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে। নাটক কথিত ভাষায় অভিনীত হয়। বেমিল অর্কেষ্ট্রার কোন বালাই নেই। 'দুর্জ্জনসংসর্গ' পরিত্যক্ত হ'য়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত এই রীতি এখনও শৈশব অবস্থায় র'য়েছে। 'কিঙ-ডায়ান্' ও 'প্যাঙ-জে' রীতিদ্বয় এখনও খুব চলতি আছে। অধিকাংশ থিয়েটারেই 'কিঙ-ডায়ান্' রীতি নিরঙ্কুশভাবে চ'লেছে। সংরক্ষণশীল চৈনিক [illegible] কে কতদিনে যে পাশ্চাত্য প্রভাব একে [illegible] বে তা' একমাত্র মহাকালই জানে।

গান

শ্রীঅমিয়মোহন বসু

মোহন বেণু উদাস সুরে
পথিক বাজায়,
রোজ সকালে এমনি ক'রে
মনটি মাতায়!

ফুলে ফুলময় বীথিকা কানন—
সে সুরে তাদের লাগে যে মাতন,
পরাগ চুমিয়া মৌমাছি ভাসে
প্রেমাশ্রু ধারায়!

ভেজা দূর্ব্বাদল, ক্ষেতভরা ধান,
বট-নদী এরা শোনে সেই তান;
সে সুরে মিলায়ে ডেকে ওঠে পাখী
গাছের শাখায়।

ভোরের শীতল দখিনা বাতাস
সবার পরাণ করে যে উদাস,
প্রেমের বাঁশরী প্রেম-প্রীতি বুকে
জাগায়, জাগায়!
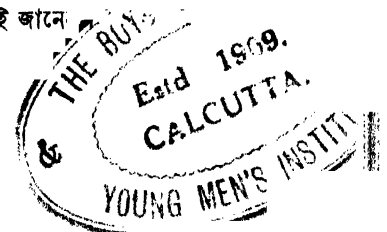
মাটীর পৃথিবী

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

নূতন ব্যাপার কিছুই নহে।

আমাদের দেশে ইহার প্রচলন আছে। প্রচলনের পিছনে আছে সুসমর্থনের অত্যুঙ্গ আভিজাত্য। স্ত্রী-বিয়োগের পর গৃহীর পক্ষে বিবাহ না করিলে চলে কি করিয়া? কে আগলায় তাহার সংসার? কেই বা অসময়ে—অর্থাৎ শুধু পারিবারিক নয়, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক কারণও আছে।

সুতরাং অবাক্ কেহই হইল না।

অত বড় জমিদার? তিন কূলে থাকিবার মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে, তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। একটি মাত্র শিশুপুত্র জন্মের পর কয়েকটা বছর কাটাইয়া সেও পৃথিবীর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। এতদিন তবু সাবিত্রীর মত সতীলক্ষ্মী গৃহিণী ঘর আলো করিয়া ছিলেন—তিনিও জীবনের নোঙর তুলিয়া নিরুদ্দেশের যাত্রায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখন বিবাহ না করিলে, এত বড় বিস্তৃত রাজ্যপাট কেই বা ভোগ-দখল করে—কেই বা দেখে শোনে!

সেই কথাটাই জমিদার মহাশয় তাহার কুল-গুরুকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন: বিয়ে করার ইচ্ছে আর ছিল না, তবে—

গুরুদেব শাস্ত্রের কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া হা-হা করিয়া উঠিলেন: বংশরক্ষাই ত সকল কাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ।

পরিষদ্-সভারও সেই মত: কি আর এমন বয়স হয়েছে হুজুরের! এই বয়সে মোগল আমলে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হতো।

নূতন কলপ-লাগান শনের মত কটা চুল দোলাইয়া, গরদের পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকাইতে ঢুকাইতে জমিদার মহাশয় বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া বিজ্ঞতার হাসি হাসেন মাত্র। এ কিছু তাঁহার কাছে নূতন কাহিনী নয়। সকল অধিকারের উপর যে বিবাহের অধিকার এদেশে শাশ্বত, ইহা তাঁহার জানা।

অধিকাংশ গ্রামের লোকের মতও দেখা গেল তাই। পাত্রীর বয়স যখন সতর ছাড়াইয়া আঠারয় পড়িয়াছে, তখন এমন কি আর অমানান বিবাহ? অত বড় জমিদারের ঘরে পড়িয়া মানুষ হইয়া উঠিবে, খাইয়া-দাইয়া সোনায়-দানায় সে ত দুদিন পরেই একটা রাজরাণী। মেয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া অনেকের চোখ ঈর্ষার এক রূপ-লাবণ্য স্বর্গীয় আভায় গাঢ় হইয়া উঠিল পর্য্যন্ত: ঐ ত হাড়গিলের মত লম্বা ফিন্‌ফিনে চেহারা; রংটাই না হয় একটু ফর্সা—বয়স ত আর কম নয়।

কেহ কেহ বা কাণাকাণি করিয়া কি সব কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত চুপে-চুপে নিজেরাই অলোচনা করিল। গ্রামের জমিদারের সহিত যখন বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, তখন ইহা লইয়া বেশী আলাপ-আলোচনার জের অনেক দূর গড়াইতে পারে, তাহাতে অনেক ধাক্কা, অনেক বিপদ।

কিন্তু গ্রামের যে কাহিনী একজনে জানে, তাহা যদি পরের বিষয়-কেন্দ্র করিয়া হয়—তাহাই শ্রুতিকর, এই ধরণের প্রবাদ আবহমান কাল ধরিয়া গ্রামে বহমান। সুতরাং জমিদারের কাণেও কথাটা গেল: শ্রীমতী বিদেহী দেবীর সহিত নাকি এ গ্রামেরই কোন একটি ছেলের গভীর পরিচয়।

জমিদার মনে মনে হাসিলেন। রাগে এবং আক্রোশে তাঁহার সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতেছে: কি নাম?

পারিষদ বলিল: গাঙ্গুলী বাড়ির সৌম্য।

জমিদার দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন: কি করে?

সবিনয়ে পারিষদ বলিল: বছর দুই হ'ল বি-এ পাশ করে কলকাতায় ঠিক যে কি করছে জানা তা' নেই কারো। থাকে কল্‌কাতায়ই এখন, সপ্তাহে সপ্তাহে আসে।

জমিদার কি ভাবিতেছিলেন। বলিলেন: সেই যে স্বদেশীতে জেল খেটেছিল মাস কতক - সেই ছোঁড়াটাই নাকি?

পারিষদ্ স্মিতহাস্যে বলিল: হুজুরের সব কথাই মনে থাকে।

জমিদার গম্ভীর হইয়াই রহিলেন।

এবারে পারিষদ আরও আস্তে আস্তে এবং একটু অগ্রসর হইয়া চাপা-গলায় বলিয়া চলিল: আলাপ এদের সেই ছোটবেলা হতেই, বুঝলেন না কর্ত্তা। রোজ নদীর ধারে সন্ধ্যায় দুজনেরই যাওয়া চাই।

জমিদার বলিলেন: হুঁ।

এবং হুঁ বলিয়াই একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন: দেওয়ানজী।

দেওয়ান প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাজির।

জমিদার বলিলেন: গাঙ্গুলী বাড়ীর ক'বছরের কিস্তী বাকী? দেওয়ান বুঝি বা মনে মনে হিসাব ঠিক করিয়া বলিলেন: তা হুজুর প্রায় তিন বছর হতে চলল—কিছুই জমা নেই।

জমিদার আবারও বলিলেন: হুঁ।

অর্থাৎ এই ছোট্ট শব্দটির অর্থ সকলেরই জ্ঞাত।

সকলে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

আর জমিদার মহাশয় তখন ভাবিতেছেন যে, যাহার নামে বাঘে গরুতে জল খায়, সরকার বাহাদুরে যাহার অতো সম্মান—সেই তাহারই সহিত সমকক্ষতার দাবী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে ছোট্ট একটি বালক। এতো তার সাহস!

সবটা সত্য না হোক, কিছু ত বটেই।

পরিচয় তাহাদের সেই কচি সুমিষ্ট বাল্যে, জীবনে সেদিন পৃথিবীকে তাহারা চেনে নাই, জানে নাই ইহার চারিদিকে কত দুঃখ, কত আর্ত্তনাদ, কত বেদনা। সেই শিশু বাল্যে তাহাদের পরিচয়। ধীরে ধীরে সেই সবুজ আলো-ছায়াময় নবীন কৈশোরের প্রথম দিনগুলির মধ্য দিয়া সে পরিচয় ভাষা পায়, সুন্দর হইয়া উঠে গভীরতায়। তারপর একের অন্তকে যেন ভালো লাগে—কি যেন ছন্দ মনের দুয়ারে আসিয়া কি যেন বলিতে চায়। চারিদিকে কত বাতাস, কত আলো—সব বুঝি তাহাদেরই জন্য প্রকৃতির বুকে ভরাট হইয়া উঠিয়াছে! বন বনানীর মর্ম্মরিকায় এত সুর আগে ত ছিল না! সব যে নূতন অতিথির দল!

বিদেহী সৌম্যর দিকে তাকাইল।

সম্মুখে গ্রামের ছোট্ট নদীটি। আকাশে অল্প অল্প জ্যোছনা। নদীর ঢেউয়ে রূপালী বিকীরণ। সমস্ত 'রূপা' যেন কে সোনার আলোর পরশ দিয়া সব কিছু সাজাইয়া দিয়াছে।

বিদেহী হাত দিয়া কয়েকটা দুর্ব্বা তুলিয়া, অকারণে তাহা আবার ফেলিয়া দিতে দিতে একবার সৌম্যর দিকে তাকাইল। ওর লাবণ্যময়ী মুখে কে যেন আজ বিষাদের ছায়া ঢালিয়া দিয়াছে। সৌম্যরও তাই।

দুইজনে পাশাপাশি রহিয়াছে—তবুও যেন কত দূর!

এবারে সৌম্যও হাসিল। দুঃখের দিনেই ত মানুষ হাসে বেশী! হাসিয়া বলিল: ভালই ত হ'ল বিদেহী।

বিদেহী অভিমানে তবু ঠোঁট ফুলাইয়া আছে।

সৌম্য বলিল: আমার হাতে পড়লে হয়তো দুবেলা দুমুঠো খেতেও পারতে না ভাল করে। এখন হবে জমিদারের গৃহিণী। দাস দাসীতে জমজমাট হয়ে থাকবে।

সৌম্য যেন নর-কঙ্কালের মত হাসিয়া উঠিল। সেই শীর্ণ হাসির কঠিন রেখা ছড়াইয়া গেল দূর দূরান্তরে। গ্রামের এই নদীটির ঢেউয়ে বুঝি তারই কথা—না হইলে অত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন? ওপারের বকুল গাছ হইতে এই সন্ধ্যেবেলাই বা কেন বকুল ফুল ঝরিতে আরম্ভ করিয়া দিল? কেন?

কিন্তু বিদেহীর মন যেন ততক্ষণে নিরুদ্দেশের যাত্রা-পথে এলোমেলো সোনার রথে চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কে চায় এই রাজ ঐশ্বর্য্য? সে যে চাহিয়াছিল তাহারই মত ছোট্ট একটি তরুণকে লইয়া জীবনের যাত্রা-পথে নিজেদের গতি। এই নদীর কোল ঘেঁষিয়াই ছোট্ট একটি কুটীর—কুটীরের চারিদিকে সে আপন হাতে লাগাইয়া দিবে যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধার ঝাড়।

হাস্নুহানার একটা গাছ রাখিবে দক্ষিণের দিকে—শয়ন-কক্ষের জানালাটির দিকে মুখ করিয়া।

বিদেহীর কাণে সৌম্যর কথা প্রবেশই করে নাই।

সৌম্য তখনও বলিয়া চলিয়াছে: শুনছি, বিয়ের আগেই নাকি অর্দ্ধেক জমিদারী তোমার নামে লিখে দেবে?

কিন্তু বিদেহীর মন তখনও বয়ন করিয়া চলিয়াছে আপন কল্পনার রঙ্গীন মালা। সৌম্যর ত এখন ত্রিশ টাকা মাইনে—এই ত্রিশ টাকা লইয়াই সে রাজরাণীর মত এত শৃঙ্খলা আনিয়া দিবে যে, সৌম্য বুঝিতেই পারিবে না যে এত প্রাচুর্য্য আসিল কি করিয়া?

বিদেহী ভাবিতে লাগিল।

বাস্তব আসিয়া তাহার মনের দুয়ারে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেহী অবসাদভরা দুটি বিবর্ণ চোখে সৌম্যর দিকে তাকাইল।

সৌম্য বলিল: অনেক সোনাদানা, হীরা-জহরৎও নাকি দেবে।

হ্যাঁ: যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণকণ্ঠে কে বলিয়া চলিয়াছে: দেবে। তুমি থামো একবার।

তারপর একটু চুপ করিয়া বলিল: আচ্ছা কোন উপায়ই আর নেই। না?

সৌম্য হাসিতে চেষ্টা করিল মাত্র।

বিদেহী বলিল: আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে তবু বিয়ে করতেই হবে? তুমিও দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবে?

সৌম্য কথা কহিতে পারিল না।

তার অন্তরে বেদনার অঞ্জন যেন রাশি রাশি নৈবেদ্য লইয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে যেন নিতান্তই নিরুপায়। এই জমিদারের নিকটই বলিতে গেলে যে সমস্ত কিছুই তাহাদের বাঁধা। তাহাকে পড়াইতে তাহার পিতামাতা সর্ব্বস্ব দিয়া রিক্ত ঋণী হইয়া আছেন। আজ সেই জমিদারের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইলে সেও কি তাহার পিতামাতা, ভাইভগ্নী সকলের মুখের গ্রাস টানিয়া লইবে না। ছোট বোনটির এখনও বিবাহ হয় নাই—মাতা মৃত্যুশয্যায়—ছোট ভাইটি সবে কলেজে ঢুকিয়াছে। একা নিজের স্বার্থের বিনিময়ে সকলের স্বার্থ সে খর্ব্ব করিবে কোন অধিকারে? প্রেমের দেবতার নিকটও নিশ্চয়ই এত বড় বিরাট্ অপরাধের মার্জ্জনা মিলিবে না। তাই তাহাকে চোখের সম্মুখেই সব কিছু দেখিয়া যাইতে হইবে। তবু তার পরম প্রিয়া বিদেহীও সুখী হইবে!'

বিদেহীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সৌম্য বলিল: দুঃখ করো না বিদেহী। যুগে যুগে এমন অনেক প্রেম পৃথিবীর ধূলা-মন্দিরে নষ্ট হয়ে যায়। জানো না—বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—দূরেও সরিয়ে দেয়! তাই।

দু'জনে আবার চুপ করিয়া থাকে।

দু'জনেই বোঝে দু'জনেই নিরুপায়।

আকাশ ভরিয়া অল্প জ্যোছনার অপূর্ব্ব লাবণ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণের বসন্ত বাতাসে না-পাওয়ার বেদনা।

সৌম্য বলিল: চল এবার ফিরি!

বিদেহী বলিল: আর একটু বসবে না? তোমার কাছে আছি—মনে হয় কি জানো? মনে হয় কোন কিছুই আর পাওয়ার বাকী নেই।

সৌম্য একবার বিদেহীর দিকে তাকাইল: রাত হয়ে গেছে, চল।

বিদেহী উঠিয়া ধীরে ধীরে সৌম্যর সাথে সাথে চলিতে সুরু করিল। কিন্তু এতক্ষণ অলক্ষ্যে যে গ্রামের জমিদার স পারিষদ্ দূরের বাবলা গাছের সীমানায় দাঁড়াইয়া ইহাদের সকল কথাবার্ত্তাই শুনিয়া গিয়াছে—সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

আকাশে চাঁদের আলো মুঠো মুঠো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীর মাঝখানে জেলেদের নৌকাগুলিতে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ও-পারের খড়ের বাড়ীগুলি অন্ধকারের মধ্যে সব যেন নিঝুম।

পাকা দেখা এখনও অবশ্য হয় নাই।

কিন্তু পাকা জমিদার ভিতরে ভিতরে যতই পাকা চাল দিবার ব্যবস্থা করিয়া চলিলেন, বাহিরে তেমনই 'কাঁচা' বনিতে সুরু করিলেন। ত্রাস দিয়া সেই বাঁধান দাঁত দু'বেলা মাজা চাই। না, পান তিনি একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সরু পাড়ের মিহি ধুতী বেশ কোঁচা করা;

আদ্দির পাঞ্জাবী। পায়ে কালো পাম্প-সু। হাতের লাঠিটা এখন আর ব্যবহার করেন না।

দু'বেলা কলপ লাগাইয়া লাগাইয়া চুল প্রায় কালো করিয়াই তুলিয়াছেন এবং মুখে হাসি।

বর হইতে চলিয়াছেন। এই একটি দিন সবাই তাহাকে লইয়া হাসি-তামাসাই করিবে। গম্ভীর হইয়া থাকিলে চলিবে না।

জমিদার একেবারে নূতন বনিয়া গিয়াছেন! কথায়-বার্ত্তায়, আহারে-বিহারে এখন মুখ তুলিয়া কথা বলেন; একটু রসিকতাও করেন। কিন্তু গোপনে পারিষদের সহিত যথারীতি 'আসল' বিষয়ে আলোচনাও বাদ যায় না। তাঁহার সেই ছেলেটি আজ যদি বাঁচিয়া থাকিত, সৌম্যের মতই সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্ আর লেখাপড়ায়ও নিশ্চয়ই সে সৌম্যের চেয়ে কম যাইত না। সে থাকিলে আজ তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহারই মনোনীত পাত্রীকে আকাঙ্ক্ষা করার মজাটা ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিত। কিন্তু ভগবান তাহাকে রাখিলেন না!

অকস্মাৎ তাঁহার সেই শিশু পুত্রটির কথা মনে পড়িয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য জমিদার সমস্ত কাজ ভুলিয়া বিমনা হইয়া পড়েন। এই শিশুকণ্ঠের ধ্বনিতে যেন সব কিছু মুখর হইয়া উঠে। নিজের উপর যেন জমিদারের একটা আক্রোশ জন্মিয়া যায়—শনির দৃষ্টির মত যে দিকেই সে চায় সব কিছু এমন করিয়া পুড়িয়া খাঁক হইয়া যায় কেন? বিবাহ করিতে যাইবে—তাহাতেও বিধাতার বিরুদ্ধাচরণ।

উপরের ঘরে বসিয়া বসিয়া জমিদার এসব ভাবিতেছেন—এমন সময়ে তাঁর প্রিয় পারিষদ্ আসিয়া উপস্থিত।

জমিদার হাসিয়া বলিলেন—আরে তুমি যে! বলি সেদিককার ব্যবস্থা সব ঠিক ত?

পারিষদ হাসিয়া বলিল—সদর হইতেই আসছি হুজুর, দিয়ে এসেছি নালিশ ঠুকে। তারিখ পড়েছে উনিশে—

জমিদার হাসিলেন: ভালই হয়েছে। উনিশে—তাহলে বিয়ের আগের দিন—না? আর সেই রেজেষ্ট্রী-পত্রগুলো সব করে এনেছ ত?

পারিষদ জামার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিল এবং রেজেষ্ট্রী করা একটা দলিল জমিদারের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল এবং মুখটা একটু বাঁকাইয়া বলিতে লাগিল: বিয়ের আগেই সমস্ত বিষ্ণুপুরের এষ্টেটটা দিয়ে দিলেন বিদেহী দেবীকে—ভাবছি বিদেহীর বাবা চক্কোত্তী মশাই আবার শেষে বেঁকে না বসেন।

জমিদার বলিলেন: সে আবার কি?

পারিষদ বলিল: বিয়ে না হতেই এতটা পেয়ে গেলে আরও ত কিছু চেয়ে বসতে পারে। গরজ ঠাউরিয়ে না যায়—

জমিদার চিন্তিত হইলেন।

তারপর বলিলেন: সে তখন দেখা যাবে। হাতে ত আর দিচ্ছিনে আগে। পাকা দেখাও ত এখনও বাকী। তারপর সৌম্যবাবুর খবর কি তোমাদের?

পারিষদ জমিদারের কাছে আগাইয়া বসিল: দারোগা-বাবুর কাছে গিয়েছিলাম। সৌম্য নাকি প্রকাণ্ড একটা লীডার, কিন্তু খুবই নাকি পরোপকারী। তা' কিছু তাঁকে দিলেই একটা মামলা লাগিয়ে দেওয়া যায়। সাক্ষ্য পাওয়া একটু কঠিন হবে অবিশ্যি।

জমিদার ভাবিতে লাগিলেন।

তারপর বলিলেন: তা দু'জনে দেখাশোনা ত হচ্ছে এখনও।

পারিষদ সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—রোজই দু'বেলা নদীর ঘাটে বসা চাই-ই।

জমিদার একটু চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন: দেখ হে অনুকূল, বিয়ের আগে এ নিয়ে বেশী ঝামেলা তুলে কাজ নেই। মামলাপত্তর সব এখন থাক। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর যাচ্ছে কোথায় বাছাধন। সে আমি সব ঠিক করব।

অনুকূল বুঝিল—জমিদার একটা বড় গোছের চাল দিয়া বাজী মাৎ করিতে চাহিতেছেন—সুতরাং পারিষদ চুপ করিয়া গেল। এত বড় পাকা জমিদার কি উদ্দেশ্যে কখন কি করেন, বুঝিবার উপায়ও আর নাই।

জমিদার ওদিকে তখনও বলিয়া চলিয়াছেন—যেমন আছে ওরা তেমনই থাকুক। এখন কিছু করলেই একটা

গোলমাল দাঁড়িয়ে যাবে—তারপর খবরের কাগজ আছে—একটা কেলেঙ্কারী না হয়, তাও ত দেখতে হবে।

পারিষদ বলিল : যে আজ্ঞে।

জমিদার বলিলেন : পাকা দেখার দিন নিশ্চয়ই ছোঁড়াটাও উপস্থিত থাকবে। পাকা দেখা হয়ে গেলেই ব্যস্—।

জমিদার হাসিয়া উঠিলেন : ওর বাবাও যাতে উপস্থিত থাকে সে ব্যবস্থাটাও তুমি করে ফেলো। এক সাথেই দু'জনকে আটকিয়ে সদরে চালান। তোমার উপর এই ভার রইলো—এর মধ্যে আর কিছু করোনা যেন।

না, পাকা দেখার আগে আর কিছুই হইল না। কিন্তু জমিদার বিবাহের নামে যেন একেবারে পাগল বনিয়া গিয়াছেন। ভোরে-দুপুরে, সময় নাই, অসময় নাই—সেক্‌রার দোকানে নিজেই যান : ওহে! পাইন-ফাইন দিওনা যেন!

জমিদারকে দেখিয়া সবাই হতচকিত হইয়া যায়। জিভে দাঁত লাগাইয়া বলে : হুজুরের জিনিষ—খারাপ করলে ধর্ম্মেও সইবে না।

জমিদার যাহাদের সহিত কোনদিন কথা বলেন না—তাহাদেরও ডাকিয়া জড়ো করিয়া খরচপত্রের ফর্দ্দ করেন।

সকলে চুপে চুপে হাসে।

বলে : বুড়ো কালে বিয়ে করলে এমনই হয়।

হাসিয়া হাসিয়া সবাই লুটাইয়া পড়ে।

কিন্তু যতই পাকা দেখার দিন আগাইয়া আসিতে লাগিল—ওদিকে দুইটি তরুণ তরুণীর জীবনের আয়ুও যেন কমিয়া আসিতেছে। সৌম্যের ভাবিবার অবসর নাই—পাকা দেখার দিন হইতেই বিদেহীর বিবাহে উঠিয়া পড়িয়া খাটিতে হইবে। কোন দিকে তাকাইলে চলিবে না। তারপর?

তারপরের কথা দুইজনেই ভাবিতে পারে না। চোখের সম্মুখটা আব্‌ছা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। মৃত্যু যেন তার শীতল স্পন্দন লইয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে। সব কিছু যেন বিষাদে ভরা—ম্লান।

তবু ভাবিলে চলিবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে দুঃখের বেদনা দিয়াই প্রতিটি দিনের কাহিনী রচিত। কিন্তু অরচিত কাব্যের গোপন সীমানায় মানুষের বেদনা রহিয়া রহিয়া জমাট বাঁধিয়া তুলিয়াছে—কে তাহার খবর রাখে?

অবশেষে পাকা দেখার দিনও আসিয়া পড়িল। সামাজিক প্রথায় নারায়ণ সাক্ষী করিয়া দান ও গ্রহণের অঙ্গীকার চিরাচরিত প্রথা—। তাই এর প্রয়োজন।

বলির পাঠার মত বিদেহী স্নান করিল। সজ্জিত হইল নূতন বেশে।

ফতুয়া গায়ে মালকোঁচা মারা সৌম্য খাবারের জিনিষপত্র-গুলি ভাঁড়ারে রাখিতে রাখিতে বলিল : সেই তেইশ জন লোক এসেছেন, শীগ্‌গির খাবারের জায়গা করে রাখো কাকীমা।

ওদিক হইতে পাত্রী লইয়া যাইবার চীৎকার সুরু হইয়া গিয়াছে। সৌম্যের উপরই সেই ভার।

বিদেহীকে লইয়া সৌম্য প্রবেশ করিল তাহাদের সম্মুখে।

গ্রামের প্রধান প্রধান সবাই আসিয়াছেন। সৌম্যের বাবাও বাদ যায় নাই, ও পাশে বসিয়াছেন—জমিদার মহাশয় নিজে।

বিদেহীকে লইয়া সৌম্য প্রবেশ করিতেই জমিদার অকস্মাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

চীৎকার করিয়া বলিলেন : এস মা, এস।

হাতে ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন—আঃ, কী সুন্দর তুমি মা—আর তুমি যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ওদিকে—এস; সৌম্যকে টানিয়া বিদেহীর হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন : তোমাদের পাকা দেখা হয়ে গেল। ওহে চকোর্ত্তী, এই নেও তোমার সেই রেজেষ্ট্রী পত্র; অনুকূল কোথায় গেল—গয়না পত্র সব বের কর দিকি—মাকে আমিই সাজিয়ে দিই।

সকলে অবাক্ বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু জমিদার কেবলই বুঝাইতে লাগিলেন : তাহার সেই পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাহার বিবাহ দিয়া এমনিই একটি পুত্রবধূ তিনি ঘরে তুলিতেন—এই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করা তাঁহার একেবারেই পোষায় না—

সে সব অনেক কিছু তিনি বলিয়া চলিলেন: তা তোমরা আর দাঁড়িয়ে থেকনা, এবারে মাঙ্গলিক কি কি বাকী শেষ ক'রে ফেল।

সৌম্য ও বিদেহী এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তাকাইয়াছিল। নত হইয়া দুইজনে জমিদারের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

কিন্তু জমিদারের কোন দিকে লক্ষ্য নাই। কেবলই মনে হইতেছে: সেই শিশু পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাহার এমনি করিয়াই বিবাহ দিতেন।

তাঁহার সমস্ত মন দুঃখে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল

শ্রীফণিভূষণ দত্ত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার ফল স্ব-স্ব গ্রন্থমধ্যে অথবা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গবেষণাকার্যে অগ্রণীগণের মধ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্. এ. বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি নানা দিক্ দিয়াই চরিতামৃতের সমাপ্তিকালের বিচার করিয়া আপনার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকালের নির্দেশক দুইটি শ্লোক পাওয়া যায়। তাহার একটি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শেষে এবং অপরটি নিত্যানন্দদাস-কৃত প্রেমবিলাস গ্রন্থের চতুর্বিংশ বিলাসে। চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বীয় গ্রন্থসমাপ্তির সময় সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পরন্তু প্রেমবিলাসের যে অংশে চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বিবৃত হইয়াছে, সে অংশ পণ্ডিত-সমাজ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রেমবিলাসের নির্দিষ্ট কাল নির্ভরযোগ্য নহে। এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী লেখকগণ বহু সারগর্ভ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রেমবিলাসের নির্দিষ্ট কাল সমসাময়িক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা কোন রূপেই সমর্থিত হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শেষে তাহার সমাপ্তিকাল এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

> "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
> সূর্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

এবং প্রেমবিলাস হইতে চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল পাওয়া যায় এইরূপ—

> "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
> সূর্যেহহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় শ্লোক হইতে অবগত হই যে, '১৫০৩ শকে রবিবারে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে বৃন্দাবনে এই গ্রন্থ (চৈতন্যচরিতামৃত) সমাপ্ত হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক হইতে কোন্ শক পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। পূর্ববর্তী লেখকগণের সকলেই, ঐ শ্লোক অবলম্বন করিয়া, এক বাক্যে বলিয়াছেন, '১৫৩৭ শকের রবিবারে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে এই গ্রন্থ বৃন্দাবনে সমাপ্ত হইল।' কিন্তু চরিতামৃতের উক্ত শ্লোক হইতে ১৫৩৭ শক কিরূপে পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কেহই কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। 'শাক সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ' হইতে আমরা পাই—সিন্ধু = ৪, অগ্নি = ৩, বাণ = ৫ এবং ইন্দু = ১। অঙ্কের বামদিকে গতি হেতু

আমরা পাইলাম ১৫৩৪ শক। কিন্তু সিন্ধু শব্দে ৭ সংখ্যা গ্রহণ করিলে ১৫৩৭ শক পাওয়া যায় বটে।

সিন্ধু, অগ্নি প্রভৃতি শব্দগুলি অঙ্ক প্রকাশের পারিভাষিক শব্দ। গণিত গ্রন্থের কোথাও সিন্ধু ও তদ্বাচক শব্দে ৭ প্রকাশিত হয় নাই—সর্বত্রই ৪ প্রকাশিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা গণিত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃশাস্ত্র হইতে দুই-চারি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। সূর্য-সিদ্ধান্তের ১ম অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিত—সূর্যাব্দ-সংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরষুতাহতৈঃ॥" ইহার সাগর শব্দের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"প্রাচীনানাং মতেন চত্বারঃ সাগরাঃ সমুদ্রাঃ 'পয়োধরীভুতচতুঃসমুদ্রাম্' ইতি কালিদাসোক্তেন সাগর-শব্দেন সংখ্যাচতুষ্টয়ং গৃহ্যতে॥" অর্থাৎ প্রাচীনগণের মতানুসারে সাগর বা তদ্বাচক শব্দে চারি সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। সূর্যসিদ্ধান্তের টীকায় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, "অব্দয়ঃ সমুদ্রাশ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ।" অর্থাৎ, সমুদ্র শব্দ চারি সংখ্যার জ্ঞাপক তাহা প্রসিদ্ধ আছে। ভাস্করাচার্য, আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, লল্ল প্রভৃতি গাণিতিকগণও সাগরবাচক শব্দে চারি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ছন্দঃ শাস্ত্রেও সমুদ্রবাচক শব্দে চারি সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, "লঃ সমুদ্রাগণঃ॥" ১২ টীকাকার হলায়ুধ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"সমুদ্রা ইতি চতুঃসংখ্যোপলক্ষণার্থম্।' তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—"তেন চতুর্ণাং সমুদ্রাঃ পঞ্চা-নামিন্দ্রিয়াণি প্রত্যেতব্যাঃ।" ১।১৫ অর্থাৎ, চারি সমুদ্র পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সংজ্ঞা লোকসমাজ গ্রহণ করিবে। ছন্দোমঞ্জরীতেও মন্দাক্রান্তা, তোটক, জলধরমালা প্রভৃতি ছন্দের লক্ষণ বর্ণনায় অব্ধি, অম্বুধি প্রভৃতি সাগর-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা চারি সংখ্যাকে বুঝাইয়াছে। আপ্তে মহাশয় (V. S. Apte) তদ্রচিত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে সমুদ্র শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন "the number four"। বাচস্পত্যাভিধানেও জলধি শব্দে লিখিত হইয়াছে 'চতুঃসংখ্যায়াং চ।' রামানন্দ তীর্থকৃত অঙ্কসংজ্ঞা-নামক পুস্তকে সিন্ধু শব্দে চারি সংখ্যাই প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, "ত্রয়ে রামবহ্নিগুণাঃ সিন্ধবেদৌ যুগং ততঃ।"

বার্ণেল সাহেব, বুহ্‌লার সাহেব এবং গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয়গণও ভারতের প্রাচীন লিপিমালা ও প্রস্তর-লিপি হইতে সমুদ্র বা তদ্বাচক শব্দ চারি সংখ্যার নির্দেশক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা কেহই সমুদ্র বা তদ্বাচক শব্দ সাত সংখ্যার নির্দেশক বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। (১)

গণিত ও ছন্দঃ ব্যবহারিক শাস্ত্র। একই শব্দে একের অধিক অঙ্ক প্রকাশিত হইলে, গণনায় ও ছন্দঃ প্রকাশে কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি করে তাহা সহজেই বোধগম্য।

বাঙলা ভাষায় 'তিনে নেত্র' 'সাতে সমুদ্র' প্রচলিত আছে। পঞ্জিকায় জ্যোতিষ-বচনার্থের মধ্যে 'বত্রিশের ঘরপূরণে' দেখা যায়—'চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ' ইত্যাদি। এই স্থলে 'সমুদ্র' শব্দে ৭ ও 'নেত্র' শব্দে ৩ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে সংস্কৃত শ্লোক বত্রিশের ঘর পূরণের মূল তাহাতে নেত্র ও সমুদ্র শব্দ স্থানে 'ত্রয়' ও 'মুনি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিকল্পলতা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে—সমুদ্র শব্দে ৪ ও ৭ লিখিত হইয়াছে। শুধু সমুদ্র শব্দ নহে—উক্ত গ্রন্থে রস শব্দে ৬ ও ৯, পর্বত শব্দে ৭ ও ৮, গুণ শব্দে ৩ ও ৬, অঙ্গ শব্দে ৫ ও ৬ লিখিত হইয়াছে। কবিকল্পলতা গ্রন্থে কাব্য রচনার উপযোগী নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। (কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীর ৭নং পুথি) এই গ্রন্থে একই শব্দে দুইটি করিয়া অঙ্ক জ্ঞাপিত হওয়ায়, শব্দে অঙ্ক প্রকাশ ব্যর্থ হইয়াছে। সমুদ্র-বাচক শব্দে যদি ৪ ও ৭ দুইটি সংখ্যাকেই বুঝায়, তাহা হইলে গণিত গ্রন্থে আমরা দুইটি অঙ্কেরই ব্যবহার দেখিতে পাইতাম। পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, সমুদ্র-বাচক শব্দে ৪ সংখ্যাই প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ গণিতশাস্ত্রে নেত্র শব্দে ২, রস শব্দে ৬, পর্বত শব্দে ৭, গুণ শব্দে ৩ ও অঙ্গ শব্দে ৬ সংখ্যাই বুঝাইয়া থাকে। এই সকল শব্দে ব্যবহার-বিরুদ্ধ সংখ্যান্তর কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

---

(১) Burnell's south Indian Caligraphy, B. The method of Expressing Numerals. p. 77

Indian Paleography—Buhler. p. 84

প্রাচীন লিপিমালা by Gourisankar Hirachand Ojha, p. 51

চরিতামৃতের যে শ্লোকে তাহার সমাপ্তিকাল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুতরাং তাহা হইতে সংস্কৃতানুযায়ী ১৫৩৪ শক গ্রহণ না করিলে ভুল হইবে। উক্ত শ্লোকে গ্রন্থ-সমাপ্তিকালের আরও পরিচয় পাওয়া যায়—উহা জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, রবিবার। কিন্তু তাহাতে সৌর তারিখের উল্লেখ নাই। আবার চান্দ্র মাস দুই প্রকারে গণিত হয়—মুখ্য চান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র। উত্তর ভারতে গৌণ চান্দ্রেরই ব্যবহার দেখা যায়। চরিতামৃত গ্রন্থও উত্তর ভারতের বৃন্দাবনে রচিত হইয়াছিল। আমরা জ্যোতিষিক গণনা করিয়া দেখিয়াছি—১৫৩৪ শকের গৌণ চান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারেই ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে গণনা করিয়া আমরা একই ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত দিন সৌর জ্যৈষ্ঠের ১২ই, এবং ইংরাজী (পুরাতন পঞ্জিকানুযায়ী) ১৬১২ খৃঃ ১০ই মে ছিল। আবার গৌণ চান্দ্রের পরিবর্তে মুখ্য চান্দ্র গ্রহণ করিলে ১৫৩৭, ১৫৩৪ ও ১৫০৩ তিনটি শকের কোনটিরই কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠ-পঞ্চমী রবিবারে হয় না।

১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারে না হইলে, আমাদের নির্দিষ্ট ১৫৩৪ শক গ্রহণে অবশ্যই বাধা উপস্থিত হইত। আভ্যন্তরীণ বা পারিপার্শ্বিক বিবরণ অথবা তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনার সহিতও উক্ত শকের বিরোধ উপস্থিত হয় না।

আমাদের এই গণনাফল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। তাহার উত্তরে ৫।৩।৩৬ তারিখে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি গণনা করিয়া দেখিলাম, আপনার গণনাও ঠিক। কিন্তু শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেও ১৫৩৭ লেখা আছে। ইহা বিবেচ্য বিষয়।" আমাদের গণনাও যে ঠিক তাহা উক্ত পত্রেও অবগত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু ১৫৩৭ ও ১৫৩৪ উভয় শকেই একখানি গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে কিরূপে? সুতরাং ইহাদের একটি শককেই গ্রহণ করিতে হইবে। রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "শিউড়ির লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের 'রতন লাইব্রেরীতে' রক্ষিত চরিতামৃতের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপিতে 'শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ' শ্লোকটি দেখা যায়। এবং ১০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি পুথির গ্রন্থশেষে এরূপও লিখিত আছে—"গ্রন্থকর্ত্তু শকাব্দা ১৫৩৭॥ চৈতন্যস্য জন্মশকাব্দা ১৪০৭॥ অপ্রকট শকব্দা ১৪৫৫॥ শকাব্দা (লিপিকাল) ১৭৫৫॥" (রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড—পৃঃ ৩৶ ও ৩।০) সকল পুথির শেষে অঙ্কে লিখিত ১৫৩৭ শক দেখা যায়। আমাদের নিকট ১১৬০ সালে লিখিত (অর্থাৎ, ১৮৫ বৎসরের পুরাতন) চৈতন্য-চরিতামৃতের একখানি পুথি আছে। তাহাতেও "সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ" ইত্যাদি গ্রন্থসমাপ্তির শ্লোকটি আছে, কিন্তু অঙ্কে প্রকাশিত কোন শক তাহাতে লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, কোন পুথির লিপিকর বাংলা মতে উক্ত শ্লোকের অর্থে ১৫৩৭ লিখিয়া থাকিবেন। পরবর্তী লিপিকরগণের কেহ কেহ হয়তো বিনা-বিচারেই ১৫৩৭ শক লিখিয়া গিয়াছেন। ১৫৩৭ অঙ্কটি গ্রন্থকর্তা কর্তৃক লিখিত হইলে, যে-সকল পুথিতে গ্রন্থ-সমাপ্তির শ্লোকটি দেখা যায়—সেই-সকল পুথিতেই অঙ্কদ্বারা ১৫৩৭ শকও লিখিত থাকিত।

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিবিধ শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে যে-সকল ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইতে কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দঃশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায়, সমুদ্র-বাচক শব্দে চারি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার কথা যে কবিরাজ গোস্বামীর অবিদিত ছিল তাহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন হয় না। অন্যথা তাঁহার পাণ্ডিত্যে দোষারোপ করা হইবে।

১৫৩৪ শককে চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে, সকল প্রকারেই সুমীমাংসা হইতে পারে। ঐ শকের গৌণ চান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারের প্রায় ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। ইহা সৌর জ্যৈষ্ঠও বটে। রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়, ১৫৩৭ শকের প্রতিপাদন-কল্পে, ১৫০৩ শকের বিরুদ্ধে যে-সকল ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণের আলোচনা করিয়াছেন, ১৫৩৪ শকের প্রতিপাদন

পক্ষেও সেই-সকল আলোচনা ব্যর্থ হইবে না। গণিতের আলোচনাতেও দেখা গিয়াছে যে, উক্ত শ্লোকে ১৫৩৪ শকই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রেমবিলাসের উল্লিখিত ১৫০৩ শক সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে, পক্ষপাতিত্ব রহিয়া যায়। নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "জ্যোতিষিক গণনায় দেখা গিয়াছে, ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারে হয় নাই—জ্যৈষ্ঠ মাসকে সৌর মাস ধরিলেও না, চান্দ্রমাস ধরিলেও না।" (২) এই কথার যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উত্তর ভারতে গৌণ চান্দ্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। আমরা গণনা করিয়া দেখিতে পাই ১৫০৩ শকের গৌণ চান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারেই ছিল। কিন্তু সেই দিন সৌর জ্যৈষ্ঠ মাসে না হইয়া, সৌর বৈশাখের ২৬এ তারিখ—ইংরাজি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের (পুরাতন পঞ্জিকানুযায়ী) ২৩এ এপ্রিল হইতেছে। শ্লোকের জ্যৈষ্ঠের সহিত সৌর মাসের সম্বন্ধ থাকিলে ১৫০৩ শক গ্রহণযোগ্য নহে। এই শক ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল ১৫৩৪ শকই গ্রহণীয়।

আমরা ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী যে ভাবে গণনা করিয়াছি—তাহার একটি প্রক্রিয়া পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

এই গণনার জন্য আমরা ১৮৫৫ শকের পঞ্জিকা অবলম্বন করিয়াছি। উক্ত শকের মেষ-সংক্রমণ হইয়াছে বৃহস্পতিবার বেলা দং ১২।৪৮ পলের সময়। সুতরাং মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় দং ৪৭।১২ পল বা '৭৮৬৭ দিন।

১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী কি বারে হইয়াছিল ?

১৫৩৪ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ পর্যন্ত সময় ৩২১ বৎসর

= ৩৬৫'২৫৮৭ (বর্ষপরিমাণ) × ৩২১ দিন

= ১১৭২৪৮'০৪২৭ দিন

যোগ, ১৮৫৫ শকের মেষ সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় ০'৭৮৬৭ দিন

∴ ১৫৩৪ শকের মেষসংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় } ১১৭২৪৮'৮২৯৪ দিন

বার নির্ণয়—১১৭২৪৮কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫। ১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্বদিন (বৃহস্পতিবার) হইবে সপ্তাহের পঞ্চম দিন।

∴ ১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখ হইবে **রবিবার**।

মেষ ভোগ বা বৈশাখ মাসের পরিমাণ = ৩০'৯৪৬৪ দিন

১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখে পূর্বে মেষ ভোগ = '৮২৯৪ দিন

∴ ১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখের সূর্যোদয় হইতে মেষভোগ = ৩০'১১৭০ দিন

∵ ৩১এ বৈশাখ সংক্রান্তি এবং পরদিন বুধবার ১লা জ্যৈষ্ঠ।

তিথি নির্ণয়—১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়

= ১১৭২৪৮ দিন

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্যোদয় হইতে ১১ই বৈশাখের অমাবস্যার শেষ পর্যন্ত সময় = ১০'৭৪২০৩ দিন

১১৭২৫৮'৭৪২০৩ দিন

১১৭২৫৮'৭৪২০৩ ÷ ২৯'৫৩০৫ (চান্দ্রমাসের দিন সংখ্যা) = ৩৯৭০, অব ২২'৬৫৭০৩ দিন

∴ ১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখের সূর্যোদয় হইতে ২২'৬৫৭০৩ দিন পরে একটি অমাবস্যা শেষ হইয়াছে। এই সময় চন্দ্র মেষ রাশির প্রায় ২৩° ছিল।

১৫৩৪ শকের ১লা বৈশাখ হইতে বৈশাখের অমাবস্যা পর্যন্ত = ২২'৬৫৭০৩ দিন

পরবর্তী পূর্ণিমা = ১৫'০৭৬৮ দিন

পরবর্তী পঞ্চমী শেষ = ৪'৫৮৬৮ দিন

৪২'৩২০৬৩ দিন

বাদ বৈশাখের দিন সংখ্যা = ৩১

১১'৩২০৬৩ দিন

অর্থাৎ, ১২ই জ্যৈষ্ঠের '৩২০৬ দিন বা প্রায় ২০ দণ্ড পর্যন্ত কৃষ্ণাপঞ্চমী ছিল। ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার থাকায় ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার।

∴ ১৫৩৪ শকের ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে কৃষ্ণা-পঞ্চমী ছিল।

(২) রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড—পৃঃ ৩১০।

বিধবা রতিমঞ্জরী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

খামের চিঠি ডাকে দিয়ে রতি প্রত্যুত্তরের পথ চেয়ে আছে ···

পাঁচদিনের দিন একটা জবাব এল—খামের একখানা চিঠি, আর একখানা খবরের কাগজ।

চিঠিতে লেখা আছে :

মাননীয়াসু,

আপনার বিজ্ঞাপনটি আমরা সাদরে পত্রস্থ করিয়াছি। আপনার অবগতির জন্য সেই সংখ্যার 'জনজাগরণ' এক কপি অত্র সহ পাঠাইলাম। আশা করি, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে। আপনার মত সাহসিকা নারীই এই দুর্ভাগা জড় দেশের জাগরণ ও প্রগতির সহায়।

বিজ্ঞাপনটির ভাষা কয়েক স্থানে সবিনয়ে সংশোধন করিয়াছি—আশা করি, অপরাধ লইবেন না। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

সম্পাদক, জনজাগরণ।

চিঠি রেখে' দিয়ে রতি কাগজ খুল্‌ল'—অল্প খুঁজতেই তার দেওয়া বিজ্ঞাপনটি মিল্‌ল' ...

বিজ্ঞাপনটি সে পড়্‌ল'—পড়ে' কেমন একটা ভয়ে তার বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, তার চোখ বুজে' এল ...

বিজ্ঞাপন এই :

"বিবাহার্থিনী বিধবা

বয়স ছাব্বিশ, বর্ত্তমানে কোনো সন্তান নাই, পুনর্বিবাহে ইচ্ছুক। জাতি কায়স্থ, পিতা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, পূর্ব্বস্বামী কাশ্যপ গোত্রীয়। দেখিতে সুশ্রী, বেশ স্বাস্থ্যবতী। ফটো সহ লিখুন। সাক্ষাৎকার সম্ভব।

রতিমঞ্জরী দাসী।

C/o ৺গোকুলেশ্বর ঘোষ।

পড়ে' রতির মন অকস্মাৎ মুদিত হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু সে অতি অল্প সময়ের জন্য।

সবাই বল্‌ছে, দেবতাকে ডাকো, দেবতাকে জানো, দেবতাকে ভালবাসো, দেবতাকে ঘরে আনো, দেবকাহিনী বলো আর শ্রবণ করো। মানুষকে ডাক্‌তে কেউ বল্‌ছে না ···

কিন্তু মানুষের মত অপরূপ আর মনোহর কোন্‌ দেবতা! কোনো দেবতার মূর্ত্তিকে মানুষের মূর্ত্তির মত অন্তররসে প্লাবিত হ'য়ে সুশ্রী হ'তে কেউ দেখে নাই। সুগঠিত আর মর্ম্মবান্‌ আর অন্তরচারী মর্ম্মবিদ্‌ মানুষ যে হয়, আর যদি আত্মদানের উন্মুখতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে সে আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তার মত শান্তিপ্রদ কোন্‌ দেবতা হ'তে পারেন! দেবতার নিজের কোনো স্বপ্রকট স্বভাবদত্ত চাহিদা নাই—তাঁর চাহিদা কাল্পনিক আর আরোপিত। ··· দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে' তাঁকে সুখদ জীবন্ত ক'রে তোলার দায়িত্ব কেবল তারই যে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে; তা' বিস্তর সাধনা-সাপেক্ষ—মুনি-ঋষি, সাধু সন্ন্যাসী; সংসারত্যাগী মোহান্তরা পর্য্যন্ত তা' করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ··· ধ্বনির প্রত্যুত্তরে ধ্বনি আর দানের বিনিময়ে দান পাবার আশা করে' দেবতাকে হৃদয় সমর্পণ আর অন্তরের কামনাকে মোহমুক্ত করে' নিবেদন করা যায় কি! নিবেদিত বস্তু নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে অনাস্বাদিত অবস্থায় একই স্থানে পুঞ্জীভূত হ'তে থাক্‌লে সে-ভার বহন করার সামর্থ্য অটুট থাকে কতদিন! ভক্তের ব্রতভঙ্গ হয় ঐ কারণেই, পূজারীরাও পাপ করতে পারে ঐ জন্যই। ··· পারস্পরিক দায়িত্ব স্বীকার করে' নিয়ে প্রেমবৈচিত্র্যে আর রসবহুলতায় মুহুর্মুহু শিহরিত বিস্মিত আর আকুল করে' তোলার সাধ্য দেবতার নাই ··· প্রাণের আকাশ প্রতি মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত আর বর্ণে বর্ণে রঞ্জিত করে' তুল্‌তে কোনো দেবতা পারেন না—দেবতার রূপান্তর নাই, ভাবাবেগ নাই, আবেশ নাই,

আগ্রহ নাই—দেবতা দিতে পারেন সীমাবদ্ধতা, বন্দীত্ব আর অচেতন মগ্ন জীবন—কেবল মানুষই দিতে পারে সাড়া পাওয়ার সজীব আনন্দ। দেবতা একঘেয়ে, নিজেই নিষ্প্রাণ।

কাজেই রতি মানুষকে ধ্যান করছে।

রতির মনে পড়ে, উপকথায় রাজপুত্র আর রাজকন্যার মিলনের বিবরণ দেখা যায়—তা' নেহাৎ ছেলেভুলান' হাল্‌কা গল্প নয়। কোন্ দেশের রাজপুত্র স্বপ্নে দেখ্‌ল' কোন্ পুরীর এক আঁধার প্রকোষ্ঠে বন্দিনী এক রাজ-কন্যার ছবি—দেখে' সে উন্মত্ত হ'ল ··· রাজকন্যাও স্বপ্নে দেখ্‌ল' সেই রাজপুত্রের রূপ—দেখে' সে উন্মত্ত হ'ল... রাজপুত্র বেরুলো তার প্রেয়সীর সন্ধানে ... অনেক বিঘ্ন সঙ্কট উত্তীর্ণ হ'য়ে অনেক কষ্টভোগ আর দুঃখবরণের পর উভয়ের মিলন হ'ল—তারা আলিঙ্গনবদ্ধ হ'ল—তারা সুখী হ'ল।

ও-কথা মিথ্যে নয়—

পৃথিবীময় এই কাণ্ড খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটছে—পুরুষ খুঁজছে নারী, নারী খুঁজছে পুরুষকে—মনের মতোটিকে পেতে তারা বদ্ধপরিকর—ধ্যানের আনন্দে লজ্জাবোধ তাদের বিনষ্ট হ'য়ে গেছে।

সে কেন খুঁজবে না। খুঁজ্‌বে, পরীক্ষা করবে, তারপর মনের মত না হ'লে ত্যাগ করবে।

বন্দিনী রাজকন্যার প্রাণে যে দুস্তর চুম্বকশক্তি জেগে' বহুদূরবর্ত্তী প্রেমিককে আকর্ষণ করে' এনেছিল তা' তারও প্রাণে আছে—তা' আছে বলে' সে অনুক্ষণ এম্‌নি করে' অনুভব কর্‌ছে যে তা' ভুল নয়, ভুল্‌বার নয়। তার সেই দুর্ব্বার শক্তি কি আর একটি প্রাণকে দুর্ব্বার বেগে তারি দিকে টান্‌ছে না! ... জন্ম সার্থক কর্‌তে, জীবন উৎসর্গ করতে, সত্তাকে সজীব, অস্তিত্বকে মোহাচ্ছন্ন করতে তার এই দুরন্ত কামনা আর - একটি সমধর্ম্মী প্রাণে যদি স্পন্দন না তুল্‌তে পারে তবে দেবতার মর্ম্ম থেকে' সে করুণা বর্ষণ করিয়ে নেবে কোন্ উপায়ে! দেবতার ধর্ম্ম আর তার ধর্ম্ম একই মর্ম্মস্থল থেকে উৎসারিত হ'চ্ছে না—মানুষের বেলায় তা' হ'চ্ছে।

রতির ধারণা জন্মাল', তার মানসলিপি পেয়ে একটি মানুষ তার উদ্দেশে যাত্রা করেছে—তার পদধ্বনি পথে জেনেছে।

কিন্তু এক সময়ে তাকে ভারি বিষণ্ণ করে' দিয়ে একটা কঠিন অনুভূতি সহসা অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠ্‌ল'। ... যৌবনের প্রথম উন্মেষে একবার একটি অনিন্দ্য পুরুষশ্রী সত্য আর জাগ্রত আর কুহকী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল তার বুক ভরে' ... প্রথম প্রভাতের বিস্ময়কর অরুণোদয় তা'—আলোকের মুকুট পরা সে পুলকের বর্ণনা নাই ··· সেই উদয়াভা তার হৃদয়-মুকুল নিবিড় চুম্বনে ফুটিয়ে তুলে' যে লালিমা সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করে' দিয়েছিল, সে সমারোহ আজ যেন নাই; আজ কেবল অনুভূত হ'চ্ছে স্থূল অনুজ্জ্বল একটা সঙ্কীর্ণ আবির্ভাব - পৃথিবীর বুকের মধুপাত্র তার উদ্দেশে কল্লোলিত হ'চ্ছে না—রং নাই—এ উদয়ে রক্তমাধুরীর অজস্র ক্রীড়া নাই। ... প্রথম চক্ষুরুন্মীলিত করে' হৃদয় যে বিস্তৃত লীলাভূমি সম্মুখে প্রসারিত দেখেছিল, সেই হৃদয়ের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে রূপের রসের সে উজ্জ্বলতা দেখা দিল না।

রতির কান্না পেল···

কিন্তু এ হচ্ছে হৃদয়ের এক দিক্‌কার কথা—অপর একটা দিক্‌ও আছে।—রতির বিষণ্ণতা ঘুচে এল।···এত' খুবই সত্য যে, তখন সে নিজেকে বুঝে নাই—আজ বুঝেছে; তখনকার অপরিপক্ক কুমারীর চোখের আর মনের ভ্রম সেটা, নকল জিনিস আর ইন্দ্রজালের মায়া-সৃষ্টি তার চোখ ধাঁধিয়েছিল আর মন ভুলিয়েছিল ··· তা' মিথ্যা বলেই অদৃশ্য হ'য়ে গেছে; আজকার পরীক্ষামূলক আর অভিজ্ঞতালব্ধ এই অনুত্তেজিত স্তিমিত আনন্দই সত্য আর শাশ্বত।

সে এখনো আসে নাই—এলে আর দেখা দিলে কি ঘটবে কে জানে! ··· হয়তো এক মুহূর্ত্তেই চক্রের বিপুল আবর্ত্তনে পটপরিবর্ত্তন ঘটে' দেখা যাবে, আগন্তুকের শুভাগমনে পুরাতন দৃশ্য স্মৃতি আর ইতিহাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে নূতনতর, শ্রেষ্ঠতর, পূর্ণতর আর পুণ্যতর প্রেমের

ভিত্তি-ভূমিতে তার প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছে—মৃত পুনর্জ্জীবন পেয়ে নূতন গঠিত সুচারু সুখময় সংসারে মুক্তি পেয়েছে!

রতি উৎকর্ণ আর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করে' রইল।

বেলা প্রায় এগারটা; রতি রাঁধ্‌ছিল ...

ঘড়্‌ঘড়্ ক'রে এসে ঘোড়ার গাড়ার শব্দ দুয়োরে থাম্‌তেই নন্দ বলে' ডাক্ দিয়ে রতি ধড়্‌ফড়্ করে' উঠে' দাড়াল···

নন্দ দৌড়ে এল—

রতি বল্‌ল, কে এল দেখো। অজানা ভদ্রলোক কেউ হ'লে বৈঠক্‌খানায় নিয়ে বসাবে।

নন্দ ছুটে গেল, এবং দেখল, গাড়ী থেকে নাম্‌ছে অজানা অপর কেউ নয়, রতির বোন্ মনো, এবং তার পিছনে আছে ব্যাগ হাতে সুকুমার—মনোর স্বামী।

রতি অদৃশ্য পথের দিকে, গাড়ীর শব্দ যেখানে থেমেছে, সেই বিন্দুর দিকে, চোখ মেলে আছে ...

এসেছে, কিন্তু মন লাফিয়ে উঠে' ছুট্‌ল' কই! এত-দিনের আর এত দৃঢ়, এত সজ্জিত আর সুখে লালিত কল্পনা যা' এমন সুষ্ঠু স্বাভাবিক উজ্জ্বল আকার ধারণ করে' বিরাজ কর্‌ছিল তা' যেন অতি সহজেই একটা অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল ··· তার অন্তরের আহ্বান প্রাণের কুহরে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে, আর তা'-ই শুনে সার্থক হ'য়ে যে রাজকন্যাসন্ধানী রাজপুত্র ছুটে' আস্‌বে বলে' সে আশা করে' ছিল, যে এসেছে তা'-কে তা' মনে হ'ল না। আগমনের ধ্বনি শুনে' শুষ্ক বুভুক্ষু হৃদয় সজল শীতল কৃতার্থ হ'য়ে তাকে ধারণ করতে উদ্যত হ'ল কই।···চিরদিন ইহলোকে বঞ্চিতা তাকে ইহলোককে নূতন ক'রে সাজিয়ে তাকে অর্পণ করতে আর জীওনকাঠি ছুঁইয়ে তাকে বাঁচাতে সে এসেছে বলে' মনে হচ্ছে না। এতদিন যে-সব সঙ্গত সুশোভন আত্মার স্বধর্ম্মে সতেজ কথা মালা হয়ে চোখের সাম্‌নে দুলেছে, ইন্দ্রধনুর মত মনের আকাশকে সাজিয়েছে, অমৃত পান করিয়েছে, তীরের মত ভেদ করে' গিয়েছে সমস্ত অস্বীকৃতিকে, সে-সব কথা এক মুহূর্ত্তেই দাঁড়িয়ে গেল অর্থহীন শব্দে গড়া মানসিক প্রলাপে ···।

এত বিস্মিত রতি জীবনে হয় নাই—আঘাত পেল' কি না তা' সে অনুভবই কর্‌তে পার্‌ল না।

রতি নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়েই আছে—

সম্মুখে দেখা দিল মনো, এবং তার পশ্চাতে তার স্বামী সুকুমার—মনোর মুখ কঠিন, গম্ভীর—সুকুমার নির্লিপ্ত। তাদের পিছনে এল নন্দ, সুকুমারের ব্যাগ তার হাতে।

দিদিকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে' মনোর একটু আমোদ বোধ হ'ল; তার মনে হ'ল, তাদের দেখে' দিদি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে' গেছে।

রতির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে আর চোখ নাচিয়ে মনো বল্‌ল', দিদি, ছোঁবো?

বিধবা দিদি স্নান করে' শুদ্ধ হয়েছে আর রাঁধ্‌ছে—তারা এল গাড়ীতে; তাদের গায়ের কাপড়-চোপড়ে অপরিষ্কার জিনিষ লেগেছে। কিন্তু কেবল তা'-ই যদি ছোঁয়ার প্রতিবন্ধক হ'ত, তবে কথা ছিল না—কিন্তু রতির মনে হ'ল, মনো তাকে ঠাট্টা কর্‌ছে। এখানে ওদের অসময়ে আসার উদ্দেশ্য সে বুঝেছে—কাগজের বিজ্ঞাপন ওদের চোখে পড়েছে। ইচ্ছা জাহির পূর্ব্বক বিধবা পুনরায় স্বামিগ্রহণে প্রস্তুত হয়েও বিধবারই আচার পালন করবে, অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামীকে স্বীকার করবে না অথচ বিধবার কায়িক পবিত্রতা নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করবে, এ কেমন আবোল-তাবোল অর্থহীন ব্যাপার! হাসিই যে পায়।···মনো তা'-ই হেসে হেসে ছোঁবে কিনা, জিজ্ঞাসা করেছে।

মনোর মনে হচ্ছে বলে' আরো একটা কথা সে অনুমান করে' নিল ···

ছুঁতে নিষেধ করার ধৃষ্টতা যদি দিদির হয়, তবে দিদিকে কথা শুন্‌তে হবে।

খুবই অল্পক্ষণের জন্য একটু থতমত খেয়ে রতি বল্‌ল, —ছোঁও। কিন্তু আমাকে ছুঁতে তোমার ঘেন্না হ'চ্ছে তা' আমি বুঝেছি।—বলে' সে চুপ করে' রইল।

মনো সে-কথার জবাবে কিছুই বল্‌ল না, প্রণামও করল না, অর্থাৎ আন্তরিক ঘৃণা যে হ'চ্ছে তা' সে স্বীকারই করল'…

গুপ্ত এই মন কষাকষি ঘুচিয়ে দিল সুকুমার—সে এগিয়ে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে একটি প্রণাম কর্‌ল—কর্‌তেই রতির কাছে মনো হ'য়ে গেল তুচ্ছ, সুকুমার হ'য়ে উঠল গণ্য … তার মনের আড়ষ্টতা তৎক্ষণাৎ কেটে' গেল—সুকুমারের এই প্রণামাদি রতির ভারি ভাল লাগ্‌ল', কিন্তু তা' সম্পর্কে গুরুজন হিসাবে নয় …

সে উপরে খোলা রোয়াকে দাঁড়িয়ে, সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে নীচেয়; তারই সমবয়সী সুদর্শন আর সদাচারী এই আত্মীয়টি পায়ের একেবারে সম্মুখে নত হ'য়ে পায়ের কাছে প্রণামটি রাখল' যে, স্পর্শ না ঘটলেও একটা স্পর্শ যেন রতির অনুভূত হ'ল …

এইটিই যেন সে মনে মনে কারো কাছ থেকে চাইছিল, দাসভাবে ভূমিগত একটি প্রণাম। … সে নিজে নাগালের বাইরে গৌরবে মহিমায় দুষ্প্রাপ্য আর স্তবস্তুতি সাধনার বস্তু হ'য়ে অবস্থান করছে, সেখান থেকে তার বিগলিত আত্মা অজস্র ধারায় ঢেলে' পড়ছে প্রার্থীর উদ্দেশে …

এই প্রণামটি যেন তাকে পাওয়ার বহুদূরবর্ত্তী সেই সাধনার অঙ্গ, তারই সাধনার প্রতিরূপ, তার যৌবনব্যাপী উগ্র তপস্যার মর্য্যাদা, দক্ষিণা আর তাদের মিলনোৎসবের অগ্রদূত …

রতি সুকুমারকে আশীর্ব্বাদ করল', সুখে থাকো—দীর্ঘজীবি হও, মনোকে আর, সুখী করো। … তারপর বল্‌ল, নন্দ, এদের নিয়ে যাও, ঘরে নিয়ে বসাও। … যাও তোমরা বিশ্রাম কর গিয়ে। মনো, যা, সুকুমারকে যত্ন কর্‌ গিয়ে। ও আবার নূতন মানুষ। … বলে' হেসে উঠল'। … আবার বল্‌ল, আমি আস্‌ছি। কথাবার্ত্তা যা' হবার তা' হবে—কিন্তু ঝগ্‌ড়া তর্ক আমি কিছুই করব' না—কেবল শুন্‌ব।

—তা'-ই হবে। বলে মনো স্বামীকে নিয়ে ঘরে গেল।

এই প্রণামটিকে অবলম্বন করে' রতি যেন উঠে' দাঁড়াল—প্রণামটির সূত্রেই তার গা শিরশির্‌ করতে লাগল' … একটু আগেই অর্থহীন প্রলাপ বলে' যা' মনে হয়েছিল, প্রণামটি পাবার পর তা' আগের মত সুসম্বদ্ধ সঞ্জীবিত হ'য়ে তার মনে হ'ল, তার পূর্ণ প্রস্ফুটন, নিষ্কৃতি আর সার্থকতা আসন্ন … সে মরে নাই, হয়েছিল—সুকুমার তার সংজ্ঞা ফিরিয়েছে।

আহারাদির পর এক জায়গায় বসে' সুকুমার তার ট্রেণজীবনের গল্প করল' ঢের—রতিকে হাসিয়ে মারল'…

বোনে বোনে এই দেখাটা অবাধ একটা আব্‌হাওয়ার ভিতর ঘট্‌ছে না—আসল কথাটার উত্থাপন যত বিলম্বে ঘটে, বিরোধের ভিতর থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকার স্বস্তি ঠিক ততক্ষণ পর্য্যন্ত—নিজের স্বার্থে সুকুমার তা'-ই গল্প জুড়ে দিয়েছে …

কিন্তু মনোর মন অসহিষ্ণু গরম হ'য়ে আছে; ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে সুকুমারের কথার মাঝেই হঠাৎ বলে' ফেল্‌ল, কিন্তু আমি তোমার গল্প শুন্‌তে আসি নাই—দিদি এ-সব কি করছে তা'-ই জান্‌তে এসেছি। … সেই টানেই মনো বলে' চল্‌ল, বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত লোক, দিদির শ্বশুর ছিলেন মানী লোক—দু'জনারই কুল কলঙ্কিত করবার অভদ্র সাহস আর রুচি দিদির কোথা' থেকে আর কেন জন্মাল, দিদি তা আমাকে বলুক।—বলে' রতির মুখের দিকে সে এমন করে' তাকিয়ে রইল যেন অকাট্য কথাই সে বলেছে।

রতি বল্‌ল, সব কথা ত' বল্‌লে না! ঐ কি সব?

মনো বল্‌লে, সব নয়। তোমাকে আমি কিছুতেই ও-কাজ করতে দেব না—তুমি, আমার দিদি, গোকুলেশ্বরের পুত্রবধূ, রজনীবাবুর মেয়ে, দ্বিচারিণী!—এ যে কেমন কঠোর কথা আর কত অসহ্য তা' তুমি ভাব্‌তে পারছ না দেখে' আমার মরতে ইচ্ছে করছে!

রতি বল্‌ল, বেশ্যাবৃত্তির দিকে চলেছি, এই বোধ হয় তোমাদের ধারণা!

শুনে' মনো কেঁদে ফেল্‌ল'…

—বলো না, বলো না; আমি অতদূর ত' মনে করি নাই। দিদি, তুমি এ-কথা কেন বল্‌লে! বলার আগে তোমার মরণ হ'ল না কেন?

রতি মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল'—বল্‌ল,—সবই বুঝেছ, সবই ভেবে দেখেছ, তোমার সব কথাই আমার বিরুদ্ধে—আমি নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়েছি—দ্বিচারিণী হবার পাপ-ইচ্ছা আমাকে ত্যাগ করতে হবে—সবই স্বীকার করে' নিলাম; কিন্তু আমাকে এ-পথ দেখিয়ে দিল কে!

—কে?

—তোমাদের অক্ষয়বাবু। তুমি জান্‌তে চেয়েছ, আমার সাহস আর রুচি জন্মাল' কোথা' থেকে! জন্মেছে ঘরেই, ভাই। যাকে ভয় করে' চলি সে ভয় ভেঙে' দিলেই সাহস জন্মে—অপরাধী শাস্তি না পেলে পরবর্ত্তীর সাহস বেড়ে যায়—রুচির শুচিতা রক্ষা করতে দেখ্‌লেই, রুচির বিকৃতি জন্মে না—তিনি আমার দেহ এত অশুচি করে' দিয়ে গেছেন যে তা' আমি টান্‌তে পারছিনে—পৃথিবীর বেশ্যার মনের কলঙ্ক আর দেহের অশুচি-স্পর্শ আমার গায়ে তিনিই মেখে দিয়ে গেছেন …

সুকুমার রতির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল—চোখ্ নামাল'—মনো নড়ে' উঠ্‌ল' …

রতি বল্‌তে লাগ্‌ল, সুকুমার, তুমি কিছু মনে করো না, ভাই; তোমার সাম্‌নে আমি লজ্জা কর্‌ছিনে। লজ্জা আমার হ'ত, যদি আমার কথা মিথ্যে হ'ত।—মিথ্যে নয়, সত্যিই তিনি আমাকে এমন অপবিত্র করে' রেখে গেছেন যে, আমি দেবপূজা করতে পারিনে—মন্দিরে প্রবেশ করিনে…লম্পট বেশ্যাকে যে চোখে দেখে—তিনি আমাকে সেই চোখে দেখ্‌তেন। সেই দৃষ্টি স'য়ে স'য়ে আমার ভিতর যদি তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—তবে নিজেকে আমি দোষ দিতে পারিনে।

—দ্বিতীয়-স্বামী তার কি সংশোধন করবেন বলে' আশা করো?—মনো মৃদুস্বরে জানতে চাইল।

রতি বল্‌লে, তিনি যদি পবিত্রাত্মা হন, আমাকে আত্মার আলিঙ্গন আর উত্তাপ দিয়ে তিনি শোধন করে' নেবেন, আমার শুদ্ধি ঘট্‌বে।…আমি চাই এই দেহে এমন স্পর্শ যা'-তে আমি পাব পূজার জল আর প্রাণের আগুন, আগুনে গলিয়ে তিনি আমাকে ধু'য়ে নির্ম্মল করে' তুল্‌বেন—ভালবাস্‌বেন।

দুরূহ এই সব উক্তি শুনে' সুকুমার অমায়িকভাবে চুপ্‌চাপ্ বসে' রইল—মনোর মুখে তৎক্ষণাৎ কোনো জবাবই এল না …

রতি বল্‌ল, আর একটা কথা বল্‌লেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। তোম্‌রা আসার আগেই আমার মনে হচ্ছিল, তা' অসম্ভব; কিন্তু তোমরা আস্‌তেই আমার মনে হয়েছে, তেমন মানুষ আছে—তা' ঘটা সম্ভব।

মনো বল্‌ল, সম্ভব সবই, অসম্ভব কেবল লোকের টিট্‌কিরি আর গা'ল কুৎসা রটান' বন্ধ করা—আর তার চাইতেও অসম্ভব পূর্ব্বপুরুষের নরকে গমন বন্ধ করা। তার উপায় কিছু ঠিক্ করেছ?

—না; দরকার নেই। গা'ল টিট্‌কিরি লোকে অকারণেও দিয়ে থাকে, কুৎসাও অম্‌নি রটে। আর পূর্ব্বপুরুষের কথা বল্‌ছ। তাঁরা যদি বুদ্ধি করে' সে-ব্যবস্থা করে' যেয়ে না থাকেন, তবে আমি নাচার। আমাকে তাঁরা বলি দিয়েই গেছেন—নিজের উপর সকল দায়িত্ব নিয়ে আমাকে তা-'ই বেঁচে উঠতে হবে।

মনো মনে মনে বল্‌ল, মরো তুমি।

রতির আর-কোনো কথা নাই—সে মুখ বন্ধ করে' চোখ ফিরিয়ে রইল।

নন্দ এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল', বৌদি, ও-বেলার জন্যে বাজার কি করতে হবে?

—কিছু কর্‌তে হবে বৈ কি! এ-বেলা সুকুমারের খাওয়া ভাল হয়নি'—ও-বেলা …

মনো বলে' উঠ্‌ল, আমরা বিকেলের গাড়ীতেই যাব, দিদি।

রতির মুখ লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে বাধা দিল না।

বিকেলের গাড়ীতেই সুকুমারকে টেনে' নিয়ে মনো চলে' গেল—

যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে আর বাক্যব্যয় করে নাই; যাবার সময়ে বলে' গেল, তোমার সব কথা আমি

বুঝ্‌তে পারি নাই, দিদি ; ভারি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ; তোমার মন বুঝ্‌তে ত' আদৌ পারি নাই। কিন্তু পৃথিবীর লোক অত সূক্ষ্ম বোঝে না ; তারা মোটামুটি এই বোঝে যে, সতীত্ব বজায় থাক্‌লেই মেয়েমানুষ শুদ্ধ থাকে—মন্দিরে গিয়ে পূজো দেবার অধিকার তার থাকেই।... তবে তোমার উল্টো শাস্ত্রে কি লেখে তা' জানিনে। স'ত্যই তুমি অত দুঃখ পেয়েছ কিনা, আর ভেবেছ কিনা, কিম্বা এখন নিজের মনের গতির কৈফৎ টেনে' টেনে' বা'র করছ কিনা তা'-ও জানিনে ; তবে যদি তুমি সত্যিই ঐ কাজ করো, করবে বলে' বিশ্বাস হয় না, তবু যদি খবরের কাগজে ঢোল পিটিয়ে স্বয়ম্বরা হও, তবে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের এই পর্য্যন্তই। তোমার স্বামীর ওপর তুমি প্রতিশোধ নিতে পারো, কিন্তু আমাদের সব্বারই ওপর নয়। আচ্ছা আসি।

সুকুমার কি বুঝ্‌ল' আর কি মনে করল'—তা' সে-ই জানে ; কিন্তু তাকে ভারী বিষণ্ণ দে'াল'—বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরেই রতিকে সে—'দিদি, আসি'—বলে' যাবার আগে বিদায়-প্রণাম করল।

— ক্রমশঃ

হীরাঝিল

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ওই সিরাজের প্রমোদ-ভবন ? ওই কি হীরাঝিল ?
ভাগীরথী, গ্রাস কোরো না, চিহ্ন রাখো তার !
আলিবর্দ্দী, বন্দী হোথায় হায় কি চমৎকার !
পাঁচ লক্ষ দেড় হাজারে খুল্‌লো দোরের খিল্ !
নবাবজাদার ফূর্ত্তি জ্যাদা, পূর্ণ হোলো দিল্ !
পার্ষদেরা কাম-কামনার এক-এক অবতার !
সিরাজ তাদের প্ররোচনায় মজ্‌তো অনিবার।
তাদের সাথে মিশ্‌তো বলেই তাল হোলো যা তিল !

হেথায় স্থাপন কর্‌লো সিরাজ আপন সিংহাসন !
অবিশ্বাসী মীর্‌জাফর তা' সঁপ্‌লো পরের হাতে।
মুসলমানের রাজ্য গেল, হায় কি বিড়ম্বন !
বণিক হোলো দেশের মালিক অম্‌নি সাথে সাথে।
ফাঁকতালে খুব নাচ্‌লো ক'দিন মীর্‌জাফরের মন !
কী লবাবীই ক'রে গেছেন ! ফল কি হোলো তা'তে ?

মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তি ঃ বস্তুবাদ

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

• মার্ক্সীয় দর্শন কতদূর বিচারসাপেক্ষ তাহা বুঝিতে হইলে উহার ভিত্তি যে বস্তুবাদ তাহাই প্রথমে আলোচ্য। বস্তুবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, জড় পদার্থ এবং জড়-শক্তি হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমবিকাশের ধারায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং যুগপরম্পরায় জড় পদার্থের শক্তি ক্রমশঃ বিকশিত হইতে হইতে উহার শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া চৈতন্য বা আত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মন বা আত্মা জড় পদার্থেরই একটা প্রকাশ মাত্র। মনোধর্ম্ম মস্তিষ্কেরই গুণ (mind is a function of brain)। সুতরাং মন ও আত্মা জড় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে *। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপাতে ইহা বলা চলে যে 'সৃষ্টি'র ক্রমপর্য্যায়ে জলেতেই প্রথম জীবাদি (Protoplasm) দেখা দেয়। কিন্তু এই জীবাদি কোথা হইতে আসিল? অর্থাৎ জড় বস্তুর মধ্যে প্রাণশক্তি ও চেতনাশক্তি কি করিয়া সঞ্জাত হইল? বস্তুবাদী বলিবেন যে, জড়বস্তু হইতেই প্রাণ এবং চৈতন্য সঞ্জাত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে চৈতন্য জড় বস্তুরই একটা প্রকাশ মাত্র (spirit is the manifestation of matter)। ইহাই জড়বাদের সর্ব্বপ্রধান তথ্য।

জড় পদার্থ বা অজীব পদার্থ হইতে জীবপদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে পাস্তুর, টীণ্ডাল, হাক্সলি প্রভৃতি বিজ্ঞানের মহারথিগণ অজস্র অধ্যবসায় সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অজীব পদার্থ হইতে জীব পদার্থ উৎপন্ন হইতেই পারে না। জীব পদার্থ হইতেই অন্য জীব পদার্থ উৎপন্ন হয়। অজীব পদার্থ হইতে জীব পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার তত্ত্বকে spontaneous generation বা স্বতঃজন্মবাদ অথবা abiogenesis বলে। এবং জীব পদার্থ হইতে অন্য জীব পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার তত্ত্বকে Biogenesis বলে। আধুনিক বিজ্ঞানের স্থির সিদ্ধান্ত, abiogenesis হইতেই পারে না। অর্থাৎ জড়পদার্থ ও প্রাণশক্তির মধ্যে যে দুস্তর সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা উত্তীর্ণ হইবার কোনও উপায়ই বস্তুবাদী অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না— আধুনিক বিজ্ঞান এই সাক্ষ্যই দিতেছে। বস্তুবাদ আর বিজ্ঞান এক জিনিষ নয়। বরং বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য বস্তুবাদের বিপক্ষের তথ্যই প্রমাণিত করে।

বস্তুবাদ অনুসরণ করিলে ইহাও বলিতে হয়, জড় বস্তু হইতেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি ব্যতীত জগতের উৎপাদক আর কেহ হইতে পারে না। এই মূল প্রকৃতিতে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করা হইয়াছে (যেমন conservation of matter প্রভৃতি)। সেই নিয়মানুসারে সমস্ত জগৎ এমন কি মানুষের মন ও চিন্তাশক্তিও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জড় প্রকৃতি ব্যতীত আত্মা বলিয়া কোনও পৃথক পদার্থ নাই এবং এই প্রকৃতির স্রষ্টাও কেহ নাই। কারণ জড় পদার্থ ও জড় শক্তি তো অনাদি অসীম এবং অবিনাশী। আত্মা পৃথক্ পদার্থ নয়। জড় বস্তুর বিকার মাত্র, সুতরাং উহা অবিনাশীও নয়, স্বতন্ত্রও নয়। অতএব আমার ইচ্ছা অনুসারে আমি অমুক কর্ম্ম করিব—তাহা নিছক ভ্রম। মানবের মুক্ত চিন্তা (freedom of will) বলিয়া কিছুই নাই। প্রকৃতি (environment) যে দিকে টানিবে সেই দিকেই সকলকে যাইতে হইবে। অর্থাৎ পদার্থের গুণ-ধর্ম্মের শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। কারণ প্রকৃতির নিয়ম (law of nature) মানিয়া সকলকেই চলিতে হয়। ইহাই বস্তুবাদীর সিদ্ধান্ত এবং উহারা এক মাত্র জড় প্রকৃতিতেই সকল বিষয়ের সমাবেশ করেন। সুতরাং সৃষ্টির পিছনে কোনও বিরাট্ পরিকল্পনা (plan and purpose) থাকিতে পারে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। এবং মানুষের চিন্তাশক্তি মুক্ত না বদ্ধ এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া মুক্ত চিন্তা বলিয়া কোনও জিনিষ থাকিতে পারে না বলিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সৃষ্টির পিছনে একটী মহান্ উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত

* পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ mind কথাটার দ্বারা আত্মা বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মা পৃথক পদার্থ।

নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এই তত্ত্বের দার্শনিক নাম Teleology; এবং সৃষ্টির পিছনে উক্ত পরিকল্পনা অস্বীকার করিয়া কার্য্যকারণ পরম্পরাক্রমে বিশ্বজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—এই তত্ত্বকে determinism বলে। এই Teleology এবং determinism কথা দুইটী পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন।

যাক্, এখন বাহ্য-জগতের মধ্যে আমরা তিনটি প্রধান জিনিষ দেখিতে পাই। যথা:—

(১) জড় পদার্থ ও জড় শক্তি (matter with motor force)।

(২) প্রাণশক্তি (life force and vital force)। এবং (৩) মন বা আত্মা (mind)।

এই তিনটী বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বস্তুবাদ ঐগুলির স্বরূপ বিষয়ে কি নির্দ্দেশ দিয়াছে পূর্ব্বেই তাহার আভাষ দিয়াছি। এক্ষণে ধীরে ধীরে তাহার আলোচনা করিব। আমরা জানি শক্তির দুই মূর্ত্তি। শক্তির স্থির মূর্ত্তিকে আমরা জড় দ্রব্য বলিয়া থাকি—যেহেতু electron ও proton নামক শক্তি-কণিকার সংযোগেই যাবতীয় জড় পদার্থ তৈয়ারী হইয়াছে। শক্তির সচল রূপের আবার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে—যথা:—আলোক, তাপ, তাড়িৎ, শব্দ প্রভৃতি। শক্তি-কণিকাগুলির সমন্বয়েই জড় পরমাণুর সৃষ্টি। এক একটী পরমাণুর ভিতরে আবার এক জগৎ বিদ্যমান। কারণ একটী পরমাণুর ভিতরে আছে একটী বা একাধিক কেন্দ্র (proton) এবং তাহার চারিদিকে ইলেক্‌ট্রণ কণাসমূহ প্রবেলবেগে ঘুরিতে থাকে। উহাও ছোটখাট একটী সৌরজগৎ। ফলে দেখা যায় যে, পদার্থ-জগতের একটী ক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতরে যে নিয়ম এবং যে শৃঙ্খলা বিদ্যমান্, প্রকাণ্ড সৌরজগতের মধ্যেও সেই নিয়ম এবং সেই শৃঙ্খলাই বর্ত্তমান। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই সাক্ষ্যে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বজগতের গোড়ায় একটী বিরাট্ মানসিক শক্তি উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা অনুসারে নিয়তই কার্য্য করিতেছে (A supreme mental power working with a plan and purpose)।

বিজ্ঞান শাস্ত্রানুযায়ী শক্তি-কণার সমবায়ে যে জড় পরমাণুর সৃষ্টি হয় তাহা ক্রমশঃ একত্রীভূত হইয়া একটী নীহারিকাময় অবস্থায় (nebulous state) পরিণত হয় এবং উক্ত নীহারিকা হইতে সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমশঃ ধরাপৃষ্ঠ শীতল হওয়ার পরে উহাতে জীবজগতের অভিব্যক্তি ক্রম-বিকাশের নিয়মে আরম্ভ হয়। ক্রমবিকাশতত্ত্ব সকলেরই মান্য। কিন্তু গোল বাধিয়াছে ক্রমবিকাশের ধারা লইয়া। উহা কি স্বয়ং শৃঙ্খলিত (fortuitious) অথবা উহা একটা বিরাট্ পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়? প্রথমোক্ত ধারাকে mechanical evolution বলে এবং বস্তুবাদিগণ এই ধারারই পক্ষপাতী। শেষোক্ত ধারাকে বলে Teleological evolution। ডারউইন্, লামার্ক এবং উইস্‌ম্যানের evolution theory-র মতে প্রাথমিক একটী মাত্র কোষ বিশিষ্ট প্রটোপ্লাস্‌মের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কি ভাবে উৎপন্ন হইল এবং এক প্রকারের প্রটো-প্লাস্‌ম হইতে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীজগতের সৃষ্টি কি করিয়া সংশোধিত হইল অর্থাৎ প্রাণিগণের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও তাহার পরিবর্ত্তন ক্রিয়া কি ভাবে সংগঠিত হইল, সে বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাঁহারা অপারগ হইয়াই যেন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (fortuitions variation) কথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। ডারউইন সাহেবের গ্রন্থ Teleological শব্দরাজীতে পরিপূর্ণ, যথা—beautiful contrivance, marvelleous adjustment প্রভৃতি। তাঁহার "Origin of specis গ্রন্থের এক স্থলে (Chapter V) আছে:—"Natures' productions are far truer in character than men's productions. They are infinitely better adopted to the most complex conditions of life and plainly bear the stamp of far higher workmenship." অর্থাৎ "প্রকৃতির রচনাকৌশল মানুষের রচনাকৌশল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। প্রাণী-জীবনের পক্ষে তাহা অধিকতর উপযোগী এবং তাহা এক বিরাট্ শিল্পীর কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়া থাকে।"

বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রকৃতির সর্ব্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খলার একত্ব বা সমপ্রণালীকতা (uniformity) দেখিতে পাইতেছেন। এই শৃঙ্খলা হঠাৎ হইতে পারে না। জড়

পরমাণুসকল আকস্মিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া কেবল মাত্র অন্ধ জড়শক্তির সহায়তায় বিশ্বজগতের মধ্যে সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলা এবং সমন্বয়সাধন করিতে পারে না। এই সব ব্যাপার অবলোকন করিয়াই দার্শনিকগণ ক্রমবিকাশের ধারাকে Teleoligical বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বস্তুবাদীর mechanical তত্ত্ব দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যথা:—

(১) জড় পদার্থ এবং প্রাণশক্তি (matter and life).

(২) প্রাণশক্তি এবং মন (life and mind).

জড় পদার্থ হইতে যে প্রাণ ও চৈতন্যশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, সে বিষয়ের বৈজ্ঞানিক মত আমরা দেখিয়াছি। এখন দেখা যাক্ যে প্রাণশক্তি এবং মনের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে তাহা উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে বস্তুবাদ কতটুকু সহায়তা করিতে পারে। বস্তুবাদী বলিবেন যে, জড়শক্তি ও জড়পরমাণু আকস্মিকভাবে (fortunately) সন্নিবিষ্ট হইয়া জীবদেহের ন্যায় একটা জটিল যন্ত্র নির্ম্মাণ করে। ঐ যন্ত্র যতক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে সেই অবস্থায় ধারাবাহিক সজ্ঞান সমষ্টির নামই হইতেছে মন বা আত্মা ("Mind is only a stream of consciousness arising from the working of the material body")। প্রাণশক্তি ও মন জড় পদার্থেরই একটা কার্য্য বা function মাত্র।

কিন্তু তাহাদের ঐ যুক্তি পদার্থ বিজ্ঞানের বিচারে টিকিতে পারে না। কারণ একটী জড়শক্তি অন্য একটী জড়শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। তাহাতে শক্তির উপচয় বা অপচয় হয় না। কিন্তু ঐ নিয়ম কেবল জড়-শক্তির বেলায়ই খাটে। সুতরাং মানসিক শক্তির মত একটা non-physical শক্তি কি ভাবে শরীরের বা মস্তিষ্কের জড়শক্তির (physical force) রূপান্তরে উৎপন্ন হইবে? অর্থাৎ তাড়িৎ হইতে তাপ, বা তাপ হইতে তাড়িৎ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইবে না। উহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। তবুও যদি এ কথা মানিয়া লওয়া যায়, মস্তিষ্কের শক্তি হইতে ক্রমশঃ চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে তো বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতানুযায়ী মস্তিষ্কের ক্ষয় না পাইয়া চৈতন্য বা consciousness উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুবাদ মানিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্ষয় পাইতে বাধ্য। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যাপারে ইহা দেখা যায় যে, যাঁহারা বেশী মানসিক পরিশ্রম করেন তাঁহাদের মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষয় না পাইয়া তাহা আরও বাড়িয়াই যায়। এ বিষয়ে বস্তুবাদী নিরুত্তর।

বস্তুবাদের আর এক তথ্য, মনটা আদতে নিষ্ক্রিয় জিনিষ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা উহা পরিচালিত হইয়া থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে আমরা পারি না। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, "মন" চারিধারের জড়-জগৎ হইতে নিঃসৃত সব খবরই গ্রহণ করে না। কিন্তু যে জিনিষটা আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনুকূল তাহার অনুভূতি মাত্রই আমার মন গ্রহণ করে এবং তাহাই জ্ঞানে পরিণত হয়। ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে কিন্তু আমি শুনিতে পাই না। কিন্তু যখন উহা শ্রবণ করার প্রয়োজন হয় তখন উহার শব্দ আরও জোরদার না হইলেও তাহা আমি শুনিতে পাই। এই ভাবের সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা প্রমাণিত করা যায় যে, অনুভূতিগুলি মনের উদ্দেশ্য দ্বারা সর্ব্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় (sensations are determined by the purpose of the mind)। অনুভূতিগুলি ভৃত্যের মতন আদেশ অপেক্ষা করে—আমাদের প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আসিতে পারে না। অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ব্বাচিত করিবার একজন কর্ত্তা আছেন, তাহারই নাম "মন"। মানুষের মন একটী নিষ্ক্রিয় পর্দা মাত্র নয়—যাহার উপর অনুভূতিগুলি তাহাদের খেয়াল মাত্র যাহা খুসি লিখিবে। বরং উহা একটী সক্রিয় জীবন্ত যন্ত্রবিশেষ যাহা অনুভূত-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চিন্তাধারায় পরিণত করে। ঐ মনই কর্ত্তা এবং সে চারিধারের বহুবিধ বিচিত্র অনুভূতির অভিজ্ঞতাগুলিকে একটী সুশৃঙ্খল চিন্তাধারায় পরিণত করে (An organ which transforms the chaotic multiplicity of experience into an ordere unity of thought)।

এতক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম, জড় পদার্থ হইতে প্রাণশক্তি এবং প্রাণশক্তি হইতে মনের কি ভাবে অভিব্যক্তি হয়, সে বিষয়ে বস্তুবাদ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। বস্তুবাদের আর একটা তথ্য নিরূপণের উপায় diterminism বা কার্য্যকারণবাদ। দুধ হইতে দই হয়। সুতরাং দুধ ও দই এই দুইটী ঘটনার মধ্যে একটী কার্য্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বেরটী অর্থাৎ দুধ কারণ (cause) এবং পরেরটী কার্য্য (effect), এভাবে যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বস্তুবাদী বলেন যে, সৃষ্টির গোড়ায় কাহারও পরিকল্পনা নাই। বস্তুতঃ উহা জড় পদার্থ, কার্য্যকারণ পরম্পরা ক্রমে (by law of causalty) উৎপন্ন হইয়াছে। এবং কার্য্যকারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিতে পারেন (Prediction)। এইরূপে কার্য্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ক্রমে কোনও জড়বস্তুর আচরণ অথবা মানব সমাজের পরিস্থিতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার তত্ত্বকে diterminism বলে। কার্ল মার্কস্ এই ডিটারমিনিস্‌মের দ্বারাই মানবেরা ভবিষ্যতে কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন। ঐ ডিটারমিনিস্‌ম্ মানিলে সৃষ্টির গোড়ায় বিরাট পরিকল্পনা আছে তাহা স্বীকার করা যায় না। উহা মানিলে একদিকে Teleology এবং অন্যদিকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি—এই উভয়ই অস্বীকার করিতে হয়।

ডিটারমিনিস্‌ম্-এর যুক্তি প্রয়োগ করিলে ব্যাপার এইরূপ দাঁড়ায়—শেক্‌স্‌পিয়রের 'টেম্পেষ্ট' বা কালিদাসের 'মেঘদূত' উভয় পুস্তকের রচয়িতা এক একজন মানুষ। তাহার কারণ তাঁহাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি; তাঁহাদের উৎপত্তির কারণ বানর জাতি; তার কারণ সরীসৃপ এবং তাহার ও কারণ জীবাদি (Protoplasm)। তাহার কারণ (অবশ্য বস্তুবাদীর স্বতঃজন্মবাদের তত্ত্বানুসারে) জড়পদার্থ। তার কারণ পৃথিবী, তার কারণ সূর্য্য, তার কারণ "নেবুলা" বা নীহারিকা। সুতরাং ঐ মতানুসারে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে "নেবুলা" নামক এক প্রকার কাল্পনিক মেঘ, আপনা-আপনি বিবর্ত্তিত হইয়া সব মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়াছে। ইহা হইতেই ধরা যাইতে পারে যে, ডিটারমিনিসিমের মধ্যে আংশিক সত্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু উহাই সবটুকু সত্য নয়।

বস্তুবাদী দর্শনের দুইটি ধারাঃ মেকানিক্যাল মেটিরিয়েলিজম্ (mechanical materialism) এবং ডাইলেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ (Dialectical materialism)। এতক্ষণ বস্তুবাদ সম্পর্কে যাহা বলা হইল তাহাই মেকানিক্যাল মেটিরিয়েলিস্‌ম। ডায়ালেকৃটিক মেটিরিয়ালিজম্-এর প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কার্ল মার্ক্‌স্। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে উহার বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। তবুও বস্তুবাদ (mechanical-ই হউক আর dialectical-ই হউক)—বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে।

(১) জড় পদার্থ ও প্রাণশক্তি (matter and life)
(২) প্রাণশক্তি ও মন (Life and mind)
(৩) কার্য্যকারণবাদ ও পরিকল্পনা (Diterminism and choice)

ঐ তিনটী মর্ম্মস্থানে (Rheuomatic joints) ঘা দিলে বস্তুবাদ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। উপরের ১ নং ও ২ নং দফার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিয়াছি। ডিটারমিনিজমের স্বরূপও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পদার্থ জগতে কার্য্যকারণ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ঐ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র অগ্রসর হয়। এজন্য প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে ডিটারমিনিজমের তথ্য খাটে। কিন্তু ডিটারমিনিজমের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিবাদ হইতেছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে। মানুষের মনের উপরে কার্য্যকারণ সম্পর্ক খাটে কি না, এ বিষয় বিজ্ঞান নিরুত্তর। কিন্তু বস্তুবাদ বলিবে যে, মন তো মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া বিশেষ। এবং মস্তিষ্ক পদার্থ জড় হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে সব সময়েই জড় জগতের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। প্রকৃতি তাহাকে যে দিকে টানিবে সে দিকেই সে চলিতে বাধ্য। অর্থাৎ পদার্থের গুণধর্ম্মের শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক কাজই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপরে নির্ভর করে।

চিন্তাশক্তিকে, বৈজ্ঞানিকের বিষয়ীভূত কার্য্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা (causalty) নিয়ন্ত্রিত করা যায় কি না, এ বিষয়ে Max Plank এর মত :

"The fact that, there is a Point, one single Point in the world of mind and matter where science and therefore every causal method of research is inapplicable. This Point is individual ego. * * * * * Science thus brings us to the threshold of ego and there leaves us to the care of other hands. In the conduct of our own lives, the causal Principle is of little helps; for by the iron law of logical consistency we are excluded from laying the causal foundation of our own future or foreseeing that future as definitely resulting from the Present. * * * * Self determination is given to us by our Consciousness and it is not limited by any causal law. Science thus fixes for itself its own inviolable boundaries, but man with its unlimited impulses cannot be satisfied with this limitation. He must overstep it, since he needs an answer to the most important and constantly repeated questions of his life:—What am I to do? And a complete answer to this question is not furnished by determinism, nor by causalty, especially not by pure science, but only by his moral sense by his character and by his outlook of life............"

—"Where is science going" by Max Plank. (p.p. 161-162.)

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। Max Plank বিজ্ঞানের একটা সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যাহা সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না। এই জন্যই তাঁহাদের ডিটারমিনিজম্-তত্ত্ব অপ্রতিহত গতিতে Teleology এবং মানবের মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্র আক্রমণ করিথা থাকে।* এই জন্যই চিন্তাশীল মনীষা বস্তুবাদের ভিত্তিতে তৃপ্তি পায় না। উহাতে কোন চরম বা পরম সিদ্ধান্ত মিলে না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন্ সাহেবের ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে ইউরোপে বস্তুবাদের বহুল প্রচার হইতে থাকে। ঐ সময়ে মহামতি কার্ল মার্ক্স্ তখনকার প্রচলিত mechanical materialism-এর সঙ্গে হেগেল-এর dialectics মিলাইয়া ইতিহাসের আধিভৌতিক ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) করেন এবং উহাই তাঁহার সমাজ-তন্ত্রবাদের মূল ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* বস্তুবাদীর তরফ হইতে কথা উঠিবে, যে বিশ্বজগৎ যদি কাহারও plan অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সেই plan-এর কর্ত্তাই তো সকল মানুষের কাজকর্ম্মও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। তাহা হইলে মুক্ত চিন্তা থাকে কই? অর্থাৎ উহাতে Teleology-র সঙ্গে free will-এর সম্পর্ক লইয়া প্রশ্ন উঠে। কিন্তু তর্কচ্ছলে ঐ দুইটীর একটীকেও যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তো বস্তুবাদীর ডিটারমিনিজম্ অখণ্ড সত্য বলিয়া যুক্তিতে টিকে না।

মিনতি

শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

আমার বুকের রক্ত-কমল তোমার করে দিব,
সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ তোমার চরণ-ধূলি নিব।
বিরাট্ ভোগের বিরাট্ সাজি, তুচ্ছ তাহার গান,
শান্তি-চরণ-পরশ তোমার, তাই হে আমার মান
প্রদীপ-শিখার কুজ্ঝটিকা মিশুক অন্ধকারে,
উদাত্ত-গান বাজুক আমার জীবন-বীণার তারে।
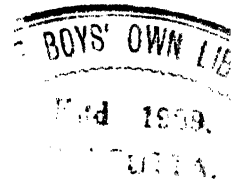
স্বীকৃতি

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম. এ.

সমাধি-ভূমি ত্যাগ করে শবযাত্রীরা একে একে রৌদ্র-দীপ্ত পথে এসে পড়ল। বেদনার গুরুভার নিয়ে মৃতের স্ত্রী সমাধির পাশে বসে রইলেন একা। সকলে চলে যাবার এক ঘণ্টা পরে সমাধি ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে ধীর-মন্থর পদে তিনি গৃহে ফিরে চললেন। গৃহের আর যেন কোন আকর্ষণ নেই, গৃহ একান্ত নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ!

স্বামীর মৃত্যুতে মাদাম মূলার সত্যই অত্যন্ত শোকার্ত্তা, কারণ তাঁর স্বামীর পত্নী-প্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ। স্বামীর অতুলনীয় ভালোবাসা ও ত্যাগ স্মরণ করে তাঁর সারা অন্তর অনুতাপের দুঃসহ গ্লানিতে ভরে গেল···মনে পড়ল বহু-দিন আগেকার এক অপ্রীতিকর ঘটনা—যার স্মৃতি তাঁর অন্তরকে নিরন্তর ব্যথিত করেছে।

নিজের দুর্ব্বলতার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছেন। সেই ঘটনার পর থেকে স্বামীর সেবা ও যত্নে নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একান্তভাবে—এক-দিনের জন্যও কর্ত্তব্যপালনে এতটুকু শৈথিল্য তাঁর হয়নি।

সে সময় মিঃ মূলার শহরের একজন কৃতী চিকিৎসক—তাঁর ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর বিষম ত্রুটি ছিল—তরুণী সুন্দরী স্ত্রীকে তিনি অবহেলা করতেন। স্ত্রীও এটা বুঝত, কিন্তু প্রতিকারের উপায় ছিল না। ডাক্তার মূলারকে নানা সভা-সমিতিতে যোগদান করতে হত, বাকী যে সময়টুকু থাকৃত তা' তিনি কাটাতেন ল্যাবরেটারীর কাজে। নিভৃতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে কোন-দিনই তাঁর আগ্রহ দেখা যেত না। স্বামীর অবহেলায় ব্যথিত হয়ে স্ত্রী অনুযোগ করত, কিন্তু অনুযোগে কোন ফল হত না। বিবাহের চার বৎসর পরে সে বেশ বুঝতে পারলে যে তার যৌবনের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। স্বামীর ভালোবাসা সে পায়নি—তার সুখ-দুঃখ স্বামীকে বিচলিত করে না। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জাগে। তবে কি ভালোবাসা অলীক-কল্পনা? না, না, অলীক-কল্পনা কেন হবে? ভালোবাসা আছে নিশ্চয়ই—ভালোবাসা না থাকৃলে কাব্য ও সঙ্গীতের সৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যেত যে! ভালোবাসা কাব্যের উৎস—সঙ্গীতের প্রাণ! ···ভালো-বাসার সন্ধান সে কি পাবে কোনদিন? কে জানে!···

সে যদি সন্তানবতী হত তবে হয়ত জীবনটা এমনভাবে ব্যর্থ হ'ত না। কিন্তু হায়, সন্তান লাভের সৌভাগ্য আজও হল না তার!

দিন কতক পরে, তারা সহর থেকে দূরে—এক পল্লী-গ্রামে বসবাস করতে গেল। অবশ্য ডাক্তার মূলার ব্যবসার খাতিরে প্যারিতেই থাকৃতেন বেশীদিন, মাঝে মাঝে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হতেন দু' একদিনের জন্য।

প্রতিবেশীদের মধ্যে রিউ পরিবারের সঙ্গে ব্লান্‌শে মূলারের ঘনিষ্ঠতা হল সবচেয়ে বেশী। একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে এসে গৃহকর্ত্তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তার। নাম তার জর্জ্জ দ্য রিউ—সুন্দর বলিষ্ঠ যুবা, শিকারে ও অশ্বচালনায় সুনিপুণ, সৌজন্যে অপরাজেয়। রহস্যালাপেও সে সুপটু, আসরে সে যখন কথা কয় তখন মেয়েরা তার কথা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। ব্লান্‌শের স্নিগ্ধ রূপশ্রী জর্জ্জের মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তুল্‌লে। বিবাহিতা নারীও যে অপরের প্রেমের প্রত্যাশী হতে পারে হয়ত সে তা অবিশ্বাস করত না। তাই সে একাগ্রভাবে চেষ্টা সুরু করলে এই সুন্দরী তরুণীর হৃদয় জয় করবার জন্য। প্রথমটা ব্লান্‌শেকে সে খুব সম্ভ্রম দেখাতে লাগল, তারপর তার নিঃসঙ্গতার দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করলে, শেষে সে তাকে আচ্ছন্ন করে দিলে তাঁর অবারিত প্রেমে ও সোহাগে।

অতৃপ্ত-যৌবনা তরুণীর তৃষিত হৃদয় অনায়াসে সে জয় করলে।

*　　　*　　　*

দিনের পর দিন তাদের প্রণয় গাঢ় হতে থাকে। মাঝে মাঝে মোটরে করে তারা বেরিয়ে পড়ে নির্জ্জন পল্লীগ্রামে—পরস্পরের সান্নিধ্য গভীরভাবে উপভোগ করবার জন্য।

কিন্তু একদিন অপরাহ্নে এক দুর্ঘটনা ঘটল। পরিচিত কোন লোক মোটর চালিয়ে তাদের দিকে আসছে মনে

করে জর্জ্জ ভয় পেয়ে গাড়ীর বেগ দিলে বাড়িয়ে। গাড়ী ছুটতে লাগল ভীষণ বেগে, কিছুদূর এসে এক বাঁকের মুখে জর্জ্জ আর সাম্‌লাতে পারলে না, বেড়ার গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে গাড়ীটা গেল উল্টে।

ব্লান্‌শে ভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়েছিল, কিন্তু দেহের কোথাও আঘাত পায়নি। জর্জ্জকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিকটবর্ত্তী গ্রামে আনা হল এবং তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকা হল চিকিৎসার জন্য।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক—অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। ব্লান্‌শে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে, টেলিফোনে স্বামীকে অনুরোধ করলে তৎক্ষণাৎ চলে আসবার জন্য এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডাক্তার মূলার এসে উপস্থিত হলেন।

জর্জ্জের সঙ্গে গাড়ীতে একা ছিল বলে স্ত্রীকে ডাক্তার মূলার কিছুমাত্র সন্দেহ করলেন না। ব্লান্‌শে যে সময় কাটাবার একজন সঙ্গী পেয়েছে এতে তিনি সত্যই আনন্দিত—স্ত্রীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।

বিলম্ব না করে আহতকে তিনি পরীক্ষা করতে সুরু করলেন এবং মিনিট পনেরো পরে স্ত্রীকে জানালেন, অস্ত্রোপচার করা একান্ত আবশ্যক।

ব্লান্‌শে বিষম বিপদে পড়ল। অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ ভিন্ন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই। চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস সযত্নে তাকে চেপে রাখতে হবে···অন্তরের নিদারুণ বেদনা স্বামী যেন কোনমতে না জানতে পারেন...অস্ত্রোপচারের বীভৎস দৃশ্য তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে ধীর অবিচলিতভাবে। নিয়তির চক্রে আজ সে এমন অবস্থায় পড়েছে যে স্বামীর সাহায্য ব্যতীত প্রণয়ীর জীবন রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর ডাক্তার মূলার? দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্য অবহেলা করে যে-নৈপুণ্য তিনি অর্জ্জন করেছেন, আজ সেই নৈপুণ্য তাঁকে এমন একজনের জন্য প্রয়োগ করতে হবে যে তাঁর ত্রুটির সুযোগ নিয়ে তাঁর স্ত্রীর ভালোবাসা আকৃষ্ট করেছে!

ডাক্তার মূলার তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সকলকে চলে যাবার আদেশ করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে রোগীর দিকে অগ্রসর হলেন।

ব্লান্‌শে এই প্রথম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্বামীকে লক্ষ্য করতে লাগল। স্বামীর সাহস ও দৃঢ়তা দেখে মন তার গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠল—তাঁর শিক্ষা ও সাধনার মর্য্যাদা এখন সে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলে।

কুড়ি মিনিট ধরে ডাক্তার প্রাণপণ যুদ্ধ করলে রোগীর জীবন রক্ষার জন্য। অবশেষে যখন তিনি শ্রান্তভাবে উঠে এলেন যুদ্ধ জয় করে, তখন তাঁকে আর চেনবার উপায় নেই। মনে হল যেন তাঁর বয়স হঠাৎ দশ বছর বেড়ে গিয়েছে!

অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর জীবন রক্ষা হল বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্বাস্থ্য সে ফিরে পেলে না। পক্ষাঘাতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অবশ, নড়বার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত নেই। কথা সে বলতে পারে না, মাঝে মাঝে শুধু অস্পষ্ট আওয়াজ করে। এখন সে না পারে বন্দুক ধরতে, না পারে ঘোড়ায় চড়তে! মেয়েদের আকৃষ্ট করবার মত তার আর কিছু নেই। ব্লান্‌শে তার পানে আর চাইতে পারে না, সেও চিনতে পারে না তার প্রণয়িনীকে। অবশেষে, জর্জ্জের আত্মীয়-স্বজন তাকে পাঠিয়ে দিলে এক নার্সিং হোমে।

ব্লান্‌শের দৃষ্টি তখন স্বামীর দিকে ফিরল। স্বামীর সঙ্গে তুলনায় জর্জ্জকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়। তা' ছাড়া স্বামীর সেদিনকার দৃঢ়তা ও সাহস জীবনে সে ভুলতে পারবে না। স্বামীর ভালোবাসার জন্য মনে-মনে সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু ভালোবাসা না দিয়ে ভালোবাসার প্রত্যাশা করা বৃথা। তাই অন্তরের সমস্ত প্রীতি সে উজাড় করে দেয় স্বামীর কাছে।

ডাক্তার মূলারও হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের দাম্পত্যজীবন প্রীতির অভাবে দুঃসহ হয়ে উঠছে—তাই স্ত্রীর ভালোবাসার প্রতিদান দিতে তিনিও তৎপর হয়ে উঠলেন। দিন কতক পরে স্ত্রীকে একদিন তিনি বললেন, কাজ-কর্ম্ম হতে তিনি অবসর নিতে ইচ্ছা করেন—অতঃপর তাঁরা পল্লীগ্রামের শান্তি ও স্নিগ্ধতার মাঝে একত্র বসবাস করবেন। স্ত্রী বিস্মিত হল বটে, তবে তার আনন্দের মাত্রা বিস্ময়কে ছাপিয়ে গেল।

তারপর থেকে তারা পরম সুখে একত্র দিনাতিপাত

করেছে—জীবনের কোন জটিলতাই তাদের মিলনের স্বচ্ছ প্রবাহকে পঙ্কিল করতে পারেনি।

* * *

অতীতের এইসব বেদনাময় ঘটনার বিষয় মাদাম মূলার যখন এক মনে ভাবছিলেন, সেই সময় কে এসে দরজায় ঘা দিলে।

পরিচারিকাকে উদ্দেশ করে মাদাম মূলার বললেন, "আজ আর আমি কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবো না—মন বড় খারাপ।"

মিনিট কয়েক পরে পরিচারিকা ফিরে এসে বললে, "উকিল বাড়ী থেকে লোক এসেছিল এই চিঠিখানা নিয়ে।"

মাদাম মূলার চিঠিখানা নিলেন। চিঠিখানা সযত্নে শীলমোহর করা—খামের উপরে ডাক্তার মূলারের হস্তাক্ষরে লেখা, "আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীকে দেবে।"

ভয় ও আবেগকম্পিত দেহে মাদাম মূলার চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন—

"তুমি বরাবরই ভেবেছ যে জর্জ্জের সঙ্গে তোমার প্রণয়ের কথা আমি একেবারেই জানি না। কিন্তু আমি জানতে পারি সেই দুর্ঘটনার দিনে······তোমার ভাবভঙ্গী থেকে নয়, তুমি তোমার ভূমিকা খুব সুন্দরভাবেই অভিনয় করেছিলে। আমি একখানি চিঠি পেয়েছিলাম—অস্ত্রোপচারের জন্য যখন জর্জ্জের দেহ থেকে পোষাক খুলছি, সেই সময় চিঠিখানা মাটিতে পড়ে যায় তার ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে।

তোমাকে আমি ক্ষমা করেছিলাম, কারণ দোষটা মূলতঃ আমারই—তোমার প্রতি কর্ত্তব্য আমি পালন করিনি। কিন্তু যে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তার প্রতি দারুণ ঘৃণা জেগেছিল ·····আর সেই ঘৃণার পাত্র তখন আমারই অধীনে—আমারই দয়ার উপর নির্ভর করছে তার জীবন! ক্লোরোফর্মে যখন সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল তখন আমি অনায়াসে তাকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিতে পারতাম—কেউই জানতে পারত না যে আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু আমার মনে হল, যদি সে এইভাবে মারা যায়, তুমি হয়ত আমাকে ঘৃণা করবে তাকে বাঁচাতে পারলাম না বলে এবং তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে তোমার মনের মন্দিরে।

হত্যার চেয়েও ভীষণ এক অপকর্ম্ম করতে আমি দ্বিধা-বোধ করলাম না। ইতরপ্রাণীর দেহে এ পরীক্ষা আমি করেছিলাম······আমি জানতাম, আমার এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা যদি মস্তিষ্কের একটি স্থান বিদ্ধ করে, তা'হলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এই সুদর্শন যুবক চিরদিনের মত পঙ্গু ও কদাকার হয়ে যাবে—মেয়েদের আকৃষ্ট করবার মত তার আর কিছুই থাকবে না।

হ্যাঁ, আমি তা' করলাম এবং আমার উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়নি তা' তুমি জানো। কারণ জর্জ্জের উপর শীঘ্রই তোমার বিতৃষ্ণা এল এবং আমাকে তুমি ভালোবাসতে সুরু করলে। ধীরে ধীরে তোমার হৃদয় আমি জয় করলাম—যা' সে আমার কাছ থেকে তস্করের মত অপহরণ করেছিল। এই জয়ের মূল্য-স্বরূপে আমাকে ত্যাগ করতে হল কর্ম্মজীবনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উচ্চাশা। প্রিয়তমে, তোমাকে পাবার জন্যে ঐ ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং তার জন্যে মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই—কারণ যা কিছু ক্ষতি আমার হয়েছে সে সবই তুমি পূরণ করেছ।"

মাদাম মূলারের দুই চোখ জলে ভরে এল—তিনি আর পড়তে পারলেন না। ঘরখানা যেন ঘুরতে লাগল—প্রথমে ধীরে, তারপর অতি দ্রুত! তাঁর পা দু'খানা থর থর করে কাঁপতে লাগল—সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে তিনি পড়ে গেলেন।

মাদাম মূলার মূর্চ্ছিত অবস্থায় অনেকক্ষণ সেখানে পড়ে রইলেন।

ঘণ্টা দুই পরে যে পরিচারিকাটি কর্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর পরিচর্য্যা করছিল, পাচককে লক্ষ্য করে সে রহস্যচ্ছলে বললে, "তোমরা ভাবো কী? এখনো জগতে এমন অনেক মেয়ে আছে যারা সত্যি স্বামীকে ভালোবাসে—যাদের ভালোবাসা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায় না।"*

*ফরাসী লেখক পল্ দ্য কক্ হইতে।

মধুসূদন ও তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্য

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করতে মনে দুর্ব্বলতা অনুভব করি। ভয় হয়, কি বলতে কি বলব। কারণ, কত সাহিত্যিক এবং সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন, কিন্তু পণ্ডিতসমাজ বলেছেন ঠিক তেমনটি হয়নি। কেউ বলেছেন তাঁর সাহিত্য-আলোচনা করতে হলে সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা দরকার। কেউ বলেছেন দশ-বারোটি ভাষা জানা চাই। ওতে ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতির ছন্দ আছে।

আছে এ কথা মিথ্যা নয়; কারণ, মধুসূদন নিজেই নিজেকে বলেছিলেন গ্রীক। গ্রীক-সাহিত্যের রসসৌন্দর্য্যে তিনি কতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, গ্রীক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁর উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল—তা তাঁর এই কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। কাজেই গ্রীক প্রভৃতি সাহিত্যের ছন্দ যদি তাঁর কাব্যে প্রবেশ করে থাকে, তাঁর মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকারা যদি ভার্জ্জিলের ইনিড, হোমারের ইলিয়ডের নায়ক-নায়িকাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; বরং ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' ছেড়ে দিয়ে যখন আমরা তাঁর 'লক্ষ্মীপূজার ঝাপি', 'শ্রীপঞ্চমী' পড়ি, যখন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পাঠ করি, তখন দেখি তিনি বাঙ্গালীই ছিলেন—একেবারে মনেপ্রাণে বাঙ্গালী। সাধারণ আর দশজন লোক যেমন দেখতে পাই, স্বভাব ও সৌন্দর্য্যে তিনি ছিলেন তাঁদেরই মত।

গ্রীক-সাহিত্যে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা, ছন্দ এবং রসালোকের অনির্ব্বচনীয়তা তাঁর কবিচিত্তে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল। তার চমৎকারিত্ব, তার রমণীয়তাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সর্ব্বোপরি, যে শিক্ষা-সংস্কৃতি বাঙ্গালীর রক্তমজ্জায় মিশে আছে, তার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হন নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা বাঙ্গালীর চির আদরের জিনিষ। এই কথা শুনে কত লোক হেসেছে, কত লোক কেঁদেছে, গড়াগড়ি দিয়েছে, পাগল হয়েছে। প্রেমের বন্যায় বাংলা দেশ ভেসে গেছে, বাংলার স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হয়ে গেছে। এখনও যার পাগল করা সুর বাংলার আকাশে বাতাসে মিশে আছে। দরিদ্র ভিখারী একতারা বাজিয়ে তপ্ত দুপুরের নীরব গৃহবাটী আজও যে বৃন্দাবন কানু সঙ্গীতে মুখরিত করে তোলে, সেই মধুর সুর মধুসূদনের প্রাণেও চাঞ্চল্য এনেছিল। তাই তাঁর রাধাও গেয়েছে—

ওই শুন, পুন বাজে মজাইয়া মন রে
মুরারীর বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে
আমি শ্যামদাসী।

তাঁর রাধা পাগলিনী হয়ে বলেছে:—

কে বাজাইছে বাঁশী সজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে গো মনে।
এ আগুনে কেন আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

রাধা উন্মাদিনী, সকল যুক্তিতর্কের বাইরে, তার বিশ্বাস বসন্ত যখন এসেছে, মাধব নিশ্চয়ই আসবে। তাই বলছে:—

মুছিয়া নয়ন জল চললো সকলে চল
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

রাধার এই উন্মাদিনী অবস্থা দেখে সখিগণ নীরবে নতমুখে কাঁদছে,—রাধা তবু কিছু বোঝে না,—তবু যে কৃষ্ণ কুঞ্জে আসে নি তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

কেন এ বিলম্ব আজি কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি
কেন অধোমুখে কাঁদ আবরি' বদন-চাঁদ
কহ রূপবতি।

আজ মাধব এলে রাধা কি দিয়ে তার পূজা করবে?

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।
দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।

কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।
এ যৌবন ধনে, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু, হইবে চন্দন বিন্দু,
দেখিব লো দশ ইন্দু স্থনখ গগনে।
চির প্রেম বর মাগি লব ওগো ললনে।

বিরহের এই যে তীব্রাবস্থার বর্ণনা এদিক দিয়ে মধুস্থদন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সমশ্রেণীভুক্ত হয়ে গেছেন। স্থানে স্থানে ছন্দও অবিকল তাঁদের মত। যেমন—

পিককুল কল কল চঞ্চল অলিদল
উছলে স্থরবে জল চললো বনে।

ইত্যাদি পংক্তিগুলি বিদ্যাপতির

ফুটিল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাইও রে।

পংক্তিগুলির সঙ্গে একেবারে সমান ছন্দে লয়ে মিলে গেছে।

তবে বৈষ্ণবকবিগণের রাধা যেমন, অবিকল তেমনটি করে মধুস্থদন তাঁর রাধা-চরিত্র অঙ্কিত করেন নি, পার্থক্য একটু দেখা যায়। যেমন—বিরহে কোন বৈষ্ণব-কবির রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার না করে আপন ভাগ্যের নিন্দা করে বলেছে—

তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতরারে
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।

মোরা গ্রাম্য গোপ বালিকা তদুহু পশু পালিকা
হাম কিরে শ্যাম সমভোগ্যা।

মধুস্থদন তাঁর রাধার মুখ দিয়ে এই ধরণের কথা বলান নাই। বোধ হয় ইহা আত্মাবমাননাকর মনে করেছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে বৈষ্ণবকবিগণ ছিলেন একাধারে কবি ও সাধক, আর মধুস্থদন ছিলেন নিছক কবি। কবিত্বের দিক দিয়েই তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করেছিলেন এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' তাই ভজন-কাব্য নহে, প্রেম-কাব্য। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিগণের কবিতা ভজন-কাব্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। এবং "তৃণাদপি সুনীচেন" নীতিই বৈষ্ণব সাধন-ভজনের মূল-নীতি। সকল ভক্ত অপেক্ষা নিজেকে ছোট মনে করাই বৈষ্ণব কবিগণের ধর্ম্ম। উপরোক্ত রাধার উক্তিও এই অর্থবোধক। অন্য কেহ হয়ত তাহার অপেক্ষা অধিক শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত, স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি প্রসন্ন হবেন কেন? বৈষ্ণব-সাহিত্যগুলিকে প্রেমের কাব্য হিসাবে ধরলে এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সহিত তুলনা করলে, ইহা তাদের সম-পর্য্যায় ভুক্ত হয়। এবং রসমাধুর্য্য ও লিরিসিজমের দিক দিয়ে তুলনা করলে ইহা 'মেঘনাদ বধ কাব্য' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 'মেঘনাদ বধে' যে লিরিসিজম আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে, এখানে তাই উদ্দাম হয়ে উঠেছে আবেগানুভূতির তীব্রতায়।

গান

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

এ তনু কর হে ধূলায় ধূসর
মধুময় কর বেণু,
আমার গানের স্থরেতে মিশাও,
তোমার চরণ রেণু।

এসো তব রঙে
খেলি ফুলদোল,
তব রঙে রাঙি'
তুলি' গীতরোল,—

আমি সাগরের তটে লহরী গণিয়া,
বিফলে ফিরিয়া গেনু।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসঙ্গীরূপে যে সমস্ত পারিষদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌরীদাস পণ্ডিত দুইজনে সমবয়স্ক ছিলেন এবং একই শকাব্দে আবির্ভূত হয়েন। গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "কাটোয়া"র সন্নিকটস্থ শালিগ্রামে ছিল। বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম "শালগাঁ চাকুন্দে" নামে পরিচিত। গৌরীদাস পণ্ডিতের পিতা শ্রীকংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও সর্ব্ব-কনিষ্ঠ নৃসিংহচৈতন্য। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার "বাৎস্য" গোত্র ছিল। তাঁহার মাতার নাম কমলা দেবী। গৌরীদাস পণ্ডিতের আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দে—তিরোভাব অনুমান ১৪৮০ শকাব্দের শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ধীরসমীর কুঞ্জে তাঁহার সমাধি অদ্যাপিও ভাগ্যবানে দর্শন করিতেছেন।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের অন্তরে সংসার-বৈরাগ্যের ভাব অতি বাল্যকাল হইতেই পরিস্ফুট ছিল। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই সংসার-বিতৃষ্ণা প্রবল হওয়ায় নিজ অভীষ্ট বস্তুর সন্ধানে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তী অম্বিকা নগরীতে (বর্ত্তমান কালনা) শ্রীশ্রীঅম্বিকা মাতা-রূপিণীর চরণতলে একটি আম্র (তেঁতুল) বৃক্ষতলায় শ্রীকৃষ্ণভজনে রত হইয়াছিলেন। এই আম্র বৃক্ষতলায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব আসিয়াছিলেন এবং এইস্থানেই শ্রীগৌর-গৌরীদাসের মিলন ও লীলা হইয়াছিল। সেই ৫০০ শত বৎসরের সুপ্রাচীন আম্র বৃক্ষ শ্রীগৌর-গৌরীদাস মিলনের সাক্ষীরূপে আজিও জীবজগতের সম্মুখে বিরাট্ কলেবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের অসীম প্রেমশক্তির পরিচয় পাইয়া তৎকালীন্ বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহাকে দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণের "সুবল" সখা বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।"

(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

"সুবল বলিয়া যারে পুরাণে কহিল।
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে সকলে জানিল॥"

(বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত বৈষ্ণব বন্দনা)
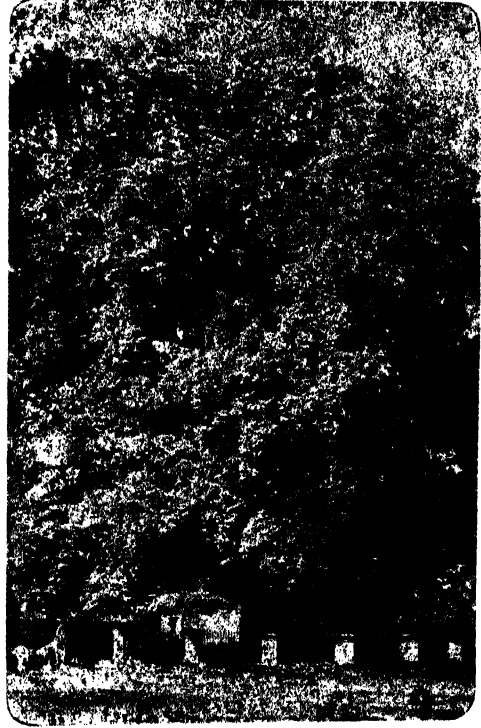
পাঁচশত বৎসরের সুপ্রাচীন আম্র (তেঁতুল) বৃক্ষ

"গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়মন বাকে যার নিত্যানন্দ প্রাণ॥"

"গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে মনে হয়, শ্রীগৌরাঙ্গদেব দুইবার অম্বিকায় আসিয়াছিলেন। প্রথমবার যখন আসিয়াছিলেন, তখন একলা আসিয়াছিলেন।

শান্তিপুর হইতে অম্বিকার অপর পাড়ে হরিনদী গ্রামে আসিয়া গঙ্গাপার হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই যে বৈঠাখানি দ্বারা নৌকা বাহিয়াছিলেন, অম্বিকা নগরীতে আসিয়া সেই বৈঠাখানি গৌরীদাস পণ্ডিতকে দান করেন। সেই বৈঠাখানি এখনও অম্বিকার শ্রীমন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

"একদিন শান্তিপুর হইতে গৌররায়।
গঙ্গাপার হৈয়া আইলেন অম্বিকায়॥
পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর গিয়াছিলু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥
গঙ্গাপার হৈলু নৌকা বহি এ বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হইতে পার করহ জীবেরে।
এত কহি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে॥"

(ভক্তিরত্নাকর)

তাহার পর অম্বিকা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইলেন। কিছুদিন গৌরীদাস পণ্ডিতকে সেখানে রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ হাতে লেখা একখানি পুঁথি তাঁহাকে উপহার দেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত আনন্দিত চিত্তে প্রভুর নিজ হস্তে লেখা সেই পুঁথিখানি সঙ্গে লইয়া অম্বিকায় নিজ ভজনস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

"পণ্ডিতে লৈয়া প্রভু গেল নদীয়ায়।
করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত-লীলায়॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত॥
কিছুদিনে পণ্ডিত আসি অম্বিকায়।
প্রভুদত্ত গীতাপাঠ করেন সদায়॥"

(ভক্তিরত্নাকর)

শচীমাতার স্নেহ, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম, ভক্ত পারিষদের আকুল কাতরতা—কোন কিছুই যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সংসার বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, তখন আমাদের শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুররূপী প্রিয় নর্ম্মসখা শ্রীসুবল নিজ সখ্য প্রেমডোরে শ্রীনিতাই-চৈতন্যদেবকে অম্বিকা নগরীতে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁহার সহিত চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় যখন শ্রীগৌরীদাস শিহরিয়া উঠিলেন—বিরহব্যথায় কাতর হইয়া যখন তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবার সঙ্কল্প করিলেন—তখনই দয়াল অবতার শ্রীনিতাই চৈতন্য প্রভু নিজেদের মূর্ত্তি নিজেরা প্রকট করিয়া তবে নীলাচলে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অম্বিকা নগরীতে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের স্বয়ং প্রকট ও প্রাচীনতম মূর্ত্তি গৌরীদাস-শ্রীমন্দিরে বিদ্যমান থাকিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং সেইজন্যই আজ এই অম্বিকা নগরী শ্রীপাটে পরিগণিত হইয়াছে।

"নিতাইচৈতন্য গৌরীদাস প্রেমাধীন।
জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রিদিন॥
নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের গৃহেতে।
যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে॥
কহিতে না জানি পণ্ডিতের অভিপ্রায়।
নিরন্তর মগ্ন মুই প্রভুর সেবায়॥"

(ভক্তিরত্নাকর)

অনেকে মনে করেন, শ্রীগৌরীদাস শ্রীমন্দিরে শ্রীনিতাই - চৈতন্যদেবের শ্রীবিগ্রহদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরের হইলে প্রভুদের গৃহীবেশে রাখা হয় কেন? সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেরই যদি হয়, তবে তৎকালে চিরকুমার অবধূত সন্ন্যাসবেশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেই বা গৃহীবেশে রাখিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস মূর্ত্তির ভজন, পূজন এবং সমাদরের মোটেই স্থান নাই। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি ছয় গোস্বামীগণ, পণ্ডিত সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ছয় পারিষদগণ যখন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সন্ন্যাসবেশে দর্শন করিলেও, তাঁহারা যখন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুর স্তব, ধ্যান, মাহাত্ম্য প্রভৃতির বর্ণনা সহ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—তখন তাঁহাদের গৃহীবেশে, নাটুয়া মূর্ত্তিরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার আদিগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যদেবের কিরূপ ধ্যান করিয়া প্রণাম করিতেছেন,—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায়, সপুত্রায়, সকলত্রায়ঃ তে নমঃ॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপাদ্ হরিদাস গোস্বামী, পরমবৈষ্ণব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা সংস্কৃত বরাহনগর-শ্রীপাট বাটীর বিরাট্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাগারের অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীপাদ্ অমূল্যধন রায়ভট্ট, রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত প্রণেতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়, বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী প্রণেতা পরমবৈষ্ণব রায় সাহেব মুরারিলাল অধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীপাট অম্বিকার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত-শ্রীমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উদয় সম্বন্ধে ঐরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তবে যদি কেহ উপরোক্ত সুধীগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া গৌড়ীয় প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত-শ্রীমন্দিরের মহাপ্রভুর এই শ্রীমূর্ত্তি প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের মূর্ত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই—যেহেতু শ্রীপাট-অম্বিকার শ্রীগৌরীদাস-শ্রীমন্দিরের শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য প্রভুদ্বয়ের এই স্বয়ম্ভু মূর্ত্তিই যে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রভুদ্বয়ের প্রাচীনতম শ্রীমূর্ত্তি—সেই বিষয়ে আর কোনও মতদ্বৈধতা ও সন্দেহের কারণ নাই এবং থাকিতেও পারে না, অধিকন্তু ইহা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের মূর্ত্তিরূপে সিদ্ধান্ত হইলে,—তাহা ইহার সর্ব্ব প্রাচীনত্বেরই আনুকূল্য সমাধান করিবে।

শ্রীগৌরীদাস আঙ্গিনার পার্শ্বেই গিরিধর নামে একটি পুষ্করিণী খননকালে তাৎকালীন সেবাইৎকে স্বপ্নাদেশ দানে "শ্রীযাদব রায় ও শ্রীমাধব রায়" নামে বাবা বিশ্বনাথের দুই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া এই গৌরীদাস-শ্রীমন্দিরে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। সেই দিন হইতে শ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে "হরিহর" মিলন হইয়া আছে। এই দুই শিবমূর্ত্তির চড়ক-মহোৎসব অদ্যাপিও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

শ্রীপাট অম্বিকার লীলাকাহিনী আলোচনার সময়ে প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের কয়টি কথা কেবল মনে পড়ে,—

প্রথম—শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের শ্রীচৈতন্যদেব-লীলাস্থান আজিও জাজ্জ্বল্যরূপে বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়—শ্রীপাট অম্বিকার গৌরীদাস মন্দিরের শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের স্বয়ম্ভু মূর্ত্তিদ্বয় আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দ্বারা প্রথম অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অবশ্য সেই রীতিতে অদ্যাপিও প্রভুদ্বয়ের জন্মতিথিতে তাঁহাদের অভিষেক কার্য্যাদি প্রভুপাদ অদ্বৈত বংশধরের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

অম্বিকা : গৌরীদাস-শ্রীমন্দিরের প্রাচীনতম গৌর-নিতাই বিগ্রহ

তৃতীয়—বর্ত্তমানে গৌরীদাস-শ্রীমন্দিরে সমস্তই আছে—তবুও যেন একটা কিছুর অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

তাঁহার এই সমস্ত উক্তি অতি সত্য, বিশেষতঃ তাঁহার তৃতীয় বাক্যের ইঙ্গিত অতি সত্য এবং সুস্পষ্ট। বাস্তবিকই অতীতের সেই সবই বর্ত্তমান—নাই কেবল এই সংসারত্যাগী গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীমন্দিরের যোগ্য সেবাইত।

যে "অম্বিকা" নামের সহিত এত স্মৃতি জড়িত, জানি না কোন অভিশপ্ত কারণে এবং কাহার দ্বারা ইহার

পরিবর্ত্তে "কালনা" নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পুনরায় "কালনা"র পরিবর্ত্তে "অম্বিকা" নামের প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করা এবং "কালনা কোর্ট" ষ্টেশনের নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীপাট-অম্বিকা" নামকরণ করিবার জন্য ই, আই, রেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ দ্বারা উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা বিধেয় বলিয়া মনে হয়। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান জাগরণযুগে এই লুপ্তপ্রায় অতীত গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি দরদী মাত্রেরই অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। •

জাপান-যাত্রীর পত্র

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

"ইণ্ডিয়া লজ"
কোবে, জাপান
৫-৫-৩৯

গতকাল সকাল ৯টার সময় মোজি বন্দরে জাহাজ পৌছেছে। মোজি হ'তে ১২॥০টার ট্রেণে এসে ১০॥০টার সময় কোবে পৌছেচি। মোজিতে "ইণ্ডিয়া লজ"-এর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। নচেৎ বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ত! তাই এখানেই উঠেছি।... এর সেক্রেটারী হচ্ছেন একজন বাঙালী—কলিকাতার বৈঠকখানায় বাড়ী। খাওয়া-দাওয়া মোটামুটি ভাল। বিদেশে আর হুবহু বাঙালীর খাবার কোথায় পাব? শরীর মোটামুটি ভাল আছে। ঠিক চন্দননগরের পৌষ মাসের শীতের মত শীত। আমাদের ওখানকার শীত দু'টি মোটা চাদর গায় দিয়ে কাটানো যায়। এখানকার শীত বড় বেয়াড়া; একটু গায়ে ঠাণ্ডা জল দিলেই হাড় পর্য্যন্ত কন্ কন্ করে! শুনলাম, ভারতবাসী যারা এদেশে প্রথম আসে—তাদের অন্য বিশেষ কিছু অসুখ হয় না, খুব নিউমোনিয়া হয়, তাই যতটা পারি সাবধানে আছি।

কোবে, ১১-৫-৩৯

এখানে এসেছি মাত্র ৫।৬ দিন। এই ক'দিন এসে যা সামান্য দেখছি বা শুনছি তাতে অবাক্ হয়ে গেছি! স্বাধীন জাতি যে কিরূপ—তা আমরা ওখানে বসে কল্পনাও করতে পারি না; তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা, এমন কি আচার ব্যবহার এত অভিনব—তা আর কি বলব! ... "ইণ্ডিয়া লজে" প্রায় ১৬।১৭ জন ভারতীয় ভদ্রলোক থাকেন; মাঝে মাঝে আরও বেশী হয়। দু'খানি বাড়ীতে সর্ব্বসমেত কেবল থাকবার ঘর প্রায় ২০খানা হবে। এই সমস্ত কিছুর ভার দু'জন পরিচারিকার উপর; এদের মধ্যে একজন রান্না করে, বাজার করে, হিসাব রাখে—আর একজন ঝিয়ের কাজ করে। রাঁধুনী বিবাহিতা—বয়স ৩০; ঝি অবিবাহিতা—বয়স ২০। দু'জনেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। এদের কাজের ব্যবস্থা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি; ঘর ঝাঁট দেওয়া, প্রতিদিন ঘর ধোয়া, পায়খানা পরিস্কার, ইত্যাদি সকল কাজ করতে হয়। এতবড় দু'খানা বাড়ী কি রকম পরিস্কার অবস্থায় রেখেছে, কোথাও এতটুকু ময়লা নাই। এসব কাজ ছাড়া প্রত্যেক 'মেম্বরে'র বিছানা করা, রৌদ্রে দেওয়া, ঘর গুছানো, এমন কি কাহারও কাহারও জুতা পরিস্কার পর্য্যন্ত করে' দেয়। লেখাপড়া শিখেছে, অথচ ছোট কাজ ব'লে এদের কাছে কিছু নেই। তা ছাড়া মেম্বরদের ক্ত কত রকম ফরমাইস খাটতে হয়—তা আর কি বলবো? আমি আমাদের পুরুষ মানুষ হরেকেষ্ট, রঘুর (কলিকাতাস্থ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বাসভবনের ভৃত্য ও রাঁধুনী) কথা ভাবি। আমার মনে হয়, আমাদের কলিকাতা বাস-ভবনে যদি ৪টি লোক রাখি—তাহলেও বাড়ী-ঘর-দুয়ার এত পরিস্কার রাখতে পারবে না বা সভ্যদের এত আরাম দিতে পারবে না। এরই মধ্যে তাদের বিকাল বেলার যথারীতি প্রসাধন আছে, নিত্য-নৈমিত্তিক দু'বেলা খবরের কাগজ পড়া আছে। যখনই রান্নাঘরে যাই, দেখি—একটা-না-একটা বই পড়ছেই। যেমনি শরীর, তেমনি খাটতে

পারে! আমার কেবিন-ট্রাঙ্কটি—যা উপর হ'তে হরেকেষ্ট (কলিকাতা বাসভবনের ভৃত্য) নীচে নামাবার সময় অন্যের সাহায্য নিয়েছিল, এ মেয়েটি আমার পৌঁছুবার দিন অক্লেশে রাস্তা হ'তে দোতলার উপরে একলাই নিয়ে এলো! এদের কাজ কাউকে দেখতে হয় না, সব নিজেরাই করে। এখানকার সম্পাদক মহাশয় সকালে খরচের টাকা দিয়ে যান—আর এই মেয়ে দু'টী নিজেরাই সব করে, একটী পয়সার গোলমাল করে না! চুরি যেন এরা জানে না। কোন বাড়ীতে বা ঘরে তালা-চাবি দেবার ব্যবস্থা নেই। সব খোলা! ব্যবসায়ীর টেবিলের উপর বাহিরে হাজার হাজার টাকা পড়ে থাকে—একটী কড়িরও গোলমাল হয় না। আমরা একটী চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না, সঙ্গে প্রতিদিন একজন করে যেতে হয়! এতে কত যে সময় অপচয় করি! এরা সময়ের মূল্য জানে। এক মিনিট বৃথা ব্যয় করে না। সামান্য ছোটখাট ব্যাপারে এই মেয়ে দু'টি এখানকার ভারতীয় বন্ধুদের যে কত রকমে শিক্ষা দেয়—তা আর কি বলব? খানিকটা ঘুরে এসে, দেখে শুনে এখানকার লোকের সঙ্গে আমাদের তুলনা করি আর গালে হাত দিয়ে ভাবি,—কি শিক্ষার গুণে এরা এত কর্ম্মঠ, এত ভদ্র এবং এত সৎ! ··· শুনি, এদের যে প্রাইমারী স্কুল আছে—তাই এখানকার মানুষের চরিত্র গড়ার একমাত্র ক্ষেত্র। জাপানে প্রাইমারী স্কুলের সুশিক্ষার ব্যবস্থার কথা সমস্ত জগতে বিদিত। ইউরোপ থেকেও এদের শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকে দেখতে আসেন। কর্ম্ম শেষ হ'লে কয়েকটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি দেখবার ইচ্ছা আছে।

···লিখেচ—আমাদের দেশে শিখবার তেমন scope নেই। আমার মনে হয়, আমাদের সব আছে, নেই শুধু একটা জিনিষ — যেটার বলে আমরা সব কিছুই করে নিতে পারি। একটা কথা বলি, এখানকার অফিসের সময় সকাল ৮॥০টা হ'তে বৈকাল ৫॥০টা পর্য্যন্ত, মাঝে জলখাবারের ছুটী—সামান্যক্ষণ। মাহিনা সাধারণতঃ আমাদের ওখানে যে রকম দেওয়া হয়ে থাকে—সেই রকম, বরং অনেক ক্ষেত্রেই কম! তবুও আমরা আমাদের ভরণপোষণ করতে পারি না। তার কারণ, প্রতি earning member-এর উপর আমাদের ওখানে ৩।৪টি পোষ্য আছে! এখানে এ ব্যাপারটী নেই, সকলেই কাজ করে, কেউ কারো উপরে বসে খায় না। এখানকার যে সব মেয়েরা বাহিরে কাজ করবার—তারা বাহিরে কাজ করে; আর যারা ঘরে থাকে—তারা প্রত্যেকে নিজের সংসারের কাজ ছাড়া ঘরে ব'সে একটা-না-একটা কিছু করেই, যে-জন্য সে ব্যক্তিগত ভরণপোষণের জন্য অন্যের ঘাড়ে চাপে না। এখানকার সংসার আমাদের ওখানকার মতই সব যৌথ পরিবার। কিন্তু সকলেই কিছু-না-কিছু উপায় করে বলে' কারও সংসারে কোন কষ্ট নেই। কোটাক কোম্পানীর অফিসে একটী টেলিফোন Girl Operator দেখলাম, বয়েস আন্দাজ ১৭।১৮। কি smart! মাহিনা আমরা আমাদের অফিসে যা দিই তার চেয়েও ১৲ টাকা কম। টেলিফোন-অপারেটারের কাজ খুব বেশী নয়, সারাদিন প্রচুর অবকাশ মেলে। এই অবসর সময়টুকু পড়াশুনা বা ছোটখাট অন্য কাজের দ্বারা সদ্ব্যবহার করা যায়। এখানকার অপারেটার প্রত্যেকে একটা-না-একটা কিছু করেই। এই মেয়েটি সারাদিন বসে কাগজের ফানুস ও ফ্ল্যাগ্ তৈরী করে, তাতে তার আরও ৮।১০ টাকা উপায় হয়। আমাদের দেশেও এমন অনেক কিছু করা যেতে পারে। আসলে তেমন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই শ্রমের মর্য্যাদা ও স্বাবলম্বী হবার প্রেরণামূলক শিক্ষার সুব্যবস্থার প্রথম প্রয়োজন। শ্রমের মর্য্যাদা এখানে এত বেশী যে, দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। কোটাক কোম্পানীর অফিসের মেয়েটী যা উপায় করে—তার মধ্যে নিজের খরচ চালায় এবং বাকী টাকা জমায় নিজের বিবাহে খরচ করবার জন্য। বিয়ের জন্য বাপ মাকে বিব্রত হ'তে হয় না। এই সব দেশের মালিকরা কম খরচে বেশী কাজ পায় বলেই আমাদের দেশ হতে সব কাঁচা মাল (raw materials) কিনে এনে এখানে তৈরী করে, জাহাজ-ভাড়া, heavy duty দিয়েও ভারতের বাজার একচেটে করে' রেখেছে। অবশ্য কারণ আরও অনেক আছে। কিন্তু এটা একটা বড় কারণ! এরকম অনেক কিছু আছে—যা আমাদের শিখতে হবে।

"পুরুষোত্তম-তীর্থ"

শ্রীরমণ

এবার চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবে প্রদর্শনীর মৃণ্মূর্ত্তি বিভাগের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, 'পুরুষোত্তম-তীর্থ।" "স্বাস্থ্য ও সমাজ", "স্বদেশী যুগের ইতিহাস", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদ", 'গীতার যোগ", "জ্যোতিষ"—এইগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সময় হইলে "প্রবর্ত্তকের" পাঠকদের এইগুলির বৃত্তান্ত একে একে দিবার চেষ্টা করিব। উপস্থিত 'পুরুষোত্তম-তীর্থের" কথাই উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের তরুণেরা ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ উদাসীন তাহাতে এই বিভাগটীর প্রয়োজনীয়তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এত সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মৃণ্ময় মূর্ত্তি ও লিপি-সহযোগে বিষয়-বস্তুটা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট কত বিশদ করা যায়, এই দৃশ্যগুলি না দেখিলে কেহ প্রত্যয় করিবেন না। ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া, আমি পরপর দৃশ্যগুলি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

এই দৃশ্যের প্রথমেই সুরঞ্জিত লিপির সাহায্যে নিম্নোক্ত 'চারটী' লক্ষ্যে পড়ে।

"হিন্দু নাম বিদেশীর দেওয়া। আসলে ভারতবর্ষ আর্য্যের দেশ। আর্য্য-জাতি অন্য কোন দেশ হইতে আসে নাই। প্রাচীন মনুসংহিতায় আছে, এদেশে আর্য্যগণ বাস করেন, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হন। ম্লেচ্ছগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া এদেশে স্থায়ী হয় না।

ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ বিদেশী।

আর্য্য-ধর্ম্ম বেদমূলক। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল আর্য্য-জাতি। ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক। মানুষের প্রথম প্রবৃত্তি—কর্ম্ম। দ্বিতীয় প্রবৃত্তি—জ্ঞান। কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, বেদে তাহার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া ভারতে বিপুল আর্য্য জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্য্য বা হিন্দু জাতি যদি বেদ অস্বীকার করে, তাহার অধঃপতন, অথবা সে অন্য জাতি হইবে। আমরা আর্য্য অথবা হিন্দু, জগতে এই নামে পরিচয় দিতে হইলে, আমাদের বৈদিক কর্ম্ম বা বৈদিক জ্ঞান অনুসরণ করিতে হইবে। জাতির এই মৌলিক ভিত্তি ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জাতিও তাই উৎসন্নের পথে।

ঐহিক জীবনযাপনের যাবতীয় কর্ম্মপ্রণালী এক পারলৌকিক জীবনের স্বর্গাদি সুখলাভের উপায় বেদের কর্ম্মকাণ্ডে আছে। সকল প্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তি এ জাতির বেদানুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবন লয় করিয়া, জীবন-মরণের দ্বন্দ্ব দূর করার পথনির্দ্দেশ বেদের জ্ঞানকাণ্ডেই আছে। ব্রহ্ম মূল। ব্রহ্মেই সৃষ্টির উৎপত্তি ও স্থিতি এবং ব্রহ্মেই লয়। ব্রহ্মনিরূপণের সহিত এই সকল বিষয়ের অবতারণা, যুক্তি-বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানকাণ্ডেই লিখিত হইয়াছে। বেদের ইতিহাস-নির্ণয় হয় নাই। আর্য্য জাতি বেদকে আর্য্যদের ঈশ্বরবিধান বলিয়া স্বীকার করে। যতদিন এই স্বীকৃতি, ততদিন জাতি-সংহতি দৃঢ়মূল ছিল। এই প্রত্যয় ম্লান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেদাচার ছাড়িয়া যথেচ্ছাচারে আর্য্য জাতি খণ্ড, বিভিন্ন, বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে।"

এই লিপি-গৃহের পরই এক নয়নাভিরাম নিষ্কলঙ্ক নীল পটভূমির সম্মুখে শ্যামশ্রী ধ্যানমূর্ত্তি এক পুরুষ বিগ্রহ। মূর্ত্তিটী ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ। ইহার নিম্নে স্বপ্নদ্রষ্টা ভাস্বর অক্ষরে এক লিপি স্থাপন করিয়াছেন। মূর্ত্তিটির সঙ্গে সঙ্গে লিখনটী মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব সঞ্চার করে। লেখা আছে—

"এখানে বাক্য নাই, মন নাই, গুণাদি নাই, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি দেবতাবৃন্দ নাই, লোক-রূপরচনা-বিশেষ নাই, কিছু নাই। যেন ঘোর-নিদ্রা, শূন্যমাত্র, সবকিছুর লয়স্থান, সৃষ্টির কিন্তু ইহাই উৎস। আমিই বহু হইব এই প্রেরণায় অক্ষর ব্রহ্মের উৎপত্তি।"

এই দৃশ্যের পরই এক অপূর্ব্ব দৃশ্যপট চক্ষে পড়ে। ইহার একদিক্ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় ভাবোদ্দীপক। অপর দিকের আকাশ

জ্যোতির্ম্ময়। হরিৎ, পীত, নীল বিটপিবল্লরীর সমাবেশ। গিরিশির হইতে উপলখণ্ডের সোপান অতিক্রম করিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে তটিনী নামিয়া আসিতেছে। জীবনের সাড়ায় দিগ্দেশ পুলকিত। যে মূর্ত্তি এইখানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকটা অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকিয়া

— পুরুষোত্তম-মূর্ত্তি —

আছে। ইহা যেন স্তব্ধ নিশ্চল। অপরার্দ্ধ উন্মীলিত আঁখি। দেহে যৌবনশ্রী। উত্তোলিত হস্তে অমৃতভাণ্ড। ইহাই অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিমা। শিল্পীর বর্ণনাও ইহাই :—

"এখানে জন্ম নাই। স্থুল - সূক্ষ্ম দেহ - ব্যতিরিক্ত, আকাশের ন্যায় দেহাদির আধার, নির্ব্বিকার, অন্তহীন,

— অক্ষর ব্রহ্ম —

জীবরূপে একদিকে মৃত্যুর আস্বাদ, অন্য দিকে আত্মচৈতন্যের অমৃতশ্রী ইহাতেই সূত্ররূপে সৃষ্টিরূপ মণিমালা ধারণ করিয়া আছে।"

— রাজা পরীক্ষিৎ ও শুকদেব —
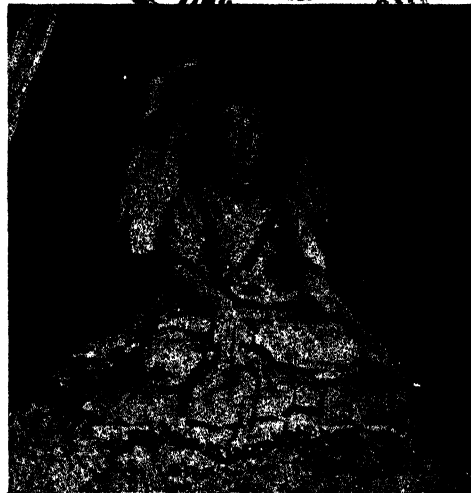
তারপর তৃতীয় দৃশ্য—যমুনাতীরে, পর্ণকুটীরে রাজা পরীক্ষিৎ মহর্ষি শুকদেবের মুখে ভাগবৎ শ্রবণ করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"এই দেহ পূর্ব্বে ছিল, সম্প্রতি জন্মিয়াছে, অতএব নষ্ট হইবে। কিন্তু দেহাদি-ব্যতিরিক্ত যে তুমি, তাহা নষ্ট হইবে না।"

এই তিনটী দৃশ্যে পুরুষোত্তম, অক্ষর ও ক্ষর ব্রহ্মের তত্ত্ব পরিস্ফুট করার চেষ্টা হইয়াছে। সাঙ্খ্যের ব্যক্ত, অব্যক্ত্যাদি তত্ত্ব-ত্রয়ের ব্যাখ্যা হইয়াছে। যাহা নশ্বর, তাহা অবিনশ্বরেরই খণ্ড-প্রকাশ। অবিনশ্বর, অক্ষর, অনন্ত চৈতন্যসৃষ্টির এই দুই ভাবই পুরুষোত্তমে আশ্রিত। এই অলৌকিক অধ্যাত্মরহস্য মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত দেখিয়া পুনরায়

লিপি-গৃহের দিকে লক্ষ্য পড়ে, আমরা উহা এইখানে যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম :—

"বেদের ব্রহ্ম ক্রমে গুণবাচক হইয়া, নানা নামে প্রচারিত হয়। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি। সৃষ্টি গুণাত্মক। অতএব ব্রহ্ম সগুণ। এই যুক্তি এক শ্রেণীর আর্য্যজাতি প্রচার করিতে লাগিলেন। আর্য্য জাতির মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম লইয়া রহিলেন মোক্ষবাদী। সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে হইলেও, উহা ভ্রম বলিয়া তাঁহারা ইহবিমুখ হইলেন। ব্রহ্ম হইতে গুণময়ী পৃথিবী, এই প্রত্যয়ে সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার সামগ্রী হইলেন। মানুষের নানা প্রকৃতি অনুসারে ব্রহ্মও নানা মূর্ত্তি ধরিলেন। এই শ্রেণীর মানুষ লীলাবাদী, সৃষ্টিবাদী। নির্গুণ ব্রহ্মের অনুসরণ করিলেন মোক্ষবাদী, মায়াবাদী। ভারত-ধর্ম্মের এই দুই পথ চিরপ্রসিদ্ধ। এক প্রবৃত্তি মার্গ। আর এক নিবৃত্তি-মার্গ। প্রবৃত্তিমার্গী বেদের কর্ম্ম জ্ঞানে অন্বিত করিলেন। নিবৃত্তিমার্গী জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক্ রাখিয়া কর্ম্ম-বিমুখ হইলেন। ব্রহ্মবাদ লইয়া হিন্দুজাতির মধ্যে মতভেদে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। আর্য্যজাতির অধঃপতনের গোড়ায় ধর্ম্মভেদই মূল কারণ।"

"ধর্ম্মসমন্বয়ের মন্ত্র উচ্চারিত হইল—বহু তত্ত্বদর্শীদের কণ্ঠে কণ্ঠে। বেদের কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানে অন্বিত করিয়া সৃষ্টিবাদী জীবনবাদীর দল জীবন-ধর্ম্মই বেদধর্ম্ম বলিয়া যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আর্য্যজাতির নূতন স্তর রচনা করিলেন। এই স্তরে দাঁড়াইয়া আর্য্যকীর্ত্তি জগজ্জয়ী হইল। ব্যাস, বশিষ্ট, পরাশর, মনু, ভৃগু, জনক, পৃথু প্রভৃতি মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ভারতরাজ্য সুবিস্তৃত করিলেন। প্রবল আর্য্য-জাতির শৌর্য্যে-বীর্য্যে বসুন্ধরা নূতন রূপ ধরিল। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের অন্বয় সুসিদ্ধ না হওয়ায়, তলে তলে পুনঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল ও জীবনক্ষেত্রে আর্য্য-জাতির মধ্যেই মোহবশতঃ গৃহকলহ উপস্থিত হইল। ভারতের কুরুক্ষেত্রে ইহার চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। অসপত্ন রাজ্য লাভ করিয়াও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়সাধনে অসমর্থ হইলেন। বাসুদেব হার মানিলেন। তিনি মুমূর্ষু ভীষ্মের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার সদুপদেশে যুধিষ্ঠিরকে সাময়িকভাবে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু আবার নিবৃত্তিমার্গই প্রবল হইল। ধর্ম্মসমন্বয়ের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় পঞ্চপাণ্ডব—তাঁহাদের স্বর্গারোহণ ভারত-জীবনের এক শোচনীয় ইতিহাস।"

"কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়-সেতু তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কপিলের সাংখ্য এক প্রকার কর্ম্মবাদ। কিন্তু জ্ঞানবাদের প্রলেপ ইহাতে আছে। সাংখ্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন না। মূল সাংখ্যের মতে সৃষ্টির মূল প্রধান বা প্রকৃতি। ভারতের শাক্যসিংহ এই নিরীশ্বর বাদের প্রভাবে তত্ত্ববিশ্লেষণে সর্ব্বত্যাগী হইলেন। মোক্ষবাদ শূন্যবাদে ভাষান্তরিত হইল। সাংখ্য নির্গুণ ব্রহ্মবাদ নহে, সগুণ শক্তিবাদ। এই শক্তি আশ্রয় করিয়া শাক্যসিংহ মহাযান, পরম নির্ব্বাণের পথ ধরিলেন। তাঁহার মতবাদ লক্ষ্যে রাখিয়া চলার পথে, উহা জাতিকে পুনরায় ঐশ্বর্য্যে ও বীর্য্যে মহিমামণ্ডিত করিল। আফগান হইতে ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সিংহল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান পর্য্যন্ত বৃহত্তর ভারত বৌদ্ধ প্রভাবের দান। অষ্টম শতাব্দীতে মহম্মদ ইব্‌ন্ কাসেম সিন্ধু ও মুলতান জয় করিলেও, দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের প্রবেশদ্বার হিন্দুদের হাতেই ছিল। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে গজনীর সবক্তগীন্ কাবুল জয় করিয়া ভারতের প্রবেশদ্বার অধিকার করেন।"

"ভারতের এই মিশ্র ধর্ম্মে বাংলার পাল-রাজা ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জের প্রতিহার রাজগণ নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় একতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদের পাঞ্জাবাক্রমণ। ভারতের চরম অধঃপতন। ধর্ম্মের উপর ভারতের প্রাণ সুদৃঢ় নহে, প্রমাণিত হইল। বৈদিক কর্ম্ম-জ্ঞানের উপর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অপর এক গুণ সংযোজিত করার প্রচেষ্টা এই সময়েই দেখা যায়।"

"বেদের ধর্ম্ম ও বেদের জ্ঞান, বেদের ভাব ও ভাষা শুধু আদর্শস্বরূপ লক্ষ্যে রাখিয়া ভারত চলিতেছিল—ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তির উপর মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্যস্থাপনই ছিল তার

অন্তরের স্বপ্ন। ভারতের ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার মূলক্ষয় হইল দশম শতাব্দীর গোড়ায়। জগতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আবির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদিক ভাব ও ভাষাই ছিল ভারত-ধর্ম্মের মূল অবলম্বন; দশত শতাব্দীতে তাহা অচল হইল। বস্তুতন্ত্র ধর্ম্ম-জীবনগঠনের প্রয়োজন হইল। অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উহা ত্রিধা বিভক্ত-রূপে পরিণত হইল। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রাচীন

— স্বরূপ —

পুরাণাদিতে যাহা শব্দ মাত্র ছিল, তাহা বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল। আত্মবিচারে দেহের নশ্বরত্ব, দেহ-মধ্যস্থ জীবের অবিনশ্বরত্ব এবং এই উভয় এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব বলিয়া মানুষ ভাবিতে শিখিল। এই ভাবত্রয়ের সবখানি লইয়া মানুষ আপনাকে ব্রহ্মের বিগ্রহ মনে করিল। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই শ্রুতিবাক্য সিদ্ধ করিয়া মানুষ চাহিল জগতে আধিপত্য। ধর্ম্মজীবনের সাধনা এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। এখনও তাহা সম্পূর্ণ হয়

নাই। ভারতের সিদ্ধি তার এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

"ভারতের কৃষ্টির ইতিহাস বেদ হইতে ষড়দর্শনে, পুরাণে,

— প্রজাপতি ব্রহ্মা —

পরিশেষে দশম শতাব্দীতে শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইল। ইহার পর বহু মনীষিগণের ভাষ্য ও হিন্দু-শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যায় ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির হিমালয়-সৃষ্টি হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে পাশ্চাত্যের অর্ব্বাচীন পণ্ডিতগণের মতবাদ, মধ্যভাগে কোমৎ, মিল, স্পেন্সার, হিগেলের মানব-ধর্ম্মের যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং রুশের নিপীড়িত শ্রমিক ও কৃষকের অভ্যুত্থানের ইতিহাসে মার্ক্স, লেনিনের প্রভাব হিন্দু মনীষাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আজ ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শাস্ত্রীয় যুক্তির অসাধারণ বিজ্ঞান ও অমানুষিক অনুভূতি তাই গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। ভারত-সংস্কৃতি মানবতত্ত্বের গুণাবলীর বিশ্লেষণ লইয়াই আবির্ভূত হয় নাই। রূপ ও গুণের ঊর্দ্ধে গুণাতীত অপ্রাকৃত অস্তিত্বের অনুশীলন ভারত করিয়াছে। ভারতের সংস্কৃতি ধর্ম্ম ও ভাগবত তত্ত্বে অনুস্যূত। ইহার যুক্তি অকাট্য, বিজ্ঞান সুস্পষ্ট, অনুভূতি অলৌকিক হইলেও জীবনসিদ্ধ। হাজার বৎসরের সংস্কৃতির ফল্গুধারা এ জাতি উপেক্ষা করিতে পারে না।"

— যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ —

ইহার পরে অতি সুন্দর মনোরম দৃশ্যপট লক্ষ্যে পড়ে। কবি এক অপ্রাকৃত ক্ষেত্ররচনার আপ্রাণ প্রয়াস করিয়াছেন। স্বপ্নপুরীর ন্যায় ফুলে ফুলে ছাওয়া এক কুঞ্জবনে বংশীবদন বাসুদেবমূর্ত্তি। চরণতলে তিনটী দেবীমূর্ত্তি। যেন বাঁশীর নিঃস্বনে রূপসৃষ্টির উৎস-স্বরূপ—এই তিন দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব। জ্যোতির্ম্ময়ী রমণীমূর্ত্তি ধ্যান-স্তিমিত-নয়না, বংশীবদন বাসুদেবের ধ্যানবিভোরা। ইনি স্থিতিময়ী সদংশে সন্ধিনীরূপা। দ্বিতীয় মূর্ত্তি ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্তা। বাঁশীর সুরে সুরে তাঁর উন্মীলিত নয়ন-পল্লব সচকিতা। ইনি চিদংশে চৈতন্যময়ী সংবিৎ শক্তি। আর তাঁরই পার্শ্বে চম্পকবরণা অপূর্ব্বা নারীমূর্ত্তি লীলা-রূপিণী হ্লাদিনীশক্তি। স্বরূপ বিহনে রূপের জন্ম নাই। এই দৃশ্যে চতুর্ব্যূহ বাসুদেব-মূর্ত্তির ইষণায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই ত্রয়ী শক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া যেন রূপের জগতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তাহার পর যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা আমাদের খুব পরিচিত হইলেও, শিল্পবিন্যাসে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। অনন্ত নীল তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে মৃণালদণ্ডে শতদল কমলের উপর রূপের প্রথম দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি প্রজাপতি ব্রহ্মা। এখনও ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। স্তিমিত নয়নে স্বরূপের সূত্র হারাইয়া না যায়, তাহার জন্য তিনি যোগমগ্ন। আবার সৃষ্টির আনন্দে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে 'তপঃ তপঃ' শব্দ শুনিয়া, রচনোন্মুখ হইয়া নয়ন খুলি-খুলি করিয়াও খুলিতে পারিতেছেন না। ইহার পরেই দেখি গোপগৃহে নন্দদুলাল—একটী চরণ ভূতলে, একটী চরণ শূন্যে তুলিয়া নৃত্যপরায়ণ। যশোমতী আনন্দে করতালি দিতেছেন। স্বরূপের পর রূপ। রূপের পর বিগ্রহ। কবি আমাদের এই রূপ দেখাইতে চাহিয়াছেন—পুরুষোত্তমের সর্ব্বোত্তম লীলা যে নরদেহ-ধারণ, এই দৃশ্যে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি-বিগ্রহ—আমি, তুমি, সে, সবই স্বরূপের রূপ। রূপেরই বিগ্রহ। বিগ্রহ হইলেই লীলার কথা মনে আসে। তাই পরবর্ত্তী দৃশ্যে দেখি প্রেমোন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গ যবন হরিদাসকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। লীলা বিগ্রহ-মাত্রেরই আছে। কিন্তু যে লীলা মহত্ত্বপূর্ণ, আত্ম-মাহাত্ম্যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ লীলার একটী চিত্র
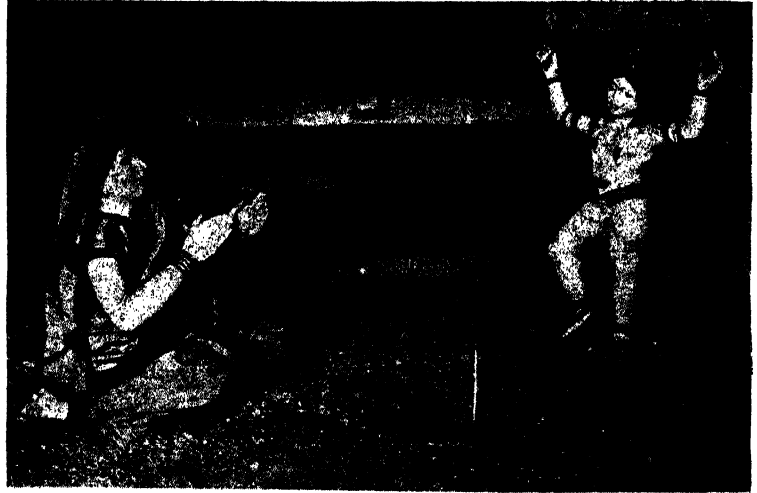
প্রতিফলিত করিয়া স্বপ্নদ্রষ্টা দর্শকদের চিত্তে প্রভূত আনন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লিপিগৃহে যে বাণী লোক-চক্ষের সম্মুখে ধরা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে এই সমগ্র দৃশ্যাবলীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমরা পর পর এই লিপিগুলিও উদ্ধৃত করিতেছি।

"যাহা দৃশ্যমান, তাহা নশ্বর। ইহার সংজ্ঞা শ্রুতি ও গীতায় ক্ষর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যাহা অবিনশ্বর বস্তুর সত্তা, তাহাই অক্ষর বলিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে। আর দৃশ্যমান জগৎ, উহাই মর্ত্ত্য। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সৌরজগতের দৃশ্যমান পদার্থ, তাহা মৃত্যুর

— শ্রীচৈতন্য ও যবন হরিদাস —

অধীন। সকলেরই উৎপত্তি ও নাশ আছে। অক্ষর অমৃত। সূত্র যেমন আশ্রয়-বস্তু, ইহা অক্ষরের উপমা। উহাতে যেন মণিগণ গ্রথিত, ইহাই সৃষ্টি। ক্ষরাক্ষর-সংযুক্ত এই বিশ্বের মূল তত্ত্ব পুরুষোত্তম।

বাঙ্গালী এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিল। কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে তাই মন্ত্রধ্বনি উঠিয়াছিল—

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাছিয়া লহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
মানুষ সংস্কার-দেহ॥

সহজ মানুষ গীতার পুরুষোত্তম। অযোনি মানুষ অক্ষর, অমৃত তত্ত্ব। মানুষ সংস্কার দেহ নশ্বর ক্ষরেরই নামান্তর। শক্তিসাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

কে জানে রে কালী কেমন?
কালী পদ্মবনে হংস সনে
হংসীরূপে করে রমণ।

পদ্মবন নশ্বর সৃষ্টি, ক্ষর ব্রহ্ম। কালী অবিনশ্বর অক্ষর তত্ত্ব। হংস পুরুষোত্তম।

এই যুগের বাঙ্গালী জাতি এই পরমানুভূতি কি বিসর্জ্জন দিবে?

"দেহেরই নাম। দেহী অনামী। নাম ধরিয়া ডাকিলে অনামীই সাড়া দেয়। নাম ভালবাসিলে অনামীকেই ভালবাসা হয়। দেহ ও দেহী, নাম ও নামী বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অধিগত করার ইহাই সাধনা। নাম ধরিয়াই অনামীর অনুভূতি। তাই পতঞ্জলীর সূত্র-রচনা, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। দার্শনিক গ্রন্থ তন্ত্রের শব্দমন্ত্রে পৌছিয়াই শেষ হইয়াছে। গীতায় উহা স্পর্শে, রূপে, রসে অবতরণ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তমের নর-বিগ্রহের মহিম্নস্তুতি উচ্চারিত হইয়াছে। যে জ্ঞান কর্ম্মে অন্বিত হইয়া শ্রুতিমাত্র ছিল, ভাগবতে তাহা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলিয়া জাতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্ব, মর্ত্ত্য ও অমৃত এই উভয়াত্মক পুরুষোত্তম-তত্ত্ব শুধু নিদিধ্যাসিতব্য হইয়া রহিল না—বসুদেবাত্মজ বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বোত্তম নর-লীলায় পরিণত হইল। এই দেহেই অমৃতস্বরূপ দেহী বিদ্যমান। এই উভয়াত্মক পরমানুভূতির পরাকাষ্ঠা পুরুষোত্তমে। এ জাতির পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, তনয়,

তনয়া, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্বেরই বিগ্রহ। পূর্ব্বে কর্ম্ম জ্ঞানে অন্বিত হইয়াছিল; এই মানুষের চরম অনুভূতিতে কর্ম্ম জ্ঞানে লয় পাইয়া, অমিশ্রা ভক্তির রসায়নে মানুষ চিনিল আপনাকে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ গাহিলেন—

সেই ত পরাণনাথে পাইনু,
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।

"বেদের অর্থ হিন্দু ভারত এই হাজার বৎসরে যেমন বুঝিয়াছে, এমন কোন যুগে বুঝে নাই। ভারতের পরাধীনতা জাতির আত্মসমাহিত ধ্যানমূর্ত্তির লক্ষণ মাত্র। আপনাকে বুঝিতে গিয়া বৈষয়িক নিশ্চেষ্টতা তাহাকে শ্রীহীন করিয়াছে। ভারতের অন্তর্যোগে অভিনব জগতের যে রূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা মূর্ত্তি লওয়ার সুদিন অদূরাগত। বেদের কর্ম্ম ছিল স্বর্গসুখাদিপ্রাপ্তির হেতু, জ্ঞান ছিল জীবন হইতে মুক্তির সেতু। সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। স্বর্গ-কামনা, মোক্ষকামনা স্রষ্টার থাকে না। স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান ক্রমেই দৃঢ় হইয়া মানুষ আপনার সত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিতে শিখিয়াছে, 'যাহা করি, যাহা খাই, সবই ব্রহ্মকর্ম্ম।' ভাগবত ধর্ম্ম—জ্ঞান, আত্মচৈতন্যের অপ্রতিহত জাগরণ। নরের মধ্যে নারায়ণ। তাই সবার উপরে মানুষের মহিমাকীর্ত্তনে কবির কণ্ঠ মুখরিত। তুরীয় চৈতন্যরূপের রসায়ণ, বিগ্রহে ও লীলায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বাসুদেবের সর্ব্বোত্তম নর-লীলায় নব নব তীর্থ-রচনার লীলারঙ্গ। মানুষই ঈশ্বর-বিগ্রহ। এ ভারত তাই বৈকুণ্ঠ। ভারতের মন বৃন্দাবন। এই অপার্থিব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভারতের যে বিগ্রহ, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ভারত আপনাকে প্রকাশ করিতেছে—অদৃশ্য জগতের সীমাহীন ঐশ্বর্য্য স্তরে স্তরে প্রকাশ করিয়া। ভারতরাজ্য এই সংস্কৃতির উপরই গড়িয়া উঠিবে।"

"দেহ ও দেহীকে লইয়াই ধর্ম্মের বিগ্রহ। ইহা পূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্ব। অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে বিশ্বের সত্য মানুষের মনীষায় অবধৃত। প্রতি দেহকে ক্ষর, দেহীকে অক্ষর এই উভয়াত্মক চৈতন্যকে পুরুষোত্তম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সমগ্র তত্ত্বই প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত। অনুভূতির পথ সাধন। সাধন আত্মসমর্পণ—পূর্ণতত্ত্ব নরে। তত্ত্বানুভূতি তাই নরদেবের শরণে। শরণের বস্তু মানুষ—কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ, নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ, আর হিন্দুভারতের ঘরে ঘরে পিতা, মাতা, পতি, ইষ্টমূর্ত্তি সবই শরণের বস্তু। পুরুষোত্তম স্বরূপ-বস্তু। রূপ তার অবিনশ্বর আত্মার। রূপ-বিগ্রহ নরদেহে। বিগ্রহের কর্ম্ম সংসারধর্ম্মে। তাই কবি নরোত্তম গাহিয়াছেন, "সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহারই স্বরূপ।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন

গুরুজনের আশ্রয়েই আত্মচৈতন্যের অভ্যুত্থান হীনতার, সঙ্কীর্ণতার মহাতর্পণ, অহঙ্কারের বিসর্জ্জন। ভারতের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব জীবনের শ্রেয়ঃসাধন ও অভ্যুত্থানের অদ্বিতীয় কারণ। ভারতের এই সংস্কৃতি ও কৃষ্টি অর্ব্বাচীন যুগের অন্ধতা বলিয়া যেখানে অস্বীকৃত, মৃত্যু সেখানে অনিবার্য্য।

ভারতের ধর্ম্ম — ঈশ্বরধর্ম্ম। ইহা বস্তুতন্ত্র, মূর্ত্ত ও জীবন্ত। ইহা যুক্তি ও বিজ্ঞান সঙ্গত। অলৌকিক ইন্দ্রজাল ইহা নহে।

দৃশ্যমান স্তরের পশ্চাতে অদৃশ্য স্তরবিন্যাস যুক্তি ও অনুভূতির সাহায্যে ভারতের ঋষি আত্মদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা স্বরূপ, তাহাই রূপ। স্বরূপের যে রূপ, তাহা অমৃত অসীম। তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিগ্রহমূর্ত্তি-জীবদেহের সৃষ্টি। কাল, ধর্ম্ম ও উপাদানভূত গুণের অধীন এই শরীর। তাই তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইলে, শরীরের ধ্বংস হয়। যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ কর্ম্ম। কর্ম্মই লীলা।

অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব, স্বরূপ-রূপ, বিগ্রহ-লীলা, এই চতুর্ব্যূহ বস্তুতন্ত্র মূর্ত্তির মধ্যেই নিহিত। ভারতের এই অমৃতজ্ঞান কি মোহে অর্ব্বাচীন যুগ অস্বীকার করিবে! বাসুদেব স্বরূপ। সঙ্কর্ষণ রূপ। প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মন ও অহঙ্কারের সমবায়ে কালধর্ম্মের, জীবধর্ম্মের নিয়ামক। এই আত্মজ্ঞানের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে উদীয়মান যুগকে আহ্বান করিয়া পাঞ্চজন্য ধ্বনি উঠিতেছে "মামকেং শরণং

ব্রহ্ম।" আপনাকে জানিয়া, আপনাকে পাইয়া, সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে লীলায়িত হও। ভারতের সংজ্ঞা ও সূত্র ভাবে, ভাষায় রূপ দান করিয়া মহাতীর্থে পরিণত কর। উদীয়মান তরুণ, উত্তিষ্ঠত।

বিগত সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার কথা নব নব ছন্দে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে"র এই অক্ষয়া তৃতীয়ার উৎসবক্ষেত্রে প্রকাশ করা হইতেছে। এবার অন্যূন পঞ্চাশ হাজার নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন। মেলা ও প্রদর্শনীতে লোক-শিক্ষার এই সুমহতী প্রচেষ্টা "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে"র পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় ভারতের অধ্যাত্মসাধনরহস্যের মর্ম্মপ্রকাশ করিতে গিয়া চিত্রে ও মডেলে ইহার অভিনব রূপ ও অধ্যাত্ম-ভাষা দিয়াছেন। উৎসবের সমাপ্তি দিবসে সমাগত সকলের সম্মুখে তিনি এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া যে এক গভীর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করেন, তাহারই অবিকল প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল। আজিকার আত্মবিস্মৃত মানসিক অরাজকতার দিনে ধর্ম্ম-রহস্যের উপর তাঁহার এই প্রজ্ঞালোকপাতের জন্য উদীয়মান ভারত-জাতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

পার্থক্য

শ্রীমতী ঊর্ম্মিমালা দেবী (ঠাকুর)

কলেজ ফের্‌তা—

সহপাঠী অমিতাভ আজ আমায় প্রথম তাদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

অমিতাভ অর্থবানের উত্তরাধিকারী, আর আমি অতি সাধারণ বাঙালীঘরের ছেলে; কিন্তু তাহলেও সে আমায় বন্ধু বলতে আগ্রহশীল, যেহেতু আমার নাকি 'হৃদয় ও মস্তিষ্ক বেশ উন্নতশ্রেণী'র এবং অমিতাভও অত্যন্ত অমায়িক ও সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন,—অন্ততঃ ছাত্রমহলে আমাদের সম্বন্ধে এইরকমই খ্যাতি শুনতে পাওয়া যায়!…

নিজের 'প্রাসাদে' পৌছেই সে সর্ব্বপ্রথমে আমায় তার দাদুর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে চললো।

একটা ঘরের দরজার সামনে এসেই, সে মুক্তকণ্ঠে হাঁক দিয়ে উঠ্‌ল: 'দাদু—ও দাদু! আমার বন্ধু—এই শিবব্রত সর্ব্বাধিকারীকে ধরে এনেছি, নাও বরণ কর!'

সামনেই আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত, রেশমবস্ত্রের লম্বা কোট ও ঢিলা ইজার পরিহিত, এক সৌম্য-দর্শন 'সুন্দর বৃদ্ধ';—কোলে একটা খোলা বই, হাতে চশমাটিকে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছছেন। … ইনি বৃদ্ধ হলেও বিশীর্ণ ও শ্রীহীন নহেন, পরন্তু ইনি যে এককালে অসাধারণ রূপবান ছিলেন—তাহা ইহাকে দেখিবামাত্র উপলব্ধি হয়। — মোটকথা, এহেন সুখ-সঞ্জীবিত বৃদ্ধকে দেখে বিরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক বরং ভক্তি আসাই স্বাভাবিক … আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলাম।

দাদু প্রসন্নহাস্যে 'বসো—বসো' বলে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিলেন, … তারপরেই চশমা মোছায় মনোনিবেশ করলেন …

তা' করুন,—আমার মনে তা' লাগলো না। বরং ভাবলাম—এ'ও একরকম অভিজাতীয় অভ্যাস,—বাচালের মত বক্‌বক্ না করে—শুধু আশীর্ব্বাদপূর্ণ হাসি দিয়েই প্রীতি-স্থাপন করা।

তবু একটু অস্বস্তি হতে লাগলো।— আমি সাহস করে সহাস্যে বললাম—'আপনার মতো দাদু পাওয়া যাবে জানলে আমি অনেকদিন আগেই আস্‌তুম,—অমিতাভ'র জানান উচিত ছিল!'

এবারেও দাদু সকরুণ হাস্যে মৃদু মৃদু মাথাটা দোলাতে লাগলেন, ভাবটা যেন এই—'তোমরা যে যা' বলছ সবই ঠিক!'

আমি একটু অবাক হ'লাম; ভাবলাম—হয়তো দাদু কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে

অমিতাভ শুধু মৃদু মৃদু হাসছে ... তার দিকে একবার দেখে নিয়েই, কথাটা আর একটু পরিষ্কার করবার জন্য বললাম —'অমিত আমায় অনেকদিনই আনতে চাইছে, কিন্তু না এসে আমিই ঠকেছি!'

দাদু আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে রয়েছিলেন,— হঠাৎ তিনি অত্যন্ত ম্লান হাসি হেসে, মাথাটা এপাশ ওপাশ নাড়তে নাড়তে ধীর ও আহত স্বরে বললেন—'কী-ই— তোমরা বলছ দাদা,—কিছুই শুনতে পাচ্ছি না ... কালা মানুষ আমি ...!'

আমার গালে যেন কে চড় বসিয়ে দিলে!

ওঁকে অপদস্থ করার অপরাধবোধে, আমি মর্ম্মে মরে যেতে লাগলাম। অমিতের দিকে একবার সতিরস্কার কটাক্ষপাত করে নিয়েই, তাড়াতাড়ি আমি দুই হস্ত মর্দ্দন করতে করতে দাদুকে স্পষ্ট ও অনুতাপস্বরে বললাম— 'আমায় মাপ করবেন দাদু—আপনারা এখন কাণে কম তো শুনবেনই; কিন্তু না বুঝে আমিই আপনার অখণ্ড শান্তির উপর উপদ্রব করছিলাম...'

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে তিনি ক্ষমার সুরে বললেন— 'তোমরা নিজেরা এবার গল্প সল্প কর ভাই!—হ্যাঁ গো অমিত, তোমরা আজ জল খাবে না? ও বেচারাকে তো কলেজ থেকে টেনে এনেছিস্, মুখ হাত ধু'তে দে!—

হাসতে হাসতে অমিত আমার হাত ধরে টান দিলে; সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে পড়ে, দাদুকে আর একবার সভক্তি প্রমাণ দিয়ে, বন্ধুর অনুসরণ করলাম।

দাদুর দরজার বাইরে একটী ভৃত্য বসে হাজিরা দিচ্ছিল, —অমিত তাকে ডেকে বলে এল—'ওরে, পঞ্চুকে ডেকে দে তো,—কোন্ দেশে সে আবার বসে রইল!'

তারপর সে আমায় অন্য একটী ঘরে এনে বসালে।

আমি লজ্জিতভাবে তাকে বললাম—'দেখ দিকি অমিত, আমারই একটু বোঝা উচিৎ ছিল যে, উনি কাণে কম শুনতেও পারেন, তার উপর বুড়ো হয়েছেন– শুনতে তো পাবেনই না!'

অমিত এবার বেশ গভীরস্বরে বললে—'না রে না— বুড়ো বয়সের জন্যও নয়, আর শুধু 'কম শোনাও নয়; দাদু বেচারী যুবা বয়স থেকেই শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন। কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, আর দাঙ্গা করার স্বরে কথা না বললে দাদু শুনতেই পান না!—এই যে এত গানবাজনার রেকর্ড, আমরা নাতি-নাত্নীরাও প্রত্যেকেই সঙ্গীত চর্চ্চা করে থাকি, কিন্তু দাদু—একদিনের জন্যও কিছুই,—কারো গলাও ভাল করে শুনতেই পাননি আজ পর্য্যন্ত। ... সন্ধ্যায় আমাদের গানের আসর জমে, দাদুকেও এসে বসতে হয়, কিন্তু বৃথা,—উদাস চোখে শুধুই এক একবার চেয়ে চেয়ে দেখেন; তারপর— চেষ্টা করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের 'যোগবাশিষ্ঠ'খানার মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে মন ডুবিয়ে দেন ...!'

অনুযোগের আর্দ্রস্বরে আমি এবার বললাম—'আমায় তোমার তাহলে বলা উচিৎ ছিল ভাই, যে, জোরে কথা কও!... অজান্তে অপমান করে ফেললুম, দাদুকে হয়তো কতটা ব্যথা মনে করিয়ে দেওয়া হোল;—কি রকম কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন দেখলে না?'

চিন্তা-যুক্ত হয়ে অমিত বললে—'ও তো প্রতিনিয়তই দেখছি!... উনি জানেন,—সকলেই চেঁচিয়ে কথা বলতে বিরক্ত হয়, আর ওঁকে এড়িয়ে চলে। এমন কি যে চাকরগুলির মুখাপেক্ষা করেও ওঁকে চলতে হয়—তারা যতই সভয় সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলুক, তবু তারাও যে তারস্বরে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কর্ত্তামশায়কে একটী জঞ্জাল ভেবে হাসে, তা'ও উনি নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারেন!... এত যে সম্মান দাদুর, এমন যে ভাগ্য, তবুও দাদুকে প্রতিপদে দুঃখিত হয়ে পড়তে হয়;—প্রত্যেকের কাছেই যেন কিছু ছোট হয়ে থাকতে হয়!...'

আমিও আফ্শোষের সঙ্গে, সাগ্রহে বলে উঠলাম— 'সত্যি, দাদুকে ভগবান আর সবই অকৃপণ হাতে ঢেলেছেন! —অমন রূপ আমি দেখিনি; দু'চোখের পাত্র ভরে— নির্নিমেষে যেন ওঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যকে তরল সুধার মত পান করছিলাম!'

বিষণ্ণ হাসি হেসে সে বললে—'এতো ধ্বংসাবশেষ! সকলে বলে—আমাদের বাড়ীতে যখন মাতৃমূর্ত্তি পূজা হ'ত —তখন ওঁর অপূর্ব্ব চেহারার জন্য আমার প্রপিতামহ আদেশ দিয়েছিলেন—ঐ ছেলের মুখের মত করে কার্ত্তিকের

মুখের ছাঁচ গড়তে হবে ... আর সেই আদেশই শেষ পর্য্যন্ত চলে এসেছিল !··· কেবল ঐ একটী বিষয়েই ভগবান মানুষটীকে পঙ্গু করে মেরেছেন।'

এ হেন ভাগ্যবান দাদুর প্রাণে যে কত সহজেই আত্মাভিমানের আঘাত লাগতে পারে—তা' সহজেই অনুভব করতে পেরে তারই সহজ সমব্যথায় এবং লজ্জিত দাদুর সঙ্গে আমারও একাত্মবোধের লজ্জায়, সত্যই আমার নিশ্বাস—টেনে তোলবার মতই ভারী হয়ে উঠ্‌ল। ···

দ্বারের বাহির থেকে কোনো একজন, যেন সভয়ে নিজের ছায়াটুকু শুধু নাড়িয়ে ও বাড়িয়ে—নিজের উপস্থিতি নিবেদন করছে মনে হ'ল। তারপরই ছায়ার কায়া পায়ে পায়ে একটু সামনে এসে, মনিবের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে না বলেই যেন, কোমর ভেঙ্গে—পিঠ ও মাথা নীচু ক'রে, যুক্তকরে দাঁড়াল।

অমিত এবার দেখতে পেয়ে, হাঁক দিয়ে জোর গলায় বললে—'কোথায় ছিলেন পঞ্চুবাবু ? ... নে, এই কোট আর জুতো রেখে চটিটা এনে দে ; আর এই বারান্দায় গাড়ু, চিলিমচে সব আন্‌,—আমাদের জল খাবার এখানে পাঠাতে বল,—বুঝ্‌লি ?'

অমিতকে জামা জুতা ছাড়তে দেখেই, পঞ্চু কুঁজো হয়েই এগিয়ে এসে সেগুলি খুলে নিলে ; নিয়ে আবার সে বাইরে গিয়ে পুর্ব্বের মত পিঠ পেতে দাঁড়াল।

অমিত এবার অধৈয্য হয়ে উঠ্‌ল, সে চেঁচিয়ে উঠে বললে—'কিরে, আবার শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে উটের মত দাঁড়ালি কেন ? ও ! — এখনও বুঝতে পারনি বুঝি ! —উঃ, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, তুমি আর আমার কাজে এস না বাপু ! ... ব্যাটা কালার ডিম কালা, তুই কি আর ইহজন্মে শুনতে পাবি ? যা—যা—তোর লক্ষ্মণকে ডেকে দে—'

পঞ্চু ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গিয়ে, একবার অমিত ও একবার এই নূতন মানুষটীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইছিল বারবার। তার 'বোকা খোকা'র মত ভাব দেখে ও অমিতের কথার বিচিত্র ধরণ শুনে আমার দারুণ হাসির উদ্রেক হল ; আমি সশব্দে হেসে ফেলতেই, পঞ্চুও অমনি ওর রুক্ষদর্শন কুশ্রী মুখখানাকে যথাসম্ভব প্রসন্নতায় পরিবর্ত্তিত ক'রে, দন্তপাঁতি বিকশিত করে—নীরবে একটু হেসে দিয়ে সরে গেল।

অমিতও হেসে ফেলে বললে—'দেখ্‌লে তো, ব্যাটা নির্লজ্জ বেহায়া ! যতই বল না কেন, ও ঠিক শেষকালে হাসিমুখে সব উড়িয়ে দেবে ; ইজ্জৎবোধ কিছুমাত্র যেন নেই !—তা নয়, ব্যাটা ন্যাকার ধাড়ি ! ঐতেই তো আরো বিরক্তি বাড়ে।'

সেকথা ঘুরিয়ে নিয়ে, আমি হাসতে হাসতে বললাম—'কিন্তু ইহজন্মে শুনতে না পারার পক্ষে যা' অদ্ভুত যুক্তি তুমি ঝাড়লে,—তা শুনে আমার এখনও হাসি পাচ্ছে—'

সে আরো হেসে বললে—'আরে, কথাটা সত্যিই বলেছি যে ! ওর বাপও বদ্ধ কালা ছিল, সারাজীবন আমাদের এই দুর্ভোগ ভুগিয়ে গেলে ;—আবার ইনি সেই পদে বহাল হয়ে, ঠিক সেই ভাবেই 'তরুণ জীবন যাত্রা' সুরু করেছেন ! ঐ জন্যেও হতভাগার সঙ্গে বাড়ীর সকলেরই ঝগড়া বকাবকি লেগেই আছে -- ওর দলের চাকর, বামুন, ঝি—কারোরই বনে না !—কে কত সইতে পারবে বলো ?—এমন কি ওর জন্যে রামকে লক্ষ্মণ করে দিতে হয়েছে !—যদি বলে—পঞ্চু, রামকে ডেকে দে—, তাহলেও গম্ভীর হয়ে মাথা নীচু করে উত্তর দেবে—আজ্ঞে, 'কাণ কেটে দে'—একশ' বার বলতে পারেন, হাজারবার বলতে পারেন, লজ্জায় আমারি কাণ কাটতে ইচ্ছে করে···

—নিপুণ ভাবভঙ্গি সহকারে পঞ্চুর এই অবান্তর আত্মধিকারের অভিনয় করে দিয়ে, উপসংহারে অমিতাভ হা—হা—শব্দে হাসতে লাগল—

সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহা প্রচুরভাবে উপভোগ করে এবং পঞ্চুর অনুমানের কথা বোঝবার তীক্ষ্ণশক্তির এ হেন পরিচয় পেয়ে, একবার প্রাণ খুলে উচ্চশব্দে হাসতে লাগলাম ··

কিছুক্ষণ আগের জমে-ওঠা ব্যথা ও অপরাধ বোধের ভারী মেঘটা কেটে গিয়ে, মনটা তখনকার মত হাল্কা হয়ে উঠ্‌লো।

নারী-সমস্যা

শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত

যখন আমরা নারীর আদর্শ বলিতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর উল্লেখ করিতাম, তখন এক কথায় এই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। কেন না হিন্দুশাস্ত্রে নারীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। নারীর ধর্ম্মই ছিল মাতার আসন অধিকার করা। এই আদর্শে সাধ্বী ও ভোগ্যা নারী, এই দুই নামে অভিহিত হইত। উত্তমা সাধ্বীর অন্তরে নিঃস্বার্থ পতিপ্রেমের শতদল বিকশিত থাকিত। সীতা, সাবিত্রী এই ছাঁচে গড়া। পুরাণাদিতে পতিব্রতা নারীর বিবরণ প্রচুর পাওয়া যায়। মধ্যমা ভোগ্যা নারী ভোগ্য বিষয় পাইলে পুরুষের সেবা করে, হিন্দুধর্ম্মে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মিলে। তৃতীয় নিকৃষ্ট নারী—কুলটা। এই শ্রেণীর নারীর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতএব সাধ্বী নারী হওয়াই ছিল নারীজাতির লক্ষ্য। আজও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই—তবে অবস্থা বিপর্য্যয়ে নারীর এই একমাত্র লক্ষ্য পাতিব্রত্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে আজ আর গৃহীত হয় না। হিন্দু-সমাজে পতিহীনা নারীও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সহিত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করে। কিন্তু বিধবার সংখ্যার উপর দেশে আজ কুমারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের লক্ষ্য কি হইবে?

গার্গী, খনা, লীলাবতী, বিদুষী নারীর আদর্শ আমরা সম্মুখে পাই, কিন্তু ইহাদেরও জীবন পতিকে আশ্রয় করিয়াই লীলায়ত হইয়াছিল। কৌমার্য্য, অবস্থার দায়। হিন্দু-জাতির ইহা ধর্ম্ম নয়। বার বৎসরের অধিক হিন্দু-ঘরে কুমারী রাখার প্রথা বিশ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল না। কিন্তু সমস্যা অধুনা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বৌদ্ধযুগে সঙ্ঘমিত্রার ন্যায় অনেক ব্রতপরায়ণা কুমারী জীবনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই। আমাদের দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন গড়িয়া উঠার পূর্ব্বেও এই শ্রেণীর আদর্শ-কুমারীর কোন কোন সদ্গুরুর আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। মাতাজী তপস্বিনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলায় এ পর্য্যন্ত কোন যশস্বিনী কুমারীর খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত নহে, অথচ কুমারীর সংখ্যাই আমাদের দেশে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছ।

ভারতের নারী-আদর্শ একমাত্র সাধ্বী হইলেও সমস্যার সমাধান সহজে হইত। সাধ্বীর জীবন তপস্যাপূতা হওয়ায় সতত নিষ্কলুষ। সকল প্রকার দুঃখ এইখানে হেয় হইয়া থাকে। গার্হস্থ্যজীবন যেখানে নারীর লক্ষ্য—সেখানে তাহার এইরূপ যশোময় জীবনই আদর্শ হওয়া উচিত। সাধ্বীর বৈধব্যও অসহায়রূপ নহে। সাধ্বী পতিহীনা হইলেও ভর্ত্তার আত্মাকে অমর জানিয়া যে অধ্যাত্ম-জীবন যাপন করে, তাহাতে সমস্যা ঠাঁই পায় না, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। যাহারা ভোগ-সুখের লালসায় গৃহধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, তাহারা দুঃখের বীজও গোড়া হইতে হৃদয়ে বপন করে। উত্তমাদর্শ ছাড়িয়া নারী অন্য কিছু আশ্রয় করিলে তাহার জন্য সে স্বয়ং দায়ী, এইখানে আমাদের কোন কথা নাই।

বিধাতা নারীকে দুর্ব্বলা করিয়াই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। নারী-প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই মনীষীরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নারীকে বিশ্বাস করাও দায়ের কথা বলিয়া নারী হইতে পুরুষকে সতর্ক রাখার শাস্ত্রবাণীও কম নাই, ইহার প্রতিবাদ করিব না। ভুয়োদর্শনে নারী-চরিত্র এইরূপ প্রসিদ্ধি যদি পাইয়া থাকে, সে অপরাধ নারীর নহে, বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল। আর পুরুষের প্রতি নারীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা রক্ষা উত্তমা নারীর ধর্ম্ম হওয়ায়, এইখানে ত্যাগ ও তপস্যার বিনিময়ে তাহাকে যে আঘাত সহিতে হয়, কাজেই নারীকে দুর্জ্ঞেয়া ও তাহার আচার ব্যবহারের প্রতি পুরুষের সংশয় দৃষ্টি অসঙ্গত কথা কিছু নহে। আমরা অনেক কিছু সহিতেছি, শাস্ত্রের বিশ্লেষণ তিক্ত ও কটু হইলেও, আমরা তাহা গলধঃকরণ করিব।

সমাজে শিক্ষার অভাব, অর্থের অভাব। নারীর প্রতি আত্মীয়স্বজনের পরুষ ব্যবহার, এই সকল দায়ের কথা লইয়া আমরা সময় ক্ষয় করিব না। নারী যে আজ সাধ্বীধর্ম্ম রক্ষায় অসমর্থ হইতেছে, ভোগবঞ্চিতা হইয়া প্রতিদিন ঘরে ঘরে মৃত্যুবরণ করিয়া লইতেছে, এই সকল কথা প্রতিদিনের ঘটনা—ইহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা, আলোচনা আন্দোলনে ইহার প্রতিকার সম্ভব নহে। অবস্থার পীড়ন সমগ্র দেশের উপর, জাতির উপর চাপিয়া বসিয়াছে, ব্যক্তিগত ভাবে এই ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ অবস্থান্তর আনিতে পারেন, তাহাতে সমষ্টি জীবনের সমাধান হইবে না। নারী পুরুষ লইয়া সংযুক্ত সমাজ জীবন যেদিন কোটীবন্ধন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে সেইদিনই সত্যকার প্রতিকার মিলিবে। নতুবা বাঁচার জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের কণ্ঠে পরিত্রাহি চীৎকার উঠিতে থাকিবে। দুঃখ ও নির্য্যাতনের সমাধান খুব বড় কথা। সমাজজীবন সচেতন হইয়া নিরাময় অবস্থা লাভ করুক, এই প্রার্থনা আমরাও করি।

কুমারী জীবনের সমস্যার কথাটা বড় করিয়া ধরার যত্নই উপক্রম করি—সধবা, বিধবা, কুমারী, নিখিল নারীজাতির সমস্যা অখণ্ডাকারে ভয় দেখায়। বিবাহিতা নারীও স্থির লক্ষ্যে চলিতেছে না, কুমারীর ন্যায় দেশের অসংখ্য বিধবাও আজ লক্ষ্যহীনা। দারিদ্র্যের আঘাতে যেন আমাদের কোন আদর্শই স্থির থাকে না, দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষকে বাধ্য হইয়া আগাইয়া চলিতে

। সমাজে সৌভাগ্যবতী বিবাহিতা ও বিধবা দুইই আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যপীড়িতার সংখ্যাই অধিক। নিখিল নারীর সমস্যার কথাই তাই উল্লেখ করিতেছি।

দারিদ্র্য দূর করার জন্য পুরুষের জাগরণের যেমন তাগিদ আছে, নারীও সে তাগিদ তেমনই পাইতেছে। এই ক্ষেত্রে পুরুষ সর্ব্বাগ্রে অসহায় হইয়া মুখ ফিরাইতেছে, এই লক্ষ্যে নারীপ্রগতিও অচিরে মুখ ফিরাইবে। প্রশ্ন করি—দারিদ্র্যই কি আমাদের দুঃখ? অথবা প্রকৃত দুঃখের ইহা লক্ষণ?

যদি ইহাই হয় তাহা হইলে সংসারে নারীর নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, সমাজের অত্যাচার সবই অন্তর্নিহিত কোন দুঃখের লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে, অতএব সেই মৌলিক দুঃখটী নিরাকৃত করিতে পারিলে, নারীরা সকল অবস্থায় সুখী হইতে পারে। সেই দুঃখটি কি? আমরা মনে করি—আমরা নারীর ধর্ম্ম হারাইয়াছি। নারীর হৃদয়বৃত্তি—স্নেহ ও প্রেম। উহা স্বার্থে ও কামে পরিণত হইয়াছে। আমরা স্নেহ করিতে ভুলিয়াছি, স্নেহের নামে যাহা করি, স্বার্থ তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়। আমরা ভালবাসা ভুলিয়াছি, ভালবাসার নামে যাহা কিছু আশ্রয় করি, কামই সেখানে আশ্রয় পায়। এইখানে যদি আমরা স্বভাব ও স্বধর্ম্ম ফিরিয়া পাই, পতিগৃহে আমরা সাধ্বী হইয়া থাকিব। সমাজে বৈধব্য নিষ্ঠুর হইলেও, আমরা এই অবস্থায় ব্রতচারিণী হইয়া দেশের ও সমাজের সেবায় যশোলাভ করিব। অবিবাহিত থাকিতে হইলেও আমরা খাঁটি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া জাতির কল্যাণ সাধনায় নিজেদের উৎসর্গ করিতে পারিব। অন্তর যদি শ্রেয়ঃ মূর্ত্তি ধরে, নির্ম্মল ও সুন্দর হয়, বাহিরে তাহাই শ্রী ও শক্তিরূপে প্রকাশ পাইবে। এই দিকেই আমরা নিখিল নারীজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কালের আবর্ত্তে আমাদের শ্রী ও আচারের পার্থক্য হইয়াছে, কিন্তু জাতির মূলগত সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। নারীও মানুষ, মানবতার যে সংস্কৃতি, যে ভাবের অমরবীর্য্য তাহাই নারীর শিক্ষা ও সাধনার আদর্শ হইবে।

নারীর জীবন পুরুষের চেয়ে খর্ব্ব। নারী ত্রয়োদশ বর্ষে যৌবন লাভ করে, চতুর্দ্দশ বৎসরে নায়িকা মূর্ত্তি ধরে, পঞ্চদশ বর্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ হয়। ষোড়শ বর্ষে সন্তানজননী হইয়া থাকে। দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিশ বৎসরকাল নারী-ধর্ম্মের আয়ুঃ। এইহেতু নারীকে কৈশোরে স্থির করিয়া লইতে হইবে—তাহার জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। এই অন্তর-বিজ্ঞান মলিন হওয়ায় নারী স্বয়ং আপনার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া উন্মার্গগামী হইতেছে। জননী যাঁহারা, সন্তানের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের আজ মাথা তুলিতে হইবে। কন্যার ত্রয়োদশ বর্ষে পরিণয় যদি সম্ভব না হয়, তবে তাহাদের এমন করিয়া মানুষ করিতে হইবে যেন তাহারা জীবনের ব্যাপ্তির সন্ধান পায়। জীবন সঙ্কীর্ণ রাখিয়া এই যে বাধ্যতামূলক কৌমার্য্য, বৈধব্য অথবা গার্হস্থ্য-জীবন, সবই বিষময় হইবে। নারীর শিক্ষা শুধুই সঙ্গীত-বিদ্যা নহে, ভাষাজ্ঞান নহে, শিল্প-চাতুর্য্য নহে, এই সকল অর্থকরী হইতে পারে। নারীর সুখ অর্থে নাই, আছে মাতৃত্বে। আছে তার স্নেহপ্রেম শতদল-বিকাশে। ই শিক্ষার সাধনার ক্ষেত্র রচনার দিকে পুরুষের দৃষ্টি নাই। নারীর দায়ভার লঘু করার জন্য পুরুষেরা নারীকে অর্থকরী শিক্ষার প্রলোভন দেখাইতেছে। চির অবলা নারী-জাতি চলিয়াছে গড্ডলিকা প্রবাহের মত, তাহাদের সঙ্কেতে অর্থই আজ তাহার আশ্রয় মনে হইতেছে, স্বর্ণালঙ্কারে অঙ্গ ভরাইয়া রাজহংসীর ন্যায় চলিয়াছে সে গর্ব্বোন্নত হৃদয়ে। মাতৃত্বের হাহাকার সে বুকে চাপিতেছে, স্নেহ-প্রেমের শতদল পদদলিত করিতেছে। স্বগুণ হারাইয়া নারীর বুকে একদা যে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার উঠিবে তাহা আর নীরব হইবে না।

আমরা মায়ের জাতি, বিশ্বের শুভ কামনায় আজ আমাদের যোষিৎ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া মহা ভৈরবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে। নারীর শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার ভার আমাদেরই হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্ব্বাচীন যুগের নারী-প্রগতির প্রবল স্রোত রুদ্ধ করিয়া আমাদের নারীধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, সেদিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অন্নদার সিদ্ধমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। দারিদ্র্য দৈন্য আমাদের আশ্রয় করিয়া ভয় দেখায় মাত্র। ভয়ে ভয়ে আমরা পিছাইতে পিছাইতে ভয়ের বিরাট্ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছি। আমরা তাই নারীজাতিকে বলিব—আমরা ঘরে ফিরিব। আমরা দাবী জানাইব—ত্রয়োদশ বর্ষে আমাদের পরিণয় চাই। ষোড়শ বর্ষে আমরা মাতৃমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চাহি। পুরুষের হৃদয়ে অন্নদার লক্ষ্মীশ্রী জাগ্রত করিয়া আমরা মায়ের ঘরে মৃত্তিকালিপ্ত প্রাঙ্গণে শুভ আলিপনা দিয়া শ্রীকে আহ্বান করিব। এই কর্ম্মই নারীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। ইহার জন্য আমাদের যদি কৌমার্য্য প্রয়োজন হয় তাহা ধর্ম্ম নহে, জাতির মাতৃত্বের জন্য সেটা হইবে আমাদের স্নেহ ও প্রেমের দায়। আমরা প্রাচীনপন্থীর ন্যায় নারীজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিব। কিন্তু উহা সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটারূপে নহে—সমাজের প্রকৃত রূপ সধবা, বিধবা ও কুমারী রূপে। এই লক্ষ্যে অবস্থাক্রমে এই ক্রমত্রয়ে চলিয়াছে নারীর স্নেহ, প্রেম ও মাতৃত্বের সাধনা। এই একনিষ্ঠ সাধনাই আমাদের সর্ব্বাবস্থায় সুন্দর রাখিবে, পবিত্র রাখিবে, সৌভাগ্যবতী করিবে।

পূজা-পদ্ধতিতে মুদ্রা-রচনা ঃ বলিদ্বীপ

স্বামী সদানন্দ

বলিদ্বীপে হিন্দু দেব-দেবীর পূজায় পুরোহিত অঙ্গুলী দ্বারা মুদ্রা-রচনা ব্যতীত পূজার কোনও অঙ্গই সু-সম্পন্ন হইল না মনে করেন। এই মুদ্রা-রচনা স্বচক্ষে যে না দেখিয়াছে তাহাকে ইহা বুঝান কঠিন ব্যাপার। পুরোহিতের বাম হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলির নখ প্রায়ই সুদীর্ঘাকার। দক্ষিণ হস্তের নখ এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয় না। শুধু বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলির সুদীর্ঘাকার নখ দেখিয়াই বুঝা যায়, সেই ব্যক্তি একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। পুরোহিত ঠাকুর যখন পূজায় বসেন তখন তাঁহার সম্মুখে এক-খানি জল-পিঁড়ির মত কাষ্ঠাসনে পুষ্পাধার, রুদ্রাক্ষের মালা রাখিবার আধার, অবলেপনের জন্য চন্দনাধার, পবিত্র জলাধার, দীপাধার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে সজ্জিত করিয়া রক্ষিত হয়। পুরোহিত ঠাকুর দুই কর্ণে ও মাথার কেশগুচ্ছে পুষ্প স্থাপিত করিবার পর রুদ্রাক্ষের মালাটি গ্রহণ করেন ও দীপ জ্বালিয়া দেন। দীপ হইতে যখন সুগন্ধ ধূম নির্গত হইতে থাকে তখন তিনি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে একটির পর একটি অর্ঘ্য লইয়া দেব-দেবী বিশেষের উদ্দেশে অর্পণ করেন। প্রত্যেক দ্রব্য যাহা তিনি আধার-বিশেষ হইতে গ্রহণ করেন বা গ্রহণান্তর দেবতাকে অর্পণ করেন তাহা অঙ্গুলি দ্বারা রচিত মুদ্রার সাহায্যে গৃহীত বা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে প্রচলিত মুদ্রা রচনায় করপুট ও দুই হস্তের দশটি অঙ্গুলিকে নানাপ্রকার ভঙ্গীতে পূজার প্রত্যেক অঙ্গবিশেষের নিমিত্ত এমন জটিলভাবে ও দক্ষতার সহিত বিন্যাস করিতে হয় যে, এই মুদ্রা-রচনা যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাসের ফল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিদ্বীপে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তীর্থ-যাত্রা ব্যপদেশে আমার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, দীর্ঘাঙ্গুল-বিশিষ্ট পুরোহিত ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সকল প্রকার মুদ্রা-রচনা সম্ভবপর নহে। সে যাহাই হউক, এই প্রবন্ধে যে কয়েকটি মুদ্রার চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাচীনতম ভারতে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মূলে মুদ্রা-রচনার বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ঐক্য-সন্ধি আবিষ্কার করিতে পারিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য মুদ্রা-রচনার আলোকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজা-পদ্ধতিতে মুদ্রা-রচনার কৌশল সম্বন্ধেও উপাদেয় তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। আমার "বৃহত্তর ভারতের পূজা-পার্ব্বণ" গ্রন্থে সুদূর প্রাচ্যের মুদ্রা-রচনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা অনুসন্ধিৎসু পাইবেন।

পূজাকালীন মুদ্রা ঃ বলিদ্বীপ

পূজাকালীন মুদ্রা ঃ বলিদ্বীপ
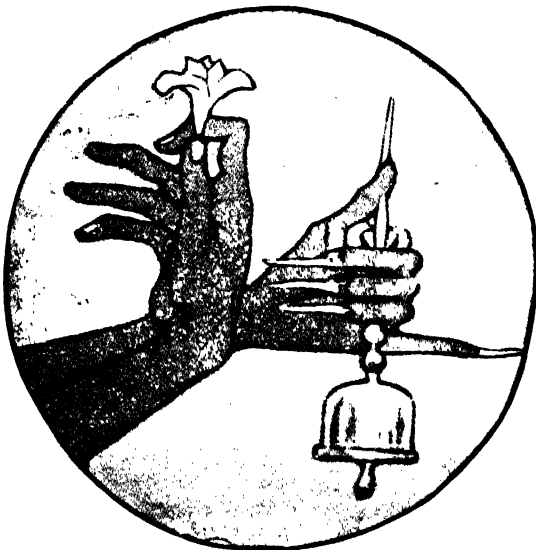
মুদ্রা (বলিদ্বীপ)
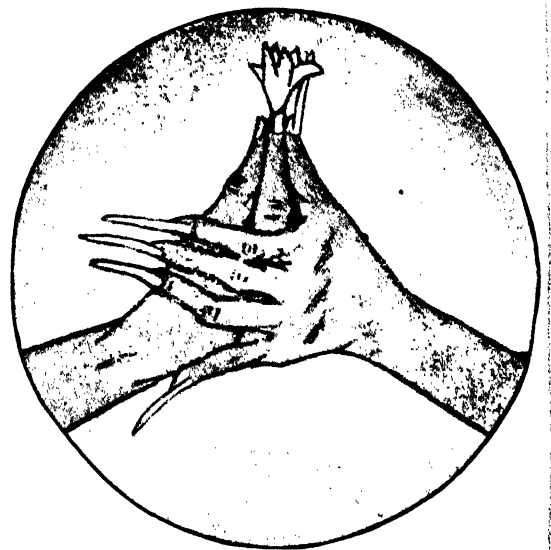
মুদ্রা (বলিদ্বীপ)

হিজ হাইনেস ওজস্বী রাজন্য প্রজ্জ্বল, নেপাল-তারা, অতি প্রবল গোর্খা দক্ষিণবাহু পৃথলাধীশ ত্রিশক্তিপট্ট শ্রীশ্রীশ্রীমহারাজা স্যার যুধা শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা, জি, সি, এস, আই ; জি, সি, আই, ই ;

গ্র্যাদ ক্রশ দ্য লা লিজ্যঁ দ্য'নার ; গ্র্যাণ্ড ক্রশ অফদি অর্ডার অফ লিওপোলিড ; গ্র্যাণ্ড করডন অফ লিওপোলড ; ষ্টার অফ দি জার্ম্মাণ রেড ক্রশ ; য়্যিং তেং পাওৎতিং শান চিয়াঙ্গ লাঙ্গ শিয়াং চ্যেঙ্গ অফ চায়না ; জি, সি, এস, এস ; মোরিজিও-ই-ল্যাজারো ; অনারারী লেঃ জেনারাল ইন দি ব্রিটিশ আর্ম্মি ; কর্ণেল-ইন-চিফ্ অব্ অল দি গোর্খা রাইফেল রেজিমেণ্টস্ ইন্ দি ব্রিটিশ আর্ম্মি ; নেপাল-রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও নেপাল সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ্য সেনাপতি।

নেপালের রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান

স্বামী অমৃতানন্দ

স্বাধীন নেপালরাজ্য—হিমালয় ক্রোড়ে প্রকৃতির লীলাবিলাসের স্বচ্ছন্দ বিকাশ-ভূমি। অদ্রির পর অদ্রি অতিক্রম করিয়া—'লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি' স্বাধীন নেপাল আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সহিত ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছে। সামর্থ্য, পৌরুষ ও সরলতার মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি লইয়া নেপাল মাতৃকার প্রাণবন্ত সন্তান—সমগ্র জাতি ও দেশের নিষ্ঠা এবং গৌরবের দীপ্ত তিলক ললাটে প্রকাশ করিতেছে।

কত বিভিন্ন ক্ষত্রিয়বংশ, কত সৈনিকের অসমসাহসিকতা ও কত ভাগ্যান্বেষী বীরপুরুষ আত্মমর্য্যাদায় গরীয়ান হইয়া বীরভূমি নেপালরাজ্যকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে তাহা ঐতিহাসিকের জানার বস্তু—কৌতূহলের সামগ্রী। সত্যনিষ্ঠ, সদাচারী সরল নেপালী জাতির বিশদ পরিচয় এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নহে। আমরা নেপালের গৌরবমণি বর্ত্তমান মহারাজ প্রধান মন্ত্রীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে এখানে প্রয়াস পাইব। বিশাল হিমগিরির ক্রোড়ে প্রসারিত পাঁচ শত মাইলব্যাপী এই উপত্যকাভূমির পরিচয় ও বিবরণ নেপাল সীমান্তের বাহিরের লোক অল্পই জানে। নেপালের বর্ত্তমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রাজপুতনার ক্ষত্রিয় শিশোদীয়কুলের রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ দেব। রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ দেবের অন্যতম সেনাপতি রাজপুতনারই ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব কুনোয়ার রাণা রামকৃষ্ণ, বর্ত্তমান নেপালের স্রষ্টা মহারাজা জঙ্গ বাহাদুর হইতে অধস্তন প্রধান মন্ত্রিগণের আদি পুরুষ। কার্য্যতঃ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তাঁহারা বিশেষ সম্মান ও পদবীর অধিকারী। পরবর্ত্তী বয়োজ্যেষ্ঠ বংশধরই প্রধান মন্ত্রীত্বের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। ভারতে মহারাষ্ট্র শক্তিকে সার্ব্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শক্তিশালী পেশোয়া-বংশ; সেই পেশোয়াগণের উত্তরাধিকার নীতির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। নেপালের সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ এবং পঞ্চ সরকার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মহারাজাধিরাজ সম্রাটের নামের আদিতে পঞ্চ শ্রী সংযুক্ত থাকে এবং প্রধান মন্ত্রীর নামের পুরোভাগে মহারাজা এবং তিন সরকার অর্থাৎ তিনটী শ্রী প্রদত্ত হইয়া থাকে। নেপালের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহারাজা স্যার যুধা শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা পরলোকগত হিজ হাইনেস মহারাজা জঙ্গ বাহাদুর মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। বর্ত্তমান মহারাজা পূর্ব্বদেশীয় রাজগণের মধ্যে অধিকসংখ্যক উপাধি ও সম্মান দ্বারা বিভূষিত এবং অলঙ্কৃত।

মহারাজা স্যার যুধা শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণার রাজ্যের শাসনভার এবং প্রধান মন্ত্রীত্ব-গ্রহণ দেশবাসী সকলেই হৃদয়-ভরা প্রীতি ও অনুরাগের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা দেশ ও জাতির নবযুগের সূচনা করিয়াছে—নেপাল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলো ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। মহারাজার শাসনকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে, তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, সমুদ্রপারে গিয়াছেন, রাজ্য ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় তাঁহার প্রচুর শিক্ষা ও সামর্থ্য আছে। রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সহিত তিনি বহু দিন হইতে নানাভাবে সংযুক্ত। অতি সুন্দর সুঠাম বীরত্বব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন মহারাজা রাজোচিত রূপে ও গুণে সমালঙ্কৃত; তিনি কঠোর পরিশ্রমী, নিয়মানুগ, দেশীয় ও বৈদেশিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। মহারাজার বয়স সপ্তষষ্ঠীতম; কিন্তু কি খেলাধূলায়, কি ব্যায়ামে, কি পরিশ্রমে সকল বিষয়েই তাঁহাকে যুবজনোচিত শক্তি ও গতিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। তিনি একজন উত্তম অশ্বারোহী। অশ্বচালনায় তিনি অতিশয় দক্ষ। সময় সময় তিনি নিরস্ত্র ও রক্ষীশূন্য হইয়া তাঁহার প্রিয় প্রজা ও জনসাধারণের নিকট অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহা তাঁহার জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। নেপাল রাজ্যের উন্নতি ও প্রগতির জন্য মহারাজা অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন। রাজ্যের উন্নতিকর সামাজিক, রাজনৈতিক

নানা সংস্কারের তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নেপালে জুয়া খেলা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। অল্পবয়স্কগণের ধূমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজদরবার ও সরকারী দপ্তরখানা হইতে চাটুকার, কুচক্রীগণকে তিনি বিতাড়িত করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মরক্ষক সদাচারপরায়ণ মহারাজা তাঁহার রাজ্যে শ্রীশ্রীগীতার প্রবর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছেন—সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম্ম, গীতা ও নীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কারাগার ও বন্দীশালায় কয়েদীগণের সংশোধন করিবার জন্য নানাপ্রকার ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সংবাদ পত্র পরিচালনা ও জাতীয় সাহিত্য চর্চ্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য রাজ-ভাণ্ডার হইতে স্থানীয় দুইখানি মাসিক পত্রকে আর্থিক সাহায্য করা হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীর হিন্দুর রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ মহারাজা স্যার যুধা শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা অতিশয় মহানুভব ও উদার-মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ক্ষুদ্রতা বা গোঁড়ামীর স্থান তাঁহার মধ্যে নাই। মহারাজার স্বদেশপ্রেম তুলনাহীন। তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কত গভীর প্রেম তাহার পরিচয় বিগত ভূমিকম্পের সময় আমরা পাইয়াছি। তিনি রাজ্যের বাহিরের কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; অতি ত্বরিতগতিতে রাজ্যের পুনঃ সংস্কার ও পুনর্নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সকল শ্রেণীর লোককে সাহায্য দানের জন্য নির্ব্বিচারে রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অমিততেজা মহারাজা অপূর্ব্ব সাহস, ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সহিত সমগ্র রাজ্যের সেই দুর্দ্দিনে অদ্ভূত ভাবে জাতির পুনর্গঠন সম্পাদন করিয়া প্রজাবৃন্দের অতিশয় প্রিয় ও আপনার জন রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সত্যই তাঁহার আসন নেপালবাসীর হৃদয়ে। তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে বিনা সুদে চারি বৎসরের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ দান করিয়াছিলেন কিন্তু মহানুভব মহারাজা কিছুকাল পরে এই ঋণ আদায় না করিবার জন্য আদেশ দিয়া জাতিকে ঋণদায় হইতে মুক্তিদান করেন। তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব মকুব করিয়াছেন—মহারাজার অতুলনীয় নিরপেক্ষতা গুণের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সেই দুঃসময়ে মহারাজা রাজ্যবাসী নিরন্ন, আতুর, নিরাশ্রয়ী, রুগ্ন-পীড়িত-জনের জন্য আহার, ঔষধ, আশ্রয়, পথ্য বিনা বিচারে বিতরণ করিয়া সকলের প্রাণ-রক্ষা করিয়াছেন। *

ভূমিকম্পের পর পুনর্নির্ম্মিত রাজধানী কাটমাণ্ডু সহরের সুদৃশ্য, প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন রাজপথ, রমণীয় হর্ম্ম্যরাজি নানা প্রকার নাগরিক উন্নতি তাঁহার ব্যবস্থা গুণেই হইয়াছে। নেপাল রাজ্যে প্রজার প্রচুর স্বাধিকার আছে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে, নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির ফলে নেপাল শনৈঃ শনৈঃ পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত সমান পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাজ্যে বিধর্ম্মীদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার নাই—মুসলমানগণকে হিন্দুদের ন্যায়ই সমানাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। রাজসরকার হইতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে।

মহারাজা স্যার যুধা শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পর 'রেল লাইন' অধিকতর বিস্তৃত করা হইয়াছে, দূর দূর স্থানে টেলিফোন স্থাপন করা হইয়াছে, নেপালী ডাক টিকিটের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নেপালে ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতা সহরেও উহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে, রাজ্য সংস্কার-বিভাগ, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ এবং কৃষিপরিবর্দ্ধন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ দান, বৃত্তি, প্রভৃতির দ্বারা ছাত্র ও বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে। নব নব বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও প্রচার করিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক গঠিত বিবিধ মণ্ডলী ও প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্ত্রী শিক্ষার বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। প্রতি বর্ষে নেপালে শিল্প-প্রদর্শনী ও গো-জাতির উন্নতিমূলক নানা প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা জাতির অর্থ, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। মহারাজা পথ নির্ম্মাণ ও রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধায়ক কমিশন স্থাপন করিয়াছেন। রাজ্যে নানাদিকে অসংখ্য প্রকার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। বিগত ভূমিকম্পের পর এত অল্পদিনের মধ্যে মহারাজা

জাতিকে ক্ষিপ্রগতিতে একটী আধুনিক উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন।

পরমমান্য হিন্দুকুলতিলক মহারাজা স্যার যুধা শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা স্বাধীন নেপাল রাজ্য ও নেপালী জাতি এবং নেপাল রাষ্ট্রকে সুপরিচালনা দ্বারা উন্নতির সর্ব্বোচ শিখরে লইয়া যাইবেন এই আশা আমরা করি। পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিকট আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিতেছি।

ভুলের জের

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের বড় ঘণ্টায় সকাল সাড়ে আটটার ঘা' পড়িতেই সম্মুখের বড় লোহার ফটক খুলিয়া গেল।

ভিতরের প্রাঙ্গণে কয়েদীর দল তিনটি সারিতে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক সারিতে বারজন। জেলার বাবু পরিদর্শন করিতে আসিয়া একবার মাথা গণিয়া লন। তার পরে প্রত্যেক দল চারিটি করিয়া সেপাই-এর পাহারায় ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া তাহাদের দৈনিক কার্য্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। রাজসাহী কলেজ গ্রাউণ্ডের ধার ঘেঁসিয়া প্রফেসারদের কোয়াটারের কিছু দূরে পদ্মার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, সেইদিকে একদল চলিল পাকা বাঁধ গাঁথিবার কার্য্যে। সহরের মধ্যে কাছারি যাইবার বড় সড়কের ধারে যে সরকারী শাক-সব্জীর বাগান—তাহার দিকে চলিল অন্য একটি দল। তৃতীয় দল দীর্ঘ পদক্ষেপে বাগ্দী পল্লীর নূতন রাস্তার দিকে চলিল, এখানে ইহারাই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কুলি মজুর!

বিনয় মিত্রকে তোমরা আর চিনিতে পারিবে না অন্ততঃ চেহারার আকৃতিতে নয়ই। বিনয় মিত্র ছয় ফিট দীর্ঘ এই বর্ণনাটুকু মনে না থাকিলে আজ তাহাকে চিনিবার আর কোন উপায়ই নাই!

দুইটা পাথরের উপর মুখোমুখী বসিয়া দুইটা কয়েদী ইট ভাঙ্গিতেছিল। সাঁইত্রিশ ও তেরো নম্বর তাহাদের পরিচয়। অন্য একটী কয়েদী ঝুড়িতে সেই ভাঙ্গা ইট ভরিয়া রাখিতেছিল এবং পালা করিয়া তৃতীয় একটি কয়েদী সেই ঝুড়ি লইয়া গিয়া পথের উপর ছড়াইয়া দিতেছিল। পথের উপরেও কয়েকজন কয়েদী ষ্টীম-রোলারের কার্য্য করিতেছিল। এইরূপে দুইটী ছোট দল প্রত্যহই বাগ্দী পল্লীর পথের ধারে দিন-মজুরের কার্য্য করে অথবা কৃত অপরাধের জন্য রাজদণ্ডের দণ্ড তামিল করে।

ইট ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পরস্পরের কথা হইতেছিল:

গেল হপ্তায় বাড়ী থেকে চিঠি পেয়েছিলে না?

সাঁইত্রিশ নম্বর মুখ তুলিয়া অথচ হাত না থামাইয়া বলিল,—বাড়ীর চিঠি? হ্যাঁ, তা পেয়েছিলাম।

তের নম্বর অর্থাৎ বিনয় কহিল,—তা'হলে অত ভাবছো কেন নিরর্থক? কে লিখেছিল চিঠি? বৌ?

বিবর্ণ ও অবসন্ন মুখাবয়বে যেন একটী স্বপ্নলোকের মধুর কান্তি ফুটিয়া উঠিল! আত্মসমাহিত সাঁইত্রিশ নম্বর কহিল,—না চিঠি লিখেছিল আমার ছোট মেয়ে।

একটা আধখানা বড় ইট ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বিনয় কহিল, জমির ব্যাপার সে কি বোঝে? কি লিখেছে?

লিখেছে, তিন বছরের খাজনা বাকী, বাড়ীর ধান চাল যা ছিল সব ফাঁক হয়ে গেছে, বলদ দুটো বিক্রি করে যে টাকাটা পাওয়া গিয়েছিল, তাও সব খরচ হয়ে গেছে।—বলিতে বলিতে সাঁইত্রিশ নম্বর অর্থাৎ হারাধনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ছাপ-মারা ডুরে উর্দ্দিটার প্রান্ত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ধরা-গলায় হারাধন কহিল, এবারে সবাই মরতে বসেছে ভাই, সবাই মরবে এবার।

জেলখানার মধ্যে এই হারাধনকে সম্বল করিয়াই বিনয়ের কয়েদী জীবনের দুর্ব্বহ ও মন্থর দিনগুলি কাটিয়াছে এতদিন।

জমি লইয়া মারামারি করিয়া একজনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ার অপরাধে এবং গ্রামের দারোগাবাবুর ভাই শশধরকে খুন করিবার জন্য ছোরা লইয়া থানার পশ্চাৎস্থিত বাগানে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে হারাধনের ছয় বৎসরের মেয়াদ স্থির হইয়াছিল। তাহার অবর্ত্তমানে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শশধর তাহার বিধবা ভগ্নী মালতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—এ-কথা গ্রামের সকলেই জানিত, কিন্তু আদালতে হারাধনের আপত্তি বা প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন কেহই বোধ করেন নাই, কেননা শশধর দারোগাবাবুর ভ্রাতা! সে আজ সাড়ে চার বৎসরের কথা।

দুই মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া অবশেষে এই রাজসাহী জেলেই সে স্থায়ী হইয়াছে। মাস চারেক কাটিবার পরই কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় দুইজন প্রহরীর নজরবন্দী হইয়া বিনয় মিত্র কারাগারে প্রবেশ করে। বিনয়ের কারাবাসের মেয়াদ হইয়াছিল চারি বৎসরের। কারাগারের দুঃসহ অনাচারের যন্ত্রণা যখন ক্রমেই গা-সহা হইয়া গেল তখন কেমন করিয়া একদিন হারাধন ও বিনয়ের এই ঘনিষ্টতার প্রথম সূচনা ঘটে।···

দ্বিপ্রহরে পথের ধারে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় আহার ও বিশ্রামের জন্য কয়েদীরা একত্র হয়। এক ঘণ্টা পরেই আবার কার্য্যারম্ভ। কাজেই এক ঘণ্টা সময়টুকু তাহাদের নিকট অতিশয় মূল্যবান।

শক্ত রুটী দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হারাধন কহিল, ভগবান প্রাণ দিয়েছেন—ভগবানই দেখবেন তেরো নম্বর, তুমি আমি ভেবে কি আর করতে পারি।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিতে করিতে বিনয় কহিল, তা নয় হারাধন, আমি অন্য কথা ভাবছি। দেখ, আর তিনদিন পরেই আমার ছুটী হবে। আমার নিজের বলতে তো কোন কাজ নেই—তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিও, আমি তোমাদের বাড়ী একবার যাবো।

কৃতজ্ঞতার অশ্রু হারাধনের [illegible] গড়াইয়া পড়িল। সে জানিত বিনয় কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালবাসে না। কেন-না প্রথম প্রথম তাহাকে 'আপনি', 'বাবু' ইত্যাদি সম্বোধন ব্যবহার করিতে দেখিয়া বিনয় কতখানি রাগ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা হারাধনের মনে আছে। সজল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া মনে মনে অশেষ মঙ্গল-কামনা জানাইয়া সে নীরবেই রুটী চিবাইতে লাগিল।···

মাঠের মধ্যে বড় পুষ্করিণীটার দিকে বিনয় চাহিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ-সূর্য্যের খর-রশ্মি পুষ্করিণীর স্থির জলের উপর একটা তাপদগ্ধ চোখ ঝলসানো প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিনয় তাহার বিস্মৃত ও বিগত জীবনের সূত্র অন্বেষণে উন্মনা হইল...

নন-কো-অপারেশনের হিড়িকে পড়িয়া বিনয় কলেজ ছাড়িয়াছিল। বৎসরখানেক মাতামাতি করিবার পর যখন সকলেই একে একে নিজের হিসাব কষিতে পথ দেখিয়াছে তখন কেমন করিয়া সে একদিন গুপ্ত-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। দলের অন্য সভ্যদের পরিচয়, তাহাদের উদ্দেশ্য বা কার্য্যপ্রণালী এ সকলের কোন সংবাদই সে রাখিত না। তাহার নিজের কাজ পিকেটিং লইয়াই সে স্বরাজ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিত। কয়েক মাস নিরাপদেই কাটিল ···

সেদিন গাঁজা ও বিলাতি মদের দোকানে পিকেটিং করিয়া ক্লান্ত দেহে সমিতির আড্ডায় ফিরিয়া সে দেখিল এক নূতন বস্তু!

মেয়েটীর নাম নির্ম্মলা রায়। পিকেটিংএর কার্য্য করিতে উৎসুক এবং লবণ অভিযান বা তদনুরূপ যে কোন কার্য্যে যোগদান করিতে সে রাজী। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য আপন প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সে প্রস্তুত।

আরও কয়েকদিন গেল।

আসা-যাওয়া ও ওঠা-বসার মধ্যে নির্ম্মলার সঙ্গে বিনয়ের প্রায়ই সাক্ষাৎকার হইত। নির্ম্মলার মধ্যে চরিত্রের একটা চিন্তাশীল গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পাইয়া সে মনে মনে তাহার প্রতি যেন একটু আকৃষ্ট হইল।

সেদিন অনেক রাত্রে গোলমাল শুনিয়া বিনয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নির্ম্মলার গলার স্বর তাহার পরিচিত। সে শুনিতে পাইল—আমার হাত ছেড়ে দিন, আপনার বদ্-খেয়াল আর বদ্-উদ্দেশ্যের কথা শোনবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। ইতরোমি করবেন না, ছাড়ুন আমার হাত।

তাহার পর কিছুক্ষণ আর তেমন কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। সহসা···

—উঃ, বাপে্‌র—হাত ছাড়ুন বলছি নরেন বাবু। কেন, পরে আপশোষ করবেন—আপনি এ রকম পশু-প্রবৃত্তির লোক জানলে, আমি কিছুতেই এখানে আসতুম না!

ঘৃণায় ও ক্রোধে বিনয়ের সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মুষ্টিবদ্ধ হাতে দ্রুতপদে দরজার নিকটে গিয়া সে দাঁড়াইল।

নরেন সেদিন মদ খাইয়াছিল। মান, অপমান, শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার তখন তাহার কাছে আশা করা বাতুল্যতা মাত্র। নির্ম্মলার ধৃত হাতখানিতে আবার টান দিতেই এবং বিনয়ের লাফ দিয়া কক্ষের মধ্যে পড়িবার আগেই চকিতের মধ্যে কোথা হইতে কি যেন হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটা "বাবারে" আর্ত্তনাদ উচ্চারণ করিয়া নরেন রক্তাপ্লুত দেহে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।···

নির্ম্মলার হাতে ছোরা—তাহার সমস্ত জামা কাপড় বিপ্রস্ত! কম্পিত হস্তে রক্তাঙ্কিত ছোরাখানি ধরিয়া সে তখনও যেন ধুঁকিতেছিল। ···

তারপর? তারপর রাতারাতি নির্ম্মলাকে লইয়া বিনয় মাণিকতলার আড্ডা হইতে সরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু পুলিশের দিব্য দৃষ্টির আড়ালে বহুদিন থাকা তাহার ভাগ্যে ঘটিল না।

··· কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া অচঞ্চল দৃঢ়স্বরে বিনয় বলিয়াছিল—আমি মেয়েটীকে ভালবাসতাম, আমার সঙ্গে মিশে দেশের কাজ করবে বলে ও আমার কাছে এসেছিল। ঘটনার রাত্রে নরেন মাতাল অবস্থায় অসৎ উদ্দেশ্যে নির্ম্মলাকে আক্রমণ করায় আমিই তাকে মেরেছি।

নির্ম্মলার ক্ষীণ আপত্তিটুকু আদালতে শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। কয়েদী-গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইবার পথে অশ্রুময়ী নির্ম্মলা বিনয়ের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, এ কি করলেন বিনয়বাবু?

চারিদিকে লোকের ভীড় জমিতেছিলি। ম্লান হাসিয়া নির্ম্মলাকে তুলিয়া ধরিয়া বিনয় বলিয়াছিল, কিছুই করিনি নির্ম্মলা। তোমাকে ভালই আমি বাসি। তুমি কষ্ট পাওয়ার চেয়ে এই কদিন আমিই না হয় ওটার ভার নিলাম। নির্ম্মলা অপলক নয়নে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দুটি চক্ষে তাহার অশ্রু যেন আর বাধা মানিতেছিল না সে-দিন। বিনয় কড়া-লাগানো হাত তুলিয়া তাহার দুটী স্কন্ধে রাখিয়া বলিয়াছিল ··· অপেক্ষা কোরো নির্ম্মলা আমার জন্যে, ফিরে এসে তোমাকে নিয়েই আমি ঘর বাঁধবো—পারবে তো ধৈর্য্য রাখতে?

দৃঢ়চিত্ত নির্ম্মলা নির্ভরশীল অকম্পিত দৃষ্টি মেলিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে জানাইয়াছিল—ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে সে পারিবে।···

শেষের এই তিনটী দিন যেন কাটিতে চাহে না। কারাগারের বাঁধাধরা নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ওঠা-বসার মধ্যে বিনয়ের কেবলই মনে হয় আর তিন দিন মাত্র বাকী।

অপরাহ্নে সাড়ে পাঁচটায় আহারাদির পরে অবসন্ন দেহ কয়েদীদের প্রায় দু' ঘণ্টার অবসর মেলে। আত্মসমাহিত বিনয় মাঠের এক স্থানে বসিয়া তাহার সমস্ত বিগত জীবনের কথা ভাবিতেছিল।···

জীবনে উন্নতি করিতে হইবে, অর্থ, যশঃ এবং আয়ুর বৃদ্ধি করিতে হইবে, এ কামনা তরুণ বয়সে কল্পনার মত তাহার অন্তরের মধ্যেও বাসা বাঁধিয়াছিল একদিন। কিন্তু নদীর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মতই নন-কো-অপারেশনের হিড়িক ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার যেন তাহাকে অত্যন্ত অকস্মাৎই কোথা হইতে কোথায় আনিয়া ফেলিল। জলমগ্ন জাহাজের বিপন্ন নাবিকের মত—সে যেন ভাসিতে ভাসিতে এ কোন নূতন দ্বীপে আসিয়া তীর পাইয়াছে।···

নির্ম্মলার কথা মনে পড়ে···

জীবনের প্রারম্ভকাল হইতেই নারীজাতি সম্বন্ধে তাহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ঠিক যে সময়ে হয়তো সে কোন তরুণীর প্রেমে পড়িয়া নিজেকে সুখী ও কৃতার্থ

মনে করিতে পারিত—বড়বাজার ও ক্যানিং ষ্ট্রীটে পিকেটিংএর নেশায় তখন সে ভরপুর মাতাল। বন্দিনী বঙ্গমাতার শৃঙ্খল-অপসারণ কার্য্যের সমগ্র দায়িত্বভার যেন তাহার একার উপরেই অর্পিত।

আজ সমস্ত কিছুই যেন সে নূতন দৃষ্টি, নূতন অর্থ লইয়া দেখিতেছে। যাহার জন্য এই দীর্ঘ চার বৎসরের প্রত্যেকটী দিবস সে গণিয়া গণিয়া যাপন করিল, সেই নির্ম্মলাকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইবে? তাহার মন এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতিবারই বলিয়াছে, হাঁ হইবে—নির্ম্মলাই তাহার পরিণীতা···প্রিয়া···সহধর্ম্মিণী। তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে নির্ম্মলার মত এমন একটী তেজস্বিনী মেয়ের পরিচয় সে কখনো পায় নাই। অতখানি চরিত্রবল ও মানসিক দৃঢ়তা যে কোন নারীর মধ্যে থাকিতে পারে, নির্ম্মলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে বিনয় তাহা কেবল ইতিহাসেই পড়িয়াছিল।

হাঁ, বিবাহ সে করিবেই। নির্ম্মলার মত একটী তরুণীর প্রেম ও শ্রদ্ধা—তাহার স্বামী হইতে পারার বিশিষ্ট একটী অসাধারণত্ব অন্তরের মধ্যে সে স্পষ্টই অনুভব করিল। আঠারো উনিশ বৎসরের নির্ম্মলাকে ফিরিয়া গিয়া সে দেখিবে তেইশ বৎসরের পূর্ণাঙ্গী যুবতী! পরিপূর্ণ বিকশিত শতদলের ন্যায় যৌবন-পুষ্পিতা নির্ম্মলার স্মৃতি তাহার নিকট সহসা যেন অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া উঠিল। শিক্ষিতা নির্ম্মলা, তেজস্বী নির্ম্মলা, রূপসী নির্ম্মলা তাহারই প্রত্যাবর্ত্তন-পথ চাহিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষায় রজনী যাপিতেছে—ইহার কল্পনা করিতেও তাহার অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে যেন পুলকের প্রবাহ বহিয়া গেল!

কারাগারের বড় ঘণ্টায় সাড়ে সাতটার ঘা' পড়িল। কয়েদীরা সেদিনকার মত শেষবার সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল···

কলিকাতা সহর ··

শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া বিনয় যেন কিছুই চিনিতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই সে কলিকাতায় বড় হইয়াছে। আজ চার বৎসরের অবর্ত্তমানতার পরে সেই কলিকাতা সহরই যেন তাহাকে আজ পরিহাস করিতেছে। জনবিরল ও সীমাবদ্ধ স্থানে সুদীর্ঘ জীবন যাপনের পর সহসা এই যান-বাহন ও জনতার মধ্যে পড়িয়া ক্ষণেকের জন্য বিনয় যেন বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

ট্যাক্সির মধ্যে বসিয়া বিনয় ক্ষণে ক্ষণে যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। গতির এতখানি তীব্রতা, পথের উপর সংখ্যাহীন মানুষের চলাফেরা, এ সমস্তই যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিতেছিল।

গৃহে প্রবেশ করিতেই অন্দর মহল হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কোন মতে আপনার কক্ষে ঢুকিয়া সে যেন আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিল।

জেলে ঢুকিবার এক বৎসর পূর্ব্বেই সে নিজের ঘর ছাড়িয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে আজ নিজের কক্ষের সমস্ত কিছুর সহিত সে যেন পুরাতন সখ্যতার ম্লান রেখাগুলির উপর ভাবী দিনের আনন্দ সম্ভাব্যতার নূতন তুলি টানিতে লাগিল সারাদিন ধরিয়া···।

বৈকালে বহুদিনের পর বিনয় তাহার পরিত্যক্ত জামা কাপড় বাহির করিয়া বিস্মৃত ও বিগত দিনের কবর চাপা অভ্যাসগুলির পুনরুদ্ধার করিতে বসিল।

নির্ম্মলা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং সে এদিকে তুচ্ছ লাজলজ্জায় বিলম্ব করিতেছে—এই চিন্তা থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। জেল হইতে মুক্ত হইয়া ষ্টীমার ঘাটের ডাকঘরে আসিয়া সে দুখানি পত্র দিয়াছিল। বাড়ীর চিঠিখানা যথাসময়েই আসিয়াছে—পিশিমার ক্রন্দন শুনিয়া ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। নির্ম্মলাও তাহার চিঠি পাইয়াছে এবং বহুদিনের বুভুক্ষিত অন্তর লইয়া তাহারই পথ চাহিয়া উন্মনা ও অস্থির হইতেছে, ইহা সে যেন মানস-চক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইল।

ভবানীপুরে নির্ম্মলাদের গৃহদ্বারে কম্পিত হস্তে বিনয় যখন কড়া নাড়িল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

দরজা খুলিয়া চাকর জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চান?

এক টুক্‌রা কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া বিনয় কহিল, এটা তোমার নির্ম্মলা দিদিমণিকে দাও!

মিনিট দশ পরে ভৃত্যটী পুনরায় আসিয়া একটা ছোট খামের চিঠি দিয়া কহিল—দিদিমণি বেড়াতে গেছেন···

ফিরিবার সমস্ত পথ বিনয়ের কেবলই মনে হইতে

লাগিল, নির্ম্মলার ব্যবহার যেন সঙ্গত হয় নাই। গৃহে পৌছিয়া চিঠিখানি আর একবার সে পড়িল।

"বিনয়বাবু, আপনার জীবনের চারটী বৎসর এইভাবে বিফল করে দেওয়ার জন্য যে কতখানি গ্লানি এতদিনে আমার মনে জমে উঠেছে সে কথা সাক্ষাৎ হলে জানাবো। সমিতির বিশেষ একটা অধিবেশনের জন্য ইচ্ছা সত্বেও ঘরে থাকতে পারলুম না। কাল সকালে দয়া করে আসতে পারবেন কি? —নির্ম্মলা।"

বিনয় নিজের সঙ্কীর্ণতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিয়া রহিল—তাহার পত্রপ্রাপ্তির বহু পূর্ব্ব হইতে যে তাহার সমস্ত জীবন স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে,—যে সমিতির মধ্যে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী তাহার পক্ষে এ আচরণ সম্পূর্ণ সঙ্গত ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজিকার এই আচরণটুকু তাহার চরিত্রগত বিশেষত্বকে পূর্ণ সমর্থন করিতেছে মনে করিয়া সে তাহার অন্তরের তুচ্ছ অস্বস্তিটুকু বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিল।

রাত্রে আহারাদির পর পিসীমা তাহার কক্ষে আসিলেন। বিনয়কে শিশুকাল হইতে তিনিই মানুষ করিয়াছেন। বিনয়ের মাতার মৃত্যুর পর পিতা দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থলেই সংসার পাতিয়াছেন। বিনয় বাল্যকাল হইতেই কলিকাতার বাটীতে বিধবা পিসীমার তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত।

বিনয় ক্লান্ত দেহে শয্যায় শুইয়াছিল। তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে পিসীমা কহিলেন, তোকে এবার আমি আর কিছু করতে দেব না বাবা, ও-সব স্বদেশী-বিদেশীও করতে হবে না, অপিসে গিয়ে কেরাণীগিরিও করতে হবে না। মেয়ে আমি দেখেই রেখেছি, সামনের অঘ্রাণে...

বাধা দিবার জন্য বিনয় কিছু বলিবে মনে করিয়া পিসীমা নিজেই কহিলেন, না না, তোকে আর কোন দালালি করতে হবে না, তুই চুপ কর! আমি তোর বিয়ে দেবোই এবার।

পিসীমার হাতখানি কপালে টানিয়া লইয়া বিনয় কহিল, তুমি ভেবোনা পিসীমা এবারে আমি বিয়ে করবই, তোমার অবাধ্য আর হব না। মেয়ে আমার পছন্দ হলেই চলবে।

এতখানি পিসীমা আশা করেন নাই! স্নেহে বিগলিত-প্রায় হইয়া তিনি কহিলেন পছন্দ আবার হবে না—তুই দেখিস্। তেমন মেয়ে ভূভারতে কেউ...

—তাড়াহুড়া কোরোনা পিসীমা, আমিও একটা ভাল পাত্রীর সন্ধান জানি। তোমাকে খুব শীগ্‌গিরই হয়তো একদিন গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসতে হবে। ক্ষণকাল বিস্মিতলোচনে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর পিসীমা হাসিয়া কহিলেন, তোর কোন বন্ধু বান্ধবের বাড়ী বুঝি? তা, সেও ভাল, কিন্তু সে মেয়ের কি এতদিনে বিয়ে হয়ে যায়নি? কে সে, কাদের মেয়ে? বালকের মত দুষ্টামী হাসি হাসিয়া বিনয় কহিল—সে তুমি চিনতে পারবে না পিসীমা, সঙ্গে করে না হয় এখানেই একদিন নিয়ে আসব!

পিসীমা সে-যুগের মানুষ। স্নেহাধিক্যে বিনয়ের অনেক অত্যাচারই তাহার বাল্যাবধি তিনি সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিনয়ের মুখে মেয়েটীর এই সামান্য মাত্র পরিচয়েই তিনি যেন প্রসন্ন হইতে পারিলেন না, অথচ, তাহার কষ্ট হইবে মনে করিয়া কোন প্রতিবাদও করিলেন না।

পরদিন নির্ম্মলাদের বাড়ীতে যখন বিনয় পৌছাইল তখন বেলা প্রায় অস্তমিত।

ভিতরের ঘরে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর নির্ম্মলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দীর্ঘ চার বৎসর পর আজ প্রথম নির্ম্মলাকে একান্ত ভাবে নিজের কাছে পাইয়া বিনয় যেন বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

—নির্ম্মলা কাছে আসিয়া কহিল—Welcome বিনয়বাবু।

বিনয় হাসিয়া কহিল—ধন্যবাদ নির্ম্মলা, কেমন আছ—কেমন ছিলে এত দিন?

ম্লান হাসিয়া নির্ম্মলা কহিল—বেঁচে ছিলাম।

—আমাদের স্বপ্ন বুঝি সত্য হল এতদিনে, নির্ম্মলা!

জানালার দিকে চাহিয়া নির্ম্মলা নীরব রহিল...

চোখের আড়াল দিয়া তাহার আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে বিনয় কোথায় যেন একটু নিরাশ হইল। নির্ম্মলাকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবতী ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে, পূর্ব্বেকার বালিকা-সুলভ কমনীয়তাটুকু যেন এখন আর

নাই, যেন এই কয় বৎসরের মধ্যেই সে পূর্ণ নারীত্বের আস্বাদ পাইয়াছে, যেন গম্ভীর, স্থির মস্তিষ্ক ও সংসারাভিজ্ঞা একটি বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীর সম্মুখে বিনয় আজ মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুইজনেই চুপ করিয়া ছিল। বিনয় কহিল, কই নির্ম্মলা, কিছু জিজ্ঞাসা করছ না তো? আমার কয়েদী জীবন সম্বন্ধে তোমার কি কোন আগ্রহ নেই?

অল্প একটু হাসিয়া নির্ম্মলা কহিল—সে তো এবারে আস্তে আস্তে শুনবই, আজই তো আর সব ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আপনি বাড়ীতেই উঠেছেন তো?

হ্যাঁ বাড়ীতেই উঠেছি, তাছাড়া স্থানই বা কোথায় আছে আর?

—এদিকের তিনটে বছর আপনি রাজসাহীতেই ছিলেন, না?

—হাঁ, সাড়ে তিন বছর।

ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া নির্ম্মলা কহিল,—আচ্ছা বিনয়বাবু, তখন আপনি আমাকে বাঁচাবার জন্যে যদি ঐ মিথ্যা কথাটা আদালতে না বলতেন, তাহলে কি আমার জেল হ'ত?

একটু বিস্মিত হইয়া বিনয় বলিল—হয়তো হত, হয়তো হত না।

—আমি কতবার যে ভেবেছি ঐ নিয়ে, তা বলতে পারি না। আমার মনে হয়, স্ত্রীলোক আত্মরক্ষার জন্য যদি কাউকে মেরেও ফেলে, তাতে বোধহয় তার কোন সাজা হয় না। মাঝে মাঝে ভাবতাম, কি জানি, আপনার এত কষ্টভোগ করাটা বুঝি নিরর্থক।

গত কল্যের পত্রটুকু হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত নির্ম্মলের সমস্ত আচরণটাই বিনয়ের কাছে কেমন সঙ্গতিহীন ও বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছিল। অথচ, এই নির্ম্মলার চিন্তাটুকু মাত্র সম্বল করিয়া কত চিন্তাক্লিষ্ট দীর্ঘ দিন ও বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে। কারাগারের কড়া শাসনের দুর্ব্বহ মুহূর্ত্তগুলিতে নির্ম্মলার সঙ্গে একটি মধুর ভবিষ্যতের চিত্র রচনা করিয়াই ভারাক্রান্ত মনে সে বল সঞ্চয় করিয়াছে। সেই নির্ম্মলাকে আজ কাছে পাইয়া সে যেন অন্তরে বিশেষ তৃপ্তি পাইতেছিল না।

নির্ম্মলার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল, বিনয় কি ভাবিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া ডাকিল, নির্ম্মলা—

অপরিচিত ও অর্থশূন্য ম্লান হাসি হাসিয়া নির্ম্মলা কহিল, ভুল হয়েছে বিনয়বাবু, আমাদের গোড়া থেকেই ভুল হয়েছে। একটা সাময়িক কল্পনাময় উত্তেজনা মুহূর্ত্তে আমরা দুইজনেই আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভুল করে' ফেলেছি। সেই ভুলের জের টানলেন আপনি বৃথাই এই চার বৎসর ধরে'—

—আর তুমি—?

জোর করিয়া পাংশুমুখে হাসি টানিয়া নির্ম্মলা কহিল, —আমি? আমি সেই ভুলের গোড়া থেকেই সংশোধন সুরু করেছি বিনয়বাবু—ঐ দেখুন, আমার খোকা কাঁদছে; ও, বলিনি বুঝি এখনো—আমি বিবাহ করেছি বিনয়বাবু,—একটু বসুন আমি নিয়ে আসি আমার খোকাকে—দেখে যাবেন—

শূন্য কক্ষে বিনয় মিত্র পনের মিনিট বসিয়া রহিল ··· মনের অবচেতন অন্ধকারে যে অনিশ্চয়তার বেদনা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল—তাহা কি এই প্রকারে বিনয়ের সন্দেহ অপসারণের জন্য? নির্ম্মলার সীমন্তে কি সিন্দূর ছিল ···? পনেরো মিনিট পরে আট দশ মাসের শিশু পুত্রকে বুকে লইয়া নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া বিনয়কে দেখিতে পাইল না। খোলা জানালার মধ্য দিয়া আকাশের দিকে উদাস নেত্রে একবার সে চাহিল। বিগত দিনের সেই স্মৃতির তন্ময়তা ভাঙ্গিল রোরুদ্যমান শিশুর কণ্ঠস্বরে। সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিনয়ের খালি চৌকীতে বসিয়া আজ বহুদিন পরে কি যেন সে নূতন করিয়া ভাবিতে লাগিল···

সন্ধ্যার ট্রেণে বিনয় ফরিদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল—হারাধনের বাড়ীর ঠিকনাটুকু সঙ্গে লইয়া। দীর্ঘ যাত্রার সমস্ত পথটুকু তাহার কেবলই মনে বাজিতে লাগিল নির্ম্মলার কথাগুলি—তাহারা দুইজনেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই ভুলের জের টানিতে তাহার যতদিন লাগিয়াছে—তাহার প্রারম্ভেই নির্ম্মলা তাহার অংশটুকু সংশোধন করিয়া লইয়াছে।

"প্রেম-ধর্ম্ম"

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের দুইখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। "প্রবর্ত্তকে"র পরিচালক এই পুস্তক দুইখানির সমালোচনার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে, এইরূপ পুস্তকের যোগ্য সমালোচনা সম্ভব, তাহা আমার নাই। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের যে পুস্তকখানির কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; উহা সমালোচনার বাহিরে দাঁড়াইয়া স্বমহিমায় মাথা তুলিয়াছে। আমি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্যই নিবেদন করিতে পারি।

এই পুস্তকের নাম প্রেম-ধর্ম্ম" ।*

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। পরিশেষে, উপসংহার-ভাগে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কয়েকটী দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে তিনি তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন; দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বের রূপটী সুকৌশলে আঁকিয়া তুলিয়াছেন; তৃতীয় খণ্ডে রূপাস্বাদের অমৃত অকাতরে পরিবেশন করিয়াছেন। 'প্রেম-ধর্ম্ম'-প্রকাশের জন্য ভাষার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যে তো আছেই, ইহার উপর বৈষ্ণব দর্শন, উপনিষৎ এবং মহাজন-পদাবলীর সহিত সুফীদের মহাবাণী, ইউরোপীয় মনীষিগণের অনুভূতি প্রভৃতির সমাবেশে ভাব ও ভাষার প্রাচুর্য্যময় মূর্ত্তি এই গ্রন্থখানিতে লক্ষ্যে পড়ে। ভারতের ধর্ম্ম বেদ-মূলক। বেদ কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রসূতি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনেই এ জাতি কর্ম্মকে ধর্ম্মে এবং জ্ঞানকে ব্রহ্মে অন্বিত করিয়াছে। নতুবা বৈদিক কর্ম্মমীমাংসার ঋষি জৈমিনী "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বলিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিবেন কেন? আর বেদের উত্তরকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাসদেবের গ্রন্থারম্ভে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্র সন্নিবেশিত হইবে কেন? শব্দ-ভেদে বস্তুভেদ হয় না—

* "প্রেম-ধর্ম্ম"—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। পৃষ্ঠা ৪৪২। মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র। স্বয়ং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই ন্যায়ের অকাট্য সূত্রেই গীতায় দেখি "ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধির" কথা। আবার, 'জ্ঞানে কর্ম্ম সমাপ্যতে' এই কথায়ও কর্ম্ম জ্ঞানে তুলিয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কর্ম্ম যখন জ্ঞানে অন্বিত হয়, তখন তাহার যে রূপ, তাহা কর্ম্মও নহে, জ্ঞানও নহে। আচার্য্যেরা ইহারই নাম দিয়াছেন ভক্তি। ইহা কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্রবস্তু নহে, কর্ম্মজ্ঞানের পরিপক্কতায় এক তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব। ইহাকে ভাগবতে অমিশ্রা ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ভক্তির উদয়ে যে তত্ত্বানুভূতি হয়, আর কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা যে অনুভূতি, তাহা এক বস্তু নহে। কর্ম্মে তত্ত্বের প্রকাশ হয় আত্মারূপে, জ্ঞানে—ব্রহ্ম। আর ভক্তিতে তত্ত্বই হন ভগবান। ভগবান সাকার, নিরাকার—সগুণ, নির্গুণ—শ-বল অথবা কেবল, এই দ্বন্দ্বময় অবস্থার অতীত এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব বস্তু। সুপণ্ডিত ও দার্শনিক হীরেন্দ্রবাবু প্রেম-ধর্ম্ম গ্রন্থে স্বীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে দূরে রাখিয়া সাধুজনোচিত বিনয়ের সহিত, উপনিষদুক্ত মধু-বিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চূড়ামণিদের কথা সাজাইয়া ইহাই সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

প্রাচীন ঋষিরা মধুবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন—কিন্তু এই পরমামৃত দর্শনে, স্পর্শনে, ঘ্রাণে, লেহনে, শ্রবণে, এমন করিয়া আস্বাদ করা যায়, তাহা বলেন নাই। এই বিষয়ে বাংলার খাঁটী সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকেরাই অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই প্রয়াস যে ব্যর্থ হয় নাই, মরমী দরদী যাঁরা, তাঁরা মর্ম্ম দিয়াই ইহা বুঝিবেন। হীরেন্দ্রবাবুর এই গ্রন্থখানি শুধু এই শ্রেণীর ভক্তদের হৃদয়েই আশা ও উৎসাহ সৃজন করিবে না, এই পথে নবাগতদের ইহা পরম সহায় হইবে—এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

প্রাচীন বেদপন্থী দার্শনিকগণ জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিলেন—আত্মার অভ্যুত্থান আর নিঃশ্রেয়স। ভারতে

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ইহার বিরুদ্ধে এক প্রবল বৈপ্লবিক অভিযান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ-বিধি ছাড়িয়া তত্ত্ব-লাভের পথে চণ্ডীদাসের যাত্রাযুগ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়াই সিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ মোক্ষ-বাঞ্ছাকে কৈতব আখ্যা দিতে ভরসা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের মধুবিদ্যা অনেকটা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলিতে পারা যায়। জ্ঞানীরা এই পথই শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধ্যাত্ম-রহস্যজাল বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে পরম তত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণাই ভাগবতে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে। নরদেহে তত্ত্বের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ভাগবতপ্রচারের পর বৈষ্ণব ধর্ম্মীদের অক্লান্ত প্রয়াসের ফল। বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ এবং তৎপরে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এবং ইহার পর শতাধিক গৌড়ীয় ভক্ত ভারতের অধ্যাত্মবাদকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া নরদেহে নারায়ণকেই প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। সে সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং ইহার যুক্তিসহ সিদ্ধ আচার্য্যগণের অসংখ্য পদ এই ক্ষেত্রে আলোচনার বস্তু নহে। বৃন্দাবনের যশোদা-নন্দনে ভাগবত তত্ত্বের পূর্ণ-রূপ-প্রতিষ্ঠার পর মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন এবং নরহরি সরকার শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রে ইহাকে নামাইয়া আনিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে নবদ্বীপের লীলা-ক্ষেত্রেই দেখেন, অন্যত্র নহে। সৃষ্টিকে নশ্বর হইতে না দেওয়ার এই যে পরম আয়াস, ইহা মোক্ষবাদ নহে, দিব্য জীবন-বাদ। শান্তে, সখ্যে, দাস্যে, বাৎসল্যে, মাধুর্য্যে পরম রূপপ্রকাশ যে না দেখিল, যে ইহা আস্বাদ না করিল, তাহার নয়ন ও রসনা, দুইই বৃথা। যে পরম প্রিয়কে বুকে না ধরিয়াছে, শ্বাসে শ্বাসে যে পরমের আঘ্রাণ না পাইয়াছে, প্রিয়তমের বাণী যাঁর কর্ণে মধু বর্ষণ করে নাই, তাহার কলেবর বৃথা, বৃথা তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস, সে বধির থাকিলেই ভাল হইত। প্রেমিক তাহার সবখানি দিয়া, প্রেমাস্পদকে চাহে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঈশ্বরকে এমনভাবে পাওয়ার উপায় যে প্রেম, তাহার বিষয়ে বলিতে গিয়া হীরেন্দ্রবাবু তত্ত্বকে মহাজনগণের পদাবলীর সাহায্যে এমন সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে তাহাতে সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়াছি। বৈধী ও রাগাত্মিকা ভক্তির বিশ্লেষণে রতির ক্রমপরিণতি, উহাই ক্রমে প্রেমের আকার ধরে। প্রেম হইতেই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ। তদূর্দ্ধে যে মহাভাব, এইখানে পৌঁছিলেই নরদেহে সহজ মানুষের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। এ সাধনা আগুন লইয়া খেলা। কিন্তু পরম বিধেয়কে জীবনে অনুবাদ করিতে হইলে, এ অগ্নি-ক্রীড়ায় ভয় করিলে চলে না। ইষ্ট-নিরূপণের পর যে রাগের উদয়, তাহা কোন বাধায় আর সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে না, কুল-লাজ-ভয় দূর হইয়া যায়, ভক্ত তখন চলে অভিসারে। নাম-পরশনে আকুল হৃদয়, অঙ্গের পরশ চাহিবেই—অভিসারের পরিণাম তাই প্রিয়-সঙ্গম। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে—প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষা আছে। মানে, মাথুরে বৈষ্ণব কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব অগ্নি-পরীক্ষার পর কায়, মন, বাক্ ঈশ্বরময় হয়, তখন সম্ভোগের কথা। এই সম্ভোগই জীবে ঈশ্বরে মহামিলন। যোগীর যে সমাধি, প্রেমিকের তাহা সম্ভোগ। হীরেন্দ্রবাবু এই সব নিগূঢ় তত্ত্ব বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া সুস্পষ্ট করিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবুর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও অতি উপাদেয় হইয়াছে—ইহা কেবল প্রেম-ধর্ম্মীদেরই কাজে লাগিবে না—বঙ্গ-সাহিত্যের মন্দিরে গৌরবের আসন পাইবে। পুস্তকখানি যিনি পড়িবেন, তিনি বাংলার সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম কথঞ্চিৎ অবগত হইবেন, ইহাতে আমার সংশয় নাই।

চিন্তা-বীথি

মহাত্মা-গান্ধী তাঁহার ১।৭।৩৯ তারিখের "হরিজন" পত্রে একটী সাময়িক প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলিয়াছেন ঃ—

"If any action claimed to be spiritual, is proved to be unpractical, it must be pronounced to be a failure. I do believe the most spiritual act is the most practical in the true sense of the term."

ইহার মর্ম্মার্থ—যদি কোন কর্ম্ম আধ্যাত্মিক বলিয়া দাবী করা হয়, অথচ তাহা জীবনে কার্য্যকরী না হয়, তবে তাহা ব্যর্থ বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সব চেয়ে আধ্যাত্মিক কার্য্য তাহাই, যাহা সত্য সত্যই সবচেয়ে জীবনে কার্য্যকরী।"

গান্ধীজির অন্যান্য অনুভবসিদ্ধ উক্তির ন্যায়, এই উক্তির মধ্যেও ভাব ও কর্ম্মের নিগূঢ় যোগসূত্রের কথা অতি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কথাগুলি আমাদের ন্যায় ভাবপ্রবণ জাতির বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

* * * *

জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধ ও তাহাদের মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াস ভারতীয় শাস্ত্রে নূতন নহে। বেদে অবশ্য এই বিরোধের পরিচয় নাই। কিন্তু উপনিষদের ঋষি যখন আত্মজ্ঞানের সহিত জগদ্‌জ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ ঘোষণা করিয়া অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সেই সমন্বয়ের পূর্ব্বে যে একটা বৈষম্যের অনুভূতি তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। ঈশোপনিষদে এইরূপ অনেকগুলি বিরুদ্ধ তত্ত্বের অপরূপ সাফল্যের বাণী আমরা পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হই। ঈশ্বর ও জগৎ, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম্ম ও মুক্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি আপাতবিরোধী ভাবসমূহের মধ্যে দিব্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা—এই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের ঋষি যাহা তর্কাতীত দর্শনে, অধ্যাত্মযোগমার্গে অনুভব করিয়া উদাত্ত ঝঙ্কারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, গীতায় স্ফুটতর যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে সেই সমন্বয়ের কথাই আরও পরিস্ফুট আকারে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের বুদ্ধি-বিপ্লব দূর করিতে গিয়া এই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টির আলোকেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় করিয়াছেন—শুধু তাই নয়, জ্ঞানকে কর্ম্মে উন্নীত করিয়া, উভয়কেই এক তৃতীয় তত্ত্ব—ভক্তি-বস্তুতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাত্মজীবন বস্তুতন্ত্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা আর এখানে টিকে না। ইহ ও অমুত্র, অধ্যাত্ম ও অধিভূত—দুইই একই তত্ত্বের এদিক্, ওদিক্—বিযুক্ত নয়, অখণ্ড—ইহাই যথার্থ ভারতীয় দর্শন। সুখের কথা, আশার কথা—মহাত্মার কথায় এই সনাতন ভারতেরই শাশ্বত মর্ম্মবাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

উপনিষদের সাধন যৌগিক সাধন। উহা শান্ত রস। গীতার সাধনও সিদ্ধ সাধন। এখানে দাস্য ও সখ্যরসে যুক্তির বিধান লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে পুরাণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতে বাৎসল্য ও মধুর রসে উহা ঘনাইয়া যুক্তিকে সুপক্ক ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের এই সর্ব্ব পর্য্যায়ের সাধনই জীবনসিদ্ধ হওয়ায়, ইহাকে এ যুগের পরিভাষানুযায়ী "practical spirituality" বলা যাইতে পারে। বিশেষভাবে বাঙালার তন্ত্র ও সহজিয়ায় এই সিদ্ধ সাধনবিজ্ঞান যে বস্তুতন্ত্র পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব। সেদিনও দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণে ইহার অপরূপ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বাঙালার উদীয়মান জাতি তাহার এই জাতীয় ঐশ্বর্য্যের প্রতি যেন আজ কথঞ্চিৎ উদাসীন, উপেক্ষাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকেই আমরা ভাবপ্রবণতা আখ্যা দিয়াছি। আসলে বাঙালী জাতি কোন দিনই এমন কাল্পনিক ভাবপ্রবণ প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল না। বাঙালার আধ্যাত্মিকতা চিরদিনই বস্তুতন্ত্র জীবনবিজ্ঞান অর্থাৎ "practical spiritualityই" ছিল ও আছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

* * * *

সর্ব্ব রসে বাঙালী জীবনকেই সাধিয়া আসিয়াছে। রস-কেন্দ্র ভগবান। সম্বন্ধ—তাঁহারই সঙ্গে। ভগবানকে জীবনের মূলকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করাই একটা মৌলিক সিদ্ধি। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই বাঙালীর জাতীয় সাধনা। চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ—ইহারা এই জাতীয় সাধনারই কয়েকটী জলন্ত আলোক-স্তম্ভ—

অগ্রগতির সমুন্নত জয়চিহ্ন। আসলে, সমগ্র জাতিটাই তলে তলে একটা বিরাট্ যোগ-সাধনা করিয়া আসিতেছে। এই যোগের ভিত্তি—ভগবান। তাঁহাকেই জীবনের সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধ করিয়া তোলা—তাঁহারই ভাব ও ইচ্ছাকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে জীবনে লীলায়িত ও বস্তুতন্ত্র করিয়া তোলাই এই মহাযোগের আসল মর্ম্ম।

* * * *

উদাহরণ-স্বরূপ, বাঙালার রাণী ময়নামতীর কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। এই মহীয়সী বঙ্গনারী—এক বিশাল রাজ্যের রাজেন্দ্রাণী—প্রতাপশালী রাজার পত্নী। তিনি তাঁহার পুত্র—কুমার গোবিন্দচন্দ্র ওরফে গোপীনাথকে স্বহস্তে সন্ন্যাস দান করেন। রাণী ময়নামতী গুরু গোরক্ষনাথের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। এই নাথ-যোগিগণ বাঙালার জীবনভিত্তিমূলে যে "মহাজ্ঞানের" বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্যতঃ, হঠযোগের তত্ত্ব হইলেও, আসলে বেদান্তেরই পরম তত্ত্ব। কুমার গোবিন্দ চন্দ্রের এই সন্ন্যাস শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। বাঙালীকে তাহার জাতীয় ইতিহাসের এই বিস্মৃত অধ্যায়টীকে একবার স্মৃতির ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলি। গোপীচাঁদের সন্ন্যাস লোকগাথাকারে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে—বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র ও পঞ্চনদে এখনও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যুগের বাঙালী ইহার মর্ম্ম প্রণিধান করে না—করিলে দেখিত, "মহাজ্ঞানের" এই প্রাচীন সাধন তাহার পরবর্ত্তী যুগের ব্যাপক তান্ত্রিক ও সহজিয়া সাধনার অটল বনীয়াদ রচনা করিয়া দিয়াছে। বাঙালী সিদ্ধ দেহে জীবনযোগের আবাহন করিয়াছে। এই সিদ্ধ দেহের সাধনই মহাজ্ঞানের সাধন। গুরু গোরক্ষনাথের স্থান তাই বাঙালার জীবন-ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়। আজিকার অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ, ম্যালেরিয়া ও যক্ষায় অর্দ্ধমৃত বাঙালী জাতিকে জাতীয় সম্পদ্‌হারার সকল দৈন্য-লক্ষণে যখন সমাচ্ছন্ন ও মুহ্যমান দেখি, তখন হুঙ্কার দিয়া তাহাকে জাগাইতে ইচ্ছা হয়—যুগের ব্যর্থ "স্লোগানের" উপকরণে নয়, এই "মহাজ্ঞানের" মহৌষধি উদ্ধার করিয়া। এইখানেই যে আমাদের সিদ্ধ দেহ-তত্ত্বের সন্ধান নিহিত আছে।

সিদ্ধ দেহেই শক্তি ও রস-সাধন। তাই আগে দেহ-বিজ্ঞান। ইহা বাঙালীরই আদিম বিজ্ঞান, তাহার জন্ম-সম্পদ্। বাঙালীর শরীর পঞ্জাবীর, রাজপুতের শরীর নয়—উহাদের দৈহিক বীর্য্য যে জাতীয়, বাঙালীর দৈহিক বীর্য্য সে জাতীয় নয়; ইহা গোড়াতেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। বাঙালার দেহ-শক্তির গঠন ভিন্ন উপাদানে। ইহা বাঙালা মায়েরই জীবন-রসায়ণে সংগঠিত ও সঞ্জীবিত। বাঙালীর শরীরের অস্থি-কঙ্কাল অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় নমনীয় হইলেও, ইহার স্থিতি-স্থাপকতা অর্থাৎ অধ্যাত্ম ধারণ-সামর্থ্য অতুলনীয়। এইদিক্ দিয়া বাঙালীর দৈহিক ধৃতি তাহার আধ্যাত্মিক ধাতুর সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু বাঙালীর শরীর আজ জ্ঞানাভাবে বিকৃত ও কলুষিত হইয়া এই স্থিতিস্থাপকতা ও ধৃতিসামর্থ্য ক্রমশঃ হারাইতেছে। বাঙালীকে অবিলম্বে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক হইতে হইবে।

* * * *

বাঙালার তন্ত্র ও সহজিয়া অর্থাৎ শক্তি ও রস-সাধন দেহকেই ভিত্তি করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতে চাহিয়াছে। তন্ত্রের শক্তি-সাধনা মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে জাগাইবার অপূর্ব্ব কৌশল। রস-সাধনার ক্ষেত্রেও, ভাবাশ্রয়ে সিদ্ধ দেহের ভাবনা অনিবার্য্য পর্য্যায়। এই সকল বাঙালীর জীবন-বিজ্ঞানের বিশেষ তথ্য (details)। তাহা যথাস্থানে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ক্ষেত্রে এই মূল কথাটীই আমরা এ জাতিকে স্মরণ করাইতে চাই যে, বড় অসাধারণ সাধনার প্রবাহে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি, আমাদের ইতিহাস সত্যই অপূর্ব্ব।

* * * *

বাঙালীর জীবন সাধারণ নয়, অসাধারণ। কিন্তু আমরা আজ আত্মবিস্মৃত। এই আত্মবিস্মৃতির গভীরতা আমাদের অধঃপতনের ভয়াবহ পরিণতি হইতেই অনায়াসে পরিমাপ করা সম্ভব হইবে। সে পতনবেগ রোধ করার একটী ছাড়া দ্বিতীয় উপায় আমাদের জানা নাই। উহা হইতেছে আত্মজ্ঞানের পুনরুদ্ধার। বাঙালী আপনাকে জানিবার অভিনব সাধন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

লীগ্ চ্যাম্পিয়ান্—১৮৯৮ এ লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া তাহা চলিতেছে এই ৪২ বৎসর। ইহার মধ্যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ময়দানে 'দেশাত্মবোধের' অত্যদ্ভুত 'আঠা-গঙ্গানয়' লীগ্ কর্ত্তৃপক্ষ সে বৎসরের মত লীগ্ খেলা বন্ধ করিয়া দেন—করিয়া দিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রোপযোগী কর্ম্মই করেন। 'আঠা' শুকাইয়া যায় চক্ষের পালট না পড়িতে পড়িতে। শীল্ডের খেলা ইহার পরে পূরা দমেই চলে। দেশাত্মবোধ কর্পূরের মত উপিয়া যায়। সে বৎসরের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ সুতরাং লীগ্ কর্ত্তৃপক্ষই। তাঁহাদের অপরূপ জয়ে কামিজপরা হাত মুখে দিয়া তাঁহাদের চাপাহাসি উপভোগ করিয়াছেন অনেকেই। সে যাহা হউক, ১৯৩০-এর প্রতিযোগিতা বাদ দিলে মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১। এই ৪১ বৎসরের মধ্যে সামরিক দল জয়ী হইয়াছে ২৪ বার এবং অ-সামরিক দল বাজী মারিয়াছে ১৬ বার। এ বৎসরের লীগ্ জয়ী মোহনবাগান। ইহারা ব্যতীত অসামরিক দলের মধ্যে দেশীয় দল মোহামেডন্ একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের লীগ্ জয়ী। লীগের ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এ ঘটনা ফুটবল-জগতে অতুলনীয়।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মোহামেডনের পূর্ব্বে ডারহাম্ লাইট্ ইন্ফাণ্ট্রি (২নং ব্যাটেলিয়ন্) লীগ জয় করিয়া লয় তিনবার (১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২)। উপর্য্যুপরি দুইবার জয়ী হয় রয়াল্ আইরিশ্ রাইফ্‌ল্‌স্ (১৯০০, ১৯০১), কিংস্ ওন্ ল্যাঙ্কাস্টার্ (১৯০৪, ১৯০৫), দ্বিতীয় গর্ডন্ হাইল্যাণ্ডার্স (১৯০৮, ১৯০৯), ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্ (১৯১২, ১৯২৩) ক্যাল্‌কাটা (১৯২২, ১৯২৩), প্রথম ব্যাটেলিয়ন্ নর্থ স্টাফোর্ডশায়ার (১৯২৬, ১৯২৭), ডাল্‌হাউসী (১৯২৮, ১৯২৯)।

স্মরণীয়—ক্যাল্‌কাটার উপর্য্যুপরি দুইবার বাজী মারা ব্যতীত ১৮৯৯, ১৯০৭, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের লীগ্ জয়ীও তাহারা। লীগে ক্যাল্‌কাটার মোটের উপর সাফল্য সুতরাং নয় বার। লীগ্ প্রতিযোগী রূপে সেই ক্যাল্‌কাটার গত বৎসর এবং এ বৎসরের শোচনীয় অবস্থা অন্যান্য প্রতিযোগী দলের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ডাল্‌হাউসীরও সাফল্য ঘটে মোট চারিবার (১৯১০, ১৯২১, ১৯২৮, ১৯২৯)। চারিবার লীগ্ জয়ী ডাল্‌হাউসীর স্থান এখন দ্বিতীয় বিভাগে।

বাঙালী ও লীগ্—একাদিক ক্রমে ১৭ বৎসর 'ঠেকো' হইয়া থাকিবার পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাঙালী (মোহনবাগান) লীগ্ প্রতিযোগীরূপে অবতীর্ণ হইবার প্রথম সুযোগ পায়। বাঙালীর লীগ্ খেলা এই বৎসর লইয়া সুতরাং (১৯৩০ বাদ দিয়া) ২৪ বৎসর মাত্র। প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান তালিকার চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পর বৎসরে লীগে প্রথম দাঁড়ায় ক্যাল্‌কাটা। দ্বিতীয় মোহনবাগান। এরিয়ন লীগ দলভুক্ত হয় এই বৎসরেই। ১৯১৭, ১৯১৮ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান তালিকার চতুর্থ স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী তাহারা হয় ১৯২০ ১৯২১ ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। তালিকার তৃতীয় স্থানে মোহনবাগানের অবস্থান ১৯২২, ১৯২৬, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩২, ১৯৩৪ ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় বিভাগ হইতে প্রথম বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল্ উন্নীত হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। তালিকার চতুর্থ স্থান অধিকার তাহারা করে সেই বৎসর। ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্টবেঙ্গলের অবস্থান ঘটে দ্বিতীয় স্থানে। বাঙালীর পূর্ব্বোক্ত তিনটী দল ব্যতীত স্পোর্টিং ইউনিয়ন্ (১৯২৯—

১৯৩৯) ও ভবানীপুরকে (১৯৩৭—১৮৩৯) প্রথম বিভাগের লীগ্ প্রতিযোগী দল রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ভবানীপুর প্রথম বিভাগে উঠিয়াই ইষ্টবেঙ্গলের সহিত বেষ্টনীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পুরা বাঙালীর দল না হইলেও কালীঘাট ও হাওড়া ইউনিয়ন্ লীগের দেশীয় দল। হাওড়া লীগে খেলে তিন বৎসর (১৯৩৩—১৯৩৫), কালীঘাট ১৯৩৪ হইতে লীগ্ভুক্ত। স্পোর্টিং ইউনিয়ন্ ও হাওড়ার প্রথম বিভাগে উঠা ও সে বিভাগ হইতে নামিয়া যাওয়া ঘটে কয়েক বৎসরের মধ্যে। পুরাতন বাঙালীর দল এরিয়ন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন স্থানে পড়িলেও, একাধিক কারণে প্রথম বিভাগে থাকিবার কারণ হইয়া থাকে। দেশীয় দল মোহামেডন্ উপর্য্যুপরি পাঁচবার লীগ্ জয়ী হওয়ায়, ইয়োরোপীয়ন্ দলের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইয়োরোপীয়ন্ ও লীগ্—বাঙালী ও ইয়োরোপীয়ন উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল আই-এফ্-এ। লীগ্ গঠিত হয় একা ইয়োরোপীয়েনর দ্বারা, দেশীয়কে দূরে রাখিয়া। ক্রীড়াক্ষেত্রে গণ্ডী বাঁধিয়া দেয় এই অ-ক্রীড়কেরা। সেই অ-ক্রীড়কোপযোগী ব্যবহার লীগ্ গঠনকারীরা ও তাৎকালীন লীগ্ প্রতিযোগী দল করায় লীগের বনিয়াদ-দোষস্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। সেই বনিয়াদের উপর যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, দেশীয় দল ইয়োরোপীয়নের সহিত

৺সতীশ মতিলাল

৺কালী মুখার্জ্জী
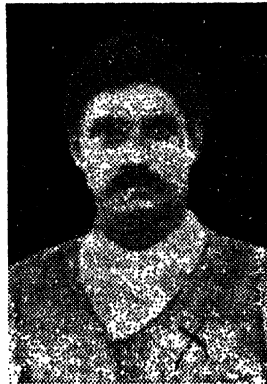
৺বিনয়প্রসাদ

সে-যুগে শোভাবাজারের শ্রেষ্ঠ তিনজন খেলোয়াড়

অনুমতি পায়। পুরাতন দল মোহনবাগানের লীগ্ প্রতিযোগিতার ফল খুবই সন্তোষজনক। দ্বিতীয় স্থান অধিকার তাহারা করে চারিবার। তন্মধ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থানাধিকারী ডালহাউসীর সহিত ব্যবধান তাহাদের থাকে মাত্র দুই জয়াঙ্কের ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের লীগ্ জয়ী ক্যাল্কাটার সহিত তাহাদের ব্যবধানের মাত্রা এক জয়াঙ্ক মাত্র। নূতন দল ইষ্টবেঙ্গল ও তিনবার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। এই তিনবারের প্রতিবারই লীগ্-জয়ী ও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য মাত্র এক জয়াঙ্কের। বাঙালীর পুরাতন ও নূতন উভয় দলই সুতরাং প্রতিপক্ষ ইয়োরোপীয়নগণের (সামরিক ও অসামরিক) বিশেষ ভীতির সমভাবে এখন তাহার দখলীদার। দেশীয় দলের সমধিক ক্রীড়াধিপত্যে ইয়োরোপীয়ন্ দল এখন কিন্তু অতিষ্ঠ। নয় বার লীগ্জয়ী ক্যাল্কাটার অবস্থা এখন সসেমিরে। চারিবার লীগ্জয়ী হইয়াও ডাল্হাউসী এখন দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম বৎসরের লীগের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং পরে একাধিকবার তৃতীয় স্থানাধিকারী রেঞ্জার্সের দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাওয়াও উল্লেখযোগ্য। সামরিক দলের 'বোলবোলাও' ১৯৩৪ হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তালিকার খুব নিম্ন স্থানে তাহাদের অবস্থান এখনকার লীগের বাৎসরিক ঘটনা। ক্যাল্কাটা ও ডালহাউসী প্রমুখ ইয়োরোপীয়ন ক্লাবসমূহের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে

নানা কারণে। লীগ্ যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এই প্রতিযোগিতা 'পারিবারিক' ব্যাপারের মধ্যে তাহারা করিয়া লয়—নাচন-কোদন আপনাদের মধ্যেই চলিতে থাকে। তখনকার দেশীয় দল শোভাবাজার ইয়োরোপীয় দলের বিরুদ্ধে শীল্ডে বিশেষ জুত না করিতে পারিলেও, জয়াঙ্ক-গণনায় যে প্রতিযোগিতায় জয়ী নির্দ্ধারিত হইবার প্রথা সেই লীগে্ তাহাদের ঢুকাইয়া ইয়োরোপীয় দলের শীল্ডের ইজ্জৎ নষ্ট করাইবার সুযোগ করাইয়া দেওয়া সমীচিন, লীগের উদ্যোগীরা মনে করেন নাই—ফাঁকা পথে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। আরও কথা ছিল। 'ষ্টেট্স্‌ম্যানের' ভাষায় হেয়ার স্পোর্টিং 'মেল্‌স্পিডে' ছুটিতেছিল; তাহাদের নিকট হইতে শত হস্ত দূরে থাকাই তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করে। লীগ্ গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখার ইহাই প্রধান কারণ। কোনও জিনিষই চিরকাল গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, লীগ্ও যায় নাই। গণ্ডী মুছিয়া ফেলিয়া হেয়ার স্পোর্টিং-এর পরবর্ত্তী দেশীয়দিগের প্রধান দল তিনটী মোহনবাগান, মোহামেডন্ ও ইষ্টবেঙ্গল ইয়োরোপীয় দলগুলিকে সরিষা ফুল দেখাইয়া দিতেছে—'ত্রাহি ত্রাহি' রব তাহাদের সামরিক ও অ-সামরিক সকলের মুখে। তাহাদের বিলাপ, "দেশীয় 'পেশাদার' খেলোয়াড়ের জন্য তাহাদের আজ এই দুর্দ্দশা"। এই অছিলায় তাহাদের কেহ কেহ নূতন লীগের আয়োজন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রতি-যোগিতাদিতে পেশাদার খেলোয়াড় লইয়া খেলার অপক্ষপাতী আমরা নহি। তবে পেশাদারী চলিতেছে যে ভাবে তাহার আমরা বিশেষ বিপক্ষে, বলিয়াছি বহুবার। ইহার মধ্যে একটী কথা এই—শোভাবাজার ও হেয়ার স্পোর্টিং-এর আমলে অসামরিক ইয়োরোপীয় দল ক্যাল্‌কাটা ও ডালহাউসী আপনাপন দলের জন্য বিলাত হইতে বা ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ভাল খেলোয়াড় সংগ্রহ করিয়াছে যে ভাবে, তাহাও 'পেশাদারী'র মধ্যে পড়ে নাকি? ভাল খেলোয়াড়কে ভাল চাকুরীর লোভ দেখাইয়া আনান হয় নাই কি? হইয়াছে প্রায়ই। 'পেশাদারী' আরম্ভের কর্ত্তা সুতরাং তাঁহারাই। তাঁহাদের মুখে 'পেশাদারী' সম্বন্ধে আপত্তি শোভনীয় নহে। তবে হ্যাঁ, পেশাদারী তখন যে ভাবে চলিয়াছে তাহা এখন রূপান্তরিত। বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে তাহার ফল ত' ফলিবেই—'পেশাদারী'র প্রবর্ত্তকেরা এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন! লীগে ইয়োরোপীয়ন্ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান্ হালি দল কাস্টম্‌স্ সময়ে সময়ে লীগের শক্তিশালী দলকে 'বেদম্' করিয়া দিবার জন্য আমাদের কাছে তাহারা 'গণ্ডার মারা' আখ্যা পাইয়াছে। তাহাদের এই কসরতে লীগ-তালিকার সু-উচ্চ স্থান একাধিকবার তাহারা অধিকার করিয়াছে। এই দলে, ই-বি-আর-এ এবং পুলিশ দলে ভাল খেলোয়াড়ের চাকুরী পাওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এভাবে খেলোয়াড়-সংগ্রহেও 'পেশাদারী'র ছায়া কি পড়ে না? যাহারা চাকুরী দিতে পারে না, তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে। ইহাই ভিতরকার কথা। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, পেশাদারী এখন রোধ করা সহজসাধ্য নহে। লীগের ইয়োরোপীয়ন দলসমূহ ইহা লইয়া বৃথা গর্জ্জন না করিলেই ভাল হয়। তবে সত্যকার সখের খেলোয়াড় যাহারা, তাহাদের পেশাদারের সঙ্গে একসঙ্গে খেলার আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সে দিক হইতে 'সৌখীন' ও 'পেশাদার' খেলোয়াড়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হওয়াই উচিত।

খেলার তারতম্য—এখানকার খেলার আদি অন্ত, নাড়ী-নক্ষত্র যাঁহারা জানেন এবং যাঁহারা ক্রীড়াদক্ষ—খেলার কখন কার অবস্থা কেমন তাহা তাঁহাদের নখদর্পণে আছে। খেলা যে উত্তরোত্তর অবনতির দিকে যাইয়া শোচনীয় অবস্থায় উপনীত, সে বিষয়ে তাঁহারা একমত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লীগের দব্‌দবা ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লীগ্-ধুরন্ধরদিগের অপকর্ষ খেলার নমুনা এবং তাহার পরে জার্ম্মান মহাযুদ্ধের কারণে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে পুরাতনের একেবারে অন্তর্দ্ধান ইউরোপীয় সামরিক ও অসামরিক দলের ক্রীড়াশক্তি হ্রাস করিয়া দেয় এমনভাবে যে, দেশীয় যে সকল ক্রীড়ক আপনাপন উন্নত অবস্থাতে ইয়োরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে 'দাঁত ফুটাইতে' পারে নাই, তাহারা তাহাদের বিশেষ অপকর্ষ অবস্থায় সেরা ইয়োরোপীয় দলকে 'নকড়া, ছ'কড়া' করিয়া দিয়াছে।

এই সময়ের কয়েক বৎসরের লীগ্-তালিকা দেখিলে সকলেরই ইহা বোধ্যগম্য হইবে। খেলায় ইয়োরোপীয়ের ক্রমিক অবনতি হইতে হইতে যে অবস্থায় তাহারা পতিত হয়, তাহাতে দেশীয়ের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অপকর্ষ হইলেও তাহাদের সেই অবস্থাই ইয়োরোপীয়ের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া পড়ে। ইহার উপর দেশীয়ের মধ্যে ২১৫ জন খেলোয়াড় উৎরাইয়া যাওয়াতে, ইউরোপীয়ের দেশীয়ের বিরুদ্ধে পাল্লা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মুসলমান খেলোয়াড় দল 'সোণার টোপর মাথায় দিয়া' বাহির হইয়া পড়িল। সোণার টোপরের জয়-জয়কার পড়িল চতুর্দ্দিকে। ইয়োরোপীয় দল তখন একেবারে হতবীর্য্য। বাঙালী হিন্দু খেলোয়াড় পড়া অবস্থার উন্নতি ঈষৎ করিলেও এবং তাহাদিগের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান খেলোয়াড়দের অনেকের অপেক্ষা উন্নত হইলেও, সমষ্টিগত খেলা মুসলমান দলের হইতে লাগিল তুলনায় অনেক ভাল। ইহাই মুসলমানের বার বার লীগ্-জয়ের গুহ্য কারণ। পড়া অবস্থা তুলিতে তুলিতে মোহনবাগান, ইষ্ট্ বেঙ্গল ও ভবানীপুরের ঘোর লীগ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল দেখিয়া তাহাদের কাহারও না কাহারও ভবিষ্যতে সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে মনে হয় সকলেরই। দলের খেলা পড়িয়া যাওয়া এবং তাহা তুলিবার আগ্রহে দলে 'বিদেশী' আমদানীর আধিক্য সৌভাগ্যোদয়ের বিলম্ব ঘটায় কয়েক বর্ষ। বিদেশী খেলোয়াড়ের মোহ হইতে মোহন-বাগানকে মুক্ত দেখিয়া লীগে তাহাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ্যভাবে আমরা ইঙ্গিত করি। আমাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

লীগ্ জয়ী মোহনবাগান : ১৩৩৯

লীগ-জয়ী হইবে কে?—১৯৩৯-শের লীগ-জয়ী সম্বন্ধে এই প্রশ্ন আমরা করিয়াছিলাম দুই মাস পূর্ব্বে। গত আষাঢ় সংখ্যার 'প্রবর্ত্তকে' সে প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজেরাই দিই। তখন লীগের প্রথমার্দ্ধ শেষ হইতে বিলম্ব ছিল। বিশ সংখ্যক খেলা পর্য্যন্ত মোহনবাগান তালিকার শীর্ষ স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। বক্রি কয়টী খেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান সংখ্যা প্রবর্ত্তকের মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। তাহা হউক, মোহনবাগানের লীগ্ সাফল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী হইবে রেঞ্জার্স ও ইষ্ট্ বেঙ্গল, ইঙ্গিতে আমরা বলিয়াছিলাম। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হইতে চলিয়াছে রেঞ্জার্স ই—ইয়োরোপীয়ের সৌভাগ্যের কথা। গলদ না ঘটাইলে (সে কথা পরে বলিতেছি), ইষ্ট বেঙ্গলেও তালিকায় সম্মানের স্থান অধিকার করিত সুনিশ্চিত। মোহামেডানের প্রথম ১১টী খেলায় ফল বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মনে হয় লীগে

তাহাদের এবার কোনও আশা নাই। এই কারণে এই বৎসরের লীগ্ জয়ীর নাম আলোচনা কালে তাহাদের কথা আমরা আদৌ উল্লেখ করি নাই। শেষাশেষি রহমৎ ও তাহার জুড়িদারের খেলার তোড়ে লীগ্ তালিকায় মোহামেডনের স্থান সুউচ্চে অবস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। উনিশটী খেলা খেলিয়া যখন তাহারা তৃতীয় স্থানে অবস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

লণ্ডনে দর্শক—গোল্

কলিকাতার দর্শক—গোল্

আনুগত্যহীনতার অপরাধে তাহারা, ইষ্ট্ বেঙ্গল এবং কালীঘাট কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আই-এফ্-এর অধীন কোনও প্রতিযোগিতায় ছয়মাস যোগদান করিতে বঞ্চিত হইয়াছে। এরিয়ন ও ভবানীপুর সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে আমরা তাহাদের ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম। কষ্টেস্থষ্টে এরিয়ন রক্ষা পাইবার পথ করিয়া লইয়াছে। কয়েকজন সুদক্ষ নূতন খেলোয়াড় ভবানীপুরের দলভুক্ত হওয়াতে তাহাদের দুরবস্থা কাটিয়া যায়। কেবল ইহাই নহে মোহনবাগান ও মোহামেডনকেও তাহারা পরাজিত করিয়াছে। জয়ীর 'শ্বাস ক্রিয়া' অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত হওয়াতে ইহা ঘটিবার সুযোগ পায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় 'খেল্' কাষ্টম্‌স্ এবার দেখাইতে পারে নাই। ই-বি-আর এর খেলাও বিশেষ উত্তেজনাজনক হয় নাই। পুলিশের তোড়জোড় বিশেষ সুফল দেয় নাই। ক্যামেরণ ও বর্ডারার্স সম্বন্ধে অনুমান যাহা করা হইয়াছিল সেই মতই তাহারা খেলিয়াছে তবে রেঞ্জার্সকে ক্যামেরণের ৫—২ গোলে হারান অপ্রত্যাশিত। ক্যাল্‌কাটার খেলা খুব নিন্দাজনক না হইলেও ভাগ্য তাহাদের বিপক্ষে গিয়াছে প্রতি পদে। লীগ্ তালিকার সর্ব্বনিম্ন স্থানে এখন তাহারা অবস্থিত। অবস্থা উন্নত করিবার কোনও সম্ভাবনা ক্যাল্‌কাটার এবার নাই।

খেলার কথা—'খেলার মাঠে অনিশ্চয়তা' আছে বটে কিন্তু এই 'অনিশ্চয়তা' ঘটে ক্বচিৎ। লীগ খেলায় যখনই নামজাদা দলের পরাজয় ঘটিয়াছে 'অনিশ্চয়তা'র বুলি তখনই আওড়াইয়াছে একাধিক 'দৈনিক-এর' 'দক্ষরা'। যক্ষের মত এই সকল 'দক্ষ' তাঁহাদের 'কম্প্লিমেণ্টারী টিকিট' সামলাইবার মতলবেই কাঁদুনি কাঁদে। প্রকৃতপক্ষে ভবানীপুরের মোহনবাগান ও মোহামেডনকে এবং ক্যামেরণের রেঞ্জার্সকে পরাজিত করা খেলার মাঠে অনিশ্চয়তার কারণে ঘটে নাই, খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া জয়ী জয়লাভ করিয়াছে। মোহনবাগানের বর্ডারার্সের সহিত খেলার ফল সমান-সমান হওয়ার কারণ মোহনবাগানের ঐ খেলা জঘন্য হওয়া। ঐ খেলার এক পক্ষ

যে লীগনেতা খেলা দেখিয়া তাহা মনে করা কঠিন হইয়াছিল। খয়রাতী খেলায় মোহনবাগান ও মোহামেডন্ সমান-পাল্লা (১-১) দিলেও মোহামেডনের খেলা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। ইহাদের প্রথম খেলার ফলও হয় সমান-সমান (০-০)। অপর পক্ষে ঘোর বৃষ্টিতে কাষ্টমসের ন্যায় দলকে 'পাত পাতিতে' বাধা দেওয়ায় মোহনবাগানের বাহাদুরী খুবই। পুলিশকে মোহনবাগানের ৫ গোলে পরাজিত করা ঘটে লীগ্‌নেতার উপযুক্ত তাহাদের খেলার 'জৌলুষ' হওয়াতে। রেঞ্জার্সকে মোহনবাগানের ২ গোলে পরাজিত করা প্রশংসার্হ। ক্যামেরণকে ৬ গোলে, কাষ্টম্‌স্‌কে ২ গোলে, মোহনবাগান ও মোহামেডন্-বিজয়ী ভবানীপুরকে ৩-২ গোলে পরাজিত করিয়া কালীঘাট পরাজিত হয় মোহামেডন্ কর্ত্তৃক ৪-১ গোলে। দ্বিতীয় স্থানের নিশ্চিত অধিকারী এবং সম্ভব হইলে প্রথম স্থানেরও দাবীদার হইতে মোহামেডন্, ইষ্ট্ বেঙ্গল্, কালীঘাট ও রেঞ্জার্সের 'দৌড়াদৌড়ি' উত্তেজনার সৃষ্টি যথেষ্ট করিলেও মোহনবাগানের ধীরতা ও খেলার সমতা লীগ-তালিকায় তাহাদের শ্রেষ্ঠাসন অটুট রাখে। পরিপূর্ণ সংখ্যার খেলা শেষ এখনও না হইলেও মোহনবাগানকে আমরা ১৯৩৯-শের লীগ চ্যাম্পিয়নরূপে অভিনন্দিত করিতেছি— তাহাদের জয় সুনিশ্চিত জানিয়া। খাঁটি বাঙালী খেলোয়াড় লইয়া তাহারা হয় শীল্ড জয়ী। ১১ জনের মধ্যে ৯ জন বাঙালী খেলোয়াড় লইয়া তাহাদের লীগ সাফল্যে বাঙালীর মুখ সমধিক উজ্জ্বল হইল। সভাবাজার ও হেয়ার স্পোর্টিং-এর আজীবন চেষ্টার সুফল এতদিনে ফলিল। বাঙালীর এই জয় বাঙালীর অন্যান্য দলের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হউক, আমাদের ঐকান্তিক কামনা। এই সঙ্গে দেশীয় আরও তিনটী দলের তালিকার উচ্চাসন অধিকার করার সম্ভাবনা যোল আনা ছিল। তাহা করিলে সোণায় সোহাগা হইত। হইল না তাহাদের স্বকৃত কর্ম্মের ফলে। ইহার জন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত।

লীগ-তত্ত্বাবধারন—লীগ প্রতিযোগিতার অনেক খেলাতেই নির্দ্দেশকের নির্দ্দেশে মারাত্মক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে, অকুণ্ঠিত চিত্তে আমরা বলিব। আবার অনেক স্থলে নির্দ্দেশকের নির্দ্দেশ নির্ভুল হইলেও দলবিশেষের তাহা বিপক্ষে যাওয়াতে সেই দলের সমর্থকদিগের ইতরতায় নির্দ্দেশক বিশেষভাবে অপমানিত হইয়াছেন। এমন কি অক্ষত শরীরে খেলার পরে গৃহপ্রত্যাগমন করাও তাঁহার পক্ষে দায় হইয়াছে। এ বর্ব্বরতার প্রশ্রয় খেলার মাঠে কিছুতেই দেওয়া উচিত নহে। উচিত কর্ম্ম যে কারণেই হউক করিতে দেখা যায় নাই। আত্মসম্ভ্রমশীল একাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দেশকের কার্য্য করিতে সুতরাং অস্বীকৃত হন। ফলে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা 'কাজ চালাইতে' কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছেন। সমস্যার কথা। এ সমস্যা পূরণ করিতে না পারিলে 'অরাজকতা' অবশ্যম্ভাবী।

'লীগ-তালিকা'—'প্রবর্ত্তক' মুদ্রিত হইবার সময়ে তালিকার অবস্থা এইরূপ থাকে :—

	মোট খেলা	জিত	হার	সমান পাল্লা	জয়াঙ্ক
মোহনবাগান	২০	১৩	১	৬	৩২
রেঞ্জার্স	২০	১২	৬	২	২৬
মোহামেডন্	১৯	১০	৪	৫	২৫
ইষ্ট্ বেঙ্গল্	১৯	৮	৩	৮	২৪
কালীঘাট	১৮	৯	৪	৫	২৩
কাষ্টম্‌স্	২১	৮	৬	৭	২৩
ই-বি-আর	২০	৮	৫	৭	২৩
পুলিশ	২১	৭	১০	৪	১৮
ক্যামেরণ	২১	৫	৯	৭	১৭
এরিয়ন	২১	৬	১১	৪	১৬
ভবানীপুর	২০	৬	১০	৪	১৬
বর্ডারার্স	২১	৪	১৪	৩	১১
ক্যাল্‌কাটা	২১	১	১২	৮	১০

দোষারোপ—সংবাদ-পত্রাদির মারফতে মোহামেডন্ স্পোর্টিং ক্লাব 'মিটিং' করিয়া যাহা জানায়, তাহার ভাবার্থ এই যে, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই উপর নির্দ্দেশকের অন্যায় নির্দ্দেশে তাহারা অতিষ্ঠ, সুতরাং আই-এফ্-এর অধীন কোনও প্রতিযোগিতার সহিত তাহারা কোনও সংস্পর্শ রাখিবে না, ক্লাব তাহার বিধি-ব্যবস্থা করুক। প্রকাশ্য-ভাবে আই-এফ্-এর বিরুদ্ধে তাহাদের

এই গুরুতর অভিযোগের কথা জানিতে পারিয়া আমরা শঙ্কিত হই। কোনও কোনও নির্দ্দেশকের কোনও কোনও নির্দ্দেশে ভুল-চুক্ ঘটিয়াছে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অন্যায় নির্দ্দেশও কোন কোন স্থলে দেওয়া হইয়াছে তাহাও আমরা জানি। কিন্তু একা মোহামেডনকে লক্ষ্য করিয়া যে এ কার্য্য কেহ করিয়াছে, ইহা প্রলাপের রোগী ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না। প্রলাপে বলা বলিয়াই আই-এফ্-এ এ কথায় কাণ দেয় নাই। কিন্তু মোহামেডন্, ইষ্ট বেঙ্গল, কালীঘাট ও এরিয়ন যখন তাহাদের লীগ্ খেলার জন্য নির্দ্ধারিত নূতন দিনগুলি সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া এবং সেই সূত্রে পক্ষপাতিত্ব দোষ আই-এফ-এর ঘাড়ে চাপাইয়া পত্রে পত্রে ঘোষণা প্রকাশ করিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে এরিয়ন ব্যতীত অপর তিনটী দল আই-এফ-এ পরিচালিত কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ এ বৎসরের মত করিতে পাইবে না, হুকুম জারী হইল। এরিয়ন দুঃখ প্রকাশ করায় পরিত্রাণ পাইয়াছে। শাস্তি কঠোর সন্দেহ নাই। অপরাধও গুরুতর। তবে ইহাদের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিয়া এবং তাহা না করিলে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা দিলে ভাল হইত। কেবল এক্ষেত্রে নহে অনেক ক্লাবই সময়ে সময়ে এমন বাড়াবাড়ি করিয়াছে যাহা সাধারণের চক্ষেও ঠেকিয়াছে বেশ। মোহামেডনের হুমকি দেওয়া ত' লাগিয়াই আছে। আমাদের মনে পড়ে মোহনবাগান একদিন খেলিতে খেলিতে উল্টা খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়, জেলেপাড়ার সং-এর ধরণে। শীল্ড্ ফাইনালে একবার দুইটী সামরিক দল কোর্ট ধরিল, 'খেলিব না'—খেলিলও না। আই-এফ্-এর আস্কারাতেই এ সকল হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে—পাকে প্রকারে খেলার মাঠের ইজ্জৎ নষ্ট করিবার পথ ইহাতে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আস্কারা দেওয়াও যেমন অন্যায়, খেয়ালের বশে বাঁধাবাঁধি করাও তেমনি অন্যায়। আশা করি, আই-এফ্-এ খেয়ালের বশে 'লাঠি-সোঁটা' ধরে নাই। সঙ্ঘাধীন দল সমূহের কাহারও কাহারও যথেচ্ছাচারিতা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে সত্যই অসহনীয়। খেলার অশেষ অনিষ্ট ঘটাও ইহাতে অনিবার্য্য। পুরাতন আই-এফ-এর এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহা ছিল বলিয়া মোহামেডন্ এথেলেটিক্ ক্লাব আই-এফ-এ হইতে চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয়। সে কাল গিয়াছে, আই-এফ-এ এখন বক্তৃতাক্ষেত্রে পরিণত—তৈয়ারী 'টাটে' বসিয়া কর্ম্মকর্ত্তারা বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখান। ইহাদের মধ্যে কয়জনের 'পায়েবলে'র অভিজ্ঞতা আছে, গত বৎসরে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রশ্নের উত্তর পাই নাই, কারণ সন্তোষজনক উত্তর দিবার উপায় বড় নাই। হোমরা-

নুর মহম্মদ (মোহামেডন)

লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্ট্ বেঙ্গল)

মুলার (রেঞ্জার্স)

জোসেফ্ (কালীঘাট)

চোমরা দলের মন রাখিয়া চলা ভিন্ন ইহাদের গত্যন্তর নাই। এই ভাবেই আই-এফ-এ চলিতেছে কয়েক বৎসর। ফলে নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিবার বালাই আই-এফ-এ ভুক্ত দলসমূহের বিশেষতঃ হোমরা-চোমরাদের একেবারে নাই। ইহার প্রমাণ আই-এ-এর সভাপতি নিকলস্ একাধিক 'মিটিং'এ কাহারও নিকট হইতে পান নাই কি? পাইয়াছেন বেশই। তথাপি কি তিনি অস্বীকার করেন, নবীন আই-এফ-এর

মজ্জাগত হইয়া যায় নাই? সপারিষদ্ সভাপতি মহাশয়ের বিদ্রোহী দল কয়টীকে শাস্তিপ্রদান কঠোর হইলেও নিয়মানুবর্ত্তিতার খাতিরে আমরা তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আই-এফ-এ কিন্তু 'রায়' বজায় রাখিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস আমাদের হয় না।

অন্যান্য লীগ—দ্বিতীয় বিভাগে স্পোর্টিং ইউনিয়ন্ শীর্ষস্থানে অবস্থিত। পর বৎসরে প্রথম বিভাগেও তাহাদের শক্তির পরিচয় তাহারা দিবে—আশা করি। তৃতীয় বিভাগে বি-এন্-আর্ এখন প্রথম স্থানাধিকারী হইলেও গ্রীয়ার ইহাদের কাণ ঘেঁসিয়া আছে। চতুর্থ বিভাগের নেতা এখন ট্রপিকাল। ইহাদের স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই। পাওয়ার-লীগের প্রথম বিভাগে বি-এন্-আর এবং দ্বিতীয় বিভাগে ইয়ং বেঙ্গল্ সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত।

মোহনবাগানের জয়—শ্রাবণের 'প্রবর্ত্তক' প্রকাশিত হইবার সময়ে লীগে মোহনবাগানের পূর্ণসংখ্যক খেলা সম্পূর্ণ হইয়া যায়। বাইশটী খেলায় তাহাদের জয়াঙ্ক দাঁড়ায় ৩৫। দ্বিতীয় স্থানে রেঞ্জার্স এবং তৃতীয় স্থানে কাষ্টমস্ অবস্থিত। আশা করি মোহনবাগানের লীগ জয় প্রত্যেক বাঙ্গালী দলকে অনুপ্রাণিত করিবে, খেলার মাঠে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

ক্রিকেটের কথা—ভারতবর্ষে আগামী টেষ্টে ভারতীয় ক্রিকেট্ দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করা হইবে কাহাকে, তাহা ধার্য্য হইবে শীঘ্রই। নেতৃত্ব করিতে মেজর নায়াডুর সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। তাহা না থাকিলেও হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কারচুপিতে নায়াডুর নেতৃপদে বৃত হওয়ার পথে বাধা বিপত্তি অল্প নহে। নায়াডু নেতা নির্ব্বাচিত না হইলে তাঁহার কিছু আসিয়া যাইবে না, আসিয়া যাইবে ভারতীয় ক্রিকেটের। 'নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ' করার মতিগতি ফেরান কিন্তু অসম্ভব।

ইংলণ্ডে ভারতীয় খেলোয়াড়—ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট্ লীগে বার্ণলের হইয়া অমরনাথ লোয়ার হাউসের বিরুদ্ধে একা করিয়াছে ১৬০। বার্ণলের তখন মোট মারদৌড়ের সংখ্যা ১২০। এই খেলায় বার্ণেলের বন্দুকাজ অমর সিং বিপক্ষের ৬ জন ব্যাটম্‌দারকে পাড়ে ৫৩ মারদৌড়ে। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের আর একটী খেলায় বার্ণলের হইয়া অমর সিং করে শতাধিক তাহার ব্যাটম্‌দারীর তোড়ে দর্শকের উল্লাসের সীমা থাকে না। উইম্বল্‌ডনের একক প্রতিযোগিতার 'কোয়টার ফাইন্যালে' গৌস মহম্মদ, জি-ভন্-ক্রাম্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে

ইংলণ্ডে টেনিস্‌কুশলী গৌস্ মহম্মদ

৬-১, ৬-৩এ প্রথম গণ্ডী হইতে এই গণ্ডীর। পর্য্যন্ত গৌসের খেলার কায়দায় 'যাদুকর' আখ্যা সে প্রাপ্ত হয় লক্ষ্য করিয়া অনেকেরই মনে হয় শেষ জয়ী হইবে সেই। প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণ্ডীতে তাহার খেলার ধরণের ইতর বিশেষ শেষ-গণ্ডীতে হওয়াতে তাহার পরাজয় ঘটে। উইম্বল্‌ডনের এই টেনিস্ প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডের একটী শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলিয়া গণ্য। কুইনস্ ক্লাব প্রতিযোগীতার বাজী মারিয়াছে গৌস মহম্মদ।

৪

শ্মশান হইতে বাড়ী ফিরিলাম আর এক দুশ্চিন্তার ভার বহন করিয়া। অগ্রজের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, এই কয় মাসের মধ্যে একমাত্র উপার্জ্জনের ক্ষেত্র কাঠের কারখানাটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় অগ্রজের অবস্থা চক্ষে পড়িল; বুঝিলাম, তিনিও কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার আমাদের বহন করিতে হয় নাই, সুহৃজ্জনের অর্থেই এই ক্ষেত্রে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। কিন্তু হিন্দুর পিতৃদায় বড়দায়। ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক, বাহিরে নাম ও খ্যাতি যেরূপ আছে, তাহাতে পিতৃশ্রাদ্ধ নীরবে সম্পন্ন করার নয়। অগ্রজ জানাইলেন—তিনি এই বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য করিতে অক্ষম। আমিও একপ্রকার ভিক্ষুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতৃদায় হইতে উদ্ধারের চিন্তা অপরিত্যজ্য হইল।

চিন্তা যখন সুরু হয়, হৃদয়ে যখন ভাবানুভূতি জাগে, তখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক সকল প্রকার চিন্তা ও অনুভূতি হইতে মুক্ত হউক, এই ইচ্ছা যতই করি, ততই চিন্তা ও অনুভূতির স্রোতঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। ধ্যান করিতে বসিলে, কোন এক বিষয়ের চিন্তা-প্রবাহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মস্তিষ্কে চলিতে থাকে। এই চিন্তা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ে তদ্বিষয় সম্বন্ধে অনুভূতির সাড়া তুলে। সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের সূত্র খুঁজিয়া পাই। আত্ম-সমর্পণের সাধনায় আমি কিছু হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অদৃশ্য শক্তির হাতে সমর্পণ করিতে পারি নাই। অন্তরেন্দ্রিয় প্রাণ, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি এক দিনের জন্যও নিষ্ক্রিয় জড়বৎ উদাসীন রাখিতে পারি নাই। যে নীথর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঊর্দ্ধলোক হইতে জ্ঞান ও শক্তির অবতরণের সম্ভাবনা, সে অবস্থা আমার আত্মসমর্পণযোগে ঘটিয়া উঠে নাই। আমি কিছু করিতে চাহি নাই। যেমন পূর্ব্বে চলিতেছিলাম, আত্ম-সমর্পণের সাধনা গ্রহণ করিয়া তেমনই সব চলিতেছিল। আমি ভাবিতেছি, আমি করিতেছি, আমার অনুভূতি হইতেছে, এই চেতনাটা স্বতঃই উল্টাইয়া গিয়া অন্তর্জ্জগতের কোথাও একটা নূতন চেতনার স্তর গড়িয়া উঠিতেছিল মাত্র, যেখানে এই জ্ঞানই ঘনীভূত হইয়া যেন নিরন্তর বুঝাইয়া দিতেছিল যে, মস্তিষ্কে যে চিন্তাস্রোতঃ, চিত্ত-মন লইয়া যে অনুভূতির সাড়া, প্রাণে যে কর্ম্ম-প্রেরণা, তাহার কর্ত্তা আমি নহি। আমার মস্তিষ্ক লইয়া যে চিন্তা চলিতেছে, তাহা যেমন আমার কর্ম্ম নহে, উহা নিবারণ করারও সাধ্য আমার নাই। নয়নের দৃষ্টি যে দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে এবং আমিও তাহার জন্য দায়ী নহি। আমার এই চেতনায় অতীতের যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা চক্ষের উপরই ভাসিয়া আছে। আত্মসমর্পণের সাধনায় কি অন্তর্যন্ত্র, কি বহির্যন্ত্র কিছুতে অনুরক্ত বা কিছু হইতে বিরত হওয়ার জন্য আমার কোনই চেষ্টা ছিল না। ধ্যানের জগৎ এই সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হইত। হস্ত, পদ সঞ্চালিত হয়, চক্ষু-কর্ণাদি নিজ নিজ কর্ম্ম করে, প্রাণে কত কর্ম্মপ্রেরণা, চিত্তে কত নূতন ও পুরাতন সংস্কারের লীলাতরঙ্গ! মনের জগতে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের কত চাঞ্চল্য! বুদ্ধির জগতে কত স্বপ্ন, কত কল্পনা! দিব্য হউক, আসুরিক হউক, সে বিচার আমার ছিল না। আমার যেখানে ধ্যান জমিত, সেই স্থান হইতে এই শরীর-মনের জগৎটা পৃথক্ হইয়া পড়িতেছিল। শরীর-মনকে কোন দিন সংযত করি নাই, বশে আনিতে চাহি নাই। আত্মসমর্পণের সাধনায় এই আধার-যন্ত্রটা উৎসাহে আনন্দে যাহা খুসী করিত, এই সকলের উপর আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছুর কর্ত্তৃত্বের জ্ঞানটা ভিতরের একটা জায়গায় পাকা হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে আত্মসমর্পণের সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সংযম-শৃঙ্খলার সীমায় আমার এই আধারটা পরিবর্ত্তিত ও শোধিত হয় নাই। উহা

উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নিরন্তর শক্তির দ্যোতনায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। দুঃখের আবর্ত্তে পড়িলেও ভাবি নাই। আনন্দের আতিশয্যেও আত্মহারা হই নাই। শাশ্বত সুখ যদি চরম সিদ্ধান্ত হয়, তাহা শরীর মনে আমি পাই নাই। পাইয়াছি শরীর মন ছাড়া অন্যত্র। বিষয়টা ঘটনার সংঘাতেই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। আমি এইখানে একটু গৌরচন্দ্রিকা করিয়া রাখিলাম।

বুদ্ধি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইল। শ্রীভগবানই চিন্তা সুরু করিলেন। এই চিন্তার কারণ নাই। ইহা সর্ব্বনিয়ন্তার শক্তি-চালিত। চিন্তা বিষয় লইয়া, নিঃস্ব অবস্থা, পিতৃদায় হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ভার যাঁহার, তিনিই ভাবিতে লাগিলেন। মস্তিষ্কের ব্যথা ও ক্লান্তি, উহা মস্তিষ্ক-যন্ত্রেরই অক্ষমতা। ঈশ্বরের চিন্তাযন্ত্র ঈশ্বরই সর্ব্বসামর্থ্যে তাঁহার পরিপূর্ণ চিন্তার উপযোগী করিয়া লইবেন। আত্মসমর্পণ-যোগীর আত্মকর্ম্ম নাই। সবই ঈশ্বর-কর্ম্ম, মল-মূত্র-ত্যাগ পর্য্যন্ত এই চেতনায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব পিতৃ-শ্রাদ্ধের চিন্তা ঈশ্বর-কর্ম্ম বৈ কি!

আমার মধ্যে চিন্তা হয়। চিন্তার সাফল্য-বিফলতা দুইই তরঙ্গের মত উঠিতে ও পড়িতে থাকে, সমস্যার আবর্ত্তে বুদ্ধিবৃত্তির ওলট-পালট চলিতেছে আমার মধ্যে। সমাধানের মূর্ত্তি সহধর্ম্মিণীর নয়নের আলোয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভাবনায় ভাবনায় চক্ষের কোলে কালি পড়িল যে! ভাবনা কিসের? রামচন্দ্র বালুর পিণ্ড দিয়াছিলেন। এক মুঠা তিল-তণ্ডুল কি জুটিবে না?"

চিন্তার মূর্ত্তি আছে, প্রেমের মূর্ত্তি আছে, কর্ম্মের মূর্ত্তি আছে। যখন চিন্তা হয়, সে এক মূর্ত্তি। চিন্তা নানা প্রকারের। তাহার রূপও নানা ভঙ্গী ধরে। যখন বুকে ভালবাসা জাগে, তখন ভালবাসার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। ভালবাসারও প্রকার-ভেদ আছে। রূপভেদও অসঙ্গত নহে। প্রাণে কর্ম্মপ্রেরণার উদয়েও তাহার আর এক মূর্ত্তি। ভিতরে যাহা হয়, বাহিরে তাহারই অভিব্যক্তি। দুশ্চিন্তার মূর্ত্তি মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের দেবী তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। চিন্তা ছিল অভাবাত্মক, কাজেই অভাবের মসীরেখা চক্ষের কোলে ছায়াপাত করিয়াছিল। চিন্তা হইতেছিল আমার মস্তিষ্কে, সমাধান মিলিল তাঁহার নয়নে। এই কর্ম্ম আমার নহে, তাঁহারও নহে—শ্রীভগবানের। চিন্তা-জগতে যিনি আবর্ত্ত সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা নিস্তরঙ্গ করিয়া স্থির ও সমাহিত করিলেন। কি অপরিসীম প্রশান্তি!

পিতৃশ্রাদ্ধের কথা উঠিল আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্বর্গের মধ্যে। হিসাবের অঙ্ক কষা হইল। ষোড়শোপচারে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হইবে, এক বাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইল। ইহাই ছিল ঈশ্বর-বিধান। যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপ্ত হইল। এই সময়ের এক প্রীতিকর স্মৃতির রেখা চিত্তে আঁকিয়া আছে। শ্রাদ্ধের পর নিয়ম-ভঙ্গ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবে বাড়ীখানি সমাকীর্ণ, রন্ধনক্রিয়ায় গৃহকর্ত্রী ব্যাপৃতা। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "দেখ, মেজদির আক্কেল দেখ, এতখানি বেলা হইল, তাহার আসিবার গা নাই। কুটুমের মত তাহার জন্য গাড়ী পাঠাইতে হইবে নাকি? একবার দেখ তো!"

পৌষ মাসের এক প্রহর বেলা অতীত, কুয়াসা কাটাইয়া প্রখর রবি-করে ধরণী উদ্ভাসিত। বৈঠকখানায় খোল-করতালে কীর্ত্তনের সুর উঠিয়াছে। দেবীর আদেশে আমি মেজবৌকে আনিতে চলিলাম। মুণ্ডিত মস্তক, মাথার দীর্ঘকেশ সদ্য চাঁচিয়া ফেলিয়াছি। শুভ্র ধুতি, শুভ্র চাদর। অতীতের বন্ধনমুক্ত। মুক্ত শুভ্র হৃদয়। মেজবৌকে আনিতে চলিলাম। দাসী ছিল, ভৃত্য ছিল; কাজের বাড়ীতে অসংখ্য বালক-বালিকা ছিল—গৃহস্বামীকে তিনি আনিতে পাঠাইলেন মেজবৌকে। আমি সকলের অগোচরেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার তো কিছুই নহে। সবই ঈশ্বরের। পিতৃশ্রাদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পাদিত হইল। এই যে চরণ চলিয়াছে ঈশ্বরশক্তির চালনায়। নয়নের দৃষ্টি ঈশ্বরের। হৃদয়ে কিসের ক্ষুধা জাগে, সে ক্ষুধাও আমার নহে। আমি শুধু দেখি, আমি শুধু অনুভব করি। সূর্য্যকরোজ্জ্বল পথের উপর দিয়া, বিভোর বিহ্বল চিত্তে চলিতেছিলাম মেজবৌয়ের বাড়ীর দিকে। হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া কার কণ্ঠ যেন বিগলিত সুরে গাহিতেছিল—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ী মায়েরে জানে।
সে না যায় তীর্থ-পর্য্যটনে
কালী নাম বিনা না শোনে শ্রবণে।
সন্ধ্যাপূজা কিছুই না মানে
যা করান কালী, এই সে জানে।"

ভাবিতে ভাবিতে মেজবৌয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। গৃহকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সাগরকালী বাবু যেন তাঁরই পিতৃশ্রাদ্ধে উদ্বুদ্ধ। শ্রাদ্ধের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার-বহনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ভার তাঁহারই উপর। তিনি আমারই বাড়ীতে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া আছেন। বাড়ী শূন্য। কেহ নাই। ইহাদের সংসারে এইরূপ ঔদাসীন্যের ভাব নূতন নহে। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নাই। আমি সোজাসুজি দ্বিতল কক্ষে গিয়া একখানি আরাম-কেদারায় ঠেস দিয়া বসিলাম। অশৌচান্তে শ্রাদ্ধপর্ব্বে শরীরের শ্রম কিছু হইয়াছিল, উৎসববাটীর কোলাহল এখানে ছিল না। বড় নিরাপদ্ শান্তিময় স্থান। নিমীলিত নয়নে, বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ অন্তরে সুখকর স্পর্শ অনুভূত হইল। সহসা নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলাম, এক অপরূপ নারীমূর্ত্তি! সদ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা, সমুজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা, একখানি সুশোভন-শাড়ীপরিহিতা—আমার সম্মুখে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন প্রস্তরপ্রতিমা। কোমল বাহুবল্লরী আলম্বিত, স্থির। মণিবন্ধে স্বর্ণ বাহুভূষণ, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর। আমি কুসুমোদ্যানে ফুলের সন্ধান পাইলাম না, সৌরভ প্রত্যক্ষ করিলাম। নারীমূর্ত্তির দৃষ্টি আমার লুপ্ত হইল, আমি নারীত্বের সন্দর্শন পাইলাম। এ-রূপ রক্ত-মাংসের নহে; নারী-স্বরূপের।

কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! কেবল কর্ণে অকপট মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রের ন্যায় একটী ধ্বনি পূতপরশ দিল "সুন্দর"!

কি সুন্দর? এ তো রূপের জয়গান নহে। মেজবৌ কি দেখিয়া আজিকার এই সন্ধিক্ষণে ত্র্যক্ষর স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করিল! আমার অন্তর বাহির চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নদীবক্ষের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে কি করিব, অন্তর্লোকে তাহার একটা সঙ্কেত পাওয়ার জন্য প্রত্যেক স্নায়ুপেশী, রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত মাতাল হইয়া উঠিতেছিল। মেজবৌয়ের দৃষ্টি-সুধার মাদকতায় আমার স্থানকালপাত্র-জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটী মন্ত্র-শব্দ মেজ-বৌয়ের ওষ্ঠপুটে উচ্চারিত হইয়া, আমায় স্থির সমাহিত করিয়া দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিমতী নতি, নতজানু হইয়া করপুটে আমার দিকে অশ্রুপুলকিত নয়নে চাহিয়া বলিল "ঠাকুর, তুমি কত সুন্দর!" আর তারপর তার মাথাটা আমার চরণ-যুগলে এলাইয়া পড়িল। জীবনে এই প্রথম দিন পরকীয়া রতির আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ হইলাম। আমার অন্তর্দেবতা যেন এতদিন এই সোণার কাঠির পরশ অভাবে ঝিমাইতেছিল। আজ 'মেজবৌয়ের' ইন্দ্রজালে সে দেবতা মাথা তুলিয়া, শ্বাসে শ্বাসে নবামৃত বুক ভরিয়া গ্রহণ করিল। যে ভাব অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছিল, সেই মহাভাব গুরুমূর্ত্তি ধরিয়া মেজবৌয়ের শিরে দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া স্বীকার করিয়া লইল—'তুমি আমার শিষ্যা, আর তুমি আমার যুগ-যুগের সহযাত্রী; আমাদের এই অমর সম্বন্ধ অনন্তকালের জন্য।' ইহা যদি দীক্ষা হয়, তাহা হইলে মান্ত্রিক-দীক্ষার আর প্রয়োজন কি? মেজবৌ নবজন্ম লইল। তাহার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী, আর দুই গণ্ডে বসুধারা সেদিন আর কেহ দেখে নাই; সে মন্দিরে সেদিন ছিল সে আর আমি!

উৎসব-বাটীতে দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহদেবীর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। মেজবৌ বেশ সাজিয়া-গুজিয়াই আসিয়াছিল। তাহার মুখকান্তি কি এক অপার্থিব লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া অসাধারণ শ্রী ধারণ করিয়াছিল, সে-রূপ লুকাইবার ছিল না। মেজবৌয়ের দিকে 'তিনি' কয়েক মুহূর্ত্ত অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অক্ষিগোলক সে চাহনীতে নিশ্চল ছিল না, থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য ললাট তাঁহার কুঞ্চিত হইল। তিনি মেজবৌয়ের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, আমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন। আমি

বেশ অনুভব করিলাম, আমাদের দেখিয়া তাঁহার অন্তর্জ্জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই সঙ্কেতের অর্থ কি ভাবে তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহা বুঝা গেল না। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলাইয়া অতি আপনার জনের উপর যে দাবীর কণ্ঠ উঠিতে পারে, সেইরূপ ভাবেই মেজবৌকে আদেশ করিলেন "যাও, দু'জনে গল্প-গুজব খুব হয়েছে দেখছি, এখন খানিকটা বাটনা বাট দেখি!"

নারীর ভাব নারী যেমন বুঝে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। মেজবৌয়ের ভাবান্তর যেমন তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, মেজবৌও তাঁহার অন্তরালোড়নের লক্ষণ বোধ হয় ধরিতে পারিয়াছিল। মেজবৌয়ের জীবনে যে দিব্য চৈতন্যের স্রোতঃ বহিতেছিল, তাহাতে সে অভিষিক্ত হইয়া আজ বড় নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছিল। যে নতি আমার চরণে নামাইয়া তার আজ নব দীক্ষা, সেই নতি উজাড় করিয়া সে ঢালিয়া দিল ছোড়দিদির যুগল-চরণে। প্রাকৃত জগতের আপনার জনের স্পর্শ ও অনুভূতি একপ্রকার; কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে আপনার যে হয়, তার অনুভূতি ও স্পর্শ কি অপ্রাকৃত আনন্দ-পূত, তাহা অনুভব্য, বর্ণনার বস্তু নহে। ছোড়দিদির সহিত মেজবৌয়ের সংযুক্তি আমার চক্ষে মধুবর্ষণ করিল। আমি সেদিন বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সারাবেলা আনন্দে অধীর হইয়া বন্ধুদের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলাম—

হরি যব আওব গোকুলপুর
ঘরে ঘরে বাজব মঙ্গল তুর॥

তারপর যথারীতি ত্রিস্রোতের সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বের ন্যায়ই নাকানি-চুবানী খাইতে লাগিলাম। একদিকে শ্রীঅরবিন্দের স্থির ও শান্ত অধ্যাত্মপ্রবাহ, অন্যদিকে বৈপ্লবিক প্রবল বন্যাস্রোতঃ; আর তালে তালে বহিয়া চলে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ফল্গুধারা। কোন টানে জীবনতরী ভাসিয়া যাইবে, তাহার দর্শনপ্রতীক্ষায় আমার ভিতরটা নীরব, নিশ্চেষ্ট। শ্রীঅরবিন্দের "আর্য্য" আসিতেছে, যোগ-সমন্বয়ের বাণী ধারাবাহিকরূপে পড়িতেছি। গীতার সন্দর্ভ, বেদের নিগূঢ় রহস্য, উপনিষদের নূতন-ভাষ্য নিবিড়ভাবে আলোচনা করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন বিপ্লবের রক্ত-পতাকা চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে। জীবনের পশ্চাতে শাশ্বত সত্তার বিদ্যমানতা যদি স্বপ্ন হইত, সেদিন আমার অস্তিত্ব হয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইত, নতুবা বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পথের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আদর্শ ও লক্ষ্যের এই দ্বন্দ্বযুগে বাহিরে যে ঝড় উঠিত, অন্তরের দেবতা তাহাতে যে অটল থাকিতেন, তার হেতু ছিল আমার চির-সহচরীর স্নেহশীতল সাহচর্য্য। অন্তর-পুরুষের নিকট তিনি যেন সতত নিমীলিত নেত্রে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া, পরম তৃপ্তি আস্বাদ করাইতেন। এই ঝটিকাবর্ত্ত বাহিরে উঠিয়া বাহিরেই শেষ হইয়া যাইত। দুশ্চিন্তা-কাতর নয়নে গৃহ-মন্দিরে দেবীর নিকট যখনই উপস্থিত হইতাম, স্মিতাননা ভরসা দিয়া বলিতেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা শুভ ছাড়া অশুভ নহে। তাহা অতিক্রমের বস্তু নয়। তুমি সব জানিয়াও বড় ব্যস্ত হও। দুর্ভাবনা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিও না।"

দেশের বিপ্লবীদের গোপন অনুষ্ঠান ও আয়োজনের কথা আমি সব জানিতাম। ভারতের সর্ব্বত্র কোন মুহূর্ত্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তিনি এই সকল বিষয়ের সবখানি অবগত ছিলেন না। নিরুদ্বেগ নয়নে স্বামীর কল্যাণ-কামনায় শীতল স্নিগ্ধ দৃষ্টিসঞ্চারে আমি যে নিরাপদ, এই প্রত্যয়ই জাগাইয়া রাখিতেন। মধ্যাহ্নে সঙ্গি-গণকে লইয়া স্নানে বাহির হইতাম। শীতের রৌদ্র বড় মিষ্ট বোধ হইত। বালুতটে দাঁড়াইয়া কত সময়ে ভারতের বিপ্লব চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া কত আলাপ আলোচনা হইত! স্বপ্ন-নেত্রে আকাশের এক প্রান্তে শোণিতলিপ্ত মেঘোদয় দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতাম। গঙ্গাবারি যেন রক্ত-রঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইত। সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইত। এই দুঃস্বপ্ন অন্যের প্রাণে হর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আমার কিন্তু এইরূপ চিন্তায় সবখানি বিষাদ-লিপ্ত হইত। মনে হইত, ভারতদেবতার এই কর্ম্মে সমর্থন নাই। রৌদ্রের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, তীরভূমির উপর নিজের ছায়ামূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম।

বহুক্ষণ আমাকে এইরূপ নীরব নিস্তব্ধ দেখিয়া বন্ধুগণের চিত্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইত। আমাকে ঘিরিয়া তাহারা নীরবে বসিয়া থাকিত। আমি ধীরে ধীরে নির্ম্মল নীলের দিকে চাহিয়া দেখিতাম—অনন্তের কোলে আমার ছায়ামূর্ত্তি সবখানি ছাইয়া প্রকট হইয়াছে। কত ক্ষণ সে মূর্ত্তি অবিকল সুস্পষ্ট থাকিত, বিরাট্ রূপের কল্পনায় অন্তর্জ্জগতে তলাইয়া যাইতাম—অনিমিষ নয়ন ধীরে ধীরে মুদিত হইত ছায়ামূর্ত্তির অস্পষ্টতার সঙ্গে। হাস্যমুখরিত কণ্ঠে স্নানঘাটে আসিতাম। জনশূন্য মধ্যাহ্নে গঙ্গাতটে দশ-বিশ জন বসিয়া যুক্তিতর্কে কোলাহল তুলিতাম। স্নান করিয়া ফিরিতাম আত্মস্থ যোগীর ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া। স্নান সারিয়া আসিতে অযথা বিলম্বের জন্য 'তিনি' তিরস্কারোন্মুখ হইয়া, আমাদের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিতে পারিতেন না। হয়তো ভাবিতেন—কোন দুঃসংবাদ পাইয়া আমরা সুগভীর চিন্তামগ্ন। তিনিও গম্ভীর বিষণ্ণ-মূর্ত্তি হইয়া, অতি সন্তর্পণে আমাদের সম্মুখে অন্নের থালি ধরিয়া দিতেন। সারাদিন, সারারাত্রি এ গাম্ভীর্য্য হয়তো ভাঙ্গিত না। এই সময়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অতি সতর্কতার সহিত সংসারের সকল কর্ম্ম একে একে সমাপন করার ছন্দোনৈপুণ্য আজও চিত্তে অপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া তুলে। হঠাৎ আমাদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শুনিয়া তিনি আমায় বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিতেন, জিজ্ঞাসা করিতেন "মাঝে মাঝে তোমাদের কি হয় বল দেখি?"

আমি সবিস্ময়ে বলিতাম "কেন?" তিনি বলিতেন 'এই হাসিখুশী, তর্কাতর্কি, তারপর সব চুপচাপ। বুকে যেন কে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া দিয়াছে! আমি ভেবে মরি—হয়তো বা কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনায় তোমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছ। ক্রমে বুঝছি, এই সব ভঙ্গী আমায় ভাবিয়ে তোলা!"

দিন হাসিকৌতুকেই কাটে বটে; বিপদ্ কিন্তু পদে পদে। বিপদের সাড়া যখন পাই, দৃঢ়চিত্ত হইয়া তাহার চরম কল্পনা করিয়া লই। বিপদের জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াই, দেখি বিপদ্ অন্তর্হিত হইয়াছে। সেদিন রাষ্ট্র-বিপ্লবের বিপত্তি জীবনকে ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিত। জীবন-সংগ্রামে আজও অন্য বিপদ্ আসিয়া তেমনই পথ আগুলিয়া ধরে। আজও কি তুমি অশরীরিণী মূর্ত্তি ধরিয়া আমার চিত্তদৌর্ব্বল্যের অংশভাগ গ্রহণ কর? আমার চেতনার ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ?

কোথায় কি হয়, জানিতে পারি না। গুপ্ত পুলিস-প্রহরীর কড়াকড়ি ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। একজন সঙ্গী কোথা হইতে খবর পাইলেন—পথে বাহির হইলে, সকলের অজ্ঞাতে আমায় ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই জন্য ইংরাজ পুলিসের মোটরগাড়ীও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার পথে বাহির হওয়া বন্ধ হইল। আর একদিন খবর পাওয়া গেল—কয়দিন ধরিয়া স্নানের ঘাটে একখানা মোটর-লঞ্চ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্নানের সময়ে আমায় ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইংরাজ পুলিসের হাতে বন্দী না হই, স্ত্রীর সতর্ক প্রহরায় আমার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল। সন্ধ্যার পর মেজবৌয়ের বাড়ী বেড়াইয়া আসার সুবিধাটুকুও হারাইতে হইল। মানুষ অনন্যোপায় যখন হয়, তখন তাহার বাঁচিবার আশ্রয়স্বরূপ এক পরমোপায় লক্ষ্যে পড়ে। দিবারাত্রি বন্দী অবস্থায় বড় করুণ কণ্ঠে গাহিতাম, চক্ষে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত—

আমার শুধু চেয়ে থাকা,
কখন তোমার পাব দেখা!

আজিও সেই একেন্দ্রিয় হইয়াই আছি। যাঁহার জন্য জীবন, দেখার মত দেখা যদি তাঁহার পাই, তবেই তো যোগ সিদ্ধ হয়, নতুবা আজীবন শুধুই শ্রম, শুধুই তপস্যা!

পুলিসের কঠোর দৃষ্টি শুধু আমারই জীবনকে সঙ্কুচিত করিল না; ক্রমে দেখা গেল—যে কেহ আমার বাড়ী আইসে তাহারই পশ্চাতে গুপ্ত পুলিস ধাওয়া করে। ক্রমে এমন হইল, আমার বাড়ী কেন, এই পথে লোক-চলাচলও কমিয়া গেল। আর আমার নিন্দা ও কুৎসা সর্ব্বত্র কে যে ছড়াইয়া দিতে লাগিল, তাহা জানিবার উপায় রহিল না। অনেক নিকট বন্ধুও আমার নাম উঠিলে, অশ্রাব্য ভাষায় গালি পাড়িত। পুলিশের কঠোর বিধানে স্বদেশীর প্রতি জনসাধারণের যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল, তাহা এই সময়ে প্রায় নির্ম্মূল হওয়ার উপক্রম করিয়াছিল। আমার এক বন্ধু "আর্য্য" পড়িতেন বলিয়া বাড়ীওয়ালা তাঁহাকে ঠাঁই দিতে চাহেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর পাইয়াছিলেন "এ,

জি'র সাহিত্য পড়েন'! সে দিন শ্রীঅরবিন্দের নাম করিলেও মানুষ আতঙ্কে মুখ ফিরাইয়া লইত।

দুঃখের কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইলাম। তিনি তদুত্তরে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমার সহকর্ম্মীদের মনঃপুত হয় নাই। কিন্তু আমার চৈতন্যসঞ্চার হইল। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—"যুদ্ধের সময় হইতে আমাদের অবস্থা ক্রমেই বিপজ্জনক হইয়া পড়িতেছে। এখানকার শাসনযন্ত্র বর্ত্তমানে যে সকল অধস্তন কর্ম্মচারিগণের হস্তে পরিচালিত হইতেছে, তাহারা স্বভাবতঃই স্বদেশীদের প্রতিকূলে। আমি এই হেতু একেবারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছি। অতি নিরীহ লোকেদের সহিতও পত্র-ব্যবহার বন্ধ করিয়াছি। তোমার বিপদের মূলেও সম্ভবতঃ বড় কারণই আছে। যাহাতে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এমন কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে। তোমার পত্রগুলির মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরিয়া রাজসিক বৃত্তির লক্ষণ দেখিতেছি। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নহে, বাংলার পুরাতন তন্ত্রসাধকদের সহিত তোমার নিবিড় সাহচর্য্য। ইহাতে আমাদের যোগের পথ বিঘ্নিত হইবে।"

এই পত্রখানি বাংলার বৈপ্লবিক জীবনের উপর ভীম বজ্রনিক্ষেপ করিয়াছিল। এই পত্রে তিনি নিজেকে আমার নিকট যেমন সুস্পষ্ট করিয়াছিলেন, এমন অতীতের কোন পত্রে করেন নাই। আমি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় লাভ করি; তার পর জীবন-মরণ-রঙ্গে অকাতরে নাচিয়াছি তাঁহারই অঙ্গুলীহেলনে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্ষুরধার পথে প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া চলার পশ্চাতে শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ নির্দ্দেশই ছিল। আজ তিনি অকস্মাৎ এক নিরাপদ্ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে চাহিলেন; আমার পূর্ব্বজীবনের অধ্যাত্মসাধন-বিজ্ঞানের অনুভূতি এই পত্র পড়িয়া আবার মধুর আকর্ষণ সৃজন করিল। ভাবিয়া লইলাম—যাঁর হাতে জীবনতরীর হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বৈপ্লবিক উত্তাল তরঙ্গে তিনি এ তরী চালাইয়াছেন। সে দিনের নির্দ্দেশ অট্ট-অট্টহাসে মহাকালীর বজ্রধ্বনির ন্যায় যিনি শুনাইয়াছিলেন, আজ নব মূর্ত্তি ধরিয়া তিনিই এক নূতন যোগসাধনায় জীবনকে চালাইতে চাহেন। আপত্তি করিলে চলিবে না। এ দেহ, এ মন যন্ত্র। অহঙ্কার আজ দ্রষ্টার আসন লইয়াছে। যন্ত্রীর মূর্ত্তি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি আমার পুরুষোত্তম। তাঁহার বাণী আর উপেক্ষা করা চলিবে না। তিনি লিখিলেন "আমি আসিয়াছি ভারতের শক্তিশালী সন্তানদের ডাকিয়া আনিতে কৃষ্ণকালীর লীলাক্ষেত্রে। অতীতের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। তাই বলিয়া আমি সাধু-সন্ন্যাসীর মঠ গড়িতে চাহিতেছি না। মনে রাখিও, বৌদ্ধ-যুগের পর হইতে এইরূপ সন্ন্যাসমূলক আন্দোলন ভারতকে দুর্ব্বলতর করিয়াছে। এবং তাহার কারণ সুস্পষ্ট। জীবন মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া এক কথা, এবং জীবনকে—ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিশ্বজনীন জীবনকে—মহত্তর ও দিব্যতর করা অন্য এক বস্তু। তুমি এক আদর্শ-বাদকে বড় করিতে পার না, অন্যকে দুর্ব্বল না করিয়া। তুমি জীবন হইতে উত্তম আত্মাগুলিকে সরাইয়া লইতে পার না। ইহাতে জীবন বৃহৎ ও বলপ্রদ হয় না। আমি জীবন হইতে মুক্তি চাহিতেছি না, অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া জীবনেই ভগবানকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিতেছি। এই যোগই আমার শিক্ষার বিষয়। অন্য প্রকার ত্যাগ আমার যোগের প্রতিপাদ্য নহে।"

ইহার পর তিনি আমার কার্য্যে তীব্র নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন "তুমি তন্ত্র ও মন্ত্র, অনুষ্ঠান ও বেদান্ত এক সঙ্গে চালাইতে চাহ; আমার আপত্তি—তন্ত্রানুষ্ঠানের সহিত বেদান্তের সংযুক্ত গতি সুসঙ্গত হইবে না। অবশ্য ইহার সমন্বয় সম্ভব; কিন্তু মিশ্রণ সমন্বয় নহে।" তারপর P. S. অর্থাৎ পুনশ্চ আর একটু টিপ্পনী দিয়া বলিতেছেন "একটা জিনিষ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও; যে কাজ আমরা করিতে চাহিতেছি, ইহার ফল সে পর্য্যন্ত বৈষয়িক জগতে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না আমার অষ্টসিদ্ধি ততখানি প্রবল হয়, যতখানি হইলে এই বস্তুতন্ত্র পৃথিবীর উপর উহা সমগ্রভাবে কলের মত কাজ করিতে পারে। তাহা এই অবস্থায় এখনও পৌঁছায় নাই। আমার পক্ষে অথবা তোমার পক্ষে অথবা যে কোন লোকের পক্ষে

রাজসিক ব্যস্ততা দূর হইলেই এই অষ্ট-সিদ্ধি লাভ হইবে এবং ইহাই দিব্য যন্ত্রস্বরূপ অমোঘভাবে কার্য্য করিয়া চলিবে। আমার শিক্ষা যদি তুমি গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতে পার, তিক্ত অভিজ্ঞতার্জ্জনের জন্য সময় নষ্ট করিতে হইবে না।"

পত্র পড়িয়া হাসি পাইল। যে হস্ত স্রুক্ ধারণ করিয়া ভারতের অতীতকে ফিরাইয়া আনিতে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, সেই হস্তে হে দেবতা! তুমিই তো ধ্বংসের বজ্র একদা তুলিয়া দিয়াছিলে। অপরিসীম করুণায় তান্ত্রিকেরা যেমন সুরার অনুকল্পে গঙ্গোদক সেবন করে, তেমনই উহা অনুকল্পের মতই হস্তে বিধৃত রহিল। ইহা এক অপূর্ব্ব সাধনা। আমার নিকট যাহা অনুকল্প, তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়া দেশব্যাপী বিপ্লববাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাকে রাখিলে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক করিয়া। এই পত্রখানি হাতে লইয়া সেদিন জীবনের সহচরীর নিকট উপনীত হইলাম। মনে হইতে লাগিল—চতুর্দ্দিকে যে আতঙ্ক, বিভীষিকা, রক্তলাঞ্ছিত পতাকা, স্বপ্নে কল্পনায় তাঁহার ঘন ঘন হৃৎকম্পের কারণ হইয়াছিল, বিধাতার ইরম্মদ গর্জ্জন শুনিয়া যে প্রাণ উত্তেজনাদৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে সতত সশঙ্ক করিয়া রাখিত, আজ বংশীবটে স্বচ্ছ-সলিল যমুনাপুলিনে বিকশিত কদম্বশোভিত মধুবনে শ্যামরায়ের মধুর মুরলী বাজিয়াছে, রুদ্রের ভৈরব তাণ্ডব নৃত্য তিনি দেখিতে ভালবাসেন না, তাই কৃষ্ণ-কালীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অপরূপ লীলা-যুগ আমাদের সম্মুখে।

পত্রখানি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। চক্ষু প্রদীপ্ত হইল বটে! এ দীপ্তি রুদ্রকে দেখিয়াও প্রকাশ পাইত। এ যেন অসীম বারিধি। ঘটনার তারতম্যে এখানে চাঞ্চল্য নাই। তিনি হাসিলেন। এমন হাসি নূতন নহে। আমি যেন এই অসীম প্রেম-বারিধির চঞ্চল তরঙ্গ। উঠি, নামি ঘটনার আবর্ত্তে। অশেষ-ধৃতিসম্পন্না এই নারীত্বের স্বমহিমায় অটল-প্রতিষ্ঠ-রূপের কথা ভাবি—সাধ যায়, প্রতিমা যদি না ভাঙ্গিত, আজও বুঝি জীবনবেদী ফুলে ফুলে নূতন শোভা ধারণ করিত।

— ক্রমশঃ

ঘাটের মায়া

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

ধূসর হয়েছে আকাশের কোল, ঘন রং ধরে গাছে,
বুঝি বা বৃষ্টি পড়িবে এখনি—এই ভাব ধরিয়াছে
ধরণীর কম করুণ মু'খানি, নদীর দু' পার জুড়ে'
ক্রমশঃ আব্ছা হয়ে আসে যেন—ঘাট উদ্যান কুঁড়ে!
সব ঘাটগুলি খালি হয়ে গেল ; দূরে দুইখানি তরী
আনমনে কোথা ভেসে চলে যায় উদাসীর রূপ ধরি'!
দুইখানি শুধু শূন্য ঘাটেতে—কাঁদিছে শূন্য মনে,
তার বুকে আজ কেহ আসে নাই, আজ কেহ তার সনে
করেনি গল্প—কত কথা—কতেক কাহিনী গান,
আজ বাদলের শান্ত বেলায় তাই তার কাঁদে প্রাণ।
ক্রমে কালীবাড়ী বন্ধ হইল উদ্যানগৃহ থেকে, .
কালো ধোঁয়া শুধু তবকে তবকে যেতে যেতে যায় ডেকে-
'—ওরে ঘুমন্ত, একলা, উদাসি—ঘাট ছেড়ে চলে' আয়,
এমন গোধূলি ছায়াময় কাল তোরই তরে বহে' যায়!
ছেড়ে আয় তোর মুখর সঙ্গী—নিষ্প্রাণ—নিষ্ঠুর,
ওরে শুনে যা রে ধূসর আকাশে করুণ ধূসর সুর!..."

টিপ্ টিপ্ করে নামিল বুঝি বা তাহারই চোখের জল—
ওরে বল্ তোরা, ঘাট ছেড়ে আমি কোথা যাই, তোরা বল।
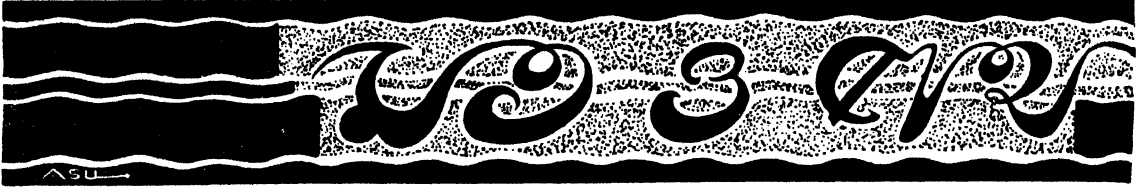
ডিগবয় সমস্যায় কংগ্রেস

ডিগবয়ের সমস্যার সুমীমাংসার কোন লক্ষণই এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। আসামের অন্যতম জাতীয়তাবাদী মুখপত্র "জনশক্তি"র সুচিন্তিত অভিমত পড়িলে মনে হয়—কংগ্রেসের ডিগবয় সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী অকপটে কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করা সম্ভব হইলেও, তাহার দ্বারা সুফলের আশা করা যায় না। কোম্পানীর যদি সুবুদ্ধি না হয়, তবে তাহার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইলে গভর্ণমেণ্ট তৈল এলাকার লাইসেন্স আর তাহাকে দিবেন না, কংগ্রেসের প্রস্তাবে এইরূপ কথা আছে। কিন্তু ইহা কার্য্যে ঘটিবার পক্ষে বাধা আছে। লাইসেন্সের সর্ত্তগুলি নাকি এমন সুস্পষ্ট নহে, যাহাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তারপর, এই বিরাট্ ব্যবসা বর্ত্তমান কোম্পানীর হাত হইতে কাড়িয়া লইলেও, টাটা বা বিড়লা প্রভৃতি ভারতীয় বণিকগণ তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যুদ্ধ বাধিলে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহা খাস এলাকাভুক্ত করিয়া লইতেও পারেন। যে কোনও অবস্থায়, এই তৈল ব্যবসায়জনিত বিপুল আয় হইতে আসাম গভর্ণমেণ্ট বঞ্চিত হইলে, তাহা তাহার যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইবে। কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করি, এই সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

কংগ্রেসের অন্যতর নির্দ্দেশ—বোম্বাই বাণিজ্য-বিরোধ বিধির মত একটা আইন প্রণয়ন করিয়া বর্ত্তমান কোম্পানীকে আপোষ-নিষ্পত্তিতে বাধ্য করা। এ সম্বন্ধেও "জনশক্তি"র মন্তব্য কংগ্রেসের বিবেচনার যোগ্য। আইন দ্বারা শ্রমিকের মজুরীর নিম্নতম হার ও শ্রমের সময়-নির্দ্দেশ এবং প্রমোশনের হার নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। 'আসল বিবেচ্য বিষয় - কোম্পানীর কাজ বন্ধ না হইয়া, ন্যূনতম লভ্যাংশ তাহারা পাইবে। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্তের ভার কোম্পানীর চীফ ম্যানেজারের হাতে না থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা-রক্ষা সম্ভব হয় না। চীফ ম্যানেজার এই ক্ষেত্রে অন্যায় করিলে, তাহার প্রতিকার আদালতের আশ্রয়ে পাইবার ব্যবস্থাই সমীচিন। এই কথাগুলিও কংগ্রেস এবং আসাম গভর্ণমেণ্ট উভয়েই নিশ্চয় ভাবিয়া দেখিবেন। জিদের বিরুদ্ধে জিদ ধরিয়া থাকিলে, অনেক সময়েই তাহা জটিল সমস্যা সমধিক জটিলতর করিয়াই তুলে।

ডিগবয়ের গুলিবর্ষণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারের তদন্তের ভার জষ্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তদন্তের ফল দেশবাসী সোৎকণ্ঠ চিত্তে প্রতীক্ষা করিবে।

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শাসন ও শিক্ষানীতি সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা দেশবাসীর মনে জাগিয়াছে, ইহা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই। সম্প্রতি ঢাকা স্কুলবোর্ড সম্পর্কে দুইখানি পত্র "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় (গ্রাম্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইনানুযায়ী ঢাকা জেলা স্কুলবোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত অবৈতনিক শিক্ষার পরিকল্পনা গত মার্চ্চ মাস হইতে ঢাকা জেলায় প্রবর্ত্তিত করা হইবে, এইরূপ ঘোষণা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং করেন এবং তদনুযায়ী স্কুলবোর্ডের নিজস্ব ও সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্ব স্ব পদে কার্য্য করিবার জন্য নূতন নিয়োগপত্র শীঘ্রই পাইবেন, ইহাও বিজ্ঞাপিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এইরূপ কোন নিয়োগপত্র এ পর্য্যন্ত পান নাই এবং অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের কার্য্যও এতাবৎ বন্ধ রাখা হইয়াছে। এই অব্যবস্থার কারণ—ঢাকা জেলা স্কুল-

বোর্ডের শেষ সিদ্ধান্তানুযায়ী যে এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লওয়া হইবে, তাহার মধ্যে শতকরা ৭০ জন মুসলমান হওয়া চাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য যোগ্য মুসলমান শিক্ষক না থাকায়, কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে, উক্ত দুই শ্রেণীতে অল্প সংখ্যক মুসলমান নিযুক্ত করিয়া, নিম্নতর পদসমূহে শতকরা ৭০ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করা হউক। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ফলে শিক্ষকের অভাবে, ঢাকা জেলার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসার কার্য্যই বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ব্যাপারটীর এইখানেই শেষ নহে। বিগত মার্চ্চ মাসেই সাধারণ নির্ব্বাচনে পূর্ব্বোক্ত ঢাকা স্কুল বোর্ডের পুনর্গঠনের কথা ছিল। বলা বাহুল্য, এই স্কুল বোর্ডেও ২৪জন সদস্যের মধ্যে একজনও নির্ব্বাচিত হিন্দু সদস্য নাই। অবশ্য ৪জন মনোনীত হিন্দু সদস্য আছেন—তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী। অধিকাংশ মুসলমান সদস্যের অনুপস্থিতিতে এই বোর্ডেরও পুনর্গঠন এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ নুতন অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির স্থান মুসলমান পল্লীতেই নাকি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—কিন্তু হিন্দুদের আন্দোলনের ভয়ে স্থানগুলির পরিচয় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই।

দেশের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা স্কুল বোর্ড কর্ত্তৃক শাসিত হইবে। এই জন্য সমস্ত স্কুলগুলি বোর্ডের অধীনে আনয়ন করা হইবে। ইহা ছাড়া, প্রাইমারী, মধ্য, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, জুনিয়ার মাদ্রাসা ও মিশন স্কুল—যত কিছু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা পরে হইবে, তাহারা প্রথম চারিটী শ্রেণীর ছাত্রদের বেতন আদায় করিতে পারিবে না। শুধু ঢাকা জেলায় নয়, এই একই শিক্ষা-নীতি বাংলার সকল জেলাতেই আজ বা কাল প্রসারিত হইবে, ইহা অবধারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা বর্দ্ধমান জেলার একটী পরিচিত পল্লীর কথা এইখানে উল্লেখ করিতে পারি। এই গ্রামে দুইটি মুসলমান পাঠশালা ও একটি হিন্দু নিম্ন প্রাইমারী স্কুল ছিল। হিন্দু প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বরাবর সরকারী সাহায্য পাইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি হিন্দু বিদ্যালয়ের সাহায্যবৃত্তি কি কারণে বলা যায় না সহসা বন্ধ করিয়া মুসলমান পাঠশালার শিক্ষকের নামেই উক্ত বৃত্তি প্রেরণ করা হইতেছে। ইহার ফলে, দরিদ্র হিন্দু বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এইভাবে সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসৃত হইলে, তাহার পরিণাম কি হইবে, ইহা অনুমান করা কিছুমাত্র শক্ত নয়। হিন্দুর দুর্দ্দিন কতদিক্ দিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিলেও সত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়।

অথচ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে শিক্ষাকর দিতে হইবে, তাহার অধিকাংশ যোগাইবে হিন্দু প্রজা। সেই করের বিনিময়ে কিন্তু হিন্দুর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম না হইয়া কণ্টকিতই হইবে। স্কুল-বোর্ডে হিন্দু প্রতিনিধির স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোনই সুযোগ থাকিবে না। শাসনজগতে হিন্দুর স্থান নাই—শিক্ষাজগতেও তাহাদের কোণঠাসা করার বন্দোবস্ত বেশ গোড়া বাঁধিয়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু কোথায়? হিন্দু বাঁচিবে না মরিবে? হয়ত মরণ-খাঁড়া মাথার উপর ঝুলিতে দেখিয়া, নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে কেহ কেহ বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি পরিপুষ্ট করিতেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। চোখের আলো নিভিয়া আসিলে মরিয়া জাতি কি করিবে না করিবে, তাহা গণনারও বাহিরে। শিক্ষায়, রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু কোথাও নিজের দিক্ দেখিয়া চলে নাই—তাহারা উদার বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিতে জাতীয়তা প্রচার করিয়াই আসিয়াছে। হিন্দু স্বধর্ম্মদ্বেষী হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহার প্রায়শ্চিত্ত আজ সুরু হইয়াছে মাত্র। এখানে কে আজ সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিবে? তাহা শুনিবেই বা কে?

আদমসুমারী

ভারতের ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন আদমসুমারীর গণনা হয়, তখন শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতৃগণ দেশবাসীকে এই গণনায় অসহযোগ করার

নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই বর্জ্জন-নীতি বাংলা হিন্দু-জাতির পক্ষে একেবারেই শুভকর হয় নাই। ইহার ফলে, বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় জনসমষ্টির অনুপাতে কাগজে কলমে সংখ্যা-লঘু প্রতিপন্ন হয়। চিনির বলদের ন্যায় বর্জ্জননীতি যে সর্ব্বক্ষেত্রে সুফল দেয় না, তাহা এই ক্ষেত্রে আমরা হাতে-হেতেড়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে পঞ্জাবের "জাত পাত-তোড়ক মণ্ডল" নামক এক সমিতি প্রচার আরম্ভ করেন যে, সরকারী সেন্সাসে কেহ যেন নামের পার্শ্বে জাতি উল্লেখ না করেন—তৎপরিবর্ত্তে "Nil" অর্থার্থ "শূন্য" কথাই ব্যবহার করিবেন। এই ভ্রান্ত নীতি পূর্ব্বোক্ত কংগ্রেস-নীতির ন্যায় হিন্দু জনসাধারণই হয়ত অনুসরণ করিতে পারে—কোন মুসলমানই ইহাতে কর্ণপাত করিবে না। বাঙালী হিন্দু তার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পর এই পাঞ্জাবী সমিতির নির্ব্বুদ্ধিতায় যোগদান করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ ঘনীভূত করিবে না, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিব।

কিন্তু এবার অনুরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা অন্য দিক্ হইতে আসিয়াছে। আগামী সেন্সাসের ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে, সেন্সাস-কমিশনর প্রস্তাব করিয়াছেন যে, (১) অন্যান্য বারের ন্যায়, সারা ভারতে একই তারিখে গণনা না হইয়া, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখে গণনার ব্যবস্থা করা হইবে; (২) বর্ণহিন্দুদের ও তপশীলভুক্ত হিন্দুদের স্বতন্ত্রভাবে গণনার ব্যবস্থা হইবে আর তাহার মধ্যে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পৃথক্ গণনা হইলেও, বর্ণহিন্দুদের স্বতন্ত্র শ্রেণীর উল্লেখ করা হইবে না; (৩) অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির পৃথক্ গণনা হইবে না।

উপরোক্ত প্রস্তাব তিনটীর মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটী কতটুকু ব্যয়সঙ্কোচে সহায়তা করিবে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহার ফলে যে অতিলেপ-দোষে সংখ্যার নির্ভুলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্ণ-হিন্দুর মধ্যে যে শ্রেণীভেদ আছে, তাহা তুলিয়া দিবার চেষ্টা কোন হিন্দুই সমর্থন করিবেন না। সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি বাস্তব সংখ্যা ও তথ্যের উপর নির্ভর করে। আদমসুমারীতে ব্যয়সঙ্কোচের দায়ে এই বস্তুতন্ত্র তথ্য বিলুপ্ত হইলে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ব্যয়-বাহুল্য ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যান্য কথাও ভাবিবার আছে। কিন্তু নিছক ব্যয়-বাহুল্যের দিক্ দিয়াও, বিচার করিলে দেখা যায়, ভারতে আদমসুমারী গণনার জন্য প্রতি হাজারে যেখানে ১২৷৷০ টাকা মাত্র খরচ পড়িয়াছে, সেখানে ইংলণ্ডে হাজার প্রতি খরচ ১৮৭৷৷০ টাকা অর্থাৎ ভারতের প্রায় ১৫ গুণ অধিক। অবশ্য ভারতের জনসংখ্যা ইংলণ্ডের মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় ১২।১৩ গুণ অধিক। কিন্তু এই দিক্ দিয়া হিসাব করিলেও, বিশাল ভারতের আদমসুমারীর ব্যয় ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের তথাভূত ব্যয়ের সীমা সম্ভবতঃ অতিক্রম করিবে না।

ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া, আদমসুমারীর গণনায় বর্ণ-হিন্দু ও তপশীলভুক্ত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ভেদ ও সংখ্যাবৈষম্য ঘটাইবার এই চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের অন্তর্নিহিত নীতিকেই সমর্থন করার আভাস পাইয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এই সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক কূটনীতির আমদানী না করিয়া পূর্ব্ববৎ সেন্সাসের সর্ব্বজনীন প্রথাই অনুসরণ করিবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চাকুরীসমস্যা

"অবশেষে সমানে সমান"—অর্থাৎ পঞ্চাশে পঞ্চাশ 'ফর্‌মুলাই' গৃহীত হইল। বাংলার সরকারী চাকুরীর হার স্থির হইল—শতকরা মুসলমান ৫০ ও অমুসলমান ৫০। এই শেষের ৫০ আবার নিম্নলিখিত উপ-বিভাগে বণ্টিত হইবে—হিন্দু ৩০, তপশীলী ১৫, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ৫। ইহা সরাসরি নিয়োগের হার। ইহা ছাড়া নিম্ন-পদ হইতে 'প্রমোশন' বা উন্নতির হারও এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে—অর্থাৎ সেখানেও শতকরা মুসলমান ৫০ ও বাকী অমুসলমান ৫০। তাহার মধ্যেও আবার একটু মারপ্যাঁচ এই যে, মুসলমানের সংখ্যা যেখানে কম দেখা যাইবে, সেখানে সরাসরি অতিরিক্ত মুসলমান লইয়াই তাহা পূরণ করা হইবে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে বর্ণহিন্দু যুবকগণের ভাগ্যে দ্রৌপদীর অংশটুকুও জুটিবার সম্ভাবনা রহিল না—কেন না,

বৃকোদর ভিক্ষান্নের মোট অর্দ্ধাংশ তো পাইবেনই, তাহার উপর অপর ভাগ হইতেও কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধ্যমত গ্রহণ করিবেন। প্রধান মন্ত্রীর পক্ষপুটে হিন্দু মুসলমান যে সমান ভাবেই আশ্রয় পাইবে, তাঁহার এই আশ্বাস-বাণী এই প্রসঙ্গে অবশ্য উপভোগের সহিত স্মরণীয়।

শুনা যায়, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রচণ্ড মতভেদ দূর হইল। হিন্দু প্রতিনিধি দল গভর্ণরের কাছে ধর্ণা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কতটুকু দাবী রক্ষা ইহাতে হইল, তাহার বিচার এখানে অনাবশ্যক। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী ও স্বয়ং গজনভী সাহেবও তাঁহাদের চির-পোষিত 'ফরমুলার' এই ভাবে মর্য্যাদালাভে সত্যই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্য কথা এখানে আমাদের বলিবার নাই—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত শুধু এইটুকু বলিয়াই আমরা নীরব হইব—"শাসনকর্ত্তাদের হাত-বদল হবে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই। তারা ভারত ভাগ্যের শরিক—অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের মধ্যে যদি গভীর করে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়, তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না।"

নাগরিকের স্বাধীনতা-হরণ

কলিকাতার নাগরিক জীবনে যে দুর্গ্রহের লীলা চলিয়াছে, তাহা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা কায়েমী করিয়াই শেষ হয় নাই। মিউনিসিপাল সংশোধন আইন ভোটের সংখ্যাধিক্যে যে ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে খাঁ সাহেব আব্দুল হামিদের প্রস্তাবে যেটুকু অনর্থের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, মন্ত্রিমণ্ডল সুদে আসলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছেন।

সম্প্রতি মন্ত্রিমণ্ডল আরও একটী আইন গঠন করিয়া কলিকাতা নাগরিক জীবনের শেষ স্বাধীনতাটুকুও কাড়িয়া লইতে মনঃস্থ করিয়াছেন। এই আইনটী কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি আইনের চেয়েও অনিষ্টকর।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ভারতের এই প্রধান মিউনিসিপ্যালিটীকে ম্যাকেঞ্জী আইনের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উহাকে একটী প্রায় স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন, ইহার জন্য জননায়কগণের সংগ্রাম বাংলার ইতিহাসে চির স্মরণীয় হইয়া আছে। বর্ত্তমান আইন সুরেন্দ্রনাথের এই জীবন-কীর্ত্তি সমূলে ধ্বংস করিয়া ম্যাকেঞ্জী বিলের দিনেই অথবা তাহার চেয়েও আরও পিছনে সময়ের ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দিতে পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই নূতন বিলের ব্যবস্থায়, কর্পোরেশন আইন-ভঙ্গ করিলে অথবা অধিকারের বাহিরে কিছু করিলে, গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে নিজ অধীনে আনিতে পারিবেন। কর্পোরেশনের কোন প্রস্তাব বা কোন কমিটীকে গভর্ণমেণ্ট স্থগিত করিতে পারিবেন অথবা কর্পোরেশনের কোন বিভাগকেও আপনার আয়ত্তে আনিতে পারিবেন। ইহার উপর, কর্পোরেশন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, তাঁহার নিয়োগের কর্ত্তা হইবেন গভর্ণমেণ্ট। ৫০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরিয়া একটি চাকুরী-কমিশনের মনোনয়নে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিবেন; তদূর্দ্ধ বেতনের চাকুরীর ক্ষেত্রে উক্ত কমিশনের সুপারিশে কর্পোরেশন লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন—কিন্তু ৫ শত টাকার অধিক বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে, গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে। উক্ত কমিশনের সভাপতিও গভর্ণমেণ্টই নিয়োগ করিবেন এবং তাহাতে কোন সম্প্রদায়ের কত প্রতিনিধি থাকিবেন, তাহারও নিয়ম গভর্ণমেণ্টই বাঁধিয়া দিবেন। এক কথায়, কর্পোরেশনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার সকল পাকাপাকি বন্দোবস্তই ইহাতে বেশ চিন্তাপূর্ব্বক করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত বিলের একটী মাত্র ধারায় আমাদের আপত্তি করার কিছু পাই নাই—তাহা হইতেছে, ভোটদাতার অধিকার যাহারা ন্যূনতম ১৲ টাকা বাড়ী ভাড়া দেয় ও ৬৲ টাকা ট্যাক্স দেয়, তাহারাই পাইবে। বর্ত্তমানে সেই স্থলে ২৫৲ টাকা বাড়ী ভাড়া ও ১২৲ টাকা ট্যাক্সের ন্যূনতম হার প্রচলিত আছে।

হরে দরে যাহা দাঁড়াইবে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা বাংলার মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীগুলিরই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে।

এক যুগের বাঙ্গালীশ্রেষ্ঠগণ যে পৌর স্বাধীনতার সৌধ ধীরে ধীরে রচনা করিয়া গেলেন, আর এক যুগের

অদূরদর্শী বামনগণ স্থূল হস্তের তাড়নায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে অকুন্ঠিত—ইহা শুধু কলিকাতা নাগরিকগণের দুর্ভাগ্য নহে, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীরই দুরপনেয় কলঙ্ক।

জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা

ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশ—জাতিগঠনের পথে। বাঙ্গলা সকলের বাহিরে। শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে নয়, কংগ্রেসের উদ্যোগে সম্প্রতি যে জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসী সমস্ত প্রদেশগুলি তো যোগদান করিয়াছেই, অকংগ্রেসী পাঞ্জাবও সহযোগিতায় কুন্ঠিত হয় নাই,—দেশীয় রাজ্যগুলিও সহযোগিতা করিতেছে—এমন কি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অনাহুত হইয়াও ইহাতে সহায়তা করিতেছে, কিন্তু বাংলার মন্ত্রি-মণ্ডল ইহাতে যোগ দেওয়া সমীচিন মনে করেন নাই। ইহা নিছক অভিমান না আর কিছু কে জানে। *

সে যাহা হউক—বোম্বাই সহরে পণ্ডিত জহরলাল-জীর নেতৃত্বে এই জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনাকমিটীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি-বিৎ মনীষিগণ ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। এই অধি-বেশনে কমিটীর সাহায্যের জন্য ২৮টি সাব্-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি সাব্-কমিটীই বিশেষজ্ঞগণের পরিচালনায় উৎসাহের সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে।

তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে মূল কমিটীর নিকট বিবরণী দাখিল করিবেন এবং তাহারই ভিত্তির উপর মূল কমিটী জাতীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে একটি গঠনকারী পরিকল্পনা রচনা করিবেন। কমিটী আপাততঃ দশ বৎসর স্থায়ী হইবে—ইহার পর অবস্থা বুঝিয়া ইহাকে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে।

এই পরিকল্পনাকমিটী একটি বিবৃতিতে তাঁহাদের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। কমিটী বলিয়াছেন—যন্ত্রশিল্প, কুটীরশিল্প ও কৃষির উন্নতির দ্বারা আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় অন্ততঃ মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর গড়ে আয় মাসিক মাথা পিছু প্রায় ৫৲ টাকা মাত্র। এই আয়বৃদ্ধি কি ভাবে করা সম্ভব হইবে, তাহার বিশেষ পরিকল্পনা না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা সমীচিন হইবে না। তবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কমিটীর এই আগ্রহ ও প্রয়াসের আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

কমিটী বিবৃতিতে আরও বলিয়াছেন—যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনে কুটীরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, এ ধারণা ভুল। কারণ, যন্ত্রশিল্প ভিন্ন কোন দেশ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভ করিতে পারে না, আবার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে কুটীরশিল্পের উন্নতিও অসম্ভব। মহাত্মা এতদিন কুটীরশিল্পেরই পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যন্ত্রশিল্পের সমর্থনে এই কথাগুলি বলা না হইয়া থাকিলে, কমিটীর যুক্তির মধ্যে যন্ত্রশিল্প ও উটজশিল্পের পরস্পর বিরোধ দূর করার একটা সঙ্গত প্রয়াসই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। এই সামঞ্জস্য-দৃষ্টির আজ খুবই প্রয়োজন আছে, আমরা মনে করি।

সেই সঙ্গে কমিটীকে আমরা এইটুকু সতর্ক করাও প্রয়োজনীয় মনে করি যে, কুটীর ও যন্ত্রশিল্প দুইই প্রকৃত জাতীয় জীবন-সমস্যার দিক্ দিয়া গৌণ স্থানই অধিকার করা উচিত। কেন না, দেশের আর্থিক সম্পদের আসল সৃষ্টি-ক্ষেত্র কৃষি; কুটীর ও যন্ত্রশিল্প কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর রূপান্তর সাধন করে মাত্র। বিহারমন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদের বিবৃতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিহারের ন্যায় ভারতের শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ভূমিতেও প্রতি বর্ষে ৫ কোটী মণ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব পড়িয়া যাইতেছে। শুধু বিহারে নয়, ভারতের ন্যায় তথা জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিবার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা দেশেও বার্ষিক ১২৫০০০ টন চাউল কম উৎপন্ন হইতেছে। এই জন্যই অন্যান্য জাতি স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব কৃত্রিম উপায়ে পূরণ করার চেষ্টা করিতে গিয়া যন্ত্রশিল্পের অত্যধিক অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে সমস্যার সমাধান

* ৯ই জুলাইএর সংবাদপত্রে মাদ্রাজের শিল্প মন্ত্রী মাননীয় গিরির উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বাংলা গভর্ণমেণ্ট সহযোগিতায় শেষে স্বীকৃত হইয়াছেন।

না হইয়া, উহা দিন দিন আরও জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির মতই হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভারত যেন এই ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির অনুকরণে কৃষি ও শিল্পের স্বাভাবিক অনুপাত ভঙ্গ করিয়া চিরদিনের জন্য সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত না করে। আমাদের মনীষিগণকে এইজন্য ভারতীয় কৃষ্টি ও পরিস্থিতির প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া স্বাধীন ও মৌলিক ভাবেই জাতীয় জীবনসমস্যার সমাধান ও অভিনব আদর্শই জগতের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে।

বাংলায় ম্যালেরিয়া

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জী রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাংলার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি প্রকাশ করেন, তাহা বাঙালীর ভাবিবার বিষয়। তিনি বলেন যে, সমগ্র ভারতে যত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ একা বাংলা দেশেই মরে। বাংলার ৫ কোটী লোকের মধ্যে ৩ হইতে ৪ কোটি প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় ও তাহার মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের ঐ রোগেই মৃত্যু হয়।

গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রোগ অনবরত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই ৩৩ বৎসরে হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারীর সংখ্যা বাড়ে নাই, কিন্তু রোগীর সংখ্যা শতকরা ৫।।০ জন বাড়িয়াছে। স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থান রোগের আকর হইয়াছে। রাস্তাঘাট, রেলপথ ও বাঁধ নির্ম্মাণের দোষে ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে খাল, ডোবা কাটাইবার ফলে, মশার বংশবৃদ্ধি ঘটে। ইহার উপর, দেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব তো আছেই। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বাঙালী সকল দিক্ দিয়াই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই সৈন্যবিভাগে দূর থাক, পুলিস-বিভাগেও আর বাঙালী বেশী সংখ্যায় স্থান পায় না।

বাংলায় ম্যালেরিয়া বাড়ে। গভর্ণমেণ্টের বহুগুণ কুইনাইন বিক্রয় হইয়া তাহাতে নাকি আয় বৃদ্ধি আছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় দিক্ হইতেই কুইনাইন সরবরাহ করিয়াও যদি রোগের উপশম দেখা না যায়, কর্ত্তৃপক্ষের ভাবা উচিত যে, এই লাক্ষণিক চিকিৎসায় এ রোগ নির্ম্মূল হইবে না। ইহার জন্য ম্যালেরিয়ার শিকড় উপড়াইবার ব্যবস্থাই করিতে হইবে অর্থাৎ দেশের মাটী, জল ও আব্‌হাওয়াই পরিষ্কার করিতে হইবে। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী যে কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নূতন নহে—কিন্তু প্রতিকারের ভাবনা কে ভাবিতেছেন? ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত বড়লাটপত্নীর যক্ষ্মা-ফণ্ডের কিয়দংশ ম্যালেরিয়ার জন্যই নিয়োগ করিতে আবেদন জানাইয়াছিলেন; তাঁহার কথা যুক্তিহীন নহে। বঙ্গে যক্ষ্মার চেয়ে ম্যালেরিয়া বড় কম শত্রু নহে। বাঙালার স্বাস্থ্যবিভাগের সহিত সেচ ও রেলওয়ে প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগও এই-জন্য একত্র কার্য্যপদ্ধতি উদ্ভাবন ও কার্য্যশক্তি প্রয়োগ করিলে, তবে যদি কিছু প্রতিকারের স্থায়ী ব্যবস্থা সম্ভব হয়। নহিলে কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী ও আমরা সকলেই অরণ্যে রোদন করিতেছি মাত্র।

রাজবন্দীর অনশন

দমদম ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ৮৯ জন রাজবন্দী আবার অনশন গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তাঁহার আশ্বাসবাণী সকলই এখানে ব্যর্থ হইয়াছে। এতগুলি জীবনের অকাল মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রহণ করার চেয়ে কি জিদ বড়—এই কথাই আজ ক্ষুব্ধ চিত্তে দেশ মন্ত্রি-মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছে—ডিগবয় সমস্যা লইয়া যখন নিখিল ভারত সমস্যায় পরিণত করা সম্ভব হয় ও তদ্বিষয়ে কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন, তখন বাংলার এই হতভাগ্য রাজবন্দীদের দীর্ঘদিনস্থায়ী সমস্যাটীর প্রতিবিধানকল্পে মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে কি কোন কিছুই করিবার নাই?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সরকারী কমিটী হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই নিশ্চয় কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারেন না। তাঁহারা অতঃপর কি করিবেন—কি করিতে পারেন? সুভাষচন্দ্র ও বাংলার কংগ্রেস এ সম্বন্ধে কি করিবেন? হোম মেম্বর খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতায় জানা যায় যে, এই অনশন গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিবার অভিপ্রায় লইয়াই বন্দীগণ করিয়াছেন—ইহাই

গভর্ণমেণ্ট ধারণা করিয়াছেন। এ ধারণা সত্য নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। দীর্ঘদিন মুক্তির প্রতীক্ষায় হতাশ হইয়াই বন্দীদের এই অনশন—মন্ত্রিমণ্ডল সহৃদয়চিত্তে এই দিক্ দিয়া ইহা দেখিয়া, মুক্তির জন্য বিবেচনাকাল একটু সংক্ষিপ্ত করিলেই এই শোচনীয় সমস্যার এখনই সমাপ্তি হইতে পারে। আমরা করুণ কণ্ঠে দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই নিবেদনই কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেছি।

নবাবী আমল ও নবাবের স্মৃতিপূজা

ব্যবস্থাপক পরিষদের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া খাঁ সাহেব আবদুল করিম বলিয়াছেন—ইংরাজ মুসলমানের হস্ত হইতে যে রাজ্য লইয়াছেন, তাহাই মুসলমানকে ফিরাইয়া দিতেছেন। সুতরাং আজ নবাবী আমল আবার সুরু হইয়া গিয়াছে।

মনের সান্ত্বনা! আলমগীরের ভূমিকা অভিনয় করিবার সময়ে যে শ্রেণীর ক্ষণিক নৈশ সান্ত্বনা উপলব্ধি করে অভিনয়-দক্ষ আমাদের পল্লীর হারু, ফেলু বা মুচিরাম গুড়—ইহা সেই শ্রেণীরই সুখস্বপ্ন। কিন্তু এ সুখস্বপ্নে পৌরুষ নাই—তাহা কবি রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। পাদপ্রদীপের বাহিরে আসিলেই সে ক্ষণিকের নেশা ছুটিয়া যায়। প্রধান মন্ত্রীই বরিশালে বলিয়াছিলেন—ইহা ইসলামরাজ বা হিন্দুরাজ নয়, ইহা বৃটিশরাজ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত হইতেও জানা যায়, মন্ত্রিমণ্ডল শাসনতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট নহেন, তাঁহারা গভর্ণরের পরামর্শ-দাতা মাত্র। আর ইংরাজ যদি তাঁহাদের ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর মুসলমানের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইবে—সেই রাজ্য কাফের অর্থাৎ হিন্দুগণকেই ফিরাইয়া দেওয়া। কারণ, তাঁহারা হিন্দুদের কাছ থেকেই তাহা পাইয়াছিলেন। খাঁ সাহেবের পক্ষ কি সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন?

ধরিলাম—নবাবী আমলাই ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নবাব সিরাজদৌলার স্মৃতি-সভায় বাংলার বর্ত্তমান মস্নদের অধিকারিগণের যোগদান করা ও স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব করা কি অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল না?

নবাবী আমল যদি আসিয়াই থাকে, তাহা হইলে মিথ্যার জয়স্তম্ভ অন্ধকূপের স্মৃতি কলিকাতার বুকে থাকে কেন?

তবে কি সিংহগড়ের গড় আসিয়াছে, কিন্তু সিংহই শুধু ফিরে নাই!

হায়, আত্ম-প্রবঞ্চকের শূন্যগর্ভ দিবাস্বপ্ন!

শেষের দিনে

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

জীবনের প্রভাত বেলা, খেলায় ছুটোছুটি।
ভাই বোনেরে সাথী ক'রে ধূলায় লুটোপুটি॥
বসুমতীর বুকের 'পরে, নিত্য নব খেলা।
ঘুমিয়ে যেতাম বাড়ী ফিরে প্রতি সন্ধ্যাবেলা॥

মাঝখানেতে সুখের মাঝে স্বপ্নে ভরা মন।
কেটে গেল রঙ্গীন নেশায় সারাটি যৌবন॥
অপরাহ্ণ দেখা দিতে চম্‌কে উঠে দেখি।
সম্মুখে যে কালো রাতি, আস্‌তে নেইক বাকী॥

জীবন মোর যায় যে চলে, ডাকিনিকো তাঁরে।
আঁধার রাতে যাবে যে জন নিয়ে হাতে ধরে॥
দিনের আলো ডুবে গেল, সাম্‌নে তম রাতি।
যাবার পথে কে বা মোরে দেখাবে আজ বাতি॥

কেমন ক'রে যাব সেথা ভবের পরপারে।
কোথায় তুমি জগতস্বামী এস দয়া ক'রে॥
তোমায় ছাড়া আজকে প্রভু কে আছে বা আর।
তুমি আমার শেষের দিনে ওগো কর্ণধার॥

সাময়িকী

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলন

সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে আগামী ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে জুলাই এবং ১লা আগষ্ট এলবার্ট হলে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি — শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার। সাধারণ সভাপতি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক (কাব্য সাহিত্য: প্রথম দিন), শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী (গল্প-সাহিত্য: দ্বিতীয় দিন), শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু (সংবাদ সাহিত্য: তৃতীয় দিন) শাখা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ও সম্মেলনের প্রতিনিধিদের দেয় চাঁদার পরিমাণ অন্যূন এক টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইয়াছে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য: বঙ্গ সাহিত্যের সুলেখক ও লেখিকাগণকে উৎসাহ-দান, সর্ব্বপ্রকার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন এবং বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপন। কবি, সাহিত্যিক ও দেশবাসীর সহৃদয় সহযোগিতা, আশা করি, সাহিত্য-বাসরের এই শুভ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

নিরপেক্ষ সত্যানুভূতি

বত্রিশ বৎসর উচ্চতন শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিবার পর ১২ বৎসর পূর্ব্বে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় বর্ত্তমানে তাঁহার রাসবিহারী এভিনিউস্থ বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তিনি এক পত্রে আমাদের জানাইছেন, "বিগত ৩রা মে হিন্দুদের চন্দ্রগ্রহণ ও মুসলমানদের ফতেয়া-দোয়াজ-দাম অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম যে, একই রাস্তায় মুসলমানেরা পয়গম্বরের জন্মতিথি-উৎসব ও হিন্দুরা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্ব্বিবাদে মনের আনন্দে চলিয়াছে। অনুভব করিলাম, সত্যকার ধর্ম্মানুভূতি যেখানে জাগ্রত, সেখানে বিবাদের স্থান কোথায়? ধর্ম্মের এই অতীন্দ্রিয় দর্শনই ভারতীয় ঋষি-চিত্তে একদা সার্ব্বভৌম বিশ্বাস, প্রেম ও সেবার শিহরণ তুলিয়াছিল। অতিমানসিক তন্ময়তার মাঝে ফুটিয়া উঠিল চারি বৎসর আগেকার নিসর্গ-নিকেতন রাজগীরের এক অপূর্ব্ব স্মৃতি—সুদূর অতীত হইতে যেখানে হিন্দু, বুদ্ধ, জৈন, মুসলমান ধর্ম্মের অনাবিল ভাবধারা প্রেমালিঙ্গনে এক অখণ্ড সঙ্গমভূমি রচনা করিয়াছে—যাহা এই বাদ-বিসম্বাদপূর্ণ বর্ত্তমান জগতে একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

এইরূপ নিরপেক্ষ সত্যানুভূতি প্রেমমপ্রীতির প্রসারক।

বিগত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী

গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র

বিগত ১৫ই জুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তাঁহার রাণী শঙ্করী লেনস্থ বাসভবনে তৃতীয় বর্ষের গ্রন্থাগারিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থীগণকে এক সান্ধ্য ভোজে আপ্যায়িত করেন। সেই ভোজসভায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয়। সভাপতি মহাশয়, শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি ছাত্রদের গ্রন্থাগারিক কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দেন। এবার ৩৭ জন শিক্ষার্থীর সমাবেশ হইয়াছিল।

ভোজসভায় সমাগত গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ

নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের পৌরহিত্যে গত ১লা আষাঢ় নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলনের সাহিত্যসেবিবৃন্দ "বর্ষামঙ্গল উৎসব" সুসম্পন্ন করেন। নবদ্বীপের লেখক ও সুধীবৃন্দ বেদ, পুরাণ, কাব্য, আদি সংস্কৃত তথা ইংরাজি কাব্য গ্রন্থ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনিষিগণের বর্ষা সম্বন্ধে মধুর নিবেশগুলির বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া—বর্ষার মাঙ্গল্যকে বর্ণনা করেন। এইরূপ সাহিত্যিক বৈঠক অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপূর্ণ।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্যার আশুতোষের জন্ম-বার্ষিকী

বিগত ২৯শে জুন হইতে ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত বাংলার সর্ব্বত্র স্যার আশুতোষের জন্ম-বার্ষিকী উৎসব শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি বিশেষ ভাষার জন্য পুরুষসিংহ আশুতোষের অমর অবদান চিরস্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার যে সুমহান্ ব্রত তাহার উদ্‌যাপনের মধ্যেই আশুতোষের সত্যকার স্মৃতি-পূজা সার্থক হইয়া উঠিবে, এদিকে জাতি যেন অবহিত হয়।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
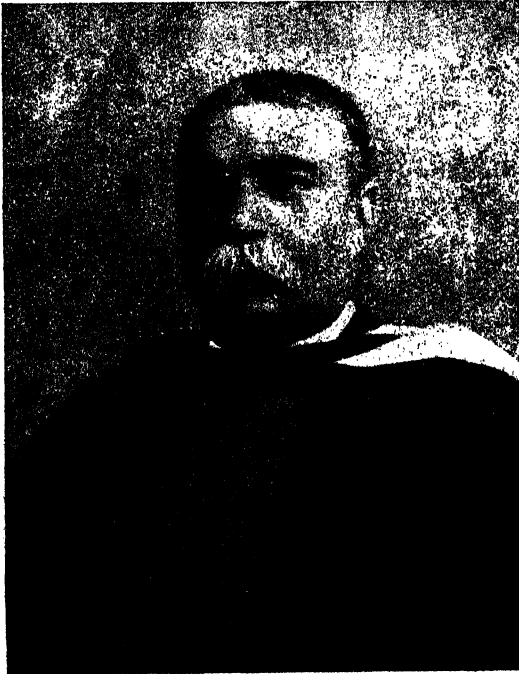
মেঘবর্ণা

শিল্পী : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার
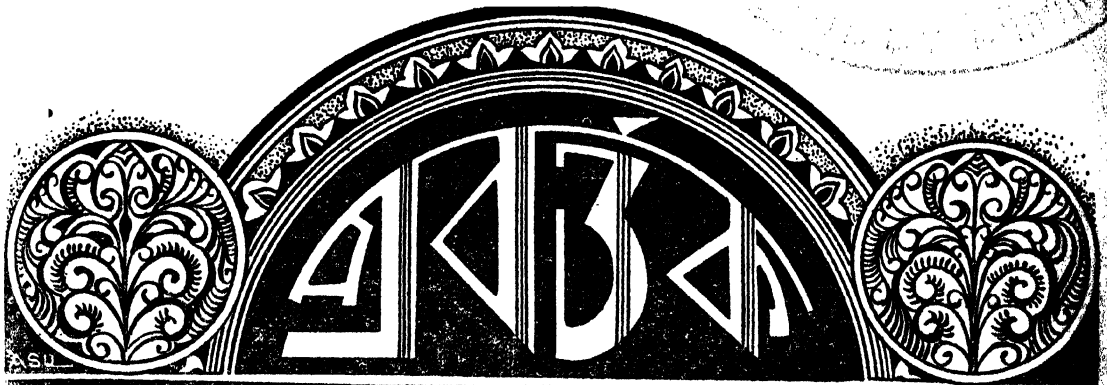
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ
১৩৪৬ সাল

ভাদ্র

প্রথম খণ্ড
৫ম সংখ্যা

সব বিদীর্ণ করে' এগিয়ে চল—কোন সাহায্য বাহিরের দিক্ থেকে আদৌ পাওয়া যাবে না। সব কিছু আত্মপ্রত্যয় থেকেই উদ্ভূত হবে। নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখ। তোমার ভিতরে ভগবান্ আছেন—এই বিশ্বাসই আত্মপ্রত্যয়ের মূল। যত বৃহৎ বাধাই হউক, অবধারিত অপসারিত হবে। সামর্থ্য তো মানুষের নয়, ভগবানের অনন্ত শক্তি অজস্রধারায় নেমে আস্‌ছে। বিষয়—ভগবান। তুমি আশ্রয়-মাত্র। আধারের সীমা হেতু সতত মনে হয়—কর্ম্মের তুলনায় শক্তি আমাদের কতটুকু, কত সামান্য! কিন্তু বিশ্বাসের আগুন জ্বেলে রেখে এগিয়ে যাও, শক্তিকে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর—অফুরন্ত প্রবাহেই ইহা কার্য্য সিদ্ধ করবে।

জাতির প্রত্যেকেই আজ যেন এই অনাদৃত সত্য ও আলোর সম্মুখে নিজেকে বিছিয়ে দেয়। কোথাও যেন অস্পষ্টতা অন্ধকার না থাকে। কেহ যেন কারও প্রতীক্ষায় জড়ের মত অবস্থান না করে। আকাশে সূর্য্য উঠে—পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে সূর্য্যের উপর অভিমান অজ্ঞতা। তবুও সে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভেদ ক'রে সর্ব্বত্র আলো ছড়িয়ে দিতে সচল। তোমায় বাহির হয়ে আসতে হবে জড়তাকে ভেদ ক'রে—অহংকার, অভিমানকে বিদীর্ণ করে'। তোমার ইষ্ট যদি থাকেন অন্ধকারের দিকেই, তবে অন্ধকারের ধর্ম্ম নিয়েই চিরযুগ সান্ত্বনার তামসিকতায় আচ্ছন্ন থাকতে হবে। কোন দিন প্রকাশাত্মক বিমল সত্ত্বের জ্যোতিতে তুমি পুলকিত উচ্ছ্বসিত মূর্ত্তিতে ফুটে' উঠ্‌তে পার্‌বে না।

প্রকাশ হ'তে দাও—ভগবানের সিদ্ধ বীর্য্যকে। উলঙ্গ হয়ে সত্য ও আলোর সম্মুখে এসে দাঁড়াও—অন্ধকারের বিন্দু তোমার এই জীবন্ত ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক।

ভারতের ইতিহাস

ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, এই কথাটা সবখানি সত্য নহে। অর্ব্বাচীন যুগের ইতিহাস-লিখন-ভঙ্গী প্রাচীন-যুগের সহিত এক নহে, এইজন্য আমরা পুরাণাদিতে যে সকল কাহিনী পাই, তাহা ভারতের ইতিহাস বলিয়া গণ্য করি না। বশিষ্ঠ-পুত্র পরাশরকে মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন, "জগতের উপাদান আকাশাদির পরিমাপ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র, পর্ব্বত ও পৃথিবীর স্থিতি, রাজাদিগের চরিত্র শুনিতে অভিলাষ করি।" এই পরাশর মুনি ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, বেদ-বেদাঙ্গপারগ ছিলেন। ইতিহাস যদি না থাকিবে, তবে তিনি ইতিহাসজ্ঞ হইবেন কি প্রকারে? অর্ব্বাচীন যুগের ইতিহাসে আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি যে, "যদিও ভারতবর্ষ মানবজাতির বাসভূমি কবে যে হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, তবু ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গবেষণায় বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নানা শ্রেণীর অসভ্য জাতি এই দেশে বাস করিত, ইহা স্থির হইয়াছে।" তারপর ভারতের প্রসিদ্ধ আর্য্যজাতিদের আগমনকালের কোন ইতিহাস না থাকায়, এই সকল পণ্ডিতেরাই মাথার খুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন—ইহারা মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন। আমরা দুঃখের সহিত বলিব, ওয়েলস্ সাহেবের পৃথিবীর ইতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে লিখিত বলিয়া, আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লই, আর আমাদের পুরাণাদিতে তত্ত্বতঃ সৃষ্টিক্রম যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা অবধান করি না; এবং ইহারও যে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাহা আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে মাথা কাটা যায়।

তমোময় সৃষ্টি হইতে স্থাবর সৃষ্টি। তাহা হইতে তির্য্যগ্স্রোতা, অর্থাৎ আহার-সঞ্চারে জীবিত এই সৃষ্টির উপর ঊর্দ্ধস্রোতা আর এক স্বর্গস্রোতা রচিত হইয়াছিল। ইহাকেই পুরাণে দেব-স্বর্গ বলিয়াছে। তারপর অর্ব্বাক্স্রোতা সাধক, অর্থাৎ আহারে জীবিত বলিয়া প্রথম মনুষ্যজাতির সৃষ্টি। এই সৃষ্টিক্রমেরও যে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তাহা গভীর অনুধ্যানে উপলব্ধিগম্য হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক তির্য্যগ্স্রোতার সৃষ্টি, তৎপরে ঊর্দ্ধ-স্রোতা দেবস্বর্গ আলো-বাতাসের লীলাক্ষেত্র, তৎপরে অর্ব্বাক্স্রোতা মানুষের সৃষ্টি। এই মানুষ হইতেই সনৎকুমারাদির উৎপত্তি, তারপর ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ৯ জন প্রজাপতির আবির্ভাব। এই সকল তত্ত্ব হইতে পর পর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা ধরিয়া যদি চলা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব, ভারতের সভ্য এবং অসভ্য উভয় জাতিরই আদিভূমি অন্যত্র নহে। ভারতবর্ষই অসভ্য বর্ব্বর হইতে অসাধারণ মনীষী ঋষির সর্ব্বপ্রথম জননী। আমরা সেই কল্পসৃষ্টি হইতে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র, তারপর রাজা পরীক্ষিৎ হইতে মগধরাজ অজাতশত্রুর কথাও পুরাণাদিতে পাইয়া থাকি। শিশুনাগের পর মহাপদ্মনন্দ, এমন কি আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ইতিহাসও আমাদের চক্ষে পড়ে। ইহার পর মৌর্য্যবংশ, গুপ্তবংশ আমাদের অবিদিত নহে। হিন্দু কীর্ত্তি ও কৃষ্টির ইতিহাস আমরা এমন করিয়া অনুধাবন করি না; তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নাই। আমাদের চক্ষের উপর সমস্ত অতীতটা কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পষ্ট স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয়। বৈদিকযুগ হইতে ভারতে পাঞ্চাল, মৎস্য, কোশল, কাশী প্রভৃতি রাজ্যপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস এমন সুন্দর ও বিশদ আছে, যাহা অবধারণ করিতে পারিলে, ভারত-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্মগত অধিকার যে ভারতের হিন্দু জাতিরই আছে, এই অমোঘ প্রত্যয়ে অন্তর উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

হিন্দুদিগের অভ্যুত্থান-যুগে ধর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে এ দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতবর্ষ অতিমাত্রায় অতিথিপরায়ণ হওয়ায়, শুধু বিদেশীয়

জাতিদেরই আহ্বান করিয়া আনে নাই, স্ব-জাতির মধ্যে ভাব-বৈচিত্র্যকে প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের সংহতি-শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতীয়দের মধ্যে নিদারুণ বিদ্বেষ ও বৈষম্যের মাত্রা বাড়িয়া উঠে। সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমানেরা হানা দিলে, হিন্দু নরপতি দাহিরের বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে তাহা বার বার ব্যর্থ হইয়াছিল। সেদিন স্থানীয় ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণই বৌদ্ধ বলিয়া দাহিরের উচ্ছেদ-সাধনে মুসলমানের সহায়তা করে। এই বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস আমরা ভুলি নাই। ভারতের হিন্দুজাতি বিভিন্ন ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়াই নিজেদের শ্মশান-শয্যা রচনা করিয়াছিল।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে—যে জাতির যে দেশের উপর জন্মগত অধিকার, সেই দেশের রাষ্ট্রশাসন এমন কঠোর হওয়া উচিত যে, সেই জাতির মধ্যে ভেদ সৃষ্টির সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এক কৃষ্টি, এক সভ্যতা, এক ভাষায় জাতির বিরাট সংহতি রক্ষা করাই জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ভারত-রাষ্ট্রের উপর অভারতীয় জাতিসমূহের যে অধিকার, তাহা কোন কালে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। কালের তুলনায় কি শক্, কি হুন, মোগল-পাঠান সকল বিদেশী শক্তির রাজ্যকাল নিমেষ মাত্র। কোটী কোটী বৎসর যে জাতির এই ভারতবর্ষ জন্মভূমি, সেই জাতিই ইহার সত্য ভূম্যধিকারী, সেই ভারতবাসীর অভ্যুত্থান আমরা চিরদিন কামনা করিব।

হিন্দুর রাষ্ট্র-লক্ষ্য

ভারতে ৩৩।৩৪ কোটী নরনারীর মধ্যে ৭ কোটী ১০ লক্ষ লোক ভারতের করদ ও মিত্র রাজগণের শাসনাধীনে আছে। প্রায় ২৬ কোটী লোক ইংরাজ রাজ্যে বাস করে। ইহার মধ্যে আবার কতক লোক ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভারতের অধিবাসী—ইহাদের লোক-সংখ্যা অতি নগণ্য। ৮।৯ লক্ষের অধিক নহে। এতদিন বৃটিশ রাজ্যের প্রজারাই স্বাধীনতার দাবী করিয়া আসিতেছে, তাহাদের সে দাবীর কিয়দংশ পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের করদ ও মিত্র-রাজ্য মধ্যে প্রজামণ্ডলী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার-লাভের দাবী জানাইয়াছে। ভারতে প্রায় ৬ শত করদ ও মিত্র রাজ্য আছে। ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই কয়টী দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সংখ্যা প্রত্যেকের ৩৫ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ। হায়দ্রাবাদ রাজ্য কাশ্মীর রাজ্য হইতে পরিমাণে কিছু কম হইলেও, ইহার প্রজাসংখ্যা ১ কোটী ৩৫ লক্ষ। হায়দ্রাবাদ মুসলমান রাজ্য ; কিন্তু প্রায় শতকরা ৯০ জন হিন্দু এই রাজ্যের অধিবাসী। কাশ্মীর হিন্দুরাজ্য। ইহার জনসংখ্যা ৩৬ লক্ষ। এই রাজ্যের অধিবাসিগণের অধিকাংশই মুসলমান। ভারতের এই দুইটি দেশীয় রাজ্যে যে গণ-আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহার বৈচিত্র্য ইহাই যে, হায়দ্রাবাদে জনসংখ্যানুপাতে হিন্দুপ্রাধান্য যুক্তিযুক্ত হইলেও, এই ক্ষেত্রে মুসলমান নরপতির আভিজাত্য ও প্রাধান্য-রক্ষা হেতু মুসলমান প্রাধান্যই রক্ষিত হইতেছে। কাশ্মীর হিন্দু রাজার অধীন হইলেও, এখানে কিন্তু হিন্দু রাজের আভিজাত্য-রক্ষার কোন দাবী নাই। মুসলমানের প্রাধান্য-রক্ষারই ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই তো গেল দেশীয় রাজ্যের কথা। ইংরাজাধিকৃত ভারতে তৃতীয় পক্ষ শাসনদণ্ড ধরিলেও, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরের নীতি এ ক্ষেত্রেও প্রবর্ত্তিত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ডক্টর লতিফ মোসলেম্ লীগ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতের ৮ কোটী মুসলমান ২৫ কোটী হিন্দুর উপর যাহাতে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, তাহার জন্য ভারতবর্ষকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র-প্রবর্ত্তনের এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সিকেন্দার ভারতের প্রাদেশিক বিভাগ এমন ভাবে করিয়াছেন, যাহাতে হিন্দু-ভারত মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি—হিন্দুর ঔদার্য্যের কথা। এখনও হাজার বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইসলাম-ধর্ম্মিগণ ভারতে আগমন করিয়াছেন। আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান হইতে ৮ কোটী মুসলমান নিশ্চয় আসেন নাই। ভারতের হিন্দু জাতি ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু ভারতের

মুসলমানগণ শুধু সংখ্যা-লঘুই নহেন, ভারতের মাটীর প্রতি আন্তরিক দরদ সৃষ্টি করিতে যেন সমর্থ হন নাই। ইংরাজশক্তির আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে অকিঞ্চনের মত তাঁহাদের স্বার্থভিক্ষা শুধু পূর্ণ হইতেছে। ইহা ইস্‌লামধর্ম্মীর গৌরবের কথা নহে। অবশ্য আমরা একদল জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহাদের নিকট আমাদের অকপট শ্রদ্ধা আমরা চিরদিন নিবেদন করিব। একথা ক্রমেই সত্য হইয়া উঠিতেছে, যে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি নিছক বৃটনবাসীর পক্ষে দীর্ঘদিন ধারণ করা সম্ভব হইবে না। মুসলমানের এ সাধ্য আমরা অসম্ভব মনে করি। এদেশের উপর যথার্থ অধিকার ২৮ কোটী হিন্দুদেরই আছে। হিন্দু জাতির আও ঘুমাইয়া নাই। তাহার দৃষ্টি স্বার্থে নহে, তাহার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে। এইখানেই তাহার জাগৃতি নির্ভর রিতেছে। ভারতের হিন্দু এখনও শতধা বিচ্ছিন্ন, অন্যান্য প্রদায়ের মত তাহার অনেকখানি আপাত স্বার্থসিদ্ধির াভে বিমূঢ়, সম্মোহিত। হিন্দু প্রকৃতিতে এইরূপ র্ধান্ধতা দীর্ঘ দিন প্রশ্রয় পাইবে না। এইখানেই তাহারা অতি গুরুতর আঘাত পাইয়া অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবে। ভারতের বিরাট্ হিন্দুজাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়া মাথা তুলিবে। কিন্তু এই জাগরণ আত্মস্বার্থ-চরিতার্থতার জন্য নহে বলিয়া ভারতের হিন্দুই এদেশে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী হইবে। গান্ধিজীর ভক্তগণ বলিতে সুরু করিয়াছেন—হিন্দু-মোস্‌লেমের একতা অতঃপর স্বার্থের দর-কষাকষিতে সম্ভব হইবে না। বিরাট্ হিন্দুজাতি ও লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের সেবায় সংসিদ্ধ হইবে। তাঁহারা এই কথা কিরূপ মনোভাব লইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের বিশাল হিন্দু-জাতি সর্ব্বশ্রেণীর ভারতীয়দের জন্যই রাষ্ট্রাধিকার অর্জ্জন করিবে। হিন্দুর প্রবল সংহতি এইজন্য আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সংহতি হিন্দু সংহতি হইলেও, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ইহার মধ্যে না থাকায়, ইহার মহতী প্রচেষ্টা ভারতের অখণ্ড সর্ব্ব জাতির হিতসাধন করিবে। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ভারতের কল্যাণ সাধন যাহাতে করিতে পারে, হিন্দুর উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সেই পথে—অতএব ভারত-জাতি যে ধর্ম্মী, যে সম্প্রদায়েরই হউক, সকলেরই শুভ-সাধন এই হিন্দু-সংগঠনের ভিতর দিয়াই হইবে। রাষ্ট্রসাধনায় আমরা এই-জন্য হিন্দু-সংহতি-গঠনের সূচনা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ভারতের বিরাট্ হিন্দু মহাসভা দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠুক, ইহাই আমরা কামনা করি। বাংলার হিন্দু সমাজও সংহতিবদ্ধ হওয়ার আকুতি প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যে বাহ্যতঃ সাম্প্রদায়িক ভাব কেহ কেহ অনুভব করিতে পারেন—ইহা জাতীয়তাবিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু আমরা নিঃসংশয়ে বলিব, হিন্দুর সংহতি সাম্প্রদায়িক-দোষদুষ্ট হইবে না। মানব-কল্যাণের যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হিন্দুর জীবনে দীর্ঘদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার প্রবল অভিব্যক্তি দিবার জন্যই রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহার অভ্যুত্থান বাঞ্ছনীয়। হিন্দুর এই জয়ে ভারতের সকল জাতির জয় নিহিত আছে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও দেবতা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ নহে—গৃহে, নদী-তীরে, বটের মূলে, মঠে, মন্দিরে, গীর্জ্জায়, মস্‌জিদেও সে ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া দাঁড়াইতে কুণ্ঠা করে না। হিন্দুর ধর্ম্ম ভাব মাত্র নহে, বস্তুতন্ত্র—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের রাষ্ট্র হিন্দু অধিকার করিতে পারিলে, তাহা ভারতীয়দেরই হইবে। আমরা এই হিন্দুর অভ্যুত্থান যত আসন্ন হয়, তাহার জন্য হিন্দু সমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে বলি।

বাঙ্গালীর আত্মরক্ষা

বাংলার রাষ্ট্র-সাধনায় বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্রকেই সেনাপতি পদে বরণ করিয়া লইয়াছে। তিনি "ফরওয়ার্ড ব্লক"-এর নিশান উড়াইয়া অভিযান সুরু করিয়াছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্র-সাধনায় গান্ধিজীর এখনও আত্মনিয়োগের কাল শেষ হয় নাই। এই হেতু আমাদের দেখিতে হইবে—বাংলার রাষ্ট্র-সাধনার লক্ষ্য কি এবং কোন্ পথে তাহা চলিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের "ফরওয়ার্ড ব্লক" সাপ্তাহিক পত্র-খানির মুখবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝা গেল—রাষ্ট্রসাধনায় অগ্র-

স্বরূপ যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গান্ধিজী হইতে স্বতন্ত্র নহে। তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রসভাকেই নিখিল জাতির রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্র-স্বরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গান্ধীজীর প্রচণ্ড আন্দোলন আজ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ম্লান ও স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতাকামী জাতির ইহা শক্তি ও স্বাস্থ্যের পরিচয় নহে বলিয়া সুভাষচন্দ্রের ধারণা, এবং তিনি একদল বলদৃপ্ত বামপন্থী লইয়া এই রাষ্ট্রক্ষেত্রটিকে দখল করিয়া লওয়ার জন্য অতিমাত্রায় আকুল হইয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রেমেরই ইহা পরিচয়। প্রাকৃত বিধান তিনি অস্বীকার করেন নাই—তিনি এ কথাও বলিয়াছেন "আজিকার এই বামপন্থী আবার শক্তিহীন হইয়া পড়িলে, আবার এক নূতন বামপন্থীর অভ্যুত্থান হইবে।" অতীতেরই ভুয়োদর্শন! একথা আমরা বার বার বলিয়াছি—বলিয়া থাকি।

ভারতের রাষ্ট্রসভা শাসনসংস্কার লাভ করার পূর্ব্বে যে প্রকৃতির ছিল, শাসন-শক্তি হাতে পাওয়ার পর তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা কিছু অস্বাভাবিক কথা নহে। পূর্ণ-স্বাধীনতাকামী ভারতের রাষ্ট্র-সংহতি আজ এক ফাঁদে পড়িয়াছে, এমন কথাও অনেকে বলেন—আর ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়ও নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, অনুদ্ধারের অবস্থাটা ক্রমেই স্বেচ্ছাকৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহার কারণ এই ফাঁদে পা দেওয়ার পর, ভারতের রাষ্ট্রসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ নূতন শাসনসংস্কার-পরিচালনার ভিতর দিয়াই পূর্ণ স্বাধীনতার পথে চলার সুযোগ আছে, এইরূপ দৃষ্টি পাইয়াছেন। বাংলার জাতীয়পন্থীদের মধ্যে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন না। তাহার একমাত্র কারণ, অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেসপন্থীরা যে অবস্থায়, বাংলা সেরূপ অবস্থাপন্ন নহে।

বাঙ্গালী গান্ধীজিকেও সংশয়ের চক্ষে দেখিতেছে। তিনি যখন বলেন—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে ভারতে প্রাদেশিকতাই বাড়িতেছে; বাঙ্গালী দুঃখের হাসি প্রকাশ করিয়া বলে — কোথায় বাড়িতেছে! গান্ধীজি সেদিকে বুঝিবা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। আসামে, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীর প্রতি মমতার অভাব সুস্পষ্ট—গান্ধীজী কি ইহা অবগত নহেন? আসাম ও বিহারে বাঙ্গালী-সমস্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, ইহা কে না জানে? সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে ১ লক্ষ বাঙ্গালী অধিবাসীর সন্তানদের বাংলা ভাষা ভুলাইয়া হিন্দি ও উর্দ্দুতে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। বাঙ্গালীর প্রতিবাদে যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী কুম্ভকর্ণ হইলেন—মহাত্মা কি এই সকল কথা শুনেন না?

ভারতের রাষ্ট্র-সংহতি বাংলাকে এক প্রকার বাদ দিয়াই চলিয়াছে। অথচ ভারত-গঠনের স্বপ্ন বাংলারও আছে—কিন্তু বাঙ্গালীর স্বরূপ ইহার জন্য বলি পড়িতে পারে না। বাঙ্গালী ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশবাসীর নিকট উপেক্ষিত হইয়া, সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিটুকুই জাগাইয়া রাখিতে চাহে। ইহা ছাড়া তাহার আর কি করিবার আছে!

অন্য পক্ষে, কংগ্রেস-শাসিত ৮টী প্রদেশ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই জাতিগঠন কর্ম্মে সুযোগ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর সে ভাগ্য হইল না কাজেই 'বিপ্লব চাই', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস কর', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' প্রভৃতি স্লোগান উচ্চারণ করিয়া তারা রাষ্ট্রক্ষেত্র তাতাইয়া রাখিয়াছে। বোম্বাইয়ে ১লা আগষ্ট হইতে সহরতলী হইতে এক কথায় মদ্যপান প্রথা নিবারিত হইল। ইহার বিরুদ্ধে রুদ্র প্রতিবাদ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট বন্দুকের গুলিতেই বন্ধ করিয়া দিলেন। আবার সংবাদ-পত্রাদিরও মুখ বন্ধ করিয়া কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট নিজেদের আদর্শ পূর্ণ করার সুবিধা লইলেন। ৫০ বৎসরের কংগ্রেসী আন্দোলনে ইহা সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস শাসন-শক্তি হাতে পাইয়াছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইল।

মন্দিরপ্রবেশ সমস্যা লইয়া গান্ধিজীর অনশনে জীবন-নাশের সঙ্কল্পের কথা আমাদের মনে আছে। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় এক কলমের আঁচড়ে তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। আবার গোয়েন্দাবিভাগের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য জাতি কত আন্দোলনই না করিয়াছে; মাদ্রাজে তাহা অতি শীঘ্র সুসিদ্ধ হইবে। যুক্তপ্রদেশে আগ্রা জিলা বোর্ড কর্ত্তৃক ৫ শত ছেলের অর্দ্ধ সের করিয়া দুগ্ধ-পানের ব্যবস্থা করিতেছে। জাতির স্বাস্থ্য, জাতির চরিত্র, জাতির আর্থিক উন্নতি, জাতির শিক্ষা, জাতীয় ভাব সিদ্ধ করার জন্য এই ৮টী প্রদেশে কি উৎসাহ, কি কর্ম্ম-চাঞ্চল্য!

জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর কাজ নাই, রাষ্ট্র হাতে না থাকিলে হয় রোদন, না হয় বিক্ষোভ—দুইই তাহাদের সম্বল হইয়াছে।

আসামে অহিফেন-সেবন বন্ধ হইবে, সিন্ধু প্রদেশে বিবাহ-পণ নিষিদ্ধ হইল, যুক্তপ্রদেশে ও বিহারেও জাতি-গঠনের কি উদ্যোগ চলিয়াছে! বাঙ্গালী জাতি আজ ক্ষুব্ধ, ম্রিয়মাণ—তার হাত বন্ধ, গলা চিরিয়া চীৎকার উঠে, বাংলার কর্পোরেশনের নূতন আইন রদ করার জন্য ৫০ হাজার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রতিবাদ তুলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। রাজবন্দী মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্রের আইন-সচিবের নিকট ছুটাছুটীও ব্যর্থ হইল। বাঙ্গালীর বিক্ষোভ ভারতের কংগ্রেস আজ বুঝিবে না; ৮টী প্রদেশে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে চলার জন্য যে উপযুক্ত চরিত্র গড়ার প্রয়োজন, কংগ্রেস তাহার সুবিধা পাইয়া বাংলাকে আমলে আনে না। আসামের মত বাংলার কংগ্রেস যদি কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট করার সুযোগ লইত, সিন্ধু আজ এই পথে, তাহা হইলে বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর এই আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণ বধির করিত না।

বাংলার রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ ছন্নছাড়া—তাই কর্পোরেশনে বাংলার কংগ্রেস নতশির হইল। বাঙ্গালী জাতি কোন পথ না পাইয়া, নূতন পথে পূর্ণ স্বাধীনতাকামী দক্ষিণপন্থীদের অবনমিত করার উদ্দেশ্যই বড় করিয়া লইল। বাংলার রাষ্ট্রপ্রাণ আজ যদি সংহতিবদ্ধ হওয়ার পথ আবিষ্কার করিতে পারিত, আমরা বাংলার রাষ্ট্রশালায় সুভাষচন্দ্রের ললাটে জয়তিলক পরাইয়া ভারতের পুরোভাগে তাঁহাকে স্থাপন করিতে পারিতাম।

বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশ আজ মসীলিপ্ত। আমরা প্রতিক্রিয়াপ্রবণ অন্ধশক্তিকে জাগাইয়া, জাতির ভিত্তি আল্‌গা করিতেছি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন ফিরাইয়া আনিতে বাঙ্গালী বাধ্য হইতেছে; কিন্তু সে আন্দোলনের সাফল্য যে জন্য হইয়াছিল, তাহা আমাদের স্মরণে নাই। বাংলার এই আন্দোলনের মূলে ছিল শতবর্ষব্যাপী ব্রাহ্ম-সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন, আর ছিল দক্ষিণেশ্বরের পূত প্রভাব। জাতি এই শক্তিবীর্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছিল বলিয়াই সে যুগ রক্ষা পাইয়াছে। আজ সেই অতীত তপঃশক্তি নষ্টপ্রায়। শ্রমিক ও কৃষকের কথা ছাড়িয়া দিই, দেশের তরুণদেরও কি সে মেরুদণ্ড আছে? অনাচারে, স্বেচ্ছাচারে তাহাদের শিরদাঁড়া বক্র হইয়া গিয়াছে। দেশের অধ্যাত্ম-প্রাণস্রোতঃ শুকাইয়া গিয়াছে। তরুণ-তরুণীদের দেখি, স্বাধীনতার শ্লোগান গাহিয়া, রাজপথ মুখরিত করিয়া, পর মুহূর্ত্তে সিনেমায় গিয়া লঘুচরিত্র হইয়া পড়িতেছে। আজিকার বাঙ্গালী যেন এ দেশের মাটী দিয়া গড়া নহে। চক্ষে দীপ্তি, বক্ষে বল নাই। বীর্য্যহীন, মেধাহীন—হুজুগের স্রোতে ভাসিয়া চলে, জাতীয় আন্দোলন ইহাতে লঘু হয়।

বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে, তাহার জন্য স্বাধিকার-রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিকে তরুণের চিত্ত আকৃষ্ট করার সুব্যবস্থাও করিতে হইবে। বাংলার রাষ্ট্রসাধনা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নাও হয়, প্রবীণ দেশদরদীদের সংহতি রচনা করিয়াও তাহা সুসিদ্ধ করিতে হইবে। তরুণদের জানাইয়া দিতে হইবে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বৈদেশিক মন্ত্র, কমরেড বলিয়া তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হইবে। তাহারা হইবে রুষের পোষ্যপুত্র নহে, বাংলার বরপুত্র। প্রবীণেরা রাষ্ট্রসাধনায় অগ্রসর হউন—তরুণদের চরিত্রগঠনের আয়োজন বাঙ্গালীকে করিতে হইবে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক রক্ষা করিতে হইবে। বাংলার রাষ্ট্র হয়তো কংগ্রেসের সাধ্যে গড়িবে না, বাঙ্গালীকেই তাহার জন্য আত্মস্থ হইতে হইবে।

অনশন-ব্রত

আয়ার্ল্যাণ্ডের ম্যাক্‌সুইনি সাহেবের নাম আমাদের মনে আছে। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য বন্দী অবস্থায় অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই অবস্থায় গতাসু হন। স্বাধীনতাকামী আইরিশদের প্রাণে ইহাতে প্রবল বিক্ষোভাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। আজ স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড ম্যাক্‌সুইনির স্মৃতি নিশ্চয়ই ভুলে নাই।

ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় মহাত্মা গান্ধীর অনশন-নীতি এদেশে প্রথম প্রচারিত হয়। যারবেদা জেলে তাঁহার দীর্ঘ অনশন-ব্রত দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির মহামূল্য প্রাণনাশের আশঙ্কায় স্বদেশবাসী ও বিদেশী বন্ধুগণ তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনশন-নীতির অনুকরণ ক্রমে ভারতে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। বন্দীশালায় দেশ-সাধকেরা অনশন পণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং এই নীতি ক্রমে সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম্ম-সংস্কারে, এমন কি ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংরক্ষণে বর্ত্তমানে প্রযুজ্য হইতেছে। কালীঘাটের পাঁঠা-বলির বিরুদ্ধে অনশনের প্রতিবাদ শুনিয়াছি। স্কুলের ছাত্রদের অপ্রিয় শিক্ষক-বিতাড়নের ব্যবস্থায় কাশীতে অনশনের দায়ে পণ্ডিত মালব্যজীকেও বিব্রত হইয়া ছাত্রদের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতে দেখিয়াছি। অনশন সঙ্কল্প-পূরণের একটী ব্রহ্মাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে ইহা সফলতা আনে নাই—এক যতীন্দ্রনাথের আত্মদান আমাদের বুকে ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

এই প্রকার অনশন-নীতি কিন্তু ভারতে আর্য্যজাতিরা সমর্থন করিবেন না। ভোজনাদি-গ্রহণে বিরতিরূপ এক-ব্রত ভারতে প্রচলিত ছিল। উহা প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে প্রযুক্ত হইত, অথবা দেবার্চ্চনা বা দেশ ও জাতির কল্যাণকামনায় অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথা ছিল। উপবাস দাবী রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথা, লৌকিক উপকথায় দেখা যায়। এখনও দাম্পত্য-কলহে, আত্মীয়স্বজনের প্রতি অভিমানে উপবাস বঙ্গসমাজে পরিলক্ষিত হয়। উহা আমরা গুরুতর-রূপে গ্রহণ করি না। কিন্তু সম্প্রতি বাংলার যে অনশন আতঙ্কে আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি, তাহা অতি ভয়াবহ—দেশের তরুণেরা এমন করিয়া যদি আত্মঘাতী হয়, দেশের ভবিষ্যৎ কি? আমরা জানি, প্রচলিত রাজশক্তির বিপক্ষে কেহ যদি তাহার পরিবর্ত্তন মানসে রাজবিধি লঙ্ঘন করিতে গিয়া গুরুতর অপরাধ করে, তাহার দণ্ড আছে; ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বহু জন এই জন্য দণ্ডিত হইয়াছে। এই দণ্ডকাল দীর্ঘ হওয়ার দরুণ অথবা দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইয়া থাকিলে, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বন্দী অবস্থায় আর কোন উপায় না থাকায়, তাহারা অনশন-নীতির আশ্রয় লইবে, ইহা কিছু অন্যায় অথবা অসঙ্গত কথা নহে।

ইহার উপর যে উদ্দেশ্যে দেশের এক শ্রেণী সুবুদ্ধি অথবা দূরদর্শিতার অভাবে কোনরূপ অন্যায় করিয়া থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য যদি কোন কারণে সংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিপথগামী বন্দীদের মুক্তির আশা দুরাশা নহে। দেশবাসীও তাঁহাদের মুক্তি কামনা করিবেন। ভারতের শাসনসংস্কারে পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ না হইলেও, আংশিক ভাবে দেশ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইয়াছে। এই অধিকার দেশবাসী এক প্রকার মানিয়া লইয়াছে, এইজন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রাজবন্দীদের মুক্তি হইয়াছে। বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি-কামনা কেন অসঙ্গত হইবে? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, মহাত্মা গান্ধিজীর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বাংলার বন্দীগণ মুক্তি পাইলেন না। বাংলার রাজবন্দীদের ধৈর্য্যের সীমা আর কত হইতে পারে? আলিপুর ও দমদম জেলে ৭ই জুলাই তাঁহারা বিনা-সর্ত্তে মুক্তির দাবী করিয়া অনশন-ব্রত গ্রহণ করিলেন। গান্ধিজীর নিষেধ সত্ত্বেও, রাজবন্দীরা অনশন ভঙ্গ করিলেন না। সুভাষচন্দ্রও প্রথমে তাঁহাদের অনশন-ব্রত ভঙ্গ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। রাজবন্দীরা একটা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে মুক্তি পাইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তিনি কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কোন মতেই রাজী হইলেন না। রাজবন্দীরা সর্ত্তভঙ্গ করিয়া অনশন ত্যাগ করুক, সুভাষচন্দ্রও ইহা প্রথমে শ্রেয়ঃ মনে করেন নাই।

এই ৮৯ জন তরুণের অকাল মৃত্যুর আশঙ্কায় বাংলার জনমত অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিল। দেশের ছাত্রবাহিনী রাজবন্দীদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি-কামনায় স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল। ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং মহাত্মা গান্ধী এই ঘটনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। গান্ধীজীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই ও রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আসিয়া রাজবন্দীদের সান্ত্বনা দিয়া অনশন-ত্যাগের উপদেশ দান করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মুক্তির সর্ত্ত সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলেন না।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও শ্রীযুক্ত দেশাইকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

ইঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, বসু-ভ্রাতৃদ্বয় স্যার নাজিমুদ্দীনের নিকট রাজবন্দীদের মুক্তি-কামনা জ্ঞাপন করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হন। এ কথা আমরা স্যার নাজিমুদ্দীনের ভাষণ হইতে পরে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে রাজবন্দীগণ সুভাষচন্দ্রের সান্ত্বনাবাণীতে ২৮ দিন অনশনের পর ব্রত-ভঙ্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেই সুভাষচন্দ্রের এই সাফল্যে অতিশয় প্রীতি লাভ করিবে এবং তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিবে।

এই সংবাদ পাইয়া যদিও মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তত্রাচ অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এইরূপ অনুমান অনায়াসেই করিতে পারি যে, যখন রাষ্ট্রপতি ও মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ বাংলার রাজবন্দীগণ বরণ করিয়া অনশন-ভঙ্গ করেন নাই, সুভাষচন্দ্রের উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়াই তাঁহারা আত্মনাশের পথ হইতে মুখ ফিরাইয়াছেন, তখন ইঁহাদের বিনা সর্ত্তে মুক্তির দায়িত্ব গান্ধীজীর আনুকূল্যে যতই লঘু হউক, সুভাষচন্দ্রকেই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ ইহা সর্ব্বতোভাবেই বহন করিতে হইবে।

সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালীর আজ মুকুটমণি। সুভাষচন্দ্রের দায় বাঙ্গালী জাতির দায়। বাংলার বিপ্লবীরা যে নীতি আশ্রয় করিয়া আজ কারাবন্দী, সে নীতি তাঁহারা বর্জ্জন করিতে যখন প্রবৃত্ত, তখন বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে বাংলার গভর্ণমেণ্টও এই সকল রাজবন্দীদিগকে নিঃসঙ্কোচেই মুক্তি দিতে পারেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিংসামূলক রাষ্ট্রীয় অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি যদি মুক্তি পাইয়া কোনরূপ অশান্তির কারণ না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাংলার বিপ্লবিগণকে মুক্তি দিলে তাহা দেশের শান্তিভঙ্গের কারণ হইবে না, বরং এই সংগঠন-যুগে যে কারণে বাংলায় উত্তেজনা ও বিক্ষোভ-সৃষ্টির সূচনা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার মূল সময় থাকিতে উৎপাটন করাই কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে সুবিচার বলিয়া আমরা মনে করি।

গভর্ণমেণ্ট মনে করিতে পারেন—নরহত্যা, ধনাদি লুণ্ঠন প্রভৃতি মারাত্মক ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত জনগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে দণ্ডিত হইয়া যখন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখন গভর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া অসময়ে বিচার-নীতি লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ মুক্তি বিধানে সমর্থ হইবেন? এই যুক্তি রাজবন্দীদের পক্ষে চিরযুগ অমোঘ নহে। রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন-যুগে সকল দেশেই রাজবন্দীরা যে কোন-রূপ অভিযোগেই কারাদণ্ড লাভ করুক না, তাহাদের মুক্তি আসন্ন হইয়া থাকে।

দেশের বর্ত্তমান আব্‌হাওয়ায় হিংসাত্মক বিপ্লব-নীতি ঠাঁই পাইবে না। দেশবাসীও এইরূপ কর্ম্মে প্রশ্রয় দিবে না। ইহা ব্যতীত রাজবন্দীগণও তাঁহাদের পূর্ব্বনীতি পরিহার করিতে প্রস্তুত, একথা গান্ধিজীর নিকট তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের আশা—দুই মাসের মধ্যে রাজবন্দীগণ মুক্তি পাইবেন। বাংলায় অনর্থক বিক্ষোভজনিত আন্দোলনে জনগণের চিত্ত যাহাতে চঞ্চল না হয়, রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ সে ব্যবস্থা করিবেন। অশান্তি উপদ্রবের মধ্যে রাজা-প্রজা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজ বিশ্বপ্রকৃতি রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছে। আমরা চাই ঐক্য ও শান্তি। গভর্ণমেণ্ট দুই মাসের মধ্যেই রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। বাঙ্গালী অপ্রিয় আন্দোলনে যাহাতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই দিকে আমরা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম

ধর্ম্মের অপেক্ষা কর্ম্ম অধিক শ্রমসাধ্য। ধর্ম্ম যদি হয় অধ্যাত্মানুশীলন, তাহা কঠোর আত্মসংযমরূপ তপঃসাধ্য, এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কর্ম্মে এই তপস্যার সহিত বাহিরের যে কঠোর সংঘাত, তাহা অতিক্রম করিয়াই উহা মূর্ত্ত করিতে হয়। কর্ম্মী হইতে হইলে, ধর্ম্ম-সাধনার যে শ্রম তাহার অতিরিক্ত আয়াসের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি কর্ম্মে অবতরণ না করিলে, আমাদের কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মক্ষেত্রে যে বাধা তাহা বহু যুগের অভিজ্ঞতায় খুবই পরিচিত। আজ আর উহা অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ধর্ম্মজীবন কর্ম্মে অন্বিত করার পথে এত অজ্ঞাত অভাবনীয় পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা, যে তাহা দেখিয়া আমরা পদে পদে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই।

ধর্ম্মের খ্যাতি আছে। কর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া খ্যাত। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি দেশের সহজ শ্রদ্ধা। কর্ম্মকুশল ব্যক্তির প্রতি সে শ্রদ্ধা পূর্ব্বোক্ত কারণে সুলভ নহে। কর্ম্মীকে তাই সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে একপ্রকার মরুভূমি অতিক্রম করিয়াই চলিতে হয়। আমরা সর্ব্বপ্রথম এই পথের যাত্রী।

ধর্ম্মের দায়িত্ব বস্তুতন্ত্র নহে, অধ্যাত্ম। এই ক্ষেত্রে নিজেকে অপসৃত করিতে চাহিলে, পৃথিবীর বাধায় সে বিপন্ন হয় না। রাষ্ট্রসাধকও যদি গতি ফিরাইতে চাহেন, একটা অদৃশ্য নৈতিক বাঁধনই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু বস্তুতন্ত্র কর্ম্ম-জীবন ধর্ম্ম-নীতি ও চরিত্র-বল, এই দুইকে অলক্ষ্যে রাখিয়া ফাঁকি দিতে পারিলেও, জাগতিক ব্যাপারে সে এমনই সর্ত্তবদ্ধ যে তাহা হইতে সে সহজে বিমুখ হইতে পারে না।

আমরা ধর্ম্মকে দেশের কর্ম্মজীবনে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছি। কর্ম্ম বলিতে অর্থনৈতিক ভিত্তির কথাটাই বড় করিয়া ধরিতে হইবে। অন্তরে ধর্ম্মের বীর্য্য, বাহিরে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি জাতিকে সাহসী ও স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা যদি দেয়, তবে এই আত্মনিবেদিত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা বাঙ্গালী জাতির সহানুভূতি পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

অর্থক্ষেত্রে দুইটী প্রধান কৃষি-সম্পদ্ আমাদের লক্ষ্যে পড়ে, ধান ও পাট। সুন্দরবনের বনভূমি আজ যে শস্য-শ্যামল হইয়াছে, তাহা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মের অগ্নি-পরীক্ষা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে পাটের চাষে ও পাটের ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার্জ্জনের কঠোর তপস্যা করিয়াছে।

তারপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর জুট মিল স্থাপনের একটী কোম্পানী রেজিষ্টারী করিয়া, সঙ্ঘ গভর্ণমেণ্টের নিকট যথারীতি প্রস্পেক্টুস ফাইল করিয়া ১৯৩৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আমরা 'commencement certificate' লাভ করে। কলিকাতার অতি সন্নিকটে কামারহাটীতে জমি ক্রয় করিয়া ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে মিল বাটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই মিলের যন্ত্রপাতির অর্ডার দিতে গিয়া সঙ্ঘ কিরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।*

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে সঙ্ঘ ভারতীয় জুটমিল এসোসিয়েশনের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে সম্মত হয়। তবে ১৯৩৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলা গভর্ণমেণ্ট জুট অর্ডিনান্স জারি করেন। ছয় মাস কর্ম্মীদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই অর্ডিনান্স উঠিয়া যায়। কিন্তু এই একবৎসর পূর্ব্বোক্ত বাধার জন্য সঙ্ঘ শেয়ার-বিক্রয় কর্ম্ম ও পুরাতন allotment-এর প্রথম কিস্তির টাকার জন্য তাগাদা বা নূতন call করে নাই।

আজ আনন্দের সহিত সঙ্ঘ জানাইতেছে যে, তাহারা সম্প্রতি জুট মিলের যন্ত্রপাতির অর্ডার দিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যন্ত্রপাতি আসার সঙ্গে সঙ্গেই অবশিষ্ট টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হইবে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে মিলের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে, পুরাতন অংশীদারগণকে তাঁহাদের দেয় বাকী টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিতে হইবে। সঙ্ঘ প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই মহতী প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য, অংশ খরিদ করারও আকুতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত "মিলের" সাধারণ অংশ বিক্রয় ছাড়াও ২॥ লক্ষ টাকার বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা ডিভিডেণ্ডের প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম কোম্পানীর অংশীদারগণের নিকট নিবেদন জানাইতেছে। এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে, নতুবা সাধারণের নিকট তাহা বিক্রয় করিতে আমরা বাধ্য হইব।

ইহা কি দুঃখের কথা নহে যে, বাংলার ৯০টী জুট মিলের মধ্যে বাঙ্গালীর চটকল মাত্র ৩টী। প্রবর্ত্তক জুট মিল বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের ক্ষেত্র হইবে। বাঙ্গালীর গৌরব-বৃদ্ধি করিবে। আমি বাঙ্গালী ভাই-বোনদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বলি—দান নয়, ভিক্ষা নয়, সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করুন। ভগবান বাঙ্গালীর আশা ও উদ্দেশ্য সফল করিবেন। জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে।

ঝড়ের সঙ্কেত

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

চার

সহসা আমাদের পারিবারিক জীবন ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গত তিন দিন হইতে বাবার অসুখ যেন দ্রুত এক বিপদের সীমারেখার দিকে চলিয়াছে, আমাদের সমস্ত সংসারটা অস্বস্তিতে আলোড়িত হইল।

পিসিমা আসিলেন, বাবার এক অতি বৃদ্ধ কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মামারা আসিলেন, মাসী ও তাঁহার তিন ছেলেমেয়ে আসিয়া জড়ো হইলেন। ডাক্তার-বাবু বলিয়াছেন, জ্বরের লক্ষণ ভালো নয়, সাবধান, বুকের ভিতরে জল ভর করিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে রান্না-বান্না চড়ানো দায় হইল। বাবার চারিদিকে সবাই আসিয়া ঘিরিল।

আট টাকার ডাক্তার বদলাইয়া, ষোল টাকা দামের ডাক্তার আনিলাম। তাঁহার ঔষধ যখন ধরিল না, তখন বাবার প্রায় অচেতন অবস্থা। আমি বত্রিশ টাকার ডাক্তারকে রোজ দুইবার করিয়া আনিতে লাগিলাম।

চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার জ্ঞান নাই, রোগের নাম ও উপসর্গের বিবরণ আমি মুখস্থ রাখিতে পারি না, কখন কি পথ্যের প্রয়োজন তাহা জানিয়া রাখিতেও আমার বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলায় না। কেবল তাহাই নয়, রোগীর সেবা করিতেও আমি পারিয়া উঠি না। আমি দুই চারিবার ছুটাছুটি করিতে পারি, গাড়ী করিয়া ডাক্তার আনিতেও অসুবিধা ঘটে না, আড়ালে থাকিয়া নিরাময় কামনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু অসুস্থের পাশে রাত জাগিয়া বসিয়া থাকা, সেবা করা, ঔষধ ও পথ্য খাওয়ানো, ওজন করিয়া যত্ন করা,—হে ঈশ্বর, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আড়ালে গিয়া বরং হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি!

আত্মীয় স্বজনের ভিতরে আমি নরাধম বলিয়া আখ্যাত ছিলাম, তাহারা আমাকে পঁচিশ বছরের নাবালক বলিয়া তিরস্কার করিত। আজ তাহারা আসিয়া যখন বাবার রোগশয্যাকে ঘিরিয়া বসিল, আমি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম। তাহাদের সহিত আমার সম্পর্ক কম, চিরকালই হিতার্থিগণকে এড়াইয়া আসিয়াছি, সুতরাং আজও তাহাদের সহিত মাখামাখি করিবার কারণ দেখিলাম না। অবশ্য আড়ালে আবডালে থাকিয়া আমার প্রতি তাহাদের বিরক্তি-প্রকাশ কাণে যে আসিল না, তাহা নহে। আমি পিতার একমাত্র সন্তান, সে জন্য যেন একটা পারিবারিক দুঃখ আছে; আমি যে ভবিষ্যতে একটা বৃহৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইব, ইহাও যেন আমার একটা ভয়ানক অপরাধ। অনেকে অনেক সময়ে আমার উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া মাকে বলিতেন, ভাগ্যি তোমার ভাল নয় মা, একটি তরকারী তাও নুনে পোড়া! আমাকে যত বারই তাঁহারা দেখিয়াছেন ততবারই বলিয়াছেন, বুঝলে বাবা, চরিত্রটি বজায় রেখে চ'লো। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের উপদেশ পাইয়া সেইদিনই প্রাণ ভরিয়া চরিত্র নষ্ট করিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। আমার জীবনে দেখিয়াছি, সংযম শিক্ষা দেওয়ার বক্তৃতা শুনিলে, তখনই যেন মনের অসংযত প্রবৃত্তিগুলি কিল্‌বিল্ করিয়া বাহিরে আসিতে চায়।

আমার বুকের ভিতরে কখনও জল ভর করিয়া জ্বরে অচেতন হই নাই, সুতরাং বাবার অসুখের গভীরতা প্রথমটা আমার অগোচরে ছিল। কিন্তু মায়ের চক্ষু যখন জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাঁহারই মুখে আসন্ন দুর্যোগের ছায়া দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। মায়ের মুখে চিরদিন তেজস্বিনীকে দেখিয়াছি, বাৎসল্যের মধুর সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া এমন একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি নাই। শুনিয়াছি, নিতান্ত বালিকা-বয়সে মায়ের বিবাহ হইয়াছিল। ইহাও শুনিয়াছি, প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে একজন অপর জনকে ছাড়িয়া একটি দিনও যাপন করেন নাই,—আজ মায়ের মুখের চেহারায় যেন দেখিতে

পাইলাম—সেই অচ্ছেদ্য গ্রন্থির স্নায়ুতন্ত্রে কেমন একটা বিচ্ছেদ সম্ভাবনার চিড় খাইয়াছে। ইহা কি বস্তু, তাহা আমি জানি না; ইহার কি নাম তাহাও আমার অজ্ঞাত; কিন্তু ইহার অন্তরে অন্তরে যে একটি মহৎ সংস্কৃতি ও শিক্ষা আছে, তাহাই যেন এই দুর্য্যোগের ছায়ায় আচ্ছন্ন সমস্ত পরিবেশের ভিতর হইতে আমি আহরণ করিলাম।

বাবার প্রদীপটি ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিল। আমার সকল চিন্তা স্তব্ধ হইয়া, একটা দিকেই যেন ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই কথাটা এতদিন কল্পনা করি নাই যে, মা-বাবার দুইজনের একজন কখনও মরিতে পারেন; কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় যখন ডাক্তার আমার সহিত কথা না বলিয়া এবং ভিজিটের টাকা গ্রাহ্য না করিয়া সটান্ গিয়া মোটরে উঠিলেন ও ড্রাইভার গাড়ী চালাইয়া দিল, তখন আমি, পঁচিশ বছরের নাবালক ও নরাধম, আমার ভিতরটা যেন ধক্ করিয়া উঠিল। যে প্রাচীন বনস্পতির নিরাপদ্ ডালপালার ভিতরে নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধিয়া নানা জায়গায় খাবার ছোঁ মারিয়া খাইয়া এতকাল পরমানন্দে উড়িয়া বেড়াইতাম, মনে হইল, আজ বড় একটা কঠিন সমস্যার দিকে ঠেলিয়া দিয়া সেই বনস্পতি শিকড় উপড়াইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। আজ আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, আমাদের এই বাড়ীর দেয়াল ও কড়িকাঠ, উঠান ও প্রাচীর, টেব্‌ল ও আল্‌মারি,—সমস্তেরই চেহারা যেন এক আকস্মিক তুহিন-ঝটিকায় সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আমি এইবার বাবার কাছে গিয়া বসিলাম।

অচেতন অবস্থার ভিতরে তিনি কি যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, মুখ বুজিয়া নীরবে কোন্ মন্ত্র জপ করিলেন, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। মাত্র তেরোটি দিন রোগে ভুগিয়া তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, ডাক্তার তাঁহার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে চেঁচাইল, কাঁদিল, গোলমাল করিল এবং নেপথ্যে মহাকাল আসিয়া তাঁহার পাওনা আদায় করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, ধীরে ধীরে বাবার মৃত্যু হইল।

মৃত্যু আমি এমন করিয়া দেখি নাই। চিরদিন সম্ভোগবাসনার দিকে মুখ ফিরাইয়া জীবন যাপন করিয়াছি, স্বভাব-চটুলতার প্রশ্রয়ের ভিতরে বড় হইয়া উঠিয়াছি, বেদনা ও দুঃখ কি বস্তু, তাহা আমার নিকটে অজ্ঞাত, দুর্ভাগ্যের কারুণ্য কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না; কিন্তু আজ শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর রাত্রে যখন বাবার চিতা রচনা করিতে গিয়া ভিজা কাঠ জ্বালাইতে না পারিয়া ধোঁয়ায় চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, তখন আমি যেন সেই দু' একটা আগুনের শিখায় নিজের চেহারাটাই একবার দেখিতে পাইলাম। মৃণ্ময়ীর মা যেদিন মরিয়াছিলেন, সেদিনও শ্মশানে আনিয়া তাঁহাকে দাহ করিয়াছি; কিন্তু তাহার ভিতরে ছিল আমার মনের নির্লিপ্ততা, পরোপকারের একটা চাপা গর্ব্ব, প্রাণটা পড়িয়াছিল লোভের বস্তুর দিকে। কিন্তু আজ যেন কেমন একটা নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, আমি সমস্ত সংসারের মূল্য নূতন করিয়া কষিতে লাগিলাম। আমার যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়া গেল।

ইহার পরে যাহা কৃত্য, তাহা একে একে শেষ হইল। অশৌচ পার হইল, দান-সাগর শ্রাদ্ধ চুকিল, নিয়ম-ভঙ্গ, আম মুণ্ডিত-মস্তকের উপর একটি টুপি বসাইয়া পথে বাহির হইলাম। শোকের তীব্রতা কমিয়া গেল। কয়েক জন আত্মীয়স্বজনের সহিত মা বিধবার বেশে পুনরায় সংসারের রাশ ধরিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আমার দিকে তাঁহার মুখ ফিরাইলেন।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়াছি, মা আমার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, এ সব কি কাণ্ড রে?

মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, কি বল ত?

তিনি বলিলেন, সরোজিনীর সেই মেয়েটা তোকে আবার খুঁজতে এসেছিল কেন?

এসেছিল নাকি?—বলিয়া অনেকটা ঔদাসীন্যের সহিত আমি জামাটা খুলিতে লাগিলাম।

মা বলিলেন, কি দরকারে এসেছিল?

বলিলাম, তা ত' বলতে পারি নে। তবে বোধ হয় বাবা মারা গেছেন, তাই একটু সান্ত্বনা দিতে—

সান্ত্বনা দিতে এলো সে? দেশে আর লোক ছিল না? সে জানলো কেমন ক'রে?

এই কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই। আমি যে ইতিমধ্যে মৃণ্ময়ীর নিকট অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি, বাবার মৃত্যুর পরের দিনও তাহার নিকট একবেলা বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের টাকা পয়সা দিয়াছি, বাবার আরও পুরাতন পত্র তাহার নিকট পাইয়া পড়িয়াছি, ইহা আমি চাপিয়াই ছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার মনোবিকলন কাহারও নিকট প্রকাশ পাইতে দিই নাই। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে কেবল বলিলাম, তা' ত' বলতে পারি নে। তারপর কি বললে?

মা বলিলেন, আমি তাকে আগে চিনতে পারিনি। পরিচয় নিলুম, সে সব বললে। তোকে খুঁজতে এল কেন, তাই জানতে চাইলুম, বললে, এমনি। বলি, তোর ব্যাপার কি রে, রাজেন?

হাসিয়া বলিলাম, কেন বলো ত?

মায়ের মুখ গম্ভীর, কঠিন। বলিলেন, তুই কি তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিস?

বলিলাম, পাগল নাকি?

তুমি জান রাজেন, এসব আমি ভালবাসিনে?

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, তুমি অকারণে বড় বেশী কঠিন হচ্ছ, মা। সে কি তোমাদের কোন ক্ষতি করেছে?

মা বলিলেন, এ বাড়ীতে তার পা দেওয়াই ক্ষতিকর। তুমি যদি তার সঙ্গে ভাব আলাপ কর, সেই ক্ষতি আমার আরও বেশী।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। জবাব দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অত্যন্ত রূঢ় হইত। মা জানেন না যে, আমি একটা বারুদের স্তূপ হইয়া আছি। মা ইহাও হয়ত জানেন না যে, যাহারা দুর্ব্বল, আমি তাহাদের হইয়া লড়াই করিবার একটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি। আগে হইলে হয়ত মায়ের কথায় সতর্ক হইতে পারিতাম; কিন্তু পিতার চিতাগ্নির আভায় আমি যে নূতন করিয়া সমস্ত সংসারটার ভাল-মন্দ পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে আর আমার কাহাকেও ভয় করিবার কারণ নাই।

মুখে বলিলাম, আচ্ছা, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি তোমার কাজে যাও।

মা যাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, তুই যার ছেলে তারই আদেশ যে, ওদের ছায়া কেউ কোনদিন মাড়াতে পাবে না।

বলিলাম, বাবা এ আদেশ কবে দিয়েছেন, মা?

এ আদেশ তাঁর চিরকালের।

যদি সত্যি না হয়?

মা বলিলেন, যদি না জেনে থাক, তবে জেনে রাখো ওদের মতন অধার্ম্মিক মানুষ ভূভারতে নেই।

মুখে যাহা আসিয়াছিল তাহা বলিয়া ফেলিতে পারিতাম কিন্তু মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু দুর্ব্বলতার কথা মা যে একেবারেই জানিতেন না তাহা নহে, ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিতেন আমার এ দুর্ব্বলতা সাময়িক, যথাসময়ে এই নেশা কাটিয়া যাইবে। ইহা লইয়া তিনি এক আধবার সজাগ ও সতর্ক করিতেন, কিন্তু এমন করিয়া শাসন করেন নাই। সরোজিনীর সম্বন্ধে মায়ের মনে যে গভীর ক্ষত আছে, আজ মৃণ্ময়ীর আনাগোনায় সেই ক্ষত হইতেই রক্তক্ষরণ হইতেছে।

মা বলিলেন, চুপ ক'রে রইলি যে?

বলিলাম, কি বলবো বল?

ওকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে বারণ ক'রে দে, এ বাড়ীতে যেন না আসে।

আচ্ছা দেবো।—বলিয়া আমি এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলাম, তাদের ওপর তোমার রাগের কারণটা জানিনে অথচ অধার্ম্মিক ব'লে আমি তাদের অপমান ক'রে তাড়াবো, এই কথাটাই ত আমি বুঝিনে।

মা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, ওরা একদিন আমাদের সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় ছিল।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, ওই মা আর মেয়ে?

হাঁ।

ওদের চাল চুলো নেই, শক্তিসামর্থ্য নেই, মাথার ওপর কোনো সহায় নেই ওরা করবে আমাদের সর্ব্বনাশ?

—এই বলিয়া হাসিলাম। পুনরায় বলিলাম, এ যেন অনেকটা ভূতের ভয়, মা।

মা কাছে আসিলেন। কিন্তু উপলব্ধি করিলাম, আমার মাথায় হাত রাখিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ওরা সব পারে। ওই মেয়েকে কখনও বিশ্বাস করিস্ নে, ওর রক্তের মধ্যে আছে শয়তানী বুদ্ধি।

বলিলাম, কিন্তু তোমার মতন মনোভাব হয়ত বাবার ছিল না। যাক্‌গে ওদের আলোচনা। আচ্ছা, আমি ব'লে রাখলুম আর কোনদিন সে এ বাড়ীতে পা দেবে না।

তুইও যাবিনি বল্?

আচ্ছা।

মা চোখ মুছিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, যদি মায়ের মান বজায় রাখতে চাস্, তবে আর কোনদিন ওদের ছায়া মাড়াবি নে।

এমন একটা বেকার-বিকৃত জীবনকে লইয়া আমি কি করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি যে কাজের মানুষ নহি, ইহা আমি যেমন বুঝিয়াছি, অপরেও তেমনি বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু তবু জীবনটাকে লইয়া আপাততঃ কি করা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে একদিন পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাবার উইলের প্রবেট্ পাইতে আমার বিলম্ব হইবে না। কলিকাতায় যে পাঁচখানা বাড়ী আছে, তাহার চারখানা আমার, একখানা মায়ের নামে। কোম্পানীর কিছু কাগজ মায়ের, বাদ-বাকী সমস্তই আমার। চটকল ও সিমেণ্ট কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারগুলিই আমার। ব্যাঙ্কের টাকা হইতে মা মাত্র দশ হাজার পাইবেন, বাকি সবই আমার। খুচরা পাঁচ দশ হাজারের কথা আমি চিন্তা করি না; কারণ তাহা জঞ্জালের ন্যায় আমার পায়ের কাছে আসিয়া পৌছিবে জানি।

মনে করিলাম, কিছুকাল জুয়া খেলিয়া আনন্দলাভ করিব। কিন্তু ভাগ্য অপেক্ষা কৌশলের প্রশ্ন যে-খেলায় বড় বলিয়া আমি সন্দেহ করি, সেখানে আমি পারিয়া উঠিব না। আমি দুষ্ট ও দুরন্ত, কিন্তু তাহা চাতুরী অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পথ ধরিয়া চলে,—সুতরাং জুয়া খেলায় হারিতেই হইবে, জিতিতে পারিব না। আমার অভিন্নহৃদয় দুই চারি জন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, একটা সিনেমা কোম্পানী খুলিয়া ছবি তুলিলে সব দিকেই লাভবান্ হইব। সুন্দরী অভিনেত্রী সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে না এবং তাহাদের অনেক সময়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রাণের ভিতরটা পুনরায় খুশী হইয়া উঠিল। এই দিক্‌টার সহিত আগে হইতেই আমার কিছু কিছু পরিচয় আছে; আর কিছু নাই হোক, অভিনেত্রীসংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে পারিলে আমার ইহকাল ও পরকাল দুই রক্ষা হইবে। বন্ধুরা সতর্ক করিয়া দিলেন, খবরদার, বিবাহ করিতে পারিবে না কিন্তু, করিলে সব মাটি হইবে।

বলিলাম, তথাস্তু।

ঝুপ করিয়া একদিন কাজে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু কাজে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে একদল ভদ্রলোক একদিন দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, তাঁহারা আমার সাহায্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান।

পুলকিত হইয়া বলিলাম, খুব ভাল কথা, এ ত' দেশের কাজ। ইস্কুলটা কেমন হবে?

তাঁহারা বলিলেন, ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই পড়াশুনা করবে। সহশিক্ষার প্রসার।

বলিলাম, খুবই উপকার হবে, কারণ এতে বিবাহের যৌতুক প্রথাটা উঠে যাবে। স্বাধীন প্রণয়টা চালু হয়ে গেলে ছেলের বাপরা আর টাকা চাইতে ভরসা করবে না। সহশিক্ষার পরিণত ফল পণ-প্রথা-নিবারণ।

তাঁহারা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আজ্ঞে, এদিক্ থেকে কথাটা আমরা ভেবে দেখিনি, আমরা শিক্ষাপ্রসারের দিক্ থেকেই ভাবছিলুম।

বলিলাম, এটা হ'লে ওটা হবে। ধরুন, ঘটকালির টাকা লাগবে না, অলঙ্কারপত্র ইচ্ছামত, বিবাহের সামাজিক খরচ ক'মে গেল, ছেলেমেয়ের পছন্দ হবে

নির্বিঘ্ন,—প্রণয়ের ব্যাপারে মেয়ের বাপ হবে লাভবান্। বেশ, আপনারা তাই করুন, আমি রাজি।

কিন্তু শিক্ষার দিক্ থেকে—তাঁহারা বলিলেন।

হবে বৈ কি, ওটাও হবে। ধরুন, একটা উৎকৃষ্ট প্রজাপতি সমিতি গ'ড়ে তোলাও ত' দেশের একটা মস্ত বড় কাজ।

তাঁহারা কি যেন সন্দেহ করিয়া 'আবার একদিন আসবো' বলিয়া সেদিনকার মতো বিদায় লইলেন। কিছু-দূর গিয়া সহসা একজন পিছন ফিরিয়া লক্ষ্য করিলেন, আমি তখনও তাঁহাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছি। বলা বাহুল্য, আর তাঁহারা আসেন নাই।

যে পরিমাণ টাকা আমার আছে, তাহাতে আমাদের জীবন নিশ্চিন্তে চলিয়া যাইবে, সেই টাকাকে ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইবার প্রয়োজন আমার নাই; বরং তাহা হইতে যদি বা কিছু নষ্ট হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে পারিব। আর নষ্টই বা বলিব কাহাকে? মৃণ্ময়ীকে যেটুকু সাহায্য করিতে পারিয়াছি তাহা মায়ের বিচারে নষ্ট, কিন্তু আমার বিচারে হয়ত সার্থক। সুতরাং এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে জানাইব, নষ্ট হওয়া বলিয়া কোন পদার্থ জগতে নাই, কিছুই নষ্ট হয় না, সমস্ত বস্তুরই একটা চরম লক্ষ্য আছে।

এই যে আমি সেদিন একটি পাঠাগার-প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু টাকা ও বই খয়রাৎ করিলাম, এই যে সিনেমা কোম্পানী খুলিবার জন্য এই প্রতিযোগিতার বাজারে দুঃসাহসিকের ন্যায় অবতীর্ণ হইতেছি, ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল লাভবান্ হওয়া?

কিন্তু আমার ভাগ্যবিধাতা যে আমার পাশে থাকিয়াই নিরন্তর হাসিতেছিলেন, আমার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সিনেমা কোম্পানীর অফিস খুলিবার জন্য কলিকাতার হৃৎপিণ্ডে একটি বাড়ী ভাড়া করিলাম। টালিগঞ্জে অন্যের একটা ষ্টুডিও প্রয়োজনমত ভাড়া লইব, এবং এই বাড়ীটা হইবে আমাদের স্থানীয় কর্ম্মকেন্দ্র। অতএব অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাহিয়া আমি নিজের নামে দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। বলা বাহুল্য, যে সকল গুণপণা দাবী করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, তাহাতে পতিতাগণের পক্ষে আবেদন করা সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল রহস্যময়।

এমন একটা প্রতিষ্ঠানের আমিই চালক হইব, ভাবিতেই আমার রোমাঞ্চ-পুলক লাগিতেছিল। সন্ধ্যার সময়টাই প্রশস্ত, দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই সময়টাই দিয়াছিলাম। দুই তিন দিন কেহ আসিল না, চার দিনের দিন খবর পাইলাম, একজন মহিলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাহাকে বাহিরে বসানো হইয়াছে।

অভিনয়-জগতের মেয়েদের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন—রূপ। রূপশ্রী, স্বাস্থ্য, শরীরের ছন্দময় গঠন, কণ্ঠস্বর—এগুলি হইলে শিক্ষা ও কৃতিত্বের অভাব পূর্ণ করিয়া লওয়া যায়। রূপহীনা মেয়ে আমি আমার কোম্পানীতে নিয়োগ করিতে পারিব না, এই আমার সঙ্কল্প ছিল। সেই জন্য আমি আমার নব-নিযুক্ত কেরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, আগে আপনি বাইরে গিয়ে দেখে আসুন ত মেয়েটি দেখতে কেমন? সেই বুঝে তার সঙ্গে আলাপ করবো।

কেরাণী ছোকরা বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই পরে আসিয়া আমার সম্মুখে ঢোঁক গিলিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, কেমন দেখলেন?

সে কহিল, এমন কখনও দেখিনি।

এতই কুৎসিৎ?—বলিলাম।

কুৎসিৎ! আপনিও এমন কখনও, দেখেননি আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

দেখতে সুন্দর কি না, তাই আগে বলো।

সে কহিল, অতি আশ্চর্য্য রূপ, একেবারে দেবীস্বরূপ। আপনার প্রত্যেক বইয়ের প্রধান নায়িকা হবার যোগ্য।

আচ্ছা, ডেকে আন।

কেরাণীটি বাহির হইয়া যাইতেই আমি আমার মাথার চুলটা ঠিক করিয়া লইলাম; ভব্য হইয়া বসিয়া মুখের উপর একটি মিষ্ট হাসি টানিয়া আনিলাম এবং এমন করিয়াই দরকারী কাগজ-পত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলাম যে, বেশীক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া কিছুতেই সময় নষ্ট করিতে পারিব না।

বাহিরে হিল্-তোলা জুতার শব্দ পাইলাম, আনন্দে

শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই পর্দ্দা তুলিয়া যাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তাহার পর আমার মুখে আর কথা সরিল না।

মৃণ্ময়ী নিজেই একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল, এবং আমার কেরাণীকে কহিল, আপনি দয়া ক'রে এবার বাহিরে যান্।

ছোকরা আমাদের দুই জনের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

মৃণ্ময়ী হাসি-মুখে বলিল, কত মাইনে বলুন?

আমিও এবার হাসিলাম, বলিলাম, যোগ্যতা বিচার ক'রে তবে ত মাইনে।

ওঃ, আমি খুব ভাল অভিনয় করতে পারি, তা বুঝি জানেন না?

বলিলাম, জানি, দেখতেই ত' পাচ্ছি। সাজসজ্জার এত ঘটা, রুজ-পাউডারের এত চাকচিক্য,—আমার ওই কেরাণীটির একেবারে মাথা ঘুরে গেছে।

মৃণ্ময়ী বলিল, কি করব বলুন, এ না হ'লে ত' আপনার এখানে চাকরী হবে না।

বলিলাম, মৃণ্ময়ী, তুমি নাচতে গাইতে জান?

খুব জানি।

কত মাইনে চাও?

সে হাসিয়া কহিল, আপনার মতন স্বত্বাধিকারীর কাছে বিনা মাইনেয় চাকরী করব।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, তোমার উদ্দেশ্য দেখছি অতি মহৎ। শিল্পকলাপ্রসারের জন্য স্বার্থত্যাগ।

সে এইবার গলা নামাইয়া বলিল, মায়ের ওপর রাগ ক'রে এসব কি কাণ্ড করছেন বলুন ত?

কেন, এ ব্যবসা কি মন্দ?

আপনি কিচ্ছু জানেন না এই ব্যবসার। মাঝ থেকে কতকগুলো নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি। এ কাজ আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

সভয়ে বলিলাম, কি বলছ মৃণ্ময়ী, কতদূর আমি এগিয়েছি জান?

জানি। দু'চারজন লোককে কাজে নিযুক্ত করেছেন, যন্ত্রপাতির বন্দোবস্ত করছেন, বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন আর ফাঁদ পেতে আছেন ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের অসৎপথে নিয়ে যাবার জন্য।—এই বলিয়া মৃণ্ময়ী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিল।

বলিলাম, তুমি জান যে, ইতিমধ্যে এর জন্যে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি?

কত টাকা?

প্রায় দেড় হাজার।

আমি দিয়ে দেবো, এ কাজ আপনি বন্ধ করুন।

তুমি দেবে? বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

হ্যাঁ, আমি দেবো, এই বলিয়া সে তাহার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি আমার টেব্‌লের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

অবাক্ হইয়া বলিলাম কি আছে এর মধ্যে?

সে বলিল, যা আছে আপনি রেখে দিন্, আমার চাল-চুলো নেই, আমি ও সব রাখবো কোথায়?

তাহার ব্যাগ খুলিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। বলিলাম, এ কি, এত টাকা তুমি পেলে কোথায়?

সে কহিল, দেশবাসীর টাকা।

মানে?

মানে, আমার ভাইরা ছিনিয়ে এনেছে ব্যাঙ্ক থেকে।

কি ভাবে?

এমন কিছু নয়, প্রাণভয় দেখিয়ে।

ভয়ে সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিল। ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, এ টাকা আমি রাখবো দ্বীপান্তরে যাবার জন্যে?

মৃণ্ময়ী বলিল, না। আপনি কেবল এই নোংরা কাজ ত্যাগ করুন, নৈলে আমিই আপনাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবো।

বলিলাম, মৃণ্ময়ী, তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে? তোমাকে জানিয়েছিলুম আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না।

হাসিমুখে মৃণ্ময়ী বলিল, চিঠিতে মায়ের প্রতি অভিমান ফুটেছিল, আর যা অস্পষ্টভাবে ছিল সেটা আপনার ছেলে-মানুষী।

তার মানে ?

মৃণ্ময়ী নতমস্তকে বলিল, সে সব অতি বাজে কথা

ঠিক মনে নেই, কি বল ত ?

সে আবার হাসিল। বলিল, উচ্ছ্বাস আর স্তাবকতা।

মিছে কথা। আন সে চিঠি।

সে কহিল, মিছে কথা হ'লেই খুশী হবো। সে চিঠি আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি। নিন্, উঠুন, আর দেরী করবেন না, অনেক কাজ।

বলিলাম, আমি উঠবো কোথায়, এখানে আমার অনেক কাজ বাকী।

মৃণ্ময়ী বলিল, আমি রাগলে কিন্তু আপনার রক্ষে নেই। এখানকার সব কাজ আপনাকে বন্ধ করতে হবে। যার যা পাওনা আছে, চুকিয়ে দিন্,—চলুন, আমার সময় বড় কম।—এই বলিয়া সে পাশের ঘরে উঠিয়া গেল এবং এক মিনিটের মধ্যেই আমার কেরাণীকে ডাকিয়া আনিল।

বলিলাম, বিনয়বাবু, আমি একটু কাজে যাচ্ছি। মেয়েরা যদি আর কেউ আসেন, আপনি কাল আসতে ব'লে দেবেন।

মৃণ্ময়ী বলিল, বিনয়বাবু, ওঁর কোন কথার ঠিক নেই, আমি যা বলছি তাই শুনুন। সিনেমা কোম্পানী উনি করবেন না, যদি কেউ আসে ফিরিয়ে দেবেন—

বাধা দিয়া বলিলাম, আরে, কি বলছ তুমি—?

মৃণ্ময়ী আমার কথা শুনিল না। বলিতে লাগিল, আপনাদেরও কাল থেকে আস্‌বার দরকার নেই। তিন মাসের মাইনে প্রত্যেকে আপনারা পাবেন। কাল সকালে ওঁর বাড়ীতে গিয়ে সেই টাকা আনবেন।

বিনয় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পরে বলিল, তবে কি কিছুই হবে না ?

না।

আমি আবার বাধা দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মৃণ্ময়ী বলিল, বুঝলেন বিনয়বাবু, মার ওপর রাগ ক'রে উনি টাকা নষ্ট করতে বেরিয়েছেন, কিন্তু নষ্ট করব বললেই বা করতে দেওয়া হবে কেন ?—আচ্ছা, এবার আপনি যান্। কাল এসে টেব্‌ল চেয়ার আলমারি আর আসবাবপত্রগুলি ফেরৎ দিয়ে আসবেন।

বিনয় মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

বলিলাম, করলে কি, মৃণ্ময়ী ?

মৃণ্ময়ী বলিল, অসৎ পথ থেকে আপনাকে সরিয়ে আনা হল।

রাগ করিয়া বলিলাম, ডাকাতি ক'রে টাকা ছিনিয়ে আনা আর ধর্ম্মের ষাঁড়গুলোকে বসিয়ে খাওয়ানো বুঝি সৎপথ ?

হাসিয়া সস্নেহে মৃণ্ময়ী বলিল, খুব বক্তৃতা হয়েছে, এখন চলুন।

কোথা যাবো ?

চলুন বেড়িয়ে আসা যাক্ একটু।

তুমি এই সাজসজ্জা ক'রে যাবে আমার সঙ্গে, লোকে বলবে কি ?

সে আমি বুঝবো, আসুন।— —ক্রমশঃ

গান

শ্রীনমিতা মজুমদার

অনন্ত তব বিশ্বে এ কী অনন্ত রঙ্গ
এ কী বিচিত্র ভঙ্গী বিচিত্র তব অঙ্গ ॥

বিচিত্র তব নৃত্যে বিচিত্রতর লাস্য
অনন্ত তব আননে এ কী অদ্ভুত হাস্য
কতো নির্ঝর-কল্লোল, কতো সাগর-তরঙ্গ ॥

হে অসীম তব লীলাতে কতো অসংখ্য মেলা
কতো নব নব ভাবনা হাসি কান্নার খেলা

তব মন্দির দুয়ারে অনন্ত তব যাত্রী
অসংখ্য পথ মাঝারে পার হয় ঘোর রাত্রি
হে বিরাট্ তব খুশীতে নিয়েছো তাদের সঙ্গ ॥

ব্যবহারিক ব্রহ্মবিদ্যা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভোগের বিলাস ও ইন্দ্রিয়ের আয়োজন ঐহিক কর্ম্ম-চেষ্টাকে রঞ্জিত করে। কিন্তু তা বলে যোগেরও কি বিলাস নেই? অধ্যাত্মচর্চ্চার উচ্চ সোপানে ভগবচ্চিন্তা ও অর্চ্চনার বিলাস কি নেই? অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিলাসিতাকে কি একটা অলস আয়েস বলা যেতে পারে? সব কিছু বর্জ্জন করে' অরণ্যে গমন ও অহরহ চিন্তাজগতের সমুচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘায় বিচরণ কি জগৎ-ব্যাপারের শেষ কৃত্য?

ব্রহ্মকে উপলব্ধির চেষ্টা ব্রহ্মের পূজা ও ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ কি শুধু সন্ন্যাস ও বাণপ্রস্থের ব্যাপার? জগতের বহুমুখী কর্ম্মপ্রবাহের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার কি কোন যোগ নেই? এই প্রশ্ন এই যুগের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।

ঐতিহাসিক দিক্ হ'তে অধ্যাত্মতাত্ত্বিকগণ ভারতবর্ষে বারবার এই প্রশ্ন তুলেছেন। ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে কর্ম্ম ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় কি? ব্রহ্মজ্ঞান কি শুধু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারেই অবরুদ্ধ—জগতে কি তার আর কোন স্থান নেই?

এ ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যান একটি অভূতপূর্ব্ব অধ্যায় উন্মুক্ত করেছে। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করেন। বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হ'য়ে ঋষির অনুরোধে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ হোমধেনু সবলাকে আহ্বান করেন। তাঁহার আদেশে সবলা নিজ শরীর হ'তে নানা খাদ্য সৃষ্টি করে' রাজার বিপুল বাহিনীকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজনের ব্যবস্থা করে। বিশ্বামিত্র বিস্মিত হ'য়ে গেলেন, এবং বশিষ্ঠের নিকট ধন, বিত্ত, যে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে সবলাকে চাহেন। বশিষ্ঠ অস্বীকার করেন। তখন বিশ্বা-মিত্রের অগণিত সেনানী সবলাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী বশিষ্ঠ বহু অস্ত্রধারী বীরসমূহ সৃষ্টি করে' বিশ্বামিত্রের সমগ্র সৈন্যকে পরাজিত করেন।

> সমুদ্রইব নির্ব্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ
> উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাংগতঃ।
>
> —রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৫৫।৯

তরঙ্গহীন সমুদ্র, ভগ্নদন্ত সর্প ও রাহুগ্রস্ত দিবাকরের মত বিশ্বামিত্র এ অবস্থায় হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হন। ফলে তিনি দিব্যাস্ত্র লাভ করেন এবং বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়ে তপোবন দগ্ধ করতে সুরু করেন। বশিষ্ঠ তাঁর দণ্ড তুলে প্রবল বারিপাত সুরু করেন এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। কাজেই প্রাচীন আখ্যান হ'তে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষেত্র ঐহিক সমাজেও ছিল—বশিষ্ঠের ব্রহ্মজ্ঞান দুরন্ত নৃপতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে

একান্তভাবে ভারতের অদ্বৈততত্ত্বের খাতিরে যে মায়াবাদ সৃষ্টি হয়েছে, তা' বৌদ্ধ ধ্যান ও নির্ব্বাণবাদের সহিত তাল রক্ষা করেছে। উভয় চিন্তাই রূপ-রস-গন্ধের প্রতি বিমুখ। ব্রহ্মবিদ্যা ও তত্ত্বকে ব্যবহারিক জগৎ হ'তে স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসবাদ বোধিদ্রুমতলে জন্মগ্রহণ করে' অসংখ্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সৃষ্টি করে। সংসারের প্রতি এই বীত-স্পৃহ প্রেরণা অধ্যাত্মজগতের সহিত ভৌতিক জগতের একটা বিরোধ সৃষ্টি করে। বৌদ্ধবাদ এমনি করে' আত্মবাদই প্রত্যাখান করে। মজ্ঝিমা নিকায়ে আছে—'আত্মা' বলে কোন ব্যাপার নেই—ব্রহ্মবাদের দায়িত্ব হ'তেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম মুক্তিলাভ করেছে। ফলে একান্তভাবে জড়বাদ ও (logic) একটা বিস্ময়জনক ভাবধারা সৃষ্টি করেছে Psychology ও logicএর সাহায্যে জগৎকে পরিমাপের ভিতর একটা আড়ষ্ট অবস্থা আছে। ইউরোপের তত্ত্ব জড়বাদের খাতিরে Block Universe সৃষ্টি করে—ভারতীয় তত্ত্ব অতি নিপুণ, তীক্ষ্ণ ও শাণিত ন্যায়বিধির সাহায্যে কর্ত্তব্য ও জগৎ-বিধি সম্বন্ধে যে code তৈরী করে তা সমগ্র বৌদ্ধতত্ত্বকে বিশুষ্ক ও গতিহীন করে।

অবশ্য ব্যবহারিক দিক্ হ'তে ইহা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ভূমিস্পর্শ মুদ্রা দ্বারা বুদ্ধ পৃথিবীর (matter) সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং সন্ন্যাসবাদ সত্ত্বেও জগতের সেবাধর্ম্মকে অসামান্য মর্য্যাদা দান করেছেন। যে সংসার ত্যাগ করার উৎসাহবীজ

বপণ করা হয়, সে সংসারের আবার সেবা কেন? বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—বোধিসত্ত্ব সুমেধা বলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত একটী নরনারী জগতে অমুক্ত থাকবে, ততদিন তিনি পৃথিবীতে থাকবেন, তিনি নির্ব্বাণের মুক্তি কামনা করেন না।

এই বৈপরীত্য পরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত করে। মহাযানবাদ অগণ্য দেববাদের সঙ্গে দেবীবাদেরও সূত্রপাত করে। ভোগের প্রতীক-স্বরূপ যুগ্ম দেব-দেবী তত্ত্ব নিঃসঙ্গ বুদ্ধবাদকে 'বিপর্য্যস্ত করে' ভোগধর্ম্মের অপরিহার্য্য নায়িকা প্রজ্ঞাদেবীর সূচনা করে। এমনি করে' প্রত্যেক বুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সন্ন্যাসের আবেষ্টন হ'তে নির্ম্মুক্ত হয়ে শক্তি-কল্পনার সহিত যুক্ত হন।

অপর দিকে তান্ত্রিক হিন্দুসাধনা ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জড়বিদ্যার পার্থক্য দূর করতে চেষ্টা করে। ব্রহ্মবিদ্যাকে নিরালম্ব বায়বীয় লোক হ'তে ব্যবহারিক জগতের বহুমুখী ক্ষেত্রে আগত করা হয়। ভারতের লীলাবাদ দ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করে' রূপরসগন্ধের মর্য্যাদা স্বীকার করেছে। রূপ-রসগন্ধের সেবা যে রূপাতীত ও রসাতীত ব্রহ্মেরই সাধনা বৈষ্ণব সাধনা তা' বারবার পরিস্ফুট করেছে। ফলে ভারতীয় বিদ্যাক্ষেত্রে নব নব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

উপনিষদে আছে—গোবৎস যেমন মাতাকে অনুসরণ করে, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ঋষির বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। ঋষির আশীর্ব্বাদ ও শাপ এজন্যই অধ্যাত্মস্তর বর্জ্জন করে' ক্রমশঃ স্থূলস্তরে একটা অনিবার্য্য সত্যের ভিত্তি পত্তন করে। এমনি করে' ব্যবহারিক জগতে ঋষিবাক্য অন্যথা হয় না। দুর্ব্বাশার শাপে শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজা দুষ্মন্তের বিস্মৃতি এই রকমের ঘটনা।

ফলে যোগ ও ভোগের ক্ষেত্রে ঐক্য সাধিত হ'য়েছে। ব্যবহারিক ব্রহ্মবিদ্যা ভোগের জগতে অসীমা প্রেরণা জাগ্রত ক'রে ভোগকেই যোগে পরিণত করে, এবং যোগও এইরূপে ভোগের রহস্যালোককে উদ্‌ঘাটিত ক'রে বিস্ময় উৎপন্ন করে।

কাজেই ইহজগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব নয়—ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা বা ধ্যানের সহিত জগতের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ নেই—এই রকমের একটা প্রতীতি অমূলক। জগতের আলো ও ছায়াবর্জ্জিত সুখদুঃখ অসংখ্য অণুপরমাণু ব্রহ্মের গোচরের বাইরে নয়। কাজেই এর ভিতরকার সমস্যা-সমূহের সমাধানের প্রশ্ন তত্ত্ববাদের পক্ষে একান্তভাবে আলোচ্য বিষয়।

গীতার অনাসক্ত কর্ম্মবাদে একটা প্রচ্ছন্ন ভীরুতা আছে। আসক্তভাবে কাজ করলে দুঃখের সৃষ্টি হয়, কাজেই—

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"

এই পথে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ্ ও এরূপ উপদেশ একটা কৃত্রিম বুদ্ধিবাদের সৃষ্টি (Intellectual philosophy)। আসক্তির মূলে আছে cosmic আকর্ষণ। অণুতে অণুতে, গ্রহে গ্রহে সর্ব্বত্র এ আকর্ষণ একটা সত্য ব্যাপার। কাজেই জগৎ-ত্যাগের এ যোগের মহাযান পথকে অস্বীকার ক'রে ত্যাগের প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসবাদ বাড়িয়ে তোলার ভিতর আছে একটা অপূর্ণ তত্ত্ববোধ। ব্রহ্মবিদ্যাকে এজন্যই ব্যবহারিক দিক্ হ'তে বার বার প্রত্যাখ্যাত করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই সব মতবাদের সহিত তা' যেন খাপ খায় না। তান্ত্রিক বিধিতে এই দুর্ব্বলতা নেই। তান্ত্রিক ব্রহ্মসঙ্গম জগতের কোন ঘটনাকে অস্বীকার করে না বা পাশ কাটিয়ে যায় না।

বস্তুতঃ শক্তিকল্পনার মূলে আছে ভোগের স্বীকার—ব্যবহারিক ব্রহ্মবিদ্যার উদ্বোধন। তন্ত্রের মতে, ভোগেই শক্তির প্রবর্ত্তন হয়। ভোগে দ্বৈততত্ত্ব নিহিত—ভোক্তা ও ভোগ্য। ত্যাগী ও ত্যাগ অদ্বৈত তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হ'য়ে থাকে। সব কিছুর বর্জ্জনই তার লক্ষ্য। Subject ও object না হ'লে ক্রিয়া হয় না—গতি হয় না। প্রাণের প্রকাশ হয় না। কাজেই অদ্বৈত বা মায়াপ্রধান ব্রহ্মবাদ জগৎকে 'তুচ্ছ করতে অগ্রসর হয়।

আধুনিক জগৎ শক্তিবাদের উপাসক। শক্তিবাদ—আধার ও প্রেরক, এই দুইটি সত্যের উপর নিহিত। কোনটি উড়িয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। এই পরম সত্যটি শিবতন্ত্র পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছে। নিঃসঙ্গ, তপস্বী শিব উপাস্য নয়—

"শিবশক্ত্যাত্মকং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্
তয়োর্যোগময়ং মন্ত্রং তয়োর্যোগেন সংজপেৎ।"

নির্ব্বাণ-তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"আদৌ রাধা ততঃ কৃষ্ণ; জপন্তি যে চ মানবাঃ
তেষাঞ্চ সম্পত্তিঞ্চাত্র দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ।"

কাজেই ব্রহ্মবিদ্যা সংসারের অতীত ব্যাপারের পোষক নয়। সংসারের প্রতি কর্ম্মপ্রবাহে ব্রহ্মবিদ্যালব্ধ শক্তির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী ও সার্থক। মহাকাব্য, পুরাণ ও ইতিহাস এই সম্পর্ক বারবার দেখিয়েছে। ব্যবহারিক ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের চিন্তাজগতে ওতঃপ্রোতঃ। তপস্যা দ্বারা শক্তিলাভ করার দৃষ্টান্ত রাবণের ইতিবৃত্তেও দেখা যায়—যাতে ক'রে সমস্ত দেবতারা বন্দী হয়। বার বার পরাজয়ে অধ্যাত্মশক্তির আহ্বান ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহায়তা ভিক্ষা করা এ দেশে অস্বাভাবিক নয়। কাজেই চণ্ডীর নিকট—

"রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি"

ইত্যাদি ব্যবহারিক প্রার্থনা একান্তভাবে স্বাভাবিক ও শোভন। বস্তুতঃ ভগবৎপ্রেম যেরূপ অধ্যাত্মসাধনার এক শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, সেরূপ আধিব্যাধি-নিবৃত্তি, ভোগৈশ্বর্য্যের সুচারু বিকাশ শিল্পকলা, তত্ত্বদর্শন ও বিজ্ঞানের ভূয়সী পরাকাষ্ঠা অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম লক্ষ্য—ইহার কোনটাই হেয় নয়। নিষ্কাম ও সকাম, উভয় সাধনারই সমান স্থান আছে। এমন কি স্বয়ং ভগবান সংসারের সেবায় নিজকে সার্থক করে' তুলছেন—কোটি কোটি জীবনে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে। এইখানেই তাঁর সত্তার সার্থকতা। নচেৎ নীরব, নিশ্চল, নির্গুণ অবস্থায় মগ্ন থাকলে কাহারও ক্ষতি ছিল না।

বস্তুতঃ প্রকৃতির দানকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর করার কাজ হচ্ছে ব্রহ্মশক্তির। ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধন, প্রাণের সরসতা জাগান—এ সমস্ত ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে কেন সুসম্পন্ন হবে না?

বিদ্যুৎ-শক্তির সহায়তায় যেমন মানবসমাজের অনেক দুঃখ ঘুচেছে, তেমনি ব্যবহারিক ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে জগতের সর্ব্ব সমস্যা ও দুঃখের তিরোধান হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রয়োগের ক্ষেত্র অরণ্য, তপোবন বা তুরীয় জগৎ নয়। ইহলোকে মানবের সুখ-দুঃখের মধ্যে ব্যবহারিক ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজনীয়।

মরণ

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

তিলে তিলে আসে যে মরণ
তার তরে নহি উচাটন।

আমি চাই সহসা করাল অন্ধকারে
ঢাকি' চারিধারে
ঝঞ্ঝাময়ী ডানা দুটি করিয়া বিথার
পাখার ঝাপটে বার বার
তুলি' কম্প, তুলি' বিভীষিকা,
অক্ষিপুটে বিদ্যুতের জালি' রুদ্র শিখা,
ধরিয়া অখণ্ড বজ্র চঞ্চুপুটে তার
হতে পরপার
অজ্ঞাত অতিথি সম আসিবে মরণ।

আমি তারে করি' দরশন
চিনি' সে বিচিত্র মম বিহঙ্গবাহন
নির্ভীক অন্তরে
কুতূহল ভরে
পুলকিয়া নিশ্বাসে নিশ্বাসে
পৃষ্ঠে তার পাড়ি দিব
অনন্ত আকাশে
লোক লোকান্তরে ল'ব নব নব স্বাদ
ভুঞ্জিবারে মৃত্যুহীন আত্মার প্রসাদ।

"যদ্দিন কত্তা তদ্দিন মান"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক

অনেক বৎসর পূর্ব্বের কথা। হারাধন নস্করের ছেলে গৌরধন বজবজ স্কুল হইতে যখন এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন কেবল হারাধনদের গ্রামে নহে, সন্নিহিত পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কারণ, সে অঞ্চলে, তৎপূর্ব্বে কোন পোদের ছেলে ইংরাজী লেখাপড়ায় গৌরধনের মত কৃতকার্য্য হয় নাই।

হারাধন নস্করের বাড়ী চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার অধীন দেউড়িপোঁতা গ্রামে। গ্রামে প্রায় একশত ঘর পোদের বাস। পোদেরা তখন জানিত না যে, তাহারা পোদ নহে, 'পথরাজ ক্ষত্রিয়'। তাহারা আপনাদিগকে ডুলে, বাগ্দী প্রভৃতি হিন্দু সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরের লোকের সমান বলিয়াই মনে করিত। তবে সেকালে অধিকাংশ স্থলে ডুলে-বাগ্দী সমাজ যেমন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, পোদগণ সেরূপ ছিল না, অনেক পোদ পাঠশালায় শেষ শিক্ষা লাভ করিত, বাঙ্গলা বই পড়িতে পারিত, চিঠিপত্রও লিখিতে পারিত, তবে সেরূপ শিক্ষিত পোদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল।

দেউড়িপোঁতা গ্রামে, পোদ ব্যতীত অন্য কোন জাতির বাস ছিল না বলিলে সত্য গোপন করা হইবে। গ্রামে একঘর পোদের ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সেই ব্রাহ্মণের নাম রামহরি চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেউড়িপোঁতায় ও নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে পোদেদের পৌরোহিত্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কিছু জমিজমাও ছিল, উপরন্তু নিজ বাটীতে একটি পাঠশালা খুলিয়া গ্রাম্যবালকগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেন। পৌরোহিত্য করিতে হইলে, সংস্কৃতে জ্ঞান থাকা আবশ্যক; সে জ্ঞানও তাঁহার ছিল। তিনি অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতিতে সংস্কৃত মন্ত্রই আবৃত্তি করিতেন। ঐ সকল মন্ত্র তিনি কোন দশকর্ম্মক ব্রাহ্মণের নিকট বা কোন মুদ্রিত পুস্তক হইতে শিক্ষা করেন নাই, পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি হিসাবে পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালের ব্যবহারে প্রস্তর, এমন কি লৌহ পর্য্যন্ত ক্ষয় পাইয়া মসৃণ হয়, বহু যুক্তাক্ষর সংবলিত, উচ্চারণে শ্রুতিকটু সংস্কৃত মন্ত্রগুলাও যে বহু শতাব্দীব্যাপী জিহ্বার সংঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সহজ উচ্চারণে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে? চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা দুরুচ্চার্য্য, যুক্তাক্ষরশূন্য, এক অপূর্ব্ব ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। তা হউক, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইত না। মানবে সেই সকল শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, দেবতারা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেন, কারণ সেই সকল মন্ত্র দেবভাষায় রচিত।

এহেন রামহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পাঠশালাতে গৌরধনের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। গুরুমহাশয়ের বুদ্ধি যেরূপই হউক না কেন, গৌরধন ছিল প্রখর বুদ্ধিমান্, তদুপরি তাহার স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। সেইজন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় একাধিকবার হারাধনকে বলিয়াছিলেন, "হরা, এর পর ওকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিস্, দু' পাতা ইংরিজি যদি শিখতে পারে, তা'হলে তোর গৌর পাঁচজনের একজন হ'তে পারবে।"

সেই গৌরধন যখন দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন যে চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গণিত ও ইংরাজী ভাষাতে গৌরধনের পারদর্শিতা দেখিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আশা করিয়াছিলেন, গৌরধন প্রথম বিভাগে ত পাশ হইবেই, চাই কি দশ টাকা বৃত্তি পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই, কারণ গৌরধন ইংরাজী ও গণিতে যেরূপ

পারদর্শী ছিল, সংস্কৃত ভাষাতে সেরূপ ছিল না। গৌরধনের বিশ্বাস ছিল যে, যদি সে পরীক্ষায় ফেল হয়, তবে সে ঐ অনুস্বর-বিসর্গযুক্ত সংস্কৃত ভাষার জন্যই হইবে। আর যদি সংস্কৃতে পাশ হয়, তাহা হইলে প্রথম বিভাগের তালিকায় স্থান না পাইলেও, দ্বিতীয় বিভাগে নিশ্চিত স্থান পাইবে, তৃতীয় বিভাগে কিছুতেই পাশ করিবে না। তাহার সতীর্থ বন্ধুরাও একথা জানিত। কারণ, ইংরাজী সাহিত্যে ও গণিতে তাহার খুব দখল ছিল। বস্তুতঃ হইয়াছিলও তাহাই, গৌরধন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিল।

পাশ করিবার পর গৌরধন কি করিবে, তাহাই জটিল সমস্যারূপে দেখা দিল। গৌরধনের ইচ্ছা যে সে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও তাহাকে সেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরামর্শ বা ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা সকল ক্ষেত্রে সহজ নহে। কলেজে পড়িতে হইলে গৌরধনকে কলিকাতায় গিয়া কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইবে। কোন কলেজেই মাসিক বেতন ছয় টাকার ন্যূন নহে। তাহার পর কলেজের পাঠ্য পুস্তকের মূল্যও চল্লিশ টাকার উপর লাগিবে, একেবারে দুই কুড়ি টাকা এবং প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া বেতন হিসাবে দিবার সামর্থ্য হারাধনের নাই। তদুপরি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন—কলিকাতায় গৌরধন থাকিবে কোথায়? কলিকাতায় অনেক "মেস" আছে বটে, সেখানে মাসিক দশ বার টাকা ব্যয় করিলে খাইতে ও থাকিতে পারা যায়। কিন্তু পোদের ছেলে ত কোন মেসে আশ্রয় পাইবে না। মেস মাত্রেই "ভদ্দোর" লোকেদের জন্য, "ছোট" লোকের সেখানে স্থান নাই। এ অবস্থায় গৌরধন কলিকাতায় গিয়া কোথায় থাকিবে?

গৌরধন পোদের ছেলে হইলেও, দেখিতে সুশ্রী ছিল। সেকালের চাঁড়াল ও পোদেরা হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরভুক্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক এরূপ সুশ্রী ছিল যে, উচ্চ জাতির মধ্যে সেরূপ খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইত। গৌরধনও ওই দুই চারিজনের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। গোস্বামীর শিষ্য হারাধন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ পুত্রের নাম গৌরধন রাখিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বিধাতা গৌরধনকে গৌরাঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহার দেহের বর্ণ ছিল গৌর। উন্নত সরল নাসিকা এবং প্রখর বুদ্ধিব্যঞ্জক উজ্জল চক্ষু তাহাকে সত্যই সুদর্শন করিয়াছিল। পিতামাতার একমাত্র সন্তান, শৈশবকাল হইতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, মৎস্য ও হংসডিম্ব প্রভৃতি আহারের ফলে তাহার শরীর বলশালী ও মাংসল হইয়াছিল। তাহাকে দেখিলে কেহই সহসা তাহাকে পোদের ছেলে বলিয়া মনে করিতে পারিত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বা রূপলাবণ্য থাকিলেই "ভদ্দোর" লোকের মেসে সেকালে আশ্রয় পাওয়া যাইত না। সুতরাং কলিকাতার কলেজে উচ্চশিক্ষা-লাভের আশায় তাহাকে হতাশ হইতে হইল।

কিন্তু বিধাতা যাহার প্রতি প্রসন্ন, তাহার উন্নতির উপায় সদাই উন্মুক্ত। দেউড়িপোঁতা হইতে দুই ক্রোশ দূরে, গঙ্গার তীরে আখড়া নামক স্থানে গভর্ণমেন্টের পূর্ত্ত বিভাগের বিস্তীর্ণ ইটের কারখানা আছে। সেই আখড়ায় ইটখোলাতে একটা চাকরী খালি আছে, সংবাদ পাইয়া একদিন গৌর একখানা দরখাস্ত সহ আখড়ায় গিয়া কারখানার ম্যানেজার সাহেবের সহিত দেখা করিল। ম্যানেজার সাহেব বৃদ্ধ হইলেও, এককালে ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলার জন্য শ্বেতাঙ্গ-মহলে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি গৌরধনের বীরত্বব্যঞ্জক দেহ, উজ্জল চক্ষু ও হাতের লেখা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ, বাঙ্গালী সমাজের জাতিভেদ প্রথার কোন ধার ধারিতেন না, কর্ম্মপ্রার্থী যুবক ব্রাহ্মণ কি পোদ, তাহা জানা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না; তাহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর বলিলেন "বেশ, তুমি কাল হইতেই কার্য্যে লাগিয়া যাও। বেলা ১১টার সময়ে হাজির হইতে হইবে, সন্ধ্যা ৭টার সময়ে আফিস বন্ধ হয়। তুমি আপাততঃ মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইবে।"

গৌরধন সাহেবকে ধন্যবাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সে যে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে, একথা পিতামাতাকে বলিয়া আসে নাই। অপরাহ্নকালে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতামাতাকে যখন এই সুসংবাদ প্রদান করিল, তখন তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইল। তাহারা প্রথমে

বিশ্বাসই করিতে পারে নাই যে, তাহাদের সেই গৌর ওরফে "পুটে" আজ সাহেবের আফিসের "বাবু" হইয়াছে, তাহাকে মাঠে লাঙ্গল ঠেলিতে হইবে না, বেগুণ পটোলের বাজরা মাথায় করিয়া হাটে যাইতে হইবে না, ডোঙ্গা শাল্তি চালাইতে হইবে না, সাহেবের পাশে চৌকীতে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ করিতে হইবে! একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়?

কিন্তু পরদিন প্রাতে, বেলা নয়টার সময়ে, গৌরধন যখন আহার করিয়া, পিতামাতাকে এবং কুটীর মধ্যস্থ গৌর-নিত্যানন্দের পট এবং প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থিত তুলসী-মঞ্চকে প্রণামপূর্ব্বক সাল্তিতে আরোহণ করিল, তখন হারাধন ও তাহার স্ত্রী রাইমণির প্রত্যয় হইল যে, গৌরধনের সত্যসত্যই চাকরী হইয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে তাহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনেই পড়িল না। তাহাদের পরিচিত এবং অপরিচিত যত দেবদেবীর নাম তাহাদের জানা ছিল, সকলের নামেই তাহারা পাঁচ পয়সা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত "মানসিক" করিল। হাটতলার "মা বেম্মা" (ব্রহ্মা) হইতে তেঁতুল তলার "ওলাবিবি" ও শা জুম্মাপীর পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান কোন দেবতাকেই বঞ্চিত হইতে হইল না।

দুই

প্রবেশিকা পরীক্ষার চারি বৎসর পূর্ব্বে, চৌদ্দ বৎসর বয়সে দেউড়িপোঁতার দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কাঞ্চনবেড়া গ্রামে, দুখীরাম মণ্ডলের কন্যা খেঁদীর সহিত গৌরধনের বিবাহ হইয়াছিল। গৌর বার বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তাহার জন্য একটি সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু গৌরের মার জেদ ছিল যে, তাহার "রাঙ্গা ছেলের" জন্য একটি "রাঙ্গা বৌ" চাই। দেউড়িপোঁতাতে অনেকের বাটীতেই ছয় সাত বৎসরের বয়স্কা বিবাহযোগ্যা কুমারী ছিল, কিন্তু গৌরের মার সেই সকল কন্যা পছন্দ হয় নাই, অগত্যা হারাধনকে গ্রামান্তরে সুন্দরী পাত্রীর জন্য অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর, হারাধন খেঁদীর সন্ধান পাইল। খেঁদীর বয়স তখন সাত বৎসর। অত বড় অনূঢ়া কন্যা বাড়ীতে ছিল বলিয়া তাহার পিতামাতা দুর্ভাবনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল। হারাধন যখন খেঁদীকে দেখিয়া পছন্দ করিল এবং তাহার একমাত্র পুত্র বঙ্গবজ ইস্কুলে ইন্‌জিরি পড়িতেছে বলিয়া পুত্রের গুণপনা প্রকাশ করিল, তখন দুখীরাম আর আপত্তি করিল না। দুখীরাম ও তাহার স্ত্রী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, আড়াই কুড়ি টাকা পণ না পাইলে তাহার খেঁদীর বিবাহ দিবে না; মেয়ে ত নয় যেন আরমানী বিবি। কিন্তু হারাধনের মুখে তাহার পুত্রের রূপগুণের পরিচয় পাইয়া সবশেষে দুই কুড়ি টাকার বিনিময়েই তাহাদের কন্যাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিল। হারাধনকে এই দুই কুড়ি টাকার উপর চারিগাছা রূপার মল্, ছয়গাছা রূপার চুড়ি, দুই কাণে দুইটি সোণার তারের মাকড়ি এবং নাকে একটি বিলাতী মুক্তাযুক্ত সোণার নোলকও দিতে হইয়াছিল। গৌরধনের যখন বিবাহ হয়, তখন তাহার সতীর্থ বন্ধুগণের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত সকলেই অবিবাহিত ছিল। বিবাহের পর যখন গৌরধনের বন্ধুরা তাহাকে তাহার বধূর নাম জিজ্ঞাসা করিল, তখন গৌর কৌশল করিয়া বধূর নামটা বদলাইয়া দিল। সে জানিত কাঞ্চন শব্দের অর্থ স্বর্ণ এবং কুমারী শব্দের অর্থ কন্যা। খেঁদী কাঞ্চনবেড়া গ্রামের কন্যা, সুতরাং তাহার নাম কাঞ্চনকুমারী বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না, এই ভাবিয়া সে 'অশ্বত্থমা হত ইতি—' হিসাবে বলিল তাহার বধূর নাম কাঞ্চনকুমারী। বিবাহের পর হইতে খেঁদী কাঞ্চনকুমারীতে পরিণত হইল। গৌরের ইচ্ছা ছিল যে, নিজের নামটাও পরিবর্ত্তিত করিয়া সতীশচন্দ্র কি সুধীরকুমার এইরূপ একটা ভদ্রোচিত নাম গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। কারণ তাহার অশিক্ষিত পিতা বঙ্গবজ স্কুলে পুত্রকে ভর্ত্তি করিবার সময়ে গৌরধন নামই লিখাইয়াছিল, সেইজন্য একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৌরকে পিতৃদত্ত নামটাই চিরজীবন ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুর থানার বহু গ্রাম জলার মধ্যে অবস্থিত, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে হইলে জলপথে

ডোঙ্গা বা সাল্‌তিতে করিয়া যাইতে হয়। এমন অনেক গ্রাম আছে, যে গ্রামে এক বাটী হইতে অপর বাটী যাইতে হইলেও ডোঙ্গা করিয়া যাইতে হয়। সেই জন্য সেই সকল গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থেরই ডোঙ্গা বা সাল্‌তি আছে। হারাধনদেরও দুইখানা সাল্‌তি ছিল। একখানা সে নিজে ব্যবহার করিত, দ্বিতীয়খানা পুত্রের স্কুলে যাইবার জন্য কিনিয়াছিল। গৌরধন তাহার সেই সাল্‌তি লইয়া আকড়ায় তাহার কর্ম্মস্থানে যাতায়াত করিতে লাগিল।

গৌরধনের বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম, এবং কর্ত্তব্যসাধনে একান্ত অনুরাগ দেখিয়া সাহেব তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। সাহেব মধ্যে মধ্যে ইটখোলা পরিদর্শনে যাইতেন; সেই সময়ে তিনি দ্বিভাষীর কার্য্য করিবার জন্য গৌরধনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহার ফলে গৌরধন অফিসের কার্য্য এবং ইটখোলার কার্য্য, উভয় প্রকার কার্য্যেই সম্যক্ আয়ত্ত করিল। তাহার আর একটা লাভ হইল, সর্ব্বদা সাহেবের কাছে থাকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ফলে সে বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল নির্ভুল ইংরাজী বলিবার ক্ষমতা লাভ করিল। এইরূপ সকল দিক্ দিয়াই সে সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিল। দুই বৎসর কার্য্য করিবার পর গৌরের বেতন ত্রিশ টাকা হইতে একেবারে পঞ্চাশ টাকা হইল। যতদিন সে ত্রিশ টাকা করিয়া বেতন পাইত, ততদিন সে বেতনের সমস্ত টাকাই পিতাকে দিত। হারাধন পুত্রের বেতনের টাকায় ভূমি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। যখন গৌরের বেতন পঞ্চাশ টাকা হইল, তখন সে তাহার পিতামাতাকে বেতন বৃদ্ধির কথা বলিল বটে; কিন্তু পিতাকে পূর্ব্বের মত ত্রিশ টাকা দিয়া বলিল যে, সে প্রতিমাসে কুড়ি টাকা করিয়া ডাকঘরে জমা দিবে। বিদ্বান্ পুত্রের প্রস্তাব মূর্খ পিতা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিল, কোন আপত্তি করিল না। হারাধনের আবাদি জমী বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহার আয়ও বাড়িয়াছিল। পূর্ব্বে সে নিজেই লাঙ্গল দিয়া জমী আবাদ করিত, এখন সমস্ত "ভুই তুলিতে" না পারিয়া একজন কৃষক নিযুক্ত করিল। তিন চারি বৎসরের মধ্যে হারাধনই দেউড়িপোতা গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী হইয়া উঠিল।

আরও পাঁচ সাত বৎসর কাটিয়া গেল। হারাধন এখন আর স্বহস্তে হলচালনা করে না, একজনের স্থলে দুইজন কৃষক রাখিয়া স্বয়ং কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানে সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। গ্রামের সকলেই তাহাকে এখন সম্মান করে। আপদে বিপদে সকলেই তাহার কাছে ছুটিয়া আসে, প্রতিবেশীদের মধ্যে কলহ-বিবাদ হইলে সকলে তাহাকে মধ্যস্থ করিয়া তাহার মীমাংসা শিরোধার্য্য করে। জমিজমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আবাসেরও উন্নতি হইল, পূর্ব্বে তাহার একখানি মাত্র ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, এখন তাহার দুইখানি অপেক্ষাকৃত বড় ঘর হইয়াছে, তাহা ছাড়া রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, গোয়াল-ঘর প্রভৃতি হইয়াছে। তাহার বাটীর এক পার্শ্বে দুইটা বড় বড় কাঁঠাল গাছ ছিল, এখন সেই গাছ দুইটা তাহার খামার বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, অন্দরমহল মৃৎপ্রাচীর-বেষ্টিত এবং সদরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপও হইয়াছে। কিছুদিন হইল গৌরধনের একটি পুত্র-সন্তানও হইয়াছে।

গৌর পূর্ব্বের মত মনোযোগসহকারে কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। সে দেখিল যে, ইটের ব্যবসায়ে ন্যূনপক্ষে শতকরা পঞ্চাশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি একশত টাকা ব্যয় করিয়া বার কি পনর হাজার ইট পোড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই ইট অনায়াসে দেড়শত টাকাতে বিক্রয় হয়। এই সকল দেখিয়া তাহারও ইটের ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা হইল। অনেক দিন ধরিয়া সে মনে মনে নানা প্রকার আলোচনা করিয়া স্থির করিল যে, সাহেবকে না জানাইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত হইবে না। সে সাহেবের কাছে কথাটা উত্থাপন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। একদিন সে সাহেবের সহিত ষ্টীম-লঞ্চ করিয়া ইটখোলায় যাইবার সময়ে পথে সাহেবকে বলিল "আমি এক বিষয়ে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।"

সাহেব বলিলেন "কি বলিতে চাও বল।"

"আমার ইচ্ছা, আমি ইটের কারবার করি, এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?"

"মতলব ভালই ; কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ লোকসান দুই আছে। লোকসানের ভয়ে হাত গুটাইয়া কাপুরুষের মত বসিয়া থাকিলে, কখনই উন্নতি হয় না। কিন্তু তুমি এখন চাকরী ছাড়িয়া ব্যবসায় করিতে গেলে তোমার সংসার চলিবে কি ?"

গৌর বলিল "আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে সংসার চলিয়া থাকে, সুতরাং চাকরী না থাকিলেও আমাদিগকে উপবাস করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে চাকরীই বা ছাড়িতে হইবে কেন ? আমি যেরূপ আপনার কাছে কাজ করিতেছি, সেইরূপ কাজ করিতে থাকিব। আপনি যদি পরামর্শ দেন, তবে আমি আগামী বৎসরে এক-লাখ ইট পোড়াইয়া দেখি, লাভ-লোকসান কিরূপ হয়।"

সাহেব বলিলেন "যদি আমার আফিসের কার্য্যে কোন অসুবিধা বা ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে আমি আন্তরিকতার সহিত তোমার প্রস্তাবের অনুমোদন করি। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।"

সাহেবের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া গৌরধন দুই লাখ ইট প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিল। ইটখোলার মিস্ত্রী ও মজুর তাহার বাধ্য ছিল, তাহাদের সাহায্যে গৌরের সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। যথাসময়ে ইট বিক্রয় করিয়া গৌর আশাতীত লাভ পাইল। পর বৎসর পাঁচ লাখ ইট পোড়াইবার ব্যবস্থা করিল। এইরূপে কয়েক বৎসর ইটের কারবার করিয়া গৌর প্রায় বার হাজার টাকা লাভ করিল। তখন সাহেব একদিন তাহাকে বলিলেন "তোমার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে দেখিতেছি, তাহাতে তোমাকে আমার আফিসে আটকাইয়া রাখিয়া তোমায় ক্ষতিগ্রস্ত করা অনুচিত। যে সময়টা তুমি আমার আফিসে থাক, সেই সময়টা যদি নিজের কাজে ব্যয় কর, তাহা হইলে তোমার বিশেষ উন্নতি হইবে। অবশ্য তোমাকে ছাড়িলে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে জানি, কিন্তু আমার সুবিধার জন্য তোমাকে আটক করিয়া রাখিলে আমার অন্যায় হইবে।"

গৌরও কর্ম্ম ত্যাগ করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। সাহেবের কথা শুনিয়া সে বলিল "আপনার হিতোপদেশের জন্য আপনায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমার পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ টাকা বেতনে, আপনি আমা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি পাইতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন "তোমা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত লোক পাইতে পারি ; কিন্তু তোমার মত সাধু, পরিশ্রমী এবং কর্ম্মদক্ষ পাইব বলিয়া আশা করি না। We don't want Shakespeares and Miltons here—we want honest, hard-working, intelligent and obedient Babus like you."

তিন

কলিকাতার দক্ষিণস্থ টালিগঞ্জে, বড় রাস্তার পার্শ্বে একখানি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা, ফটক পার হইয়া একটি সুন্দর ফুল বাগান, বাগানের এক পার্শ্বে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণীতে অনেকগুলা সাদা ও লাল পদ্ম ফুটিয়া আছে। ফটকের এক পার্শ্বে একখানা উজ্জ্বল পিত্তল ফলকে মোটা মোটা কাল অক্ষরে লেখা আছে :—

'G. Naskar & Co.
Government and Railway Contractors"

অন্য পার্শ্বে মর্ম্মর-ফলকে লেখা আছে "নস্করনিবাস"।

এই অট্টালিকার অধিকারী গৌরধন। ইটের কারবার আরম্ভ করিবার পর প্রায় পনর বৎসর অতীত হইয়াছে। আকড়ায় এবং অন্যান্য স্থানে তাহার বিস্তীর্ণ ইটখোলাতে প্রত্যহ তিন চারি শত লোক কার্য্য করিতেছে। কলিকাতায় অট্টালিকা বা সেতু-নির্ম্মাণকারী যত বড় বড় শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় কন্‌ট্রাক্টর আছেন, তাঁহাদের সকলের কাছেই গৌরধনের অসামান্য প্রতিপত্তি। তাহার সহিত বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য প্রত্যহ বহু ইঞ্জিনীয়ার ও কন্‌ট্রাক্টারের প্রতিনিধিকে গৌরধনের বাটীতে যাতায়াত করিতে হয়। "নস্কর-নিবাসের" নিম্ন-তলের তিনটা কক্ষ তাহার আফিস-ঘর। "G. Naskar & Co." লিখিত তক্‌মা-আঁটা, উর্দ্দী-পরিহিত একজন দ্বারবান্ বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসের প্রবেশ পথে বসিয়া থাকে। গৌরধন প্রত্যহ বেলা এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কোট-প্যাণ্ট প্রভৃতি

পাশ্চাত্য সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আফিষে বসিয়া কাজকর্ম্ম করে। বেলা দুইটার সময়ে যখন সে জলযোগ করিবার জন্য উপরে যায়, সেই সময়ে আফিষের কর্ম্মচারীদিগেরও জলযোগ ও ধূমপানের জন্য আধ ঘণ্টার অবকাশ হয়। জলযোগের জন্য পদমর্য্যাদা বা বেতন নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে দুই আনা করিয়া আফিস হইতে দেওয়া হয়।

গৌরধনের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথমে নিজ গ্রামে আবাস-বাটী পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম বৎসরে অন্দর-মহলে চারিটি সুবৃহৎ শয়ন-কক্ষ, পর বৎসর সদরবাটীতে ঠাকুরদালান, তাহার পর বৎসর বৈঠকখানা, এইরূপে হারাধনের তৃণাচ্ছাদিত কুটীর চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে দ্বিমহল দ্বিতল অট্টালিকায় পরিণত হইল। কলিকাতা হইতে ঝাড়, লণ্ঠন, খাট, পালঙ্ক, কৌচ, টেবিল, তাকিয়া, তোষক, জাজিম প্রভৃতি গৃহসজ্জা আনিয়া গৌরধন নিজের বাটী সুসজ্জিত করিল। হারাধন নস্কর এখন প্রায় হাজার বিঘা ধান জমীর অধিকারী, গ্রামের মধ্যে বা গ্রামসংলগ্ন কাহারও বাগান, পুষ্করিণী, ধান-জমী প্রভৃতি বিক্রয় হইলেই হারাধন তাহা কিনিয়া লইত। এইরূপে আট দশ বৎসরের মধ্যে গ্রামের জমিদার হইয়া উঠিল। হারাধন এখন আর হাঁটুর উপরে কাপড় পরিয়া শুধু পায়ে শুধু গায়ে বেড়ায় না। তাহার পায়ে ঠন্ঠনের চটী, পরিধানে রেলির উনপঞ্চাশ নং থান ধুতি, গায়ে লংক্লথের পিরান। গ্রামের সকলেই তাহাকে সম্মান করিয়া "কর্ত্তা" বলিয়া সম্বোধন করে। হারাধনের স্ত্রীরও অনুরূপ বেশ-পরিপাট্য হইয়াছে। তাহার হাতে সোণার মোটা বালা, অনন্ত, গলায় হার, কোমরে সোণার গোট। আর খেঁদী ওরফে কাঞ্চন-কুমারীর? তাহার বেশভূষার বর্ণনা না করিয়া পাঠকগণকে তাহা কল্পনা করিয়া লইতে অনুরোধ করি।

হারাধনের পুরোহিত রামহরি চক্রবর্ত্তী এখন আর হারাধনকে "হরা" বলিয়া বা "তুই" বলিয়া সম্বোধন করেন না, তিনি হারাধনকে হয় "হারাধন" না হয় "নস্করের পো" বলিয়া সম্বোধন করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হারাধন অধিকাংশ পোদের মত বৈষ্ণব মতাবলম্বী এবং গোস্বামীর শিষ্য ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় হারাধনের স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়া তাহাদের বাটীতে গৌর-নিতাই যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন। ঠাকুরদালানে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে প্রতি বৎসর, যথোচিত সমারোহ সহকারে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস এবং দোল উপলক্ষে গ্রামস্থ সকল গৃহস্থের বাটীতে "মালসা ভোগ" বিতরিত হইত। হারাধনও তাহার স্ত্রীকে এইরূপে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করাইবার ফলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও সাংসারিক উন্নতি হইয়াছিল। গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা এবং ব্রত-পার্ব্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে তাঁহার মাসিক দশ পনর টাকা আয়ের সংস্থান হইয়াছিল।

সাহেবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া গৌর কলিকাতায় গিয়া প্রথমে ভবানীপুরে একটা ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল। একটা হোটেলে সে দুই বেলা আহার করিত আর সমস্ত দিন কলিকাতায় কন্ট্রাক্টরদের আফিষে আফিষে ঘুরিয়া সাহেব সুবার সহিত আলাপ পরিচয় করিত। আবার প্রয়োজন হইলে, কলিকাতার বাসায় তালা চাবী দিয়া ইটখোলার কাজ দেখিবার জন্য বাটীতে আসিয়া দশ পনর দিন বাস করিত। এইরূপে তিন চারি বৎসর কাটাইয়া সে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া উড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন চাকর রাখিয়া পৃথক্ সংসার পাতিয়া বসিল। সেই সময়ে দেউরিপোঁতাতে তাহাদের ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতেছিল। দেশের বাটীনির্ম্মাণ শেষ হইলে, সে কালীদর্শন ও গঙ্গাস্নান করাইবার জন্য পিতা, মাতা ও পত্নীকে দিন পনরর জন্য কলিকাতার বাসাতে আনিয়া রাখিয়াছিল। হারাধন বা তাহার স্ত্রীর এই প্রথম কলিকাতা-দর্শন। তাহারা কলিকাতার শোভা, সমৃদ্ধি ও জনবাহুল্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা মনে করিল, বুঝি তাহাদের সেই চির-পরিচিত পুরাতন ভূলোক ছাড়িয়া কোন নূতন নক্ষত্রলোকে উপস্থিত হইয়াছে! গৌর তাহাদিগকে শিবপুরের বাগান দেখাইল, বাগবাজারের মদনমোহন দেখাইল এবং একদিন তদানীন্তন "ষ্টার থিয়েটার" দেখাইতে লইয়া গেল। তখন নব-প্রতিষ্ঠিত ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্য-লীলার" অভিনয় চলিতেছিল। অভিনয় দেখিয়া সরল-প্রাণ হারাধন ভাবে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইল।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হারাধন গ্রামবাসীদের নিকট সেই অভিনয়ের গল্প করিয়া আসর জমাইয়া তুলিল। সেই বর্ণনা শুনিবার পর, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুযোগ সমাগত বুঝিয়া হারাধনকে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্রণা দিল, সে মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল না। গৌর পিতার ইচ্ছানুসারে, কলিকাতায় নিম্ব-কাষ্ঠের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া দেশে পাঠাইয়া দিল।

এই সময়ে গৌর একদিন সংবাদ পাইল যে, টালিগঞ্জের বড় রাস্তার উপর একটা বাগান-বাড়ী বিক্রয় হইবে। উহার আয়তন প্রায় আট বিঘা হইবে। বাগানে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফলকর বৃক্ষ ও দুইটা পুষ্করিণী আছে। গৌর একদিন নিজে গিয়া ঐ সম্পত্তি দেখিয়া আসিল এবং উহা মনোনীত হওয়াতে সাতাশ হাজার টাকা মূল্যে সেই বাগানবাড়ী ক্রয় করিল। তাহার পর সেই বাটীর সংস্কার ও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেও পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় হইল। সংস্কার-কার্য্য শেষ হইলে, সে পুরাতন বাসা ত্যাগ করিয়া নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। নূতন বাটী "নশ্বর-নিবাসে" উঠিয়া আসিবার পর সে পিতামাতা ও স্ত্রীকে আর একবার কলিকাতায় লইয়া আসিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, তাহারা সকলেই কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করে। কিন্তু বৃদ্ধ হারাধন তাহাতে সম্মত হইল না। সে বলিল, পৈতৃক গ্রাম ত্যাগ করা উচিত নহে। সেখানে জমি-জমা, বাগান-পুকুর, চাষ বাস আছে, নিজে তাহার তদারক না করিলে সমস্ত নষ্ট হইবে, তাহার উপর বাটীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, এখন কি বাড়ী ছাড়িয়া সহরে আসিয়া থাকা যায়? অনেক বিবেচনা, আলোচনা এবং গবেষণার পর স্থির হইল যে দেউড়িপোতা ত্যাগ করা হইবে না; তবে কাঞ্চনকুমারী অধিকাংশ সময়ে টালিগঞ্জে থাকিবে, হারাধন ও তাহার স্ত্রী মাঝে মাঝে আসিয়া পনর দিন কি এক মাস টালিগঞ্জে কাটাইয়া যাইবে। হারাধনের এক দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী টালিগঞ্জের বাটীতে থাকিয়া গৃহিণীপণা করিবে। এই ব্যবস্থাই পাকা হইল।

এখন গৌরধন যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বড় ছেলে সনৎকুমার এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া পিতার সহকারীরূপে বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্যান্য ছেলেরা স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। স্কুলের অবকাশ সময়ের অধিকাংশ তাহারা গ্রামে পিতামহ পিতামহীর কাছে কাটাইয়া আসে।

চার

বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতার বহু ভদ্র সন্তানের সহিত গৌরধনের আলাপ পরিচয় ও বন্ধুতা হইয়াছিল। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, সেই সকল ভোজে গৌরধনেরও নিমন্ত্রণ হইত। কাহারও কন্যার বিবাহ, কাহারও পুত্রের উপনয়ন বা অন্নপ্রাশন এইরূপ একটা না একটা উপলক্ষে গৌরধনকে বন্ধুদের ভোজ-সভাতে যোগদান করিতে হইত। তাহারও ইচ্ছা হইত যে, তাহার বন্ধুবর্গকে মাঝে মাঝে ভোজ দেয়, কিন্তু নিজের সামাজিক অবস্থা চিন্তা করিয়া সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস পাইত না।

অবশেষে সে স্থির করিল যে, তাহার কলিকাতার বন্ধুরা ত সকলেই অবস্থাপন্ন লোক, তাঁহারা অন্যের বাটীতে ভোজ খাইয়া আসেন, অন্যকেও নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। কিন্তু তাহার স্বজাতীয় গ্রামবাসী আত্মীয় কুটুম্বগণের এইরূপ নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য ভক্ষণ ত দূরের কথা, দেখিবার পর্য্যন্ত সৌভাগ্য কখনও হয় না। যদি ভোজ দিতেই হয়, তবে গ্রামে গিয়া আত্মীয়কুটুম্বদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ একদিন ভোজ দিবে। ভোজ দিবার একটা সুযোগও উপস্থিত হইল। আশ্বিন মাসে তাহার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে গ্রামস্থ সকলকে একটা প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিল।

হারাধন সে সময়ে টালিগঞ্জে ছিল। গৌর পিতার নিকট এই কথা প্রকাশ করিলে, বৃদ্ধ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল। বৃদ্ধ তাঁহার পুত্রের কোন প্রস্তাবেই কখনও আপত্তি করিত না। তবে সে বলিল "এত লোক খাবে, এসব কর্ম্মে কম্মাবে কে?"

গৌর বলিল "সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি এখান থেকে সব যোগাড় করে' নিয়ে যাব। তুমি আগে গিয়ে মাছ ধরবার, কাঠ কাটবার বন্দোবস্ত করে' রেখ, আমি ঠিক সময়-মত সব নিয়ে যাব।"

সে বৎসর ১৮ই আশ্বিন হইতে ২০শে আশ্বিন দুর্গোৎসব ছিল। গৌরধন পঞ্জিকাতে দেখিল—২৭শে আশ্বিন রবিবার এবং ২৯শে আশ্বিন মঙ্গলবার অন্নপ্রাশনের দুইটা দিন আছে। সে ২৭শে আশ্বিন রবিবারটাই অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিল। হারাধন মহাষ্টমীর দিন কালীঘাটে গঙ্গাস্নান ও ৺কালী দর্শন করিয়া স্বগ্রামে চলিয়া গেল। গৌর পিতাকে বলিয়া দিল, অন্ততঃ দুই গাড়ী শুষ্ক কাষ্ঠ যেন সংগ্রহ করা হয়। হারাধন প্রস্থান করিলে, গৌর একজন কণ্ট্রাক্টারকে ডাকিয়া বলিল, ২৭শে আশ্বিন রবিবার তাহার বাটীতে তিন চারি শত লোক খাইবে, তাহার বাড়ীর পার্শ্বে যে পতিত জমি আছে, সেইখানে আটচালা বাঁধিতে হইবে। বাঁশ ও দড়ি লইয়া যাইতে হইবে না, গ্রামে যথেষ্ট বাঁশ আছে, দড়িও পাওয়া যাইবে, কেবল সামিয়ানা ও পর্দ্দা লইয়া গিয়া আটচালা বাঁধিতে হইবে। কণ্ট্রাক্টারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া গৌর তাহাকে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিল।

তাহার পর দ্রব্যাদি ক্রয় আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে ঘৃত, ময়দা, চিনি, আলু, পটল, কপি, মাটির কটোরা, গ্লাস প্রভৃতি বোঝাই লইয়া একখানা নৌকা ভোজের তিন চারি দিন পূর্ব্বে দেউড়িপোঁতার নিকটে গঙ্গায় উপস্থিত হইল, সেখান হইতে সালতি করিয়া ঐ সকল দ্রব্য হারাধনের বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার গৌর কলিকাতা হইতে পাঁচ ছয়জন হালুইকর ব্রাহ্মণ এবং বড়বাজারের নানা প্রকার উপাদেয় মিষ্টান্ন লইয়া বাটীতে গমন করিল। শনিবার অপরাহ্নে গৌরের একজন কর্ম্মচারী প্রায় দেড় মণ ছানা লইয়া দেউড়িপোঁতায় গমন করিল। গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য গৌর কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শনিবার প্রাতে গৌর স্বয়ং গ্রামবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। সে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া করযোড়ে যথোচিত বিনয়সহকারে, পরদিন মধ্যাহ্নকালে তাহার বাড়ীতে সপরিবারে পানভোজন করিবার কথা বলিয়া এক একখানি ছাপান পত্র রাখিয়া আসিল। গোলাপী রঙের খামের মধ্যে গোলাপী রঙের কার্ডে সোণার রঙে ছাপান নিমন্ত্রণপত্র দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কেতাব ত কালো কালিতেই ছাপা হয়, সোণা দিয়ে ছাপলে কেমন করে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অনেকের বাটীতেই গৌরধনকে সেই পত্র পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হইল। অনেকে সেই সুদৃশ্য নিমন্ত্রণপত্রকে অমূল্য সম্পদ্ বিবেচনা করিয়া সযত্নে চালের বাতায় বা হাঁড়ীর মধ্যে তুলিয়া রাখিল।

শনিবার অপরাহ্ন হইতে রবিবার মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত হালুইকরগণ নানা প্রকার মিষ্টান্ন এবং পোলাও, মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাই কারি ও কাটলেট, ফুলকপির চপ, আলুবোখরা ও খেজুরের চাট্‌নি এবং নানাবিধ আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। সে হারাধনকে বলিয়াছিল যে, সে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিবে, তাহার পিতা সে-কেলে লোক, একালের অভ্যর্থনার আদব-কায়দা কিছুই জানে না।

বেলা একটা হইতে নিমন্ত্রিতগণের সমাগম আরম্ভ হইল। যেমন দুইজন, চারিজন লোক আসিতে লাগিল, অমনই গৌরধন করযোড়ে "আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হউক, যান বৈঠকখানাতে বসিয়া বসিয়া তামাক খান" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানার সিঁড়ি দেখাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় শতাধিক লোকের অভ্যর্থনা হইবার পর গৌরের বড় ছেলে সনৎকুমার পিতাকে গিয়া বলিল "বাবা, কুটুম্ব মহাশয়েরা বৈঠকখানাতে না বসিয়া খামারবাড়ীতে কাঁটালতলায় জড়ো হয়ে কি সব বলাবলি করছে। তাদের কি একটা মতলব আছে, বোধ হয় আমাদের কিছু ত্রুটি হয়েছে।"

পুত্রের কথা শুনিয়া গৌরধন তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় গিয়া দেখিল—সেখানে একজনও লোক নাই, বৈঠকখানায় যে কেহ প্রবেশ করিয়াছিল বা বসিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সকালে যেরূপ জাজিম পাতা হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপই আছে। তখন গৌর ছুটিয়া খামারবাড়ীতে গিয়া দেখিল নিমন্ত্রিত লোকেদের প্রায় সকলেই কাঁটালতলায় সমবেত হইয়া অনুচ্চ স্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অনেকে খড়ের গাদা হইতে এক এক আটি খড় টানিয়া লইয়া তাহাতেই বসিয়া আছে। গৌর তাহাদের কাছে

গিয়া করযোড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল, তাহার অনুরোধে কেহই কর্ণপাত করিল না, কেহই বৈঠকখানায় গিয়া বসিল না। তখন গৌর নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধ পিতার নিকট গিয়া বলিল "বাবা, আমার কি ত্রুটি হয়েছে জানি না, কুটুম্ব মহাশয়েরা বৈঠকখানায় না বসে কাঁটালতলায় গিয়ে কি সব গোলযোগ পাকাচ্ছেন।"

পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল "চল্ দেখি, দেখিগে।" এই বলিয়া পুত্রের সঙ্গে খামার-বাড়ীতে গিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিল "হারে ও নিধে, ও কালো, ওরে গোব্রা, শালার ঘরের শালারা, তোদের মৎলবটা কি শুনি, জানিস্ আমার নাম হারাধন নস্কর, মনে কল্লে সব জুতিয়ে ছাল খেঁচে দেব, তা' যেন মনে থাকে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি বর্ষণ আরম্ভ করিবামাত্র নিধিরাম গোবর্দ্ধন মণ্ডলকে বলিল "গোব্রা, ঐ দেখ, কত্তা না হলে আমাদের খাতির করে কে? একালের ছোক্‌রা বাবুরা কি আমাদের মান বোঝে...না আমাদের কদর জানে?"

গোবর্দ্ধন নিধিরামের কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "যা বলেছিস্। যদ্দিন কত্তা তদ্দিন মান। কত্তা গেলে আমাদের এমন খাতির করবে কে?"

অভ্যর্থনার ব্যাপারে গৌরধনের যেরূপ ত্রুটি হইয়াছিল, আহারের ব্যবস্থাতেও সেইরূপ ত্রুটি হইয়াছিল। কারণ, আমরা শুনিয়াছি যে, আহারের পর গৌরের "কুটুম্ব মহাশয়েরা" বাটী ফিরিবার সময়ে পরস্পরের মধ্যে, আহার্য্যের ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। নসীরামের মতে গৌর কালুয়া পুলুয়া করিয়াছিল বটে কিন্তু পুলুয়ার সঙ্গে যদি প্যাঁজ দিয়া গুগ্‌লি চচ্চড়ি করিত, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইত। নিবারণের মতে, লুচির সঙ্গে অসোগোল্লা করেছিল, কিন্তু নারিকেল নাড়ু করে নাই; লুচির সঙ্গে নারিকেল নাড়ু যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। গুইরামের মতে, দ'য়ের সঙ্গে মুড়কি না হলে কি খেয়ে মজা হয়? আবড়ি বলে খুরিতে যেটা দিলে সেটায় কেমন গন্ধ! হারাণ মণ্ডলের মতে, কিচিমিচির অম্বলের চেয়ে কাঁচা তেঁতুল দিয়ে কুঁচো চিংড়ির অম্বল ঢের ভাল। কিচিমিচির সঙ্গে আলুবোখ্‌রো না দিয়ে যদি কুঁচো চিংড়ি দিত ... ইত্যাদি!

পুরাতন খাট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বয়স ত এ খাটের হইয়াছে ঢের
সঙ্গী মায়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহের।
এসেছে কটক থেকে,
কাঠে দেছে নাম লিখে,
সারবান আবলুস্ রঙটী খয়ের।

সার্ত্ত পুরুষের এ যে বিলাসের খাট,
বাস্তু দেবের যেন সোহাগ জমাট।
ইহাতে করেছি খোট্,
মেরেছি গায়েতে চোট,
এ বাড়ীর শিশুদের এ যে রাজপাট।

নামে হেথা বালক ও বালিকার দল,
পূর্ণ সে চন্দ্রের পরিমণ্ডল।
যুদ্ধ অনেক বার—
হয়ে গেছে বুকে তার,
শান্তি অশান্তির মিলনের স্থল।

নির্ম্মল মঞ্চ এ বংশলতার,
স্নিগ্ধ সূতিকা গৃহ রূপ ও কথার।
শত বাসরের স্মৃতি
এরে ঘিরে আছে নিতি,
উৎসব দেখা, নয় কম সখ তার।

এর বুকে সুখে দুখে কাটায়েছি রাত,
পদ্মনাভের আমি লভি সাক্ষাৎ।
দূর গত দয়া সব
করি বুকে অনুভব
মহাপুরুষের দানে করি প্রণিপাত।

কে যেন এখানে মোর কাণে কাণে কয়,
এ আসন চায় জেনো পুণ্য হৃদয়।
সম্ভ্রমে হই নত,
কৃপা মাগি অবিরত।
স্বর্গবাসীরা হাসি সব চেয়ে রয়।

"ও কালো মেঘ, সাঁঝের অতিথ্!
আভাসে কও একটি কথা;
এই অবেলায় ঘুমিয়ে গেলে
না বুঝি মোর গোপন ব্যথা।"

শিল্পী: শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবা-উপবন : কাশী

ফটো : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যবদ্বীপে হিন্দু-সংস্কৃতি

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে একদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল, একথা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর ভারতে"ও যে একদিন ভারতীয় সভ্যতার দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। যবদ্বীপের গভীর বন-জঙ্গলের অন্তরালে যে সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা এখন য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে সভ্য জগতের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা চিরকাল ধর্ম্মের দ্বারাই বিস্তার ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কোনকালেই ধর্ম্ম হিন্দু সভ্যতার প্রসার কার্য্যে পরিপন্থী হয় নাই। কি সমাজ, কি শিল্পকলা, কি স্থাপত্য সকল বিষয়েই হিন্দু সংস্কৃতি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া বৃহত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যবদ্বীপের ভগ্নপ্রায় শিবমন্দিরগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের বিস্তৃতি উপলব্ধি করিতে পারি। হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈবধর্ম্মই সুদূর প্রাচ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যবদ্বীপের শিবমন্দিরগুলি বিশ্লেষণ করিলে, আমরা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে প্রাম্বানাম হইতেই যবদ্বীপের শিবমন্দিরের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। প্রাম্বানাম ও নিকটস্থ অন্যান্য যাবতীয় মন্দির যবদ্বীপীয় ভাষায় "লরো জেঙ্গরাং" (Loro Djenggrang) নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রাম্বানাম মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলি যথেষ্টভাবেই হিন্দু আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্য বিজয়ঃ পিত্তল মূর্ত্তি

প্রাম্বানাম মন্দিরমণ্ডলী একটি বৃহৎ সমাবেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত পর্য্যায়ের প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দিরের তলদেশে ভস্মাদি ও দগ্ধাবশিষ্ট চিহ্ন

গভীর গহ্বরসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বিবরাদি যে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইত, এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। মধ্য-স্থানীয় মন্দিরগুলি যবদ্বীপের রাজপুত্রগণ, কুলপুরোহিত অথবা নিকটস্থ মঠাধ্যক্ষদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত চতুঃপার্শ্বস্থ অন্যান্য প্রায় ১৫৬টি মন্দির উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, রাজবংশের নগণ্য প্রতিনিধিগণ অথবা ক্ষুদ্র মঠধারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। ইহা যে একটি লুপ্তপ্রায় জাতির "ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার এবি"—স্বরূপ ছিল, একথা ভাবিলেও আনন্দ হয়। মন্দিরশ্রেণীর মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত পূর্ব্বাভিমুখী প্রাঙ্গণ অবস্থিত। প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া দুইটি মন্দিরশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। দুই সারি মন্দিরের মধ্যস্থ অনাবৃত স্থানটি দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির দ্বারা দুই পার্শ্বে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। সমগ্র আটটি মন্দিরের প্রথমটি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টি মহেশ্বর এবং তৃতীয়টি বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত।

এই মহান্ মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, যবদ্বীপের অধিবাসিগণের স্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যবদ্বীপের জাতীয় ইতিহাস মতে ইহা ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল, তৎপরে প্রচণ্ড ভূকম্পে উহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে Dr. Lons'এর বিবরণীতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও Mackenzie, Brumund ও Hoeferman প্রমুখ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত যোগজাকর্ত্তের পুরাতত্ত্ব সমিতির প্রথম প্রচেষ্টা ছিল এই মন্দিরটির সংস্কার করা, কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যাভার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই সকল মন্দিরের জীর্ণ সংস্কারের ভার গ্রহণ করেন। ওলন্দাজ পণ্ডিতদিগের প্রশংসনীয় ও শ্রমবহুল চেষ্টার ফলে এই বিশাল মন্দিরটি সমগ্র জগতের মনীষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাম্বানামের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য দেবতার মন্দির থাকিলেও, শিব-মন্দিরটিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য প্রাম্বানাম আজ লোকচক্ষে শিবমন্দির বলিয়া পরিগণিত। শিবমন্দিরটি সমগ্র মন্দিরশ্রেণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া আকার ও সৌষ্ঠবে অন্যান্য সকল মন্দিরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র শিবমন্দিরটিতেই চারিটি কক্ষ আছে। মধ্যস্থ কক্ষটিতে "মহাদেব শিবের" একটী বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি অবস্থিত। শিবের এই মূর্ত্তিটি কি গঠন সৌকুমার্য্যে, 'কি ভাস্কর্য্যে কোন অংশেই গুপ্ত শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অপেক্ষা

অর্দ্ধ নারীশ্বর: প্রস্তর মূর্ত্তি

নিকৃষ্ট নহে। শিবমূর্ত্তির চারি পার্শ্বের মূর্ত্তিগুলিতে তাঁহার গুণরাজি মূর্ত্তরূপে বিকাশলাভ করিয়াছে। বিষ্ণু, দুর্গা, শিবগুরু, গণেশ, ব্রহ্মা, নন্দী প্রভৃতির মূর্ত্তি যেন তাঁহার অনন্ত গুণরাজির এক একটী প্রতীক। শিবের প্রশান্ত আনন, ধ্যানস্তিমিত নেত্র ও কমনীয় ভাব আমাদিগকে

হিন্দু পুরাণোক্ত "মহাযোগী মহেশ্বর"কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি যে "সত্য, শিব এবং সুন্দর" তাহা আমরা সম্যক্ ধারণা করি।

শিব ও অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তিগুলিতে এক অপূর্ব্ব ধ্যান-সমাহিত ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিরূপ বিরাট্ (Bas-reliefs) "বরোবুদুরের" ভাস্কর্য্য অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। মন্দির-গাত্রের চতুর্দ্দিকে রামায়ণের ঘটনাবলী অতি সুষ্ঠুরূপে ও বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই সকল প্রস্তর-চিত্র যবদ্বীপের কারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে সম্মান লাভ করিতেছে। শ্রদ্ধেয় স্বামী সদানন্দ গিরি

শিব : পিত্তল মূর্ত্তি

চন্দ্র : প্রস্তর

কল্পনা ও কলাকুশলতার দ্বারা যে যবদ্বীপীয় শিল্পীগণ প্রস্তর-গাত্রে এই সকল ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

মন্দিরটি প্রাচীর গাত্রস্থ উৎকীর্ণ চিত্র দ্বারা আড়ম্বর সহকারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই সকল উৎকীর্ণ-চিত্র মহাশয় তাঁহার "বৃহত্তর ভারতের পূজা-পার্ব্বণ" শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন (পৃঃ ৫-৭):—"বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে আমরা শিবের যে রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু ভারতবর্ষে দেখিতে পাই না।......হিন্দু-ভারতের আদর্শ শিব মূর্ত্তিতে এমন এক

নির্ব্বিকার ভাব লক্ষিত হয়, যাহার তুলনা বৃহত্তর ভারতের শিবমূর্ত্তিতে আছে বলিয়া মনে হয় না।······যবদ্বীপে আগ্নেয়গিরির উৎপাতে যে ধ্বংসলীলার অভিনয় প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে হইয়াছিল, তাহাতেই যেন ধ্বংস-কর্ত্তার বিরাট্

তারাঃ পিত্তল মূর্ত্তি

রুদ্র ভাব প্রকট হইয়া এখানকার শিবমূর্ত্তিতে সেই ভাব আরোপিত করিয়াছিল। বৃহত্তর ভারতের মন্দিরে মন্দিরে যেমন হিন্দুর দেব-দেবীরা বিরাজ করিতেছেন, প্রসিদ্ধ মন্দিরসকলের গাত্রে সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলী হইতে বীরত্বের কাহিনীগুলি পাষাণের ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া সুদূর প্রাচ্যে হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর সংস্কৃতি জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেছে।"

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট্ (লণ্ডন) মহাশয় প্রাম্বানাম্ মন্দিরগাত্রস্থ শিলাচিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন (প্রবাসী, ১৩৩৫ সাল কার্ত্তিক সংখ্যা ২৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৩-৭৭):— "প্রাম্বানাম মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত চিত্রাবলীতে বিষ্ণু-মন্দিরের গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা বিষয়ক অথবা 'লোরো জোঙ্গরাং' শিবমন্দিরের রামায়ণী চিত্রসমূহে একটা মানবীয়তার আভাষ পাওয়া যায়। এই কারণে এইগুলি আমাদিগকে অধিকতর আনন্দ দান করে, মনে হয় যেন আজন্মপরিচিত রামায়ণ মহাকাব্যটি প্রস্তর-লিপিতে পাঠ করিতেছি। বাস্তবিক যবদ্বীপের রামায়ণী চিত্রাবলীতে একটা বিশিষ্ট ভাব আছে, যাহা হিন্দু পুরাণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যবদ্বীপের নিজস্ব আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী হিন্দু আদর্শ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা সৌন্দর্য্য ও কলা-শিল্পের দিক্ দিয়া কোথাও অঙ্গহানি হয় নাই, বরং শিল্পে জাতীয়তার আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ বিরাট্ প্রতিভাবলে ও আপ্রাণ শক্তির দ্বারা এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় মস্তক আপনা-আপনিই নত হইয়া পড়ে।

আয়ুর মূল্য

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

অখ্যাত এ ভূষণ্ডীর আয়ু
জনপ্রাণী নাহি জানে নাম,
প্রাণ শুধু 'নিঃশ্বাসের বায়ু
মৃত্তিকায় দেহ মাত্র দাম।

তা'র চেয়ে শেফালীর মত
স্বল্প প্রাণ অস্ফুট প্রভাতে
স্নেহধন্য দৈন্যে অবনত
মিশাইতে চাই মৃত্তিকাতে।

বিধবা রতিমঞ্জরী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

১০

মনোর আসার আর যাওয়ার পরদিনই রতি একখানা চিঠি পেল। চিঠিতে নাম ধাম, সন তারিখ, কুশল প্রশ্ন, শ্রীদুর্গা শরণং প্রভৃতি চিঠির আকারগত কিছুই নাই—আছে লেখক বা লেখিকার মনের কথা কয়েকটি:

"পোড়াকপালী, আপনখাগী, মরণ নেই তোমার? ছাব্বিশ বছরের ধাড়ী বিধবা হ'য়ে খবরের কাগজে ঢেঁরি দিয়ে সোয়ামী খুঁজ্‌ছিস্! ঘরে কেন আছিস্? বাজারে বেরো, সোয়ামী মিল্‌বে হাজার হাজার। দড়ি কলসী জোটে না তোমার?"

চিঠিখানা চোখের কাছে ধরে' রতি আগাগোড়া পড়ল' নিশ্চয়ই, কিন্তু পড়ে' সে আঘাত কিছু অনুভব করল না—তার কেবল মনে হ'ল, মনো যা' বলে' গেছে, আর, এই চিঠিতে যা' লেখা আছে, তা'-ই হ'চ্ছে তার সমসাময়িক স্ত্রীজাতির অভিমত। কিন্তু সমসাময়িক স্ত্রীজাতি 'দেখাচ্ছি মজা' বলে' যতই কাছে ঘেঁষে' আসুক, তার ইচ্ছাবিধায়িনী শক্তি তারা নয়। পৃথিবীকে দু' ভাগে বিভক্ত করে' নিয়ে মানুষ—স্ত্রী এবং পুরুষ—তার প্রাত্যহিক কর্ম্ম যেমন নির্ব্বাহ করছে, তেম্‌নি করছে অন্তরের আহুতি দান্। সেই দুই ভাগের এক ভাগে একটি মানুষ একক, আর এক ভাগে সে রেখে দেয় তা'কে যা'কে দিয়ে তার প্রয়োজন; প্রয়োজন মিটাবার জন্যে যারা আহূত হয়েছে তারা ছাড়া আর সবাই অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই তার কাজে যারা কথা বল্‌তে এসেছে তারা অবোধ সুবোধ, হিতকামী কি অহিতকামী যা'ই হোক, অনধিকার চর্চ্চা করতেই এসেছে—সুতরাং তারা মূল্যহীন, গ্রাহ্যের বাহিরে।

রতি যখন তার ঘরে বসে' অনধিকার-চর্চ্চারত মানুষকে গ্রাহ্যের বাহিরে নির্ব্বাসিত করছে, ঠিক্ তখনই কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের বিশ্বপতি চৌধুরী লেনস্থ ৭৭।১ক নং বাড়ীর বৈঠকখানায় কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের একটি বৈঠক চল্‌ছে—

রতির সেই বিবাহবিষয়ক বিজ্ঞাপনটি সেই ভদ্র-বৈঠকে আলোচিত হ'চ্ছে···

বাড়ীটা দোতালা, কিন্তু পুরাতন আর ছোট আর আধা-অন্ধকার। গলির ফাঁক পেয়ে আকাশ জানালা দিয়ে বৈঠকখানায় খানিক আলো প্রেরণ করেছে—সেই আলোকে আর একখানা চাদর-বিছান' তক্তপোষে আর দু'খানা চেয়ারে ওঁরা বসে' আছেন—মধ্যস্থলে বিস্তৃত রয়েছে বিজ্ঞাপন-সম্বলিত সেই কাগজখানা; ওঁদেরই একজন বিজ্ঞাপনটি লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন—কালোর ভিতর থেকে স্বতন্ত্র করে' তাকে গুরুত্ব দে'য়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়, হামেসাই সে-দিকে তাকা'তে হ'চ্ছে বলে' চট্ করেই যা'তে নজরে পড়ে সেই জন্যেই উজ্জ্বল করে' দাগটি দিয়েছেন।

দাগের দিকে তাকিয়ে সজনীবাবু বল্‌লেন, কিন্তু একটা কথা এই, আমি যেন এ-র ভেতর একটা বেহায়াপনা দেখ্‌ছি।

গৃহস্বামী মোহনবাবু বল্‌লেন, আমি বেহায়াপনা কিছু দেখছিনে।

—তুমি ত' দেখবেই না—গরজ যে বেজায়। বলে' সজনীবাবু হাস্‌লেন; কিন্তু তাঁর হাসিতে আর কেউ যোগ দিলেন না।

মোহনবাবু দুর্গত ব্যক্তি সন্দেহ নাই। তাঁর অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে। বছর দেড়েক হ'ল তিনি বিপত্নীক হয়েছেন। পত্নী সরস্বতী বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা আর ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে রেখে মারা গেছেন—সকলের ছোটটি বছর আড়াইয়ের। মাত্র চৌদ্দ বছরের শোভনার উপর শিশুগুলিকে প্রতিপালনের ভার পড়েছে; কিন্তু সে আর পেরে' উঠছে না—ভারি ক্লান্ত, বিব্রত আর ক্রুদ্ধ সে এখন—ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহ করে' সে ঘরে খিল দিচ্ছে।

মোহনবাবুর বয়স এখন চল্লিশ—চাকুরী করেন; বেতন সামান্য, খেয়ে পরে' কিছু বাঁচে না—সাংসারিক দুর্ভাবনায় তাঁর যেমন ক্ষুধার তেজ নষ্ট হয়েছে তেমনি কয়েকগাছা চুলও পেকেছে।···তাঁর চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় না যে, সংসারের কোনো ধাক্কা সাম্‌লাতে তিনি সক্ষম। রং কালো, শরীর দীর্ঘ, শরীরে মাংস কম—কালো জামা পছন্দ করেন।

মোহনবাবু এই অবস্থায় বিবাহ করতে চান্ আত্ম-রক্ষার্থে, গৃহ রক্ষার্থে, এবং সন্তান রক্ষার্থে। কুমারী কন্যার সন্ধান তিনি অবশ্যই পেয়েছেন; কিন্তু কুমারীকে ত্যাগ করে' কেন তিনি বিধবার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক?

এ ইচ্ছার কারণও অবশ্যই আছে।

মোহনবাবু বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই—সূচ্যগ্র বুদ্ধি তাঁর। রতির দে'য়া বিজ্ঞাপনটি বারম্বার পাঠ করে' তিনি তার ভিতর থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ আর তার ভিতরে অনেক লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন—অকথিত সমাচার আবিষ্কারে তিনি দক্ষ। এটা তিনি শিখেছেন অফিসের বড়বাবুর কাছে। সেই ভদ্রলোক অসুখের কারণে সামান্য একখানা ছুটির দরখাস্তের ভিতর থেকে এত বজ্জাতি, ধাপ্পাবাজি, কুমৎলব, চালাকি, আলস্য, ধৃষ্টতা° প্রভৃতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য এমন তৎপরতার সঙ্গে আবিষ্কার করে' থাকেন যে, সেই বিশ্লেষণের সময় যারা উপস্থিত থাকে তারা স্তম্ভিত না হ'য়ে পারে না। মোহনবাবু কৌশলটি যত্নপূর্ব্বক শিখে' নিয়েছেন···তা' কাজে লাগল' এখন।

বিধবাটি বিধবার পাণিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে স্বীয় নামে; কাজেই ভেবে' নে'য়া কঠিন নয় যে, তার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই—ছেলেমেয়ে ত নাই-ই—লেখাই আছে। কাজেই গুটিক্ ছেলেমেয়েসহ খৃষ্টানী দ্বিতীয়দারপরিগ্রহ, অর্থাৎ একটা হুল্লোড় কাণ্ড, এ হবে না।··বাড়ীঘর নিশ্চয়ই আছে—হাতে টাকা থাকাও বিশেষ সম্ভব; টাকা না থাকলে সৌখীনতা আসে না—শত্রু সৃষ্টির সাহস জন্মে না—মন গরম হ'য়ে বিবাহের অভিপ্রায় প্রচার করে' বসে না···অনাথিনী হ'য়ে তখন তার ঔদরিক সমস্যাই হয় সর্ব্বগ্রাসী। পেটের দায়ে বিধবা বিয়ে করতে চেয়েছে বলে' শুনা যায় নাই। বয়স ছাব্বিশ লিখেছে, কিছু বেশীও হ'তে পারে।···সন্তানাদি হ'য়েছিল, এখন নাই। এ একটা মস্ত সুবিধার কথা; সন্তান পালন করেছে, করতে জানে; শোভনাকে ছুটি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই খোকাদের ভার নিতে পারবে। শোভনা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

এই সব ভেবে' দেখে' মোহনবাবুর মনে হ'ল, একবার দর্শন করে' আসা যাক্—সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ নয়। গেলেই বাড়ী-ঘর আর টাকাকড়ির খবর পাওয়া যাবে।

তারপর প্রশ্ন হ'চ্ছে, বিধবা বিবাহ করলে জা'ত যাবে কি না—মেয়ের বিয়ের বিঘ্ন ঘট্‌বে কি না। মোহন-বাবুর মনে হ'ল, না, সে-ভয় নাই। হাওয়া বদ্‌লেছে। আজকার দিনেও যে সব আড়ষ্ট তন্দ্রাতুর মানুষ পুরাতন সমাজব্যবস্থা সনাতনী শক্তির সঙ্গে আঁকড়ে' ধরে' আছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার্‌লেই অনুকম্পা, পৃষ্ঠপোষণ, সাহায্য আর সাধুবাদ চতুর্দ্দিক থেকে আসবেই। সংবাদ-পত্রে তার দৃষ্টান্ত প্রচুর মেলে। বিধবা বিয়ে করায় সংস্কারের শিকল ছেঁড়ার দুঃসাহসিকতার দরুণই শোভনার সৎপাত্র জুটে যাবে।

তারপর রূপ—

মোহনবাবুর মনে হ'ল, হয়তো কালো, দাঁত উঁচু, নাক চ্যাপ্‌টা, গাল বসা, শুক্‌নো, ট্যারা, কাণে কম শোনে···

অর্থাৎ রতিমঞ্জরীকে তিনি একটি কুৎসিত বিধবা-রূপে কল্পনা করে' নিলেন—কেন নিলেন তা' তিনি জানেন না—সুন্দরী বলে' কল্পনা করতে তাঁর বোধ হয় সাহস হ'ল না; কারণ, বেশী আশা করতে, বেশী উৎফুল্ল হ'তে, আর বেশী ভালবাসা দেখা'তে নিষেধ আছে।

"শোন আমার কথা।" বলে' মোহনবাবু উপরি-কথিত বিশ্লেষণ বন্ধুগণকে শুনালেন, অবশ্য রূপ যা' কল্পনা করেছেন তা' বাদ দিয়ে।

সরোজবাবু বল্‌লেন, তোমার সুবিধে হবে—যা' বল্‌লে তা' সবই সম্ভব।···প্রধান বিঘ্ন মেয়ের বিয়ের ভাবনা। বিয়ে আট্‌কাবে না আমরা থাকতে।

সত্যেনবাবু বল্‌লেন, চেহারা কেমন কে জানে!

সরোজবাবু বল্‌লেন, ভাল হওয়াই সম্ভব। দর্শন দিতে যখন অগ্রসর, তখন সেদিকে মনে জোর আছে।

অখিলবাবু বল্‌লেন, মোহনের গেরস্তালী এবার গড়ে' উঠ্‌বে ভাল।

সত্যেনবাবু বল্‌লেন, কিন্তু আমার কতকগুলো কথা মনে হ'চ্ছে—মোহন যদি অভয় দেয় ত' বলি।

মোহন তা' দিলেন—তাঁর সঙ্গে আর সবাইও অভয় দিলেন–বল্‌লেন, বলো কি বল্‌বার আছে। নূতন পথে যাওয়া হচ্ছে যখন, তখন পথের কোনো স্থান অজানা থাকাই ভয়ের কথা—চারিদিক্ থেকে' ব্যাপারটাকে বুঝে' নিতে হবে।

সত্যেনবাবু অল্প একটু হাস্‌লেন, তারপর বল্‌লেন,—বিয়ে করতে যাচ্ছ বিধবাকে। একজনের সঙ্গে সে ঘর করেছে, উঠেছে, বসেছে, ব্যবহার করেছে—ছেলেপিলেও হয়েছিল; ভালবাসা নিশ্চয়ই জন্মেছিল। কিন্তু সে-ভালবাসা সে ভুলেছে, তা'তে সন্দেহ নাই। ভুলেছে সে কিসের ঝোঁকে তা' প্রকাশ্যে অনুমান করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায়; কারণ, তিনি ভদ্রমহিলা। খোঁটায় খোঁটায় পুরুষগুলোকে সংস্কারের গোঁজে বেঁধে রেখেছে মেয়েরাই। সংস্কারের প্রভাব যাদের ওপর এমন প্রবল হ'য়ে আছে, তাদেরই একজন স্বাধীন ইচ্ছায় যদি সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করতে চায় তবে তাকে আমরা বিস্তর তারিফ করতে পারি, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতে পারিনে। মোহন কি ভাববে জানিনে, কিন্তু সত্য কথা এই যে, সে-মেয়েকে আমরা অবিশ্বাসের চোখে না দেখে' পারিনে।

'তবে থাক্'। বলে মোহনবাবু হঠাৎ উঠ্‌তে গেলেন, যেন সত্যেনের ঐ কথাতেই ঐ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে।

কিন্তু সত্যেনবাবু বাধা দিলেন; বল্‌লেন, সব কথা বলা হয়নি। আরো যা' বলবার আছে আমি বল্‌ব। বলা উচিত বলেই বল্‌ব।

—বলো। বলে' মোহনলাল গা ছেড়ে' দিয়ে বস্‌লেন।

—তুমি ভুল বুঝো না। তোমার এই বিয়ের সম্পর্কে আমি কথাগুলো বল্‌ছিনে। আমাদের ভিতর বয়স্থা বিধবার বিয়ে হ'লে কি জটিলতার সৃষ্টি হ'তে পারে তা'ই যথাসাধ্য ভাব্‌ছি।…বিধবা পুনরায় স্বামী পেলে, কিন্তু স্বামীর মন থেকে' যদি এ-সন্দেহ না ঘোচে যে, মেয়েটি দ্বিতীয় পুরুষ যেমন চেয়েছে তেম্‌নি তৃতীয় পুরুষও চাইতে পারে, তখন উপায়!…মাপ করো আমাকে তোমরা; এমন ঘট্‌বেই তা' বল্‌ছিনে, কিন্তু ঘট্‌লে অস্বাভাবিক কিছু ঘট্‌ছে এ-কথা বল্‌ব না। মানুষের মন শান্তি চায়, কিন্তু খুঁজে অশান্তির কারণ বা'র করতেও সে পটু—কল্পনা করে' নিতেও গর্‌রাজি নয়।

মোহন বল্‌লেন, কিন্তু আমি চাই একটি বয়ঃস্থা স্ত্রী—ইনি তা'-ই। আর আর সুবিধের সম্ভাবনা আগেই বলেছি।

সরোজবাবু বল্‌লেন, এখনই ত' তুমি বিয়ে করে' আন্‌ছ না…পরস্পর সাক্ষাৎকারটা হ'য়ে যাক্—খোঁজ খবর নিয়ে এস। তারপর ভয় হয় করো না—ক্ষতির কারণ বুঝ্‌লেও করো না।…অনুমান তুমি যা' করেছ, বাড়ী আছে, টাকা আছে, তা' যদি সত্য হয়, ইত্যাদি এবং যদি জান্‌তে পারে চরিত্রও ভাল, আর স্বামী-গ্রহণের কারণটা যদি ভদ্রোচিত হয় তবে বিয়ে করবে। যাও, ঘুরে এস একবার।

পরামর্শ দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন—

মোহনবাবু সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লেন—শুভদিন দেখা হ'ল।

১১

মোহনবাবু সেজে'-গুজে' পাত্রী দেখ্‌তে রওনা হ'লেন—

তাঁদের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিবেচনা করা হয়েছে—তাঁদের পছন্দ হবে কি না, সমগ্রতঃ এটা কেমন শোভন হবে, তাঁদের ঘরে এই বিধবা এসে কিরূপ আচরণ করবে আর অনন্ত অশান্তির মূল হ'য়ে উঠ্‌বে কি না, ইত্যাদি, ধীরেসুস্থে ভেবে' দেখা হয়েছে—

মোহনলালের মনে হ'য়েছে, তাঁর অনুমান যথার্থ হ'লে আসান্ কিছু পাবেনই…

কিন্তু ও-পক্ষের ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকা সম্ভব, নিজের বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করেই সে পছন্দ অপছন্দ করতে পারে, প্রবৃত্তি ও শিক্ষা অনুযায়ী গ্রহণে ও পরিত্যাগে স্বীকৃতি অস্বীকৃতি খুবই প্রাধান্য সে দিতে চাইবে, ইহা তখন তাঁদের মনে হয় নাই।

কিন্তু মোহনলালের পরে তা' হয়েছে…

মোহনলাল চম্‌কেও উঠেছেন কয়েকবার—পূর্ব্বস্বামীর স্বামীত্বের প্রতিষ্ঠা আর সৌষ্ঠব তাঁকে দেখামাত্রই বিধবার স্মরণ হ'তে পারে…তুলনায় তিনি খর্ব্ব আর নিকৃষ্ট বিবেচিত হলেই আর হাত নাই। অগ্রগতি-প্রাপ্ত ধারণার আর নূতন আলোকে তীব্র দৃষ্টির মানুষ সে…

যা'-ই হোক্, দেখা যাক্।—ভেবে' মোহনবাবু বেরিয়ে পড়্‌লেন।

রতিমঞ্জরীর নাম গাড়োয়ানরাও জেনে' ফেলেছে। বিধবা হ'য়ে দ্বিতীয় স্বামীর সন্ধান করে' বিজ্ঞাপন দিয়েছে কে? না, রতিমঞ্জরী দাসী। তিনি কে? অক্ষয়বাবুর স্ত্রী, গোকুলেশ্বরের পুত্রবধূ।

সুতরাং মোহনবাবু খানিক থতমত খেয়ে থেকে' অপর কারো নামের অভাবে গাড়োয়ানকে রতিমঞ্জরীর নামটি বল্‌তেই সে বল্‌ল, বাড়ী চিনি। আসুন।…

গাড়ী এসে রতির বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াল'—খোয়ার উপর লোহার চাকার তুমুল শব্দ থাম্‌ল'। আল্‌পাকার কোট্ পরা, গলায় পাকান' চাদর আর মিহি ধুতি আর বুরুস্-করা জুতো পরা মোহনবাবু অবতরণ করলেন… মোহনবাবু গাড়ী থেকে নেমে' ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অন্য-দিকে তাকাতেই প্রথমে অবাক্ হয়ে গেলেন, রতিমঞ্জরীর বাসস্থানের পারিপাট্য দেখে'—রাস্তার একেবারেই ধার থেকে' বাহিরের উঠান সুরু হয়েছে—পরিষ্কার দূর্ব্বামণ্ডিত ভূমিটুকু…স্থানটার একটা স্নিগ্ধকর শ্যামরুচি তাঁর চোখে পড়ল—তারপর তাঁর চোখে পড়ল' সেই উঠানের ডানদিকে একটা একতালা ইষ্টকগৃহ—সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন আর নূতন প্যাটার্ণে প্রস্তুত।… মোহনবাবুর সকল ভাবনার উপর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাটা ভেসে' গেল যে, এই নির্জ্জন বৈঠক-খানায় বসে' বাড়ীর ভিতর চায়ের অর্ডার পাঠা'তে পারলেই তিনি আর-সব ইচ্ছা ত্যাগ করতে রাজি আছেন।…তারপর তিনি দেখ্‌লেন, সম্মুখেই দ্বিতল একটি শ্বেত অট্টালিকা—এ-দিক্‌টা তার পিছনের দিক্; খড়্‌খড়ি-ওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা—একটি বাদে সবগুলি জানালা বুজে' আছে—একতালার একটা খড়্‌খড়ি একটু-খানি তোলা…

মোহনবাবু টের পেলেন না যে, খড়্‌খড়ি একটু তুলে' ঘরের অন্ধকারের ভিতর থেকে রতিমঞ্জরী দাসী তাঁকে লক্ষ্য করছে…

তিনি আরো এগিয়ে গেলেন—

বৈঠকখানা গৃহের সংলগ্ন একটা দেয়াল গিয়ে মিশেছে বড় কোঠাটার সঙ্গে—ঐ দে'য়ালেই অন্তঃপুরে যাবার দরজা আছে, মোহনবাবু তা' অনুমান করলেন…

কিন্তু তিনি ডাকবেন কাকে? জনমানব কেউ নাই। …ঐ সুবৃহৎ ইষ্টকালয়ের অভ্যন্তরে, মোহনের দৃষ্টির অন্তরালে, কি আছে, কে আছে, কি ঘট্‌ছে, কি ঘট্‌তে পারে, তার কোনো আভাসই বাইরে নাই…মোহনবাবুর একটু ভয় হ'ল—ঢুকে' পড়ে' অপরাধী হ'লেন না কি! কিন্তু ওটা তাঁর ভ্রম ছাড়া কিছুই নয়—ভিড়ের ভিতর আর ভিড়ের কলরবের ভিতর তিনি চিরকাল বাস করছেন—ভিড় একটু পথ দিলে আর চীৎকার একটু কম্‌লেই তিনি সুখী হ'ন্—সে-ই তাঁর গার্হস্থ্য অভ্যাস। সেই অভ্যাসের ব্যতিক্রমে শান্তির নিঃশব্দতাকে তাঁর দুর্জ্ঞেয় রহস্য মনে হয়েছে… ভিতরে স্ত্রীলোক আছে বলে' তাঁর মনের রহস্যমূলক ভীতি আরো প্রশ্রয় পেয়েছে—আর, তাঁর স্বার্থ আছে বলে' তিনি আরো ঘাব্‌ড়ে' গেছেন।

আরো একটু দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লে তিনি কি করতেন বলা যায় না—চীৎকার বা পলায়ন এই দুটোর একটা তিনি করতেনই, কিন্তু তাঁকে তা' করতে হ'ল না, তখনই বেরিয়ে এল নন্দ। রতি তা'কে পাঠিয়ে দিয়েছে…

কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েই রতির মনে হ'ল, সে দাঁড়াতে পারছে না—চোখ জ্বালা করছে, আর বুকের ভিতরটা কেমন করছে।…খানিক্ অম্‌নিই দাঁড়িয়ে থেকে রতি বসল'—তার সম্মুখের পৃথিবী তখন ঘুরছে।

এতদিন রতি এক ফোঁটাও কাঁদে নাই, কিন্তু আজ কান্না পেল'…

তার অন্তরের যে নিরবচ্ছিন্ন আকুল আহ্বান তার রক্ত মথিত করে' ছুট্‌ছে, বীরভোগ্যা হবার, সুন্দরের সাথে মিলিত হবার, পবিত্র হবার প্রার্থনা, আর প্রেমের

বীজমন্ত্রের তেজে নূতন সৃষ্ট জগতে প্রবেশের জন্য এই ছাব্বিশ বছর বয়সে যে দুঃসহ দুঃখময় তপস্যা সে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে করছে, তাদের সকলের মিলিত আকর্ষণী-শক্তি মাত্র এইটুকু! কেবল একটা কীটকে টেনে বাইরে এনেছে!... এতদিন সে আশা করেছে, চিন্তা করেছে, ধ্যান করেছে—নিজের জন্য অপরূপ স্বর্গীয় জগতের কাঠামো গড়েছে; তারই ফলস্বরূপ তার ভাগ্যবিধাতা পাঠিয়েছেন এই ব্যক্তিকে তার সেই ভূস্বর্গ সুসম্পূর্ণ করবার শিল্পী করে', আর ভূস্বর্গের সহচর করে'! ... পরম আত্মার যে উপলব্ধ বস্তু, আর জীবনের যা' প্রকৃতি তাকে ফুটিয়ে তুলে' সার্থকতা দিতে এ-ব্যক্তি আসে নাই—এসেছে তাকে সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির যন্ত্র করে' নিতে।

শুন্‌তে অদ্ভুত, কিন্তু সত্যই যে, মোহনকে দেখেই রতি চিনেছে; বিদ্যুৎ ঝলকের মত তার চোখেই পড়্‌ল' যেন, আগন্তুক তাকে কষ্‌তে এসেছে, যাচাই করতে এসেছে, বুঝ্‌তে এসেছে, আর দেখ্‌তে এসেছে নে'য়ার মত কি না ... নিঃশঙ্ক প্রাণে পথ ব'য়ে এসে এক মুহূর্ত্তেই চিত্তজয় করে' আপনার করে' নিতে পারে দুর্দ্দম শক্তির যে উপলব্ধি তা'র সঙ্গে এ পরিচিত নয়—এ-ব্যক্তি ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, হীন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন স্বার্থান্বেষী।

কিন্তু পাপ ব্যতীত পাপকে আর কেউ টানে না। রতির মনে হ'ল, পাপেরই সে ফলভোগ করছে—পাপ তার সঙ্গে ঘুরছে। অপবিত্রতাকে সে সহ্য করেছে বহুদিন; নিজের সুখ আর পরিপূর্ণতাই সে সন্ধান আর কামনা করেছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করে নাই; সূক্ষ্মদেহী পাপাত্মা আত্মা তার আত্মায় বিচরণ করছে—মন্ত্রের সুযোগে একদিন সে প্রবেশ করেছিল—তার অনুভূতির অজ্ঞাত স্থানে সেই পাপ পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। নতুবা এমন ঘটবে কেন! সে নিজেকে পাবে না কেন! যা'কে সে চায় তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সে পরিত্যক্ত বঞ্চিত বুভুক্ষু থাকবে কেন!...

কঠিন নিষ্ঠুর ক্রোধ জন্মে' রতির মনে হ'ল, কাউকে সে ক্ষমা করবে না—নিজেকেও সে ক্ষমা করবে না।

— ক্রমশঃ

নিবেদন

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

যে-মালা গেঁথেছি পরম পুলকে ঢল ঢল জ্যোৎস্নায়
কম্প্র-আবেগে দুটি হাত দিয়া মুগ্ধ এ চেতনায়,
সে আমার প্রেমে সরসিত প্রিয়,
রাঙা অরুণের মত রমণীয়,
প্রথম-স্বপ্নভীরু হৃদয়ের আনিয়াছি উপহার,
মাতাল তখন বন-নিকুঞ্জে কুসুম-গন্ধ-ভার।

দুয়ারে তোমার এসেছি আজকে শুভ-মুহূর্ত্ত-ক্ষণে,
অনুভূতিময় প্রথম প্রেমের আনন্দ-শিহরণে;
তনু-বীণা মোর কাঁপে থর থর,
মিলনের লাগি পিপাসা-কাতর,
বিরহ-ব্যথায় আমার নয়নে বাদল এনেছি টানি'
কত না আশায়, পরাবো তোমায় সুন্দর মালাখানি।

মৃদু মৃদু হাসে চাঁদের আলোকে সারা বন-উপবন,
তুমি কেন হায় ম্লান নিশীথের টানিয়াছো আবরণ!
মোরে ভালবেসে নাহি যদি তব
হৃদয়ে ফুটে গো মঞ্জরী নব,
আমি ফিরে যাবো সান্ধ্য-আঁধারে ক্লান্ত কপোত সম,
শুধু এ মালিকা নিও তুমি তুলে',—এই নিবেদন মম।

গান ও স্বরলিপি

গান

সিন্ধু-কাফি—দাদ্‌রা

সংসারের এই খেলাঘরে
তোমার আসন পাতা
সকল আশায় ভালবাসায়
নামটি তোমার গাঁথা!
সকল রূপে, সকল শোভায়,
তোমার বীণা মনকে মাতায়,
নিত্য তব মন্দিরে এই
উঠ্‌চে জয়গাথা।

আপন জনের মিলন যেথায়
মিলন তোমার সনে
শিশুর মুখের হাসির মাঝে
হাস আপন মনে।
এম্‌নি করে প্রাণ দুলিয়ে
সকাল সাঁঝে মন ভুলিয়ে
সঙ্গে আছ প্রিয়তম
পায়ে নোয়াই মাথা।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি. এল, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—শীলা ও রীণা বসু

II {সা -া সা রা রা -জ্ঞা I মা মজ্ঞরা -রজ্ঞা রা সা -া I
স ং সা রের্ এ খে লা০০ ০ ঘ রে

সা /ণা -ণা | ধা পাঃ -ধঃ I মপা মজ্ঞা -া -রা -সা -ণা} I
তো মা র্ | আ স ন্ পা০ তা০ ০ ০ ০

পা র্সা -না র্সা নর্সা -র্রা I র্সা র্সণা -া ধা পা -মা I
স ক ল্ আ শা০ য়্ ভা ল ০ বা সা য়্

মা -ণা ণা ধা পাঃ -ধা I মপা মজ্ঞা -া -রা -সা -ণা II
না ম্ টি তো মা র্ গাঁ০ থা০ ০

১´ ০
[ণা ণা -মা -া]
II {পা পা -া | -া পা ধা I না র্সা -া | না র্সা -া I
স ক ০ | ল্ স্ব পে স ক ল্ | শো ভা য়্

ধা ণা -র্রা | র্রা র্রা -র্জ্ঞা I র্সর্রা -র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া } I
তো মা র্ | বী ণা ০ ম০ ০ন্ কে | মা তা য়্

পা -র্সা না | র্সা নর্সা -র্রা I র্সা -া ণা | ধা পা -মা I
নি ০ ত্য | ত ব০ ০ ম ন্ দি | রে এ ই

মা -ণা ণা | ধা পাঃ -ধঃ I মপা মজ্ঞা -া | -রা -সা -ণা II
উ ঠ্ ছে | জ য় ০ গা০ থা০ ০ | ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
[জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা -সা সা সা -পা পা পা -া]
II {গা গা -া | গা মগা -রসা I সা রগা -মা | গা মা -া I
আ প ন্ | জ নে০ ০র্ মি ল০ ন্ | যে থা য়্

[মা মা -রা]
জ্ঞা রা -া | রা রা -মা I জ্ঞমা -জ্ঞা -রা | সা -া -া I
মি ল ন্ | তো মা র্ স০ ০ ০ | নে ০ ০

পা পা -া | পা পা -া I ণা ণা -া | ধা পা -া I
শি শু র্ | মু খে র্ হা সি র্ | মা ঝে ০

ধা -পধা -পা | মা গরা -গমা I গা মা -া | -া -া -া} II
হা স০ ০ | আ প০ ০ন্ ম নে ০ | ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
[ণা -া ণা মা]
II {পা -া পা | -া পা ধা I না র্সা না | র্সা র্সা -া I
এ ম্ নি | ০ ক রে প্রা ণ্ ছু | লি য়ে ০

ধা ণা -র্রা | র্রা র্রা -র্জ্ঞা I র্সর্রা -র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া} I
স কা ল্ | সাঁ ঝে ০ ম০ ০ন্ ভু | লি য়ে ০

পা -র্সা না | র্সা নর্সা -র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -মা I
স ০ ঙ্গে | আ ছ০ ০ প্রি য় ০ | ত ম ০

ণা ণা -া | ধা পাঃ ধঃ I মপা মজ্ঞা -া | -রা -সা -ণা II II
পা য়ে ০ | নো য়া ই মা০ থা০ ০ | ০ ০ ০

খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ শতাব্দীর ভারত

শ্রীহরিদাস পালিত, বিদ্যাবিনোদ

যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, উত্তর ভারতে ২য় পরীক্ষিত পুত্র ২য় জনমেজয় তক্ষশিলার নাগরাজার সহিত সমরে লিপ্ত, যখন বৈশম্পায়ন ভাগিনেয় তিত্তিরি ও যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষকতায় নিযুক্ত, প্রায় সেই সময়ে ভারত-বহির্ভাগে হিতাইত ও মিতাননী নামক দুই জাতি যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত,—ক্যাপাডোসিয়ার মাঠে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। ভারতে তক্ষশিলায় নাগ-যুদ্ধ এবং ভারত বহির্ভাগে ক্যাপাডোশিয়ার ,মিতাননি ও হিতাইত যুদ্ধ হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ দুইজন—এক বৈদিক, দ্বিতীয় মহাভারতীয়। মতান্তরে পরীক্ষিতের (বৈদিক) পর এক হাজার বৎসরে জনমেজয় নাগ যুদ্ধ করেন। অবগত হওয়া যায়, নাগরাজ (তক্ষক?) পরীক্ষিতের শ্বশুর হইতেন। ১ম পরীক্ষিতের জনমেজয়, উগ্রসেন, ভীমসেন ও শ্রুতসেন নামে চার পুত্র ছিল—মৎস্য-পুরাণের শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন ও জনমেজয়। ২য় পরীক্ষিত খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতকে ছিলেন। গো-পথ ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও রামায়ণে এক জনমেজয়ের উপাখ্যান আছে। তিনি মহৎ রাজা ছিলেন। তৈত্তিরি আরণ্যক উপনিষদে বৈশম্পায়ন ও জনমেজয় এক সময়ের বলিয়া উক্তি আছে। (জনমেজয়ের পর সতানিক ও অশ্বমেধদত্ত এবং অবিসীম কৃষ্ণ রাজা হইয়াছিলেন। নিক্ষবস্থর সময়ে কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়)।

গত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হুগো ভিনকার* (হুগো উইনক্লার?) মেশোপটেমিয়ার বর্তমান বোঘাজকোই† (বোঘজ কিউই?) নামক স্থানে, ভূ-মধ্য হইতে লিপিমালা প্রাপ্ত হন। সেই লিপিমালায়, তথাকথিত হিতাইত ও মিতাননী রাজাদের যুদ্ধের কথা এবং উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন এই ঘটনার কাল খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দী। (কোন মতে ১৫০০ শতক)।

ভারতে তখন ২য় জনমেজয়ের রাজত্বকাল। তথাকালে কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ প্রকটলাভ করে। ইহার পূর্বে বা সমকালে ঐন্দ্র-ব্যাকরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের রচিত শুক্ল-যজুর্বেদখানির ভাষা কৃষ্ণ অপেক্ষা নিয়ম বদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য ঐন্দ্র-ব্যাকরণিক ছিলেন। [প্রশ্নোপনিষদের অশ্বলায়ন কোশলবাসী। শ্রাবস্তির অশ্বলায়ন (মজ্ঝিম নিকায়োক্ত) বুদ্ধের সময়ের]। তথাকালে ক্যাপাডোসিয়ার প্রসিদ্ধ দেবতাগণের নাম উৎকীর্ণ আছে। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্যদ্বয়ের (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) উল্লেখ আছে। যুদ্ধ অবসান হইল, সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রকম ব্যাপারটি প্রাচীন ভারতেও হইত।

নিবিদ্ মন্ত্র বিশেষে—মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের নাম আছে, এই মন্ত্রের কাল ভারতের বৈদিক আদ্য যুগের, সম্ভব খ্রীঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীর কিছু পূর্বের। সুতরাং ক্যাপাডোসিয়ারা তখন মিত্র, বরুণাদি দেবতার উপাসনা করিত। তাহারা ভারতীয় জাতি বিশেষ থাকাই সম্ভব।

এই বোঘাজ কোই লেখমালার দেবতাগণের নাম অবগত হইয়া, কোন কোন দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ভারতের নিবিদ্-মন্ত্র এবং অধিকাংশ ঋঙ্ মন্ত্র ভারত-বহির্ভাগে রচিত হইয়াছিল। স্থূল হিসাবে ভারতের যজ্ঞ প্রবর্তনের কালটি, এই বোঘাজ কোই লেখমালার প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বের (অধিক বই কম নয়)। নিবিদ্-বিশেষে দেখা যায় রথে চড়িয়া তখন রথীরা যুদ্ধ করিত। খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বে, রথ ব্যবহার, অ-ভারতের এরিয়নগণ করিত কি? রথে চড়িয়া পরিবারবর্গসহ ভারত-প্রবেশ তখন অসম্ভব কিছু ছিল না। তখন য়ুরোপের লোকেরা পাষাণ যুগে অবস্থান করিতেছিল। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে 'ক্যাপাডোসিয়া' হইতে এরিয়ন আগমন বর্ণিত হইতে পারিত। কতকটা এই মত পোষণকারীর দল, ভারতে এরিয়ন আগমন কালটি,

* Hugo Winckler.

† Boghaz Keul.

খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দী বলিয়া থাকেন। এ মত ঘাতসহ না হওয়ায় এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কুরু-যুদ্ধ কালটি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দী বলেন। ভারতের সভ্যতার ও লিপি-বিদ্যা প্রবর্তনের কালটি, খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ বৎসরেরও অধিক। অসভ্য বর্বরপ্রায় বৈদেশিক এরিয়নরা ভারতে আসিয়া, ভারতীয় সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই ভারতীয় সভ্যতায় বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন, ভারতকে দিবার মত সভ্যতা তাঁহাদের ছিল না। এরিয়নদের আগমন ব্যাপার এক রকম কথা-পুরুষীয় উপাখ্যান। এই এরিয়নদের আগমনের বহু পূর্বে ভারতবাসীরা পশ্চিম জনপদে গমনাগমন করিত, বাস করিত, তাহারা মাঝে মাঝে ভারতে আসিত। ভারতীয় সভ্যতা বাবিলনীয় সভ্যতার অনেক আগের। য়ুরোপের "রুণিক-সভ্যতা" সুপ্রাচীন। আইরিশ, গ্রীক্ এবং কেলিক জাতিরা ও টিউটনেরা—মূলতঃ একই ধারার লোক। দেখা যায় যে, কোন এক অজ্ঞাত কালে এই জাতিদের মূল ধারা (রুণিক ?) পূর্ব দেশ হইতে গিয়াছিল। এই যে পূর্ব দেশ—ইহাই ভারত। আর সেই আদি রুণিকগণ (?) ভারত হইতে লইয়া গিয়াছিল এক প্রকার অসম্পূর্ণ বর্ণ-মালা। ২১টি অক্ষর তাহারা অবগত ছিল। একমাত্র ভারতেই প্রথমে লিপি-বিদ্যা প্রকট প্রাপ্ত হয়। সেকাল খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৩২০০ অব্দের সমসাময়িক। য়ুরোপে রুণিক বর্ণমালা যথাকালে চিত্রে কিছু কিছু নূতন ধরণ পাইয়াছিল।[১] রুণিক বর্ণমালার প্রকটের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে, ভারতের সৈন্ধবী-মুদ্রা-লিপি অভিব্যক্ত হইয়াছিল। মহেন্‌জোদাড় এবং হড়প্পার আদি বর্ণ-মালা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাদি লিপি। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইরূপ লিপি রাঢ় দেশে (সং-রাঢ়, নিন্দনীয় নাম) প্রচলিত ছিল। রাঢ় দেশের প্রধান কেন্দ্র তখন অংগ (চম্পা) দেশ।

অধিকন্তু রুণিক-সভ্যতা এবং সুমারিয়ান সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা। ঐতিহাসিক হল প্রণীত 'হিস্‌টরি অব দি নিয়ার ইষ্ট' ইতিহাসে সুমারীয় (আকাদ ?) সভ্যতার বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল, নূতন সংস্করণে, সুমারীয় সভ্যতার কথা আর রাখা হয় নাই। হেরো-ডোটসের ইতিহাসে বাবিলীয় প্রায় ৮০ জন ভারতীয় রাজাদের উল্লেখ ছিল, তাঁহারা তথাকার প্রথম রাজবংশীয় ধারা বলিয়া বুঝা যায়। পরে যাঁহারা তথাকার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঐতিহাসিক আদি গুরু হেরোডোতসের (সৌর দ্যুতিনা ?) বর্ণনা ত্যাগ করিয়া, নূতন বংশ ধারার বর্ণনা করিয়াছেন।

য়ুরোপের সুমারীয়ন সভ্যতা প্রাচীন-সভ্যতা। ভারতীয় সোম-জাতিদিগকে, সংস্কৃতে 'সৌমার' বলা হইয়াছে। সোম অর্থে—শিব-দুর্গা, অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ, সোমোপাসক-দিগকে 'সুমার' বা সৌমার বলিত। এখন 'সোমড়া' নামে সেই জাতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আদম-সুমারীতে ইসলাম ধর্মীরূপে দেখা যায়। সোমগণ কোন কারণে কামরূপ দেশে আসিয়া বাস করে, তথায় সৌমারপীঠ নামক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। যোগিনী তন্ত্রে তাহাদের বিস্তীর্ণ বিবরণ আছে। তাহারা সুসভ্য জাতি ছিল। এই সোম বংশে মহাভারতীয় যুগে শিশুপালের আবির্ভাব হয়। শিশুপাল ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুটুম্ব হইতেন। সৌমারপীঠে একাধিক এড়ুক বিদ্যমান আছে (গেইট আসাম দ্রষ্টব্য)।

সোমকগণ কামরূপ হইতে পূর্ব তাতারের মধ্য দিয়া, যথাকালে য়ুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং তথায় সোমারিয়ান (সোম-এরিয়ান ?) নামে পরিচিত হয়। সম্ভবতঃ এইরূপভাবে রুণ (রণবাসী ?) গণ, তথায় প্রবাসীরূপ গিয়া অধিবাসী হইয়াছিল। বোধ হয় রণকচ্ছ দেশবাসীরাই রুণ বা রুণিক। এ সম্বন্ধে আলোচনা পাশ্চাত্য ঐতি-হাসিকেরা সহজে করিবেন না। সম্প্রতি 'ষ্টেটস্‌ম্যান' অফিস হইতে "গুড ইংলিশ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।[২] এই পুস্তকে উক্ত হইয়াছে প্রাচীন আইরিশ গ্রীক, কেলটিক[৩] প্রভৃতি একত্রে টিউটনিক জনগণ সকলেই এক ধারার জাতিবিশেষ, অতি পূর্বকালে তাহারা পূর্বদেশ

১। রুণিক লিপির নামগুলি—পরবর্তীকালে আইরিশ, এ, বি, সি ইত্যাদি রূপে ভাষান্তরিত হইয়াছে। মূলে এ প্রকার নাম থাকা সম্ভব নয়।

২। The Home Library Club—Good English, p. 75.

৩। কালদিয়া—চালদিয়ার পূর্ব অধিবাসী (?)

হইতে গিয়াছিল। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানিত। ক্রমে ক্রমে তাহারা য়ুরোপের অধিকাংশ ভূভাগে প্রসারিত হয়।

ইংরেজ, স্কন্ডিনেভীয়ান এবং জারমান (নামে) উত্তরাংশে বাস করে, এই জাতীয় অপর শাখাগুলি দক্ষিণ-দিকে গিয়া গ্রীস, ইতালী এবং স্পেনে বাস করে।

প্রাচীন ভারতীয় লিপি-তত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, ঠিক ঐ সকল দেশের প্রাচীন লেখমালা যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় সৈন্ধবী ও রাঢ়ী-আদ্য লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তদুপরি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতীয়-'এড়ুক' (সমাধি-স্তূপ?) সদৃশ 'ডলমেন' সেই সেই অঞ্চলে একাধিক বিদ্যমান। যেখানে ভারতীয় লিপি, সেইখানেই ডলমেন (এড়ুক) দেখা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক 'বনৃষ্টেটেন' মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—এড়ুক-নির্মাতারা ভারতের মালবর উপকুল হইতে বহির্গত হইয়া ককেসস পর্বতমালার মধ্য দিয়া য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণসাগরের তীরে তীরে এড়ুক চিহ্ন রাখিয়া (বাস করিয়া) ক্রমে ক্রিমিয়ায় (ক্রাইমিয়া) যায়; এই স্থানে বাসকালে তাহারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, এক ভাগ দলে দলে গ্রীস, সিরিয়া, ইটালী ও কর্সিকায় এবং অন্য দলেরা উত্তর-দিকে—হারিশিনিয়ান বনের এক প্রান্তে গিয়া, ক্রমে বৃটেনী, নরম্যান্ডীর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে ও পীরানিস পর্বত পার হইয়া স্পেন, পর্ত্তুগাল দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদেরই শাখাবিশেষ যথাকালে প্রাচীন সাইরেনীয়ার অন্তর্গত মিশর সীমান্তে রাজ্য স্থাপন করে। পণ্ডিত বনৃষ্টেনের এই মত (সত্য হইলেও) সকলে স্বীকার করেন নাই। না করিবারই কথা, কারণ ভারত-গৌরব তাঁহাদের অসহ্য ব্যাপারের মধ্যে প্রধান।

ভারতবাসীরাই য়ুরোপকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিল, ইহা যাঁহাদের অসহ্য হয়, তাঁহারা এরিয়ন আনিয়াছেন ভারতে। কিন্তু ভারতীয় সভ্য-অসভ্য আদি মানবেরা যে য়ুরোপে গিয়া, সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিল এবং রাজত্ব করিয়াছিল এবং ভারতীয়গণই যথাকালে য়ুরোপীয় হইয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] দ্রাভিডিয়ানরা সম্ভব দ্রাবিড়গণ, সম্বন্ধে আলোচনা এখন আর করা হয়না। এড়ুকের[৫] আবিষ্কার যে যে স্থানে হইয়াছে—প্রাচীন ভারতীয় লিপি সেই সেই স্থানেই প্রায় পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির পরিচয় দিয়াছি—বাংলা মহাকোষে, অক্ষর অধ্যায়ে। ডলমেনের সম্বন্ধে বনষ্টেটেন বর্ণিত দেশ-গুলির প্রত্যেক স্থানে, প্রায় প্রাচীন ভারতীয় লিপি-মালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? রুণ (রণ), বা সুমারীয় সভ্যতাই য়ুরোপীয় সভ্যতার আদি, এবং সেই সভ্যতা ভারতীয়। একথা বলিতে কোনই বাধা নাই। মূলতঃ ভারতীয় প্রাচীন-সভ্যতাই য়ুরোপকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিল।

খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ শত অব্দে 'বোঘাজকোই' আবিষ্কৃত লেখমালায় যে ভারতীয় দেবতা-বিশেষের নাম পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। ভারতের যাজ্ঞিক-ধর্ম্ম ভারতেই আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই যাজ্ঞিক ধর্ম্মের প্রবর্তক মনু (দ্রবিড়রাজ) একেবারে সেকালের অংগ দেশের রাজকুমার (বংগালী?), আদৌ বিদেশী নহেন। অংগের সভ্যতা ও দ্রবিড় সভ্যতা এক। ভারতবাসীরা লিপির আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে—ভারত-বহির্ভাগে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। হেরোডোতস—এই জন্যই বাবিলনের '৮০ জন রাজা ভারতীয়' তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। ভারতীয় পুরাণে—কর্দম দেশে (কালদিয়া) এবং বাবিরু (বাবিলন) দেশের উপাখ্যানে একথা পাওয়া যায়। রাজা পুরূরবসের মাতামহী ছিলেন বাবিলনের রাণী। ভারতীয় পুরাণে এবং হেরোদোতস-বর্ণিত বাবিলনের বিবরণে যখন ঐক্য দৃষ্ট হয়, তখন বাবিলনে ভারতীয় রাজারা যে রাজ্য শাসন করিতেন, ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপারের মধ্যে ধরা চলে। ভারতীয় লিপি-

৪। নিম্নলিখিত পুস্তক আলোচনা আবশ্যক—এনথ্রপলজিক্যাল জর্ণাল, ভঃ ১, পত্র ১২২। প্রি-হিস্টরিক ম্যান এণ্ড বিস্‌ট্‌স্ পত্র ২৫০-২৫৫। জন ইলিয়টের এসিয়াটিক রিচার্স ভঃ ৩, ডাঃ হুকারের —হিমালয়ান জর্ণালস। থমাস ওল্ডহাম কৃত ইণ্ডিয়ান জিয়লজিক্যাল সার্ভে, খাশিয়া পাহাড়।

৫। কাপ্তেন মেডোটেলর দক্ষিণ ভারতের প্রায় ২১২৯টি এড়ুকের বিবরণ দিয়াছেন। গ্রেট বৃটনে এড়ুক আছে (ডলমান), ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং জেনারেল পিটরিভার্স বলিয়াছেন—ভারতের খাশিয়া পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য এশিয়া, পারস্য, এশিয়া মাইনর, ইটরিয়া, ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম, ডেনমার্ক, সুইডেন দেশে ডলমেন আছে

মালা অবলম্বনে, পূর্বোক্ত দেশে যে ভারতীয় জনগণ বাস করিতেন ইহা প্রমাণিত হয়। এই লিপি হইতেই ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিমের ইতিহাসে এ তথ্য রাখা সম্ভব হয় নাই। রাখিলে শ্বেতকায় এরিয়নদিগকে ভারতে আনিয়া অভিনয় দেখান হয় না। এমন কি কেহ কেহ নির্লজ্জভাবে বলেন—নিবিদ্ স্তোত্র ও ঋক্-মন্ত্র বিশেষ—অভারতে রচিত হইয়াছিল। তথামন্ত্রের শব্দগুলি যে ভাষার, সেগুলি ভারতীয় আদিশব্দ—ধাতু-জাত সুনিশ্চিত। নিবিদ ও ঋঙ্মন্ত্র আলোচনায় দেখা যায়, আদি ভারতীয় প্রাকৃত-শব্দে গঠিত পদাদির ব্যবহার হইয়াছে। অধিকন্তু ভারতীয় ধাতু-শব্দ ও লিপি য়ুরোপের সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল। য়ুরোপের প্রাচীন লেখমালার শব্দ ও পদগুলির প্রায় সবই ভারতীয় প্রাকৃত-ধাতু গঠিত।

খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দীতে বোঘাজকোই আবিষ্কৃত লেখ-মালা ধৃত—মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ভারতীয় দেবতাদের নাম দৃষ্টে এমন কিছু ব্যক্ত হয় না যে—মিত্রাদি দেবতা বাচক শব্দগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব দেশে আসিয়াছিলেন। মিত্র (মিতর মি+অত+অর ?), বরুণ (বর-উন ?) ইন্দ্র [ই-নদর-(অর) ?] শব্দগুলি ভারতীয় আদ্য-প্রাকৃত-ভাষা (ধাতু-ভাষা)-তেও ছিল। বৈদিক নাম—প্রাকৃত শব্দজাত পদ-বিশেষ। উক্ত লেখামালা, বাণমুখ লিপি উহাতে লেখা আছে,—ভারতীয় দেবতাদের নাম, যথা—নশত্তিয়ন, ইনদর, মিত্রশ শিল, উরুবনশ শিল। বৈয়াকরণ-গণ—প্রাকৃত শব্দ প্রকরণ গ্রহণ না করিয়া, পৃথক্ পদ-প্রকরণে ব্যাখ্যান করিয়াছেন মাত্র।[৬] অথচ একাধিক শব্দাদির প্রাকৃত রূপই রহিয়াছে।

রুণীয় (রুণ—রণ—রুচ্ছ ?) এবং সুমারীয় (সোমক) ? ভাষা, য়ুরোপীয় ভাষা বিশেষের আদি। ইহা আদ্য ভারতীয় প্রাকৃত-ভাষা বিশেষ। বর্তমান রামায়ণ ও মহাভারত যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত, তাহা পাণিনির সংস্কৃত-ভাষা; আর্ষ-ভাষার বা প্রাকৃতের গাথা বিশেষ অনুবাদ মাত্র। আর্ষ-প্রাকৃত আদ্য প্রাকৃত-ভাষা-সৃষ্ট ভাষা বিশেষ। যেহেতু প্রাকৃত-ভাষী ভারতীয়গণ কতক ধর্মে পৃথক্ হইয়া, দ্রাবিড়রাজ মনুর সময়ে বা অব্যবহিত পরবর্তীকালে—প্রাকৃত বিকৃত আর্ষ-প্রাকৃতে মন্ত্রাদি রচনা করেন। ভারতের সর্বাদি মাতৃ-ভাষাই প্রাকৃত-ভাষা (ধাতু-ভাষা-বিশেষ), প্রাকৃত-ধাতু-গঠিত শব্দ-পদাদি গঠিত বৈদিক আর্ষ-প্রাকৃত ভাষা। কথিত-ভাষা তথাকালে ছিল-প্রাকৃত। প্রথমে মন্ত্রের ভাষা আর্ষ-প্রাকৃত ভাষা দ্বারা গঠিত করা হয়। সে ভাষা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ (ব্রহ্মা আখ্যাত ?) কৃত। প্রাকৃত মাতৃভাষা বিকৃত ভাষা বিশেষ। প্রথমে যজ্ঞের পুরোহিতগণ সে ভাষা বুঝিতেন, অন্য কেহ বুঝিত না। কালেনিবিদ্-মন্ত্রের ভাষার ব্যাকরণ না থাকায় অবোধ্য হইয়া গিয়াছিল। পাণিনির পূর্বে ১৭ জন বৈয়াকরণ আর্ষপ্রাকৃতের ব্যাকরণ রচনা করেন, সেই সময়ের ভাষায় ঋঙ্-মন্ত্র বলিয়া অর্থ উপলব্ধি হয়। যাস্ক প্রাচীন মন্ত্রের কিছু ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাঁহার পূর্বের ব্যাকরণ অবলম্বনে।

য়ুরোপে রুণিক ও সুমারিয়ান-ভাষা প্রথমে 'ধাতু-ভাষা' বিশেষই ছিল। তাহাদের ভাষা প্রাকৃত-ধাতু হইতেই অবগত হওয়া যায়। ভারতের প্রাকৃত-ধাতু রুণীয় এবং সুমারীয় ভাষায় বিদ্যমান ছিল নিশ্চয়। প্রাচীন ধাতু-শব্দের অর্থভেদ পরবর্তীকালে হইয়াছিল, বৈয়াকরণ কৃত ধাতু-অর্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একাধিক ধাতু-শব্দের রূপও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহাও ধাতুপাঠে অবগত হওয়া যায়। পদপ্রকরণের সুবিধার জন্য বৈয়াকরণগণ কোন কোন মূল ধাতু-শব্দকে পৃথক্ রূপ দিয়াছেন—বর্ণ-সন্ধি দ্বারা শব্দ পৃথক করিয়াছেন। ভারতের সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের এমন এক যুগ আবির্ভাব হইয়াছিল, যখন শব্দের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য, প্রলোভিত হইয়া সন্ধির অতিমাত্রায় আড়ম্বর হয়। বিস্তারিত শব্দকে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। করাই তখন পাণ্ডিত্য প্রকাশের পরিচায়ক হইয়াছিল। এই ব্যাপারে তখন শব্দবিশেষের লিংগ ও বচন উপেক্ষিত সূত্রপ্রণয়নে তাহার একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাষা-ভেদের ইহাও অন্যতম কারণ। প্রাকৃত ভাষাকে সংহত করিয়া আর্ষ-প্রাকৃত করা হয়, এবং আর্ষ-প্রাকৃত শব্দ-পদকে সংহত করিয়া সংস্কৃত করা

৬। যাজ্ঞিক বৈয়াকরণ কৃত পদ বিস্তারিত করিলে, ধাতুগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতকে বিকৃত করিয়াই প্রথমে আর্য-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং আর্য পদাদি হইতে সংস্কৃত রূপ দান করা হইয়াছে, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। যদিও কয়েক শত বৎসর পূর্বেই কতক হইয়াছিল, তথাচ পাণিনির সময় হইতে ধরা চলে।

হয়। বর্তমানে সংস্কৃত বৈয়াকরণদের সে সন্ধির ঝোঁক আর নাই।

আদ্য-প্রাকৃত-ভাষা, বিস্তারিত ভাষা—ধাতুসহ ধাতু-শব্দ যোগের ভাষা। আর্ষ প্রাকৃত সে প্রথা ক্রমে পরিহার করিয়া সংহত ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত আরও সংহত ভাষা এবং একাধিক সূত্র দ্বারা আরও বিকৃত করা হইয়াছে। যতই সংহত করা হউক না কেন, ধাতুগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিলে (প্রত্যয় বাদে) প্রাকৃত ভাষায় পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ভাষার মূল ধরা যায়। প্রাকৃত-ভাষা কোন ধাতুজাত, সরল প্রকরণে বদ্ধ। আর্ষ-প্রাকৃত কিন্তু বিকৃত, সংস্কৃত অধিকতর বিকৃত। পদার্থের মূল কারণ যেমন পরমাণু, তদ্রূপ ভাষার মূল উপাদান ভারতীয় প্রাকৃত ধাতু-শব্দ। মূল ধাতুকে আর বিভাগ করা যায় না।

প্রাচীন সুমারীয় আদি ভাষা ধাতুজাত, কিন্তু ক্রমশঃ পৃথক প্রাদেশিক শব্দ প্রকরণে অভারতীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে। রুণিক-লিপি আলোচনা করিলে, তাহাদের প্রাচীন ২১টি বর্ণমালা যে ভারতীয় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশভেদে শব্দের উচ্চারণ ভেদ হইয়াছে। যেমন পূর্ববংগ ও পশ্চিমবংগের ভাষা এক, কিন্তু উচ্চারণ-ভেদে পৃথক্ ভাষা মনে হয়। রুণিক বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ ছিল না। ভারতে প্রথমে তাহাই ছিল।* অ, ব, চ, দ, ই, ফ, গ, হ, র, ক, ল, ম, ন, ও, প, র, স, ট, থ, য়, উ—এই ২১টি, যথাকালে ২৬টি হইয়াছে। সম্ভব, পাণিনির সময়ে বা পূর্ব্বে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালার শ্রেণী বিভাগ হয় এবং বর্গগত করা হয়। প্রাচীন কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে, অন্তঃস্থ বর্ণেরও বর্গ-বিভাগ পাওয়া যায় (তন্ত্রসার ও গৌতমীতন্ত্র দেখুন) রুণিক-বর্ণমালার—একাধিক বর্ণ—প্রাচীন ভারতীয় বর্ণের অনুরূপ (সৌন্ধবী ও রাঢ়ী লিপি দেখুন)। সৌন্ধবী মুদ্রালিপি ও রাঢ়ী লেখমালার একাধিক বর্ণগত ধ্বনি অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু রুণিকলিপি হইতে সেই সেই বর্ণের ধ্বনি অবগত হওয়া যায়।

রুণিক অ, চ, দ, ই, ফ, গ, হ, ক, ল, ম, ন, ও, প, থ, য়, উ বর্ণগুলির মধ্যে প এবং ও এবং উভয়ের যৌগিকরূপ সৌন্ধবী মুদ্রায় দৃষ্ট হয়, ভারতের প এবং ও চিত্র ভেদ হইয়া গিয়াছিল। সুমারীয়, ক্রীট এবং হালিকার্ণাস ইত্যাদি লিপি হইতে ভারতীয় লুপ্ত লিপির পরিচয় পাওয়া যায়।[৭] সৈন্ধবী মুদ্রালিপির পাঠকালে যে যে চিত্রগুলিকে ভাবচিত্র বলা হয়, তাহা মূলতঃ যৌগিকবর্ণ বিশেষ। অক্ষর-পরিচয়ের ফলেই শুদ্ধ পাঠ পাওয়া যাইবে। ধৃত পাঠের ভাবার্থ অবগত হইতে হইলে, পদের ধাতু বিশ্লেষণ করিয়া ধাতুগত অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ সে অজ্ঞাত কালের ভাষার অর্থ বুঝিবার অন্য কোন সহজ পথ নাই।

এই সকল বিষয় অবলম্বনে, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা ভারতীয় আদিম সভ্যতা লইয়া য়ুরোপ, আফ্রিকার ইজিপ্ত প্রভৃতি দেশে গিয়া বাস করিত এবং বৈদিক পূর্ব ও পরে বৈদিক ধর্ম-কর্ম প্রবাস স্থানে আচরণ করিত। নিনিভির বন্দরে ভারতীয় বণিক্ ও মাঝি মাল্লাদের যাতায়াত ছিল। হুগোর আবিস্কারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দীতে—ভারতবাসীরা - মিত্রাণি (মিতাণি ?) ও হিতাইত (হিটাইট)[৮] নামে তথায় খ্যাত হইত। তাহারা স্বদেশের লোকায়ত ধর্ম্ম (আগমিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম) প্রতিপালন করিত। প্রাকৃত-যুগে ইনদর, বরউন ও মিতর (মিত্র ?) দেবতা বা তদনুরূপ কিছু দেবত্বজ্ঞাপক শব্দ বিশেষের প্রচলন ছিল। যাজ্ঞিকেরা পূর্ব দেবতাগণেরই নামান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্ষ প্রাকৃত-ভাষায় ও সংস্কৃতে। যেহেতু তথাকথিত শব্দগুলি মৃৎ-ফলকে বিকৃত রূপেই খোদিত হইয়াছে। প্রাকৃতের ইনদ, বর, মি (মিথ, মিত) শব্দ স্পষ্টপদ। বৈদিক ধাতুজ পদ নয়। বৈদিকগণ—আর্ষ-প্রাকৃতে মন্ত্রের জন্য যে সকল

* য়ুরোপীয় বর্ণমালা—স্বর ও ব্যঞ্জন মিশ্রিত, রুণিক তুল্য।

৭। "বাংলা-ভাষা ও লিপির ক্রম-বিকাশ" নামক পাণ্ডুলিপিতে তাহা দেখান হইয়াছে। প্রাচীন প এবং ও বর্ণের চিত্র পূর্ণরূপে অজ্ঞাত হইয়াছিল। সুপ্রাচীন লেখমালায় ধৃত আছে, পরে ব্যবহার ছিল না পৃথক্ সহজ চিত্রের প্রচলন হইয়াছিল।

৮। মিত্রানি (মিতানি)—প্রাকৃতে—'মি+তর+অন+নি'= মিতর+অনি (সম্ভবদ্ধ মিত্রের দল ?) হিটাইট (হিতাইত) প্রাঃ—হি+অত অট+ইত= হিত (অট) +ইত। (পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন ভ্রমণকারীর দল বুঝায়) তখন জাতিভেদ ছিল না। অগ্নি-বৈদিক পূর্বেও পূজিত হইত, ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই অগ্নির স্তব-কীর্তন হইয়াছে। পারস্যের স্তুহা বিশেষে মিত্র দেবতায় বেশী ছিল। (Encychlopaedia Bri. 269—70 page.) অগ্নির (অগনির ?) উপাসনা বৈদিক পূর্ব।

শব্দ-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেগুলির সবই প্রাকৃতের মূলশব্দ বিশেষ। উক্ত তিন দেবতা—বৈদিক দেবতা এবং প্রাকৃতের শব্দ বিশেষ। প্রাকৃত যুগে উহাদের পৃথক অর্থ ছিল। দেবতা বা অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হইত। মিতানি ও হিটাইট রাজারা—দেবতা এবং পূজনীয় নেতারূপে নামের শপথ করিয়াছিলেন। ভারতীয় ধাতু এবং ধাতুজাত শব্দ পদাদির ব্যবহার, তথাকথিত কালে য়ুরোপাদি দেশে প্রচলিত ছিল, প্রচলন-কর্ত্তারা ছিলেন ভারতীয় সভ্যগণ। গ্রীস, রোমক ইত্যাদি জনপদবাসীরা পূর্বদশোগত রুণিক এবং সুমারিয়ান্ বলে মিশ্র-জাতি বিশেষ, পূর্বদেশের মূল-শব্দ (ধাতু) তথায় প্রচলিত ছিল। ভারতের ধাতু-শব্দ ভারতবাসীরাই তথায় প্রচলিত করিয়াছিল। সে দেশের দেবতাদের নম-শব্দে এবং ভারতীয় শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য ছিল—দীর্ঘকাল তথাকথিত দেশে বাস করায় তাহারা শ্বেতকায় হইয়াছিল এবং শ্বেত নারীগ্রহণে জাত বংশধরেরা শ্বেতাঙ্গ হইয়াছিল। সে দেশেও এক প্রকার প্রাচীন শ্বেতজাতি বাস করিত, এখনও সেই প্রাচীন লুপ্তপ্রায় জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্পেন দেশের বাসক্ প্রদেশে, আয়র্লণ্ডের পশ্চিম এবং ওয়েলেসের কোন কোন অংশে এবং স্কট্ল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডসমূহে এক প্রকার শ্বেত মানব দেখা যায়। ইহারা কেলট জাতির পূর্বের লোক। ইহাদিগকে 'আইবিরিয়ান' নাম দেওয়া হইয়াছে। কেহ বা তাহাদিগকে সিলিউরিয়ান, য়ুগেরিয়ান বা বাসক বলেছেন। ইহারা য়ুরোপের প্রাচীন জাতিবিশেষ। পূর্বদেশের লোকের মিশ্রণে য়ুরোপের একাধিক জাতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকিবে।

এই আইবিরিয়ানগণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই। কারণ শ্বেতকায় বর্বরজাতি—যাহারা য়ুরোপের আদিম অধিবাসী—এ এক প্রকার জাতি প্রকট পাইয়াছিল পশ্চিম দেশে। তাহারা তথাকার আদিম-মানব বংশ। ভারতীয় জাতি বিশেষের (পূর্ব দেশের) লোকেরা প্রথম যখন হড়্মোশিয়া দ্বীপে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে, তখন উক্ত মানবেরা—কালদিয়াদি জনপদে হয়ত বাস করিত। আদি পাষাণ যুগের মানুষ তাহারা, তাহাদের নারী গ্রহণ করিয়া হড়মোশিয়ার ওয়ালেশ পরিচালিত হড় (মানব) গণ, বাসকদিগকে বশীভূত করিয়া সভ্য করিয়াছিল এবং তথাকার নারী গ্রহণ করিয়া বংশ বিস্তার করিয়া থাকিবে। সেই প্রাচীন জাতির ধারা এখনও বিদ্যমান। তাহারা য়ুরোপের আদিম মানব। এ কথা স্বীকার করিতেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয়ানগণের লজ্জা হইয়া থাকে। এ পর্যন্ত তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। বাবিলনের সভ্যতা সে দেশের আদিম সভ্যতা, স্পেনাদি দেশের বাসকগণ (বাস+অক ?) যখন আদি মানব, তখন তাহাদের সহিত মিশ্রণে যে একাধিক জাতির অভিব্যক্তি হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কেলট জাতির পূর্বে ড্রুইড (দ্রাবিড় ?) তাহারও পূর্বে আইবিরিয়ানগণ য়ুরোপে বাস করিত। আইবিরিয়ান, ড্রুইড, কেণ্ট জাতির মিশ্রণে নবীন জাতির উদয় হয়। যাহাই হউক, বিভিন্ন কালে ভারতবাসীরা ভারত-বহির্ভাগে গমন করিয়া বহুবিধ মানবজাতির উৎপাদন ও সভ্যতা দান করিয়াছিল। রুণিক ও সুমারিয়ান সভ্যতা আদৌ ভারতীয় পরবর্ত্তী কালের সভ্যতা, তখন ভারতে লিপি-বিদ্যা প্রকট পাইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ হাজার হইতে ১৪০০ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা পশ্চিমাদিগকে সভ্য-ভব্য করিয়াছিল। সুতরাং বৈদিক পূর্ব হইতে ভারতের প্রাকৃত-সভ্যতা ও ধর্ম তাইগ্রীস ও ইউক্রেতীশ (গ্রীক প্রদত্ত নাম) তীরে প্রচলিত হইয়াছিল। পবিত্র বাইবেলের মোজেস যে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন, তাহার বহু পূর্বে ভারতবাসীরা ইজিপ্তে, উরে, বাবিলনে, কালদিয়ায় অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। মিত্র (সূর্য) দেবতা কেবল বৈদিকগণের নয়, তাহারও বহু পূর্বে সূর্য, অগ্নি দেবতার পূজাদিসহ উৎসব হইত। খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দের বৃহত্তর ভারত পশ্চিম দেশে সভ্যতা দান করিয়াছিল। তথাকালের ভারতীয় সভ্যতায় নগরনির্মাণ, বড় বড় ইমারত-নির্মাণে বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, সৈন্ধবী সভ্যতায় ইহার আদর্শ বিদ্যমান।

সঙ্ঘমিত্রা

(একাঙ্ক কথা-নাটিকা)

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

পাত্র ও পাত্রী

পাত্র

উপগুপ্ত—বৌদ্ধ মহাস্থবির, মহারাজ অশোকের ধর্মগুরু।

অশোক—ভারতসম্রাট্।

কুমার মহেন্দ্র—ঐ পুত্র।

সিংহলরাজ।

কনকসিংহ—ঐ পুত্র।

প্রসেন—কুমারের সহচর।

মন্ত্রী, সভাসদ্, স্থবির, ভিক্ষু, নাগরিক, সভাপণ্ডিত, দৌবারিক প্রভৃতি।

পাত্রী

সঙ্ঘমিত্রা—সম্রাট্ অশোকের কন্যা।

ভিক্ষুণী, আরোগ্যশালার সেবিকাগণ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বুদ্ধগয়ার বিহার

মহাস্থবির উপগুপ্ত, শিষ্যগণ ও রাজকুমার মহেন্দ্র

উপগুপ্ত—বৎস, বল ত্রি-রত্ন কি ?

মহেন্দ্র—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—এই ত্রি-রত্ন; বৌদ্ধধর্ম্মের এই স্তম্ভ।

উপগুপ্ত—বুদ্ধত্ব কি ?

মহেন্দ্র—নিরঞ্জন জ্ঞান। সকল ধারণা সংস্কারের অতীত। তাই তাহাকে শূন্যস্বরূপও বলা যায়।

উপগুপ্ত—তথাগত কে ?

মহেন্দ্র—তথাগত গৌতম করুণার বিগ্রহ-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জীবগণের তিনি মুক্তি-সেতু।

উপগুপ্ত—বুদ্ধ-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্য কি তুমি গ্রহণ করেছ ?

মহেন্দ্র—বুদ্ধ যেদিন নির্ব্বাণের সিংহদ্বার থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে এলেন মানবের বেদনায় কাতর হয়ে—সেইদিন তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ফুটে' উঠেছিল। মানবজাতির জন্য তিনি নির্ব্বাণ, মুক্তি তুচ্ছ করেছিলেন—এই তাঁর জীবনের সর্ব্বোত্তম শিক্ষা, সর্ব্বোত্তম তাৎপর্য্য। আমার কাছে এই তত্ত্বই সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী।

উপগুপ্ত—উত্তম। কুমার, তোমার শিক্ষার পরিচয়ে প্রীত হলেম। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। এই জয়টীকা ললাটে নিয়ে তুমি দিগ্বিজয়ে বাহির হও।

(ললাটে তিলক-দান)

মহেন্দ্র—(প্রণত হইয়া) আর্য্য, একটী নিবেদন—

উপগুপ্ত—বল বৎস, নিঃসঙ্কোচে বল। আমার কাছে কোন কুণ্ঠার কারণ নাই।

মহেন্দ্র—আমার ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রা দুয়ারে দাঁড়িয়ে—সেও একসঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ করেছে। আপনার কাছে সেও আজ পরীক্ষার্থিনী।

উপগুপ্ত—সে কি! বালিকা সঙ্ঘমিত্রাও ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা নিতে চায়! মহারাজের এতে সম্মতি আছে ?

মহেন্দ্র—পিতার আদেশ-পত্র সঙ্গে এনেছে। তাকে ডেকে আনি ?

(উপগুপ্ত মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলে, মহেন্দ্র বাহির হইতে সঙ্ঘমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া আসিল)

সঙ্ঘমিত্রা—(মহাস্থবিরকে প্রণাম করিয়া) আর্য্য, পিতার এই পত্র। (পত্র প্রদান)। তিনি সম্মতি দিয়াছেন। দাদার মত আমিও ধর্ম্মপ্রচারে অভিলাষিণী। আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

উপগুপ্ত—কিন্তু নারীর তো প্রচার-ধর্ম্মে অধিকার অভিধর্ম্ম দেয় নাই!

সঙ্ঘমিত্রা—দেব, আর্য্যা গোতমী, গোপা সঙ্ঘধর্ম্মে স্থান পেয়েছিলেন—আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই। আমায় আপনি অনুমতি দান করুন।

উপগুপ্ত—বৎসে, তোমার শুভ সঙ্কল্পে বাধা দেওয়ায় আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু এ ব্রতের দায়িত্ব কি গুরুতর, তা'

কি অবগত আছ? নারী-হৃদয় চঞ্চলা, বৎস তোমাদের ভক্তিমার্গ ই সরল পথ। ভিক্ষুণীর জীবন ক্ষুরধার ও বন্ধুর। রাজকুমারি, তুমি আরও ভাল ক'রে' বিবেচনা করে' দেখ।

সঙ্ঘমিত্রা—প্রভো, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যে সঙ্কল্প করেছি, তা' যেন চিরদিন স্থির থাকে। আপনার কৃপায় সকল বিপদেই অনায়াসে উত্তীর্ণ হব।

উপগুপ্ত—শুভে, অগ্নিপরীক্ষা সম্মুখে। সতর্ক থেক। আশীর্ব্বাদ করি, সিদ্ধ-মনস্কামনা হও।

(মস্তকে করার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ)

(মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা উভয়ে প্রণাম করিল)

উপগুপ্ত—বল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

উভয়ে— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

শিষ্যগণ—(সকলে সমস্বরে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" প্রভৃতি পুনরায় আবৃত্তি করিল)।

(শিষ্যগণসহ মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার প্রস্থান)

উপগুপ্ত—(স্বগত) সম্রাট্ অশোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য-কীর্ত্তি এই পুত্র-কন্যা। আজ আমার জীবন ধন্য! চির-দিনের স্বপ্ন আজ সফল হল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ

সম্রাট্ অশোক, মন্ত্রী ও পারিষদ্‌বর্গ

চারণগণের গীতি

জয় প্রজাপতি প্রিয়দর্শন
দেব রঞ্জনকারী।
ভারত-রাজ-রাজ জয়তু
ধর্ম্মব্রতধারী॥
ধরণী-বুদ্ধ-শরণ-মানসে
বন্দি' জনগণ-নাথ তাপসে
আকাশে বাতাসে কীর্ত্তি প্রকাশে
অশোক পুণ্যচারী॥

সম্রাট্—গান্ধার থেকে রাজদূত ফিরে এসেছে। পারস্য, মহাচীন, তুর্কিস্থান—তাদের বার্ত্তা এখনও পাইনি। উত্তর আফ্রিকার টলেমি প্রমুখ রাজন্যবৃন্দেরও আজ পর্য্যন্ত কোনও সাড়া নেই! সিংহল ও প্রাচ্য দ্বীপ-পুঞ্জে রীতিমত প্রচার-কার্য্য তো এখনও আমরা আরম্ভই করতে পারিনি। দিন যায়, চিত্ত আমার অস্থির হয়ে ওঠে। তথাগতের শান্তিবাণী বুঝি জীবন থাকতে জগন্ময় ছড়িয়ে দিতে পারলুম না!

মন্ত্রী—মহারাজের আকুলতার মর্ম্ম বুঝি। কিন্তু চেষ্টার তো ত্রুটি কিছুই করেন নি! দূর দীর্ঘ পথ—দূতগণের প্রত্যুত্তর লিপি নিয়ে ফিরে' আসার সময় এখনও যায়নি। মনে হয়, পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দ কেহই আপনার মহানুভব হৃদয়ের শান্তি-প্রার্থনায় অনুকূল সাড়া দিতে বিমুখ হবেন না। আজ বুদ্ধগয়া মহা-বিহার থেকে মহাস্থবির ভগবান উপগুপ্তের অনুগ্রহ-লিপি এসেছে। বার্ত্তাবহ স্থবির দ্বারে অপেক্ষা করছে।

সম্রাট্—ডাক তাকে। কুমার মহেন্দ্র ও রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রার সংবাদ পেতে চিত্ত উৎসুক।

(মন্ত্রীর ইঙ্গিতে দৌবারিকের বহির্গমন ও স্থবিরকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

স্থবির—(হাত তুলিয়া)—দেবানাং পিয় পিয়দর্শী সম্রাট্ অশোকের জয় হউক!

সম্রাট্—কি সংবাদ, স্থবির?

স্থবির—মহাস্থবির ভগবান উপগুপ্ত স্বয়ং এবার সিংহলে তীর্থযাত্রা করছেন। সিংহল থেকে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, দক্ষিণ ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপময় এশিয়ায় তিনি অভিযান করবেন। তাঁর সহযাত্রী হবেন—ভিক্ষু মহেন্দ্র ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা। মহাস্থবির আচার্য্য দেব আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি রাজ্যে ঘোষণা করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই তাঁর নির্দ্দেশ-পত্র।

(পত্র-প্রদান)

সম্রাট্—(পত্র-পাঠান্তে)—ধন্য, ধন্য আমি! অহো, আজ ত্রিসংসারে আমার চেয়ে সুখী কে? প্রভুপথযাত্রী রাজপুত্র, রাজকন্যা—স্বয়ং আচার্য্যদেব ধর্ম্মপ্রচারে দিগ্বিজয়ে চলেছেন। মন্ত্রী, এই সংবাদ দুন্দুভিনিনাদে

আজই সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক। প্রজারা জানুক—তাহাদের রাজপুত্র, রাজকন্যা ধর্ম্ম-বিজয়ে অগ্রগামী। অহিংসা ও শান্তির বাণী দিকে দিকে তারা প্রচার করবে।—স্থবিরের যথাযোগ্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে' দাও মন্ত্রিবর। আজ এখনই সভা-ভঙ্গ হউক। আমিও মহারাণীকে এই আনন্দ-বার্ত্তা দিতে অন্তঃপুরে চল্লুম।

(সম্রাটের প্রস্থান)

সকলে—(সমকণ্ঠে) জয় দেবানাং পিয় পিয়দর্শী মহারাজাধিরাজ অশোকের জয়! জয় ভারতসম্রাটের জয়!!

স্থবির— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

(বলিতে বলিতে মন্ত্রীসহ স্থবির ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(দুইজন পথিকের দ্রুতবেগে প্রবেশ)

১ম পঃ—(সভয়ে) ওরে পালা, পালা—কে কোথায় আছিস্, পালা, পালা!

২য় পঃ—কেন—কেন—কি হয়েছে বলত!

১ম পঃ—হয়েছে যা হবার সবই—আর বলার, কওয়ার কিছু নেই! পালাও, পালাও, যে যেখানে আছ। যদি প্রাণের মায়া থাকে তো, এখনই প্রাণপণে দাও ছুট—নইলে তোমার মরণের খবরও আর ঘরে নিয়ে যাওয়ার লোক থাকবে না। ছোটো, ছোটো—

২য় পঃ—কিন্তু ব্যাপারটা কি, তা' না জেনেই বা পালাব কেন? কি হয়েছে কি—বল না!

১ম পঃ—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! ঐ রাবণ রাজার-দেশ থেকে খবর এসেছে—তারা আস্ত আস্ত মানুষ সব ধরে' নিয়ে যাবে এখান থেকে। মহারাজের অহিংসা মন্ত্র তারা মান্‌বে না। রাক্ষসেরা আস্ত আস্ত মানুষ যে গিলে খায়, তাও জান না!

২য় পঃ—ওঃ, সিংহলের কথা বল্‌ছ? কিন্তু এ সিংহল তো সে রাবণ রাজার সোণার লঙ্কাপুরী নয়। তা' ছাড়া, সিংহলে স্বয়ং মহাস্থবির উপগুপ্ত তীর্থ-যাত্রা কর্‌ছেন—এই খবরই তো এই মাত্র কাড়া-নাকাড়া পিটে ঘোষণা করে' গেল। এই খবর নিয়ে তুমি ক্ষেপে উঠেছ—পাগল আর কারে বলে!

১ম পঃ—তবে তুমিও ঢেঁড়্‌রা কাণে শুনেছ! হলপ্ করে' বল্‌তে পার—ঠিক শুনেছ? তীর্থিযাত্রা—কেন তীর্থি কি আর ভূভারতে মিল্‌ল না! ঐ রাক্ষসের পুরীতে যেতে হবে তীর্থি করতে।

২য় পঃ—মহাস্থবির উপগুপ্ত শুধু নয়, আমাদের রাজকুমার, রাজকুমারীও যে সঙ্গে চলেছেন। তা তুমি এতে ভয় পাচ্ছ কেন?

১ম পঃ—তবে আর তোমায় বল্‌ছি কি! বুড়ো উপোগুপ্তটা রাক্ষসের পেটে গেলে না হয় হাড় জুড়ুত; কিন্তু আমাদের অমন কার্ত্তিকের মত রাজপুত্তুর মহেন আর ঐ গলা টিপলে দুধ বেরোয় কচি মেয়ে সঙ্ঘমিত্তা—সেখানে গেলে আর রক্ষা পাবে ভেবেছ! একেবারে গপাৎ করে' আস্ত মুখে পুরে কচি পাঁঠার মত—বুঝেচ কিনা—গ—লা-ধঃ—ক—র-ণ!

১ম পঃ—(হাসিতে হাসিতে) হা-হা-হা, তা নয় বুঝ্‌লুম! কিন্তু রাজকুমার রাজকুমারীরা যদি নাও ফেরে, তাতে তোমার আমার কি এসে যায়! আমরা খামোকা নগর ছেড়ে পালাব কেন?

১ম পঃ—আরে, আমরা না হয় মুরখ্যু সুরখ্যু মানুষ—তোমরা তো পণ্ডিত-মণ্ডিত লোক গো! তোমরা এই সামান্য কথাটুকুও মাথায় আনতে পারলে না! রাজ্যের রাজপুত্তুর, রাজকন্যেকে ঐ রাক্ষসপুরীতে বনবাসে পাঠিয়ে বুড়ো রাণী তিষ্যমিত্তা নিজের ছেলেকেই সিংহাসনে বসাবার মতলব ফেঁদেচে আর কি! ঐ কুণেলটার কি অবস্থা হল মনে নেই! দুর্বুদ্ধি—দুর্বুদ্ধি—মহারাজের বুড়ো বয়সে ভীমরতি ছাড়া আর কি বলব! আহা! ঐ মহেন আর আমাদের দুগ্‌গাপিতিমের মত মেয়ে সঙ্ঘমিত্তা দিদিমণিকে ছেড়ে আমরা এ রাজ্যে বাস কত্তে পারব না। রাজা বেশ জানে—যত ভাল ভাল লোক সব ঝেঁটিয়ে চলে' যাবে ওদের সঙ্গে—রাক্ষসদের পেট ভরাতে।

আর খুব মজা লুটবেন ওঁরা এখানে বসে! ঝাড়ু মার—ঝাড়ু মার—ঐ বুড়োরাণীর মুখে!

২য় পঃ—চুপ্-চুপ্! রাজনিন্দা মুখে এনো না! তোমার মরণের ভয় নেই! রাস্তার গাছগুলারও কাণ আছে, তা জান!

১ম পঃ—রেখে দাও তোমার যত বাজে কথা! হক্ কথা—রাস্তায় হেঁকে বলব! ভয় কিসের? জান্ যাবে—তা যাক্! আমাদের সঙ্গে চালাকী করা আর চল্‌বে না।

২য় পঃ—তা এই মাত্র তো জানেরই ভয়ে পালাতে বল্‌ছিলে।

১ম পঃ—ষাট্, ষাট্! তোমরা একেবারে এমন নিরেট কেন গো! ও—তোমরা বুঝি ঐ সব ভিক্ষু শাস্তর-পড়া পণ্ডিত লোক! তাই বলি—সংস্কিত্যি অং-বং না জান্‌লে আবার সে কখন পণ্ডিত হয়! যত সব কিচির-মিচির করা গোবদ্যি এসে বুড়ো রাজারও মাথা খেলে—ধম্ম-কম্মও সব রসাতলে দিলে!

২য় পঃ—তুমি দেখ্‌ছি—বৌদ্ধদ্রোহী! ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড হ'ল কি ক'রে?

১ম পঃ—আরে বাবা, রাজ্যে এয়োলক্ষীরা আর আঁশের চিহ্ন দেখতে পায় বল্‌তে পার—যে তারা সতী-ধম্ম রক্ষে করবে! মা কালীর দুয়ারে আর জোড়া পাঁটা বলি পড়ে—দেখ্‌তে পাও। তবুও বল—ধম্ম আছে!

২য় পঃ—চুপ—চুপ—ঐ আবার নাকাড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে! রাজকুমার, রাজকুমারী শোভা যাত্রা করে' আস্‌ছেন বোধ হয়।

(ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা গান গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে—পশ্চাতে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা)

গান

মন্ত্র-সাধনে ধর গো পণ।
ধর্ম্ম-বরণে দাও জীবন।
সঙ্ঘ-মহিমা ঘোষণা করি'
চলরে চলরে চল॥

প্রভু বুদ্ধ যা দিয়েছে দান
শিরে তুলে লই সে নিশান—
স্মরণে মননে, জীবনে মরণে
চলরে চলরে চল॥

আজ প্রাচ্যে বহে নবীন বান
পশ্চিমে তার লাগে তুফান।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বাঁধিয়া বাঁধন
চল্‌রে চল্‌রে চল॥

যে যেথায় আছ ক'র না ভয়।
কণ্ঠে ফুকার শ্রীবুদ্ধ-জয়!
অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, প্রেম—
চল্‌রে চল্‌রে চল্॥

চতুর্থ দৃশ্য

সিংহলের সমুদ্রতীর

(রাজপুত্র কনকসিংহ ও সহচর প্রসেন বেড়াইতে বেড়াইতে কথোপকথনরত)

কনক—সোণার সিংহল; আর ঐ দূরে সমুদ্র-পারে বিশাল ভারত-ভূমি। সেই ভারতের পূর্ব্ব খণ্ডে আমার পিতৃরাজ্য বঙ্গদেশ। নূতন অতিথিরা এসেছে শুনি সেই বাংলার প্রতিবেশী মগধ থেকে। মগধ-সম্রাট্ আজ সারা ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্। একে একে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁর কাছে নাকি বশ্যতা স্বীকার করেছে—বাহুবলে নয়, ধর্ম্মবলে! কিন্তু সিংহল আজও স্বাধীন, আজও মাথা তার আত্মধর্ম্মে উন্নত। এ গৌরব আমি নষ্ট হতে দেব না।

প্রসেন—কিন্তু কনক, আমার মনে হয়, ঐ গৌরব আর বুঝি থাকে না। ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসে—নূতন আলোরই রূপ নিয়ে। ভারত-সম্রাটের রাজদূত ইতিমধ্যেই অনেকখানি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে' তুলেছে। শিক্ষিত প্রজাদের মধ্যে অনেকেই আজ ভারতের নূতন ধর্ম্মের সংবাদে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা চায় নূতন ভাব, নূতন অনুপ্রেরণা। পুরাতনে আর তাদের যেন মন উঠ্‌ছে না। খুঁজছে তারা একটা নূতন সত্য, নবীন আশার বাণী। এই সময়ে মহাস্থবির উপগুপ্তের

আগমন তুমি কি সিংহলের পক্ষে সম্পূর্ণ শুভকর মনে কর? যে ধর্ম্মবন্যা সমগ্র ভারতকে ভাসিয়ে সাগর-পারে আজ এসে পৌঁছেছে—তার দুর্ব্বার স্রোতঃ রোধ করা বোধ হয় আর আমাদের সাধ্যায়ত্তে কুলাবে না।

কনক—সেই আশঙ্কা আমারও মনে হয়নি, তা' বলি না। কিন্তু আমি এর প্রতিরোধের জন্য সমস্ত সিংহলকে ডাক দেব—সিংহলের তরুণদের একত্র করে' বুঝাব—আমার পিতৃবংশ বাঙালী; কিন্তু বাংলার ভাব-ভাষা-সভ্যতা বরণ করলেও, সিংহলবাসী তার নিজস্ব ধর্ম্ম ছাড়েনি। এই প্রাচীন ধর্ম্মই এ পর্য্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে—আমাদের দেশকে রক্ষা করেছে। এই ধর্ম্মগৌরব ক্ষুণ্ণ হতে আমরা কিছুতেই দিব না। উপগুপ্ত যদি নবধর্ম্ম প্রচার করতে চায়, তার অবাধ ক্ষেত্র আর যে কোন দেশই হউক—সিংহল নয়। সিংহল স্বাধীন, স্বতন্ত্র—রাষ্ট্রে স্বাধীন, ধর্ম্মেও তাই। তুমি কি বল প্রসেন—দেশ-বাসী, দেশের যৌবন কি আমার এ আকূতি বুঝবে না—শুনবে না!

প্রসেন—কিন্তু কনক, প্রাচীন হলেই যে সব সময়ে তা' উত্তম হয়, তা' কি তুমি মনে কর? আমার মনে হয়, যুগের ভেরী যখন বেজে ওঠে, সে ডাকে তাজা মানুষের প্রাণ সাড়া দেবেই। ভারতে যে যুগবাণী বেজেছে, সমস্ত এশিয়ায়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সিংহল শুধুই কেন সে বাণীর উত্তরে সাড়া দেবে না?

কনক—নূতনের এ মোহ সর্ব্বনাশী, তা' কি তুমি আজও উপলব্ধি করবে না প্রসেন? এই নূতনের নামেই যুগে যুগে কত জাতি আত্মবিক্রয় করেছে—তারা মরেছে। এই পতঙ্গ-বৃত্তি থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই। তার জন্য মৃত্যুপণ করতে হয়, আমি করব।

প্রসেন—বঙ্গরাজ বিজয়সিংহ যেদিন রণতরী সাজিয়ে এখানে হানা দিয়েছিলেন, সেদিন যদি সিংহলবাসী নবীনকে অভিনন্দন করে' না নিত, সিংহলের বর্ত্তমান সভ্যতা ও গৌরবই বা কোথায় থাকৃত কনক? আমি বলি—নূতন বলে'ই তাকে ঘৃণা না করে', সূক্ষ্ম বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিচার করে' দেখা হোক—তার মধ্যে কি ভাল, কি মন্দ—যা' ভাল, সেইটুকুই বেছে নিতে আপত্তি কি?

কনক—তর্কের কথা নয়। জীবনের সত্য-নির্ণয় তর্কে হবার নয়। আমি সিংহলের বীরধর্ম্মে বিশ্বাসী। সিংহলের সত্য ও স্বাধীনতা বাহুবলেই রক্ষা করতে চাই—রক্ষা কর্‌ব।

(গান গাহিতে গাহিতে একা সঙ্ঘমিত্রা দূর হইতে সমুদ্রতীরে পাদ-চারণা করিতে করিতে আসিতেছেন)

গীত

রঙীন আকাশপথে আমি চলি দিশেহারা
ঝঙ্কার শুনি পায় পায়।
আমার চলার সাথে স্পন্দন জাগে আজ
স্পন্দিত ঘন কুয়াশায়॥
ঝঙ্কার শুনি পায় পায়॥
আগুনের বাণী বাজে, তারি শিখা জ্বালি কাজে,
তারি ব্যথা, প্রয়োজন, গীতি ও বিরহ
জ্বলে মোর মনের শিখায়—
ঝঙ্কার শুনি পায় পায়॥

প্রসেন—(সবিস্ময়ে) সম্রাট্-দুহিতা বুঝি! অলোক-সামান্যা রূপসী! নিরলঙ্কারা সন্ন্যাসিনী হলেও, স্বর্গের সুষমা যেন মুখের উপরে ফুটে' উঠেছে। দৃষ্টির কি অপূর্ব্ব মাধুরী! যেন স্বর্ণাঞ্চলা সন্ধ্যারাণী স্বয়ং আজ সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছেন। আর কণ্ঠে যেন অমৃত-লহরী সুরে সুরে উছলে উঠ্‌ছে। নয় কি?

কনক—(গম্ভীরভাবে দৃষ্টি নামাইয়া)—অপূর্ব্ব তপস্বিনী! (পরে চমক ভাঙ্গিয়া) চল প্রসেন—মহিলা যিনিই হউন, একাকিনী সমুদ্রতীরে যখন বিশ্রাম-সেবনে এসেছেন, তখন আমাদের এ স্থানে থাকা আর কর্ত্তব্য মনে করি না! সন্ধ্যাও আসন্ন—চল সখা, গৃহে যাই।

(ভিন্ন পথে উভয়ের প্রস্থান)

সঙ্ঘমিত্রা—(আরও আগাইয়া) অপূর্ব্ব এ দেশ! যেন সমুদ্রের বুকে সোণার কমলের মতই ফুটে' উঠেছে! রাজগৃহ, পাটলীপুত্রের উজ্জ্বল মুখর সৌন্দর্য্য এ নয়,

কিন্তু বড় স্নিগ্ধ, মনোরম! এখানে মন যেন আপনি এলিয়ে আসে। বৈরাগ্যের রুদ্র অগ্নি-শিখা যেন করুণায় নমিত, সুষমায় মুগ্ধ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কি একটা আচ্ছন্নতা হৃদয়ে অনুভব করছি। অন্তর্য্যামিন্, তোমার সুর, তোমার শিখা আমার অন্তরে নিয়ত জ্বালিয়ে রাখ। প্রভো, আমি যেন তোমার পুণ্য প্রদীপ-শিখা হয়ে চিরদিন জ্বল্‌তে পারি।

(পুনরায়) গান

বাজাও এ সুরগীতা মর্ম্মতারে,
হৃদয়ে তোল না নবীন তান!
ভেঙ্গে চুরে মোর অন্ধ মানসে
ফুটায়ে তোল না নূতন প্রাণ।
প্রভাতে চলেছি আলোক-প্রভায়
শঙ্কিত পদে তিমির কাটায়—
সন্ধ্যা-অর্ঘ্য ঢালিয়া হেথায়
করিব শেষ সাগর-স্নান!
(আমি) সাধিয়া চলেছি জীবন-খেলায়
সাধিয়া দিই সকল দান॥

পঞ্চম দৃশ্য

সিংহলের রাজ-সভা

বৃদ্ধ সিংহলরাজ, সভাসদ্‌গণ, উপগুপ্ত, মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা ও সিংহলীয় সভাপণ্ডিত

রাজা—আমার সিদ্ধান্ত—বিচার হোক। বিচারে যদি আমার দেশের পণ্ডিতগণকে সদ্ধর্ম্মিগণ পরাস্ত করতে পারেন—যুক্তির দ্বারা বুঝাতে পারেন যে, তাঁদের ধর্ম্ম সত্যই রাজ্যের ও লোক-সমাজের সমধিক কল্যাণক্ষম—আমি সেই ধর্ম্মে স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। (উপগুপ্তের প্রতি)—আপনারা আপনাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

উপগুপ্ত—রাজন্, ধর্ম্ম অনুভবের বস্তু—বিচারের নয়। তর্কে, যুক্তিতে হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। তবু আমি প্রশ্নের যথাসাধ্য সদুত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার পক্ষীয় পণ্ডিতগণকে আমি প্রশ্ন করতে অনুরোধ করছি।

সভাপণ্ডিত—আমার প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন—বুদ্ধদেব ঈশ্বর স্বীকার করেন কিনা! তা' যদি তিনি স্বীকার না করেন, আপনাদের ধর্ম্ম নাস্তিকতারই পরিপোষক। এমন ধর্ম্ম কখনও মানব-সমাজের কল্যাণ করতে পারে না।

উপঃ—প্রভু বুদ্ধ কোথাও ঈশ্বর-তত্ত্ব অস্বীকার করেন নি। অবশ্য কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে তা স্বীকার করাও প্রয়োজন মনে করেন নি। আসল কথা, তিনি যুক্তি-তর্কের বাহিরেই তাঁকে রেখেছেন—কারণ, যুক্তি-তর্কে কোনও অলৌকিক তত্ত্বই যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সদ্ধর্ম্ম বলেন—অষ্ট আর্য্য সত্যের সাধনে আপনাপনিই অনুভূতির বিকাশ হয়। তখন যা সত্য, তাই-ই অনুভবের গোচর হয়। সদ্ধর্ম্ম এই জীবন-সাধনেই সমগ্র দৃষ্টি দিতে বলে। করুণা ও মৈত্রী এই সাধনেরই উপায়। ইহাই লোক-কল্যাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ নয় কি?

সভা পঃ—মহারাজ, ইনি প্রশ্ন ঘুরিয়ে, এড়িয়ে চলেছেন। আমরা চাই সরল সোজা উত্তর—তাঁরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী অথবা পরম নাস্তিক? (উপগুপ্তের প্রতি)—মহাশয়, যদি পারেন, এই প্রশ্নেরই স্পষ্ট সরল উত্তর দিন।

রাজা—যুক্তিযুক্ত কথা! মহাস্থবির, আপনাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করলে যদি ঈশ্বর-বিশ্বাস বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তাহা কিছুতেই শ্রেয়স্কর মনে করতে পারি না। উহা স্বভাবের হীন পরিণাম থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনারা বেদ-বিশ্বাসী নন?

উপঃ—অপৌরুষেয় তত্ত্ব—যুগে যুগে সত্যদ্রষ্টা মহাজনদের মুখ দিয়ে যাহা বাহির হয়, তাহা যদি বেদ হয়, আমরা বেদ-বিশ্বাসী। গ্রন্থ বেদ নয়, বেদ জ্ঞানস্বরূপ। ভগবান বুদ্ধ জ্ঞানের নূতন সত্য, নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করে' গেছেন। বুদ্ধ-বাণীকেই আমরা বেদবাণী বলে' মান্য করি।

সভা-পঃ—(রুখিয়া সগর্জ্জনে) নাস্তিক—ঘোর নাস্তিক! শূন্য-বাদী পাষণ্ড! মহারাজ, এই নাস্তিক্য-প্রচার অবিলম্বে নিরস্ত করুন। আর একদিনও যদি ইহারা প্রশ্রয় পায়, রাজসভা থেকে সংক্রামিত হ'য়ে, ইহা প্রজার

চিত্ত বিষাক্ত করবে—কলুষিত করবে। আপনি এই নাস্তিকদের দেশ থেকে দূর করে' দিন—বিতাড়িত করুন।

রাজা—মহাস্থবির, আর আপনাদের কিছু বলবার আছে?

উপঃ—ভারত-সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাশোক শান্তি-নীতির পক্ষপাতী। তাঁর একান্ত ইচ্ছা—আপনি শুধু আমাদের সঙ্ঘকে এখানে একটী কেন্দ্র স্থাপন করতে অনুমতি দিন। জীব-সেবাব্রতে এখানে তাঁরই পুত্র-কন্যা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বেশে আত্মোৎসর্গ করবেন। ইহাতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি থাকতে পারে না।

রাজা—আপনারা যদি নাস্তিক্য-মত-প্রচারে বিরত থাকেন, আমার তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই।

সভা পঃ—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—না, মহারাজ! প্রকাশ্য ধর্ম্ম-প্রচারে বিরত হলেও, ইহারা সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সমাজ-মন কলুষিত করতে চায়। ইহাদের ছলনা বুঝবেন—ইহারা প্রকারান্তরে আত্ম-প্রচারেরই সুযোগ অন্বেষণ করছে!

রাজা—জীব-সেবা কি উপায়ে আপনারা করতে চান?

উপঃ—(মহেন্দ্রকে দেখাইয়া)—ইনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আর ইঁহার ভগ্নী তপস্বিনী সঙ্ঘমিত্রা আর্ত্তের শুশ্রূষায় অতি সুনিপুণা, সিদ্ধহস্তা। আমরা এখানে প্রথমে একটী আরোগ্যশালা-নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

রাজা—ইহা যুক্তিযুক্ত কথা। আমি এই অনুমতি দিলাম।

(উত্তেজিত হৃদয়ে যুবরাজ কনকসিংহের প্রবেশ)

কনক পিতঃ, ক্ষান্ত হউন—এই প্রার্থনা। ধর্ম্মের ছদ্মবেশে ভারতসম্রাট্ সিংহলকে পদানত করতে চান। শান্তি-ময় অভিযান প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণার চেয়ে ভয়ঙ্কর। আমরা সিংহলবাসী প্রস্তুত—মৃত্যুপণে আমরা স্বাধীনতা-রক্ষা করব।

রাজা—যুবরাজ, রাষ্ট্রনীতির কূট রহস্যে তুমি সন্দিহান, ইহা অযথা নহে। কিন্তু আরও বৃহৎ দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আমায় বাধা দিও না। ভারতসম্রাটের সন্ধি-সূত্র লঙ্ঘন করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। মহাস্থবির, আপনাদের প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিয়েছি। আপনারা স্বচ্ছন্দে পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তে আমার রাজ্যে আরোগ্যশালা নির্ম্মাণ করতে পারেন।

(ভিক্ষুপক্ষ হইতে জয়ধ্বনি)

জয়, সিংহলেশ্বরের জয় হোক।

রাজা—সভাসদ্গণ, অদ্যকার সভাভঙ্গ করা হউক। মাননীয় অতিথিদের উত্তম বাস, উত্তম পরিচর্য্যার সুব্যবস্থা কর।

(উত্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরোগ্যশালা

শয্যাগত রোগিগণ, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা

১ম রোগী—উঃ, তেষ্টায় বুক ফেটে যায়—একটু জল দাও মা!

২য় রোগী—জল—জল!

(সঙ্ঘমিত্রা ও মহেন্দ্র উভয়ে জল দিতে দিতে)

মহেন্দ্র—সঙ্ঘমিত্রা, বিসূচিকার কি ভীম আক্রমণ! চিকিৎসাবিদ্যায় আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা আজ পর্য্যুদস্ত—সিংহলে আমায় পরাজয় স্বীকার করতে হল। মহামতি বুদ্ধের করুণা শুধু তোমার মধ্যে সেবা-রূপে সাফল্যমণ্ডিত। আমি কি করি সঙ্ঘমিত্রা!

সঙ্ঘমিত্রা—হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সিংহলের এই দুর্দ্দিনে স্বয়ং তথাগতই আমাদের প্রেরণ করেছেন। তুমি যদি চিকিৎসার ভার না নিতে, এই আরোগ্য-শালায় এমন সুব্যবস্থা না করতে, সিংহল আজ মৃত-স্তূপে পর্ব্বত সৃষ্টি করত। পূতিগন্ধে বিশ্বের বায়ু বিষাক্ত হত। আর অকৃতার্থই বা হয়েছে কোথায়? এই দেখ, এই কক্ষের গতায়ুঃ প্রায় সকল রোগীই আজ আরোগ্যের পথে!

(ধরাধরি করিয়া একজন মুমূর্ষুকে লইয়া কয়েক জন সেবকের প্রবেশ)

১ জন সেবক—মতিমান্, সিংহলের রাজপথে হঠাৎ রোগের আক্রমণে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে ইনি ছট্‌ফট্ করছিলেন। ইঁহার নাবালক পুত্র কাতর, রোরুদ্যমান। আপনি এর শীঘ্র ব্যবস্থা করুন।

মহেন্দ্র—চল, প্রাথমিক পরীক্ষাগারে নিয়ে চল। এখানে প্রথম আক্রান্ত রোগীর বীভৎস যন্ত্রণা-মূর্ত্তি দেখে' অন্যান্য রোগীরা সন্ত্রস্ত হবে। সঙ্ঘমিত্রা, তোমারও শ্রমের অন্ত নাই। (দূরে চাহিয়া) ঐ দেখ, কাতারে কাতারে রোগী বহন করে' জনস্রোতঃ আরোগ্যশালার পথে। জয় সিদ্ধার্থ! শক্তি দাও প্রভু, সেবার শক্তি দাও।

(নবাগত রোগীসহ মহেন্দ্রের প্রস্থান)

সঙ্ঘমিত্রা—(রোগীদের কাছে ঘেঁষিয়া) কেমন আছ তোমরা! তৃষ্ণা-নিবারণ হয়েছে?

১ম রোগী—হাঁ মা, আরাম পাচ্ছি। দেবী তুমি।

(কুমার কনকসিংহের প্রবেশ)

কনক—শাসনের শক্তি ধরি; কিন্তু দেবি, লোকসেবার অধিকার আমাদের নাই। কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে' যায়। যত সংশয় আজ হৃদয় দংশন করে—প্রায়শ্চিত্ত, যদি ক্ষমা কর দেবি!

সঙ্ঘ—কুমার, বৃথা সংশয়। ভারত তো সিংহলের শত্রু নয়। কলিঙ্গ-জয়ের পর, পিতা রাজ্যলিপ্সায় রক্ত-অসি আর কোষমুক্ত কর্‌বেন না—এ কথায় প্রত্যয় করুন।

২য় রোগী—মা, আর একটু জল!

কনক—তরবারি-ধারণের এ কর নিষ্ঠুর, কর্কশ—সেবার অধিকারে এ হস্ত পবিত্র হোক। দেবি, ঝারি আমার হাতে দাও। রোগীর মুখে আমি জল দেব। (ঝারি লইয়া, জল দিয়া) কঠোর ব্রত তোমাদের। কিন্তু ভারতসম্রাট্ অশোকের ইহার মধ্যে রাজ্যবিস্তারের অভিলাষ নাই—এ অতি আশ্চর্য্য কথা!

সঙ্ঘ—রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ভারত-সম্রাটের আছে। সে স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা নয়, ধর্ম্মস্পৃহা। তার অস্ত্র—হিংসা নয়, অহিংসা। মৈত্রী ও করুণায় ভারত-সম্রাট দিগ্বিজয়ী হতে চান।

কনক—সে কেমন করে' হবে দেবি! বীর্য্যহীন অহিংসা-ধর্ম্ম রাজ্য-শাসনে সমর্থ নয়।

সঙ্ঘ—অহিংসা বীর্য্যহীন নয়। হিংসা পশুবল; মানবতার ব্রহ্মাস্ত্র অহিংসা। সিংহলের এই মহামারী হিংসার বজ্রে কি দূর কর্‌তে পারেন?

কনক—কিন্তু এ শত্রু অলক্ষ্য। পররাজ্য আক্রমণের ভীম সেনাবাহিনী যদি সম্মুখীন হয়, মৈত্রী ও করুণা কি সেখানে কার্য্যকরী হবে?

সঙ্ঘ—অস্ত্রবল মানুষ একদিনে অর্জ্জন করে নি। কত দীর্ঘ দিন হিংসার সাধনে ইহা নরহত্যার পক্ষে কার্য্যকর হয়েছে। অহিংসারও একটা সাধন আছে। আজ তার সূচনা। সে দিন আস্‌বে—আজ এই আরোগ্য-শালায় অলক্ষ্য শত্রুকে সঙ্ঘবদ্ধ অকৃত্রিম সেবায় যদি নিরস্ত কর্‌তে পারি, একদিন আততায়ীর ভীম আক্রমণও সঙ্ঘবদ্ধ মৈত্রী ও করুণার শক্তি-প্রয়োগেই নিরস্ত্র কর্‌তে পার্‌ব। মানবতার এই সুমহান্ অভিযানে সিংহলের তরুণ প্রতিনিধি, আপনার সাহায্যতা কি প্রত্যাশা করতে পারি না?

কনক—সম্রাট্-দুহিতা, মানবতার অনুশীলন-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজ যে মহানুভবতার স্পর্শে আমায় প্রবুদ্ধ করেছ, আমি এই ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে চাই। কে আমায় দীক্ষা দেবে এই সুপবিত্র সাধনে?

সঙ্ঘ—ধর্ম্ম ও নিয়মের মূর্ত্তি তথাগতের প্রতিনিধি উপগুপ্তই আপনাকে দীক্ষা দেবেন। মানব-জীবন নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর—এই আরোগ্যশালায় যে অনন্ত করুণা-স্রোতঃ নেমে আসে, তথাগতের সেই প্রেমের অমৃতেই আপনি অভিষিক্ত হবেন।

কনক—সেবার বিঘ্ন হবে দেবি—এখন তাই বিদায় প্রার্থনা করি।

সঙ্ঘ—আমার আকৃতি ভুলবেন না। নমস্কার। (নমস্কার)

(নমস্কারান্তে কনকসিংহের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

সিংহলরাজ, প্রসেন

রাজা—যুদ্ধের চেয়ে ভীষণ—যুদ্ধের চেয়ে নিষ্ঠুর! এত নর-মৃত্যু আর কখনও দেখিনি! এই দুঃসময়ে যদি মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাদের সেবাহস্ত এসে না পড়ত, কত অধিক বিপন্ন হতুম, তা চিন্তারও অগোচর। এখন দেখছি—বিধাতার দানরূপেই এরা সিংহলে এসেছিল।

আমার অন্তরগত ধারণার পরিবর্ত্তন হচ্ছে—ধীরে ধীরে যেন নূতন আলো চক্ষে ফুট্‌ছে!

প্রসেন—কিন্তু সিংহলের অজ্ঞতা এই আশীর্ব্বাদকেই অভিশাপরূপে মনে করছে—তা কি আপনি জানেন? চর-মুখে এই মাত্র সংবাদ পেলুম—একদল সিংহলবাসী ষড়যন্ত্র করে' এই নূতন সেবক-সেবিকাদের হত্যা করতেও প্রস্তুত হয়েছে। তাদের ধারণা—দেশের এই মহামারীর মূলে নব-ধর্ম্মেরই আগমন!

রাজা—হত্যা করতে প্রস্তুত? কে? কারা? কেন? এ কুসংস্কার ঘোরতর অসত্য—অবিচার! অকৃতজ্ঞতার মহাপাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে, প্রসেন। হত্যার কি ষড়যন্ত্র তারা করেছে—জান?

প্রসেন—শুনেছি, আজই রাত্রে তারা আরোগ্যশালায় অগ্নি-সংযোগ করা স্থির করেছে।

রাজা—অগ্নি-সংযোগ! আজ রাত্রেই? এ খবর পেয়েও তুমি এখনও নীরব, নিথর, নিশ্চিন্ত আছ? চল—এই মুহূর্ত্তে আমরা সশস্ত্র অভিযানে গিয়ে পাপাত্মা দস্যুদের নিপাত করি।

(বেগে সুশান্তের প্রবেশ)

প্রসেন—কি নূতন সংবাদ সুশান্ত?

সুশান্ত—নগরবাসীরা আরোগ্যশালা আক্রমণ করতে ছুটেছে! নগরপাল তাদের শান্ত করতে পারছেন না! ভিক্ষুণীর জীবন-সংশয়! ঐ দেখুন—উন্মাদ জনতা এই দিকেই কাকে যেন টেনে নিয়ে আস্‌ছে!

(মূর্চ্ছিতা রক্তাক্তা সঙ্ঘমিত্রার দেহ বহন করিয়া কনক প্রভৃতির প্রবেশ—সঙ্ঘমিত্রাকে অতি ধীরে যত্নে পালঙ্কে স্থাপন)

কনক—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লেই সব শেষ হয়ে যেত! এই স্বর্ণ-প্রতিমা নরপিশাচদের দ্বারা দলিতা, নিষ্পেষিতা হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যেত অনন্তের বুকে! পিতঃ, দেখুন, দেখুন—এখনও ইনি জীবিতা আছেন কিনা!

রাজা—(সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া) সঙ্ঘমিত্রা! সঙ্ঘমিত্রা!

(সঙ্ঘমিত্রা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল)

সঙ্ঘ—উঃ—মাথায় বড় যন্ত্রণা!

(রাজা মাথায় প্রলেপ লেপন করিলেন—প্রসেন ব্যজন করিতে লাগিল)

সঙ্ঘ—জল!

(স্বর্ণভৃঙ্গারে সুবাসিত জল কনক আগাইয়া দিল, রাজা তার মুখে ঢালিলেন)

সঙ্ঘ—আঃ—একটু সুস্থ হলেম (সম্মুখে তাকাইয়া) কোথায় আমি!

রাজা—প্রাসাদে মা—আমি সিংহলরাজ!

সঙ্ঘ—মহারাজ, যুবরাজ কোথা?

কণক—দেবি, এই যে আমি!

সঙ্ঘ—হিংসার রক্ত-তরঙ্গে সিংহলের নবধর্ম্ম-গ্রহণের ইহা উৎসব-সূচনা। কুমার, প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন।

কনক—পিতঃ, আমি তথাগত বুদ্ধের শরণ-প্রার্থী।

রাজা—উত্তম কথা কনকসিংহ। সিংহল-রাজ্য আজ থেকে সম্রাট্ অশোকের অখণ্ড ধর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হোক।

সঙ্ঘ—তবে বলুন যুবরাজ—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

কুমার—(নতজানু হইয়া, মুদিত নেত্রে ত্রিমন্ত্র উচ্চারণ করিল)

(উপগুপ্ত ও মহেন্দ্রের দ্রুত প্রবেশ)

মহেন্দ্র—কৈ—কোথায় সঙ্ঘমিত্রা!

সঙ্ঘ—আমি নিরাপদ—সিদ্ধার্থের আশ্রয়ে। কুমার আজ তথাগতেরই আশ্রয়-প্রার্থী। হে আচার্য্যদেব, আপনি তাঁকে দীক্ষাদান করুন।

উপ—তথাগত স্বয়ং করুণার মূর্ত্তি ধরে' কুমারকে বরণ করে' নিয়েছেন—সকলে বল—

সকলে— ধম্মং শরণং গচ্ছামি
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

রাজা—হে মহামতে, শুধু কুমার নয়, আজ সমগ্র সিংহল-বাসীর সহিত আমিও আর্ত্তকণ্ঠে শ্রীবুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করি।

উপগুপ্ত— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামঃ
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামঃ
ধম্মং শরণং গচ্ছামঃ

সকলে—(পুনরুচ্চারণ করিল)।

যবনিকা

জৈনগ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা

শ্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য

জৈন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই হইত না, যদি ডাঃ ভাণ্ডারকর, ডাঃ পিটার্সন্, ডাঃ বুলার প্রভৃতি মনীষিগণের বহু তথ্যপূর্ণ রিপোর্টগুলি বাহির না হইত, সেই রিপোর্টগুলি হইতে আমরা জৈনসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারি। জৈনগণ যে কেবল অহিংসা নিয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে—সাহিত্য ১, স্থাপত্য ২, ন্যায় ৩, সংস্কৃতি ৪ ইত্যাদিতেও তাঁহারা জ্ঞান এবং সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষতা যে কেবল তৎকালেই ছিল, তাহা নহে; আজ পর্য্যন্তও তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে।৫

মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হইয়া জৈনগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, এই জন্য সমস্ত গ্রন্থগুলি মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিয়া দেন।৬ তাহাতে অনেক অমূল্য গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলমান আক্রমণের ভয় দূরীভূত হওয়া সত্ত্বেও সেই সংস্কার এখনও দূরীভূত হয় নাই। এখনও জৈন মন্দিরগুলিতে বিস্তর প্রাচীন পুঁথি আছে, সেই সমস্ত প্রাচীন পুঁথির ভিতরে কি আছে, তাহা দেখাইতে এখনও অনেক মঠাধ্যক্ষ সঙ্কোচ বোধ করেন।৭ এই দুই কারণে জৈন গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মনীষিগণ আশানুরূপ গবেষণা করিতে পারেন নাই। কাজেই হিন্দু গ্রন্থের বা বৌদ্ধ গ্রন্থের যত দূর সমাদর হইয়াছে, জৈনগ্রন্থ তত দূর সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই।

সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট "পূর্ব্ব"গুলি উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সকল পুব (পূর্ব্ব) হইতে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় অঙ্গগ্রন্থগুলি সম্পাদন [illegible] সূত্র গ্রন্থে এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ আছে।৮ কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত "পূর্ব্ব"গুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, কারণ সেগুলি এখন একেবারে লুপ্ত। তাহাদের নাম অবশ্য পরম্পরা আমাদের কাছে আসিয়াছে, তাহা এই:—

(১) উৎপাদ, (২) অগ্রায়ণী, (৩) বীর্যপ্রবাদ, (৪) অস্তিনাস্তি প্রবাদ, (৫) জ্ঞানপ্রবাদ, (৬) সত্যপ্রবাদ, (৭) আত্মপ্রবাদ, (৮) কর্ম্মপ্রবাদ, (৯) প্রত্যাখ্যানপ্রবাদ, (১০) বৈদ্যানুপ্রবাদ, (১১) অবন্ধ্য, (১২) প্রাণায়ু, (১৩) ক্রিয়াবিশাল, (১৪) লোকবিন্দুসার।৯

লিখন রীতি (art of writing) খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে বা পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।১০ কিন্তু তার

---

(১) সাহিত্য সম্বন্ধে এক কথায় কিছুই বলা যায় না। অলঙ্কার শাস্ত্রে "কলিকাল সর্বজ্ঞ" হেমচন্দ্র সুরির অনেক উপাদেয় গ্রন্থ আছে। হাল প্রণীত সপ্তসই দাম্পত্যপ্রণয়বিষয়ক মহাকাব্য। হালই নাকি প্রাকৃত ভাষার প্রথম কবি। "সংস্কৃতে আদ্যকবির্বাল্মীকিঃ, প্রাকৃতে শালিবাহনঃ (শালিবাহন=হাল), ভাষাকাব্যে পিঙ্গলঃ—" প্রাকৃত পিঙ্গলে লক্ষ্মীনাথ ভট্ট এইভাবে বলিয়াছেন। এই বিষয়ে পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তৃত লিখিবার ইচ্ছা আছে।

(২) "Hindu art including Jaina and Buddhist in the comprehensive term, is the real Indian art"—V. A. Smith's "History of Fine Arts in India and Ceylon". এবং "The Earliest Jaina architects seem to have used wood as their chief building material." Mrs. Sinclairএর "Heart of Jainism" দ্রষ্টব্য।

(৩) ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "History of Indian Logic" দ্রষ্টব্য।

(৪) জৈন দর্শনের "স্যাদ্বাদ" একটী স্তম্ভ বিশেষ। স্যাদ্বাদের যুক্তি অখণ্ডনীয়। হিন্দুদার্শনিকেরা এই বাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মতকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই মতকে অনেকে "Intellectual ahimsa" বলে থাকেন। (Indian Philosophical Congress Benares session).

(৫) গুজরাটই জৈনধর্মের প্রধান ঘাঁটি (stronghold)—মহাত্মা গান্ধীর "অহিংসা প্রতিরোধ" জৈনের অহিংসা নীতি দ্বারাই প্রভাবান্বিত। গুজরাটে হিন্দু এবং জৈনদের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান প্রদান আছে।

(৬) Barodia—History and literature of Jainism পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য।

(৭) "—It is for the first time in the history of Patan Bhanders that Mss. were lent to scholars living outside the walls of the ancient capital of Gujrat and I feel it a great honour to have been the first recipient of this favour—" Preface. Vaidya's Nyayavatara দ্রষ্টব্য।

(৮) Sacred books of the East series vols. XXII এবং XLV দ্রষ্টব্য।

(৯) Epitome of Jainism—Nahar & Ghosh. ৬৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১০) "The alphabet which the Phoenicians and Aramaeans (Ancient Palestine) invented has had a

পূর্ব্বে লেখার প্রচলন না থাকায় এইগুলি উপদেশ পরম্পরায় একজনের মুখ হইতে অন্য একজনের মুখে আসিতে লাগিল, তাহাতে বিষয়বস্তুগুলি অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়। কাজেই এইগুলিকে যথাযথভাবে রক্ষা করিবার জন্য আচার্য দেবর্দ্ধিগণের সভাপতিত্বে বলভিতে (বর্তমান গুজরাট) একটী বিরাট্ সঙ্ঘ আহ্বান করা হয়। সেই সঙ্ঘে এই স্থির হয় যে, সভাপতি সমস্ত উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ করিবেন। তদনুযায়ী উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হইতে থাকে, তাহা প্রায় ৪৬৬ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সঙ্কলিত গ্রন্থগুলিই বর্তমান জৈন ধর্ম গ্রন্থের মূলস্বরূপ।১ মথুরাতেও স্কন্দিলাচার্য কর্তৃক অনুরূপ একটী সূত্রগ্রন্থের সঙ্কলন হয়, তাহার নাম "মাথুরী বাচন" (Mathuri redaction).

জৈন-ধর্ম গ্রন্থের কতকগুলি গ্রন্থ যে খুব প্রাচীন তাহা, অনেক জ্ঞান-প্রবীণ স্বীকার করিয়াছেন।২ এই ধর্মগ্রন্থগুলিকে "আগম" বা "সিদ্ধান্ত" বলা হয়। তাহাদের সংখ্যা কম পক্ষে ৩৫ এবং নিম্নলিখিত-ভাবে বিভক্ত।

(১) একাদশ অঙ্গ, ২। দ্বাদশ উপাঙ্গ, ৩। চতুর্মূলসূত্র, ৪। [illegible] ছেদসূত্র, ৫। দশ প্রকীর্ণক। ৬। চুলিকাদ্বয়।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও জৈনদের নিগম বা উপনিষদ্ গ্রন্থও আছে। [illegible]লির সংখ্যা প্রায় ৩৬।

১। উত্তরারণ্যক, ২। পঞ্চাধ্যায়, ৩। বহ্বৃচ, ৪। বিজ্ঞানঘনার্ণব, ৫। বিজ্ঞানেশ্বর, ৬। বিজ্ঞানগুণার্ণব, ৭। নবতত্ত্বনিদাননির্ণয়, ৮। তত্ত্বার্থনিধি রত্নাকর ইত্যাদি।৩

জৈন সূত্রগুলির চার প্রকারের ব্যাখ্যা বিদ্যমান। ১। টীকা, ২। নির্যুক্তি, ৩। চূর্ণি ৪। এবং ভাষ্য। সূত্রগুলি সমস্তই প্রাকৃতে লিখা। হেমচন্দ্র তাহার অষ্টাধ্যায়ীতে "আর্ষম্" ৪ এই বলিয়া একটী সূত্র পাঠ করেন। তাহার ব্যাখ্যা হইতে অনেকে মনে করেন যে, সূত্রগ্রন্থগুলির ভাষার জন্যই তিনি এই সূত্র লিখিয়াছেন। সে যাহা হউক, সূত্রগ্রন্থগুলি যে প্রাকৃতের ৫ কোন ভাষায় লিখিত, সেই সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ আছে এবং অনেকে বলেন যে, তাহা অর্ধমাগধীতে লিখিত।৬ পূর্বোক্ত চারি প্রকার ব্যাখ্যার সহিত যদি মূল সূত্রগুলি যোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে "পঞ্চাঙ্গী সিদ্ধান্ত" বলা হয়। হরিভদ্র সূরি অভয়দেব সূরি প্রভৃতি এইরূপ পঞ্চাঙ্গীসিদ্ধান্ত লেখক।"

পাটলীপুত্রে পুনঃ যে সঙ্ঘ আহ্বান করা হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন ভদ্রবাহু।৭ পূর্বোক্ত সূত্রগ্রন্থগুলি সঙ্কলন করাই এই সঙ্ঘের মহান্ উদ্দেশ্য ছিল। ভদ্রবাহু তদনুযায়ী কল্প সূত্র সঙ্কলন করেন। এই কল্পসূত্র বিস্তৃত দশশ্রুত গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের নবম বিভাগের অন্তর্গত। এই কল্পসূত্র গ্রন্থখানি জৈনধর্মের অতিশয় প্রমাণ গ্রন্থ। এবং চাতুর্মাস্যে "পর্য্যুপাসন ৮ উৎসবে খুব ধুমধামের সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

জৈনদের মধ্যে মোটামুটি দুইটা বিভাগ আছে। একটী শ্বেতাম্বর ও অন্যটী দিগম্বর। দর্শন শাস্ত্রে দিগম্বরগণ অতিশয় ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন। তাহা দ্বারা বুঝা যায় না যে, শ্বেতাম্বরেরা এই বিষয়ে তত দেখান নাই, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্বেতাম্বরদের দর্শন গ্রন্থগুলি অনেক নষ্টপ্রায়। দিগম্বরদের গ্রন্থগুলি বেশীর ভাগ বিদ্যমান। প্রমেয়কমলমার্তণ্ড, সম্মতিতর্ক প্রভৃতি উভয় সম্প্রদায়ের আচার্য প্রণীত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আরও লিখিতে বাসনা রহিল।

triumphant march as a means of commercial and intellectual intercourse amongst various peoples. The Babylonians forced by this movement westward into the proximity of Egypt and ancient civilization of Asia Minor knew how to impose their script upon the whole of the near East. Hebrews and Arabs are Semiti people"—Literary Hebrew and more popular Aramaic dialet.

(১) Epitome of Jainism—Nahar & Ghosh ৬৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) প্রফেসর জেকবী বলেন, "Regarding their antiquity many of these books can vie with the oldest books of the Northern Buddhists—S. B. E. দ্রষ্টব্য।

(৩) অনুসন্ধিৎসু পাঠক নামগুলি আকর গ্রন্থ হইতে দেখিয়া লইবেন। সুবিধা হইলে, পরবর্তী সংখ্যায় সেইগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

(৪) সিদ্ধ হেমচন্দ্র ৮।১।৩, ৮।১।৪৬, ৮।১।৫৮, ৮।১।৭৯, ৮।১।১১৮, ৮।১।১২১, ৮।১।১৫১, ৮।১।১৯৭, ৮।১।২২৮, ৮।১।২৫৪, ৮।২।১৭, ৮।২।২১, ৮।২।৮৬, ৮।২।১০১, ৮।২।১০৪, ৮।২।১৪৬, ৮।২।১৭৪, ও ৮।২।১৬২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৫) মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী শৌরসেন্যর্ধমাগধী
বাহ্লীকি, মাগধী চৈব ষড়েতে দাক্ষিণাত্যজাঃ॥
ব্রাচণ্ড লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্বারাবন্ত্যপাঞ্চাল টাক মালবকৈকয়াঃ॥
গৌড়োড্র দৈব পাশ্চাত্য পাণ্ড্যকৌন্তলসিংহলাঃ।
কালিঙ্গপ্রাচ্যকার্ণাটকাঞ্চ্য দ্রাবিড়গৌর্জ্জরা॥
আভীরমধ্যদেশীয়ঃ সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশাঃ বৈতালাদিপ্রভেদতঃ॥

শেষচন্দ্র কর্তৃক প্রাকৃত চন্দ্রিকা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭ সন দ্রষ্টব্য।

(৬) "The language of the Jaina Sutras is called Ardhamagadhi—" Woolner, Introduction to Ardha Magadhi Dictionary. পৃঃ V. এবং "Arsa and Ardha Magadhi are identical......" Pischel's Prakrit grammar section 17 দ্রষ্টব্য।

(৭) "Heart of Jainism" Mrs. Sinclair দ্রষ্টব্য।

(৮) পর্য্যুপাসন—"সেবা, ভক্তি, উপাসনা......অভয়দেব কর্তৃক লিখিত পঞ্চাশক ১০।৩৪ দ্রষ্টব্য" মুনি শ্রীরত্নচন্দ্রজীমহারাজ কর্তৃক লিখিত অর্ধমাগধী কোষে উদ্ধৃত।

জাপান-ভ্রমণ

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

সাগর-পাড়ী দিবার আকৈশোরের স্বপ্ন শেষ পর্য্যন্ত সফল হল। ৬ই এপ্রিল (১৯৩৯) "এস, এস তালামা" জাহাজ খিদিরপুর ১২নং জেটি হতে ছাড়বে। মাসাধিক পূর্ব্বেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বার্থ বুক করলাম। উপলক্ষ —বিভিন্ন মেশিনারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞতার্জ্জন এবং জাপানী ফার্ম্মগুলির সহিত মেশিনারী-ব্যবসা সম্পর্কীয় পূর্ব্ব সম্বন্ধের দৃঢ়ীকরণ ও নূতন সম্পর্ক-স্থাপন।

বৎসরাধিক কাল হতেই জাপান-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। জাপান-প্রত্যাগত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং জাপান-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ও প্রকাশিত লেখা সাগ্রহে পাঠ করি। বিশেষভাবে, 'প্রবাসীতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত শান্তা দেবীর জাপান-ভ্রমণ আমার খুব ভাল লাগতো এবং উৎসাহ দিত।

"প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের" কার্য্যব্যপদেশে ভারতের বহু স্থানে আমাকে প্রায়শই ভ্রমণ করতে হওয়ায় যাত্রার প্রাথমিক আড়ষ্টতা আমার একরূপ ছিল না বললেই হয়। কিন্তু জাপান-যাত্রার দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই কেমন যেন একটা অহেতুক অবসাদে ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। দীর্ঘ বাৎসরিক প্রস্তুতির যে সংস্কার, তাহারই ফলে যেন এই নিরুৎসাহ দেহটা না-বুঝে মুখস্থর মতই প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কেনা-কাটা করতে লাগলো। আমার সহকর্ম্মী ও সঙ্ঘভাইদের আন্তরিক প্রযত্ন ব্যতীত এটা হয়তো বহুলাংশেই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। যাত্রার দু'দিন পূর্ব্বে সঙ্ঘের চন্দননগর ও কলিকাতা-কেন্দ্র হতে আমায় অভিনন্দন দেওয়া হল। এই সানন্দ আড়ম্বরে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম মদীয় ইষ্টদেব পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায় আমার গলে জয়মাল্য ও ললাটে জয়টীকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করলেন। নিঃসঙ্গ ও লৌকিক সম্বন্ধবর্জ্জিত হয়ে জীবনের দীর্ঘ আঠারোটি বর্ষ তাঁরই অসীম অহেতুক স্নেহচ্ছায়ায় নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় কেটেছে। তিনি হাসি-মুখে সগর্ব্বে মুক্তি দিলেন বিশ্বমানবের কণ্টকিত কোলাহলপূর্ণ হাটে। আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এতদিন খতিয়ে দেখিনি। দেখার অবসরও আসেনি। একটা নীরস নিরুপায়তার মাঝে ডুবে গেলাম। ডাঃ কালিদাস নাগ ভারতের অতীত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির গরিমা ও দায়ভার বহনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। এক দিকে সহকর্ম্মীদের অজস্র আন্তরিক ভরসা ও শুভেচ্ছা, অপরদিকে অজানা অনাত্মীয় দেশ-গমনের ভীরু আশঙ্কা। একবারে ভেঙ্গে পড়লাম।

প্রিয়জনবেষ্টিত হয়ে ৬ই এপ্রিল বেলা চারটেয় খিদিরপুর ডকে পৌছলাম। সম্মুখে অপেক্ষমাণ 'তালামা' জাহাজ। ব্যস্ত-সমস্ত যাত্রীদের ত্রস্ত গমনাগমন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রথম অনুভব করলাম। মনের আকাশের ঘনীভূত মেঘ খানিকটা কাটলেও, আপন জনের আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায় অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো। দিনের আলো নিভে এল। সাঁঝের ঘোরে আলিঙ্গন অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বন্ধুরা বিদায় নিলেন। অকারণ আঁখি-কোণ সিক্ত হয়ে উঠলো। অবশিষ্ট তিন জন শেষ পর্য্যন্ত আমায় খাইয়ে ও নানারূপ সান্ত্বনা দিয়ে উঠলেন। কম্পিত চরণে ডেক পর্য্যন্ত এগিয়ে এলাম। উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, আঁধারের বুকে আলোর মালা। অদূরে ম্রিয়মাণ চিরপরিচিত কলকাতা সহর। অশ্রুর বন্যায় অন্তর আপ্লুত নির্লিপ্ত উদাসীন চিত্ত। নিঃসম্পর্কের অহেতুক সম্বন্ধের নিবিড়তার এত স্পষ্ট স্পর্শ —আত্মার এক অভিনব অনুভূতি এই সর্ব্ব প্রথম অনুভব হল। বিদায়মান বন্ধুত্রয় আঁধারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। উদ্গত অশ্রু চেপে কোন রকমে কেবিনে ফিরলাম অবসন্ন দেহ এলিয়ে পড়ল অনভ্যস্ত শয্যা'পর।

ঘুম থেকে জেগে বুঝলাম—জাহাজ চলছে। কেবিন হতে বাইরে আসতেই প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ অভিনন্দনে

মন-প্রাণ-সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠলো। নিজেকে নিজের মধ্যে যেন ফিরিয়ে পেলাম। গঙ্গাবক্ষ বাহিয়া মন্থর-গতিতে জাহাজ চলেছে। জোয়ার ধরিয়া জাহাজের চলা। পূর্ব্বপরিচিত পরিবেশ কৌতূহল জাগায় না। শুধু ভাবি, কখন সমুদ্রে পৌছব।

পরদিন সকালে বারতলা হতে জাহাজ পূর্ব্বাভিমুখে গতি নিলে। ডায়মণ্ডহারবারের মাইল কুড়িক ভাঁটিতে এই বারতলা। এখান হতেই ভাগীরথী বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগরসঙ্গমে মুক্তি পেয়েছে। মোহনার যোজনব্যাপী বিস্তৃতির ইতস্ততঃ সবুজ-ঘন দ্বীপগুলো মাথা উঁচু করে' মাটির সংলগ্নতা রক্ষা করার যেন ব্যর্থ প্রয়াস করে' চলেছে। পশ্চাতে ২৪ পরগণা ক্রমশঃ পিছনে হটে যাচ্ছে। গঙ্গার প্রধান স্রোতঃ ধরে' জাহাজ পশ্চিমমুখী চলেছে। উত্তরে [illegible]নীপুর জেলা; দক্ষিণে দ্বীপের ফাঁকে ফাঁকে বঙ্গোপসাগরের অসীমতার আভাস। দূরে অস্পষ্ট জম্বুদ্বীপ; সাগরদ্বীপের পাশ ঘেঁষে কয়েকটা বাঁক ঘুরতেই বঙ্গোপসাগরের উদার মহিম্ন-মাধুরী কৌতূহলী নয়নের সামনে নগ্নবিস্ময় নিয়ে দেখা দিল। বেলা তখন তিনটা।

গঙ্গা ও সাগর যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছে, সেখানটায় চোখে পড়্ল — খানকয়েক জাহাজ পাইলট জাহাজের সামনে ঘাঁটি আগ্‌লে নঙ্গরাবদ্ধ রয়েছে। মোচার খোলার মতই 'তালামা' ঢেউয়ের তালে তালে অনন্ত যাত্রা করলে সুরু। সম্মুখে, ডাহিনে, বামে কূলকিনারা-হীন জলরাশি। পশ্চাতে দ্বীপ, ভূখণ্ড, জলময় অবকাশ ক্রমে মিলেমিশে একটানা বঙ্কিম একটা কালো রেখায় পরিণত হল। তারই উপরে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভা। পারগামী এক ঝাঁক পাখী দ্রুত উড়ে' চলেছে। অপেক্ষমান ষ্টীমারের উদ্গীরিত মসীঘন ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের বুকে একটা কলঙ্ক রেখা এঁকে দিচ্ছিল। সব কিছু মিলিয়ে মনের উপর অননুভূত একটা মায়ার পরশ বুলিয়ে গেল। ব্যষ্টির মমত্ব-সজাগতা অখণ্ড বঙ্গজননীর মধ্যে ডুবে একটা নূতন রূপ নিল। আমার শ্যামল বাংলা মায়ের দূরে অতি দূরে দৃশ্যমান অস্পষ্ট কুয়াশাময় শ্যাম রেখার উদ্দেশ্যে আপাদমস্তক আপনা হতেই নত হয়ে এল। কতক্ষণ আঁখি মুদিয়া ছিলাম জানি না। চক্ষুরুন্মীলন করে' দেখি, সব মিলিয়ে গেছে ঘনায়মান আঁধারের মাঝে। শুধু আঁধার আর আঁধার এবং তারই বুকে বিকট শব্দ করতে করতে একটা দৈত্য যেন চলেছে অজানা এক উদ্দেশ্যে। অসাড় চিত্ত-মন নিয়ে ফিরে এলাম কেবিনে। 'তালামা'র বিরামহীন গতি।

দিন রাত একঘেয়ে চলার মাঝে গতিটুকুই বৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখে। কেবল সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, জল আর জল; দিক্‌চক্রবাল - আবরিত মাটি - বৃক্ষহীন একটা অস্বস্তিকর আবেষ্টনী। নিত্যনৈমিত্তিক স্বভাবসংস্কারবশে তাই দৃষ্টি পড়ে জাহাজের অভ্যন্তরে। সে ব্যবস্থাও সুন্দরই আছে। মন চায় জীবন্ত মানুষের সঙ্গ। পরে পরে পরস্পরে আলাপ-পরিচয় তাই সহজেই উঠে জমে'। দিন কাটাবার জন্য পড়বার গ্রন্থাগার, সাঁতার কাটার পুষ্করিণী, রেডিও, খেলাধুলা এবং সঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে। জাহাজের ডাক্তার বাবু বাঙ্গালী—কলিকাতায়ই বাড়ী। তাঁর ঘরে একটি দামী রেডিও মেশিন আছে। পৃথিবীর যে কোন স্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব শীগ্‌গীরই জমে উঠলো। তা' ছাড়া মৈমনসিংহ হতে একটি বাঙালী ছাত্র (মিঃ বর্ম্মণ) জাপানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং (Kriyo University) পড়তে যাচ্ছিলেন। যাত্রীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দশ জনই ইউরোপীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২১ জনের মধ্যে ৪ জন পুরুষ, বাকী সবই স্ত্রীলোক। পুরুষ চার জনের মধ্যে আমরা দুইজন বাঙালী আর দুইজন পাঞ্জাবী। এঁরা মিলিটারী অফিসার—ফৌজ সহ হংকং চলেছেন। মিঃ বর্ম্মণ দ্বিতলের এক কেবিনে থাকেন, আর আমি থাকি তিন তলার একটি কেবিনে। তিন তলার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরুষ একা আমি, আর বাকী প্রায় সব কেবিনগুলোই মেয়েদের দ্বারা অধিকৃত।

১১ই এপ্রিল প্রাতে জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে পৌছিল। রেঙ্গুনে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-কেন্দ্রের পার্শ্বনাথদা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমায় নিয়ে গেলেন। জাহাজে ক'দিন অনভ্যস্ত রান্না ও খাবারে অরুচি ধরে' উঠেছিল। নিরামিষ আহারের জন্য আমায় আরও বেশী বেগ পেতে হয়েছিল। দুধ-পাঁউরুটি আর আধসিদ্ধ আলু-কপির একঘেয়েমী

অভিভূত করে' তুলেছিল। পার্শ্বনাথদার অকপট স্নেহমাখান প্রচুর দেশীয় ভোজনোপকরণের সদ্ব্যবহার তাই অপরিসীম তৃপ্তি দিল। রেঙ্গুন সহর ঘুরে' দেখলাম। রামকৃষ্ণ মিশন, বিশেষতঃ মিশন-হাঁসপাতাল বাঙালীর অতুলনীয় সুশৃঙ্খল সেবা-নিদর্শন। বর্ম্মা প্যাগোডার দেশ। দুইটী প্যাগেডা দেখবার সুযোগ হয়েছিল। বড় প্যাগোডায় দেখলাম—সিংহাসনোপবিষ্ট একজন শ্রমণ ধর্ম্মবক্তৃতা দিচ্ছেন। বিশৃঙ্খল শ্রোতার দল (অধিকাংশই মহিলা) বিচিত্র ভঙ্গীতে বসে' কেউ হাই তুলছে, কেউ আলস্য ভাঙ্গছে। একটা নেশার আমেজে যেন অধিকাংশই আচ্ছন্ন। হয়তো পরাধীনতার অভিশাপ! পাদুকা সহ প্রবেশ-নিষেধ। ইহার পরে বুদ্ধ-ধর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভ এই প্যাগোডা স্বাধীন জাপানেও দেখেছি। বর্ম্মা-প্যাগোডার অমূল্য ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তুল্য না হলেও, শৃঙ্খলা ও প্রাণ প্রাচুর্য্যে উহা উদ্দীপ্ত। মন্দিরের অভ্যন্তরে (গর্ভমন্দিরে অবশ্য যাইনি) সপাদুকা প্রবেশ করতে বাধা সেখানে পাইনি। নেতৃবৃন্দের সামরিক সুশৃঙ্খলা, ভঙ্গি-সাম্য, গভীর মনোযোগ স্বাধীন জাতির বৈশিষ্ট্যেরই জ্ঞাপক।

রেঙ্গুন ত্যাগ করে' ক্রমাগত তিনদিন জাহাজ চলবার পর ১৭ই এপ্রিল পিনাং বন্দরে জাহাজ ভিড়লো। প্রতীচীর সাধারণ সহরগুলির মতই পিনাং বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত এবং নোংরা। দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে শুনলাম, এখানে নাকি একটা সাপের মন্দির আছে। লোক এখানে সাপ ছেড়ে' দিয়ে যায় এবং সাপগুলো মন্দিরাবেষ্টনীর পূত আব্‌হাওয়ায় অহিংস হয়ে উঠে, মানুষকে কামড়ায় না। আমার কিন্তু সময়াভাবে তা' আর পরীক্ষা করা হয়ে উঠেনি।

পিনাং ছেড়ে দিনরাত জাহাজ চলবার পর ১৯ এপ্রিল সিঙ্গাপুর পৌছলাম। পথিমধ্যে রেডিওতে মাজদিয়ার মর্ম্মান্তিক রেল-দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে মনটা আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

সাগর বেঁধে বন্দরটি নির্ম্মিত। চারিদিকে পাহাড়। স্নিগ্ধ সবুজের মেলা। গগনচুম্বী নারিকেল-বৃক্ষশ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য। শুনলাম, উত্তর ভারতের হিমগিরিমালা সমগ্র প্রাচ্য পরিক্রমণ করে' ব্রহ্ম হয়ে এই সিঙ্গাপুরে এসে শেষ হয়েছে। এখান হতেই ভারত-মহাসাগরের শেষ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সুরু। দুইটি স্রোতোধারার সম্মেলনস্থল-হেতু সিঙ্গাপুর বন্দরটির সামরিক প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। মালয়ার অন্তর্বর্ত্তী সিঙ্গাপুর দ্বীপটির বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থান এমনি যে, এই দুই মহাসাগরের স্রোতোবেগ পরিহার করতে গিয়ে, প্রত্যেক পূর্ব্ব ও পশ্চিম-গামী জাহাজের পক্ষে সিঙ্গাপুর বন্দরের আশ্রয় অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। এই ষ্ট্র্যাটাজিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই ইংরাজ এখানে প্রকাণ্ড নৌ-বন্দর (Naval Yard) এবং

আদিম মালয়-সুন্দরী

উড়োজাহাজের ঘাঁটির (Civil and Military Air-plane base) পত্তন করেছে। জাহাজ ভিড়তেই তাই প্রথমেই চোখে পড়ে অদূর পাহাড়ের উপরে ফোর্ট, মিলিটারী ব্যারাক এবং বন্দরে সারি সারি সজ্জিত যুদ্ধজাহাজ।

ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে আলাপ করছি, এমন সময়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম° মিঃ অমিয় চ্যাটার্জি। সিঙ্গাপুর মিউনিসিপালিটির স্যানিটারী ইনস্পেক্টারের

কাজ ১৫।১৬ বৎসর করছেন। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। অনেক আলাপ হল। নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

বিকেল বেলা নিজের মটরে আমাকে, ইলেট্রিক ইঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তার বাবুকে নিয়ে অমিয়বাবু বেড়াতে বেরুলেন। প্রায় সমগ্র সিঙ্গাপুর সহরটি ঘুরে' দেখলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। প্রশস্ত রাস্তা। বৈদ্যুতিক আলো, জলের এবং আধুনিক সহরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণের সুব্যবস্থা আছে। রাস্তার দু'ধারে সুসজ্জিত সুবৃহৎ হর্ম্ম্যরাজী। চীন, জাপান, মালয়, কোরিয়া, শ্যাম প্রভৃতি বিচিত্র জাতির লোক-সমাগম এখানে দৃষ্ট হয়। সমগ্র সহরটির আব্‌হাওয়া উৎকট কর্ম্মব্যস্ততায় পূর্ণ। জীবনের এই বিরামহীন বহির্মুখী গতি আধুনিক সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ। দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য র‍্যাফেল্‌স্ মিউজিয়ম। এখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাই। বোধহয় বিভিন্ন জাতির জগা-খিচুড়ীর জন্য উহার প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। সন্ধ্যার সময়ে মিশনে গেলাম। গর্ব্ব হল, এত দূরেও বাঙালী তার ভাবধারার গৈরিক উড়িয়েছে। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দজী (বাঙালী) সাদরে স্কুল, লাইব্রেরী, ঠাকুর-ঘর, বক্তৃতা-গৃহ প্রভৃতি ঘুরিয়ে দেখালেন এবং বাংলা তথা ভারতের নানা আন্দোলন, বিশেষ কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। এখানে ৫০।৬০ ঘর বাঙালী এবং বহু মাড়োয়ারী ও পাঞ্জাবী আছেন। এঁদের অধিকাংশই চাকুরী করেন। বাঙালীর মধ্যে রাজনৈতিক কৌতুহল খুবই। সুভাষ-বাবুর সমর্থকই বেশী। স্বামীজীর নিকট বিদায় নিয়ে অমিয় বাবুর বাসায় পৌছলাম।

ডাক-বাংলো ধরণের সুসজ্জিত বাড়ীর সামনে মটর থেকেই একটি সুশ্রী মহিলা করমর্দ্দন করে' আমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং ডাবের জল ও পান দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। পরিচয়ে জানলাম, ইনি মিঃ চ্যাটার্জির জায়া-স্ত্রী। নাম লিলি। মেয়েটি পদ্মের মতই নরম-নরম ও স্নিগ্ধ। অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। নিজের হাতে বিচিত্র বাঙালী খাদ্য তৈরী করলেন এবং স্বহস্তে পরিবেশন করে' সযত্নে অতিথি-সৎকার করলেন। লিলি দেবী বাঙ্‌লা বলতে পারেন না, তবে কিছু কিছু বললে বুঝেন। মিঃ চ্যাটার্জি নিজের গাড়ীতেই আমাদের জাহাজে পৌছে দিলেন এবং ফিরবার পথে আবার নিমন্ত্রণ করে' রাখলেন।

মিঃ চ্যাটার্জ্জির আন্তরিক প্রীতির স্পর্শ বিস্মৃত হবার নয়। ফিরবার পথে আমি সানন্দেই সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম। এবার মিঃ চ্যাটার্জ্জির ভগ্নী কুমারী অনিলার সঙ্গে পরিচয় হল। মিঃ চ্যাটার্জ্জির মা ও অন্যান্য ভাই-ভগ্নী মালয়ার অন্তর্গত জুহুরে' স্থায়ীভাবে বাস করছেন। অনিলার জন্ম মালয়ায়। লালিতপালিতও ঐ দেশে। কত যেন আপনার—কত দিনের যেন পরিচয়, এমনি নিঃসঙ্কোচ তার ব্যবহার। সুভাষবাবু ও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-সংগ্রহ, সঞ্চিত তার সখের আরও এমন অনেক কিছু কত না সাগ্রহেই সে আমায় দেখালে!

আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত মালয়বাসী

সিঙ্গাপুর বন্দরে নৌ-ঘাঁটি ঃ সিঙ্গাপুর

চীনা-চাষী : হংকং

কথা প্রসঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জ্জি বললেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনিলার বাংলা দেশে বিয়ে দেয়। অনিলার সলজ্জ রক্তিম মুখে অন্তরের মৌন আবেদন ফুটে' উঠলো। দুঃখ হল। পরাধীন আমরা, প্রবাসী ভাই-বোনদের ব্যথা-বেদনা অনুভব করবার শক্তি ও দরদই হারিয়ে ফেলছি। অবজ্ঞা ও অবহেলায় কে জানে হয়তো এমনি কত প্রবাসী আপনার জনকে হারিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও হারাবো। মালয়-প্রবাসী এই বাঙ্গালী পরিবারের সুখস্মৃতি আমার জাপান-ভ্রমণ-প্রসঙ্গের একটি মধুময় অধ্যায়। স্বজনবিরহ-ব্যথাতুর তাঁদের অশ্রুময় বিদায়-সম্বর্দ্ধনা হৃদয়পটে চিরদিন অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

স্থানীয় আদিম অধিবাসী : পিনাং

সিঙ্গাপুর হতে ২০শে এপ্রিল বেলা ৩টায় জাহাজ ছাড়লো। দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য কেবিনগুলি যাত্রীতে ভরে' গেল। এর মধ্যে ৬০ জন জার্ম্মাণ ইহুদী। জার্ম্মাণী হতে বিতাড়িত হয়ে অধিকাংশই সপরিবারে সাংহাই যাচ্ছেন। অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। নাজী জার্ম্মাণীর অত্যাচার ও অবিচার-কাহিনী মর্ম্ম স্পর্শ করে। একজন সুদর্শন ইহুদীর সঙ্গে খুবই আলাপ জমে উঠলো। নাম এ্যালবার্ট জ্যাভেইল মানাসে (Albert Javail Manassa)। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ! ভদ্রলোক প্রায়ই আমার কেবিনে এসে তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতেন। প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, বলবার সময়ে তাঁর আঁখিকোণ সজল হয়ে উঠতো—গলার স্বর ধরে' আসতো। ভদ্রলোক ড্রেসডেন সহরের খান দশেক বাড়ীর মালিক ছিলেন। নাজী গভর্ণমেণ্ট খুশীমত সেগুলির দাম ধরে' মোট মূল্যের শতকরা ছয় ভাগ এবং সাংহাই-এর পথের খরচ দিয়ে জার্ম্মাণ হতে এঁকে বিদায় দিয়েছেন। ড্রেসডেণ সহরে তাঁর বিশেষ মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি

সাগরতীরের একটি নয়নমনোহর দৃশ্য : সিঙ্গাপুর

ভাল ইংরাজী জানেন না। কোনও রকমে বুঝালেন, শুধু তাঁরই এই দশা নয়, এই জাহাজের জার্ম্মাণ ইহুদী যাত্রী সকলেরই। জীবিকার্জ্জন ও বসবাসের আশায় সাংহাইয়ে এঁরা চলেছেন। এ্যালবার্ট দিনে অন্ততঃ দশবার আমার কাছ থেকে নস্য নিতেন। তাঁর কাছেই জানলাম, জার্ম্মাণীতে নস্য নেওয়ার প্রচলন আছে।

পৈতৃক বাসবঞ্চিত এই সর্ব্বহারা ইহুদীদের উৎফুল্ল

জাহাজ-জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করে' বিস্মিত হলাম। প্রচুর আত্মপ্রত্যয় ও আনন্দ যেন এদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অনিশ্চিত লক্ষ্য, অপরিচিত দেশ-গমন; তবুও আচার-আচরণে অপরিমেয় প্রাণচাঞ্চল্য। হাসি, ঠাট্টা, গান, বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, চপলতা দিয়ে জীবনটাকে এঁরা ভরপুর রাখে কেমন করে', আমার তা ধারণায়ই আসে না। একদিন এদের ঘুর্ণিনৃত্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল যাত্রীকে এবং জাহাজের অফিসারদের নিমন্ত্রণ করলেন। নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীর সে উচ্ছ্বসিত পুলক-চাপল্য দেখে' কল্পনাও করা সম্ভব নয় যে, এরা গৃহহারা, বিত্ত-বঞ্চিত। ডেকে এই সকল অর্দ্ধনগ্ন ইহুদী তরুণ-তরুণীর প্রকাশ্য কাম-কেলি অনভ্যস্ত আমাদের চোখে ভারী বিসদৃশ ও অশোভনীয় ঠেকলো।

বেশ আমোদেই দিন কাটছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় ১১০০ মাইল আসার পর চীন-সমুদ্রের ভীষণ তাণ্ডব লীলায় সব লণ্ডভণ্ড করে' দিল। পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউ। ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনি কাণে তালা লাগিয়ে দেয়। এত বড় প্রকাণ্ড জাহাজ-খানা একবার সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়, আবার ভেসে উঠে। রোলিং-এর জন্য মাথা ঠিক রাখতে পারি নে। ঢোঁকে ঢোঁকে বমি উঠে। নতুন যাত্রী আমি। দুর্দ্দশা দেখে' ডাক্তারবাবু বললেন, এ ত স্বাভাবিক অবস্থা, ঝড়-বাতাস বইলে এর দশগুণ হ'ত! ২৫ শে এপ্রিল বেলা ১২টায় নোটিস-বোর্ডে লেখা দেখলাম, হংকং আর ৫৪ মাইল। বেলা দুটায় পাহাড়ের উচ্চচূড় দেখা গেল। সাগরের বুকে ইতস্ততঃ বিছানো সবুজঘন মখমল-মোড়া অত্যুচ্চ পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে জাহাজ সপিল গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। গোটা চারেকের সময়ে জাহাজ হংকং বন্দরে ভিড়লো। মেজর সুবেদার সিং ও তাঁর সঙ্গী (পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসার) এখানে নামবেন। জাহাজ থেকেই তাঁরা আমায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত ফোর্ট, মিলিটারী ব্যারাক, সারি সারি সজ্জিত কামান, তাদের থাকবার বাংলো ও ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ দেখালেন। হংকং-সম্বন্ধে অনেক গল্প করলেন। ইংরেজ এই স্থানটি সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রচুর খরচ করেছেন। মেজর সুবেদার সিং বিদায় নিলেন এবং ফিরবার পথে তাঁর আতিথ্যগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন।

পরদিন চিঠিপত্র লিখে পোষ্ট করলাম এবং সহরটি ঘুরে' দেখলাম। সুদক্ষ শিল্পীর সযত্ন অঙ্কিত ছবির মত সুদৃশ্য সহর। পাহাড়ের উঁচু-নীচু ও ঢালুর গায়ে গায়ে বাড়ী। অধিকাংশ সৌধই আমেরিকান ধরণের। রাত্রে আলোক মালা সজ্জিত হংকং সহরের স্বপ্নরূপ আমি অনিমেষ নয়নে জাহাজ হতে সন্দর্শন করে' মুগ্ধ হতাম। সুদূর প্রাচ্যে ইহাই না কি সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য সহর। জিনিষ-পত্র মনে হল মহার্ঘ। একটা কমলা লেবুর দাম তিন আনা। শুনলাম এখানে ৮।১০ জন বাঙ্গালী আছে। পাঞ্জাবী মুসলমান পরিচালিত একটি 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল' আছে। অধিকাংশ অধিবাসী চীনা। এরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখে। এখানকার চীনা জনসাধারণের ধারণা, ভারতীয় মাত্রেই পুলিস। পাঞ্জাবী মিলিটারী ও পুলিশ চাকুরের আধিক্য
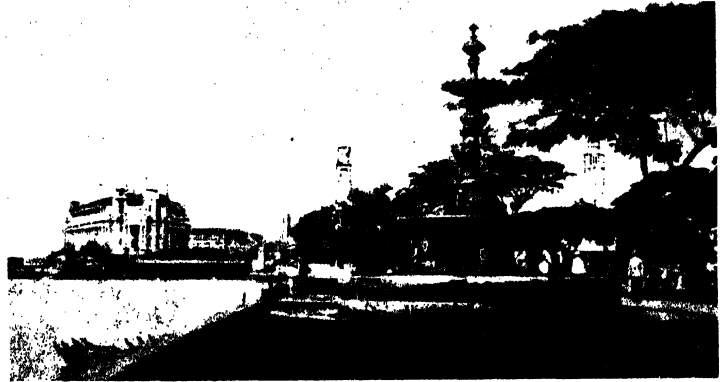
কোলিয়ার কোঠি : সিঙ্গাপুর

হতেই সাধারণ লোকের এরূপ ধারণার জন্য, ঠিক যেমন কলকাতার জনসাধারণের ধারণা চীনা মাত্রেই বুঝি চর্ম্মকার।

এখানকার নৌকার গঠন অন্য রকমের। চট্টগ্রামের স্যাম্পান প্যাটার্ণের নৌকা সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বার পর থেকেই লক্ষ্য করলাম, নৌকার ঢংও সম্পূর্ণ বদলে গেছে। নৌকাতেই ঘর-বাড়ী বেঁধে বহু চীনা পরিবার বাস করছে। নারী-পুরুষ উভয়েই নৌকাও বায়। জলকে এরা একেবারেই ভয় পায় না। জাহাজ ভিড়ার সময়ে ডিঙ্গী-ভর্ত্তি চীনা ডুবুরী এল। মজা দেখবার জন্য যাত্রীরা গভীর জলে পয়সা ফেলে দেয় আর এরা ডুব দিয়ে তা' তুলে আনে। আমাদের তিন তলার ডেক থেকে একটি সাহেব দশ টাকার সিকি-দুয়ানী ফেলে এই মজা উপভোগ করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অংশ গ্রহণ করলাম।

অপেক্ষমাণ চীনা রিক্সাওয়ালা : হংকং

২৭শে এপ্রিল বৈকালে রূপ-কথার রাজ্য হংকং বন্দর ত্যাগ করে' জাহাজ উত্তর চীন সাগরের বুকে ভাসলো। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই গিরি-নদী বন-উপবন, শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু হংকং-এর মনোরম নিসর্গ-মাধুরী চিত্তে একটা দাগ রেখে গেল। আবার উপরে অসীম আকাশ আর নীচে অনন্ত বারি। চলা আর চলা। পরদিন মধ্যাহ্নে এক নূতন অভিজ্ঞতা হল। দূরে মনে হল—কালো পাহাড় আর তার উপরে ধবল বরফের স্তূপ। ডাক্তার বাবু বললেন, মেঘে পর্ব্বত ভ্রম হচ্ছে আপনার। হংকং-এর ভাসমান পাহাড়ের মেলা আপনার চোখে নেশা ধরিয়েছে। চীন-সমুদ্রে দিক্‌চক্রবালের গায়ে সাদাকালো মেঘসমাগমে চমৎকার দৃশ্য রচিত হয়। ভারী নয়নস্নিগ্ধকর। বিকেলে আমরা ক'জন ডেকে বসে' গল্প করছি, এমন সময়ে অস্বাভাবিক রকমের একটানা সোঁ-সোঁ একটা শব্দ কাণে আসতেই আমরা সশঙ্ক হয়ে উঠলাম। একটু জলের চাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। বাটলার এসে বললে, মাইল পাঁচেক পেছন দিয়ে টাইফুন বয়ে গেল। হংকং হতে আগাম সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন দ্রুত জাহাজ চালিয়ে এগিয়ে এসেছে, নচেৎ জাহাজের টাইফুনে পড়ার

হংকং সহরের প্রান্তবর্ত্তী একটি পল্লীর দৃশ্য

সম্ভাবনা ছিল। এই বলে' তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে টাইফুনের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী বললো। বছর কয়েক পূর্ব্বে নাকি সাংহাইয়ের নিকটে এক প্রবল টাইফুনের প্রকোপে খান কুড়িক জাহাজ ধ্বংস হয়। কিছু বা ডুবে, কিছু বা দূরে পাহাড়ের উপরে গিয়ে পড়ে। কয়েক সহস্র লোকের প্রাণও নষ্ট এতে হয়। আমাদের গল্প শেষ না হতেই জাহাজ এসে ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহনায় নঙ্গর করলে।

পরদিন প্রভাতে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উজান বাহিয়া জহাজ চললো। মাঝে মাঝে পাহারায় নিযুক্ত জাপান রণতরী চোখে পড়লো। দুইখানা প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ আটখানা করে' ষোলখানা উড়োজাহাজ বুকে ধরে' দাঁড়িয়ে আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ভাল করে' দেখলাম। ইয়াংসিকিয়াং পদ্মা নদীর মতই চওড়া, তবে অত খরস্রোতা মনে হল না। অনেক দূর গিয়ে অপর একটা উপনদীর মধ্যে জাহাজ মোড় ফিরালে। উপনদীটি আমাদের গঙ্গার মত প্রশস্ত। এই দুই নদীর সঙ্গম স্থলেই উষাং ফোর্ট। এই ফোর্ট আগে চীনাদের ছিল, এখন জাপানীদের অধিকৃত। সূর্য্যোদয় চিহ্নিত জাপানী পতাকা এই জয়ের নিদর্শন জ্ঞাপন করছে। হৃতশ্রী উষাং ফোর্টের সর্ব্বাঙ্গ জাপানী গোলার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ম্রিয়মাণ বিরল পরিবেশ জাপানের নৃশংস অপকীর্ত্তি বুকে বহন করে যেন ক্রন্দনরত। ইহার পরই একটা সহরের ভগ্নস্তূপের হৃদয়বিদারক দৃশ্য। মনে হল যেন ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই মজাফরপুর এসেছি। সংস্কার কার্য্য চলছে। কিন্তু নগ্ন নির্লজ্জতার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য এখনও ঢাকা পড়েনি। অপর পারে সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। চীনা মেয়ে-পুরুষে চাষ করছে। আর একটু এগুতেই বামে সাংহাই সহর। একদা চীন, অধুনা জাপানাধিকৃত দক্ষিণ পাড়ে জাহাজ ধরলো। বেলা তখন বারটা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দশ বার জন যাত্রী ছাড়া আর প্রায় সবাই নেমে গেল। জার্ম্মাণ ইহুদী মিঃ এলবার্ট আমার হাত দুখানা ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরে বললে, বন্ধু বিদায়! করুণ কণ্ঠস্বর। চোখে মুখে অসহায় নিরুপায়তার সুস্পষ্ট ছাপ। অব্যক্ত ব্যথায় হিয়া আমার নিঃশব্দে কেঁদে উঠলো। আবেগভরে বললাম, বন্ধু, ঈশ্বর আপনার সহায়, সুখী হোন। এলবার্ট জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে নেবে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় আমি রেলিং ধরে' চেয়ে রইলাম। ভাবি এলবার্ট আমার কে? কেন এই অহেতুক সমবেদনা? পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ও রঙের পার্থক্য সত্ত্বেও স্নেহ-মমতা-প্রীতির অখণ্ড বন্ধনে সর্ব্বদেশের মানুষ এক। ইহাই তো সর্ব্বমানবের মনুষ্য-ধর্ম্ম। ইচ্ছে হল এলবার্টকে নিজের দেশে নিয়ে যাই। কিন্তু আমিই যে নিজ বাসভূমে পরবাসী! বাধাও প্রচুর।

প্রায় সকলেই সাংহাই সহর দেখতে গেলেন। অবসন্ন মনে একা ডেকে বসে আছি। একজন জাপানী কাষ্টম অফিসার এলেন। নানা প্রসঙ্গে আলাপ হল। শুনলাম, প্রায় দুই বৎসর পরে ব্রিটিশ যাত্রী-জাহাজ এই 'তালামা'ই সর্ব্বপ্রথম এল। ইনি তিন মাস মাত্র এখানে এসেছেন। মাহিনা ৩০০ ডলার। এই এলাকা জয়ের পর বহু জাপানী মোটা ভাতায় এখানে জাপানী সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েছে। বুঝলাম, পররাজ্য জয়ের মজাই এই। জাপানী কায়দায় নমস্কার তাঁর কাছে শিখে নিলাম। ভদ্রলোক ভাল ইংরাজী জানেন না। একখানা অভিধান সঙ্গে আছে। কথা না বুঝলেই অর্থ দেখে নেন। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসা করলাম, what is your opinion about Sino-Japanese war?

বললে: opium opium—you mean.

No—opinion; কথাটা বানান করে বুঝালাম।

ইংরাজী-জাপানী পকেট অভিধান খুলে অর্থ দেখলে: হেসে বললে, My opinion Nippon right, Chinese wrong. এই বলে সগর্ব্বে ভদ্রলোক মিনিট পাঁচেক ভাঙ্গা ইংরাজী-জাপানী মিশ্রিত বুকনীতে নিপ্পনের স্তুতি বন্দনা করলে।

এর পর থেকে আমিও সর্ব্বদাই নিপ্পন ব্যবহার করতাম। এই কথাটাই ওরা জাপানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা ব্যবহার করে থাকে।

সন্ধ্যে ৭টায় অফিসারটি উঠে গেলে উপাসনাদি সেরে কেবিনে শুয়ে 'কপালকুণ্ডলা' পড়া সুরু করলাম।

বন্ধু

শ্রীমতিলাল দাশ

বৈশাখের রৌদ্রোজ্জ্বল বেলা। অপূর্ব্ব রিপণ কলেজের পাশে দাঁড়াইয়া ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিল। অপূর্ব্ব উকিল—সেদিন কাজ ছিল না, তবু অভ্যাস রক্ষা করা উচিত, তাই ধড়াচূড়া পড়িয়া সে একটু বিলম্বে চলিতেছিল। পার্ক সার্কাসের ট্রামগুলি গদি-মোড়া—তারই আসার আশায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু যাহা চাওয়া যায়, তাহা সহজে পাওয়া যায় না—বাসওয়ালা যায়—শিয়ালদহের ট্রাম চলে—পার্ক সার্কাসের গাড়ী আসে না! অনেক পরে গাড়ী আসিল—সে কণ্ডাক্টারকে গাড়ী থামাইতে বলিল। সে উঠিবে, এমন সময়ে পিছন হইতে কে ডাকিল—"আরে অপূর্ব্ব যে, কেমন আছিস্ ভাই?" লোকটি তাহাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল—ট্রাম ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব বিস্মিত দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চাহিল।

আগন্তুক বলিল—"কলেজের মোড় থেকেই তোকে চিনতে পেরেছি—কতকাল দেখা হয় নি—তা এক যুগ হবে—কি বলিস্?"

অপূর্ব্ব স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু স্মরণে পড়িল না। কিন্তু এমন আন্তরিকতা যার, তাকে চিনি না বলিয়া অপমান করিতে অপূর্ব্বের বাধিল। অপূর্ব্বের সঙ্কোচ লক্ষ্য না করিয়া আগন্তুক বলিল—"তারপর কোথায় চল্‌ছিস্?"

"হাইকোর্টে।"

"আজ আর নাই বা গেলি—আমায় আবার কালই ফিরতে হবে—চল, বাড়ী ফেরা যাক—তোর ওখানেই মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করা যাবে—না খেলে ত আর তোর মন খুশী হবে না—"

অপূর্ব্বের মনে জাগিল দ্বিধা—কিন্তু যে খাইতে চায়, তাকে খাইতে না বলা নিষ্ঠুরতা—তাই আমতা আমতা করিয়া বলিল—"তা কি হয়, না খেলে তোর বৌদির রাগ হবে—"

"বেশ বেশ, বিয়ে করলি কোথায়? ছেলেপিলে কি? কেমন চলছে দাম্পত্য-প্রীতি? বলতে হবে না, তোর ভাব দেখেই বুঝেছি 'জ্বলতি মম জীবনং যৌবনম্'।

অপূর্ব্ব বলিল, "বিয়ে অনেক দিন হয়েছে—একটী ছেলে—চলছে কোনও প্রকারে—তোর খবর বল ভাই—"

"আমি যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরে—কোনও নীল শাড়ী পরাণ ভুলাতে পারল না—"

"যাক্, আমার ভয় হয়েছিল তুই চিন্‌তে পারবি না—কিন্তু সে আমার মিথ্যা ভয়—গত দিনের স্মৃতি কি সহজে ভোলা যায়—দৌলতপুর কলেজে দু'জনের কি ভাবই ছিল—তার আগে আবার স্কুলে দু'জনের গলাগলি ভাব—কতদূর হাঁটতে হবে তারপর?"

অপূর্ব্ব বলিল—"বেশীদূর নয়, কাছেই বাসা—তারপর তোর খাওয়ার খুব অসুবিধে হবে—রান্নাবান্না ত শেষ হয়েছে—"

"তার জন্য ভাবনা করিস্‌নে—লক্ষ্মীর ভাঁড়ার কখনও শূন্য যায় না—তারপর তোর ওখানে ডাল-চচ্চড়ি খেয়ে আর মুখ নষ্ট করি কেন—দই, রাবড়ি, পুঁটিরামের রাজ-ভোগ, দ্বারিকের আইস্-ক্রিম সন্দেশ—তাতেই অর্দ্ধেক হবে—আর বৌদি চট্‌পট্ দু'চারখানা আমলেট করে দেবে'খন—ভাত যদি নাই বা থাকে, দোকান থেকে গরম গরম লুচি তরকারি নিয়ে আসবি—না, না এতে আমার একটুও লজ্জা নেই, খাব—তায় আর লজ্জা কি—আর তার উপর তোর বাসায়!"

এই দিল-খোলা বন্ধুটির উচ্ছ্বাস অপূর্ব্বকে কিন্তু উৎসাহিত করিতে পারিল না। কোনও প্রকারে কষ্টে-সৃষ্টে সে বাসা চালায়। বন্ধুর আহারের ফর্দ্দ তাহাকে ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু এমন সরলতা যার, তাহাকে সংসারে অদেয় কি?

অখিল মিস্ত্রির লেনে অপূর্ব্ব'র বাসা, বাসায় পৌঁছিয়া বন্ধুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া অপূর্ব্ব পত্নী সুধাকে খাওয়ার আয়োজন করিতে বলিল। বন্ধু ততক্ষণ ইজি-চেয়ারে শুইয়া ভৃত্য শঙ্করকে দিয়া গাত্র-মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। অপূর্ব্বকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—"নিজেই সব ঠিক করে নিচ্ছি ভাই, তোর সঙ্গে ত আর ভব্যতার অভিনয় করা চলে না। ভাল, শঙ্করকে দিয়ে কিছু ভাল

সিগারেট আনা—যা তা আমার মুখে রোচে না—হাঁ তা বলতে পারিস্ আমায় ধূম-বিলাসী।"

অপূর্ব্ব বলিল—"স্নানের যোগাড় করুক, আমি ততক্ষণ ধড়াচূড়াগুলি খুলি।"

"বেশ, বেশ, কি তেল মাখিস্ তুই—গন্ধ তেল মাখতে হয়রে ভাই—তা না হলে মস্তিষ্ক শীতল রাখা কঠিন—আজকালকার দিনে মানুষের এত ঝঞ্ঝাট যে, মাথা ঠিক রাখাই দায়।"

পরিপাটি ভোজন-পর্ব্বের শেষে বিছানায় গড়াইতে গড়াইতে বন্ধু বলিল—"কিন্তু এমন করলে তোর চলবে কি করে'? বড় হওয়ার জন্য চাই একাগ্রনিষ্ঠ তপস্যা—তা আসচে বার তোর একটা হিল্লে করে' দিয়ে যেতে হবে—যাদের পেশা চালিয়ে খেতে হয়—তাদের জাঁকজমক চাই ভাই—"

অপূর্ব্ব উত্তর করিল না। ব্যবসা-বুদ্ধি তার নাই—লোকে যে কাজের প্রতি প্রশংসা করে—গৌরব ও সম্মান দেয়, তার কীর্ত্তির আসন সহজ-লভ্য নয়। এখনকার দিনে জয় কণ্টকিত পথে। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সে পথ অবলম্বনে অপূর্ব্বের কোনই উৎসাহ নাই। বন্ধুর অতীত কিছুই তাহার মনে পড়িতেছিল না—সে ভাবিল, পুরাতন স্কুল জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপারটি জানিয়া লইবে।

সে বলিল—"হাবুল এখন কি করছে?"

"হাবুল—কোন হাবুলের কথা বলছিস্ আমার ত মনে পড়ছে না।"

"কেন—আরে তার ভাল নাম সমীর—সমীরের কথা ভুলে গেলি কি করে'—?"

আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া বলিল—সমীর স্কুলের মাষ্টার হয়েছে—তার নাম যে হাবুল ছিল—তা মনেই ছিল না আমার—

অপূর্ব্ব ভাবিল, বিস্মৃতি তার একারই হয় না—গত দিনের স্মৃতিতে হাবুলকে ভোলাই চলে না—সে ছিল ক্লাসের মূর্ত্তিমান্ আনন্দ—তার ছন্দে ছন্দে ছিল রঙ্গ, তার কথায় কথায় ছিল হাসি—

ভাই বলিল—"বিস্মরণ হওয়া আশ্চর্য্য নয়—এই যেমন আমার—সত্যি কথা বলতে কি—তোকে একদম স্মরণই পড়ছিল না—"

আগন্তুক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—হাসির দাপটে অপূর্ব্বের অভীপ্সিত প্রশ্ন হারাইয়া গেল। বন্ধু বলিল—"তা হয় ভাই, হয়—অন্তরঙ্গতা অনেক থাকলেও, অন্তরঙ্গকে আমরা ভুলে যাই—স্মৃতি এমনই চালাকি করে—"

"তোর কি থার্ড পণ্ডিতের কথা মনে আছে—যিনি কে ক' পৃষ্ঠা লিখেছে দেখে নম্বর দিতেন!" তার খুব স্মৃতি-বিভ্রম ছিল—অতীতের ছায়াছবি মনে ভাসে। যে বিগত দিন আনন্দ নিয়া আর ফিরিবে না, তাহারই কথা বারে বারে মনে পড়ে—আজিকার নীরস অসুন্দর জীবন-যাত্রার সঙ্গে সেই আনন্দমুখর শৈশবজীবনের উল্লাসের কত পার্থক্য আছে। অপূর্ব্ব তার সংশয়-ব্যাকুল চিত্তকে শান্ত করিল—

"পণ্ডিতমশায় মারা গেছেন জানিস্ ত?"

অপূর্ব্ব জানিত না—শুনিয়া দুঃখিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে খুব ভালবাসিতেন—বলিল—"তাঁর স্মৃতির জন্য কিছু করেছিস্ তোরা—করা উচিত ভাই, এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের এমন মহানুভব শিক্ষকের জন্য কিছু করা দরকার—"

শ্রোতার চোখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—সে বক্তার ভাবগদগদ মুখের দিকে চাহিল, পরে বলিল—"আমরা আর কি করতে পারি—যারা তাঁর কৃতী ছাত্র, তারা সব দেশ-বিদেশে—আমরা সবাই একটা সভা করি, তাতে একটি কমিটিও হয়েছে—আমাকে জোর করে' আবার সম্পাদক করেছে—কিন্তু কিছু করা যাবে, সে ভরসা করতে পাই না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"না, না এ কাজ তোকে করতে হবে ভাই—আমি তার অধম ছাত্র, জীবন-যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি—কিন্তু তবুও তাঁর জন্যে আমার সাধ্যমত দেব—চাঁদার খাতায় কত উঠ্ল রে?"

নির্লিপ্তভাবে আগন্তুক বলিল—কত আর উঠবে ভাই, গোটা দশেকও ওঠে নি—গুরুভক্তি বলে' কোনও পদার্থ আজকাল আছে কি—"

"এ খুব অন্যায়, এ খুবই অন্যায়—আমার নামে পঁচিশ টাকা লিখে নে ভাই—একেবারে দিতে পারব না—

"একেবারে দেওয়া কষ্ট বুঝি—কিন্তু শুভ সঙ্কল্পে দ্বিধা করিস্ নে ভাই—তা'হলে সেটা হয় না—অনেকেই কিছু দেবে বলে' লিখেছে, কিন্তু তাদের দেওয়া আর হয়ে ওঠে না—"

অপূর্ব্ব আপন উৎসাহের ফাঁদে আপনি ধরা পড়িল।

সুধার সহিত অনেক কলহ করিয়া সে পঁচিশ টাকা বন্ধুকে দিল। টাকা পাইয়া বন্ধু বলিল—"আমার আবার বাজার করতে হবে, তা'হলে কিন্তু উঠি—আর একদিন এসে জ্বালাতন করব। বৌদির সঙ্গে আলাপ হ'ল না—সেদিন করা যাবে—"

চলিবার মুখে অপূর্ব্ব আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—"কিন্তু ভাই, যদি কিছু মনে না করিস্—তোর নামটি আমি একদম ভুলেই গেছি—"

আগন্তুক পুনরায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল - চলিতে চলিতে বলিল—স্মৃতিকে যতই আবদার দিবি—ততই সে ভুলতে যাবে—তার চেয়ে এই রহস্যের সমাধান করতে থাক—আবার যেদিন আসব, সেদিন ফলাফল শুনব।"

অপ্রতিভ অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল। স্মৃতিকে আলোড়ন করিয়া সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তার মনে হইল আগন্তুক তার একদম অচেনা লোক। আগন্তুক আর কখনও ফেরে নাই—রহস্যও রহস্যই রহিয়া গিয়াছে।

মন-চোরে করিনু অর্পণ

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

আপন বলিতে, জানি আছে একজন
যখন তখন
কত দিকে, কত কাজে, কত প্রেরণায়
ঘুরে সে বেড়ায়;
যেখানে পাঠাতে চাই নিমেষে তথায়
উড়ে চ'লে যায়;
বাঞ্ছিত যখন যাহা, ধরিতে তাহায়
পিছু পিছু ধায়।

আমার সেবায় রত আছে অনুখন
বিশ্বাসী সুজন;
মোরে ছলি, আজি তারে করিতে হরণ
কেন এ যতন?
তুমি যদি লহ, তবে কে করে বারণ
তোমার মতন
চোর সুচতুরে? স্থান কোথা করিতে গোপন
মোর সে রতন?

তবে ল'য়ে যাও সাথে, ওহে শক্তিধর
চোর মনোহর!
দিতেছি আনিয়া তব চরণ-গোচর
মোর সে দোসর।
তোমার আশ্রয়ে রবে ভৃত্য নিরলস
তোমারি সে বশ
তৃপ্ত হবে তব কাছে লভি সুধারস,
গাহি তব যশ।

অনুগত অনুচরে দানিয়া বিদায়
অর্পিনু তোমায়;
অনুরোধ রেখো মোর—দিও গো তাহায়
বাস তব পা'য়।
চঞ্চল স্বভাব তার, যদি চ'লে যায়
ভুলিয়া তোমায়
ক্ষণেকের তরে কভু, আমার মায়ায়—
ত্যজিও না তায়;
ক্ষমি তারে, আদেশিও যেন পুনরায়
"আমারে" না চায়

শিক্ষা-পরিকল্পনা

শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত, প্রধান শিক্ষাসচিব, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের মনীষিবৃন্দ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, নেতৃগণের নির্দ্দেশে বার বার জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; কিন্তু কোথাও আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। মহাত্মা গান্ধি প্রবর্ত্তিত ওয়ার্দ্ধা স্কীমও আজ জাতীয় শিক্ষার এই অভাব দূর করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার প্রবল আন্দোলন হইলে, সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় জাতীয় জীবনগঠনের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের আহ্বান করেন এবং এই সময়ে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি "বিদ্যাপীঠ" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইয়া আসে, তাহাদের মধ্য হইতেই প্রায় ৩০টি ছাত্র এই বিদ্যাপীঠে যোগদান করে। আজ ইহাই গৌরবের কথা যে, এই সকল তরুণই যথোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মেরুদণ্ড হইয়াছে। ইহার দ্বারা জাতীয় শিক্ষার যে লক্ষ্য—ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের পরিস্ফুরণ ও তৎসঙ্গে সৃষ্টি-শক্তিকে জাগ্রত করা, তাহা যে এই ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছে, ইহা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

আজ আমরা তাই নিঃসঙ্কোচে জাতীয় শিক্ষার এক পরিকল্পনা জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। বীজাকারে যে অব্যর্থ শিক্ষাবিধান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যাপকরূপ দিতে হইলে অবশ্যই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান পরিস্থিতি, আবহাওয়া ও দেশের মনোবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া না চলিলে ইহা সার্থক হইবে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা দেখিতেছি—রাজশক্তি সহায় না থাকিলে, শিক্ষাবিস্তার সম্ভব নহে। রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়াই মহাত্মা গান্ধি ওয়ার্দ্ধা স্কীমকে সফল করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করিতে হইলে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলাই যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেই জাতীয় শিক্ষা যে বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, এমন কোন হেতু নাই।

কেননা, ছেলেদের চরিত্রগঠনের শিক্ষা দিতে হইলে যে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যবশতঃই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে না। বরং স্বর্গীয় মহাপুরুষ স্যার আশুতোষের সঙ্কল্পানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের গতি ও পরিস্থিতি যে ভাবে বিহিত হইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, ব্যবহারগুণে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগেই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিব।

জাতীয় শিক্ষা সিদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিবে তখনই, যখন ইহা জাতীয় ভাবধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিবে ও তাহার লক্ষ্যে উন্নীত হইবার উপযোগী হইবে। ভারতের লক্ষ্য ভূমার দিকে, "নাল্পে সুখমস্তি"। এই হেতু মানুষকে সে কখনও ক্ষুদ্রাধারে সীমাবদ্ধ, খণ্ডবিচ্ছিন্নভাবে দেখে নাই, মানুষকে দেখিয়াছে শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপে। প্রাচীনকালে ঋষিদের তপোবনে তাই আমরা সেই শিক্ষাবিধানই দেখিতে পাই, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সফলকাম হইত। সেখানে শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠস্থ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তরে ব্রহ্মবীর্য্য জাগিয়া উঠিত। গুরুনিষ্ঠা ও সেবার ভিতর দিয়া তাহারা হৃদয়কে সরস ও পবিত্র করিয়া তুলিবার অবসর পাইত। আচার ও নিষ্ঠার অনুসরণে প্রাণের সংযম ও শুদ্ধি লাভ করিত এবং নিরলস শ্রমের মর্য্যাদাদানে অকুণ্ঠ থাকায় তাহারা শক্তির বরপুত্র হইয়া উঠিত। কালধর্ম্মে সে সকলই গিয়াছে। কিন্তু

তাই বলিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না; জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রপরিস্থিতিকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের সেই মৌলিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকে কেমন করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তাহাই দেখিতে হইবে।

দেহ, প্রাণ, হৃদয়, বুদ্ধি ও আত্মা—ইহা লইয়াই গোটা মানুষ। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবিধানের মূলে এই পাঁচটী অঙ্গের উৎকর্ষ-বিধান থাকা প্রয়োজন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শিক্ষাধারা এইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাহা সার্থক হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে শরীররক্ষার মূল নীতি তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তাহাদের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ করিতে হইবে, শ্রদ্ধা ও প্রেমে উহা ভগবন্মুখী করিয়া তুলিতে হইবে, স্বাধ্যায়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুরণ এবং ঈশ্বরানুরক্তির দ্বারা আত্মার জাগরণ সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের অভিজ্ঞতানুযায়ী দেখিয়াছি যে, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক, এই পঞ্চাঙ্গ শিক্ষাই উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং আমাদের বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া অথবা সম্ভব হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়াই আমরা যদি এই পঞ্চাঙ্গ শিক্ষানুশীলনের ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে করিতে পারি, তবে অচিরেই একটি নবজাতি গড়িয়া উঠিবে। অতঃপর আমরা ইহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরিকল্পনাটি শেষ করিব।

প্রথম—**শারীরিক**—(physical & dietic)—শরীর অন্নময় কোষ। সুতরাং স্বাস্থ্যবিধির মূলে আহার্য্যবিধি বিশেষ লক্ষণীয়। অন্ন বা খাদ্যই রক্ত, মেদ, মজ্জা, মাংস, অস্থি ও বীর্য্যে পরিণত হইয়া আমাদের শরীর সংগঠন করিয়াছে ও উহাকে ওজঃসম্পন্ন করিতেছে। এই শরীর লইয়া পরে ব্যায়াম—শরীরের উপাদান না যোগাইলে, শরীরচালনা অনর্থেরই মূল। শিক্ষার এক অঙ্গ হিসাবে সেই কারণ আমাদের মনে হয়, ব্যায়ামের অপেক্ষা আহার্য্যবিধির উপর ছাত্রছাত্রীদিগের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। খাদ্যাখাদ্য বিচার না করা এবং অধিকাংশ সময়ে খাদ্যের শুচিতা অশুচিতা, সময় অসময় এবং পরিমাণ-জ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকায় আমরা আমাদের স্বাস্থ্যকে সুন্দর রাখিতে পারি না। অসংযত শ্লথ স্বভাব শরীরভ্যন্তরস্থ ওজঃশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া শুধু দেহের গ্লানি আনে না, মনকেও বিষাক্ত করিয়া তোলে। অল্প বয়স হইতেই ছাত্রদের ধারণা করিয়া দিতে হইবে যে, তাহাদের এই শরীর শ্রীভগবানের লীলানিকেতন—সেই আধারের মধ্য দিয়া তিনি তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকশিত হইয়া উঠিবেন বহু ছন্দে, বহু ভাবে। অতএব ছাত্রের কর্ত্তব্য—নিত্য পরিচর্য্যায় ইহার যথাবিধি সংরক্ষণ এবং ইহাকে সুস্থ, সবল ও পবিত্র করিয়া রাখা। এই ধারণা তাহাদের মনে দৃঢ় করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাধন-বিধি-হিসাবে একটী routine বা দিনচর্য্যা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীর খাবার কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁহারা কখন কি খাইবে এবং দিনে কত বার খাইবে, আহারের পরিমাণ, এমন কি গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার প্রভৃতির শরীরের উপর কি প্রভাব এবং তাহার ফলে উপবাসাদির বা খাদ্যাখাদ্যের বিচার এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ত্রিবিধ গুণযুক্ত খাদ্যের প্রভাব শরীর ও মনের উপর কতখানি হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক্ শিক্ষার প্রয়োজন। এতৎসঙ্গে মুক্ত বাতাসে নিত্য প্রাতর্ভ্রমণ, অপরাহ্নে ক্রীড়া বা নিয়মিত ব্যায়াম, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা, দিবানিদ্রাপরিহার ইত্যাদি সকল বিষয়েরই অনুশীলনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ছাত্রেরা নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে "ব্রহ্মৈবাহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্" এই মন্ত্রে জীবন-দেবতার আরাধনায় জীবনের সুর বাঁধিয়া লইয়া, সারাদিন অকাতর শ্রমের পর রাত্রি অধিক হইবার পূর্ব্বেই মাতৃমন্ত্র জপ করিতে করিতে অনুদ্বিগ্ন মনে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিতে শিখিবে। দেবশরীর লইয়া সে যে আসিয়াছে, এই প্রত্যয় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনে দৃঢ়মূল করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটী সম্যক্ দৃষ্টি-সম্পন্ন, শক্তিসমন্বিত স্বাস্থ্যবিধিই—শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়—**মানসিক**—(intellectual or academic)—বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে যে জ্ঞান আমাদের

জন্মে, সচরাচর সাধারণ-শিক্ষা বলিতে আমরা তাহাই বুঝি; মন ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষ-সাধন ইহার লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া এই জ্ঞান আমরা যথেষ্ট লইতেছি এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় যেটুকু অভাব ছিল তাহাও ক্রমশঃ পরিপূরণের ব্যবস্থা হইতেছে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বর্ত্তমান জগতের সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়েই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ক্রমশঃই হইতেছে। অধিকন্তু বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা হওয়ায়, যেটুকু অসুবিধা ছিল ও সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনীয়তা ছিল, তাহাও তিরোহিত হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া আমাদের অধিক বক্তব্য কিছুই নাই। তবে বিদেশীয় সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনাদি অধ্যাপনার যেমন সুব্যবস্থা আছে এবং তাহা যেমন অবশ্যপাঠ্য তালিকার মধ্যে নিহিত হইয়াছে, তেমনি ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতের দর্শন ও ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইত্যাদি পাঠেরও যেন সমান ব্যবস্থা থাকে এবং অবশ্যপাঠ্য হিসাবেই পরিগণিত হয়।

আমরা মনে করি, শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ নয়, পদ নয়, সম্মান নয়; শিক্ষার উদ্দেশ্য—আপনাকে জানা ও পাওয়া। জাতীয় ভাষার আয়ত্তীকরণে জাতীয় চৈতন্যই ফুটিয়া উঠিবে। স্বরূপের উপলব্ধি হইবে। ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য দিয়া যেরূপ অবধারিত হইবে, অন্য কোন ভাষার মধ্যে দিয়া তাহা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃতশিক্ষারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা দরকার; এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। তরুণমতি ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে বাহিরের কোন মতবাদ ঢুকাইবার পূর্ব্বেই ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাসের মর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়োজন খুবই আছে; নচেৎ আত্মপ্রীতি, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে, সুবিচারে অক্ষম হইয়া ছাত্রেরা বাহিরের ভাবগুলির সত্যাসত্য ও প্রকৃত তত্ত্বের অবধারণে কখনই কৃতকার্য্য হইবে না। আত্মবিক্রয় করিয়া যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আমরা প্রতিষ্ঠা করিব, তাহা কোন মতেই স্থায়ী হইবে না। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অনুভূতির দ্বারা আত্মবলকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, বাহিরের ভাবসমূহের প্রভাবে আত্মপ্রত্যয়হীন না হইয়া, বরং তাহাদিগকে জীবনজয়ের উপকরণ-রূপেই তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়েরও দৃষ্টি শীঘ্রই এদিকে পড়িবে বলিয়া আশা করি। ইহা ব্যতীত দেশের ও বিদেশের বর্ত্তমান সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি পরিস্থিতির সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের অনুশীলনও প্রয়োজন। এই হেতু বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার সহিত উপযুক্ত সংবাদপত্রাদি পাঠ এবং উপপাঠ্য হিসাবে এতৎসম্বন্ধে যথারীতি পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া নিত্যনিয়মিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

তৃতীয়—**নৈতিক** বা **কৃষ্টিমূলক** শিক্ষা (Spiritual practices)—ভারত ধর্ম্মপ্রাণ দেশ, ধর্ম্মই ইহার বৈশিষ্ট্য। ধর্ম্ম রক্ষিত হয় আচারনিষ্ঠা ও উৎসর্গে, নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রভূমি সেইজন্য হৃদয়। হৃদয় রসাপ্লুত না হইলে, আচার-রক্ষা দায় হইয়া উঠে। নিয়মপালনে নিষ্ঠা থাকে না। ত্যাগে আনন্দের উদ্রেক হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনধারা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজনীয়, যাহাতে তাহাদের হৃদয় সরস, ভক্তিপ্লুত ও ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া উঠে। মানবজীবনের উন্নতির প্রধান কেন্দ্র এই হৃদয়। এইখানেই জাগে শ্রদ্ধা, তাহাই পরে জীবনের বীর্য্যরূপে প্রকাশ পায়। দুঃখের বিষয়, শিক্ষার মধ্যে হৃদয় গড়ার এই নীতি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ফলতঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যর্থই হইতেছে। সেবা ও প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের ভিতর দিয়া তরুণদিগের নৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে। আমরা দেখিয়াছি—ছাত্র-ছাত্রীদিগের হৃদয় গড়িবারও অমোঘ উপায় এইগুলিই। সেবা জীবনকে সংযত ও সহানুভূতিপূর্ণ করিয়া তোলে। ইহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনাকে দিতে শিখিয়া ছাত্রেরা উৎসর্গের মন্ত্রে অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে, নিঃস্বার্থ ও বিদ্বেষহীন হইতে শিখিবে। পক্ষান্তরে পূজা, জপ, স্তব-স্তোত্র, ভক্তি ও প্রেমের কাহিনীর ভিতর দিয়া তরুণেরা নিয়ম-পালনের অধিকারী হইবে। এই প্রেম ও ভক্তি অবলম্বন করিয়াই তাহাদের শিখাইতে হইবে—আসন, প্রাণায়াম, জপ, মুদ্রা,—ধ্যান, ধারণা, ত্রাটক, নাড়ীশোধন, নাড়ীবিজ্ঞান ও শ্বাসবিজ্ঞান।

দেশের ধর্ম্ম, দেশের সমাজ, আচার, নীতি প্রভৃতির উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে; দেব, দ্বিজ, গুরুজনদিগের প্রতি তাহাদের ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখাইতে হইবে। সংযত জীবনে ব্রতধারী হইয়া তাহারা জাতির কল্যাণকামী হইবে। ধৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, দান, তপস্যা, এই সকলের অধিকারী হইয়া তাহারা ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিগ্রহরূপ-ধারণে, সত্যের ও ভগবানের মানুষ হইয়া নূতন জগৎ রচনা করিবে। ভারতের নৈতিক জীবন এই কারণে শুধু Ethics নয়; পরন্তু সাধন ও কৃষ্টির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সংসারে পিতা মাতা, পুত্র-কন্যা ভ্রাতা এবং ভগ্নী প্রভৃতি পরস্পরের মধ্যে যে অপ্রীতি ও অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ এই হৃদয় গড়ার নীতিকে অবহেলা করা হয় বলিয়াই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাহা সম্ভব হইবে কিনা, তাহাও বিবেচ্য। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে ছাত্রকে বেদমন্ত্র আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যগণ সযত্নে এই সব বিষয় অনুশীলন করাইতেন। আমাদের শিক্ষাপরিকল্পনার ভিতর আমরা ইহা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি।

অতঃপর চতুর্থ — **আধ্যাত্মিক** (Purely spiritual)। "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ তেনাহং কিমকুর্য্যাম", এই একটি বাণীতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মর্ম্ম লিখিত আছে। সকল শিক্ষাই ব্যর্থ, যদি অমৃতের অধিকারী না হই। এই অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায় ঈশ্বরানুভূতির ভিতর দিয়া। শিক্ষার্থিদিগকে তরুণ অবস্থা হইতেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের মহাবীর্য্য এইখানেই লুক্কায়িত আছে। যাঁহারা বলেন—ধর্ম্ম এবং ভগবান জাতির উন্নতি-পথের অন্তরায়, অতএব জাতীয় শিক্ষা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হইতে এই দুইটীকে সরাইয়া দেওয়া হউক, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। আত্মার শক্তি বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আত্মার জাগরণ হয় ভগবদুপাসনায়। আমাদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মূলে কর্ম্মপটুতার বা শিল্পশিক্ষার অভাব যত না আছে, তাহা অপেক্ষা অন্তরের দৈন্য ও অলসতাই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। এ মরা জাতির হাড়ে হাড়ে ঘুণ ধরিয়াছে। নির্ব্বীর্য্য জীবনে কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষার যে কোন ব্যবস্থা হউক না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবে। আত্মশক্তির অভাবে সৃষ্টির ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে। দেশ ও জাতি তাহাতে সমৃদ্ধ হইবে না। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের এই যে বিরাট্ সৃষ্টি, ইহার মূলে আছে এই অধ্যাত্মশক্তির পরিস্ফূরণ। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় শিক্ষার মূল এইখানেই নিহিত। জাতি আজ পঙ্গু, অসহায় হইয়াছে, তাহার কারণ—সে ভগবানকেই ভুলিয়াছে। অতএব জাতির মেরুদণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করাই হইবে জাতীয় শিক্ষার মূল মন্ত্র।

ভারতের এই মূলতত্ত্বকে অবধারণ করিতে হইলে, স্বাধ্যায়ের আবশ্যক। ভারতের বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ, গীতা প্রভৃতির মর্ম্মকথা তরুণ ছাত্রছাত্রীদিগকে নিত্যনিয়মিত শুনাইতে হইবে এবং উহার পঠনপাঠনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদিগকে প্রথম অবস্থায় বাছিয়া বাছিয়া শ্রুতি-স্মৃতির শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করান প্রয়োজন এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা ও মর্ম্মানুশীলন করাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত "অনুশীলনী" পুস্তকখানি নিম্নশ্রেণীর বালকবালিকাদিগের জন্য ব্যবহৃত হয়। তৎপরে "নারদীয় ভক্তিসূত্র" এবং পাতঞ্জলের "যোগসূত্র" এবং "শ্রীমদ্ভাগবদগীতা" যথারীতি পড়ান হইতেছে। এই স্বাধ্যায়ের ভিতর দিয়াই বালক-বালিকাদিগের আস্তিক্যবুদ্ধি ফুটিয়া উঠিবে। তাহারা আত্মপ্রত্যয়ী হইবে এবং ঈশ্বরচেতনা লাভ করিবে। আমরা দেখিয়াছি—বর্ত্তমান বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশিকা কাল পর্য্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদিগকে সাধারণ স্তব-স্তুতি অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র গীতা অথবা অন্ততঃ পক্ষে গীতার ষষ্ঠ, দ্বাদশ, একাদশ ও ষোড়শ অধ্যায়, ঈশ ও কেন, এই দুইখানি উপনিষৎ এবং বিষ্ণুপুরাণের কিয়দংশ অনায়াসেই পড়াইতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আমরা জানিয়াছি, তাঁহাদের পক্ষ হইতে এরূপ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। অতএব এই দিকে মনোযোগী হইলে, বাঙ্গালীর প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে।

পরিশেষে, পঞ্চমাঙ্গ **ব্যবহারিক** (vocational) বা **কার্য্যকরী বিদ্যা**—যে জাতি আধ্যাত্মিক ক্ষুধানিবৃত্তির সহিত জীবনের রসদ-সংগ্রহে উদাসীন, তাহার মৃত্যু অবধারিত। শরীরের ধর্ম্ম যেমন আহারবিহার, হৃদয়ের ধর্ম্ম যেমন প্রেম, বুদ্ধি জ্ঞানার্জ্জনেই ধাবিত হয় এবং আত্মা যেমন ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি প্রাণের ধর্ম্ম প্রসারণ ও সৃষ্টি। তাই অর্থকরী শিক্ষার জন্য বিদ্যার্থীদের প্রথম চাই এই প্রাণের মুক্তি ও সচ্ছন্দতা। তরুণেরা যাহাতে শিশুকাল হইতেই প্রাণের জড়তা দূর করিতে শিখে এবং অকাতরে শ্রম ঢালিতে পারে, তাহার শিক্ষা দিতে হইবে। আজকাল প্রায় দেখা যায় যে, ছাত্রেরা সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় গৃহকর্ম্মগুলি করিতে উদাসীন। লজ্জা, অনিচ্ছা ও শ্রমকাতরতা তাহাদিগকে কর্ম্মবিমুখ করে। এই প্রাণের গতিকে ফিরাইয়া তরুণদিগের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া তুলিতে হইবে, তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সৃষ্টির আস্বাদ অপূর্ব্ব। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তরুণ ছাত্রেরা সৃষ্টিশক্তির উন্মাদনায় শ্রমের কঠোরতা ভুলিয়া যায়, শিল্পসাধনার প্রেরণায় অকুণ্ঠচিত্তে আত্মদান করে। এই জাগ্রত প্রাণশক্তিকে ভিত্তি করিয়া ছাত্রদিগকে বয়সানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান Syllabus অনুযায়ী প্রতি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা দিবার কিছু না কিছু ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু উহাতে সাধারণ শিক্ষার পরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে, যে বিদ্যালয়ের দিনচর্য্যার মধ্যে ইহার জন্য সময়ই পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রতি শ্রেণীর জন্য সপ্তাহে দুই দিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টা করিয়া শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেও হয়। ইহার অধিক একেবারে অসম্ভব। অন্যাধিক ৫।৬ ঘণ্টা অতিবাহিত করিবার পর ছাত্রদিগকে পুনরায় শিল্পশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে আসিতে বলা তাহাদের উপর পীড়ন হইতে পারে। স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমরা আমাদের বিদ্যালয়সমূহে এই দিক্ দিয়া চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছি। তাঁত, কাঠের কাজ, কৃষি, সেলাইয়ের কাজ, ছাপাখানার কাজ প্রভৃতি কয়েকটী শিল্প আমরা সহজেই প্রতি বিদ্যালয়ে আয়োজন করিতে পারি।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য যে পঞ্চাঙ্গ শিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে চাই একটা পঞ্চাঙ্গ syllabus এবং উপযুক্ত আচার্য্য। বস্তুতঃ শিক্ষাদান নির্ভর করে তিনটি বস্তুর উপর। শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষা-ব্যবস্থা। শিক্ষামন্দিরে শিক্ষকই ছাত্রদিগের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। ইঁহাদের আদর্শানুসারে ছাত্রজীবন গড়িয়া উঠিবে। উপরোক্ত পঞ্চাঙ্গ শিক্ষা মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করাইতে না পারিলে, শিক্ষাদানের কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয় না। ইহার জন্য যে ত্যাগী ও তপস্বী শিক্ষকের প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই দেশে একদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পদ্ধতিকে রূপ দিবার জন্য যেমন শিক্ষক তৈয়ারীর প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তেমনি অন্য দিকে ওয়ার্দ্ধা-পদ্ধতিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক গড়িবার সুদৃঢ় ব্যবস্থা হইতেছে। আচার্য্য হইবেন শুধু অধ্যাপনার জন্য নহে, পরন্তু কর্ম্মী এবং সাফল্যের কল্পমূর্ত্তি—তাঁহাদের প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিশক্তি ফুটিয়া উঠিবে। তাহার পরই ছাত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়া এমন করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে মর্ম্ম দিয়া অনুভব করিতে পারে সেখানে তাহারা কি শিক্ষা লইতে যাইতেছে, কিরূপ চরিত্র-বিকাশের আশায়। বিদ্যালয়ে প্রবেশকাল হইতেই ছাত্রেরা অভ্যাস করিবে শিক্ষক ও গুরুজনের অনুগত হইয়া চলিতে, তাঁহাদিগকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিতে, নিরলস জীবনযাপন করিতে, কুসঙ্গ ত্যাগ করিতে এবং বিনয়-ভাব অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন, শুচিতা ও মৌন অভ্যাস করিতে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ ব্যবস্থা যদি কোথাও গড়িয়া উঠে, আমাদের বিশ্বাস রাজশক্তি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অন্তরায় হইবেন না।

দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি

রায়
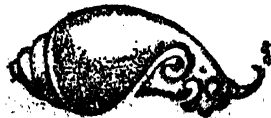
শ্রুতি, স্মৃতি আর ন্যায় বিশাল হিন্দুজাতির অপূর্ব্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-রক্ষার অমর ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রুতি বেদাদি শাস্ত্র। স্মৃতি মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র। আর তৃতীয়—ন্যায় বা যুক্তিপ্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্র। এই প্রস্থানত্রয় ভারতের জাতি-সংরক্ষণের সেতু-স্বরূপ। যুগের সঙ্গে এই প্রস্থানত্রয় কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রধানেরই ইহা ব্যপদেশ, তাই ক্ষতির কারণ হয় নাই। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎ শ্রুতির, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও গীতা স্মৃতির এবং বেদান্তই ন্যায়ের স্থান লইয়াছে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য শাস্ত্রবিধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই সকল কথা পরে আসিবে।

গীতায় ভগবানকে পার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান যদি সর্ব্বকর্ম্ম উৎসর্গ করা হয়, আর ইহাতেই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নিহিত থাকে, তবে মানুষ ইহার অন্যথা করে কেন?" শ্রীকৃষ্ণ এক কথায় ইহার উত্তর দিয়াছিলেন "অত্যুগ্র দুষ্পূরণীয় রজোগুণসমুদ্ভব কামে ও ক্রোধরূপ যে মহাপাপ, তাহাই মানবের ধর্ম্মপথের পরিপন্থী।"

পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাপও সমরেখায় চলিয়াছে। পুণ্য—পুণ্য। পাপ—পাপ। পুণ্য কখনও পাপ হয় না। পাপও পুণ্যে উন্নীত হয় না। এই দুইটি প্রসিদ্ধ পথের কথা এই অধ্যায়ে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এক দৈবী, অন্য আসুরী। এই উভয় পথের পাথেয় যাহা, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। মানুষ কোন পথের যাত্রী, তাহা কর্ম্ম ও গুণ-লক্ষণ দেখিয়া নিজেরাই নির্ণয় করিতে পারিবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—ন্যায়াদি শাস্ত্রে জগৎকারণ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য নহে, এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। বেদান্তেও সৃষ্টির উপাদান-স্বরূপ ব্রহ্মই নির্ণীত হইয়াছেন। গীতাও বলেন, "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" এক অদ্বয় তত্ত্ববস্তু হইতেই সমুদয় উদ্ভূত এবং তাহাতেই বিধৃত বা ব্যাপ্ত। সৃষ্টির মধ্যে এমন দুরতিক্রমণীয় বৈষম্য তবে কেমন করিয়া সম্ভব হয়? ইহার উত্তর গীতায় নানা স্থানে আছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে "অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি" ইত্যাদি—আমরা ইহা লইয়া অধিক আলোচনা করিব না। ঈশ্বর সৃষ্টির মূল হইলেও, "কর্ম্মানুবন্ধীনি" হেতু এই লোকে অসংখ্য প্রকার বিষম গতির সৃষ্টি হয়। নবম অধ্যায়ে "মোঘাশা মোঘ-কর্ম্মাণঃ" শ্লোক উচ্চারণ করিয়া লোকচরিত্রের দ্বিবিধ গতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্ণয় করিয়াছেন। যাঁহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাঁহাদের বলা হইয়াছে রাক্ষসী ও আসুরী। আর ঈশ্বরযুক্ত লোকেদের দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন বলা হইয়াছে। রাক্ষসী ও আসুরী জীবদ্বয়ের তুল্যতা অধিক থাকায়, এই উভয়াত্মক জীবন-ধারাকে এই অধ্যায়ে একই আসুরী নাম দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নোক্ত তিনটী শ্লোকে দিব্যগুণসম্পন্ন লোক-চরিত্র বর্ণনা করা হইতেছে।

> অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
> দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১
> অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
> দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
> তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
> ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

হে ভারত, নির্ভীকতা, প্রসন্নতা, জ্ঞানযোগনিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরশ্রীতে অকাতরতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অজিঘাংসা, অভিমানরাহিত্য—দৈবজীবন লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তির এই গুণগুলির স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে।

ইহার বিপরীত স্বভাব যাহা, তাহাই আসুরী। উহা হইতেছে—

> দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
> অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

* গীতার ষোড়শ অধ্যায়াবলম্বনে লিখিত। পূর্ব্বানুবৃত্তির ক্রম: গীতার যোগ (২য় খণ্ড) দশম পরিচ্ছেদ।

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান আসুরী সম্পদ্। আসুরীসম্পদ্‌সম্পন্ন ব্যক্তি এইগুলি আশ্রয় করে।

'অভিজাতস্য' শব্দের অর্থ "অভিলক্ষ্য উৎপন্নস্য" অর্থাৎ গৃহীত-জন্মা জীবের যে লক্ষ্য, সে তদুপযোগী সম্পদে সম্পন্ন হয়। যাহার লক্ষ্য দৈবী, সে দৈবী-সম্পৎ-সম্পন্ন হয়। যাহার লক্ষ্য আসুরী, সে আসুর-সম্পৎ-সম্পন্ন হয়। এইরূপ অর্থই এই ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। কেননা, এই উভয় প্রকার সম্পদ্ লইয়া "দ্বৌ ভূতসর্গৌ" সৃজনের কথাই পরে ব্যক্ত হইবে।

প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রগুলির উপর ভিত্তি করিয়া অর্ব্বাচীন যুগ যতই কেন বর্ত্তমান যুগোপযোগী ধর্ম্ম ও আচারের সমর্থন অন্বেষণ করুক, উহা একেবারেই নিরর্থক। গীতা এই ক্ষেত্রে মহর্ষি মনুর যুক্তিই অনুসরণ করিয়াছে। মহারাজ মনু বলিয়াছেন—

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃপুনঃ॥

শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট ইহার টীকায় বলিয়াছেন "স প্রজাপতি যং জাতিবিশেষং ব্যাঘ্রাদিকং যস্যাং ক্রিয়ায়াম্ হরিণমারণাদি-কায়াম" ইত্যাদি অর্থাৎ সেই প্রজাপতি ব্যাঘ্রাদি যে যে জাতিবিশেষকে সৃষ্টি করিলেন, হরিণমারণাদি কার্য্যে যাহাদের নিযুক্ত করিলেন, তাহারা পুনঃ পুনঃ সেই সেই কর্ম্মই আচরণ করিয়া থাকে। জন্মের যাহা লক্ষ্য, জীবনে তাহাই সিদ্ধ হয়। অতএব জীবের জন্ম-লক্ষ্য যাহা, তাহার জন্য জীব দায়ী নহে, প্রজাপতি স্বয়ং দায়ী। অমৃতবৃক্ষ অমৃত-ফল, বিষবৃক্ষ বিষফল প্রসব করিবে — ইহাই সৃষ্টিবিধি। সৃষ্টির প্রথমে যে বীজে যে গুণ নিহিত হইয়াছে, উত্তরকালে তাহাই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। এই কথারই সমর্থন পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডবঃ।
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥৬॥

দৈবী সম্পদ্ বন্ধনমুক্তির হেতু। আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব! শোক করিও না। দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়াই তোমার জন্ম।

হে পার্থ, ইহলোকে দৈব ও আসুর, দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি। দৈব সবিস্তারে বলিয়াছি। আসুর সৃষ্টি আমার নিকট শ্রবণ কর।

দৈবী সম্পদ্ 'বিমোক্ষায়' অর্থাৎ মুক্তির হেতু। আসুরী সম্পদের লক্ষণ তদ্বিপরীত, 'তন্নিবন্ধায়' উহা বন্ধনের হেতু। আচার্য্য শ্রীধর দৈবী সম্পদ্ "যুক্তোময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে—"দৈবীসম্পদ্ তোমার লক্ষ্য, মাশুচঃ।"

যাঁহারা দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্যে রাখিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ঈশ্বরযুক্তির মানুষ। আর অন্য এক শ্রেণীর জীব ঈশ্বরবিযুক্ত হইয়া চলিয়াছে—সেই উপনিষদের "অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ, অন্ধেন তমসাবৃতা" অবর স্তরে। এই অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে আমরা এই কথারই সমর্থন পাইব।

সৃষ্টির ঊর্দ্ধ ও অধঃ, দুই দিকই অনন্ত। যাত্রীরা পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্যে এই উভয় পথে ছুটিয়াছে। মর্ত্ত্য এই উভয় লোকের সন্ধিক্ষেত্র। এইখানে আমরা দৈবী ও আসুর লোক, দুইই প্রত্যক্ষ করি। দেবাসুর-সংগ্রামের ইতিহাস মর্ত্ত্যেরই ইতিহাস। দৈবী সম্পদের কথা বিস্তর উক্ত হইয়াছে। আসুর সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হইতেছে। শ্লোকগুলি পর পর অবধারণ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥৮॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥৯॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০॥

অসুরজনেরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না। তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার এবং সত্য নাই।

তাহারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর মনে করে। স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে সম্ভূত যাহা তাহা কামমূলক ভিন্ন অন্য কিছুই তাহারা মনে করে না।

নষ্টাত্মা, অল্পবুদ্ধি, ক্রূরকর্মা এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া শত্রুর ন্যায় জগৎ-ধ্বংসের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়। দুষ্পূরণীয় বাসনাকে আশ্রয় করিয়া তারা দম্ভমানমদযুক্ত হয়। অশুচি-ব্রত অসুরেরা মোহ-হেতু অশুভকে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

আসুর জনেরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুই প্রসিদ্ধ পথ অবগত নহে। এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা রক্ষিত হওয়ায়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দের দুই স্থলে দুইটী চকার থাকায়, বিধি-বাক্যের প্রতিপাদক প্রবৃত্তি, নিষেধ-বাক্যের প্রতিপাদক নিবৃত্তি বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ইহারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন। শৌচ, আচার, সত্য ইহাদের মধ্যে নাই। এই তিনটী গুণ শাস্ত্রবিদ্ ঋষিদের চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ। শৌচ উপরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নহে। অন্তর ও বাহির পূত হয় যে তপস্যায়, শৌচ এইরূপ তপস্যারই নামান্তর। শুচিসম্পন্ন দিব্য চরিত্রের মানুষ সুদর্শন। শরীরে ক্রোধ-চিহ্ন নাই। নয়নে হিংসার ভ্রূকুটী নাই। স্বার্থ-সাধনে তাহাদের ভাবভঙ্গী সন্ত্রস্ত নহে। অন্তরের শৌচ বাহিরেও সৌম্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

আচার দেহাত্মবুদ্ধিতে আত্মরক্ষা বা আত্মপুষ্টির নিয়ম-নিষ্ঠা নহে। আচার ঈশ্বর-যুক্তির উদ্দেশ্যে নিয়ম ও সংযমের কায়ক্লেশরূপ তপশ্চরণ। অসুরেরা ইহা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। অসুরেরা নিজ স্বার্থসাধনে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরী শ্রেয়ঃ মনে করে। ইহাদের চরিত্র ভিন্ন পথের জন্য ভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছে। দৈবী সম্পদের উপদেশ এই ক্ষেত্রে ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মর্ম্মবোধ অনবগত হওয়ায়, এই জগতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা বিশুদ্ধ নহে। গীতায় যে আছে "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" এই কথা ইহারা স্বীকার করে না। সৃষ্টির মূলে রিরংসা-প্রবৃত্তি ইহারা বড় করিয়া দেখে।

ইহারা ঈশ্বরবাদী নহে। অবিনশ্বর সত্তার সহিত ইহাদের যুক্তি না থাকায়, দৃষ্টিও সঙ্কীর্ণ, বুদ্ধিও অল্প। ইহারা জগতের অহিত করিতেই জন্মগ্রহণ করে। দুষ্পূরণীয় বাসনাই ইহাদের প্রাণে শক্তিকে জাগাইয়া রাখে। ঈশ্বর হইতে পৃথক্ চৈতন্য হওয়ায়, তাহারা দম্ভ ও অহঙ্কারে অশুভকেই আহ্বান করিয়া আনে। আর এই হেতু

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থামন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

—ইহারা অপরিমিত প্রলয়ান্ত চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া, কামভোগই পরম পুরুষার্থ, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া, অসংখ্য আশা-পাশে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধপরায়ণ অসুরেরা কাম-ভোগ নিমিত্ত অন্যায় পরপীড়নের দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

'প্রলয়ান্তাম্' শব্দের অর্থ আচার্য্যেরা 'মরণান্তাম্' করিয়াছেন। প্রলয় শব্দের অর্থ "প্রলীয়তে ক্ষীয়তে জগদস্মিন্ সঃ"—এই প্রলয় চারি প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। নিত্য প্রলয় "যোঽয়ং সংদৃশ্যতে নূনং নিত্যম্ লোকে ক্ষয়স্তীহ" এই ক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দুই প্রকার প্রকৃতি লইয়া ভূতসর্গের সৃষ্টি। আসুর-চরিত্র লোকের মরণান্তকাল এই কাম-ভোগপরায়ণ চিন্তা অপরিমেয় বলা হয় নাই। যতদিন সৃষ্টি, ততদিন এইরূপ অশুভ চিন্তা এই শ্রেণীর লোককে আশ্রয় করিয়া থাকে। আচার্য্য রামানুজ তাই বলিয়াছেন "প্রলয়ান্তাং প্রাকৃত-প্রলয়াবধি" ইত্যাদি। প্রাকৃত প্রলয়ের লক্ষণ—

মোহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ম্।
প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ ॥"

—অতএব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক স্মরণীয়।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪

বীজপ্রদ পিতা মহৎ যোনিতে যে যে সৃষ্টি সম্ভব করিয়াছেন, তাহা এই প্রাকৃত প্রতিসর্গের লয়-কাল পর্য্যন্ত বীজগত গুণ লইয়া প্রকাশ পাইবে। সর্ব্বভূতই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কল্পক্ষয় না হইলে, তাহার অন্ত হইবে না। এইজন্য আমরা দেব-দ্বেষী অসুরকে কৃত যুগেও দেখিয়াছি, বর্ত্তমানেও দেখিতেছি। গৃহশত্রু বিভীষণ যে অমর, এ কথা আমরা স্বীকার করি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের নৈশ গুপ্তহত্যাকারী অশ্বত্থামা এখনও যে বিরাজ করিতেছেন, তাহা আর না বলিলেও চলিবে। যশোহরের

কীর্ত্তিধ্বংসকারী ভবানন্দের শেষ হইবে না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ান্তকাল ইহা চলিবে। প্রহ্লাদাদির অসুর-কুলে জন্ম হইয়াও দৈবী সম্পদের অধিকারী হওয়ার যে উপাখ্যান, তাহা হয় কণ্টক-বনে চন্দন-তরুর জন্মের ন্যায় আকস্মিক অথবা ইহা দৈবী সম্পদের শক্তিজ্ঞাপক। হিন্দুজাতি অসত্য হইতে সত্যে, হিংসা হইতে অহিংসায় ক্রমবিকাশের বিজ্ঞান স্বীকার করে না। হিন্দুর বিজ্ঞানদৃষ্টি এই লোকে দ্বিবিধ প্রকৃতির কথা স্বীকার করিয়াছে—শুধু অনুভূতির সাহায্যে নহে, ভূয়োদর্শনে। আসুরী শক্তির প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে, দৈবীশক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আবার দৈবী শক্তির প্রাদুর্ভাবে, আসুরী শক্তি প্রশমিত হয়। গুণাদির নিত্যত্ব হেতু ইহার আশ্রিত জীবেরও নিত্যত্ব আছে। খলকে, কপটকে, নাস্তিককে হিন্দুশাস্ত্র তদ্বিধ-ভাবেই দেখিয়াছে—তাহাদের প্রতি যে করুণা, তাহা মানবহৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বলিয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপনাদের সংযুক্ত করিয়া, সত্য হইতে সত্যে, যুক্তি হইতে পরম যুক্তিতে উর্দ্ধলোকে যাত্রার নির্দ্দেশ দিয়াছে। আমরা এই দৈবী চরিত্রের ক্রমভেদের কারণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাইব। কিন্তু অশুচি, অনাচারী, অবিশ্বাসী কোনদিন দৈবী সম্পদের অধিকারী হইতে পারে, এ যুক্তি গীতায় পাইব না। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"—যাহার যে অংশ, তাহা সে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে বিধি-নিয়মে, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে। এইখানে মানুষের পরিত্রাতা মূর্ত্তি খোদার উপর খোদকারী বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে অভিমত প্রকাশ করে।

প্রতিবাদী প্রশ্ন তুলিতে পারেন "তবে কি পতিতের উদ্ধার নাই, পাপীর মুক্তি নাই?" এই প্রশ্নের উত্তর পরে দিব। গীতার বর্ত্তমান অধ্যায়ে দুইটী বিশেষ গতির কথাই বলা হইতেছে। এই বিষয়টী আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। গীতায় আর্ত্তের উদ্ধার আছে। অর্থার্থীর কৃতার্থতা আছে। জিজ্ঞাসুর জ্ঞান-প্রাপ্তির কথা আছে। মুমুক্ষুর মোক্ষ-বিধান আছে। নষ্টচেতাঃ, দুর্ম্মতিপরায়ণ, অহঙ্কারীর প্রতি করুণার কোন কথা নাই। বরং "প্রকৃতেগুর্ণসমূঢ়া" অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ-প্রভাবে বিমোহিত হীনবুদ্ধি মানব-গণের বুদ্ধিবিপর্য্যয় সংঘটন করা গীতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। গীতার বহু স্থানে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। নানারূপ কামনার প্রাবল্যে অপহৃত-বিবেক মানবেরা ঈশ্বর ভিন্ন বাসনা-সিদ্ধির বিধায়ক অন্যান্য দেবতাগণের আরাধনা করে। সপ্তম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে এই কথা আছে। "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা" নবম অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায় "জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো-গচ্ছন্তি তামসাঃ"। গীতার পূর্ব্বোক্ত বাণী বর্ত্তমান অধ্যায়ে বিশেষ করিয়াই বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোক এই প্রকার প্রকৃতির মানবগণের অভিসন্ধির কথা আখ্যাত হইতেছে

ইদমদ্য ময়ালব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬

আজ আমা কর্ত্তৃক এই সকল দ্রব্য আহৃত হইয়াছে। এই সকল মনস্তুষ্টিকর আমি পাইব। আজ আমার এই ধন আছে। পুনরায় আমার এই ধন হইবে।

আজ আমি শত্রুকে নিহত করিয়াছি, অন্যকেও করিব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, সুখী।

আমি ধনবান্, কুলীন, আমার মত কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব, সুখ লাভ করিব। ইহারা অজ্ঞান-বিমোহিত।

অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্ত, মোহ-জাল-সমাবৃত, কামভোগে আসক্তগণ অপবিত্র নরকে পতিত হইতে হয়।

আশাপাশসৃষ্টি বাসনার দ্বারাই হয়। আজ ইহা পাইয়াছি, কাল আরও পাইব। ভবিষ্যতে আরও অধিকতর সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিব। এইরূপ আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের কল্পনায় এই শ্রেণীর মানবদের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তাহারা মনে করে—কাল ইহাকে জয় করিলাম। পরশ্ব অন্যকে জয় করিব। আত্মকর্তৃত্বের উপর বিশ্বাস দৃঢ়

হয়। আপনাকে ছাড়াইয়া বৃহতের সন্ধান ইহারা করে না। ধনের গরিমা, আভিজাত্যের গরিমা তাহাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে। 'আমি, আমি' করিয়া তাহারা অবিবেকে মুগ্ধ হয় ও পরিণামে অপবিত্র নরকে নিপতিত হয়। 'নরক' শব্দের অর্থ যন্ত্রণাময় স্থান। আচার্য্যেরা ইহাকে বৈতরণী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈতরণী নদী যেমন যমদ্বার হইতে ইহলোককে যোজনদ্বয় ব্যাপিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, উপরোক্ত ভূতসর্গের মধ্যে ইহা দ্বিবিধ গতির পার্থক্যই বুঝাইতেছে। এই নরক শব্দ অশুচি শব্দে বিশেষিত হইয়াছে। ঈশ্বর-চৈতন্য-যুক্ত হইয়া যে কর্ম্ম, তাহাই "নো কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"। অর্থাৎ "মদর্থং কুরু কর্ম্মণি" কর্ম্মে ক্ষুদ্র স্বার্থচরিতার্থতার হেতু নাই। ইহার বিপরীত কর্ম্মে মানুষ সীমা হইতে সীমায় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। এক সৃষ্টি সীমার মধ্যে নিপীড়িত, আর এক অসীমের মধ্যে লীলায়িত। সীমা অপূত। অসীম পূত, মুক্ত। স্বর্গ, নরক শব্দ এই লক্ষণ-যুক্ত অর্থেই এই ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। আসুরী স্বভাবের বর্ণনা এখনও শেষ হয় নাই।

আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥

আপনা আপনি অহঙ্কৃত, অনম্র, ধন-মান-মদযুক্ত অসুরেরা দম্ভ সহকারে নামপ্রসিদ্ধির নিমিত্ত অবিধি-পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

ভোগাধিকারেই এই সকল লোকের চিত্ত অভিভূত থাকে না। "আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ" ধন-মান-মদে অহঙ্কৃত হইয়া নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করে—যেন তাহাদের আর কিছুই করিবার নাই। তাহারা নামমাত্র যজ্ঞে ধর্ম্মধ্বজিত্বের খ্যাতি অর্জ্জন করে। শ্রীধর স্বামী নাম-যজ্ঞ শব্দের অর্থ নাম মাত্র প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহারা যাহা কিছু করে, নামের জন্যই করে, তাহার মধ্যে না থাকে বিধি, না থাকে শ্রদ্ধা।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মমাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ।৪।১৮॥

অহঙ্কার, বল, কাম, দর্প, ক্রোধের আশ্রয়ে আত্মদেহে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করিয়া সাধুগণের নিন্দুক হয়।

আমিই কর্ত্তা, আমার তুল্য আর কেহ নাই—ইহার নাম অহঙ্কার। আমার প্রভাব ও প্রতিপত্তি আমারই অর্জ্জিত—ইহাই বল। আমার সমকক্ষ কেহ নাই—ইহাই দর্প। আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হওয়া চাই—ইহাই কাম। আর যে আমার অনিষ্ট করিবে, তাহাকেই নিপাত করিব; অতএব আমার বড় কাহাকেও দেখিলে তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। আত্মবুদ্ধিবশতঃ স্ব-দেহে ও অন্যের মধ্যে সর্ব্বনিয়ন্তার দর্শন ইহাদের হয় না। কুযুক্তির দ্বারা সাধুজনের প্রতি ইহারা দ্বেষ প্রচার করিয়া থাকে। এইরূপ চরিত্রবিশিষ্ট অসুরগণের গতি-নির্ণয় পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥

আমি দ্বেষকারী, হিংস্রক, নরাধম, অশুভকর্ম্মপরায়ণ তাহাদিগকে সংসারে আসুরী যোনিসমূহে নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

ভগবান করুণাময় বলিয়া যে খ্যাতি, এই কথায় তাহার হানি হইতেছে। নবম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে তিনিই না বলিয়াছেন "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ' —তবে আবার এই শ্লোকে ঈশ্বরদ্বেষীদের নরাধম বলিয়া নিরন্তর আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন কেন?

কিন্তু এই কথাগুলির মধ্যে "অহং ক্ষিপামি" এই কর্ত্তৃত্ববাচক বাক্যে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিচলিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তমের কর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। এখানে বিধানের কথাই বলা হইয়াছে। বীজধর্ম্মের যাহা অভিব্যক্তি, তাহা স্বতঃই হইতেছে। মূলে আছে—ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাই ঈশ্বরচৈতন্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নির্গত এই সনাতন বাণী দ্বেষের নহে। তাঁহার কর্ম্মে যে বৈষম্য, তাহা আমরা স্বীকার করিয়া লই না। সাম্য ঈশ্বরে, সৃষ্টিতে নহে। পূর্ব্বেই এই কথা বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন "অথ কপূয়চরণা অভ্যাশেহ শীঘ্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" অর্থাৎ পাপনিরত ব্যক্তি কর্ম্মানুসারে পাপনিরত অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে—কুক্কুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ অধ্যায়ের

প্রথমেই "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি" প্রভৃতি গুণাধিকারী মানুষ দিব্য এবং দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি যাহাদের চরিত্রের লক্ষণ, তাহারা আসুরী বলিয়া বিষয়টী উপলব্ধি করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই যে দ্বিবিধ চরিত্র, দ্বিবিধ সৃষ্টির দ্যোতক সৃষ্টিবৈষম্য—ইহাতে ঈশ্বরের উপর বৈষম্য-দোষের আরোপ হয় না। তিনি সৎ ও অসৎ ভূমিকার কল্পারম্ভে যে অভিনয় সুরু করিয়াছেন, কল্পান্তে তাহা শেষ হইবে। ঋষি বাদরায়ণও বলিয়াছেন "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে নোপাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।"। অর্থাৎ বিষম-সৃষ্টি-দর্শনে ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষের আরোপ করা যায় না। সমস্তই নিমিত্তান্তরের দ্বারা উদ্ভূত হয়। এই নিমিত্ত মহদাদি-গুণ-সম্ভূত। জগতের দুই প্রকার গতিরই অনস্তত্ব আছে। দৈবী গতিও ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধ স্তরে চলিয়াছে। আসুরী গতিও তলাতল ফুঁড়িয়া অধো-মুখে ছুটিয়াছে ঈশ্বর-লীলায়। দৈবী লীলার কথা গীতাকার সবিস্তারে বলিয়াছেন; এই ক্ষেত্রে আসুরী লীলার কথাই বলিতেছেন। পূর্ব্বে ভগবান যেমন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ...যুগে যুগে" তাঁহার আসার কথা বলিয়াছেন, এইখানে তেমনি কেবল নিজের নামটী গোপন করিয়া অধর্ম্মের জন্য "জন্মনি জন্মনি" আনাগোনার কথা তুলিয়াছেন। ভাষার ছলনায় তাঁহার লীলাকে খণ্ড করিয়া আমরা দেখিব না। তিনি বলিতেছেন—

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম ॥২০

হে কৌন্তেয়, অবিবেকিগণ জন্ম জন্ম আসুর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পায় না। এই হেতু তাহারা অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জন্ম জন্ম মূঢ়েরা আত্মচৈতন্যবিমুখ হইয়া অধম গতি পায়। আর জন্ম জন্ম উত্তম গতির জন্য ভগবান আবি-র্ভূত হন। এই 'মূঢ়' শব্দটির মূলগত সাদৃশ্য কাহার সহিত মনে করিব? নিম্বের তিক্ততা, রসালের মিষ্টতা কাহার বিধানে অনুস্যূত? অমৃতের পুত্রেরা যে তোরণ-দ্বারে প্রবেশ করে, তাহার বর্ণনা শাস্ত্রে যথেষ্টই মিলে। আসুর সম্পদ্ লইয়া যাহারা চলে, সংক্ষেপে তাহাদের গতি-পথের কথাই অতঃপর গীতা বলিতেছেন।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ংত্যজেৎ ॥২১॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিন নরকের দ্বার। আত্মার নাশকর এই তিনটীকে এই হেতু ত্যাগ করা বিধেয়।

নাটকারম্ভে যাহাকে যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, সে তাহার সাজসজ্জা সংগ্রহ করিয়া লয়। নাটকের মধ্যে অংশ-বিশেষের অবস্থান্তরও বিহিত থাকে। রাজবেশে যিনি আবির্ভূত হন, তাঁহার কাঙ্গাল বেশও দেখিতে হয়। এ জগৎ একটা মহানাট্য। দৈবী অথবা আসুরী—আবার ইহার মধ্যে অসংখ্য বৈচিত্র্য-সৃষ্টি জগদভিনয়ে চলিয়াছে। কাম, ক্রোধ ও লোভ সংযত করিয়া সর্ব্বভূত সম্বন্ধে যাঁহার চৈতন্য জাগ্রত, এই দীর্ঘ অভিনয়ে তাঁহারও অবস্থান্তর দেখা যায়। আবার আসুরী চরিত্রেরও এইরূপ অভাব-নীয় অবস্থাভেদ আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। যতক্ষণ অভিনয়, ততক্ষণ কিন্তু চরিত্রবৈষম্য সুরক্ষিত হয়। সাম্য অভিনয় নয়। উহা লয়, অভিনয়ের অবসান।

এই জীব-শরীর ভূতাত্মা নামে পরিচিত। ইহা লইয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতিরিক্ত মহৎ-সংজ্ঞক আর এক চৈতন্যময় সত্তা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। ইহাকেই অন্তরাত্মা বলা হয়। এই মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পঞ্চভূতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সর্ব্বজীবেই ইহারা অবস্থিত। সেই পরমাত্মা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসংখ্য জীব বিনিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনিতে নানা দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছে। এই সৃষ্টিকালে প্রতি দেহীর অভিলক্ষ্য কি, তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে এবং এই অমর প্রেরণাই জীবকে স্ব-স্ব ভাবে ও ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সৃষ্টি-বৈষম্যের ছন্দঃ রক্ষা করে। অর্জ্জুনের অভিলক্ষ্য দৈবী প্রকৃতি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ 'মাশুচঃ' বলিয়া এই জন্যই আশ্বাস দিয়াছেন। দুর্য্যোধনকে এ কথা তিনি বলেন নাই। এই দৈব লীলার আচার ও শাস্ত্র ভারতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গীতার বর্ণে বর্ণে সেই ইতিহাসই প্রকাশিত হইয়াছে। আসুরী সম্পদের কথা বিস্তর বর্ণনা করিয়া এই বার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন—

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

হে কৌন্তেয়! এই তিন তমোদ্বারবিমুখ মানব আত্মশ্রেয়ঃ সাধন করে। তাহা হইতে তাহারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

তমোদ্বার ঈশ্বর-বিমুখ সঙ্কীর্ণ-চিত্ত লোকের জন্য। তাহা অন্ধকার হইতে অন্ধকারেই লইয়া চলে। এ পথ অর্জ্জুনের নহে। দৈবী ও আসুরী চরিত্র এই মর্ত্ত্যেরও সম্পদ্। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্মৃতি বলিয়াছেন "ঋতং সতং তচ্চ প্রায়েণ দেবানাং"। মর্ত্ত্যজীব দেবতা নহে, মানুষ। তাই আবার "অনৃতং অসতং তদপি মনুষ্যানাম্"। এই মানুষের মধ্যেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ নিহিত হইয়াছে। সে চাহিয়াছে 'দেবহিতং আয়ুঃ'। কাজেই তাহাকে অহিত ও অনৃত হইতে মুক্তি লইতে হইবে। বিষ ও অমৃত মর্ত্ত্যের যুগল খাদ্য। "অনৃতম-সত্যম্" রুচিও মানুষেরই আছে। সে বিষও সেবন করিবে। পার্থের অভিলক্ষ্য যদি দেবহিত আয়ুঃ হয়, এই এক পাত্রে বিষামৃতের মিশ্রণ হইতে অমৃতই তাহাকে আহরণ করিয়া লইতে হইবে। এই গ্রহণের শিক্ষা আছে, কৌশল আছে। উহার জন্যই পক্ষিমাতা শাবককে খাদ্য-গ্রহণাদি ব্যাপারে যেমন করিয়া শিক্ষা প্রদান করে, শ্রীভগবান ভক্ত অর্জ্জুনকে অমৃতগ্রহণের উপায় ও কৌশল তদ্রূপ প্রদর্শন করিতেছেন।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে, সে তত্ত্বজ্ঞান পায় না। না সুখ, না পরম গতি সে লাভ করে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রাবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

অতএব কার্য্য ও অকার্য্যের অবধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। যাহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, তাহা জানিয়া ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

পরম গতির জন্য আত্মার শ্রেয়ঃ যাহা, তাহার আচরণের কথা পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে। তমোদ্বারে প্রবেশ করিয়া যাহারা অধোগতির পথে, তাহাদের জন্য গীতা নহে। 'পরাম্ গতিম্' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গতির জন্য গীতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আমরা বুঝিয়াছি— ইহলোকে অর্থাৎ এই মর্ত্ত্যে দুই প্রকার সৃষ্টি আছে। এক দৈবী, অন্য আসুরী। দৈবী সৃষ্টির সম্পদের নাম আমরা শুনিয়াছি মাত্র। বস্তুর নাম শুনিলেই তাহা হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে বলে 'উপায়েন হি সিধ্যন্তি, কার্য্যাণি নো মনোরথৈঃ"—মনে মনে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, উপায় আশ্রয় করিতে হয়। অতএব দৈবী সম্পদের অধিকারী হইতে হইলে, তাহার জন্য আচারানুষ্ঠান আছে। সেই আচারানুষ্ঠান 'কামকারতঃ' নহে, শাস্ত্রসঙ্গত হওয়া চাই। শাস্ত্র কি? যাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা হইতে বিরত করিয়া, বিধিমার্গে পরম গতির দিকে আগাইয়া দেওয়ার বাণী-মন্ত্র যাহাতে, তাহাই শাস্ত্র। হিন্দুজাতি এইরূপ ১৮ খানি শাস্ত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ৬টী বেদাঙ্গ। ৪টী বেদ। মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। এই ১৮ খানি আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ। চতুষষ্ঠী বর্ণের উচ্চারণ-বিধি নিরূপিত হয় শিক্ষায়। কল্পে বৈদিক কর্ম্মাদির উপদেশ আছে। শব্দতত্ত্ব—বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট ও বাক্যরচনার বিশেষ জ্ঞান ব্যাকরণেই মিলে। নিরুক্তে অর্থতত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত আছে। ইহা না হইলে বেদ-মন্ত্র চাষার গান বলিয়া মনে হইবে, বেদের শব্দার্থ মর্ম্মগত হইবে না। জ্যোতিষ এই বেদের চক্ষুস্বরূপ। হোরা, গণিত, সংহিতা, কেরলী এবং শাকুন, ইহার পঞ্চস্কন্দ। শ্রৌত অথবা স্মার্ত্ত কোন কর্ম্মই এই শাস্ত্র ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। ছন্দঃ বেদমন্ত্রের উচ্চারণের নীতি শিক্ষা দেয়। যে বেদ ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল, ছন্দঃ সেই বেদের চরণ। কল্প হস্ত। জ্যোতিষ চক্ষু। নিরুক্ত শ্রোত্র। শিক্ষা ঘ্রাণ এবং ব্যাকরণ মুখ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিজ্ঞান মীমাংসা শাস্ত্রে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসা, বেদব্যাসের উত্তর মীমাংসা পূর্ণাঙ্গ বেদ-ধর্ম্মের নিরূপক। ন্যায়শাস্ত্র ষড়্দর্শনের

ভিত্তিস্বরূপ। ভারতের জাতি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যেই নাস্তিকদিগের মত খণ্ডন হয়। জগৎ-কারণ ঈশ্বর স্থির করিয়া, সকল সংশয়ে মূল উৎপাটন ও বেদার্থনির্ণয় ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন সম্ভব নহে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান—ন্যায়-দর্শনে এই ষোড়শ পদার্থ নির্ণয় দ্বারা ভারতের মৌলিক জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মনু ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা; আরও ১৯ জন প্রধান ভারতীয় ঋষি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এই ১৯ জন স্মৃতিকার ঋষির নাম ভারতে চির প্রসিদ্ধ। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। পুরাণ প্রধানতঃ পঞ্চলক্ষণযুক্ত—উহা সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পুরাণ আখ্যায়িকাবলম্বনে বেদার্থই বর্ণনা করিয়াছে। পুরাণের মধ্যে এ জাতির সুপ্রাচীন ইতি-হাসও নিহিত আছে।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র। আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান ও প্রশমন আয়ুর্ব্বেদেই পাওয়া যায়।

ধনুর্ব্বেদ অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ ও উপায়সমূহ প্রদর্শন করে। গান্ধর্ব্ববিদ্যা সঙ্গীত ও নৃত্যকলাশাস্ত্র। ইহা সপ্তাধ্যায়বিশিষ্ট। স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, তালাধ্যায়' নৃত্যাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, কোপাধ্যায় এবং হস্তাধ্যায়। আর সংসারে বৈষয়িক ব্যাপারের উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উহা সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয় যে নীতির দ্বারা, তাহাই অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

একটা জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অভঙ্গ অখণ্ড রাখিতে হইলে, তাহার পশ্চাতে জীবনের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-সাধনের সুপরীক্ষিত যে সার্ব্বজনীন নীতির প্রয়োজন, তাহা হিন্দুজাতি বহু সহস্র বৎসরের অনুশীলনে আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এ নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিপ্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার অহমিকা, তাহাই জাতির ভিত্তি উল্টাইয়া দেয়। হিন্দুজাতি ইহা স্বীকার করে না। হিন্দু প্রাচীন কল্পিত শাস্ত্রাদির শাসনে জাতিকে রক্ষা করিতে চাহে, জাতির শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করে। শ্রীকৃষ্ণ এইজন্য হিন্দুর শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করিয়া যে জাতি ভারতে শাশ্বত কাল বাস করিতে চাহে, তাহাদের এই চব্বিশ শ্লোকটী প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে সুদৃঢ় নিষ্ঠা স্থাপন করার প্রেরণা উপসংহার-শ্লোকে সুস্পষ্ট রূপেই উক্ত হইয়াছে।

আসুরী চরিত্রের কথা এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। "দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্" সপ্তদশ শ্লোকের প্রতিবাদ এই শ্লোকে করা হইল। অহঙ্কার হইতে মুক্তির উপায় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করা। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, সুখী প্রভৃতি উক্তির ন্যায়, আমি যাহা করিতেছি তাহাই সত্য, তাহাই যথার্থ, ইহাও অহঙ্কারোক্তি। এই হেতু কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। শাস্ত্রবিধি স্বীকার করিলে, অহং-বোধ প্রশমিত হয়। যে শাস্ত্র আমাদের আত্মার অভ্যুদয়সূচক, মুক্তি-মূলক ও শাশ্বত সুখের নির্দ্দেশক, তাহা উপেক্ষা করার হেতু অহংদৃপ্ত আত্মপ্রাধান্যের দুষ্টবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আজিও জগতে এমন কিছু সত্য, সুন্দর ও শুভ নীতি দেখা যায় না, যাহা এই জাতির শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। আর এই জন্যই উপনিষদের ঋষি মহাবাণী উচ্চারণ করিতে গিয়াও আত্মদম্ভ দমন করিয়া বলিয়াছেন "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্"। যদিও আমরা বেদমন্ত্রে উচ্চারিত হইতে দেখি 'অগন্মজ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্"—সেই সকল সাক্ষাৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে আমরা ঈশ্বরের সমানধর্ম্মপ্রাপ্ত, জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়াই আখ্যা দিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের বাণীও কুত্রাপি ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। এ জাতি যদি শাশ্বত সুখ ও পরম গতি চাহে, তবে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন উপরোক্ত অষ্টাদশ শাস্ত্রের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। স্বকপোল-কল্পিত শাস্ত্র অথবা শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় আমরা যাহাতে আসুরী ভাব প্রশ্রয় না দিই, এই জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বিশ্লেষণ করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি প্রমাণের বশ্যতা স্বীকার করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভারতের প্রস্থানত্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। উহা সংক্ষেপ করিয়া উপনিষৎ, গীতা ও বেদান্তকে শাস্ত্রসার ত্রি-প্রস্থানরূপে গ্রহণ করার কথাও উল্লেখ করিয়াছি। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শাস্ত্র শব্দ উচ্চারিত হওয়ায়, আমাদের আজ বিচার করিতে হইবে—অষ্টাদশ ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থানে প্রস্থানত্রয় যদি কার্য্য-সিদ্ধির অনুকূল হয়, তবে এক গীতার ভিতর দিয়াই আমরা শাস্ত্র-নির্দ্দেশ পাইতে পারি কিনা। মানুষের আয়ুঃ ক্ষীণ হইতেছে। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া থাকিলে, তাহা অবশ্যই গ্রহীতব্য। গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্র বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিয়াছে। উত্তম গতির জন্য গীতার উত্তম রহস্য যদি অবগত হওয়া যায়, গীতাই সর্ব্বশাস্ত্রসার বলিয়া শিরোধার্য্য হইতে পারে। যুগের পক্ষে এ সুবিধা অপরিত্যজ্য। আমরা বারান্তরে ইহা আলোচনা করিব।

আমি ও পৃথিবী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আমি যাহা চাই পারিবে কি দিতে বসুন্ধরা ?
বেশী কিছু নয়, শুধু বাঁচিবার একটু ভূমি,
দু'মুঠো অন্ন, তৃষ্ণা-জল পাত্র ভরা,
আকাশের তলে নিরাপদ প্রাণ দেবে কি তুমি ?

মাঠে মাঠে কত ফল আর ফসল ফলে,
খনিতে খনিতে কত মণি তব বসুন্ধরা,
কত না রত্ন, রত্নাকরের অগাধ জলে—
হে জীব-পালিনি জীব-জগতের দুঃখহরা !

মরা মানুষের ইতিহাসময় জীবন তব
জানিতে বাসনা একদিনও মোর জাগেনি মনে,
প্রকৃতি তোমার কত বিচিত্র, কী অভিনব
ক্ষুধার জ্বালায় দেখেও দেখি না ব্যথার সনে।

ইহ-পরকাল মোর কাছে সবই মিথ্যা কথা,
জন্ম, মৃত্যু, মহাকাল, নিয়ে কি হ'বে বল ?
পথে পথে ঘুরি বুকভরা লয়ে নিষ্ফলতা
কক্ষে কক্ষে একাকিনী তুমি যেমন চল।

আমি তো জানি না কত আরও বাঁচিতে হ'বে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতাতপ-জ্বালা সহ্য করি',
ভিক্ষাপাত্র আমরণ কি গো শূন্য র'বে ?
নিরাশা-সাগরে বাহি ডুবু ডুবু জন্মতরী।

হে মোর পৃথিবি, বলিতে কি পার কিসের লাগি' ?
এত প্রেম মোর ডুবে যা'বে ঘোর অন্ধকারে ?
শত দুঃখের আঘাত সহেও নীরবে জাগি'
মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বিধাতার চির বন্ধদ্বারে।

আমি জানি সে যে চির অকরুণ তোমারি মত
তোমারি মতন তারি' দ্বারে পাতি ভিক্ষা-ঝুলি,
গোপনে চাপিয়া রক্তাক্ত এ বুকের ক্ষত—
ছন্দে গাঁথিয়া চলেছি মনের স্বপ্নগুলি।

বিজলী ঝলকে কোথা হ'তে এক সোণালী আলো
মাঝে মাঝে মোর ভীরু অন্তর যায় গো ছুঁয়ে,
ঝড়ের ঝাপটে নিভে যায়, সে-যে নিকষ কালো
আঁধারের কোলে আশা-তরুশাখা পড়েগো নুয়ে।

আমি যে তোমার সন্তান অয়ি বসুন্ধরা—
যাহা চাই তাহা দয়া করে' আজ দেবে কি তুমি ?
বিকট অট্ট হাসিতেছ কেন ভয়ঙ্করা,
এলোকেশে তব বহ্নি জ্বালিছে আকাশ চুমি'।

নদী, গিরি, বন, কান্তার, ভূমি, সিন্ধু-বুকে
বুকফাটা কত ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিছে নিতি,—
রাখ নাই আজো ভিখারীরে একবিন্দু সুখে
অগ্নিগর্ভে গ্রাসিতেছ তা'র আর্ত্তগীতি।

ওগো দয়াময়ি, দয়া কর আজ আর্ত্ত জনে,
পারি না যে আর ভয়ে ভয়ে পথে চলিতে একা।
অভাবের জ্বালা সহিতে সহিতে শূন্য মনে,
পরিশেষে কিগো মরণের সাথে করিব দেখা ?

সেদিন ভিক্ষা চাহিব না আর বসুন্ধরা,
চাহিব না আর বাঁচিবার তরে একটু ভূমি,
দু'মুঠো অন্ন, তৃষ্ণার জল পাত্র ভরা,
চিতানলে দিও, মিশে যা'বে ধূম আকাশ চুমি'।

শীল্ডের পরে

বঙ্গদেশের ফুটবল্ খেলার জনক, আই-এফ-এ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম যুগের অতুলনীয় কেন্দ্রচারী শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মর্ম্মকথা পূর্ণ, 'শীল্ডের পরে' পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ আমরা করিতে পারিলাম না। — পরিচালক : প্রবর্ত্তক

শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সপ্তচত্বারিংশৎ শীল্ড প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে 'প্রবর্ত্তক'এর কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ অনুরোধ কেন তাঁহারা করিয়াছেন জানিনা। উপদেষ্টা রূপে আমি কিছু বলি—বোধ হয় সেই আশা তাঁহারা করেন। সে আশা যদি তাঁহারা করেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিরাশ হইবেন—উপদেশ-দানের যোগ্যতা আমার নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফুট্‌বল খেলা প্রবর্ত্তিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে দেশীয়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়া, ইণ্ডিয়ান্ ফুট্‌বল্ এসোসিয়েশন গঠনে বাঙ্গালীর দান, সভাবাজার, হেয়ার স্পোর্টিং, ন্যাশন্যাল, মোহনবাগান ও মোহামেডনের কল্যাণে ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ, আই-এফ-এ গঠিত হইবার কালে কাউন্সিলে বাঙ্গালীকে ইয়োরোপীয়ের সমাদরের সহিত আসন দান, আই-এফ্-এর সভাপতি ও সহকারী সভাপতির আসন বাঙ্গালীর অলঙ্কৃত করা প্রভৃতি কোনওটাই কাহারও উপদেশ-প্রসূত নহে—যোগ্যতা-বলে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিয়াছে, যোগ্যতা ফলে যাহা ন্যায্য প্রাপ্য—বাঙ্গালী তাহা উপভোগ করিয়াছে। আমার আন্তরিক কামনা এ শক্তির হ্রাস বাঙ্গালীর না হয়।

এই সূত্রে বর্ত্তমান বর্ষের শীল্ডজয়ী পুলিশ দলকে সানন্দে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। 'গতকল্য' পর্য্যন্ত অনামা এই পুলিশ দলের অপূর্ব্ব সাফল্য কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জ্জনে সম্ভব—ক্রীড়কমাত্রেরই জানা আছে। শীল্ড সম্বন্ধে ইহার অধিক আমার বলিবার কিছু নাই।

শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বাদুলে শীল্ড্—শ্রাবণের ধারার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসরই শীল্ডের খেলা হয়। এ বৎসরে দুর্য্যোগ যেমন হইয়া গেল তেমন দুর্য্যোগ শীল্ড খেলার সময়ে আর কখনও পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক কয়েকটী গণ্ডীর খেলায় 'রোদ হয়, বৃষ্টি হয়' অবস্থাতেই যায়। তাহার পরে আকাশ যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে—চতুর্থ গণ্ডীর কয়েকটী খেলা, শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীর দুইটী খেলা ফুট্‌বল্ খেলা বলিয়া মনে হয় নাই। মুষলধারায় খেলার মাঠ 'এক হাঁটু', খেলিতে খেলিতে 'কাদা গোলা' হইয়া খেলার মাঠ বলিয়া তাহা আর চিনিতে পারা যায় নাই। খেলোয়াড়দের 'খেলার চাল' দেখিয়া মনে হইয়াছে ভাঁটি-
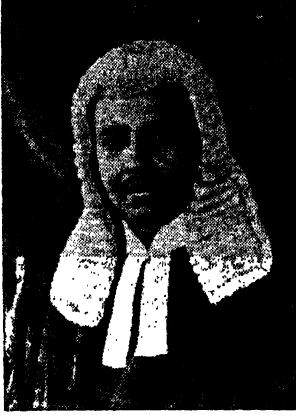
৺মহারাজা মন্মথনাথ চৌধুরী—
আই-এফ্-এর সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়
সভাপতি
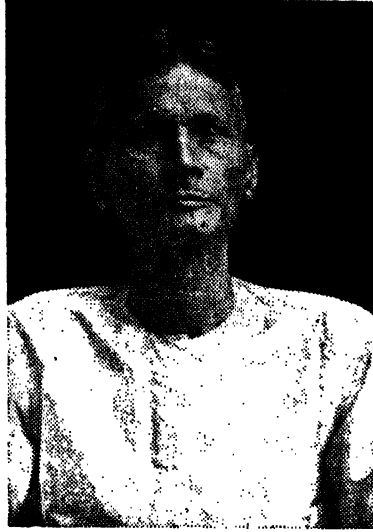
কালীচরণ মিত্র—
আই-এফ্-এর সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—
আই-এফ্-এর সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়
সহকারী সভাপতি

থানার মৌজে জনকতক 'থানাসই' হইয়া আপাদ্-মস্তক কর্দ্দমাক্ত কলেবরে কম্পিত চরণে 'গ্যাস পোষ্ট' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, পুলিশের এক্তার হইতে আপনাদের বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে। ঘোর বর্ষা ও বাদলের জন্য শেষ গণ্ডীর খেলা সময়ে খেলান যায় নাই।

শীল্ডের কদর—আই-এফ্-এ শীল্ডের কদর ভারত জুড়িয়া। ডুরাণ্ড যতদিন সামরিক গণ্ডীবদ্ধ ছিল ততদিন ইহার একটা নিজস্ব ইজ্জৎ ছিল। রোভার্স-এরও নাম আছে, নাম আরও বাড়াইবার চেষ্টা অল্প নহে। তবে ভারতবর্ষের 'ব্লু রিবণ্ড' (Blue Ribband) এই আই-এফ্-এ শীল্ড—ইহা লাভ করা ভারতের সকল কুশলী ক্রীড়া সঙ্ঘের চরম আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে দূর দুরান্তর হইতে সেরা সেরা দল ইহাতে যোগদান ত' করেই, পক্ষান্তরে জয়ের আশা আদৌ করে না, এমন দলও অনেক আসে। পরাজয়ের মধ্য দিয়া আপনাপন দলের ক্রমোন্নতি করা, দেখিয়া শেখা তাহাদের উদ্দেশ্য। ঘোর বাদলের জন্য শীল্ডের যোগ্য খেলা এবার বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না—আফ্‌শোষের কথা।

শীল্ডজয়ী—শীল্ডজয়ীর মধ্যে সামরিক ও অ-সামরিক দলের সংখ্যা আমরা একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছি। সংখ্যায় অধিকবার জয়ী সামরিক দলই। তাহাদের মধ্যে আবার বাহিরের দলই বেশী। সামরিক

ভারতের 'ব্লু রিবণ্ড'—আই-এফ্-এ শীল্ড

দলের মধ্যে উপর্য্যুপরি তিনবার জয়ী হইয়াছে গর্ডনস্ (১৯০৮, ১৯০৯, ১৯১০) শেরুউড ফরেষ্টরস্ (১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮) উপর্য্যুপরি দুইবার জয়ী হইয়াছে রয়াল্ আইরিশ্ রাইফল্‌স্ (১৮৯৩, ১৮৯৪—প্রথম দফা), (১৯১২, ১৯১৩—দ্বিতীয় দফা) ইহা ব্যতীত ১৯০১-এর শীল্ড জয়ীও রয়াল্ আইরিশ্ রাইফল্‌স্। অসামরিক দল ক্যাল্‌কাটা জয়ী হয় উপর্য্যুপরি তিনবার (১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪), উপর্য্যুপরি দুইবার (১৯০৩, ১৯০৪) ইহা ব্যতীত ক্যাল্‌কাটার শীল্ড সাফল্য ঘটে, ১৮৯৬, ১৯০০, ১৯০৬ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। ডাল্‌হাউসী শীল্ড জয় করে ১৮৯৭ ও ১৯০৫

১৯১১র শীল্ড জয়ী—মোহনবাগান। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মোহামেডন শীল্ড-বিজয়ী।

আই-এফ্-এ শীল্ড-বিজয়ী 'পুলিশ'

শীল্ডে দেশীয়ের কৃতিত্ব—১৮৯৩ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত ৪৭ বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইবার দেশীয় দলের শীল্ড জয় হইতে প্রতিযোগিতায় দেশীয়ের ক্রীড়াশক্তির অল্পতাই অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক। ঘটনা পরম্পরার কথা জ্ঞাত হইলে এ যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা বোধগম্য হইবে সকলেরই। শীল্ড প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ট্রেড্‌স্ কাপই ছিল ফুট্‌বলের বড় প্রতিযোগিতা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফুট্‌বল্ খেলা প্রথম আরম্ভ করিয়া দশ এগার বৎসরের মধ্যে বড় প্রতিযোগিতা সেই ট্রেড্‌স্ কাপে বাঙ্গালীর সভাবাজার হয় ইইসারে বিজয়ী। শীল্ড প্রতিযোগিতা যখন আরম্ভ হইল বহুবৎসর ধরিয়া একটানা খেলার ফলে সভাবাজারের খেলোয়াড়দের অনেকেই তখন বিশেষ ক্লান্ত। উঠ্‌তি নূতন খেলোয়াড়-যোগানের সুবিধাও তখন তেমন নাই। হাওড়া স্পোর্টিং, হেয়ার স্পোর্টিং, ন্যাশন্যাল্, মোহনবাগান, এরিয়ন, শিবপুর কলেজ, বিশপ্‌স্ কলেজ প্রভৃতি দল তখন বেশ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রেড্‌স্ কাপ্, কুচ্‌বেহার কাপ বা ইলিয়ট্ শীল্ড লইয়া মত্ত—এই সকল বাজী মারাই তাহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা। শীল্ডের নামে তাহারা শত হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সভাবাজারের নূতন যোগান হইবে কোথা হইতে! সভাবাজারকে এ সমস্যার দায় হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয় হেয়ার স্পোর্টিং সদলে। হাওড়া স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের দুই এক-জন খেলোয়াড়ও আগুয়ান হয়। ইহাতে শীল্ড প্রতি-যোগিতায় শক্তির পরীক্ষা দিবার সুযোগ হইয়া যায় বাঙ্গালীর খুবই। হইলে কি হইবে, এ সুযোগ কাজে লাগান ঘটিয়া উঠে নাই, সভাবাজার ও হেয়ার স্পোর্টিং-এর মনান্তর হওয়ায়। এ সম্বন্ধে অনেক কথা গত বৎসরে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-এ লেখক কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সে যাহা হউক শীল্ডে দেশীয়ের বিশেষ কৃতিত্ব সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, হেয়ার স্পোর্টিং-এর দৌলতে। হেয়ার স্পোর্টিং সংযুক্ত চিনসুরা বিপক্ষ ইয়োরোপীয় দল সমূহকে কচু কাটার মত শোয়াইয়া শীল্ডের শেষ পূর্ব্ব গণ্ডীতে উপনীত হয় সতেজে। শীল্ডের সুউচ্চ ধাপে দেশীয়ের উঠা সেই সর্ব্বপ্রথম। ইহার পরের ঘটনা :—

(১) ১৯১১—মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়।
(২) ১৯২০—কুমারটুলির (শীল্ডে) দ্বিতীয় হওয়া।
(৩) ১৯২৩—মোহনবাগানের ,, ,, ,,
(৪) ১৯৩৬—মোহামেডানের শীল্ড বিজয়।
(৫) ১৯৩৮—মোহামেডানের (শীল্ডে) ২য় হওয়া।

১৯০৫ হইতে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত শীল্ডে দেশীয়ের এই কৃতিত্ব ক্যালকাটার দৌলতে শ্বেতাঙ্গ অসামরিক দল অবশ্য ছাপাইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে ক্যালকাটার ইণ্টার-

ন্যাশন্যাল্ খেলোয়াড় প্রায় প্রতি বৎসর আমদানী করাতেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা মনে রাখিয়া দেশীয় দল যাহা করিয়াছে, তাহার 'ওজন মাপা' বোধহয় ন্যায়সঙ্গত।

৪৭ বৎসরে—কি দেশীয়, কি ইউরোপীয়, কি সামরিক, কি অসামরিক সকল দলেরই খেলা পড়িয়া গিয়াছে বহু পরিমাণে—পূর্ব্বের খেলার কঙ্কালও এখনকার খেলায় নাই—'একবাক্যে বলিয়াছে ও বলিবে' দুই যুগের খেলা যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নূতন ভাল খেলোয়াড় বলিয়া যাহারা বিজ্ঞাপিত ও চিত্রিত—লীগ্ ও শীল্ডের খেলা হইতে তাহাদের স্বরূপ ধরিতে কেহ পারেন ধরিয়া লইবেন। 'আন্‌সার্টেন্টি অব স্পোর্টস্' (uncertainty of sports) কি এই যুগের জন্যই জমা করা ছিল! ১৯৩৯-এর শীল্ড প্রতিযোগিতার বিশিষ্ট ব্যাপার, 'হাতি ঘোড়া তল' যাইলেও স্থানীয় দল পুলিশের শীল্ড জয়ী হওয়া। পড়া অবস্থাতেও এক অনামা দলের এই কৃতিত্ব ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় ফুটবলে কলিকাতার শ্রেষ্ঠত্বের নূতন দৃষ্টান্ত। এই-বারের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—হীন দ্বেষ বিদ্বেষের কোনও আচরণ খেলার মাঠে এবার দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এবারের প্রতিযোগী দল—সুখের বিষয় বাহিরের অনুপযুক্ত কতকগুলি সামরিক দল আসিয়া আই-এফ্-এর অযথা ব্যয়ভূষণ এবার করায় নাই। ইষ্ট ইয়র্কস্ (গত বৎসরের শীল্ড জয়ী) রয়াল্ ফিউজিলিয়র্স, ডি-সি-এল্-আই ও বেঙ্গল আর্টিলারী প্রভৃতি যোগদান করে। উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও চট্টগ্রাম হইতে দেশীয় দল আসা এবার নূতন। দিল্লী, এলাহাবাদ ও কানপুরও আসা সুরু করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের দল-সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিযোগীরূপে স্থানীয় দলের সংখ্যার ইতর বিশেষ বড় হয় নাই তবে আই-এফ-এ কর্ত্তৃক দণ্ডিত তিনটী দল প্রতিযোগীরূপে গৃহীত হয় নাই। স্থানীয় ক্রীড়াকুশল দলের সংখ্যা ইহাতে হ্রাস পাইলেও শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে উপনীত হয়, স্থানীয় চারিটী দল—কাষ্টমস্, ক্যামেরন্, পুলিশ ও ই-বি-আর।

সামরিক দল—শীল্ডে বাহিরের কোনও সামরিক দল সুবিধা করিতে এবার পারে নাই আদৌ। এক ডি-সি-এল্-আই ব্যতীত অন্য কেহ একাধিক গণ্ডী টপ্‌কাইতে পারে নাই। ডি-সি-এল্-আই-এর টপ্‌কানও খেলিয়া জিতিয়া নহে—প্রতিপক্ষের গরহাজিরীর ফাঁকে। পরের গণ্ডীতেই কিন্তু ঢাকার ওয়ারী তাহাদের দফা সারিয়া দেয়, তাহাদিগকে এক গোলে পরাজিত করিয়া। অপর দলের মধ্যে ফিউজিলিয়র্স পরাজিত হয় পুলিশ কর্ত্তৃক ৪-১ গোলে। পূর্ব্ব বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্কস্‌কে বি-এন-আর পরাজিত করে ২-২, ১-০ গোলে। স্থানীয় সামরিক দল বর্ডার্সকে উচ্ছেদ করে হবিগঞ্জ ১-০ গোলে। বেঙ্গল আর্টিলারী ফতে হইয়া যায় কুল্‌টী ক্লাবের দ্বারা ১-০ গোলে। সামরিক দলের মধ্যে এক ক্যামেরন টিকিয়া যায় চতুর্থ গণ্ডী পর্য্যন্ত। শেষ পূর্ব্ব গণ্ডীতে তাহারা পরাজিত হয় কাষ্টমসের কাছে ২-৯ গোলে। লীগ প্রতিযোগিতায় গোড়ার দিকে ক্যামেরন সুবিধা করিতে না পারিলেও শেষের দিকে তাহাদের খেলার উন্নতি হয় যথেষ্ট। সেই মুখেই পড়ে শীল্ডের খেলা। উন্নত অবস্থার পরিচয় দিবার চেষ্টা তাহারা করে উৎসাহভরে। তাহারই ফলে তাহাদের উত্থান শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডী পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় গণ্ডীতে কিন্তু বরিশাল ক্যামেরন্‌কে ভীষণ বেগ দেয়। অতিরিক্ত সময়ে বরিশাল পরাজিত হয় ১-০ গোলে। শীল্ডের পূর্ব্ব বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্কের গোড়ার দিকেই 'মাত' হওয়া লক্ষ্য করিবার। দেশীয় দল ওয়ারীর ডি-সি-এল্-আই বিজয়ী হওয়ার কৃতিত্ব যথেষ্ট।

(কাষ্টমসের কয়েকজন)

কে, ভট্টাচার্য্য ডেভিস্ লামস্‌ডেন্

বাহিরের অন্যান্য দল—উয়ারী ব্যতীত বাহিরের দেশীয় দল—খুলনা, রাজসাহী, হবিগঞ্জ, উড়িষ্যা ও কুলটীর শীল্ডে একাধিক গণ্ডীতে খেলিবার অধিকারী হওয়া তাহাদের পক্ষে খুবই গৌরবের সন্দেহ নাই। বাহিরের এই সকল দলের চিত্রাদি প্রকাশিত করিয়া কলিকাতার সংবাদ পত্র তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহান্বিতও করিয়াছে। খেলা-ধূলায় যথার্থ অভিজ্ঞ যাঁহারা তাঁহাদের চক্ষে দলগুলির মধ্যে 'মাল' যাহা কিছু তাহা তাঁহারা ধরিয়াছেন এবং 'পয়মাল'ও ধরা পড়া বাদ যায় নাই। 'মাজা' 'ঘষা' ঠিক মত ঠিক সময়ে হইলে এই সকলের কোনও কোনও দলের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। ফুটবলে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার অধিকারে আমরা আর-এর কাছে ছোটনাগপুরের পাঁচ গোলে ও বি-এন-আর-এর কাছে কানপুরের নয় গোলে পরাজিত হওয়া বাহিরের দলের এ বৎসরে 'বড় হার'।

স্থানীয় দল—দণ্ডপ্রাপ্ত তিনটী দলের শীল্ডে খেলিবার সম্বন্ধে পুনঃ বিবেচনা করিতে আই-এফ-এ প্রস্তুত থাকিলেও বাহিরের 'অধিক সন্ন্যাসী'র গণ্ডগোলে তাহা ভেস্তাইয়া যায়। 'নাড়াবুনে'র দল 'কীর্ত্তনে' সাজিয়া 'মালসা'র গন্ধে' কি অশ্রুপাত! সে অশ্রুবন্যায় আই-এফ-এ বিগলিত হইল না। 'কম্‌লি' কিন্তু ছাড়িল না 'চব্বিশ প্রহর' করিবার ভয় দেখাইল। সে তালও টিকিল না—দণ্ডপ্রাপ্ত দল তিনটীকে বাদ দিয়া শীল্ড খেলার সকল আয়োজন কর্ত্তৃপক্ষ সুসম্পন্ন করিল। সম্পাদকীয়

(বিভিন্ন দলের কয়েকজন)

এন, মজুমদার

•(ক্যামেরণ) রাসেল্ (ক্যামেরণ) ক্যাল্‌কাটার নূতন সেণ্টার ফরওয়ার্ড পমিংস্ (ই-বি-আর) সামাদ (ই-বি-আর)

আমাদের এই সকল নবীন বন্ধুবর্গকে সাবধান করিয়া দিতেছি, 'কাগুজে ছবিছাবা'য় বৃথা গর্ব্বিত যেন তাঁহারা না হ'ন। 'ছবিছাবা'র চটকে পথভ্রষ্ট হওয়ার ভয় আছে খুবই। আর এক কথা—কলিকাতার ক্রীড়াশক্তির সে তীব্রতা এখন নাই বলিলেই চলে। শক্তি হ্রাস কলিকাতার বর্ত্তমান ক্রীড়া-পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ তাহাদের পক্ষে শুভদায়ক হইবে না। মাল যাহা আছে তাহার গড়ন পাকা ওস্তাদের হাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক গণ্ডীতে ওদিককার মহারাণা ক্লাব পুলিশ কর্ত্তৃক পরাজিত হয় মাত্র এক গোলে। দুই গণ্ডী কাটাইয়া তৃতীয় গণ্ডীতে দিল্লী পরাজিত হয় কাষ্টমসের কাছে দুই গোলে। মহারাণা ক্লাব ও দিল্লীর ক্রীড়া শক্তি সুতরাং নগণ্য নহে। ই-আই-বোলে ভয় দেখানর রকম নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে তখন আরম্ভ হইল। অন্যায়ের সমর্থনে এ সকল হীন উপায় অবলম্বন করিতে যাহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করে না, তাহারা কোন শ্রেণীর জীব খেলা-ধূলার উচ্চাদর্শ রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণপাত করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদের কল্পনার অতীত। আই-এফ্-এর দৃঢ়তায় ফন্দীবাজের সব ফন্দী বিফল হইয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, তিনটী শক্তিশালী স্থানীয় দলের অবর্ত্তমানেও শীল্ড থাকিয়া যায় কলিকাতাতেই। 'বড়'র গরবে যাহারা হিতাহিত জ্ঞান বর্জ্জিত তাহাদের চৈতন্যের উদয় ইহাতেও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শীল্ডের সুরুতে বি-এন্-আর-এর কানপুরের বিরুদ্ধে

নয় গোল করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ঘটনায় চিন্তান্বিত হয় পরশ্রীকাতর অনেকে। নয় গোল গলাইবার শক্তি যাহারা ধরে তাহারা ত' সামান্য নহে—শীল্ড নাগালের মধ্যে আনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কি? মাথার টনক নড়িবারই কথা। আই-এফ্-এ অপদস্থ হয়, কলিকাতা অপদস্থ হয়, তাহাদের যে গোপন ইচ্ছা। এ চিন্তার আসান হয় তাহাদের অনেক, লীগ-জয়ী মোহনবাগানের শীল্ডের প্রথম খেলাতেই কাৎ হওয়াতে। বি-এন্-আর কিন্তু যখন আবার পূর্ব্ব শীল্ড জয়ী ইষ্ট ইয়র্কস্‌কে পরাজিত করিল মুখ পাংশু হইয়া গেল হিংস্রভাবাপন্ন সকলেরই—কলিকাতার শীল্ড ইহার পরে কলিকাতায় থাকা সুনিশ্চিৎ দেখিতে পাইয়া। 'মোহনবাগানের পরাজয় অপ্রত্যাশিত' হইয়া যায় তৃতীয় গণ্ডীতে পুলিশ কর্ত্তৃক। পুলিশ যথাক্রমে মহারাণা ক্লাব, রয়াল্ ফিউজিলিয়র্সকে পরাজিত করে তিন ধাপ উঠিয়া ক্যাল্‌কাটা পরাজিত হয় পুলিশের কাছে চতুর্থ গণ্ডীতে। শেষ-পূর্ব্বগণ্ডীতে পুলিশ ই-বি-আরকে পরাজিত করে ১-০ গোলে। ও-দিকে কাষ্টমস্ ভবানীপুর, দিল্লী এবং ক্যামেরনকে খতম করিয়া শেষ গণ্ডীতে জাঁকিয়া বসে। ভবানীপুর ও কাষ্টমসে রণারণি হয় খুবই—অতি কষ্টে কাষ্টমস্ ফাঁড়া কাটাইয়া উঠে। ই-বি-আর দৌড় বড় কম দেয় নাই। সেই দৌড়ের মুখে পড়িয়া লীগের উপনেতা রেঞ্জার্স বহু চেষ্টা করিয়াও টাল সাম্‌লাইতে পারে নাই—মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

(মোহনবাগান-বিজয়ী এরিয়ন্‌সের কয়েকজন)

এম্ দাস

ডি, ব্যানার্জ্জী

এস্, রায়

ডি, মিত্র

নাসিম

প্রসাদ

শত্রুমিত্র সকলে একবাক্যে বলিলেও, এ কথার কোনও মূল্য খেলোয়াড়ের কাছে নাই। যে গোল এরিয়ন গলায় তাহা 'আগসাজ' (offside) দূষিত অধিকাংশ দর্শকের অভিমত। ইহা লইয়া কোনও প্রতিবাদ মোহনবাগান করে নাই।

"Above all may they be true sportsman always whether in prosperity or adversity" —লীগ জয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কালে মোহন্‌বাগানের উদ্দেশ্যে ফুটবলে বাঙালীর আদি গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীনগেন্দ্র-প্রসাদ এই কথা কয়টী বলিয়াছিলেন। গোল সম্বন্ধে কোনও গোল না করিয়া আদি গুরুর বাক্যের সম্মান রক্ষা মোহনবাগান সদা সদাই করে।

এরিয়ন্‌স তৃতীয় গণ্ডীতে খুলনাকে ৪-০ গোলে পরাজিত করিয়া চতুর্থ গণ্ডীতে পরাজিত হয় কাষ্টমস্ কর্ত্তৃক ১-০ গোলে। ও-দিকে বি-এন্-আর্-এর গতি রুদ্ধ

শেষ গণ্ডীতে—লীগের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে কাষ্টমস্‌ই লীগের ইজ্জৎ রক্ষা করে, শেষ গণ্ডীতে উপনীত হইয়া। এ বৎসরের শীল্ডের চমকপ্রদ ঘটনা, লীগ তালিকার নিম্ন স্থান অধিকারীদের উচ্চ স্থানাধিকারীদের হটাইয়া দেওয়া। ভবানীপুর ও বর্ডারার্স ব্যতীত নিম্নের অন্য দলগুলির মধ্যে শীল্ডে অল্প বিস্তর সাফল্য লাভ লোকতঃ অপ্রত্যাশিত হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। একটা বাঁধাধরা খেলার ঠাট কোনও দলেরই না থাকাকে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা অনিবার্য্য। 'পড়া খেলা তাও আল্লা ঠাটের'! কাজেই যে যখন যেমন 'মেজাজে' তখনই তাহার খেলা অল্প বিস্তর সেই ভাবেরই হয়। লীগ-তালিকার সর্ব্বনিম্ন দল ক্যালকাটার শীল্ডের চতুর্থ গণ্ডীতে উঠা এবং মোহনবাগান ও রেঞ্জার্সের দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে পড়া, এ অভিমত বিশেষ সমর্থন করে। লীগে যে মোহনবাগান পুলিশকে ৫ গোলে

পরাজিত করে, শীল্ডে সেই মোহনবাগান গেল তলাইয়া আর পুলিশ হইল শীল্ড্ জয়ী। কথাটা ভাবিবার খুবই। আল্গা ঠাট, অল্প দম ও অল্প অভিজ্ঞতাই একের পতনের কারণ। অন্য পক্ষে বার বার পরাজিত হইয়াও ক্লান্তিহীন জয় লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও তাহা পূরণে অসীম যত্ন ও অধ্যবসায় পুলিশের অপূর্ব্ব সাফল্যের মুখ্য কারণ। লীগের প্রারম্ভে পুলিশের খেলা সম্বন্ধে আশার অনেক কথা আমরা বলিয়াছিলাম, তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া। নবীন খেলোয়াড় লইয়া গঠিত পুলিশের দলের প্রত্যেকের ক্রীড়াজয়ী হইতে দৃঢ় পণ—দলের অবস্থা উন্নত করিতে বিশেষ সহায়ক হইবে, আমরা জানিতাম। পরাজয়ের মধ্যে পুলিশের কখনও কখনও চমক মারায় ক্ষণিক 'সোর-গোল' শুনা গিয়া আবার তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। নীরবে কিন্তু দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া পথের শেষে পুলিশের উপনীত হওয়া, ফুটবলের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করাইল। লীগের গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শীল্ডের শেষ খেলা পর্য্যন্ত কাষ্টম্সের এ বৎসরের খেলা মোটের উপর সমভাবেই চলিয়াছে। সে দিক্ হইতে হিসাব মত কাষ্টম্সের শেষ গণ্ডীতে উঠা উচিৎ ছিল, হইয়াছেও তাই। কাষ্টম্স্ অপল্কা দল একেবারেই নহে। ইহার বিশেষ পরিচয় ইহারা দিয়াছে বহুবার, বহু ক্ষেত্রে। এইবার লইয়া চারিবার শেষ গণ্ডীতে ইহাদের উঠা—এ বৎসর ছাড়িয়া পুলিশ উঠে একবার—সমধিক অভিজ্ঞতা কিন্তু বানচাল হইয়া যায় বিপক্ষের অসামান্য মানসিক বলের সহিত খেলার ভঙ্গীতে। খেলা উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। তবে জয়ী হইতে উভয় পক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা এবং দর্শকের তজ্জনিত অসীম উৎসাহ অটুট থাকে খেলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। সমধিক দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া পুলিশ হয় শেষ জয়ী। ১৯৩৯এর শীল্ড প্রতিযোগিতা স্মরণযোগ্য রহিবে একাধিক কারণে। 'বিদ্রোহীর' বিদ্রোহে কলিকাতার ক্রীড়া-শক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি এবং তাহার উপর 'ভীষ্ম দ্রোণের অকাল নিধন' সত্ত্বেও স্থানীয় দলের শীল্ড জয়, তাহার মধ্যে প্রধান। শীল্ডজয়ী পুলিশকে আমরা সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি।

অন্যান্য প্রতিযোগিতা—শীল্ড খেলা শেষ হওয়াতে কলিকাতায় ট্রেড্স্ কাপ, কুচ্‌বেহার কাপ্, ইলিয়ট শীল্ড এবং অন্যান্য বহু প্রতিযোগিতা সম্বন্ধীয় খেলার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। এ সকল খেলা দেখিতেও দর্শক-সংখ্যা বড় অল্প হয় না। বড় লীগে মোহা-মেডনের আসাবধি ময়দানে মুসলমান দর্শকাধিক্য দেখা গিয়াছে। এ বৎসরের শীল্ডে তাহাদিগকে তেমন দেখিতে না পাওয়ায় জনতা গত কয়েক বৎসরের ন্যায় হয় নাই। খয়রাতী খেলা দুইটীতে 'আমদানী' সুতরাং কমই হইয়াছিল। বৃষ্টির জন্য শীল্ডের শেষ খেলা খেলিতে বিলম্ব হওয়ায় তৃতীয় খয়রাতী খেলা খেলান বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

ভারতে এম্-সি-সি — ইয়োরোপে বর্ত্তমান অশান্তির কারণে সমরানল প্রজ্জলিত হইবার আশঙ্কায় এম্-সি-সি-র আসা ঘটিবে কিনা বিশেষ সন্দেহ ছিল। সম্প্রতি তাঁহারা জানাইয়াছেন, "আসা স্থির"। দলস্থ হইয়া যাঁহাদের আসিবার সম্ভাবনা তাঁহাদের নামও তাঁহারা জানাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইংলণ্ডের হইয়া যাঁহারা খেলিতে যান তাঁহাদের একজনেরও নাম নাই। ভারতের প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ একটা বাজে দল ইংলণ্ড এখানে পাঠাইতেছে, এইভাবের কথা এখানকার প্রায় সকলেই বলিতেছেন। এভাবের কথা আর একবার এম্-সি-সি'র আসিবার পূর্ব্বেও বলা হইয়াছিল। সেই দলই কিন্তু ভারতবর্ষকে 'গো বেড়ন' দিয়া যায়। এইবারের দলও যে তাহার পুনরভিনয় করিবে না— বলিতে কেহ পারেন কি? বলিতে পারা যাইত অনায়াসেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একতা যদি থাকিত। একতা ত' নাই-ই, হইবারও সম্ভাবনা আছে কি? তাহার উপর লণ্ডনে ভারতীয় দলের কীর্ত্তিস্তম্ভের কথাও সহজে ভুলিবার নহে। এ অবস্থায় ইংলণ্ড বলিয়াই কথা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। অন্য কেহ হইলে কি করিত? ক্রিকেটে ভারতীয় গুণপনাই অলিম্পিকে হকির 'পাট' তুলিয়া দিতে কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করিয়াছে।

বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু তাহার জের মিটাইতে আরও কয়েক বৎসর বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, ভারত রক্ষা আইন প্রবল মূর্ত্তি ধরিলে সেই পথে আমার বাড়ী বিপ্লবীদের কেল্লায় পরিণত হইয়াছিল। স্থান-সঙ্কুলানে অসমর্থ হইয়া, শেষে চন্দন-নগরের নানা স্থানে ইহার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যেও গৃহকর্ত্রীর এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্য প্রচুর পাইয়াছিলাম, নতুবা এই দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইত না। এই সকল কথা প্রয়োজন-মত বলিব।

ব্যক্তিকে, জাতিকে, বিশ্বজনীন জীবনকে, মহত্তর ও দিব্যতর করার অগ্নি-প্রেরণা আমার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। বৌদ্ধযুগ হইতে শূন্যবাদের পর মায়াবাদীর মোক্ষবাদ আশ্রয় করিয়া ভারতের জীবনের প্রতি ঔদাসীন্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস আমার চক্ষের সম্মুখে এই সময়ে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্র-মহাসংগ্রামের পর ভারত-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মহারাজ অশোকের নির্ব্বাণমুখী জীবন-যাত্রার আকাঙ্ক্ষা আমার চিত্তকে পীড়িত করিয়াই তুলিল। এমন কি পাঠানগণ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত প্রতাপ-রুদ্রের রাজ্যাক্রমণকালে তাঁহার এই বিষয়ে ঔদাসীন্য জীবন-ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া মনে হইল। পল্লীর পথে পথে বৈরাগ্যের গান গাহিয়া ভিক্ষুব্রতী চারণেরা পল্লী-জীবনের আয়ুঃক্ষয় করে, এমন কথাই মনে হইতে লাগিল। আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে যদি কোন ভিখারী জীবনকে জগৎকে, মায়া বলিয়া ঈশ্বর-শরণের সঙ্কেত দিয়া সঙ্গীত করিত, আমি তাহা নিবারণ করিতাম। ভূতাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখার একটা প্রয়োজন আছে বটে, তবে তাহা মাত্র দার্শনিক অনুভূতি। জীবনের যে বস্তুতন্ত্র সাধনা, তাহা ইহা নহে। ভূতাত্মার সহিত পরমাত্মার যুক্তিই সৃজন। আর এই যুক্তির অভিব্যক্তিস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞানপ্রকাশ, হৃদয়ে প্রেমপ্রকাশ, প্রাণে শক্তিপ্রকাশ, দেহে সৌন্দর্য্যপ্রকাশ, ইহাই জীবের সাধ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এই অনুভূতির সহিত ভারতধর্ম্মের পার্থক্য আমার চক্ষে পড়িল না। বৌদ্ধ যুগের ধর্ম্ম, মায়াবাদ-প্রচারের যুগ, আমার চক্ষে প্রতিক্রিয়ামূলক বলিয়াই প্রতিভাসিত হইল। কে যেন চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল—ভারতের ধর্ম্ম বেদ-প্রবর্ত্তিত। আর সেই বেদ ঈশ্বর-স্বীকৃতির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—কর্ম্মে, জ্ঞানে, উপাসনায়। ভারতের জাতি বেদের দিব্য আদর্শ জীবনে অনুবাদ করার জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রে রীতি, নীতি, বিধি-নিষেধ-মূলক সূত্রের রচনা হইয়াছে। ভারত-জাতির ইহাতেও মনস্তুষ্টি হয় নাই। বেদকে, স্মৃতিকে যুক্তি-তর্কের যাঁতায় ফেলিয়া সে ন্যায়শাস্ত্রে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছে। দর্শনাদি শাস্ত্রে জীবন হইতে মুক্তির ব্যাখ্যা আমার কুব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হইল। এ জাতি জীবনকে ইন্দ্রজাল বলিয়া উড়ায় নাই, জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিতেই চাহিয়াছে। ধর্ম্ম তুরীয় নহে—জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তি-সৌন্দর্য্যে এ জাতি জীবনেরই জয়-কামনা করিয়াছে। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বেদ-চর্চ্চার আকুতি আমায় বেদাদি শাস্ত্রে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—"I have not seriously entered on in connection with the Veda and the Sanskrit language. In that same connection will you please make a serious effort this time to get hold of Dutt's Bengalee translation for that matter which gives the European verson ?"

ইহার মর্ম্ম—বেদ এবং সংস্কৃতভাষায় আমি গভীরভাবে প্রবেশ করি নাই, এই জন্য তুমি এই সময়ে অতিশয় প্রযত্ন-

সহকারে দত্তের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, যাহাতে ইয়োরোপীয়ান-দিগের বেদ সম্বন্ধীয় মতবাদ পাওয়া যাইবে—পাঠাইয়া দিও। এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে থাকিয়াও, অন্য কোন-দিকে লক্ষ্য না থাকায়, তাঁহার অন্তপ্রের্রণার সহিত নিজেকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত মনে করিতাম—ইহাতে অন্তরে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতাম। 'আর্য্যে' বেদ-রহস্য বাহির হইলে, অতি মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি প্রবল অনুরাগ শ্রীঅরবিন্দের ইন্ধনেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং শাস্ত্রাদির প্রাচীন ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে নূতন ব্যাখ্যা চক্ষে পড়িল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রবিবাসরের ছাত্রসভায় ধারাবাহিক-রূপে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এইক্ষণ হইতে উহা নূতনরূপে জীবন্ত ও জাগ্রতরূপে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যতই শ্রীঅরবিন্দকে অন্তরে পাইতে থাকি—মস্তিষ্কে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে। উদ্দীপনায় সমস্ত শরীর নৃত্য করিতে থাকে। শাস্ত্রাদির নূতন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচারাকাঙ্ক্ষা প্রাণকে ভাবাবেশে নাচাইয়া তুলে। তাঁহার আদেশ-বাণী যেন কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিত। তাঁহার মূর্ত্তিও চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। বাহিরে শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত এই ভাবের সমর্থন আমি কোথাও পাই নাই; কিন্তু আমার নিকট এই অবস্থা আজও সত্য হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। এ কথা এখন থাক্।

পরম সুহৃদের দান ক্ষুদ্র হইলেও, আমার অভাব এই সময়ে কিছুই ছিল না। শরীরধারণের জন্য এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জানিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র আমি যথেষ্ট মনে করিতাম। আমার পত্নীও আমার ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত উড়ানীগুলি সংগ্রহ করিয়া লজ্জা নিবারণে প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন, কোন দুঃখই আমার ছিল না। মাত্র একমাস কাল এই অবস্থা আমার ছিল। কর্ম্মপ্রেরণায় আমার পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হইল না—কর্ম্ম-সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তখনও জানিতাম, বিষয় ও অবিষয় লইয়া জগৎ। বিষয় ত্রিগুণাত্মক। নির্গুণ অবিষয়। পার্থকে শ্রীভগবান অবিষয়-বস্তুর সহিত যুক্তি লইয়া নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান্ হইতে বলিয়াছিলেন।

জ্ঞান এক বস্তু; আর বাস্তবজীবনের ধর্ম্ম অন্য বস্তু। কর্ম্মপ্রেরণায় আমি বিষয়-সৃষ্টির পথেই প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইলাম। তবুও আজও আমি বিশ্বাস করি—যাহা কিছু হয়, যাহা কিছু করি, তাহা অধীত জ্ঞান অথবা সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারে নহে। ঈশ্বরই কর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছায় সব কিছু হয়। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলা সম্ভব নহে। বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইয়া, নূতন জীবনক্ষেত্রে পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মপ্রচেষ্টাই আমাকে পাইয়া বসিল।

আমার মনে হইতে লাগিল—অন্যে শ্রদ্ধা করিয়া যে অর্থ আমার জীবনযাত্রার জন্য দান করে, তাহা অন্য কোন বৃহৎ কর্ম্মে ব্যয়িত হইবে, যদি আমার মধ্যে জীবন-যাপনের যে আয়াস, তাহা অবরুদ্ধ না রাখি। প্রত্যেক মানুষের যেটুকু প্রয়োজন, তাহা প্রত্যেক মানুষকে মিটাইতে হইবে। কাহারও মধ্যে ঈশ্বর দীন মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হন নাই। নিজের মধ্যে এইরূপ কর্ম্মপ্রেরণার অনুভূতি আরও একটি উদ্দেশ্য লইয়া আমায় অতিষ্ঠ করিয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন যে মূর্ত্তি ধরিল, তাহার সহিত আমার সংযুক্তি যখন আর সম্ভব নহে, তখন শ্রীঅরবিন্দের জন্য যে মাসিক অর্থ-প্রেরণের ব্যবস্থা পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা আর কোন মতে সম্ভব হইবে না। ভারত-রক্ষা আইনের চাপে বিপ্লবীরাও ছন্নছাড়া হইতেছিল এবং আমারও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও সমর্থন না থাকিলে, উহাদের কাছ হইতেই বা অর্থসাহায্যগ্রহণ কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? অতএব স্বাবলম্বনের সাধনাই শ্রেয়ঃ করিলাম। সেদিন এই স্ব-য়ের সহিত শ্রীঅরবিন্দ সংযুক্ত ছিলেন—সেদিন জীবনের ছিল ইহাই রস, ইহাই আনন্দ। পরকে আপন করার সুপথ আমার মিলিয়াছিল। সাধন সিদ্ধ করার যোগ্য আশ্রয়ও আমি লাভ করিয়াছিলাম।

যাহা ঘটিতেছিল, তাহাই আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, কোনরূপ কার্পণ্য বা সঙ্কোচ আমার নাই। কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, কোনরূপ দুর্ভাবনার প্রশ্রয় দিতাম না—কোনরূপ বাধাও স্বীকার করিতাম না। সবই অনুকূল মনে হইত। প্রতিকূল চিন্তা উদয় হইলে তাহা আমলে আনিতাম না। কেহ বিপরীত বাণী উচ্চারণ করিলে,

তাহাতে কাণ দিতাম না। কিন্তু একজন ছিলেন, যিনি আমার প্রতি কর্ম্মে বাধাস্বরূপ হইতেন—ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কোন কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হই, তাঁহার মুখে একটা বিপরীত বাণী শুনিবই, ইহা আমি জানিতাম। সেদিন এই আচরণ অতি বিরক্তির চক্ষে দেখিতাম এবং কটু ভৎর্সনায় তাঁহাকে নিরস্ত করিতাম।

আজ ভাবিয়া দেখিতেছি—আমার উদ্দাম স্বাধীন জীবন-গতির প্রতিবাদী বা সমালোচক কেহ না থাকায়, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ম্ম করার যে সুফল, তাহা ভাগ্যে মিলিত না—তাঁহার ক্ষীণ প্রতিবাদ এইটুকু সুযোগ আমায় দিতে চাহিত। আজ তাহা অনুভব করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই প্রতিবাদ ঈর্ষ্যার নহে, বিদ্রোহী মনোবৃত্তির নহে, আমার কর্ম্ম-প্রেরণার সত্যতা পরীক্ষার জন্য গতির প্রতি পদে তাঁহার কণ্ঠে প্রতিবাদের সাড়া উঠিত। দুইজনেই যন্ত্র, যন্ত্রীকে সেদিন দুইজনেই এমন করিয়া চিনি নাই। প্রতি পদে সংঘাতই বাধিত, অতি আপনার জনের সঙ্গেই। শেষে দুইজনের অশ্রু একত্র সম্মিলিত হইয়া সংযুক্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিত—জীবনে অমৃত সঞ্চারিত হইত। কর্ম্মের সূত্রপাতে প্রতিবাদ, তারপর তাঁর অকৃত্রিম সাহচর্য্যে আমি সর্ব্বত্র বিজয়ী মূর্ত্তি ধরিতাম।

আমি বলিলাম "ব্যবসা করিব।" তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "ঝঞ্ঝাটে গিয়া কাজ নাই। বেশ আছি, বেশ আছ; সাধন-ভজন ভালই চলিবে। ব্যবসা করিবে কাহার জন্য?"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিল্যম "পরমুখাপেক্ষী যে, তার জীবন শ্রেয়ঃ মনে করি না। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইব।"

তিনি বলিলেন "কালীবাবু আমাদের পর নহেন। যেদিন পর মনে হইবে, সেদিন ব্যবস্থা করিও।"

কথা যত বাড়ে, বিরক্তির মাত্রা ছাড়িয়া উঠে। যাহা করিতে ইচ্ছা, তাহার পথে বাধা আমি আজও সহিতে পারি না। ইহার জন্য দেহ-মন শাস্তি পায় প্রচুর। কিন্তু তবুও আমি নিরুপায়। গোড়া হইতে স্বীকার করিয়াছি—কর্ত্তা শরীর বা মন নহে, নারায়ণ। একটী তৃণখণ্ডও তাঁর বিনা ইচ্ছায় নড়ে না। দুঃখ দেহ-মনের, তাহা স্বামী নহে। যাহা ঈশ্বরেচ্ছা নহে, তাহা হইবে কেন—এই আমার বিশ্বাস। আমার জিদ দেখিয়া, তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন। যাঁহার কণ্ঠে প্রতিবাদের বাণী উঠিয়াছিল, তিনিই আমার নূতন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-রচনার সর্ব্বপ্রধান সহযোগিনী হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্বাবলম্বী হইতে হইবে। নিজেকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। উপায় করিয়াই শ্রীঅরবিন্দের দাবী পূরণ করিব। উৎসাহে, পুলকে আমার সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎ বহিতে লাগিল। অগ্রজের কাঠের কারবারে আমার অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার কাজ বন্ধ হইয়াছে। সেই কাজ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিব। কিন্তু পুঁজি নাই। অর্থহীন আমি। যাঁহার প্রেরণা, তাঁহাকেই চিন্তা করিতে হয়। আমি আধার-যন্ত্রটী তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

২২শে পৌষ আমার জন্মদিন। এ বৎসর এই জন্মদিনে একটী ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন হইল। এই আয়োজনের প্রধান আয়োজন-কর্ত্রী আমাদের মেজবৌ। গৃহলক্ষ্মী এই উৎসবটীকে অভিনন্দিত করিয়া লইলেন। ১০।১৫ জন অনুরাগী বন্ধুদের আনন্দোচ্ছ্বাসে এই দিনটী নূতন ভাবে ও ছন্দে আমার জীবনে একটী নূতন অনুভূতির সাড়া তুলিল। ১২৲ টাকার সংসারে সেদিন প্রাচুর্য্যের বান ডাকিল। জীবনের উৎসব। উৎসব-সঙ্গী যাঁহারা, তাঁহারা অতি পরিচিত। সকলের সহিত অভিনব সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছি। এই উৎসব—মনে হইল—কোন এক নূতন অতিথিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। শীতের অন্ধকার-রাত্রি দীপমালায় উজ্জ্বল হইল। ফুলের সৌরভ, ধূপ-ধুনার গন্ধে গৃহ-মন্দির পুলকিত হইল। সকলে একত্র উপবেশন করিয়া কত আলাপ, কত প্রসঙ্গ, কত কথার আলোচনা হইল। প্রতি জন মনের দুয়ার খুলিয়া কত গোপন কথা প্রকাশ করিল। ১০।১৫টী মানুষের হৃদয়ে হৃদয় সংযুক্ত হইয়া জাতি, বর্ণ, বয়স সব এক হইয়া গেল। মধুর সঙ্গীতে উৎসবের ঘোষণা হইল। সেদিন এই অভাবনীয় আনন্দের আতিশয্যে সেই একজনকে স্মরণ করিয়া গাহিয়াছিলাম—

তুমি ধন্য তুমি ধন্য
আমায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছ,
তোমার অসীম প্রেম-পাথারে
সাদরে আমারে নিয়াছ।
তোমার প্রেম-বিগলিত বাহু দুটী দিয়া,
জড়ায়ে রেখেছ জুড়াইয়া হিয়া ;
আমি সংসার-দহনে দহিতে পারি নে
তাই এত দয়া করেছ।
আমার মিটাইয়া আশ, দিয়া আলিঙ্গন,
অমিয়-সাগরে রেখ অনুক্ষণ।
অকিঞ্চন বলে' ভুলো না কখন
যদি দীনে দয়া করেছ ॥

মর্ম্ম ছিঁড়িয়া এ সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উৎসব-মন্দির মুখরিত করিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ মৌন থাকিয়া যখন নয়ন উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম—সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শুধু আমাদেরই নয়ন আর্দ্র হয় নাই, দুটী সজল নয়নের চাহনী দ্বারপার্শ্বে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। সেদিন তিনি আমায় কেমন দেখিয়াছিলেন, জানি না। ভোজনের ডাক পড়িলে যখন তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, মেজবৌয়ের আগেই তিনি আমার পদতলে মাথা নত করিলেন। তারপর প্রণতির স্রোতে আমি হাবুডুবু খাইলাম।

নৈশ-ভোজন সমাপন করিয়া, কয়দিন ধরিয়া যে কথাটা মনের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছিল, তাহা সকলের কাছে প্রকাশ করিলাম। কালীবাবুকে বলিলাম—"খরচের টাকা আর তোমাকে দিতে হইবে না। আমি নিজেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া লইব। আমি আজ হইতেই স্বাবলম্বনের সাধনায় ব্রতী হইলাম।"

তার পরদিন প্রভাতে আমার সোদর-প্রতিম পরম সুহৃৎ মাণিকলাল আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কাল স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলিয়াছেন, কোন ব্যবসা করিবেন নাকি ?"

আমার সম্মতিসূচক উত্তর শুনিয়া বলিল, "আমারও লেখাপড়া শেষ হইয়াছে, আপনার কাজে আমিও লাগিয়া যাইতে চাই।"

স্নেহ-প্রীতির উৎসে আমার নয়নে অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িল। স্বাবলম্বী হওয়ার উলঙ্গ প্রেরণাটুকুই আমার সম্বল ছিল। কি করিব, পুঁজি কোথা হইতে পাইব, তাহার চিন্তা তখনও বুদ্ধি-যন্ত্রে অবতরণ করে নাই। মাণিকলালের মুখে তাহার সহযোগিতা পাইব শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "একটী মাত্র ব্যবসা সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, সেটী কাঠের কারখানা। আমি এই কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করিব।"

চন্দননগরে তাঁতের কাপড়ের ন্যায়, কুমারের হাঁড়ীর ন্যায়, সেগুন, মেহগ্নি, শিশু প্রভৃতি দামী কাষ্ঠের চেয়ার এক প্রকার একচেটিয়া ছিল। কলিকাতার ইয়োরোপীয়গণ চন্দননগরে আসিয়া কারখানা স্থাপন করিতেন। এমন দিন গিয়াছে, চন্দননগর হইতে ৩।৪ লক্ষ টাকার চেয়ার কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সম্বৎসরে চালান গিয়াছে। আমাদের পারিবারিক ব্যবসাটিরও বেশ সুনাম ছিল। আমিই তাহার তত্ত্বাবধান করিতাম। কলিকাতার খরিদ্দারগণ আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতেন। এই সময়ে যদিও আমার কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল, তত্রাচ পত্রাদি-সহযোগে মাণিকলালকে কলিকাতায় পাঠাইলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে না। কিন্তু ব্যবসা ফাঁদিবার পক্ষে উপযুক্ত লোকের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও প্রয়োজন।

আমি অর্থহীন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা যখন ব্যবসার পথে আমায় লইয়া চলিয়াছে, তখন লোকবল ও অর্থবল, দুই-ই পাইব—এই বিশ্বাস আমার ছিল। মাণিকলাল নিজেই বলিল, "আপনার টাকা নাই, ব্যবসা করিবেন কি প্রকারে ?"

আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। পরক্ষণেই সে বলিল, "আমি কিছু টাকা দিতে পারি।"

পল্লীর যে সকল তরুণেরা আমায় ভালবাসিত, তাহাদের সহিত আমি নিজেকে একাত্ম মনে করিতাম। কালে অনেক ক্ষেত্রে অতি নির্ম্মমভাবেই আমার সে ভুল ভাঙিয়াছে! বিশ্বাসের অমৃত-সায়রে ডুব দিয়া, অবিশ্বাসের কণ্টকগুল্মে আমি আজ পর্য্যন্তও ক্ষত-বিক্ষত হই। কিন্তু অমৃত-প্রলেপে সে ব্যথা আমায় বিচলিত করিতে পারে না।

এই মাণিকলাল অতি কিশোর বয়সে আমায় অগ্রজের ন্যায় ভালবাসিয়াছে; আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমা সে অতিক্রম করে, তার অনবদ্য-প্রীতির বন্ধন নানা অপ্রীতিকর ঘটনার সংঘাতেও শিথিল হয় নাই। ঈশ্বরের এই সকল মহাদান জড় হইয়া আমায় অধ্যাত্মক্ষেত্রে ইহাদের মুখ চাহিয়াই স্থির রাখিয়াছে। মাণিকলালের ঋণ বাহ্যতঃ পরিশোধ্য হইলেও, অন্তরে তাহা চির-অপরিশোধনীয়। সম্বন্ধের অমৃত-বন্ধন মর্ত্ত্যের নহে, স্বর্গের।

মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত টাকা দিতে পার?" মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "কত টাকা আপনার প্রয়োজন?"

মাণিকলাল সদ্য বিদ্যামন্দির হইতে বিদায় লইয়াছে। সে আর কত টাকা দিতে পারে? আমি বলিলাম, "আমি একটী চেয়ারের কারখানাই খুলিব। প্রথম তোমাদের শিক্ষার জন্য সামান্য ব্যবস্থারই প্রয়োজন। ব্যবসা শিক্ষা করিলে ক্রমে ক্রমে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে।"

মাণিকলাল কথার উত্তর দিল না। দ্রুত প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া আমার হাতে ২০০৲ টাকা দিয়া বলিল "পড়া ছাড়িয়াছি, কাজ শিখিব, শ্রম দিব, টাকার আমার প্রয়োজন নাই। আপনার কাজ এই ব্যবসার দ্বারাই চলিবে।"

আমি নির্ব্বাক্। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমিও আর এক দিনও বিলম্ব করিতে পারি না। কয়েকখানা বাঁশ ও দুইখানা হোগলা বাজার হইতে আনিতে বলিলাম। আমার আর এক সুহৃৎ রায় বাহাদুর ৺পূর্ণচন্দ্র সোমের পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সোমের বাগানে হোগলার ঘর নিজেরাই বাঁধিলাম। তার পরদিন প্রভাতে জয়মূর্ত্তি গৃহদেবী বলিলেন, "পূজার আয়োজন হইবে না?"

আমি বলিলাম "তোমার সম্মতিই আজিকার অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র।" তিনখানি খাতা খরিদ করা হইয়াছিল, তাঁহাকে সেই খাতা তিনখানি হাতে করিয়া আমায় তুলিয়া দিতে বলিলাম। অন্নপূর্ণার এই মহাদানের কথা "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইলে, চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমি নিঃসঙ্গ নিষ্কাম কর্ম্মজীবনের পথে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের দায় বড় ছিল না। জাতিরই ভ্রূণ-মূর্ত্তি-স্বরূপ সঙ্ঘের এই প্রথম অর্থক্ষেত্রে মাণিকলালের প্রথম উৎসর্গপূত জীবনের দান আজ সুদূর প্রসারিত ও উৎসর্গেরই সমবায় গুণান্বিত হইয়া কলিকাতায় "প্রবর্ত্তক ফার্নিশার্স" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার বীজক্ষেত্র কিন্তু আজিও চন্দননগরে বিদ্যমান।

রামেশ্বর সেদিন আমার সহযাত্রী, সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সম্বন্ধের বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, এ কল্পনা আমার ছিল না। অকৃত্রিম সুহৃৎ কালীবাবুর অযাচিত দানে বিগত নয় মাস আমার জীবনযাত্রা চলিয়াছে। এই তিন ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় রাখার জন্য কারবারের নামকরণ হইল "রক্ষিত-দে-ঘোষ এণ্ড কোম্পানী।"

সেদিন প্রেরণাপূর্ণ বাণী বুকে ধরিয়া শ্রীঅরবিন্দের যে সকল পত্র আসিত, সেই সকল পত্রের প্রান্তভাগে তিনি ইংরাজী অক্ষরে 'কালী' নাম স্বাক্ষর করিতেন। আমি খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিলাম "শ্রীশ্রী৺কালীমাতার ইচ্ছায় এই কারবারের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার মূলধন ১০,০০০৲ টাকা হইল। উপস্থিত ২০০৲ টাকা প্রদত্ত হইল।"

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ইতিহাসে ব্যবসাক্ষেত্রে আমার প্রথম অভিযানের এই স্মরণীয় দিনটীর এই ক্ষেত্রে অনুলিপি রক্ষিত হইল।

খাতা পত্তনের সময়ে এই ২০০৲ টাকা মাণিকলালের নামে জমা করিবার কথা। মাণিকলাল জানাইল, "এ টাকা আমার নহে, আপনার।" আমি তখন ১০০৲ টাকা মাণিকলালের নামে আর ১০০৲ টাকা রামেশ্বরের নামে জমা করিয়া, নিজের হাতে খাতা লিখিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলাম। কালীবাবু বলিলেন "ব্যবসা আমাদের নামে, কিন্তু ইহা তোমার কাজের জন্য করা হইল, এই কথাটা যেন আমরা স্মরণে রাখি। আমিও ইহার পুঁজি বাড়াইতে সচেষ্ট হইব।"

কারবার চলিল। কর্ম্মস্রোতঃ সংহতির শ্রম আকর্ষণ করিল। মাণিকলালের অবরুদ্ধ প্রাণশক্তি বিস্তৃত প্রবাহে কারবারটীকে দেখিতে দেখিতে বৃহৎ করিয়া তুলিল। নৌকায় কাঠ আসিত, গঙ্গাতীর হইতে আমরাই পাঁজা

প্রথম ব্যবসায়ের স্মৃতিলিপি

করিয়া তাহা বহিয়া আনিতাম। বড় বড় চকোর কাঠ ২০।২৫ জন মিলিয়া টানিয়া গোলায় তুলিতাম। হাত-করাতে কাঠ চিরিতাম। চেয়ারের পটিতে নম্বর দিতাম। শিরীষ কাগজে ঘষিয়া কলিকাতায় যে দিন মাল প্রথম চালান দেওয়া হইল, সে দিন সাফল্যের শিহরণ দেখিয়াছিলাম যাঁহার মধ্যে, আজ তিনি নাই। কত কর্ম্মপ্রকাশ সঙ্ঘের জীবনে, সে আনন্দের অনুভূতি আর পাই না। দর্পণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রতিচ্ছবি দেখার আশা দুরাশা।

স্বাবলম্বনের সাধনায় তন্ময় হইলাম। মাণিকলাল হাতের কাজ কাড়িয়া লইতে লাগিল। কালীবাবু খাতা লিখিতে বসিলেন। হোগলার চালের পরিবর্ত্তে পাকা কারখানা-গৃহ গড়িয়া উঠিল। দুইজন চারিজন করিয়া ২০।২৫ জন কারিগর পাওট পাতিয়া বসিল। নীরব পল্লী হাতুড়ি-বাটালীর আঘাতে প্রাতঃকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শব্দিত হইল। এই কারখানাটীই হইল তরুণদের মিলনক্ষেত্র—সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মভূমি।

এক দিনের কথা মনে পড়ে, একখানা সুবৃহৎ চকোর কাঠ গঙ্গাতট হইতে কুলিমজুরেরা টানিয়া আনিতে পারিল না। আমার মনে হইল, আজিকার এই অসমাপ্ত কর্ম্ম শেষ করিতেই হইবে। আমি তরুণদের লইয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমার এক বয়োবৃদ্ধ বন্ধু এই অসম্ভব কর্ম্মে আমাকে নামিতে দেখিয়া, নানা বিদ্রূপ বাক্যে এই কার্য্যে যে আমরা অসমর্থ হইব—এই কথাই জ্ঞাপন করিলেন। আমাদের জিদ্ আরও বাড়িল। সেই কাষ্ঠখানির আয়তন এত বৃহৎ ছিল, ২০।২৫ জন কুলি যাহা পারে নাই, আমরা ১০।১৫ জনে তাহা পারিব—ইহা বিশ্বাস করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কোন কর্ম্মই সেদিন আমার অসাধ্য বোধ হইত না। বিজ্ঞ বন্ধুর বিদ্রূপ-বাক্য আমায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিল। আমরা সে এক সন্ধ্যায় অতি কৌশলে বাঁশের টুকরা কাঠের তলায় রাখিয়া, ১০।১৫ জন মিলিয়া টানাটানি সুরু করিলাম। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। কাষ্ঠখানি যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমাদের ১০।১৫ জনের আকর্ষণে সবেগে গোলায় আসিয়া প্রবেশ করিল। জয়গর্ব্বটা আমাকে চিরদিনই অনুভব করিতে হইয়াছে নিত্যসঙ্গিনীর মধ্যে। কোথাও ছোট হইলে, তাঁহারই চক্ষে মালিন্যের ছায়াপাত হইত। সাফল্যে চক্ষে জয়-দীপ্তি বিকশিত হইত। আজিকার এই দুঃসাধ্য কর্ম্মটাও সিদ্ধ হওয়ায় এবং প্রতিবাদীদের ধারণা উল্টাইয়া আমাদের জিদ রক্ষা হওয়ায়—সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই পুলকিত হইয়াছিলেন। ছেলেরা বিজয়ী বীরের মত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি নিজে আসিয়া খাদ্য-পরিবেশন করিলেন। গোলা হওয়ার পর হইতে আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে সমবেত তরুণেরা প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার হাতের রুটি, পরোটা, ব্যঞ্জন প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করিত। ভাবপ্রবণতাপূর্ণ সে উজ্জ্বল জীবন-যুগে আমাদের চক্ষে বিষাদের ছায়া ছিল না, নৈরাশ্যের অন্ধকারও ঘনাইয়া উঠিত না। শ্রমের পর জলযোগে পরিপূর্ণ প্রাণে পল্লী কাঁপাইয়া সেদিন এক নূতন সঙ্গীত আমাদের কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইল। সে সঙ্গীত বিজ্ঞ প্রতিবাদী বন্ধুদের শুনাইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। সে শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিবার জন্য সেই সঙ্গীতটী এইখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

"ওরে ও অকেজোর দল
তোরা কাজের মানুষ সাম্‌লে চল।
ওরা নাড়ে মাথা, কয় যে কথা,
ঐ ওদের সম্বল।
কোন্‌টা হবে, কোনটা হবে না,
করার আগে জানা যাবে না,
বুদ্ধির গোড়ায় কোপ দিয়ে ভাই
ফেলে দেরে ফলাফল।"

গান গাহিতে গাহিতে সে উদ্দাম নৃত্য আর ১০।১৫ জনের উচ্চকণ্ঠ বৃদ্ধকে বেসামাল করিয়াছিল। গৃহিণী মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে চক্ষের ইঙ্গিতে বুঝাইতেছিলেন—খুব হইয়াছে, মানুষকে অত অপ্রস্তুত করা ভাল নয়।

কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করার জন্য এইরূপ প্রবৃত্তি প্রকাশ হইত না; ইহা সেদিন ছিল নূতন শক্তির স্বতঃ স্বচ্ছ উলঙ্গ প্রকাশ। হাসির মাত্রা ঠিক থাকিত না। কথা ছন্দোবদ্ধ ছিল না। আহার-নিদ্রার ঠিকানা রাখা যাইত না।

কর্ম্ম আর কর্ম্ম। ভোরে উঠিয়া সঙ্গীত, উপাসনা, মন্ত্র-জপ। এমন 'ওঁ কালী' বলিয়া চীৎকার উঠিত—পাড়া-প্রতিবাসী চমকিত হইত। তারপর গোলায় কাঠ তোলা, কাঠ সাজাইয়া রাখা। অপরাহ্নে প্রাচীন হাডুডু খেলার নূতন সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহাতে মাতিয়া থাকা। ফুটবল এসোসিয়েশনের মত এই দেশীয় খেলাটীকে নিয়মবদ্ধ করিয়া "বঙ্গীয় ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল প্রতিযোগিতা" নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা এইখানেই প্রথম হয়। আজ বাংলার অনেক ক্ষেত্রে এই খেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমি তৃপ্তি অনুভব করি।

সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবনক্ষেত্রে কত ভাব, কত স্বপ্ন যে মস্তিষ্কে লীলায়িত হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সারা দিন, সারা রাত্রি কি এক অদ্ভুত মাদকতায় চিত্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। গোলার কাজে আমার আর বেশী সময় দিতে হইত না। অবকাশের মাত্রা অন্তর স্বপ্নে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দ চলিয়া যাওয়ার পরেই ১৯১১ ও ১২ সালে একখানি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম। উহার নাম হইল "সনাতনী"। ইতঃপূর্ব্বে "দেবজন্ম" নামে একখানি সাময়িক কাগজ বাহির করি। সেই সময়ে বিদেশ হইতে অনেক বৈপ্লবিক ইস্তাহার আমাদের নিকট আসিত। "তলোয়ার" বলিয়া একখানি কাগজ আমার নিকট নিয়মিত ভাবেই আসিত। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ছিলেন ইহার সম্পাদক। আমার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ইঁহাদের চিন্তা-ধারার সহিত খাপ খাইত না। যে সকল তরুণ আমার ছত্রতলে মানুষ হইতেছিল, তাহাদের মস্তিষ্ক পাছে এই সকল পাশ্চাত্যপ্রভাবযুক্ত বৈপ্লবিক যুক্তিবাদে সংক্রামিত হয়, তাহার জন্য আমি একখানি হস্তলিখিত পাক্ষিক পত্র বাহির করি। উহারই নাম ছিল "দেবজন্ম"। এই কাগজখানির চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এই জন্য গোপন ভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র প্রেস স্থাপন করার ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রেসের ব্যাপার আমাদের কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু কোন বিষয়ই আমাকে একজন পশ্চাৎপদ হইতে দিতেন না। সর্ব্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ না হইলেও, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন হইতে বঞ্চিত হই নাই। শিশু যেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে বার বার ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, আমার অবস্থাও বহু বার এইরূপই হইয়াছে। প্রেসের চিন্তাও আমায় স্থির থাকিতে দিল না। কিছু টাইপ খরিদ করিয়া, একটি কাঠের যন্ত্রে "দেবজন্ম" ছাপিবার চেষ্টা করিলাম। এক পৃষ্ঠা অতি ক্ষুদ্র "দেবজন্ম" টাইপ সাজাইয়া ছাপিতে ১০।১২ দিন সময় কাটিয়া গেল। এই কর্ম্ম হইতে বিরত হইলাম। কাঠের কারবারটী সুন্দরভাবে চলিতে আরম্ভ করিলে, এই প্রেরণা আবার আমায় উদ্বুদ্ধ করিল।

আমি আমার দীর্ঘজীবনে কামনা ও প্রেরণার মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ঈশ্বরের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিলে, সব কর্ম্মের মূলেই ঈশ্বরপ্রেরণা থাকে বটে, কিন্তু আধারগত অশুদ্ধির সহিত বিজড়িত হইয়া উহা প্রাণের সাহায্যে যখন মূর্ত্তি লইতে চাহে, তখন তাহা রোধ করা যায় না। অনিবার্য্যরূপেই অবিশুদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া তাহা প্রকাশ পায়। বেশ বুঝা যায় যে, কর্ত্তার হাত ফস্কাইয়া এই কর্ম্মবীজটী অতি অপরিণত অবস্থায় বিকৃতাঙ্গ হইয়া বাহির হইয়াছে। চেষ্টা করিয়া এইরূপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আজিকার যে অবস্থা সেদিন অপেক্ষা তাহার অধিক উন্নতি বড় দেখি না। সেদিনের ঔদাসীন্য আত্মসমর্পণ-যোগবীজের পরিপুষ্টির কারণ হইয়াছিল—অবাধ সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। আজ সতর্কতার চেতনামাত্র আছে—কিন্তু যে কর্ম্ম হয়, সতর্কতায় বা ঔদাসীন্যে অবরুদ্ধ হয় না। সেদিনের অবস্থার দায় বোঝা হইয়া শরীর ও মনকে পীড়িত করে; কিন্তু আজিকার সঙ্ঘের জন্য পূর্ব্বের মত পীড়ার কারণ নাই—সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়ার আকিঞ্চনই হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ রাখে। যখন যে অবস্থা, ভগবান তখন তদনুরূপেই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যোগসিদ্ধ জীবন সুনির্দ্দিষ্ট কালের সীমায় সম্ভব নহে। সুদীর্ঘ জীবন শুধু নহে, কত জন্ম ইহার জন্য দিতে হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই যোগ অন্যান্য যোগ-পদ্ধতির ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মের অধীন নয়। আধার ও প্রকৃতি-ভেদে নানা ভঙ্গীতে ইহার সাধন চলে। আত্মসমর্পণ-

যোগ নিয়মানুবর্ত্তী হয় না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এবং সাধনক্ষেত্রে এইজন্যই অনেক ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া মানুষ যাহাতে যোগপথ আশ্রয় করে, তাহার জন্য নিজের অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া অন্যকে আশ্রয় দিতে পারি, অপকারের ভয় হয় না—ভরসার বাণীই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

ব্যবসার প্রেরণা অধ্যাত্মজীবনক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পুষ্টির প্রতীক্ষা করিল না—রূপ লইল। ধৈর্য্যের বাঁধন আমার মধ্যে খুবই অনুচ্চ শিথিল। কর্ম্ম-প্রেরণা অবরুদ্ধ রাখিয়া তাহাকে শোধন ও সাধনের অবকাশ দিতে আমি চিরদিনই অসমর্থ হইয়াছি। এমন আয়াস আমার কাছে—মন ও বুদ্ধির অপপ্রচেষ্টাই মনে হইয়াছে। কাঠের কারখানাটী প্রবর্ত্তন করার পর "সনাতনী" ও "দেবজন্ম" প্রচারের পূর্ব্ব প্রেরণা নূতন আকারে আমায় চাপিয়া ধরিল। কারবারের বৈশাখী নূতন খাতায় কয়েক মাসের যে জের উঠিল, তাহাতেই বুঝিলাম, কারবার চলিবে ভাল। এই ক্ষেত্রে আমার কিছু আর করার নাই। প্রচার-ব্রত সুসিদ্ধ করার জন্যই চিন্তা সুরু হইল।

আষাঢ়ের আকাশ যখন ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন, বারিপাতে নিদাঘের ক্লান্তি হরণ করিতেছে, বর্ষণধারার ন্যায় ঊর্দ্ধলোক হইতে বাণীপ্রচারের সুস্নিগ্ধ অনুভূতি আমায় অভিষিক্ত করিল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে প্রায় সকলেই তখন কলেজের ছাত্র। রবিবাসরীয় সভায় সাহিত্যচর্চ্চা কম হইত না। একখানি সাময়িক পত্রিকার প্রচারের সঙ্কল্প সকলেই সমর্থন করিল। পত্রিকাখানি পাক্ষিক করিতে হইবে, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল। নামকরণ লইয়া সমস্যার অন্ত রহিল না। কেহ বলিল—"দেশের এই ঘন ঘোরে ইহা খদ্যোতের মত ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দু স্বরূপ হইবে, অতএব ইহার নাম 'খদ্যোত' রাখা হউক।" একজন বলিল —"দেশের ভণ্ডামী দূর করার জন্য এই পত্রিকাখানিতে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইবে, অতএব ইহার নাম 'সম্মার্জ্জনী' রাখা হউক।" কয়েকজন পূর্ব্ব প্রেরণার সুর ধরিয়া জানাইল "নাম তো আছেই 'সনাতনী' অথবা 'দেবজন্ম', এই দুটোর মধ্যে একটা দিলেই চলিবে।" 'সনাতনী' কথাটা অনেকের পছন্দ হইল না। উহার মধ্যে তাহারা প্রাচীনতার দুর্গন্ধ বাহির করিল। আর 'দেব-জন্ম' নামটা বড় বাড়াবাড়ি ধরণের হয়। নাম লইয়া সারাদিন আলোচনা আন্দোলন চলিল। আমার মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ উঠিল।

সাধনার পথে জীবনচ্ছন্দের প্রকৃতি একটু অবহিত হইলেই ধরা পড়িয়া যায়। বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ লইয়া অন্তর-চালনায় একটা অনুভূতি-ভেদ আছে। যখন অহমিকার ফাঁক দিয়া উপরের শক্তি ইহার উপর পড়ে, তখন চিন্তার যে আস্বাদ, আর উপরের রুদ্ধ আলোকে শুম্ভিত বুদ্ধির মধ্যে যে চিন্তার সংস্কার সঞ্চিত থাকে, বাহিরের তাগিদে উহা যখন স্বভাব-বশে নড়াচড়া করিতে থাকে, সে চিন্তা-তরঙ্গের অনুভূতি স্বতন্ত্র ধরণের। বুদ্ধির উপরের ছিদ্র পথ কি করিলে মুক্ত হয়, কি না করিলে রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান আমার কাছে জানা ছিল না; আর তাহা জানিলেও, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা উহা হয় না। আত্মসমর্পণের চেতনা যখন সবখানিকে ঘনাইয়া তুলে, তখন সকল অন্তর-যন্ত্রের আবরণগুলি সংস্কৃত হয়। এই আত্মসমর্পণের রসানুভূতিতে আবার অবগাহিত হওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা নিরর্থক। এখানেও সাধককে অসহায় অবস্থায় থাকিতে হয়—"যখন তোমার ইচ্ছা হবে", এই ভাবেতে বসিয়া থাকার মত অবস্থায় ইহার অমৃত আস্বাদ মিলে। আধার-যন্ত্রে আত্মসমর্পণের বীর্য্য স্থান পাইলেই ইহাতে পুষ্ট হইয়া যোগ-রহস্য প্রকাশ করে। দর্শনে, সাহিত্যে, কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে, যত্নে ও চেষ্টায় অহঙ্কারেরই অনুশীলন হয়। আধারে বীজ অবধৃত না হইলে, নিষ্ফল জীবন—উহা অহঙ্কারেরই লীলাভূমি।

পত্রিকা বাহির হইবে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কি তাহার নাম হইবে, তাহা জানি না। তাহা ভগবান তখনও জানান নাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধি-যন্ত্র স্তব্ধ হইল। বন্ধুরা আলোচনার সুর রাখিয়া গেল। আমার বাহির ভিতর কিন্তু স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

তাহার পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া ধ্যানে বসিলাম। রাত্রির শেষ অংশটা আমার নিকট অতি লোভনীয়। নিস্তব্ধ পৃথিবীর কোলে বসিয়া এই সময়ে ঊর্দ্ধলোক হইতে যে অমৃতের বর্ষণ হয়, তাহা আমি মাথা

পাতিয়া গ্রহণ করি। ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে আলোর ঝরণা ঝরে, পাখীর কণ্ঠে প্রথম বন্দনা উঠে; পল্লীতে জাগরণের প্রথম সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও অন্তর্জ্জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই। ইহা আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সেদিনও ইহার অন্যথা হয় নাই। একটী ক্ষুদ্র কক্ষে, নিস্তব্ধ সমাহিত চিত্তে অন্ধকারে বসিয়া আছি। অন্তর্জ্জগতের দুয়ার যেন উন্মুক্ত হইল। মুদিত চক্ষেই দেখিলাম, কয়েকটা জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর। সেই অক্ষর কয়টা পর পর সাজান রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষর নহে, দেবনাগরী অক্ষরে, "প্রবর্ত্তক" এই শব্দটী আমি সুস্পষ্ট দেখিলাম,

চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল—আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু স্থির ঋজুভাবে বসিয়াছিলাম। হউক স্বপ্ন, অন্তর্দ্দেবতার নির্দ্দেশ এইভাবেই আসিয়াছে। আমি সেইদিন সাময়িক পত্রিকাখানির নাম "প্রবর্ত্তক" হইবে, সকলকে জানাইলাম। কথাটা সকলেরই ভাল লাগিল, নূতন মনে হইল।

কথার সঙ্গেই কাজ। স্বার্থের হিসাব করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারি নাই। এই হিসাব উহ্যই রহিল। "প্রবর্ত্তকে"র এক অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করিলাম। "রয়েল ৮ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা পূর্ণ পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাক মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য নগদ ৴০।"

অনুষ্ঠান-পত্রটী বাহির করিয়া বলা হইল—ইহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টে বাহির হইবে। কিন্তু যথাসময়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাওয়ায়, উহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে বাহির হয়। কাঠের কারখানায় রামেশ্বরের মন বসে নাই। রামেশ্বরকে এই পত্রিকার পরিচালক করা হইল। আমার আর এক সহকর্ম্মী চির-সুহৃৎ মণীন্দ্রনাথ নায়েককে ইহার সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করা হইল। কাগজ বাহির করিয়াই এই কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইলাম, আর আমি যে একেবারে তন্ত্র-সাধনা ছাড়িয়া বেদান্তে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি, এ কথাও জানাইতে ভুলিলাম না। তিনি কয়েক দিন পরে জানাইলেন—"You have done well in confiding yourself to Vedantic Yoga...."বেদান্ত-যোগে নির্ভর করিয়া ভালই করিয়াছ।" "প্রবর্ত্তকে"র তৃতীয় সংখ্যা পাইয়া লিখিলেন—"The last number was very good"—ইহার উপর জানাইলেন—"You must not mind if you do not get always a written answer. The unwritten will always be there."—সর্ব্বদা লিখিত উত্তর না পাইলে ভাবিও না —ঐখানেই আমার অলিখিত উত্তর পাইবে।

দৃঢ় প্রত্যয়ে হাতের কলম চলিল—ভাবিতাম, আমি যন্ত্র—যন্ত্রী আমায় লিখাইতেছেন। সে ইতিহাস ক্রমে বলিতেছি। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

দেবতা আসিয়া ফিরে গেল তোর দ্বারে।
ঘুমে অচেতন র'লি ওরে মন
দেখিলি না ফিরে তারে।
শূন্য দেউল র'ল চিরদিন,
শত আশা তোর শুধু হ'ল লীন,
বাজালি কেবল বেদনার বীণ্,
কাঁদিলি যে বারে বারে।

মিছে হেলাফেলা করি' কত কাল
শুধু পেলি ব্যথা তুলিতে মৃণাল,
এবারে ও তুই ছুটে যারে তোর দেবতার অভিসারে
তোর আপনার হৃদয়ের ফুলে
অর্ঘ্য দে তাঁর চরণের মূলে,
আর কত দিন র'বি ওরে তুই
ভুলে ভুলে আপনারে?

আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান—এই বাণী উপনিষদের। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসেরও এই একই কথা—"Know thyself." লক্ষ্য লইয়া কোন মতভেদ নাই। বাঙালী কিন্তু লক্ষ্য লইয়া গণ্ডগোল না করিয়া, অসাধারণ জীবন-পথে এই আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্যই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সাধনাই বাংলার 'কাল্‌চার'। বাঙালীর ইহা অমূল্য জাতীয় সম্পদ্।

* * * *

এই সাধনা উত্তম রহস্য। ইহা বড় নিগূঢ় মর্ম্ম-তত্ত্ব —মরমীরই অধিগম্য। বাহিরের ভাসাভাসা বুদ্ধি দিয়া ইহার ত্রিসীমায় পৌঁছান যায় না। ইহা অধিগত করিতে বুদ্ধিকে তলাইয়া অবচেতনার স্তরে ডুব দিতে হয়। সেইখানে মগ্ন হইয়া যে বস্তুর স্পর্শ অনুভূত হয়, তাহাই বুদ্ধির ক্ষেত্রে শুভক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন যাহা প্রাপ্ত, তাহাই স্বতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। বস্তুপ্রাপ্তি অন্তরের অন্তরে—বাহিরের চিন্তাপটে তাহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ যথাকালে ফুটিয়া, ফলিয়া উঠে।

* * * *

এই অবচেতনায় ডুব দেওয়ার সঙ্কেত আছে। এই-খানেই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্কেত চিন্তা নয়, চেষ্টা নয়। বাঙালীর বুঝার বস্তু প্রথমেই তর্কগ্রাহ্য করিতে গেলে, উহা ধরা দেয় না। স্থূলবুদ্ধি, স্থূল চিন্তা ও চিন্তার প্রণালী যেন কিছুতেই সূক্ষ্মতমের নাগাল পায় না। এইজন্য বাঙালীর আসল ধারণা তথাকথিত "Ideation" নয়—ইহা যৌগিক ধারণা। ঋষি পতঞ্জলির সংজ্ঞার সহিত ইহার বরং গভীর মিল আছে। ঋষি পতঞ্জলির সূত্রে পাই—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"। চিত্তের ধারণা দেশবদ্ধ হইয়া সংস্থিত হয় অর্থাৎ দেহের (system)-এর ভিতরেই তাহা বীর্য্যরূপে স্থিতিলাভ করে। ইংরাজী "Conception" শব্দটী এই যৌগিক ধারণা-শব্দের অধিকতর অনুকূল প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শুনিয়াছি, মনীষী Addison যখন বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের নবীন সভ্য হইয়া তিন বার "I conceive" বাক্যাংশ উচ্চারণ করিয়া স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে বসিয়া পড়েন, তখন তাঁহার সহতীর্থেরা তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিয়া-ছিলেন—"Mr. Addison conceived thrice but produced nothing !" এডিসন সাহেব তিন বার ধারণার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু প্রসব কিছুই করিলেন না! ধারণা-শব্দে গর্ভধারণারই সমতুল্য অর্থ করিয়া, তাঁহারা এই ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু conception-এর যৌগিক-অর্থ নারীর conception-এর সমতুল্য বলিলে সত্যই অত্যুক্তি হয় না। নারী যেমন বীর্য্যবস্তু গর্ভে ধারণ করিয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়, তেমনি আন্তরিক ধারণা-বস্তুও দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া নিহিত করিতে হয়। এই নিধানই চিত্তের দেশবদ্ধ-স্থিতি—এক হিসাবে ইহা গর্ভাধানেরই সমতুল্য। বাঙালীর সাধন-সঙ্কেত এমনই যৌগিক ধারণার বস্তু। ভাব-বীর্য্য মগ্ন চেতনার নিগূঢ় স্থির ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া, তথায় সুদৃঢ় নিষ্ঠায় তাহাকে সঞ্চিত, পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই এই ডুব দেওয়ার প্রথম সঙ্কেত।

* * * *

তাই গুরুর নিকট ভাব-বীর্য্য গ্রহণ করাই অব্যর্থ সাধন-বিধান। ইহা মর্ম্মের স্বীকৃতি। মর্ম্ম পাতিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম-দান 'স্বীকার' অর্থাৎ আপনার করিয়া লইতে হয়। সতী যেমন পতির সার-মর্ম্ম আপনার দেহগত করিয়া, তাহাকেই আপন মরমের মরম দিয়া পোষণ ও বর্দ্ধন করে, ইহাও সেই প্রকার প্রক্রিয়া। আবার বীর্য্য যেমন গর্ভে ভ্রূণ-মূর্ত্তি ধরে, তেমনি বীর্য্যময়ী ধারণাও দিনে দিনে অন্তরে বিকশিত—শনৈঃ শনৈঃ প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি পরিপুষ্ট ও সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। ধারণার এই স্বাভাবিক পরিপুষ্টি ও পরিব্যাপ্তিকেই আমরা যথার্থ ধ্যান অভিহিত করি। তাহার শেষ পরিণতি সমাধি—যাহা তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ বলিলে ঠিকই বলা হইবে।

বাঙালার সাধন-বিজ্ঞানে ধারণা-ধ্যান—যাহা পতঞ্জলির শাস্ত্রানুসারে "ত্রয়মেকং সংযমঃ"—সেই "সংযমের" এই অভিনব রহস্য ও প্রক্রিয়ারই আমরা সন্ধান পাইতে পারি।

* * * *

উপরে যেটুকু সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে যে, সংযম অধ্যাত্ম-প্রক্রিয়া। কিন্তু ইহার সাধন—বস্তুতন্ত্র সাধন। অর্থাৎ বাঙালী ইহা স্থির বুঝিয়াছিল—এবং ভূয়োদর্শনে সাধক মাত্রেই আমাদের এই কথার সমর্থন করিবেন যে, প্রকৃত অধ্যাত্ম-ক্রিয়া মাত্রই বস্তুতন্ত্র সাধন ছাড়া কিছু নহে। নিরাধারা শক্তি লইয়া সাধন জমে না। ইহাকে সাধনা বলিয়াই খাঁটী বাঙালী স্বীকার করে না। কুণ্ডলিনী শক্তি দেহাধারে কুণ্ডলিতা থাকেন বলিয়াই তাহার জাগরণ সম্ভব ও সিদ্ধ হয়। নতুবা আকাশে গৃহনির্ম্মাণ সুন্দর কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাধনা নহে। বাঙালী এই দেহস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'কুল' হইতে 'অকুলে' তুলিতে গিয়াই শক্তি-সাধনা অর্থাৎ তন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিল। শক্তি-সাধন—দেহতন্ত্র শক্তিরই সাধন। সহজিয়ারাও দেহহীন আসক্তির কথা একেবারেই সাধনা বলিয়া আমল দেয় নাই। তাহা নিছক ছেলেখেলা, আজগবী কল্পনা।

দেহ-স্থিত শক্তি বা আসককে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিবার জন্যই বাঙালীর সাধনা। তাই তাহার প্রথম সাধ্য—দেহ। কিন্তু ইহা কোন হঠযৌগিক প্রক্রিয়া নহে। বলিয়াছি—সাধন সংযম। ইহা অধ্যাত্ম-প্রক্রিয়া। দেহকে নিছক দেহ দিয়াই বুঝা যায় না, আয়ত্ত করা যায় না। এইরূপ বুঝিবার ও ধরিবার চেষ্টা—বাতুলতা। আমাদের বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞান সাধনার দৃষ্টিতে তাই একাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। হঠযোগকেও এইরূপ অপূর্ণ জিনিষ ছাড়া বাঙালী অধিক কিছু মনে করিতে পারে নাই। গোরক্ষ-নাথের হঠযোগ বাঙালায় রূপান্তরিত হইয়া, অধ্যাত্ম-সংযমেরই কয়েকটী বিশেষ গৌণ উপকরণে পরিণত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে অনুপানের যে কাজ,-ইহা তাহারই মত। আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের দানও বাঙালী সেই নাথযোগীদিগের অবদানের মতই অদূর ভবিষ্যতে আরও কয়েকটী অনুকল্পরূপে আত্মসাৎ করিয়া লইবে। বাঙালীর মর্ম্মদৃষ্টি যাঁহার আছে, তিনিই ইহা আনায়াসে বুঝিবেন, আমরা ইহা জোর করিয়াই বলিব।

* * * *

জড় দেহে আসক্তিই মূলশক্তি। এই আসক্তি যদি দেহের বাহিরে কোথাও স্থির হয়, দেহের জড়ত্ব-মুক্ত হইয়া তাহা অনায়াসেই বিশুদ্ধ বীর্য্যরূপে পরিণত হইতে পারে। দেহ ছাড়িয়া ইহা হয় না—বা হইলেও, তাহার কোন অর্থ হয় না; তাহার দ্বারা সাধনার উদ্দেশ্যসিদ্ধিও হয় না। তাই এই দিক্ দিয়া সতর্ক হওয়ার জন্যই দেহের কিছু সাধনের প্রয়োজন থাকে। এইটুকুই হঠযোগ বা জড়-বিজ্ঞানের আলোকে যদি কিছু পাওয়ার বস্তু থাকে, তাহা হইতে গ্রহীতব্য—কিন্তু এইটুকুই, ইহার অধিক নহে। বাঙালী আসক্তিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়াই যেমন শুদ্ধ ও সিদ্ধ দেহ অর্জ্জন করিতে পারে, তেমনি বিভিন্ন দেহ-কেন্দ্রে নিবদ্ধ আসক্তি-বিন্দুগুলিকে মিশ্রিত ও গুচ্ছবদ্ধ করিয়া সুসিদ্ধ সংহতি-চক্রও নিখুঁতভাবে গঠন করিয়া তুলিতে পারে। বিশুদ্ধ আসক্তিই মহাবীর্য্য। তাই কামই বাঙলার সাধনার রসায়ণ। তন্ত্র ও সহজিয়া—উভয় সাধনাই কামের দ্বিধা-বিভক্ত অনুশীলন মাত্র। গতি ও প্রকরণ বিভিন্ন; কিন্তু কার্য্য এক—কামেরই শোধন ও সিদ্ধি-বিধান। ইহা অসম্ভব, যদি দেহ দেহই থাকে। তাই বাঙলার সাধন-ক্ষেত্রে নব বেদের ঝঙ্কার উঠিয়াছিল—

"এই দেহে দেহান্তর সাধিবে নিশ্চয়"

—সে কথা পরে আলোচনা করিব।
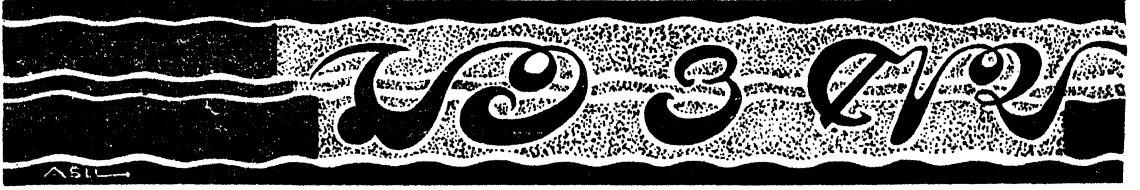
বোম্বাই-এ সুরাবর্জ্জনবিধি

বোম্বাই সহরে গত ১লা আগষ্ট কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট সুরাবর্জ্জনবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে লইয়া দুই লক্ষাধিক লোকের বিরাট্ শোভাযাত্রায় এই ঘোষণাপর্ব্ব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে নব রাষ্ট্রশক্তির ইহা এক অপূর্ব্ব জয়োৎসব। জনসাধারণের উৎসাহের সীমা থাকে নাই। যাঁহারা এই নীতির বিপক্ষে, তাঁহারাও অবশ্য মিছিল করিয়া এই জয়োৎসবে বাধা দিতে ত্রুটি করেন নাই। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই বাধা সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। বিরুদ্ধবাদীদের বাধা যেমন দাঙ্গার আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল, তেমনি গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতেও পুলিসকে গুলি চালাইতে হইয়াছিল। স্বদেশীয় শাসনতন্ত্র হইলে যে জনসাধারণের কল্যাণ লক্ষ্যে রাখিয়া শাসনশক্তি প্রযুজ্য হইবে না, এইরূপ আশা করা বাতুলতা। যাঁহারা এইরূপ আশা করেন না, তাঁহারা এই ঘটনায় বিস্মিত বা বিচলিত হন নাই।

বোম্বাই-এর এই নব বিধান কংগ্রেসের বহু-ঘোষিত নীতিরই অনিবার্য্য কার্য্য-সূচনা। তাঁহারা এই প্রস্তাবটীকে কার্য্যে পরিণত না করিলে, প্রত্যবায় হইত। বোম্বাই প্রদেশে যাহা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা অন্যান্য কংগ্রেসী প্রদেশেও ধীরে ধীরে প্রসারিত হইবে। এই বর্জ্জননীতির সর্ব্বপ্রধান বিরোধিতা আসিয়াছে স্থানীয় পার্শী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই। মুসলমান সম্প্রদায়ও ইহার বিরুদ্ধে। তবে পার্শীদের ন্যায় নীতি ও স্বার্থ উভয় দিক্ দিয়াই আর কেহই এতটা আঘাত পায় নাই। পার্শী সম্প্রদায়ই বোম্বাই-এর একচেটিয়া সুরা-ব্যবসায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধোগতি-নিবারণের জন্য পরম ত্যাগ-স্বীকারে আকুতি জানাইয়াছেন। সুরা-ব্যবসায়ই যাহাদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় ছিল, তাহাদের পক্ষে এই ত্যাগ অতি কঠোর, মৃত্যুদণ্ড তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়। প্রকাশ, মদ্য-বিপণির এক পার্শী কর্ম্মচারী ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করিয়া বেকার-ভয় এড়াইয়াছেন। পার্শীদের এই দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়াই সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমান বর্জ্জননীতি কিছু অদল-বদল করিয়া, রহিয়া সহিয়া প্রচলন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উক্তির মধ্যে দলাদলির গন্ধ পাইয়া, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রহিয়া সহিয়া সংস্কার সিদ্ধ হয় না। কেহ কেহ নাকি সমুদ্রোপকূলে ভাসমান পানাগার চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিরোধী পক্ষ নানাভাবেই শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। শাসনশক্তি হাতে পাইয়া, কংগ্রেসও এই সকল বাধাবিঘ্নে বিচলিত না হইয়া, অধিকারের নিজ আদর্শসম্মত ব্যবহারে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহা জিদ নয়, শক্তিরই পরিচয় বলিতে হইবে।

হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ বন্ধ

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে আর্য্য সমাজ তথা হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম বন্ধ করা হইয়াছে। নিজামের নব-ঘোষিত শাসন-সংস্কার পরিকল্পনায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে সভাসমিতি করিবার ও অন্যান্য যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম আর চালাইবার কোনও হেতু নাই, এই বিবেচনায় সত্যাগ্রহের উদ্যোক্তৃগণ সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছেন—যে সকল ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার-সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার নিরসন হইবে, নিজামের এই আশ্বাসে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর, একটী দীর্ঘদিনব্যাপী অশান্তি ও সমস্যার সমাধান হইল বলিয়া

আমরা মনে করিতে পারি। এই ক্ষেত্রে জনমতেরই জয় হইল বলিয়া আমরা আনন্দিত।

নিজাম বাহাদুরকে হিন্দু সত্যাগ্রহীদের এই ন্যায্য দাবী-রক্ষায় শুধু রাজকীয় জিদ নহে, গোঁড়া মুসলমান প্রজাদের প্রতিবন্ধকতাও অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাই ইহাতে তাঁহার মহানুভবতাই উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী স্যার আকবর হাইদারীর মন্ত্রণাকৌশল ন্যায় ও সুবিচারেরই সহায়তা করিয়াছে, তজ্জন্য তিনিও ভারতবাসী ও বিশেষ-ভাবে হিন্দুজাতির ধন্যবাদভাজন। সত্যাগ্রহী কমিটীও রণোন্মাদনায় মুক্তি ও শান্তির পথ কোন ক্ষেত্রেই পরিহার করেন নাই, ইহাতে তাঁহাদেরও স্থিরবুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠারই পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কংগ্রেসের সহায়তা দূরে থাক, তাহার বিনা অনুমোদনে হিন্দু প্রজা স্বাধিকার-রক্ষার সংগ্রামে এই ক্ষেত্রে জয়ী হইল, ইহা প্রজাশক্তির স্বাধীন জাগরণের এক অমোঘ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। অতঃপর, সঙ্ঘবদ্ধ ত্যাগ ও আত্মবলির শক্তির উপর জনসাধারণ অধিকতর নির্ভর করিতে শিখিবে, ইহা আমরা আশা করিব। কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সাধনার পার্শ্বে এই হিন্দু জাতির সংহতি-শক্তির অভ্যুত্থান বিশেষ অর্থপূর্ণ ঘটনা। হিন্দু ভারত এই জয়ে নব শক্তি লাভ করিবে।

হায়দ্রাবাদের শাসন-সংস্কার

হায়দ্রাবাদের প্রচারিত শাসন-সংস্কারে কিন্তু হিন্দু প্রজার রাষ্ট্রীয় অধিকার ন্যায় ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। হায়দ্রাবাদের মোট জনসংখ্যা ১৪,৪৩৬,১৪৮—তন্মধ্যে হিন্দু ১৩,১৭৬,৭২৭ ও মুসলমান ১,৫৩৪,৬৬৬। কিন্তু প্রায় ১২১ লক্ষ হিন্দু প্রজা ব্যবস্থা-পরিষদে ১৫ লক্ষ মুসলমান প্রজার সহিত সম-সংখ্যক প্রতিনিধি পাইবেন—ইহা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার বলা যায় না। ইহার সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও ন্যায়ানুমোদিত নহে। সংখ্যালঘিষ্ঠের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তির জন্য তাহাকে গরিষ্ঠের আভিজাত্যমণ্ডিত করিলে, উহাতে গণতন্ত্রের আদর্শ সিদ্ধ হয় না। কাশ্মীরে এই একই নীতি গৃহীত হইলে কি হইত, তাহা ভাবিলেই নিজাম গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহার বিসদৃশতা প্রতিপন্ন হইবে। তারপর, মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্য-সংখ্যাও গণতন্ত্রসম্মত হয় নাই। উক্ত ব্যবস্থা পরিষদের ৮৫জন সদস্যের মধ্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ৪২ জন মাত্র, মনোনীত ৪৩ জন।

নির্ব্বাচনের নীতি বিষয়ে বৃটিশভারত হইতে স্বতন্ত্র পদ্ধতি নিজাম গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিবেন। হিন্দু মুসলমানের যুক্ত নির্ব্বাচন হইলেও, এই নির্ব্বাচন দেশগত বিভাগ আশ্রয় না করিয়া আর্থিক বৃত্তি বা স্বার্থ ধরিয়াই সম্পন্ন হইবে। এই অভিনব পদ্ধতির গুণবিচার অবশ্য ফলাফল না দেখিয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাও উদ্দেশ্যমূলক মনে হয়। ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রমূলক জনসভার আইন একটু উদার হইয়াছে বটে; কিন্তু সাধারণ জনসভার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় নাই।

শাসনতন্ত্রে নিজামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা সংস্কার-পরিকল্পনার গোড়াতেই স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ, নিজাম যখন স্বাধীন রাজা নহেন, বৃটিশ শক্তির অনুগ্রহাধীন, বৃটিশ ভারতের প্রজাশক্তি যে অধিকার লাভ করিতে চলিয়াছে, নিজামের প্রজাবৃন্দ সেইটুকু অধিকার হইতেও চিরদিন বঞ্চিত হইয়া থাকিবে। তাই হায়দ্রাবাদের ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষমতা শুধু অনুরোধ-মূলক হইবে—অর্থাৎ শাসকমণ্ডলের উপর কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন হইবে না—এই কথায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই।

প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণচিত্ততা প্রবল কোথায়?

যাঁহারা বাঙালীকেই প্রাদেশিক মনোবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া দিনে রাতে খোঁটা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙালীও আছেন। বাংলার বাহিরে, এ অপবাদ দিবার লোকের তো অভাব নাই-ই। কিন্তু বাঙালীর প্রাদেশিক মনোবৃত্তির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত কোথায়? পক্ষান্তরে, বিহারের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই। বিহার-বাঙালী সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পরেও, নানা আকারে বাঙালীর বিরুদ্ধে এই প্রাদেশিক মনোবৃত্তি এখনও পুরাদস্তুর খেলিতেছে। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশেও বাঙালা ভাষার বিরুদ্ধে এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যুক্ত প্রদেশের বাঙালীর ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না, মন্ত্রিমণ্ডলী এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথাকার হাই স্কুল ও মধ্যশিক্ষা বোর্ডের নির্দ্দেশানুযায়ী পরীক্ষার্থিগণকে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় ইংরাজী ছাড়া সকল বিষয়ের উত্তর লিখিতে হইবে। বোর্ডের সভাপতি অনুমতি দিলে, ইংরাজীতেও পরীক্ষা দেওয়া চলিবে।

যুক্ত প্রদেশের বাঙালী অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে শিক্ষামন্ত্রীকে জানান হয়, এইরূপ ব্যবস্থায় বাঙালী ছাত্রছাত্রী মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দী বা উর্দ্দু শিখিতে বাধ্য হইবে—বাঙালীর ভাষা ও কৃষ্টির অনুশীলন উপেক্ষিত লুপ্ত হইবে। শিক্ষামন্ত্রী তখন বাঙালীর স্বার্থ-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধান মন্ত্রী পন্থও একই ভাবের আশ্বাস দিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে উভয়েই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করিয়া শিক্ষাবোর্ডের প্রদত্ত উর্দ্দ ও হিন্দীর সপক্ষেই সুপারিশের সমর্থন করিয়াছেন। অতঃপর এক লক্ষ বাঙালী অধিবাসীকে জোর করিয়া মাতৃভাষা অনাদর করাইবার ব্যবস্থা কায়েমী হইল।

বাঙালার বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী, উর্দ্দু, আসামী, উড়িয়া বহু ভাষায় পরীক্ষা দিবার সুব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। হক-মন্ত্রিমণ্ডলও এই ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। পক্ষান্তরে, যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টের ছত্রতলে বাঙালীর মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার রহিল না। কে অধিক সঙ্কীর্ণমনাঃ? বাঙালী, না অন্য প্রদেশবাসী?

আমরা আশা করি, যুক্ত প্রদেশের লক্ষাধিক বাঙালী অধিবাসী একযোগে এই ব্যবস্থার প্রতিকারে সচেষ্ট হইবেন। বাঙালী হিন্দী শিক্ষা করুক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মাতৃভাষার পরীক্ষার উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? পন্থ-গভর্ণমেণ্ট ইংরাজীভাষীদিগকে যে অধিকারটুকু দিয়াছেন, বঙ্গভাষীদিগকে অন্ততঃ সেটুকুও দিবেন না কেন?

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত আইন

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর স্যার জেম্‌স্ টেলার ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোন ব্যাঙ্ক ৫ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন ও ৫০,০০০ টাকার রিজার্ভ ফণ্ড দেখাইতে না পারিলে, কোন প্রেসিডেন্সী সহরে অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে কাজ করিতে পারিবে না। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলিকে আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড ৫০,০০০৲ টাকা দেখাইয়া কাজ সুরু করিতে হইবে। আমানতী টাকায় একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ, যথা—শতকরা ৩০৲ টাকা ব্যাঙ্কে নগদ বা কোম্পানীর কাগজ রাখার ব্যবস্থাও বাবস্থামূলক করা প্রস্তাবিত হইয়াছে। আমানতকারী ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় উভয়েরই স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের মতে, এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, আমানতকারীদের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সুরক্ষিত হইবে বটে; কিন্তু আমানতী টাকার শতকরা ৩০৲ টাকা মজুত রাখিয়া ও ৫ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালনা অধিকতর দুঃসাধ্য হইলে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জনসাধারণের সহযোগিতায় ও বেসরকারী উদ্যমে যে সকল ব্যাঙ্ক কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে উন্নতির পথে চলিয়াছে, তাহারা সহসা এই অত্যধিক মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড সঞ্চয় করিতে না পারিয়া তথা হইতে বিতাড়িত হইবে—বাঙালার অনেক বর্দ্ধনশীল প্রতিষ্ঠান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ করা—এই পথেও নূতন ব্যবস্থায় অনেকখানি অসুবিধা-সৃষ্টি হইবে। বাঙালায় কোটীপতি ধনী কম আছেন—যাঁহারা পার্শী, মাড়োয়ারী বা গুজরাটী মহাজনদের সহিত প্রতিযোগিতায় এই নূতন প্রস্তাবানুযায়ী ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে পুষ্ট করিয়া এই অবস্থায় দাঁড় করিয়া রাখিতে পারিবেন—জনসাধারণের সমবায়শক্তির উপরেই বাঙালীর অধিক নির্ভরতা—কাজেই এই ব্যবস্থায় বাঙালীর উদীয়মান ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিশেষভাবেই আঘাত পাইবে। আমরা ভারত ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যবৃন্দকে স্যার জেম্‌স্

টেলারের প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্ব্বে বাংলার দিক্ হইতে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

চাউল ও গম

বাঙালী ভাত খায়—"ভেতো বাঙালী" তার অপবাদ। কিন্তু মাদ্রাজীদের 'ভেতো মাদ্রাজী' কেহ বলে না। সর্ব্বোপরি, বীর জাপ জাতিরও প্রধান খাদ্য—ভাত, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং "ভেতো" বলিয়াই দৌর্ব্বল্য—কার্য্যকারণ-সূত্রে বলা যায় না। প্রশ্ন উঠে—চাউলের পুষ্টিগুণ গমের চেয়ে বেশী না কম? সম্প্রতি মাদ্রাজ ভিজিগাপটমের জেলা স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাঃ রঙ্গস্বামী এতদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

চাউল যোগ্য শ্রেণীর বাছাই করিয়া ও যোগ্যভাবে প্রস্তুত করিয়া খাওয়া হইলে, তাহা গমের চেয়ে উৎকৃষ্টতর খাদ্য হয়। গমের প্রাণ-বিজ্ঞানানুযায়ী গুণ যদি হয় ৬৭, চাউলের সেই ক্ষেত্রে ৮৬', চাউলে ফসফরাস প্রচুর। ভাতের ক্যালসিয়াম অংশও সব্জী ও দুগ্ধ যোগে সমধিক পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই চাউল হওয়া চাই কাঠের ঢেঁকি-ছাঁটা অর্থাৎ কলের ছাঁটা নয়।

ডাঃ রঙ্গ ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল যে আর্থিক ও স্বাস্থ্যকর উভয় দিক্ দিয়াই বরণীয়, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে ছাড়েন নাই। ঢেঁকি ছাঁটা হইলে, ২০ কাঁচ্চা ধান হইতে ১২ কাঁচ্চা চাউল পাওয়া যাইবে; ইহা খাইতে লাগিবে কম—কলে ছাঁটার চেয়ে প্রায় ⅓ অংশ পরিমাণে কম; সুতরাং খরচও তদনুপাতে অল্পতর হইবে। প্রত্যুত, সেই চাউলে প্রস্তুত ভাত সমধিক পুষ্টিদায়ী হইবে। ঢেঁকি-ছাঁটা মোটা চাউল কম পরিমাণে খাইতে লাগে বলিয়া তাহা হজম করাও সহজ হয়। ইহাতে লবণাংশ বেশী থাকে বলিয়াও অধিক হজমকর হয়, কারণ এই স্বাভাবিক লবণ পরিপাকের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় উপাদান। ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের মধ্যে চর্ব্বির ভাগও বেশী থাকায়, ইহা যক্ষ্মারোগের আয়ত্তীকরণে গমের চেয়ে অধিকতর সহায়ক হয়। তাহার আরোগ্যকর মূল্যও এক হিসাবে সমধিক। তাই চিকিৎসকগণ রুটির চেয়ে ভাত সহজপাচ্য, রুচিকর, সুতরাং উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া রোগিদের ব্যবস্থা দিতে পারেন।

তবে ডাঃ রঙ্গ সতর্ক করিয়াছেন- ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল গুদামজাত করার দোষে দূষণীয় হয়, তাহাতে স্নায়ু-রোগের উৎপাদন হওয়া সম্ভব। সেইরূপ হইলে, উহা কলে ছাঁটা চাউলের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হয়।

এই গবেষণা পরীক্ষাসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইলে, বাঙালীর নিজেকে "ভেতো" বলিয়া আর আত্মগ্লানি বহন করিতে হয় না—ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে, ভাত খাইয়াই বাঙালী সবল স্বাস্থ্য অর্জ্জন ও বীর জাতির উপযোগী শক্ত দেহ গঠন করিতে পারে। যক্ষ্মারোগের সহিত সংগ্রামে ভাত অধিক উপযোগী—মাদ্রাজী ডাক্তারের এই তথ্যেও আমরা বাঙালীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অতি-ভোজনে রাজদ্রোহ

জর্ম্মণীর জাতীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক নাজী বিশেষজ্ঞ কমিটীর অন্যতম সদস্য ডাঃ উইর্জ বলেন—"প্রত্যেক জর্ম্মণ যখন অপরিমিত ভোজন করে, তখনই সে উৎপাদন ও উপযোগের মধ্যে যে ক্রমবর্দ্ধিত ব্যবধান, তাহা বাড়াইতেই সহায়তা করে—সে সমগ্র জাতির যথাযোগ্য পরিপুষ্টির বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সুতরাং ক্রমাগত গুরু-ভোজনে শুধু নিজের স্বাস্থ্যক্ষয় নহে, উহা উৎকট রাজদ্রোহ অপরাধ বলিয়াই পরিগণ্য।"

আহারে বিহারে সংযম-নীতি জাগ্রত জাতি নিজে নিজেই উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন করে। তখন শয়নে জাগরণে বিধি ও আচার ব্যক্তি ও সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করে—এই সংযম ও শাসন জাতিকে সুগঠিত ও শক্তিমান্ করিবার জন্যই। নিয়ম সেখানে বন্ধন মনে করা উচিত নয়। যাঁহারা মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির বিধান কঠোর নিগড় বলিয়া ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারকেই চরম ভাবিয়া আত্মনাশ ও জাতিনাশেরই পথ সুগম করেন। আপনার ও জাতির কল্যাণেই জীবন-

বিধানের প্রয়োজন হয়—সংযম ও নিয়মের অনুশাসন তাই স্বতঃই বরণীয়। ইহা আমরা কবে বুঝিব?

সিংহল ও ভারত

ক্ষুদ্র সিংহলও ভারতকে খেদাইতে চায়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। এক দেশ অপর দেশের অন্নে ভাগ বসাইলে তাহা যথাসময়ে স্বার্থের সংঘাতে পরিণত হইবেই। সিংহলবাসী নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে যতই সচেতন হইতেছে, তথায় যে সব ভারতীয় শ্রমিক জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহাদের প্রতি বিমুখ হইতেছে, তাহাদের তাড়াইবার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রকার ২০,০০০ ভারতীয় কর্ম্মচারীকে ভারতে ফেরৎ পাঠাইবার আয়োজন হওয়ায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হয় এবং উপরন্তু ভারতের দূত-স্বরূপ পণ্ডিত জহরলালজীকে সিংহল গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করিতে পাঠান হয়। পণ্ডিতজী সিংহল হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ-গ্রহণের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায় যে, জহরলালজীর প্রচেষ্টায় সিংহল ও ভারতের মধ্যে মানসিক আব্‌হাওয়া কতকটা পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেও, আসল পরিস্থিতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারত-গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সিংহল-ভারতীয় আগামী বাণিজ্য-সন্ধি সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা স্থগিত করা হইলেও, তাহার ফলেও সিংহল গভর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প উল্লেখ-যোগ্য ভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই।

সিংহলের সহিত ভারতের কৃষ্টিগত ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বর্ত্তমানেও সিংহলের সহিত ভারতবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপেক্ষণীয় নহে। সিংহলের সমগ্র অধিবাসীর প্রতি ৫ জনের মধ্যে এখন ১ জন ভারতবাসী। ইহাদের মোট সংখ্যা ১০ লক্ষের কম নয়। সুতরাং সিংহলের জাফ্‌না তামিল, বার্গা ও ইউরোপীয় বাদে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিতে ১০ লক্ষ ভারতবাসীর দাবী রাষ্ট্রক্ষেত্রেও নগণ্য হইতে পারে না। সিংহলের যে আগামী শাসন-সংস্কার হইবে, তাহাতে বর্দ্ধিত রাষ্ট্রপরিষদে সমগ্র আসনের মধ্যে অন্ততঃ ১৪টী সদস্যের আসন তাহারা ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিষৎ এই ক্ষেত্রে তাহাদের ৮টী সদস্যের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ভারতীয় বিদ্বেষ-ভাবে প্রণোদিত হইয়া, ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর উপর শাস্তি-মূলক শুল্ক-স্থাপন, পাসপোর্ট পাওয়ার অসুবিধা, প্রথমে সরকারী চাকুরী ও ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটীগুলির চাকুরী হইতেও ভারতীয়গণকে বিতাড়ন, এমন কি বেসরকারী কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানেও সিংহলীদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কর্ম্মচারি-গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া সিংহলবাসী ভারতীয়দের সিংহলের সর্ব্ববিধ প্রজাধিকার হইতেও বঞ্চিত করার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতগভর্ণমেণ্ট এই ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দিগের স্বার্থ লক্ষ্যে রাখিয়া, ভারতবাসীর স্বার্থ-রক্ষায় শ্লথ ও উদাসীন। অথচ সিংহলের বর্ত্তমান প্রধান অর্থ-ভিত্তি চা ও রবারের ব্যবসায় দুইটীর সব চেয়ে বড় খরিদ্দার ভারতবাসীই। ভারতের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ-স্বরূপ দক্ষিণভারতীয় নারিকেল সরবরাহ বন্ধ করার কথা উঠিয়াছে। ইহাতে সিংহলের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সমস্যা দিন দিন জটিলতর হওয়ার আশঙ্কাই দেখা যাইতেছে।

ইহার মীমাংসার জন্য, সিংহল রাষ্ট্রপরিষদে সম্প্রতি জর্জ্জ দে সিল্‌ভা এক রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতগভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস উভয়েই এই ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন।

সুভাষচন্দ্রের উপর দণ্ড

ওয়ার্দ্ধায় ভারত রাষ্ট্রসভার ওয়ার্কিং কমিটী বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্রের উপর নিম্নোক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন :—

"১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসর তিনি কোন নির্ব্বাচিত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হইতে পারিবেন না।"

তাঁহার অপরাধ—বোম্বায়ের ভারত সভায় ওয়ার্কিং কমিটী প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলির রাষ্ট্রশক্তি ইহাতে খর্ব্ব

হইয়া গিয়াছে—সুভাষচন্দ্র এইরূপ ধরণের গণতন্ত্র-বিরোধী ওয়ার্কিং কমিটীর দুই একটী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন করিয়াছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে দক্ষিণপন্থীদের শক্তি এখন প্রবল, সুভাষচন্দ্র এই প্রবল মত উপেক্ষা করিয়া বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। কোন এক দলের প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধ প্রচার অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু গোড়া হইতেই তাঁহার এই প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য প্রতিপক্ষ সজাগ ছিলেন। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবের প্রতিবাদে ৯ই জুলাই সুভাষচন্দ্র দেশকে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবার আহ্বান দেওয়া মাত্র রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ কংগ্রেসের নিয়মানুবর্ত্তিতার ধুয়া ধরিয়া এই আহ্বানে কংগ্রেসকে যোগ দিতে নিষেধ করেন।

ইহার পর জব্বলপুর হইতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকেও এই মর্ম্মে তার করেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই।

অতঃপর সুভাষচন্দ্রকে জানান হয়, "কংগ্রেসকর্ম্মীরা যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব পালন না করে, কংগ্রেস অচল হইবে এবং ইহা খুবই আশঙ্কাজনক—অতএব ওয়ার্কিং কমিটী ৯ই জুলাইয়ের ব্যাপারে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে আপনার মতামত জ্ঞাপন করিবেন।"

সুভাষচন্দ্র ৭ই আগষ্ট বহরমপুর হইতে জানাইয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সকল বিষয় লইয়া সংগ্রাম, তাহার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা একটী। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিবে, তাহাতে যদি মত-ভেদ থাকে, তাহার অভিব্যক্তি দিবার স্বাধীনতা থাকিবে না, এমন অদ্ভুত কথা ভাবা যায় না। তা ছাড়া কংগ্রেসের এখন ৪৫ লক্ষ সভ্য-সংখ্যা, তাহাদের মধ্যে লঘিষ্ট যাহারা তাহাদের বিনা আন্দোলনে নিজ মত ব্যক্ত করা ছাড়া উপায় আর কি আছে? মোট কথা, সুভাষচন্দ্র আত্ম-মত যুক্তিযুক্তভাবে সমর্থন করিয়া রাষ্ট্রপতিকে পত্র প্রদান করেন।

তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই। সুভাষচন্দ্র নিজেও বলেন—নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার-পন্থীদের দিক্ হইতে এই দণ্ড ঠিকই হইয়াছে, নূতন কিছু নহে।

সুভাষচন্দ্র এই শাস্তি হাসি-মুখেই বরণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, বরং তিনি কংগ্রেসকে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়াছেন।

গান্ধীজীর মতে বর্ত্তমান দক্ষিণপন্থীরা নিয়মতন্ত্র ও জাতিসংস্কারের পথই আশ্রয় করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র চাহেন কংগ্রেসের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি রক্ষা করিতে—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নিয়মতন্ত্র ও সংস্কার-কর্ম্মের অবকাশ থাকায়, সুভাষচন্দ্রের মর্ম্মবাণী অন্যান্য প্রদেশবাসীর কর্ণে হয়তো তেমন গভীরভাবে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান দুরবস্থার যুগে সুভাষচন্দ্রের আকুতির মূল্য যে অনেকখানি, তাহা বাঙ্গালী বুঝিবে।

দুঃখের কথা, বাংলার শক্তি এক্ষণে শতধা বিচ্ছিন্ন। কৃষক ও শ্রমিক সম্বল করিয়া বাংলার বৈপ্লবিক মনোভাব-রক্ষার আয়োজন লক্ষ্যে পড়ে। বাংলার যুবশক্তি হয় অবসন্ন—নয় সংগঠনমুখী। হিন্দু সভা মঞ্চে ডাক্তার শ্যামা-প্রসাদ তরুণদের গঠনের পথেই চলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি কংগ্রেসকে একদিন অধিকার করিবে, এই দৃঢ় প্রত্যয়েই তিনি দলে দলে দেশ-বাসীকে তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করিতে বলিয়াছেন। বামপন্থীদের লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিয়া উহা অধিকার করিয়া লইতে আদেশ দিয়াছেন—তাঁহার বাণী অনুসরণ করার যোগ্য-চরিত্র মানুষের অভাব নাই।

তবে আমরা বলিতে পারি—বাংলার রাজনীতিক যে পরিস্থিতি তাহাতে সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা নাকচ করা এবং বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে বাংলার সহিত সংযুক্ত করার একটা প্রবল আন্দোলন আমাদের আজ আত্মরক্ষার পথ। তাহার পর লোকগণনার সময়ে বাংলার প্রাণশক্তিকে জাগ্রত থাকিতে হইবে। সুভাষচন্দ্র যদি বাংলার প্রাণশক্তিকে সংগঠিত করিয়া, তাহার ইপ্সিত কর্ম্মে অগ্রসর হন, বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে যুগবিগ্রহ বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। দীনা বঙ্গ-জননীর অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠ আমাদের মর্ম্মের মীড়ে মীড়ে এই করুণ মূর্চ্ছনাই তুলে—"আমায় বাঁচাও, আমি যদি বাঁচি, সারা ভারত বাঁচিবে, বিশ্বের কল্যাণ হইবে।"

সমালোচনা

হিন্দু স্ত্রীলোকগণের সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ক আইন—আইনঘটিত আলোচনা-পুস্তক। শ্রীবিনয়েন্দ্র প্রসাদ বাগচী, এম-এ, বি-এল, য়্যাড্‌ভোকেট প্রণীত এবং মিঃ এস, সি, রায় কর্ত্তৃক ১৫৭-বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত মানব-সমাজ শৃঙ্খলা-রক্ষার দায়ে আইন-রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। লোকাচার এবং দেশাচার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক ও ব্যবহারিক নীতির মধ্য হইতে মানব-চরিত্রের ঐক্যমুখী অনুশীলনশীলতা পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনার যে সদিচ্ছা—ধর্ম্মানুগত অভিজ্ঞ মহাপুরুষগণের আইনপ্রণয়নের মধ্যে তাহার বিকাশ লক্ষ্য করিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া যাই। যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে ইঁহারা আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আজিও মানব-সমাজে অটুট শৃঙ্খলা অব্যাহত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে শ্রীযুক্ত বাগচী পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকগণের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-আইনের সম্পূর্ণতা সর্ব্বাধিক প্রতীয়মান হয়।

হিন্দু-সমাজে বিধবা বধূ অথবা মাতার নির্য্যাতন ইদানীং প্রকট হইয়া উঠিতে দেখিয়া, সমাজের প্রতিভূ হিসাবে ডাঃ দেশমুখ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন—তাহা "১৯৩৭ সালের ১৮ নং য়্যাক্ট" হিসাবে পরিচিত। মূল আইনে কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায়, উহা আবার "১৯৩৮ সালের ১১ নং য়্যাক্ট" কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ হিন্দু বিধবাগণকে স্বাধিকারে ও সম্মানজনক সামাজিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যাপকভাবে হিন্দু নারীর পক্ষে অবস্থাবিশেষে সম্পত্তির অধিকারে সহায়তা করা। মূল আইন সংশোধনের ফলে হিন্দু নারী কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন, কোন্ কোন্ সম্পত্তি "স্ত্রীধন" বলিয়া গণ্য হইবে—আইনঘটিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাহায্যে গ্রন্থকার তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ—হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত এই দুই প্রচলিত মতের ভিত্তিতে রচিত আইনের আলোচনাপ্রসঙ্গে, বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুরূপ উল্লেখসমূহের সহিত হিন্দু নারীর অধিকার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিবার সহজ ব্যাখ্যায় লেখকের আয়াস সার্থক করিয়াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রভাব যে স্বতঃই সাধারণ্যে অনুভূত হইবে—ইহা অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি। ছাপা ও বাঁধাই আধুনিক রুচিসম্মত।

এপ্রিল ফুল—গল্পের বই। শ্রীতরুণ দাস প্রণীত এবং বাণী সাহিত্য চক্র, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম ।০ চার আনা।

সর্ব্বসমেত ছয়টি গল্প আছে। বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, অবস্থা-বিশেষে অবসর-বিনোদনের পক্ষে এইরূপ রচনার সার্থকতা অনুভূত হইতে পারে।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

100 Magics you can do—ইংরাজীতে লিখিত ম্যাজিকের বই। পি, সি, সরকার প্রণীত এবং সরস্বতী লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

যাদুবিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাইয়া শ্রীযুক্ত সরকার আজ শুধু ভারতে নয়—বহির্ভারতেও পরিচিত হইয়াছেন। বইখানিতে তিনি সাধারণের শিখিবার উপযোগী করিয়া ১০০টি ম্যাজিকের কৌশল বর্ণনা করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত বহু যাদুকরের অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ ম্যাজিক কিরূপ সামান্য কৌশলের উপর সাধিত হয়—তাহা বিবৃত হওয়ায় পুস্তকখানির উপযোগিতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুৎসিৎ থিয়েটার, বায়স্কোপ উপভোগ করা অপেক্ষা এইরূপ নির্ম্মল আমোদপ্রমোদের প্রচলন সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয়। বইখানির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। মূল্য আরও একটু কম হইলে ভাল হইত।

শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের রাজ্যশাসন-প্রণালী—লেখক শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ। ১ম সংস্করণ, ১৩৪৪ সন। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৪।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ঢাকার বিশিষ্ট পুস্তকালয়-সমূহ। মূল্য দশ আনা মাত্র।

পুস্তিকাখানি মোট তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদেরই বর্ণনাভঙ্গী ও লিপিকুশলতা প্রশংসনীয়। যে সমস্ত বিষয় পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে লেখককে যথেষ্ট শ্রম ও বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। 'রাজা', 'বিচার বিভাগ', 'সামরিক বিভাগ' ও বিশেষতঃ 'রাজস্ববিভাগ' শীর্ষক অধ্যায়গুলি সুলিখিত। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় জাগরণের দিনে এই পুস্তকখানি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবিনয় সরকার

শিবম্—(মাসিক পত্র) শ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ভবানীপুর মহেশ চৌধুরী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শিবম্ ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় একখানি উত্তম মাসিক পত্রিকা। হরিদ্বারের সিদ্ধ সন্ন্যাসী স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের বঙ্গদেশীয় ভক্ত, শিষ্য এবং অনুরাগীদের জন্য এই উপাদেয় মাসিক পত্র প্রথমে ভক্ত সাধক ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় বৈঠকখানা হইতে প্রকাশিত হয়। এই আদর্শ-বিপ্লবের যুগে হিন্দুর সাধন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাতিকে, সমাজকে সচেতন রাখিবার জন্য সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের পরিচালনাধীনে ও নির্দ্দেশে শিবম্ বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

স্বামী অমৃতানন্দ

বেসুরা—শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। চিতুরা, পোঃ লাভপুর, বীরভূম। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

কবিতার বই। ভারতীয় ভাব ও শীলতাসম্মত বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া শুচিস্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক কবি-মনের অমর এই সৃষ্টি স্বতোৎসারিত কাব্যরস, অনুপম ভাব, সুললিত ভাষা ও বলিষ্ঠ বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ প্রকাশের মধ্যে ফলভারাবনত। সদ্য পূজা-সমাপ্ত দেবালয়ের পুষ্প-চন্দনের পবিত্র সৌরভে 'বেসুরা'র আগাগোড়া ভরপুর। কবির অধ্যাত্মপ্রবণ ভাবলোকসম্প্রাপ্ত বিকাশোন্মুখী তুরীয় সূক্ষ্ম সংবেগ বাঁধাধরা ছন্দোসুরের আবেষ্টনী উপচিয়া অবাধ রূপমণ্ডিত হইয়া উঠায় 'বেসুরা' নাম অর্থব্যঞ্জকই হইয়াছে। বাংলার কাব্যক্ষেত্রে 'বেসুরা' সার্থক সৃষ্টি।

সাঁঝের-প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত, উখরা (বর্দ্ধমান) হইতে শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের নাম মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। সাহিত্য তাঁহার পেশা নহে; কবি-মনের সহজ সংবেগে লিখিত বলিয়াই কবিতাগুলি অকপট আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল ও মাধুর্য্যময়। বিভিন্ন বয়সে বিচিত্র ছন্দে লিখিত নানা বিষয়ক ১৫১টি কবিতা তিন শতাধিক পৃষ্ঠা সমন্বিত, 'সাঁঝের প্রদীপে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রচনার সময়-ক্রমানুযায়ী না সাজাইয়া গ্রন্থকার কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত আবেদনানুযায়ী 'ধূপ', 'দীপ' এবং 'আরত্রিক' নামে প্রকৃতি, প্রেম এবং ভক্তি পর্য্যায়ে শ্রেণী বিভাগ করিয়া ভাব ও রস পরিপুষ্টির সহায়তাই করিয়াছেন।

কবি-হিয়ার দরদ-মাখানো কবিতাগুলিতে সমাজ জীবনের খাঁটি অভিজ্ঞতা ও পল্লী-পরিবেশের অবিকল ছবি পরিস্ফুট। সাঁঝের প্রদীপ কবিতায় কবি যখন লিখিতেছেন—

> কল্যাণী অয়ি চলগো তুলসী-তলে
> অঞ্চলখানি বেড়িয়া আপন গলে।
> * * * * *
> কোলের বাছার আপদ বালাই যত
> সাঁঝের প্রদীপে নিমেষে হইবে হত।

তখন সত্যই স্নিগ্ধ সাঁঝের পল্লীগৃহাঙ্গণ কোণের তুলসীতলে প্রণতিরতা মঙ্গলদীপ-শঙ্খধৃতা, গললগ্নাঞ্চলা গৃহস্থ বধূর মধুর স্মৃতিই মনে করাইয়া দেয়। কবির হৃদয়রসসিঞ্চিত এমন বহু কবিতারই অতি পরিচিত পরিবেশ ও বিচিত্র বেদনাময় জীবনের মাধুর্য্যস্পর্শ চিত্ত ব্যাকুল করিয়া তুলে। সাঁঝের ঘৃত প্রদীপের মতই আলোচ্য কবিতাগুলি স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল। গ্রন্থের কলেবর হিসাবে দাম সস্তাই বলা চলে।

সাথী—

মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সাহিত্যশাস্ত্রী। ৭১, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ৵০, বার্ষিক সডাক ১৸০। বয়স সবে মাত্র পাঁচ মাস। ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যুক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদনে ও রচনা-নির্ব্বাচনে আভিজাত্য আছে বলিয়াই অদ্যকার ভাব-বিপ্লবের দিনে চলার পথে সাথীর বহু বেগ পাইতে হইবে। বর্ত্তমান বাধা-বিঘ্নকে বিদীর্ণ করিয়া সাথী সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক, এই কামনাই করি।

এলডোর‍্যাডোর বন্দী—হিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত। প্রকাশক : শচীন মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্ল লাইব্রেরী, ৭১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲ মাত্র।

এলডোর‍্যাডো বা স্বর্ণদ্বীপের কথা বিশেষ সুবিদিত নয়। হিমাংশু বাবু এই পুস্তকে অজ্ঞাত দ্বীপের সেই স্বর্ণ আহরণের রোমাঞ্চকর কাহিনী সরল ভাষায় ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া শুধু অনুবাদ-মূলক শিশু-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন নাই—উদীয়মান তরুণের প্রাণে প্রেরণা জাগাইবার সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ রোমাঞ্চকর 'এ্যাড্ভেঞ্চার' কাহিনী বাংলা ভাষায় যত অধিক লিখিত হয় ততই ভাল। বহুবর্ণের কৌতূহলোদ্দীপক প্রচ্ছদপটখানি বিশেষ আকর্ষণীয়।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

সাময়িকী

ভারতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের বার্ষিক (১৩৩৯) পুরস্কার বিতরণী-সভায় সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় মহোদয় ভারতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন—

"ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে" ঋষি-কণ্ঠের এই ঋক্-মন্ত্রের মর্ম্ম বাঙালীকে শিক্ষার মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিতে হইবে। ভারতের বেদ, উপনিষৎ, গীতা ও দর্শনের মধ্যে যে অমৃত সঞ্চিত আছে—ভারতকে আবার উহা আবিষ্কার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য আমাদের—পরদেশীয় শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক এমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ভারতের ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের মধ্যে যে জ্ঞান সঞ্চিত আছে, তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শন পড়িবার আগে যদি আমরা কপিল, কণাদ ও গৌতমের দর্শনশাস্ত্র অধিগত করিয়া লই, তবে উহার কাছে পাশ্চাত্য দর্শন যে কত অকিঞ্চিৎকর—তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিব। শিক্ষার মধ্য দিয়া যতদিন ভারতীয় প্রাণ, ভারতীয় হৃদয় ও ভারতীয় শরীর গড়িয়া না উঠে—ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভারতকে কখনও শ্রেয়ঃ দিবে না।"

শ্রীযুক্ত রায়ের এই সঙ্কেত সুকুমারমতি ছাত্রদের শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহাদের বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, রায়না আশ্রম
পারিতোষিক বিতরণী সভা

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাংলায় নূতন ছন্দে জাতি গঠনের সূচনা করিয়াছে, এই উদ্দেশ্যে মূল কেন্দ্রকে ঘিরিয়া দিকে দিকে যে সকল নব নব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, রায়না থানার অন্তর্গত প্রবর্ত্তক আশ্রম তন্মধ্যে অন্যতম। এই আশ্রমে ১৩৪২ সালের বন্যার পরেই একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের অন্যতম সাধক-কর্ম্মী শ্রীদোলগোবিন্দ গাঙ্গুলীর আপ্রাণ উৎসর্গে ও যত্নে এবং স্থানীয় পল্লী-বাসীর সহানুভূতি লাভে পাঠশালাটী এক্ষণে একটী সুপরিচালিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। গত ৩রা আষাঢ় রবিবার, এই বিদ্যালয়টীর পারিতোষিক বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। জোতশ্রীরামের স্বনামধন্য ডাঃ শ্রীআশুতোষ সিংহ এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে চন্দননগর হইতে স্বামী অমৃতানন্দ, সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সুপ্রশস্ত সভাগৃহটী স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও পল্লীর বহু ভদ্রমহিলায় সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। রবিবার সকাল ৮॥টায় বিদ্যালয়গৃহে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমান্ অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটী সুললিত উদ্বোধন সঙ্গীতের পর, স্বামী অমৃতানন্দ একটী ক্ষুদ্র ভাষণে সভাপতি বরণ করেন ও তৎপরে সঙ্ঘগুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায়ের প্রেরিত একটী আশীর্ব্বাদ বাণী পাঠ করেন। তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল:—আমার কথা এই মরা জাতিকে বাঁচানো। বাঁচাবার জন্য উত্তেজনা আন্দোলন কার্য্যকরী ব'লে আমার বিশ্বাস নাই—বাঁচতে হ'লে চাই ভারতের চরিত্র, চাই ত্যাগ ও তপস্যা, চাই সত্যনিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি চাই ঈশ্বর নির্ভরতা ও আত্মার উপর অকম্পিত বিশ্বাস—এই শিক্ষা আজ উপেক্ষিত। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতির শিশু জীবনে এই মহান বীর্য্য বপন যাহাতে হয় তাহার সুব্যবস্থা কর। এইখানে 'তোমাদের আত্মদান সাফল্য মণ্ডিত হবে।...... ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ তোমাদের শিরে বর্ষণ করুন—ঈশ্বর প্রসাদ মাত্র আশ্রয় করে বাংলায় একটা নূতন জাতি গ'ড়ে উঠুক।" ইহার পরে, জনৈক

প্রবর্ত্তক আশ্রম : রায়না, বর্দ্ধমান

ছাত্র একটী প্রশস্তি পাঠ করিলে, রায়না আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীদোলগোবিন্দ গাঙ্গুলী বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহা হইতে বুঝা যায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বর্ত্তমানে ৭২ হইয়াছে। তন্মধ্যে অল্প বয়স্কা ছাত্রীর সংখ্যা ১৫ জন। বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতিশীল অবস্থা বিবেচনায় সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতির অনুরোধে সঙ্ঘ সম্পাদক অরুণবাবু প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ভাব ও সাধনার কথা ওজস্বিনী

ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁহার বাণীর মধ্যে পল্লীর মহিলা, তরুণ ছাত্র সম্প্রদায় এবং দেশবাসী সকলেই আজ কোন্ ভাবে শ্রীভগবানকে অন্তরে জাগাইয়া জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহার সঙ্কেত পাইয়া আশা ও উৎসাহ বোধ করেন। পরিশেষে, সভাপতি মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় সঙ্ঘের গঠন কর্ম্মে বর্দ্ধমানের এই পল্লীক্ষেত্রে যে গভীর প্রাণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, এই কর্ম্ম সকলেরই সহানুভূতির যোগ্য এবং নিজে পায়ের জুতা হইয়াও এইরূপ শুভোদ্যমে যদি সহায়তা করিতে পারেন, এই ভাব প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন। সভাপতি আশা করেন, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ একটী নলকূপ নির্ম্মাণ করাইয়া বিদ্যালয়ের জলাভাব দূর করিবেন ও অন্য প্রকারেও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। অতঃপর, স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে, একটী সমাপ্তি-গীতান্তে যথারীতি সভা ভঙ্গ হয়। এই উৎসব উপলক্ষে, আশ্রমে প্রায় তিনশত পল্লীবাসীর ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাত্রে স্থানীয় ছাত্র ও তরুণেরা "মহাপূজা" নাট্যাভিনয় করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল।

প্রতাপচন্দ্র শেঠ প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী

বিগত ১২ই শ্রাবণ সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়ের পৌরহিত্যে উল্টাডাঙ্গা লিলি বিস্কুট কোম্পানীর কারখানা সংলগ্ন নবনির্ম্মিত 'প্রতাপ ভবনে' স্বনামধন্য কর্ম্মবীর ৺প্রতাপচন্দ্র শেঠের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উক্ত কোম্পানীর কর্ম্মিগণের উদ্যোগে সশ্রদ্ধ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কবিবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক রচিত সময়োপযোগী একটি সঙ্গীত গীত হইবার পর প্রতাপচন্দ্রের অনুজ ও আজীবনের সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠ মহাশয় সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সভাপতি বরণ করেন। অতঃপর 'প্রতাপ ভবনে'র দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং কর্ম্মিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর আহ্বানে সভাপতি মহাশয় প্রতাপচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

৺প্রতাপচন্দ্র শেঠ

এই উপলক্ষে কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। অভ্যাগতদের সাদর অভ্যর্থনা ও প্রচুর জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। গণ্যমান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

বাঙালীর শিল্প-সাধনায় আজ লিলি বিস্কুট কোম্পানী বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্যতম

রায়না প্রবর্ত্তক আশ্রম বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণোৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণ

প্রতিষ্ঠাতা ও অক্লান্ত কর্ম্মী হিসাবে প্রতাপচন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকী আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বাবলম্বী উদীয়মান বাঙালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে তরুণ রাম ফুকন

আসামের অবিসংবাদিত জননায়ক তরুণ রাম ফুকনের পরলোকগমনে শুধু আসাম নয়, সমগ্র ভারত একজন একনিষ্ঠ ত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক রাষ্ট্রসাধককে হারাইল। বিগত অসহযোগ আন্দোলন তিনি অকুতোভয়ে পরিচালনা করিয়া আসামের গণজাগরণ সম্ভব করিয়া তুলেন। গৌহাটী কংগ্রেসের সময় অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার ত্যাগ ও সাধনা চিরোজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

সাহিত্যিকের বিবাহ

জনপ্রিয় কবি ও সাহিত্যিক জসীম উদ্দীন সাহেবের সহিত ফরিদপুর-নলগোড়া নিবাসী মৌলবী মোহছেন উদ্দীন খাঁ সাহেবের প্রথমা কন্যা মমতাজ বেগমের শুভ পরিণয় সম্প্রতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুহৃদ্বর জসীম উদ্দীন সাহেবের দাম্পত্য জীবন শুভ ও নিরাময় হউক, কামনা করি।

বিশ্বভারতী ও লোক-শিক্ষা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নদ্রষ্টাই নন, স্রষ্টাও বটে। সে পরিচয় তাঁর বিশ্বভারতীর বিপুল নির্ম্মাণ-যজ্ঞে পাওয়া যায়। লোক-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া একদা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, বৈদেশিক অনুকরণে শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি দেশের বুকে পরগাছার মতই হইয়া পড়িয়াছে, জনসাধারণের সঙ্গে রস-সংযোগের সূত্রাভাবে। প্রাণে বিপুল বেদনা লইয়াই কবি লোক-শিক্ষা-সংসদ স্থাপন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর কর্ম্ম-সচিব সম্প্রতি সংবাদপত্রের মারফতে ইহার পাঠ্য বিষয়ের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির অভিমত প্রার্থনা

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এইরূপ মহতী প্রচেষ্টায় দরদী দেশবাসীর সহযোগিতার অভাব হইবে না। পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা:—সম্পাদক, লোক-শিক্ষা সংসদ, পোঃ সুরুল, বীরভূম।

পরলোকে স্যার আব্দুল করিম গজনভী

ময়মনসিং জিলার দিলদুয়ারের স্বনামধন্য জমিদার আলহজ্জ নবাব বাহাদুর স্যার আব্দুল করিম গজনভী বিগত ২৪শে জুলাই পরলোকগমন করিয়াছেন।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের টাংরাস্থ কাঠের কারখানা পরিদর্শনে ময়মনসিংহের [illegible]

১৮৭২ সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং আকৈশোর ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৯—১৯২২ পর্য্যন্ত তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১৩—১৯১৬ পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের কাউন্সিলে সমগ্র বাঙালাদেশের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯২৩ সনে তিনি বাঙালার আইন সভায় নির্ব্বাচিত হন ও বাঙালা প্রদেশের মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হন। ১৯২৪ সনে দ্বিতীয় বার ও ১৯২৭ সনে তৃতীয় বার তিনি মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন। ১৯৩০ সনে তিনি বাঙালদেশের এক্সেকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯২৮ সনে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি অমায়িক, উদার ও দানশীল জমিদার ছিলেন। তাঁর স্বজন-পরিজনের এই নিদারুণ শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বন্যা, রেল লাইন ও স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "নদীশাসন ও পলিপড়া নিয়ন্ত্রণ" সম্পর্কীয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য্য রায় বলেন,

"১৮৬০ সালে রেল লাইন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র বহু বাঁধ ও রাস্তা তৈরী হয়। কিন্তু ঐ সব বাঁধ ও রাস্তা দেশের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রনালীগুলির পক্ষে বিঘ্নকর হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া করা হয় নাই। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রকৃতির 'কাজে এইরূপ হস্তক্ষেপের ফলে পরিণাম ভীষণ হয়। ১৮৫৯ সালে রেল লাইন খোলার পর ও বন্যা হইতে রেল লাইন রক্ষার জন্য দামোদর নদের বাঁধ আরও শক্ত করার পর, বর্দ্ধমান বিভাগের লোকদের মধ্যে প্রবল ম্যালেরিয়া দেখা দেয়; দশ বৎসরে ম্যালেরিয়ায় এই অঞ্চলে ৩০।৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। উত্তর ও মধ্যবঙ্গে রেল লাইনসমূহ নদীগুলির স্বাভাবিক গতির পথে অত্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের হাতে গড়া কাজ ও নদী শাসনের অভাব—এই দুই কারণে বাঙলার কতকাংশে নদ-নদী একেবারে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। নদ-নদী হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় ঐ সব অঞ্চলের শস্যসম্পদ ও স্বাস্থ্য লোপ পাইয়াছে। বন্যার সময়ে লোকের ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু বন্যা চলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সমস্যাটি ভুলিয়া যায়।"

প্রতি বৎসরই বন্যার দারুণ প্রকোপে বাংলার দৈন্য-দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন সময়ে আচার্য্য রায়ের এই সুচিন্তিত সারগর্ভ বক্তৃতাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

স্বর্গীয় স্যার সর্ব্বাধিকারীর স্মৃতি-বার্ষিকী

স্বর্গীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর চতুর্থ স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে বিগত ২৬শে শ্রাবণ শুক্রবার সায়াহ্নে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে মাননীয় বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর পৌরহিত্যে যে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারীর তৈলচিত্র ও আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন এবং দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে লেডী সর্ব্বাধিকারী ইন্‌ষ্টিটিউটের দরিদ্র ছাত্র ভাণ্ডারে চার হাজার টাকা দান করেন। স্বর্গীয় স্যার সর্ব্বাধিকারীর এই যোগ্য সম্মানে আমরা আনন্দিত।

"রামদাস ও শিবাজী"

'রামদাস ও শিবাজী' সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সিরাজ-চরিত্রের মতই শিবাজী-চরিত্র লেখকের ঔদাসীন্যে অথবা স্বার্থাভিসন্ধিতায় অতিরঞ্জিত ও মসীময় হইয়াছে। মহারাষ্ট্রকেশরী একনিষ্ঠ রাষ্ট্র-সাধক শিবাজী নির্ম্মম লুণ্ঠন-পরায়ণ ছিলেন, এই শিক্ষাই ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রেরা এতদিন পাইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অধরচন্দ্র মুখার্জ্জি লেকচারার (১৯৩৮) নিযুক্ত হইয়া সম্প্রতি 'রামদাস ও শিবাজী' সম্বন্ধে এক গভীর গবেষণা-মূলক প্রবন্ধে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এই ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবে। শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয় মহারাষ্ট্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য ও দলিল-পত্রাদি হইতে ইহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। আজিকার জাতীয়-জাগরণ-যুগে চারুবাবুর এই মহতী অবদান আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে জাতিকে বিশেষ সহায়তা করিবে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও ধন্যবাদার্হ। আমরা আশা করি, শীঘ্রই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

— শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষড়ৈশ্বর্য্যময় বুদ্ধ

(প্রাচীন চৈনিক চিত্র)

জন্মাষ্টমী
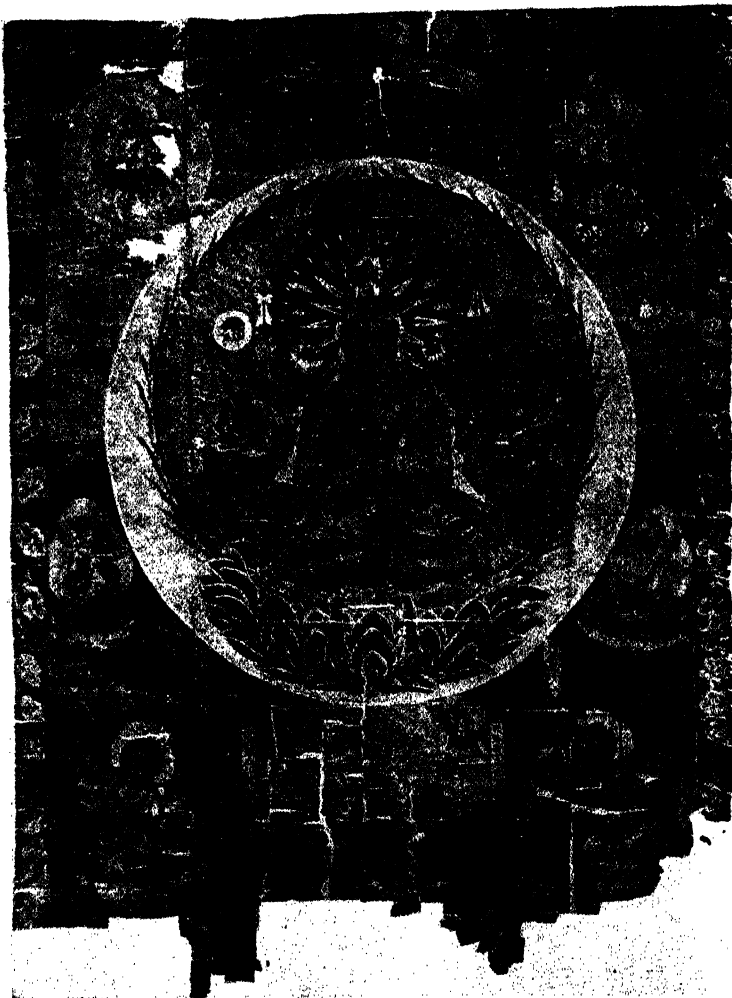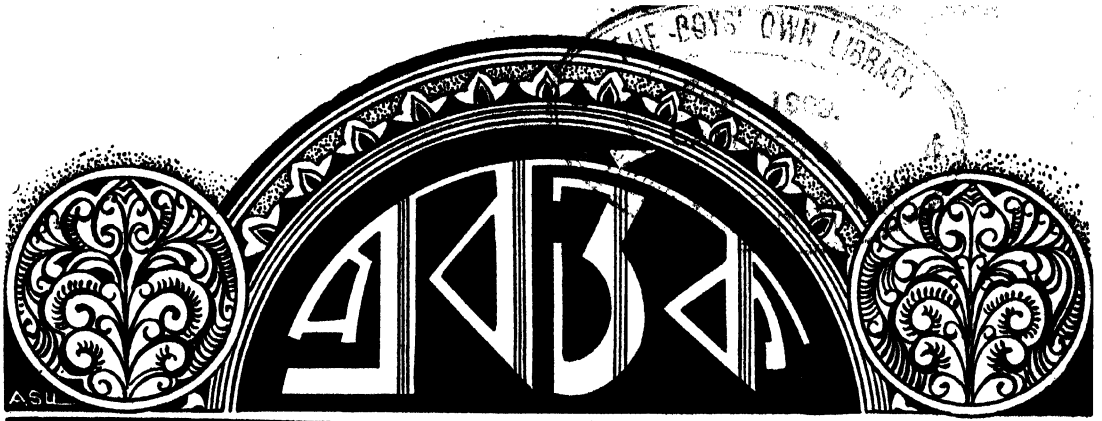
আজ এই যে কোটী কোটী হিন্দুর কণ্ঠে উৎসবের জয়ধ্বনি তোমার অবতরণ-যুগের মহোৎসব সূচনা করে, হে অধর্ম্মনাশন দেবতা, আজ আমাদের মধ্যে তোমার নবজন্ম সার্থক কর। আমাদের শিরা উপশিরা, আমাদের রক্ত, মাংস, স্নায়ু, পেশী, সব আজ এই আনন্দোৎসবে পুলকিত হয়ে উঠুক। তোমার আবির্ভাবে, নবচেতনায় আমাদের সবখানি ভরিয়ে দাও। আমাদের এই দেহ-রাজ্যে যত পাপ, যত বাধা, যত অকল্যাণকারী বিরুদ্ধ শক্তি আছে, তাদের হত্যা কর। তোমার রাজ্যে পাপ যে থাকতে নেই, মিথ্যা যে থাকতে নেই। তুমি অধর্ম্মকে বিনাশ করে', ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হেতুই যে যুগে যুগে—শুধু যুগে যুগে কেন, প্রতিদিন জন্ম গ্রহণ কর। আজ এই মহাদিনে আমাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ হউক। এই পুণ্যদিনে আমরা যেন তোমার আবির্ভাব-তত্ত্বের অনুভূতি-স্পর্শে নূতন হয়ে উঠি।

ওগো চিরসুন্দর, চির প্রেম ও আনন্দের নির্ঝর, তেজঃ-বীর্য্য-শক্তির অনন্ত মহাসিন্ধু, তোমারই ইচ্ছার মহাপ্লাবনে আমাদের অভিষিক্ত করে' দাও—সে অজস্র অফুরন্ত ধারায় স্নাত হয়ে আমরা আজ সুনির্ম্মল, সুন্দর হই। পৃথিবীর মলিনতা ধুয়ে মুছে যাক। ক্লান্তি, অবসন্নতা দূর হোক। হে অমৃতময় অন্তর্য্যামী ঠাকুর, তুমি আজ আমাদের পাগল করে' দাও, তোমার করুণায় ও প্রেমে আমরা সতত বিভোর, উন্মাদ হয়ে থাকি।

সে জীবন অর্থহীন, যে আপনার স্বার্থে আত্মহারা। সে জীবন ম্লান, অপদার্থ, যে ঈশ্বরের প্রেম-বঞ্চিত, ঈশ্বরের কামনাবীর্য্য থেকে বিযুক্ত। আমাদের হৃদয়ে যদি প্রেমের বান ডাকে, আমাদের দৃষ্টি যদি সুন্দর কিছু দেখে, আমাদের শ্রুতি যদি মধুর কিছু শ্রবণ করে, ঘ্রাণে জাগে নব সৌরভ, রসনা করে অমৃতাস্বাদ, সে যে তোমারই হৃদয়ে, নয়নে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, আস্বাদে তোমারই উন্মাদ লীলার সৌন্দর্য্য, রসময় মাধুর্য্য। আজ তোমারই পরিপূর্ণভাবে আমাদের যুক্ত করে' লও—শরতের নবীন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে তমোনাশের মত আমাদের মধ্যে তোমারই অমর প্রকাশ সার্থক হউক।

ভারতের বৈশিষ্ট্য বেদে

এই দেড়শত বৎসরের শিক্ষাগুণে—শিক্ষিত একশ্রেণীর হিন্দু নিঃসংশয়ে বেদশাস্ত্রের প্রতি কটু কটাক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদ চাষার গান বলিয়া হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি হিন্দু জাতির অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দু আর হিন্দু নহে—হিন্দু বলিয়া আজ যে আমাদের মধ্যে কলরব—তাহা শুধু শাসনপরিষদে হিন্দুর সদস্যপদ প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফল। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে ইংরাজই যেন আমাদের আজ বাধ্য করিয়াছে। একদিন যাঁহারা হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, হিন্দু বলিলে প্রতিবাদ-চ্ছলে মুখ ফিরাইতেন, তাঁহাদের অনেকে শেষে হিন্দু-সংগঠনে উদ্বুদ্ধ, অবশ্য হিন্দু জাতির পক্ষে ইহা মন্দের ভাল। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে আমাদের অন্তরে দেশপ্রীতির প্লাবন বহিয়াছিল; আর আজ ম্যাক্‌ডোনাল্ডীয় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে হিন্দুজাতি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা তুলিতেছে। এই জাগরণ উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার হিন্দুজাতি যদি সংহতিবদ্ধ হয়—তাহা আশার কথা। কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি জনগণ যদি নিজেদের স্বার্থ লক্ষ্যে রাখিয়াই হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা এই জাগৃতির মূলে হিন্দুত্বের মেরুদণ্ডে শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ জাগরণ হিন্দুত্বের না হইয়া—স্বার্থের হইবে। ইহা কোন এক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র-জাগরণের প্রচেষ্টা রূপেই দেখা দিবে। ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়া-নৈপুণ্যে আজিকার এই দৃশ্য কালে আবার ভিন্ন দৃশ্য প্রকাশ করিবে

হিন্দু শব্দটা বঙ্গভাষা নহে—পারস্য ভাষায় বিজেতা পারস্যরাজ হীনতাব্যঞ্জক অর্থে আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। ইংরাজও আমাদের বাবুর জাতি করিতে পারিতেন—কিন্তু ইংরাজের এইদিকে ততটা আগ্রহ ছিল না—আমরা এই ক্ষেত্রে রক্ষা পাইয়াছি। হিন্দু নামটাই কিন্তু আমরা মানিয়া লইয়াছি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ লোকটিকে কেহ যদি কালাচাঁদ নামে অভিহিত করে—তাহার স্বভাবজ রংটা তাহাতে মুছিয়া যায় না। ভারতের এই আর্য্যজাতি হিন্দু নামে আখ্যাত হইয়াছে বলিয়া আমরা যে আর্য্য-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইব, এমন কোন কথা নাই। এইজন্য নাম লইয়া দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নাই। তবে জাতির মধ্যে যদি তেমন আত্ম-সংবিৎ জাগ্রত হয়, বিদেশীর দেওয়া নামটা বর্জ্জন করিয়া আমরা নিজেদের আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারি—তাহা খুব ভাল কথা। তাহাতে জাতির জাগ্রত জীবনের পরিচয় দেওয়া হইবে।

নাম লইয়া আজ কথা নহে; উহাতে কিছু আসিয়া যাইতেছে না। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত আমাদের বাহ্যতঃ গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও আমরা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইব বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমরা নিশ্চিহ্ন হইব, যদি আমরা আমাদের মৌলিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে সরিয়া দাঁড়াই। এই ক্ষেত্রে হিন্দুকে মাথা তুলিতে দেখি না। বেদ চাষার গান বলিয়া আমরা যদি ক্রমে বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করি, তবে কি লইয়া হিন্দুজাতি জগতে টিকিয়া থাকিবে? ইতর প্রাণীর মত মানুষ আহার-বিহার, শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া টিকে না। মানুষ বাঁচে লোকাতীত স্বপ্ন আশ্রয় করিয়া। দৃষ্টি তার শুধু ঐহিকের দিকেই নহে—পারত্রিকের রহস্য-রশ্মি তাহার চক্ষের দীপ্তি, অনাগতকে পাওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প ললাটে তার ত্রিবলী-চিহ্ন সৃজন করিয়াছে। বাঁচার জন্য মানুষের সব শক্তি উজাড় করিতে হয় না; বাঁচিয়া কি করিবে—সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার জীবন। হিন্দু এই লক্ষ্যে

চলিতে গিয়াই চাহিয়াছে বাণিজ্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি। অনির্ব্বচনীয় অদৃশ্য পরমাত্মিক তত্ত্ব জানিবার জন্যই তো তাহার জন্ম, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য সব। বিশ্বে ভাগাভাগি করিয়া বিচিত্র জাতির সৃষ্টি শুধু খাওয়া পরার দায়ে নহে—খাওয়া পরার দায় বাহ্যতঃ বড় বলিয়া মনে হইলেও, প্রত্যেক জাতির পশ্চাতে একটা করিয়া কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য আছে। স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার এই মৌলিক প্রয়োজন অস্বীকারের বস্তু নহে। কোন মনীষীই এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না।

আমারও এইরূপ একটা বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া আছি। যে কোন কারণেই হউক, বিদেশীরা নানা ছলে আমাদের এই বৈশিষ্ট্যের মূল শিথিল করিতে চাহেন—সম্মোহিত আমরা, তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহাতে আমাদের ত্রুটি নাই। কিন্তু তবুও ভারতে এক শ্রেণীর হিন্দু আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কোনমতে নষ্ট করিতে চাহেন না।

এই বৈশিষ্ট্য মূলতঃ বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বেদের প্রভাব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই এমন ভাবে অনুস্যূত, যাহা হাজার বৎসরের পরাধীন ভারত বিস্মৃত হইয়া আত্মস্বাতন্ত্র্য হারাইতে পারে নাই। দীর্ঘদিন পরাধীনতার কারণও একদিক্ দিয়া তার এই আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জিদ্ বলা যাইতে পারে। এই জিদ্ না থাকিলে কোন না কোন রাজশক্তির সহিত সে মিশিয়া যাইতে পারিত। ইহা না হওয়ায় পর-শাসন তাহার দুঃখের হইয়াছে। ভারতের পরাধীনতার ব্যথা ক্রমেই যে ঘনীভূত হয়, তাহার কারণ এই জাতির বৈশিষ্ট্য-রক্ষার দায় ভিন্ন আর কি বলিব! এ দায়টা তলে তলে আছে বলিয়াই বাহিরে বিক্ষোভ—এই বিক্ষোভ দূর করার উপায় তার বৈশিষ্ট্য-বোধ মুছিয়া দেওয়া—হিন্দু ক্রমে এই পথই আশ্রয় করিতেছে অক্ষমতায়। কিন্তু বেদধর্ম্ম বিনষ্ট হওয়ার নয়, ইহা জীবনের কোন এক উপেক্ষিত অংশ আশ্রয় করিয়া নাই—কেবল পূজা ও আরাধনায় ইহা মূর্ত্ত নহে। যজ্ঞ, হোম প্রভৃতিও বেদের সবখানি নয়; একটা জাতির জন্ম হইতে মরণ, আবার নবজন্ম—সবখানির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, স্বভাব, আয়ুঃ সবই বেদ-প্রবর্ত্তিত। এমন কি দেশ, জাতি, ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, সমাজ, কৃষ্টি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সবই বেদ হইতে গ্রহণ করিয়া একটা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর এই জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদ ভুলিলে তাহার কিছু থাকে না—যদি কিছু থাকে, তাহা প্রেতমূর্ত্তি, ভারতের জীবন্ত বিগ্রহ নহে।

পরাধীনতার ব্যথা এই দিক্ দিয়া যদি আসে, তাহা হইলেই ইহা হিন্দু জাতির সত্য জাগরণ বলিয়া স্বীকার করা যায়। এইখানেই জাতি ম্রিয়মাণ; আর এইখানেই সে আজিও সাড়া তুলে না! তাই হিন্দুকে আমরা এখনও মাথা তুলিতে দেখিতেছি না। হিন্দু কি মরিয়াছে? তার প্রেতমূর্ত্তিই কি জাগরণের গান গাহে? অনেকে মনে করেন, পরমাত্ম-তত্ত্বই হিন্দুর সবখানি, এখানে ঘাত-প্রতিঘাতের কিছু নাই। আমরা বলি—সে কি কথা! হিন্দু কি মাটি, পাথর!—তার কি জীবন নাই? ব্রহ্মসূত্র আবৃত্তি করিয়াই কি মহাসমাধিমগ্ন হইবার জন্য সে জন্মিয়াছে? মনে রাখিতে হইবে, তাহারও জীবন আছে—সে জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাসও আছে। এই ইতিহাস কেবল মাত্র ধর্ম্মের কঙ্কাল লইয়া নহে, সমগ্র জীবন-ধর্ম্মের ইতিহাস—সেই ইতিহাস তার বেদমন্ত্র। এই মন্ত্র সে ভুলিতে পারে না বলিয়াই এত দুর্দ্দিনেও তাহাকে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, ভাষাবিজ্ঞান, প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য, প্রাচীন যুগের নদ, নদী, জনপদাদির নাম প্রভৃতি জীবনের যত কিছু অভিব্যক্তি, সব কিছুর পরিচয় লইয়া এই মহাজাতি বেদ বুকে করিয়া আজও অস্তিত্ব রক্ষা করে। বেদ তাহার এক অখণ্ড জাতি-চেতনার মহামন্ত্র, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ অমর গ্রন্থ। ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের জীবন-নীতির পরিচয় বেদেই আছে। জগতের শিক্ষা-সভ্যতার ইতিহাস, অর্ব্বাচীন যুগের মানুষ যত দূর জানিতে পারে, তাহা হইতে কত অধিক অতীতের অপূর্ব্ব কাহিনী যে এই বেদে নিহিত, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। স্বামী ভাস্করানন্দ তাই বলিতেন "হিন্দু আত্মরক্ষার পক্ষে যত নিরুপায় হউক, সে যদি প্রতিদিন "বেদ, বেদ, বেদ" বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে, এই শক্তি তাহাকে একদিন পরম শ্রেয়ঃ দিবে।"

কোন ইসলামধর্ম্মী মহম্মদ-প্রচারিত কোরাণের নিন্দা করিবে না। খৃষ্টধর্ম্মীও তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ করিবে না। সেদিনের শিখজাতিও গ্রন্থসাহেবকে মাথায় রাখিয়া আরাধনার মন্দির নির্ম্মাণ করে। আর হিন্দুনামধারী বিদ্যাভিমানী আমরা বেদ-নিন্দাকারী! ইহা বোধ হয় জ্ঞানকৃত নহে। স্ব-ধর্ম্ম বুঝিবার মত আকুলতা আমাদের খর্ব্ব হইয়াছে। হিন্দুর অতীতকে অকারণে আমরা তাই শ্রদ্ধা দিতে পারি না। যদি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তবে আজ অধ্যবসায়-সহকারে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে। যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যেই ইহা শ্রদ্ধার বিষয় হইবে, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। আমরা এই হেতু ভারতের হিন্দু জাতিকে শুধু হিন্দু নামে পরিচয় দিয়া বাঁচার পক্ষপাতী নহি—ইহা তাতল সৈকতে জলবিন্দুর মত নিমেষেই শেষ হইবে। ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুজাতিকে সশ্রদ্ধ হইতে বলিব। যাহা জানি না, বুঝি না, তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, আমরা কে ও কাহার বংশধর—তাহা জানিবার জন্য আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুশীলনে অর্ব্বাচীন যুগের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। শ্রদ্ধাবান্ দেখিবেন—বেদাদি শাস্ত্র যথারীতি আবিষ্কৃত হইলে, ভারত বাঁচিবে, বিশ্ব এক অসাধারণ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাইয়া, নিজ নিজ ধর্ম্মে আত্মস্থ হইয়া, পৃথিবীতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিবে।

ভারতে জাতিগঠনের নূতন ভিত্তি

স্বভাব, শক্তি ও আয়ুঃ, এই তিনের সমবায়ে মানুষের জীবন। মানুষের এই তিনটী বিষয় সর্ব্বত্র সমান নহে। ভেদ ও পার্থক্য আছে বলিয়াই আমরা পরস্পরকে পূরণ করিয়া সংহতিবদ্ধ হই। এই তিনটী বস্তুর আশ্রয় স্থাবর জঙ্গমময়ী এই পৃথিবী। স্থাবর ও জঙ্গম, চেতন ও অচেতন, এই নীতির দ্বারা অসংখ্যপ্রকার সংজ্ঞায়, অসংখ্যপ্রকার জাতি রচনা করিয়াছে। স্থাবর মৃত্তিকা-পাথরেরও জাতি আছে। উহাও শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত প্রভৃতি বিচিত্র গুণ-ধর্ম্মী —বিচিত্র স্বভাব লইয়া কালে উৎপন্ন হইয়াছে, কালে লয় পাইবে। জঙ্গম বৃক্ষ হইতে ইতর প্রাণী ও মনুষ্য জাতি-ভেদে নানা প্রকার। সে কত প্রকার, তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুজাতি এক, কিন্তু ইহার মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে —শক্তি ও স্বভাবের পার্থক্য। পার্থক্য যেখানে তত স্পষ্ট নহে, সেখানে আমরা জাতি-বিশেষকে এক-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখি। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান বা খৃষ্টানের শক্তি ও স্বভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবের পার্থক্য যত সহজে চক্ষে পড়ে, শক্তির পার্থক্য তত স্পষ্ট হইয়া দেখা যায় না—স্থূলতঃ মানুষের চলা-ফেরা, কর্ম্ম করা প্রভৃতি শক্তি-প্রকাশের কৌশল এক প্রকারের মনে হয়। পরন্তু জাতিভেদে স্বভাবভেদের ন্যায়, শক্তিভেদও আছে শক্তিভেদের কথায়, শক্তির পরিমাণের কথা বলিতেছি না। শক্তির ছন্দঃ ভিন্ন ধরণের হয়। একজন মুসলমানের শক্তি-প্রকাশ যে ধরণের, হিন্দুর তাহা নহে। এমন কি হিন্দু-জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের যে শক্তি, এই দিক্ দিয়া দেখিলে শূদ্রের তাহা নাই। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভারতের প্রাচীন জাতির ছিল; তাই তাহারা শক্তিভেদে একই আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণভেদ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞান-শক্তি, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য ও বীর্য্যপ্রকাশের শক্তি সমচ্ছন্দে লীলায়িত, তবে একই অখণ্ড শক্তির একটা লীলাবৈচিত্র্য আছে। তাই একের তুল্য অন্যে নহে; এইজন্য শক্তির সাম্যাকাঙ্ক্ষা খুবই স্বাভাবিক। পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংযুক্তি-প্রয়াস মানবসমাজে চিরদিন আছে। তাই বিচিত্র স্বভাব ও শক্তি-বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে সংহতিগঠনের প্রয়াস লক্ষ্যে পড়ে। ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য ইহারই ফল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পর সান্নিধ্যবর্শতঃ এইরূপ সংহতি গড়িয়া তুলে। একের যাহা অভাব, অন্যে তাহা পূরণ করে বলিয়া আমরা পরস্পর সন্নিবদ্ধ হই। শক্তির মত আয়ুরও এইরূপ তারতম্য আছে। এক একটা সমষ্টির জন্ম-মৃত্যুর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত জাতি মরিয়াছে, আবার জন্মিয়াছে। সকল জাতির সমান আয়ুষ্কাল নহে। এই আয়ুষ্কালের পরিমাণ কীটাদি হইতে ব্রহ্মাদি দেব-

গণেরও ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য আজ যে বাঁচিয়া আছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। ভারতের যে জাতিগুলি অধুনা ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও শক্তি লইয়া টিকিয়া আছে, আজ তাহাদের পরস্পর সান্নিধ্যে যে যে জাতি উপস্থিত, শক্তি-সাম্যের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা পরস্পর সংহতিবদ্ধ হইতে চাহিবে ও এক নূতন জাতিধর্ম্মের বেদী রচনা করিবে, অথবা এক জাতি যাহাদিগকে সমীকৃত করিয়া লইতে পারিবে না, তাহাদিগকে অপসৃত করিয়া নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়া লইবে। এ নীতি শুধু ভারতের নহে, সর্ব্বত্র এইরূপই হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্বভাবের মানুষকে সমীকৃত করিয়া লওয়ার সাধ্য শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন, কর্ম্মতৎপর মানুষদের অপেক্ষা জ্ঞানপ্রধান জাতির পক্ষে ইহা অধিকতর সহজ হয়। প্রাচীন খোলস ছাড়িয়া জাতি যখন নবীন মূর্ত্তি ধরে, তখন এই প্রয়োজন নানা দুর্ব্বোধ্য উপলক্ষ্যের ন্যায় আসিয়া থাকে; পরন্তু কোন জাতির শক্তিপূরণের যুগ উপস্থিত হইলে, সে জাতির শক্তি ও স্বভাব নানা ছলে বিচিত্র শক্তি ও স্বভাববিশিষ্ট জাতিকে নিজ সান্নিধ্যে ডাকিয়া আনে; তার পর শক্তিসাম্যের বিগ্রহ হইয়া স্বদেশের উপযোগী গুণ ও কর্ম্ম প্রকাশ করে। স্বভাব ও শক্তির বিচিত্র সংযোগের ফলে, শুভাশুভময় জাতির অদৃষ্ট আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। যতদিন শক্তি সমীকৃত থাকে, ততদিন সৃষ্টি অব্যাহত। তার অখণ্ডত্বের হানি হয় না। ইহার অভাবে আবার এই সংহতিও সংহারপ্রাপ্ত হয়। বহু স্বভাব ও শক্তিবিশিষ্ট মানুষ লইয়া জাতি। উহা একটি নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ লইয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সেই আয়ুঃ চিরদিনের নহে; কেন না, শক্তি ও স্বভাব কোথাও সমতা লাভ করে না। জগতের এই নীতি আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে।

ভারতের যে জাতিটা আজ আত্মস্বভাব ও আত্মশক্তির অসমান অবস্থায় ম্রিয়মাণ, সে যদি বিজ্ঞানঘন আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাহার সান্নিধ্যে তাহাকে পূরণ করার জন্য যে স্বভাব ও শক্তিবিশিষ্ট জাতি আজ সমাগত, তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজেকে শক্তিশালী জাতিরূপে গড়িয়া তোলাই তার পক্ষে শ্রেয়ঃ সাধন করিবে। অভিমানবশতঃ এই সমীকরণ-প্রচেষ্টা যদি পরিত্যক্ত হয়, জাতির পঙ্গুত্ব ও অভাবাত্মক বৃত্তি কোন দিন ঘুচিবে না, নিজেও সে পূর্ণ হইতে পারিবে না। ভারতের হিন্দু জাতি আজ জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে; হয় সে নবজন্ম লইবে, না হয় মরিবে, —অন্য মধ্য পথ আর নাই।

বৃটনের যুদ্ধঘোষণা

অবশেষে যুদ্ধ বাধিল। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ইউরোপের কুরুক্ষেত্র হইতে এই যুদ্ধের পরিণাম ভীষণতর হইবে বলিয়াই অনেকে অনুমান করিতেছেন। কথা অমূলক নহে। পৃথিবীর প্রবল রাজশক্তিসমূহ ধ্বংসের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। সংগ্রামের ভাবী পরিণাম চিন্তা করিয়া জগদ্বাসী আজ নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে।

আবিসিনিয়ায় ইটালীর আক্রমণ ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া শান্তিপ্রয়াসী জাতিগণের মধ্যে একটু কোলাহল উঠিয়াছিল মাত্র। তার পর যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিগত কুরুক্ষেত্রের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারা একে একে নিশ্চিহ্ন হইতে লাগিল। সত্য ও ন্যায়ের রাজদণ্ড বিধাতা যেন বৃটনের হস্তেই দিয়াছেন, এই ধারণায় যে বিশেষ ভারতবাসীর কণ্ঠে বৃটনের বিরুদ্ধে বিরক্তির একটু অধিক কটূক্তি শুনা গিয়াছিল। স্পেনের গণতন্ত্রশক্তি পরাজিত হইলে, তবুও বৃটনকে অবিচল থাকিতে দেখিয়া অনেকে তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিয়াছিল। তারপর জাপানের চীনাক্রমণ। তিয়ানসানে বৃটিশ জাতির অপমানের কাহিনী বৃটনের ও বৃটনাধিকৃত প্রদেশবাসীর মনে পীড়ার কারণ হইয়াছিল। বৃটন তবুও নিশ্চেষ্ট ছিল। ইহাতে তাহাকে অনেকে ক্লীব ও পঙ্গু বলিয়াও গালি দিয়াছে। বৃটনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন করপুটে কর্ণ ঢাকিয়া মিনতি করিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন "বৃটন জগতের শান্তি-ভঙ্গের পথে পা দিবে না। এবার যুদ্ধ বাধিলে, পৃথিবীর সুখ-শান্তি বিন্দুমাত্র থাকিবে না। শতাব্দী শতাব্দী কাল ধরিয়া যে সকল কৃষ্টি-সভ্যতা জগতে মাথা

তুলিয়াছে, এই সবই নিশ্চিহ্ন হইবে।" বৃটন শান্তি-কামনায় ইটালীর দম্ভ দেখিয়াছে, জার্ম্মানীর অবাধ অভিযান নীরবে লক্ষ্য করিয়াছে, স্পেনের গৃহ যুদ্ধে সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই, জাপানকেও সে বাধা দেয় নাই। সে জানিত—এই সকল শক্তিশালী জাতির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি তাহার আছে বটে; কিন্তু এরূপ হইলে, বিশ্বব্যাপী যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না। পৃথিবী সে আহবে ভস্মীভূত হইবে। কিন্তু জার্ম্মানী চাহে—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাহার যে বিস্তৃতি ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, তাহা সব সুদে আসলে ফিরিয়া পাইতে। পূর্ব্ব ইউরোপের জনপদগুলি একে একে অধিকার করিয়া সে পোলের ডান্‌জিগ ও করিডরে হানা দিতে চাহিল। পোলের একটা প্রাচীন সংস্কৃতি আছে, বিশিষ্ট শিক্ষা ও সভ্যতা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে পোল্যাণ্ডকে অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়া ভাগাভাগি করিয়া লয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সংগ্রামকালে দেখা যায় যে, পোলের ২ কোটী অধিবাসী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত জনপদ রুশের অধিকৃত, অবশিষ্ট অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার অধিকৃত।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পোল্যাণ্ড বিজয়ের পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে পোলগণ প্যারী সহরের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ লাভ করে। পোলেরা ফ্রান্সের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অনুরাগী হয়। বিগত যুদ্ধাবসানে ফ্রান্সের সাহায্যেই পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। তাহাকে সাহায্য করার জন্য ফ্রান্স ও বৃটন সর্ত্তবদ্ধ আছেন। এই অবস্থায় পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত ডান্‌জিগ জার্ম্মানী যখন দাবী করিয়া বসিল, তাহার এই একমাত্র সমুদ্র-বন্দর সে ছাড়িতে রাজী হইল না। বৃটিশ রাজমন্ত্রী এই উভয় জাতির মধ্যে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করাও যখন সম্ভব করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিরাশ হইয়া লোকক্ষয়কারী সংগ্রাম ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন।

জার্ম্মানী ডান্‌জিগ ফিরিয়া পাইতে চাহে। করিডর ও পোল্যাণ্ড হইতে কাড়িয়া লইয়া সে নিজের রাজ্যভুক্ত করিবে। করিডর সম্বন্ধে গণ-ভোটের একটা অছিলা আছে বটে; কিন্তু তার জন্য সে এক মুহূর্ত্তও প্রতীক্ষা করিতে চাহে না। করিডর হইতে পোলদের সামরিক বহর শীঘ্রই উঠাইয়া লইতে হইবে। গণ-ভোটের ফলাফল যাহাই হউক, করিডরের মধ্য দিয়া প্রুশিয়া যাওয়ার পথ এখনই মুক্ত হওয়া চাই। এইরূপ জোর প্রস্তাব পোল্যাণ্ড স্বীকার করিতে পারিল না। জার্ম্মানীর সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। জার্ম্মান সৈন্য পোলদের আক্রমণ করিয়াছে।

বৃটন অতিশয় ধৈর্য্যসহকারে বিশ্বের শান্তিরক্ষার জন্য জার্ম্মানীকে অনেক বুঝাইয়াছে, এক প্রকার মিনতিও জ্ঞাপন করিয়াছে; কিন্তু হিটলারের উদ্যত রাজ্যবিস্তারের প্রাণ-শক্তি তাহাতে নিরস্ত হয় নাই। বৃটন এই অবস্থায় পোল্যাণ্ডের প্রতি তাহার প্রতিশ্রুতি-রক্ষার কর্ত্তব্য পালন করার জন্য কোষ-মুক্ত অসি উত্তোলন করিয়া সমর-ঘোষণা করিল। বৃটনের পূর্ব্ব আচরণে অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বৃটন অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে, কিন্তু বিপদে পা বাড়াইবে না। এই ভ্রান্ত ধারণা তাহার যুদ্ধ-ঘোষণায় নিরসিত হইয়াছে। এক্ষণে বৃটন শুধু নহে, ভারতকেও তাহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

যুদ্ধের ভীষণতা

জার্ম্মানীর সুপণ্ডিত বিস্‌মার্ক রুশের সহিত জার্ম্মানীর ঐক্য রক্ষা করার নীতিই জাতিকে রক্ষা করার উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। বিস্‌মার্কের সময়েই জার্ম্মানজাতি পোল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। জার্ম্মান ভাষা ও জার্ম্মান সংস্কৃতি পোলদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে, তাহারা কতক পরিমাণে জার্ম্মানই হইয়া গিয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান সম্রাট্ কাইজার বিস্‌মার্কের নীতি উপেক্ষা করেন। রুশ জার্ম্মানীর শত্রু হইয়া উঠে। কিন্তু হিটলার কূট রাজনীতি-বলে রুশকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। এই হিট্‌লার একদিন বলিয়াছিলেন যে, রুশের কমিউনিজম্ তিনি সমূলে উৎপাটন করিবেন। আজ সেই হিট্‌লার রুশকে আপনার করিয়া ইংরাজ ও ফ্রান্সকে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহেন।

মুসোলিনীও রুশের আদর্শ-বাদ-বিরোধী। স্পেনের রুশ-প্রভাব ধ্বংস করার জন্য ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানের পশ্চাতে মুসোলিনী ও হিটলারের বীর্য্য নিহিত। জাপানও এই এক নীতি আশ্রয় করিয়া জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত সন্ধিবদ্ধ। এই অবস্থায় বৃটন হয়তো ভাবিতে পারে নাই যে, হিটলার স্বীয় আদর্শের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়া ষ্ট্যালিনের সহিত সর্ত্তবদ্ধ হইবেন। রুশের সহিত জার্ম্মানীর চুক্তি অতিশয় বিস্ময়ের হইলেও, তাহা যেমন বাধিল না; বৃটন যেন মনে রাখে, ইটালীরও ইহা না বাধিতে পারে। জাপানও ইহা হইতে বাদ পড়িবে, এমন প্রত্যয়ও ঠিক হইবে না। রাজ্য-পিপাসায় জাতি অন্ধ হইলে, তাহার আদর্শ ও সভ্যতা বলি দিতে বাধে না। আজ সত্যই বৃটন সঙ্কটময় ক্ষেত্রে। একদিকে জার্ম্মানী, ভূমধ্য সাগরে ইটালীর প্রতিপত্তি, ভারতের সুদূর পূর্ব্ব সীমায় জাপানের লেলিহান রসনা। উপরে রুশ নখদন্ত শানাইয়া বসিয়া আছে। এ যুদ্ধ যদি অলক্ষিত কোন তৃতীয় শক্তির প্রতিবন্ধকতায় রুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মানচিত্র একেবারে নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে। পৃথিবীর বিবর্ত্তন-যুগের এমন রহস্যময় ইতিহাস কল্পনার সীমা অতিক্রম করিবে।

ভারত ও বৃটন

ভার্সেইসের সন্ধিপত্র নব-শক্তি-দীক্ষিত জার্ম্মানী ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছে। মিউনিকের চুক্তি বৃটনের স্বার্থ-রক্ষার অনুকূলে চটকদার ফাঁদ বলিয়া ইটালী ও জার্ম্মানী ভ্রুকুটীকুটিল কটাক্ষে উপেক্ষা করিয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর রণক্লান্ত বৃটন ও ফ্রান্স বিশাল সাম্রাজ্য-রক্ষার দায়ে এবং নিরস্ত্রীকরণের আদর্শের সম্মোহনে অনেকদিন বিশ্ব - শক্তি - সঙ্ঘের কেন্দ্র - নির্ম্মাণে শক্তি ও সময়ের অপচয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান, এমন কি আমেরিকা পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্পদে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। আজ জার্ম্মানীর সমরপোত বৃটনের শক্তি অতিক্রম করিয়াছে। ইটালী জলযুদ্ধেও দুর্দ্ধর্ষ শক্তি লাভ করিয়াছে। জার্ম্মানী ও ইটালীর সংযুক্ত সামরিক শক্তির সম্মুখে বৃটন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তি যদিও অধিক হয়, রুশ, জাপান, স্পেন, জার্ম্মানীর গোপন মন্ত্রণায় যদি যোগ দিয়া থাকে, কি যে অনর্থ বাধিবে, সে কথা ভাবিতেও আমাদের হৃৎকম্প হয়।

বৃটনের অনাবিষ্কৃত শক্তি অফুরন্ত আছে, ইহাই এক মাত্র ভরসা। বৃটন তাহার ঔপনিবেশিক শক্তি প্রয়োজনে লাগাইবে, মিশরকেও সে ছাড়িবে না। আয়ার্ল্যাণ্ডের ২৫ হাজার সৈন্য নিরপেক্ষ যদিও থাকে, বৃটনের ভরসা ভারতের উপর কম নহে।

ভারতে ৪০ কোটী লোকের বাস। ভারতে ৬ শত করদ ও স্বাধীন রাজ্য। বিশ্বের রত্নাগার সোনার ভারত-ভূমি। বৃটন তাহাকে এই দেড় শত বৎসর 'মিত্র' করিতে পারে নাই। আজ দৈব তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছে। ভারতের নেতৃবৃন্দকে বড়লাট আহ্বান দিয়াছেন। দীর্ঘ দিনের পরাধীন ভারত আজ স্বাধীনতা-কামী। হিংসা-বিদ্বেষের সে পক্ষপাতী নহে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের আজ রাষ্ট্রনেতা। সুভাষচন্দ্র সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি জাগাইয়া রাখার ঋত্বিক্ হইলেও, তাঁহার কণ্ঠেও অহিংসা ঋক্ই উচ্চারিত হয়। বৃটন আজ এই ভারতের যোগ্য গৌরব দান করিয়া যুগবিবর্ত্তনকারী মহাযুদ্ধে যদি সত্য ও ন্যায়ের রাজদণ্ড ধরিয়া অগ্রসর হন, ভারতের অবরুদ্ধ শক্তি জগজ্জয় করিয়া বৃটনের সহিত অমর মৈত্রীবন্ধনে জগতে অভিনব যুগ প্রবর্ত্তন করিবে।

ভারত নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। ক্লিষ্ট চিত্তে এই আহবে যদি বাধ্য হইয়া তাহাকে যোগ দিতে হয়, ভারতের সে অবদান শক্তিপূত হইবে না। অনিচ্ছাকৃত তাহার অভিযান বৃটনের জয়-পথে বাধার সৃষ্টি করিবে। অশক্তিই আহ্বান করিয়া আনিবে।

বৃটনের পররাজ্যপিপাসা অভাব - নিয়ন্ত্রণে — উহা বিধাতারই আহ্বান। তাহার জন্য আজ ভারতবাসী তত ক্ষুন্ন নহে। কিন্তু আজ ভারতের ললাটে তার সত্য অধিকারের জয়-টীকা পরাইয়াই তাহাকে লইতে হইবে— স্বাধীনতাহরণকারী বিরুদ্ধ শক্তির দমন-যুদ্ধে। আমরা বড়লাট বাহাদুরের নেতৃগণকে আহ্বান শুভ-বুদ্ধির লক্ষণ

বলিয়া মনে করি। তিনি দেশ-নেতৃগণের সহিত যোগ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া, মহাজয় আসন্ন করিয়া তুলুন।

আমরা বড়লাটের বাণী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, বৃটনের এই যুদ্ধঘোষণা আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য নহে। মানব-স্বাধীনতার পথ মুক্ত রাখাই এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞ দার্শনিকের ন্যায় অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন যে, এই সঙ্কটে অস্ত্রবল বড় নহে, আত্মিক শক্তি ও দৈব বলের উপরই জয় নির্ভর করিবে। জীবনের অতি সঙ্কট-কালে অব্যর্থ শক্তি এবং সহিষ্ণুতার চির প্রবহমান উৎস ইহাতেই উৎসরিত হয়।

তিনি ভারতের সহানুভূতি ও সমর্থন কামনা করিয়াছেন। জগৎসভ্যতার ইতিহাসে ভারতকে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান দিয়াছেন। ভারত এ বাণী অগ্রাহ্য করিবে না। মহাপ্রাণ উদার ভারত এ সঙ্কটকালে যোগ্য চরিত্রের পরিচয় দিবে। সম্রাটের ঘোষণা-বাণী জগদীশ্বরের চরণে ফলাফলার্পণের মন্ত্রে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে—ঈশ্বরপ্রসাদ বৃটনকে জয়ের অধিকারী করিবেই। বৃটন যেদিন পরনারীকে সাম্রাজ্ঞীর আসন দিতে ইতস্ততঃ করিয়া অষ্টম এডোয়ার্ডকে আকূতি জানাইল, স্বেচ্ছায় তিনি বৃটনের পূত-সিংহাসন পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ করিলেন, বৃটিশ জাতির এই সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা আর্য্যজনোচিত আচারনীতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়াছে। সেদিন উহা তাহার রাজ্যকালের আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়াছে! ভারত তাই তাহার সহযোগী হইবে। পরাধীনতার ব্যথায় ভারত ক্ষুণ্ণচিত্ত। সত্যের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি বৃটনের নিষ্ঠা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগসিদ্ধি যদি কোথাও সম্ভব হয়, তাহা ভারত ও বৃটনের মধ্যেই হইবে। বৃটনের যুদ্ধঘোষণায় ভারতও সমকণ্ঠ। আশা করি, ভারতের নেতৃবৃন্দ যথাবিধানে আমাদের এই অভিমত নিশ্চয় সমর্থন করিবেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

আজ যে সঙ্কট আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহা অতিক্রম করিয়া আমাদের প্রাণশক্তি অন্য কোন আন্দোলন ও আলোচনায় ছড়াইয়া রাখা সম্ভব নহে। এই সঙ্কটে বিধাতা ভারতকেও ডাক দিয়াছেন, এ ডাকে আমাদের সাড়া দিতে হইবে।

আজ এই জন্য কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস জাতীয় পক্ষ ও হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি বিভিন্ন দলের আদর্শ-ভেদ রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে। আজ নিখিল জাতিকে একযোগে সম্মুখের সমস্যা দূরীকৃত করার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতের ভাগ্যবিবর্ত্তন-যুগ উপস্থিত। হিন্দু-মোসলেম অনৈক্য এই ঘটনায় বলি পড়িলেই আমরা সুখী হইব। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জাতিকে শ্রেয়ঃ দিবে না। বিধাতার বজ্র গগন বিদীর্ণ করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে, এ বাণী আমাদের সকলের পক্ষেই।

তবুও হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে যে সকল অসঙ্গত কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত বলিয়াই মনে করি। একটা দীর্ঘদিনের পরাধীন জাতি বাঁচার সুপথ না পাইয়া, দীর্ঘদিন তির্য্যক্ পথেই চলিয়াছে। ধর্ম্মরক্ষা করার নামে ২৫ কোটী হিন্দুর মধ্যে উপধর্ম্মের জালই আমরা বুনিয়া তুলিয়াছি। সমাজ-সংস্কারের নামে বিধবার বিবাহ দিয়াছি। স্বাধীনতার নামে নারীজাতিকে স্বৈরাচারী করিয়াছি। বাল্য-বিবাহ নিরোধ করিতে গিয়া, ঘরে ঘরে কলঙ্কের কালি লেপিতেছি। বর্ণধর্ম্ম ভাঙ্গার নামে এক হিন্দুজাতির মধ্যেই কায়েমী স্বার্থে শ্রেণীবিশেষ গড়িয়া তুলিতেছি। শিক্ষা-সংস্কারে কুশিক্ষার প্রশ্রয় পাইতেছে। ছেলেরা প্রতিভা হারাইতেছে, বিলাসী হইতেছে। প্রগতিপরায়ণ জাতি ধর্ম্ম ছাড়িতেছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেছে, আত্মঘাতী হইতেছে। কোনদিকেই আমরা শ্রেয়ঃ করিতে পারি নাই। আবার এক পতি-পত্নীর সম্বন্ধ-ত্যাগের বিল কেন্দ্র-সভায় উত্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেস - সভ্যেরা উপস্থিত না থাকায়, বিলটী আঁতুর ঘরেই মারা গেল। শ্রীযুক্ত অ্যানে বলিয়াছেন, "হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন ধর্ম্মগত।" শরীর-ক্ষুধা বা মনের বিলাসপূর্ত্তির জন্য সত্যই হিন্দুর

পরিণয় নহে, ইহা হিন্দুমাত্রেই জানে। হিন্দু হইয়া এইরূপ বিল প্রবর্ত্তন যাঁহারা করেন, তাঁহারা একেবারেই বুদ্ধিভ্রষ্ট বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুর গর্ভাধান হইতে চিতায় শয়ন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-নীতি-শাসিত। এইটাই হিন্দুর শক্তি ও আয়ুঃ। ইহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া জাতিটাকে দেহাত্মবোধের চেতনায় টানিয়া আনার প্রয়াস আমরা অত্যন্ত গর্হিত মনে করি।

হিন্দুর ধর্ম্ম ভোগে ও অপবর্গে। এই ভোগ মর্ত্ত্যের নহে। ভোগ শাশ্বত সুখের লক্ষণ-স্বরূপ। ইহা ধর্ম্ম-নীতির অনুসরণেই মিলে, শরীর-নীতিতে মিলে না। এই উৎকৃষ্ট জীবন-নীতি হিন্দু বিশ্বকে দিতে পারে। এই জন্য তার বাঁচার প্রয়োজন—রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সে তাহার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্যই বাঁচিতে চাহে। হিন্দু পদে পদে মরার পথে চলে কেন, তাহা আমরা বুঝি না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের জন্ম, কর্ণবেধ, নামকরণ সবই বিধিলিপির অনুগত। জ্যোতিষ-শাস্ত্র আমাদের জীবন-নীতির সহায়ক। এ কথা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি? বালিকা দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইলে শনি যে রাশিতে, পুনরায় এই গ্রহ সেই রাশিতে পুনরাবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নারীর ভোগক্ষয় হয় না—নারীকে তাই সতর্ক থাকিতে হয়। নারীর পবিত্রতা স্বর্গের অপেক্ষাও মহীয়সী। আজ কোন্ যুক্তি ও নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দুর এই বৈজ্ঞানিক নীতি আমরা লঙ্ঘন করিয়াছি! কিশোরীর প্রথম শোণিত-দর্শনের কাল হইতে ৩০টী বৎসর শনিগ্রহের পূর্ব্বরাশিতে পুনরাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত তাহার যে যৌগিক প্রাণক্রীড়া, তাহা লঙ্ঘন করার বিবাহ-বিল-রূপ বৈপ্লবিক রীতি হিন্দুর নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। হিন্দু বলিয়াই আমরা বাঁচিব না। হিন্দুত্বের একটা আচার আছে, সেই আচার মালা-তিলক নহে, উহা জীবননীতি—আমরা ইহা দুর্ব্বদ্ধিবশতঃ ক্ষুণ্ণ করিয়া জাতিটার ভিত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।

হিন্দু আত্মবিশ্বাসী, তার পরিণয় আত্মার সহিত আত্মার। যেখানে দুর্ঘটনা প্রকট হয়, তাহার জন্য যে অশান্তি ও অসুবিধা, তাহা হিন্দু-সমাজকে সহ্য করিতে হইবে। 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ' ভাল নয়; ঈশ্বরের নির্ম্মম বিধান যে সহিতে পারে, সে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। অসমর্থ পক্ষে বিধবার বিবাহ হউক, কুমারী যৌবনের সীমায় পরিণীতা হউক, পত্নী পতিত্যাগ করুক—সমাজে ও বালাই উপেক্ষার বস্তু হউক। যদি মন্ত্রণা-পরিষদে আইন প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, হিন্দু হিন্দু বলিয়া যাহাতে পরিচয় দিতে পারে, সেইরূপ নিয়মপদ্ধতি আইনে পরিণত করা হউক। আমরা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে হিন্দু-সমাজের বালাইয়ের মাত্রা আর বাড়াইতে চাহি না। অনেক হইয়াছে, এখন একটু থামিতে বলি।

বাসনা

শ্রীজহরলাল বসু

চাহি না মা রাজপদ; রাজোপাধি আমি
অতি তুচ্ছ ভাবি মনে; প্রধান পূজারী
হব বাণীর মন্দিরে—তাও আমি মানি
নিতান্ত দুরাশা বলি; দিবা বিভাবরী
সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দেয় ভাগ্যবান্
ভারতীর অঙ্ঘ্রি-কোকনদে; দীন আমি,
চাহি শুধু দিবা-নিশি করিতে ধেয়ান
বাণীর রাতুল পদ; আর(ও) ভাগ্য মানি—
দৌবারিক বেশে যদি পাই দাঁড়াবারে
বাণীর মন্দির-দ্বারে, আমি অনুক্ষণ;
ভক্তগণ পূজা যবে ষোড়শোপচারে
দিবে মার রাঙা পায়, করি বিলোকন,
সার্থক করিব নেত্র;—অধম তনয়
এই মাত্র ভিক্ষা মাগো মাগে তব পায়।

পথের সঙ্কেত

প্রবোধ কুমার সান্যাল

পাঁচ

মৃণ্ময়ীর উপর রাগ করিলাম কিন্তু তাহার আদেশ অমান্য করিতে পারিলাম না। রেশমী শাড়িখানা এমন অপরূপ কৌশলে সে তাহার দেহলতায় আঁটাআঁটি করিয়া জড়াইয়াছে, চুলের ঝুরি নামাইয়া সুন্দর মুখখানিতে এমন করিয়া প্রসাধন আঁকিয়াছে, এমন করিয়াই তাহার রাজহংসীর চলন ঢলঢল করিতেছে যে, তাহার অবাধ্য হইবার সাধ্য আমার রহিল না। পিতার মৃত্যুর পর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, মেয়েদের সহিত মিশিব কিন্তু দেহাসক্তির উত্তেজনা তাহাদের নিকট আর প্রকাশ করিব না। ভাবিলাম মৃণ্ময়ীর এই আদেশ কেন মানিয়া লইতেছি? এখনও আমি তাহার প্রেমে ডুবি নাই, এখনও তাহাকে নষ্ট করি নাই যাহার জন্য চক্ষুলজ্জা মানিব, এখনও তাহাকে তাহার এই টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া বিদায় করিয়া দিতে পারি, কিন্তু নিজের মনের চেহারা আমি অনুভব করিতে পারিলাম। আমি একজন ঔপন্যাসিক হইলে এখানে রস ফলাইয়া সত্য ও সততাকে চাপা দিতে পারিতাম, কবি হইলে রং বুলাইয়া এখানকার ইতর আত্মপ্রতারণাকে ঢাকিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হইবার নয়। মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সাধুতার ছদ্মবেশ চড়াইয়াছি কিন্তু মনে মনে প্রাণের তটে ভাঙন লাগিয়া আছে। আমার রক্তগত যৌন-শৈথিল্য ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে বন্যজন্তুর ন্যায় ভিতরে ভিতরে মৃণ্ময়ীকে লেহন করিতেছে, এই সত্য চাপিব কাহার ভয়ে? হয়ত মৃণ্ময়ীও আমার এই সাংস্কারিক প্রবৃত্তির সন্ধান ক্রমশঃ পাইয়াছে, সেই জন্য আমাকে বাগ মানাইতে হইলেই সে একটা অদ্ভুত বিলাসিনী রমণীর বেশ ধরিয়া আসিত। সে যেন বারে বারে এই কথাটাই প্রকাশ করিয়াছে, আমি যদি আমার স্বভাবে দৈবভাব আনিতে চাই তবে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই আনিতে হইবে, আর যদি বীভৎস প্রবৃত্তির তাড়নায় অতল তলে তলাইতে চাই, তবে তাহারই হাত ধরিয়া নামিয়া যাইতে পারিব, কিছু অসুবিধা হইবে না।

স্ত্রীলোকের পরিপুষ্ট দেহ পাইলেই আমি খুশি থাকিতাম, তাহাদের মনের দিকে চাহিবার ইচ্ছা ও অবসর আমার হয় নাই, ও-বস্তু তাহাদের মধ্যে আছে এই সংবাদ শুনিলেই আমি হাসিয়া ফেলিতাম। উহারা জীবন্ত মাংস-পিণ্ডের ন্যায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে পৃথিবীর জল বাতাসে উহারা সুপুষ্ট হয় এবং আমাদের ক্ষুধা পাইলেই উহাদের ধরিয়া কচি ও নধর মাংসের আস্বাদ করি—ইহাই বিশ্বের নারীজাতির আবহমান কালের ইতিহাস। সৃষ্টির বিবর্ত্তনে মানুষের ঐতিহ্য-কাহিনী পুরুষের বর্ব্বরতা ও সাধুতা, পুরুষের ভোগ ও ত্যাগ, পুরুষের সৃষ্টি ও ধ্বংস—ইহাদেরই কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে, সেখানে নারীর স্বাতন্ত্র্যের কোথায় প্রমাণ পাইলাম? শক্তির আধার বলিয়া নারীকে যাহারা হ্লাদিনীর উৎস বলিয়া স্তুতিবাদ করে তাহারা কি জানে না যে, পদ্মের ভিতরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সূর্য্যদেবতারই অনুগ্রহে? জানে না কি, পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতেই তাহাদের শক্তির উদ্ভব? কবি বলো, দার্শনিক বলো, যোগী বলো,—নারীর স্তুতিবাদের মূলে তাহাদের সেই একই সৃজন-কামনা, একই যৌন-শৈথিল্যের লক্ষণ,—অন্ততঃ ইহাই আমি বিশ্বাস করিতাম।

কিন্তু আমার জীবনে যে-পথবাসিনীকে পথের উপর হইতেই কুড়াইয়া পাইলাম, আজ এই সন্ধ্যায় তাহাকে সহসা অপরূপ বলিয়া মনে হইল। উঁচু আসনে তাহাকে বসাইয়া নারী-লোলুপ বাক্যবাগীশের ন্যায় পূজা দিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমার নাই, তাহাকে লইয়া প্রাণের মধ্যে গীতিকাব্য রচনা করিবার অবসরও আমি খুঁজিয়া পাইলাম না, কিন্তু অন্ধকার পথে নামিয়া মৃণ্ময়ীর হাতখানা ধরিতে গিয়া সহসা নিজেকে সম্বরণ করিলাম। আমার দুরন্ত রথচক্রের গতির পথে যে-মেয়ে অলঙ্ঘ্য বাধা বিস্তার করিল, আজ তাহার মুখখানি আর একবার ভালো করিয়া দেখিলাম। বিলাসিনীর লোভনীয় সাজসজ্জায় ইহা রমণীর

মুখ সন্দেহ নাই, আমার নারকীয় কামনার সহচারিণী হইবার আপত্তিও সে-মুখে দেখিলাম না, আমার সহিত পাতালপথে যাইতেও সে প্রস্তুত, কিন্তু তবু যেন আমার কেমন সন্দেহ হইল। সেদিন রাত্রে এই রমণীই কল্যাণী প্রতিমার মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে বসিয়া আমারই জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, আমার ভিতর হইতে দেবত্বকে উদ্ধার করিয়া আমার জীবনকে ঊর্দ্ধায়িত করিয়া তুলিবার একটি পরম ব্যাকুলতা এই মুখের উপরেই অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম। ভালোবাসা পাইতে চাহে না, আমাকে ভালোবাসিয়া আমার জীবনকে অসুবিধার মধ্যে লইতেও তাহার অভিরুচি নাই, তাহার জীবনের কোনো স্বার্থকে আমার সহিত জুড়িয়া দিয়া কাজ হাসিল করিবার ফন্দীও তাহার দেখিলাম না,—সেই রাত্রে আমার ভয় হইয়াছিল পাছে ইহার প্রভাবে পড়িয়া আমি রাতারাতি সচ্চরিত্র হইয়া উঠি। সেদিনআমি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। আজ আবার ইহার সাজসজ্জায় নূতন খেলা দেখিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম।

আমার হাতে তাহার টাকার ব্যাগটা ছিল, পথে নামিয়া বলিলাম, এইভাবে তোমরা টাকা আনো, বিপদের ভয় করো না?

মৃণ্ময়ী বলিল, বিপদ ত মানুষের পদে পদে, তাই ব'লে কি ব'সে থাকবো? আপনিও ত' একটা মূর্ত্তিমান বিপদ।—এই বলিয়া সে হাসিল।

ইহার অকপট সাহস দেখিয়া অনেকদিনই আমি শিহরিয়া উঠিয়াছি, মনে মনে ইহার নিকট নিজেকে ভীরু বলিয়া অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, তবে এমন বিপদ মাথায় নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা কেন?

সে বলিল, বিপদকে নিয়ে খেলা করায় কম আনন্দ?

বটে, আমি তোমার খেলার সামগ্রী?

আপনাকে নিয়ে খেলা করব কেন, করি নিজেরই প্রাণ নিয়ে।

প্রাণের মায়া নেই তোমার?

খুব আছে।—মৃণ্ময়ী বলিল, আমার কেউ নেই বলেই আমি নির্ভয়। কেউ থাকলে তারই কাছে আশ্রয় নিতুম, রাজেনবাবু।

তাহার কথায় কারুণ্য ফুটিল। বলিলাম, স্বাধীন মেয়ে আমিও পছন্দ করি, কিন্তু তার জীবনের ভিত্তিটা খুব শক্ত হওয়া দরকার। নইলে স্রোতের আগাছা হওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়।

মৃণ্ময়ী মুখ তুলিয়া স্বচ্ছকণ্ঠে কহিল, আগাছা কেন হবো? মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ত আমি আপনার দেখা পেলুম।

মানে?

চলিতে চলিতে হাসিমুখে সে কহিল, ভয় নেই, বিপদ আমিই মাথা পেতে নেবো, আপনাকে বিপদে ফেলবো না। লোকের কাছে কি আর বলবো আপনি আমার আশ্রয়দাতা?

বলিলাম, মনে মনেই বা কেন বলবে? আমি ত তোমাকে আশ্রয় দিইনি?

সে পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিল, মেয়েমানুষ কি ভাবে আশ্রয় পায় একি আপনি জানেন?

বলিলাম, আমার দুর্ব্বলতা কোথায় তা তোমাকে জানিয়েছি। আমাকে এতটা বিশ্বাস ক'রো না মৃণ্ময়ী।

এ ত' বিশ্বাসের কথা নয়, নির্ভরের কথা।

আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল। পথ চলিতে চলিতে বলিলাম, আমার ওপর কোনো মেয়ে নির্ভর করেছে, একথা শুনলে আমি ভয় পাই। তাদের আমি শ্রদ্ধা কখনো করিনি, তাদের কল্যাণ-চিন্তা মনে কোনোদিন আনিনি। একি, কোথায় চলেছি বলো ত?

দু'জনেরই যেন চমক ভাঙিল। চলিতে চলিতে অনেক দূর আসিয়াছি, রাত্রিও হইয়াছে, আকাশে একবার শরৎকালের মেঘ ডাকিয়া উঠিল,—চাহিয়া দেখিলাম, গড়ের মাঠের একপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। মৃণ্ময়ী বলিল, কথায় কথায় পথ ভুলে এসেছি। এবার ফিরবেন?

আর একটু চলো।

আবার অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইতেই একটা ঝাপটা দিয়া বৃষ্টি আসিল, আমরা একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিকটে-দূরে মানুষ কোথাও

নাই। দূরের পথের আলোগুলি এখান হইতে ঝাপসা দেখাইতেছিল। সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, এত নির্ভর করেছ তুমি আমার ওপর, কিন্তু ধরো, আমি যদি তোমার সম্ভ্রম রাখতে না পারি, মৃণ্ময়ী ?

মৃণ্ময়ী বলিল, মানে ?

এই ধরো, আমার প্রভাবে তুমি যদি নষ্টই হয়ে যাও ?

আবার আপনার সেই পুরণো কথা! আমি ত বলেইছি নষ্ট হ'লে ক্ষতি আমার নয়, আপনার।

আমার ক্ষতি ? কেন ?

নষ্ট হ'লে জানবো এ আমার বিধিলিপি, কিন্তু নষ্ট যে করে শাস্তিটা ত তারই পাওনা ?

হাসিয়া বলিলাম, তুমি এখনো ছেলেমানুষ, এখনো কৌমার্য্য তোমার পরিচ্ছন্ন, তাই বুঝতে পারলে না। যদি তোমাকে আবার পথের ধারে ফেলে দিয়ে মুখ মুছে চ'লে যাই তবে কোন্ শক্তি আমার সেই নিষ্ঠুরতাকে বাধা দিতে পারে ? কে আমাকে দেবে শাস্তি ?

মৃণ্ময়ী হাসিয়া আমার হাত ধরিল। বলিল, আপনি বড়লোক, আর বড়লোকরাই অন্যায়কে অন্যায় বলে না। তবু শাস্তি আপনি পাবেন, আমি জানি।

কে দেবে সেই শাস্তি ? হাইকোর্ট, না ভগবান ?

না, আপনি নিজে।

বলিলাম, আমি নিজে ? তুমি কি মনে করো তখন আমি অনুতাপ করবো ? আমাকে তুমি এখনো চেনোনা মৃণ্ময়ী, নিজের কৃত অপরাধ আমার নিজেরই বেশীদিন মনে থাকে না। আর শাস্তি দেব নিজেকে ? পাপকে পাপ ব'লেই আমি মনে করিনে। যে-কোন অন্যায়কেই একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ব'লে মনে করি, আর সেই য়্যাক্সিডেণ্ট ভুলতেও আমার দেরি হয় না।

মৃণ্ময়ী হাসিয়া বলিল, নিজের বাইরের দিকটাই আপনি চেনেন, ভেতরের দিকটা নয়। আপনার দিকে যখন চোখ তুলে চেয়েছিলুম তখন আপনার বয়স তেরো আর আমার প্রায় দশ। বেশ মনে পড়ে শিবের গাজন গাইতুম দু'জনে গলা ধরাধরি ক'রে, কিন্তু মেয়েমানুষের প্রাণ প'ড়ে থাকতো পুরুষের প্রাণের দিকে। মোটাসোটা মেয়ে ছিলুম, আমার গায়ের গন্ধে আপনার নাকি নেশা লাগতো, কিন্তু আমারও যে-চোখ খুলতো সে-খবর আপনি রাখেননি। যাক্‌গে সে কথা। আমি বলি আপনার বাইরের দেখাটা সত্যি, কিন্তু ভেতরের দিকে আপনার চোখটা নেই। এবারে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধ'রে আপনাকে দেখলুম, বৈশাখ থেকে আশ্বিন,—বেশ দেখলুম, বাইরেটাই আপনার অপরাধ করে, নোংরা ঘাঁটে, কিন্তু ভেতরটা নয়। তোষামোদ মনে করবেন না, আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী ব'লেই সত্যি কথা বলি। বাইরেটা আপনার কঠিন বর্ব্বরতা দিয়ে ঢাকা, কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার ছিদ্র আছে সেটা আপনারও চোখে পড়ে না।

বলিলাম, কি রকম ?

মৃণ্ময়ী বলিল, বৃষ্টি ধ'রে গেছে, চলুন, আর একদিন হবে। ওকি, ছেলেমানুষী করবেন না।

সে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই শক্ত করিয়া তাহার হাতখানা ধরিলাম। বলিলাম, বল কি বলছিলে!

মৃণ্ময়ী হাসিমুখে বলিল, টাকা ক'টা দিন্ আমি যাই ? রাত হোলো যে ?

অধীর হইয়া বলিলাম, দেব না টাকা, আগে বলো।

বারে, এ অভ্যেসও বুঝি আপনার আছে ? গড়ের মাঠে অন্ধকারে গাছতলায় এনে মেয়েমানুষের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া ?

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি বলিলাম, তার চেয়েও মন্দ অভ্যেস আমার আছে। আমার এই ধুতি পাঞ্জাবীর নীচে যে-দানবের বাসা তাকে তুমি এখনো চেনোনি।—বলিতে বলিতে অন্ধকারে আমার চোখ জ্বলিতে লাগিল, তাহার শান্ত নরম হাতখানা ধরিয়া আমারই বজ্রমুষ্টি অতিশয় উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল,—পুনরায় বলিলাম, আজকে যাবার আগে তোমাকে ব'লে যেতেই হবে কোথায় আমার সেই ছিদ্র।

অদ্ভুত একটি স্নেহের হাসি মৃণ্ময়ীর প্রসন্নমুখে ফুটিয়া উঠিল। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে কহিল, আচ্ছা বলছি, আগে ছাড়ুন হাতখানা ? আসুন এদিকে, বেড়াতে বেড়াতে বলি।—এই বলিয়া ধীরে ধীরে সে হাতখানা ছাড়াইয়া লইল।

বেড়াইতে বেড়াইতে সে পুনরায় তাহার বাঁ হাতখানি দিয়া আমার ডান হাতের নড়াটা ধরিল। মধুর কণ্ঠে কহিল, সেই তেরো বছরের বালক আপনি, তেমনি জেদী, তেমনি উচ্ছ্বাসভরা। সংসারে কিছুই যখন আপনি পরোয়া করেন না, দস্যুবৃত্তির ভাঙনে আপনি যদি সব লণ্ডভণ্ডই করতে চান্, তবে আমার এই সামান্য কথাটা শুন্‌তে এত আগ্রহ কেন? যার আত্মবিশ্বাসের মূলে সংশয়ের বিষ ঢালা তার মুখে এত বড়াই কিন্তু বেমানান।

আমি এতক্ষণ পরে হাসিলাম। বলিলাম, ওঃ এই তুমি বলতে চাইছিলে, তারই এত ভনিতা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ, আমি বাধিত। আমার আত্মবিশ্বাসের মূলে সংশয়? একবিন্দুও নয়। জানো, আমি কতজনের সর্ব্বনাশ করেছি?

মৃণ্ময়ী বলিল, তারা বোধ হয় পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ।

আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে কহিল, মেয়েরা সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ নেয় না, পুরুষের অপরাধ তারা নিজের চোখের জলে মুছে দেয়। কেন জানেন? সকল পুরুষের জন্মই তাদের গর্ভে।

চলিতে চলিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মৃণ্ময়ী পুনরায় কহিল, বর্ব্বরের লোহার চাকা আমাদের বুকের ওপর দিয়ে সহজেই চ'লে যায়, তার কারণ, পথটা ত দুর্গম নয়, স্নেহে মসৃণ। কিন্তু তাদের দুরন্তপনাকে যদি ক্ষমাই না করতে পারবো তবে মেয়েমানুষ হলুম কেন?

মনে হইল তাহার চেখে জল আসিয়াছে। মাঠের প্রান্তে দেওদারের মাথার উপর কৃষ্ণকায়া রাত্রির কপালে তারাদলের দিকে আমার চোখ পড়িল। যে-কারণে তাহার চোখে এই অশ্রুর আভাস তাহা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নহে, এই পথবাসিনী তরুণী নিজের দুঃখ ও দুর্য্যোগ ভুলিয়া বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির অন্তরের বিচার এই-ভাবেই করিয়া চলিয়াছে। পুরুষের অনাচারের প্রতি তাহার এই অসীম বাৎসল্যের অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিয়া আমি কেবল বিস্মিত হইলাম না, উপরে ওই তারকার জাজ্জল্যমান চক্ষে তৃষ্ণাতুরা নিশীথিনী যেমন করিয়া কাঁপিতেছে, আমিও অমনি করিয়া থরথর করিতে লাগিলাম। প্রবৃত্তির শতপাকে সহস্র গ্রন্থিতে নিজেকে আমি জড়াইয়া রাখিয়াছি, বাসনার অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন যোগাইয়া চলাই আমার নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি, কিন্তু আজ যে-নারী আমাকে অসীম ব্যাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমার বন্ধনগ্রন্থি কাটিতে লাগিল, তাহাকে অভিনন্দন জানাইতে ভরসা পাইলাম না,—চারিদিকে নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্র দেখিয়া ভয় পাইতে লাগিলাম। আমি মনে মনে যেন প্রাণপণে নিজেকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলাম।

ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলিলাম, বাড়ী চলো, মৃণ্ময়ী।

মৃণ্ময়ী শান্তকণ্ঠে কহিল, চলুন।

কিন্তু তাহার যাইবার লক্ষণ না দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া চলিতেই লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া সে কহিল, রোগের একটি বীজাণু শরীরের সমস্ত রক্তকে দূষিত করে, মানেন ত?

বলিলাম, মানি।

মৃণ্ময়ী পুনরায় কহিল, উপমাটা উল্‌টে নিন্। একবিন্দু পুণ্য সমস্ত পাপকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট, এও আপনাকে মানতে হবে।

কিন্তু আমি যে চিরজীবন নোংরামি ক'রে এসেছি, মৃণ্ময়ী?

মৃণ্ময়ী বলিল, কোন ক্ষতি হয়নি।

কী বলছ তুমি?

বলছি, মানুষ সত্যিই অমর, এ আপনি বিশ্বাস করুন। উপরের দিকটা প'চে ~~পঙ্কে~~ ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরে চেয়ে দেখুন অগ্নিঋষি আগুনের কুণ্ডে ধ্যানে ব'সে রয়েছেন, তাঁর মৃত্যু নেই। বারে বারে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে তিনি জ্বালিয়ে দেন সকল বাহ্য অপরাধ আর স্খলন-পতন। ভয় কি? আপনার আত্মবিশ্বাসের মূলে যে-সংশয়ের ছিদ্রপথ, সেই পথেই যে মহৎ চিন্তার আনাগোনা। মানুষ কখনো মরে? সে যে দেবতা! ক্লেদক্লিষ্ট, বীভৎস, লোভলালসা জর্জ্জর, দুষ্টব্যাধিগ্রস্ত,—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সেই দেবাত্মা এক সময় দেব-সেনাপতির মতন বেরিয়ে পড়ে।—মৃণ্ময়ী বলিতে লাগিল, এ আমি দেখেছি, যে-বস্তিতে আমি জন্তুর মতন লুকিয়ে

থাকি, তার চারিদিকে দেখেছি এর নিত্য উদাহরণ। মানুষ নশ্বরও নয়, মানুষ পাপীও নয়।

কেমন যেন ভারাক্রান্ত মনে দুজনে সেদিন মাঠের পথ ছাড়িয়া রাজপথের উপরে আসিয়া পড়িলাম। পথের আলো, গাড়ী-ঘোড়া ও জনসমারোহ দেখিয়া আমি যেন কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইলাম। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

মৃণ্ময়ী এতক্ষণ পরে সহজ কণ্ঠে হাসিল। বলিল, শাস্ত্রে বলেছে, মোহিনী-মায়া, আপনি এতক্ষণ তারই প্রভাবে পড়েছিলেন, না রাজেনবাবু?

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, মোহিনী-মায়া নয়, এতক্ষণ ভূতে ধরেছিল। এ ভূত আমাকে ছাড়াতেই হবে।

ছাড়ালেই পালাবে, ভয় নেই। কিন্তু সাবধান, আর যেন আঁদাড়ে-অন্ধকারে বেরোবেন না, তাহলেই আবার ধরবে।

গাড়ী ভাড়া করিয়া দুজনে চড়িয়া বসিলাম। মৃণ্ময়ী বলিল, যাই বলুন, মেয়েমানুষ আরাম চায়, গাড়ীর গদিতে ব'সে বাঁচলুম। চলুন, এখন আপনার যেদিকে খুশি।

হাসিয়া বলিলাম, যদি পাতালপথে নিয়ে যাই?

বেশ ত, কিন্তু মাঝপথে থামতে দেবো না, একেবারে শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

কেন?

মৃণ্ময়ী বলিল, আমি জানতে চাই আপনার ক্ষুধা দুর্ব্বলের নয়, দানবের।

বলিলাম, মৃণ্ময়ী, জানাতে তোমাকে পারতুম আমি কী। কিন্তু—

সে কহিল, কী আপনি, শুনি?

আমি? নিজের গুণের কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তবু ব'লে রাখি হিংস্র জানোয়ার আর বর্ব্বর দস্যুর একটা সংমিশ্রণ আমার মধ্যে পাই। শুনে ভয় পেয়ো না।

হাসিয়া মৃণ্ময়ী বলিল, ভয় পাবো? জানোয়ার যদি হয় নরসিংহ আর দস্যু রত্নাকর হয় মহাকবি বাল্মীকি, তবে কেমন লাগে?

বলিলাম, তুমি কি আমাকে কিছুতেই ছোট ক'রে দেখতে পারো না? একটু ভালোবাসো আমাকে, নয়?

মৃণ্ময়ী সহসা আড়ষ্ট হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। চলন্ত ফীটনের ভিতরে তাহার মুখের চেহারাটা আমি দেখিতে পাইলাম না। এবং তাহার মনোভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আমিও একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। ইহা বরাবরই দেখি ভালবাসার কথা উঠিলেই সে যেন কেমন হইয়া যায়, তাহার চেহারাটা পাষাণের মতো হইয়া আসে। হয়ত একথা আমার ন্যায় মহাপুরুষের মুখে সে শুনিতে চাহে না।

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, হ্যাঁ, যা বলছিলুম। তোমাকে জানাতে পারতুম আমার সত্য চেহারাটা কিন্তু—

মৃণ্ময়ী নড়িয়া বসিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু কেন?

বলিলাম, বাধা অনেক। ছোটবেলা থেকে তোমাকে জানি, সরোজিনী মাসিমার মেয়ে তুমি, আমরা তোমাদের গ্রামের ঘর জ্বালিয়ে উৎখাত করেছি, বাবার সঙ্গে তোমার স্বর্গতা মায়ের অমন একটা অদ্ভুত প্রণয়ের সম্পর্ক জানতে পারলুম,—বহু কারণে তোমাকে অপমান করতে আমার হাত ওঠেনি। অনেক সময়ে মনে হয়েছে তোমার সম্ভ্রম রক্ষার একটা দায়িত্বও বুঝি আমার নেওয়া উচিৎ।

সে বলিল, সেই দায়িত্বরক্ষার জন্যে বুঝি সিনেমার ফাঁদ পেতেছিলেন?

সিনেমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

উষ্ণকণ্ঠে সে কহিল, সিনেমা কোম্পানী খুলে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে কাদা ঘাঁটলেই বুঝি আমার মানরক্ষা হোতো?

বলিলাম, অবাক করলে তুমি, মৃণ্ময়ী। তোমার মান কিসে থাকে আর কিসে যায় এ ত' আমি বুঝতে পারছিনে?

বুঝবেন একদিন।

কবে?

যেদিন আমি থাকবো না। বলিয়া এক ঝলক হাসিয়া মৃণ্ময়ী চুপ করিয়া গেল।

উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম, থাকবে না? কোথায় যাবে?

চুলোয়। যেখানেই যাই না কেন, আমার গতিবিধি আপনার শুনে কি লাভ?

তোমার সঙ্গে এতক্ষণ বেড়িয়েই বা আমার কী লাভ হোলো, বলো দেখি?

মৃণ্ময়ী বলিল, আমি না থাকলে এতক্ষণ আপনি অবশ্যই কোথাও নোংরা ঘাঁটতে যেতেন, কিম্বা গিয়ে ঢুকতেন ধর্ম্মতলার সেই মদের দোকানটায়, কিম্বা কোনো সিনেমা-থিয়েটারের আস্তাকুঁড়ে।

বলিলাম, বলেছ তুমি ঠিক। তবে ওসব জায়গায় লাভ-লোকসান দুই-ই হোতো, সময়ের বাজে খরচ হোতো না।

বড় বড় চোখে চাহিয়া মৃণ্ময়ী বলিল, কাল থেকে নিশ্চয়ই আপনার অমূল্য সময় সেইখানেই ব্যয় করবেন?

তা একরকম বটেই ত।

মৃণ্ময়ী কহিল, কথায় দ্বিধা কেন?

বলিলাম, মেয়েদের কাছে সত্য কথা বলতে দ্বিধা একটু হয় বৈকি।

সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, একটি কথা আপনাকে বল্‌ব? কিছু মনে করবেন না?

কথাটা কি জাতীয়, শুনি? আমাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া?

না। আপনাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া।

তাহার কথায় রস পাইয়া সাগ্রহে বলিলাম, সতর্ক ক'রে দেওয়া আমাকে? কি বলো ত?

মৃণ্ময়ী বলিল, আপনি যদি আজ থেকে সমস্ত বদ্ অভ্যেসগুলো ত্যাগ করতে পারেন তবেই আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সে ত' আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মৃণ্ময়া।

তা হ'লে আমাদের এই দেখাই শেষ, রাজেনবাবু।

অতি উত্তম কথা। এই গাড়োয়ান—

ক্যা বাবু?

মৃণ্ময়ী উত্তর দিল, কুছ নেই, ঠিক হ্যায়, চলো।

আমি আহত নতমুখে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর সহসা রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম, মৃণ্ময়ী, তোমাদের মতন মেয়ে পথে ঘাটে কিনতে পাওয়া যায়, তা জানো?

মৃণ্ময়ী বলিল, যায় কিনা জানিনে, যদি যায় তবে একটু বেশি দামই লাগবে। কিন্তু যে কৃপণ আপনি।

কৃপণ বটে, তবে রূপবতী মেয়ের সম্পর্কে নয়।

রূপ কি আর আপনি চিনতে পারেন? যে-রুচি আপনার!

আমার রুচির উপর কাহারও কটাক্ষ আমি কোনো-কালেই সহ্য করিতে পারি না। আমার ভিতরটা একবার কেশর ফুলাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। কিন্তু এই সামান্যা নারীকে অসম্মান করিতে আমার মন উঠিল না, সাহসেও কুলাইল না। ভীষণ আক্রোশ অতি কষ্টে দমন করিয়া কেবল শান্তকণ্ঠে বলিলাম, রুচির প্রশ্ন তুলে আর কাজ নেই, কারণ তোমার মাকেও জেনেছি, তোমাকেও দেখছি।

মনে করিয়াছিলাম তাহাকে অপমান করিবার পক্ষে আমার এই জঘন্য কটাক্ষই যথেষ্ট, কিন্তু আমার বুদ্ধিহীন নির্ব্বুদ্ধিতাটা ইহার অন্যদিকটা বিবেচনা করে নাই। সেই দিক হইতেই মৃণ্ময়ী এক কথায় আমাকে একেবারে পথে বসাইয়া দিল। হাসিমুখে বলিয়া উঠিল, আমার মায়ের স্বাভাবিক কাল্‌চার আর রুচি অতি উঁচুদরের ছিল, সেইজন্য তিনি আপনার বাবার মতন একজন রূপবান আর শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আপনার বাবা ছিলেন অসাধারণ পুরুষ। যদিও আপনারা আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, এবং সে আপনার মায়েরই হুকুমে, কিন্তু আমার মা জানতেন আপনার বাবা তাঁর কত আপন, কত আদরের। আর আমার রুচির কথা? আমার রুচিকে অবশ্য আপনি নিন্দে করতে পারেন তবে—

মৃণ্ময়ী উচ্ছল হাসি হাসিয়া তাহার বাকি কথাটুকু প্রকাশ করিল।

মার-খাওয়া কুকুরের মতো শেষ কামড় না দিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। দুর্ব্বলের মুখে যে কথাটা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া হাজির হয় তাহাই প্রকাশ করিলাম, বেশ, তোমাদের রুচি না হয় খুব উন্নত মানলুম। কিন্তু নীতি দুর্নীতির দিক থেকে? সেদিক থেকেও কি তোমরা সীতা-সাবিত্রী?

মৃণ্ময়ী কহিল, ভূতের মুখে রাম নাম! সীতা-সাবিত্রী আমরা না হই, দ্রৌপদীও ত বটে! দেবী হিসেবে দ্রৌপদীই বা কম কিসে? সত্যিকার ভালবাসার ব্যাপারে নীতি-দুর্নীতি বড় কিনা আমি জানিনে, তবে—

তবে কি, বলো?—আমার আগ্রহ বাড়িয়া গেল।

মনের কথা যদি বলি আপনার ভাল লাগবে না।

বলিলাম, মৃণ্ময়ী, মনের কথা যদি কঠোর হয় হোক, কিন্তু সত্য হলেই ভাল লাগবে।

মৃণ্ময়ী বলিল, জানি মেয়েমানুষ ভালোবাসার কাঙাল, এও জানি নিরাশ্রয় মেয়েমানুষের মন স্নেহের আশ্রয় চেয়ে বেড়ায়, কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারটায় খুব একটা বড় মহিমা আছে ব'লে আমি মনে করিনে। জীবনে এর দাম বড় কম।

তোমার কথার অর্থ কি, মৃণ্ময়ী?

গাড়ীর বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া মৃণ্ময়ী বলিল, এই ধরুন, আমার জীবনটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের, কিন্তু যে-দুঃখটা নেই সেই দুঃখকেই ঘরে ডেকে আনবো এমন ভুল কখনো যেন না করি। আমার পথের জীবন যেন পথেই শেষ হয়ে যায়।

আমি সহসা তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম, মৃণ্ময়ী, পৃথিবীতে সকলের বড় সত্য যা, তাকেই তুমি জীবনে অস্বীকার করতে চাও?

আমার হাতখানা ধীরে ধীরে আমারই কোলের উপর ফিরাইয়া দিয়া মৃণ্ময়ী বলিল, আমার জীবন খুব সামান্য, আসন খুব ছোট,—তবু তাকে অস্বীকার আমি করতে চাই। আমার চোখ অন্য দিকে, হয়ত দূরের দিকে, হয়ত আমার প্রাণপদ্ম চেয়ে রয়েছে আকাশের অসীম স্বপ্ন-লোকের দিকে, যেখানে সূর্য্যের ঘন অন্ধ নিগূঢ় আলো-আনন্দের প্লাবন,—হয়ত এমনও হ'তে পারে আমি মানুষের কাছে কিছুই চাইনে, কিছুই আশা করিনে, শুধু যেন যাবার সময় সকলের দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হেসে যেতে পারি।

কেমন একটা ভাবাবেগ হইল। প্রিয়জনের সহিত চিরবিচ্ছেদের সময় যেমন একটা উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতা দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠে, আমি যেন তেমনি করিয়াই মৃণ্ময়ীর দিকে হাত বাড়াইতেছিলাম, কিন্তু নিজের হাতখানাকেই সংযত করিলাম। কথা বলিতে পারিলাম না।

মৃণ্ময়ী বলিল, ভালবাসার সঙ্গে জড়ানো থাকে মস্ত বড় লোভ, মস্ত স্বার্থের কামনা, তাই তার সঙ্গে থাকে দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা, অসম্মান। নির্দ্দয় নিন্দায় আর কুৎসিত ক্লেদে প্রাণের ক্ষেত্র ভ'রে ওঠে, তারপর একদিন অশ্রুর বন্যায় তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়। আমার মা আর আপনার বাবার জীবন এর চরম উদাহরণ, আজ তাঁদের আত্মার শান্তি হয়েছে বোধ হয়। রাজেনবাবু, আমি আবার সেই ভুল করবো? যে-জন্তু ঘুমিয়ে আছে তাকে খুঁচিয়ে জাগাবো? আহার দেবো কোত্থেকে?

বলিলাম, মৃণ্ময়ী, সৎশিক্ষা আর কাল্‌চার আমার নেই কিন্তু পণ্ডিতদের বিচারে বোধ হয় তোমার কথায় একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। তোমাকে নীচে নেমে যেতে আমি বলিনে, ভালোবাসার জন্যে দুঃখ পাও তাও আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু হয়ত সব ভালোবাসার পরিণতি দুঃখে নয়, দুঃখের ভিতর দিয়ে অসীম আনন্দলোকের দিকে।

এমন কথা আমার নোংরা মুখ দিয়া বাহির হইবে ইহা আমিও ভাবি নাই। আমার সকল দুষ্কৃতির মূলে সংশয়ের ছিদ্রপথ-আছে, মৃণ্ময়ীর এই কথাটা আমার মনে পড়িল। কিন্তু আমার কথাটা শুনিয়া মৃণ্ময়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার একান্ত চাহনি দেখিয়া আমি লজ্জায় মাথা নত করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি তাহারই চিন্তাধারার ব্যর্থ অনুকরণ করিয়াছি।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া মৃণ্ময়ী কথা কহিল। বলিল, কি জানি, হয়ত আমি আজো চিনিনি নিজেকে। কিন্তু আমার ভাইরা, আমার বোনরা,—যাদের বুকের মধ্যে পরাধীনতার অসীম যন্ত্রণা, যাদের হৃদয়ে বিশাল কল্পনা, যাদের জীবনের বিরাট্‌ আদর্শ হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত সংহত জাতীয়তার মহান্‌ স্বপ্ন, আমি যেন তাদের ভালোবেসে যেতে পারি। আমার চিরদুঃখিনী দেশজননী, আমার সন্তানদল—যারা দেশের দুর্গম অন্ধকারে উপবাসে শীর্ণ, যারা ব্যর্থপ্রাণ, ক্ষয়ক্ষীণ—আমি যেন এদের সবার কিছু, উপকার ক'রে যেতে পারি। যদি নাও পারি কিছু, তবে তাদের জন্যে আমার চোখের জলের অভাব কোনোদিন না হয়।

আমাদের গাড়ী চওড়া রাস্তা ছাড়িয়া সরু পথে হাটবাজারের ভিড়ের ভিতর দিয়া প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই নোংরা বস্তির কাছে মৃণ্ময়ীকে নামাইয়া দিতে হইবে এই কথা এতক্ষণ পরে মনে পড়িতেই আমি আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। তাহার এই হতশ্রী জীবনযাত্রাটা যেন আমারই আত্মসম্মানবোধকে বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সহিত আমার সম্পর্কটা এমনই অসম্ভব যে, নিরুপায় হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

কাছাকাছি আসিতেই মৃণ্ময়ী হাসিয়া বলিল, আপনার সিনেমা কোম্পানীতে চাক্‌রি নিতে গিয়েছিলুম একথা মনেই ছিল না,—আমাকে গিয়ে এখুনি রান্না ক'রে দিতে হবে, তা জানেন?—এই বলিয়া সে গায়ের কাপড় সংযত করিল, কাণের দুল্‌ খুলিল, মুখের রুজ-পাউডার বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল, পরে বলিল, চাক্‌রীর লোভে কী সঙই সেজে'ছিলুম!

বলিলাম, চাক্‌রির লোভ ত' তোমার ছিলনা, আমাকে সৎপথে ফেরাবার আগ্রহ ছিল।

ফেরাতে পারলুম কই,—এই গাড়োয়ান, দাঁড়াও।

গাড়ী থামিতেই তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ তুলিয়া বলিলাম, তোমার টাকা নিয়ে যাও, মৃণ্ময়ী।

মৃণ্ময়ী নামিয়া গিয়া কহিল, টাকা? টাকা আমার কী হবে?

বলিলাম, সে কি, তোমার ভাই-বোনরা, সন্তানরা—

গাড়ীর ভিতরে মুখ আনিয়া সে হাসিমুখে বলিল, আপনিও ত' তাদের দেশের লোক, ও-টাকা আপনাকেই দান করলুম। তা ছাড়া টাকা যে আপনার বড় প্রিয়।

আহত হইয়া বলিলাম, কিন্তু তোমার টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই, মৃণ্ময়ী।

মৃণ্ময়ী বলিল, বেশ ত' লুঠ-করা টাকা ডাকাতিতেই খরচ করবেন। আপনিই ত' বলছিলেন টাকা খরচ করলে আমার মতন মেয়ে পথেঘাটে কিনতে পাওয়া যায়। ওই টাকায় তাদেরই কিনবেন।

আমি অপমানিত মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, মৃণ্ময়ী মুখ ফিরাইয়া সেই ইতর বস্তিটার অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার গাড়ী ফিরিয়া চলিল।

— ক্রমশঃ

মেঘদূত

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

বরষার নবঘন মেঘরাশি যখন আপনার নয়নাভিরাম রূপ নিয়ে আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে—তখন আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার সহিত মহাকবি কালিদাস বর্ণিত "কশ্চিৎ যক্ষে"র মনের ভাব এক। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—সকলেই এমনি দিনেতে আপনার প্রিয়জনকে নিকটে পাবার জন্যে কামনা করে থাকে। এ রামগিরি আশ্রমবাসী বিরহী যক্ষ-ই হোক বা আধুনিক যুগের যে কোন মানুষই হোক, দু'জনেই একই মনোভাবের অধিকারী। তাই কবির এই অমর কাব্যটী এমন একটী ভাবের আশ্রয়ে, রসের উপাদানে প্রস্তুত হয়েছে যে, তা যুগযুগান্তরের ব্যবধান পার হয়ে আমাদের অন্তরকে রসাভিসিক্ত করতে পেরেছে।

বরষার নয়নস্নিগ্ধকর মেঘরাশি দেখে সুখভরে কেতকী ফুলদল ফুটে ওঠে। তাকে দেখে যে সুখী—সেও স্থির থাকতে পারে না, আপন প্রিয়জনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকবার জন্যে সেও ব্যাকুল! তাই এমনি দিনে একদিন বিরহ-বিধুর যক্ষ পর্ব্বতগাত্রে যখন একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলে, তখন সে—মেঘ যে জড় পদার্থ—সে-কথা ভুলে গেল। তাকে সে সমব্যথী বলে মনে ক'রে, পর্ব্বতজাত একটি নবমল্লিকা তুলে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে সাদর সম্ভাষণ জানালে। যক্ষ বললে—মেঘ, তুমি স্বেচ্ছারূপী! তুমিই আমার যক্ষপুরীর সুদূর অলকায় বার্ত্তা বহন করে নিয়ে যাবার একমাত্র অধিকারী! কবির এ কল্পনা কত সুন্দর! কবি মেঘের গতিপথকে কত বিচিত্ররূপে চিত্রিত করে আমাদের সমক্ষে এক একটী উপস্থিত করেছেন। যক্ষ মেঘকে সম্বোধন ক'রে বলছে, হে মেঘ! তুমি আকাশগাত্রে আত্মপ্রকাশ করলে জনপদ-বধূরা মুখের চূর্ণ কেশরাশি সরিয়ে তোমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে। সে ভাববে, তার প্রিয়ের সাথে তার দেখা হবে। কেবল আমিই একমাত্র হতভাগ্য! পরাধীন! আমি তোমাকে দেখেও প্রিয়তমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ ক'রে বেঁচে আছি। তোমার পথে কোন বাধ পাবে না। তুমি চলে যাও অলকায়, বিরহিণী প্রিয়া আমার বিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হয়ে, দিন গুণছে। তুমি কি জান না—

> "রমণী-হিয়া যেন কোমল ফুল হেন,
> বিরহ তাপে সদা ঝরিতে চায়,
> আশা যে বোঁটা সম ধরিয়া রাখে তারে—
> বিরহী হিয়া বাঁচে শুধু আশায়।"

বিরহী যক্ষ মেঘকে দেখে তার এতখানি আপনার জন বলে মনে করছে যে, সে মেঘকে বন্ধুভাবে সম্বোধন করছে, এবং সেই সুদূর অলকাপুরী যাবার পথশ্রম যে মেঘের কম হবে না, সে-কথা ভেবে সে একটু সহানুভূতির স্পর্শ দিয়ে বলছে—অলকাপুরী বহুদূর, পথে যেতে যেতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন পর্ব্বতের মাথার উপর বসে একটু বিশ্রাম নিও। আর পথে যেতে যেতে বর্ষণ করে যদি ক্ষীণ হয়ে পড়ো তো আবার কোন স্রোতের জল পান করে আত্মরক্ষা করো। তারপর মেঘের যাত্রা আরম্ভ হয়। যক্ষ বলে—হে মেঘ, তুমি শস্যক্ষেত্রে প্রাণ ঢেলে দাও তাইতো জনপদ-বধূরা তোমার প্রতি সরল, বিলাসহীন, দৃষ্টি হেনে থাকে। তুমি সদ্য-কর্ষণ-সুরভিত মালভূমির উপর দিয়ে উত্তর দিকে চলে যেও। তোমার জলধারায় আম্রকূট গিরির দাবানল নিভে যাবে। সেই কারণে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সে তোমাকে তার মাথার উপর রাখবে। তুমি সেখানে একটু বিশ্রাম নিও। অধম হ'লেও যে উপকারী তাকে সে স্থান দিতে চায়। পর্ব্বতের বনে আম পেকে সোণালী রঙে চারিদিক সুন্দর করে তুলবে, তুমি তখন তার শিরে চিকণ কাল বেণীর ন্যায় শোভা পাবে। আর স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করে অমর দম্পতি তখন দেখবে, শিরে কাল আর সোণালী অঙ্গসৌষ্ঠবে পর্ব্বত যেন ধরণীর স্তনের ন্যায় শোভিত রয়েছে। তুমি আমার 'কারণে দ্রুত যেতে চাইবে কিন্তু তা তুমি পারবে না। পর্ব্বত নানা ফুলের

সুবাস ছেড়ে দিয়ে তোমার বিলম্ব করে দেবে। তোমার আগমনে যত বন উপবনে শ্বেতকেয়া কাঁটার বন্ধন মুক্ত হয়ে ফুটে উঠবে, যত পাখী গ্রামের চৈত্যেতে আপনাপন নীড় বাঁধবে, জামের বনে জাম পেকে উঠবে। হংসের দল আনন্দে মানস সরোবরের দিকে যাবার জন্য পক্ষ বিস্তার করবে।...এমনি কত ছবিই কবি পূর্ব্ব মেঘের এক একটী শ্লোকের মধ্যে এঁকে গেছেন। তারপর উত্তর মেঘে যক্ষপ্রিয়ার যে অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা করেছেন তা বিশ্বের সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

উত্তর মেঘের গোড়ার দিকে কবি অলকার লীলাচপল নারীবৃন্দের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা সত্যই অনবদ্য। সেখানকার বধূদের হস্তে শোভা পেতো লীলা কমল, অলকে নব ফোটা কুন্দফুল বাঁধা থাকতো, আর লোধ্রের রেণুমাখা সুন্দর ধবল তাঁদের মুখ, যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব ভাষায় লিখেছেন—

"কুরবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলা-কমল রইত হাতে কী জানি কোন কাজে।
অলক সাজ্‌ত কুন্দফুলে
শিরীষ পর্‌ত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখ্‌ত মুখে বালা।"

এই অলকাপুরীর যক্ষদের জীবন এতো আনন্দে ভরপূর যে, তাদের চোখের জল যখন পড়ে, তা শুধু আনন্দে পড়ে। তারা সর্ব্বদা মদন দেবতার শরে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের কোন বয়স নেই, তাঁরা সর্ব্বদা যৌবনের জোয়ারে চঞ্চল হয়ে চলেছে। আর সেখানকার লীলা-চপল পুরনারীরা মুঠি মুঠি রত্ন নিয়ে নদীর তীরে বালির উপর ফেলে দিচ্ছে আর সেই হারানো রত্ন বালুকারাশির মধ্য থেকে পুনরায় খুঁজে আনা হচ্ছে। এই হচ্ছে সেখান-কার নারীদের খেলা। এই প্রাণচপল পটভূমিকা থেকে কবি তাঁর মেঘকে সরিয়ে এনে এবার তাঁর বিরহিণী প্রিয়ার দ্বার পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। এখানে এসে হঠাৎ আমাদের কাব্যলোকের বাতাস থেমে গেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি বিরহে মুহ্যমান। যক্ষ মেঘকে তার বিরহিণী প্রিয়ার সহিত পরিচয় করে দিচ্ছে—তার মুখে আর কোন কথা নাই। তুমি জানিও যে আমার আর একটী প্রাণের সমান। আমার এ সুদূর নির্ব্বাসনের পর হতে সে চক্র-বাকীর মত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। গভীর চিন্তায় তার দিনগুলি বড়ই গুরুভার—আর কাটতে চায় না। যদিও সে অতই বিরহে কাতরা তবুও রূপের তার তুলনা নেই। শিশিরমথিত একটী পদ্মও তার কাছে রূপের গর্ব্ব করতে পারে না। সে তরুণী, কৃশ তনু তার। দাঁতগুলি মুক্তার সারের ন্যায়। কটিদেশ অতি ক্ষীণ, নয়নযুগল যেন চকিত হরিণীর ন্যায়, গভীর নাভি, দেহলতা স্তনভারে কিছু নত, বিধাতার গড়া প্রথম যুবতী সে। কিন্তু তার কি শান্তি আছে? দিবারাত্র যক্ষের কথা চিন্তা করে অবিরল অশ্রুধারায় তার নয়ন দু'টী ফুলে উঠেছে। তার ওষ্ঠ দুটী নিশ্বাসের প্রখর তাপ লেগে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। তার কুন্তল বিলুণ্ঠিত হয়ে মুখের উজ্জ্বলশ্রীকে ম্লান করে দিয়েছে। হয়তো সে আমার শুভকামনায় দেবার্চ্চনা ক'রে দিন কাটাচ্ছে অথবা মানসলোকে আমার চিত্র অঙ্কিত ক'রে তার বিরহী আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করছে। সে প্রতিদিন মলিন বসন পরিধান ক'রে থাকে। আমার তরে বিরহের গীত রচনা ক'রে আপনার বীণাটী নিয়ে একান্ত মনে গান গায়—কতবার অশ্রুধারায় বীণার তার-গুলিও আর্দ্র হয়ে ওঠে, তবুও সে তা মুছে ফেলে পুনরায় তারি মধ্যে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তোলবার চেষ্টা করে। সে প্রতিদিন মানসলোকে আমার মূর্ত্তি রচনা ক'রে ভাঙে গড়ে। প্রতিদিন দ্বারের পার্শ্বে বিরহ অবসানে একটী ক'রে কুসুম তুলে রেখে দেয়। পরে একান্তে বসে বিগত বিরহের দিনগুলির মালা গাঁথে। রুক্ষ স্নানে তার অলক সৌষ্ঠব-হীন, তা আলুথালুভাবে গণ্ডের উপর ঝুলে পড়েছে। তার চূর্ণ অলক দুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস নেমে আস্‌ছে। সে নিদ্রার জন্য বিশেষ কামনা করে,—কারণ তা হলে সে স্বপ্নেও হয়তো আমাকে দেখতে পারে।...

এই হ'ল যক্ষের বিরহিণীর রূপ। বিরহী আত্মার এই অপূর্ব্ব চিত্র আর কোন সাহিত্যে বিরল। সমস্ত জিনিষটা যদিও কবির নিছক কল্পনা তা হ'লেও চিত্রগুলি

বাস্তবের মত রোমাঞ্চকর। নির্ব্বাসিত যক্ষ সত্যই অসহায় এবং আমাদের সহানুভূতির একমাত্র অধিকারী। তার প্রাণপ্রিয়ার নিকট মিলনের জন্যে যখন সে উন্মাদপ্রায় তখন পর্ব্বতগাত্রের মেঘখণ্ড দেখে তার মনে হয়েছিল বুঝি সেও তার একজন সমব্যথী এবং তার কৃপায় সে তার প্রিয়ার নিকট তার অন্তরের অস্ফুট, অব্যক্ত বাণীর পশরা উজাড় ক'রে দিতে পারবে। এরূপ চিন্তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। এটা জীবধর্ম্ম। দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, মানুষ তার চারিপাশে যা দেখে তার মধ্যে আপনার জন্য সহানুভূতি অন্বেষণ করে। তার কবির এই অমর কাব্যটাকে একটা Pathetic fallacy বলে মনে করাও যেতে পারে। যক্ষ মেঘকে কেবলই আপনার সমব্যথী বলে মনে করে ক্ষান্ত হয় নাই। সে তাকে বন্ধু বলেও গ্রহণ করেছে। সে তার অভাব অভিযোগ, সুবিধা অসুবিধা সকল দিকেই দৃক্‌পাত করতে কার্পণ্য করে নাই। পথে গমনকালে মেঘ যদি শ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা বর্ষণ ক'রে ক্ষীণ তনুতে পরিণত হয় তাহ'লে তার কি করা কর্ত্তব্য তা সে তাকে অগ্রজের ন্যায় উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মেঘ আর জড় পদার্থ নয়। সে যেন জীবন্ত একজন কেউ।

কবির অমর মেঘদূত কাব্যের সহিত আমাদের অন্তরের এক অলৌকিক মিলনের অবকাশ আছে। কেবল পাত্রপাত্রীর সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনার করুণ কাহিনীতে কাব্যের আকাশ বর্ণহীন হয় নাই। এখানে পাখী গান গেয়েছে, কুসুমরাশি ফুটে উঠেছে, নদী কুলকুল ধারায় ছুটে চলেছে, মেঘের কোলে বিদ্যুতে স্ফুরণ জেগেছে, বনের শীর্ষে শীর্ষে কাঁপন লেগেছে। পাত্রপাত্রীর সুখ দুঃখের সহিত সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে কবি যে ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন তা সত্যই সুন্দর। শ্লোকগুলি এমন সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে যে, পাঠকের মন পূর্ব্ব মেঘ হ'তে উত্তর মেঘের দিকে আপনা আপনিই মেঘের ন্যায় ভেসে চলে। মেঘ যেমন আপনার গমন-পথে দেশদেশান্তর, নদনদী, বন উপবন, পার হয়ে যেতে যেতে শেষে হঠাৎ এক বিরাট্ পর্ব্বতের সম্মুখে এসে আট্‌কা'পড়ে গিয়ে আপনার বাষ্পকণাগুলিকে জলকণায় পরিণত ক'রে দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ফেলে সেইরূপ পাঠকের মন পূর্ব্ব মেঘের শ্লোকের পর শ্লোক পার হতে হতে হঠাৎ এক সময় সম্মুখে উত্তর মেঘের বিরাট্ পর্ব্বতের বুকের মধ্যে নিজেকে আটকে ফেলে আপনার সমস্ত সত্তা ভুলে যায়। তখন কেবল তার দুনয়ন দিয়া অশ্রুর ধারা নেমে আসে।

ভজন

(মীরাবাঈ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি.এল্. বাণীকণ্ঠ

হে প্রিয় দরশন দাও
তৃষ্ণা-জরজর কাতর জীবন
চাতকের তিয়াষা মিটাও।
জল বিনা কমল যথা
চন্দ্র বিনা রজনী
তেম্‌নি আমি ওগো সজনী!

আকুলি-ব্যাকুলি ফিরি দিনরাতি
তোমা বিনা ওগো সাথী
নয়ানে নিদ্ নাই বয়ানে হাসি নাই
বচন মুখে নাহি সরে তাও।
হে প্রিয় দরশনা দাও॥

তোমারি আমি যে গো তোমারি
তুমি প্রিয় যুগে যুগে আমারি।
কেন ব্যথা দাও অন্তরযামী
তোমা বিনা সব আঁধার যে স্বামী
মীরা তব দাসী জনম জনমের
পায়ে ধরি প্রিয়তম বাঁচাও॥

পরিবর্ত্তন

শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ

প্রদ্যোত ছেলে হিসাবে লোভনীয়। প্রফুল্লবাবু পুত্রের জন্যে যা জমিয়ে গেছেন, তা দিয়ে তিন পুরুষকে অধঃপাতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রদ্যোত নিজে বাঙ্‌লা ভাষার অধ্যাপক। মাসের নির্দ্ধারিত মাইনে ছাড়াও বই বিক্রী ক'রে তার আয় আছে যথেষ্ট।

বাঙ্‌লা দেশে প্রদ্যোতের ন্যায় ছেলে পড়ে থাক্‌বার কথা নয়! কত খোঁজাখুঁজিই না তার বিয়েতে কর্‌তে হয়েছিল! কোথায় এলাহাবাদ, আর কোথায় কলকাতা —এই দুই সহরের মধ্যে কোন স্থান বাদ পড়েনি, যেখানে প্রদ্যোতের জন্যে মেয়ে দেখ্‌তে যাওয়া হয়নি। তবুও তার মনের মতন একটা পাত্রীও পাওয়া গেল না।

সবই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল। এলাহাবাদের আইভি, ভাগলপুরের সুমিত্রা, পাটনার মণিকা, ডেরী-অন্‌শোণের ডলি—এদেরই যখন তার মনে ধর্‌ল না, তখন হতাশ না হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি?

প্রদ্যোতের বিয়ের কথাবার্ত্তা একরকম প্রায় চাপাই পড়েছিল। সহসা সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল, যখন শুন্‌লে সে বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছে রাজীবপুরের নির্ম্মলবাবুর মেয়ে শিপ্রাকে: যে শিপ্রা ম্যাট্রিক শেষ করার অবকাশ পায়নি সংসারের চাপে। কলকাতার সভ্যতার ধার দিয়েও যে কোনদিন চল্‌তে শেখেনি নিজেদের অস্বচ্ছলতার দরুণ। মেয়ে হিসাবে সে অতি সাধারণ। এগার হাত শাড়ীও কখনো পরেনি; হাই হিলের শব্দ ক'রে একবারও মেট্রোয় ঢোকেনি। তবুও প্রদ্যোতের তাকে পছন্দ হ'ল।

তার খুড়ীমা বল্‌লেন: 'বালীগঞ্জের সেই মেয়েটি তো দেখ্‌তে কোন অংশে শিপ্রার চেয়ে নিন্দনীয় ছিল না। বরং বাপের সঙ্গে জাপান ঘুরে এসেছে।'

তার ভগ্নীপতি বল্‌লে: 'হাজারিবাগের মেয়েটি আর কিছু না হোক্‌ কালচারাল সোসাইটিতে চিরদিন কাটিয়েছে।'

মা বল্‌লেন: 'শ্যামবাজরের মেয়েটিকে আমার ঘরে নিয়ে আসবার খুব ইচ্ছে ছিল।'

বড় বোন বল্‌লে: 'বেথুন থেকে রমা অনার্স নিয়ে পাশ করেছে, সে-ই বা নিতান্ত কি খারাপ দেখ্‌তে?'

প্রদ্যোতের মত: বাঙলা দেশে শিপ্রার চেয়ে সুশ্রী মেয়ে তার চোখে পড়েনি। তার চোখ দুটো হরিণীর ন্যায় নীলাভ, অলকগুচ্ছ বর্ষার মেঘের ন্যায় ঘন, দাঁতের সারি ডালিমদানার ন্যায় ঝক্‌ঝকে, গায়ের রঙ্‌ ফোটা বেলফুলের ন্যায় শুভ্র।

পাড়ার মুখুজ্জে মশাই নির্ম্মলবাবুকে শুনিয়ে বল্‌লেন: 'অমন কাজটি করো না ভায়া! বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা।'

বুড় কবিরাজ বল্‌লেন: 'গেরস্থ ঘরে বিয়ে দাও নির্ম্মল, মেয়ে তাতে সুখী হবে।'

অফিসের বন্ধু বল্‌লেন: 'Superiority Complex হচ্ছে একটা ভয়ানক জিনিষ ভাই।'

বোসগিন্নী বল্‌লেন: 'ও বাড়ীতে বিয়ে দিলে কি জাত ধম্ম থাকবে?'

নির্ম্মলের মত: 'প্রদ্যোতের ন্যায় ছেলে সহজে মেলে না। কপালে যদি মেয়ের সুখ লেখা থাকে, কেউ ঘোচাতে পার্‌বে না।'

আরও আশ্চর্য্য!

যে মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে বলে প্রদ্যোত সকলকে অবজ্ঞা কর্‌লে, তাকে পেয়েও সে সুখী হ'তে পার্‌লে না একটুও। বিয়ের আগে যে সকল আকাশ-কুসুম সে সৃষ্টি করেছিল, সবগুলোই একে একে ভেঙে গেল শিপ্রা যতই তার ঘনিষ্ঠতায় আস্‌তে লাগ্‌ল। তার মধ্যে সে না পেলে একটুও আধুনিকতার ছাপ, না পেলে কোন বিশিষ্টতার চিহ্ন। সেই মামুলি দিনের পুনরভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার ব্যাজার ধরে গেছে।

মনের মধ্যে দারুণ অশান্তি পুষে প্রদ্যোত উপন্যাসের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। নিজেকে সব চিন্তা থেকে পৃথক্ ক'রে রেখে দেবার ঐ একমাত্র উপায়ই তার জানা আছে। সে অশিক্ষিত নয়—স্ত্রীকে অবহেলা করতে পারবে না কোনদিন। হাজার গরমিল হ'লেও তাকে নিয়েই তার চলতে হবে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত। অবজ্ঞা দেখিয়ে তাকে ব্যথিত করা, তার মনের কোণে দুঃখের অস্পষ্ট একটা আঁচড় টেনে দেওয়া তার দ্বারা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

সে পাতা উল্টে গিয়ে ভাবতে বসল, এমনিধারা সঙ্কোচের বাঁধ দিয়ে প্রত্যেকেরই পরিধি একদিন পরিমিত থাকে। কালের কুটিল প্রভাবে সবই তচনচ হয়ে যাবে। সে ও কি প্রথম প্রথম ডলিরিয়োর সামনে স্পষ্ট করে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিল ?…

রাত্রির গাঢ়ত্ব নিশুতি হয়ে এল।

তার চোখের পাতায় তন্দ্রার জড়িমা ঘনিয়ে এল। বইখানা টেবিলের ওপর মুড়ে রেখে সে একটা সিগারেট জ্বালালে। তবু যদি এর রুক্ষ গন্ধে ঘুমকে সে কিছুক্ষণের জন্যে নির্ব্বাসন দিতে পারে। অলসভাবে মাঝে মাঝে সে এক মুখ ধোঁওয়া ছাড়ছে আর অনর্থক শিপ্রার কথা ভাবছে।...সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখনো পর্য্যন্ত তার না-আসার কোন অসতর্ক সম্ভাবনার ইঙ্গিত এসে পৌঁছল না।

কুমারী মনের মৃত্যুকে সরলভাবে আলিঙ্গন করতে শিপ্রার দস্তুরমত মায়া হবে। তার চিরাগত প্রবৃত্তিকে প্রদ্যোত সহজে কেড়ে নিতে পারবে না। অষ্টাদশী জীবনকে সে একটা বছরের ত্রিসীমায় ঢেকে ফেলতে পারবে না। কিন্তু কেন পারবে না ? কেন ? কেন ? কত মেয়েকে সে দেখেছে সীমান্তের সূক্ষ্ম আলপনার পর একেবারে বদলে যেতে। শিপ্রার জীবনের গতি সে ফেরাবেই যেমন ক'রে পারে। অনাগত সুখের মুখ চেয়ে সে নির্ব্বিবাদে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে যদি ভবিষ্যৎ তার শত্রুতা না ক'রে : যদি কোনদিন দুর্ব্বলতা এসে তার মনুষ্যত্বকে আক্রমণ ক'রে না বসে। সে এড়িয়ে দিলে যাবতীয় চিন্তা। নিজেকেও।

শিপ্রা সুজাতাদের বাড়ী গিয়েছিল। বান্ধবীর অনুরোধ উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। অবিরাম চলার পথে যদি তার সঙ্গে মেলবার সুযোগ আর না আসে, ঐ একটি মাত্র অনুতাপ তাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দেবে ; তাকে অকারণে কাঁদাবে। এসে যখন সে শুনলে স্বামী এসেছে, আনন্দের তার সীমা রইল না। পোষাক না ছেড়েই সে ঘরে ঢুকল। কিন্তু ঘরে ঢুকে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেল। ঘর উজ্জ্বলতর ক'রে দিয়ে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

স্বামীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে সে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলে, 'ঘুমুলে নাকি !'

প্রদ্যোত জেগেই ছিল। উঠে বসল। পাশের টেবিল থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'রতিকান্তবাবু বুঝি কালই মুর্শিদাবাদ চলে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই সুজাতার অনুরোধ ঠেলে দিতে পারলুম না।'

শিপ্রাকে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বললে, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ! বসো।'

ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা মুখখানি আড়াল না ক'রে শিপ্রা কোণাকুণি বসল।

প্রদ্যোত সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি শিপ্রা।'

শিপ্রা এ কথার কোন জবাব দিতে পারলে না।

নিজের স্বাধীন সত্তা বলতে তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শ্বশুরবাড়ীর বিরাট সমারোহের মধ্যে একটা দিনও সে স্বচ্ছ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারেনি। নিয়তই বাধা এসে তাকে উপদ্রব ক'রে গেছে। সারাদিন কাঁচের পুতুলের ন্যায় চুপ ক'রে বসে থাকা তার রুচি-বিরুদ্ধ। হয়তো একদিন তাকে আরও অবসরের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, কিন্তু এখন সে কোনমতেই নিজের জীবনকে অভিব্যাপ্ত আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারছে না। বিয়ের আগে সে যেমন মনে মনে খুশী হয়েছিল স্বামীর পরিচয়ে, শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তির কাহিনী শুনে : বিয়ের পর ওরাই তার সুতীব্র স্বপ্নকে ভেঙে

দিয়ে গেল। এক-একদিন সে নিভৃতে কেঁদেছে শুধু নিজের অন্তর্য্যামীকে অন্তরতম বাসনা ব্যক্ত ক'রে'। ভাবতে ভাবতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল।

প্রদ্যোত বললে, 'ঠাট্টাও বোঝ না! যাবার কথা বলেছি বলে বুঝি বিশ্বাস কর্‌লে নিয়ে যেতেই এসেছি।'

হাল্‌কা হাসি দিয়ে প্রদ্যোত নিজের কথা ভোলবার চেষ্টা কর্‌লে।

শিপ্রা আহ্লাদে ফেটে পড়্‌ল। মার ফিক ব্যথাটা কেমন আছে, তা পর্য্যন্ত সে খোঁজ নিতে ভুলে গেল। আলো নিভিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়্‌ল।

আকাশে টুক্‌রো টুক্‌রো তারাগুলো মিট্‌ মিট্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। স্তূপাকার অন্ধকার তাদের চারিপাশে জড়িয়ে রয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে অনেকখানি আকাশের দেহ দেখা যাচ্ছে। প্রদ্যোতের সিগারেটের স্বল্প আলোয় দেখা গেল শিপ্রা সেইদিকে তাকিয়ে আছে মুগ্ধ নয়নে।

'তুমি রাগ কর্‌লে না তো!' শিপ্রা অতি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'না, না। তুমি ঘুমিয়ে পড়। তোমাকে যেতে হবে না।'

প্রদ্যোৎ বাকী সিগারেট্‌টা জানালার বাহিরে ফেলে দিয়ে পাশ ফিরে শু'ল।

সারারাত্রি শিপ্রার ঘুম হ'ল না। কেবলই সে ভেবেছে। বেহায়াপণা দেখিয়ে রাস্তা চলায় কতখানি সভ্যতা লুকিয়ে আছে, এ নিয়ে কোনদিন সে গবেষণা করেনি। সিনেমায় বন্ধু-বান্ধবের পাশে নিজের স্ত্রীকে বসিয়ে কতখানি প্রফুল্ল হওয়া যায়, এ তার কল্পনার বাহিরে। নিজে দোকানে দোকানে ঘুরে এটা-সেটা কিনে কতখানি লাভবান্ হওয়া যায়, তার খোঁজ সে রাখে না। তবুও স্বামীর মন যুগিয়ে তাকে চল্‌তে হবে। সেবার টি-পার্টিতে যোগদান করেনি বলে স্বামীর কত অর্থহীন অনুযোগ তাকে শুন্‌তে হয়েছে। সবই তার অন্তরে সমাবেশ হয়ে আছে, যেগুলো দিনের ক্লান্ততায় হারাবে না কোনদিন। সে মুখ বুঁজে হজম ক'রে এসেছে এতদিন। এখন দেখ্‌ছে, না কর্‌লেই ছিল ভাল। এতখানি মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'তে পার্‌ত না। সুজাতা এই কারণেই স্বামীর এত প্রিয়। স্বামী তার গান ভালবাসে। সে দিনরাত তাকে গানের সুরের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দেয়। লোক-লজ্জা দেখ্‌তে গেলে নারীর ঘর করা চলে না। সে-ও তাই কর্‌বে। সে-ও নিজের ভবিষ্যৎ প্রচ্ছদ-পটে রঙীন স্বপ্নজাল বুনে যাবে একটির পর একটি। কোনদিকে তাকাবে না, কারুকে গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌বে না। এই হবে তার কালকের জীবনের চরম পাওয়ার কঠিন সাধনা।

ভোর বেলার দিকে সে নিদ্রিত স্বামীকে জাগিয়ে তুলে বল্‌লে, 'আমি যাব।'

প্রদ্যোত স্বপ্ন দেখ্‌লে না তো?

স্বামীকে বিস্ময়াভিভূত ক'রে দিয়ে শিপ্রা অদৃশ্য হয়ে গেল।

নতুন একটা সিগারেট্ জ্বালিয়ে নিয়ে প্রদ্যোত পুনরায় ভাবতে বস্‌ল: এতদিনে শিপ্রার অবসাদ চূরমার হয়ে গেল। যে আদিম একাগ্রতা তার অন্তরে এতদিন পুঞ্জিত হয়ে জমে ছিল, কিসে তার গ্রন্থি মোচন হ'ল? কে তার কাণে কাণে গোপনে এ সব কথা বলে গেল? তার পুরাতন মনের অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে নবজন্ম সে লাভ কর্‌লে তা যেন আলোর ঝর্ণায় রঙীন্ হয়ে ওঠে—মনে মনে এইটুকু সে কামনা কর্‌লে। মনের মধ্যে একটা সতেজতার ঢেউ খেলে গেল তার। আজকের দিনটিকে স্মরণীয় ক'রে রেখে দিতে তার ইচ্ছে হ'ল জীবনের খাতায়।

রোদ ফুটে বেরুল। গ্রামের মধ্যে বেশ একটা চঞ্চলতার সাড়া পড়ে গেল। কলরবে ভরে' উঠ্‌ল বাতাস পর্য্যন্ত। প্রদ্যোত কোনদিন এর কিছুই উপভোগ কর্‌তে পারেনি, আজ এই সুন্দর প্রভাতে সব তুচ্ছতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে তার অন্তর উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল।

শিপ্রা আজ আর ছোট ভাইটির হাতে চা পাঠিয়ে না দিয়ে নিজেই নিয়ে এল।

প্রদ্যোত মনে মনে একচোট হেসে নিলে তার কল্পনাকে লীলায়িত হ'তে দেখে। ভয়ানক রকমের ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল সে।

'তোমার আকস্মিক এই আবির্ভাবে আমি চম্‌কে উঠেছি শিপ্রা।' প্রদ্যোত বিহ্বলের ন্যায় তাকিয়ে রইল।

শিপ্রা বল্‌লে, 'যেতে তো সেই বিকেল।'

'ও কথা এখন পড়ে থাক। ও হচ্ছে অনেক দূরের কথা। তোমার আজ হ'ল কি শিপ্রা? আমাকে সুখী কর্‌বার জন্যে যেন তুমি বড্ড বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।'

'কোনদিন না হয়েছি? প্রতিদিন নিজের যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছি। ভাবতে পারিনি যে তুমি আমার সেই দীনতাকে নিয়ে খেলা কর্‌বে।'

'একথা কিসের জন্যে শিপ্রা?'

'মনে নেই সেদিনের সিনেমা যাবার কথা? তুমিও গোঁ ধরে বস্‌লে যেতেই হবে আর আমিও পণ ক'রে বস্লুম শৌরীনবাবুর সঙ্গে কিছুতেই যাব না তুমি না গেলে। তুমি গুম্ হয়ে বসে রইলে আর আমিও কাঁদতে সুরু ক'রে দিলুম। ফোনের পর ফোন এসে শুধু বিল বাড়িয়েই দিলে।'

'শৌরীন সেদিন ভীষণ রেগে গিয়েছিল। মালতী তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বার জন্যে এসেছিল। ভাগ্যিস্, তুমি ছিলে না তাই—'

'মালতীর হয়তো এতে অস্বচ্ছন্দতা না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ভারী বিশ্রী লাগে।'

'শৌরীনকে আমি বিশ্বাস করি শিপ্রা। তোমারও করা উচিত।'

'অবিশ্বাস আমিও করি না। তাঁর অন্তরের পরিচয় এত বেশী পেয়েছি যা তুমি পাওনি। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, এত বাড়াবাড়ি হয়ত একদিন বন্ধু-বিচ্ছেদের পথ পরিষ্কার করে দেবে। শৌরীনবাবু তোমার অকৃত্রিম বন্ধু জানি বলেই আমি সেদিন যেতে রাজী হইনি।'

'না, শিপ্রা, না। তুমি হয়ত আমাদের সম্বন্ধ বুঝ্‌তে পারনি, তাই একথা বল্‌তে পার্‌লে।'

'যেখানে মিলনের পূর্ণাহুতি, সেইখানেই বিচ্ছেদের বিরাটত্ব। তাই তো তোমাকে আগ্‌লে রেখেছিলুম নিজেকে না প্রকাশ করে। তুমি এতদিন আমায় অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় দেখেছিলে, আজ থেকে সংসারের সকল কাজে, সবার মধ্যেই আমার আসন পাতা রইল।'

'তুমি যেন আজ বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ কর্‌লে শিপ্রা।'

'একই ভূমিকায় অভিনয় ক'রে ক'রে আমার নিজেরই অরুচি ধরে গেছে।' ফিক্ ক'রে একটুখানি হেসে শিপ্রা পালিয়ে গেল।

প্রদ্যোত—বিমূঢ় হয়ে বসে রইল, তাকে ধর্‌তে পর্য্যন্ত যেতে পার্‌লে না।

শিপ্রা ফিরে এসেছে।

শুধু ফিরে আসেনি, তার পূর্ব্বতন মনের অপমৃত্যু ঘটিয়ে সে ফিরে এসেছে। যে গরমিল এতদিন সে সৃষ্টি করেছিল নিজেকে জেদী ক'রে রেখে, সে অহঙ্কারকে সে নির্ব্বাসিত করেছে অন্তঃস্থলের নিরালা নির্জ্জনে। যে শিপ্রার সাড়া শব্দ পাওয়া যেত না বাড়ীর মধ্যে দিনান্তে একবারও, সে এখন মুখরা হয়ে উঠেছে এতদূর যে, দাস-দাসীরা শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে সদাসর্ব্বদা। নিজেও সে সজাগ হয়ে উঠেছে পুরোদস্তর। নিজের ফরমাস মত আসবাবপত্তর কিনে সে ঘর সাজিয়েছে। পুরাণো আলমারীটা ঘরের রূপশ্রীর ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল, সেটাকে টেনে বাইরে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌লে। নতুন ডিজাইনের সোফা এল, টেবিল এল, চেয়ার এল। এক কথায় সে বাড়ীখানাকে আধুনিকতার আবরণে মুড়ে ফেল্‌লে। নীচে থেকে অর্গানটা এনে সে নিজের ঘরের এককোণে বসালে। ড্রেসিং টেবিলটা খাটের ঠিক মাথার গোড়ায় সরিয়ে আন্‌লে। ঘুম থেকে উঠেই যাতে সে হাতের কাছে প্রসাধনগুলো পায়। টান মেরে ফেলে দিলে দেওয়ালের ছবির গোছা। আর্ট একজিবিশান্ থেকে খানকয়েক ছবি সে পছন্দ করে কিনে এনে ঝুলিয়ে দিলে মর্ম্মর দেয়ালে। সবগুলোই শিল্পকলার এক চরম উৎকর্ষ। যে ছবির মানে বোঝা তোমার আমার পক্ষে নিতান্ত গবেষণার বিষয়।

শিপ্রা আলট্রা মডার্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তার শাড়ী বদ্‌লান চাই মেঘের রঙ্ বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে। আকাশে রঙের সঙ্গে শাড়ীর রঙের অনৈক্য সে আজকাল দেখ্‌তে পারে না।

শিপ্রা প্রসাধন সাজ করে বারান্দায় থম্‌কে দাঁড়াল। আজ তার অখণ্ড সময়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খরচ ক'রেও

সে শেষ ক'র্তে পার্বে না। ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্ল। শৌরীনের এরি মধ্যে এসে পড়া উচিত ছিল। সময়কে ভুলিয়ে দেবার জন্যে সে গান গাইতে বস্ল। গান গাইতে বসে বাল্য-সখী সুজাতার কথা তার বেশী ক'রে মনে পড়্ল। আরো যদি বেশী ক'রে সে গান শিখে নিতে পার্ত!

প্রদ্যোত ঘরে না ঢোকা পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর্তেই পারেনি যে, এ গলা শিপ্রার। বিস্ময়ের পরিসীমা তার ডিঙিয়ে গেল। শিপ্রা এত ভাল গান গাইতে পারে? সত্যিই সে এতদিন শিপ্রাকে চিন্তে পারেনি।

অর্গানের রেশ তখনো পরস্পর ঠোকাঠুকি কর্ছিল।...

বেশ খোশ মেজাজে প্রদ্যোত বল্লে, আমার অন্তরের মানসীকে তোমার মধ্যে মূর্ত্ত হ'তে দেখ্লুম আজ প্রথম। আজ আমার ক্ষোভ বল, মনস্তাপ বল, আলোড়ন বল—যা কিছু সমস্তই আজ বিবাগী হয়ে পালিয়ে গেছে। আমার বৈভব, আমার ঐশ্বর্য্যের বিশালতা আমি একা জগতের সাম্নে দেখাতে পারিনি বলেই তোমাকে সাহায্য কর্তে উপরোধ করেছিলুম। তুমি বাধিয়েছিলে এতদিন যে বিভ্রাট, ক'রে তুলেছিলে আমাকে যতখানি অন্যমনস্ক, উদ্বিগ্ন, অসহন—আজ তার পট-পরিবর্ত্তন হ'তে দেখে মনে হয় যেন যবনিকার অন্তরালে তোমার প্রেতাত্মারই দর্শন পেয়েছিলুম, তোমার দেখা পাইনি। তুমি যেন লুকিয়েছিলে আর আমি তোমার লুকিয়ে-চলার গোপনীয়তা বারে বারে উন্মোচন কর্বার প্রচেষ্টায় নিজেকে দুর্দ্দান্ত ক'রে তুলেছি। আজ তোমাকে অপ্সরীর মূর্ত্তিতে দেখে আমার যাবতীয় উদ্দীপনা যেন মুক্তি পেলে: পরিত্রাণ পেলে নাগপাশের বন্ধন থেকে অকুণ্ঠিতের যত লজ্জা ও ভয়।—'

এমন সময়ে শৌরীনের মূর্ত্তি উদিত হ'ল। তার ভাষার খেই হারিয়ে গেল। সে এতখানি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, নড়তে পর্য্যন্ত পার্লে না।

শিপ্রা তাকে আসতে দেখে স্মিত হেসে বলে উঠ্ল, আপনাকে কখন ফোন্ করেছিলুম বলুন তো!'

শৌরীন ভেবে পেলেনা যে শিপ্রাকে সে কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেও আলাপ জমাতে পারেনি আগে, সে আজ হঠাৎ একদিনে এতটা কৃতকর্ম্মা হয়ে উঠ্ল কিসে। ঘরে ঢুক্তে গিয়ে তার মনে বারংবার সংশয় জেগেছে, ভুল ক'রে সে অন্য বাড়ীতে এসে পড়েনি তো! সেই পঞ্চবটী বনের চিত্রখানিকে তার চোখ দুটো খুঁজে বেড়াতে লাগ্ল; যেখানা সাতশ' টাকা দিয়ে নীলেম থেকে কিনে এনেছিল।

'বসুন'—এক ঝলক হাসি ঠোঁটের ডগায় এনে শিপ্রা বল্লে, 'ঘরের এ ছিরি দেখে চম্কে উঠ্লে চল্বে না। এক বছর অজ্ঞাতবাসের পালা আমার শেষ হয়েছে। এবার থেকে আর নিজেকে লুকিয়ে রাখ্ব না। আকাশের সূর্য্যের ন্যায় আমার উপস্থিতি এবাড়ী থেকে অনুভব কর্তে পার্বেন সকল ক্ষেত্রেই।

শৌরীন যেন সমুদ্রের মাঝে ডাঙা পেলে। এগিয়ে যেতে যেতে বল্লে, 'নিজেকে লুকিয়ে রেখে আপনি শুধু নিজেকে প্রতারিত করেন্ নি; আমাদেরও করেছেন।'

'শুধু সিনেমায় যাবার জন্য আপনাকে ডাকিয়ে আনিনি।' শিপ্রা ক্ষীণ কটাক্ষ হেনে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

শৌরীন গম্ভীর হয়ে উঠ্ল অস্বাভাবিক। অসম্ভবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকারণ পরিহাসে যোগ দিতে সে পার্লে না।

শিপ্রা হিন্দোল রাগিণী বাজাতে সুরু করে দিলে।...

মানুষের জীবনে এমন এক অসতর্ক মুহূর্ত্ত আসে, যখন সে অতীতের পুঞ্জীভূত বিক্রমকে বহির্মুখিনতার দ্বারা পরাস্ত ক'রে নিজেকে ভবিষ্যতের নিষিদ্ধ বাহ্য জগতের মধ্যে টেনে আনে। প্রস্থিতকে আকৃষ্ট কর্বার কোন হেতু দেখ্তে না পেয়ে নিজেকে বিক্ষোপিত ক'রে বসে বাতাসের অণু-পরমাণুর সঙ্গে। এই একাধিক রূপ যেমন উন্মেষের প্রস্ফুটন; তেম্নি আবার অগাধ সৌন্দর্য্যের অধিকারী।

ভৃত্য চা নিয়ে এল। শিপ্রা অর্গান বন্ধ ক'রে দুজনের মাঝখানে এসে বস্ল। হাল্কা কথা ও টুক্রো হাসি দিয়ে সে উভয়ের মন রাঙিয়ে দিলে। চা খাওয়া তাদের শেষ হ'ল, মুখের গল্পও প্রায় ফুরিয়ে এল। দু'জনের কেউই আর নতুন কথা জোগাতে পার্ছে না, এমন সময়ে শিপ্রা বলে উঠ্ল, 'উঠুন, শৌরীনবাবু—সময় যে হয়ে এল!' একদিন আমার যাওয়া নিয়ে আপনাকে মনঃক্ষুণ্ণ হতে হয়েছিল।

আজ সেই অপূর্ণতার পরিশোধ করে দিতে চাই। অনাগত জীবনের শেষে যেন ঐ একটি মাত্র আচরণ আমার পক্ষে অগৌরবের না হয়ে দাঁড়ায়।

শৌরীন তখনি সম্মত হ'ল। সিনেমা তার নেশা।

প্রদ্যোতের যাওয়া হবে না। সন্ধ্যে ছ'টায় কলেজে বাঙলা সাহিত্যের অধিবেশন।

মোটার দু'জনকে নিয়ে তখুনি বেরিয়ে পড়ল।...

প্রদ্যোত ফিরে এসে দেখ্‌লে শিপ্রা তখনো ফেরেনি। একটা উগ্র গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। পাউডারের ঢাকনি দেবার পর্য্যন্ত তার অবসর হয়নি। সেণ্টের শিশিটা অর্গানের ডালার ওপর পড়ে। ভ্যানিটি ব্যাগ সে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। জুতোর বাক্স বিছানার এক পাশে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। এরা যেন সবই তাকে বিদ্রূপ করছে। রাগে তার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছিল। শিপ্রা ভেবেছে কি! যা ইচ্ছে, তাই করবে! শৌরীনের সঙ্গে তার সিনেমায় যেতে লজ্জাও করল না। নরেনবাবু সভাপতির অভিভাষণে ঠিকই বলেছেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদের দেশে অচল। হাঁক দিয়ে রঘুয়াকে ডেকে সে নিজে দেওয়ালের ছবিগুলো খুল্‌তে লেগে গেল। 'হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস, এগুলো সব নীচে নামিয়ে রেখে আয়।' খিঁচিয়ে কথাগুলো শেষ করে সে প্রসাধনের সম্ভারকে টান মেরে জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলে—চেয়ার, টেবিল সব চোখের সাম্‌নে থেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌বার আয়োজন করলে।

শিপ্রা ঘরে ঢুকে হকচকিয়ে গেল। একি! সামান্য এই ক'ঘণ্টার মধ্যে এতখানি পরিবর্ত্তন কি করে সম্ভব হ'ল! তার কান্না পেতে লাগ্‌ল। গুম্ হয়ে সে খাটে গিয়ে বস্‌ল। শৌরীনের আশ্চর্য্য ঠেক্‌ল। বন্ধুর কার্য্যকলাপ দেখে সে হতভম্বের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রদ্যোত হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এল। সটাং ঘরে ঢুকে সে বল্‌লে, 'তুমি ভেবেছ কি শিপ্রা? আজ থেকে ও সব আর চল্‌বে না। চিরকাল অন্ধকারের গহ্বরে বাস করে এসেছ। আলোর ঝর্ণার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছ বলে মনে করেছ বুঝি এম্‌নিভাবেই চিরদিন কাটবে? চলবে না—ও-সব চলবে না।' রাগে সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লে।

শিপ্রা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, অন্ধকারেই থাকতে চেয়েছিলুম, তুমি আমাকে থাক্‌তে দাওনি। মনে পড়ে আর একদিনের কথা। যেদিন শৌরীনবাবুর সঙ্গে আমায় সিনেমায় পাঠাতে পারনি বলে অভিমানের তোমার অন্ত ছিল না, রাগের তোমার পরিসীমা ছিল না! মনে পড়ে?

শৌরীন নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভৃত্য এসে পঞ্চবটী বনের রামসীতার ছবিখানা দেওয়ালের সাদা বুকে ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। প্রদ্যোত কথার জবাব না দিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

রাত ধুক্ ধুক্ করে শুধু এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল।...

গান

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

আমার বীণায় সেধেছি যে সুরখানি
আজি পলে পলে কেন ভুলে যাই নাহি জানি।
তোমার স্মরণ উজল পথে হে প্রভু
মোরে কোন মায়া-মৃগ আঁধারে লয় গো টানি!

ভুল ক'রে যদি ক'রে থাকি অপরাধ
তুমি ক্ষম মোরে ক্ষম, খুলে দাও পথ বাঁধ।
যে গান গাহিয়া চিনেছি তোমারে আমি
পুনঃ কণ্ঠে আমার জাগাও তাহার বাণী।

বাংলায় লবণ-শিল্পের ইতিবৃত্ত

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

"প্রবর্ত্তকে" পূর্বে লবণ এবং লবণ-শিল্প সম্বন্ধে দুটী প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া সাধারণ ভাবে কিছু বলিয়াছিলাম। বর্তমানে, বঙ্গভূমির অতীত যুগে বিস্তৃত ভাবে যে লবণ-শিল্প ও বাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং গত কয়েক বৎসর যাবত সেই হৃত শিল্পের পুনরুদ্ধার প্রয়াসে বঙ্গবাসী কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দেখাইব। সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু রাজত্বের সময়ে বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ সীমানায় বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে এবং লবণাক্ত ভূমিসম্পন্ন নদী বা খালের তীরে তীরে লবণ প্রস্তুত হইত। যদিও তাহা কুটির-শিল্পে নিবদ্ধ ছিল, তথাপি তৎকালীন বঙ্গের অর্ধেক চাহিদা মিটিত এই সমুদ্রজ লবণে। বাকী অর্ধেক অংশ আসিত উত্তর ভারতের লবণ খনিগুলি হইতে—যেথাকার লবণকে আমরা সৈন্ধব-নুন বলিয়া জানি। সিন্ধু নদের পুর্ব কূল হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবের মধ্য পর্যন্ত এই বৃহৎ খনি হইতে আজও ভারতবাসী (উত্তর) বহু পরিমাণে এই নিত্যকার খাদ্যোপকরণ ঈশ্বর-কৃপায় লাভ করিতেছে।

নোনা মাটী হইতে পরিস্রুত নোনাজল সংগ্রহ: মলঙ্গীরা এই ভাবে কাজ করিত

সে-যুগে লবণের উপর কোন শুল্ক ছিল না, মুসলমানেরা আসিয়া নুন ব্যবহারের উপর কর বসাইয়া রাজভাণ্ডারের আয় বাড়াইল। যাহাতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া রাজস্ব বাড়িয়া যায়, তাহার জন্য স্বভাবতই লবণ-শিল্পকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় ক্রমান্বয়ে বঙ্গের দক্ষিণ উপকূলে চট্টগ্রামের ইসলামাবাড়ি হইতে জলেশ্বর পর্যন্ত প্রায় সাতশত বর্গ মাইল লবণাক্ত ভূমি ব্যাপিয়া বিপুলভাবে লবণ প্রস্তুতি চলিত। তাহারই মধ্যে মেদিনীপুর এবং সুন্দরবনে দুটী কেন্দ্র গড়িয়া লবণ-বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। মেদিনীপুরে কাঁথি, খড়্গপুরের মাঝে হিজলী অঞ্চলে বহুদিন ধরিয়া লবণ-প্রস্তুতির রেওয়াজ ছিল—মুসলমান আমলে এই স্থান নিমকমহাল নামে পরিচিত ছিল এবং ওই নিমক-মহলে অন্যতম প্রধান লবণবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। হিজলীর নিমকমহালের লবণ কারবারের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে। সাধারণতঃ স্থানীয় নিম্নবঙ্গের হিন্দু জমিদারদের উপর নবাবী আমলে এই লবণ কারবারগুলির পরিদর্শনের ভার দেওয়া থাকিত এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের লবণবাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। ফলে, উত্তর ভারতের সৈন্ধব লবণের আমদানী বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহাতে প্রাদেশিক সরকারের (নবাবের) রাজস্ব যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। এই হেতু প্রতি লবণের ঘাঁটিতে এবং যাতায়াতের পথে শুল্ক আদায়ের বন্দোবস্ত ছিল। এখনকার মত মণ প্রতি এক

টাকা নয় আনা—এত বেশী শুল্ক সেই সময়ে কোনও দিন ছিল না। অল্প শুল্ক হইলেও প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তাহা হইতেই বুঝা যায়, কি ব্যাপক ভাবে বঙ্গের লবণ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কি প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত।

বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্রে এই লবণ ক্রয় করিবার জন্য বঙ্গের বহির্দেশ হইতে বহু সংখ্যক সওদাগর আসিত।* ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া থাকিতেন—তাহাদের প্রতিপত্তি এত ছিল যে ক্রমশঃ সেই কয়েকজনের মধ্যেই লবণবাণিজ্যটা একচেটিয়া ভাবে হাতে আসিয়া গিয়াছিল। সেই একচেটিয়া ব্যবসাকে তাহাদের হাত হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেমন করিয়া কাড়িয়া লয়—তাহা পরে বলিব। এই সমস্ত সওদাগরকে অনেক সময়ে "ফাকের-উল-তেজর" (ব্যবসায়ীদের গর্ব), "মালিক-উল-তেজর" (বণিকশিরোমণি) প্রভৃতি খেতাবে ভূষিত করা হইত। ইহারা যে-সময়ে লবণ ক্রয় করিতে আসিত—সে সময়ে লবণের দর ছিল প্রতি মণ পিছু ২৲ টাকা।

কি ভাবে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা বলি। বর্ষাঋতু বাদ দিয়া কার্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কার্য হইত। সমুদ্রের জল বার বার জোয়ারের মোহানা দিয়া আসিয়া তীরস্থ মাটীকে লবণাক্ত করিয়া থাকে—সেই সমস্ত ভূমিকে 'চর' বলিত। জল নিকাশ করিবার জন্য এই চরগুলি কতকগুলি অংশে বিভক্ত হইয়া কয়েক জনের উপর ভার পড়িত। চরের বিভক্ত অংশ-গুলিকে বলা হইত—খালাড়ি। শুনা যায়, নবাবী আমলে হিজলীতে প্রায় চার হাজার খালাড়ি ছিল। প্রতি খালাড়িতে সাতজন করিয়া লোক নোনা মাটী চাঁচিয়া নোনা জল পরিশ্রুত করিয়া বাহির করিত। এই উপায়ে আজও ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা লবণ প্রস্তুত করে। এই লোক বা শ্রমিকগণকে মলঙ্গী বলা হইত। মলঙ্গীরা মাহিন্দরদিগকে নোনাজল হইতে ব্রাইন বাহির করিয়া দিত। মাহিন্দরগণ সেই নোনাজলকে চুল্লির উপর জ্বাল দিয়া নুন নিষ্কাশন করিত। প্রতি খালাড়িতে সাতজন মলঙ্গী গড়ে

মলঙ্গীদের নোনামাটী সংগ্রহ

প্রতি ঋতুতে আড়াইশত মণ লবণোপযোগী 'ব্রাইন' নোনাজল বাহির করিত। মলঙ্গী সম্প্রদায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে ৫৩ হাজার সংখ্যা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। নবাবী সরকার হইতে প্রতি মলঙ্গীর শত মণ পিছু বাইশ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য ছিল। যে সমস্ত জমিদারের অধীনে মলঙ্গীরা কার্য করিত—তাহারা বর্ষাবাদলে যে ছয়মাস লবণ প্রস্তুত হইত না, সেই কয়মাসে চাষবাস করিবার জন্য জমিদারের নিকট হইতে জমি পাইত। মলঙ্গীরা, মনে হয়, অধিকাংশই মুসলমান ছিল। আমি উহাদের বংশধরগণকে

---

* সত্য শাস্ত্রী রচিত মহারাজ নন্দকুমার—পৃঃ ৬৫

নিম্ন বাঙ্গালা লবণ প্রস্তুতের জন্য সে কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশ হইতে লবণ লইবার জন্য দলে দলে কাশ্মীরী, মুলতানী, শিখ, সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গোঁসাইরা বাণিজ্য করিয়া বিশেষ ধনবান হইয়াছিলেন), ভাটিয়া প্রভৃতি নানা-দেশের লোক আগমন করিত। ইহাতে আমাদের দেশের লোকেরা যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করিত। কোম্পানীর ভৃত্যগণ লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করায়, বিদেশীয় বণিকদের বাঙ্গালায় আগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালায় লবণের ব্যবসায়ে অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইতেছিল, কিন্তু কোম্পানীর অবিচারে দেশীয় লোকদিগকেও বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কাঁথি অঞ্চলে দেখিয়াছি—তাহারা কেহ কেহ পুনরায় গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর চরে চরে পুরাতন পদ্ধতিতে লবণাক্ত জল সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিয়া জ্বাল দিয়া নুন সংগ্রহ করিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিম্নবঙ্গ অধিকার করিলে, প্রতি খালাড়ির জন্য খাজনা ও শুল্ক বাবদ ৩০৲ ত্রিশ টাকা মালিকদের নিকট আদায় করিতে আরম্ভ করিল। এই হইল আমাদের দেশের উন্নত লবণ-শিল্পের প্রতি বৃটিশের প্রথম অস্ত্রক্ষেপণ। পরে, পুনরায় প্রতি শত মনের উপর দশটাকা কর বসান হইল। অর্থাৎ প্রতি খালাড়ির জন্য যাহা হইতে আড়াইশত তিনশত মণ নুন পাওয়া যাইত - তাহার জন্য ২৫।৩০৲ টাকা কোম্পানীকে বাড়তি

লবণ কারখানায় পারসিয়ান হুইলে জল-টানার দৃশ্য

করের মত দিতে হইত। পলাশী যুদ্ধের সময়ে (১৭৫৬ খ্রীঃ অঃ) হিসাব করিলে, দেখা যায় নিম্নবঙ্গে সমুদ্র-উপকূলে ২৫ লক্ষ মণ নুন প্রস্তুত হইত।*

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিবার পর, তাহাদের হাতের পুতুল নবাব মীরজাফরকে দিয়া সুপারী, তামাক ও লবণ—এই তিনটী দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা-সত্ত্ব পাশ করিয়া লইল। কিন্তু কোম্পানীর বা ক্লাইভের **Trading Association**-এর এই মনোপলী ট্রেড্ বা একচেটিয়া ব্যবসা এরূপ অন্যায়মূলক এবং অযথাভাবে প্রযুক্ত যে, বিলাতের বোর্ড অব ডিরেক্টর্স্ যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহা তুলিয়া নিতে আজ্ঞা দিলেন। ক্লাইভ তাহা শুনিলেন না, বরঞ্চ লবণ-প্রস্তুতির ভারপ্রাপ্ত জমিদারদিগের উপর কঠোর পরোয়ানা পাঠাইয়া* তাহাদের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া আয়ত্ত সফল করিলেন। বণিক-সভা বা ক্লাইভের ট্রেডিং এসোসিয়েসন নিয়ম করিল যে, লবণ-কারখানার মালিকগণ সওদাগরদিগকে লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং তাহার পরিবর্তে তাহারা সমস্ত লবণ কোম্পানীকে শতমণ ৭৫৲ টাকার দরে বিক্রয় করিবে। বণিক-সভা সেই লবণ-ক্রেতাদের যত ইচ্ছা দরে বিক্রয় করিবে। অধিক লাভ করিতে গিয়া কোম্পানী শেষ পর্যন্ত শতমণ ৫০০৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে থাকে। অর্থাৎ প্রতিমণে প্রায় তিনটী টাকা লাভ করিত।† কিন্তু এই চড়া দরে লবণের বিক্রয় কমিয়া আসিল। বোর্ড অব ডিরেক্টারদের বিষম আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়।

উঠিয়া গেলেও, আর এক কঠোর নিয়মে দেশীয় লবণ-শিল্পীদের বাধা হইল। পাঁচ হাজার মণের বেশী কোন লোককে লবণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইল না এবং যে পরিমাণ হইবে—তাহা কোম্পানীর কোন নির্দিষ্ট স্থানে আনিয়া শুল্ক-দানে তবে অন্যত্র চালানি বা বিক্রয় করিতে দেওয়া হইল। ফলে, লবণ-প্রস্তুতি কমিয়া যাইয়া কোম্পানীর আয় বিশেষ পড়িয়া গেল। ওয়ারেন হেষ্টিংস রাজস্ব-আদায় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লবণ বিভাগের ব্যবস্থার ভার লইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন করেন, কিন্তু কোনরূপেই কোম্পানীর আয় বিশেষ বাড়াইতে পারেন নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দমননীতির ফলে বঙ্গের যে সমস্ত জমিদার ও মহাজনগণ লবণ প্রস্তুত করাইতেন এবং তাহা লইয়া বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমশঃ ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন; যেহেতু অত্যন্ত লোকসান যাইতেছিল। ফলে ক্রমশঃ খালাড়িগুলি সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর আয়ত্তে আসিয়া গেল। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটী লবণ-বিভাগ খুলিয়া, এজেন্সি

* **Rai Saheb Mukherji's report** পৃঃ ১১

* চণ্ডীচরণ সেন রচিত—নন্দকুমার

† **Bolt's Consideration of Indian Affairs**

প্রতিষ্ঠা করিয়া লবণ সংগ্রহ করিলেন। এবং (সল্ট্ ট্রেড্) লবণের বেচাকেনা নিজেদের করতলগত রাখিলেন। অবশ্য অনেকস্থলে ওই সমস্ত লবণ-ব্যবসাভিজ্ঞ জমিদার বা ধনীদের কয়েক জনকে কোম্পানীর এজেণ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট মাসহারা ভিন্ন কিছুই পাইতেন না। বহু ইংরাজ এবং স্বদেশের মাত্র কয়জন কর্মঠ ব্যক্তি এজেণ্ট হইয়াছিলেন। লবণ-প্রস্তুতির এক এক অঞ্চলে একজন করিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ এজেণ্ট থাকিতেন। শান্তি-সংস্থাপনের জন্য তাঁহাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত ক্ষমতা দেওয়া ছিল—তাহা ছাড়া ডেপুটী কালেক্টারের মত লবণের শুল্ক আদায় করিতেন। হিজলী, তমলুক, চট্টগ্রাম, সুন্দরবন, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বিভাগে এক একজন করিয়া এজেণ্ট থাকিতেন।

করকচ লবণের কন্‌ডেন্সার — ফটো: শ্রীমনুজ দত্ত

কিছুদিন এই ভাবে বঙ্গে লবণ প্রস্তুত হইয়া, কোম্পানীর রাজস্ব বেশ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে বিদেশী সরকারের অধীনে মলঙ্গী এবং মাহিন্দরদের গোলমাল বাধে। তাহার পর সুলভ মূল্যের চেশায়ার লবণ কলিকাতা বন্দরে আসিতে আরম্ভ করিলে, লবণ-প্রস্তুতের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চেশায়ার লবণ বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়।* কোম্পানী নিজেদের লবণবিভাগের আয় হ্রাস পাওয়ায় শুল্ক-লাভের প্রত্যাশায় বিদেশী লবণ আমদানীর নিষেধ আইন তুলিয়া লয়েন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রায় অর্ধেক চাহিদা মিটাইত চেশায়ারের এবং অন্য অভারতীয় লবণ। ক্রমশঃ এই অর্ধেকও বাকী রহিল না—সুলভ মূল্যে সুন্দর পরিষ্কার বিদেশী নুন সহজেই বৎসরের পর বৎসর স্বদেশী নুনকে কোণঠাসা করিল। কোম্পানীর এজেন্সী নষ্ট হইতে লাগিল—মলঙ্গীরা নুনের বাজার হয় না দেখিয়া উহা প্রস্তুতি বন্ধ করিয়া দিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী লবণ ব্যবহার একরূপ উঠিয়াই গিয়াছিল।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদেশী লবণের সহিত মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ হইতেও প্রতি বৎসর লবণ আমদানী হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লবণচর বা খালাড়িগুলি মলঙ্গী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিলেই হয়। অল্প যাহা ছিল—তাহা কোম্পানীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রেহাই পাইলেও, মূল্যের সম্বন্ধে অত্যন্ত লোক্‌সান খাইতে লাগিল। বনজঙ্গল কাটিয়া কাটিয়া এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে, নিকটে অল্প খরচায় কাষ্ঠ পাওয়া ক্রমশঃ দুষ্কর

বাংলায় আধুনিক লবণ-সংগ্রহের নমুনা: বর্মা-প্রণালীতে জল ঘন করা হইতেছে

* India in the Victoriam Age—R. C. Dutta.

হইয়া উঠিতে লাগিল। অবস্থা শোচনীয় হওয়াতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের লবণ কারখানাগুলি আইন পাশ করাইয়া বন্ধ করা হইল।

কুটীর-শিল্পে বা গৃহস্থের প্রয়োজনানুযায়ী যে অল্প পরিমাণ লবণ-প্রস্তুতি (পূর্বে ঘরে ঘরে) প্রচলিত ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহাও Prohibition Act-এ নিষেধ করেন। তাহার ফলে চেশায়ার বা বিদেশী লবণের চাহিদা আরও বাড়িয়া যায়। তাহার আরেকটী কারণ, স্বদেশজাত লবণের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। লবণ-শিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে বাংলার মলঙ্গীদের দুর্দশার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

কাঁথীতে একটি লবণ-কারখানা

বাঙ্গালীর লবণ-কারখানা : বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী

বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতী ও বিদেশী লবণের আমদানী কমায় এবং অসম্ভব রকম দর বাড়িয়া যাওয়ায়, বৃটিশ ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথম বুঝিতে পারিলেন—দেশের এই শিল্পটীর উদ্ধার সম্বন্ধে কোন প্রয়াস না করাতে কি ফল হইয়াছে! পাঁচ টাকা করিয়া লবণের মণ কেহ কি ভাবিতে পারিয়াছিল? যাহা হউক, সেই সময়ে বাংলাতে যাহাতে পুনরায় লবণ প্রস্তুতের প্রচলন ঘটে, তাহার জন্য ভারত সরকার ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এক ঘোষণা-পত্রে ব্যবসায়িদিগকে লাইসেন্স দিবার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেশীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ উৎসাহ পায় নাই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে টেরিফ বোর্ড যখন সরকারকে বাড়তি Additional Import Duty শুল্কের সুপারিস করিয়া বঙ্গে লবণ-শিল্পের পুনর্প্রচলনের জন্য ব্যয় ও বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন * সেই সময়ে কয়েকটী প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্ট-এর নিকট টাকা পাইবার ভরসায় লাইসেন্স লইয়া অফিস

* The proceeds of duty... would be earmarked for the......(2) The investigation of the possibility of the development of other sources of supply in India, for example in Bengal, Bihar & Orissa and generally on the East Coast, including possibly actual experiments in suitable methods of manufacture.

খুলিলেন। এর পূর্ব বৎসর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রকূলে পুরাতন মলঙ্গী পদ্ধতিতে বিনা বাধায় অল্প অল্প লবণ প্রস্তুত হইতেছে।

"অতি দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গে লবণ-শিল্প পুনরায় প্রচলিত না হইয়া, সল্ট সার্ভে কমিটীর অনুমোদনে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাড়তি শুল্ক অ্যাক্ট্ (Additional Import Duty Act) পাশ হয়। তাহার আদায়ী অর্থে উত্তর ভারতে খায়াগোদা, ঘেওড়া, ওখা, মৌরীপুর প্রভৃতি স্থানে অন্য প্রদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এবং বাংলার বাজারে সকলেই (এডেন ত অর্ধেক চাহিদা গ্রাস করে) লবণ পাঠাইয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়।

এডেনের অতি সুলভ লবণের এবং ভারতবর্ষীয় লবণের মূল্যের প্রতিযোগিতায় বঙ্গের প্রস্তুত লবণ কিরূপ দাঁড়াইবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। এজন্য ভারত-সরকারের নিকট শুল্কের সুবিধা আদায় করিতে হইবে। আমাদের দেশে মলঙ্গীরা যাহা প্রস্তুত করিত, সে লবণ আজকের বাজার দরের মত এত অল্প ছিল না; সেজন্য তাহাদের খরচায় পোষাইত।

১৯২০টী প্রাইভেট বা যৌথ প্রতিষ্ঠান লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স পাইয়াছে। চট্টগ্রামে, নোয়াখালিতে, সুন্দরবনে, ২৪ পরগণায় এবং কাঁথিতে কতকগুলি কার-খানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহারা সকলেই বর্মা পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুত করিতেছে। এই পদ্ধতি বর্তমান অবস্থা-অনুযায়ী বঙ্গের পক্ষে অতীব উপযুক্ত। ব্রহ্মদেশ প্রণালী এবং লবণ শিল্প প্রচলন প্রচেষ্টায় বাঙ্গালীরা কি করিতেছে, সে সম্বন্ধে 'প্রবর্তকে' আমি পূর্বে বলিয়াছি। এই প্রণালী ভিন্ন শুদ্ধমাত্র রৌদ্রতাপে ও শুষ্ক বায়ুর সাহায্যে শীতকালে কয়েকটী কোম্পানী করকচ লবণ প্রস্তুত করিতেছে। আনন্দের বিষয় এই যে, কলিকাতার বহু গৃহস্থের বাড়ীতে বঙ্গের করকচ লবণের আদর বাড়িতেছে।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম

(অপ্রকাশিত রচনা)

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় সুখে বিলাসের ঘোরঘটায় নিদ্রিত আছি। শুইয়া বিলাস-ভোগে বিভোর আছি, কত সুখের স্বপ্ন চিন্তা করিতেছি, কত আনন্দের ঢেউ উঠিতেছে, কত কল্পনার কল্লোল ছুটিতেছে। একি ঘোর নিদ্রা! একি ঘোর ভোগসুখে প্রবৃত্তি! এ ঘুম কি আর ভাঙ্গিবে না? এ নিদ্রা কি আর যাইবে না? এ দেশ কি আর উঠিবে না? এ জাতি কি আর উন্নত হইবে না? এখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, জল আনিতে হইবে, নতুবা আগুনে সব দগ্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের অতীতের ইতিহাস নাই—যাহা ছিল, সব ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে; যাহা আছে তাহাও আর থাকে না—ঘরে জল না ঢালিলে সব ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে।

বৎসরান্তে বৈষ্ণবসম্মিলন, হয় আমাদের ডাক পড়ে, আমরা আসি—ভগবৎ লীলা, কীর্ত্তন শ্রবণ করি, আদর অভ্যর্থনার ত্রুটী হইলে অভিমান করি, আমাদের প্রভুকে হেলায় ডাক, শ্রদ্ধায় ডাক—উত্তর দেন, সকল কষ্ট অপ-সারিত করেন। তাঁহাকে ডাকিতে হইলে ডাকিবার জ্ঞান থাকা চাই, সুধু বক্তৃতা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। 'পাঁচকড়ি এদিকে এস' বলিলে আমি আসি, আমার ডাক শুনিতে পাওয়া চাই; তাঁকে ডাকিলে, ডাক শুনিতে পান—এ-বিশ্বাস আমাদের থাকা চাই। বিশ্বাস না থাকিলে তিনি ডাক শুনিতে পান না। হেলায় হরি বলিয়া ডাকিলেও, তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্"—তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। তাঁহার জ্ঞানই ঠিক, তিনি নিত্য-সিদ্ধ, বাস্তবিক শ্যামসুন্দর ভারতের রক্ত—বিশ্বাস করিতে হইবে, এ আমার নন্দদুলালের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকিতে হইলে হৃদয় খুলিয়া বলিতে হইবে তিনি নীলমাধব ব্রজের যশোমতী দুলাল (হরিধ্বনি) "নব নীরদ-নিন্দিত কান্তিধরং" সুধু পদ্য আবৃত্তি করিলে চলিবে না। আবার ভাবিতে হইবে "নবদং শুভদং ভূপবরং"। তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, হেলায় হরি বলিলেও তিনি আসেন, আমাদের ডাক শুনিলেই তাঁহার প্রাণে ব্যথা হয়। সত্য কথা, এখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, ঘর পুড়িতেছে, ব্রজরাজের বেণু-নিনাদ না শুনিয়া আমাদের সব পুড়িতেছে, সেই ব্রজরাজের আশাপথ না

চাহিয়া আমাদের বৃন্দাবনের সব পুড়িতেছে, সেই রাখাল-রাজা বিহনে আমাদের সব পুড়িতেছে, আজ আমাদের প্রাণকানাই সাধের বৃন্দাবনে শ্রীদাম, সুদামের লীলা-স্থান দাবানলে দগ্ধ হইতেছে! সেই কানাইর গোরুর পাল আর মাঠে যায় না। তাই কানাইর লীলাক্ষেত্রের বৃক্ষপত্র আর মুঞ্জরিত হয় না। আমাদের সে বোধ হইয়াছে কি? তাহা হইলে কানাইর কাছে ছুটিতাম। আমাদের সে বিশ্বাস কৈ? কাছেই রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই না, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম কৈ? "দিল্লীর লাড্ডুর" মত শুনিলাম, আস্বাদন পাইলাম কৈ? মহারাজা বৈষ্ণবসম্মিলনী করিয়াছেন, আমাদের মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমরা আসিয়াছি, বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—বক্তৃতা করিতেছি। আমাদের সে জ্ঞান হইয়াছে কি? তিনি কি জ্ঞেয়? তিনি যে অনুভূতির জিনিস! সবাই কি তাঁহার দেখা পায়? ভক্তিযোগ না হইলে তাঁহার দেখা মিলে না।

বাঙ্গালার তীর্থ বাদে অন্যান্য দেশেও তীর্থ আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালার গৌরব, বৈষ্ণবধর্ম্ম আমাদের, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালার — নিজস্ব; এ ধর্ম্ম রামানুজের নহে; ইহা শ্রীগৌরচন্দ্রের! তিনি এই হরিনাম উৎকলে বিকীর্ণ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালায় বিতরণ করিয়াছেন। এসব মাল বিলাতী নহে, এই হরিনামরূপ ঔষধ পান কর, সর্ব্বরোগ দূর হইবে। বিলাতী মোহে ভুলিও না। এই হরিনাম সর্ব্বদোষহর, "শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে"—আমরা এখন ব্রাহ্মণ মুচি হইয়া কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের এ ব্যথার বেদনা কাহাকে জানাই, এ অভাব অনুভূতি কে বুঝিবে? আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মাচার বৈষ্ণবসেবা কর, হরিনাম কর। দেশে বড় টাকার অভাব, ভোগ-বিলাসে সব ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন বৈষ্ণব-সেবার জন্য বড়ই টাকার অভাব। তোমার বিলাস-লালিত দেহ ৪০।৪৫ বৎসর যায় না, আর আমাদের কাশীচন্দ্র ৭০।৭২ পার করিয়াছেন। বিলাসে থাকিলে হয় না। দেহ রাখিতে জানিলে হয়। এটা ভেজালের যুগ পড়িয়াছে। ধর্ম্মে ভেজাল, শিক্ষায় ভেজাল, খাবারে ভেজাল, এ ভেজালে মিশিও না। যাহা সত্য ও সনাতন তাহাই অবলম্বন কর, ঐ হ্যাটকোট-প্যাণ্ট ছেড়ে দাও—চটি ও চাদর পর, দীর্ঘজীবী হইবে।

এই যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী প্রভাত হইতেই "জয় রাধে" বলিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত—ইহাই আমাদের সত্য ও সনাতন। চেহারা সব বদ্‌লাইয়াছে, ইহা বদ্‌লায় নাই। পাঠান এলেও ইহার এই চেহারা, মোগল এলেও ইহার এই চেহারা আর ইংরাজের আমলেও ইহার এই চেহারা! সনাতন বাঙ্গালার চেহারা একটুও বদ্‌লায় নাই। কাল রঙে অন্য রঙ চড়ে? ইহার গায়েও অন্য রঙ চড়ে নাই। কাল কম্বলে অন্য রঙ চড়ে না। "সুরদাসকি কারি কমলিয়া ছাড়ে না রঙ।" এই সুরদাসের কালকম্বল—ইহার কাল রঙ কিছুতেই যাইবে না।

আমাদেরই দেশের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতা সব বিদেশে গিয়াছে, তাহাদের কত উন্নতি করিয়া দিতেছে—আর আমাদের এ কি হইতেছে! "আমারই বঁধুয়া আন্ ঘরে, আমার বুকের পরে!" আমরা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। বৈষ্ণব হইতে হইলে অনেক সহ্য করিতে হয়, তৃণাদপি নীচ হইতে হয়, তৃণের সমান দীন হইতে হয়, বৈষ্ণব হইতে বড় সাধ ছিল মনে। "তৃণাদপি পড়ি তাহা ঘটে গেল বাদ।" তৃণের মত নীচ হইতে হইবে, কুলীনে-শ্রোত্রিয়ে, পণ্ডিতে-মূর্খে, চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে সমান দেখিতে হইবে।

সবাই হরির নাম কর ভাই, ধন্য হইবে, উদ্ধার হইবে। অতি হীনও এই নামে উদ্ধার হয়, প্রভু আমার পতিতপাবন, রেষারেষী, দ্বেষাদ্বেষী সব ত্যাগ কর, হরিনাম কর!

হে প্রভু, তোমার চরণে অচলা ভক্তি থাক! বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেম-মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, ভগবানের প্রেরণায় এই বৈষ্ণবধর্ম্মে মাধুর্য্য আছে। আর কোনও ধর্ম্মে এই প্রেম ও মাধুর্য্য নাই। ইহার তুল্য আর কোনও ধর্ম্ম নাই, এইরূপ মাহাত্ম্য আর কোনও ধর্ম্মে নাই, এই প্রবুদ্ধ বাঙ্গালার এই বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর দাঁড়াইবার স্থান নাই!*

---

* নায়ক পত্রিকার সম্পাদক মনীষী ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত।

বিধবা রতিমঞ্জরী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

১২

নিশ্চল আবহাওয়ায় মোহন ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন—

নন্দ বেরিয়ে আস্তেই সচল এবং স্বাভাবিক আকৃতির মনুষ্য চোখে পড়ে' তাঁর ভয়ের অস্বস্তি দূর হ'ল। নন্দ নিয়ে তাঁকে চেয়ারে বসাল', এবং মোহনকে বসে' বিশ্রাম করতে সবিনয় অনুরোধ ক'রে গেল।

মোহন এখন চেয়ারে বসে' আরাম আর আনন্দ অনুভব করছেন—ভয় ত' গেছেই, বসে' আরাম পেয়ে তাঁর এ-কথাও মনে হ'চ্ছে, এ-বাড়ীর কাহারো যেন তিনি পুরাতন নিকট আত্মীয়।...বৈঠকখানার ব্যাপারটা, অর্থাৎ সেটা সাজান' কেমন—মোহনবাবু ধীরে ধীরে তা' পর্য্যবেক্ষণ করলেন; অনেকগুলি অফিস-কেদারা রয়েছে, তা'তে ধুলোবালি নাই—চৌকোণা পালিস আর বার্ণিশ-করা টেবিলটাতেও ময়লা নাই। স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষিত যে-কেদারায় মোহনবাবু বসে' আছেন—সেটা হচ্ছে আরাম-কেদারা। তাঁর ডান দিকে কিছু দূরে পরস্পরে লাগালাগি একজোড়া তক্তপোষ, পড়ে' রয়েছে—ফরাস্ তুলে' নে'য়া হয়েছে—মোহনবাবুর সুস্পষ্টই তা' প্রতীয়মান হ'ল, এবং মোহনবাবু তা'তে দুঃখবোধ করলেন, এইজন্যে যে, স্বামী বেচারা মারা গেছে; সে বেঁচে' থাকতে, এই ফরাসে বোধ হয় মজলিস বসাত'; কিন্তু পটোল তুলতেই মজলিসী শয্যা তুলে' দে'য়া হয়েছে।...স্বামী বেচারার সম্বন্ধে পটোল তোলা শব্দ দু'টি হঠাৎ মনে মনে ব্যবহৃত হ'য়ে যাওয়ায় মোহনবাবু মনে মনেই একটু হাসলেন—মৃত্যুর জন্য দুঃখবোধ তাঁর দূর হ'ল।...একটি ব্যক্তির মৃত্যুর মত দুর্ঘটনাকেও উপভোগ করার মত ভাষার সৃষ্টি এবং প্রয়োগ-রস নিশ্চয়ই সৃষ্ট হয়েছে।

তারপর মোহনবাবু দে'য়ালের দিকে তাকালেন—চারদিক্কার চারটি দে'য়ালের দিকেই তিনি মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকা'লেন—গণনা করে' দেখলেন, চা'র দে'য়ালে আটখানা উৎকৃষ্ট ছবি রয়েছে। তার মধ্যে একখানা ছবি তাঁর বিশেষ ভাল লাগল: বিলিতি ছবি—একটা মেমসাহেব একটা সাহেবের মুখের কোনো গুরুতর কথা অন্যদিকে তাকিয়ে কাণ পেতে শুনছে, বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে। সাহেবের মুখে দুশ্চিন্তা আর মেমের মুখে মনঃসংযোগ বেশ ফুটেছে; মোহনবাবুর মনে হ'ল, বেটাচ্ছেলের মেয়েটাকে ফুস্লে' নিয়ে পালাবার চেষ্টা।......

নন্দ এসে দাঁড়াতেই তিনি ছবির দিক্ থেকে নজর নামিয়ে নন্দর দিকে নজর দিলেন...

নন্দ জিজ্ঞাসা করল', খেয়ে এসেছেন কি, না, খাবেন এখানেই?

মোহনবাবু খেয়েই এসেছেন—শোভনা তাঁকে না খাইয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে দেয়নি। কিন্তু খাবেন কি না জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধির উদয় হ'ল...নারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আর অবাধে বিচরণ করবার স্থান আর নিজেকে লুক্কায়িত রাখবার স্থান যে অন্তঃপুর—সেখানে দৃষ্টিপ্রেরণের কৌতূহল ও অভিলাষ অনেকের মত তাঁরও আছে। কাজেই তাঁর মনে হ'ল, প্রস্তাবে না বলে' কাজ নাই—ভিতরটা একবার দেখেই আসা যাক্।... দ্বিতীয় কারণ, বাড়ীর মূল্যটাও অনুমান করা যাবে। উপরন্তু, তাঁর সঙ্গে হঠাৎ চোখোচোখি হ'য়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আর কেউ আছে কিনা সে তল্লাসও পাওয়া যাবে; ছোট বোন্টোন্ যদি থাকে, তবে ভাবী ভগিনীপতি হিসাবে হাসি-ঠাট্টাও পাওয়া যেতে পারে—এ-টা উপরিলাভ, কিন্তু তুচ্ছ নয়।

বললেন: ভাত আর খাব না। তবে সামান্য জলযোগ একটু করলেও হয়। খিদে তেষ্টা একটু পেয়েছে বৈকি—ট্রেণে এসেছি।—বলে' মোহনবাবু নন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘায়তভাবে হাসলেন, যেন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে' তিনি ঠিক্ আত্মীয়ের মতই ব্যবহার করছেন।

—যে আজ্ঞে। বলে' নন্দ চলে' গেল।

ভৃত্য যেমন সম্মানের সঙ্গে প্রভুর আদেশ গ্রহণ করে, নন্দ ঠিক তেমনি সম্মানের সুরে কথা বলেছে—পুলক সৃষ্টি করে' নন্দ কিছুক্ষণ তাঁর সামনে রইল।

মোহনবাবু বসে' আছেন — অন্তঃপুরে তাঁর ডাক্ পড়বে……

কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল, তা ই বা কেমন করে' নিশ্চয়ই হ'তে পারে! এখানেই তাঁকে জলযোগ করান' কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। অপরিচিত তিনি—হুট্ করে' নিয়ে তাঁকে বাড়ীর ভেতর মেয়েদের সাম্‌নে তুল্‌বে কেন!……কিন্তু ধরে' নে'য়া যাক্, ভিতরেই নিয়ে গেল, তবু পাত্রী হিসাবে দেখাশুনা এখনই বোধ হয় হবে না। তা' না হোক্, তাড়াতাড়ি নেই। … কথাবার্ত্তা কইবে কে—রতিমঞ্জরী নিজে, না, অপর কেউ!

মোহনবাবুর মনে হ'ল, এটা একটা সমস্যা।……কিন্তু তা' ভেবে' খুন হ'তে তাঁকে কে বলেছে! ওরা যখন পাত্র ডেকেছে, তখন সেদিক্‌কার ব্যবস্থা ওরাই করবে।…… মোহনবাবু নিশ্চিন্ত হ'লেন।

কিন্তু দেখ্‌তে কেমন হওয়া সম্ভব! ভালই নিশ্চয়ই। এত বড় বাড়ী যে-ব্যক্তি রেখে' গেছে, সে কুৎসিত একটা মেয়ে বিয়ে করেছিল—এ হ'তেই পারে না; আর, যে-রকম লক্ষ্মী-শ্রী ঘরেদুয়োরে দেখা যাচ্ছে, তা'তে এ সবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে সৌন্দর্য্যময়ী নন্—তা' মনে হয় না। … সৌন্দর্য্যের আবার রকমারি আছে—কালোর উপরেই দিব্যি শ্রী থাকে, গঠন আঁটসাট, চোখ চমৎকার, ইত্যাদি; আবার গৌরাঙ্গিণীরও তা' থাকে—সেইটাই হয় সোণায় সোহাগা……

নন্দ এসে দাঁড়াল—

সোণায় সোহাগায় মিল হ'লে যা' ঘটে—মোহনবাবুর মনে যখন তা'-ই অর্থাৎ তারল্য ঘট্‌ছে, তখনই নন্দ ডাক্‌ল', বাবু, ভেতরে আসুন। জলখাবার দে'য়া হয়েছে।

—চলো। বলে' মোহনবাবু উঠে' পড়লেন—চাদরটা ঘাড়ের উপর থেকে টেবিলে নামিয়ে রেখে' তিনি গম্ভীর ভাবে আর নির্ভয়ে নন্দর পশ্চাদানুসরণ কর্‌লেন… .. প্রবেশদ্বার পার হ'লেন… …দেখ্‌লেন, অন্তঃপুরের বেশ পরিপাটি সুসজ্জিত রূপ। বহিরঙ্গন থেকে' যে ইষ্টক-গৃহ দেখা যায়, তা' ছাড়াও দু'দিকে পাকা ঘর আছে—উঠানের একদিকে খালি উঁচু প্রাচীর—পাকা ঘরগুলির সাম্‌নে উঁচু রোয়াক্—রোয়াক্ ঢেকে টালির ঢালু ছাদ। পাকা উঠান্। মোহনবাবুর মনে হ'ল, ভোজ ব্যাপারে অনেক লোককে একসঙ্গে বসান যায়।……নন্দ পুনরায় বল্‌ল, আসুন।……উঠান পার হ'য়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে রোয়াকে উঠ্‌লেন।……তারপর রোয়াক লম্বালম্বি পার করে' নন্দ তাঁকে একটা কুঠুরিতে নিয়ে এল … দরজা থেকেই মোহনবাবু দেখ্‌লেন, সেই ঘরেই তাঁর জলখাবার দে'য়া হয়েছে—

এবং পুনরায় তাঁর মনে হ'ল, জনমানব এখানে কেউ নাই।

নন্দ সেখানে তাঁকে পৌঁছে দিল, একেবারে আসন পর্য্যন্ত; প্রকাণ্ড গালিচার আসনে তিনি বস্‌লেন …

বাড়ীতে খেতে' বসে' 'জল দে, জল দে' বলে' তাঁকে শোভনার উদ্দেশ্যে গলা ফাটা'তে হয়। এখানে বৃহৎ আর রৌপ্যোজ্জ্বল কাঁসার গেলাসে স্বচ্ছ জল দেখে' তাঁর বাড়ীর আর বাড়ীতে অসুবিধার কথা মনে পড়ল'—এবং তিনি রতিকে না দেখেই এবং বাড়ীর মূল্য কত তা' অনুমান না করেই, এবং রতির ছোট বোন্‌টোন্ এসে হাসিঠাট্টা না কর্‌লেও রতিকে তিনি পছন্দ করে' ফেল্‌লেন।

"ক্ষিদে তেষ্টা একটু পেয়েছে বৈকি।"—মোহনবাবু বলেছিলেন 'একটু'র উপর ঝোঁক্ দিয়ে, কিন্তু ভাবাবেগে তাঁর মনে রইল না যে, যেমনটি বলি তেমনটি যদি না করি তবে লোকে বলে, এ কেমন হ'ল! তিনি তা' বিস্মৃত হ'লেন, অকস্মাৎ অসহনীয় ক্ষুধাবৃদ্ধির দরুণ নয়, কেবল এই কারণে যে, যাঁর তিনি অতিথি, না খেয়ে তাঁকে কর্‌তে তিনি পারেন না। লুচি, মিষ্টি প্রভৃতি তিনি বিস্তর খেলেন—

"আর দু'খানা লুচি"—বলে' দু'খানা লুচি মোহনবাবু চেয়েও নিলেন এমন হৃদ্যতার সঙ্গে যেন বিশেষ প্রিয়পাত্র তিনি—আপনার লোক—চেয়ে খেতে তিনি হক্‌দার।… তাঁর মনে এ দুষ্টামিও বোধ হয় ছিল যে, দেখা যাক্ লুচি দিতে কে আসে, বিশিষ্ট অতিথির সম্মানার্থে রতিমঞ্জরী দাসী স্বয়ং, কি অন্য কেউ।

কিন্তু তাঁর পাতে লুচি দিতে রতিমঞ্জরী এল না, এল বর্ষীয়সী আর লোলচর্ম্ম এক বামুন ঠাকরুণ—তাকে দেখে মোহনবাবু দাঁতে জিব্ কাটলেন, অবশ্য মনে মনে।

জলযোগ শেষ করে' মোহনবাবু পুনরায় বৈঠকখানায় এসে আরাম-কেদারায় বস্‌লেন। বসে' যখন তিনি সুখাদ্য ভোজনে তৃপ্ত, তখন মনও তাঁর স্বচ্ছ ভবিষ্যতে অপরিসীম দাম্পত্য-সুখের প্রতিবিম্ব দেখে' সুখী হয়েছে।

বসে' থাক্‌তে থাক্‌তে মোহনবাবুর একটু তন্দ্রা এসেছিল····· নন্দর কণ্ঠস্বরে তিনি চম্‌কে' উঠ্‌লেন—

নন্দ নিবেদন কর্‌ল, কর্ত্রী আপনাকে ডাক্‌ছেন—দেখা কর্‌তে চান।

আহ্বান শুনে' প্রত্যাশী মোহন আশাপূরণের আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌বেন কি, তাঁর বুকই দুরু দুরু কর্‌তে লাগ্‌ল—এ যেন শঙ্খধ্বনি করে' তাঁকে যুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।—যা'তে তিনি মগ্ন হ'য়ে ছিলেন, সেই স্বপ্নবিলাস আদৌ এ নয়।... সাধারণতঃ যা' দেখা যায়, তা'তে কনে' দেখার ব্যাপারটা কতকটা দোকানদারী—কনে' মুখ্য সামগ্রী আর কেন্দ্র হ'লেও সে মূক। কনে' যার দ্রব্য সে-ব্যক্তি ক'নের রূপগুণের ওজন বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে' হাতে তুলে' দিতে চায়; যে নেবে সে কেবলি ইতস্ততঃ করে, যেন হিসাবে মিল্‌ছে না; বলে দেখি ত'—নেব কিনা এখনই বল্‌তে পারিনে'। লাভক্ষতির হিসাব মূলে একটা টানাটানি চল্‌তে থাকে, অবশ্য কর্ত্তা ও গিন্নী ব্যক্তিবর্গের ভিতর।··· কিন্তু এখানে তা' তেমন নয়। রতিমঞ্জরী বিধবা; ছাব্বিশ বৎসর তার বয়স; কাগজে সে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বর চাই। 'স্বয়ং আমি'—বলে' ঘোষণা করে' সর্ব্বপ্রধান আসনে সে বসে' আছে; বরের গলায় দিবার মালাটি তার হাতে আছে বটে, কিন্তু আমার গলায় দাও, বলে' গিয়ে ক্যাণ্ডিডেট্ হ'য়ে দাঁড়ালেই কৃতার্থ হয়ে সে নির্ব্বিবাদে মালাটি গলায় পরিয়ে দেবে—এমন সুলভ কনে' সে নয়, এমন সহজেও তা' হ'তে পারে না।.....কর্ত্তৃত্ব হাতে—নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হ'য়ে পুরুষ এবং পরিপক্ক মোহনের লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল'। প্রশ্নপত্র পাবার আগে পরীক্ষার্থীর যেমন ভয় ভয় লাগে, তেমনি একটা ভয় হ'ল তাঁর।

একটা ঢোক গিলে মোহন উঠে' দাঁড়ালেন—বল্‌লেন, কর্ত্রী আমাকে ডাক্‌ছেন? চলো।

মোহন এসে চেয়ারে বসে' আছেন চারিদিক্‌কার জানালা দরজা খোলা একটা ফাঁকা ঘরে—নন্দ তাঁকে বসিয়ে দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আর কেউ কোথাও নাই, থাকার একটা আভাসও নাই; কিন্তু দূরে আর-একখানা চেয়ার রাখা আছে, রতিমঞ্জরী এসে তা'তে বস্‌বে। মোহন সেই শূন্য চেয়ারের দিকে তাকিয়ে রইলেন ...

বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তিনি পটাপট্ সত্য কথাই বলে' যাবেন, না, অবস্থা গোপন কর্‌তে মিথ্যা কথাও বল্‌বেন, এ-ভাবনা মোহনের হ'ল। ··· তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, চেহারা যদি পাৎলা দুর্ব্বল হয়, অর্থাৎ রতিকে যদি নেহাৎ ক্ষীণজীবী দেখা যায়, তবে নির্ভয়ে মিথ্যা কথা বলা যাবে; কিন্তু মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারা যদি হয়, তবে বোধহয় থতমত খেয়ে যেতে হবে; স্থূলকায়া রমণীরাই উগ্র আর গিন্নীর ধাতের হয় বেশী। ··· বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান - আক্কেল, প্রতিপত্তি - ধৈর্য্য মানুষের যতই থাক্ তা' প্রকাশ পায় পরে, তার প্রভাব কখনো ফোটে, কখনো ফোটে না; কিন্তু ব্যক্তির চেহারার মাধুর্য্য যেমন, তেম্‌নি তার দুর্লঙ্ঘ্য প্রবল ব্যক্তিত্ব এক মুহূর্ত্তেই শাসনে অনুজ্ঞায় বশীভূত, এমন কি পদানতও করে' ফেল্‌তে পারে।

মোহন তা'-ই সেই চেয়ারের দিকে তাকিয়ে রইলেন দোলায়মান সঙ্কুচিত চিত্তে ··· ঐ শূন্য আসন ভরে' উঠ্‌বে কেমন লোকের দ্বারা! আর, তিনি তখন কর্‌বেনই বা কি, বল্‌বেনই বা কি! হাঁ করে' তাকিয়ে থাক্‌বেন খালি! তারপর বল্‌বেন, পছন্দ হয়েছে—এখন দেনা-পাওনার কথাটা হোক্! ধ্যেৎ ···

দরজায় এসে দাঁড়াল' রতি—

মোহন অন্যমনস্ক ছিলেন — দরজার স্থির আলো বিচলিত হ'তেই তিনি চম্‌কে' উঠে' সেদিকে তাকালেন ·· এবং তাঁকে উঠে' দাঁড়াতে হ'ল—উঠে' তিনি দাঁড়ালেন আনন্দে নয়, আতঙ্কে নয়, উৎসাহে নয়, বিস্ময়ে। ··· রতি এসে দাঁড়িয়েছে—আদ্যন্ত শুভ্র, পরিধানে সাদা ধবধবে' খান কাপড়, আর হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়ে গায়ে জড়ান' আরো

সাদা ধবধবে' একটা চাদর; কেশপ্রান্ত পর্য্যন্ত অনাবৃত শুভ্র ললাটও মোহনের চোখে পড়ল; এক নিমেষেই রতির রঞ্জনবস্তুহীন পাদপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি বিচরণ করে' এল ...

মোহন চিরকাল সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ভিতর চলাফেরা করে' গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করে' এসেছেন, আর তার ফলেই তিনি হ'য়ে উঠেছেন ভীরু—অপরূপ বস্তু আর দৃশ্য চোখে পড়ে' বিস্মিত হবার সৌভাগ্য তাঁর ক্বচিৎ ঘটেছে—এমনটি ত' ঘটেই নাই। বিধবা তিনি ঢের‌ই দেখেছেন, তাঁর পিসী মাসীদের অনেকেই বিধবা; কিন্তু বিধবার সমগ্র সত্তা, অনবনমনীয় প্রভুশক্তিও যেন দেহশ্রীতে প্রতিফলিত হ'তে তিনি কখনও দেখেন নাই—দেখ্‌লে "মনে কতটা ধাক্কা লাগে তা'-ও তিনি জান্‌তেন না ... এখন তা' দেখে' আর জেনে' তিনি বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন।

এই বিধবাটিকে তিনি বিবাহ কর্‌তে চান্; দেখ্‌তে এসেছেন; এবং দেখ্‌লেন। সরমার সঙ্গে বিবাহের সময় সরমার মুখ তিনি দেখেছিলেন একটা সোরগোলের ভিতর লোকাচার পালনের অনুষ্ঠানের মারফৎ—তখন স্ত্রীর নারী হিসাবে সমগ্র মূর্ত্তি আর সূক্ষ্ম রূপ তাঁর চোখে পড়ে নাই, উদ্ঘাটিত হয়েছিল ধীরে ধীরে—ধাক্কা তিনি পান্ নাই; কিন্তু নারী যে তার সহজ নারীসত্তা আর সাধারণ পারিপার্শ্বিকতা উত্তীর্ণ হ'য়ে সহসা এমন অভিভূত কর্‌তে পারে, তা' তিনি জান্‌তেন না। সংসার বিষয়ে অপার বৈরাগ্য ইহা নয়, এ একটা অনাহত দুরতিক্রম্য উচ্চতা। শুভ্র আর সজ্জাহীন 'অথচ দিব্যদ্যুতি ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত নারীকে দেখে' তাঁর তৎক্ষণাৎ মনে হ'ল, এ তাঁর জন্য নয়; মৃত্তিকায় অবস্থিত কোনো পুরুষের জন্যই সে নয়—মৃৎবর্ত্তী যে মানুষ ইহাকে আকাঙ্ক্ষা করে সে বাতুল।

সরমা ছিল বিয়ের কনে'—হামেসা যা' তিনি দেখ্‌তেন তারই অভিজ্ঞতার আর শোনা কথার সূত্রে তাকে তিনি অনেক আগেই খানিক্ পেয়েছিলেন—কল্পনাকে বিপর্য্যস্ত কর্‌তে সে পারে নাই—সে ছিল আটপৌরে সংসারের জিনিস; কিন্তু এ! ... এ যে কি তা' ধারণা করাই যায় না—সংসারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক বৈরাগ্য এ ঠিক নয়।

মোহনের জিব্ শুকিয়ে এল; মনে হ'ল যে বলেন, 'ভুল করেছি—ক্ষমা কর্‌বেন। আমি আসি'।

কিন্তু তা' তাঁর বলা হ'ল না—

রতি তখন এসে চেয়ারে বস্‌ছে, এবং তাঁকে নমস্কার কর্‌ছে ...

সাদা হাত দু'খানার দিকে তাকিয়ে মোহনের চোখে জল এল ...

তিনি প্রতি নমস্কার করে' বসে' পড়লেন।

মোহনবাবু বসে' পড়ে' চোখ নত করেছেন, কিন্তু নত করে' রাখার স্বস্তি তিনি এক মুহূর্ত্তও ভোগ কর্‌তে পেলেন না—তখনই শুন্‌তে পেলেন রতি বল্‌ছে, আপনি চোখ নামিয়েছেন কেন? আমার পানে তাকান্—ভাল করে' আমাকে দেখুন...

সুন্দরী রমণী ভাল করে' তাকিয়ে দেখ্‌তে বল্‌ছে—এ আহ্বানে চোখের সুখের যে সম্ভাবনা জাগে—তার আনন্দ আর যে মাদকতা থাকে, তার ক্রিয়া আপাদমস্তকের রক্তে চক্ষের নিমেষে ছড়িয়ে যায়; কিন্তু মোহনবাবুর তা' হ'ল না—রতির কণ্ঠস্বরে ধমক্ ছিল কি বিদ্রূপ ছিল তা' ঠিক্ বুঝা গেল না; কিন্তু প্রথম থেকে' এ-পর্য্যন্ত যে বিপাক্ অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি এসেছেন, তার দরুণই তাঁর মনে হ'ল—বড়বাবু আদেশ করে' যেটুকু দেরী স'য়ে থাকেন, ততটুকু দেরীও এ সইবে না ...

মোহনবাবু চোখ তুল্‌লেন—রতির মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি গেল—তারপর তার সর্ব্বশরীরের উপর...মনে হ'ল, এমন রূপ তিনি কখনো দেখেন নাই—ছিপ্‌ছিপে গড়ন কিন্তু হাল্কাভাবে এর কথা ভাবতে পারা যেন যায় না।—ভাবকুশলীর গঠন-নিপুণতা মানুষটিকে ব্যেপে একটা দুর্ব্বার তীক্ষ্ণতা যেন দিয়েছে—সেটা রূপের জ্যোতির, কি অন্তরের দৃঢ়তার, কি মানসিক পবিত্রতার—তা' ঠাহর হয় না, কিন্তু সে আছে...

মোহনবাবু দেখ্‌লেন, হাত দু'খানা ঠিক ততখানি সরু—যতখানি সরু হ'লে মোটা বলা চলে না...নিটোল স্বচ্ছ মুখখানি অত্যন্ত স্থির—চক্ষু দু'টি আর ভুরু দু'টি ততটা টানা যার একটু বেশী হ'লেই মনে হ'ত খুঁৎ চোখে পড়ল

দৃষ্টি মোহনের মুখে নিবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টি এমন নির্লিপ্ত যে, সেই নির্লিপ্ততা ভেঙে দিয়ে তাকে কথা বলা'তে সাহস হয় না...অতিশয় সহজ দৃষ্টি; মোহনবাবুর মনে হ'ল, এম্‌নি দৃষ্টিই জগতে দুর্লভ।

কিন্তু রতির পরবর্ত্তী কথা শুনে' তিনি আরো অবাক্ হ'লেন—

তিনি তাকাতেই রতি পুনরায় বল্‌ল',—আমাকে আপনি বিয়ে করতে চান্, অথচ দেখে নিতে সাহস কেন হ'চ্ছে না? পণ্য কেমন তা' দেখ্‌তেই ত' এসেছেন আপনি! আমি উপস্থিত—দেখুন আমাকে; জিজ্ঞাসা করার কিছু যদি থাকে করুন, জবাব দেব।

মোহনবাবু কিছু বল্‌লেন না; কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন তিনি? বর হিসাবে তাঁকে পছন্দ হয়েছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন! দূর, তা'-ই কি হয়! ছেলেমেয়েকে ভালবাসবে, না, রাক্ষুসী সৎমায়ের মত যা তা কর্‌বে, তা-ই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন? তা'-ও হয় না।

ইহা সত্যই যে, রতির মাতৃমূর্ত্তি, কি প্রেয়সী-মূর্ত্তি, কি সেবিকা-মূর্ত্তি, মোহনবাবু রতির সত্তায় স্ফুরিত দেখেন নাই—তা' ছিল না বলেই দেখ্‌তে পান নাই; রিক্ত একটা করুণ মূর্ত্তি বহু দূরবর্ত্তী, অস্পৃশ্য আর অস্পৃহনীয় হয়ে তাঁর চোখে পড়েছে...

কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনেই দূরবর্ত্তিতার সঙ্কোচ তাঁর খানিক্ দূর হয়েছিল......তারপর তাঁর এ-ও মনে হয়েছে, মেয়েটি বোধ হয় প্রগল্‌ভা—বাহ্যিক গম্ভীর স্থৈর্য্যের নীচে চপলতা আছে।

মোহনবাবু কিছুই জান্‌তে চাইলেন না—সাহস পেয়ে তাকিয়ে রইলেন কেবল, এবং প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন, গোপনে রূপামৃতপানরত দৃষ্টি প্রকাশ্যে অভদ্র হ'য়ে না ওঠে...

রতিই জান্‌তে চাইল, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?

এই প্রশ্নে মোহনবাবু অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে নিজের অভ্যস্ত সংসারে চট্ ক'রে ফিরে এলেন; বল্‌লেন, পাঁচটী।

—বড়টির বয়স কত?

—বড়টি মেয়ে। পনর বছরের হবে।

—সকলের ছোটটি?

মোহনের মনে হ'ল, খোঁজ নিচ্ছে, কতটা ঝক্কি ঘাড়ে পড়বে।

বল্‌লেন—বছর তিনেকের।

—এদের আমাকে মানুষ কর্‌তে হবে?

বিয়ে কর্‌তে মনে মনে সম্মত না হ'লে কি এই প্রশ্ন করত'? করত' না। মোহন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,—তা কর্‌তে হবে বৈ কি!

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তান-দিগকে মানুষ কর্‌বে এ আশা নয়, মানুষ কর্‌তে বাধ্য—এমনি একটা দাবীই মোহনের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল।

রতি একটু হাস্‌ল—

মোহন দেখ্‌লেন, রতির হাসিও যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির—পরিমাণে প্রসারে অতি অল্প, কিন্তু তারই দরুণ তার অধর আর মুখশ্রী এমন একটি সুকুমার তরঙ্গে লীলায়িত হ'ল—যে তা' বল্‌বার নয়। ভারি ভাগ্যবান্ ছিল সেই পরলোক-গত স্বামীটি!

মোহন মনে মনে তার দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন।

হেসেই রতি বল্‌ল, যদি না করি ত মার্‌বেন?

মোহন দাঁতে জিব্ কেটে অসম্ভব উক্তির দৃঢ় প্রতিবাদ কর্‌লেন; বল্‌লেন, ছি, ছি! ভদ্রলোক কখনো স্ত্রীকে মারে!

—মারে। হয় আপনি মিছে কথা বল্‌ছেন, নয় আপনি জানেন না। মারে।...কেবল তা'-তেই মারে না, শত্রু মনে করে' মারে, ভার আর বইতে পারছিনে বলে' রাগ করে, মারে, বেশ্যাসক্ত যারা তারা সুখের প্রতিবন্ধক দূর কর্‌তে মারে; কথার বিষে মারে, না খাইয়ে মারে।

মোহনবাবু একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে' কেবল বল্‌লেন, আমি কখনো মারি নাই।

—আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভালবাসতেন?

—বাস্‌তাম।

—খুব বল্‌তে কতটা বোঝেন?

পাল্টা একটা সরস প্রশ্ন মোহনবাবুর মনে উদয় হ'ল: ইঞ্চি গজের মাপ, না, বাটখারার ওজন চান্?—কিন্তু এ প্রশ্ন তিনি কর্‌লেন না।...যথার্থ ব্যাপার এই যে, খুব

ভালবাসা বল্‌তে কতটা বুঝায় তা তিনি কথনো অনুভবই করেন নাই। প্রথম যৌবনে স্ত্রীর সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মনে হ'ত, খুব ভালবাসি; কিন্তু সেটা মনে হ'ত প্রচণ্ড একটা ইন্দ্রিয়োল্লাস পরিতৃপ্ত হবার পর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য; বিবাহিতা স্ত্রী বলে' এই পবিত্র অনুভূতি ঘট্‌ত না, যে-কোনো স্ত্রীলোক সম্পর্কে তা' ঘট্‌তে পার্‌ত।...তারপর ভালবাসার রকম বদ্‌লেছে। স্ত্রী কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ আর বিরক্ত না হ'লে এবং তাঁর নিজের আরামে ব্যাঘাত না ঘট্‌লে যে তৃপ্তি আর সন্তোষ তিনি পেতেন, ভালবাসা হয়েছিল সেই তৃপ্তি আর সন্তোষের দরুণ আনন্দপ্রকাশের নামান্তর। মনটা যদি খুশী থাক্‌ত তবেই ভালবাসতে ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু খুব ভালবাসি বলে' জম্‌কালো একটা নাট্যৈশ্বর্য্য পৃথিবীকে প্রদর্শন, কি অতুলনীয় একটা কাব্য-সম্পদ দেশদেশান্তরে কি কর্ণান্তরেও রাষ্ট্র তিনি করেন নাই।...

বল্‌লেন, যত্ন আত্তি কর্‌তাম—মনে কষ্ট দিইনি, কোনোদিন।

—তিনি তা'তেই খুশী ছিলেন?

—হ্যাঁ। তা' ছাড়া আর কি চাইবেন তিনি!

—তা' ঠিক্। বলে' রতি একটু নড়ে' উঠ্‌ল'।...রতির ঈষৎ এই দৈহিক বিচলন মোহন দেখ্‌তে পেলেন না এমন নয়, কিন্তু দেখেও তার মানে তিনি বুঝ্‌লেন না। তিনি বুঝ্‌বেনই বা কি করে' যে, রতির তাঁর বিরুদ্ধে ক্রোধ, বিদ্বেষ, আক্রোশের সীমা নাই—সমগ্র পুরুষজগতের প্রতিনিধি করে' নিয়ে সে তাঁকে দেখ্‌ছে—মনের কথা ব্যক্ত হ'চ্ছে না বলে' সে যন্ত্রণা পাচ্ছে—আর, তাঁর শেষের ঐ কথাটায়—'তা' ছাড়া আর কি চাইবেন তিনি—বলায়, রতি তাঁকে মানুষের পর্য্যায় থেকে সরিয়ে দিয়েছে...

রতি বল্‌ল, বিয়ে করে' স্ত্রীকে দিয়ে আপনি কেবল সুলভ গণিকাবৃত্তি করিয়েছেন।

—সে কি!—মোহন বিস্ময় প্রকাশ কর্‌লেন।

—তা'-ই ত' বল্‌লেন।...বিয়ে না করে' রক্ষিতা রাখেন নি কেন?

কথায় কথায় একটা রসোৎপন্ন নিশ্চয়ই হ'য়েছে, আর পূর্ব্বেকার সমুদয় মানসিক চাঞ্চল্য আর মনের উপর দুর্ব্বোধ্য ছায়ার নৃত্য তিরোহিত হ'য়ে মোহনের প্রাণে নারী-সাহচর্য্যের একটা উত্তাপ জন্মেছে।... কিছু পূর্ব্বেই রতিকে দেখে' তা'কে যে হিমালয়ের মত উত্তুঙ্গ একটা দুর্গম আর পবিত্র স্থানের অধিবাসিনী মনে হয়েছিল, সে-স্থান থেকে তিনি তাকে নামিয়ে এনে সাম্‌নে রেখেছেন।

রতির কথায় তাঁর সে সম্ভোগ বাধাপ্রাপ্ত হ'ল।...

এবং তিনি কিছু বলার পূর্ব্বেই রতি বল্‌ল, আপনার বয়স কত?

গোটা তিনটি বৎসর বেমালুম চুরি করে' মোহন বল্‌লেন, সাইত্রিশ।...তারপর হেসে' বল্‌লেন, একেবারে বুড়ো হইনি।—বলে', রতির মুখের দিকে পুনরায় তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—উদ্দেশ্য, রক্তমাংসের মানুষ রতিকে সেই সহজ উপায়ে আকৃষ্ট করা—যে-উপায় সর্ব্বপ্রথম দেখা দেয় ক্ষুদ্র লম্পটের মনে। নারীর সকল কাঠিন্য বিগলিত করে' এনে আর সকল উচ্চতা ধূলিসাৎ করে' দিয়ে তাকে যৌনমিলনে অবতরণ করাতে সে চায়, কেবল নিজের আতুর অনুকম্পাপ্রার্থী মনটি তার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে'।

এক মুহূর্ত্তের জন্য রতির মুখ কাল হ'য়ে উঠ্‌ল; তারপর বল্‌ল, আপনার সঙ্গে আমি এখানে একা রয়েছি। বলুন ত' সত্যি করে', আপনি আমাকে পরস্ত্রী জেনেও এখনই আমাকে পাওয়ার লোভ কর্‌ছেন কি না?...অস্বীকার কর্‌বেন না, লালসা আপনার চোখে মুখে আমি দেখেছি—শারীরিক উত্তেজনা লক্ষ্য করেছি। আপনি যান্।

রতি উঠে' দাঁড়াল'—

ওঠা ছাড়া মোহনের গত্যন্তর রইল না—তিনিও উঠ্‌লেন।

১৩

অপদস্থ মোহনবাবু সেখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে' বৈঠকখানা থেকে তাঁর পোষাকী চাদরখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়্‌লেন...

এ কেমন অদ্ভুত লোক!—অদ্ভুত লোক স্বচক্ষে দেখার বিস্ময়ে তিনি কেবল দিশেহারা হ'য়ে নয়, প্রায় অসাড় অবস্থায় ফিরে' এলেন। ... একেবারে শেষে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল, যার দরুণ তিনি বিতাড়িত হয়েছেন—তা এমনই

কি অন্যায়! ... স্পষ্ট শুনিয়ে আসাই উচিৎ ছিল, যে-বিধবা বিজ্ঞাপন জাহির করে' পুরুষের পাল জোটাতে চায় —সে যদি পুরুষেরই বেচাল দেখে' মূর্চ্ছা যায় তবে সে—

অনেকগুলি কুৎসিৎ আখ্যা মোহনের মনে এল।

কিন্তু সত্যেনবাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সম্মুখে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করলেন না, অপমানের জ্বালাও চেপে গেলেন—ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের মত একটা হাস্যকর পণ্ডশ্রম করে' এসেছেন যেন, এম্‌নি লঘুভাবে হেসে তিনি সবাইকে হাসাতে চাইলেন...,

বল্‌লেন, মোটা, ঢুপ্‌সী আব্‌লুষের মত কালো—ক্ষ্যাপার মত কথা কয়—কথার মানে হয় না। একটু একটু গোঁফ উঠেছে দেখ্‌লাম। আচ্ছা, মেয়েমানুষের কি কখনই গোঁফ ওঠে না?

এই কথায় সেখানে স্ত্রীলোকের গোঁফ সম্বন্ধে ভারী হাসাহাসি আর উৎসাহের সৃষ্টি হ'ল, এবং রতিকেও যা' তা' বলা হ'ল।

রতি মোহনকে যেতে' বলে' আস্তে আস্তে গিয়ে শুলে ... তারপর ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল—তার মর্ম্মযন্ত্রণার অন্ত নাই...

মোহন এসেছিলেন তার জ্বালার ইন্ধন হ'য়ে, এবং মোহনকে দেখে' তার যা' মনে জন্মেছিল—তা' হ'চ্ছে আশার যে সর্ব্বনাশ করে তারই প্রতি ক্ষমাহীন ক্রোধ। ভাষায়, শব্দে উৎক্ষিপ্ত ক'রে সে ক্রোধোত্তাপ নির্গত করে' দে'য়া যাদের পক্ষে সম্ভব, রতি তাদের মত নয়—ক্রুদ্ধ ভাষা ভিতরেই স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে পিণ্ডের মত আবর্ত্তিত হয়ে থাকে—নিজে পুড়ে' সে ছারখার হ'য়ে যায়—মুখে তা ফোটে না। অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, ঐ ধূর্ত্ত জীবনহীন আর কাপুরুষ লোকটিকে মনের আগুনে একেবারে অচল দগ্ধ ক'রে দিতে পারলে, তবেই জীবনের ইতিহাসের আর-এক অধ্যায় লিখিত হ'ত, কিন্তু তা' সে পারে নাই—এখানেও তার পরাজয় ঘটেছে।

ক্রূর দুরভিসন্ধি আর নির্লজ্জ লাম্পট্য নিয়ে স্বামী তাকে চেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেন।—পুরুষের ভিতর তার কাছে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য, পুরুষত্বের আর পুরুষধর্ম্মের একমাত্র নিদর্শন...কিন্তু তিনি তাকে অপমান আর লাঞ্ছিত করে গেছেন—

এই ব্যক্তি এসেছিল তারই দোসর হ'য়ে, পাপের দ্বিতীয় দূত হয়ে, তাকে দ্বিতীয়বার গণিকাবৃত্তিতে প্ররোচিত করতে...

তার মনের নিষ্ঠুরতা আর বিদ্বেষ আর তার প্রতি আচরণের চূড়ান্ত প্রতিবাদ তার মনেই রয়ে গেল—বেরিয়ে এল না—কিছুই সে বল্‌তে পারে নাই—কতকগুলো বাজে কথা বলেছে কেবল।

রতি হঠাৎ উঠে' বস্‌ল—

তার গণিকাবৃত্তিই পৃথিবী চায়—গণিকাই সে হবে।

গণিকা। অপবাদ তার রটেছে; ইন্দ্রজিতেশ্বরানন্দ-সিংহের স্ত্রী রণদাকিঙ্করী ইঙ্গিতে তা'কে তা'ই বলে গেছেন; পাড়ার মেয়েরা তার সংসর্গ কুসংসর্গ ব'লে ত্যাগ করেছে। সরোজিনী রামায়ণখানা কে'ড়ে নিয়ে গেছে—যা'রা পায়ের তলায় বস্‌ত'—তা'রা এখন শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তবে তার গণিকা হ'তে বাকি কি!...তার দেহ আর মনকে কেন্দ্রচ্যুত করে' গণিকাবৃত্তিতে শিক্ষিত করে' তুল্‌বার আয়োজন না চলেছে এমন স্থান নাই—পুরুষ তাকে ডাকছে, নারী তাকে ঠেল্‌ছে। গণিকাই সে হবে।

সে যে গণিকা বৈ আর কিছুই নয় রতি তা' সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, ব'সে ব'সে তাই সে ভাবে।...

একদা এ'টি লোক গণিকাগৃহ থেকে এসে তাকেও গণিকা সাজিয়ে অশুচিতা দিয়ে গেছে; সেই অসহ্য অশুচিতাবোধ সে অবিরাম পরিত্যাগ কর্‌বার কৃচ্ছ্রব্রত পালন করছে...

নন্দ একদিন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্‌ল, বৌদি, তুমি বাঁচবে না বেশীদিন।

—কেন?

—দুর্ব্বল বোধ করো না?

—করি।

—শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে উঠেছ।

(সমাপ্ত)

প্রেয়সী মেরিয়ান

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ও জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। বণিক কোম্পানীর বাণিজ্যব্যপদেশে রাজ্যলাভ এবং সে রাজ্য-সংরক্ষণে বোধ হয় তখন সূক্ষ্ম রাজনীতির প্রয়োজন তত অনুভূত হয় নাই, যতটা প্রয়োজন ছিল ক্ষত্রিয় বীর্য্যের। কিন্তু শাসনকার্য্যে তাঁহার যে অতি বড় দক্ষতা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে—

"হাতী পর হাওদা ঘোড়ে পর জিন
জল্‌দি আও জল্‌দি আও সাহেব হেষ্টিং"

—প্রভৃতি ছড়া প্রচলিত আছে। কোম্পানীর রাজত্ব তখন বাল্য অতিক্রম করিয়া কৈশোরেও পদার্পণ করে নাই। এই সদ্যভূমিষ্ঠ ক্ষুদ্র রাজত্বে তিনি ভবিষ্যৎ সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু তিনি যে বজ্রমুষ্টিতে শাসনদণ্ড ধরিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই শাসনকার্য্য চালাইয়াছিলেন—এ জন্য পরবর্ত্তীকালে ইংলণ্ডে জনসভা (House of Commons) কর্ত্তৃক সাত বছর ধরিয়া বিচার হইয়াছিল। হেষ্টিংসের এই অতি বড় লাঞ্ছনা ইতিহাসের অত্যন্ত প্রাথমিক ছাত্রেরও জানা আছে। যাঁহারা অভিযোগ জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বার্ক, শেরিডন ও ফক্সের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রধানতঃ তিনটি ছিল। প্রথম অভিযোগ বারাণসীর অধীশ্বর চৈতসিংহের প্রতি অত্যাচার, তাঁহাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা, তাঁহাকে কয়েদ করা ইত্যাদি। দ্বিতীয় অভিযোগ, অযোধ্যার নবাব-হারেমের অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমদিগের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের দ্বারা প্রভূত অর্থ আদায়; তৃতীয় অভিযোগ, রোহিলা-দিগের ন্যায় একটি স্বাধীন যোদ্ধৃজাতির উপর অত্যাচার। ভারতবর্ষে এবং পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডে তাঁহার এই ঘটনাবহুল জীবন-নাট্যের সঙ্গিনী ছিলেন মেরিয়ান। তাঁহাকে ওয়ারেন হেষ্টিংস চিঠিপত্রে 'প্রেয়সী মেরিয়ান' (Beloved Marian) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই ব্যক্তিত্বসম্পন্না তীক্ষ্ণবুদ্ধি নারীর ধমনীতে ফরাসী রক্ত প্রবাহিত ছিল কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় তিনি জর্ম্মান ছিলেন। ইংরাজীভাষাজ্ঞানও তাঁহার উঁচু দরের ছিল না, মোটামুটি কাজ চালাইবার মত ছিল। এই নারীর স্বামী কার্ল ইমহোপ একটি ব্যক্তিত্ববিহীন, ভবিষ্যৎহীন দরিদ্র চিত্র-শিল্পী ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি ছিল দাম্ভিক ও বেপরোয়া। চিত্রাঙ্কনে তাঁহার হাত ছিল কারণ পত্নী মেরিয়ানের একটি ছবি, যাহা তাঁহার অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়, তাহাতে শিল্প-নৈপুণ্যের অভাব নাই। সমসাময়িক গ্রন্থাদি পাঠে ইহা বোঝা যায় যে, কার্ল ইমহোপকে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কারণ তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর খরচে এদেশে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল চিত্রশিল্পীরূপে ভাগ্য পরীক্ষা করা। এই ধাপ্পাবাজী যখন কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণ-গোচর হইল, তখন ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; সুতরাং মেরিয়ানের প্রেমে মশগুল ওয়ারেন হেষ্টিংস এক লক্ষ টাকা দিয়া কার্ল ইমহোপকে পত্নী-ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন—এই উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ গ্লীগ (Gleig) মেকলে প্রভৃতি লেখকগণ লিপি-চাতুর্য্যের দ্বারা ঐরূপ রটাইয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কার্ল ইমহোপের সহিত মেরিয়ানের বিবাহিত জীবন পূর্ণ দশ বৎসর। যে সকল গ্রন্থে ইঁহাদিগের দাম্পত্য জীবন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ কিছু পাওয়া যায় না—যাহাতে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, মেরিয়ান স্বামীকে দেখিতে পারিতেন না অথবা ঘৃণা করিতেন। এই স্বামীর সহিত ঘরকন্নায় তিনি দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন প্রচুর কিন্তু তবুও স্বামী-ত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষে এই দম্পতীর দুঃখ-দৈন্যের অভাব যখন রহিল না, কোম্পানী যখন স্বামীকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করিলেন, সেই দৈন্যদশায় কার্ল ইমহোপের পত্নী-ত্যাগ সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক বলিতে হইবে। যখন শিশুপুত্র লইয়া স্বামী বিদায় হইলেন, তখন মেরিয়ান গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বামী ও পুত্র একটি বজরায় মাঝ-দরিয়ায় অবস্থিত জাহাজ ধরিবার জন্য রওনা হইল, তীরে দণ্ডায়মানা মেরিয়ানের অশ্রু সিক্ত হইয়াছিল কিনা কে বলিবে? যে জাহাজে কার্ল ইমহোপ শিশুপুত্র সহ ভারত ত্যাগ করেন, সে জাহাজের নাম 'মারকুইস অব রকিংহাম'।

ইহার পূর্ব্বের একটু রোমান্টিক ইতিহাস আছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্য-সভার সিনিয়র মেম্বার নিযুক্ত হওয়ায় ডিউক অব্ গ্রাফটন জাহাজে মান্দ্রাজে আসিতেছিলেন। এই জাহাজেই ইমহোপ-দম্পতীও ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। এই সময়ে জাহাজে হেষ্টিংস খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জাহাজে স্বল্পপরিচিতা বিবি ইমহোপ হেষ্টিংসকে অকৃত্রিম সেবা করেন। সেবা-মুগ্ধ হেষ্টিংসের সহিত যে বন্ধুত্ব হয়, ক্রমে তাহাই প্রেমে পরিণতি লাভ করে। ইহা আয়েসা-সেবালব্ধ জগৎসিংহের কাহিনীর একটু রূপান্তরিত পুনরভিনয় মাত্র, যদিও অবসান দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় করুণ নয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারত অভিমুখে এই যাত্রা প্রথম যাত্রা নয়, কারণ তিনি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাবান পুরাতন কর্ম্মচারী। ভারতবর্ষে তিনি ইহার পূর্ব্বে কৃতিত্বের সহিত কোম্পানীর কাজ করিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংস নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলেও মুর্শিদাবাদের কুটীতে ছিলেন এবং নবাবের পতনের পর মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

হেষ্টিংসের পত্নী-বিয়োগ ভারতবর্ষেই ঘটে (জুলাই ১৭৫৮)। হেষ্টিংসের পত্নীকে মাদ্রাজ বহরমপুরে সমাহিত করা হয়।

কিন্তু হেষ্টিংসের এইবারকার যাত্রা জয়যাত্রা বলিতে হইবে। মাদ্রাজ সদস্য সভার সিনিয়র সদস্যরূপে আসিয়া তিনি ডেপুটী ডিরেক্টার পদে উন্নীত হন। ইহার পর তিনি বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন।

কার্ল ইমহোপ ও বিবি ইমহোপরূপিণী মেরিয়ানও কলিকাতা আসেন। কার্লের আশা ছিল যে, কলিকাতার সাহেব মহলে ও বাঙালী অভিজাত সমাজে তাঁহার চিত্র-শিল্পের খরিদ্দার জুটিবে। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিন পরে ভারত ত্যাগ করিতে হয়। আশ্রয়হীনা ও সম্বলহীনা হেষ্টিংস-পরিচিতা মেরিয়ান সম্ভবত হেষ্টিংসের দাক্ষিণ্যে আলিপুরে একটি গৃহে থাকিতেন। কার্ল ইমহোপ চলিয়া যাওয়ার পর মেরিয়ান লালদিঘীর নিকটবর্ত্তী হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে আসেন। এই গৃহটির বহু অদল বদল হইলেও ইহা এখনও দণ্ডায়মান আছে। পতি পরিত্যক্তা মেরিয়ান এই গৃহে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল ছিলেন। দুঃখের বিষয় এ সময় তিনি অনেকের চক্ষে হেষ্টিংসের রক্ষিতা বলিয়া গণিত হইতেন। কারণ হেষ্টিংসই এই সময় মেরিয়ানের সকল ব্যয় বহন করিতেন এবং সে ব্যয়ও সামান্য ছিল না। কারণ বহু দাসদাসী পরিবৃতা হইয়া বাংলার গভর্ণরের এই আশ্রিতাটি এই স্থানে বাস করিতেছিলেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ যেরূপ ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষের আগার হইয়া উঠিয়াছিল, এ সময় সেইরূপ ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিদ্বেষ-বহ্নি কলিকাতায় জ্বলিতেছিল। বিশেষ করিয়া এই বিদ্বেষ-বর্ত্তিকা কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজদিগের সহিত শাসন-সদস্যদিগের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত ছিল। শাসন সভার সদস্যদিগের মধ্যে ক্লেভারিং, মনসন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ও বারওয়েল ছিলেন এবং গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস শাসন সদস্য সভার সভাপতি ছিলেন। বারওয়েল এই সময় ক্লেভারিংএর কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু ফ্রান্সিস প্রভৃতি এই পরিণয় যাহাতে না ঘটে ইহাই চাহিতেছিলেন। এই সময় শাসন সভার সদস্যগণের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের মনোমালিন্য চলিতেছিল। সদস্যগণ প্রায়ই সভায় ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধতা করিতেন এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিতেন। এই সময় অতীত যৌবন ওয়ারেন হেষ্টিংস ক্ষতবিক্ষত মন লইয়া মেরিয়ানের কাছে শান্তি লাভের জন্য আসিতেন। বস্তুতঃ এই সময় মেরিয়ানের সঙ্গই হেষ্টিংসের ভারাক্রান্ত জীবনে একমাত্র আনন্দবিধায়ক প্রলেপ ছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রিপন জাহাজে মেরিয়ানের স্বামী কার্ল ইমহোপের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের কাগজপত্রগুলি এদেশে আসিয়া পৌঁছে। স্যাক্সনির ডিউক এই বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়াছিলেন ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। পূর্ণ এক বৎসর পরে ইহা ভারতে পৌঁছিয়াছিল।

আইনতঃ যখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত মেরিয়ানের পরিণয়ের সকল বাধা দূর হইল, তখন ৮ই আগষ্ট ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মেরিয়ান ও ওয়ারেন হেষ্টিংস পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। হেষ্টিংস দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর বাঞ্ছিতা মেরিয়ানকে তো পাইলেনই ইহা ছাড়া হেষ্টিংস-বিরোধী শাসন সদস্যদিগের মধ্যে ক্লেভারিং মারা যাওয়াতে শাসন-সভায় তাঁহার কাজের সুবিধা হয়, কারণ সহজেই ভোটাধিক্যের বলে তিনি কাজ চালাইতে পারিতেন। সুতরাং এই সময় হইতে একজন নিষ্কণ্টক হইয়া নবোঢ়া ভার্য্যার সহিত আনন্দে দিন যাপনের ও শাসন-কার্য্য পরিচালনের কোনও বাধাই হেষ্টিংসের রহিল না। এই সময় হইতে মেরিয়ান এত আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন যে, তাঁহার জীবনযাত্রা যে কোনও স্বাধীন রাজ্যের রাজ্ঞীর সহিত তুলনীয় হইতে পারিত। শুধু বহু দাসদাসীই তাঁহার ছিল না, তাঁহার আটজন এডিকং ও বহু অস্ত্রধারী দেহরক্ষী ছিল। তাঁহার একটি গাউনের দামই আড়াই লক্ষ টাকার বেশী ছিল এবং এই অনুপাতে অন্যান্য মূল্যবান পরিচ্ছদও ছিল। যে বজরায় মেরিয়ান নদীবক্ষে বেড়াইতেন, তাহার ভিতরকার কারুকার্য্য ও চারু-শিল্প অতুলনীয় ছিল এবং দুইজন কাফ্রী তাঁহাকে ব্যজন করিত। এই সময় তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মিশর রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার কথা মনে হইতে পারিত।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের উপর মেরিয়ানের এতটা জোর ছিল যে, হেষ্টিংসের নিকট হইতে অনুগ্রহ বা পদোন্নতি চাহিলে মেরিয়ানের দ্বারাই তাহা করাইতে হইত। ইহা লইয়া তৎকালীন বেঙ্গল গেজেটে কিছু লেখালেখি হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস এই গেজেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফিলিপ ফ্রান্সিসের ডাইরি পাঠে এ সময়ের অনেক তথ্য জানা যায়।

বাল্যে ও কৈশোরে পিতৃগৃহে, যৌবনে প্রথম স্বামীর সহিত যথেষ্ট অভাব অভিযোগ ও দারিদ্র্য ভোগ করিলেও, এ সময় মেরিয়ান বিলাসিতাতে এতই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে খুব মূল্যবান পরিচ্ছদ ও বহু মূল্য অলঙ্কার ছাড়া স্বল্প মূল্যের জিনিস তিনি ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু প্রৌঢ় গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস সাদাসিধাভাবে থাকিতেন। মেরিয়ানকে সাজাইতে, নবপরিণীতা পত্নীর খেয়াল চরিতার্থ করিতে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। ইহার জন্য হেষ্টিংসকে অনেক সময় অর্থকষ্টে পড়িতে হইয়াছে। বিলাসিনী হইলেও মেরিয়ানের বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়চিত্ততা অতুলনীয় ছিল। বিলাস যে নৈতিক অবনতির সূচনা করে, মেরিয়ানের জীবনে তাহা বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হয় নাই। বোধ হয় ইহার জন্যই ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় শাসনকর্ত্তা তাঁহার অঙ্গুলী হেলনে চলিয়াছিলেন। বারাণসীর রাজা চৈতসিংহের বিবরণ সাধারণ ইতিহাস পাঠকের জানা আছে। হেষ্টিংস তাঁহাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। রাজা চৈতসিং সে জরিমানা না দেওয়াতে হেষ্টিংস তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। পত্নী মেরিয়ানও এই বিপদসঙ্কুল যুদ্ধযাত্রায় স্বামীর সহগামিনী হন। যাইবার সময়

পথে নবাব মীরজাফরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী পত্নী মণি বেগমের সহিত মেরিয়ান মুর্শিদাবাদে দেখা করেন। মণি বেগম মেরিয়ানকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। তিনি দেখা হইলেই 'চোখের আলো' 'প্রিয় মেয়ে' প্রভৃতি সম্বোধনে মেরিয়ানকে আপ্যায়িত করিতেন। অতি চতুরা মণি বেগমের এই স্নেহ অকৃত্রিম অথবা কোম্পানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর পত্নীকে হাতে রাখার উদ্দেশ্যমূলক কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। মণি বেগম সাক্ষাতে মেরিয়ানকে সোণার কাজ করা শাড়ী ও গভর্ণরের জন্য দামী আতর দিয়াছিলেন। রাজা রাণীদের কতকগুলি বহু মূল্য চিত্রও মেরিয়ানকে বেগম এ সময় দিয়াছিলেন। মেরিয়ানও তাঁহার স্বহস্তে নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্য করা কাপড় অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বেগমকে গ্রহণে রাজী করিয়াছিলেন। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেগমের সহিত ওয়ারেন হেষ্টিংস-প্রেয়সী মেরিয়ানের প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

রাজা চৈতসিংহের সহিত সংঘর্ষে মেরিয়ানকে লইয়া বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া হেষ্টিংস মেরিয়ানকে মুঙ্গেরে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন সাণ্ডস নামক একজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেরিয়ান সম্বন্ধে এই সময় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অতিশয়োক্তি হইলেও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন "হেষ্টিংস-গৃহিণী এরূপ মহিলা যে, কোনও দেশে এরূপ মহিলা পূর্ব্বে জন্মে নাই, পরেও জন্মিবে না।" কি উদ্দেশ্যে এই ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেরিয়ানের এত বড় প্রশস্তিকার হইলেন তাহা জানা যায় না। বিজয়গড়ের দুর্গ পতনের পর সেখানকার ধনাগার লুণ্ঠিত হয়। সৈন্যগণ মেরিয়ানকে একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত বহুমূল্য তরবারী ও মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার দেয়। কিন্তু হেষ্টিংস এই সকল লুণ্ঠিত সামগ্রীর অংশবিশেষও মেরিয়ানকে লইতে দেন নাই এরূপ প্রকাশ।

ফিলিপ ফ্রান্সিস হেষ্টিংস-বিরোধী দলের নেতা ছিলেন এবং ইংলণ্ডে পরবর্ত্তী কালে হেষ্টিংসের বিরোধী দলকে তিনি সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনিও মেরিয়ান সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মহিলাটি সত্যই গুণবতী। তাঁহার পদমর্য্যাদার যোগ্য ব্যবহার তিনি জানেন এবং অপরের শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারিণী।" ফিলিপ ফ্রান্সিসের এই অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ মেরিয়ানের পক্ষে একটি মূল্যবান দলীল।

এই সময় ফিলিপ ফ্রান্সিস ক্যাথারিন নাম্নী একটি ফরাসী রমণীর প্রেমে পতিত হয়। এই ফরাসী রমণী মিঃ গ্রাণ্ডের পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন। ফিলিপ নাকি গোপনে ক্যাথারিনের নিকট যাইতেন। ইহা লইয়া তৎকালীন কলিকাতাস্থ ইংরেজমহলে অনেক কুৎসা রটে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মিঃ গ্রাণ্ড, ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন কিন্তু ফ্রান্সিস তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর গ্রাণ্ড এক লক্ষ বাট হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করেন এবং ছয় হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ডিক্রী পান এবং ইহা আদায়ও করেন। ফ্রান্সিস ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং মনে মনে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, হেষ্টিংসের এই মামলায় তাঁহাকে অপদস্থ করাইবার মধ্যে যথেষ্ট হাত ছিল। ক্যাথারিন ইহার পর কলিকাতা হইতে চন্দননগরে তাঁহার পিতামাতার কাছে চলিয়া যান। গ্রাণ্ড পত্নী ক্যাথারিন পরে বিখ্যাত ফরাসী রাজনৈতিক ধুরন্ধর কাউণ্ট ট্যালিরাণ্ডের পত্নী হইয়াছিলেন। এক সময় হেষ্টিংসের সহিতও ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, ইহাতে ফ্রান্সিস আহত হন।

ইহার কিছুকাল পরে হেষ্টিংস মেরিয়ানকে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। মেরিয়ান আলবানাস জাহাজের যে কক্ষে যাইবেন স্থির হয়, সে কক্ষটি বহু মূল্য উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। রূপসী প্রেয়সীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য হেষ্টিংসকে এই জন্য কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। মেরিয়ানের সঙ্গে ভারতীয় দাসদাসী ও মিসেস মোট নাম্নী একটি মহিলাও প্রেরিত হন। প্রাচ্যের ধনরত্নের নিদর্শন বহু মূল্য হস্তীদন্ত নির্ম্মিত পালঙ্ক, বহুমূল্য আসন, কিংখাব, জরি, মসলিন ও বহু হীরা, মুক্তা প্রভৃতি রত্নাদি মেরিয়ান সঙ্গে লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদিগের য়ুরোপস্থ বন্ধু ও বান্ধবীদিগের জন্য বহু মূল্যবান উপহারও সঙ্গে ছিল। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হেষ্টিংসের বয়স তখন বায়ান্ন বছর এবং মেরিয়ানের বয়সও সাঁয়ত্রিশ বছর ছিল। কিন্তু অতীত যৌবন হইলেও 'কায়েন মনসা বাচা' মেরিয়ানকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা এই সময় মেরিয়ানকে লিখিত হেষ্টিংসের একটি চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছে। মেরিয়ান-বিচ্ছেদ-কাতর হেষ্টিংস লিখিতেছেন :

"তোমার জাহাজকে আমি দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিতেছিলাম, তারপর তাহা দৃষ্টি পথের বাহিরে চলিয়া গেল। দুঃখপূর্ণ কাতর হৃদয়ে এবং পীড়িত মস্তিষ্ক লইয়া আমি সমস্ত দিন শোকগ্রস্তভাবে অতিবাহিত করিয়াছি।"

হেষ্টিংস ভারত হইতে আরব্য উপন্যাসের অর্থ ও অতুল বৈভব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। হেষ্টিংসের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। মেরিয়ানের পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত দুই পুত্র হেষ্টিংসের ব্যয়েই এ সময় ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে শিক্ষালাভ করিতেছিল। হেষ্টিংস নিজ পুত্রজ্ঞানে তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন।

দুইটি সুদৃশ্য আরবীয় অশ্ব হেষ্টিংস ইংলণ্ডেশ্বরকে এবং একটি বহু মূল্য শয্যা রাজ্ঞীকে উপহার দেন। তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারী। রাজদম্পতীকে এইরূপ উপহার দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। সমসাময়িক যে সব তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি ও চিঠিপত্র পাওয়া যায়, তাহা পড়িলে এই সত্য চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে যে, তাঁহার সুদিনে দুর্দ্দিনে তিনি রাজা-রাণীর সমান প্রিয় পাত্র ছিলেন।

মেরিয়ান ইংলণ্ডে আসিয়া আনন্দেই দিন যাপন করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে এ সময়ে লর্ড থার্লো'র সাহচর্য্য ও সঙ্গই যেন বেশী আনন্দ দিতেছিল। ইহা লইয়া মিসেস মোট হেষ্টিংসকে একখানি

ইঙ্গিতপূর্ণ পত্র লিখেন: তাহাতে উল্লেখ ছিল, "আমার আপনাকে ইহা অবশ্যই জানান উচিত যে চ্যান্সেলরের (লর্ড থার্লো'র) সঙ্গই যেন অপূর্ব্ব সুন্দরী হইবার জন্য মেরিয়ানকে আগ্রহান্বিতা করিয়া তুলিয়াছে এবং ইহা আপনার কতিপয় বন্ধুকে ভীত এবং ঈর্ষান্বিত করিয়াছে।"

কিন্তু মিসেস মোটের এই ইঙ্গিতের কোনও গূঢ় তাৎপর্য্য ছিল আমরা মনে করি না। হয়ত স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত মেরিয়ান লর্ড থার্লো'কে সাময়িক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে এমন কিছু মলিনতা ছিল না যাহার কদর্থ করা যাইতে পারে। কারণ মেজর স্কটের লেখা হইতে জানা যায় যে, সমসাময়িক কোনও ভোজে হেষ্টিংসের স্বাস্থ্য পান করিবার সময় বিচ্ছেদকাতর মেরিয়ান অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সময় মুঘল সম্রাট শা আলম প্রদত্ত উপাধির ফারমান হেষ্টিংস মেরিয়ানকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তা হইলেও, রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। সেইজন্যই তাঁহাকে নানা অসুবিধা ও বিপদ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রকার বিপদেই তিনি মেরিয়ানের নিকট হইতে সান্ত্বনা ও শক্তি সঞ্চয় করিতেন। মেরিয়ানের বয়স যখন ৬৭ বৎসর তখনও তাঁহাকে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা বলিয়া মনে হইত।

অবশেষে হেষ্টিংসের ভারত ত্যাগের পালা আসিল। তিনি "বারিংটন" জাহাজে কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার সম্মানের জন্য এ সময় উনিশটি তোপ দাগা হইয়াছিল। হেষ্টিংসের বহু অনুরক্ত বন্ধু অন্য একটি জাহাজে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন লণ্ডনে পৌছিয়াছিলেন। ইহার এক সপ্তাহ মধ্যেই এডমণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া নোটীশ দেন, আগে হইতেই বন্দোবস্ত এরূপ পাকা হইয়াছিল। হেষ্টিংসের স্থানে ম্যাক্‌-ফার্সন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তাঁহার শাসনকালকে পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। হেষ্টিংসও ম্যাক্‌ফার্সনকে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ভারত ত্যাগের সময় একান্ত অনিচ্ছার সহিত আফিসের চাবি তাঁহার হস্তে দিয়াছিলেন। বিলাতে পৌছিয়া তিনি "ডেলসফোর্ড" নামক সুরম্য ভবন ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন এবং উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী 'বিউমন্ট লজ' নামক বাড়ীটি ক্রয় করেন। এসব ব্যাপারে মেরিয়ানই তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। সুবিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রধুরন্ধর মিরাবো ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে মেরিয়ানকে দেখেন এবং তাঁহাকে রোম সম্রাট ক্লেইয়াসের পত্নী সম্রাজ্ঞী লোলিনা পলিনার সহিত তুলনা করেন। সম্রাজ্ঞী পলিনার দেহবল্লরী সাম্রাজ্যের বহু স্থান হইতে আহৃত বহু মূল্য মণি ও রত্নাদি ভূষিত ছিল, বহু রত্ন ভূষিত মেরিয়ানকে রোম সম্রাজ্ঞীর সহিত তুলনা করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয় তাহাই। বোধ হয় মিরাবোর উক্তিতে এই দুই নারীর মণিরত্নাদি আহরণের সাদৃশ্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও থাকিতে পারে। কিন্তু মেরিয়ানের লুক্কায়িত সঞ্চিত অর্থ ও ধনভাণ্ডার ছিল। মেকলের এ উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয় না।

রিচার্ড সেরিডন হ্যারো বিদ্যালয়ে হেষ্টিংসের সতীর্থ ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকারীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। বিরুদ্ধবাদীদিগের ধারণা ছিল, হেষ্টিংস অসদুপায়ে প্রভূত ধনরত্ন ও অপ্রমেয় অর্থ ভারত হইতে লইয়া গিয়াছেন কিন্তু স্যার গিলবার্ট ইলিয়ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, হেষ্টিংস দরিদ্র ছিলেন এবং সত্যই প্রভূত ধনরত্ন লইয়া তিনি আসেন নাই। এমন কি ফ্রান্সিসও স্বীকার করিয়াছেন যে হেষ্টিংস অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই।

হেষ্টিংস তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলার গোড়াতেই দুইটি ভুল করেন। প্রথম ভুল তাঁহার মেজর স্কটকে ব্যবহারজীব নির্ব্বাচন করা। দ্বিতীয় ভুল বার্ককে তাঁহার নোটীশ সম্বন্ধে পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনেই সচেতন করিয়া দেওয়া। ইহাতে বার্ককে উস্কাইয়া দেওয়াই হইয়াছিল। এ সময় হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কুৎসায়ও দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। পিট হেষ্টিংসের পক্ষে থাকিবেন, হেষ্টিংস ইহাই আশা করিয়াছিলেন। পিটও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ দলে ভোট দিলেন এবং বেনারসাধিপতি চৈতসিংহকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা ঠিক হয় নাই, ইহাই পিটের বিরুদ্ধ দলে ভোট দিবার কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই মামলা পরিচালনায় হেষ্টিংস অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হন। কলিকাতা হইতে সতের জন ধনী নাগরিক প্রত্যেকে এক হাজার পাউণ্ড দিয়া সতের হাজার পাউণ্ড হেষ্টিংসের সাহায্যার্থে পাঠাইয়া-ছিলেন। হেষ্টিংসের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছিল, যে মেরিয়ানের রত্নাদি নেসবিট টমসনের নিকট বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

মামলা-পরিচালকদিগের মধ্যে বার্ক অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় হেষ্টিংসকে এরূপ ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, হেষ্টিংস স্বয়ং অর্দ্ধঘণ্টাকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার বাগ্মীতা শুনিতেছিলেন, হেষ্টিংস নিজেই পরবর্ত্তী কালেই হা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেরিডনের শালীনতাবোধ বার্ক অপেক্ষা বেশী ছিল, সেই জন্য বোধ হয় তিনি বার্কের ন্যায় তীব্র ভাষা ব্যবহার করেন নাই। মামলাতে হেষ্টিংসের প্রতি যখন "হীন ও অখ্যাত কুলোদ্ভব" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করা হইত তখন এই সকল উক্তি মেরিয়ানকে নিদারুণ পীড়া দিত।

ডেল্‌সফোর্ড নামক যে সুরম্য গৃহটি হেষ্টিংস-দম্পতী ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াও কিনিতে পারেন নাই, তাহা তাহার মালিকের মৃত্যুর পর ক্রয় করেন। এই গৃহটি তাঁহাদের নির্ব্বিরোধ বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান ছিল। হেষ্টিংস এরূপ মেরিয়ান-গত প্রাণ ছিলেন যে, মেরিয়ানের পূর্ব্ব স্বামীর

পুত্র দুটিকে তিনি নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। চার্লস জর্ম্মনীতে একটি উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। জুলিয়াস হেষ্টিংসের তদ্বিরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি চাকরি যোগাড় করিয়া ভারতবর্ষে আসেন। মেরিয়ানের সহিত জুলিয়াসের আর দেখা হয় নাই। কর্ণেল ব্রিসকোর একটি মেয়ে হেষ্টিংসের গৃহে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম মেরিয়ান ব্রিসকো রাখা হয়। মেরিয়ান ও হেষ্টিংস দুইজনেই এই মেয়েটিকে নিজ কন্যার ন্যায় লালন ও পালন করেন।

মামলার সময় লণ্ডনে থাকা অপরিহার্য্য বলিয়া মেরিয়ান লণ্ডনের পার্ক লেনে এই সময় একটি গৃহ ক্রয় করেন। ছয় বৎসর পরে মেরিয়ান এই গৃহটি চড়া দামে লর্ড রোজবেরীকে বিক্রয় করেন। হেষ্টিংসের মামলা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শেষ হইয়াছিল কিন্তু মামলার রায় প্রায় এক বৎসর পরে দেওয়া হইয়াছিল। এই মামলায় হেষ্টিংসের এক লক্ষ পাউণ্ড, দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল। মেকলে বলেন যে, এ সময় হেষ্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রগুলিকে বশে আনিবার জন্য দুই লক্ষ টাকার অধিক তিনি উৎকোচ দিয়াছিলেন—ইহাই বার্কের অভিমত। মামলায় নিজেকে দোষমুক্ত করিবার জন্য অনুকূল জনমত তৈয়ারী করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলি হাত করা প্রয়োজন এবং সেজন্য এইরূপ পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য্য, বোধ হয় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মেরিয়ানের পরামর্শ মত হেষ্টিংস এ কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

মামলায় হেষ্টিংস নির্দ্দোষ গণ্য হইবার পর মেরিয়ানের নেতৃত্বে যে আনন্দোৎসব চলিয়াছিল তাহাও স্মরণীয়। লণ্ডনের বেঙ্গল ক্লাবে পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন। মেরিয়ান ইহাতে পুনরায় লর্ড থার্লোর পার্শ্বে বসিয়া এই বিজয়োৎসব পরিচালনা করেন। মেরিয়ান দোষমুক্ত হেষ্টিংসের জন্য একটি উপাধির উৎসুক ছিলেন। বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, যদি হেষ্টিংস এ সময় লর্ড উপাধি পাইতেন, মেরিয়ান নিশ্চয়ই "লেডী অব দি ডেল্সফোর্ড" হইতেন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকৃত যে, ইংলণ্ডেশ্বর ও যুবরাজ উভয়েই মেরিয়ানকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

মামলা পরিচালনে ও এই সকল উৎসবে হেষ্টিংসের অর্থ-সম্পত্তি এক প্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মেরিয়ান এ সময় স্বামীর মানসিক অশান্তিরও অংশভাগিনী ছিলেন। হেষ্টিংসের ব্যাঙ্কার রিচার্ড জনসনকে একখানি ব্যক্তিগত পত্রে হেষ্টিংস ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার গচ্ছিত টাকার বেশী আরও কত টাকা লইয়াছেন তাহা জানাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। সেই পত্রে ইহাও লিখেন যে, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না; পরন্তু স্বামীকে মানসিক অশান্তি হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছাই তাঁহাকে ইহা করাইতেছে। কিন্তু এ সকল মানসিক উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও মেরিয়ান তাঁহার খরচ কমাইতে চেষ্টা করেন নাই। কারণ নিজেই হেষ্টিংস ভুলিতে পারেন নাই যে, তিনি একদা ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন এবং মেরিয়ান কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদিগের বাসগৃহ, চালচলন, সাজসজ্জা তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদার অনুরূপই ছিল। শুধু একটি নয় ডেল্সফোর্ড গৃহের প্রতি কক্ষই স্বর্ণ, রৌপ্য ও হস্তীদন্ত নির্ম্মিত আসবাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের পালঙ্কও হস্তীদন্ত নির্ম্মিত ছিল। মেরিয়ানের প্রসাধন কক্ষে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত চেয়ার, সোণার কাজ করা কৌচ প্রভৃতি ছিল। বস্তুতঃ ডেল্সফোর্ড "ভূস্বর্গে" পরিগণিত হইয়াছিল।

হেষ্টিংস এ সময় তাঁহার যে অর্থ মামলায় খরচ হইয়াছে তাহা মঞ্জুরের জন্য একটি দরখাস্ত করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী পিট ইহা পেশ করিতে রাজী হন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড (পাঁচ লক্ষ টাকা) বিনা সুদে ধার দেন এবং চার হাজার পাউণ্ডের (চল্লিশ হাজার টাকা) একটি বাৎসরিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন এবং এই বৃত্তি তাঁহার ইংলণ্ডে পৌছিবার তারিখ হইতে মঞ্জুর করেন। ইহাতে হেষ্টিংস একসঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকা পান। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হয় নাই, কারণ অভাব অভিযোগের মধ্যেও তাঁহাদিগের ডেল্সফোর্ড গৃহের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। মেরিয়ান বহু বালক বালিকার 'ধর্ম্ম মা' হইয়াছিলেন। মামলার সময় হেষ্টিংস যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি মেরিয়ানের নামে বেনামী করেন এবং মেরিয়ানও সেগুলি ইংলণ্ডের বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মেরিয়ানের মাতা তখনও জীবিত ছিলেন, মেরিয়ান তাঁহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করিতেন। মেরিয়ান 'নর্থ ব্রিটন' সম্পাদক কুখ্যাত আন্দোলনকারী জন উইল্‌কিসের কন্যা মেরী উইল্‌কিসকে নিমন্ত্রণ করেন। মেরিয়ানের পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র জুলিয়াস এ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হেষ্টিংস ও মেরিয়ান দুইজনেই জীবজন্তু পুষিতে ভালবাসিতেন। 'সুলেমান' নামক অশ্বটি হেষ্টিংস নিসবিট টমসনকে উপহার দেন। হেষ্টিংস ও মেরিয়ান অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং দুইজনেই অশ্বারোহণে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু স্যার ইলা ইজা ইম্পে এ সময় জীবিত ছিলেন; তিনি অত্যন্ত বিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিতেন।

ইংলণ্ডেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র ডিউক অব গ্লষ্টার ডেল্সফোর্ড ও লণ্ডন গৃহে কয়েকবার হেষ্টিংসের সহিত দেখা করিয়াছেন। প্রিন্স রিজেন্ট, হেষ্টিংস ও মেরিয়ানের সহিত অতি মাত্রায় সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

ইংলণ্ডের জনসভা কর্ত্তৃক সুদীর্ঘ সাত বছর ধরিয়া হেষ্টিংসের বিচার হইলেও হেষ্টিংস ক্রমশঃ তাঁহার প্রনষ্ট গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ বদলের সময় হেষ্টিংস পার্লামেন্ট জনসভায় (House of Commons) প্রবেশ করা মাত্র হর্ষধ্বনির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মেরিয়ান এ সংবাদ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে শ্রবণ করেন, কারণ এই হৃত গৌরব উদ্ধারে মেরিয়ানের অনেকখানি হাত ছিল। হেষ্টিংস ইহার পর প্রিভি

কাউন্সিলর নিযুক্ত হন। কিন্তু মেরিয়ান তাঁহার এই সম্মানের সমান অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই, এজন্ত হেষ্টিংস দুঃখ অনুভব করিয়াছেন।

ফরাসী রাজা বারবোঁ বংশোদ্ভব অষ্টাদশ লুইয়ের রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরীর বৈঠকখানায় যে উৎসব হয়, মেরিয়ান তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এ সময় হেষ্টিংসের বয়স আশী বৎসর। মেরিয়ান প্রায় সত্তর বছর, কিন্তু মেরিয়ান তাঁহার সৌন্দর্য্য এ বয়সেও বজায় রাখিয়াছিলেন।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, হেষ্টিংস সর্ব্বদাই মেরিয়ানের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার উপরে স্থান দিতেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

পুনরায় হেষ্টিংস-দম্পতী লণ্ডনে আসেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগকে সমাদর করেন। এ সময় হেষ্টিংসের বয়স চুরাশী, মেরিয়ান সত্তর।

হেষ্টিংসের মৃত্যুর পরও মেরিয়ান জীবিত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও ব্যয়ে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবীতে হেষ্টিংসের একটি অর্দ্ধ মূর্ত্তি ও উৎকীর্ণ ফলক স্থাপিত হয়। ডেল্‌স্‌ফোর্ড গৃহেও হেষ্টিংসের বিবাহের আংটী হইতে অন্যান্য যাবতীয় স্মৃতি চিহ্ন মেরিয়ান কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হয়।

হেষ্টিংসের মৃত্যুর পরও মেরিয়ান অভিজাত সমাজে পূর্ব্বের স্থায় সম্মানের পাত্রীই ছিলেন। ডিউক অব্ গ্লষ্টার এ সময় তাঁহাকে লণ্ডনে আসিতে অনুরোধ করিয়া এইরূপ পত্র লেখেন :

"সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আপনার স্বাস্থ্য ও মনের উপকার করিবে। * * আপনি বৎসরে অন্তত একবার রাজধানীতে আসিবেন, এ দাবী আপনার বন্ধুগণ আপনার উপর রাখে।"

মেরিয়ান স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও সাহসী প্রকৃতির নারী ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি বিশেষ মতবাদ ছিল, যথা—মেরিয়ান বুঝিতেই পারিতেন না যে, মানুষ কাজ দিলে কাজ না করিয়া কেন "ধর্ম্মঘট" করে।

তিনি ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি চিরকাল আকৃষ্ট ছিলেন এবং বলিতেন "ভারতের ধন আমাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে বাদ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব নহে।"

এই সময় মেরিয়ান অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে কাল কাটাইতেছিলেন। অতীতে তাঁহার দ্বারা উপকৃত কোনও মহিলা তাঁহাকে এ সময় কিছু সাহায্য করেন কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার আর্থিক অনটন দূর হয় নাই। সেই জন্যই তিনি রাজকুমারী সোফিয়র সাহায্যে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট 'পেন্‌সন' দাবী করিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে একটি দরখাস্ত করেন। সম্ভবত এই দরখাস্ত রাজার নিকট পৌঁছে নাই। অন্তত মেরিয়ান কোনও 'পেনসন' পান নাই।

ইহার পর ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত একটি যুগের তিরোধান ঘটে, কারণ তাঁহারই ঘটনাবহুল রাজত্বে ভারতবর্ষে বহু স্মরণীয় ঘটনা, আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, ফরাসী বিদ্রোহ, নেপোলিয়ানের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। রাজার মৃত্যুকালে মেরিয়ান অতি বৃদ্ধা, তাঁহার পুত্র চার্লসও মধ্য বয়সে উপনীত। মেরিয়ান এ সময় সর্ব্বদা অতীতের মনোরাজ্যে বাস করিতেন ও নিজ মনোমন্দিরের দেউলেই সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিতেন। তাঁহার যুগের লোক তখন একটিও জীবিত ছিল না। উইলের দ্বারা তিনি চার্লসকে ডেল্‌সফোর্ড গৃহ দান করেন। উইলে মেরিয়ান তাঁহাকে সমাহিত করিবার যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত হইয়াছে। তাহা এই, "আমার ইচ্ছা যে, আমার মৃত্যুর পর দশ দিন অতিবাহিত না হইলে আমাকে যেন সমাধিস্থ করা না হয়। আমাকে যেন গোপনে সমাধিস্থ করা হয়। কোনও পুরুষ যেন আমাকে স্পর্শ না করে।"

এই উইল সম্পাদনের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ ১৮৩০। শুধু হেষ্টিংসের স্থায় পতি লাভ নহে, মেরিয়ানের পুত্র-সৌভাগ্যও ছিল। কারণ পুত্র চার্লস অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, কোন মাতা বোধ হয় চার্লস অপেক্ষা মাতৃভক্ত পুত্র কখনও লাভ করেন নাই।

মেরিয়ান তাঁহার সম্পাদিত উইলে "এ, এম, হেষ্টিংস" নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই উইল সম্পাদনের সাত বছর পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ মেরিয়ান ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহাকে ডেল্‌সফোর্ডে হেষ্টিংসের পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়।

মেরিয়ান হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার বিবাহকে নিজ সৌভাগ্যরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দেন নাই—ইহাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মত।

এমন কি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধবাদী ফিলিপ ফ্রান্সিসও বলিয়াছেন যে, মেরিয়ান গভর্ণর হেষ্টিংসকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মানুষ হেষ্টিংসকে নহে।

অদূর অতীতের এই কর্ম্মকুশলা সুন্দরী নারী আমাদিগের মনোরথে মাঝে মাঝে ভাসিয়া ওঠে। তাঁহাকে আমরা ভারতবর্ষে তিন মূর্ত্তিতে দেখিয়াছি। ভবঘুরে ছন্নছাড়া চিত্রশিল্পীর দারিদ্র্যক্লিষ্টা পত্নীরূপে, স্বামী-পরিত্যক্তা হেষ্টিংসের আশ্রিতারূপে, হেষ্টিংসের পার্শ্বে সহধর্ম্মিণীর গৌরবময় আসনে। দূর অতীতের সুলতানা রিজিয়া, সম্রাজ্ঞী নূর জাহান, অদূর অতীতের মণি বেগম, মহারাণী ঝিন্দন বাঈ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মকুশলা মহীয়সী নারীর পরিচয় আমরা পাই, তাঁহাদিগের সহিত হেষ্টিংসের প্রেয়সী বণিতা মেরিয়ান তুলনায় নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই, কারণ কোনও শাসনদণ্ড তিনি নিজে পরিচালনা করিবার সুযোগ পান নাই। সে গৌরবের অধিকারিণীও তিনি ছিলেন না। শক্তিশালী শাসনকর্তা হইলেও তাঁহার স্বামী একটি বণিক কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মেরিয়ান সে সময় বাংলা তথা ভারতবর্ষের ঘটনাবহুল কয়েকটি বছরের ও পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া হেষ্টিংসের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগ

শতাব্দী-সঙ্ঘ

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রেবা পাণ্ডুলিপিখানা খুলে' ঠিক ক'রে মেলে ধরূলে: গভীর রাত্রিতে, অনেক দূরে রেলের লাইনে ট্রেণের শব্দের কেমন যেন একটা উদাস আর গম্ভীর শব্দ; সীমা জানলার ধারে এসে বস্‌ল। চারদিন হ'ল চৈত্র এসেছে, বাতাসে তার চিহ্ন, গাছের পাতাতেও তার চিহ্ন, সীমা জান্‌লাটা সম্পূর্ণ ক'রে খুলে ফেল্‌লে—

"চুপ" যূথিকা রেবার ডান হাতটায় একটু মৃদু চাপ দিলে।

সভাপতি, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুবিমল সেন ঘরে ঢুক্‌লেন। মুহূর্তে সমস্ত ঘরের গুঞ্জন স্তব্ধ হ'ল। সঙ্ঘ-সম্পাদক জগৎ দাশ সভাপতিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন, সভাস্থ ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যারিষ্টার সাহেব আসন গ্রহণ করূলেন। প্রচুর করতালি-ধ্বনি শোনা গেল। সভার মধ্যে আবার একটু অস্পষ্ট গুঞ্জন—এক ঝাঁক নীল মৌমাছিকে যেন ব্যস্ত করা হ'য়েছে এই মাত্র!

"কি রকম লাগ্‌ছে বিগিনিংটা?" রেবা যূথিকার প্রায় কাণের কাছে মাথা নিয়ে এলো।

"সিম্‌প্লি ওয়াণ্ডারফুল—আমি তো আগেই তোকে ব'লেছি, তারপর যে রকম হেডিং দিয়েছিস্ 'অ-ক্ষ-রে-খা' বাব্‌বা: একেবারে পিওর জিওগ্র্যাফিক্যাল, সত্যি চমৎকার হ'য়েছে!"

"থাম্, তোর যত সব ইয়ে", রেবা যূথিকার কাছে আরো ঘন হ'য়ে এলো, "মানে, সভার মধ্যে গল্পটা লোক হাসাবে না তো রে?"

"জানিনা—তোর সঙ্গে আর কথাই বল্‌ব না আমি", যূথিকা বেশ গম্ভীর হ'য়ে গেছে।

"না ভাই, সত্যি রাগ করিস্‌নি, আমার যেন কেবলি ভয় করে, কি জানি, যদি—" রেবা হঠাৎ চুপ করল।

প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপরে সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগৎ দাশ উঠে দাঁড়িয়েছেন, হাতে একটা এক্‌সারসাইজ বুক খোলা, চোখের চশমাটা তিনি একবার ঠিক ক'রে নিলেন।

সভা নিস্তব্ধ হ'ল।

"আজ আমাদের" একটা অকারণ কাশি এনে তিনি গলাটাকে পরিষ্কার ক'রে নিলেন, "আজ আমাদের সঙ্ঘের উনবিংশ অধিবেশন, সভাপতি সুধীবর শ্রীযুক্ত সুবিমল সেন মহাশয় তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে এবং এই অকিঞ্চিৎকর সভায় যোগদান ক'রে আজ আমাদের কৃতার্থ ক'রেছেন, আমরা প্রথমেই তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যে সকল ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয় আজকের এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে আমাদের বাধিত ক'রেছেন, তাঁদেরও এই সুযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রাখ্‌লাম।" পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে তিনি আবার একটু কাশ্‌লেন। সামান্য হাত তালির শব্দ শোনা গেল।

"আমাদের এই শতাব্দী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য জানাবার জন্যে কয়েকখানি চিঠি আমি পেয়েছি; এর আগে সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনেই এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছিল, যাই হোক", শ্রীযুক্ত জগৎ দাশ চোখের চশমাটা আবার ঠিক ক'রে নিলেন, "আজ আরও একবার সে-কথা বলার প্রয়োজন হ'য়েছে। শতাব্দী সঙ্ঘের প্রথম এবং প্রধানতম উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা", সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে চেয়ে, হাতের খাতাটা তিনি বন্ধ করূলেন, "মানে সাহিত্যের নতুন দিক, নতুন চিন্তাধারার উন্নতি সাধন করা। আমাদের সভার নিয়ম, সভ্যেরা তাঁদের রচনাবলী এখানে এনে পাঠ করবেন, তারপরে আমরা, সমবেত ভদ্রব্যক্তিরা, সেই রচনাটার বিশেষ ভাবে সমালোচনা করব, যদি নতুন কিছু তাঁর মধ্যে দেখ্‌তে পাই, তাহ'লে আমরা তাঁকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দেব, ডিফেক্টস্—" তিনি বোঝাতে চেষ্টা করূলেন, "মানে ত্রুটি

থাক্‌লে আমরা তার উল্লেখ কর্‌তেও পশ্চাৎপদ হ'ব না।" সঙ্ঘ-সম্পাদক চুপ কর্‌লেন।

সমস্ত সভা আগের মতই নিস্তব্ধ। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে, তিনি হাতের সেই এক্‌সারসাইজ বুকটা আবার খুল্‌লেন, "এবারে আমাদের গত অধিবেশনের রিপোর্টটা পড়া হবে। গতবারে শতাব্দী-সঙ্ঘের অষ্টাদশ অধিবেশন এই বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। সভাপতি ছিলেন সুকবি বিমলেন্দু সরকার; সঙ্ঘ-সভ্যাদের অন্যতমা সুলেখিকা শ্রীমতী বেলা বসু একটী গল্প প'ড়েছিলেন। গল্পটীর নাম ছিল 'স্বর্গের দুয়ার খোলো'। গল্পটী বেশ সুন্দর হ'য়েছিল। তারপরে, ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতাটী আবৃত্তি করেন, আবৃত্তিও ভাল হ'য়েছিল। তারপরে সঙ্ঘের অন্যতম সুকবি শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী রায় একটী সুন্দর কবিতা পড়েন, সর্ব্বশেষে বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি' নামক প্রবন্ধ পাঠের পর সভার কাজ শেষ হয়। অনেক মাননীয় এবং মাননীয়া ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।"

সঙ্ঘ-সম্পাদক আবার চুপ কর্‌লেন।

সভার মধ্যে আগের মতই অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ হ'ল। "এইবার পড়া আরম্ভ হবে কিন্তু", যূথিকা রেবার হাতে মৃদু চাপ দিলে।

"হুঁ, আমার নামটা প্রথমেই দিয়েছে নাকি?"

"কি জানি, বোধ হয় না।"

"তা হ'লেই ভাল, ভাই।"

"তোর ওই এক স্বভাব, আগে দিলে ক্ষতিটা কি শুনি?"

"না—ক্ষতি আর কি; তবু—"

"হ'য়েছে, চুপ কর্‌ এখন" যূথিকা ওকে একরকম জোর ক'রেই চুপ করিয়ে দিলে।

সভাপতির ডান দিকে, কোণে, এ-যুগের অতি-আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত অশোক গুপ্ত ব'সে আছেন। এর আগে সঙ্ঘে আস্‌বার জন্যে তাঁকে বহুবার নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল, বহুবার অনুরোধ করা হ'য়েছিল, কিন্তু তিনি আস্‌তে পারেন নি। অবশ্য এর জন্যে তিনি প্রত্যেকবারেই লজ্জিত হ'য়েছেন, দুঃখিত হ'য়েছেন। এবারে, সঙ্ঘের সৌভাগ্যই বল্‌তে হবে, তিনি এসেছেন। আর আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি সভায় তাঁর আধুনিকতম রচনা থেকে কোন একটী কবিতাও পড়তে রাজী হ'য়েছেন। সঙ্ঘের এ একটা কম গৌরবের কথা নয়! একে তাঁর উপস্থিতিই তো দুর্লভ, তার ওপরে সভায় তাঁর কবিতা পাঠ; খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার বলা যায়! সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশ একবার গর্ব্বিত মুখে অশোক গুপ্তের দিকে চাইলেন।

অশোক গুপ্তের পাশেই, তাঁর প্রধান এবং প্রথম ভক্ত শ্রীযুক্ত অরুণেশ রায় ব'সে। চোখে রীমলেশ চশমা; ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন, বেশ টক্‌টকে সুন্দর রঙ— অতিশয় ভদ্র!

সভাপতি সঙ্ঘের নাম ছাপানো প্যাডখানা টেব্‌লের ওপরে টেনে নিলেন।

"সন্তোষবাবু, শুনছেন?"

সহঃ সম্পাদক সন্তোষ ঘোষ পেছনের দিকে চাইলো।

"কি ব্যাপার?"

"একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে" অমলেন্দুবাবু চেয়ারটা টেনে আরও একটু কাছে এগিয়ে এলেন।

"কি, বলুন" সন্তোষ বল্‌লে।

"একটা কবিতা এনেছিলাম।"

"বেশ, ভালই।"

"মানে, আপনি যদি আমার নামটা একটু এন্‌লিষ্ট করিয়ে দেন—"

"একটু আগে বল্‌লেই পার্‌তেন; সভা আরম্ভ হ'য়ে গেছে, এখন তো মুস্‌কিল!"

"আজ্ঞে, আপনি একটু চেষ্টা কর্‌লেই হবে।"

"দেখুন অমলবাবু, কিছু মনে কর্‌বেন না—"

"আজ্ঞে, আমার নাম অমলেন্দু বটব্যাল!"

"বেশ, অমলেন্দুবাবু, গতবারে দেখেছেনই তো আপনার কবিতাটা, মানে, সে রকম এ্যাপ্রিসিয়েশন্‌ পায়নি; আমি বলি কি, এবারে আপনি আর না-ই বা পড়লেন" বিরক্তিতে সন্তোষ চুপ ক'রে গেল।

"তা হ'লে থাক, মানে, এই সভার জন্যে এটা বিশেষ

ক'রে লিখেছিলাম কিনা" অমলেন্দু বাবু দীর্ঘশ্বাসকে কষ্টে চেপে রাখ্‌লেন মনে হ'ল।

"দাঁড়ান দেখ্‌ছি"—সন্তোষ চেয়ার থেকে উঠে একেবারে সোজা প্ল্যাট্‌ফরমের ওপরে চ'লে গেল। তারপরে সম্পাদকের কানে কানে কি বলে গম্ভীর ভাবে নিজের চেয়ারে এসে বস্‌ল।

"বলেছেন ?" আবার সেই স্নকাতর-প্রশ্ন !

"আজ্ঞে হ্যাঁ—" গম্ভীর ভাবেই সন্তোষ বল্‌লে।

"ধন্যবাদ।—"

সন্তোষ আর উত্তর দিলে না।

হঠাৎ বাইরে মোটর থামার শব্দ পাওয়া গেল। জগৎ দাশ তাড়াতাড়ি জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন, হুঁ, কুমারেরই মোটর বটে ! খাতাটা রেখে তিনি প্ল্যাট্‌ফরম্‌ থেকে নেমে পড়লেন।

একটু পরেই কুমার অলকেন্দুনারায়ণ ঘরে ঢুকলেন, দীর্ঘ স্থূল চেহারা। দেখ্‌লে অভিজাত শ্রেণীর বলে মনে না হওয়ার কোন কারণই নেই, সঙ্ঘ-সম্পাদক স্বয়ং তাঁকে হাত ধরে এনে সাম্‌নের বড় খালি চেয়ারটার ওপরে বসিয়ে দিলেন।

"বড্ড দেরী হ'য়ে গেল আমার—" অলকেন্দুনারায়ণ, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পরিশ্রমে একটু হাঁপাচ্ছিলেন মনে হ'ল।

"না—না, খুব বেশী দেরী করেন নি" জগৎ দাশ রিষ্ট্‌ ওয়াচের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "এইবার আমাদের সভা আরম্ভ হবে আর কি।"

সভাপতি প্যাডের দিকে চাইলেন: "প্রথমেই আপনাদের সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের একটী কবিতা আছে, তিনি পড়তে পারেন।"

ডান দিকের সারি থেকে সুন্দর মত একটী ছেলে উঠে দাঁড়াল, চোখে চশমা, হাতে একখানা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজ, হাতটা তার থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে। একটু পরে কবিতাটা সে ভালভাবেই পড়ে গেল, শীত ঋতুর ওপর লেখা, একটা সাধারণ কবিতা, মন্দ নয় বলা যেতে পারে, নমস্কার ক'রে ছেলেটী ব'সে পড়ল।

"কবিতাটী সম্বন্ধে আপনাদের কারও কিছু যদি বলার থাকে—" সেন সাহেব সমবেত ভদ্র-জনমণ্ডলীর ওপর দৃষ্টি বুলোলেন। নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্‌ সভা। স্থানটা অন্ধকারময় হ'লে সমাধিভূমি ব'লে ভুল করা যেতে পার্‌ত ! অগত্যা সভাপতি সম্পাদকের দিকে চাইলেন। সম্পাদক রুমাল দিয়ে মুখটা আবার মুছে নিলেন; "হ্যাঁ, কবিতাটী আমাদের ভালই লেগেছে।" দম দেওয়া মেশিনের মত সম্পাদককে মনে হ'ল, "বর্ণনাগুলি বেশ মনোরম আর নিখুঁত, তবে কবি যদি শব্দ-যোজনার দিকে আর একটু লক্ষ্য রাখ্‌তেন, তা হ'লে কবিতাটীর আঙ্গিক উন্নতি আরও একটু হ'ত, যাই হোক, কবিতাটি বেশ সুন্দর হ'য়েছে।" সম্পাদক চুপ কর্‌লেন। সভাপতি আবার সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের তা হ'লে ভালই লেগেছে ধ'রে নিতে পারি ?"

সভায় একটু অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠেই থেমে গেল।

প্রায় স্কুলের ছেলেকে প্রশ্ন করার মত জগৎ দাশ হেসে অশোক গুপ্তের দিকে চাইলেন, "আপনার ?"

অশোক গুপ্ত একটু হাসলেন—করুণার হাসি বলা যেতে পারে। এ-সব কবিতারও সমালোচনা তাকে কর্‌তে হবে নাকি ? বল্‌লেন, "খুব ভাল !"

সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন, "কবিতাটী সত্যিই খারাপ হয় নি, ইনি যেন আরও লেখেন, কবিতায় এঁর বেশ হাত আছে; তবে একটু পড়াশুনোও যেন সেই সঙ্গে করেন। একটা কিছু সৃষ্টি কর্‌তে হ'লে স্রষ্টার সাধনা দরকার, আমরা সাধারণতঃ সেই সাধনাই করে' থাকি না, এ দিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ, মোট কথা, কবিতাটী ভাল !"

সভাপতি আবার আসন গ্রহণ কর্‌লেন।

সভার মধ্যে এবার বেশ স্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ হ'ল।

"পারুল, ওই মেয়েটিকে নতুন মনে হচ্ছে না ?" বেলা বসু পারুলের দিকে চাইলে।

"কে ?"

"আরে ওই যে সেকেণ্ড রোয় কর্ণারে ব'সে আছে—" বেলা রেবাকে দেখিয়ে দিলে।

"হ্যাঁ, উনি নতুনই এসেছেন এখানে।"

"চিনিস নাকি তুই ?" বেলা জিজ্ঞেস করলে।

"আলাপ নেই, তবে চিনি।"

"ও ; পড়েন নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ, আশুতোষে—সেকেণ্ড ইয়ার !"

"লেখেন নাকি ?"

"শুনেছি তো, আজ এখানে ওঁর একটা গল্প পড়বার আছে।"

"ওঃ", বেলা চুপ করলো।

"কেন, আলাপ করবি নাকি ?" পারুল জিজ্ঞেস করলো।

"ইচ্ছে তো ছিল, নাম কি ওঁর ?"

"রেবা রায়—"

"রেবা রায় ? এ মাসের "প্রদীপে" ওঁর একটা গল্প আছে না ?"

"মনে হচ্ছে, উনি অনেক জায়গাতেই তো লেখেন।"

"বটে !" বেলা বসু আরও একবার ভাল ক'রে রেবার দিকে চাইলে।

সভাপতি আবার উঠে দাঁড়ালেন, "এইবার শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু একটী প্রবন্ধ পড়বেন।" সভা, মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার নিস্তব্ধ হ'ল।

প্রবন্ধটী, অতি আধুনিক বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে লিখিত হ'য়েছে—লেখক পাণ্ডুলিপি খুলে' পড়তে আরম্ভ করলেন।

"ও মশাই সন্তোষবাবু !"—সন্তোষ পেছন ফিরে দেখে, সঙ্ঘের অন্যতম গল্প-লেখক সূর্য্য সরকার পাঞ্জাবী ধ'রে টানছে !

"কি বলছেন ?"

আমার গল্পটা কোন প্রেসে দিলেন, এর পরেই নয় তো ?"

"না, আপনার অনেক নীচে আছে।"

"হ্যাঁ, তা হ'লেই ভাল, ওঃ গল্পটার যা স্প্লেনডিড্ ফিনিশিং হ'য়েছে ; সোমেন গুপ্ত তো শুনে অবাক্, আমাকে একেবারে জড়িয়েই ধ'রেছিল আর কি !"

"—ও মশায় শুনচেন ?" সন্তোষের পাঞ্জাবীতে আবার টান পড়ল।

"কি বলছেন ?—প্রবন্ধটা একটু শুনতেই দিন না।"

"আরে রাখুন আপনার প্রবন্ধ ; সেই খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড় তো ;—ও রবিঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধ বসু পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক কথা ব'লেছেন, আর কেন জ্বালানো আমাদের এই সব লিখে লিখে !" সূর্য্য সরকার কয়েক মিনিটের জন্য একটু চুপ করলেন, তারপরে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, "নিজের লেখা নিয়ে মশাই, বেশী কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু সেদিন ওরা আমার এই গল্পটা নিয়ে যা আরম্ভ করল, সে আর বলার কথা নয় ! সোমেন গুপ্ত তো স্পষ্ট বললে, 'ওটা সোজা শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দাও হে, দেখবে ট্রানস্লেটেড্ হ'য়ে মডার্ণ রিভিউ-টিভিউতে বেরিয়ে গেছে !' ওরা তো ভাবে, আমি একটা মস্ত বড় জিনিয়াস্"—সূর্য্য সরকার ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি বের ক'রে একটু হাসল।

প্রাবন্ধিক বিজয় বসু তখন প্ল্যাট্‌ফরমের ওপরে দাঁড়িয়ে গদ্য-কবিতা এবং ছন্দ-কবিতার প্রভেদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করছেন; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন—বিজয়বাবু সেটা উদ্ধৃত ক'রে, গদ্য কবিতা সোণার পাথর বাটী কি না, তা-ও বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

"সন্তোষবাবু, শুনছেন মশাই ?"

পেছন ফিরে সন্তোষ দেখলে—ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"আপনার কি চাই আবার ?" সন্তোষ একটু বিরক্ত ভাবেই ব্রজেনকে প্রশ্ন করল ; এরা সকলে মিলে প্রবন্ধটা ওকে শুনতেই দেবে না দেখা যাচ্ছে !"

"না, সে-রকম কিছু না ; একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম আর কি—"

"বেশ তো, বলুন না।"

"মানে, এবারের সভাটা বেশ বড় হয়েছিল, একটা আবৃত্তির ব্যবস্থা করলে ভাল হ'ত না ?"

"বড় দেরী ক'রে আপনারা সব পরামর্শ দিতে আসেন, এখন কি ক'রে হয় বলুন দেখি ?"

"না, মানে আজ করতেই হবে—তা বলছি না ; তবে হ'লে মন্দ হ'ত না। আমার সেই যতীন বাগচীর 'সিংহগড়'টা খুব ভাল তৈরী ছিল ; সেই—'সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে, পড়ে আছে শুধু গড়, এই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—"

"আঃ, থামুন না!"

মাতাকে নিবেদনের ভঙ্গীতে বিস্তৃত হাত দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে বস্‌লেন। "সভার মধ্যে একি আরম্ভ কর্‌লেন আপনারা? একটু সাধারণ জ্ঞানও থাকা উচিত আপনাদের।" সন্তোষ, শুধু বিরক্ত নয়, এবার রীতিমত রেগে উঠেছে। সভাপতি এদিকে ঈষৎ গোলমাল হওয়াতে একবার চাইলেন।

ওদিকে প্ল্যাট্‌ফর্‌মের ওপরে শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে বল্‌তে বল্‌তে 'বার্ণাড শ' আর 'সেক্‌স্‌-পীয়রে'র কী একটা তুলনা-মূলক সমালোচনার মধ্যে প'ড়ে ভীষণ রকম ঘেমে উঠ্‌ছেন। সভাপতি একটু সোজা হ'য়ে ব'সে বল্‌লেন: "থাক্‌, আপনি বিষয় থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছেন, দয়া ক'রে আপনার শেষ বক্তব্যটা জানালে বাধিত হব।"

বিজয় বসুর কাণ দুটো লাল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে "দাঁড়ান, বুঝিয়ে দিচ্ছি সব আপনাদের" বলে' আবার পড়তে আরম্ভ কর্‌ল।

তারপরে, শেষ পর্য্যন্ত অনেক বাদানুবাদের পর, অনেক যুক্তি-তর্কের পর প্রবন্ধের ঢেউ থাম্‌ল।

এইবার গল্প পড়বেন সঙ্ঘে নবাগতা এবং আমন্ত্রিতা উদীয়মানা লেখিকা শ্রীমতী রেবা রায়।

গল্পটীর নাম, 'অক্ষরেখা'। রেবা সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল:

গভীর রাত্রিতে, অনেক দূরে রেলের লাইনে ট্রেণের শব্দের মত, কেমন যেন একটা উদাস আর গম্ভীর শব্দ; সীমা জানলার ধারে এসে বস্‌ল। চারদিন হ'ল চৈত্র এসেছে, বাতাসে তার চিহ্ন, গাছের পাতাতেও তার চিহ্ন —সীমা জান্‌লাটা সম্পূর্ণ ক'রে খুলে ফেল্‌লে।"—

স্বচ্ছ, সুন্দর গতিতে গল্প এগিয়ে চল্‌ল। বেশ ঝর্‌ঝরে গল্প। ভাষার তীব্রতা আছে—শব্দবিন্যাসও প্রশংসনীয়। একটী মেয়ে একটী ছেলেকে কোন দিন ভাল বেসেছিল। অবস্থা বিপর্য্যয়ে মেয়েটিকে কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে দূরে স'রে যেতে হয়। ছেলেটীকে যেতে হয় আরও দূরে। দিন কাট্‌ছিল, তারপর ওদের এই অবস্থার মধ্যেই আবার ঘনাল দুর্য্যোগ; সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ওদের দেখা হ'ল। মিলনাত্মক, সুন্দর ঝক্‌ঝকে গল্পটী—প্রচুর প্রশংসা আর হাততালির মধ্যে গল্প শেষ হ'ল! রেবা নিজের জায়গায় বস্‌ল। ওর বুক তখনও দুর দুর ক'রে কাঁপছে!

"চমৎকার গল্পটী!" সভাপতি প্লাট্‌ফরমের ওপরে উঠে দাঁড়ালেন, "লেখিকার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল!" রেবা এবারে মাথা নীচু কর্‌লে, "গল্পটীর টেক্‌নিক—প্লট, ভাষা, প্রত্যেকটাই প্রশংসনীয়, সে দিক থেকে আমাদের কোন অভিযোগই নেই; তবে এ গল্প সম্বন্ধে আমার অন্য একটু কথা বলার ছিল"—রেবা সভাপতির মুখের দিকে চাইল একবার, "কথাটা হচ্ছে, গল্পের ষ্টাইলটা যাতে নিজস্ব হয়, সে-বিষয়ে লেখিকার একটু দৃষ্টি রাখা উচিত। ষ্টাইলটা অনেকটা অচিন্ত্য-গন্ধী; মানে অচিন্ত্যকুমারের বেশ কিছু প্রভাব আছে! অবশ্য এটা আমি খারাপ বল্‌ছিনা; তবে লেখিকা যখন প্রতিভাসম্পন্না, তখন, এটাকে সহজেই এড়াতে পার্‌বেন বলে'ই আমার ধারণা—এর বেশী আমার আর কিছুই বলার নেই!"

সভাপতি আবার আসন গ্রহণ কর্‌লেন। রেবা আগের মতই মাথা নীচু ক'রে রইল।

গল্প-লেখক সূর্য্য সরকার রেবার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, "নাঃ, মেয়েটি মন্দ লেখেনা মশাই"—পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য ক'রে আবার তিনি বল্‌লেন, "ওর লেখা আমি প্রায়ই প'ড়ে থাকি, 'প্রদীপে'ই ও বেশী লেখে দেখি"—সূর্য্য সরকার পকেট থেকে কৌটা বের ক'রে একটিপ নস্যি নিলে।

"এইবার গল্প পড়বেন" সভাপতি আবার উঠে দাঁড়ালেন, "শ্রীযুক্ত কুমার অলকেন্দু নারায়ণ মহাশয়"।

কুমার অলকেন্দুর গল্পের নাম, "আশ্চর্য্য প্রতিশোধ"। কুমার বাহাদুর সমস্ত গল্পটা ধীরে ধীরে প'ড়ে গেলেন; সমস্ত গল্পটাই ডিটেক্‌টিভ্‌ ধরণের ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। হত্যা, লুণ্ঠন, জুয়াচুরী, প্রভৃতির বহু চিত্র তাঁর গল্পে ভীড় ক'রে আছে, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে গল্প শেষ হ'ল।

সভা আগের মতই নিস্তব্ধ, কেবল জগৎ দাশ কয়েক-বার সামান্য হাততালি দিলেন, বল্‌লেন "চমৎকার

হ'য়েছে, কুমার বাহাদুরের এই নতুন রকম ক'রে গল্প লেখার প্রচেষ্টা সফল হোক, কামনা করি, তাঁর এই 'আশ্চর্য্য প্রতিশোধ' আমাদের খুব সন্তুষ্ট ক'রেছে।"

সভাপতি আবার উঠে দাঁড়ালেন, "আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এ-গল্প সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চান, তাহলে—"

সভা পূর্ব্বের মতই নির্ব্বাক্‌, নিস্তব্ধ! কাণ পেতে থাকলে কেবল কতগুলো লোকের নিঃশ্বাস-পতনের শব্দ শোনা যায়; কেউ কিছু বলবেন—এ-রকম কোন চিহ্নই কোথাও দেখা গেল না। অগত্যা সভাপতি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন, তাঁকেই এবার কিছু বল্‌তে হ'বে।

হঠাৎ পশ্চিম কোণে সুন্দর একটী ছেলে উঠে দাঁড়াল! ছিপ্‌ছিপে একহারা গড়ন, চোখে মোটা চশমা, বল্‌লে, "গল্পটী সম্বন্ধে আমার কিছু বলার ছিল, যদি অনুমতি দেন—"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! এখানে আসুন!—" সেন সাহেব আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটীকে ডেকে নিলেন।

অজয় একেবারে প্লাট্‌ফর্‌মের ধারে এসে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, "আমার ধারণা ছিল", একবার কুমারের দিকে চেয়ে তারপর সভার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সে বল্‌লে, "এখানে প্রকৃত সাহিত্যের চর্চ্চাই হ'য়ে থাকে। এ পর্য্যন্ত যে ক'টা অধিবেশনে যোগ দিয়েছি, তা'তে আমার এ-ধারণা পরিবর্ত্তন কর্‌বার মত কিছু ঘটেনি। কিন্তু আজ শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরের এই রকম ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প-রচনার প্রয়াস দেখে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হ'লাম। তার ওপরেও কাশীনাথকে (গল্পের একটি চরিত্র) আমরা ঠিক সাধারণ মানুষ হিসেবে ধর্‌তে পারি না। আমার মনে হয়, তাঁর চরিত্র-চিত্রণে লেখক বেশ ভুল ক'রেছেন; লতিকার চরিত্রও বিশেষ ফোটেনি—এ-রকম যা-তা কতগুলি নিছক আবর্জ্জনা রচনা ক'রে সাহিত্যের অপমান করার কি সার্থকতা থাকতে পারে জানিনা! আর সব থেকে আশ্চর্য্য লাগ্‌ল—এতেও আমাদের সঙ্ঘ-সম্পাদক তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন! সভাপতি মহাশয় এ-সম্বন্ধে সুবিচার কর্‌লে বাধিত হ'ব, এর বেশী আমার আর কিছু বলার নেই।"

গম্ভীর পাদক্ষেপে অজয় নিজের চেয়ারে ফিরে গেল।

সভাপতি আবার উঠে দাঁড়ালেন, এতখানি তীব্র সমালোচনা হ'বে, এটা তিনিও আশা ক'র্‌তে পারেন নি। বল্‌লেন, অজয়বাবু, (সম্পাদকের কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে অবশ্য) এই মাত্র যা বলে' গেলেন, তার অধিকাংশই সত্য, আমরা যখন সাহিত্যের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে কাজে নেমেছি, তখন সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত, সত্যিই আমাদের রচনাগুলি সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত হ'চ্ছে কি-না। আশা করি, কুমার বাহাদুর এবারে সেই দিকে একটু প্রখর দৃষ্টি রাখবেন—সাহিত্য সেবা যেন সাহিত্য-সেবাই হয়, সেটা সাহিত্য-সৎকারে পর্য্যবসিত হ'লে খুবই দুঃখের বিষয় হ'বে! যাই হোক—", সেন সাহেব পরবর্ত্তী লেখকের নাম পড়লেন, "এইবার শ্রীযুক্ত সূর্য্য সরকার তাঁর লেখা একটী গল্প পড়বেন।"

সেন সাহেবের কথায় সভার মধ্যে একটা মৃদু চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল—সূর্য্য সরকার উঠে দাঁড়াতেই সকলে চুপ কর্‌লেন।

সূর্য্য সরকারের গল্পের নাম, "কো-ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়্যালিজ্‌ম্‌!"

সভাস্থ সকলেই স্তব্ধ হ'লেন। অমলেন্দু বাবু বল্‌লেন, "নাম বটে একখানা।"

সূর্য্য সরকার, জগৎসিংহের সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই মুসলমান বীরটীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে পাণ্ডুলিপিখানা হাতে নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্‌মের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি গল্প পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। পড়বার সময়ে তাঁর হাত-পা রীতিমত দ্রুতবেগে এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত হচ্ছিল, মাঝে মাঝে মাথাও ঝাঁকাচ্ছিলেন; আবার পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে কড়ি-কাঠের দিকেও চাইছিলেন—তর তর করে তাঁর গল্প এগিয়ে চল্‌লো।

গল্পের ঘটনাটী বেশ! একটী ছেলে একটী মেয়েকে খুব ভালোবেসেছিলো; তারা দু'জনেই কলেজে পড়ত, তাদের একটা 'হবি' ছিল রোজ সন্ধ্যের সময়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠেতে পায়চারি করা! ওরা এতদিন কলকাতায় আছে, তবু একদিনও বোটানিকেল গার্ডেনে যায়

নি, রোজ সন্ধ্যে হ'লেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘাসে-ঢাকা সেই সবুজ মাঠটা ওদের ডাকৃত, এমন কি একদিন নায়ক ১০২ ডিগ্রী জ্বর গায়ে নিয়েও সন্ধ্যের সময়ে মাঠটা ঘুরে গেছে।

এখন, এরই মধ্যে এলো ওস্‌মান, নায়কের জীবন দুবিসহ হয়ে উঠ্‌ল; আর এরই কয়েকদিন পরে নায়িকা সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে ব'সেই নায়ককে পানের সঙ্গে কি যেন খাইয়ে দিলেন। পরের দিন মাঠেই গল্পের নায়ককে মৃত দেখা গেল। এরই কিছু পরেই, গল্পের শেষ! এদিকে ওদিকে কয়েকবার হাততালি পড়ল—সভার মধ্যে আবার মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হ'ল।

সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন।

"অজয় বাবুর পুরো নাম জানিস্?" রেবা যুথিকার আঁচল টান্‌লে।

"না—তো", যুথিকা এদিকে চাইলে, "বোধ হয় অজয় চক্রবর্ত্তী; দাঁড়ানা একটু পরেই তো উনি গল্প পড়বেন।"

"গল্প পড়বেন?"

"হ্যাঁ, তাইতো জানি।"

"উনি গল্প লেখেন বুঝি?" রেবা আবার যুথিকার আঁচল টান্‌লে।

"বাঃ, তা—ই জানিস্ না? চমৎকার গল্প লেখেন, এই সঙ্ঘেই কয়েকবার ওঁর গল্প আমি শুনেছি।"

"বাইরে কোথাও তো লেখেন না?"

"না, উনি লেখা ছাপতে চান্ না, ওই ওঁর এক দোষ!"

"ওঃ" রেবা চুপ ক'রে রইল।

ওদিকে সভাপতি তখন আধুনিক যুগের সুবিখ্যাত কবি অশোক গুপ্তের কবিতা পড়া হবে জানিয়ে সবে মাত্র আসন গ্রহণ ক'রেছেন।

অশোক গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন—করতালি ধ্বনিতে সভা প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম হ'ল। অশোক গুপ্ত কবিতা পড়তে আরম্ভ কর্‌লেন। রীমলেশ চশমা পরা, ইউনিভার্সিটীর উজ্জ্বল রত্ন অরুণেশ রায় সোজা হ'য়ে ব'সলেন।

কবিতাটী আধুনিক যন্ত্র-যুগকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা। বিংশ শতাব্দী যে যন্ত্রের তলায় বার বার পিষ্ট হ'য়ে দলিত, মথিত ও বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, সেই কথাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় সুন্দর ক'রে ব্যক্ত ক'রেছেন। প্রচুর প্রশংসাধ্বনির মধ্যে অশোক গুপ্ত নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন।

এইবার অমলেন্দু বাবুর কবিতা!

সভা আবার নিস্তব্ধ হ'ল।

অমলেন্দুবাবুর কবিতাটীর নাম 'ফেরিওয়ালার কান্না!'

রাস্তার ধারে, ফুটপাথের ওপরে, রোজ সন্ধ্যার পর অস্পষ্ট অন্ধকারে যে সব দরিদ্র ফেরিওয়ালারা চিনাবাদাম, গেঞ্জি, মোজা, সাবান, তরল আলতা, আশ্চর্য্য অদৃশ্য গুপ্ত কালি, কমলালেবু, দাড়িকামানো ব্রাস প্রভৃতি নিয়ে বসে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে বিচরণশীল লাল পাগড়ীযুক্ত পাহারা-ওয়ালাদের লাঠীর আশঙ্কায় শশঙ্কিত চিত্তে তাদের পণ্য-দ্রব্য বিক্রী করে, এবং পুলিশ দেখলেই অন্ধকারময় গলির মধ্যে পলায়ন করে, তাদেরই পক্ষে ও পাহারাওয়ালাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অমলেন্দুবাবু সমস্ত কবিতাটী ভ'রে অভিযোগ করেছেন!

অনেকক্ষণ, দীর্ঘ ক্রন্দনের পর তাঁর কবিতা শেষ হ'ল। সভার একপ্রান্ত থেকে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল, "প্রবন্ধটী আমাদের ভালোই লেগেছে"। সভাপতি সেই দিকে একবার চাইলেন, কিন্তু কে ব'লেছে, ঠিক করা গেল না।

সভার মধ্যে আবার একটা হাসির রোল উঠ্‌ল, অস্পষ্ট কোলাহল আরম্ভ হ'ল এদিকে ওদিকে। সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন, "এইবার গল্প পড়বেন শ্রীযুক্ত অজয় চক্রবর্ত্তী"।

অজয়, পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। চোখের চশমাটা রুমাল দিয়ে ভালো ক'রে মুছে নিলে;—গল্পটীর নাম 'উত্তর মেরু'!

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, স্পষ্ট স্বরে অজয় পাণ্ডুলিপি থেকে গল্পটা পড়তে আরম্ভ ক'র্‌ল।

একটী শিক্ষিতা, নির্য্যাতিতা তরুণীর জীবনের করুণ কাহিনী, ভাষা ও শব্দবিন্যাস অতি সুন্দর। সকলের ওপরে আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত ভাবে ফুটেছে মেয়েটীর মনস্তত্ত্ব। ডায়ালগ্‌গুলিও চমৎকার! পরিষ্কার, সুন্দর, ঝর্‌ঝরে গদ্য,—সমস্ত সভা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

মেয়েটার জীবনে কত দুর্য্যোগই না এল, কত সংঘাত, কত অন্তর্দ্বন্দ্ব,—সে, এক কথায়, যেন বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল! তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার সেই সংঘাত অতি চমৎকার ভাবে অজয় ফুটিয়ে তুলেছে; অদ্ভুত মনোবিকলন! সূর্য্য সরকার স্তব্ধ হ'য়ে অজয়ের দিকে চেয়ে ব'সে রইলে; জগৎ দাশ খাতা হাতে ক'রে ঠিক একই ভাবে প্ল্যাট্‌ফরমের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। অমলেন্দু বাবু ফেরিওয়ালার শোক তখন অনেকটা ভুলে গেছেন; সেন সাহেবের চোখে জল, সভায় আরও কয়েকজন কাঁদ্‌ছিলেন।

গল্প শেষ হ'ল।

সমস্ত সভা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সমস্ত সভায় যেন একটা আনন্দের ঢেউ এল, "চমৎকার হ'য়েছে অজয় বাবু", "ওঃ মারভেলাস্ অজয়দা—" "নাঃ বাস্তবিকই অদ্ভুত গল্প হ'য়েছে মশাই, আমি তো একেবারে কেঁদেই ফেলেছিলাম আর কি, আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্ ইউ অজয় বাবু" সূর্য্য সরকার ডান হাতটা অজয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

সভাপতি আবার উঠে দাঁড়ালেন, "গল্পটা সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নেই, এ-গল্পের প্রশংসা আমি এক কথায় কর্‌তে পার্‌ব না। শুধু একটা কথা বলার ছিল—লেখকের কাছ থেকে আমার পত্রিকার জন্যে গল্পটা আমি নিতে চাই।" পরে জগৎ দাশের দিকে ফিরে, আবার সভার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আপনাদের সঙ্ঘে এ-রকম একটা প্রতিভাবান্ এবং উদীয়মান সাহিত্যিকের পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হ'লাম—অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম।" অজয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "অজয় বাবু, আপনি যদি কাল দয়া ক'রে আমার ওখানে গল্পটা নিয়ে আসেন, তাহ'লে বড়ই আনন্দিত হ'ব, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা বলার দরকার আছে।"

অজয় সম্মতি জানালে।

আবার প্রচুর করতালি ধ্বনির মধ্যে সভাপতি আসন গ্রহণ কর্‌লেন। সঙ্ঘ সম্পাদক খাতা খুলে জানিয়ে দিলেন, সভা, আজকের মত এখানেই শেষ হ'ল; পরবর্ত্তী অধিবেশনের তারিখ আবার যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

চক্‌চকে, কালো আর মসৃণ পিচের পথের ওপরে অজয় নেমে এল। অনেক রাত হ'য়েছে, সাম্‌নে, খাবারের দোকানের ঘড়িটায় প্রায় দশটা বাজে।

অজয় তাড়াতাড়ি পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। এতটা রাত করা আজ তার উচিত হয়নি। মা এতক্ষণে সমস্ত খাবার গুছিয়ে নিয়ে হয়তো পথের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন; হয়তো কত কী দুর্ঘটনার কথাই ভাব্‌ছেন। দেরী হ'লে মা তো যত সব বাজে কথাই ভাবেন, অজয় আরও তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল—এতটা রাত করা তার কিছুতেই উচিত হয় নি।

অথচ এখানে না এসেও সে পারে না, চল্‌তে চল্‌তে অজয় ভাব্‌লে; এখানে ওর উপস্থিতি কেমন যেন নেশার মত হ'য়ে গেছে; সঙ্ঘের প্রত্যেক অধিবেশনেই ও যোগ দিয়েছে; অজয়ের একটু হাসি পেল, অথচ এ বিলাস কি ওর সাজে? ঘরে বিধবা মা, আজ তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকী, কলেজেরও মাইনে বাকী প'ড়েছে! কাল কি খাবে, রোজ সন্ধ্যের আগে ওকে ভাবতে হয়। একটা টিউশানিও হাতছাড়া হ'য়ে গেছে দু'দিন—ঠিক সময়ে হাজির হ'তে পারেনি ব'লে, অজয়ের আবার হাসি পেল। সাহিত্য কি তার জন্যেই? এ সব নেশা সত্যিই দূর করা উচিত; পাগলের মত অজয় আবার খানিকটা নিজের মনেই হাস্‌লো।

নির্জন পথ, ক্বচিৎ দু' একটা মোটরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—চারদিক নিস্তব্ধ।

অথচ, আজকে ওর গল্পটা প্রশংসাও পেয়েছে কম নয়, ব্যারিষ্টার সাহেব ডেকেছেন—গল্পটার যদি কিছু মোটা দাম দেন; অজয়ের ভাবী লাভের আশায় মুখটা একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। বলা যায় না, সেন-সাহেব খুবই ভাল লোক, হয়তো গল্পটার ওপরে তিনি সুবিচারই কর্‌বেন।

অজয় একটা গলির মধ্যে ঢুকলো, আরও খানিকটা গেলেই তাদের ঘর; দেখা যাক্, কাল সকালেই অজয় সেন সাহেবের কাছে যাবে।

নিউ মার্কেটের সাম্‌নে, একটা মোড়ের ওপরে মোটরটা বিচিত্র শব্দ ক'রে থেমে গেল, অজয় ততক্ষণে ফুটপাথের

ওপরে কোন রকমে ছিটকে পড়ে নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছে; ড্রাইভার একেবারে মারমুখো হ'য়ে তেড়ে এল— "রাস্তাঘাট ভাল ক'রে দেখে চল্‌তে পারেন না মশাই?"

"কে? অজয়বাবু?"

প্রকৃতিস্থ হবারও সময় অজয় পেল না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে রেবা রায়, গাড়ীতে আর কেউ নেই।

"আপনি?" রেবা একেবারে ধারে স'রে এল, আপনাকে আমার ভীষণ দরকার, সেদিন এত তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন, ভাল ক'রে কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না, চলুন না একবার আমার সঙ্গে।" রেবা গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলে, "কাজ আছে আপনার?"

"কাজ?—না, মানে—" অজয় এতক্ষণে কিছু প্রকৃতিস্থ হ'তে পেরেছেন মনে হ'ল।

"তা হ'লে আসুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা ভীষণ দরকার ছিল" রেবা দরজাটা আরও ভাল ক'রে খুলে দিলে।

অজয় প্রায় অভিভূতের মত মোটরে উঠে বস্‌ল। "কিন্তু সেদিন আপনার কাজ ছিল বোধ হয়?"

"না—হ্যাঁ মানে অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল কিনা!" অজয় কোন রকমে উত্তর দিলে।

মোটর তখন চৌরঙ্গী দিয়ে চ'লেছে।

ড্রইং রুমে এনে রেবা অজয়কে বসালে, "বসুন অজয় দা, আমি এখুনি আস্‌ছি ওপর থেকে।"

অজয় স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল, এ কি ব্যাপার? প্রথমেই অজয় দা!

"ও অজয় দা ব'লেছি বলে' রাগ করলেন বুঝি?" রেবা অজয়ের কাছে এগিয়ে এল, "না, সত্যি আপনি আজ থেকে আমার দাদা হ'লেন। আর আমাকে কক্‌খোনো 'আপনি' বল্‌তে পারবেন না, কেমন?"

অজয় আগের মতই চুপ ক'রে রইল, কি যে বল্‌বে, কিছুই ঠিক করতে পার্‌ল না।

"বসুন, আমি এখুনি আস্‌ছি" ব'লে রেবা ওপরে চলে গেল

ঠিক্‌, এই ঘটনার একমাস পরে কাগজে দেখা গেল— আগামী ১০ই ডিসেম্বর শতাব্দী সঙ্ঘের বিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে, সভাপতি বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত সরোজ বসু। রেবা রায় একটী কবিতা পাঠ করবেন এবং সঙ্ঘের আরও অন্যান্য সভ্যেরাও গল্প, কবিতা পড়বেন।

অজয় কাগজটা রেখে উঠে দাঁড়াল। আজও ওকে একবার রেবাদের বাড়ী যেতে হবে। রেবা এই মাস-খানেক হ'ল কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে; অজয়ের প্রায়ই সে সব কবিতাগুলি সংশোধন ক'রে দিতে হয়। অজয় যে ভাল কবিতাও লিখ্‌তে পারে, তা রেবাই প্রথমে আবিষ্কার ক'রেছিল; 'অজয় দা'কে নিয়ে রেবা যে কি করবে, ভেবে পায় না—বাস্তবিক অজয় দার মত একখান জিনিয়াস্‌ সে দেখেইনি!

দশই ডিসেম্বর এল।

সন্ধ্যা ৬টার সময়ে অধিবেশন আরম্ভ। কথা ছিল, বিকেলে অজয় এলে এক সঙ্গে মোটরে ক'রে রেবা সভায় যাবে। কিন্তু পাঁচটা বেজে গেল, তবু অজয় এল না। আজ দু'দিন হ'ল রেবাদের বাড়ী অজয় আসেনি— অসুখ-টসুক হল নাকি? রেবার রীতিমত ভয় হল, না, হয়ত একেবারে সভাতে গিয়েই দেখা হবে—যে খেয়ালী মানুষ; এ রকম লোক নিয়ে আর পারা যায় না! রেবা তাড়াতাড়ি মোটরে উঠ্‌ল।

খানিকটা এসেই রেবা হঠাৎ সোফারকে মোটর থামাতে বল্‌লে, একটা শব্দ ক'রে মোটরটা ফুট পাথের ধারে থেমে গেল। অজয় আগেই রেবাকে দেখ্‌তে পেয়েছিল, মোটরের দিকে এগিয়ে এল; কি রকম যেন শীর্ণ চেহারা, কেমন যেন রুক্ষ ভাব, এ কি ব্যাপার, এত দেরী করলেন যে? সভায় যাবেন না?" রেবা মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলে, "অসুখ ক'রেছে নাকি আপনার?"

"না, তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি ওখানে" অজয় একটু ম্লান হাস্‌ল।

"এখন কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

"তোমার কাছেই।"

"আমার কাছে ?"

"হ্যাঁ, তোমার একখানা চিঠি ছিল।" অজয় একটা খাম রেবার হাতে দিলে, "তুমি যাও, আমি যাচ্ছি এখুনি।"

মোটর ছেড়ে দিল।

ক্ষিপ্র হাতে রেবা খামটা খুলে ফেল্‌লে, শতাব্দী-সঙ্ঘের ছাপানো একখানা ফর্‌ম্; আগের দিনের তারিখ দেওয়া, রেবা প'ড়ে গেল :

প্রিয় অজয়বাবু,

সঙ্ঘের পক্ষ থেকে, এবং সম্পাদকের গুরুতর কর্ত্তব্য হিসেবে, আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে গত উনবিংশ অধিবেশনে কুমার বাহাদুরের গল্পের ওপরে আপনি যে নির্লজ্জ এবং হীন মন্তব্য ক'রেছিলেন, তাতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক'রেছেন এবং আমরাও যথেষ্ট লজ্জিত হ'য়েছি। ভাল গল্প লেখেন বলে'ই যে অন্য গল্প-লেখককে আপনার অপমান করার অধিকার আছে, এ কথা আপনিও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। যাই হোক, সঙ্ঘের আগামী বিংশ এবং তৎপরবর্ত্তী কোন অধিবেশনেই আপনি যেন উপস্থিত না থাকেন। সভ্য তালিকা থেকে আজ আপনার নাম বাদ দেওয়া হ'ল। সম্পাদকের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যের দিকে চেয়ে আশা করি, আপনি আমার ওপরে রাগ কর্‌বেন না। নমস্কার।

ইতি— জগৎ দাশ

— সম্পাদক, 'শতাব্দী-সঙ্ঘ'।

নীচে ছোট ক'রে লেখা : কাল রাত্তিরে মা মারা গেছেন, তোমার সঙ্গে সম্ভবতঃ আর দেখা হবে না—আজ সন্ধ্যা ৭ টার ট্রেণেই আসাম যাচ্ছি। — অজয়

রেবার হাতের চিঠিটা তখনও কাঁপছিল, কয়েক মিনিট রেবা চুপ ক'রে বসে রইল, কিছুই যেন তার কর্‌বার নেই, এর পরেও তাকে সভায় গিয়ে কবিতা পড়তে হ'বে ? রেবার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছিল; এখুনি গাড়ী ঘোরানো যায় না ? নাঃ রেবা গাড়ীর গদিতে আবার এলিয়ে পড়্‌ল। সভায় তাকে যেতেই হবে; কবিতা পড়তেই হবে, নাম ছাপান হ'য়ে গেছে, না যাওয়াটাই ভীষণ অভদ্রতা; রেবা তা পার্‌বে না, যেতে তাকে হবেই।

খানিকক্ষণ রেবা সেই ভাবেই রইল।

তারপর, আস্তে আস্তে সে কবিতাটা বের করলে। কবিতাটার নাম 'পাতাল কন্যা'।

শেষের দুটো ষ্ট্যান্‌জা অজয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়েছিল। সংশোধন করার পরে অতি সুন্দর হ'য়েছে কবিতাটা, রেবা প'ড়ে গেল, ঠিক এইখান থেকে অজয় লিখে দিয়েছে, চমৎকার হ'য়েছে; রেবা আস্তে আস্তে প'ড়্‌তে লাগল :

"রাজার কুমার ছুটেছে দারুণ বেগে
ললাটে তাহার ঘর্ম্ম ঝরিছে কত,
—শালের শাখায় উষ্ণীষ গেছে ছিঁড়ে
(সোণার হরিণ ধরাই বিড়ম্বনা!)

রাজার কুমার, আসাই কি তার সোজা!
সুগভীর বন চিরকালই নির্দ্দয়;
সাগর কন্যা—পাতাল কন্যা জাগো,
তোমার রাজার কুমার মরেছে বনে!"

রেবা কবিতাটা বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে। মোটর ততক্ষণে বড় গেটের মধ্যে দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে প'ড়েছে। রেবা সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌ল।

না—না এ কবিতা সে কোনরকমেই পড়তে পার্‌বে না।—রেবা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; এ কবিতা সে কিছুতেই পড়্‌বে না। রেবার পা দুটো কাঁপ্‌ছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে ওর রীতিমত কষ্ট হচ্ছে : না, না এ কবিতা কিছুতেই পড়া চলে না। রেবার কাণে কাণে আবার কে সুর ক'রে বল্‌লে :

'তোমার রাজার কুমার মরেছে বনে'—

রেবা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে কবিতাটা সিঁড়ির ওপরে ছড়িয়ে দিলে। আসাম যাচ্ছে অজয়, ৭ টার গাড়ীতে, নিশ্চয়ই সেই তার মাসীমার কাছে—

"আসুন, আসুন মিস্ রায়" জগৎ দাশ অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, "কবিতাটা এনেছেন ত ?"

"না" রেবা কি যে বল্‌বে, ঠিক কর্‌তে পার্‌ল না, "কবিতাটা আমি ভুলে ফেলে এসেছি জগৎবাবু।"

"আঃ আপনারা এত ভুল করেন—এখনও সময় আছে, শীগ্‌গীর গাড়ী ক'রে ঘুরে' আসুন না একবার।"

"না—না, মানে কবিতাটা হারিয়ে গেছে—আজ সারা দুপুর খুঁজেও ওটা পেলাম না" রেবার গলা কেঁপে গেল, "আমার নামটা আজকের লিষ্ট থেকে দয়া ক'রে কেটে দিন জগৎবাবু। সত্যি এর জন্যে আমি ভীষণ দুঃখিত" রেবা তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে এসে বস্‌ল।

সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে—সভায় সকলেই এসেছেন, শুধু সভাপতি আসেননি। জগৎবাবু নিজেই মোটর নিয়ে তাড়াতাড়ি সভাপতির বাড়ী চলে' গেলেন।

প্রায় সাতটার কাছাকাছি সভাপতি এসে উপস্থিত হ'লেন।

সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। আজকের সভা গত অধিবেশনের থেকে বেশ বড় হ'য়েছে। সমস্ত সভায় আর তিল ধারণের স্থান নেই। জগৎ দাশ প্ল্যাট্‌ফর্‌মের ওপরে এসে দাঁড়ালেন। এবারে ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা কবিতা আবৃত্তি কর্‌বেন—তিনি সামনেই ব'সে আছেন। সূর্য্য সরকারের এবারে একটা অতি অদ্ভুত আর সুন্দর গল্প পড়া হবে, গল্পের নাম:—'এ্যাকসিডেন্ট ইন্ দি বোটানিকেল গার্ডেন!' সোমেন গুপ্ত এটা প'ড়ে শ্রীযুক্ত সরকারকে একটা সোণার মেডেল দেবেন বলেছেন। এঁদের পাশেই কুমার অলকেন্দুনারায়ণ ব'সে আছেন। তিনি আজ আর কিছু পড়বেন না, এ এক মাসের মধ্যে তিনি কিছু লিখ্‌তেই পারেননি। কুমার বাহাদুরের পাশেই সমব্যথী কবি শ্রীঅমলেন্দু বটব্যাল। তিনি এবারে যে সব কুলীরা ডকে, ক্রেণে, রেলে প্রভৃতি জায়গায় সামান্য জীবিকার্জ্জনের জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে, তাদেরই পক্ষ নিয়ে সুদীর্ঘ চার পৃষ্ঠাব্যাপী একটী অনবদ্য সুন্দর কবিতা রচনা ক'রেছেন!

প্ল্যাট্‌ফর্‌মের ওপরে শ্রীযুক্ত জগৎ দাশ গত অধিবেশনের রিপোর্ট পড়া শেষ কর্‌লেন।

সাতটা বেজে দশ মিনিট। চশমার ভেতর দিয়ে রেবা রিষ্ট ওয়াচটার দিকে চাইলে।

জগৎ দাশ মাথা তুলে নির্দ্দিষ্ট কোণটার দিকে তাকালেন: অজয় নেই। ওইখানেই ও বরাবর বস্‌ত, আজকে একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক অজয়ের চেয়ারটা অধিকার ক'রেছেন, জগৎ দাশ আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন, তাঁর দোষ কি? সঙ্ঘ-সম্পাদকের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব কঠিন—সেখানে অন্যায় যেন একটুও না ঘটে!

ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাট্‌ফর্‌মটা খালি, পেছনে পড়ে আছে শুধু ঝক্‌ঝকে দুটো রূপালী লাইন, আর—কোন্ রাজকুমারের আরণ্যক মৃত্যুর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, রেবা চশমার মধ্যে চোখ বুজ্‌লে।

প্ল্যাট্‌ফর্‌মের ওপরে দাঁড়িয়ে ব্রজেন চট্টোপাধ্যায় সভাপতি এবং সভাস্থ সকলকে নমস্কার করলেন, সুবিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'সিংহগড়' কবিতাটী এইবার তিনি আবৃত্তি কর্‌বেন। ব্রজেনবাবু জামার হাত দুটী গুটিয়ে নিলেন।

শতাব্দী-সঙ্ঘের বিংশ অধিবেশন আরম্ভ হ'ল।

গান

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

তব পথে সখা কুসুম ছড়ান
বকুল মাধবী মালতী,
বাজিছে মধুর মুরজ মুরলী,—
প্রেমের আলোয় আরতি!

ফেনিল বাসনা উতল সিন্ধু,
গরজে কমল পায়,
বাঁশীর লহরী, করুণা বিন্দু,
পরশে থামিয়া যায়

রাজসভাতলে নাচে দেবদাসী
বিকাশি সে-রূপ ভারতী!

জাপান-ভ্রমণ

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

সাংহাই বন্দর।

এপারে জাপানী অধিকৃত চীনারাজ্য, ওপারে ইন্‌টারন্যাশন্যাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট এবং ফ্রেঞ্চ কন্‌সেশন ইত্যাদি।

পরদিন সকালে উঠেই ভাবলাম, এবেলা চীনা অঞ্চলটা ঘুরে দেখা যাক। যাবার উদ্যোগ কর্‌ছি, এমন সময়ে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক নিষেধ কর্‌লেন। বল্‌লেন, এখানে দেখ্‌বার তেমন কিছু নেই। তাছাড়া জাপানী - সৈনিকের অত্যাচার এখনও কমে নাই। বিশেষ আপনি ব্রিটিশপ্রজা—উৎপীড়নের মাত্রাটা আপনার উপর একটু বেশী হ'তে পারে। এমন কি গুপ্তচর মনে ক'রে সর্ব্বশরীর খানাতল্লাসী, শেষ পর্য্যন্ত কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প······

সাহেবের কথাটা সঙ্গতই মনে হ'ল। নিরস্ত হলাম। ডেক থেকেই কৌতুহলী দৃষ্টিপাতে সদ্য স্বাধীনতাবঞ্চিত চীনবাসীর চলাফিরা লক্ষ্য করতে লাগলাম। সমবেদনাময় কল্পনার রঙীন পটভূমিকায় তাদের ব্যথাতুর মনের নির্ব্বাক্ কাহিনী প্রতিফলিত হয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখা যায়। চোখে পড়ে ঐ হাস্যমুখর চীনাশিশুর সানন্দ ছুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, আহার - বিহার। পৃষ্ঠদেশে সন্তানবাঁধা চীনা-মায়ের উদাস নয়নের অসহায় দৃষ্টি কেমন যেন করুণার উদ্রেক করে! অপরাহ্নে জাহাজ কোম্পানীর লঞ্চে অপরপারে আন্তর্জাতিক এলাকায় বেড়াতে বেরুলাম। সঙ্গে একমাত্র বাঙ্গালী-বন্ধু মিঃ বর্ম্মণ।

লঞ্চখানা বন্দরের যেখানটায় ভিড়্‌লো, ঠিক তার পাড়ে সম্মুখেই একখানা অর্দ্ধভগ্ন বাড়ী প্রথমেই চোখে পড়লো। লঞ্চের কর্ম্মচারীর কাছে জানলাম, গত বৎসর জাপানীদের বোমায় বাড়ীখানি বিধ্বস্ত হয়। সেইজন্য জাপ-সরকার পতাকা না-বুঝার কৈফিয়ৎ দেয় এবং দুঃখ প্রকাশ করে। দেখ্‌লাম বাড়ীখানির মেরামত চলছে এবং তা নাকি জাপানীদের খরচায়। স্মরণ হ'ল, ঘটনাটার বিবরণ পূর্ব্বেই কাগজে পড়েছিলাম।

চীনা-জননী ও তাহার পৃষ্ঠদেশে বাঁধা সন্তান

সহরটা অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখ্‌লাম। সাংহাই উর্ব্বর উত্তর-চীনের বাণিজ্য-কেন্দ্র। ইহার তোরণ-পথেই আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতা বাণিজ্য-বাহনে উত্তর-চীনে প্রথম প্রবেশ লাভ করে। প্রাচীন চৈনিক-সভ্যতার সুকুমার প্রাণ-স্পন্দন এখানে আজি দীর্ঘদিন কবরিত। বৈজ্ঞানিক বলে বলীয়ান প্রতীচীর দুর্ব্বার প্রাণশক্তি

সাংহাইয়ে চিত্তচমৎকারী শিল্প-নগরী নির্ম্মাণ করেছে। নদীর পারে পারে বিচিত্র ফ্যাক্টরী। যান-বাহন, লোক-সমাগমে সমগ্র সহর সরগরম। বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে বিশ্বের সর্ব্বজাতীয় লোক এখানে হাট বসিয়েছে। স্থবির চীনের বিপুলাঙ্গ এদের অনির্ব্বাণ শোষণের শোণিত জোগায়। পণ্য-শুল্কের সুবিধা বলে' এখানে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য চলে ভাল এবং তা প্রায় সবই বিদেশীর করতলগত। আত্মবিক্রীত স্বদেশবাসী চীনা নরনারী যে কি দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত—তা তাদের দেখলেই আন্দাজ হয়। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে নিপীড়িত চীনা নির্জ্জন পল্লীবাস ছেড়ে নিরাপদ সাংহাই সহরে এসে ভীড় পাকিয়েছে।

আহাররত চীনা-বালক

ফলে জিনিষপত্রের দাম এবং তাদের দৈন্য উভয়ই সমানানুপাতে গিয়েছে বেড়ে! একটা উৎকট অসামঞ্জস্য। কি নির্ম্মম ভাগ্যের পরিহাস! নয়নের দর্শন আর মনের ভাবনা মিলে অন্তরটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। আমি ফিরলাম। মিঃ বর্ম্মণ একাকীই ফ্রেঞ্চ কন্‌সেশন দেখতে গেলেন।

ঘাটে পৌছে শুনলাম, জাহাজ কোম্পানীর লঞ্চ ছাড়ার তখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকী। এতটা অপেক্ষা! সবুর সইলো না। ডিঙ্গিতে পার হবার মনস্থ করলাম। পাড়ে পাড়ে খানিকটা এগিয়ে এক ডিঙ্গীওয়ালাকে অপরপারের তালামা জাহাজ দেখিয়ে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলাম—কত ভাড়া?

চীনা মাঝি অনর্গল কি বকে গেল; চন্দ্রবিন্দু আর অনুস্বার-বাহুল্য শব্দ ছাড়া বিন্দুবিসর্গ আর কিছুই বুঝলাম না। নৌকার পাটাতন ঝাড়ার বহরে উঠে বসবার আগ্রহান্বিত ইঙ্গিতটা বেশ ধরা পড়লো। ভাড়ার পরিমাণটা না জানায় একটু ইতস্ততঃ করছি, এমন সময়ে জনৈক শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্ট পেছন হ'তে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ভাবনা হ'ল, অন্যায় কিছু হয়নি তো! সবিশেষ জেনে সাহেবটি চীনা-ডিঙ্গিতে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, এদের ডিঙ্গিতে যাওয়া আপনার নিরাপদ নয়। অনেক বদ্‌মায়েস্ আছে, বিদেশী লোক পেলে অন্যায় অত্যাচার-উৎপীড়ন ওরা ক'রে থাকে। পয়সার জন্য এমন কি প্রাণনাশও করতে পারে! এসব পল্লী অঞ্চল তেমন সুশাসিত নয়। যাহোক্, সার্জ্জেণ্টের নির্দ্দেশমত কিছু বেশী ভাড়া দিয়ে একখানা লঞ্চে এসে জাহাজে উঠলাম।

ঘণ্টা দেড়েক পরে মিঃ বর্ম্মণ ফিরলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ফ্রেঞ্চ কন্‌সেশন কেমন দেখলেন? বললে, আর বলবেন না—আপনাকে ছেড়ে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূরে গিয়ে পড়ি। অচেনা রাস্তা ঠিক না করতে পেরে কি বিপদেই পড়লাম! আরও মুস্কিল—কেউ ভাষা বোঝে না। আকার ইঙ্গিতেও বোকা চীনাগুলোকে বুঝাতে পারিনে। এরা যে ভীষণ দরিদ্র—তার পরিচয় পেলাম। সন্ধ্যার সময় দুই রাস্তার এক মোড়ে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি—এমন সময়ে এক চীনা এগিয়ে এসে একটি তরুণীর ছবি দেখিয়ে ভাঙ্গা ইংরাজিতে বললে, ১৬।১৭ বছর বয়েসের যুবতী চীনা সুন্দরী চাই? দুই ঘণ্টায় এক ডলার। উত্তর দিলাম, ধন্যবাদ, প্রয়োজন নেই। তবুও ব্যাটা পিছন ছাড়ে না। অনুরোধ উপরোধ করতে করতে সঙ্গ নিলে। ভয়ও হ'ল। হঠাৎ এক পাঞ্জাবী পুলিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই আমাকে পৌছে দিয়ে যায়।

২রা সাংহাই বন্দর হ'তে জাহাজ ছাড়লো। কয়েক-ঘণ্টার মধ্যেই ইয়াং সিকিয়াং নদীর মোহানা ছাড়িয়ে আবার চীন-সমুদ্রে এসে পড়লাম। জাহাজ পূর্ব্বাভিমুখী অবিরাম চলেছে। পশ্চিমে বিস্তৃত চীনদেশ দূর দিগন্ত-

সীমায় ধূমায়িত হয়ে আসে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সবুজাভ দ্বীপপুঞ্জ দূরত্বের ব্যবধানে ঢেউয়ের প্রতীতি জন্মায়। মনে হয় যেন ঢেউগুলি জমাট বেঁধে গিয়েছে। সম্মুখে এসিয়ার উদীয়মান সূর্য্য জাপানের স্বপ্নমুখর ছবি মানস-পটে উঠে ভেসে। বিলীয়মান অপরাহ্নের অস্তগামী রবির রক্তরশ্মি অবসাদময় চীনের অস্পষ্ট তটরেখার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তরে-বাহিরে একটা উদাসীন উত্তাপহীন পরিস্থিতি। বিরহ-মিলন, হারানো-পাওয়ার আবেশময় অব্যক্ত একটা আন্তর অনুভূতি। মনের করার মত বর্ত্তমানে কি সম্পদ্ সে অর্জ্জন করেছে। অবচেতনার গভীরে চীন যায় তলিয়ে আর অনাগত অদৃশ্য জাপানের প্রতি মনটা আবার সজাগ হয়ে উঠে।

পরদিন প্রাতরুপাসনা সেরে ডেকে এসে বসলাম। তখনও ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত! আমি ছাড়া আর কেহ জাগেনি। সূর্য্যদেবও নয়। তবে তার জাগরণের আভাস পূব গগনে সূচিত হচ্ছে। সূর্য্যাস্তের চেয়ে সূর্য্যোদয়ই আমায় বেশী পুলকিত করে। প্রভাতী রবির আগমন নিত্য নতুন লাগে, চিত্তাকাশে একটা সুমধুর সঞ্জীবতা আনে—আশার

জাপানী-বোমা-বিধ্বস্ত ভগ্ন-অট্টালিকা

কল্পাকাশে ফুটে উঠে অতীত চীনের সেই সমুন্নত সমুজ্জ্বল বিপুল বৈভব। মানবতার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে তার গৌরবময় দর্শন, জ্ঞান, সভ্যতা, সংস্কৃতির অমর অবদান! চীন আজ মহিমাহারা শ্রীহীন। ভারতেরই মত বিরাট্ অঙ্গের জড়তায় হয়তো চীনের আত্মা আজ নিদ্রিত। আর এই প্রাচ্যেরই ক্ষুদ্র জাপান? আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদানবের যাদুস্পর্শে সে উন্মাদ। শক্তির সংঘর্ষে আজ সে সমগ্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে আহ্বান করছে অসীম উদগ্র স্পর্দ্ধায় বিপুল চীনকে গ্রাস করতে সে উদ্যত। ভাবি, কিন্তু ভাবীকালে তাকে অগ্রবহ এবং স্মরণীয় শিহরণ তুলে। বৃক্ষবল্লরী বেষ্টিত এবং পাখীর প্রভাতী-বন্দনা-মুখরিত আশ্রমের কথা মনে হয়। মনে হয় উৎকট কোলাহলময় কলিকাতা মহানগরীর ভোরের নিস্তব্ধ নিঝুমতা। আর এই অনন্ত অব্ধির বুকে বৃক্ষ নাই, বাড়ী নাই, মাটি নাই, নাই পাখীর কলরব। কিছু নাই শুধু আছে অসীম নীলিমার মাঝে আমার অস্তিত্বের একটা অচঞ্চল অনুভূতি। সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের এই অখণ্ড অবকাশ-মুহূর্ত্তে নিজের পরিচয় পেলাম অনন্তের পট-ভূমিতে নিজের চেহারা দেখার অবসর হ'ল। সত্য সত্যই—

"আমার মনের জান্‌লাটি
আজ হঠাৎ খুলে গেল
তোমার মনের দিকে।"

সমুদ্র আর তার তরঙ্গের মতই সর্ব্বব্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রাণের সাম্য ও বৈষম্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সঙ্কোচন-প্রসারণ প্রত্যক্ষ হ'ল। বিশ্বের হৃদয়স্পন্দনের যোগাযোগে চিত্ত আমার হিল্লোলিত হ'য়ে উঠলো।

"মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান।"

সুপ্রভাত! কি এত ভাবছেন?

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। চেয়ে দেখি হাসিমুখে ডাক্তারবাবু সামনেই দাঁড়িয়ে। বাস্তবতায় ফিরে এলাম। বললাম, এমন কিছুই নয়।

অদূরে একখানা জাহাজ দেখিয়ে ডাক্তার বললে, জাপানীদের মাছ ধরার কৌশল দেখুন। সাংহাই-জাপানের মধ্যে সারা সমুদ্র পথে এমনি বহু মাছধরা আড্ডা আছে। জাহাজ নয়তো যেন একটা ফ্যাক্টরী। বরফ তৈরী হতে মাছ রক্ষণের ব্যবস্থা (Cold Storage) সব কিছুই আছে। মাঝে মাঝে উড়োজাহাজ এসে এই সব জাহাজ থেকে মাছ সংগ্রহ করে জাপানের বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে দেয়। জাপানীরা ভাত আর প্রচুর মাছ খেয়েই তো এত শক্তি অর্জ্জন করেছে। সস্তাও—পাঁচ ছয় পয়সা সের।

দেখলাম, জাহাজখানা নঙ্গরাবদ্ধ আর ৭০।৮০খানা নৌকা ইতস্ততঃ মৎস্য শীকাররত। মনে হ'ল নৌকাগুলি জাহাজের সঙ্গে লম্বা লম্বা শিকল দিয়ে বাঁধা। জাপানের উদ্যম ও প্রাণের পরিচয় বেশ অনুভব করলাম। ভাবি আমাদেরও তো নদীমেখলা সাগরবিধৌত বঙ্গদেশ—কিন্তু কোথায় আমরা?

কথাপ্রসঙ্গে জানলাম, আগামী কল্য সকাল ৯টায় মোজি বন্দরে জাহাজ ভিড়বে এবং দুইদিন অপেক্ষা করবে। ইচ্ছে করলে মোজি থেকে ট্রেণে ঐ দিনই কোবে পৌঁছান যায় এবং সেজন্য অতিরিক্ত ট্রেণভাড়াও লাগবে না।

মাটির জন্য মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। জাহাজ আর জলের একঘেয়েমীতে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছি। মোজি হতে ট্রেণে যাওয়াই স্থির করলাম।

এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু অতি দুঃখের সঙ্গে বললেন, আজই আপনার সঙ্গে শেষ রাত্রি-যাপন। এতদিন এক সঙ্গে কি আনন্দেই না থাকা গিয়েছিল! যাহোক আপনার সম্মানার্থে নৈশ-ভোজের আয়োজন করবো। আপনিই তার প্রধান অতিথি। নিছক নিরামিষের ব্যবস্থা হবে! ডাক্তারবাবুর নিবিড় আত্মীয়তা আমার মর্ম্মস্পর্শ করলো।

কয়েকজন যাত্রী ও কর্ম্মচারী এই ভোজে যোগ দিলেন। প্রচুর আয়োজন, ডাক্তারের সুপটু তত্ত্বাবধানে সবই বাঙালী ধরণে প্রস্তুত। দীর্ঘদিন পরে "কে, সি, দাসে"র কৌটায় রক্ষিত রসগোল্লা ভোজের চরম আনন্দ দিলে। স্বাদের বিশেষ তারতম্য অনুভব করা গেল না। আমাকে কেন্দ্র করেই আনন্দ কোলাহল চললো। অনভ্যস্ত আমি কিন্তু ডাক্তারের আন্তরিকতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হ'লেও তেমন ভাবে পুলকোচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে পারলাম না।

ভোজ-পর্ব্ব সমাপ্ত হ'ল। আমরা এসে ডেকে আসন গ্রহণ করলাম। রাত্রি ৯টা। নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশ। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। নীলাকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আর জলে তারই স্নিগ্ধ প্রতিবিম্ব। সমগ্র ব্যোম ব্যাপিয়া শুভ্র জ্যোৎস্নার প্লাবন। বিশ্বসৃষ্টির এত সৌন্দর্য্য, এত সুষমা আগে আর দেখিনি। নগ্ন নিসর্গরাণী অপরূপ রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এ রূপসুধা আকণ্ঠ পান করেও তৃপ্তি নেই। মন স্বভাবতই গভীরে মগ্ন হয়ে যায়। সত্যিই অনুভব করি—

"মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।"

এ তন্ময় অবস্থায় সঙ্গীদের গল্পগুজবে যোগ দেওয়া এক রকম জোর করে'।

রাত্রি দশটায় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। কল্পনার পাখা মেলে মনটা কখন উড়ে এসেছে বাংলার শ্যামল কোলে। মানস-নয়নে দেখছি ভাগীরথীর তীরে তীরে পুণ্যস্নানকামী বিচিত্র নরনারীর ভীড়, পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন দলের হরিধ্বনি, চন্দননগর সঙ্ঘতীর্থে আশ্রমী ভাইবোনেদের সানন্দ

সমাবেশ! ভাবি, হয়তো কলিকাতার ত্রিতল চাতালে সহকর্ম্মিরা উৎসুক দৃষ্টি ফেলে রাহুগ্রাস লক্ষ্য করছে আর আমারই কথা ভাবছে। কিন্তু নাঃ! কোথায় আমি আর কোথায় তারা? চার সহস্রাধিক মাইলের ব্যবধান! হেথা সবে রাহুগ্রাস আরম্ভ আর সেথা মুক্তি! মানসিক যোগসূত্র আকস্মিক ছিন্ন হয়ে গেল। নিষ্কলঙ্ক চাঁদিমার আলোর ঝর্ণা নয়নে লেপিয়া কেবিনে এসে শুয়ে পড়লাম।

•

সারা সকাল জিনিষ পত্র গোছানো এবং নামবার জন্য প্রস্তুত হ'তেই কেটে গেল। এই কেবিন, এই জাহাজ, এর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর অজ্ঞাতসারেই যেন কেমন একটা হাল্কা আসক্তি এসে গিয়েছিল। মনটা খচ্ খচ করতে লাগলো। কোবেতে আমাদের নিয়ে যাবার পূর্ব্ব ব্যবস্থা ছিল কিন্তু অচেনা মোজিতে কোন অভ্যর্থনা নেই। একটা অজানা আশঙ্কা অনর্থক চিত্ত চঞ্চল করে তুলতে লাগলো।

ঠিক নয়টার সময়ে জাপানের কোরাণ্টিনে (Quarantine) জাহাজ থামলো। এখান থেকেই টিকা দেওয়া, পাশপোর্ট পরীক্ষা ইত্যাদি হ'ল সুরু। আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। দেখলাম দু'জন ইংরাজকে পাশপোর্ট ব্যাপারে প্রায় ঘণ্টাখানেক নাস্তানাবুদ হতে হ'ল। ব্রিটিশের প্রজা আমরা; তাই রাজার জাতকে যে পীতাঙ্গ জাপের নিকট এমন কড়া কৈফিয়ৎ দিতে হ'তে পারে, সে ধারণা আমাদের নেই, দেখতেও অভ্যস্ত নই। স্বাস্থ্যবিষয়ে জাপানী অফিসারকে ভীষণ রকম সজাগ, লক্ষ্য করলাম। শুনলাম জাহাজের মালপত্র এমন কি জাহাজ পর্য্যন্ত নির্দোষ (sterilize) করার পরে তবে বন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। পরে একটি স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীতে এর যে কি সুফল তার প্রমাণ পাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমগ্র জাপানে মাত্র একটি লোক কলেরায় মারা গেছে বলে' যতদূর স্মরণ হয়, আমি সেখানে দেখেছিলাম।

পৌনে এগারটায় মোজি বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করলো। নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত টিলাসমন্বিত কতকগুলি দ্বীপচিত্র যেন সমুদ্রের উপর ইতস্ততঃ ভাসছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পর্ব্বতচূড়ে ও গাত্রে ছবির মত কাঠের বাড়ীগুলি অনেকটা আমাদের শিলংএর ধরণের। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চিত্রাপিতের মতই স্বাধীন জাপানকে আমি প্রথম অভিনন্দন করলাম।

চিন্তারত চীনা-বালক

বৈশাখ মাস হ'লেও সাংহাই ছাড়ার পরই শীতের আমেজ বোধ হয়েছিল। কিন্তু মোজিতে পৌঁছে বেশ শীত বোধ হ'তে লাগলো। গরম পোষাকের ব্যবহার লক্ষ্যে পড়লো। জাহাজ-কর্ম্মচারিদের নিকট বিদায় নিয়ে আমি ও'মিঃ বর্ম্মণ নামবার যোগাড় করছি এমন সময়ে ডাঃ ব্যানার্জ্জি হ্যাটকোট্-পরা এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডাক্তারের পুরোণো বন্ধু ইনি। থাকেন কোবেতে, কি একটা কাজে মোজিতে এসেছিলেন। আশ্বস্ত হ'লাম। পরিচয়ে জানলাম, বাড়ী কলিকাতায়; নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস। জাপানে ৪।৫

বৎসর আছেন, এখানকার ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটির ইনি সম্পাদক। দাস মহাশয়ের সঙ্গে কাষ্টম হাউসে চল্‌লাম। জিনিষ পত্রের পরীক্ষা হ'ল। মুস্কিলে পড়লাম, নস্যির টিন নিয়ে। জাপানী অফিসারটিকে আর বোঝাতে পারি না যে নস্যি চীজটা কি! দাস মহাশয় অফিসারটিকে বুঝালেন যে This is a medicated substance for cold. আর আমাকে বাংলায় বললেন যে, নস্যি ব্যবহার ওদের অজ্ঞাত, তামাক জানলে শুল্ক আদায় করে নিত।
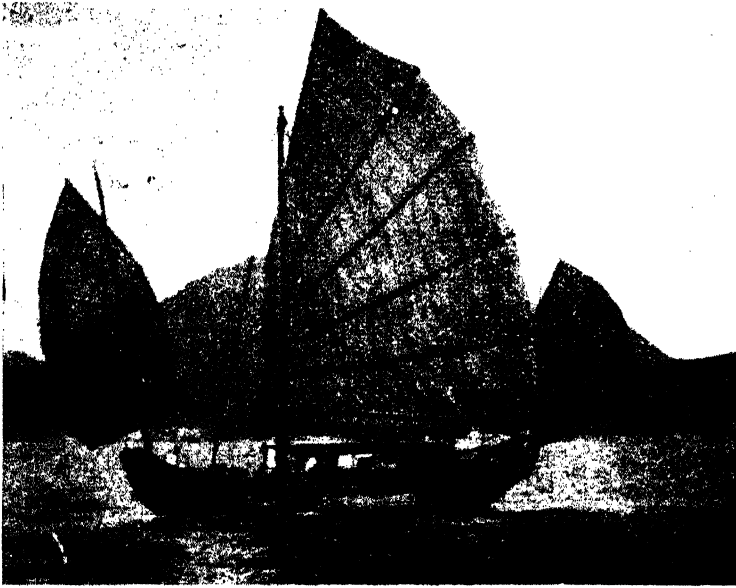
চীন-সমুদ্রের নৌকা

মোজি ষ্টেশনে পৌঁছে দাস মশায় এক জন কুলীকে (porter) ডেকে আমাদের ভিজিটিং কার্ড ও সিট নম্বর দিয়ে তাকে মাল-পত্তর নিয়ে যেতে বল্‌লেন এবং আমাকে ষ্টেশন-ফটকের নিকট একটু অপেক্ষা করতে বলে' কোথায় যেন কি কাজে গেলেন। মস্ত বড় ষ্টেশন। যাত্রীর ভিড়ও খুবই। আমি উৎসুকভাবে নূতনের পরিচয় করতে লাগলাম। প্রথমেই কুলীর ব্যবহার আমায় আশ্চর্য্য করলে। না ডাকলে এরা কেউ আসে না। অদূরে তাদের বসবার ব্যবস্থা আছে। সুন্দর সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত। মাঝখানে লম্বা লম্বা টেবিল আর তারই দু'ধারে বেঞ্চি পাতা। দেখলাম কুলীরা বসে বসে সংবাদ পত্রাদি পড়াশুনা করছে। যাত্রীর ডাকে যথানিয়ম পালামত আসে।

ইতিমধ্যে আমাকে ঘিরে প্রায় ৬০।৭০ জন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কৌতুহলী জনতার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাদের সকৌতুক হাসি, গা-টেপাটেপি, সবিস্ময় উপভোগের বিষয় বস্তুটি যে আমি—তা বুঝতে বাকী রইলো না। ভারি মুস্কিলে পড়লাম। ভাষা জানি না যে, কারণ জিজ্ঞাসা করি বা ট্রেণে উঠে বসি। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এ অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সটান ট্রেণের দিকে হাঁটা দিলাম। ও মা! সমগ্র জনতা দেখি আমার পিছন নিয়েছে। আশে পাশের লোকগুলো পর্য্যন্ত আমাকে দেখা মাত্রই থমকে থেমে যায়। ছেলেগুলো তো হেসে লুটিয়ে পড়ে! ভাবি, ঢিল মারবে না তো? কি বেয়াদপ এই জাপানীরা!

এমন সময়ে দেখি দাস মশায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছেন। এসেই বললেন, "শীগ্‌গীর চলুন ট্রেণের আর সময় নেই।"

"কি অশিষ্ট এই জাপানীগুলো"- চলতে চলতেই ঘটনাটা খুলে বললাম।

দাস মশায় হাসতে হাসতে বললেন, যস্মিন্ দেশে যদাচার। একে তো বিদেশী, তার উপর ধুতি-চাদর পরে' আছেন। এখনও তো স্কুলের ছেলের পাল্লায় পড়েননি। এ কৌতুহল মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এদের বিচিত্র কিমনো পোষাক পরে' যদি কোন জাপানী মেয়ে আমাদের কলকাতার পথে বেরোয় তো ওখানকার লোকের কৌতুক দৃষ্টি তাকেও অতিষ্ঠ করে তুলবে।

ট্রেণে উঠে বসতে মিনিট তিনেক পরে ১১টা ৫৫মিঃ-এ গাড়ী ছাড়লো। কুলীর ভদ্রতা ও সততায় মুগ্ধ হ'লাম।

শুনলাম, আমরা যদি ট্রেণ নাও ধরতে পারতাম তো কুলীটা আমাদের কার্ডের লিখিত গন্তব্যস্থানে মাল পৌঁছে দিত। ন্যায্য পাওনা ছাড়া বখ্‌শিষ্‌ দিলেও এরা সহজে নিতে চাহে না। জাতিটার এত আত্মসম্মান জ্ঞান যে, ভিক্ষুক একরকম এদের মধ্যে নেই বললেও চলে।

নতুন দেশের খুঁটিনাটি সংবাদ আমি দাস মশায়কে জিজ্ঞাসা করি—আর তিনি বহুদিন পরে দেশী লোক পেয়ে দেশের নানাবিধ বিশেষ রাজনৈতিক সংবাদ জানতে চান। এমনি করেই সারাটা পথ কাটলো।

ওদের ট্রেণের বন্দোবস্ত দেখেই বুঝলাম—আমাদে সঙ্গে ওদের কি তফাৎ! আমাদের দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতই ও-দেশের সমগ্র ট্রেণখানা। আমাদের কামরায় আরও দু'জন ভারতীয় ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও অনেক আলাপ হ'ল। এঁরা একবার লঞ্চ ও আর একবার ডিনার খেয়ে এলেন। অনেক অনুরোধ সত্বেও আমার আর খেতে যেতে প্রবৃত্তি হল না। আমাদের সামনেই এক জাপানী দম্পতি বসেছিলেন। সন্ধ্যার সময়টা মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। বুঝলাম না। দাস মশায় বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাকে সারাদিন না খেতে দেখে মেয়েটি কিছু ফল খেতে দিতে চাচ্ছেন এবং মিঃ দাসও খেতে অনুরোধ করলেন, নচেৎ তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন। ভেতরটা একটু ইতস্ততঃ করলেও স্বীকার হ'লাম।

মেয়েটি 'রেষ্টুরেণ্টে কার' হ'তে ছুরি ও থালা এনে অতি সযত্নে দুটো কমলালেবু ছাড়িয়ে একটি আপেল কেটে স্নেহভরে প্লেটখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে যেন অসীম তৃপ্তি লাভ করলেন। ওদের ভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে উহা গ্রহণ করলাম। এদের এই অযাচিত অমায়িকতায় মুগ্ধ হ'লাম।

রাত্রি ১০টায় কোবে সহরের সান্নোমিয়া ষ্টেশনে গাড়ী ধরলো। জাপ-দম্পতির নিকট বিদায় নিয়ে আমরা অবতরণ করলাম। অভিবাদন প্রত্যভিবাদন প্রভৃতি শিষ্টতার মাত্রাধিক্য সারাপথই লক্ষ্য করে চমৎকৃত হ'লাম। আমরা দৃষ্টির বাইরে না-পড়া পর্য্যন্ত দেখলাম,
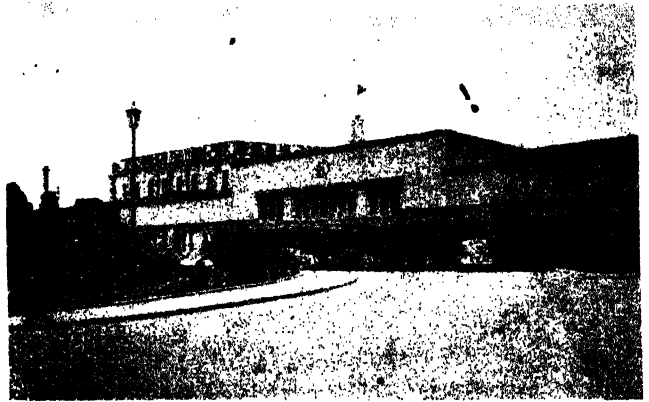
কোবের রেল ষ্টেশন : সান্নোমিয়া

মেয়েটি মাথা নীচু করেই আছেন। মনে প্রশ্ন জাগে, এত স্নেহার্দ্র ও বিনয়াবনত যাঁরা তাঁরা রণক্ষেত্রের এইরূপ নৃশংস নরহত্যা করে কোন প্রেরণায়?

ট্যাক্সি একটা সুদৃশ্য বাড়ীর ফটকে এসে থামতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো — আলোর অক্ষরে (ইংরাজী) লেখা **'ইণ্ডিয়া লজ'**।

গান

কুমারী সুলেখা নন্দী (রাণী)

বাজি মন্দির দ্বার খোল।
আগমনী গানে বিশ্ব-ভুবনে
মঙ্গল ধ্বনি তোল

বাজিছে শঙ্খ মন্দির তলে,
আরতি প্রদীপ উজলিয়া জলে,
মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীত গাহি সকল দুঃখ ভোল।

গান ও স্বরলিপি

মিশ্র—কাফি

বিরহে মোর আকাশ ছিল ছেয়ে
করুণ কালো মেঘে
মিলনে মোর এল গগন বেয়ে
পুলক ঝরে বেগে।

এই যে কাহার ছোঁয়া এসে
হৃদয়ে মোর পড়ে হেসে
রাঙা রঙের দলগুলি তাই ফোটে
প্রাণের পরশ লেগে।

কথা—শ্রীনমিতা মজুমদার

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমিলন মুখোপাধ্যায়

II {পা পা পা -মজ্ঞা | পা -া -া -া I সা জ্ঞা -া ঋা | সা -া -া ণ্দ্ I
বি র হে ০ | মো ০ ০ র্ আ কা শ্ ছি | ল ০ ০ ছে০

সা -া -া -া | জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞরা সরা I রজ্ঞা -া -মা -পা | মা -জ্ঞা ঋা -সা} I
য়ে ০ ০ ০ | ক রু ০ণ কা০ লো০ ০ ০ ০ | মে ০ ঘে ০

সা দা দা -া | দা -া দা পা I মা -পা দা -পা | মা -মপা মগা -া I
মি ল নে ০ | মো র্ এ ল গ ০ গ ন্ | বে ০০ য়ে ০

-া -া -া -া | সা জ্ঞা -মা পা I পা -া -া -া | মা -জ্ঞা ঋা -সা I
০ ০ ০ ০ | পু ল ক্ ঝ রে ০ ০ ০ | বে ০ গে ০

জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞরা সরা | রজ্ঞা -া -মা -পা I মা -জ্ঞা ঋা -সা | -া -া -া -া II
ক রু ণ০ কা০ | লো০ ০ ০ ০ মে ০ ঘে ০ | ০ ০ ০ ০

II {মা দা দা না | না না -া -া I র্সা -র্ঋা র্ঋা র্সনা | র্সা -া -া -া I
এ ই যে কা | হা ০ ০ র্ ছোঁ ০ য়া ০এ | সে ০ ০ ০

পা র্ঋা র্ঋা -া | র্ঋা -া -া -া I র্সা -র্ঋা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা | র্সা -া -া -দা} I
হৃ দ য়ে ০ | মো ০ ০ র্ প ০ ড়ে হে | সে ০ ০ ০

-র্সা -া -া -া | র্সা র্জ্ঞা -া র্সর্রা I র্রজ্ঞা -া -া -া | র্জ্ঞা -র্মা র্জ্ঞা র্ঋা I
০ ০ ০ ০ | রা ঙা ০ র০ ঙে০ ০ ০ র্ | দ ল্ গু লি

র্সা -া -া দর্সা | র্সা -ণা -দা -মা I র্সা -া -া -া | পা দা -ণা দা I
তা ০ ০ ই | ফো ০ ০ ০ টে ০ ০ ০ | প্রা ণে র্ প

মা -মা -মা -া | জ্ঞঋা -া -া -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
র শ ০ ০ | লে ০ ০ ০ গে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

মার্ক্সীয় ডায়লেক্টিক্স্

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন

"প্রবর্ত্তকে"র শ্রাবণ সংখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে, বস্তুবাদী সাহিত্যের দুইটী ধারা আছে। যথা:— মেকানিক্যাল মেটিরিয়েলিজম্ ও ডায়লেকৃটিকেল মেটিরিয়েলিজম। এক্ষণে ডায়লেকৃটিক্স্ বিষয়ে আলোচনা করিব। ডায়লেকৃটিক্স্ তর্কশাস্ত্র-সম্মত এক প্রকার বিচার-পদ্ধতি। চেয়ার কি, সে বিষয় জানিতে হইলে টেবিল, খাট প্রভৃতি দেখিয়া চেয়ার কি নয়, সে বিষয়েও জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। এজন্যই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কোনও বিষয়ের মীমাংসার জন্য ডায়লেকৃটিক্ বিচারপদ্ধতি অনেক সহায়তা করে। প্রাচীন গ্রীসে Zeno of Elea সর্ব্বপ্রথমে ডায়লেকৃটিক্ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সক্রেটীস ও প্লেটো ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বেদান্ত দর্শনেও ঐ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। উহাকে মহাবিদ্যা বলা হইত। কিন্তু প্রাচীনকালে সর্ব্বত্রই উহা তর্কশাস্ত্রের (Logic) একটী পদ্ধতি মাত্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ক্যাণ্ট, হিগেল ও মার্ক্সের প্রভাবে উহা খোদ দর্শন শাস্ত্রের মধ্যেও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আধুনিক চিন্তারাজ্যে (dynamic) গতিশীলতা সঞ্চার করিয়াছে।

ডায়লেকৃটিক্স্ অনুসারে প্রত্যেক জ্ঞানের মূলে একটা বাদ (Thesis) ও প্রতিবাদ (anti-thesis) আছে; এবং ঐ দুইটীর সম্মিলনে (union of two opposites) একটা নূতন সংবাদ (Synthesis) সৃষ্ট হয়। ধরুন, একটী চেয়ার আছে—উহা হইল বাদ (Thesis)। তাহা হইলে আলমারি, খাট, টেবিল প্রভৃতি দেখাইয়া বলা যায় যে, ওগুলি চেয়ার নয়,—উহা হইল প্রতিবাদ (anti-thesis)। এখন "চেয়ার" ও "চেয়ার নয়", এ দুইটী বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করিবার জন্য বলা যাইতে পারে যে, ঐ চেয়ার, টেবিল, আলমারি সবই আসবাব-পত্র (furnitures)। এখন আবার আসবাব-পত্র কথাটা হইল বাদ; সুতরাং কাঠের খুটী দেখাইয়া বলিতে পারি যে, উহা আসবাব নয়; তাহাতে আমরা "কাঠ" কথাটা পাইব। তারপর "কাঠ" ও "কাঠ নয়" এই বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়া "জড় পদার্থ" কথাটা আমরা পাইব। তারপর 'জড় জগৎ' ও 'চিন্ময় জগৎ' এই প্রকার বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়া হিগেল চরম সত্যের (ultimate reality) সন্ধান পাইয়াছেন।

হিগেল বস্তুবাদী ছিলেন না। ফুয়েরবেখ্ (Fuerbach) প্রথমে আস্তিক দর্শনের প্রতিবাদকল্পে হিগেলের ডায়লেকৃটিকের সঙ্গে মেকানিকেল মেটিরিয়েলিজমের তথ্য মিলাইয়া—বস্তুবাদে গতিশীলতা সঞ্চার করেন। মার্ক্স্ পরে উহাকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের সৌধ রচনা করেন। উঁহাদের মতে, পদার্থজগতই একমাত্র সত্যবস্তু, মন নামক জিনিষটা পদার্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি। মেকানিকেল মেটিরিয়েলিজ্‌মে গতিশীলতা নাই, তাহা ছাড়া উহার দ্বারা জড়পদার্থ, প্রাণশক্তি ও মনের মধ্যে যে অনতিক্রমনীয় ব্যবধান আছে, তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এজন্যই মার্ক্স্ ডায়লেকৃটিক্ বস্তুবাদ অবলম্বন করিলেন। হিগেল তাহার ডায়লেকৃটিক্সের মূল আধার ধরিয়াছেন ভাবকে (Idea)। মার্ক্স্ মনে করেন—Idea, যাহা কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই, তাহা অর্থহীন। চিন্তাকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কে স্থান পাইতে হইবে এবং ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা হইল বহির্জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র। ব্যক্তি অন্য একটা কিছুর যন্ত্র মাত্র। এই "অন্য একটা কিছু" মার্ক্সের মতে শেষটায় পার্থিব জগতের চলাচল ও পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে (The ideal is nothing else than the material world, reflected by human mind and translated into terms of thought —Marx)। সমস্ত কিছু পরিবর্ত্তন—চিন্তাজগতের বা বাস্তব জগতের—নির্ভর করে বিপরীত ভাবপূর্ণ চিন্তা বা বস্তুদ্বয়ের সংঘাতের উপর।

আসল কথা এই যে, ডায়লেকৃটিক্স্ বলিতে বুঝায়

একটা অন্তর্নিহিত প্রেরণা, যদ্দ্বারা কোনও তত্ত্বের একদেশ-দর্শিতা ও অসম্পূর্ণতা (limitation) হৃদয়ঙ্গম হয় এবং যদ্দ্বারা ঐ তত্ত্বের প্রতিবাদী মত প্রতিষ্ঠা করা যায়। সকল পদার্থই সসীম বা নশ্বর, তাহার মধ্যে ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত আছে বলিয়াই। জীবনের পথেই হউক আর ধ্বংসের পথেই হউক, কোনও স্থানে গতি দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, ওখানে প্রাণশক্তি (Life) বর্ত্তমান এবং কোনও স্থানে একটী ঘটনা সংঘটিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ওখানে ডায়লেক্‌টীক পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছে (where-ever anything is carried into effect in actual world—the dialectic is at work)। পদার্থের সসীমত্ব বা নশ্বরত্ব বাহির হইতে আসে নাই—উহার প্রকৃতিই উহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। মৃত্যুর বীজ লুক্কায়িত আছে বলিয়াই জীবনটা জীবন। নশ্বর পদার্থ নিজের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করে বলিয়াই উহার নশ্বরত্ব। ধনাত্মক (positive) এবং ঋণাত্মক (negative), দেনা এবং পাওনা, সব একই কথা। পূর্ব্বদিকে গমনের যে পথ, তাহা পশ্চিমযাত্রীরও একটা পথ বটে। চুম্বকের উত্তর প্রান্ত উহার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আলাদা নয়। একটী চুম্বককে কাটিলেও, উহার উত্তর প্রান্ত (North magnetic pole) হইতে দক্ষিণ প্রান্তকে পৃথক্ করা যাইবে না। চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের দুই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না, বিরুদ্ধ ভাব সত্ত্বেও তাহারা ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত (interpenetrated)। ঝড়ের গতি এখন আছে, তখন ছিল না—উহা চলমান প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নামক দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির (contradiction) ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া মাত্র।

প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নামক বিরুদ্ধভাবাপন্ন গুণ-দ্বয়ের সমবায়ে কার্য্য করিতেছে। উহা কোনও পরিকল্পনার (Teleology) অধীন নয়। প্রকৃতির গতি কোনও শাশ্বত নিয়মের বলে বৃত্তাকারে পরিচালিত হয় না। বরঞ্চ একটা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উহার প্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ মাত্র নয়—উহার একটা গতিভঙ্গী আছে। রও একটা ক্রমবিকাশ আছে—উহার পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন শক্তির ডায়লেক্‌টিক্ সমন্বয়ের নিয়মে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে এবং ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতির আভ্যন্তরীণ সন্ধান যাঁহার অধিগত হইয়াছে, তিনি যে কোনও স্থানের মানবসমাজের পরিণতি কি হইবে, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction) করিতে পারিবেন। মার্ক্‌স্ ঐ পদ্ধতি অধিগত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, মানবসমাজের প্রাথমিক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ দাস-প্রথা (Slavery), কৃষাণ-প্রথা (serfdom), ফিউড প্রথা বা সামন্ত তন্ত্র (Feudalism), ধনতন্ত্র এবং তারপর নিশ্চয়ই সাম্যবাদ-মূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। পদার্থজগতের বা মানব-সমাজের সমসাময়িক অবস্থা কার্য্য-কারণ পরম্পরাক্রমে অনুধাবন করিয়া উহাদের ভাবী পরিস্থিতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার তত্ত্বকে ডিটারমিনিজ্‌ম্ বলে। এজন্যই মার্ক্‌স্-প্রবর্ত্তিত সমাজ-তন্ত্রবাদের আর একটী নাম "Economic determinism।"

মার্ক্‌স্‌বাদের গোড়ার কথা অর্থাৎ ডায়লেক্‌টিক্ বস্তুবাদের বিষয়ে সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এখন পাঠককে বিগত শ্রাবণ সংখ্যার "প্রবর্ত্তকে"র "মার্ক্‌সীয় দর্শনের ভিত্তি" নামক প্রবন্ধের কথা আবার স্মরণ করিতে হইবে। আমরা সেখানে বলিয়াছি যে, বস্তুবাদের তিনটী মর্ম্মস্থল আছে, যেখানে আঘাত করিলে উহা আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া পড়ে। তাহা হইতেছে :—(১) জড়পদার্থ ও প্রাণশক্তি (Matter and Life)। (২) প্রাণশক্তি ও মন (Life and Mind)। (৩) ডিটারমিনিজ্‌ম্ ও পরিকল্পনা (Determinism and Choice)। ঐ তিনটী মর্ম্মস্থলকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই ডায়লেক্‌টিক্ বস্তুবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। জড়পদার্থ ও প্রাণশক্তির মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা উত্তীর্ণ হইবার মত কোনও সাহায্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে না পাইয়া মার্ক্‌স্ ডায়লেক্‌টিক্‌সের ধোঁয়াটে আবরণের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা বলিবেন যে, পদার্থ মাত্রেই প্রাণবন্ত ও প্রাণহীন—এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়া (Thesis and antithesis) প্রাণিজগৎ ও জড়জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং ইচ্ছাশক্তিবিহীন, এই প্রকার বাদ-

প্রতিবাদের মধ্য দিয়া মানুষের মন অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার কতকটা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু ঐ ইচ্ছাশক্তিও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্ত জগৎ ছাড়া অব্যক্ত জগৎ বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং এই পদার্থজগতের আইন-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই মানুষের অন্তর্জ্জগৎ পরিচালিত হয়। সুতরাং মানবসমাজের পরিস্থিতি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার যুক্তি বা ডিটারমিনিজম্ অভ্রান্ত সত্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জড় পদার্থ প্রাণশক্তি ও মনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া মার্ক্স্ যে ডায়লেক্‌টিক্‌স্ নামক ধোঁয়াটে আবরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দুর্ভেদ্য নয়। বিগত সংখ্যায় আমরা ঐ তিনটী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ঐ ডায়লেক্‌টিক্ বস্তুবাদ পরিণত হইয়া সমাজতন্ত্রবাদের মূলে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিগেল ডায়লেক্‌টিক্‌স্ অবলম্বন করিয়াছিলেন ভাবরাজ্যে; কিন্তু মার্কস্ উহার অবলম্বন করিলেন অর্থনীতির জগতে। সুতরাং হিগেল ও মার্কস্, এই দুইজনই পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ। যাহা হউক, মার্কস্ তাঁহার অভিনব পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর ভাবুকগণের জন্যই একটী সমগ্র মতবাদ রচনা করিয়াছেন। চলতি কথায় ইহাকে Marxism বলে। এই মতে মানুষের ইতিহাস একটী শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস মাত্র। ধনতান্ত্রিক যুগে ঐ শ্রেণীসংগ্রাম পুঁজিপতি (Capitalist) ও শ্রমিকের সংগ্রামে পর্য্যবসিত হইবে। ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে আর কোনও শ্রেণী বিদ্যমান থাকিবে না। যুগে যুগে ঐ প্রকার শ্রেণী-সংগ্রামে দেখা গিয়াছে যে, উৎপাদন-শক্তি (Productive Force) যে শ্রেণীর করায়ত্ত থাকে—তাহারাই রাষ্ট্রেরও রশ্মি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্র অপরাপর শ্রেণীকে শোষণ করিয়া সেই শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগের শেষ অবস্থায় প্রত্যেক দেশে মূলধন কেন্দ্রীভূত হইয়া, মাত্র জন কয়েকের হাতে আসিবে। মধ্যবিত্ত অন্যান্য শ্রেণী বিলুপ্ত হইবে এবং সব-হারাদের proletariate) সংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইবে। ঐ সময়ে সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগৎ (Capitalistic system) আপনার ভারেই আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং শ্রমিক শক্তি পুঁজিপতিগণকে বিদূরিত করিয়া রাষ্ট্রের রশ্মি গ্রহণ করিয়া নিজেরাই উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথা ও পরিবার-প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া, সাম্যবাদ-মূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহাকে ইতিহাসের আধিভৌতিক ব্যাখ্যা (materialistic interpretation of history) বলা হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, ডায়লেক্‌টিক্ পদ্ধতির শেষ হয়। কারণ তখন আর অন্য শ্রেণীর অস্তিত্ব না থাকায়, উহার প্রতিবাদ (anti-thesis) সম্ভাবনা থাকে না। উহাই মার্কস্‌বাদের মোটামুটি তথ্য। মার্কসের একনিষ্ঠ সেবকগণ উহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ঐ মন্ত্র লইয়া তাঁহারা পৃথিবীর নানাস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন।

মার্ক্স্‌বাদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ঘটনাগুলির পরিস্থিতি বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় বলিয়া আমরা মনে করি না; কারণ, সেই সব ঘটনা পারিপার্শ্বিক ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া, মানব জাতি কেবল অর্থনীতির দ্বারাই পরিচালিত হয়, এই তথ্যও স্বীকার করা যায় না। কারণ কৃষ্টির সাধনা, ধর্ম্ম ও পূর্ব্বপুরুষাগত বৈভব (tradition) মানবসমাজের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মার্ক্স্ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া সব-হারাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। কিন্তু ফলে হইয়াছে তার উল্টা। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা আরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন একটা সম্ভ্রমজ্ঞান (dignity) থাকে যে, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে কাল কাটাইতে বাধ্য হইলেও, সে সব-হারাদের সমাজে মিশিতে ইচ্ছুক হয় না। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের এই প্রকার মনোভাবের জন্যই জার্ম্মাণীতে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়াছে। মার্ক্সের নির্ম্মম অনুচরগণ উহাকে অভ্রান্ত সত্য বিবেচনা করায়, পৃথিবীতে গোল বাধিয়াছে। ফলে, উহা একটা

dogma মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রত্যেক dogmaতে সত্যের আংশিক বিকাশ থাকে; কিন্তু তাহা পরিপূর্ণ সত্য নয়। একটী dogmaর প্রচার হইলে, উহার প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে অন্য dogmaরও প্রচার হইয়া থাকে। মার্ক্‌স্‌বাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট মত-বাদের প্রচার হইতেছে। মার্কস্‌বাদ যদি thesis হয়, তবে ফ্যাসিজম্ উহার anti-thesis। ঐ দুইটাই কিছুতেই একসঙ্গে সত্য হইতে পারে না। ঐ দুইটাই ইউরোপের মতবাদ এবং ঐ মতবাদগুলির গোড়ায় ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। কিন্তু ইউরোপ এখনও ঐ উভয় মতের সমন্বয় করিতে পারে নাই। যদি ইতিহাসের আধিভৌতিক ব্যাখ্যার ভিতরে সবটুকুই সত্য হয়, তবে কমিউনিষ্টগণের প্রোগ্রাম নির্ভুল; আর যদি উহার ভিতরে কতটুকু অসত্যও থাকে, তবে ফ্যাসিষ্টদের প্রোগ্রামেরও কিছু স্বার্থকতা আছে। এখন ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য করিবে কে?

মার্ক্‌স্‌বাদই হউক আর ফ্যাসিজিম্‌ই, হউক, ইউরোপীয় ভাবধারার একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, উহারা চরম সত্যকে একটী সরলরেখার মত কল্পনা করেন। এজন্য ইউরোপীয় প্রগতিমূলক আর্টের মধ্যে সরলরেখার প্রাবল্য। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র মতেও সরলরেখায় কোনও গতি হইতে পারে না; গতি সর্ব্বদাই তরঙ্গাকার। এদেশেও প্রগতির রূপ হইতেছে বঙ্কিম। কারণ প্রতি যুগই চরম সত্যের ছায়াকে রূপায়িত করিতেছে ও করিবে। মার্ক্‌স্‌বাদী, যাহারা এতদ্দেশেও উহার প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এ কথাটী যেন তাঁহারা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, মার্ক্‌স্‌বাদের মধ্যে দেখা যায় সত্যের আংশিক প্রকাশ। পুঁজিপতির শোষণ, দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার প্রভৃতি সত্য জিনিষ। এদিকে জনসাধারণ অবহিত না হইলে, সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উক্ত প্রকারের সমাজ-বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা না করিয়াও উহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্ প্রভৃতি নানা প্রকারের প্রত্যেকটী মতবাদের মধ্যেই আংশিক সত্য আছে। ঐ আংশিক সত্যগুলিকে চরম সত্যের মধ্যে শৃঙ্খলিত (co-ordinate) না করিলে, ঐ প্রকারের আংশিক সত্যগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে মানব-সমাজে বাদ-বিসম্বাদের অন্ত থাকিবে না। বর্ত্তমান ইউরোপে তাহাই ঘটিতেছে। ডায়লেক্‌টিক্‌সের মূলকথা হইল বাদ ও প্রতিবাদ অর্থাৎ দুইটী পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘর্ষ। যেমন ধনতন্ত্রী সমাজে ধনী ও শ্রমিকের সংঘর্ষ হইতেছে। কিন্তু ডায়লেক্‌টিক্‌সের এই তথ্য অপরাপর দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ডায়লেক্‌টিক পদ্ধতি ভুল, যেহেতু বাদ-প্রতিবাদ দুইটী পরস্পরবিরোধী শক্তি নয়; তবে তাহারা দুইটী পৃথক্ জিনিষ বটে। যেমন এক বৃক্ষের দুইটী শাখা অথবা এক বৃন্তে দুইটী ফুল। উহার একটী অপরটী হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহার শত্রু নয়। ধনিক ও শ্রমিক, এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী নয়, উহারাও এক বৃন্তের দুইটী ফুল। শ্রেণীসংগ্রামটাই মানবেতিহাসের সবখানি কথা নয়। শ্রেণী-সমন্বয়ই অধিকতর সত্য প্রকাশ করে। ফ্যাসিজম্ শ্রেণীসমন্বয়ে বিশ্বাস করে—কিন্তু ইউরোপীয় ধাঁচে; এজন্যই ফ্যাসিজমে ও কমিউনিজমে সংঘর্ষ বাধিয়াছে। সংগ্রামই একদিন পশ্চিমকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে। তখন তাহারা অধিকতর সমন্বয়ী সত্য ও দর্শনের সন্ধান করিবে। আধুনিক কালের এই মানসিক অরাজকতার যুগে স্থির প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে ভারতকে মানবসমাজ-ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, তাহার সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং ইহা করিবার সত্য দৃষ্টি ভারতীয় দর্শনে আছেও। আজ ভারত এই প্রজ্ঞালোকপাতের জন্য প্রস্তুত হইবে কি?

শিল্পে ললিত-কলা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য

প্রকৃতির শিল্প-ভাণ্ডার হইতে মানুষ যেদিন বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের রসাস্বাদন করিতে অনুভব করিল, সেদিন সৌন্দর্য্যকে আর সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। এই রূপ ও রসের মধ্যে অন্তর্নিহিত অখণ্ড আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ নিত্যকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যাহার প্রেরণায় পত্রের মর্ম্মরে, নির্ঝরের ঝর্ঝরে, কল্লোলিনীর কল্লোলে, পাখীর কাকলীতে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যে সুর অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া মানুষের চিত্তে বার বার আঘাত করিতেছে, সেই সুর অবচেতন মনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া যখন মানুষকে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া দেয়, মানুষ তখনই কবি বা শিল্পী বলিয়া মানব-সমাজে পরিচিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এই কবি বা শিল্পী বলিতেই সাধারণতঃ কোন একটা ব্যক্তি-বিশেষকে ধারণা করিলে, তাঁহাদের প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহারা এক-একটা অন্তর-লোকের সৌন্দর্য্য-রসের ভাব বা কল্পনার রূপ। তাই, তাঁহারা দেহের মধ্যেই দেহাতীত, সীমার মধ্যে অসীম এবং অরূপের মধ্যে স্বরূপ। এইজন্যই তাঁহারা মানুষের সুখ-দুঃখের অবস্থা চিত্রে, স্থাপত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে লীলায়িত করিয়া এমন সুন্দরভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন, যাহাতে মানুষ সংসারের সমস্ত দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া সেই আনন্দের রসোপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইংরেজ কবিও ইঁহাদের সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন,—"A poet or an artist is a man speaking to men." কতখানি প্রাণ-প্রাচুর্য্য ও মনের রঙ্গিনতা থাকিলে মানুষ এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়! তাই কবি বা শিল্পী জগতের গুরু ও দ্রষ্টা। ইঁহাদের সৃজনী-লীলা সৃজন করিবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয় না। ইঁহাদের সৃষ্টিক্ষম মন আনন্দের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে সৃষ্টি-মাধুর্য্যে বিকাশ-লাভ করে, তাহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রসে পরিপুষ্ট ও গতিশীল। তাই, এই শিল্প, কাব্য তখনই পরিপূর্ণ-সম্পদে বিকশিত হইয়া উঠে—যখন "it lights the veil from the hidden beauty of the world." তাঁহারা যে শুধু আকাশের রঙের-খেলা, নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, উদ্ভিদের নীরব প্রকাশ-ভঙ্গী, বন-বীথিকার মৃদু দোলন, ছায়ালোকের স্পন্দন প্রভৃতি লইয়াই পূজার আরতি শেষ করেন—তাহা নহে, তাঁহারা অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের প্রেরণা দেন, মৃতের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করেন। তাই তাঁহাদের কাছে জগতে কোন ঘৃণ্য বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। তাঁহারা চিরযুগের আনন্দ-স্বরূপ ও প্রাণময়।

কিন্তু এই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের প্রকাশ-ভঙ্গিমা প্রাণী মাত্রেই উপভোগ করিবার প্রয়াস করিয়া থাকে। হয়তো তাহারা সেই অন্তর্দৃষ্টি না দিয়াও ইহা অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের এই সৌন্দর্য্য-বোধের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কোন মতেই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। তাহাদের সঙ্গে যে খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্যের যোগসূত্র কবি বা শিল্পীর অন্তরালে বিরাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে—তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সৌন্দর্য্য-বোধ সাধারণতঃ মানুষ দুইটা দৃষ্টি দিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করে। একটা ব্যক্তির ভাব-প্রকাশক চিত্রের উপর দিয়া, আর একটী তাহার রসোপলব্ধির মধ্য দিয়া; ইংরাজীতে যাহাকে বলে (১) Expressional Arts ও (২) Impressional Arts.

এই Expressional Arts অর্থাৎ ভাব-প্রকাশক শিল্পের অভিব্যক্তি চিত্রে, স্থাপত্যে, সুসজ্জীকরণের মধ্যে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটার মধ্যেই অলক্ষিত এমন একটা ছন্দ (Rhythm) নৃত্য করিয়া উঠিতেছে যে, প্রাণীমাত্রেই আনন্দে চঞ্চল এবং বেগবান। কিন্তু ছন্দের সাহায্যেই আবার শিল্পী বা কবির রস-ঘন মনের অনুরূপ ভাবটিও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া উঠে।

চিত্র-শিল্প ভারতবর্ষে ঠিক কোন্ সময়ে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—তাহা বলা কঠিন, তবে অনুমান খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। অনেকের

মতে রোম নগরেই ইহার প্রথম প্রসার হইয়াছিল। তবে এই চিত্রাঙ্কণ ভারতবর্ষের চাইতেও পাশ্চাত্যে বেশী অনুশীলন ও সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং মধ্য-যুগের শেষ-ভাগে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরীতে যে-সমস্ত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল—সেই র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, টিসিয়ান, রুবেন্স, বাট্টিসিলি প্রভৃতির সারা জীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠ অবদান মন-প্রাণ-ঢালা বিশ্ব-পূজিত ম্যাডোনা, মনোলিসা, খৃষ্টের মৃত দেহের উপর রোরুদ্যমানা জননী মেরীর মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতি বিশ্ববাসী আজও শ্রদ্ধা-বনত মস্তকে সম্ভ্রম জানাইতেছে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের সহিত পাশ্চাত্যের ভাবধারা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। প্রতীচী বাহিরের রূপ-সৌন্দর্য্য ও রঙের সমাবেশ এত বেশী করিয়া সমাদর করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রত্যেক ছবিটাই সাধারণের চোখে অত্যন্ত আনন্দ ও সুখাবেশ আনিয়াছিল। কিন্তু এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ভারতীয় শিল্পীরা মনেপ্রাণে বেশী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবের অতীন্দ্রিয় বস্তুকে (Internal Object) পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য শুধু যে চিত্রকলার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা নহে, ভাস্কর্য্যের মধ্যে মনে হয়, আরও বেশী ও নিখুঁতভাবে পূর্ণাঙ্গ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সেই ক্ষীণ নিদর্শন—অজন্তা ও ইলোরার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে, আজও ভাব ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহা ছাড়া, অতীতের কত ভগ্নস্তূপের মধ্যে, মন্দির গাত্রে, স্তম্ভে, প্রস্তর-ফলকে ও গুহায় কত রকমের কারুশিল্পের মনোরম অভিব্যক্তি অঙ্কিত রহিয়াছে—যাহা আজও কবি, শিল্পী ও ভাবুকের মনে অপরিসীম আনন্দ ও প্রেমের সূচনা করে! তবে, এই স্থাপত্য-শিল্প অনেকে অনুমান করেন যে, গ্রীসেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। এইহেতু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের মানদণ্ডস্বরূপ গ্রীসকে লক্ষ্য করিয়াই সমগ্র সভ্য-দেশ চলিত। রোমের সেন্ট্ পিটার্স বার্গ গির্জ্জাটী মনে হয় তাহারই অনুরূপ।

প্রসাধক-শিল্প (Decorative Art) কিন্তু ঐতিহাসিকের মতে আরও প্রাচীন। মিশরের রাজা তুতানখামেনের সময়ে পর্ণকুটীরবালাদের হস্তের কারুকার্য্য, শিল্পকলা প্রভৃতির যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় ৫।৬ হাজার বৎসরের আগেকার কথা, কিন্তু সেই অতীতের দিনেই কাইরো নগরী একদিন এই জগতে সভ্যতার বুকে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। বর্ত্তমানে আল্‌পনা, এম্‌ব্রয়েডারি প্রভৃতির কাজ যেরূপ দ্রুত অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে আশা হয়, এইগুলিও একদিন তাহাদের সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। এমন কি, হয়তো নিজেদের বৈশিষ্ট্যে জগতের কাছে এক নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে পারিবে!

এই যে ভাবের বহিঃপ্রকাশ, ইহা কেবল জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে মাত্র—কিন্তু রসলুব্ধজনের সে রস পরিবেশন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা সত্যকারের রসিক—তাঁহারা কবিমনের অন্তর্নিহিত রস-ভাণ্ডটির প্রতি লোলুপ হইয়া উঠেন। তাঁহারা প্রত্যেক চিত্রটীর মধ্য হইতেই রস নিঙড়াইয়া লহেন। যখন কোন দৃশ্যবস্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া মনের ভিতরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং রসোৎপাদন ঘটায়, যাহার প্রভাবে একটা সুমধুর ভাবের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠে—সেই রস-চিত্রটাই রসিকজনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই ভাবটাই ইংরেজীতে আমরা "Impressional Arts" বলিয়া অনেকটা মনে করিতে পারি। সুতরাং, এই সমস্ত সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গিমা কাব্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যেই সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সুন্দর বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই একটা স্বকীয় বুদ্ধি দেখা যায়। কবি বা শিল্পী—তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা আছে; কোন ধরাবাধা নিয়ম কানুন বা গণ্ডীর মধ্যে তাহারা আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেদের ভাবেই আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। বিশ্বের দৈনন্দিন পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে রসাস্বাদন ও আনন্দোপলব্ধি হয়—সে কেবল তাঁহাদেরই একমাত্র নিজস্ব নয়—প্রাণী মাত্রেরই সে-অনুভূতি আছে। কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁহারাই একমাত্র রস আস্বাদন করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, উদ্যানে গোলাপ, বেলি, যুথি, চামেলী কতশত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া নয়ন

রঞ্জন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। যে কেহই উহাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুক না কেন, অন্তর তাহার আকৃষ্ট না হইয়া আর থাকিতে পারে না; যেমন, শিশু লাল গোলাপ দেখিয়া হাত বাড়াইয়া ফুলটী তুলিয়া লয় এবং একটী একটী করিয়া তাহার প্রত্যেকটী পাঁপড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া পড়ে; কীট যেমন পুষ্প গন্ধে লুব্ধ হইয়া তাহার হৃদয়দলে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শ্রীহীন ও বিবর্ণ করিয়া ফেলে; গাভী যেমন তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মুখ উঁচু করিয়া ফুলটি ছিঁড়িয়া লয়, তাহার পর তৃপ্তির সহিত সেটিকে চর্ব্বণ করিয়া ফেলে। সেইরূপ, কবিরও একই আনন্দের অনুপ্রেরণায় ফুলটী দেখিয়া অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে কিন্তু তাঁহার উপলব্ধি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। তিনি মমতা বুদ্ধির সাহায্যে উহা হইতে রসাস্বাদন করিতে চেষ্টা করেন; কারণ ভোগ্যবস্তু নিজের অধিকারের মধ্যে আনয়ন করিতে যাইলে উহা তখন শ্রীহীন ও বিবর্ণ হইয়া উঠে। উহার স্বাভাবিক স্ফুরণ তখন চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। তাই কাব্যের সাহায্যে কবি বলিয়া উঠিলেন—

"ফুলের যা দিলে হবে নাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ;
আমি চাই সেই সৌরভ শুধু
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর হতে পাওয়া,
আমি চাই শুধু মশগুল্ হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব!"

এই যে ত্যাগ ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গ, নিঃস্বার্থ প্রেম এ কেবল আনন্দের উন্মাদনায় কবি তাঁহার আপন সত্ত্বাকে বিলীন করিয়া দিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহাকে উচ্চ আদর্শের পুণ্য বেদীতে দাঁড় করাইয়া, প্রেয় ও শ্রেয়কে বরণ করিয়া লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু যে আনন্দোপলব্ধির কথা বলিতেছিলাম, সে কেবলমাত্র কবি বা মানব-সুলভ ধর্ম্ম নহে; তাহা প্রাণীমাত্রেরই সাধারণ বৃত্তি। মূলতঃ সুন্দরকে যে যে-ভাবেই গ্রহণ করিয়া ভোগ করুক না কেন, সেইটেই তাহার কাছে আনন্দ ও রসানুভূতির কারণ!

ইহা ছাড়াও, এমন সব প্রকার-ভঙ্গিমা আছে—যাহা তখন প্রাণী-সাধারণের বোধানুকূল না হইয়া, শিল্পী বা কবি-প্রধান মনের নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ না করিয়া আর উপায় নাই। তখনই কবির কাব্যের মধ্যে আসিয়া রসিকজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাছাড়া গত্যন্তর নাই। একটী সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা আরও সহজ করিয়া বুঝিতে পারিব; যেমন কবির ভাষায়,—

"—মধুর হাসি তার, দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।—"
"—যাহার ঢল ঢল, নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।—"

এই যে সব চিত্র—এ কেবল কবিতার মধ্যেই সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে এবং ইহার রসাস্বাদন বা ভাবের অন্তর্নিহিত রূপকে বাস্তব সৌন্দর্য্যের সাহায্যে অনুভব করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। বিপরীত ধর্ম্মী হইলে বরং রসেরই ব্যাঘাত ঘটে। কাব্যের মধ্যে যেন একটা অশরীরী আত্মা আছে, যাহার সংস্পর্শে মানবের অন্তর ক্রমেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠে। এবং ইহার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে যখন আবার কাব্যের বাক্য সীমা অতিক্রম করে, তখনই সুরের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এই সুর বা সঙ্গীত কেবল একটী সূক্ষ্ম পূর্ণাঙ্গভাব মানবের চিত্ত-পটে প্রতিফলিত করিয়া দেয়; শুধু তাহাই নহে, মানবের সূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশেরও সহায়ক হইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রথম শ্রুতির প্রচলন। কিন্তু সুরের দ্বারাও মানুষ যখন মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে না পারে; যেমন—

—"কথা তারে শেষ ক'রে
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।"—

তখনই নৃত্যছন্দের প্রয়োজন স্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং ললিত-

কলার ইহাই হয় শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। কোন কিছুকে পাইতে হইলে, অথবা মনের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করিতে হইলে, নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুরই দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। দক্ষিণ-ভারতে এখনও বোধ হয় ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে যে, যথায় দেব-দাসীরূপে আজিও তপঃস্বিনী সন্ন্যাসিনীরা নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে দেবতার পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকে। তাহাদের এই হৃদয়ের আকুতি তাহাদের শুদ্ধ অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবের দ্যোতনা ফুটাইয়া তুলে। বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে অহরহ যে ইঙ্গিত—সুর ও নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, কবি বা শিল্পীই পূর্ণভাবে তাহার ভাব-গ্রহণ, রসাস্বাদন ও অন্তরের আবেদন অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যপ্রাণ হৃদয়ের সদাজাগ্রত অনুভূতি প্রেমাভিমুখ মনের সংমিশ্রণে অভিষিক্ত হইয়া, রসিয়া-মজিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। রসাবিষ্ট হৃদয়ের এই অনুভূতিই শিল্প ও ললিত-কলার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া রস-পিপাসু মন-সমুদ্রে বীচিভঙ্গে আলোড়িত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে।

কে ডাকো

শ্রীসুশীল জানা

কে যেন ডাকে দূর—দূর সীমায়,
কে যেন কাণে কাণে বিমনা মনে প্রাণে শিহরি' যায়।
মেঘ পাহাড়ী বঁধু যেথায় প্রেমানত আবেশময়,
যেথায় নীল বন সলাজে অনুখন শিহরি' রয়—
সে বনে বাঁকা পথে নয়ন থমকিল হারায়ে পথ,
সেথায় বন বীণে বাতাসে দেয় শিশ্ হারায়ে পথ!
সেথায় কে মিতা গো
আমার লাগি' জাগো
অচীন ভীন দেশী স্বপন ছায়।
কে ডাকো মোরে দূর—দূর সীমায়!

যে ধূমায়িত শেষে আকুল আঁখি মেশে—বাতুল মন,
যে ঘাটে বাঁধা তরী পবনে থরোথরি' যাপিছে ক্ষণ,—
কা'র সে ভীন দেশে মেঘ বরণ কেশে কাজল জল
রাঙা গোধূলি বেলা সপ্রেমে করে খেলা—ছলল ছল্।
সেথা বসন ভিজা যে মিতা ফেরে ধীর কুটিরে তা'র,
স্তিমিত দীপ জ্বালা, বকুল ফুল ঝরা কুটিরে তা'র—
সেথা কী ছুটে যাবো,
কে ডাকো—বলো না গো!
কোথা সে কোথা দেশ নিঝুম ছায়!
কে ডাকো মোরে দূর—দূর সীমায়?

কে ডাকো মোরে দূরে মিতা-মিনতি সুরে ক্ষণে গো ক্ষণে!
কোথায় ছুটে যাই—সে পথ-রেখা নাই বিমনা মনে।
মুখর তালিবন, কোথা সে নিরজন দীঘির ঘাট,
কোথা সে ঘর-ফেরা বটের ছায়া-ঘেরা স্বপন বাট!
কোথা সে কাজ ভাঙা প্রদীপ জ্বালা ডাক কুটির ছায়,
কোথা সে থম্‌কানো নিঝুম ঝিঁ ঝিঁ রাত কুটির ছায়!
সে ভীন দেশ কই
বলো গো বলো সই—
যে দেশ পথহারা স্বপন-ছায়?
কে ডাকো মোরে দূর—দূর সীমায়!

মদন ঠাকুর

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

পীঠস্থান। দেবীচণ্ডী, ভৈরব মহাকাল। মহাকালের মন্দির ঘিরে বৈশাখ মাসটায় মেয়েদের ভিড় জমে। স্থানীয় মেয়েরা আসে জল দিতে। বাবার মাথায় জল দিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করে।

এ ছাড়া অন্য সময়ও লোকের গতায়াত আছে। মানসিক পুজো দিতে, মানৎ করতে, চরণামৃত নিতে—অনেক মেয়ে পুরুষকে আসতে দেখা যায়। সবাই আসে, পুজো দেয়। দূর দেশ থেকে আসে যারা, মন্দিরের পাশের মাঠটায় রান্নাবাড়া করে; এদিক ওদিক বেড়িয়ে ঠাকুর দর্শনের পর আবার সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে যায়—রাত্রিটা এখানে নিরাপদ নয়।

সারা গাঁয়ে দোকান হাটের বালাই নেই। কেবল এখানটায় দুচারটে দোকানের জটলা। কঞ্চি আর বাঁখারির বেড়ার ওপর মাটি ধরানো। গোল পাতার ছাউনি। দরজার দুপাশে বাঁশের মাচা; মাচার ওপর সেই কোন্ আদিম কালের কেনা গামলায় সওদা থাকে। খদ্দেরের তেমন ভিড় নেই। দোকানীরাও লোকের চেনা জানা। ধারে কেনা বেচা চলে।

শিবরাত্তিরে এখানে মেলা বসে। সহর থেকে দু একজন সওদা বেচতে আসে,—ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখিয়ে যায় কেউ। তাঁবু খাটিয়ে টকি বায়স্কোপ হয়, হাট বসে, ভিন গাঁ থেকে জন মজুরেরা আসে, মেয়ে পুরুষের অসম্ভব সমাবেশ হয়। মন্দিরটা সরগরম হয়ে ওঠে এ সময়টায়।

মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ একজন। শিবরাত্রিতে ঠিক সামলে উঠতে পারে না। অনেক লোকে দক্ষিণার পয়সা না দিয়েই সরে পড়বার অবকাশ পায়—ধর্ম্মভীরু মেয়েরা তা করে না অবশ্য। উপার্জ্জন মন্দ হয় না। এই পূজারী ঠাকুর মদনকে নিয়েই আমাদের গল্প।

মদনের গোড়ার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। গাঁয়ে এসেছে আজ আঠারো বছর। বাবার হাত ধরে এ গাঁয়ে এসেছিল। ছোট্ট ছেলে তখন বছর সাতেক বয়েস। দেবত্র সম্পত্তির মালিকত্ব পেয়ে ওর বাবা ঠাকুরের পূজারীর পদে উন্নীত হয়েছিল। সে সকল দীর্ঘ ইতিহাসের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বাবার নাম পঞ্চু ঠাকুর। থুর্‌থুরে বুড়ো। কিন্তু তবু ঠিক সময়টিতে মহাকালের মন্দিরে এসে কম্পমান হাত নেড়ে নেড়ে আরতি করা চাই। সকাল সন্ধ্যে পুজো সেরে যেতেন।

ক্রমে পরিবর্ত্তন এলো। পঞ্চু ঠাকুর একদিন মন্দির, মহাকাল, মদন প্রভৃতির মায়া কাটিয়ে পরলোকে সরে পড়লেন। মদনের কপালে ঘনিয়ে এলো ঘনান্ধকার দুঃখ।

মদনের বয়স তখন পনেরো, কিশোর বয়সের দুঃখের রেখা গাঢ়ভাবে না বসলেও—মদন এ দুঃখ সহজে ভুলতে পারলো না। বাবার কাছ হতে সে পুজো পার্ব্বণের বিধি নিয়মগুলো রপ্ত করে নিয়েছিল। মন্দিরের পূজারী বহাল হলো সেইই।

সকাল সন্ধ্যা মন্দিরের কাজ সেরে নিজের রান্নাবান্না করতে হতো মদনকে। দুপুরে আহারের পর একটু অবকাশ। এই সময়টা সে নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতো। কুমোরদের বাড়ী ঘুরে হাটখোলার মাঝ দিয়ে সুরকির পথ। গরুর গাড়ী চলে চলে রাস্তার উপর চাকার দাগ বসে গেছে। দুপাশে আসশ্যাওড়া আর ফণীমনসার গাছ। মেথি ফুলের ঝোঁপ আর আকন্দ গাছ আছে মাঝে মাঝে। থোকে থোকে ফুল ফোটে, আর ঝরে যায়। শিবরাত্রির সময় আকন্দ ফুলগুলো শুধু কাজে লাগে।

সুর দত্তের বাড়ী তাসের আড্ডা বসে রোজ। মদন সেখানেও যায় দুদণ্ড। বড়রা খেলতে বসেছে; গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা। পরের বাড়ীর মেয়ে-বৌয়ের কুৎসার সঙ্গে তাস খেলাটা রুচিকর ঠেকে না মদনের, বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয়।

জগৎ কাওরার বাড়ীতে কান্নার রোল ওঠে। জগতের বউটা ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল আজ তিন বছর। ওষুধ পালায় কিছু হয় নি। ভুগে ভুগে এই হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। মদনের মনটা ভারী হয়ে আসে। নদীর ধারে এসে বসে।

রোজ আসে এখানে। আজ যেন কেমন মনে হয়। নিজের দেশ কোথায় মদন তা জানে না। এই গ্রামটাকে নিজের দেশের মতো সে ভালবাসে। এর জল হাওয়া, এর আকাশ-মাটি, গাছপালা, ডোবাপুকুর—সব কিছুর সঙ্গে সে একটা হৃদয়ের যোগ দেখতে পায়। একটা অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধ—বাইরের ও মনের।

জগৎ কাওরার বউটা ছিল ভাল। মদনঠাকুরকে যত্ন আত্তি করতো। প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় যেতো মন্দিরে। চরণামৃত নিয়ে আসতো। মদনকে গড় করে আশীর্ব্বাদ চাইতো—দাদাঠাকুর আশীর্ব্বাদ করো যেন ওনার আগে মরতে পারি। এয়োস্ত্রী যেন যেতে পারি।

জগতের যক্ষ্মা। কোলকাতায় গিয়ে এই রোগ নিয়ে আসে। বাড়ীতে ঝগড়া করে দেশ ছেড়ে সে পালিয়ে যায় একবার। কোলকাতায় গিয়ে চাকরী নেয় এক মিলে। সহরতলীর আবর্জ্জনাময় প্রলুব্ধ জীবন যাপনের ফলে তার এই রোগ। উপযুক্ত চিকিৎসার অর্থাভাব। বলে—আর ডাক্তার পাত্তিতে কি হবে ঠাকুর। দিন ফুরুলেই বাঁচি। তাই জগতের স্ত্রীর সাধ এয়োস্ত্রী মরবার। বৌটা মরেছেও তাই।

মন্দিরের আয়ে মদনের চলে। দূর গাঁ থেকে লোক-জনেরা এলে ওর সুবিধা হয় খুব। তরীতরকারীটা কিছু বেশী মেলে। অর্থভাগ্যও মন্দ হয় না। অবশ্য খাটুনি বাড়ে। সে সামান্য। স্নানাহারের জায়গা দেখিয়ে দেওয়া, কাঠ-কুটোর সন্ধান বলা—নিজের ঘর থেকে দরকার পড়লে থালা বাসন ধার দেওয়া ইত্যাদি।

যাত্রীরা যদি স্বজাতীয় হয়—মদনের সেদিন রান্না করতে হয় না। প্রসাদ করে দেবার নিমন্ত্রণ হয়। নানা যাত্রী আসে। ছোটদল, বড়দল,—দুতিন গৃহস্থেরা এক সঙ্গে মিলে প্রকাণ্ড দলেরও সমবায় হয়।

মন্দিরের সামনে একটা প্রকাণ্ড পুকুর। পুকুর না বলে সেটাকে দীঘি বলাও চলে। মদন তার পাড়ে যেতো কখনও কখনও। জলের ওপর ওর একটা আকর্ষণ আছে, কেমন যেন একটা মাদকতা; মৃদু ও মধুর। নাইতে নামলে এক ঘণ্টা সময় লাগবে ঠিক। পাড়ে বসে বসে জলের দিকে চেয়ে থাকবে—খুব দূরে, ডুব জলেরও বেশী জল যেখানে, পদ্মফুল ফুটেছে; হাওয়ায় দোল খায়। হেলে দুলে আবার সোজা হয়ে যায়। চ্যাটালো চ্যাটালো পদ্মপাতা জলের ওপর ভাসে। জল দাঁড়ায় না তাতে, টলমল করে। মদনের এ সব ভাল লাগে দেখতে।

যাত্রীরা এলে হাঁকে—ও ঠাকুর, দাদাঠাকুর গো, আমাদের ব্যবস্থা করে দাও।

মদন উঠে আসে। একটু বিরক্ত হয়: মহাকাল, মন্দির, যাত্রী, পুকুর, নদী এই সব নিয়েই তার জীবন। দীর্ঘ ছন্দহীন জীবন, একক। একঘেয়ে লাগে মদনের।

একএক সময় মদনের জীবনে জাগে বসন্ত। ফুলকে দেখে রঙের পরী, জ্যোৎস্নাকে লাগে মদির। বনের রঙ হয়ে আসে ফিকে সবুজ। দুপুরের রোদে জোলো মাটি থেকে ওঠা সোঁদা গন্ধকে মনে হয় আবেশময়। ক্লান্ত কাকের প্রতি জাগে দরদ। কিন্তু সে ক্ষণিক। সহজ কোন কিছুর আবেষ্টন নেই। বাস্তবের কর্কশতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে না। মদনের মন এ সব মেনে নেয়।

ছোট্ট একটা ঘর বেশ সাজানো গুছানো। পয়সা জমিয়ে জমিয়ে মদন দামী আসবাব পত্র কিনে ঘরখানাকে সাজিয়ে রেখেছে। ছেলেমানুষী জিনিষই বেশীর ভাগ। জাপানী, বিলাতী প্রায় সব রকমের খেলনা আছে ওর ঘরে। প্রাকৃতিক বড় বড় ছবি টানানো। নীলের পূজোর পর মহাকালের জন্য মদনকে কোলকাতায় যেতে হয় একবার করে। তখন ওই সব ও কিনে আনে।

গ্রামের শশী ঘোষাল ওর এই ছেলেমানুষী পছন্দ করে না। মদনের বয়স এখন পেরিয়ে গেছে পঁচিশ ছাব্বিশে; তার মত যুবকের পক্ষে এ ভণ্ডামি এবং ধৃষ্টতা। কিন্তু মদন তার কথা শোনে না। প্রতি মানুষের মধ্যে একটা একটা করে শিশু মন লুকিয়ে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের মানুষটার হয় সম্যক্ পরিবর্ত্তন, কিন্তু ভেতরের ছেলেমানুষ মনটায় কোন আঁচ লাগে না। সংসারের নিয়ম কানুন, বিধি ব্যবস্থা, সব কিছুকে সেই খেয়ালী ছেলেমানুষ মনটা মানে না। সৃষ্টি ছাড়া অবাস্তবতায় মনের পাগলামিকে নিয়ে একান্ত হয়ে মেতে ওঠে। মদন একথা মানে।

খেলনা এবং পুতুল জমানো ও সাজানো মদনের একটা

খেয়াল। এই, ছেলেমানুষকে সে ভালবাসে। ওসব জিনিষে কারো হাত দেবার অধিকার নেই। লুকিয়ে নয়, দেখিয়েও নয়। জোর করলে অভিশাপ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না মদন। পৈতা হাতে ছুঁয়ে আরক্ত চোখে ভয় দেখায়! নয়ত ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—এমনি আমাদের মদন।

যাত্রীরা আসে যায়—দাগ কেটে রেখে যায় মদনের মনে। মদনের শিশু মনে, নির্জ্জন নিঃসঙ্গ মদনের অবচেতন মনে—ওদের কথাবার্ত্তায়, স্নেহে যত্নে একটা আবেশময় অনুভূতির প্রলেপ পড়ে; ক্ষণস্থায়ী অবশ্য। দীর্ঘজীবী হ'লে মদনের পক্ষে মনের এ শূন্য অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব।

ভোরবেলায় একদল যাত্রী এসে হাজির হয়েছে। ঠাকুমা, মা ও মেয়ে। আরো পাড়া-পড়শী গিন্নীবান্নীও জন দুই সঙ্গে আছেন। মদনের শরীরটা ভালো নেই। তাড়াতাড়ি পূজো শেষ করে সে শুয়ে পড়েছে। মাথাটা টিপ্‌টিপ্‌ করছে, সারা গায়েও ব্যথা। চণ্ডীতলায় তিন-রাত্রি গান শুনেছে রাত জেগে। বোধ হয় জ্বর হবে। বসন্তের সম্ভাবনাও আছে। এমন সময়ে ডাক পড়লো দাদাঠাকুরের।

ভেজানো দরজার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে ঠাকুমা ও মেয়ে। মদন উঠে পড়লো। ঠাকুমাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। গতবার নীলোৎসবের দিনে বোধ হয় ইনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তুলে মদনের বাড়ীতে আনা হয়। ডাক্তার কবিরাজ ডেকে সারিয়েছিল। সেই জন্যে তিনি মদনের বাড়ী চিনেছেন।

কিন্তু মেয়েটিকে মদন আর দেখেনি। সুন্দর মেয়েটি। বড় বড় চোখ। বয়স বোধ হয় চৌদ্দ পনেরো হবে। এলানো চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। কপালের আশে পাশে দু চারটা চুল উড়ছে। গণ্ড দুটো লাল। আনত লজ্জায় মেয়েটি অধোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কোথাও আড়ষ্টতা নেই। মদন আর একবার মেয়েটির দিকে তাকালে।

কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে ঘরের ভেতর তাকাতে মেয়েটি বিস্মিত হলো। পূজারী ঠাকুরের ঘরে এসব ছেলেমানুষী সরঞ্জাম কেন? খেলনা, রঙ-বেরঙের পুতুল, দম দেওয়া মোটর গাড়ী, মাটি-গড়া চামড়ার ঢোলক—এসব। মদনকে লুকিয়ে সে আঙুলের ইসারায় ঠাকুমাকে একবার ঘরের ভেতরটা দেখতে বলে। দেখালে পুঁতির একটা রাজহাঁসকে।

সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে মদন ঘরে ফিরে এল। শরীরটা তার বিশেষ ভালো নয়। মাথার জানালাটা খুলে দিলে মন্দিরের পাশের মাঠটা চোখে পড়ে। মদন জানালাটা খুলে দিলে। যাত্রীদের কলগুঞ্জন চলছে। রান্না হচ্ছে। মেয়েটার মা রাঁধছেন। গিন্নীরা কে কবে হরিদ্বার কাশী সেরে সাগরে যাবেন—তারই আলোচনায় ব্যস্ত। সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পর্য্যন্ত আজ তাঁরা ভুলে গেছেন। মেয়েটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুলগুলো এখনো এলানো। কচি একটা আম গাছে দু' একবার ঢিল মারলে। ফাল্গুন মাসের শেষ। মুকুল ফুটে কচি আম বেরিয়েছে সবে। মেয়েটার সেই আমে লোভ।

মদনের মনে হল আম পেড়ে দেয়। কিন্তু তা অসামাজিক হয়ে দাঁড়ায়। সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ে যেতেই মেয়েটা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো—চঞ্চল চোখে নেমে এল অসহায়তা। সে ছুটে পালালো মার পাশে। মদন মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

একটুখানি ঘুমিয়েছিল মদন। সেই ফাঁকে কোন্ দুঃসাহসে ভর করে মেয়েটা তন্ন তন্ন করে মদনের ঘর খুঁজে গেছে। জেগে উঠে মদন তা বুঝতে পারলো। অনেক জিনিষ দেখলো সে এলোমেলো হয়ে রয়েছে। এই মৃদু অত্যাচার মদনের কিন্তু মন্দ লাগলো না। এরূপ অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে কেউ তার ঘর এমন করে খোঁজেনি কোন দিন। সে বাইরে বেরিয়ে এল।

যাত্রীদের বন-ভোজন চলেছে। মেয়েটা ওকে দেখতে পেয়েই কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। মদনের চোখে ওর এই সঙ্কোচময় নির্জ্জনতা ধরা পড়লো। রাখাল মুখুজ্জেদের বাড়ীর দিকে চললো মদন। শরীর ভালো না থাকলে সে ওখানে যায়; সাবু, রুটী এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই রাখাল ঠাকুরের বউ যত্ন নিয়ে করে দেয়। ছেলের মতো দেখে তাকে।

মদন ভাবে মানুষের জীবনটা ফাঁপা। সার জিনিষ এতে কিছু নেই। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, আয়োজন-সমারোহ—সব কিছুরই আড়ালে ফাঁকির আভাস আছে। অথচ জীবনে এরা অপরিহার্য্য। তাই মানুষের জীবন বড় রহস্যময়। অসার বস্তুকেও গুরুত্ব দিতে হবে, আবশ্যকীয়তার মূল্য হয় তো কোন সময়ে দেওয়া হয় না। সব কিছুই হেঁয়ালী। মদন বুঝে উঠতে পারে না। ফিরে এসে মদন আবার শুয়ে পড়ে। এবারে তার ঘুম আসে না। চোখ বুজে সে ভাবছে। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সকলের অপরিচিত। সেই আঁকা-বাঁকা অন্তহীন অপরিচিত পথে দেখা হয়ে যায় মনের মানুষের সঙ্গে—কতকটা অতর্কিতে এবং অসাবধানতায়। কথা জমে ওঠে পরস্পরের কণ্ঠে; কিন্তু আবার তারা যায় হারিয়ে, যায় তলিয়ে।

মেয়েটা ধীরে ধীরে ঢুকলো মদনের ঘরে। মেয়েটার লোভ ওই রাজহাঁসটার ওপর। রঙীন পুঁতি দিয়ে তৈরী। জাপানদেশের সৌখীনতা। আস্তে আস্তে সে হাঁসটি তুলে নিলে। মদনের দিকে বার দুই দেখলে সে চোখ বুঁজে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। শুনেছে সে মদনের শরীরটা ভাল নেই। ঠাকুরের একার জীবন। রোগ বালায়ে দেখবার কেউ নেই। মেয়েটা তার ভীরু কোমল একখানি হাত একবার মদনের কপালে রাখলে। অত্যন্ত স্নেহভরে এবং ভক্তির সঙ্গে। মদন চোখ বুজে আছে, একটা অনুভূতিময় আবেশতায় তার সর্ব্বশরীর অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। অসহ রোমাঞ্চ জাগলো তার বুকে ও মনে। সে বুঝতে পারলো আজ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মন নিঃশব্দে অন্তরঙ্গতা চায়, আত্মীয়তার বন্ধন চায়। এতটুকু ওই কুমারী মেয়েটা প্রেমের কিছুই জানে না। যেমন সরল মদন, তেমনি নিষ্পাপ মেয়েটা। তবু মদনের মনে হল—এই স্পর্শের অর্থ একেবারে শূন্য নয়; এর গভীরতায় আছে নারী-মনের গোপন পরিচয়। প্রেমের দাম দু'জনের কাছেই সামান্য, নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। অন্ততঃ মেয়েটার কাছে তো বটেই। খেলার সাথী হিসাবে প্রয়োজন তার হতে পারে একজনকে, প্রেমিক হিসেবে নয়; না হলেও চলে, একটু মন কেমন করার মধ্যেই সেই সাথীর অভাবের পূরণ হয়।

মেয়েটা হাঁস নিয়ে চলে গেল। মুহূর্ত্তের ব্যবধান। মদন এইবার চোখ চাইলে। প্রথমেই চোখ পড়লো তার পূব দিক্‌কার তাকের ওপর। বড় হাঁসটি সেখানে নেই। ঘাড় উঁচু করা, হলুদ আভাযুক্ত, বঙ্কিম পুচ্ছ সেই রাজ হাঁসটি।

মদনের মন গেল বিগড়ে। কাল্পনিক প্রেম, রোমাঞ্চময় অনুভূতি, আবেগকম্পিত মেয়েটার স্পর্শ সে ভুলে গেল। দৌড়ে সে এলো মাঠের মধ্যে। বিকেল ঘনিয়ে এসেছে তখন। যাত্রীরা ফিরে যাবার আয়োজন করছে। মদন মেয়েটার মাকে বল্লে, মেয়েটা তার হাঁস চুরি করেছে। বড় সাধের ও বড় যত্নের তার হাঁস। ফিরিয়ে দেওয়া হোক্ সেটা।

মেয়েটার মুখ হয়ে এসেছে এতটুকু—শুকিয়ে ছাইয়ের মত শাদা। মা'র ধম্‌কানিতে ঠাকুমার পুঁটলির মধ্যে থেকে সে হাঁসটিকে ঠক্ করে বের করে দিলে। জমাট উদ্গত অশ্রুকে গোপন করে মেয়েটির চোখে নেমে এল দুরন্ত অভিমান। অর্থহীন এই অভিমান। মদন হাঁসটিকে নিয়ে ফিরে গেল। যাত্রীরাও নিজেদের পথ ধরলে।

মদনের মন গেল ভেঙে। দীর্ঘ একটানা পঁচিশ বছর বয়সের জীবনে ওই মেয়েটার স্পর্শে সে সচকিত হয়ে উঠেছিল; এর অনুপাতে ও তুলনায় হাঁসটার মূল্য কি? পুঁতির গড়া খেল্‌না, অল্পেতেই ভেঙে যাবে! জীবনে ওর দাম নেই। ওর সঞ্চয়ের মূল্য একটি জীবনের পাথেয়রূপে খরচ হ'তে পারে না। সখ মিটলেই ফেলে দিতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু মেয়েটা মদনকে যা আজ দিয়ে গেল—তার অর্থ জীবনে অমূল্য। জীবনের পাথেয়রূপে সে অক্ষয়। মনে হয় শুধু একটু হাওয়া—চঞ্চল জল-কল্লোল; কিন্তু একটু হলেও জীবনের পথে মূল্য ওর অসীম এবং অনস্বীকার্য্য। মদন কিন্তু ওর মনের গোপন ভালবাসাকে করেছে ব্যাহত। ওর মনের যে আকাঙ্ক্ষা যে ভালো-বাসাকে মদন আজ এভাবে অপমানিত করলে—তার অনুতাপ করবার অবসর মিলবে অজস্র, কিন্তু এই ভুলের সংশোধন হবে না চিরজীবনে। ইচ্ছে হল দৌড়ে হাঁসটাকে দিয়ে আসে মেয়েটার কাছে। তার বুকের

তলায়। কিংবা সেই ঠাকুমার পুঁটুলির মধ্যে, লুকিয়ে যেমন করে মেয়েটী রেখেছিল।

কিন্তু নড়বার শক্তি নেই মদনের। শুধু নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওদের চলার দিকে। পথটা ঘুরে রেল লাইনের দিকে চলে গেছে সোজা। পড়ন্ত রোদ আর ধূসর ধূলোয় হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পড়ল মাঠের ধারে। ধানের ক্ষেত, কিন্তু ধানকাটা হয়ে গেছে,—দু চারটে খড়ের আঁটী ছড়ানো এখানে ওখানে, তার পাশ দিয়ে ওরা চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকালো না মেয়েটী। দুর্ব্বার অভিমান বুকে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

দুহাতে হাঁসটাকে চেপে ধরলো। আবেগ ভরে, কম্পিত হাতে। মেয়েটীর কোমল স্পর্শের উপর মদনের উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। মনে আজ সব কিছু সে হারিয়ে ফেলেছে। কৈশোরের ভালবাসা, প্রথম যৌবনোন্মেষের সঞ্চয় সব কিছু। এবার সে সম্পূর্ণ রিক্ত। পাখীর ডাক, ঝাউ গাছের শিরৃ শিরৃ করা মর্ম্মর ধ্বনি, মেঠোপথে ধূলো উড়িয়ে চলা ঘরমুখো গোরু ছাগলের উল্লাস, গুটীকতক মানুষের আনাগোনা এদেরই একান্তে দাঁড়িয়ে নিরুপায় ও সর্ব্বস্বান্ত মদনের দুই চোখ দিয়ে টস টস করে নেমে এল অশ্রু।

তর্পণ

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

জানি আজি মর-দেহ নাহি পাব ফিরি'
মরণের কালো-জল নাচে তারে ঘিরি'।
সৃষ্টি হ'তে বহু দূরে তোমার আসন—
দ্যুলোকের স্বপ্নরাজ্যে করেছ স্থাপন।
যদি বলি, ফিরে এস—আসিবে না তুমি?
তোমারে হারায়ে কাঁদে দীনা বঙ্গভূমি,
কাঁদে তারা—যারা তোমা বেসেছিল ভালো,
রাতের তিমিরে যারে দেখিয়েছ আলো।
আপনার সৃষ্টি মাঝে রহ তুমি বাঁচি'—
অমর আসন তলে বর নিব যাচি।
প্রেরণার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দাও ঋষি,
ভিক্ষা দাও—জাগিল যা' ললাট উদ্ভাসি'।

লজ্জাতুরা জননীরে যোগায়ে বসন
তুমি মারে সাজায়েছ করি' সম্মোহন।
শিল্পের ভিত্তিতে রচি' বাঙ্গালীর স্থান
জগতের চোখে তারে করেছ মহান্।
তোমার পদাঙ্ক স্মরি' শিল্প-জাগরণ
অমর করেছে তব অকাল মরণ।
বাঙ্গালীর বুক জোড়া তব সিংহাসন;
এ অশ্রু-উৎসবে তোমা করি আবাহন।
বল্লরীর রাজ্যে তুমি উচ্চ তুলি শির
হিমাদ্রীর মত ছিলে অটল গম্ভীর।
বৈশাখের ঝঞ্ঝাবাতে তোমার শিখর
ধ্যান নেত্র মেলি' ঊর্দ্ধে রয়েছে অজর।

নিদাঘের খর-তাপে ছায়া-বাহু মেলি'
বল্লরীরে বাঁচায়েছ স্বেদবিন্দু ফেলি'।
বর্ষায় বাদল ঢালি' করেছ শীতল,
শ্রাবণের ধারা কেন তপ্ত আঁখিজল?
জান না কি অকরুণ ওগো নগপতি!
তোমারে হারায়ে মার কতটুকু ক্ষতি?
পঞ্চ ভ্রাতা মাঝে তুমি পাণ্ডব ফাল্গুনী,
নিষ্ঠায় করেছ জয় অমর 'আরুণী'।
শিল্প রথে তুমি পার্থ, রথী ও সারথি;
দুর্দ্দাম, দুরন্ত তব অবিরাম গতি—
যেদিন বিজয়লক্ষ্মী নিয়ে এলে কাড়ি'
বাঙ্গালীর হাতে দিয়ে, নিজে গেলে ছাড়ি'।
বঙ্গের প্রাঙ্গণে তব গাণ্ডীব তূণীর—
তোমার বিরহে আজি হ'য়েছে অধীর।
কে দিবে টঙ্কার তাহে, কে দিবে সায়ক?
তুমি যদি ছেড়ে যাও, সুযোগ্য নায়ক?
দেবতা দেউল ছাড়ি' যদি চলে যায়
সাধক কাহারে চাহি' বাঁচিবে সেথায়?
মন্দিরে এস গো ফিরি অশরীরী ছায়া,
মর্ম্মর-মূরতি মাঝে লভ তুমি কায়া।
বিরহের অশ্রু দিয়ে ধোয়াব চরণ,
ব্যথার আসনে তব হোক জাগরণ।
উঠ জাগি, প্রেরণার দীপ্ত প্রতিভায়,
বাঙালী দেখিবে পথ তাহারি প্রভায়।
শিল্পের গাণ্ডীব তুমি তুলে নাও করে
পুষ্প বৃষ্টি হোক তাহে বাঙ্গালীর পরে।*

* বাসন্তী কটন মিলের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ৺সুবোধ মিত্রের স্মৃতি-বাসরে পঠিত।

গীতা কি উপশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম কি সার্ব্বজনীন?*

শ্রীমতিলাল রায়

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥১॥১৭

হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী? রাজসী অথবা তামসী?

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ অথচ 'কামকারতঃ' শাস্ত্রবিধির অবজ্ঞা করে, তাহাদের দুর্গতির কথা গীতার ষোড়শোধ্যায় ২৩ শ্লোকেই বলা হইয়াছে। শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রূপে যাহা নিরাকৃত, তাহা জানিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করা উচিত। অবিহিত কর্ম্ম করিতে নাই। এই প্রসিদ্ধ উপদেশ তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকেই আছে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন—যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়াছে, অথচ শ্রদ্ধার সহিত যজনা অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা করে, তাহার নিষ্ঠার পরিচয় কিরূপ হইবে?

শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে। গীতায় এই কথা উক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান জ্ঞাতব্য-প্রবিবেক বলা যাইতে পারে। শ্রদ্ধা এই প্রবিবেকের মূল অর্থাৎ যে বিষয়ের যজনা, তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধা না থাকিলে, বিহিত কর্ম্মে চিত্তের প্রসন্নতাও অসম্ভব। শ্রদ্ধাই যোগদর্শনে বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞান নাই অথচ শ্রদ্ধা আছে, আস্তিক্যবুদ্ধি প্রযুক্ত অগাধ স্পৃহা লইয়া যে ঈশ্বর-পথের যাত্রী তাহার নিষ্ঠার মূল্য-নিরূপণেরই এই প্রশ্ন। নিষ্ঠা এই ক্ষেত্রে শ্রদ্ধারই নামান্তর।

শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত শাস্ত্র আছে অথবা হইতে পারে, এমন ধারণা লইয়া গীতাকার এই শ্লোক রচনা করেন নাই। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার পরিণাম জানিবার জন্যই এই প্রশ্ন। অর্ব্বাচীন যুগের অনেকে মনে করেন—প্রাচীন যুগের শাস্ত্রই যে একমাত্র শাস্ত্র, তাহা ব্যতীত অন্য শাস্ত্র যে আর হইতে পারে না, এমন কোন কথা নাই। প্রগতিপরায়ণ জাতির এরূপ মনোবৃত্তি কিছু অসঙ্গত নহে। কিন্তু গীতা কি বলিতেছেন, তাহাই আমাদের উপলব্ধিগম্য করিতে হইবে। ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে পরমকে, সনাতনকে পাইয়াছেন, জানিয়াছেন, এমন এক শ্রেণীর লোক উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন "অগন্মজ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্" আমরা জ্যোতিদর্শন করিয়াছি দেবতাকে জানিয়াছি। ইঁহাদের বাণীই শাশ্বত যুগের জন্য, গীতা ইহা সমর্থন করেন। পরোক্ষ জনশ্রুতি-মূলক বাণীমন্ত্র এ দেশের শাস্ত্রে নাই। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সাক্ষাৎকৃত সত্যবাণীই শাস্ত্র-রূপে উচ্চারিত হইয়াছে; ভারতের ইহাই বেদ-গ্রন্থ। তাই এ জাতি বেদকে ব্রহ্ম বলিয়াছে। বেদ অনাদি, অনন্ত, অপৌরুষেয় বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে—আমরা যে গীতার অনুধাবন করিতেছি, সেই গীতার বক্তা তাঁহার নিজস্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্যের পথেই আমাদের লইয়া চলিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—ভারতের প্রাচীন বেদই যদি মানুষের চরম সত্যে পৌঁছাইয়া দিবার অমোঘ ও অদ্বিতীয় শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে গীতার স্বতন্ত্র প্রয়োজন কি? এবং গীতা কেনই বা নিজেকে উত্তম-রহস্য স্বরূপ অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলিয়া আত্মপ্রাধান্যে আমাদের প্রণোদিত করেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। গীতা নিজেই বলিয়াছেন, "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি·· তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে" আর বেদের ব্যাপদেশ যাহা, তাহা প্রাধান্য হেতু নহে। বেদ ব্যাপ্য—গীতা তাহার ব্যাপক শাস্ত্র মাত্র।

এই কথার প্রতিবাদ আছে। এই প্রতিবাদ বাহিরের দিক্ হইতে যত নহে, গীতার মধ্যেই ততোধিক পাওয়া যাইবে এবং এই জন্যই বেদ-বিরহিত ধর্ম্ম ভারতে নানাবিধ

* গীতার সপ্তদশ অধ্যায়াবলম্বনে লিখিত। পূর্ব্বানুবৃত্তির ক্রম: গীতার যোগ (২য় খণ্ড) একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গীতাতেই আমরা বেদ-বিরুদ্ধ পাঞ্চজন্য প্রথমে শ্রবণ করিয়াছি। মীমাংসা না হইলে, গীতা ও বেদের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ তিষ্ঠিতে পারে না।

গীতা বলিয়াছেন "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্" প্রভৃতি (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) ইহার মধ্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" "হে অর্জ্জুন, তুমি "নিস্ত্রৈগুণ্য" হও এবং তাহা হইলে যাবতীয় বেদে যে পরমার্থের কথা আছে, তাহা তুমি সহজেই প্রাপ্ত হইবে। গীতা এই শ্লোক কয়টীতে বেদকে যে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, ইহা সহজেই লক্ষ্যে পড়ে। ২য় অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকেও আছে, "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" প্রভৃতি। শ্রুতি, বেদ বিপ্রতিপন্না, বিক্ষিপ্ত। অর্থাৎ বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন নিশ্চলা হইবে, তখনই তুমি যুক্তি পাইবে। ইহাও বেদের প্রতি কটাক্ষ বলিতে হইবে। এমন অনেক উক্তি গীতায় আছে। ৮ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকেও আছে "বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব......অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং......। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় প্রভৃতিতে যে পুণ্যফল সেই সব অতিক্রম করে —ইহাপেক্ষা অধিক বেদ-বিরুদ্ধ শ্লোক নবম অধ্যায়ে আছে। "ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে" অর্থাৎ বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মানুগত 'কামকামাঃ' কামনা-পরতন্ত্র' হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গতায়াত করে। আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই গীতার বেদ-বিমুখতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ১১ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে "ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈঃ" অর্থাৎ আমায় বেদ, যজ্ঞ ও অধ্যয়নের দ্বারা কেহ দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না। গীতা বেদকে যখন নাকচ করিয়া দিয়াছেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন "আমি সেই অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাম" ইত্যাদি; তখন স্বীকার করিয়া লইতে হয়, বেদ অথবা বেদের অনুগামী সংহিতা-পুরাণাদি শুধু শাস্ত্র নহে, বেদ ব্যতীত অন্য শাস্ত্রও আছে। স্বয়ং গীতাই তাহার দৃষ্টান্ত। ইহা যদি হয়, তবে শাস্ত্র আরও থাকিতে পারে, হইতে পারে।

এই জন্যই তবে কি অর্জ্জুন "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে"—এই প্রশ্ন তুলিলেন ? অসম্ভব নহে। ভারতের দেশে বেদ ব্যতীত শাস্ত্র আছে। ভারতেও বেদই যে এক-মাত্র শাস্ত্র, ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় নাই। চার্ব্বাক দর্শন বেদানুগত নহে। জৈন ও বৌদ্ধ-শাস্ত্র বেদকে স্বীকার করে না। ভারতে পাশুপৎ শাস্ত্রও প্রচলিত ছিল, আজিও আছে। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রানুসারকগণ সকলেই হিন্দু জাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারে নাই। গীতা যদি বেদ-বিরহিত শাস্ত্র হয়, তবে কি কারণে তাহা হিন্দু সমাজে সমাদৃত হইল ? কি কারণেই বা তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত কৃষ্ণ-ধর্ম্মও এ জাতি অস্বীকার করিল না ? মনু তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, "অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনম্" উপপাতক মধ্যে গণ্য। গো বধ, অযাজ্য-যাজন, নাস্তিক্য প্রভৃতি উপপাতক। অশাস্ত্র—শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই। গীতা যদি অসচ্ছাস্ত্র হয়, হিন্দু জাতির চক্ষে এই শাস্ত্র-চর্চ্চা উপপাতক বলিয়া গণ্য হইবে।

হিন্দু জাতির এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বর্ত্তমান যুগ কি চক্ষে দেখিবে, তাহা কে জানে! কিন্তু লোকচক্ষে বড় হইবার লোভ হিন্দুধর্ম্মীর নাই। এই সিদ্ধান্তে কোরাণ, বাইবেল, ত্রিপিটক প্রভৃতি গ্রন্থও উপপাতকের থাকে পড়ে। হিন্দুর পক্ষে ঔদার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্ম-নিষ্ঠা বড়। হিন্দু নিষ্ঠার দিকটা বড় করিয়া দেখিয়াছে।

হিন্দুর মতে উপপাতক যাহা, গীতা কি সেই শ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ ? পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি অনুধাবন করিলে আপাততঃ ইহাই মনে হয়। কিন্তু ষোড়শ অধ্যায়ে গীতায় যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে গীতার পূর্ব্বাধ্যায়ের কথাগুলি ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিবার প্রবৃত্তি জাগে।

যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি বৈদিকধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ-শাসিত আচার আছে। সেই আচার শাস্ত্র-প্রমাণ প্রাচীন ঋষিদের অনুভূতিতে সুনির্ণীত হইয়াছে। সেই শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিত যাহা, তাহা জানিয়া শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম করণীয় বলিয়া গীতার সুস্পষ্ট উপদেশ ষোড়শ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। কাজেই পূর্ব্বোক্ত বেদ-নিন্দা-মূলক শ্লোকগুলির প্রকৃত তত্ত্বানুধাবন করার প্রবৃত্তি হইতেছে।

হেঁয়ালীর মত কোন বস্তু অকস্মাৎ সম্মুখে উপস্থিত

হইলে, উহা দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু হেঁয়ালীর চক্রান্তটী একবার চক্ষুগোচর হইলে, উহার গুরুত্ব একেবারেই চলিয়া যায়। গীতা বেদমূলক নহে, এই ধাঁধা চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া তুলে। কিন্তু ইহা বেদানুগত, ইহা প্রতীতি হওয়া মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকগুলির ভাষা বিশদরূপে বেদ-স্তুতির ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া উঠে।

বেদ বিষয় ও অবিষয় বস্তু লইয়া। বেদের কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ীভূত। জ্ঞানকাণ্ড অবিষয়ের বোধক। মানুষের প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মে সংক্রামিত। প্রবৃত্তি যাহাতে চোদিত হয়, তদ্বিরোধী বিষয়ে নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। রুচিভেদে প্রবৃত্তি-ভেদও আছে এবং এই রুচি-ভেদ-বশতঃ শ্রদ্ধা-ভেদও পরিলক্ষিত হয়। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণনা আমরা পাইব।

বেদ বস্তু-বিশেষের প্রতি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জন্য নহে। বেদ সার্ব্বজনীন। ভোগৈশ্বর্য্য-গতি, স্বর্গপ্রার্থী, কামাত্মা ব্যক্তিদেরও বেদ যেমন আশ্রয়, নির্দ্বন্দ্ব, আত্মবান্, নির্যোগক্ষেম ব্যক্তিরাও এই বেদই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকেন। গীতা জীবের পরম গতি, পরম ধামের নির্দ্দেশ দিবার শাস্ত্র। পার্থকে শ্রীকৃষ্ণ 'মামেতি' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। এই 'মাম্' শব্দটীর অর্থ যে পরম পুরুষার্থ, সে কথা গীতার পাঞ্চজন্যে ঘোষিত হইয়াছে। এই আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি। আবার প্রজননশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"—বৃহৎ সাম, গায়ত্রী, বেদ-প্রবর্ত্তিত কোন ধর্ম্মই ইহা হইতে বাদ পড়ে না। ইহাই "দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়"। অর্জ্জুনকে এই জন্যই বেদের যে ত্রিগুণাত্মক বিষয়, তাহা হইতে মুখ ফিরাইতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বিষয়কামী যে বেদবাদে আসক্ত হইবে, ইহা কামাত্মাদিগের প্রকৃতিজাত ধর্ম্ম। বেদে তাহার জীবন-গতির শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইয়াছে। মুমুক্ষু যে নহে, বিষয়-স্পৃহায় তাহার ক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইয়া যাহাতে অভীষ্ট-পূর্ত্তির পথ পায়, 'ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ' তাহার জন্য বৃহৎ আশ্রয়। বিষয় অপরিসীম নহে। তাই ভোগেরও অন্ত আছে। বেদ-প্রবর্ত্তিত নিয়মে কামনাকুল চিত্ত অনেকটা 'পূতপাপাঃ" হয়। এই জন্য ঐহিক ঐশ্বর্য্য ব্যতীত দেব-ভোগ্য বিশাল স্বর্গলোকও সে পাইয়া থাকে। আবার ক্ষীণ-পুণ্য হইলে, পুনরায় সে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। জীব ক্ষেত্রাশ্রয়ী। ক্ষেত্র দ্বিবিধ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। উৎক্রমণ-কালে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়, সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরের জন্মার্জ্জিত অনুভূতি তাহাকে সুখ হইতে অধিকতর সুখে অন্বিত করার প্রেরণা দেয়, এবং সে ক্রমে শাশ্বত সুখের জন্য মুমুক্ষু হইয়া উঠে। বেদ আপামর মানবজাতির সুপথ-প্রদর্শক। এই পথচারী জীব কর্ম্ম হইতে উপাসনা, উপাসনা হইতে জ্ঞানে উপনীত হইয়া, অহঙ্কার ও বাসনাময় ক্ষেত্রে আর পুনরাবৃত্তি করে না। ঈশ্বর-যুক্ত হইয়া "সম্ভবামি যুগে যুগে" বাণীর সে অনুসরণ করে। গীতার ইহাই উত্তম রহস্য। গীতার উপসংহার-কালে আমরা সে কথা আরও পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইব।

এক্ষণে দেখা গেল—পার্থকে পরম ধামে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য গীতাকার স্বর্গপ্রদ বেদ-বাদ হইতে তাঁহাকে বিমুখ হইতে বলিয়াছেন। যে বেদ 'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ" তাহাতে আসক্ত না হইয়া "নিস্ত্রৈগুণ্যাঃ অবিষয়াঃ" বেদে অর্জ্জুনকে একাগ্রচিত্ত হইতে তিনি বলিতেছেন। এইরূপ হইলেই ঈশ্বর-কোটীর থাকের দৈবী প্রকৃতি লাভ হইবে। উহা নির্দ্বন্দ্বঃ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ, নির্যোগক্ষেমঃ ও আত্মবান্ হওয়া। এখানে "সত্ত্ব" শব্দের অর্থ পূর্ব্বাচার্য্যেরা গুণ ব্যতীত অন্য কিছু ধরেন নাই। 'নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুনঃ" উক্তির পর আবার এই সত্ত্ব-গুণ কথাটী ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা বিরোধের কারণ হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নিত্য শব্দটীর বিশেষণ প্রয়োগে "সদা-সত্ত্বস্থ" এই অর্থ সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীধর নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়ার জন্যই উপায়স্বরূপ নিত্য সত্ত্বের আশ্রয়-গ্রহণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ এখানে গুণ নহে, চেতনা। ব্রহ্মপুরাণে এই "সত্ত্ব" শব্দের অর্থ এইরূপ আছে :—

আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য গুণশব্দো ন চেতনাঃ।
সত্ত্বং হি চে[illegible]ঃ সৃজতি ন গুণান্ বৈ কথঞ্চন॥

—সত্ত্বের আশ্রয় নাই। গুণ চেতনা নহে। সত্ত্ব হইতে চেতনার উৎপত্তি। এই সত্ত্বেই নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া থাকার কথা গীতায় কথিত হইয়াছে এবং ইহা হইলেই "গুণেভ্যশ্চ

পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি"—গীতার ইহাই লক্ষ্য। বেদের জ্ঞান-কাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে যে বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ক্ষরাক্ষর ভেদে দ্বিবিধ প্রকারের। বেদ অচিতের স্বরূপ ও পরম স্থান স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া চিতের স্বরূপ ও ধাম, কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট করিয়াছেন। বেদের মীমাংসা-শাস্ত্র ষড় দর্শনেরই অন্তর্গত। অচিৎ-ধর্ম্ম পূর্ব্বমীমাংসায় এবং চিৎ-ধর্ম্ম উত্তরমীমাংসায় আছে। সাংখ্যের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণে বেদের জ্ঞান-কাণ্ডেরও বিশদ বিশ্লেষণ হইয়াছে। সাংখ্য তত্ত্বাবিষ্কার করিতে গিয়া তত্ত্বের নানাত্বে জড়াইয়া পড়িয়াছেন—ব্রহ্ম-সূত্রে উহা একত্বে সুমীমাংসিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান এই সকল শাস্ত্রে লব্ধ হয়—গীতার উত্তম পুরুষ প্রকৃতি ও পুরুষের উপরে। তাহা গীতায় শুধু যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, সেই পুরুষোত্তমকে পাইয়া জীবের পুনরাবৃত্তির পথ রোধ করার কথাও উক্ত হইয়াছে। আরও গীতার বৈশিষ্ট্য—"অনাবৃত্তি" অর্থে জীবচৈতন্য হইতে মুক্তি, ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অহঙ্কার ও বাসনা হইতে মুক্তিতে ঈশ্বরেই জীবের অনাবৃত্তি। গীতার এই মহাদান শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি ভারতের শাস্ত্র-নীতির উপর সহস্রদল কমলের মত বিকশিত। এই জন্য গীতা বেদমূলক তো বটেই, উপরন্তু উহা এ জাতির সর্ব্ব-শাস্ত্রসার—এই সিদ্ধান্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

"শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ-শাস্ত্রশিক্ষণম্" উপপাতক বলায়, বেদ-ধর্ম্ম মানুষের নব নব সত্যাবিষ্কারের পথ রোধ করে কি না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে এবং গীতাও যদি ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতির অনুগত শাস্ত্র হয়, গীতাকেও আমরা সঙ্কীর্ণতা-দোষ-দুষ্ট বলিতে পারি। ভারতেতর জাতির মধ্যে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আমরা জানি। ভারতের প্রাচীনতার তুলনায় উহা একান্ত অর্ব্বাচীন যুগের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ব্যতীত অন্তঃকরণের যে ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণা আছে, সেই অনুভূতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিলে, সেই পথে চলার জন্য বিধি-নিষেধ-মূলক শাস্ত্র রচিত হয়। এই সকল শাস্ত্র এইরূপ ঘটনাবলম্বনে সৃষ্ট হইয়াছে। হিন্দুজাতির স্বীকৃত শাস্ত্র ঠিক এইরূপ নহে। হিন্দুশাস্ত্রের ইতিহাস নাই। ইহা অপৌরুষেয় বলিয়া প্রখ্যাত। এত প্রাচীন শাস্ত্র অথচ আমরা এখনও ইহা অতিক্রম করিতে পারিলাম না—ইহা খুব বিস্ময়ের কথা। অতীতের মত বর্ত্তমানেও একথা অনেকের মনে হয় বটে যে, অতি প্রাচীন শাস্ত্র চিরযুগের জন্য হইতেই পারে না, ঐগুলি মরিয়া গিয়াছে, অথবা ঐগুলির উপযোগিত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব নূতন শাস্ত্র-রচনার প্রয়োজন এবং অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানেও জীবনের পথে নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে হইবে। ভারতের সুদীর্ঘ অতীত আমাদের চক্ষের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতে এইরূপ মনোবৃত্তিবশতঃ যাহা কিছু, গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এ দেশে উপধর্ম্ম হইয়া আমাদের দুর্গতির পথই প্রশস্ত করিয়াছে। আমরা পাশুপত ধর্ম্মে প্রবুদ্ধ হই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের সুতীব্র জ্যোতির্জ্জালে আমাদের যে সাময়িক খ্যাতি, তাহা দীর্ঘ দিনের জন্য জাতিকে শ্রীহীন ও যশোহীন করিয়া রাখিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি উপধর্ম্ম এইরূপে মাথা তুলিয়া উঠিতে চাহিয়াছে; কিন্তু তাহাও হিন্দুজাতিকে প্রবুদ্ধ করে নাই—একটা সঙ্কীর্ণ খ্যাতির সীমায় সম্প্রদায়বিশেষের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। গীতা বলিয়াছেন "এমন জ্ঞান আমি তোমায় দিব, যাহা জানিলে অন্য কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না।" এই যে উক্তি, ইহার প্রতি প্রত্যয় যদি রাখিতে হয়, তবে সেই জ্ঞান গীতাকার নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিয়া এই স্পর্দ্ধার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এইরূপ নিঃসংশয় সত্যবাণী যাঁহারা উচ্চারণ করেন, সাধারণ শ্রেণীর বহু লোক তাঁহাদের অনুগত হয়। আর সেই মানুষ যখন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া অতীতকে উপেক্ষা করে, তখনই জাতির সমস্বার্থতা, ঘনত্ব বা গুরুত্ব অসার ও শ্লথ হইয়া পড়ে। জাতির সংহতি-শক্তি এমন করিয়াই নষ্ট হয়। এইরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম গীতার ভাষায় আসুর সৃষ্টি। "ঈশ্বরোঽহম্", "সিদ্ধোঽহম্" প্রভৃতি উক্তি গীতাকারের কণ্ঠেও উঠিয়াছে; কিন্তু তাঁহার বাণী বেদকে অতিক্রম করে নাই, বেদের ধর্ম্মই সেই বাণীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে, বেদে যাহা কিছু

আছে, সবই কি ধর্ম্ম? এমন কি নূতন তত্ত্ব নাই, যাহা বেদে নাই? ইহার উত্তর মীমাংসকেরা দিয়াছেন। "চোদনা-লক্ষণোঽর্থঃ ধর্ম্মঃ"। যে বাক্যে ইহা হয় না, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া হিন্দু গণ্য করে না। আত্মসাক্ষাৎকার যদি পরম ধর্ম্ম হয়, তদ্বিষয়ক মহাবাক্য যদি কোথাও উচ্চারিত হয়, তাহা কোন মতেই বেদ-বহির্ভূত হইবে না। এই জন্যই বেদে যাহা কিছু আছে, তাহা মৃত, যুগোপযোগী নহে, এইরূপ কথা সত্য নহে। বেদ অনাদি যুগের, তাহার অনেক কথাই আজ আর হয়তো প্রযুজ্য নহে; কিন্তু অনন্ত বলিয়া তাহা আবার অতিক্রম করার শক্তিও আমাদের হইবে না। তাই বেদকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা বলিতে পারি "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

এই সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। হিন্দুধর্ম্মকে বিশ্বজনীন করার ঔদার্য্য অধুনা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। ধর্ম্মকে যদি একটা বিশেষ দেশ ও জাতির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে হয়, তাহা ভূমার ধর্ম্ম হয় না—বিজ্ঞজনেরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ইহাতে ধর্ম্মই দায়ে পড়ে। ধর্ম্ম যাহাতে সার্ব্বজনীন হয়, সেই চেষ্টাই বড় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন যদি হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজনকে ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্ম সর্ব্বজনের মনের মত হইবে না। ধর্ম্মের প্রাধান্য ও মহিমা ব্যর্থ ঔদার্য্যের দায়ে আমরা নষ্ট করিতে বসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী বলিবেন—ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইলে, সর্ব্বজনকে হিন্দুধর্ম্মেরই যে অনুগত হইতে হইবে, এমন কি কথা আছে? কথা আছে। হিমালয়ের উচ্চতা পৃথিবীর সকল অচল শ্রেণীর উচ্চতা অপেক্ষা যে অধিক, তাহা প্রমাণ করার জন্য হিমালয়ের দায় নাই। সর্ব্বোচ্চ-পর্ব্বত-নির্ণয়কারীর এই দায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষের অন্তঃকরণ হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী হইতে বাধ্য হইবে। হিন্দুত্বের এই স্বতঃসিদ্ধ শক্তি আছে। অন্যে অন্য কথাও বলিতে পারে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সত্য স্বতঃই প্রমাণিত হয়। সত্যধর্ম্মীর এইরূপ প্রত্যয় সর্ব্বথা কার্য্যকরী হয়। সত্যের বীর্য্য লইয়া যে জীবন, উহার গতি সত্যেই উপনীত হইবে। এইজন্য অটল হিমাদ্রির ন্যায় ভারতের হিন্দুধর্ম্ম আপূর্য্যমান, অচলপ্রতিষ্ঠ ও সার্ব্বজনীন।

মিলনে

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

হে কল্যাণি, অন্তরের কি মাধুর্য্য দিয়া
রেখেছিলে পূর্ণ করি' আমাদের হিয়া,
ছোটখাট প্রত্যহের বেদনারে ঢাকি'
দিয়েছ কল্পনা দিয়া কত ছবি আঁকি!

নিরন্তর কত রূপে আমাদের মনে,
আমাদের শূন্যময় অন্তর-অঙ্গনে—
দিয়েছ ছড়ায়ে কত আনন্দ অপার,
অকুণ্ঠিত ক্লান্তিহীন দাক্ষিণ্যে তোমার।

আকাশ সীমান্ত হ'তে হে নভচারিণি,
দৈব আজি পাঠায়েছে বন্ধনের বাণী;—
বাঁধিতে হইবে জানি আজি সে আহ্বানে—
জীবনের বীণাখানি নূতনের গানে।

এই স্মৃতি, এ দিনের পুরাণ ঝঙ্কার,
বেজে উঠে সুরে যেন সাথে সাথে তার!

রণভেরী ও ক্রীড়ক সম্প্রদায়—প্রতীচ্যে সমরানল প্রজ্বলিত। পোলাণ্ডের প্রতি সর্ব্বভুক্ হিট্‌লারের লোলজিহ্বা প্রসারিত। পোলাণ্ডের প্রতি অন্যায় নিবারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইংলণ্ড, জার্ম্মানী কর্ত্তৃক 'পোল্‌স্' অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে—মিত্ররূপে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত সংযুক্ত। এ অনল সীমাবদ্ধ রহিবে, না পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে ভবিতব্যই জানে। যাহা হয় হউক, ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের যাবতীয় খেলা-ধূলার আয়োজন বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নূতন খেলা খেলিতে ক্রীড়ক সম্প্রদায় নাচিয়া উঠিয়াছে। একটা কথা হিট্‌লার সম্বন্ধে 'অমানুষী' অনেক কথা অনেক লোকে নানাভাবে আমাদিগকে শুনাইয়াছে, হিট্‌লার স্বয়ং কত কথাই না লিখাইয়া জানাইয়াছেন! এ-সকলের কোথাও হিট্‌লারের ক্রীড়ানুরক্তির কোনও আভাষ কেহ দেয় নাই। 'অমানুষী'ভাবে পোল্‌স্ আক্রমণ, মুখপাতেই নিরীহ পোল্‌স্‌বাসীর উপর বর্ব্বরতার চূড়ান্ত করণ, মার্কিণ যাত্রীপূর্ণ এথিনিয়া জাহাজের ধ্বংস প্রভৃতি ঘটনা হইতে অ-ক্রীড়ক হিট্‌লারের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থ ক্রীড়ানুরাগী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অ-ক্রীড়কের শাস্তি যথোপযুক্তভাবে দিবে, আমরা নিঃসন্দেহ।

আমাদের কর্ত্তব্য—অ-ক্রীড়ক কেবল স্থান বা জাতি বিশেষের শত্রু নহে, সমগ্র পৃথিবীর শত্রু। ক্রীড়াক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রচালনা শিক্ষা, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপালনে সংস্কৃতি—আচার্য্যগণের কৃপায় যখন ঘটিয়াছে, ক্রীড়াক্ষেত্রকেই মূল করিয়া তাহা তাঁহারা ঘটাইয়াছেন—অ-ক্রীড়কের ছায়াপাত কিছুতে যাহাতে না হয় তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া। ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রভাবে ক্রীড়ক পরিণত হইয়াছে আদর্শ ক্ষত্রিয় যোদ্ধায়। কালপ্রবাহে আর্য্যাবর্ত্তের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইলেও সংস্কৃতি বলেই আধুনিক ক্রীড়াক্ষেত্রের কোনও কোনও শ্রেষ্ঠ উদ্যোগীদের কল্যাণে এদেশে গঠিত 'বেঙ্গল্ এম্বুলেন্স্ কোর' ও 'বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট' বাঙালী যুবকের দলে দলে যোগদান ও তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিতে ক্ষত্রিয়োপযোগী তাহাদের অপূর্ব্ব শৌর্য্য-বীর্য্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। বিভিন্ন ক্রীড়া-সঙ্ঘের বহু যুবক এবং ক্রীড়া-সঙ্ঘের বাহিরের কিন্তু ক্রীড়ক-মনোবৃত্তি পূর্ণভাবে বিকশিত অসংখ্য নবীনের কর্ত্তব্য পালনে সেই প্রাণোন্মাদকর উত্তেজনা ভুলিবার নহে। বাঙলা ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করিতে তাহাদের প্রাণপণ—দেশের, দশের, জগতের শত্রু-দমনে তাহাদের অপূর্ব্ব অভিযান যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। দেশ-মাতৃকার সেই সত্যকার পূজায় মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়াছে, পূজার সার্থকতায় সন্তান অসীম 'রণে বনে' জয়যুক্ত হইয়াছে অবাধে। দেশমাতৃকার সেই পূজার সুযোগ আবার উপস্থিত। অবহিত চিত্তে শোন, বাঙালী কর্ত্তব্যের আহ্বান! তোমার করণীয় কি বিবেচনা কর ধীরভাবে। কালবিলম্বে এমন সুযোগ নষ্ট যদি হয় পরে আক্ষেপ করিতে হয়ত' হইবে জীবন ভরিয়া।

খেলা-ধূলা বন্ধ—যুদ্ধের কারণে এম্-সি-সির ভারতবর্ষে আসা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে অন্যান্য অনেক প্রতিযোগিতার খেলাও বন্ধ হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতা এক বৎসরের জন্য বন্ধ থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'পেণ্টাঙ্গুলারে' সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে সেই পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ত' এই কারণে একেবারে বন্ধ হওয়া উচিৎ।

ইহার উপর যুদ্ধের সময়ে ইহার আয়োজনের কল্পনা কর্ত্তৃপক্ষ যদি করেন তাঁহাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি যে ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইব। রঞ্জী প্রতিযোগিতা পরিচালনাও যুদ্ধকালে সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যুদ্ধের কারণে খেলাধূলার এই প্রতিবন্ধকতা হেতু খেলার অপকর্ষতা ঘটা স্বাভাবিক। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে খেলার অবনতি যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে সামাল দেওয়া সম্ভবপর এখনও হয় নাই। কলিকাতায় ইয়োরোপীয়ন্ ফুটবল সেই যে পড়িয়া গিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন ত' এখনও হইল না। পুলিশের শীল্ড জয় ইয়োরোপীয়ন্ ফুটবলের উন্নত হওয়ার দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য যদি হয়, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। স্থানাভাবে তাহা আলোচনা করা সম্ভবপর হইল না। খেলার এই পড়া অবস্থায় বর্ত্তমান যুদ্ধ খেলার অবস্থা আরও কত নামাইয়া দিবে, ভুক্তভোগী যাঁহারা তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রে অমর 'রঞ্জী', যুদ্ধের কারণে রঞ্জী প্রতিযোগিতা সম্ভবতঃ বন্ধ থাকিবে

ক্রীড়াঙ্গনে বিরোধভাব—কলিকাতায় ইয়োরোপীয়ের ফুটবল্ খেলা বিশেষ পড়া অবস্থার হইলেও দেশীয়ের খেলা এখন তাহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। সেই সকল খেলোয়াড়দের মধ্যে 'বিদেশী' খেলোয়াড়ের সংখ্যা অধিক। 'বিদেশী'র এই আধিক্য স্থানীয় ক্রীড়কের পক্ষে যে অনিষ্টকর তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যাপার অনিষ্টকর হইলেও 'আপাত মধুরের' লোভে দেশীয় দলের কর্ত্তা ব্যক্তির মধ্যে প্রায় সকলেই 'চ'খকাণ বুজিয়া' স্থানীয় খেলাধূলার এই ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করেন নাই। এই অনিষ্ট নিবারণের আয়োজন আইন করিয়া করা হইলে 'অন্ধ মধুপায়ী'রা তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং তাহা করিয়া তাহারা বড় না কর্ত্তৃপক্ষ বড় সকলকে আঙ্গুল নাড়িয়া জানাইয়া দেয়। দর্পভরে কর্ত্তৃপক্ষের আইন-কানুন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এইভাবে অনেকের স্বভাবের মধ্যে হইয়া পড়ে। এই দর্প, কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি এই অসম্মান নানা ভাবে 'ধামা-চাপা' দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেও কাহারও কাহারও উদ্ধতভাব বাড়িয়া যায় এত যে, 'ধামাচাপা' দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে আর অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে তিনটী দলের সহিত আই-এফ-এর ভীষণ গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। গণ্ডগোলের আগাগোড়ার কথা আই-এফ-এর প্রেসিডেণ্ট দলীল, দস্তাবেজ সহ প্রকাশিত করিয়াছেন। অপর পক্ষও তাহাদের বক্তব্য উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিবরণ সহ সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। একদিকে ঘটনাবহুল বিবৃতি, অন্যদিকে আবেগভরা উচ্ছ্বাস ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন ক্রীড়া সঙ্ঘ স্থাপনের বিজ্ঞপ্তি। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া অপক্ষপাতের ন্যায় সিদ্ধান্তে আসা আদৌ কঠিন নহে। সেই সিদ্ধান্তের মূল কথা এই, "কর্ত্তৃপক্ষের ন্যায় শাসন মানিয়া চলা যাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ, কর্ত্তা হইয়া বসার যোগ্যতা তাহাদের থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নূতন দল গড়ার ফল সেই দল ভাঙ্গা ও নূতন শত দলের ভাঙ্গাগড়া হওয়া।" অপ্রীতিকর হইলেও ইহা কঠোর সত্য। ক্রীড়াক্ষেত্রে ইহা সমূহ বিপজ্জনক। ইহার জন্য আই-এফ্-একে যথেষ্ট অশান্তি ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিরোধিতায় দেশীয় দলের খেলাধূলায় যে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কুচ্‌বেহার কাপ্—আই-এফ্-এ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে তৎকালীন কুচবেহারের মহারাজের বদান্যতায়

আই-এফ্-এ কর্ত্তৃক কুচবেহার কাপ্ প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হয়। কাপ্‌দাতা মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী এই প্রতিযোগিতায় কেবল দেশীয় দলেরই যোগদান করিবার অধিকার থাকে। শীল্ডে দেশীয় ও ইয়োরোপীয় জুনিয়র দলের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হওয়ায় নিছক দেশীয় দলের জন্য স্বতন্ত্র একটী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। শীল্ডের পরেই কুচ্‌বেহার কাপের গুরুত্ব অন্যান্য প্রতিযোগিতা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্রীড়ানুরাগী শীঘ্রই দেখিতে পায়। এক সভাবাজার ব্যতীত অন্য সকল শ্রেষ্ঠ দেশীয় দলের সমাবেশে এই প্রতিযোগিতায় ক্রীড়ার উৎকর্ষতার অবধি থাকে না। কুচবেহার কাপের দৌলতেই বাঙালীর বাগান কুচবেহার কাপ জয়ী বলিয়া বর্ণিত। এ জয় খেলা জিতিয়া নহে। শেষ গণ্ডীর খেলায় হেয়ার স্পোর্টিং দশজন লইয়া খেলিলেও মোহনবাগান জুত করিতে পারে নাই। খেলা অমীমাংসিত থাকায় এবং এই খেলায় নির্দ্দেশকের কার্য্য বিশেষ আপত্তিজনক হওয়ায় হেয়ার স্পোর্টিং দ্বিতীয় দিন খেলিতে আর সম্মত হয় নাই। মোহনবাগান সুতরাং না জিতিয়া কাপ জয়ী হয়। মোহনবাগানের কাপ পাওয়ার সেই হাতে খড়ি। এ বৎসরের কুচবেহার কাপ জয়ী এরিয়ন্‌স্। শেষ গণ্ডীতে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত তাহারা করিয়াছে ৩—২ গোলে।

ট্রেড্‌স্ কাপ—ডাল্‌হাউসী ক্লাবের পূর্ব্বপরিচয় 'ট্রেড্‌স্ ক্লাব'। ট্রেড্‌স্ কাপ, ট্রেড্‌স্ ক্লাবেরই দান।

৺এস্, চৌধুরী

৺গোবরা

ন্যাশন্যালের দুইজন সুবিখ্যাত খেলোয়াড়
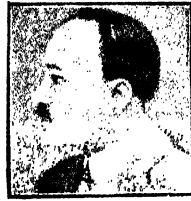
কুচবেহার কাপদাতা
৺কুচবেহারের মহারাজা

সত্যধেনু ঘোষাল

৺হরি চাটুজ্যে

ন্যাশন্যালের দুইজন সুবিখ্যাত খেলোয়াড়

বড় বড় খেলোয়াড়ের 'জন্ম'—ইয়োরোপীয় সামরিক ও অসামরিক দলের খেলা যখন চরমে তখন এই সকল দেশীয় খেলোয়াড়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তাহারা তটস্থ হইয়া পড়ে। সেই ইয়োরোপীয় দল সমূহের একচেটিয়া শীল্ড জয়ের গোড়া আল্গা করিয়া দেয় এই সকল দেশীয় খেলোয়াড়েরাই। কুচবেহার কাপে হেয়ার স্পোর্টিং বা ন্যাশন্যালের খেলার ধরণ তখন এত উচ্চস্তরের যে, সেই খেলা দেখিতে ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের গাঁদি লাগিয়া যাইত। এক একটী খেলা ৪।৫ দিন খেলিয়াও মীমাংসা হওয়া দায় হইত। দর্শকশ্রেণীভুক্ত বিরাট্ জনতার উত্তেজনার সীমা থাকিত না। কুচবেহার কাপে উচ্চাঙ্গের সেই খেলা গত ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে শীল্ডেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ফোর্ট্ উইলিয়ম্ আর্সেনাল্, কুচবেহার কাপের প্রথম জয়ী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মোহন-এ প্রতিযোগিতা আই-এফ্-এ গঠিত হইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। আই-এফ্-এ গঠিত হইলে আই-এফ্-এর তত্ত্বাবধানে ট্রেড্‌স্ কাপ 'জুনিয়র' প্রতিযোগিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৯৩-এর ট্রেড্‌স্ কাপ্ জয়ী—সেন্ট্-জেভিয়র্স্। দেশীয় দলের মধ্যে ন্যাশন্যাল্ সর্ব্বপ্রথম ট্রেড্‌স্ কাপ্ জয় করে। ইহা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। মোহন-বাগান প্রথম ট্রেড্‌স্ কাপ্ জয়ী হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। বার বার এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াও মোহামেডন্ একবারও ইহা জয় করিতে পারে নাই। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মোহামেডন্ কষ্টে সৃষ্টে শেষ গণ্ডীতে উঠে কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া কাপ্ জয়ী হয়। এ বৎসরের কাপ্ জয়ী মোহনবাগান। প্রতি-পক্ষ হাড্‌সনের দল একদিন খেলার ফল সমান সমান করিয়া দ্বিতীয় দিনে ১—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে।

ইলিয়ট্ শীল্ড—আই-এফ্-এ গঠিত হইবার পর বৎসরে এই কাপ্ বঙ্গের তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর সার্ চার্লস্ ইলিয়টের দান। দেশীয় স্কুল ও কলেজ দলের প্রতিযোগিতার জন্য বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইহা দান করেন। প্রতিযোগিতার প্রথম পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে জয়ী হয় বিশপস্ কলেজ। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজও একাদিক্রমে পাঁচবার জয়ী হয় (১৯০৪-১৯০৮) ১৯১৪ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও প্রেসিডেন্সি কলেজ ইলিয়ট্ শীল্ড জয়ী। বিদ্যাসাগর কলেজকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ শীল্ড্ জয় করিয়া লইয়াছে এ বৎসরেও।

আব্বাস—প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের নেতা।

অন্যান্য কাপ্—উইলিয়ম্ ইয়ঙ্গর কাপের শেষ গণ্ডীতে ক্যাল্‌কাটা পরাজিত হইয়াছে ডাল্‌হাউসির কাছে ১-০ গোলে। গ্রিফিথ্ শীল্ড জয় করিয়া লইয়াছে মোহনবাগান, শেষ গণ্ডীতে ক্যাল্‌কাটাকে ৩-২ গোলে পরাজিত করিয়া। রিপনকে পরাজিত করিয়া (৩-২) প্রেসিডেন্সী হার্ডিঞ্জ্ শীল্ড্ জয়ী হইয়াছে।

কলিকাতা বনাম পঞ্জাব— কলিকাতা ও পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলিকাতায় আপোশের ফুটবল্ খেলায় পাঞ্জাব কলিকাতার কাছে পরাজিত হইয়াছে ৩-১ গোলে। ফুট্‌বলে কলিকাতার শ্রেষ্ঠত্বের ইহা নূতন নিদর্শন।

রোভার্স কাপ্—বোম্বায়ের রোভার্স কাপ এবার কলিকাতায় আসিয়াও আসিল না। কলিকাতা হইতে এরিয়ন্‌স্, রেঞ্জার্স ও হাওড়া রোভার্স কাপে যোগদান করে। এরিয়ন্‌সের দল পাঠাইবার সুবিধা কিন্তু হয় নাই। না হইলেও রেঞ্জার্স ও হাওড়া আসর গরম করিয়া তুলে খুবই। রেঞ্জার্স, বম্বে জিম্‌খানা, ষ্টাফোর্ডস্ ও সাফোক্‌কে পরাজিত করিয়া উপনীত হয় শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে। রেঞ্জার্সের খেলার ধরণে তাহাদের রোভার্স কাপ জয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকেরই দৃঢ় প্রত্যয় হয়। ওদিকে হাওড়া—সিমলা কলেজিয়নস্, দিল্লী ইয়ংমেন্ ও কে-ও-আর-আরকে পরাজিত করিয়া শেষ গণ্ডীতে উপনীত হয়। ২৫ সংখ্যক ফিল্ড্‌স রেজিমেণ্ট্ আর-এ নামজাদা না হইলেও পূর্ব্ব বৎসরের রোভার্স-কাপজয়ীকে, কলিকাতার রেঞ্জার্সকে (শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে) এবং হাওড়াকে (শেষ গণ্ডীতে) দুই দুই গোলে কাবু করিয়া রোভার্স জয়ী হইয়াছে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা— কলিকাতায় সন্তরণ প্রতিযোগিতার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় ১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল্ সন্তরণে দুর্গাদাসকে ৯০ মিটার পশ্চাতে রাখিয়া মদন সিং বাজি মারিয়াছে। ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে কিন্তু দুর্গাদাস কাবু করিয়াছে মদন সিংকে। স্ত্রীলোকদিগের ১০০ মিটার ফ্রী ষ্টাইলে জয়ী হইয়াছে কুমারী সুখলতা পাল।

ডেভিস্ কাপ্—বিশ বৎসর পরে অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস্ কাপ্ জয় করিয়া টেনিসে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব আবার প্রতিপন্ন করিয়াছে। ইউ-এস্-এ অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হইয়াছে ৩—২ খেলায়।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্- প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড পরাজিত করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্‌কে ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্টের খেলার ফল হয় সমান সমান। 'রবার' জয়ী হইয়াছে সুতরাং ইংলণ্ডই।

লেখকের নিবেদন—আধুনিক খেলাধুলার রেওয়াজ তখন সবে মাত্র হইয়াছে, লেখক তখন স্কুলের ছাত্র, বয়স বারো বৎসর মাত্র। খেলাধুলায় দীক্ষিত হইয়া তাহার দুই বৎসরের মধ্যে শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলায় খেলিতে লেখকের সুযোগ ঘটে। তদবধি বিদেশী বিবিধ খেলাধুলার বিস্তৃতি উত্তরোত্তর যে ভাবে ঘটিয়াছে এবং লেখক ও তাহার সমসাময়িক ক্রীড়ানুরাগী বালক ও যুবকবৃন্দের অসীম উৎসাহে বঙ্গদেশে সেই সকল খেলাধুলা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বঙ্গের বাহিরে যে ভাবে ছড়াইয়া পড়ে সে কথা সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে স্বতঃই সকলের মনে হইবে—কয়েকজন বালক ও যুবকের চেষ্টায় কেমন করিয়া এই বিরাট্ আয়োজন হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল! গভর্ণমেণ্ট্, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও ক্ষীণ দৃষ্টি বা তিলমাত্র সহানুভূতি কর্ম্মীরা পায় নাই। অন্য পক্ষে তাহাদের এ কার্য্যে চারিদিক হইতে নানা বাধা-বিপত্তির অন্ত থাকে নাই। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাষ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। লোকবলের মধ্যে স্কুল ও কলেজের কয়েকজন ছাত্র, আর অর্থবল মূলতঃ পিতৃমাতৃ দত্ত আমাদের 'জল খাবারের পয়সা'। এই পুঁজি সম্বল করিয়া যে অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহার ভিতরকার কথা বলিতে হইলে উচ্চকণ্ঠে আজ বলিব—সরলতা, আন্তরিকতা ও একপ্রাণতা বলেই তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল—ক্রীড়াক্ষেত্রে শিক্ষা নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সখ্যতা তাহা সম্পাদনে কি সহায়তাই না করিয়াছিল! ক্রীড়াক্ষেত্রের এই গুণেই খেলাধূলায় আমরা ঘোর পক্ষপাতী হই। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই মানুষ গড়িয়া তুলিতে, দেশের কল্যাণ সাধনের উপযোগী দেশবাসীকে করিতে, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' আমরণ রাখিতে এবং পরকেও আপন করিতে ক্রীড়াক্ষেত্রের তুলনা ক্রীড়াক্ষেত্রই — ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। খেলাধূলার সার্ব্বজনীনতার যথার্থ কারণ নির্ণয় করা ইহার পরে কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না।

অবসর গ্রহণ—ক্রীড়াক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল আমাদের যথাসাধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ যখন আমরা করি, তখন খেলাধূলার কদর বাড়িয়া গিয়াছে দেশের সর্ব্বত্র। স্কুল কলেজে ছেলে ভর্ত্তি করিবার সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করেন, 'খেলাধূলায় ছেলের ঝোঁক আছে কিনা'। কর্ম্মস্থলে কর্ম্মপ্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'খেলাধূলায় সে পোক্ত কিনা'। লাট বেলাটের খেলাধূলায় অনুরক্তি দেখিয়া শিক্ষিত পদস্থ দেশীয় 'হোমরা চোমরা' খেলার মাঠের ত্রি-সীমার মধ্যে পূর্ব্বে যাঁহাদের দেখি নাই, দেখিলাম তাঁহারাও ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া খেলার দলের 'কেষ্ট বিষ্টু' হইতে লালায়িত, মুক্তহস্ত। রাজা-মহারাজের খেলার দল আজ এখানে কাল সেখানে গজাইতে আরম্ভ হইল। কেহ কেহ বা নামজাদা দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। আমরা ভাবিলাম — আমাদের কঠোর সাধনার ফলেই আমরা দেশকে জাগাইলাম, এত অকৃত্রিম বন্ধু আমরা লাভ করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি—মনে মনে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিলাম।

বিদেশ গমন—ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাত্ররূপে সাগর পারে আমাকে যাইতে হয়। ফুট্‌বলে ইংলণ্ডের অসাধারণ খ্যাতি। সেই ইংলণ্ডের লীগ ও কাপের খেলা দেখিবার লোভ সম্বরণ আমি করিতে পারি নাই। লণ্ডনে অবস্থানকালে খেলার মত খেলা দেখিয়াছি আমি প্রায় সবই। খেলার্ কয়েকটী ধরণ সেখানে যাহা দেখি পূর্ব্বে তাহা কখনও দেখি নাই। সে ধরণের খেলা খেলোয়াড় খেলে কেমন করিয়া তাহা বুঝাও কঠিন হইয়াছে। অপূর্ব্ব কুশলতাপূর্ণ এই ধরনের কয়েকটী 'মার' ব্যতীত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ দলের খেলার ধরণ ও আমাদের কালের ক্যাল্‌কাটা, বাফ্‌স্‌, রয়াল্ আইরিশ্ বা রয়াল্ ওয়েল্‌সের খেলার ধরণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছু দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বোপরি লক্ষ্য করি, খেলার দলগুলির নির্দ্দেশকের নির্দ্দেশ অবনত মস্তকে মানিয়া চলা ও কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ সসম্ভ্রমে পালন করা।

স্বদেশ প্রত্যাগমন—দেশে ফিরিয়া দেখি ইয়োরোপীয়ের খেলা ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। অনেক দেশীয় দলের বাহ্য চাক্‌চিক্যের অবধি নাই। বাঙালীর শীল্ড জয়ে রবাহুত কত 'হিতৈষী' বিভিন্ন দেশীয় দলে ভাল করিয়া 'বার' দিয়া বসিয়াছেন—'দহরম মহরম্' তাহাদের 'সাহেব-সুবা'র সঙ্গে। বেশ দেখিতে পাইলাম 'ভোল ফিরান' তাহাদের আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। হাসি চাপা দায় হইল। ভাবনারও অন্ত রহিল না—"দেখিতেছি, দেশ জাগাইয়াছি খুবই! এখন ইহার পরিণাম?" মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। জার্ম্মান যুদ্ধ বাধিল। মনঃসংযোগ করিতে হইল বেঙ্গল এম্বুলান্স কোর ও বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠনে।

স্বাস্থ্য ও মনোভঙ্গ—এম্বুলেন্স কোর ও রেজিমেণ্ট গঠনে কয়েক মাস আহার ও নিদ্রার অনিয়মে এবং দিবারাত্র ঘোর পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য আমার ভঙ্গ হয় ভীষণ ভাবেই। শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে

না হইতে ভগবানের নির্দ্দেশে আমি, আমার একমাত্র কন্যা হারা হই। আমার প্রাপ্য এই কঠিন আঘাতে আমি স্থাণুবৎ হইয়া পড়ি।

মেজর নায়াডুর সহানুভূতি— কন্যা বিয়োগের পরে কয়েক বৎসর কেহই আমাকে ঘরের কোণ হইতে বাহির করিতে পারে নাই। কলিকাতায় টেষ্ট্ ম্যাচ্ উপলক্ষে মেজর নায়াডু কলিকাতায় আগমন করিলে আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিজয় বোধ হয় আমার সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলে। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সজোরে আমাকে নাড়া দিয়া বলেন, "আপনার মত Sportsmanএর কি এই ভাবে পড়িয়া থাকা উচিৎ? চলুন খেলায় আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন—এ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" মেজরের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া না দিয়া আমি থাকিতে পারি নাই? কতকাল পরে খেলার মাঠে আবার আমি উপস্থিত হই।

খেলা-ধূলার ইতিহাস— পুরাতনের অনেকে খেলার মাঠে আমাকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে 'বাঙ্গালীর খেলা-ধূলার ইতিহাস' লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি আমি দিই। বহু বর্ষ পূর্ব্বে ৺অমরনাথ দত্তের 'রঙ্গালয়ে' খেলা-ধূলার কথা বাঙ্গলায় আমি লিখিলেও—ইতিহাস রচনা আধা-ইংরাজী আধা-বাংলায় করিতে আমি ইতস্ততঃ করি। 'চুঁচড়া বার্ত্তাবহ' ও 'হিতবাদী'র তাগিদে কিন্তু ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিতে হয় আমাকে অনতিবিলম্বে। কন্যা-শোক বুকে চাপিয়া লেখনী চালনায় আমি দ্রুত অগ্রসর হই।

"প্রবর্ত্তকের ডাক"—ইতিহাস রচনা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রবর্ত্তকের পরিচালক 'প্রবর্ত্তকে' খেলা-ধূলা বিভাগ খুলিবার কথা তুলিয়া তাহার সম্পাদনার ভার গ্রহণে আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। সে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। খেলার মাঠে বিশৃঙ্খলতা, আদর্শচ্যুত হইয়া দেশীয় দলের শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্তি, খেলা-ধূলার নামে ঔদ্ধত্য, দ্বেষ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার পরাকাষ্ঠা, খেলা-ধূলা পরিচালনার আবরণে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়া লওয়া প্রভৃতিতে খেলার মাঠ যখন ছাইয়া গিয়াছে, সে অবস্থায় খেলা-ধূলার উচ্চাদর্শ সংস্থাপনে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ যাহার অতিবাহিত হইয়াছে, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্ন দেহ ও চিত্ত তাহার পক্ষে 'প্রবর্ত্তকের' সাগ্রহ আহ্বানে সাড়া দিয়া কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত হওয়ার গুরুত্বের কথা স্বতঃই আমার মনে উদয় হয়। খেলা-ধূলার কল্যাণকল্পে দ্বিধাভাব মন হইতে দূর করিয়া নবীনের ন্যায় নবোৎসাহে প্রবর্ত্তকের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি সম্মত হই। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল 'প্রবর্ত্তকে' খেলা-ধূলার আলোচনা ও পুরাতন কথার বিবৃতি যাহা করা ও দেওয়া হইয়াছে, আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। চেষ্টা যে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বোধ হয় বলা যায় না— ক্রিকেট্ বোর্ডের ওলট-পালট্ ও কর্দ্দমপ্রোথিত আই-এফ-এর উত্থান চেষ্টা দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। সে যাহা হউক, লেখকের ক্ষীণ চেষ্টার মূল্য কিছু আছে কিনা সাধারণের বিচার্য্য। খেলা-ধূলার পরিভাষা লিখিয়াও আমি ধন্য হই।

বিদায় গ্রহণ—১২ বৎসর বয়স হইতে ৬১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক বা অন্যরূপে খেলা-ধূলার মঙ্গলকামনায় লেখক যাহা করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহাতে ভুলচুক কখনও হয় নাই—এমন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা লেখক রাখে না। তবে পক্ষপাতিত্ব বা সত্যগোপনের চেষ্টা করা তাহার কল্পনাতে কখনও আসে নাই। অক্ষমতার জন্য হয়ত' অনেক স্থলে অনেক দোষ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, শক্তিবান কেহ পরে তাহা নির্দ্দোষ করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন— বিদায় গ্রহণকালে ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। বিদায় গ্রহণের যে ক্লেশ—মর্ম্মে মর্ম্মে আমি তাহা অনুভব করিতেছি। আমার যাহা দিবার উজাড় করিয়া আমি তাহা দিয়াছি, তথাপি যাইবার সময় মনে হইতেছে—কিছুই দেওয়া হয় নাই। স্মৃতি কত কথা মনে জাগাইয়া দিতেছে। যাইবার সময়ে খেলার মাঠে শান্তি বিরাজমান দেখিয়া যাইতে পারিলে আনন্দের অবধি থাকিত না। আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা যেন শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হয়।

৬

আজ যে বীজ বপন করা হয়, সে বৃক্ষ যখন ফলিতে থাকে, তাহা সহজে নিঃশেষ হয় না। বিশেষতঃ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিপ্লববাদিগণের উপর্য্যুপরি তাণ্ডব-ক্রীড়ার ফলে ভারত-রক্ষা আইন ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের প্রয়োগে বাংলার বিপ্লবিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত একদল শিখ ভারতের বিপ্লব-কর্ম্মে যোগদান করায়, অবস্থা খুবই গুরুতর হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতায় ও কঠোর শাসনে ভারতব্যাপী বিপ্লবপ্রচেষ্টা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। মাকড়শার জালের ন্যায় পুলিসের শৃঙ্খল-রচনার ফলে আমাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। বিপ্লবীদের সংসর্গ হইতে যতই দূরে পড়িতে-ছিলাম, গুপ্ত পুলিসদিগের কঠোর দৃষ্টি-প্রভাবে আমার নূতন কর্ম্মপ্রেরণা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম করিতেছিল। বিধাতার অলক্ষ্য হস্তও যেন আমার অনুকূলে ছিল না। অপ্রত্যাশিত ঘটনার সংঘটনে আমি ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। দুই একটী অপ্রিয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া, আমার তাৎকালীন অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

আমার বয়স তখন যৌবনের সীমা ছাড়ায় নাই। শ্রীঅরবিন্দের অনুগ্রহে ধর্ম্মসংস্কারের বন্ধনমুক্ত হইয়া অধ্যাত্মসাধনার বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিতেছি মাত্র; দুর্ঘটনার আবর্ত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতাম। এমন কেহ বিজ্ঞ জন ছিলেন না, যাঁহার সহিত দুর্দ্দিনে পরামর্শ করিতে পারি। চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী ভার্য্যাই ছিলেন আমার প্রধান মন্ত্রী। কর্ম্মের গুরুতায় নিজেকেও যেমন বয়সের তুলনায় প্রবীণ মনে করিতাম, গৃহলক্ষ্মীর বয়সের প্রতিও তেমনি আমার লক্ষ্য ছিল না। যৌবনেই ত্যাগ ও সংযমের শাসনে তাঁহার সুকোমল শ্রীমণ্ডিত ললাট কঠিন তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে আমাকেও থতমত খাইতে হইত। সকল বিষয়েই তিনি সুগভীর ভাবে আলোচনা করার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ আমায় মুগ্ধ করিত। তাঁহার গভীর চিন্তা-শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতাম। কিন্তু সকল বিষয় লইয়া মতামতের আলোচনা হইত মাত্র; তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না। অনেক সময়ে বুদ্ধিতে দপ্ করিয়া যাহা ফুটিয়া উঠিত, তাহারই অনুসরণ করিতাম এবং এইরূপেই আমি অনেক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ফলও লাভ করিয়াছি। যেখানে নিজের অনুভূতির সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত মিলিত না, সেখানে আমি নিজের দায়িত্বেই কার্য্য করিয়া বসিতাম। এই মতানৈক্য হইলে, তিনি দুই কারণে বিপন্ন হইয়া পড়িতেন। প্রথম কারণ, এত করিয়াও তিনি আমার সহিত মতৈক্য লাভ করিতে পারিতেছেন না; দ্বিতীয় কারণ, কার্য্যের পর বিপদের মাত্রা যদি বর্দ্ধিত হইত, জীবনের পথে অধিক বাধা সৃষ্টি করিত; তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেন, বলিতেন, "দর্শীর কথা বাসি না হইলে, তোমার ভাল লাগিবে না।" আমি জানিতাম—বিপদ্ অথবা সম্পদ্, এই দুইয়েরই আগমন ঈশ্বরেচ্ছায় হয়। যদি ভুল করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনি, দুঃখের মাত্রা বাড়ে, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। এইরূপ প্রত্যয় সহিবার শক্তি দিত। দুঃখ-ভারে কিন্তু উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। তিনি সর্ব্বদা চাহিতেন স্বস্তি এবং শান্তি। আমি কিছুই চাহিতাম না। প্রবাহের মত বহিয়া চলাই ছিল আমার ধর্ম্ম। দুই জনের স্বভাব ছিল এইরূপ বিপরীতমুখী।

দোলের দিনে ফাগুয়া লইয়া উৎসবের আরম্ভ হইত। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তার পর রঙের পালা, এই সময়ে তিনি একটু সরিয়া দাঁড়াইতেন। ইহার পর যাহা হইত, সেখানে তাঁহার আর দর্শন মিলিত

না। ঘরে খিল আঁটিয়া কাঁদিতেন, আর বাহিরে চলিত ভৈরব তাণ্ডব-লীলা। রং ফুরাইলে দোয়াতের কালি, তার পর গোময়; শেষে নর্দ্দামার পাঁক লইয়া হুড়াহুড়ি, মারামারি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। শত তরুণ লইয়া আমার দিন চলে। যৌবনের এই উত্তেজনায় আমি প্রতিবন্ধক ছিলাম না। বিচিত্র প্রকৃতির বিচিত্র প্রকার অভিব্যক্তি আমাকেও দশচক্রে ভূত করিয়া ছাড়িত। মারামারি, পেটাপিটির সময়ে ছেলেদের অতি সতর্কতা সত্ত্বেও, আমার বুকে পিঠেও কিল-চড় না পড়িত, এমন নহে। স্নানের ঘাটে গিয়া, গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া ছোঁড়াছুড়ির সময়ে একবার আমার চক্ষু বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অপরাহ্নে অবসন্ন দেহে স্নানান্তে বাড়ী ফিরিলে, তিনি বিষণ্ণ মনে ঘর হইতে বাহির হইতেন; উৎসবের দিনে তাঁর এই মলিন মুখ দেখিয়া আমি অপ্রস্তুত হইতাম। তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘর-দোর-উঠান ক্লেদমুক্ত করিতে নীরবে শ্রম দিতেন। পরিশ্রান্ত শরীর সন্ধ্যায় এলাইয়া পড়িত। পরদিন প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি বলিতেন "ঠাকুরের দোল এমন ভূতের লীলা নয়, তোমাদের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।"

বেশ বুঝিতাম—তিনি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব ভাল বাসেন না। স্থির শান্ত প্রকৃতির পরিপূর্ণ প্রসাদে তাঁর সবখানি ছিল শান্তি ও অনাবিল আনন্দে ভরপুর। স্থৈর্য্য তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম। বিপ্লব-চাঞ্চল্য আমার জীবন-ধর্ম্ম। তবুও ছিল অপার্থিব ঐক্য—অন্তরের এত প্রেম অন্য কোথাও আর খুঁজিয়া পাইব না।

উৎসব-পর্ব্বের আর একটী দিন ছিল বড় আতঙ্কের। কালীপূজার দিন তিনি করুণ নয়নে বলিতেন "দীপ-মালায় বাড়ী-ঘর সাজাইয়া মায়ের আরতি কর, দুম্-দাম্ আওয়াজে আর বারুদের কালি লেপিয়া ঘর-দোর অপরিচ্ছন্ন করিও না।"

সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিত কালো আঁচল দোলাইয়া, তিনি স্থির ধীর চিত্তে সহস্র সহস্র দুর্গাপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখা জ্বালিতেন বড় আনন্দে। আমরা দলে দলে সে শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতাম। কিন্তু বারুদের ধোঁয়ায় অঞ্জন না ভরিলে, কালীপূজার নেশা জমিত না। আরম্ভ হইয়া যাইত দুম্ দাম্, তাঁর অনিচ্ছায় বাজি পোড়াইবার ধুম। তিনি খিল দিয়া ঘরে ঢুকিতেন। বাজি খেলা শেষ হইলে, আঁটি আঁটি প্যাকাটির মশাল জ্বালিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ হইত। আনন্দের আতিশয্যে একবার মেজ-বৌয়ের বিশাল খড়ের স্তূপ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। আগুনের শিখা যখন লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া পল্লীগৃহ স্পর্শ করে, তখন আবার কলসী কলসী জল ঢালিয়া সে আগুন নির্ব্বাপিত করা হয়। কত ক্ষয়-ক্ষতি, কত অনাবশ্যক কর্ম্মসৃষ্টির মধ্যে আমাদের শক্তি অপচিত হইতেছিল, সে হিসাব তখন কে করিবে? ভোরে উঠিয়া, তিনি বটু তিরস্কারের সঙ্গে কালীপূজার কালি-ধুলি মুছিয়া আবার গৃহদ্বার সুন্দর করিয়া তুলিতেন। তিনি চাহিতেন কাজে-কর্ম্মে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে নিয়ম ও ছন্দঃ। সৌন্দর্য্য ও অমৃতের ডালি সাজাইয়া, তিনি দেবতার আরাধনা কামনা করিতেন। আর আমার ছিল ছন্দোহীন, উন্মাদ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-রঙ্গ। তরুণের প্রাণ ইন্ধন পাইয়া চতুর্দ্দিকে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত। তাঁর বিনীত নিষেধ আমায় ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। একবার কালী-পূজার রাত্রে চরম জব্দ হইয়াছিলাম।

সন্ধ্যার প্রদীপ হাজারে হাজারে ছাদে, অলিন্দে, প্রাচীরে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সে শোভা দেখিয়া চিরদিনের ন্যায় কিছুক্ষণ আমাদের স্তব্ধতা; তারপর বাজির মাত্রা ছাড়াইয়া মহাবাজির বিকট আওয়াজে বাড়ী-ঘর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বন্ধ ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া করযোড়ে কাকুতি জানাইলেন, "ওগো, থাম।" তখন আমরা কালীপূজার একটা বড় বোমার রজ্জুতে আগুন ধরাইয়া, একটা ক্যানেস্তারার বড় টিন চাপা দিয়া, তাহার উপর আবার একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপাইয়া মজা দেখার উপক্রম করিতেছি। ব্যাপারটার মধ্যে ভীষণ কিছু ঘটার যে সম্ভাবনা আছে, এইরূপ ধারণা আমার মনে ঠাঁই পায় নাই। তাঁর হৃদয়ে একটা ভাবী আশঙ্কা এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিয়া ঐরূপ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য আমাদের মিনতি জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ নিবেদনেও ঐ কার্য্য হইতে কেহ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। আমার ছাত্র-বন্ধুরা আমায় আড়াল করিয়া,

বোমার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ক্যানেস্তারাটা কত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা দেখিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কর্ণ-বধিরকারী গগনভেদী শব্দে প্রাঙ্গণের যত আলো সব নিভিয়া গিয়াছে, শুধু অন্ধকার; কাহারও মুখে কথা নাই, একপার্শ্বে কে একজন আর্ত্তনাদ করিতেছে! ধূমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে অনবগুণ্ঠনে মহাবিপদাশঙ্কায় হ্যারিকেন হাতে জগদ্ধাত্রী আসিয়া সচকিত দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথমেই আমার দিকে চাহিলেন। আমার উদরের দক্ষিণ অংশের কতকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। আমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তরুণ, তাহাকে অতিক্রম করিয়া সঙ্ঘের চিরসেবক কৃষ্ণচন্দ্রের বাহুমূলের উর্দ্ধভাগ একেবারে ছেঁচিয়া রুধিরাক্ত হইয়াছে, স্থূল মাংসপেশী ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বজ্র আর রক্ত—মহাকালীর তাণ্ডব পূজা এইদিনেই সমাপ্ত হইল। আজিও তাঁহার ইচ্ছামত কালীপূজার রাত্রে মন্দিরে মন্দিরে দীপমালার শোভা ফুটে; কিন্তু তাঁহার জীবনকালে এই সুস্থিরতা, সঙ্ঘের এই সৌম্য শান্ত ভাব কোথায় লুকাইয়াছিল! দেবী কি আজ সান্ত্বনা পাইয়াছেন?

এই চরিত্র-চিত্র ভিতরের। সঙ্ঘের অঙ্কুরাবস্থায় বাহিরের দুরন্ত জীবনরঙ্গ যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল উল্লেখ করায় লাভ নাই। এই সকল শ্রীঅরবিন্দের যোগপর্ব্বেই চলিতেছিল। শক্তি ছন্দোহীন আধারে সেদিন অপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি লইয়া আমাদের এমন করিয়াই নাচাইতেছিল। এইবার অন্য কয়েকটা বাহিরের ঘটনা বিবৃত করিব।

ভারত-রক্ষা আইনে চতুর্দ্দিকে ধরপাকড় চলিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন—"I see people are interned, who have no connection at all with politics or have long cut off, whatever connection they had. Owing to the War, the authorities are uneasy and suspicious and being ill-served by their Police upon prejudicial and often false report."

অর্থাৎ আমি দেখিতেছি—'যাহাদের সহিত রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই, অথবা যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাহাও বহুদিন পূর্ব্বে যাহারা ছাড়িয়াছে, তাহারা অন্তরীণ হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধের দরুণ অস্বস্তিপূর্ণ ও সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পুলিশ-বিভাগ সংস্কারদুষ্ট ও প্রায়শঃ মিথ্যা সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে।' আমাকেও সতর্ক করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"You have to sit tight, spiritually defend yourself and physically avoid putting yourself where the Police can do you any harm and as far as possible, avoid also doing anything which would give any colour or appearance of a foundation for their prejudices."

অর্থাৎ 'তোমাকে স্থির হইয়া বসিতে হইবে। অধ্যাত্মশক্তিতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে এবং বাহ্যতঃ এরূপ কোন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করায় বিরত হইবে, যেখানে পুলিস ক্ষতি করিতে পারে। আর যতদূর সম্ভব, এমন কোন কার্য্যও করিবে না, যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব সংস্কারে রঙ ফলাইবার বা ঘুণাক্ষরেও তাহার ভিত্তি-রক্ষার প্রশ্রয় দান করে।'

শ্রীঅরবিন্দের এই শুভেচ্ছা কার্য্যকরী করার জন্য আমি খুবই সচেতন ছিলাম। কিন্তু ঘটনার স্রোতঃ অতিক্রম করার সাধ্য তখনও আমার ছিল না। সেদিন শ্রীঅরবিন্দের এই সতর্কতা তত কার্য্যকরী হয় নাই; কিন্তু তাঁহার অমোঘ ইচ্ছা ব্যর্থ করিতেও আমি পারি নাই। এ জগতে শুভেচ্ছা কখন ব্যর্থ হয় না, ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ আর ভারতে বৈপ্লবিক অশান্তি—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সময়ে কি কঠোর রুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সে দিনের ভুক্তভোগী যাঁহারা, তাঁহারা ভিন্ন অন্যে কেহ বুঝিবেন না। বিপ্লবী বলিয়া যাঁহারা ধৃত হন, তাঁহাদের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। কলিকাতার উপকণ্ঠে জেলগুলিতে বন্দীদের স্থান সঙ্কুলান হইত না। প্রসিদ্ধ দালান্দা হাউসের নাম আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঠিক এই কড়াকড়ির সময়ে পরপর কয়েকটি ঘটনায় আমার

অবস্থা এমনই হইল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের প্রতীক্ষায় আমায় বসিয়া থাকিতে হইত ; আর ওষ্ঠে ওষ্ঠপুট চাপিয়া, আমার উপর কল্যাণদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আমাকে ভরসা দিতেন, আশা দিতেন দূরে শ্রীঅরবিন্দ আর নিকটে চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী ভার্য্যা। অপূর্ব্ব রহস্যময় জীবন আমার। পৃথিবীতে দুই নৌকায় পা দিয়া আমি যে চলিয়াছি, তাহা সেদিন উপলব্ধি করি নাই।

সে একদিন কলিকাতার এক জরুরী ডাকে রাত্রি-শেষেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া কলিকাতায় ছুটিতে হইল। ফিরিলাম অন্ধকারে অন্ধকারে মধ্য রাত্রিতে। আসিয়াই শুনিলাম, আমার ছাত্র-বন্ধু অনেকেই "মাদাদেপো" হইয়াছে। "মাদাদেপো" ফরাসী কথা, ইহার অর্থ পুলিস-গারদে আটক থাকা। ঘটনার বিবরণ—আমারই এক নিকট প্রতিবেশী আমাকে গালি দিতে দিতে সদল-বলে যাইতেছিলেন। আমার ছাত্র-বন্ধুরা প্রতিবাদ করায়, প্রথম মুখোমুখী, তার পর হাতাহাতি, শেষে রক্তারক্তিতে ঘটনা পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তরুণেরা ব্যতীত পল্লীর অনেকেই কারণে অকারণে আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি তাহারই অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন। প্রতিদানে উত্তম-মধ্যমের মাত্রাটা সীমা ছাড়াইয়া যায়। খণ্ড-যুদ্ধে আমার ছাত্র-বন্ধুদেরই জয়-লাভ হয়। ঘটনাটি পুলিস পর্য্যন্ত গড়ায়। তারপর ডাক্তার সাহেবের জোর সার্টিফিকেটের বলে আমার বন্ধুরা পুলিস-গারদে আটক পড়ে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভিভাবকমণ্ডলী আমায় খোঁজাখুঁজি করিয়াছেন। আমি বাড়ী আছি, এ কথাও গৃহলক্ষ্মী বলিতে পারেন নাই ; কেন না, কথাটা মিথ্যা হইবে। আবার বাড়ী নাই, এ কথাও তিনি বলিতে ভরসা করেন নাই ; কেন না, সে কথা শুনিলে পুলিস আমার ফেরার পথেই ধর-পাকড় করিতে পারে। সারা দিনের দুশ্চিন্তায় তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি নিরাপদে ফিরিয়াছি, ইহাতে তিনি অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু এইরূপ দুঃসময়ে ছেলেদের এইরূপ দুর্দ্দান্ত ব্যবহার আমারই প্রশ্রয়ের ফল বলিয়া আমাকে তিনি কড়া কড়া উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না।

রাত্রিতে কিছু করার ছিল না। দুশ্চিন্তাও আমার কম হইল না। পাড়া-প্রতিবাসী কেহ রাজনৈতিক ভয়ে, কেহ স্বভাবদোষে আমার হিতকামী নহে। সকাল হইলে, অভিভাবকেরা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তুমুল আন্দোলন সুরু করিলেন। এই অবস্থায় ঘটনাটা বড় বিসদৃশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

প্রাতঃকালে সদর পুলিসে গিয়া বুঝিলাম, ব্যাপারটা নানা প্রকারের শত্রুপক্ষের চক্রান্তে বেশ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার সাহেব সার্টিফিকেটে লিখিয়াছিলেন "প্রহারের গুরুত্ব খুবই, ইহার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাও আসন্ন হইতে পারিত।" এই অবস্থায় ছাত্র-বন্ধুদের মুক্তির উপায় সোজা ছিল না। দোষ স্বীকার করাইয়া, তাহাদের দণ্ডভোগটাও অন্তর্দ্দেবতার সম্মতি-পূত বলিয়া মনে হইল না। দেখিলাম, সদর পুলিসের গেটের সম্মুখে বেশ ভীড় জমিয়াছে। পাড়ার দুই একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এইবার আমাদের জব্দ করিতে পারিবেন মনে করিয়া বেশ উৎফুল্ল। ইংরাজ গোয়েন্দা-বিভাগের দুই একজন কর্ম্মচারীকেও সেখানে দেখা গেল। আমি কর্ত্তব্য এক মুহূর্ত্তেই স্থির করিয়া লইলাম। কৌশলে স্থানীয় পুলিস-কমিশনার মঁসিয়ে ফ্রান্সিসের স্ত্রীর সহিত সাক্ষৎকারের সুযোগ মিলিল। বিপদের সময়ে "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি" মন্ত্র মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ শরণে শ্রীঅরবিন্দই মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। বুকে বেশ ভরসা পাই। পুলিস-কমিশনারের পত্নীর সহিত কথাবার্ত্তা ভালই হইল। পুলিস-কোতোয়ালের নিকট আসামী ও ফরিয়াদীদের জবানবন্দী যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পর, পুলিস-কমিশনারের নিকট কাগজ-পত্র প্রেরিত হইল। তাহার পর পুলিস-কমিশনার সিগার মুখে দিয়া ঘন ঘন ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে-এক প্রস্থ রিপোর্ট লিখিয়া আসামী ও ফরিয়াদীদের প্রকিয়োর‍্যার জেনারেলের নিকট কেস্ পাঠাইয়া দিলেন। ফরাসী চন্দননগরে ইহাকেই আমরা "পণ্ডিত সাহেব" বলি। ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার হুকুম ইনিই দিয়া থাকেন। আসামী ও ফরিয়াদী তাঁহার নিকট হাজির হইল। তিনি উভয় পক্ষের বিবৃতি গ্রহণ করিয়া ও পুলিস কমিশনারের রিপোর্ট অনুধাবন

করিয়া, পরিশেষে গম্ভীর মুখে গুরু-গর্জ্জনে বলিলেন "ক্লাসে।" অর্থাৎ বেকসুর খালাস।

প্রতিপক্ষ যাঁহারা, তাঁহারা সবিস্ময়ে 'হাঁ' করিয়া রহিলেন। আর আমার ছাত্র-বন্ধুরা সগৌরবে কোর্ট হইতে বাহির হইয়া, সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল 'বন্দেমাতরম্'। অভিযোক্তা এই ঘটনার পর আমার হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় প্রতিবেশি মহলে আমাদের একটু প্রতি-পত্তি বাড়িল। আমাদের দলের বিরুদ্ধে এই সময়ে একটী বিরুদ্ধ কথাও কেহ উচ্চারণ করিতে ভরসা করিত না আমাদের অলক্ষ্যে কিন্তু বিপদ্ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং ইহার সঙ্কেত আমি বৎসরের প্রথমেই পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা আমলে না আনিয়া, প্রচণ্ড বেগে নূতন জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম।

যে সকল ছাত্র আমার সহিত একত্র হইয়া দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিল, যাহারা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে উপাসনার মন্দিরে বসিয়া পূজা করিত, বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিত, যাহাদের লইয়া আমি রবিবাসরীয় সাহিত্যসভায় পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থাদির আলোচনা করিতাম, তাহারা সকলেই দেশ-জননীর কৃতী সন্তান হউক, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাধনায় সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠুক—এই প্রার্থনা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট করিতাম। যে রবিবাসরীয় সভা ৺কানাইলাল দত্তের সাহায্যে ১৯০৬খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নানাবিধ ঘটনার আবর্ত্তে উহা এখন পর্য্যন্ত আমারই তত্ত্বাবধানে চলিতেছিল। এই সাহিত্যসভার অগ্রণী ছাত্র শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র কানাইলালেরই এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা। একনিষ্ঠ চিত্তে সে এই সভার শিক্ষা ও সাধনা নিয়মিত ভাবে পালন করিত এবং সেই নির্দ্দেশ-মত জীবন গ্রহণ করিতেও কৃতসঙ্কল্প ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ও আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে রিপণ কলেজে যখন অধ্যয়ন করিতেছিল, সেই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের কলিকাতায় শুভাগমনোপলক্ষে অরুণচন্দ্র পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইহার দুইদিন পূর্ব্বে মণীন্দ্রনাথ এম, এস্.সি পড়িতে পড়িতে পুলিসের হাত এড়াইয়া নির্ব্বিবাদে চন্দননগরে উপস্থিত হয় ও এক প্রকার সহরবন্দী হইয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। অরুণচন্দ্রের বন্দী হওয়ার সংবাদ তাহার বিধবা জননী আমার নিকট আসিয়া যখন জ্ঞাপন করিলেন, মাথায় আমাদের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বিধবার সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সন্তান আমারই সংসর্গে আজ সে বিপন্ন হইয়াছে; অরুণের মাতাঠাকুরাণী করুণ কম্পিত কণ্ঠে শুনাইয়া দিলেন যে, তাহার মুক্তির ব্যবস্থা যে কোন প্রকারে আমাকেই করিতে হইবে। খুব দুশ্চিন্তায় পড়িলাম। কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমার উপর পুলিসের অশুভ দৃষ্টির কথা জানিয়া অরুণ-চন্দ্রের মাতুল আমায় শাসাইয়া গিয়াছিলেন, যেন আমি অরুণকে আর আমার নিকট আসিতে না দিই। অভিভাবকগণের এইরূপ শাসন-বাক্য আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। আমি বলিতাম—আমার বাড়ীর দুয়ার দিবারাত্রই মুক্ত থাকিবে, শত্রু-মিত্র সকলেরই অধিকার আমার বাড়ীতে। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের পর অরুণচন্দ্রের বন্দীদশা সহিয়া লইবার মত অবস্থা আমার ছিল না। এই সংবাদে আমি বেশ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার স্ত্রীও এই কথা শুনিলেন। তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তোমার যে কাজ, পরের ছেলেপুলে লইয়া এইরূপ মাতামাতি ভাল নয়। তোমার জন্য পাড়া-প্রতিবাসী এত বিপদ্ মাথা পাতিয়া বহিবে কেন?"

সারাদিন আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু মনে হইতেছে তোমাদের কাহারও কিছু হইবে না। অরুণ নিরাপদেই ফিরিয়া আসিবে। সারারাত্রি কিন্তু ঘুম হইল না। পরদিন প্রভাতে আমার পূর্ব্বপরিচিত এক ব্যারিষ্টার বন্ধুকে অরুণের মুক্তির ব্যবস্থার ভার লইতে অনুরোধ করিব চিন্তা করিতেছি, নানা প্রশ্ন, নানা জনের পরামর্শ পুরাদমে চলিতেছে; হঠাৎ অরুণচন্দ্র আসিয়া আমাদের চমৎকৃত করিল। উল্লাসের সীমা রহিল না। 'গুরু মহারাজের' জয়ধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইল। আমরা সানন্দে অরুণকে লইয়া তাহার মাতার নিকট পৌছাইয়া দিলাম।

এই দুইটী ঘটনাই ভবিষ্যতের দুর্দ্দিন জ্ঞাপন করিতেছিল। কিন্তু সে দূর-দর্শন সেদিন ছিল না আজিকার দিন কাটিলেই ভাল, কাল কি হইবে, যে

চিন্তা করার অবকাশও আমার ছিল না। আজও এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বিপ্লববাদের আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু রাজশক্তি সে কথা সহজে বুঝে না। শ্রীঅরবিন্দ আমায় ধর্ম্মতঃ ও কার্য্যতঃ এমন ভাবে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, যাহাতে আমি পুলিসের ফাঁদে পা দিয়া না বসি। কিন্তু ভবিতব্যের অলক্ষ্য হস্ত আমায় অকারণে অভাবনীয় ভাবে বিপজ্জালে জড়াইতে উদ্যত হইয়াছিল।

বোধ হয়, সেটা শ্রাবণ মাস হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই আছে। সকালে উঠিয়াই শুনিলাম—ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে একখানি সাইকেল আর খান দুই ভাল চেয়ার অপহৃত হইয়াছে।

ঘটনাটী শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। চুরির প্রতিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু এই ঘটনায় আমার কর্ম্মের পথে কি ভীষণ অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, সে কথা আমি তলাইয়া বুঝি নাই। আমাদের পারিবারিক ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে আমার চলিয়া আসার পর ব্যবসাটী নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, অগ্রজের অবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে শিশুকাল হইতেই কাজের মানুষ করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমাদের রবিবাসরীয় সভার সেও একজন ছাত্র ছিল। কিন্তু মানুষের কর্ম্মই স্বভাব ও স্বধর্ম্ম হইয়া জীবনকে চালাইয়া লয়। আমার অবিরাম চেষ্টা এই জন্যই এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। মন্দ সংসর্গে পড়িয়া সকল প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিতে তাহার বাধিত না। আমার শয়নগৃহে আমার একখানি বাঁধান ছবি ছিল। ছবিখানি একদিন অপহৃত হওয়ায়, আমার স্ত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রটীকেই দায়ী করিয়াছিলেন, আমি সে কথা উড়াইয়া দিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, গোয়েন্দা পুলিসের লোকেরা তাহার কৃতিত্বের পরীক্ষার জন্যই হউক অথবা অন্য উদ্দেশ্যবশতঃ হউক, আমার একখানি ছবি হস্তগত করার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল।

সাইকেল ও চেয়ার চুরির পর এই ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে নিখোঁজ হইতে দেখা গেল। সংশয় দৃঢ় হইল। চরিত্রহীন হইলেও, আমার প্রতি তাহার একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল। সে বাড়ী ফিরিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে সব বলিয়া ফেলিল। সে বলিল, "সাইকেলটী বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি, আর চেয়ার দুইখানি এক গোয়েন্দা-পুলিস কর্ম্মচারী খরিদ করিয়াছে।"

আজিকার মত সে দিন অহিংসা-নীতির এত সুব্যাখ্যা মিলে নাই। এই সূত্র ধরিয়া গোয়েন্দা পুলিসকে একটু শিক্ষা দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীমান্‌কে ভরসা দিয়া পুলিসে ব্যাপারটী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিস কমিশনার সাহেবকে বলিলাম "বিষয়টী জানাজানি হইবেই, অতএব বামাল সরাইবার আগেই গোয়েন্দা পুলিসদের বাড়ীটী খানাতল্লাসী করিতে হইবে।"

এই সময়ে আর একজন ফরাসী পুলিস কমিশনার ছিলেন, নাম মঁসিয়ে পমেজ। তিনি একজন স্বাধীনচেতা রাজপুরুষ, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি বলিলেন "এখন অপরাহ্ন, বড় সাহেবের নিকট হইতে হুকুমনামা বাহির করিতেই ৬টা বাজিয়া যাইবে, আজ খানাতল্লাসী সম্ভব নহে। কাল সকালে করিব।"

ফরাসী দেশে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই খানাতল্লাসীর নিয়ম প্রবর্ত্তিত। কিন্তু কাল সকাল পর্য্যন্ত বামাল যে গোয়েন্দা পুলিস কর্ম্মচারী রাখিয়া দিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?

পমেজ সাহেব বলিলেন "আপনারা একটু নজর রাখুন, বামাল না সরাইয়া ফেলে।"

একজন রাজকর্ম্মচারীর এইটুকু ভরসার বাণীই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া, আমার তরুণবাহিনীকে আহ্বান দিলাম। প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০ জন তরুণ একত্র হইল। গোয়েন্দা পুলিসকে জব্দ করার এই সুযোগ ছাড়িবার নয়। এই প্রবৃত্তি অবাধে আমায় যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ধরাইয়া দিবার গুরু-মূর্ত্তি আমার নিকট নাই; কিন্তু পথের বাধা চিরদিনই যিনি, তিনি কথা শুনিয়া, এইরূপ হইলে একটা অনর্থ বাধিবে বলিয়া এই কর্ম্ম হইতে আমায় প্রতিনিবৃত্ত

করার চেষ্টা করিলেন। আমার হৃদয়ের রাজসিক প্রকৃতি তখনও রূপান্তরিত হইয়া বিশুদ্ধ সত্বশ্রী ধারণ করে নাই—চক্ষের সম্মুখে ভাল মন্দ যাহা কিছু আসে, তাহা আশ্রয় করিয়া এই প্রকৃতি ভীম বেগে আগাইয়া চলে। এ রকম একটা সম্মুখ-সংগ্রামে চিত্ত আমার প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিল না। আমরা বাঁশের লাঠী হাতে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেড় মাইল দূরে গোয়েন্দা পুলিসের বাড়ীখানি ৫০ জনে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম। সন্ধ্যার পর গুমট আঁধারে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া, আমাদের তাহারা দেখিতে লাগিল। এত বড় দুঃসাহসীকে তাহারা সেদিন ভীষণ মূর্ত্তিতেই দেখিয়াছিল; কেন না, বুঝা গেল, অনেক জল্পনা-কল্পনার পর একজন অতি সতর্কে বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল। আমাদের লক্ষ্য, কেহ না চেয়ার লইয়া পলায়।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল, চুঁচুড়া হইতে ছদ্মবেশে এক শত রিজার্ভ পুলিস আমাদের প্রতি জনের দুই পাশে দুই জন করিয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা তাহাতে আপত্তি করিলাম না। আমাদের দৃষ্টি বামালের দিকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, একেবারে মিলিটারী সাজে আমাদের পুলিস কমিশনার পমেজ্ সাহেব জন-কয়েক বরকন্দাজের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমায় একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া, একটু রুক্ষ বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আপনি করিয়াছেন কি? রাজ্যটা কি আপনার?"

আমি বলিলাম, "হইয়াছে কি! আপনিই তো বামাল না সরায়, তাহার জন্য দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ দৃষ্টি রাখিয়াছেন! আপনার বিপ্লবীদের লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ-ঘোষণাই হইয়াছে। কিন্তু দেশটা এখন আপনার হয় নাই। দেশটা আমাদের ফরাসী জাতির। বৃটিশ আমাদের মিত্র। আপনার জন্য ফরাসী জাতি বন্ধু-বিচ্ছেদ করিবে না। আপনি যে একটা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বাধাইবার উপক্রম করিয়াছেন, বুঝেন না কি?"

ব্যাপারটা যে কিরূপ গুরুতর হইয়াছে, সব কথা তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। "বৃটিশ পুলিসের বাড়ী আপনারা এত লোকে ঘেরাও করিয়াছেন। হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, কলিকাতায় খবরাখবর চলিয়া গিয়াছে। ফরাসী রাজ্য, নতুবা এতক্ষণ আপনাকে উড়াইয়া দিত। আপনি মানে মানে প্রস্থান করুন, বামাল দেখার ভার আমার উপর রহিল।"

আমি বলিলাম "তবে কি অপরাধীর শাস্তি হইবে না?"

সাহেব বলিলেন "কাল আদালতে তাহার বিচার হইবে। সকালে পুলিস আদালতে হাজির হইবেন।"

আমি "তথাস্তু" বলিয়া বন্ধুদের ডাকিয়া একত্র করিলাম; তারপর রাইট, লেফ্ট করিতে করিতে উল্লাস উৎসাহে আমরা ফিরিলাম। অর্দ্ধ পথে আমাদের কাণের পাশ দিয়া ঝটিকাবর্ত্তের ন্যায় রিজার্ভ পুলিস শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়া গেল। তাহাদের বক্র দৃষ্টি যেন শাসাইয়া বলিতেছিল—লোকটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

কি আকুল উৎকণ্ঠিত চিত্তে, কি ব্যাকুল সজল নয়নে প্রতীক্ষানিরত দেবীমূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গ প্রার্থনাপূত, ঊর্দ্ধ হইতে করুণার ধারায় যেন তিনি অভিষিক্ত। আমাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন "ফিরিয়াছ! এক কাজ কর, আমায় কিছু দাও, আমি খাই, প্রতিদিন একটা না একটা কাণ্ড, এর চেয়ে মৃত্যু আমার ভাল।"

আমি সস্নেহে সকল কথা বলিলাম। তিনি সান্ত্বনা পাইলেন না, বলিলেন "সামান্য দুইখানা চেয়ারের জন্য তুমি ঘুমন্ত বাঘকে খোঁচা দিয়া ভাল করিতেছ না।"

আমি এই নিরীহ ভীরু নারীটীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "আমায় লইয়া তুমিও যেমন বিব্রত, তোমাকে লইয়া আমার দুশ্চিন্তাও বড় কম নহে।"

এই কথায় তিনি আর্দ্র চক্ষে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—যেন মুক্তি-প্রার্থনায়।

তার পরদিন পুলিস আদালতে গিয়া দেখিলাম—কাণ্ড গুরুতরই বটে। পুলিস সাহেবের ঘরে তখন মিষ্টার টেগার্ট, চুঁচুড়ার এস, পি, আরও অনেক বৃটিশ রাজ-কর্ত্তৃপক্ষ মঁসিয়ে পমেজের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। আমি সেই ঘরের সম্মুখেই পাদচারণা করিতেছিলাম। তাঁহারা ঘন ঘন কটাক্ষে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; পরে দেখিলাম, তাঁহারা মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ম'সিয়ে পমেজ আমায় ডাকিয়া বলিলেন "মোকদ্দমা উঠাইয়া লউন।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "কেন ?"

তিনি বলিলেন "আপনি কি পাগল ? এই মোকদ্দমায় কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝিতেছেন না ?"

আমি বলিলাম "আমি কোন এক অপরাধীর বিচার-প্রার্থী। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কথা নাই। আসামী আপনার সম্মুখে; তাহার এজাহারে প্রকাশ হইবে, তাহার অপহৃত দ্রব্য কে খরিদ করিয়াছে। সে ব্যক্তি যে-ই হোক, আপনি কি তাহার বিচার করিবেন না ?"

সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার সহকারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেক ক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর তাহাকে বিদায় দিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "আমার পুলিস যথারীতি খানাতল্লাসী করিয়াছে; বামাল পায় নাই। আপনি কি করিবেন ?"

আমি বলিলাম "আসামীর স্বীকারোক্তি কি কোন কাজেরই হইবে না ?"

তিনি তারপর বুঝাইয়া বলিলেন "আপনি আমার উপদেশ গ্রহণ করুন, মোকদ্দমা তুলিয়া লউন। আপনার কথা হয়তো সত্য; কিন্তু বিচারে উহা প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই। বিচারে আপনি ঈর্ষ্যাবশতঃ ইংরাজ পুলিসের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, এই মোকদ্দমা যদি চলে, আপনি পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন। বন্ধু হিসাবেই আমি ইহা বলিতেছি।"

আমি একটু ব্যথিত হইয়াই বলিলাম "ফরাসী রাজ্যে ফরাসী প্রজার কি সুবিচারপ্রার্থনা দুরাশা মাত্র ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ফরাসী রাজ্যে আপনি নিরাপদ। কিন্তু বৃটিশ রাজ্য না হইলে, আপনার দিন গুজরান হইবে না, এই কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। এখন কি করিবেন, বলুন ? মোকদ্দমা যদি চালাইতে চাহেন, আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু বন্ধু-হিসাবেই বলি—এ মোকদ্দমায় আপনার হার হইবে।"

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে আমার কান্না পাইল। এত উদ্যম, এত উৎসাহের পর পর্ব্বতের মুষিক-প্রসবের ন্যায় এক প্রকার পরাজয় স্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিব, এ দুঃখ অহঙ্কারের। আমি এক প্রকার অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিলাম। তারপর মনে হইল, উত্তেজনার কুহকে আত্মসাধন দূরে রাখিয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আমি বলিলাম "মোকদ্দমা তুলিয়া লইলাম।"

সাহেব প্রফুল্ল মুখে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "Bien ! Bon jour !" (বেশ ! প্রাতঃকালীন অভিবাদন গ্রহণ করুন !)

(ক্রমশঃ)

বিরহী হিয়া

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পুণ্য প্রেমের হিন্দোলাতে চিত্ত দোদুল্ দোলে,
সঙ্গীহীন এই হৃদি শুধু বক্ষে তুফান তোলে !
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি,
আকুল প্রেমের জনমভূমি !
জ্যো'স্না-নিশায় দূর্-বিপাকে কে তোমাকে ভোলে !

আজ বিরহের ব্যথায় বুকে বিপুল বাণী গো
বাজ্‌ছে সদা আমার হিয়ায়, হৃদয়রাণি গো !
হৃদয়রাণি, হৃদয়রাণি,
ভুল্‌বো না ওই আননখানি !
রও না সুদূর, মিলন-লোভে গাইবো মধুর বোলে।

চিন্তা-বীথি

পৃথিবীর ন্যায়, মানব-দেহেরও দুইটী মেরু—এই দুই মেরু দুই প্রকার শক্তির আধার। উর্দ্ধের মেরু যদি চিচ্ছক্তির কেন্দ্র হয়, তবে অধোমেরুকে জড়-শক্তির আধার বলা যাইতে পারে। চিৎ ও অচিৎ—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতেরই ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী অথচ পরস্পর পরিপূরক। আমাদের আসক্তির প্রবাহ এই দুই কেন্দ্রের মধ্যেই চলাচল করে। উপরের দেহ-মেরুই ভারতীয় যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম নামে উক্ত হয়; নিম্নের কেন্দ্রের নাম তেমনি মূলাধার পদ্ম। সহস্রার ও মূলাধার পদ্ম বা চক্রের মধ্যে যে যোগ-সেতু, যাহা আসক্তির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের যৌগিক প্রণালী, তাহাই আমাদের মেরুদণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী সুষুম্না-নাড়ী। তন্ত্র বা শক্তিসাধনা এবং যোগ, উভয় সাধনবিজ্ঞানই এই দেহবিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার অধ্যাত্মসাধনায় এই দেহাশ্রিত শক্তি ও চক্রগুলির সহিত একটা মোটামুটি পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীয়।

* * * *

অধ্যাত্মবিজ্ঞান আসলে দেহস্থিত শক্তিরই বিজ্ঞান। বলিয়াছি, বাঙালী বিদেশী বা দেহাতীত সাধনার কথা বুঝে না, তাহাকে সাধনা বলিয়াই স্বীকার করে না। বাঙালীর সাধনা তাই শুধু ভাবুকতা বা দর্শন নহে, ইহা একাধারে দর্শন ও ধর্ম্ম। জীবনই সাধনার ভিত্তি। সুতরাং অধ্যাত্ম-সাধনা জীবনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিশ্লেষণেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একটী কথাও কাল্পনিক, অবৈজ্ঞানিক নহে—যদিও পরাধীন-যুগে, সর্ব্বপ্রকার মানসিক অবনতির সহিত জাতির এই সাধনপরা মনোবৃত্তিও অনেক অবাস্তব কল্পনা ও অনুমানে আপনাকে জড়াইয়া, স্বপ্নবিলাসে আচ্ছন্ন অথবা প্রাণহীন গতানুগতিকতায় আড়ষ্ট ও শৃঙ্খলিত হইয়া গড়িয়াছে। এই মোহ বা আড়ষ্টতা জাতির জীবনীশক্তির অভাব — তাহার জন্য ধর্ম্ম বা অধ্যাত্মসাধনাকে দায়ী করা সমীচিন নয়।

* * * *

তন্ত্র উপলব্ধির শাস্ত্র। এই উপলব্ধি চিৎ ও অচিৎ, উভয় লইয়া। আমাদের আসক্তি শুধু জড়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা লীলায়িত নহে, ইহা অচিৎ বা চিন্ময় বস্তু-রাজিকে ঘিরিয়াও বহুলাংশে প্রবাহিত। আমাদের দশেন্দ্রিয় জড়বস্তু লইয়া আলোচনা ও ব্যবহার করে—ইহাই আমাদের জাগ্রত জীবন। কিন্তু শুধু জাগ্রত জীবনেই আমাদের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ নহে। স্বপ্নে আমরা ইন্দ্রিয়গুলিরই সূক্ষ্মাবস্থার ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করি। সকল স্বপ্নই জাগ্রত মনের প্রতিভাসিক বা সাংস্কারিক প্রতিক্রিয়া নহে; অর্থাৎ ইহার সবখানিই মিথ্যা কল্পনা নয়। সত্য স্বপ্নও আমরা প্রত্যক্ষ করি। এইরূপ স্বপ্ন প্রত্যক্ষে যে ইন্দ্রিয়ের খেলা, তাহা কি সূক্ষ্মক্ষেত্রে, সূক্ষ্ম বস্তু বা শক্তিপুঞ্জ লইয়া আমাদের অন্তঃকরণের স্পন্দন নহে? সূক্ষ্মবস্তু বা শক্তি একান্ত জড় নহে, তাহা চিতেরই আভাস ও সম্ভাবনীয়তায় পূর্ণ। উহা Ideas বা Spiritual forces. যদিও জড়ত্বের একটা সূক্ষ্ম প্রাণময় বা মনোময় আবরণ অন্নময় কোষেরই ন্যায় এই অবস্থায়ও আমাদের অন্তঃকরণের আধাররূপে ধারণ-কার্য্য করিয়া থাকে।

* * * *

ইচ্ছাশক্তি তন্ত্রের কেন্দ্রশক্তি। ইহাই মূলাপ্রকৃতি। জগতে ইচ্ছাশক্তি চিরক্রিয়াময়ী। ইহাকে তাই অঘটনঘটপটীয়সীও বলা যায়। আমাদের জীবন—ইচ্ছারই বিকাশ, ইচ্ছারই মূর্ত্ত বিগ্রহ। কিন্তু যে ইচ্ছাটুকু লইয়া আমরা সাধারণতঃ চলা-ফেরা করি, তাহা ঝঞ্ঝাতাড়িত পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ নানা অনিত্য ভাবনায় বা প্রেরণায় সঞ্চালিত; এই ক্ষণভঙ্গুর, সদাপরিবর্ত্তনশীল খেয়াল বা বাসনা প্রকৃত ইচ্ছা নহে। আমাদের অন্তর্যন্ত্রে তাই যথার্থ ইচ্ছাশক্তির স্থান কোথায়, তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইচ্ছা থাকিলেই আমরা কার্য্য করি—কথা বলি, নানা ঘটনার সৃষ্টি করি। আসলে, এই সকল কার্য্য, কথা বা ঘটনা সবখানি আমাদের নিজ ইচ্ছাধীন নহে। কেন না, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলেও অনেক কিছু ঘটে; আমাদের নিজস্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কত কাজ করিতে বাধ্য হই। তবে আর এই ইচ্ছাশক্তিকে কেমন করিয়া সেই আদ্যা সৃষ্টিশক্তি বলা যায়, যাহা অঘটনঘটন-পটীয়সী,

যাহা জগতের মূলাপ্রকৃতি? জীবের ইচ্ছা শুধু তাহার চিন্তা ও কল্পনাকে একমুখে চালিত করে, বুদ্ধিকে দেয় একটা এক-লক্ষ্যে গতি—যাহারই নাম সঙ্কল্প বা determination—ইহাও অধ্যাত্মশক্তি। কিন্তু তন্ত্রোক্ত ইচ্ছাশক্তি ইহারও মূল বা উৎসস্বরূপ। তাহা স্বয়ং ভগবতী বা দৈবী মাতৃশক্তি। তিনি শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাময়ী বিগ্রহরূপিণী।

*   *   *   *

শিব ও শক্তি, সৎ ও শক্তি জীবদেহে বাস করেন। তাই পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব একই দেহে সমাশ্রিত বলা যায়, যদিও ভাবের প্রাধান্যতঃ লিঙ্গভেদ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ রূপে বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য। আবার আমাদের দেহযন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ কখন ভিতর হইতে বাহিরে, কখনও বাহির হইতে ভিতরে চলাফিরা করে। এই গতির সেতু বা প্রণালী—আমাদের সর্ব্বদেহব্যাপী স্নায়ুতন্ত্র। বাহির ও ভিতরের যোগাযোগ এই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়াই। আমাদের স্নায়ুতন্ত্র যে যুগ্ম-ধর্ম্মী, ইহা সুর্ব্বজনবিদিত। ইহার যে অংশ আমরা সজ্ঞানে ইচ্ছা চালনা না করিলেও, স্বতঃ কার্য্য করিয়া চলে, তাহা আধুনিক শাস্ত্রে sympathetic nervous system নামে প্রসিদ্ধ। অপরাংশ—cerebro-spinal system. তাহার কাজ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বোধ সজ্ঞানে গ্রহণ করা। প্রথমটী আমাদের অবচেতন মনেরই ক্রিয়াযন্ত্র বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় সচেতন মনের করণ। এখানে আমরা স্মরণ রাখিব যে, জ্ঞান মূলতঃ বিশুদ্ধ মনের ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় এবং এই মনের প্রত্যেক ক্রিয়াই দ্বিধাবিভক্ত স্নায়ুতন্ত্রে অনুরূপ যে আণবিক স্পন্দন তুলে, তাহাই শরীর-বিজ্ঞানশাস্ত্রে সজ্ঞান ও সহানুভূতিমূলক পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার স্নায়ুপ্রবাহরূপে সুপরিচিত। এই দুইটী স্নায়ুধারার মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ, তাহার আবিষ্কার ও ক্রিয়া-পরিচয়ই তন্ত্রের সমগ্র সাধন-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। ইহাই তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগের নিগূঢ় রহস্য। তবে আমরা যেন না ভুলি যে, এই ক্রিয়াযোগ অধ্যাত্মসাধনার কারণ নহে, কার্য্য বা লক্ষণ মাত্র।

মনের দুইটী ক্রিয়া। এক—ভিতর হইতে (subjective); অন্য—বাহির হইতে (objective). প্রথম ক্রিয়াটীর জন্য সুনির্দ্দিষ্ট যন্ত্র আমাদের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ; শেষোক্তের জন্য মস্তিষ্কের পশ্চাদংশ। এই উভয় অংশের যে মধ্যভাগ, তাহার মধ্যে উপর্য্যুক্ত দুই প্রকার ক্রিয়াই বিমিশ্রিত হইয়া আছে। এইখানেই সকল অন্তঃপ্রেরণা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের সচেতন মনের গোচরীভূত হয়। সচেতন মন যে মুহূর্ত্তে কোন চিন্তা গ্রহণ করে, অমনি স্নায়ুতন্ত্রে একটা স্পন্দনপ্রবাহ বহিয়া যায়—পরক্ষণেই উক্ত চিন্তা বিষয়ী বা জ্ঞাতার (subjective mind) নিকট সমর্পিত হয়। এক্ষণে এই স্নায়ব-প্রবাহটীকেও অনুসরণ করিলে কি দেখা যায়? প্রথমতঃ, ইহা মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতম কেন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখের মস্তিষ্কাংশে উপনীত হয়—তখন ইচ্ছামূলক স্নায়ু-তন্ত্রের (voluntary system) মধ্য দিয়া ইহা মূলাধারে (solar plexus) চালিত হয়। ইহার পর, ইহা আবার গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করে—অর্থাৎ মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া সহানুভূতিমূলক স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের পৃষ্ঠাংশে আসিয়া গতি সমাপ্ত করে। এই প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহই জ্ঞাতৃ-মনের (subjective mind) ক্রিয়া-পরিচয়। সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম মস্তিষ্ক-পদার্থের সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল, যাহাকে বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র corpus callosum বলে। ইহাই আত্মতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র (subjective ও objective) উভয় প্রবাহের সম্মিলনভূমি। তাই যে কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা প্রথমে শুধু অস্পষ্ট ভাবেই আমরা অনুভব করি। যখন উহা বস্তুতন্ত্র মনের (objective mind) নিকট পুনরর্পিত হইয়া একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে, তখনই সুস্পষ্ট পূর্ব্বধারণার উপর তাহা কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। সেই ধারণার বীর্য্য এইরূপেই ধ্যানরূপে প্রগাঢ় হইয়া জীবনে অভিব্যক্ত ও ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে। বাংলার এই জীবন-তান্ত্রিক সাধনবিজ্ঞান ক্রমশঃ আমরা আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

সমালোচনা

বাঙ্গালীর বল—বাঙ্গালী জাতির সামরিক ইতিহাস। শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ, সাহিত্য-সরস্বতী, পুরাতত্ত্ব-রত্ন, বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ২য় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)। শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত কর্ত্তৃক ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৬৭৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা।

বাংলার গৌরব—শুধু সামরিক নয়। কিন্তু সামরিক গৌরবও উপেক্ষার নয়। বাঙালীর রাষ্ট্রগৌরব আজ সব চেয়ে বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন। তার কারণ আছে। বাঙালী না ডুবিলে, ভারত ডুবে না। ভারত না ডুবিলে, প্রাচ্যের প্রধান গৌরব-রবি অস্তমিত হয় না—পাশ্চাত্যের দিগ্বিজয় নহিলে সম্পূর্ণ হয় না। তাই বাঙালীকে তার ইতিহাস ভুলাইবার নানা ব্যবস্থাই দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পাঠান, মোগল যাহা স্বরু করিয়াছে, ইংরাজ তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছে। আজ আমরা পূর্ণ আত্মবিস্মৃত।

এই আত্মবিস্মৃতির মোহ-ভঙ্গের ক্ষীণ প্রচেষ্টা আবার ইংরাজের যুগেই আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার, হরপ্রসাদ, নিখিলনাথ, রাখালদাস—ইঁহাদের সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় নাই। ভাবিতেছিলাম—অর্দ্ধপথে ইহাও কি পথ হারাইতেছে? শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য সাহিত্য-সরস্বতী, পুরাতত্ত্বরত্ন মহাশয়ের বর্ত্তমান গ্রন্থ আবার একটু মনে আশা জাগাইল—এ কথা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি।

আরও আনন্দের কথা, বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। তাহা হইলে, বাঙালীর আত্মপরিচয়ের ক্ষুধা এখনও নিভে নাই।

যাহা ভাল, মুখর প্রশংসায় তার মর্য্যাদাবৃদ্ধি হয় না, তাই সে চেষ্টা করিব না। যাহাকে নিখুঁৎ, সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার সাধ,,তাহার ত্রুটি কিছু মনে হইলে তাহা নিঃসঙ্কোচেই জানাইব। গ্রন্থকারকে আমরা ভালবাসিয়াছি বলিয়াই ইহাতে কুণ্ঠা করিব না।

বাঙালীর গৌরবঘোষণায় গ্রন্থকার কিছু কুণ্ঠিত কেন? বইখানির স্থানে স্থানে এই apologetic tone কি বাংলার তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করিবেন না বলিয়া? যাঁহারা আবিষ্কৃত সত্যকে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বাঙালীও নহেন, ঐতিহাসিকও নহেন। তাঁহাদের বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কি আসিয়া যায়? আর তাঁহাদের বিদেশীয় গুরুগণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বাংলার গৌরবেতিহাস কল্পে কল্পে লিখিত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচেই তাহা উদ্ঘাটন করিতে হইবে।

গ্রন্থকার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যকে ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিলেন কেন? তারই পূর্ব্বের সম্রাট্ মহাপদ্ম নন্দ কি অনৈতিহাসিক পুরুষ? হেরোডোটাস, ভাজল বা মেগাস্থিনিসের চেয়ে পুরাণের সাক্ষ্য কি হীনতর সত্য? গুপ্ত, পাল, সেনবংশ বাঙালীর সাম্রাজ্যশক্তি-পরিচালক বলিয়া যদি গ্রন্থকার স্বীকার করেন, তাহা হইলে জরাসন্ধ, প্রদ্যোৎ, নাগ, নন্দ, মৌর্য্য বংশীয়দিগকেও বাংলার সাম্রাজ্যশক্তিরই পূর্ব্বাধিকারী বলা যাইতে পারে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড়, পাটলীপুত্র একই সাম্রাজ্যশক্তিরই মহাকেন্দ্র ছিল না কি? আসলে বাঙালা ও বাঙালীজাতির ইতিহাস—গৌড়ীয় সাম্রাজ্যেরই যুগ-যুগব্যাপী প্রায় অনবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ইতিহাস—ইহা বলিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

রাজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে বাংলার প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত রূপই দেখিলাম—হয় সকল প্রকাশিত প্রমাণ তাঁহার গোচরে আসে নাই নতুবা তিনি প্রচলিত মতের দায়ে উহাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত রূপই দিয়াছেন। তাঁহার কাছেও কেন সকল গ্রহণ-যোগ্য তথ্য ও প্রমাণ সমাদরে গৃহীত ও আলোচিত হইবে না? মন্দসোর লিপি, সুদিয়া জয়, প্রতাপাদিত্য—এ সব সম্বন্ধেও যে আরও তথ্য ও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে—সত্য-মিথ্যার বাছাই হইয়াছে—তাহাও কেন তাঁহার গ্রন্থে স্থান পাইবে না?

অনেক দাবী তাঁহার নিকট করিলাম—দাবী করিবার তিনি যোগ্য পাত্র বলিয়াই তাঁহার নিকট প্রচুর আশা রাখি। তাঁহার গ্রন্থের শত সংস্করণ হউক—এই প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত। গীতা প্রচার কার্য্যালয়, ১০৮।১১ মনোহর-পুকুর রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে ৮/০ ও ১/৵০ মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ রচিত গীতার অভিনব ব্যাখ্যা বাংলায় অনুবাদ করিয়া অনিলবরণবাবু বাঙালী পাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। উহার সাহায্যে সকলের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মযোগের আলোকে গীতার মর্ম্মার্থ বুঝা অনেকখানি সহজ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে গোড়া হইতে শ্লোক ধরিয়া আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা নাই। অনিলবরণ বাবু সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গীতা-ভাষ্যের দুই খণ্ড মাত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক অরবিন্দবাবুর মূল ভাষ্যের মর্ম্ম মন্থন করিয়াই এই গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতে গীতা নিছক রূপক—অন্তর্জ্জগতের সংগ্রামেই মানুষকে সহায়তা করিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার যোগ—জীবনযোগ। গীতার মধ্যে সেই তত্ত্বই তিনি পাইয়াছেন। গীতার শিক্ষা বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই

প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি মনে করেন। বর্ত্তমান ব্যাখ্যা-গ্রন্থে সেই দৃষ্টিভঙ্গী সুরক্ষিত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। বইখানির সুপ্রচার কামনা করি।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

আধুনিক রাজনীতি কা ক, খ, গ,—(হিন্দী) —জ্যোতিভূষণ গুপ্ত, লক্ষীকান্ত ঝা, রঘুনাথ সিংহ প্রণীত। কাশী 'রচনা নিকেতন' হইতে প্রকাশিত—মূল্য ॥৵০।

অদ্যকার মানসিক অরাজকতা ও আদর্শ-সঙ্ঘাতের দিনে আলোচ্য গ্রন্থে বৈদেশিক মতবাদগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও পরিচয় সর্ব্বসাধারণের নিকট সহজ হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করা সময়োচিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি Toddএর ইংরাজী ভাষায় লিখিত অনুরূপ পরিচয়পুস্তিকা-খানির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অতি সুন্দর ও মার্জ্জিত হিন্দীতে লেখকগণ বিভিন্ন মতবাদগুলিকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহযোগিতা পাওয়ার ফলে কোন কোন বিশেষ মত ও আদর্শের পরিচয় সুষ্ঠু হইয়াছে। সোস্যালিজমের অর্থ ও ব্যাখ্যা অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। বইখানির প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে।

—স্বামী অমৃতানন্দ

উপমা কালিদাসস্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্, এ; পি, আর্, এস প্রণীত। রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্ হইতে শ্রীরাধেশ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার রচিত বাংলা সাহিত্যে নবযুগ গ্রন্থে আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচার এবং বিশ্লেষণ বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। সাহিত্যসমালোচনায় তাঁহার নিজস্ব একটি বিশেষ ধারা আছে।

উপমা কালিদাসস্য সত্যই একখানি উৎকৃষ্ট ধরণের সমালোচনা গ্রন্থ। কালিদাসের কাব্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই—আমার মনে হয় এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের সে রসাস্বাদন কতক পরিমাণে ঘটিবে। শশিবাবুর রসবোধ এবং বিচার বিশ্লেষণ দেখিয়া মনে হয় কালিদাসের কাব্যগ্রন্থগুলির সহিত তাঁহার শুধু পরিচয়ই ঘটে নাই, গভীর অনুভূতির দ্বারা তিনি সেই রস পান করিয়া মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়াছেন। সেই অনুভূতিই তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনায় ভাষা যোগাইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারের সহিত তিনি পাঠকচিত্তের পরিচয় ঘটাইবার জন্য যে সকল যুক্তি এবং নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মৌলিক প্রচেষ্টা। সাহিত্যে চিত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অভিনব। কালিদাসের উপমাগুলির বৈচিত্র্য ও বিরাটত্বের সহিত তিনি আমাদিগকে যে ভাবে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। বইখানি বার বার পড়িয়াছি এবং পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। নিছক পাণ্ডিত্যের গুরুভারে তিনি তাঁহার রচনাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলেন নাই। যাহা কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

আধুনিক সমাজ—শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত। শ্রীশচীন মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক ৭১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

সুকুমার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে লেখক সুপরিচিত। আধুনিক সমাজ গ্রন্থকারের প্রশংসনীয় অবদান।

নিপুণ তুলিকাপাতে লেখক মানুষের নির্ম্মম অদৃষ্টের রহস্য ও জটিলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কয়েকটি সুন্দর স্বাভাবিক চরিত্র ও ঘটনাসমাবেশের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার মানুষের সহজ ইচ্ছার প্রতিকূলে তার অজ্ঞাত ও অভাবনীয় ভবিতব্যকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। নিরুদ্বেগ জীবন-যাত্রার আকস্মিক অথচ সুসমঞ্জস পরিবর্ত্তনে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। অবচেতন মনের কথা প্রকাশেও শশধরবাবুর শিল্প-কুশলতার পরিচয় মিলে। পুস্তকান্তর্গত 'দে সাহেব', 'মৌলিকা', 'নন্দিনী', 'কল্যাণকুমার' প্রভৃতি চরিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। আশা করি, ৪৩৫ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসখানি বাংলার পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে।

প্রথম প্রশ্ন—উপন্যাস—শ্রীরাইমোহন সাহা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান — গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

'প্রথম প্রশ্ন' লেখকের প্রথম প্রচেষ্টা হইলেও, তাঁর শক্তির পরিচয় আমরা বইখানিতে পাইয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে এবং গতানুগতিক-জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে তাহার একটী চিত্র লেখক বইখানির ভিতর নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং উহা সমাধানেরও চেষ্টা করিয়াছেন।

উপন্যাসের প্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র হইল পমু। পমু বিশ্ব-বিপ্লবী। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী এবং কমলের মত 'প্রথম প্রশ্নের' 'পমু' বর্ত্তমান বাংলার দুর্ল্লভ হইলেও, লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি বলিতে হইবে। তারপর মায়া গাঙ্গুলীর আধুনিক ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে অনিচ্ছাকৃত আত্মবিসর্জ্জন মনের কোণে এক গভীর ছাপ আঁকিয়া দেয়।

আরও কয়েকটী বিশিষ্ট চরিত্র—কমলা, ব্রজবাবু, বীণা, পরেশ, বিমান প্রভৃতি। এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটীর ভিতরেই একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে এবং সেই ছাপ খুব সহজে মন হইতে মুছিয়া যায় না। সাহিত্য-রসসৃষ্টির দিক্ দিয়াও প্রথম প্রশ্ন উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকারের ভাবী প্রতিষ্ঠা আশা করা যায়। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
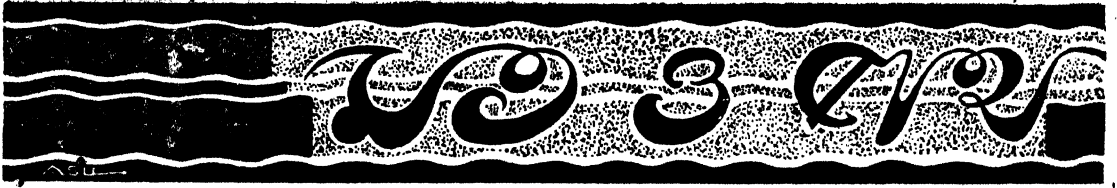
যুদ্ধের বাজার

যুদ্ধের দামামা শুনিয়াই টাকার বাজার চড়ে। সকল পণ্য সামগ্রীর, মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির মূল্য বাড়িতে আরম্ভ করে। যখন যুদ্ধ বাধে নাই, তখন হইতেই সকল জিনিষের দর বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল; এমন কি শাক, মাছ, টিকের পর্য্যন্ত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যুদ্ধজনিত আমদানী-রপ্তানীর বাধায় এই মূল্যবৃদ্ধি নহে, ব্যবসায়ীদের সুযোগ বুঝিয়া অতিরিক্ত লাভ করিবার স্পৃহাই ইহার মূলে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ইহার বিরুদ্ধে অতি তৎপরতার সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্যদ্রব্যের যে মূল্য ছিল, তাহার সহিত তুলনায় শতকরা দশ ভাগ মাত্র মূল্য বৃদ্ধি করা চলিবে, কর্ত্তৃপক্ষ এই নীতিই ঘোষণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই বৃদ্ধির হার শতকরা বিশ ভাগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই মূল্যনিয়ন্ত্রণের হার কি আদর্শে করা হইতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু যদি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে এই দেশেরই আন্তর্প্রাদেশিক আমদানী রপ্তানীর মধ্যে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। যে প্রদেশে বেশী মূল্য, সেইখানেই পণ্যসামগ্রী চালান হইবে, অন্যত্র হাহাকার উঠিবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতের সকল প্রদেশেই একই নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

আর একটা কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয়। পণ্যের পড়তার উপরেই তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। যুদ্ধের জন্য যে সকল বিদেশাগত পণ্য পৌছিতেছে, জাহাজ ভাড়া, বাটার হার, বীমার হার প্রভৃতি বর্দ্ধিত হওয়ায় সত্যই বর্দ্ধিত হারে ভারতের বাজারে আসিয়া পৌছিতেছে, ইহাদের মূল্যনিয়ন্ত্রণের সময়ে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে। ভারতে উৎপন্ন শিল্প-সামগ্রী সম্বন্ধেও এই বিবেচনার প্রয়োজন হইবে। কেন না, তাহাদের বহু উপাদান বিদেশ হইতেই আসিয়া থাকে। সেই সকল উপাদানের মূল্যবৃদ্ধির সহিত উৎপন্ন পণ্যেরও পড়তার হার নিশ্চয়ই বাড়িবে।

আমাদের আশা, কর্ত্তৃপক্ষ যেমন পূর্ব্বাহ্নেই তৎপর হইয়া লোভীর লোভকে সংযত করিতে উদ্যত হইয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, তেমনি শিল্প-নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থও অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিবেন এবং ইহাদের আশ্বস্ত করিবেন।

বাঙালী কোন্ পথে?

সহযোগী "সঞ্জীবনী" সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন :—

"সমগ্র ভারতে আজ বাঙালী-বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, বাঙালী-বিদ্বেষে উগ্রতা দেখা যায় বাংলার সংলগ্ন প্রদেশ-সমূহে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে বাঙালীর বাংলা ভাষা ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যুক্ত প্রদেশেও সেই অবস্থা। মাদ্রাজে একজন চিকিৎসক বাঙালী বলিয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। ইউরোপে ইহুদীদের যে অবস্থা, ভারতে বাঙালীদের সেই অবস্থা হইতে বসিয়াছে।

"সঞ্জীবনীর" কথা বাঙালীর ভাবিয়া দেখা উচিত অন্যান্য প্রদেশবাসীর আত্ম-চেতনা যত জাগিতেছে, বাঙালীকে স্বভাবতঃ তাহারা তাহাদের নিজ ক্ষেত্রে স্বাং হরণ করিতে দিবে না। কিন্তু বাঙালী নিজে এ বিষয়ে কতখানি সচেতন, তাহাই ভাবিবার। তাহার চেয়ে অধিকতর ভাবনার কথা, বাঙালীর ছোট বড় চাকুরী ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকার্জ্জন ও সর্ব্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠা-লাভের শক্তি-সামর্থ্যও কি অনুশীলনের অভাবে পঙ্গু হইয়া পড়ে নাই? এ বিষয়ে তাহারা ইহুদীদের চেয়ে আরও দুঃখী ও হতভাগ্যই বলিতে হইবে। উদীয়মান তরুণ জাতিদের

এ সম্বন্ধে আজই সতর্ক হইতে হইবে—নহিলে আমাদের ভবিষ্যৎ সত্যই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

স্কুলের সময়-পরিবর্ত্তন

ছেলেমেয়েদের আহারান্তে বিদ্যালয়ে ছুটিতে হয়, স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া এ ব্যবস্থা সমীচিন নয়। এই জন্য বিদ্যালয়ের ১০টা—৪টা সময় পরিবর্ত্তন করিয়া, ৬টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্কুল বসিবার ব্যবস্থা করিলে, ইহার প্রতিকার হইতে পারে। বাংলায় চিরদিন এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবটী প্রবর্ত্তন করিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন—এই সংবাদ জানা গিয়াছে। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, সময়ের কিছু অল্পতা ঘটিবে, তাহাতে পাঠ্য শেষ করার কিছু অসুবিধা হইবে, ইহা ভাবিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ এই সঙ্গে সময় বাড়াইবার জন্য গ্রীষ্মকালীন ও পূজার দীর্ঘ অবকাশ দুইটী এবং প্রয়োজন হইলে অন্যান্য ছুটীগুলিও কমাইবার কথা তুলিয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছি, ফ্রান্সেও বাংলাদেশেরই ন্যায় সকালে, বিকালে রাজকার্য্যাদি সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয়েরও একই নিয়ম। শীতপ্রধান ফরাসীদেশে এই নিয়ম যখন অসুবিধাজনক নহে, আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা উঠাইয়া দিবার কোনই কারণ নাই। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবটী যথাযোগ্যভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবেন, আশা করি।

পাটের মূল্যনিয়ন্ত্রণ

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট যে জুট অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কাঁচা পাটের ১০৲ টাকা সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা,—দেশের অর্থনীতিক পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত যে, এইরূপ অর্ডিন্যান্সের ফলে, পাটের উৎপাদকগণ উপকৃত হইবেন। কেননা, এই নির্দ্দিষ্ট উচ্চ হারে বিক্রয় করিতে পারিলে, কৃষকগণ অধিক টাকা হাতে পাইবে এবং কৃষকদের হাতে অধিক টাকা আসিলে, তাহাদের ক্রয়শক্তিবৃদ্ধির সহিত দেশের বাণিজ্যে একটা উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে।

যুদ্ধের ফলে, পাটের বাজারে আবার একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় চটকলসমূহে ৬ কোটী থলে অর্ডার দেওয়ায়, কলিকাতার পাটের দর ক্ষিপ্র বেগে চড়িয়া যায়। ক্রমশঃ ইহা আরও চড়িবে মনে হয়। কলিকাতার এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে; মফঃস্বলের বাজারেও অনিবার্য্যক্রমে স্বতঃই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহাতে কৃষকগণ এই বৎসর বৰ্দ্ধিত মূল্যের সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করিতে পারিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। কেননা, উৎপন্ন পাট এখনও কৃষকের ঘরে প্রায় সবই মজুত আছে, বাজারে বাহির হয় নাই। যুদ্ধের পরিস্থিতি গভর্ণমেণ্টের শুভ উদ্দেশ্যের অনেকখানি সহায়তা করিবে।

কিন্তু এইরূপ ফাটকা বাজারের অনিশ্চিত পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে গভর্ণমেণ্ট স্থায়ীভাবে কৃষকদের কল্যাণবিধানে সক্ষম হইবেন, ইহা আমরা মনে করি না। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞকে লইয়া তাঁহাদের স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পাট উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলায় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন নয়। কারণ, ইহা এ প্রদেশের প্রধান শিল্প। এইরূপ চাষ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে, যদি মূল্য অতি বৃদ্ধি পায়, তখন পাটের পরিবর্ত্তে বিদেশে তুলা ও কাগজের থলে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা এই আশঙ্কা অমূলক মনে করি। কেননা, পাটের বিকল্প-শিল্প আজ পর্য্যন্ত কিছুই উদ্ভাবিত হয় নাই। হইলেও, পাটের সর্ব্বনিম্ন দর ধার্য্য হইলে, তাহার ব্যবহার রোধ করা অসম্ভব হইবে না।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে ব্যাপারী ও ফড়িয়াদের ওজন চুরি ও ফাটকা বাজারের জুয়াখেলাও বন্ধ করা উচিত। নতুবা, গভর্ণমেণ্ট পাটের সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্ধারিত করিলেও, তাহার দ্বারা কৃষকদের আসল অসুবিধা দূর হইবে না।

বস্ত্র-শিল্পের সুযোগ

চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপান ভারত হইতে বার্ষিক ২০ লক্ষ বেল তুলা কিনিতে পারিবে না—

বিনিময়ে জাপান ১৯৩৮-৩৯ সালের বিক্রীত বস্ত্রের অতিরিক্ত পরিমাণ বস্ত্র লইবার জন্য ভারতের উপর দাবীও করিবে না। বৃটনের যুদ্ধ-ঘোষণার পরে, ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-রপ্তানীর পরিমাণও ভারতে আরও কম হইবারই সম্ভাবনা। ভারতের বস্ত্রশিল্পের পক্ষে, এই উভয় ঘটনাই যে অভাবনীয় সুযোগ সূচনা করে, তাহাতে সংশয় নাই। কেননা, যে দুইটী প্রধান প্রতিযোগিতা ভারতের এই শিল্পোন্নতির পথে অনেকটা বাধা প্রদান করিতেছিল, তাহার মাত্রা-সঙ্কোচ হওয়ায়, এই সুযোগ সুব্যবহার করিয়া এতদ্দেশীয় বস্ত্রশিল্প স্থানীয় বাজারে সম্পূর্ণ একাধিপত্য বিস্তার করার দিকে বহু দূর অগ্রসর হইতে পারে। সুচতুর ব্যবসায়িগণ ইহা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই সুযোগ বাঙালী কি ভাবে ব্যবহার করিবে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। বাঙালী বস্ত্রশিল্পে যে যে কারণে পশ্চাৎপদ, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের প্রতিযোগিতা অবশ্য এই অবস্থাতেও বাঙালীর বিরুদ্ধে থাকিবে, শুধু থাকিবে না, বরং উহা আরও প্রবল হইবে। কিন্তু বাঙালার ধন-কুবেরগণ সমবেতভাবে উদ্যোগী হইলে, এই প্রতিযোগিতার সহিত সংগ্রাম করিয়াও আরও কয়েকটা কল অনায়াসেই চালাইতে পারেন। যৌথ কারবার খুলিয়া, জনসাধারণের নিকট হইতে তিল তিল অংশ সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ। ধনিকগণ নিজেরা এ ক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে, অন্ততঃ তাঁহারা মুক্ত হস্তে যৌথ কারবারগুলির পশ্চাতে আসিয়া রস-সঞ্চার না করিলে, এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হওয়াই সম্ভাবনা। এ দিকে বাংলার ধনিকমণ্ডলীর আমরা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

'যদ্দিন কর্ত্তা তদ্দিন মান' ও পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সমাজ

শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত "যদ্দিন কর্ত্তা তদ্দিন মান" শীর্ষক একটী গল্প ভাদ্রের 'প্রবর্ত্তকে' বাহির হইয়াছিল। এই গল্প পড়িয়া পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় বন্ধুগণ মনে আঘাত পাইয়াছেন—ইহার জন্য আমি দুঃখিত। যোগেন্দ্রবাবুর উত্তর অবশ্যই তাঁহাদের সান্ত্বনা দিবে—এই হেতু পৌণ্ড্রীয় ক্ষত্রিয় সমাজের শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিদ্দা ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ নস্কর ও মেদিনীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার রায় প্রভৃতি বন্ধুগণের প্রতিবাদ-পত্র 'প্রবর্ত্তক' পত্রে প্রকাশ হইতে বিরত হইলাম। হিন্দু জাতির ভিত্তি টলিয়া পড়ে—এই অবস্থায় ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ-সৃষ্টি বাঞ্ছনীয় নহে। যোগেন্দ্রবাবু স্বীকার করিয়াছেন—ইহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি তাঁহার নাই—অতীতের ইতিকথা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু ইহা যদি কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে আঘাত দিয়া থাকে—তাহার জন্য তিনিও যেমন দুঃখিত হইবেন, তাহার সহিত আমিও মর্ম্মাহত।—আশা করি, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় বন্ধুগণ এই অসতর্ক বাণী সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিবেন। যোগেন্দ্রবাবুর পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

চন্দননগর, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৬ সাল।

"প্রবর্ত্তক" সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু—

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিদ্দা এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের যে পত্র আপনি আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেই পত্র পাঠ করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কোন ব্যক্তি, জাতি বা শ্রেণীকে হীন বলিয়া আমি মনে করি না। শিক্ষার সুযোগ পাইলে এবং সেই শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিলে যে কেহ সমাজের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ—ইহাই আমার বিশ্বাস। তবে কোন সমাজের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে—সেই সমাজভুক্ত দুই দশ জনকে উন্নত করিলে হয় না, সমাজের সকল স্তরেই শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন। সমাজের কলঙ্ক ও দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে, সেই দুর্ব্বলতাকে লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া তাহার অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া দিতে হয়, তাহাকে চাপা দিয়া রাখিলে বিপরীত ফল হয়। ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৺অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণ তাঁহাদের নাটকে ও প্রহসনে সমাজকে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য নির্ম্মমভাবে, শ্রেণী ও জাতি নির্ব্বিশেষে কশাঘাত করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া কেহই মনে করেন না যে, জাতি বা শ্রেণী-বিশেষকে হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাঁহারা নাটক ও প্রহসন লিখিয়াছিলেন।

প্রথম

বর্ত্তমান ভাদ্র মাসের "প্রবর্ত্তকে" আমি "যদ্দিন কর্ত্তা তদ্দিন মান" নামক যে গল্পটি লিখিয়াছি—তাহাতে আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কোন শ্রেণীর যদি একজন লোক সুশিক্ষিত, ধনশালী ও সভ্য হয়, তাহা হইলে সেই শ্রেণীর সকলেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত, ধনবান্ ও উন্নত হয় না। যে সকল অশিক্ষিত লোক অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন, তাহাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের একান্ত অভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাদ্র মাসের "প্রবাসী" পত্রে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা" নামক প্রবন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন তাঁহার প্রজাদের উন্নতির জন্য তাহাদের সহযোগিতা কামনা করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন মাতব্বর প্রজা তাঁহাকে বলিয়াছিল "বাবু, আমরা শিয়াল কুকুরের সামিল, চাবুক না মারলে আমাদের দিয়ে কোন কাজ পাবেন না।"

আমি "প্রবর্ত্তকে" যে গল্পটি লেখাতে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমার উপর বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়াছেন, সেই গল্প লেখারও উদ্দেশ্য ছিল যে, শিক্ষিত পোদগণ তাঁহাদের স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগরূক করুন। এজন্য আমি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনেই গল্পটি লিখিয়াছিলাম। চব্বিশ পরগণায় বিষ্ণুপুর থানার অধীন কয়েকখানি গ্রামে আমার মাতামহের কিছু ব্রহ্মত্র জমী ছিল। ঐ সকল জমির প্রজারা জাতিতে পোদ। এখনও রসপুকী গ্রামে আমাদের কয়েক ঘর পোদ প্রজা আছে। আমার মাতুল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদেরই কোন শিক্ষিত ও ধনবান্ প্রজার বাটীতে আমার গল্পে লিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। সে আজ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ "প্রবাসী", "মাসিক বসুমতী" এবং "প্রবর্ত্তক"-এ সেকালের সামাজিক অবস্থা অবলম্বনে বহু গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়াছি—সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে "প্রবর্ত্তকে" কৌলীন্যাভিমানী ব্রাহ্মণের মূঢ়তা, অদূরদর্শিতা, বৃথা অভিমানের পরিণাম দেখাইয়া "উল্টা বুঝিলি রাম" নামক একটি গল্প লিখিয়াছিলাম। অথচ আমি স্বয়ং স্বভাব কুলীনের সন্তান, আমার আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই কুলীন।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বাবু ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একটি বিষয়ের আমি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা ঐ পত্রে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"even he did not feel ashamed to wound the prestige of the faminine sex-"

এই অভিযোগ আমি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিতেছি। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। আমার ঐ গল্পের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে একটিও নিন্দাসূচক কথা বা ইঙ্গিত নাই। কোন্ কথা তাঁহারা আপত্তিজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন—তাহা আমাকে দেখাইয়া দিলে আমি বাধিত হইব। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া আমি বিবিধ সংবাদ-পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখিয়া আসিতেছি, কেহ আমার লেখাতে সুরুচির অভাব বা অসৎ উদ্দেশ্য আছে, একথা বলেন নাই। এখন অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্য-সাধনার পর আমার ৭৩ বৎসর বয়সে, জীবনসন্ধ্যায় লিখিত একটা গল্পে আমি "followed a malicious attitude towards the caste from beginning to the end and have vomited venom of jealousy." এই ধারণা যদি কোন পাঠকের মনে হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার একান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

আমি জানি যে, এক সমাজভুক্ত এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করিলে, সমাজের যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল হয়, সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না। কেবল হিন্দুসমাজভুক্ত বিভিন্ন জাতি নহে, আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রত্যেক বাঙ্গালীর উন্নতিপ্রার্থী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সম্পাদিত "এডুকেশন গেজেটে" ১৩৪১ সালের ১৬ই কার্ত্তিক সংখ্যায় "শিষ্টাচার" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম :—

"ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী যেরূপ বিদ্যা-শিক্ষায় উন্নত হইয়াছে, শিষ্টাচার সম্বন্ধেও প্রত্যেক বাঙ্গালী সেইরূপ অন্যান্য প্রদেশবাসীর আদর্শস্থানীয় হউক, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই শিষ্টাচার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" বলা বাহুল্য যে, "প্রত্যেক বাঙ্গালী" এই কথা আমি হিন্দু-মুসলমান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইতর-ভদ্র সকলকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম।

আমার এই গল্পটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাতে আমি যত না দুঃখিত হইয়াছি, উহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া এক-শ্রেণীর পাঠক ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

ভবদীয়
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িকী

শ্রীমৎ অভেদানন্দজীর তিরোভাব

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী গত ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের ভবনে চির সমাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মন্ত্র-শিষ্যদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই এতাবৎকাল জীবিত ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৮৬ সনের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সত্যসন্ধিৎসু ছিলেন এবং ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে আকৃষ্ট হইতেন। যৌবনে তিনি যোগ - শিক্ষার আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দক্ষিণে-শ্বরে গমন করেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় এই সময়েই ঘটে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি সংসারা-শ্রম ত্যাগ করেন এবং স্বামী বিবেকা-নন্দের সহিত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি দশ বৎসরকাল সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া বদরীনারায়ণ, দ্বারকা, রামেশ্বরম, জগন্নাথ প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে লণ্ডন যাত্রা করেন। তিনি লণ্ডনে বহু চার্চ্চ এবং অনেক জনসভায় জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে যে বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহার ভার লইবার জন্য স্বামী অভেদানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ অনুরোধ করেন এবং সেই জন্য ১৮৯৭ সালে তিনি আমেরিকা গমন করেন। সেখানে তিনি বহু স্থানে বক্তৃতা করেন এবং ভগবদ্গীতা, কঠোপনিষদ ও অন্যান্য উপনিষদ বিষয়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদান করেন। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ

তিনি জাপানেও গমন করিয়াছিলেন। সাংহাই, হংকং, ক্যান্টন, মালয় রাজ্য ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করেন। ১৯২২ সালে বৌদ্ধ দর্শন, লামা ধর্ম

এবং তিব্বতের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য পদব্রজে তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত গমন করেন। ১৯২৩ সালে তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কলিকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন এবং দেহরক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনিই উহার সভাপতি থাকিয়া আশ্রমটিকে সুপ্রতিষ্ঠা দেন।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-জন্মোৎসব

যুগ-প্রবর্ত্তক, অসাম্প্রদায়িক ভাববিগ্রহ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর ৯৯তম জন্মোৎসব বহু স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গ্রাম্য যোগাশ্রমের উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ১২ই ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমা হইতে ২৩শে ভাদ্র জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত পাঠ-কীর্ত্তন-সভাসমিতির মধ্য দিয়া এই জন্মবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে মণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০৮ শ্রীমহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের সভাধ্যক্ষে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে সমন্বয়ীসাধক গোস্বামীজীর ভাব যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

পরলোকে ভিক্ষু উত্তম

বিগত ২৩শে ভাদ্র বৌদ্ধসমাজের সর্ব্বজনপূজ্য ভিক্ষু উত্তম দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিতে বর্ম্মা ও ভারতকে তিনি অবিচ্ছিন্ন ভাবিতেন। হিন্দু মহাসভার কাণপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় হিন্দু-সমাজেরও যে তিনি প্রিয় ছিলেন তাহা বুঝা যায়।

মোটরে লণ্ডন-কলিকাতা ভ্রমণ

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মেসার্স এস. কে. মিত্র, কে. বি. বসু, এ. টি. সাহা ও এম. কে. রেড্ডি মোটরযোগে লণ্ডন হইতে ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত তিনজন সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপ, তুরস্ক, এশিয়া মাইনর, পারস্য, আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া লাহোর দিল্লী হইয়া আসিয়াছেন। ইরাণে একটি মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহাদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অর্থলোভী ইরাণবাসী অর্থ ভিন্ন কোন কথাই বলেন না। প্রাচ্যের রাস্তাঘাট এখনও পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে বহুলাংশে নিকৃষ্ট। আকস্মিক ভাবেই মিউনিকে হের হিটলারের মোটর শোভাযাত্রার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাহাদের মোটরে লণ্ডন-কলিকাতা সাইনবোর্ড এবং ভারতের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা লক্ষ্য করিয়া হের হিটলার তাঁহার মোটরের গতি শ্লথ করিয়া তাঁহাদের নাকি নাৎসী কায়দায় অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। আমরা এই ভ্রমণকারী ছাত্র চতুষ্টয়ের এই অভিনব দুঃসাহসের জন্য তাঁহাদিগকে সাদর অভিনন্দন করি।

কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসনের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে প্রবীণ ধ্রুপদগায়ক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এতদুপলক্ষে

বৈশাখ—আশ্বিন, ১৩৪৬

(চতুর্স্ত্রিংশ বর্ষ)

লেখকের নামানুক্রমিক ঃ

চিত্র-সূচী

মাসানুক্রমিক ঃ

বাংলার স্বনামধন্য সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতাদি করিয়া অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারা স্বভাবতই তাঁহার জীবনের ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নূতন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা নব নব রূপে নানা বাঁকে মোড় ফিরিয়াছে।
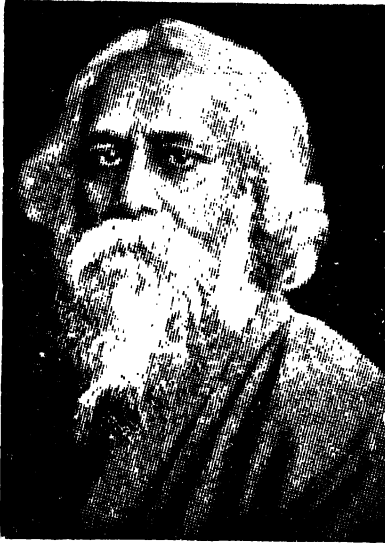
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

অল্প পরিসরের মধ্যে বালক কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্ব্বের মধ্য দিয়া তাঁহার কবি-জীবনের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে পারিলেই কবির রচনার আদর্শ প্রস্ফুট হইয়া ওঠে এবং তাঁহার জীবনের মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। কবির সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে, তাঁহার সমগ্র বাংলা রচনা একত্র করিয়া ধারাবাহিক ভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন অনুসারেই এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি সাধারণ ও একটি শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে, যথা:

(১) কবিতা ও গান (২) উপন্যাস ও গল্প
(৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবধ প্রবন্ধ

রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত প্রথম খণ্ড আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং প্রতি দুইমাস অথবা তিনমাস অন্তর একটি করিয়া খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এইরূপে প্রায় পঁচিশটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্রে গ্রথিত হইবে। প্রতিখণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৬০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং কাগজ ও বাঁধাইয়ের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইবে ৪।।০, ৫।।০, ৬।।০, টাকা। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ও শোভন কাগজে মুদ্রিত পরিমিত সংখ্যক চামড়ার বাঁধাই প্রতিখণ্ডের দাম হইবে ১০৲ টাকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ আকর্ষণ হইবে ইহার চিত্রসম্ভার। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব ফটোগ্রফ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও পুস্তক-চিত্রণ, রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং কবির অঙ্কিত চিত্রও থাকিবে। প্রার্থনা, বিশ্বভারতীর এই উদ্যম সফল হউক এবং দেশবাসীর সমর্থন লাভ করুক।

আই, ডি, এফ এর আধুনিক রণসজ্জা

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন বৃটেনের নবগঠিত মন্ত্রীসভার দেশরক্ষাসচিব লর্ড চ্যাটফিল্ডের অধিনায়কত্বে যে কমিটী গঠিত হয় তাহাতে ভারতের দেশরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক রণসম্ভারে সজ্জিতকরণের বিষয়ও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। চ্যাটফিল্ড কমিটীর সুপারিশের সারমর্ম্ম ভারতের বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতের বর্ত্তমান সৈন্য-বাহিনীর অবস্থা ও উহাকে আধুনিকীকরণ এবং জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার জন্য যে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তন্মধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সাড়ে তেত্রিশ কোটি টাকা সাহায্য ও বাকীটা ঋণ হিসাবে দিবেন। এই প্রচুর দানের একমাত্র সর্ত্ত এই যে, ভারত তাহার দেশরক্ষাবাহিনীকে আধুনিক রণসম্ভারে সজ্জিত করিবে এবং বর্ত্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

১। **সৈন্য-বাহিনীর কার্য্য:** (ক) সীমান্ত রক্ষণকার্য্যে নিয়োগ, (খ) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানে

নিয়োগ, (গ) উপকূল রক্ষণকার্য্যে নিয়োগ, (ঘ) জেনারেল রিজার্ভ কমিটি, (ঙ) বহির্বিভাগ রক্ষণবাহিনী।

২। **সৈন্য-বাহিনীর বিভাগঃ** (ক) বৃটিশ ও ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনী। ইহা লাইট ট্যাঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হইবে। (খ) ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনী। (গ) মোটরযান দ্বারা সুসজ্জিত ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনী। (ঘ) ভারতীয় ও বৃটিশ ফিল্ড আর্টিলারি বাহিনী। প্রতি বাহিনীই আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত ও ২৫ পাউণ্ড বন্দুকধারী হইবে। (ঙ) বৃটিশ ও ভারতীয় রাইফেলধারী পদাতিক বাহিনী।

বিমান-বাহিনীর সজ্জাঃ (ক) বোমারু বিমান বাহিনী। (খ) ভারতীয় বিমান বাহিনী—ইহার গঠন। ১৯৪০ সালের শেষভাগে সম্পূর্ণ হইবে (গ) কয়েকটি বন্দরে উপকূল রক্ষায় নিযুক্ত বিমান বাহিনী। (ঘ) রাজকীয় নৌ-বাহিনী।

৪। **যুদ্ধ-জাহাজঃ** (ক) চারিটি "রিটার্ণ" শ্রেণীর প্রহরী জাহাজ। (খ) চারিটী "মাষ্টিফ" শ্রেণীর ট্রলার 'ইন্দাস' ও 'হিন্দুস্থান' নূতন ধরণে সজ্জিত হইবে। ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইবে।

৫। ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য বর্ত্তমান অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাসমূহকে বর্দ্ধিত কিংবা পুনর্গঠিত করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে।

— শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিচিত্রার নিয়মাবলী

১। বিচিত্রার সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা ছয় আনা, ষাণ্মাষিক তিন টাকা তিন আনা। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য বিনা ডাক মাশুল ছয় টাকা, ষাণ্মাষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল তিন টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ব্রহ্মদেশের সডাক বার্ষিক মূল্য সাত টাকা ও সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ খরচ পাঁচ আনা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে সডাক বার্ষিক ও সডাক ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে দশটাকা ও পাঁচ টাকা। বিজ্ঞাপনের দাম এবং মূল্যাদি 'ম্যানেজার বিচিত্রা নিকেতন লিঃ'—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। শ্রাবণ মাস হইতে বিচিত্রার বর্ষ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইতে সেই বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। কিন্তু যে-মাস হইতে ইচ্ছা উল্লিখিত হারে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। বিচিত্রা প্রতি বাঙলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে সেই মাসের বিচিত্রা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে ঐই মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে নিষেধ-আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকের পক্ষে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের পক্ষে ষাণ্মাসিক চাঁদার হিসাবে ভি-পি করা হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম পড়ে।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময়ে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মনিঅর্ডার কুপনে অথবা আদেশ-পত্রে জানাইবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য চাঁদা পাঠাইবার সময়ে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক সংখ্যা মনে না থাকিলে "পুরাতন গ্রাহক" নিশ্চয় লিখিবেন। নচেৎ আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

৬। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়েও গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চয় জানাইবেন, অন্যথা আমাদিগকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

প্রবন্ধাদি

৭। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৮। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ যাইবার ডাক খরচা না থাকিলে অমনোনীত কবিতা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৯। প্রবন্ধ-মনোনয়নের বিষয়ে সংবাদ লইতে হইলে এবং অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচ দিতে হয়। সংবাদ পাওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা না করিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১০। বর্ত্তমান মাস হইতে দুই বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সকল রচনা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথচ এতাবৎ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি অন্যত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এই মর্ম্মে লেখকের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে আর বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

১১। বাঙলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় আর তাহা দিতে পারা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপনাদির ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও সে খবর উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই, নচেৎ সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

১২। "বিচিত্রা"র সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণত "স্মল পাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; হেডিং প্রভৃতিতে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞাপনদাতা যদি 'বর্জ্জাইস্' অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চাহেন বা অন্য কোন প্রকার আকারে বিজ্ঞাপন সাজাইতে চাহেন, তাহা হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। সাধারণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

মাসিক বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা বা দুই কলম	২৫৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	১৩৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম	৭৲
ঐ সিকি কলম	৫৲
সূচীর পৃষ্ঠায় ১ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
ঐ ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৯৲
ঐ ঐ ⅛ পৃষ্ঠা	৬৲

কভারের ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠার রেট এবং অন্যান্য বিশেষ স্থানের রেট পত্রে জ্ঞাতব্য।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

ম্যানেজার—**বিচিত্রা নিকেতন লিঃ**

২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা